CUK-H 04865-56 P35951

নবী

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ /

৯ জুলাই ১৯৭৬ ॥

মূল্য ৭৫ পয়সা
অতিরিক্ত বিক্রয় মাশুল ৭ পয়সা

CENTRAL LIBRARY
UNIVERSITY OF CALCUTTA

56

হায়

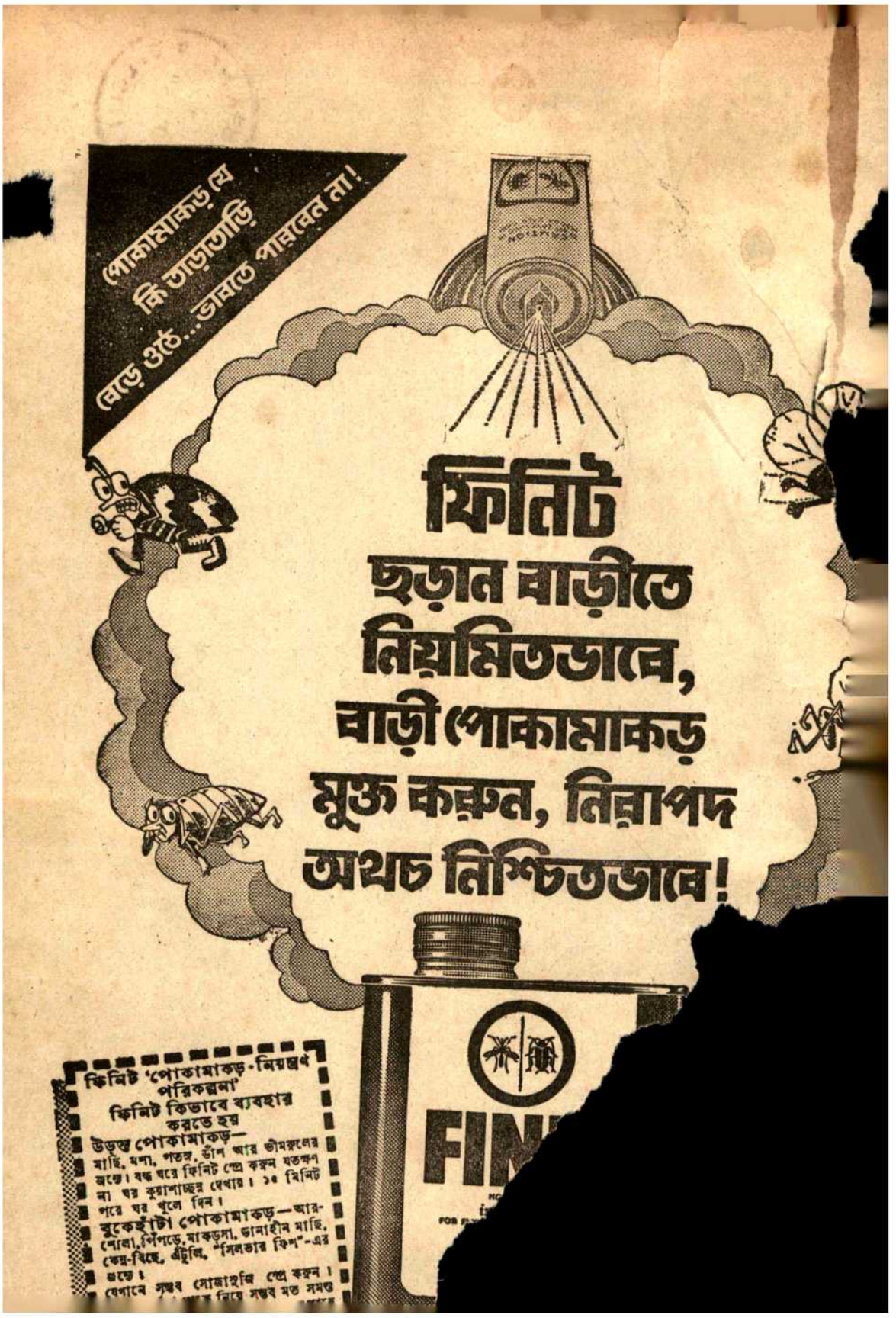
পোকামাকড় যে
কি তাড়াতাড়ি
বেড়ে ওঠে...ভাবতে পারবেন না!
ফিনিট
ছড়ান বাড়ীতে
নিয়মিতভাবে,
বাড়ী পোকামাকড়
মুক্ত করুন, নিরাপদ
অথচ নিশ্চিতভাবে!
ফিনিট 'পোকামাকড়-নিয়ন্ত্রণ' পরিকল্পনা'
ফিনিট কিভাবে ব্যবহার করতে হয়
উড়ন্ত পোকামাকড়—
মাছি, মশা, পতঙ্গ, ডাঁশ আর ভীমরুলের জন্যে। বন্ধ ঘরে ফিনিট স্প্রে করুন যতক্ষণ না ঘর কুয়াশাচ্ছন্ন দেখায়। ১০ মিনিট পরে ঘর খুলে দিন।
হুকেইটা পোকামাকড়—আরশোলা, পিঁপড়ে, মাকড়সা, ডানাহীন মাছি, কেন্নো-বিছে, এঁটুলি, "সিলভার ফিশ"-এর জন্যে।
যেখানে সম্ভব সোজাসুজি স্প্রে করুন।
FIN

ভ্রমণ-সাহিত্যে অনন্য শঙ্কু মহারাজের সার্থকতম রচনা

মধু-বৃন্দাবনে (তিন পর্বে সম্পূর্ণ)

আলোক-চিত্র শোভিত, মধুময় বৃন্দাবনের পথপঞ্জীসহ উপন্যাস-রসসিক্ত অপূর্ব গ্রন্থ।

ব্রজপর্ব ১০৲ * বনপর্ব ১০৲ * মহাবন পর্ব ১২৲

এই লেখকের নবতম রচনা

মন-দ্বারকায় ১২৲

শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করছে

নিখিলচন্দ্র সরকারের অনন্য উপন্যাস

সজনে নির্জনে ১২৲

প্রখ্যাত বিপ্লবী ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়ের

ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব ২৫৲

সুসাহিত্যিক নটরাজনের অনন্য গ্রন্থ

থানার মাটি নোনা ১৬৲

১৯৭৫ সালের সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কারপ্রাপ্ত

সুভাষ সমাজদারের

গঙ্গা থেকে কাস্পিয়ান ১৮৲

হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের

দুঃসাহসী অভিযাত্রী ৭৲

দুটি নির্ভীক, অচঞ্চল বাঙালী তরুণের সাইকেলে বিশ্ব-পরিভ্রমণের রোমাঞ্চকর কাহিনী। অসংখ্য আলোকচিত্র-শোভিত। শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস

ভালোবেসেছিলাম ৮৲

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

থৈ থৈ হাহাকার ১৮৲

চিরঞ্জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা

বিশ্বকাপ ফুটবল ২৫৲

দৃষ্টিহীনের উপন্যাস

মঞ্চ ১০৲

নিমাই ভট্টাচার্যের উপন্যাস

অন্যদিন ৪৲

কল্‌হনের উপন্যাস

খবরে প্রকাশ ১০৲

শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাস

অভয়ারণ্য ১৫৲

ব্রজমাধব ভট্টাচার্যের উপন্যাস

স্বর্ণভ্রমর ১৪৲

অমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

সুবর্নাশরি ২০৲

নিগুঢ়ানন্দের উপন্যাস

হৃদয়ে নাবিক ৮৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস

চাঁদের কাছাকাছি ৭৲

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাস

স্বাতীপ্রদীপ ১০৲

নারায়ণ সান্যালের উপন্যাস

বিহঙ্গ বাসনা ১০৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাস

একাল চিরকাল ১০৲

আবদুল জব্বারের

পল্লীর পদাবলী ১৬৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

নীলাঙ্গুরীয় ১২৲

শ্রীহংস-এর উপন্যাস

লাস্ট ওয়ার্ড ৮৲

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট; কলিকাতা-১২ ॥ ফোন : ৩৪-৮৩৫৬

প্রগতির নতুন প্রেরণায় ভারত

১৯৭৫-৭৬

তন্তুবায় এবং শ্রমিকদের সাহায্যার্থে

- জমে যাওয়া তাঁতের কাপড় খালাস করার জন্যে ৪৭·২ মিলিয়ন টাকা দেওয়া হয়েছে।
- হস্তচালিত তাঁতশিল্প সম্প্রসারিত করে তার বিকাশ-কল্পে তেরটি নিবিড় উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং কুড়িটি রপ্তানি উন্নয়ন কেন্দ্র গড়ে উঠছে।
- 'জনতা' বস্ত্রের গুণমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা সহজে পাওয়া যাচ্ছে। জুলাই ১৯৭৫ থেকে খুচরো বিক্রীর কেন্দ্র বৃদ্ধি পেয়ে ৪৭,৬৯৪—এতে দাঁড়িয়েছে যার শতকরা আশীটি হ'ল পল্লী অঞ্চলে।
- সড়কপথে দেশের সর্বত্র অত্যাবশ্যক সামগ্রী অনায়াসে নিয়ে যাবার জন্যে ১,১৮১ জাতীয় পারমিট ছাড়া হয়েছে।
- সাতচল্লিশটি কেন্দ্রীয় সরকারী শিল্প সংস্থা সমেত ৬১৭-এরও বেশি শিল্প সংস্থায়, পরিচালন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের অংশীদার করার জন্যে, 'শপ্ কাউন্সিল' এবং 'জয়েণ্ট কাউন্সিল' স্থাপন করা হয়েছে।

ডিএভিপি ৭৬।১২

১৬ বর্ষ

অমৃত

৯ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ফরেন নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 9th July, 1976 শুক্রবার, ২৫ আষাঢ়, ১৩৮৩

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৬	সম্পাদকীয়	
৯	ভবিষ্যতের ছায়া	(গল্প) শ্রীপ্রফুল্ল রায়
১২	নিশিগন্ধ	(গল্প) ঐ
১৭	নতুন বই	
১৯	বিজ্ঞাপন বিচিত্রা	শ্রীআনন্দ রায়
২১	কথায় কথায়	শ্রীতারাপদ রায়
২২	বিষাদের গভীরে	(কবিতা) শ্রীহরিজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়
২২	হোমের আগুন	(কবিতা) শ্রীগৌতম দাসগুপ্ত
২২	অন্তত একবার	(কবিতা) ওয়াজেদ আলি
২৩	গোধূলিবা	(উপন্যাস) শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
২৬	মনের অসুখ	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ-এর

সবার প্রিয় সুভাষ ১৫

গী দ্য মপাসাঁ-র বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস

সুন্দর তুমি প্রিয়তম ১২

চৌধুরী তোফাজ্জল হোসেন অবধূত-এর উপন্যাস

দুর্গমচিসুল ৬ পথে যেতে যেতে ৫

হোমার রচনাসমগ্র

প্রকাশিত হয়েছে। এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। গ্রাহকমূল্য ১৫

দান্তে রচনাসমগ্র

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। গ্রাহকমূল্য ১৫

শেক্সপীয়ার রচনাবলী

৫ম খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে জুলাই মাসের শেষে।

মোট গ্রাহকমূল্য ষাট টাকা। অনুবাদ : সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

তুলি-কলম : ১ কলেজ রো, কলকাতা—৯ ফোন : ৩৪-৮১৪০

কলেজ পাঠ্যপুস্তক

দর্শন (Philosophy)

ভারতীয় দর্শন—
১ম খণ্ড—৯ম সংস্করণ ১২-০০
ভারতীয় দর্শন—
২য় খণ্ড—৩য় সংস্করণ ৭-০০
ভারতীয় দর্শন—
৩য় খণ্ড (বেদ ও উপনিষদ) ৭-০০
পাশ্চাত্ত্য দর্শন—১১শ সংস্করণ ১২-০০
নীতিবিজ্ঞান—৭ম সংস্করণ ১২-০০
সমাজদর্শন—৯ম সংস্করণ ১২-০০
মনোবিদ্যা—৮ম সংস্করণ ২২-০০
পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—
(বেকন-হিউম) ৩য় সংস্করণ ১২-০০
পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস—কান্ট ১৮-০০
ধর্মদর্শন ২২-০০
সমাজ মনোবিজ্ঞান— ১০-০০
অধিবিদ্যার কয়েকটি সমস্যা—
৩য় সংস্করণ ৬-০০

শিক্ষা (Education)

অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও রায় প্রণীত
শিক্ষাতত্ত্ব—৩য় সংস্করণ ১৪-০০
ভারতের শিক্ষা সমস্যা—
৩য় সংস্করণ ১৫-০০
শিক্ষা মনোবিজ্ঞান— —
৪র্থ সংস্করণ ২২-০০

শিক্ষক শিক্ষণ

অধ্যাপক গৌরদাস হালদার প্রণীত
শিক্ষণ প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ—
১৬-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে অর্থনীতি ও
পৌরবিজ্ঞান ১৪-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে ইতিহাস— ১৫-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষার ইতিহাস—১৬-০০
অধ্যাপক সেনগুপ্ত রায় ও ঘোষ প্রণীত
শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান—
২য় সংস্করণ ২৫-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষাতত্ত্ব— ১৬-০০

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য

উচ্চ মাধ্যমিক দর্শন—
অধ্যাপক প্রমাদবন্ধু সেনগুপ্ত
উচ্চ মাধ্যমিক মনোবিজ্ঞান—
—অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও সেন
উচ্চ মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা—
অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় ও সেনগুপ্ত
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা—
—অধ্যাপক সেনগুপ্ত, ঘোষ ও হালদার

BP ব্যানার্জী পাবলিশার্স

৫।১এ কলেজ রো, পিন-৭০০০০৯
ফোন : ৩৪-৭২৩৪

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে আমরা দায়ী থাকব না। অমনোনীত রচনা ফেরতযোগ্য হলে তার সঙ্গে যথেষ্ট ডাকটিকিট পাঠাবেন।

২। পৌরাণিক রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। ব্যঙ্গাত্মক ও সাহিত্যিক রচনাদি ছাড়া অন্য প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে অমৃত কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

সংশোধিত চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৮-০০	টাকা ৪৪-০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১৯-৫০	টাকা ২২-৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৮
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

পি এন বি

পেন্‌সানারদের সেবায় হাজির

আপনি কেন্দ্রীয় সরকারের অসামরিক বিভাগে কাজ করার পর অবসর নিয়েছেন কি? তা হলে এখন আমরা, আপনার পেন্‌সন আনিয়ে দিতে পারি।

দিল্লী/নতুন দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা, হায়দ্রাবাদ, ব্যাঙ্গালোর এবং লক্ষ্ণৌ-এ আমাদের যে কোনও শাখায় একটা সেভিংস/কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলুন আর আপনার ট্রেজারী অফিসারকে, আমাদের সংশ্লিষ্ট শাখায় আপনার অ্যাকাউন্টে, আপনার পেন্‌সান জমা দিতে বলুন। একবার এই ব্যবস্থা চালু হয়ে গেলে আপনাকে আর ভাবতে হবে না। পেন্‌সান পাবার জন্য স্রেফ একটা চেক্ কেটে দিলেই হল। ভেবে দেখুন ...না কোনও ঝঞ্ঝাট, না কোন দুশ্চিন্তা। আমাদের 'টেলার' (TELLR SYSTEM) পদ্ধতি রয়েছে বলেই এ কথা বলছি।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ডিএভিপি ৭৬/১৭০

কেন্দ্রীয় সিভিল পেন্সনারগণ

লক্ষ্য করুন

নিম্নোক্ত শহরগুলিতে পাবলিক সেকটর ব্যাঙ্কের সমস্ত শাখাকে (স্টেট ব্যাঙ্ক ও ইহার সহায়কসমূহসহ) আপনাদের পেন্সন বন্টনের জন্য ক্ষমতা-মোদিত করা হইয়াছে।

দিল্লী। নবাদিল্লি, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলিকাতা, হায়দ্রাবাদ, বাঙ্গালোর ও লক্ষ্ণৌ। কোন বিল দাখিল করিতে হইবে না। স্বয়ংক্রিয়ভাবেই পেন্সনের টাকা আপনাদের সেভিংস ব্যাঙ্কে। কারেন্ট অ্যাকাউন্টে জমা পড়িবে।

স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ নিম্নোক্ত বিবরণ দিয়া ট্রেজারি অফিসারের নিকট অবিলম্বে দ্বিপ্রস্থে দরখাস্ত করিতে পারেন।

নাম ও ঠিকানা :
পিপিও নং।
যেখানে আদায়দান নিষ্পত্তি, সেই পাবলিক সেকটর ব্যাঙ্ক ও ইহার শাখার নাম।
উক্ত শাখায় সেভিংস। কারেন্ট অ্যাকাউন্ট নং।
নমুনা স্বাক্ষর।

জুলাই মাস এবং অপ্রাপ্ত বকেয়ার জন্য পাবলিক সেকটর ব্যাঙ্কসমূহ পেন্সনের টাকা বন্টন করিবে।

অর্থ মন্ত্রক,
অর্থনৈতিক বিষয়ক দপ্তর,
ভারত সরকার

ডিএভিপি—৭৬।১৭২

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
২৯	মোহিনী আট্টম	(উপন্যাস)	শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি
৩৫	রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা		শ্রীসুশান্তকুমার মিত্র
৩৭	অদ্য শেষ রজনী	(উপন্যাস)	শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
৪০	একালের গান		শ্রীসন্ধ্যা সেন
৪৪	একালের চিত্রকলা		শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৪৭	ওকে নিয়ে পাঁচজন	(গল্প)	শ্রীমানবেন্দ্র পাল
৫১	অঙ্গনা		শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৫২	মাঠ থেকে বলছি		শ্রীঅজয় বসু
৫৪	খেলাধুলো		দর্শক
৫	মাঠের নায়ক		শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
৬	সিনেম্যাটিক টক		শ্রীঅরুন মজুমদার
৫৮	লোকেশন থেকে		মুসাফির
৬০	কয়েকজন		নিয়াশিং
৬২	নাটমঞ্চ		
৬৩	জলসা		চিত্রাঙ্গদা

প্রচ্ছদ পরিচিতি : ১৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

অফিস এবং ইনজিনীয়ারিং-এর
নিখুঁত সরঞ্জাম
এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

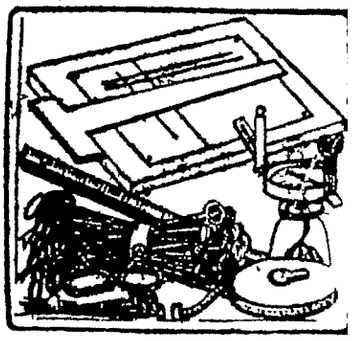

সার্ভে, ড্রইং, নানা রকম কাগজ
খাতা, লেজার, ক্যাশবই কালি ও
উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য
অন্যতম প্রতিষ্ঠান
কুইক ষ্টেশনারী ষ্টোর্স
৬৩ই, রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিঃ-১
ফোন : ২২-৮৫৮৮, ৬৭-৪৬৬৪
গ্রাম : অর্ষারপিন, পোষ্ট বক্স—৩৮ হাওড়া
পরিবেশক : কার্মলিন প্রডাক্টস
(ষ্টেশনারী বিভাগ)

বিখ্যাত ডাটা
গুঁড়ো মশলার
প্রস্তুতকারক
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত
(কুকমী) প্রাঃ লিঃ
এখন আপনাদের দিচ্ছেন
একটি নতুন অতি
সুদৃশ্য টিনের কৌটায়
সবরকম গুঁড়ো মশলার
অপূর্ব সংমিশ্রণ

এক কৌটা ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন
কুইন প্যাক কিনলে আর কোনরকম
মশলা এখন কি পেঁয়াজ, আদা, রসুন
প্রভৃতি আলাদা করে রান্নায় দিতে হয় না।
ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাকএ
মাছ, মাংস, ডিম ও সবরকম মুখরোচক
তরিতরকারি অল্প সময়ে চটপট রান্না
করা যায়। আপনার সবরকম রান্নায়
আজই ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার
(কিচেন কুইন প্যাক) ব্যবহার করুন।

ডাটা
রেডিমিক্সড কারি
পাউডার
কিচেন কুইন প্যাক

প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ
২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭, পোষ্ট বক্স নং ৬৭৭৪.
ফোন : ৩৩-১৪৩৭, ৩৪-১৭০৮

PAN—KCD-74

সম্পাদকীয়

একটি বছর, একটি যুগ

ইতিহাসের বিস্তীর্ণ পটভূমিতে হাজার হাজার বছরের কথা ভাবলে একটি বছর হয়তো মনে হতে পারে নিতান্তই সামান্য, কিন্তু জাতীয় জীবনের কোনো কোনো সন্ধিক্ষণে তার তাৎপর্য হয়ে উঠতে পারে অতুলনীয়।

ঠিক সেই ঘটনাই সুস্পষ্ট হয়েছে আমাদের এই দেশে।

কোনো ভারতীয়ই ভুলতে পারবে না ১৯৭৫ সলের ২৬শে থেকে ১৯৭৬ সালের ২৬শে জুন পর্যন্ত, এই একটি বছরের পবিবর্তন ও রূপান্তরের ইতিহাস। ভুলতে পবরে না কেউই এই ৩৬৫ দিনের শুরুর দিকে সেই অসন্ন দুর্বিপাকের ঘনঘটা, কিন্তু জরুরী অবস্থা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই কেমন ফুৎকারে মিলিয়ে গেল সেই মেঘডম্বর। আসমুদ্র হিমাদ্রি যাঁরা কম্পিত করে তুলেছিলেন তাঁদের সিংহনাদে, দেখা গেল কেউই তাঁদের সমর্থনে টুঁ-শব্দটুকুও করে নি। তাঁরা ছাত্রদের স্কুল-কলেজ বয়কট কবতে বলছিলেন, ছাত্ররা প্রথমে কোনো কোনো শহরে কিছুটা বিভ্রান্ত হলেও অচিরেই তাদের ভুল বুঝতে পেরে ফিরে এল বিদ্যায়তনে। তাঁরা ট্যাকস দেওয়া বন্ধ করতে বলছিলেন, কেউই তাতে কান দিল না। তাঁরা পুলিশ এবং সেনাবাহিনীকে সরকারী আদেশ অমান্য ও বিদ্রোহ করতে উস্কানী দিলেন, কর্তব্যপরায়ণ শান্তিরক্ষক ও ভারতীয় জওয়ানেরা যোগ্য অবহেলার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলেন সে উপদেশ। কিন্তু হতাশ হওয়া এই ভদলোকদের স্বভাবই নয়, কেননা তাঁরা স্বনিযুক্ত নেতা—নেতৃত্ব তাঁদের বারে বারে ব্যর্থ এবং উপহাসিত হলেও নেতা না হয়ে তাঁরা থাকতেই পারেন না।

তাঁদের প্রধান যুদ্ধ-জিগীব ছিল—ভ্রষ্টাচার। কিন্তু ভ্রষ্টাচারের জবাব কি নষ্টাচার? ভারতের যেখানে যতকিছু গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু আছে তাকে অচল কবে দেওয়া, সেকি স্বৈরাচারের পথই সুগম করে দিত না জাতির জীবনে? ঠিক সেই পথটিই বেছে নিয়েছিলেন এই সার্বিক বিপ্লবের ধ্বজাধাবীরা। গত বছর ২৫শে জুন দিল্লিতে একটা সভা ডেকে ঘোষণা কবলেন তাঁরা তাঁদের বিদ্রোহ আর বিপ্লবের কর্মসূচি।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে ২৬শে জুন সকালবেলাতেই বেতার ভাষণে জানালেন জরুরী অবস্থা ঘোষণার কথা। রাজধানীর রঙ্গমঞ্চে যাঁরা নায়কের ভূমিকায় গলাবাজী করছিলেন, ২৫শে জুন, ২৬শে জুন দেখা গেল তাঁদের সঙ্গে সাঙ্কো পাঞ্জার ভূমিকা নিতেও রাজি নয় কেউ।

সারা ভাবত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

এই এক বছরে আমরা অনেক পেয়েছি। পেয়েছি আমাদের জাতীয় জীবনে নিরাপত্তা, বিশ দফা কর্মসূচি এবং তার ক্রমিক রূপায়ণ, শৃঙ্খলাবোধ এবং আত্মবিশ্বাস। মুদ্রাস্ফীতি, যা ছিল এর পূর্ববর্তী দুটি দশকে ক্রমবর্ধমান এবং যা থেকে পশ্চিমের উন্নত দেশগুলিও পায়নি কোনোরকম উদ্ধারেব পথ, অতি আশ্চর্যভাবে সেই দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে এসে ভারতের অর্থ ব্যবস্থাকে দাঁড় করাতে পেরেছি আমবা একটা সফল ও নির্ভরযোগ্য ভিত্তিব উপর। পেরেছি একটা নতুন দায়িত্ববোধ, যা আমাদেব শিখিয়েছে—সেই গণতন্ত্রই প্রকৃত সার্থক যা দেশের বৃহত্তম জনসাধারণকে সাহায্য করে তাদের অন্নবস্ত্রেব সমস্যাকে মোকাবিলা করতে। এবং ভারতের সত্তরভাগ লোকই যেহেতু যুক্ত রয়েছে কৃষির সঙ্গেই, তাই ভূমিহীন চাষীদের জমি দেওয়া এবং গৃহহীনকে বাস্তু ভিটেয় ফিরিয়ে আনা, এই গণতন্ত্রকে কার্যকরভাবে সফল করার সব থেকে জরুরী দায়িত্ব। গত এক বছরে এই যে এক নতুন সচেতনতা ছড়িয়ে পড়েছে ভারতীয় জীবনের সর্বস্তরে—জরুরী অবস্থার যুগান্তকারী অবদান এইগুলিই।

এর জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ আমাদেব প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে। সঠিক সময়ে তিনি সঠিক পদক্ষেপে ভারতীয় জীবনযন্ত্রাকে গভীর এক নৈবাশ্য ও নৈরাজ্যের চক্রান্ত থেকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন নতুন যুগের তোরণে। এ যুগের তাৎপর্যকে সার্থক করে তোলার পথ হল বিশ দফা কর্মসূচির ক্লান্তিহীন রূপায়ণ।

এবং সেই হবে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানানোর যোগ্য উপায়।

দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ।

জনশাসনের একবছর

২৬ জুন জরুরী অবস্থা ঘোষণার এক বছর পূর্ণ হলো। নিরোধীদের ভাষায় এটা হচ্ছে অনুশাসন পর্ব। আজ তাই দিকে দিকে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক এমনকি আপামর জনসাধারণের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে, অনুশাসন পর্বের এই ৩৬৫ দিন কি কাজ হয়েছে বা আমরা কোথায় আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি? অবশ্যই এই দুটি আমাদের যে অভীষ্ট লক্ষ্য, তা ভুললে চলবে না।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিরুদ্ধ সমাজ বিভিন্ন আলোচনা চক্র সভা-সমিতিতে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, গত ১৮ জুন নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী অন্যতম সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষকে এক বিশেষ

মহেন্দ্র চক্রবর্তী

সাক্ষাৎকারে যে সকল কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এক বছর আগে দেশের সামনে যে বিপদ ছিল, এখনও তা আছে। নাশকতামূলক কাজ হচ্ছে ভিতর থেকে এবং তার উস্কানি আসছে বাইরে থেকে।

১৯৭৫ সালে জুন মাসের আগে দেশের ভেতরে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা চলেছিল, তা শুধু প্রধানমন্ত্রী নয়, কলকাতার একটা আলোচনা সভায় বক্তৃতায় পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়, উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী নন্দিনী সংপতি, আসামের মুখ্যমন্ত্রী শরৎচন্দ্র সিংহ, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মাসুদ প্রমুখরা বিশদভাবে বিবৃত করেছেন। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে,

অমৃতবাজার পত্রিকা ও যুগান্তর পত্রিকার যুক্ত উদ্যোগে কলকাতায় আই সি আই-এর অডিটোরিয়ামে তিনদিন ধরে এই আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। বিষয়বস্তু ছিল 'জরুরী অবস্থার এক বছর ও তার সাফল্য'। সিদ্ধার্থবাবু নিজে এই আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করেন। অমৃতবাজার ও যুগান্তরের ইতিহাস যে জাতীয়তা আন্দোলনের ইতিহাস তা মুখ্যমন্ত্রী একা নয় তিনদিনে অনেক বক্তাই তার উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন: বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্যের শক্তির হাত থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য অন্য কোন পথ নেই বুঝেই প্রধানমন্ত্রী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন। এই জরুরী অবস্থার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী তুষারবাবুকে সাক্ষাৎকারের সময় বলেন, জরুরী অবস্থায় নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে অধিকতর চেতনা এসেছে বটে কিন্তু এই নিয়মানুবর্তিতা এখনও জীবনের একটা অংশ হয়ে উঠতে পারেনি। এই প্রবীণ সাংবাদিকের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটি মন্তব্য রেখেছেন। তাঁর মন্তব্য দেশবাসী নিশ্চয় বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্লেষণ করে দেখবেন। ইন্দিরাজীর মন্তব্যগুলো : (১) ঠিক এই মুহূর্তে নির্বাচন সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারি না। (২) আমরা ভারতীয় দর্শনের মূল ভিত্তিতে অটল থাকতে চাই। (৩) আমাদের এমন একটা পদ্ধতি ব্যবস্থা করতে হবে যাতে গণতান্ত্রিক নিয়মানুবর্তিতা স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। (৪) আমরা জানি জরুরী অবস্থায় কি উপকার হয়েছে। আমাদের চেষ্টা উৎপাদন বাড়ানো। (৬) আমাদের প্রতিবেশী প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র মজুত করেছে, সেই কারণে আশঙ্কা রয়েই গেছে। (৭) এখন আরো বেশী গুরুত্ব দেওয়া হবে সেচ ও বিদ্যুতের ওপর।

'অনুশাসনের এক বছর'—এই আলোচনা চক্রে অংশ গ্রহণ করেছিলেন পূর্ব ভারতের চারজন মুখ্যমন্ত্রী, পাঁচজন রাজ্যমন্ত্রী, দুজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বারোজন উপাচার্য, বিজ্ঞানী, ক্রীড়াবিদ, অভিনেতা অর্থনীতিবিদ, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী বিচারপতি সাংবাদিক প্রমুখ। সিদ্ধার্থবাবু আলোচনা চক্রে অংশ নিয়ে প্রথমই প্রশ্ন তুলেছিলেন: প্রধানমন্ত্রী নীরব দর্শক থাকলে দেশকে বহুধা বিভক্ত হতে দিলে কেউ তাঁর পক্ষে যেতেন কি?

এই তিনদিনের আলোচনা চক্র সবদিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ। সব কয়জন বক্তার বক্তৃতাই যুক্তি ও তথ্যে পূর্ণ। যে যার দৃষ্টিকোণ থেকে জরুরী অবস্থা ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন। কেউ কেউ বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের মধ্যে অনেকেই এমন পর্যন্ত মন্তব্য করেছেন জরুরী অবস্থা আরো আগে ঘোষিত হলে দেশের উন্নয়নমূলক কাজ অনেক বেশী এগিয়ে যেতে পারতো।

পত্রিকার সম্পাদক তুষারবাবু বলেছেন : দেশের একজন প্রবীণতম সাংবাদিক হিসেবে তিনি বলতে পারেন, চরিত্রহনন বা কুৎসা প্রচার বন্ধ করাকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ বলা চলে না। তিনি মনে করেন সংবাদপত্রের কেউ কেউ স্বাধীনতার অপব্যবহার করেছিলেন। তাতে ভারতের গণতান্ত্রিক অগ্রগতি বাধা পাচ্ছিল।

কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ভাষণ সুধীজনের প্রশংসা লাভ করে। তিনি সুন্দর বাংলায় বলেন : জরুরী অবস্থা ঘোষণা শুধু উচিত কাজই হয়নি। তার ঔচিত্য প্রমাণিত হয়েছে। বিলেতী গণতন্ত্রের ভাল ও মন্দের দিকটা ১৯৪৭ সালে পরিষ্কার বোঝা যায়নি। এখন কিন্তু দেখা যাবে বহু দল। সংবাদপত্র, বিচার ব্যবস্থা ও শ্রমিক আন্দোলনের অবাধ স্বাধীনতা প্রভৃতি অন্য কোন দেশেই নেই। মানুষের দেশের পক্ষে তা স্বীকার করে নেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী নন্দিনী সৎপতী বলেছেন জরুরী অবস্থা ঘোষিত হবার দরুণই ভারতের জনগণ নিজেদের চিনতে পেরেছে। তিনি আরো বলেন বিশৃঙ্খলা ও অবনতি দূর করে শ্রেষ্ঠ অর্থনীতি কায়েম করতে সারা দেশ একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে।

দিল্লির নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ বি ডি নাগচৌধুরী বলেছেন : জরুরী অবস্থা নতুন সুযোগ এনে দিয়েছে। মুদ্রাস্ফীতির গতি এখন ভিন্ন দিকে।

আসামের মুখ্যমন্ত্রী শরৎচন্দ্র সিংহ বলেছেন : জরুরী অবস্থার মধ্যে ব্যবহারিক জীবনে সাফল্য লাভ করা ছাড়াও সর্বস্তরে মানসিকতায় বিশেষ রূপান্তর ঘটেছে। এবং সেটাই বড় কথা। জনসাধারণ বুঝতে পেরেছে অন্যায়কারী কারা? তবে আগে সাধারণ মানুষের শক্তি ছিল না। কিন্তু এখন সে সেই সাহস অর্জন করেছে। তাই দিকে দিকে সাফল্যের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

অকস্মাৎ বন্যার জন্য শেষ মুহূর্তে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত এসে পৌঁছতে পারেননি। কিন্তু তিনি তাঁর মন্ত্রিসভার রাজস্বমন্ত্রীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর লিখিত ভাষণে ছিল, জরুরী অবস্থা বিনোবাজীর ভাষায় যা হচ্ছে অনুশাসন বা শৃঙ্খলার পর্ব। তাই জাতির সবস্তরে আজ সৃজনশীলতার আবহাওয়ার সূচনা করছে। রাজস্বমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর এই লিখিত ভাষণ পাঠ করার আগে মুখবন্ধে বলেন : জরুরী অবস্থার আগে উচ্ছৃঙ্খলতার যে তান্ডব দেখা গিয়েছিল, তা বন্ধ হয়েছে।

বিচারপতি মাসুদ মনে করেন, বর্তমান কাল হচ্ছে প্রায়োগিক বিপ্লবের যুগ। এই যুগ হচ্ছে হতাশা থেকে পূর্ণতায় নিয়ে যাওয়ার যুগ। ভারতের ইতিহাসে এটা চিরদিনের জন্য লেখা থাকবে।

ভুবনকান্তি ঘোষ বলেন ভারতকে শক্তিশালী করার জন্য জরুরী অবস্থার প্রয়োজন ছিল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মানে যদি চরিত্রহনন কুৎসা রটনা সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানো হয় তাহলে তিনি তার মধ্যে নেই। সংবাদপত্রের একটি অংশ দেশ এবং গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে গিয়েছিল বলেই সেনসার ব্যবস্থা। ইন্দিরাজি যথেচ্ছাচারেই শুধু বাধা দিয়েছেন। তিনি জাতিকে বুঝিয়ে দিয়েছেন শুধু দাবি নয় দেশবাসীর দায়িত্বও আছে। জরুরী অবস্থার এক বছরে যা হয়েছে গত শ বছরেও তা হয়নি। গরিবী হঠাও শুধু ধ্বনিই ছিল। এখন সত্যিই গরিবী হঠছে।

সাংবাদিক কে এম মাথু বলেছেন : জরুরী অবস্থা সাংবাদিকদের নতুনভাবে সংবাদপত্র গড়ে তোলার উৎসাহ দিয়েছে।

মোদ্দা কথা এই তিনদিন ধরে বিভিন্ন বাক্তিরা এই আলোচনা চক্রে যোগ দিয়ে তাঁদের যে সুচিন্তিত মতামত বিশ্লেষণ তা সেই সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ধারক ও বাহকদের কাছে 'মুখের মত জবাব' হয়েছে। বিশেষ করে বিদেশী কয়েকটি সংবাদপত্র যারা ভারতে গণতন্ত্র গেলো গেলো বলে কুম্ভিরাশ্রু ফেলছে তাদের ভেতরের চক্রান্ত সাধারণ মানুষের সামনে প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরতে বক্তারা সক্ষম হয়েছেন। কি পরিস্থিতিতে ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী ও পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠদের সুপারিশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন, কিংবা যে আইন বা সংবিধান দরিদ্র মানুষের মঙ্গল আনে না, সেই তা কেন পরিবর্তন করা একান্ত দরকার, তাও ঐতিহাসিক রাজনীতিবিদ বা সাংবাদিকরা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। সবদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, এই আলোচনা চক্র ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এতো বড় তাৎপর্যপূর্ণ এক ঘটনা সম্পর্কে আলোচনার জন্য সেখানে এমন একটা মঞ্চ গড়ে উঠেছিল যেখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অকপটে তাঁদের বক্তব্য রেখেছেন। জরুরী অবস্থা বলবৎ রাখার পক্ষেই তাঁরা অভিমত দেন।

একই লেখক

দুই গল্প : দুই সময়

ভবিষ্যতের ছায়া

প্রফুল্ল রায়

মুখ না তুলেও সুজাতা টের পেল কারা যেন তার আর অরুণাভর মাথার ওপর একটা নতুন তসরের চাদর দিয়ে চটপট চাঁদোয়া বানিয়ে ফেলল। তারপর চারজন চাদরটার চারটে কোণ ধরে দাঁড়িয়ে গেল।

এদিকটায় বিয়ের আসর। কনেকে সাত-পাক ঘোরাবার পর শুভদৃষ্টির তোড়জোড় চলছে। এখন এখানে দারুণ ভিড়; গোটা বিয়ে-বাড়িটাই যেন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছে। দু পক্ষের পুরোহিতরা তো আছেনই। তাছাড়া আছেন ভারিক্কি চেহারার বরকর্তা—খুব সম্ভব অরুণাভর পিসে-মশাই-ই হবেন। আর আছে সুজাতাদের দিকের আত্মীয়-স্বজন নিমন্ত্রিত অতিথি আর ব্যবস্থাকারীরা।

বয়স্করা এবং যাঁরা বাবা-কাকা জাতীয় অভিভাবক—একটু দূরে দূরেই আছেন। কিন্তু সুজাতা আর অরুণাভর বন্ধু-বান্ধবরা তাদের গা ঘেঁষে ঘিরে রয়েছে।

সুজাতার ডান পাশে আছে তার ফুল-মাসি আর রাঙা কাকিমা। দুজনেই দারুণ আমুদে এবং হুল্লোড়বাজ। বয়সের তফাতটাকে তারা আমলই দেয় না। তাদের আচরণ চালচলন একেবারে সমবয়সী বন্ধুর মতো। তাই নিজেদের বয়স থেকে দশ পনেরটা বছর ছেঁটে ফেলে এই দলে ভিড়ে গেছে। সুজাতার বাঁদিকে রয়েছে তার কলেজের বন্ধুরা—বিশাখা হৈমন্তী সোমা মৃদুলা স্বাতী ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুজাতা আস্ত নতমুখে দাঁড়িয়ে ছিল। তার পরনে জরির কাজ-করা শাল বেনারসী আর ওই একই কাপড়ের ব্লাউজ। হাতে পল-কাটা সোনার চুড়ি আর ব্রেসলেট। তিন আঙুলে তিনটে আংটি—একটা মুক্তোর একটা হীরের আরেকটা সবুজ মীনে-করা তার কপালে সেটিং-এর টিকলি গলায় চিক। আর সীতাহার—তার ওপর টাটকা যুঁইয়ের মালা। সারা মুখে চন্দনের কারুকাজ মাথায় রুপোর মুকুট।

এমনিতেই সুজাতা দারুণ সুন্দরী। এখন বিয়ের সাজে সে যেন কোন অলীক স্বপ্নের দেশের পরী হয়ে গেছে।

অরুণাভও খুব সুপুরুষ। ছ' ফুটের ওপর লম্বা। টান টান সমুন্নত শরীর। চন্দন কাঠ খোদাই করে তার চেহারাটা যেন বার করে আনা হয়েছে। পরনে গরদের ধুতি গরদের পাঞ্জাবি হীরের বোতাম হীরের আংটি। কপালে চন্দনের টিপ আর মাথায় ফিলিগ্রির কাজ-করা রুপোর টোপর। গলায় সুজাতার মতোই যুঁইয়ের মালা।

আশপাশ থেকে কারা যেন উলু দিচ্ছিল। ঘন ঘন শাঁখ বাজাচ্ছিল। বাড়ির গেটের কাছে উঁচু মঞ্চ করে সানাই বসানো হয়েছে। এই মুহূর্তে সানাইওলা ভারি মিষ্টি একটা সুর বাজিয়ে যাচ্ছে।

অরুণাভর এক বন্ধু ওধার থেকে বলে উঠল ফাইন মানিয়ে দুজনকে। একেবারে মেড ফর ইচ আদার।'

চারদিক থেকে সবাই কোরাসে বলে উঠল 'ঠিক ঠিক—' সেই সঙ্গে টুকরো টুকরো হাসি এবং নানারকম মজার মজার মন্তব্য চলছে।

এরই মধ্যে ফুলমাসি পাশ থেকে বলল 'মুখ তোল রিনি—তাকা তাকা—' সুজাতার ডাক নাম রিনি।

অরুণাভর আরেক বন্ধু ওধার থেকে বলল হ্যাঁ মাডাম তাকান—'

মুখটা তুলতে চেষ্টা করছে সুজাতা কিন্তু কিছুতেই পারছে না।

রাঙা কাকিমা এবার বলল 'মেয়ের কি লজ্জা! আরে বাবা সব মেয়েকেই বরের সঙ্গে শুভদৃষ্টি করতে হয়। আমরাও করেছি।' বলেই সুজাতার চিবুক ধরে মুখটা তুললেন 'দ্যাখ বরকে ভালো করে দ্যাখ—'

চারপাশে হাসি যেন একশো ফোয়ারা হয়ে ফেটে পড়ল।

সুজাতার চোখ দুটো লজ্জায় বুজে গিয়েছিল। বন্ধুরা হৈ-চৈ জুড়ে দিল 'চোখ বুজে বরকে দেখবে নাকি? তাকাও—'

এবার আস্তে আস্তে চোখ মেলল সুজাতা। দেখল সারা মুখে স্নিগ্ধ হাসির আলো মেখে তার দিকে তাকিয়ে আছে অরুণাভ।

অরুণাভ এর আগে মাত্র একবারই তার জ্যেঠামশাইর সঙ্গে সুজাতাকে দেখতে এ বাড়ি এসেছিল। মুখোমুখি বসেও তার দিকে ভালো করে তাকাতে পারে নি সুজাতা। লজ্জানত রক্তাভ মুখ বসে থাকতে থাকতে অরুণাভর একটা হাত দুটো পা কাঁপের একটু অংশ শুধু তার চোখে পড়েছিল। কলেজে-টলেজে পড়লেও সে খুব লাজুক ধরনের মেয়ে।

আজই এই শুভদৃষ্টির সময় সুজাতা অরুণাভকে ভালো করে দেখতে পাচ্ছে। স্বামীকে দেখতে দেখতে তার চোখ পাতা হঠাৎ কাঁপতে লাগল। বুকের ভেতরটা ভয়ঙ্কর ভয় পাওয়ার মতো দুলে উঠল। মনে হল, অনেক দূরে কোন এক সমুদ্র তীরে সে একটি তরুণীকে দেখতে পাচ্ছে। তার গায়ে পুরোপুরি বিধবার সাজ। সুজাতা বুঝতে পারল সে গল গল করে ঘামতে শুরু করছে। তার স্নায়ুতন্ত্রের মধ্য দিয়ে আগুনের স্রোত বয়ে যেতে লাগল।

রগাড়ের গলায় অরুণাভর এক বন্ধু বলে উঠল 'স্মাইল মাডাম, স্মাইল—'

আরেকজন বলল 'এমন যেন মুখ দেখাবেন হোল লাইফ কিন্তু অরুণাভ সেই রকম মুখই দেখবে। একটু হাসুন—হোয়াসে মুস্কুরা—'

সুজাতার বন্ধু হৈমন্তী এবার মুখ খুলল, 'তখন তো তাকাতে চাইছিলি না এখন যে চোখের পাতা পড়ছে না।'

স্বাতী বলল, 'একবার দেখেই চোখ নামাতে পারছিস না; এর পর তো আর কোন দিকেই তাকাবি না।'

হাসির সেই ফোয়ারাগুলো চারদিকে বার বার ফেটে পড়তে লাগল।

উলুধ্বনি, শাঁখের আওয়াজ, সানাইয়ের আচ্ছন্ন-করা সুরের মধ্যে শুভদৃষ্টি এবং মালাবদল হয়ে গেল। তারপর কোন এক সময় সুজাতার বাবা তাকে অরুণাভর হাতে সম্প্রদান করলেন। সেই সঙ্গে বারো কি-সব অনুষ্ঠান যেন করা হল।

চারদিকে অস্ত্র আলো অরুণ অনেক হৈ চৈ, পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ উচ্চ নিচু হাসির স্রোত নানারকম আচার-অনুষ্ঠান—কোন কিছুই যেন বুঝতে পারছে না সুজাতা, কিছুই তার ওপর দাগ কাটতে পারছে না। সে যা করতে বলছে হাতুড়ে এক দোরের মতো সে তাই করে যাচ্ছে। আর থেকে থেকেই সমুদ্রতীরে একটি বিধবা তরুণীর ছবি তার চোখের সামনে ফুটে উঠছে।

এক সময় বিয়ের আসর থেকে বর-কনেকে বাসরে নিয়ে যাওয়া হল।

সুজাতাদের দেশ ছিল পূর্ব বাংলায়, অরুণাভদের তা-ই। এই পক্ষই হিন্দু-অনুষ্ঠানে এখনও সেকেলে আচার-টাচার অক্ষর অক্ষরে মেনে চলে।

পূর্ব বাংলার রীতি অনুযায়ী বর-কনের চাকলেপা করা হল। তারপর খাওয়া-দাওয়া। সুজাতা কী যে খেল বুঝতে পারল না।

একটু রাত হলে বরযাত্রীরা বিদায় নিয়ে চলে গেল। যাবার সময় সুজাতার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করল এবং জানিয়ে দিল ফুলশয্যার দিন তাকে নিয়ে জমজমাট আসর বসাবে।

সুজাতার বন্ধুরা কিন্তু কেউ গেল না। তারা সুজাতার বাসর জাগবে।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাসরঘরে হুল্লোড় শুরু হল। হৈমন্তী আর বিশাখা গোটা কয়েক করে সাম্প্রতিক গান গাইল। তাদের গলা মোটামুটি ভালোই।

বিশ্রামের পর ফুলমণি হঠাৎ হারমোনিয়ম টেনে নিয়ে বলল, 'তুমরা ঐসব গান হবে না। এই শোন—' বলে সেদিনের চুরিয়ে আনা টপ্পা ধাঁচের পুরনো আমলের গান গাইতে লাগল একের পর এক। সেই সঙ্গে রাঙা কনিমা হাত দুটো মাথার ওপর তুলে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে মনের মতো নাচতে লাগল। মুহূর্তে তাদের ঘরে গেল।

হারমোনিয়ম থামতে গেস্ট বিয়ার ধরে যাচ্ছিল সবাই। অরুণাভ মিনমিনে গলায় বলল, 'মাগো রে বাবা, এরকম ঢাল দেখেছি তাতে বাড়ি।'

গান থামিয়ে ফুলমণি বলল 'কেনেই বোন—' সুজাতার বন্ধুদের দেখিয়ে বলল, 'আতোনাদের মেয়েগুলো কোন কামের না।' বলেই হারমোনিয়ামের রিডে ঝড় তুলে আবার গান ধরল।

পান বিড়ি-সুপারি, কোনদিকেই লক্ষ্য নেই সুজাতার। ঘোরের মধ্যে সে মাঝে মাঝেই অরুণাভর দিকে তাকাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রতীরের বালুকাবেলায় এক বিধবা তরুণীর বিষণ্ণ মুখ ফুটে উঠছে। মুখটা খুব স্পষ্ট নয়, ছবির ওপরকার কাচ ঘষা হলে যেরকম চেহারা দেখায়, মুখটা তেমনি ঝাপসা। তবু চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।

প্রায়ই সুজাতা এরকম ছবি দেখতে পায়। যখনই সঙ্গে হেরেই সে অনেক কিছু বুঝতে পারে। যতবার সে অরুণাভকে দেখছে ততবারই তার বুকের ঝড়ের মতো কিছু বয়ে যাচ্ছে।

মৃদুলা তাকে লক্ষ্য করছিল। আলতো করে তার পাশে একটা টোকা মেরে কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলল, 'এমন করে থাকবি না, চাঁদ হয়ে যাবি। একটু চা খাবি? কফি-টফি?'

মাথা নেড়ে না বলে সে যা জানাতে চাইল তা বুঝতে পারল না মৃদুলা। কথা আর বলে লাভ কি নেই না।

পরের দিন বাসি বিয়ের পর বাড়ি ফেরা নিয়ে হৈ-চৈ হল। তারপর একটু বিশ্রাম করতে না করতেই অরুণাভদের বাড়ির লোকেরা তাড়া দিতে লাগল। 'বিকেল হলে হবে। আমরা কিন্তু সন্ধের আগেই বেরুতে চাই।'

আজ দুপুরবেলাতেই অরুণাভদের নিয়ে মাসি-পিসি গুরুজন বাড়ি থেকে ওর মামা ফোটো তোলে। এরা আসেন আর দুই বোন এসেছে।

বাসেই তাদের দেখা হল না। সুজাতাকে বিদায় হাতে সাজিয়ে দিয়ে মুক্তকেশী [illegible] মতো ভরা গলায় বলে, এসো মা, বাড়িতে গিয়ে উঠল সুজাতা।

অরুণাভদের বাড়ি থেকে দশটা প্রাইভেটকার এসেছে। উপহার আর স্যুটকেস নিয়ে যাবার জন্য ওরা একটা বড় লরিও ভাড়া করে এনেছিল।

একটা গাড়ি শুধু সুজাতা আর অরুণাভর জন্য। বাকি গাড়িতে উঠছে অরুণাভর ভাই-বোন ভাগ্নে-ভাগ্নেরা।

মুর্শিদাবাদ থাকে পাইকপাড়ায়, অরুণাভদের বাড়ি টালিগঞ্জে—রিজেন্ট পার্কে। অনেকটা রাস্তা তাদের যেতে হবে।

গাড়ি ছাড়ার পরই অরুণাভ সুজাতার কাছে নিবিড় হয়ে বসেছে। স্ত্রীর একটা হাত তুলে নিয়ে খেলতে খেলতে দারুণ আবেগের গলায় নানারকম কথা বলে যাচ্ছিল অরুণাভ। বেশির ভাগ কথাই সুজাতার কানে যাচ্ছে না।

বিকেল আর সন্ধের মাঝামাঝি এই সময়টায় ট্রাফিক টঙ্কিস ছুটি হয়েছে। রাস্তায় এখন দারুণ ভিড়। অফিসফেরতি মানুষে আর গাড়িতেই ঢলের মতো হয়ে যাচ্ছিল। দু' ধারে বিরাট বিরাট বাড়ি, দোকান, শো-উইন্ডো। জানালার ওইসব এই সব দৃশ্য যেন বিছুই দেখতে পাচ্ছিল না সুজাতা। কাল শুভদৃষ্টির পর থেকেই 'হতাশ অরুণাভকে দেখছে বা তার কথা শুনছে তত বারই সমুদ্রের বেলাভূমিতে সেই বিধবা তরুণীর অস্পষ্ট বিষণ্ণ মুখ দেখতে পাচ্ছে।

সুজাতার বয়স যখন বারো-তেরো কোন থেকেই সে অনেক কিছু বহু আগেই দেখতে পায়।

একবার স্কুলের ছুটির দিনে দুপুরবেলা ঘুমোতে ঘুমোতে হঠাৎ স্বপ্নের ভেতর সে দেখতে পেল, খাটে করে শকাদ্রিনী কালীকালিকাকে শ্মশানে নিয়ে চলেছে। প্রকাণ্ড কাল ঠোঁট বেরিয়ে রয়েছে। পাশেই মা শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। সুজাতাকে ওইরকম উঠতে দেখে আধো ঘুমে ঘুমে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী হয়েছে রে বিনি?'

সুজাতার মনে হয়েছিল, সেই দুপুরবেলার স্বপ্নটা এখনও লেগে আছে। সে ভয়ে ঘামছিল। মা ঘুমের মধ্যে বলেছিল, 'মরুক কালিমার কি দুঃখ হচ্ছে!'

সুজাতার মা-বাবা সুজাতা এবং তাদের যে বোনেরা তখন পাটনায় থাকতেন। কলিনা আসেন পাটনা থেকে চিঠি এসেছে - তারা ভালো আছেন। মা বরাবরই করে তাকে যাবার জন্য লিখে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'দিনরাত কী যে ভাবিস! তাই পালিয়ে একবার দেখে আয়।'

সেদিনই সুজাতাদের টেলিগ্রাম এসেছিল [illegible] হঠাৎ বরোনোবি এটাকে মারা গেছেন।

[illegible] বাড়িতে [illegible] সে [illegible] মাকে [illegible] [illegible] [illegible]

জন্য তাঁকে পুলিশ হাজতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ভবিষ্যতের এইরকম অসংখ্য ছবি আগে থেকেই দেখেছে সুজাতা। পরে অনিবার্য এবং নিষ্ঠুর নিয়তির মতো সেগুলো ঠিক ঠিক ঘটে গেছে। মা-বাবা এই নিয়ে প্রচুর বকাবকি করেছেন। তাঁরা ভয়ও পেয়েছেন খুব এবং এ-ব্যাপারে তারা ভয়ানক চিন্তিতও। মেয়ে আগে থেকে অমঙ্গলের ভয়াবহ দৃশ্যগুলি ছবির মতো দেখতে পাবে এটা ভালো না!

সুজাতার একটা অভ্যাস আছে—মাঝে মধ্যে ছাদের কোণে কিংবা বারান্দার ধারে বা পড়ার টেবলে একা-একা চুপচাপ যাদুঘরে রাখা কোন মূর্তির মতো বসে থাকা।

মা বাবার ধারণা এইভাবে বসে থাকতে থাকতে, বিভিন্ন মানুষের কথা ভেবে যায়। একসময় সেই ভাবনাটা একটা তীক্ষ্ণ বিন্দুতে এসে তার চোখের সামনে ফ্ল্যাশ লাইটের মতো কোন বিপজ্জনক ছবি ফুটিয়ে দেয়। পরে দেখা যায় সেটা সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক নয়, হঠাৎ হঠাৎ চলতে-ফিরতে কিংবা ঘুমের ঘোরে ভবিষ্যতের ভয়াবহ কোন চিত্র দেখে ফেলে। যার ভবিষ্যতের ছবি সে দ্যাখে তার কথা হয়ত দু-মাসের মধ্যে একবারও ভাবেনি। আচমকা কোন এক অলৌকিক নিয়মে ব্যাপারটা ঘটে যায়, একে বাধা দেবার সাধ্য তার নেই।

দু-চারটে ঘটনা ঘটে যাবার পর মা-বাবা সুজাতাকে চোখে চোখে রেখেছেন। তাকে কখনও একলা থাকতে দেন না। নিজেরা তো বটেই, বাড়ির অন্য সবাইকে বলে দিয়েছেন তার ওপর নজর রাখতে। এর পর থেকে একলা থাকার সুযোগ সুজাতা আর পায় নি। কেউ না কেউ সর্বক্ষণ তার পাশে পাশে ছায়ার মতো ঘুরেছে। এমন কি রাত্তিরেও মা তার কাছে শুতেন। যতক্ষণ না সুজাতা ঘুমিয়ে পড়েছে। মা নানারকম গল্প করে তাকে অন্যমনস্ক করে রাখতেন।

হলে কি হবে চেনা বা অচেনা চেনা মানুষ সম্বন্ধে ভবিষ্যতের সেই চিত্রগুলো সুজাতা ঠিকই দেখে যেত। তবে মা-বাবা ভয় পাবেন তাদের উৎকণ্ঠা আবার বেড়ে যাবে সেই জন্য পরে আর ওইসব ছবির কথা বলত না। কিন্তু যা সে দেখত অনিবার্যভাবেই তা ঘটে যেত।

মাঝখানে বেশ কিছুদিন প্রায় মাস ছয়েকের মতো কোন খারাপ দৃশ্য দ্যাখে নি সুজাতা। কিন্তু একদিন রাত্রে কালই শুভদৃষ্টির সময় আবার সে একটা ভয়াবহ চিত্র দেখেছে। শরীর এবং মনের সবটুকু শক্তি এক জায়গায় এনে প্রাণপণে কাল থেকে সেই দৃশ্যটাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চেয়েছে, ভুলে যেতে চেষ্টা করেছে। বিয়েবাড়ির হৈ-চৈ হুল্লোড় আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের ভিড়ে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চেয়েছে কিন্তু সেই দৃশ্যটা তাকে ছাড়েনি। সারা রাত ধরেই সমুদ্রতীরে বাদামী বালির বেলাভূমিতে এক সুদর্শন-বিধুর তরুণীর বিষণ্ণ মুখ সুজাতাকে যেন তাড়া করে নিয়ে বেড়িয়েছে।

কখন সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছিল। লাটাইতে সুতো গুটনোর মতো শেষ-বেলার রোদটা কেউ যেন দ্রুত টেনে নিয়েছে। এখন কালো রঙের একটা জাল বৃত্তের মতো ছড়িয়ে গিয়ে চারদিকের উঁচু উঁচু বাড়ি, মানুষজন, রাস্তা—সব কিছু মুড়ে দিতে শুরু করেছে।

অরুণাভদের গাড়িগুলো কখনও পাশাপাশি, কখনও আগে-পরে করে এগিয়ে যাচ্ছিল। যখনই পাশাপাশি আসছিল অন্য গাড়ি থেকে অরুণাভর ছোট ভাইবোনেরা কিংবা ভাগ্নে খুশিতে চেঁচিয়ে উঠছিল। কেউ বা বগড়ের গলায় সুজাতাকে দু-একটা মজার কথা বলছিল।

এক সময় ওরা এসপ্ল্যানেডে পৌঁছে গেল। ট্রাফিক সিগনালে এখন লাল আলো জ্বলছে। কাজেই তাদের গাড়িটা থেমে গেছে। অন্য গাড়িটা এখন আর দেখা যাচ্ছে না। গাদা গাদা প্রাইভেট কার, বাস, টেম্পো, ভ্যান, মিনি বাস ইত্যাদির জটলায় কোথায় সেটা আটকে গেছে কে জানে।

অরুণাভ বলল, 'আজ তো কালরাত্রি, তাই না?'

দুর্মনস্কর মতো মাথা নাড়ল সুজাতা অর্থাৎ কালরাত্রিই।

অরুণাভ আবার বলল, 'বাড়িতে যাওয়া মাত্র মা তোমাকে তার কোন গোপন 'সেল'-এ পুরে রাখবে; সেটা আমার কাছে ফরবিডন ল্যান্ড। মানে আমাকে তোমার কাছে ঘেঁষতে দেবে না। একটা রাতই তাহা 'লস'।'

সেই দৃশ্যটাকে ভুলবার জন্য সুজাতা ঠিক করে ফেলল, অরুণাভর সঙ্গে অনেক-অনেক কথা বলবে। মৃদুগলায় সে বলল, 'নিয়ম যে—'

'থার্ড ক্লাশ নিয়ম। কোন মানে হয়—'

সুজাতা কিছু বলল না।

ট্রাফিকের লাল সিগনালটা এখনও জ্বলছে। এ-ধারে সেন্ট্রাল এ্যাভেনিউ আর ও-ধারে চৌরঙ্গীর মুখে কয়েক শো গাড়ি স্প্রিন্টারদের মতো স্টার্টের জন্য সন্নায়ু টান টান করে রুদ্ধশ্বাসে ওৎ পেতে আছে। সবুজ আলোটা জ্বলার শুধু অপেক্ষা। মাঝখানে ধর্মতলা স্ট্রীট দিয়ে বুনো শুয়োরের গোঁ নিয়ে গাক গাক করে ট্রাম-বাস-ট্যাকসিগুলো তাড়াতাড়ি ছুটে যাচ্ছে।

হঠাৎ কি যেন ভেবে নিল অরুণাভ। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে আলোর মতো কিছু খেলে যেতে লাগল। দারুণ উৎসাহের গলায় সে বলল, আমার মাথায় একটা ফার্স্ট ক্লাস প্ল্যান এসেছে বিনি।' এর মধ্যেই অরুণাভ সুজাতার ডাকনামটা জেনে গেছে।

সুজাতা কিছুটা উৎসুকভাবে মুখ তুলল কী?

'এখন আমরা বাড়ি ফিরব না।'

'কখন?'

'ময়দানের দিকে গঙ্গার পাড়ে একটু ঘুরে টুরে যাব।'

অরুণাভর প্ল্যানটা মোটামুটি বুঝতে

সুমথনাথ ঘোষের

ওখানে পদ্মা এখানে গঙ্গা ৫,

জলাধিতরঙ্গে ৫,

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

কুয়ারী গিরিপথে ১০, ত্রিলোকনাথের পথে ৪

শঙ্কু মহারাজের

গঙ্গাসাগর ৮।। গিরিকান্তার ৯,

জয়ন্তকুমারের

অভিনেত্রী খুন ৪, নায়িকার প্রতিহিংসা ৪,

মহাশ্বেতা দেবীর অবধূতের

অজানা ৪।। একাঙ্কা ৪।।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের প্রফুল্ল রায়ের

লগ্ন ৪, অন্য ভুবন ৪।।

ভৃগুজাতকের

হাত দেখতে শিখুন ৭, ভাগ্যলিপি ৯,

অমর সাহিত্য প্রকাশন, ৭, টেমার লেন, কলিকাতা - ৯

পেরেছে সুজাতা। একটু ভেবে সে বলল, 'কিন্তু ওরা?'

ওরা বলতে দ্বিতীয় গাড়ির লোকজনেরা। অরুণাভ বলল, 'ওদের কিছু জানাবো না। স্রেফ চোখে ধুলো দিয়ে আমরা ময়দানের দিকে উধাও হয়ে যাব।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'ওরা তো বাড়ি চলে যাবে। আমাদের সেখানে না দেখতে পেলে সবাই ভাববেন।'

সুজাতার নাকে আলতো করে একটা টোকা দিয়ে অরুণাভ বলল 'খারাপ কিছু ভাববে না।' তারপর গলাটা ঝপ করে নামিয়ে বলল, 'আফটার অল তুমি আমার বউ তো—'

সুজাতার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে যেতে লাগল।

অরুণাভ এবার বলল, 'বাড়ি ঢোকার পরই তো লক-আপে চলে যাচ্ছ। তার আগে যতটা কমপেনসেসন আদায় করে নেওয়া যায়।'

এই সময় ট্রাফিক সিগন্যালে সবুজ বাতি জ্বলে উঠল। অরুণাভ ড্রাইভারকে বলল 'ডান দিকের লেনটা ধরবে, আমরা ময়দানে যাব—'

আলোকিত ময়দানে, গঙ্গার পাড়ে, রেস-কোর্সের পাশের রাস্তায় অনেক ঘোরাফেরি আর অরুণাভর সঙ্গে কথা-টথার পর পুরো ঘন্টা দুয়েক পর ওরা যখন বিজেন্ট পার্কে পৌঁছুল সেই সময় আবার সমুদ্রতীরের সেই বিষণ্ণ তরুণীর মুখ দেখতে পেল সুজাতা। নাঃ, মেয়েটা তাকে কিছুতেই ছাড়বে না।

একটা অদ্ভুত ব্যাপার এর আগে ভবিষ্যতের যে ছবিই সে দেখেছে তাতে প্রতিটি মানুষকে স্পষ্ট চিনতে পেরেছে। কিন্তু এই মেয়েটাকে কিছুতেই সনাক্ত করা যাচ্ছে না। অথচ তার মুখটা সুজাতার খুবই চেনা-চেনা।

পরের দিন ফুলশয্যা। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘোরের মধ্যে কেটে গেল সুজাতার।

অরুণাভদের প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি। ছাদে ডেকরেটরেরা সিঁথি এবং চোখকাড় একটা প্যান্ডেল বানিয়েছে। সন্ধের পর সেখানে আলোর অজস্র ফোয়ারা চারদিক যেন ধাঁধিয়ে দিতে লাগল। তার ওপর রঙিন বালবের মতো অগুণতি টুনির মালা ঝুলছে।

প্যান্ডেলের একধারে রাজসভার মতো জমকালো মখমলে মোড়া সিংহাসনের মতো মখমলে-মোড়া সিংহাসনে একটা চেয়ারে সুজাতাকে বসানো হয়েছে। তাকে ঘিরে অরুণাভর বোনেরা এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা বসে আছে। সুজাতার বোনেরা বাড়ভাকিমা ফুলমালি এবং কলেজের বন্ধুরা বিকেলেই চলে এসেছিল। তারাও বসে আছে।

নিমন্ত্রিতরা একে একে এসে সুজাতাকে আশীর্বাদ করে উপহার দিয়ে যাচ্ছেন। যাদের বয়স কম তারা শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। মাঝে মাঝে কোত্থেকে একেকটি বন্ধুকে ধরে আনছে অরুণাভ; সুজাতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে।

অরুণাভর বন্ধুরা সবাই দারুণ হাসি-খুশি আর আমুদে। তাদের একেকটা ঠাট্টা বা রগড়ের কথা আতসবাজির মতো ফেটে ফেটে পড়ছে।

সুজাতা শিষ্টাচার বা ভদ্রতার খাতিরে দু-একটা কথা-টথা বলছে, নমস্কারও করছে। কিন্তু এখন সেই বিধবা তরুণীর বিষণ্ণ মুখটা অনেক বেশি করেই দেখতে পাচ্ছে।

অনেক রাতে নিমন্ত্রিতরা একে একে চলে গেলেন। ফুলমাসিরা খেয়ে-দেয়ে আগেই চলে গেছে। বাড়িটা এখন বেশ ফাঁকা। সারা দিনের হৈ-চৈ আওয়াজ স্তিমিত হয়ে এসেছে।

সুজাতা আর অরুণাভর খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। অরুণাভর খুড়তুতো, পিসতুতো মামাতো মাসতুতো বোনেরা প্রায় শোভা-যাত্রা করেই সুজাতা আর অরুণাভকে ফুল-শয্যার ঘরে নিয়ে গেল। তারপর দু-একটা মজার কথা বলে বাইরে থেকে দরজাটা টেনে দিয়ে চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে দরজায় খিল দিয়ে সুজাতার কাছে এসে আগুলের নরম ছোঁয়ায় তার চিবুকটা তুলে মুগ্ধ গলায় বলল 'বিউটি-

---

আগের গল্প ॥ রচনা ১৯৭১ খৃঃ

নিশিগন্ধা

শহরতলীর লাস্ট ডাউন ট্রেনটা বোরি-ভিলি পৌঁছে গেল। সাবার্বান রেইলওর এইটেই শেষ স্টেশন।

ট্রেনটা এলো যেন ভয়ে ভয়ে যুদ্ধবাজ সরীসৃপের মত বুকে হেঁটে। আন্ধেরী থেকে ইন্দিরা যখন এই গাড়িটায় উঠেছিল মনে হয়নি শেষপর্যন্ত বোরিভিলি পৌঁছতে পারবে। একটা বিহ্বল ভয়ার্ত আশঙ্কা লাস্ট ডাউন ট্রেনটার ওপর ভর করে বসে ছিল বুঝি।

ফল হয়েছিল এই, তার চোখগুলো ঘুমিয়েছিল কি ঘুমোয়নি না।

কামরাগুলো জনশূন্য এবং অন্ধকার। আলোর একটি বিন্দু কোথাও আবিষ্কার করা যাচ্ছিল না। আন্ধেরীতে তবু দু-চারজন যাত্রী ছিল। কোথায় কখন নিঃশব্দে তারা নেমে গেছে কে বলবে। শেষ স্টেশনের যোনো কেউ বসে থাকে নি।

পিছন দিকের একটা কামরা থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে এল ইন্দিরা। নেমেই টের পাওয়া গেল অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে।

মাসটা সেপ্টেম্বর, এ-দেশের হিসেব অনুযায়ী ভাদ্র। অর্থাৎ মধ্য-ঋতু, শরৎ শুরু হয়েছে।

শরৎ সে শুধু নামেই। নইলে আকাশে মেঘহীন লঘু রোদের পালে তুলো বাদলি; বাতাসের স্বভাবও প্রগলভ নয়।

মেঘ কি নেই? অবশ্যই আছে। তবে সে মেঘ গর্ভিনী মহিলার মত মন্থর; জলভরা। আর আরব সাগরের নোনা জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে সে বাতাস উঠে আসছে তা উদ্দাম বেপরোয়া। দিগন্তের ওপর দিয়ে সে মাই সাই ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। এদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে অবিশ্রান্ত বাজের গর্জন। আকাশটাকে জ্বালা জ্বালা করে মাঝেমাঝেই বিদ্যুৎ চমকে যাচ্ছে। মোট কথা ঋতুতে শরৎ হলেও দিন বর্ষার খাস বখাটে।

এখন কত রাত ইন্দিরা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছে। পৌনে এগারোটার মধ্যে এই ট্রেনটার বোরিভিলি পৌঁছে যাবার কথা। আজ ঘন্টাখানেকও যদি লেট করে থাকে রাতের বয়স এখনও মধ্যযম পার হয়নি।

অনাদিন এই সময়টা বোরিভিলিতে টিউব আলোয় স্নান করে সাদা। আজ সেখানে একটি বাতিও কেউ জ্বালে নি। সেটা অস্বাভাবিক নয়। রেডিও আর খবরের কাগজ মারফত আখনুর ট্রাজিডীর পর, পাস, কার্ফু; ছাব্বি-জারিয়ান—এই শব্দগুলো ইন্দিরার জানা হয়ে গেছে। সে জানে এখানে ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে এবং শত্রুপক্ষের বিমান আমাদের দেশে উড়ে এসে নির্বিচারে বোমা ফেলে যাচ্ছে। তার হাত থেকে বাঁচবার জন্য বোম্বাই শহর আজ থেকে নিষ্প্রদীপের বক্ষাকবচ নিয়েছে। শুধু কি বোম্বাই সারা দেশেই ব্ল্যাক-আউটের থাবা প্রসারিত।

অনাদিন এই লাস্ট ট্রেনও মেলা বসানো থাকে যেন। কত মানুষ যে এখানে—এই শেষ স্টেশনে নামে তার হিসেব নেই। আজ কিন্তু কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। খুব সম্ভব সন্ধ্যে হবার আগে আগেই সন্ত্রস্ত ভয়-তাড়িত মানুষের দল চুপিসারে যে যার বিবরে ফিরে গেছে। ইন্দিরার মনে হল এই স্টেশনে সে-ই আজ শেষ স্টেশন একমাত্র যাত্রী।

সামনে পিছনে দুদিকে যতদূর চোখ যায় শুধু গাঢ় গভীর অন্তহীন অন্ধকার। এ অন্ধকার যেন নিরবয়ব নয় বীভৎস স্পর্শকাতর। মাথার বৃষ্টি নিয়ে আর দুহাতে সামনের নিশ্ছিদ্র যবনিকা সরাতে সরাতে ইন্দিরা এগিয়ে চলল।

সামনের দিকে কয়েক গজ এগুলো যেন ওভারব্রিজ। রাত্রে পেরিয়ে ডানদিকে নামলেই সাইকেল-রিকশার স্ট্যান্ড। জটলাটার পা

ফুল, আমার কপালটা একেবারে সোনা-বাঁধানো।'

সুজাতা কিছু বলল না। সেই তরুণীর মুখটা কুয়াশার ঝাপসা পর্দা সরিয়ে একটু একটু করে যেন স্পষ্ট হচ্ছে। সুজাতার বুকের ভেতর ভূকম্পনের মতো কিছু একটা ঘটে যেতে লাগল।

পাশেই নতুন খাট। অজস্র ফুল আর ফুলের মালা দিয়ে খাটের ছত্রি থেকে বিছানা পর্যন্ত সব মোড়া।

চিবুকের তলা থেকে আঙুল সরিয়ে স্নিগ্ধ গলায় অরুণাভ বলল, 'এসো—' স্ত্রীর কাঁধে একটা হাত রেখে আস্তে করে তাকে খাটের দিকে নিয়ে গেল সে। তারপর পাশে বসিয়ে দু-হাতে সুজাতাকে বেষ্টন করে বলল 'এতক্ষণ তোমাকে নিজের করে পেলাম।' একটু থেমে বলল 'জানো পরশু থেকে একমাসের ছুটি নিয়েছি। হনিমুন করতে পুরী যাব। গ্র্যান্ড হবে—না?'

সুজাতা মাথা নাড়ল।

চলে যাবার আগে বেশি পাওয়ার আলোটা নিভিয়ে অরুণাভর বোনেরা একটা নীলাভ আলো জেবলে রেখে গিয়েছিল।

কোমল আলো ডিসটেম্পার-করা মেরুন রঙের দেয়াল বাতাস ফুলের গন্ধে ম-ম একটি সুগন্ধ সুন্দর যুবক দুহাতে ঘিরে আছে, তার নিঃশ্বাসের সুগন্ধ কাঁধের ওপর এবং গাল এসে পড়ছে—সব মিলিয়ে এই ঘর যেন এক অলীক মায়াকাননের দেশ। আজকের এই রাত তো জীবনে একবারই আসে। তরল ঈষদুষ্ণ সুখের কোন সরোবরে যে কোন মেয়েরই তো ডুবে যাবার কথা। কিন্তু সেই সমুদ্রতীরের সেই তরুণীর মুখ—

হঠাৎ সুজাতা লক্ষ্য করল একটি পরম সুন্দর মুখ প্রগাঢ় আবেগ এবং ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে প্রথম বর্ষণের মতো তার মুখের দিকে নেমে আসছে।

সুজাতা একবার ভাবল তার পাপড়ির মতো পাতলা ফুরফুরে কোমল ঠোঁটদুটি একটু তুলে এই বর্ষণকে গ্রহণ করবে। সে চোখ বুজল, তারপর যেই নত চিবুক তুলতে যাবে সেইসময় সমুদ্রতীরের সেই তরুণীর বিষণ্ণ মুখটা আচমকা চিনে ফেলল। সে মুখ তো তার নিজেরই। সঙ্গে সঙ্গে ধারাল ছুরির মতো তার গলাটাকে ছিন্নভিন্ন করে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল—'উঃ!'

অরুণাভর মুখ নেমে আসতে আসতে থেমে গেছে। সে উদ্বেগের গলায় জিজ্ঞেস করল 'কী হয়েছে?'

সুজাতা কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল; পারল না। ঠোঁটদুটো কাঁপতে লাগল শুধু।

অরুণাভ কি বুঝল সেই জানে। আবার বলল 'শরীর কি খারাপ লাগছে?'

'হ্যাঁ—আস্তে মাথা নাড়ল সুজাতা। প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগে তার শরীর দারুণ কাঁপছিল। হৃৎপিণ্ড মুচড়ে মুচড়ে কোথায় যেন অনবরত বক্তক্ষরণ হয়ে যাচ্ছিল। ঘামে তার জামা এবং শাড়িটাড়ি ভিজে উঠেছে।

অরুণাভ খুবই হৃদয়বান। জীবনের এই সবচেয়ে মূল্যবান মুহূর্তটাকে সে হাতের মুঠো খুলে বেরিয়ে যেতে দিল। তারপর অত্যন্ত ব্যস্তভাবে সুজাতাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলল, 'ঘুমোও। কটা দিন দারুণ ধকল গেছে। ঘুমোলে সব ঠিক হয়ে যাবে।' পাশে বসে বসে সে সুজাতার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

অনেক রাত্রে বিছানায় উঠে বসল সুজাতা। সে ঘুমোয় নি। চুপচাপ চোখ বুজে পড়ে ছিল। সুজাতা দেখল তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে অরুণাভ। তার মুখটা বালকের মতো সরল নিষ্পাপ।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে স্বামীকে দেখল সুজাতা। তারপর নিজের অজান্তেই ঝুঁকে অরুণাভর ঠোঁটে যেই মুখ ছোঁয়াতে যাবে সমুদ্রতীরে সে নিজেকেই আবার বিধবার সাজে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে তীরবিদ্ধ কোন পাখির মতো যন্ত্রণায় চকিত হয়ে উঠল যেন। আস্তে আস্তে তার চোখ জলে ভরে যেতে লাগল।

অনেকক্ষণ পর বিছানা থেকে নেমে, এ্যাটাচড বাথরুমে চলে গেল সুজাতা।

পরের দিন সকালে সবাই দেখল সুজাতার সুন্দর শরীর বাথরুমের সিলিং থেকে ঝুলছে।

প্রফুল্ল রায়

ঘোষে যে রাস্তাটা সোজা উত্তরবাগিনী হয়েছে—সেটা ধরে মিনিট পঁচিশেক হাঁটলে তাদের 'চাওল' (বস্তি) পাওয়া যাবে। স্টেশন থেকে চাওল পর্যন্ত পথটুকু ইন্দিরার মুখস্থ। প্রতিদিন এই পথে দুবার তাকে পাড়ি জমাতে হয়। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই স্টেশনে ছোটে সে। সেখান থেকে ফার্স্ট ট্রেন ধরে আন্ধেরী। আন্ধেরী থেকে রাতের মধ্যমগ্রামে লাস্ট ডাউন ট্রেনে সে বাড়ী ফেরে।

স্টেশন থেকে চাওল পর্যন্ত পথটুকু হেঁটেই যাতায়াত করতে হয় ইন্দিরাকে। কেননা চাওলের এক কোণে দেড় কামরার একটি অংশে অসুস্থ বিধবা মা, নাবালক দুটি ভাই দুটি বোন এবং তাকে নিয়ে যে বিরাট মাপের সংসার তা সচল রাখতে হলে স্টেশনে যাওয়া-আসার পথে রিকসায় ওঠার সৌখিনতাটুকু বর্জন করতে হয়।

আজ অবশ্য রিকসা তাকে নিতেই হবে। কেননা স্টেশন থেকে বাড়ি যাবার রাস্তাটার কিছু খ্যাতি আছে। তা এইরকম। মহারাষ্ট্র সরকার সমস্ত রাজ্যটিকে 'ড্রাই' করে দিয়েছেন। মদ নিষিদ্ধ হবার ফলেই বোধহয় এ অঞ্চলের মানুষ সে ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছে। এই বোরিভিলিতে গোপনে কিছু ভাটিখানা আছে; সেখান থেকে ঝাঁকে ঝাঁক মাতাল বেরিয়ে এসে প্রতিদিন রাস্তায় খিস্তি খেউড় আর হয়া করায়। অন্যদিন তবু সঙ্গে লাস্ট ট্রেনের অনেক যাত্রী থাকে। রাস্তায় মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের বাতি জ্বলে। কাজেই ভয়ের তেমন কারণ থাকে না। আজ নির্জন ব্ল্যাক-আউটের রাত্রে মাতাল-দেরই তো রাজত্ব।

যাই হোক আজ আর বেলের টিকিট কালেকটরকে কোথাও দেখা গেল না ক্ষিপ্রপায়ে ওভারব্রীজ পার হয়ে রাস্তায় এসে নামল ইন্দিরা।

আশ্চর্য! অন্যদিন এখানে সাইকেল রিকসার হাট বসে থাকে। ঘন ঘন ঘন্টি মেরে সওয়ারী ধরবার জন্য ডাকাডাকি সাধাসাধি করে রিকসাওয়ালারা জায়গাটাকে সরগরম করে রাখে। কি এক তোজবাজিতে আজ তাদের চিহ্নমাত্র নেই। ভয়তাড়িত হয়ে তারাও বুঝি পালিয়েছে।

এদিকে বৃষ্টিটা এতক্ষণ মুদুই ছিল। হঠাৎ সে যেন কোমর বাঁধতে শুরু করল। মনে হচ্ছে বেশ তোড়জোড় করেই এবার নামবে।

নিরুপায় চোখে চারদিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ চোখে পড়ে গেল। নাঃ এই চত্বরটা একেবারে শূন্য নয়। একটা-দুটো রিকসাই এখনও আছে। আশ্বস্ত উৎসাহিত ইন্দিরা ছুটতে ছুটতে রিকসাটার কাছে এসে পড়ল। বলল 'ভাড়া যাবে?'

রিকসাওয়ালা তার সিংহাসনেই বসে ছিল। বলল 'ভাড়া তো হয়ে গেছে মাইজী।'

আগে লক্ষ্য করেনি ইন্দিরা। এবার তার চোখ দুটি রিকসার ভেতর দিকে ফিরল; অন্ধকারে পুরুষ দেহের অস্পষ্ট একটি আভাস সেখানে টের পাওয়া যাচ্ছে। তার হাতে জ্বলন্ত সিগারেটের একটি বিন্দু। হতাশ সুরে রিকসাওয়ালার উদ্দেশ্যে ইন্দিরা বলল এক কাজ কর বরং একে পৌঁছে দিয়ে এস। তারপর আমাকে নিয়ে যাবে।'

রিকসাওয়ালা কি বলতে যাচ্ছিল তার আগেই ভেতরের সীট থেকে ভদ্রলোক বলে উঠলেন 'যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা বলব।'

'কী?' ইন্দিরার গলা থেকে অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল।

'আপনি কোথায় যাবেন?'

নীলকান্ত আস্তে বোড।

'আমি আরেকটু এগিয়ে সিন্ধী কলোনীতে যাব। আপনার [illegible] থাকলে আমার সঙ্গে [illegible] একটা ভদ্রলোক। [illegible] কি ভেবে [illegible] পৌঁছে দিয়ে রিকসাওয়ালার [illegible]

সময় লাগবে অনেকটা। ততক্ষণ আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তাছাড়া বৃষ্টিটাও জোরে ঝরে পড়তে শুরু করেছে। মাথা বাঁচাবার মত শেডটেড কিছু এখানে নেই। একেবারে ভিজে যাবেন।'

ভদ্রলোকের প্রস্তাবটা ভালোই। একটু ইতস্তত করল ইন্দিরা। তারপর দ্বিধাগ্রস্তিত সুরে বলল 'কিন্তু আপনার অসুবিধে—'

মাঝপথে তাকে থামিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন 'বিন্দুমাত্র না?'

অন্ধকারে একজন অপরিচিত পুরুষের পাশাপাশি বসে যেতে হবে। ভয়ে ভয়েই ইন্দিরা রিকসায় উঠল। সঙ্গে সঙ্গে রিকসা-ওলা প্যাডেল মারল। আর পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোক হাতের সিগারেটটা বাইরে ছুড়ে ফেলে দিলেন। মহিলার প্রতি সৌজন্যের খাতিরেই বোধহয়!

ইন্দিরা অনুভব করল, এই সংকীর্ণ জায়গাটুকুতে যতখানি সম্ভব সংকুচিত হয়ে বসেছেন ভদ্রলোক। ইন্দিরাও জড়সড় হয়ে স্পর্শ বাঁচাতে চেষ্টা করছে।

রিকসাটা যে রাস্তার ওপর দিয়ে চলছে সেটা অসমতল, কর্কশ। সম্প্রতি ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট এ জায়গাটার অভিভাবক হয়েছে। একে পূর্বোপরি শহরের জল তোলার জন্যে রাস্তাগুলোয় খোদা পড়েছে। এর পরেই তাদের পাঁচের মলাট পরানো হবে।

প্রায় প্রতি মুহূর্তে রিকসাটা ঠক্কর খেতে খেতে চলেছে। অন্ধকার রাস্তার দু পাশে সারিবদ্ধ নিস্তব্ধ বাড়িগুলো কেমন যেন রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটা কিছুর প্রতীক্ষা করছে যেন তারা। কিসের প্রতীক্ষা? এই পথটা দিয়ে চলতে চলতে ইন্দিরার মনে হল, তবে যেন একদিন এখানে মৃত্যুর জীবনস্রোত ছিল। চিরদিনের মত তা বুঝি স্তব্ধ হয়ে গেছে। আবার মনে হচ্ছে একটি বিচিত্র যান চড়ে সে আর পাশের অপরিচিত ভদ্রলোকটি পাতালের অতল অন্ধকারে কোন এক নির্জন পরিত্যক্ত নগরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

যাই হোক, একটা ব্যাপার ইন্দিরা লক্ষ্য করছে, রিকসায় ওঠার পর থেকে ভদ্রলোক উপযাচক হয়ে একটি কথাও বলেন নি। এক সময় নীলকান্ত আসতে বাঁক এসে পড়ল। রিকসা থামিয়ে ইন্দিরা ভাড়া দিতে যাবে, ভদ্রলোক বাধা দিলেন। কণ্ঠস্বরে বললেন, 'না—না, অনুগ্রহ করে কিছু দেবেন না। আমি তো আসছিলামই।

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম.বি.ডি.জি.ও
ডাঃ এস এন পাণ্ডে এম.বি.বি.এস
যৌবনের রহস্য
নূতন লাইব্রেরী

আপনি না এলেও পুরো ভাড়াটা দিতেই হত। বাইচান্স আপনি সঙ্গে এসেছেন। রিকসাওলার উদ্দেশ্যে বললেন, চল—'

ইন্দিরা কিছু একটা বলতে চাইল, কিন্তু তার আগেই রিকসা ছুটতে শুরু করেছে।

পরের দিনও সেই একঘেয়ে রথখানিতে সেই ভদ্রলোকটির পাশে বসেই বাড়ি ফিরতে হল। পরের দিন অর্থাৎ আজ। আজকের ব্যাপারটা অবশ্য কালকের তুলনায় একটু ভিন্ন ধরনের।

আজ ট্রেন থেকে নেমে ইন্দিরাই প্রথমে রিকসাটার দখল নিয়েছে। এই রিকসাতেই সে কাল পাড়ি জমিয়েছিল কি না, বোঝা যাচ্ছে না। তবে রিকসাওলার প্রকাণ্ড পাগড়ী দেখে সে সম্বন্ধে কিছু সংশয় জাগছে। নিঃসন্দেহ হবার জন্য ইন্দিরা বলল, 'কাল এই সময় তুমি এখানে ছিলে না?'

'হাঁ মাইজী।' বলে একটু থামল রিকসাওলা। পরমুহূর্তে কি ভেবে আবার শুরু করল, 'কাল আপনি আর এক সাহেব তো আমার রিকসায় গিয়েছিলেন?'

রিকসাওলা সম্বন্ধে আর সংশয় নেই। ইন্দিরা বলল, 'হাঁ। এখন চল।'

চলতে চলতে ইন্দিরা আবার প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা কালও দেখেছি আজও দেখছি, তুমিই শুধু লাস্ট ট্রেনের জন্য থাক। আর সব রিকসাওলারা যায় কোথায়?'

'বেলাক আউটের রাত মাইজী—' মুখ ফিরিয়ে রিকসাওলা বলল, 'সন্ধ্যের পর যত ট্রেরেন (ট্রেন) আসে, তাতে আর লোক থাকে না। বেকার বসে থেকে কি লাভ! তা-ই ওরা চলে যায়। লেকেন আমি আশা ছাড়ি না, যদি কেউ এসে যায়।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল, 'ছিলাম বলে কাল আপনাদের ভাড়া পেয়েছি। আজও পেলাম—'

এবার চুপচাপ। এদিকে রিকসাটা খোয়া-ওঠা কর্কশ পথের ওপর দিয়ে দোল খেতে খেতে খানিকটা এগিয়ে গেছে। হঠাৎ পিছন থেকে চিৎকার শোনা গেল, 'এই—এই—এই রিকসা, রুখো—'

রিকসাওলা গাড়ি থামিয়ে দিল। আর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে একটি ভদ্রলোক সামনে এসে দাঁড়ালেন। রিকসাওলা বলল, 'সাব, রিকসা তো ভাড়া হয়ে গেছে।'

'তাই তো, ভারি মুসকিল হল।' ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করলেন। তারপর অন্ধকারেই ইন্দিরার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি সিধী কলোনী যাব। এত রাতে আর কোন রিকসা পাচ্ছি না। দয়া করে যদি আপনার সঙ্গে—'

সিধী কলোনীর নাম শুনেই খানিকটা অনুমান করা গেল। তা ছাড়া গলার স্বরটা কালকের মতই মনে হচ্ছে। ইন্দিরা বলল, 'আসুন।' ভদ্রলোক উঠে বসতেই আবার বলল 'আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, কাল আপনি নিশ্চয়ই এ সময় একটি মেয়ের সঙ্গে রিকসায় করে ফিরেছিলেন—'

ভদ্রলোক সবিস্ময়ে বললেন, 'ও, আপনি!'

'হাঁ।' ইন্দিরা মাথা নাড়ল। বলল, তবে একটা কথা। আজকের ভাড়াটা কিন্তু আমিই দেব।'

ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠলেন। বললেন 'ঋণ শোধ করতে চান? বেশ।'

কিছুক্ষণ নীরবতা। ওদিকে ভদ্রলোক উঠে আসতেই রিকসা চলতে শুরু করেছে।

এক সময় ভদ্রলোকই স্তব্ধতা ভাঙলেন, 'আচ্ছা আপনি কি রোজই লাস্ট ট্রেনে ফেরেন?'

ইন্দির বলল 'হাঁ।'

'আমাকেও তাই ফিরতে হয়।' ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, 'অন্য দিন হলে স্টেশন থেকে হেঁটেই আমি বাড়ি ফিরি। ব্ল্যাক-আউট বলে রিকসা নিতে হচ্ছে। তা, এক কাজ করলে কেমন হয়?'

'কী?'

'দুজনকেই যখন লাস্ট ট্রেনে আর রিকসায় ফিরতে হচ্ছে তখন এই রিকসা-ওলাটাকে ঠিক করি না কেন? একদিনের ভাড়া আপনি দেবেন একদিনের আমি। কি বাজী?'

প্রস্তাবটা লোভনীয়। প্রতিদিন একা একা যেতে হলে দ্বিগুণ ভাড়া দিতে হবে। অতএব উৎসাহিত ইন্দিরা বলে উঠল 'রাজী।'

এরপর প্রত্যহ রিকসাটা নীলকান্ত আসতে বোডে একবার থেমে সিধী কলোনীতে যেতে লাগল। প্রথমদিনের সেই সংকোচ সন্দেহ দ্বন্দ্বা—ইন্দিরার মনে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। প্রথমদিনের মত দুজনের কেউই আর নিঃশব্দে পথটুকু পাড়ি জমায় না। নানা প্রসঙ্গে তাদের কথাবার্তা হয়। বিশেষতঃ যুদ্ধ করে শেষ হয়ে ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকার পার হয়ে তবে ঝলমলে আলোকিত গাড়ি আবার ফিরবে—এসব নিয়ে তারা মুখর থাকে। তাছাড়া জিনিসপত্রের দাম বেকারিত্ব ব্যালোবাজারি ইত্যাদি ইত্যাদি কত বিষয়ে নিতান্ত অকারণেই যে তারা কথা বলে যায় সে সম্বন্ধে নিজেদেরই হুঁশ থাকে না।

ইন্দিরা যোশীর বয়স চল্লিশের প্রায় কাছাকাছি। বাবা মারা যাবার পর সমস্ত সংসারটা তারই মাথার ওপর ভাঙিয়ে পড়ছে। নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সে সচেতনও। তাই বেলা ফার্স্ট ট্রেন ধরে সে ছোটে অফিসে। সেখানে পুরোপুরি একটা পেনের কারখানায় কাজ করে সন্ধ্যে থেকে পার্ট টাইম টাইপিস্টের আরেকটা কাজও করতে হয়। খাওয়া দাওয়া সবই তার বাইরে বাইরে।

সংসারের দিকে তাকাতে, নিজের নিজের দিকে এই চরিশ বছর সময়ের ফেলে আসা দিনগুলি ইন্দিরার। নিজের সম্বন্ধে কত যে বড় বড় স্বপ্ন দেখেছিল ইন্দিরা, নিজের সম্বন্ধে কত যে বড় বড় আশা ছিল তার জীবনের প্রথম দিকে তা সে নিজেই হিসেব করে উঠতে পারে না।

যাই হোক, সারাদিন অফিসের কাজের পর ঘরে ফিরে আসবার জন্য তার সমস্ত সত্তা উন্মুখ হয়ে থাকে। ঘরে যে

বাংলা সাহিত্যে যে সমস্ত বই আলোড়ন এনেছে

রবীন্দ্র সাহিত্য

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—রবিরশ্মি (১ম খণ্ড) ২০-০০; রবিরশ্মি (২য় খণ্ড) ২০-০০ • আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন-শাস্ত্রীর—বলাকাকাব্যপরিক্রমা ১০-০০ • শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের—ভারত-পথিক রবীন্দ্রনাথ ৮-০০ • ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের—রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য ১২-০০ • কনক বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্র নাট্য সমীক্ষা ৫-০০ • অমিতা মিত্রের রবীন্দ্রকাব্যালোক ৫-০০ • ডঃ প্রবাসজীবন চৌধুরীর—রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শন ২-৫০ • অশোক সেনের—রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা ২০-০০ • ডঃ শশিশভূষণ দাশগুপ্তের—উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্র মানস ১৫-০০ • ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের—রবীন্দ্র বিতান ৫-০০, রবীন্দ্র সমীক্ষা ৩-০০ • ডঃ মোহিনীমোহন ভট্টাচার্যের—মনীষী রবীন্দ্রনাথ ৩-৫০ • ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের—রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সাহিত্য ৪-৫০ • দক্ষিণারঞ্জন বসুর—শতাব্দীর সূর্য ৭-৫০ •

প্রবন্ধ সাহিত্য ও বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস ৫০-০০; বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড ৪৫-০০, ২য় খণ্ড ৩৫-০০, কাদম্বরী ৬-০০ • ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের—বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ ৮-০০, শ্রীরামের জন্মবিকাশ ১৮-০০, শিল্পলিপি ১২-০০, কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায় ১০-০০ • কনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের—বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ ৫-০০ • নারায়ণ চৌধুরীর—সমকালীন সাহিত্য ৩-০০, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ১০-০০ • ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডঃ প্রফুল্ল পালের—সমালোচনা সাহিত্য ১৬-০০ • গোপাল হালদারের—বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা ১ম খণ্ড ১০-০০, ২য় খণ্ড ১২-০০, রুশ সাহিত্যের রূপরেখা ১২-০০ • ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের—সাহিত্য প্রবাহ ৩-০০, ইংরেজী সাহিত্যের ধারা ১৫-০০ • দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের—সাহিত্য ও শিল্পলোক ৭-৫০ • ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের—নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল ৮-০০, বাংলা সমালোচনা পরিচয় ১৫-০০, শরৎচন্দ্র ১০-০০, মধুসূদন (কবি ও নাট্যকার) ৬-০০ • ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও কালীপদ সেন সম্পাদিত—মেঘনাদ বধ কাব্য (সম্পূর্ণ খণ্ড) ১০-০০ • ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত ও কালীপদ ভট্টাচার্যের—ধ্বন্যালোক ৫-০০ • ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের—সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ১৬-৫০, প্রাকৃত অপভ্রংশ সাহিত্য-বীথিকা ২-০০ • শশাঙ্ক সেনের—মধুসূদন ৬-০০ • ডঃ সুশীলকুমার দে—দীনবন্ধু মিত্র ৪-০০ • ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের—কথা-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ১৫-০০ • অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ ৮-০০ • ডঃ সুধীরকুমার করণের—সীমান্ত বাংলার লোকযান ১৫-০০ • অরুণ মৈত্রের—সিকিমের আদিবাসী লেপচা ৮-০০ • শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের—সামগ্রিক দৃষ্টিতে প্রভাতকুমার ২-৫০ • ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্তের—কাব্যালোক ১৫-০০ • ডঃ হরিপদ চক্রবর্তীর—দাশরথি ও তাঁহার পাঁচালী ১৫-০০ অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের—ভারতের শিল্প ও আমার কথা ১৫-০০ • নির্মলেন্দু রায় চৌধুরীর—বিশ্ব সাহিত্যের রূপরেখা (প্রথম পর্ব) ১৫-০০, (দ্বিতীয় পর্ব) ১৫-০০, খ্যাতি যাদের জগৎ জোড়া ১০-০০ • নিশীথরঞ্জন রায়ের—বাঙলার কথা ৭-৫০ • চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের — বিশ্বসাহিত্যের আঙিনায়।
নলিনীকিশোর গুহের—বাংলার বিপ্লববাদ ১৬-০০ • অতুলকুমার বসুর—মেদিনীপুরে বোমা ও পিস্তল ৩-০০।

ছোটদের জন্য সেরা বই

শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্যিক কুলদারঞ্জন রায়ের পুরাণের গল্প ৩-০০, কথা সরিৎসাগর ৩-০০, বেতাল পঞ্চবিংশতি ৩-০০ রবিনহুড ৪-০০, কফি খাঁর সুভাষ আলেখ্য (সচিত্র) ৫-০০, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটদের সেরা পাঁচালী ৫-০০।

দর্শন গ্রন্থ

রমেশচন্দ্র মুন্সীর—ধর্মতত্ত্ব পরিচয় ১ম খণ্ড ৫-০০, ২য় খণ্ড ৫-০০ • ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তীর—দর্শনের ভূমিকা ১২-৫০

ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ

গঙ্গেশচন্দ্র চক্রবর্তীর—বাংলার সাধক ১ম খণ্ড ৮-০০, ২য় খণ্ড ১০-০০, ৩য় খণ্ড ১২-০০, পরমযোগিনী আনন্দময়ী মা ১ম পর্ব ১০-০০, ২য় পর্ব ১০-০০, ৩য় পর্ব ১০-০০ • স্বামী পরমানন্দ সরস্বতীর—নিরুক্ত ১৪-০০ • বিভাবতী দেবী কাব্যভারতীর—ভাগবতী কথা (দশম স্কন্ধ) ১০-০০, (প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্কন্ধ) ১০-০০, (সপ্তম ও অষ্টম স্কন্ধ) ৬-০০ • লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের—শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা ৬-০০ •
শিশির নিয়োগীর—বাল্মীকি রামায়ণ ১২-০০, গল্পে মেঘনাদ বধ ১-১২ • অনুবাদক রামপ্রসাদ সেনের—তুলসীদাসের দোহাবলী ৫-০০ • সুবোধকুমার চক্রবর্তীর—দেবতার কথা ৭-৫০, উপদেবতার কথা ৭-৫০ • ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্তের—আমাদের পরিচয় ৪-০০, গল্পে উপনিষৎ ৪-০০ • ত্রিপুরারী চক্রবর্তীর—মহাভারতে বিদুর ও গান্ধারী ২-০০।

ভ্রমণ সাহিত্য

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর—রম্যাণি বীক্ষ্য—অন্ধ্র পর্ব ১৮-০০, তামিল পর্ব ১৮-০০, কেরল পর্ব ১২-০০, কর্ণাট পর্ব ১২-০০, কালিন্দী পর্ব ১৫-০০, রাজস্থান পর্ব ১৫-০০, সৌরাষ্ট্র পর্ব ১৫-০০, কোঙ্কণ পর্ব ১২-০০, অবন্তী পর্ব ১৫-০০, উৎকল পর্ব ১৫-০০, মগধ পর্ব ১৫-০০, কোশল পর্ব ১৫-০০, হিমাচল পর্ব ১৫-০০, কাশ্মীর পর্ব ১৫-০০, কামরূপ পর্ব ১৮-০০, গৌড় পর্ব ১৫-০০, ভাগীরথী পর্ব ১৫-০০, হিমালয় পর্ব ১৬-৫০, সুন্দর নেহারি ১০-০০, চোখের আলোয় দেখেছিলেম ৪-০০, রূপমতীর দেশে ৮-০০ আমাদের দেশ—উড়িষ্যা ৪-০০, অন্ধ্র ৪-০০, মহিসুর ৪-০০ তামিলনাড় ৪-০০ • উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের—পশুকেদার ১২-০০, মন্মথ রায়ের—অমৃতভূমি অমরকণ্টক ১০-০০ • দেবপ্রসাদ দাশগুপ্তের—একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে (প্রথম পর্ব) ১২-০০, (দ্বিতীয় পর্ব) ১৮-০০ • কিরণশঙ্কর মৈত্রের—শৈলশিখরে নাগাভূমি ৬-০০, বামপদ মুখোপাধ্যায়ের—হিমালয়ের আঙিনায় ৭-৫০ • বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্যের—দেহুলি প্রান্তে ১০-০০, • শ্রীদেবল-এর—এই ভারতের পুণ্যতীর্থে ৮-০০, ডঃ অমূল্য সেনগুপ্তের—মন চল গঙ্গা-যমুনা ১২-০০। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের—সুন্দরী ইন্দোনেশিয়া ১৫-০০।

সংগীত সম্বন্ধীয় গ্রন্থ

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের—গীতসূত্রসার ২০-০০, সুবিনয় রায়ের—রবীন্দ্র সংগীত সাধনা ৭-০০ • সুকুমার রায়ের—বাংলা সংগীতের রূপ ৮-০০।

প্রকাশক ঃ এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

এই চল্লিশের সীমান্তে কোন অজানা বনে অচেনা একটি ফুল ফুটেছে। মনে হয় কোথা থেকে কোন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এক ঝলক দক্ষিণা বাতাস ছুটে এসেছে।

ভদ্রলোক তার প্রতিদিনের সঙ্গী। অন্ধকারে অস্পষ্ট যে আভাসটুকু পাওয়া যায় তাতে মনে হয় তিনি সুপুরুষই। কণ্ঠস্বর গম্ভীর ব্যক্তিত্বময়। কিন্তু মুখটা এখনো দেখা হয়নি তার; অথচ ইন্দিরার প্রাণের কোণে সেটা দেখবার বড় লোভ। একদিন সে বলেই ফেলল প্রথমদিন দেখেছি আপনি সিগারেট খান। কিন্তু কই আমার সঙ্গে যেতে যেতে তো কোনদিন খেতে দেখলাম না।

ভদ্রলোক বললেন—সিগারেটের গন্ধে আপনার অসুবিধে হবে—

সিগারেট ধরাতে হলে দেশলাই জ্বালাতে হবে আর সেই আলোতে মুখখানা দেখে নেবে— ইন্দিরার এই হল ইচ্ছা। সে প্রায় নবীনা কিশোরীর মত প্রগলভ হয়ে উঠল ওমা সে কি! নানা আমার কিছু অসুবিধে হবে না। আপনি সিগারেট ধরান দিকি। না খেয়ে নিশ্চয়ই রোজ আপনার কষ্ট হয়।

কিন্তু ইন্দিরাকে হতাশই হতে হল। হাজার অনুরোধেও ভদ্রলোক কিছুতেই সিগারেট ধরালেন না।

এত মুখরতা এত প্রগলভতার মধ্যেও একক দিন তলা কাটতে লাগল। একদিন ইন্দিরাকে নিশ্চুপ দেখে ভদ্রলোক বললেন—কি ব্যাপার আজ মুখে একেবারে চাবি লাগানো যে?

বিষণ্ণ সুরে ইন্দিরা বলল—আমার মা খুব অসুস্থ। তাঁর জন্যে আজ সারাদিন ঘুরে ঘুরেও একটা হরলিক্স জোগাড় করতে পারিনি। এদিকে গোয়ালাটা দুধ দিচ্ছে না কদিন ধরে—

ভদ্রলোক চকিত হয়ে উঠলেন ও তাই নাকি! একটু আগে তাঁর স্বরে যে চাপল্য ছিল এখন তার চিহ্নমাত্র নেই।

আশ্চর্য! পরের দিন ভদ্রলোক হরলিক্সের শিশি ইন্দিরার হাতে দিতে দিতে বললেন—একটা দোকানের সঙ্গে জানাশোনা ছিল নিয়ে এলাম।

ব্যাগ থেকে দাম বার করে কৃতজ্ঞ সুরে ইন্দিরা বলল—কি উপকার যে আপনি করলেন।

আরেক দিন ভদ্রলোক ভাবলেন কী অত ভাবছেন?

শঙ্কা জড়ানো বিমর্ষ মুখে ইন্দিরা বলল—সে ভারি লজ্জার কথা।

কথাটা কিছুতেই ইন্দিরা বলবে না কিন্তু ভদ্রলোকের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত বলতেই হল। তিন মাসের বাড়ি ভাড়া মশুদ্ধই টাকা বাকি পড়েছে। সে জন্যে বাড়িওলার লোক অপমান করে গেছে। শাসিয়ে গেছে তিনদিনের মধ্যে টাকা শোধ না করলে উঠিয়ে দেবে।

কিন্তি ব্যাপার! পরের দিন একতোড়া নোট ইন্দিরার হাতে গুঁজে দিতে দিতে ভদ্রলোক বললেন— নশ্বইটা টাকা আছে। কালই ভাড়াটা মিটিয়ে দেবেন।

কুণ্ঠিত হতচকিত ইন্দিরা কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই দু হাত ধরে ভদ্রলোক আবার বললেন—আমাকে বন্ধু হিসেবে ধরতে পারেন। এ লজ্জার কিছু নেই। আর টাকাটা একেবারে দিচ্ছি না। যখন পারবেন শোধ করবেন।

অন্ধকারে দু চোখ ঝাপসা হয়ে গেল ইন্দিরার।

অবশেষে সেই দিনটি এসে গেল। সেদিন অন্ধকারেও ইন্দিরাকে বোধহয় অত্যন্ত চঞ্চল আর উদভ্রান্ত দেখাল। ভদ্রলোক বার কয়েক তার দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত বলে উঠলেন 'আজ আপনাকে খুব অস্থির মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ—' ভারী গলায় অন্যমনস্কের মত ইন্দিরা বলতে লাগল 'আপনাকে আগেই বলেছি আমার মা অসুস্থ। বাবা মারা যাবার পর থেকে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। কখনও একটু ভালো থাকেন। কখনও খারাপ। আজ সকালে যখন কাজে বেরুই তখন খুব বাড়াবাড়ি দেখে এসেছি। মনে হচ্ছে মা এবার আর বাঁচবেন না।'

'ছিঃ ওকথা ভাবছেন কেন? অসুখ হলেই কি মানুষ মরে?' একটু থেমে ভদ্রলোক আবার বললেন—'মা তো অনেক দিন অসুস্থ। তা তাঁর চিকিৎসার কি ব্যবস্থা হচ্ছে?

ইন্দিরা বলল—কি ব্যবস্থা আর করব। আমাদের মত গরীবের সংসারে—বুঝতেই পারছেন—

একটু চুপচাপ। তারপর গাঢ় গলায় ভদ্রলোক বললেন—'দেখুন পৃথিবীতে আমার কেউ নেই। মা-বাবা ভাই-বোন স্ত্রী কেউ না। আপনার মায়ের চিকিৎসার দায়িত্ব যদি আমি নিই মানে আপনার মাকে যদি নিজের মা মনে করি আপনার আপত্তি আছে?'

আচ্ছন্ন সুরে ইন্দিরা বলল—'আপনার কাছে আমার এমনিতেই ঋণের শেষ নেই। তার ওপর—'

কথা আর শেষ হল না ইন্দিরার। তার আগেই পিঠের ওপর স্নিগ্ধ শঙ্কায় একটি বাহু প্রসারিত হল।

সেদিন নীলকান্ত আপ্তে রোডে এসে বিকসা থামতেই ভদ্রলোক বললেন—'চলুন মাকে আজ দেখে যাই—'

ইন্দিরা চকিত হল। মুহূর্তে চাওলের এক প্রান্তে নিজেদের সেই দীন ঘরখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল। ছেঁড়া ময়লা বালিশ দাগ-ধরা বিছানার চাদর ভাঙা চেয়ার হাঁড়ি-কুড়ি সব মিলিয়ে কুশ্রী একখানা ছবি। যদিও তার দৈন্যের কথাটা ভদ্রলোকের অজানা নেই তবু ইন্দিরা বলল—'আজই যাবেন?'

'যদি আপনার আপত্তি না থাকে—

কুণ্ঠিত স্বরে ইন্দিরা বলল—'আজ না গিয়ে যদি কাল—'

ভদ্রলোক বললেন—'বেশ কালই যাব।'

পরের দিন ভাইবোনদের বালিশের ওয়াড় আর বিছানার চাদর ধুয়ে ঘরখানা সাজিয়ে গুছিয়ে শোভন করে রাখতে বলে কাজে বেরুল ইন্দিরা। নিশীথের সেই সন্ধ্যাকে আজ প্রথম দেখবে—ভাবতেই ইন্দিরার চল্লিশ বছর বয়স্ক হৃদপিণ্ড সমস্ত দিন দ্রুতবহ জলদ বাজনার মত বেজে যেতে লাগল।

কাজের শেষে লাস্ট ট্রেন ধরতে এসে ইন্দিরা অবাক! আজ আর ব্ল্যাক আউটের তেমন নেই। কয়েকটা দিন অথৈ অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকার পর বোম্বাই আবার তার আলোকিত রাত ফিরে পেয়েছে।

লাস্ট ট্রেনে আজ আগের মতই আবার মেলা বসেছে। বোরিভিলিতে তেমনই আলোর বান ডেকে আছে। অগণিত মানুষের সঙ্গে ট্রেন থেকে পায়ে-পায়ে বিকসা স্ট্যান্ড এসে ইন্দিরা দেখল জায়গাটা আজ সরগরম। সব রিকসাওলাকেই আজ দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু যে পাগড়ী দেখে এতদিন তাদের আজ তাকে খুঁজে বার করার উপায় নেই। সেই বিকসাওলাটাকে চিহ্নিত করা গেছে কেননা প্রায় সব রিকসাওলার মাথাতেই পাগড়ী বাঁধা।

বিকসাওলা নিয়ে বিশেষ দুর্ভাবনা নেই ইন্দিরার। উদভ্রান্তের মত চারদিকে তাকাতে লাগল সে কিন্তু অন্ধকারের সেই সহচরকে খুঁজে বার করবে সাধ্য কি! নামও তার জানা নেই যে চেঁচিয়ে ডাকবে।

একে একে সবাই চলে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে সেই ভদ্রলোকও কি চলে গেছেন? একবার ইন্দিরা ভাবল সিন্ধী কলোনীতে গিয়ে খোঁজ করবে। কিন্তু সিন্ধী কলোনীর কোন ঠিকানায় ভদ্রলোক থাকেন তা জেনে নেওয়া হয়নি। তার মনে হয়েছিল ব্ল্যাক আউটের রাত্রি কোনদিন শেষ হবে না। অন্ধকারে চিরকাল পাশাপাশি বসে তারা স্টেশন থেকে বাড়ির পথে পাড়ি জমাতে পারবে।

এর চাইতে কালই যদি ভদ্রলোককে বাড়ি নিয়ে যেত।

হঠাৎ নিজের বুকের ভেতর অসীম শূন্যতা অনুভব করতে লাগল ইন্দিরা। মনে হল অন্ধকারে বিদ্যুৎ-চমকের মত কি যেন তার কাছে এসেছিল সম্পূর্ণ বুঝবার আগেই তা বিলীন হয়ে গেছে।

অথবা জীবনে অতর্কিতে একবার—মাত্র একবারই বুঝি পরমাশ্চর্য সামনে এসে দাঁড়ায়। তাকে তুলে নিয়ে আঁচলে বাঁধতে না পারলে আর কোনদিনই সে ধরা দেয় না।

গতসংখ্যায় প্রকাশিত মতিনন্দীর আগের গল্পের রচনাকাল হবে ১৯৫৮। এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

এ সংখ্যার প্রচ্ছদ

পৃথিবীর একটি সুপ্রাচীন নগরী হল রোম। জানা যায়, খৃষ্ট জন্মের ৭৫৩ বছর আগে রোমিউলাস আর রেমাস নামে দুই ভাই স্থাপন করেন এই শহর। শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে টাইবার নদী। কাছাকাছি অবস্থিত সাতটি পাহাড়ের উপর ছড়িয়ে রয়েছে এই নগরী।

রোম ছিল প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী। কিন্তু সেই সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগের অবসানে কয়েকশ বছর ধরে এই শহর হয়েছিল দলের পর দল বর্বর জাতিগুলির আক্রমণের শিকার। প্লেগের মহামারীও ছিল তখন অতি ব্যাপক। বলা যায়, সে ছিল এক অন্ধকার যুগ।

তারপর পনের শতকে রোম আসে পোপের অধীনে। রোমের সাতটি পাহাড়ের একটি, অর্থাৎ ভ্যাটিকান হয় পোপের প্রধান কর্মকেন্দ্র। কিন্তু প্রায় চারশ বছর পরে ১৮৭০ সালে রোম যায় ইতালি রাজ্যের দখলে, এই শহরই হয় ইতালির রাজধানী। পোপ বেছে নেন ভ্যাটিকানে স্বেচ্ছা-নির্বাসন। কিন্তু ১৯২৯ সালে এক সন্ধির ফলে ভ্যাটিকানের স্বাধীন সত্তা স্বীকৃত হয়। পৃথিবীর সমস্ত দেশের ক্যাথলিক গির্জা-প্রতিষ্ঠানগুলির উপরও স্বীকৃত হয় পোপের অধিকার।

পনের শতকে রোম যখন পোপের অধীনে আসে তখনকার শ্রেষ্ঠ শিল্পী ভাস্করদের রোমে এনে ভ্যাটিকানকে তাঁরা শিল্প-ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত করে তোলেন। এই শিল্পীদের মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য হলেন মিকেল্যাঞ্জেলো বাফায়েল, দা ভিঞ্চি প্রমুখেরা। মিকেল্যাঞ্জেলোর প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল ভ্যাটিকানের সিস্টাইন চ্যাপেল। এইখানেই আঁকেন তিনি অনেকগুলি দেয়াল-চিত্র। তাছাড়া ভাস্কর্যেও সমান দক্ষ ছিলেন তিনি।

এই সংখ্যার প্রচ্ছদ মিকেল্যাঞ্জেলোরই সিস্টাইন চ্যাপেলের আঁকা একটি দেয়াল চিত্রের প্রতিলিপি থেকে নেওয়া। নাম—প্রফেট জেরিয়া, স্থান পেয়েছে ব্ল্যাকেটের উপর।

পর পর কয়েকটি সংখ্যায় শুধু ভ্যাটিকানের এই দেয়ালচিত্রের প্রতিলিপিই নয়, রোম নগরীর অন্যান্য ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীন কীর্তিরও পরিচয় ছাপা হবে প্রচ্ছদে।

আমরা ভারতীয়েরা এক সুপ্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকার পেয়েছি বলেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অনুরূপ ঐতিহ্যের প্রতিও আমাদের শ্রদ্ধা থাকা স্বাভাবিক। এই পর্যায়ে তাই আমরা রোমের পর জানাব প্রাচীন মিশর অর্থাৎ এখনকার ইজিপ্টের কথাও। এবং আমাদের কথাও থাকবে অবশ্য এই পর্যায়েই।

নতুন বই

শরৎচন্দ্র : জীবন ও সাহিত্য। নিতাই বসু। মানস প্রকাশনী। ৬৪ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট। কোলকাতা—১২। দাম দশের টাকা।

বাংলাভাষার একজন শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় লেখক সম্পর্কে তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সেই গ্রন্থতালিকায় নিতাই বসুর এ গবেষণা গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

'মানব দরদী শরৎচন্দ্র' শরৎচন্দ্রের আটপৌরে বা ঘরোয়া জীবন এবং তাঁর অন্তরঙ্গ বাহিনী ও সামাজিক অবিচার বিরোধী শরৎচন্দ্রের বিক্ষুব্ধ ভূমিকা—মোটামুটি এই ধারাতেই শরৎচন্দ্র সম্পর্কিত গ্রন্থাদি লেখা হয়ে থাকে। মানবদরদী শরৎচন্দ্রকে নিয়ে আলোচনা সম্ভবত পূর্বসূরী কোন সমালোচকের একটি নির্দেশিত পথে যেন প্রবাধাবিত পদচারণা। এই বিশেষ অভিধার কোন বিশেষ সমালোচক হয়তো একদা শরৎচন্দ্রকে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। সে প্রভাব একাল যেন কাটাতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বসুর মত শরৎচন্দ্রকে মানবদরদী বিশেষণে সমালোচকরা বারবার ভূষিত করেছেন দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় আমাদের সাহিত্য সমালোচনার স্তর এখনো প্রথাবদ্ধ গন্ডীর মধ্যে আটকে পড়ে আছে। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে নারী দরদী বিশেষণটি প্রয়োগের প্রাদুর্ভাব প্রসঙ্গে শ্রীবসু শরৎচন্দ্রকেই দায়ী করেছেন। অবশ্য শরৎ সাহিত্যে পুরুষ চরিত্রের অপ্রধান্যের সামাজিক কারণ সম্পর্কে প্রখ্যাত সমালোচকরা যে বরাবরই উদাসীন সে বিষয়েও ইঙ্গিত রেখেছেন। বলা বাহুল্য শ্রীবসুর এই ইঙ্গিতটি যথাযথ। সমাজ সংস্কারে শরৎচন্দ্রের অবদান সম্পর্কেও ছড়ানো ছিটানো প্রবন্ধে এবং শরৎচন্দ্র সম্পর্কিত একাধিক গ্রন্থে সমালোচকরা প্রথাসিদ্ধ আলোচনা করে থাকেন। একথা বলতে দ্বিধা নেই বিষয়টি সম্পর্কে যথার্থ বিশ্লেষণ অনেক আলোচনাতেই অনুপস্থিত।

ব্যক্তিজীবন, সাহিত্যজীবন; দেশকালের প্রতিক্রিয়া; চরিত্র-চিত্রণ; সামাজিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এবং অর্থনীতি ও রাজনীতির আলোকে, শরৎ প্রতিভাকে আলোকিত করার চেষ্টা করেছেন শ্রীবসু—সফল হয়েছেন প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই। বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব, নারী চরিত্রের প্রাধান্য ও কারণ, পুরুষ চরিত্রের বৈচিত্র হীনতা; স্কেচধর্মী চরিত্র সৃজনে বৈচিত্র্য সৃষ্টি; লেখকের উচ্ছ্বাস ও অসংযম, অর্থনৈতিক চেতনা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চেতনার পার্থক্য অংশগুলি বইখানির বিশেষ মূল্যবান অংশ।

শরৎচন্দ্রকে জানার এবং বোঝার বিষয়ে ও শরৎ সাহিত্যের যথার্থ বিশ্লেষণে লেখক যথেষ্ট সচেতনতার সঙ্গে অগ্রসর হয়েছেন। নেহাৎ বিতর্ক সৃষ্টির খাতিরেই সমালোচনার চলতি ধারাকে অস্বীকার করেননি। নিজস্বতার বৈশিষ্ট্যে শরৎ জীবন এবং

সাহিত্যে যথার্থ এক সন্ধানী আলো ফেলেছেন। এ পর্যন্ত প্রচলিত সমালোচনার ফাঁকগুলি যথাসাধ্য বুদ্ধির বিশ্লেষণের সহায়তায় পূরণের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর সমস্ত বক্তব্যই যে তর্কাতীত তা নয় তবে বুদ্ধির বিশ্লেষণ এবং যুক্তির নিষ্ঠায় সেগুলি রীতিমত জোরালো।

চার্বাক

পৃথিবীর গল্পকথা : দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা-৯ : ছ'টাকা (সচিত্র, ১০৮ পৃষ্ঠা)।

বাংলায় সাধারণ ও অ-বিশেষজ্ঞ পাঠকের মুখ চেয়ে এ-পর্যন্ত জগৎ-বিজ্ঞান (অ্যাবথ্-সায়ান্স)) বিষয়ে বিশেষ কিছু লেখা হয়নি; সেদিক থেকে দিলীপবাবুর বইটি উল্লেখ্য ব্যতিক্রম। লেখক বয়স্ক ও কিশোর পাঠক-পাঠিকার জন্যে যথাসম্ভব সহজ ভাষায় ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য, পৃথিবীর বয়স, মহাদেশ ও সমুদ্রের উৎপত্তি, চলমান মহাদেশ, ভাসমান মহাদেশ, পৃথিবীর নানা স্তর, পাহাড়, ধস, বন্যা, ভূমিকম্প; আগ্নেয়গিরি হিমবাহ জলপ্রপাত হ্রদ সমুদ্র, প্রবাল দ্বীপ সম্পর্কে তথ্য-সমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন। লেখক নিজে ভূবিজ্ঞানী, তাই তাঁর পরিবেশিত তথ্য নির্ভরযোগ্য বলে ধরা যায়; তবে পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে তিনি আর একটু সংযত হতে পারতেন। তবু গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি। সাধারণের মনে তিনি পৃথিবী ও নানা নৈসর্গিক ঘটনা ও অঘটন সম্পর্কে কৌতূহল জাগিয়ে তুলতে পেরেছেন। গ্রন্থের অন্তর্গত চিত্রগুলিও আকর্ষক ও সুমুদ্রিত। গৌতম রায়ের আঁকা প্রচ্ছদও সুন্দর।

নীল তাঁর রক্তাক্ত আকাশ : অহিভূষণ চট্টোপাধ্যায় : বিকাশন, কলিকাতা-১৪ : দশ টাকা।

এই সচিত্র কাব্য-সংকলনটি রসিক ও তন্নিষ্ঠ পাঠকের নিশ্চয়ই মনোযোগ আকর্ষণ করবে; এখানে শিল্পী ধীরাজ চৌধুরী বিষয়ানুগ চিত্রায়ণে ৪০টি কবিতাকেই বিশিষ্ট ও দ্রষ্টব্য করে তুলেছেন। কবি-শিল্পীর এই যুগলবন্দী অভিনয় এবং হৃদ্য! অহিভূষণের জীবন-দৃষ্টি পরিণত। মনন ও অভিজ্ঞতায় ভূষিষ্ঠ। কবিতাগুলি তিনি অকারণে জটিল করে তোলেননি, বরং শিল্পীর চিত্রায়ণগুলি সেই অনুপাতে মাঝে মাঝে প্রতীকী এবং দুর্বোধ্য।

INDIA
By INDIRA GANDHI
A few autobiographical sketches and selection of speeches of
PRIME MINISTER OF INDIA.
Hardback Rs. 60.00
Paperback Rs. 10.00
Rupa & Co
15 Bankim Chatterjee Street
Calcutta 700 012
Also at
Allahabad : Bombay : Delhi.

নৈর্ব্যক্তিক চিত্রলিপি : তুষার রায়চৌধুরী : শ্লোক কবিতা প্রকাশনী। কলকাতা—৭০০০৩৪ : তিন টাকা।

সত্তরের দশকে জ্বলজ্বল, আবর্ষক কবিতা লিখে বেশ কিছু তরুণ কবিই আমাদের অনুভূতি উদ্দীপ্ত করে তুলেছেন। ঐ কবি গোষ্ঠীর মধ্যে তুষার রায়চৌধুরীর নামও সম্ভবত করা চলে। তাঁর এই কাব্য সংকলনের কয়েকটি কবিতা চিত্রকল্পের অনন্যতায়, বক্তব্যের তীক্ষ্ণতায় ও ভাষার বৈভবে ধনী। অন্ধকার আর আলোকিত এই দুই জগতের দ্বন্দ্ব, সাম্প্রতিক সংকটে বিদ্ধ কবির ভাবনা যে এই সংকলনে 'মূর্ত হতে চেয়েছে' তা তাঁর স্বীকারোক্তি থেকে জানা গেল।

জয় সূর্য (উপন্যাস)। রমেশ দাস। জ্যোতি প্রকাশন ২এ নবীন কুণ্ডু লেন কলকাতা-৯। চার টাকা।

রমেন দাস লিখিত জয়সূর্য উপন্যাসটির পটভূমি স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত-কালের পূর্বের ভারত। নায়কের নামেই আলোচ্য উপন্যাসটির নামকরণ কিশোর জয়সূর্য তার জন্মসূত্রে পাওয়া নামটিকে সার্থক করার জন্যই বদ্ধ পরিকর। মিশনারী স্কুলে তার কিশোর জীবনের শিক্ষা হলেও পরিণত মনে সে বিদেশী অত্যাচারী ইংরাজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে একটা ছোট বাহিনী সে গড়ে তোলে। শত্রুপক্ষের সম্মিলিত আক্রমণের মুখে জয়সূর্য আর তার বাহিনী বীরের মত প্রাণ দেয়। উপন্যাসটি কিশোর পাঠকদের ভালো লাগতে পারে।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

ভান্ডার : (রবীন্দ্র-জয়ন্তী সংখ্যা)। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন। ২৩এ নেতাজী সুভাষ রোড। কলকাতা—১। দাম তিন টাকা।

ভান্ডার পত্রিকার রবীন্দ্র সংখ্যাটি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত একাধিক মূল্যবান রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে পাঠকদের হাতে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের একটি গান রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে নিমগ্ন ভুবনডাঙ্গা : বোলপুর শান্তিনিকেতন—এ সংখ্যার উল্লেখযোগ্য রচনা লিখেছেন সৈয়দ মুজতবা আলী প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং বিনয় ঘোষ। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের গ্রাম এ আমাদেরই লোক নামের রচনাগুলিও ভালো। সুন্দর প্রচ্ছদ। ছাপা পরিচ্ছন্ন। সংখ্যাটি সংগ্রহযোগ্য। বিশেষ করে সৈয়দ মুজতবা আলির রচনার জন্য—যদি অবশ্য তা পুনর্মুদ্রণ না হয়।

অক্ষর। (কবি প্রণাম সংখ্যা) সম্পাদনা নির্মল দাস। ১৯০ এস পি মুখার্জি রোড। কলকাতা—২৬। তিরিশ পয়সা।

রবীন্দ্র সংগীত ও আমরা রচনাটি ভালো লাগল। তবে আরও ব্যাপক আলোচনার দরকার ছিল। তা হলে বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ হোত। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র কৃষ্ণ ধর অজিতকুমার সিংহ শুদ্ধসত্ত্ব বসুর কবিতা ভালো লাগল।

মানব মন। সম্পাদক ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৩২।১৩ বিধান সরণী। কলকাতা ১৪। এক টাকা বারো আনা।

মনোবিজ্ঞান জীব বিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞানের আধুনিক ধারার পরিচালক মানব মন পত্রিকা চিন্তাশীল পাঠকের কাছে নতুন পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। এর প্রতিটি সংখ্যাতেই থাকে মূল্যবান প্রবন্ধ। এ সংখ্যাটি যে ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। শরৎচন্দ্র ও রোমান্টিক প্রেম নারী মুক্তি আর মুক্তি মনস্তাত্ত্বিক দিক? শিল্প কারখানায় মনস্তাত্ত্বিক অভিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার এই সংখ্যার উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ। ছাপা এবং প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন।

চারুবাক। সম্পাদক : অমিয় ভট্টাচার্য। চৌরঙ্গী রোড। কলকাতা—৭১। দাম উল্লেখ নেই।

অফিস পাড়া থেকে প্রকাশিত চারুবাক পত্রিকা বেশ কিছুকাল ধরেই সাহিত্যানুরাগীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছে। পরিচ্ছন্ন রুচির পত্রিকাটিতে উন্নতমানের গল্প প্রবন্ধ প্রায়ই চোখে পড়ে। সম্প্রতি চারুবাক এর চৈত্র সংখ্যাটি হাতে এলো। এ সংখ্যার একাধিক প্রবন্ধই অপরাজেয় কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র সম্পর্কিত। আধুনিককালে শরৎ সাহিত্যের মূল্যায়ন শরৎ জীবনী সৃষ্টির উৎস শরৎচন্দ্রের কবিমানস উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ। আশানন্দ চৌধুরী এবং অলোক সেনের গল্পও ভালো লাগল। প্রচ্ছদ এবং ছাপা পরিচ্ছন্ন।

সাহিত্য প্রবাসী পত্রিকা। (শরৎ শতবার্ষিকী সংখ্যা)। সম্পাদক শৈলেন শেঠ। ৪৫ যাদব দাস লেন। হাওড়া—২।

কালজয়ী কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্করের চিঠিতে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য রূপ স্পষ্ট হয়েছে। আশাপূর্ণা দেবী বিমল কর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ একালের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের উপলব্ধিতে শরৎচন্দ্রের মূল্যায়নের একটা প্রয়াস আছে। তাছাড়া শরৎচন্দ্র ও পরবর্তী কাল শরৎচন্দ্রের উপন্যাস : আঙ্গিক বিষয় উজ্জ্বল মজুমদার এবং ক্ষেত্র গুপ্তের প্রবন্ধ দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রূপম। সম্পাদনা আনওয়ার আহমদ। বি-৯১ইএফ-৭ মতিঝিল কলোনী। ঢাকা—২। তিন টাকা।

একাধিক গল্প একটি বহস্য উপন্যাস দুটি উপন্যাস একাধিক ফিচারে সংখ্যাটি ভরাট করেছে। জীবন নয়বার ধারাবাহিক উপন্যাস ঘর বদল ভালো লাগছে। কয়েকটি গল্পও ভালো লাগল।

ইকবাল সিং সান্ধু
মুখ্য জনসংযোগ অধিকর্তা

সাউথ ইস্টার্ণ রেলওয়ে

যুগ যুগ ধরে চক্র আমাদের প্রগতির প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। সমৃদ্ধির পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে মানুষের মহান আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এই চক্র দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে উত্তরাধিকার সূত্রে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের নিকট থেকে লাভ করেছে। দেশের ইস্পাত কারখানার — ভিলাই বোকারো, টাটানগর, বার্নপুর, দুর্গাপুরের জন্যে প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল এবং কারখানাগুলি থেকে মূল্যবান ইস্পাত পরিবহনের সুযোগ পেয়ে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে গর্ব অনুভব করছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে বোকারো কারখানারও চাহিদা মেটাচ্ছে।' দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের এক বিজ্ঞাপনের বয়ান এটা। এই বিজ্ঞাপনটার কথা আমার বার বার মনে পড়ে যাচ্ছিল যখন এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য জনসংযোগ অধিকর্তা শ্রীইকবাল সিং সান্ধু আমায় বলছিলেন—ভারতবর্ষের ষ্টীল প্ল্যান্ট এবং তৈল শোধনাগার মূলত আমার রেলপথের উপর নির্ভরশীল। এই সব প্রতিষ্ঠান এবং বৃহৎ বৃহৎ শিল্প কারখানাগুলোকে আরও সজীব ও আরও উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আমরা আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে সেবা করে চলেছি। শুধু তাই নয়, এক এক বৎসরের সর্বাধিক পরিমাণ করলা এবং খনিজ দ্রব্যের ট্রান্সপোর্টেশনও আমাদের রেলপথের মাধ্যমেই হয়। তাছাড়া গোটা দেশের শতকরা ৭০ ভাগ পরিমাণের কাঁচা মালও এই রেলওয়ের মাধ্যমেই চলাচল করে।

কথাগুলো বলে চশমাটা খুলে আমার দিকে তাকালেন শ্রীসান্ধু। ৪৫ বছর বয়সের পাঞ্জাবী কণ্ঠের ভরাট স্বরে হেসে বললেন—'আরে! এ যে আমিই শুধু বলে যাচ্ছি!' আরও জোরে হেসে ফেললেন। হাসি থামলে বললেন—বলুন আপনি। দুঃখিত আমি। প্রশ্ন করুন।

—আচ্ছা মিষ্টার সান্ধু প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই বিজ্ঞাপনের একটা ক্রমবিবর্তনের ধারা থাকে। সময়, পরিবেশ এবং প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাই বিজ্ঞাপনের বা প্রচারের কৌশল, ভাষা, বয়ান এমন কি আঙ্গিকগত কাঠামোও বদলায়। তা আপনি আমাকে আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনের দিক বদলের পালাটা কি পরিবর্তনের কারণসহ বুঝিয়ে দেবেন?

চোখে চোখ রেখে ইকবাল সিং সান্ধু বললেন—আই এ্যাপ্রিসিয়েট ইওর আপ্রোচ। ভেরি ডেপথ ডাইমেনশনাল কোশ্চেন। কিন্তু আমার পক্ষে তো তা বলা সম্ভব নয়। কারণ বেশি দিন নয়, মাত্র দু বছর হল এই পদে এসেছি আমি। ১৯৭৪ সালে।

সুতরাং এখানকার বিজ্ঞাপনের পূর্বেকার গতি-প্রকৃতিটা তো আমার জানা নেই। সুতরাং ক্রমবিবর্তনের ধারাটা বলাও আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। সুতরাং আপনি বরং অন্য প্রশ্ন করুন।

আমি তখন চা খেতে খেতে উত্তপ্ত চায়ের ধোঁয়াটা কিভাবে উঠছে, বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে, তাই দেখছিলাম।

হঠাৎ প্রশ্ন রাখলাম—এখানে আসার পর আপনিই বা বিজ্ঞাপন কি প্রচারের মাধ্যমটাকে কিভাবে ভাবতে শুরু করলেন?

চশমাটা আবার পরে নিলেন মিষ্টার সান্ধু। বললেন—দেখুন, অন্যান্য কমার্শিয়াল প্রতিষ্ঠান থেকে আমার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনের ধারাটা সম্পূর্ণ অন্য রকম হবে। যেমন অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছে পণ্য বিক্রি বা ঐ সম্পর্কিত ব্যাপারটাই প্রধান। সুতরাং তাঁদের প্রচারের ভাষাও মূলত সেই ধরনের। কিন্তু আমার বিজ্ঞাপনের অধিকাংশতেই আমায় রাখতে এডুকেশনাল আন্ড মরাল ভ্যালু! বিশেষত যেখানে জনগণকে নিয়ে আমায় প্রত্যক্ষভাবে কাজ করতে হয়। মূলত সোস্যাল এডুকেশান এবং সেলস প্রোমোশন, এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীতেই বিজ্ঞাপনের সব কিছু আমি ঠিক করি।

কথাগুলো বলে তাঁর বক্তব্যের যাথার্থ প্রমাণের জন্য আমার সামনে একে একে কতগুলো বিজ্ঞাপনের বয়ান তুলে ধরলেন। চট করে একটা সামান্য বিজ্ঞাপন চোখটা টেনে নিল। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম বিজ্ঞাপনটার দিকে। লেখার কায়দায় একটা

উদ্যত হাত চলন্ত ট্রেনেরও শিকল টানতে উদ্যত। বিজ্ঞাপনের ভাষা হলো—'একে থামান। এ আপনাদের সকলকে থামাচ্ছে।' অর্থের গভীরতাটা ভালোভাবেই উপলব্ধি করলাম। বিজ্ঞাপনটার দিকে আমার একান্ত মনোনিবেশ দেখে শ্রীসাধু। বললেন—'এর পরিকল্পনা আমার তৈরি। সামাজিক শিক্ষা এবং গতি এই দুই বিচারে তৈরি করেছি বিজ্ঞাপনটা। 'এ আপনাদের সকলকে থামাচ্ছে' অর্থাৎ আপনাদের গতিকে থামাচ্ছে। সমগ্র জীবনটাই একটা গতি। সময়ের দাম সেখানে অমূল্য। হাজার হাজার মানুষ সেই সময়ের দাম নিয়েই চলেছে ট্রেনে। আধ ঘণ্টার এদিক-ওদিক হয়ত অজস্র যাত্রার ক্ষতি করতে পারে। এই রকম অবস্থাতে কোন দুর্বৃত্ত বা সমাজবিরোধী কিম্বা অসাধু লোক যদি নিজের স্বার্থে ট্রেনের গতি বন্ধ করে দিতে চায়, তবে আমাদের সম্মিলিত কর্তব্য সেই লোককে প্রতিরোধ করা, বাধা দেওয়া। এই বিজ্ঞাপনে সেই বক্তব্যই তুলে ধরতে চেয়েছি।

আর একটি বিজ্ঞাপনের ভাষা এরকম—'এমন একজন যে ট্রেনপথে আপনার মালপত্র চুরি করে অথবা যে ব্যক্তি গাড়ীতে বা ষ্টেশনে আপনার সুযোগ-সুবিধা নষ্ট করে

এবং যে লোক রেলওয়ে সরঞ্জাম, যন্ত্রাদি চুরি ও ক্ষতি করে যেগুলি আপনার যাত্রাকে আরও নিরাপদ, সুগম ও স্বচ্ছন্দ করতে পারত, সে যেই হোক, সে একজন সমাজবিরোধী, সে আপনার, আমাদের ও জাতির বিরুদ্ধে অপরাধ করছে, সে একজন অপরাধী—এবং গুরু অপরাধী, ভিজিল্যান্স ও আইনের প্রসারিত হাত থেকে তার রেহাই নেই। আপনিও সহযোগিতার হাত এগিয়ে দিতে পারেন।'

শুধুমাত্র এই ধরনের বিজ্ঞাপন নয়, রেলপথে ভ্রমণার্থীদের ভ্রমণ-স্থানে আকৃষ্ট করতেও ভোলেন না দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে। তাই বিজ্ঞাপনে তাঁরা ঘোষণা করেন—'দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে হোটেল, পুরী ও রাঁচী। সেবা ও বৈশিষ্ট্যের ঐতিহ্যমণ্ডিত এই জুটির জন্য আমরা গর্বিত।'

আমি নোট নিচ্ছি। তা দেখে শ্রীসাধু বললেন—'এসব ছাড়াও আমরা আমাদের কর্মচারীদের জন্য ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় 'হাউস ম্যাগাজিন' বের করি। আমরা বিশ্বাস করি—'এভরিম্যান ইজ এ কিয়ারম্যান।' আমার প্রতিষ্ঠানের [illegible] প্রতিষ্ঠানের কার্যকর্ম, নিয়মানুবর্তিতা, উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয়ে ওয়াকিবহাল করে তুলতে না পারি, তবে কিছুতেই তাঁরা যথার্থ কর্মী হতে পারবেন না। সেই উদ্দেশ্যেই আমরা 'হাউস ম্যাগাজিন' বার করি। সেই সঙ্গে দেখানোর ব্যবস্থা ও শিক্ষা-মূলক অথচ আনন্দদায়ক চলচ্চিত্রও।

—বছরে আপনাদের বাজেট কত এই বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ খাতে?

—সেটা বলায় অসুবিধা আছে।

—গ্রামের মানুষ আপনার প্রচার পদ্ধতি সম্পর্কে কতটুকু জানে বলে আপনার ধারণা?

—সেটার সমীক্ষা নিই নি। তবে মফস্বল অঞ্চলের সব ছোট ছোট কাগজেই আমরা বিজ্ঞাপন দিই, সেখানেও সিনেমা দেখাই। আমরা আমাদের প্রচেষ্টা ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছি।

বিদায় জানাবার জন্য করমর্দন করতে করতে হাসতে হাসতে কথাগুলো বলে গেলেন শ্রীসাধু।

আনন্দ বাগ

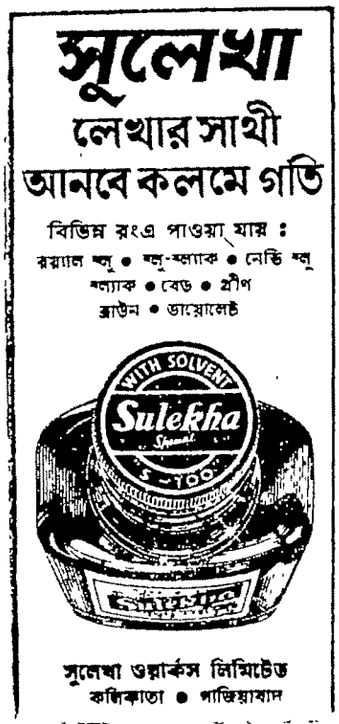

কথায় কথায়

চোরের কষ্ট

কয়েকদিন আগে এই পাতায় চোরেদের বিষয়ে খারাপ-মন্দ কি সব যেন লিখেছিলাম। কি কুক্ষণেই না লিখেছিলাম। যেদিন লেখাটি বেরুলো সেদিনই গভীর রাতে জানলার নিচে চাপা গলায় আওয়াজ পেলাম, 'দেখে নেবো।' দেখে নেওয়া মানে জানলার পুরানো কালের পিতলের ছিটকিনিটি নিয়ে তারা চলে গেলো। পরেরদিন সন্ধ্যায় বাড়িতে কেউ নেই কে যেন এসে দরজার পাশ থেকে ডাকবাকসটা খুলে নিয়ে চলে গেলো। বাড়িতে সবাই বলাবলি করতে লাগলো খুব সাবধানে থাকতে হবে, এ সবই হলো খুব বড় চুরির পূর্বাভাস।

বড় চুরি কিছু হলো না বটে কিন্তু একদিন অন্যরকম ঘটনা ঘটলো। খুব ভোরে আমাদের বাচ্চা কুকুরটা নিয়ে রাস্তায় হাঁটছি সামনা সামনি এক ভদ্রলোক পাকানো চেহারা দুই চোখে প্রখর বুদ্ধির জোনাকি ঝকঝক করছে। আমার কুকুরটা এই অপরিচিত ভদ্রলোকটিকে দেখে ভীষণ লেজ নাচিয়ে কান গুটিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আদুরেপণা করতে লাগলো। আমি শুনেছি এবং জানি যে কুকুরেরা চোর দেখলে ভীষণ খুশি হয়। চোর বাড়িতে এলে কুকুরেরা পায়ে লুটিয়ে পড়ে, হৌ হৌ করে তাদের স্বাগত জানায়। তারপর যখন তারা তালা-আলমারি-সিন্দুক ভেঙে চুরি করতে থাকে তখন যে দু একটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করে না তা নয়, কিন্তু সেটা সে তার মনিবকে সজাগ করার জন্য করে না, সেটা করে চোরদের কাজে উৎসাহ দেওয়ার জন্যে। সেটাকেই অনেকে বোধকরি কুকুরের প্রভু-ভক্তি, একনিষ্ঠা কর্তব্যপরায়ণতা ইত্যাদি মহৎ গুণ বলে ভুল করেন। যা হোক আমার কুকুরশাবকটি এই পথচারীকে এতটা খাতির করছে দেখে এক মুহূর্তে আমি বুঝে গেলাম, এই ভদ্রলোকটি একজন চোর। এবং আমার সেই লেখার ব্যাপারে কৈফিয়ৎ চাওয়ার জন্যেই এই শেষরাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

ভয়ে আমার বুকের মধ্যে, রেলগাড়ি ছাড়ার আগে স্টেশনে যেমন ঘণ্টা পেটার সেই রকম কি একটা ঘণ্টা ঢং ঢং করে বাজতে লাগলো। আমি শুকনো মুখে বোকার মত অল্প অল্প হাসলাম। তিনি কোনো ভাবান্তর প্রকাশ না করে বললেন, 'আপনার সঙ্গে কথা আছে। তার আগে...' বাকী সমাপ্ত না করে তিনি পকেটে হাত দিলেন, আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলাম এইবার রিভলভার বা ছোরা বেরিয়ে আসবে। বেরিয়েও এলো, ঠিক ছোরা জাতীয় কি একটা জিনিস পিতলের তৈরি। আমি বুঝতে পারলাম এবার আমার দৌড় দেওয়া উচিত, অন্তত প্রাণ বাঁচাতে। কিন্তু তিনি আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, '...তার আগে এই পিতলের ছিটকিনিটি আপনাকে ফেরৎ দেবো, আর আপনার ডাকবাকসটিও এতক্ষণে নিশ্চয় লাগিয়ে দিয়ে এসেছে আমার লোকেরা।'

আমি স্তম্ভিত। আমার মনের অবস্থা অনুমান করেই হয়তো তিনি বললেন, 'দেখুন এতে অবাক হবার কিছু নেই। আমরা ইচ্ছা করেই আপনার জিনিস ফেরৎ দিয়ে দিচ্ছি। আমাকে আপনি চিনতে পারছেন না হয়তো। আমি হলাম তস্কর মহাসংঘের পূর্বাঞ্চলীয় শাখার ভ্রাম্যমাণ সম্পাদক। আপনি তো লেখেন-টেখেন। আপনি নিশ্চয় জানেন আমরা ইচ্ছে করলে যে কোনো লোকের বাড়ির সদর দরজার পাপোষ থেকে চায়তলার ছাদের টেলি-ভিশনের এরিয়েল পর্যন্ত আগাগোড়া বেমালুম সাফ করে দিতে পারি। আপনাকেও পারি। আপনার আর কি জিনিস আছে এক লরিতেই হয়ে যাবে।'

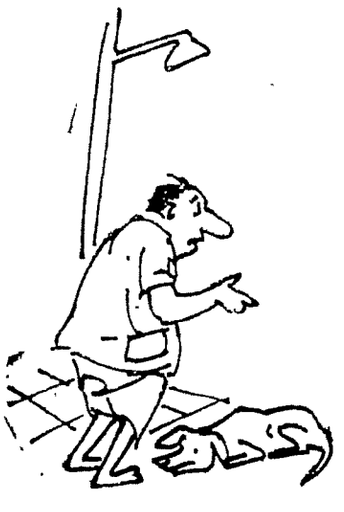

আমাকে ঘামতে দেখে ভ্রাম্যমাণ সম্পাদক সহানুভূতিময় কণ্ঠে বললেন 'ভয় পাবেন না। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আপনার কোনো ক্ষতি করবো না, কিন্তু আপনি আমাদের বিষয়ে আর ঐ সব উল্টোপাল্টা কথা লিখতে পারবেন না।' আমি কোনো-রকমে গলায় জোর এনে বললাম তবে কি লিখবো?

উক্ত সম্পাদক বললেন, আগে আমাদের কথা শুনুন আমাদের সমস্যাটা বুঝুন। তারপর আমাদের দুঃখের কথা পাবলিকের কাছে তুলে ধরুন। দেখবেন আপনারও নাম হবে, পাবলিকও আমাদের দুঃখে কাঁদবে।'

আমি আরো বিস্মিত হয়ে বললাম, কি সমস্যা, আপনাদের? তস্কর সম্পাদক বললেন, সমস্যা কি একটা মশাই, সমস্যা তের। এই দেখুন না আগে সবরকম তালা খোলার মাস্টার কি'র দাম ছিলো আঠারো টাকা, কুড়ি টাকা, এখন আশি টাকার কম কিছুতেই পাওয়া যায় না। তাও বাজে চাবি, দুবার ঘোরালেই নষ্ট হয়ে যায়। তারপর দেখুন ঐ সিন্দুকাঠি। খাঁটি স্টিলের সিন্দুকাঠিতো আজকাল পাওয়াই যায় না। বাঁচা লোহার একটা সিন্দুকাঠি জোগাড় করতেই বস্তু জল হয়ে যায়। শুধু যারা খানদানি চোর, তারা কেউ কেউ বাপ-জ্যাঠার কাছ থেকে সাবেকি জার্মান সিন্দু-কাঠি হয়তো পেয়েছে, বাকিরা কি করে বলুন তো?' P 32981

সত্যিই এর আগে কোনোদিন আমি এসব দিক ভেবে দেখিনি। আমি চালাকি করে তখনকার মত হাত এড়ানোর জন্যে বললাম, 'একটু গুছিয়ে লিখে দিন, কাগজে সব ছেপে দেবো।'

ভ্রাম্যমাণ সম্পাদক হেসে বললেন, 'ঠিক আছে এক সপ্তাহের মধ্যে লেখা পাবেন।'

বাড়ি ফিরে দেখি সদর দরজায় চুরি যাওয়া ডাকবাকসটি ফের লাগানো রয়েছে।

তারাপদ রায়

বিষাদের গভীরে ॥

হরিজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

এই মুহূর্তে আর কেউ নেই
এই মুহূর্তে শুধু একমাত্র পৃথিবী, বিষাদ,
রৌদ্রকরোজ্জ্বল লাবণ্যের মত বিষাদ
একটি মমতার নাম হতেও পারতো।

এই মুহূর্তে আর কেউ নেই
ভ্রষ্ট তাপস কিম্বা ক্রীত রমণীর ঠোঁট,
গুহাচিত্রে অবিনশ্বর নারীর মিথুন মূর্তি,
সুবহ পান্থশালা, ধ্বংসাবশেষ,
কেউ নেই

শুধু প্রস্তাব গভীরে এক বিষ—বিষমালা
মমতার থেকেও নিবিড় জড়ে রয়েছে মমতা
এ শেষ প্রহরে অনন্তের ছায়ায় দাগ কেটে রাখে
কিছু ছিন্নছাড়া বেদনা!

সম্মোহিত ঘুমিয়ে রয়েছে এক অপরূপ সেতু
নদের বুকের 'পরে আড়াআড়ি সে অবোধ প্রেমিক ঘুমায়
তার শরীরের তটরেখা ভেঙেছে জোয়ার
ফণিমনসার রাতের আঁধারে দুপাশে সাজানো
দুরবগাহ বিষাদ
তুমি প্রতিটি নখের ঝিলীতে শুধু একমাত্র পৃথিবী,
বুকের গভীরে একটি সেতুর নাম—
রৌদ্রকরোজ্জ্বল লাবণ্যের মত
বিষাদ একটি মমতার নাম হতেও পারতো।

হোমের আগুনে ॥

গৌতম দাশগুপ্ত

উত্তুরে হাওয়ার সঙ্গে ক্যারাভ্যান আসে ক্রোশ বেয়ে
শুকরের মাংস এক ঝুড়ি ডিম প্রাইভেট ত্রিপল
ময়ালের মত সর্পিল হয়ে রঙীন সংসার
দেখেছে দুর্গম আর হিমের শীতল অনুভূতি
খেলেছে শরীরে তার, শকটের লেসের পর্দায়
পানপাত্র মুখ খোঁজে সিমেণ্ট প্রমাণ শক্ত বুক
ঠাকুরমার ঝুলি নিয়ে চোখে ঘোর সাতশো বছর
মরুর প্রান্তর ছুঁয়ে বিষুবের ছমছম ছায়ার
উপোষীনগর পোড়ামাটি কারুকার্যময় রথ
চঞ্চল রহস্যনীল চোখে তার বিশ্রাম কথাটি
গ্রীকের মতন ছিল, তলোয়ার ছিল অমলিন
মুখের আদল ফোটে সামগানে হোমের আগুনে।

অন্তত একবার ॥

ওয়াজেদ আলি

অন্তত একবার আমাকে তোমার
চোখের মণি ক'রে জানো।
অন্তত একবার আমাকে তোমার
বুকের গোলাপ ক'রে ফোটাও।

আর তোমার ওই পল্লবিত দু'চোখে,
আমার ভালবাসা নদী হয়ে থাক,—
আর আমি তার স্বপ্ন-নীল ঢেউ ছুঁয়ে
যেন ভেসে চলে যাই.....।

অন্তত একবার
আমাকে তোমার কাছে ক'রে নাও।

উপন্যাস

গোধূলিয়া

নিমাই ভট্টাচার্য

— বাইশ —

মনটা একটু বেসুরো হয়ে গেলেও কল্পনাকে পড়াচ্ছিলাম। দশ-পনের মিনিট পরে আলপনা এক কাপ চা টেবিলের পর রেখে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, কবে সিনেমা দেখাচ্ছেন?

সিনেমা?

চোখ দুটো বড় বড় করে মিট মিট করে হাসতে হাসতে বললো, হ্যাঁ। সিনেমা দেখাবার পর ভাল রেস্টুরেন্টে কবিরাজী কাটলেট খাওয়াবেন।

হঠাৎ?

তারপর জোর করে একটা ট্রু বেরি..

কিন্তু কেন?

এবার মাথা দুলিয়ে বললো, চাকরি পেয়েও....

হা ভগবান! এটা কোন চাকরি পাওয়া হলো?

মার উপর রাগ করে আমাকে কেন চিমটি কেটে কথা বলছেন?

আমি কারুর উপরই রাগ করি নি।

চা খেতে খেতে কথা বলুন।

আমি চায়ের কাপে চুমুক দিতেই কল্পনা জিজ্ঞাসা করল, প্রদীপদা, আপনি সত্যি চলে যাবেন?

আমি ওর মাথায় হাত দিতে দিতে বললাম, কি করব বল! চাকরি যখন পেয়েছি তখন যেতেই হবে।

আপনি আর আমাদের এখানে আসবেন না?

নিশ্চয়ই আসব। কলকাতায় এলেই তোমার সঙ্গে দেখা করব।

আলপনা সঙ্গে সঙ্গে বললো, আমার সঙ্গে দেখা করবেন না?

আমি হাসি। বলি, আমি পাটনা থেকে কলকাতা আসার আগেই হয়ত কল্পনার জামাইবাবুর সংসারে....

আমি কথাটা শেষ করার আগেই কল্পনা হাসতে হাসতে বললো, সত্যি প্রদীপদা, মা সেদিনই দাদুকে দিদির বিয়ের কথা বলছিলেন।

আমি চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়েই বললাম, কাকাবাবু যখন কেস টেক্-আপ করেছেন তখন আমি আর কবিরাজী কাটলেট খাওয়াবারও সময় পাচ্ছি না।

আলপনা একটু গম্ভীর হয়ে বললো, ওসব বাজে কথা ছাড়ুন। বলুন, কবে সিনেমা দেখাচ্ছেন?

সত্যি সিনেমা দেখবেন?

তবে কি আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করছি?

কিন্তু ঠাকুর-দেবতার কোন বই চলছে কি?

আমার কথা শুনে ওরা দু' বোন হেসে উঠল। আলপনা জিজ্ঞাসা করল, আমি কি ঠাকুমা-দিদিমা হয়ে গেছি যে ঠাকুর-দেবতার বই দেখব?

তবে কি বই দেখবেন?

চৌরঙ্গীপাড়ার কোন হলে....

না, না, ওসব হলে আপনাকে সিনেমা দেখাতে পারব না।

কেন?

ওসব হলে বড্ড অসভ্য বই দেখায়।

আপনি কি তবে আমাদের ভক্ত তুলসী-দাস দেখাতে চান?

ঐ রকম বই হলেই খুব ভাল হয়।

থাক। আপনাকে সিনেমা দেখাতে হবে না।

আলপনা আর দাঁড়াল না। চলে গেল। আমি আবার কল্পনার হোম-টাসকের খাতা দেখতে শুরু করলাম।

পড়ান প্রায় শেষ হয়ে গেছে এমন সময় আলপনা কচুরি আর আলুর দমের একটা প্লেট আমার সামনে রেখে বললো, মা পাঠিয়ে দিলেন।

কল্পনা সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে বললো, এই দিদি, আজ কচুরি হয়েছে?

আলপনার জবাবের অপেক্ষা না করেই ও আমার থেকে ছুটি নিয়েই দৌড়ল।

এবার আমি কচুরির প্লেটের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে আলপনাকে বললাম, ক্ষিদে থাকলে নিশ্চয়ই খেতাম কিন্তু আজ পারব না।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই ও বললো, ছোট ছোট এই কটা কচুরি খেলে...

অনেক ত খেয়েছি; আর কেন?

আমি আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলাম।

রাস্তায় বেরিয়েই পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম সিগরেটের প্যাকেটে একটা সিগরেট আছে। সামনের একটা পান-সিগরেটের দোকানের দড়ির আগুনে সিগরেটটা ধরিয়ে টানতে টানতে মেসের দিকে হাঁটছিলাম। ভাবছিলাম কল্পনাদের বাড়ীর কথা। ওরা নিঃসন্দেহে ধনী ওর মা কি শুধু অনুকম্পা দেখিয়েই আমাকে জয় করতে চান? আমার কি কোন মর্যাদা নেই? সিগরেট টানতে টানতে হাঁটছি আর ভাবছি। মনে মনে ঠিক করলাম, অসুস্থতার জন্য যখন কামাই করেছি তখন এ মাসের পুরো মাইনে নেব না।

মেসে ফিরতে গিয়েও ফিরলাম না। কাকাবাবুর বাড়ী গেলাম কিন্তু দেখা হলো না। বুড়ী ঝি বললো, কালীঘাটে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছেন। ফিরতে রাত হবে। মনে মনে ভাবলাম, ভালই হলো। উনি হয়ত অনেক কিছু বুঝাতেন। তার চাইতে আমি আমার কথা জানিয়ে যাই। কাকাবাবুকে একটা চিঠি লিখে জানালাম, আপনাদের আশীর্বাদে ন্যাশনাল কেমিক্যাল কোম্পানীর পাটনা অফিসে ডিপো ম্যানেজারের চাকরি পেয়েছি। শুরুতে তিনশ' পঁচিশ পাব। আগামী ১৬ই পাটনায় জয়েন করতে হবে। আমি ১লা থেকে আর ছাত্রছাত্রী পড়াব না। তিনচার তারিখে কাশী যাচ্ছি। তারপর ওখান থেকে পাটনা। কলকাতা ছাড়ার আগে নিশ্চয়ই দেখা করব। বাড়ী বাড়ী ঘুরে গোলামী করতে হবে না ভেবে খুব ভাল লাগছে। কল্পনার মাকে জানিয়েছি ১লা থেকে আসব না এবং নতুন মাষ্টার ঠিক করতে।

শেষে লিখলাম, কলকাতা ছাড়ার আগে কটা দিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকব। আপনি মেসে গেলে হয়ত দেখা পাবেন না।

পরের দিন দুপুরে মেসে ফিরে দেখি

কাকাবাবু বসে আছেন। একটু গম্ভীর মনে হল। আমি তাড়াতাড়ি ওকে প্রণাম করেই জিজ্ঞাসা করলাম, চিঠি পেয়েছিলেন?

হ্যাঁ পেয়েছিলাম।

চাকরিটা পেয়ে বেঁচে গেলাম।

কাকাবাবু একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, চাকরি হিসেবে মন্দ না কিন্তু তুই ত এখনই প্রায় প্রায় তিনশ' পাচ্ছিস।

চার বাড়ী থেকে মোট আড়াইশ' পাচ্ছি।

একটু চেষ্টা-চরিত্র করলে হয়ত এখানেই একটা চাকরি পেয়ে যেতি।

এতকাল চেষ্টা করে ত পেলাম না।

ভাবছি কলকাতা ছেড়ে যাওয়া কি তোর ঠিক হবে?

মন আগে থেকেই তৈরী হয়েছিল। তাই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম, কলকাতায় আমার কে আছে যে এখানেই থাকতে হবে? তাছাড়া এ চাকরি না পেলেও আমি এখানে থাকতাম না।

কোথায় যেতি?

কাশীতে। পিসীর কাছে।

কদিন আর পিসীর কাছে থাকতে পারতি?

আমাকে খাওয়ান-পরানর মত ক্ষমতা ও মন—দুইই পিসীর আছে। তাছাড়া কাশীও কম বড় শহর না। ওখানেও নিশ্চয়ই দু'তিনটে ছাত্রছাত্রী পেয়ে যেতাম।

কাকাবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর বললেন, তোর সঙ্গে আমার কিছু জরুরী কথা ছিল।

বলুন।

না, না, এখন তুই ক্লান্ত। পরে এক সময়...

এই কদিন ত আমি খুবই ব্যস্ত থাকব। তাই এখনই বলুন না কি বলতে চান।

বলব?

বলুন।

কাকাবাবু আমাকে পাশে বসিয়ে সস্নেহে আমার মাথায় হাত দিতে দিতে বললেন, তোর বাবা আর আমি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। তাই তোকে নিজের ছেলের মতই দেখি।

সে কথা আর কেউ না জানুক, আমি জানি।

তোর ভবিষ্যত জীবন সম্পর্কে আমি মনে মনে একটা কথা ভেবেছিলাম কিন্তু....

আমি খুব আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ভেবেছেন কাকাবাবু?

কাকাবাবু আমার একটা হাত নিজের দুটো হাতের মধ্যে নিয়ে আমার দিকে প্রায় অসহায়ের মত তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যি বলবি?

কেন বলবেন না? আপনার যা খুশী তাই আমাকে বলতে পারেন।

কাকাবাবু মুখ নীচু করে আবার একটু ভাবলেন। তারপর প্রায় আপন মনেই বললেন, ভেবেছিলাম একটা ভাল বংশের একটা ভাল মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়ে তোকে সংসারী করে দেব। কাকাবাবু হঠাৎ একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন সবাই জানে তুই আমার পুত্রতুল্য। তাই এক জায়গায় মোটামুটি কথাও দিয়ে দিয়েছি।

কাকাবাবুর কথা শুনে আমি রাগে ও দুঃখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার বাবা মা নেই বলে কি আমার ব্যক্তিগত কোন সত্তাও নেই? আমাকে স্নেহ করেন বলে কি আমি ওর ক্রীতদাস হয়ে গেছি! আমার বিয়ের ব্যাপারে উনি কথা দিয়ে দিলেন অথচ একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন না? মনের মধ্যে হাজার প্রশ্ন তোলপাড় শুরু করল। ভাবছি কাকাবাবুকে কি বলব। কি করে বলব।

জানিস প্রদীপ, ওদেরও তোকে খুব পছন্দ।

কাকাবাবুর কথা শুনে আমার সারা শরীরের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বয়ে গেল। আমি আর এক মুহূর্ত দেরী না করে বললাম, কাকাবাবু, বোধহয় বিয়ে আমি করব না। করতে পারব না। আর যদিও কোন কারণে বিয়ে করতেই হয় তাহলে অত দাম্ভিক মহিলার জামাই নিশ্চয়ই হবো না।

কিন্তু প্রদীপ, ও তোকে অত্যন্ত স্নেহ করে।

সঙ্গে একটু অতিরিক্ত মাত্রায় অনুকম্পা মিশ্রিত থাকে।

পরিস্থিতিটাকে একটু সহজ করার জন্য উনি একটু হেসে বললেন, তুই ওকে ঠিক বুঝতে পারিস নি।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, কাকাবাবু, এবার আমি খাওয়াদাওয়া করে বেরুব।

তুই আজ রাত্রে একবার আসবি?

চেষ্টা করব।

আজ না হলে কাল আয়।

দেখি।

কাকাবাবু আর কোন কথা না বলে আস্তে আস্তে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সমস্ত কাজকর্মের মধ্যেও সব সময় কাকাবাবুর বিচিত্র আচরণের কথাই শুধু মনে পড়ছিল। ভাবছিলাম, ওর এত আগ্রহ কেন? আগে ভেবেছিলাম কল্পনাকে পড়াতে যাব না কিন্তু পটুয়াটোলার ছাত্রকে পড়িয়ে বেরুতেই মনে হল কল্পনা আমার জন্য বসে আছে। চলে গেলাম। অন্য দিনের মত পড়ালাম। আলপনা এক কাপ চা দিল। খেলাম কিন্তু বিশেষ কথাবার্তা বললাম না।

পরের দিন সকালে ছাত্রছাত্রী পড়িয়ে নেমে ফিরতেই কার্তিকবাবু বললেন, এক্ষুণি দিদি এলো।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। নৃপতি ওকে তোমার ঘরে বসিয়ে বোধহয় গল্প করছে।

আমি উপরে উঠতেই নৃপতি এক গাল হাসি হেসে ঘোষণা করল, দাদাবাবু এসে গেছেন।

ঘরে ঢোকার আগেই আমি ওকে বললাম, তাড়াতাড়ি দুটো চা দুটো কেক নিয়ে আয়।

নৃপতি চলে গেল। আমি ঘরে ঢুকেই হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি কিছুই জানেন না?

সব জানি বলেই আপনাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি।

সব জানেন?

আলপনা হাসতে হাসতে বললো, সব জানি মানে আপনার বাতিল করে দেওয়া পর্যন্ত জানি। তারপর আর কিছু হয়েছে নাকি?

না।

আমি ত ভেবেছিলাম কাল আপনি পড়াতে আসবেন না।

আমিও একবার ভেবেছিলাম, যাব না।

তারপর গেলেন কেন?

ভাবলাম কল্পনার প্রতি আমার কিছু কর্তব্য আছে।

আজ আসছেন?

আসব। আগামীকালও যাব।

বেনারস যাচ্ছেন কবে?

আগে ভেবেছিলাম তিন-চার তারিখে যাব কিন্তু এখন ভাবছি পয়লা-দোসরাই চলে যাব।

আমাকে সিনেমা দেখাবেন না?

আমার সঙ্গে সিনেমা গেলে আপনার মা আপনাকে মেরে ফেলবেন।

চিরকাল দাদু-দিদির কাছে থেকেছি বলে মাকে ভয় করতে শিখিনি।

নৃপতি চা আর কেক আনল।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথাও কাজে যাচ্ছেন?

আপনার কাছেই এসেছি।

কোন কাজ আছে?

না।

কিছু বলবেন?

না।

তবে?

মুহূর্তের জন্য আলপনা কি যেন ভাবল। তারপর বললো, হঠাৎ আপনার কথা মনে হল, তাই চলে এলাম।

কয়েক মিনিট দুজনেই চুপ করে বসে রইলাম। তারপর আমি বললাম, মনে হচ্ছে আপনি কিছু বলতে এসেছেন কিন্তু বলছেন না।

ও হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তাই নাকি?

হ্যাঁ।

আবার একটু নীরবতা। তারপর স্বাবার আমি বললাম, বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে আপনি যা ইচ্ছে বলতে পারেন।

সত্যি? কোন দ্বিধা করব না?

না।

ও একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললো, আগে মনে হতো আপনার কোন ব্যক্তিত্ব নেই কিন্তু এখন দেখছি সত্যি আপনার ব্যক্তিত্ব আছে।

আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, তাই নাকি?

একশ' বার। ও একটু চুপ করে থেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনার কাকাবাবু এ ব্যাপারে এত উৎসাহী কেন, তা জানেন?

না।

সময়ে-অসময়ে মা আপনার কাকাবাবুকে টাকা ধার দিয়েছেন। আস্তে আস্তে অনেক টাকা হয়েছে। আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে পারলে বোধ হয় মা আর টাকাটা ফেরত নেবেন না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

কি আশ্চর্য!

আপনি আপনার কাকাবাবুকে যত ভক্তিই করুন, আমি ওকে একটুও সহ্য করতে পারি না।

আমি ত এসব জানতাম না তাই ..

যাই হোক কবে কোন ট্রেনে বেনারস যাচ্ছেন, তা জানতে পারব কি?

কাল জানাব।

জানাবেন।

ও উঠে দাঁড়াতেই জিজ্ঞাসা করলাম, এখনই যাবেন?

যাব না?

আর একটু বসুন।

আজ চলি। কাল এই রকম সময় আবার আসব।

আমি কিছু বললাম না। আলপনা নিঃশব্দে মুখ নীচু করে বেরিয়ে যেতেই মনে হলো, চিৎকার করে বলি, আলপনা, আর একটু বসো কিন্তু পারলাম না।

(ক্রমশ)

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ কর্তৃক গ্রন্থিত

শ্রীশ্রীঅমিয়নিমাই চরিত LORDGOURANGA

(১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড)

প্রতি সেট—মূল্য ২৪-০০

(vol. 2)

Per Vol. Rs. 6.00

কালাচাঁদ গীতা

প্রতি কপি—মূল্য ১-৫০

LIFE OF SISIR KUMAR GHOSH

নরোত্তম চরিত

প্রতি কপি—২-০০

Per Copy Rs. 6.50

প্রাপ্তিস্থান ঃ

পত্রিকা হাউস (হিসাব বিভাগ)

১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩

অনন্য প্রকাশনের বই

বিমল কর	ঃ	নির্বাসন	৮৲
নিমাই ভট্টাচার্য	ঃ	ইনকিলাব	৯৲
সমরেশ বসু	ঃ	চেতনার অন্ধকারে	৭৲
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	ঃ	ফেরা	১০৲
ফাদার দ্যতিয়েন	ঃ	রোজনামচা	১২৲
বিক্রমাদিত্য	ঃ	ব্ল্যাকমেইলিং	১৬৲
অমিতাভ রায়	ঃ	রাসপুটিন	৮৲
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	ঃ	বিবাদীরাগ	১২৲
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	ঃ	যুবতী পরম রূপবতী	১০৲
শওকত ওসমান	ঃ	রাজা উপাখ্যান	৭৲
বিমল কর	ঃ	কেরাণী পাড়ার কাব্য	১৫৲
হাইনরিখ বোল	ঃ	যুদ্ধ যখন শুরু হয়	১০৲
প্রণবেশ চক্রবর্তী	ঃ	বিবেকানন্দের রাষ্ট্রচিন্তা	৭৲
নিখিলচন্দ্র সরকার	ঃ	ধস	১২৲
বিমল কর	ঃ	নির্বাচিত গল্প	২০৲
তাপস গঙ্গোপাধ্যায়	ঃ	দ্যুবাই এর হাইজ্যাক	৮৲
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়	ঃ	আলোয় কালোয়	৮৲
বিমল কর	ঃ	আয়োজন	৬৲
বরেন গঙ্গোপাধ্যায়	ঃ	কলকাতা	১১৲
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়	ঃ	অনিলের পুতুল	১২৲
অমিয়কুমার সেন	ঃ	দেখেছি পথে যেতে	১২৲
অমিতাভ রায়	ঃ	রোমেল	১০৲
চিরঞ্জীব	ঃ	নেপথ্যে	১০৲
পূর্ণেন্দু পত্রী	ঃ	ডোমরাগড়	১২৲

অনন্য প্রকাশন ঃ ৬৬, কলেজ স্ট্রীট (দ্বিতল) - কলিকাতা-১২

মনের অসুখ

(আট)

—মায়ের চেহারা আমার চেয়ে অনেক ভাল, সত্যিকারের রূপসী বলা চলে মাকে। মায়ের পাশে দাঁড়ালে ছেলেরা আমার দিকে ফিরেও তাকাবে না, মাকেই দেখতে থাকবে। হ্যাঁ মনে হবে আমার বোন খুব জোর বছর চার-পাঁচেকের বড়। অপরিচিত কেউ বিশ্বাসই করতে চাইবে না যে সঙ্গীত সমাজ্ঞের পরিচালিকা শান্তিদেবীর আমার বয়সী মেয়ে থাকতে পারে। আমাদের ছোট্ট শহরের অনেকেই জানে না শান্তিদেবীর মেয়ে আছে। দশ বছর বয়স থেকে আমি কলকাতার এক স্কুল বোর্ডিং-এর বাসিন্দা, সিনিয়র কেমব্রিজ পাশ করার আগে মায়ের কাছে গেছি মাত্র দুবার,— তাও দিন তিনেকের জন্য। গরমের আর পুজোর ছুটিতে মা কলকাতায় আসতেন সানু মামাকে নিয়ে। হয় আমরা তিনজন ছুটিতে কোনো জায়গায় বেড়াতে যেতাম, না হয় মা আমার সঙ্গে কলকাতার কোন হোটেলে ছুটিটা কাটিয়ে দিয়ে বাড়ী ফিরে যেতেন। আমার জন্মস্থান প্রায় আমি ভুলতেই বসেছিলাম। স্কুল ছাড়ার পরীক্ষার পর আমি মাকে একখানা পোস্টকার্ড লিখে দিয়ে উত্তরের অপেক্ষা না করেই বাকস বিছানা নিয়ে সোজা গিয়ে দেশের বাড়ীতে হাজির হলাম। এখন ভাবি না গেলেই বোধহয় ভাল ছিল।

এই অবধি বলেই মেয়েটি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। মনে হল, অন্য কিছু ভাবছে বা শুনছে। ওর স্বামীর কাছ থেকে জেনেছিলাম মাঝে মাঝে একটা বাজনার শব্দ কানে আসে, আর তারপরই মেয়েটির সারা দেহে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে। পাশের চেয়ার থেকে উঠে এসে স্বামী ওর কাঁধ ধরে মৃদু ঝাকানি দিলেন, ওর নাম ধরে ডাকলেন মেয়েটি সাড়া দিল না। ওর চোখ দুটো তখন সামনের দেওয়ালে নিবদ্ধ, পলক পড়ছে না। সারা শরীর শক্ত আর ভারী হয়ে গেছে—ওর হাত ধরে আকর্ষণ করতেই সেটা বোঝা গেল। স্বামী ইঙ্গিতে জানালেন, জয়ার ফিট্ হয়েছে। এখন কিছুক্ষণ ওর এই অবস্থা চলবে। দেহ কঠিন হয়ে থাকবে, চোখ দুটো ঐ দেওয়ালে আটকে থাকবে, ডাকে সাড়া দেবে না কথা বলতে না, মাথা নাড়বে না। ডাক্তারী শাস্ত্রে এই অবস্থাকে বলে ক্যাটালেপসি।

জয়ার অসুখ বেশ পুরোণো। পাঁচ ছয়ের মধ্যে দুবার নার্সিংহোমে থাকতে হয়েছে, প্রথমবার মাস তিনেক দ্বিতীয়বার সিখামেক। আগের তুলনায় এখন বেশ কিছুটা ভাল আছে, কিন্তু অসুখটা পুরোপুরি সারছে না। প্রতি বছর এই পুজোর সময় অসুখ বাড়ে। কাজ কর্মে অনিচ্ছা, স্নাহারে অরুচি, সব সময় অস্থিরতা, কথা বার্তা কমে যায়, ঘুম একেবারে হয় না,— আরো অনেক কিছুর একটা ছোটখাটো ফিরিস্তি দিলেন ওর স্বামী প্রবীরবাবু। মফঃস্বলের একটা স্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষক এই প্রবীরবাবু। দীর্ঘ, বলিষ্ঠ চেহারা বক্তব্য অল্প কথায় গুছিয়ে বলতে পারেন, দেখে মনে হয় বেশ রুচিবান ও বুদ্ধিমান। তাঁর মুখে শুনলাম এই ক্যাটলেপটিক ফিট্টা আগে ছিল না, বছর দুয়েক হল হচ্ছে। এই ফিট হবার আগে জয়া একটা গান শুনতে পায়, কথাগুলো বুঝতে পারে না, কিন্তু সুরটা খুবই পরিচিত মনে হয়— যেন আগে কোথাও শুনেছে। নতুন উপসর্গ হবার পর ওকে আর কিছুতেই নার্সিং-হোমে পাঠান যাচ্ছে না, ওষুধও খেতে চাইছে না। বারবার স্বামীকে বিবাহ বিচ্ছেদের কথা বলছে। ওর ধারণা এ অসুখ কোনদিনই সারবে না। প্রবীরবাবুর জীবনটাকে ও নষ্ট করে দিতে চায় না। বিবাহ বিচ্ছেদের পর মার কাছে ফিরে যাবে জয়া। সেখানে ও সুখে থাকবে না, ঠিকই, কিন্তু প্রবীরবাবু তো এই চিররুগ্ন স্ত্রীর ভার বহনের দায় থেকে নিস্কৃতি পাবেন।

—কিন্তু আমি জানি মার কাছে জয়া থাকতে পারবে না, কিছুদিন থাকার পর হয় পালাবে কিম্বা আত্মহত্যার চেষ্টা করবে। মায়ের কবল থেকে ওকে উদ্ধার করবার জন্যই আমি ওকে বিয়ে করি।

আমার নির্দেশে প্রবীরবাবু জয়ার জীবন-ইতিহাস খুলে বললেন।

ছোটনাগপুরের একটা ছোট শহরে জয়ার বাড়ী। বাড়ীটা ওর মাতামহের ছিল, বর্তমানে মায়ের অধিকারে। জয়ার মা অবাঙ্গালী খৃষ্টান। ডাকসাইটে সুন্দরী গানবাজনায়ও খুব নাম। কয়েক বছর হল বাড়ীতেই একটা গানের স্কুল খুলেছেন, স্কুলটা ভালই চলছে। বছর পঁচিশেক আগে জয়ার বাবা একটা অভ্রখনিতে চাকরী নিয়ে ঐ শহরে আসেন, তাঁরও গানবাজনার খুব শখ ছিল। সেই সূত্রে জয়ার মার সঙ্গে তার পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা, পরে বিবাহ হয় মাস ছয়েকের মধ্যে। জয়ার বাবা বাঙ্গালী, হিন্দু, বিবাহটা তাই শাস্ত্রমতে হয়নি। বিবাহের পর দশ বছর ওঁরা কোন মতে বিবাহবন্ধনটা টিকিয়ে রেখেছিলেন। শুনেছি রোজই ওঁদের মধ্যে খিটিমিটি, ঝগড়াঝাঁটি লেগেই ছিল। ইতিমধ্যে জয়ার বাবার মৃত্যু হয়েছে, জয়ার বাবা যে কোম্পানীতে কাজ করতেন, সেই কোম্পানীও লালবাতি জ্বেলেছে। জয়ার বাবা বাধ্য হয়ে নিজের বাসা তুলে দিয়ে স্ত্রীর বাড়ীতে এসে উঠেছেন। তাঁর জমান টাকা ছিল না, কাজেই খাওয়াপরার জন্য স্ত্রীর ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। জয়ার দাদামশাই বেশ মোটারকমের ব্যাঙ্কব্যালান্স রেখে যান, জয়ার মা-ই তার একমাত্র সন্তান।

সবদিক থেকেই জয়ার মার মুক্ত জীবন যাপনের সুযোগ ছিল এবং সে সুযোগের সদব্যবহার করতে তিনি কোন সময়েই দ্বিধা করেন নি। এ অবস্থায় যা হবার তাই হল। জয়ার বয়স যখন ৮।৯ বছর, তখন ওর বাবা-মায়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটল। বাবা ঐ শহর ছেড়ে চলে গেলেন, তখন থেকে জয়া তাঁর কোন খবর জানে না। জয়ার মা বলেন কুম্ভমেলায় ভিড়ের চাপে তিনি মারা গেছেন—এ খবর তিনি নাকি নির্ভরযোগ্যসূত্রে পেয়েছেন। জয়াও এতদিন তাই বিশ্বাস করে এসেছে। বছরদুয়েক আগে মায়ের বাকসে একটা চিঠি পায়, সেটা পড়ে বুঝতে পারে বাবার মৃত্যুসংবাদটা বানান। তখন থেকেই ঐ গান শুনছে, আর ঐ রকম ফিট হচ্ছে।

—আপনার সঙ্গে জয়ার কি করে পরিচয় হল?

—কোলকাতা থেকে পরীক্ষা দিয়ে ও বাড়ী চলে আসে, ওর মুখেই শুনেছেন। সেও প্রায় বছর-ছয়েক হতে চলল। সেই সময়ে আমি ওখানকার খৃষ্টান মিশনের স্কুলে চাকরী পাই। ঐ স্কুলটা বলতে গেলে জয়ার দাদুর ব্যক্তিগত চেষ্টাতেই গড়ে উঠেছিল। তিনি কিছু টাকাও স্কুলের জন্য রেখে যান। স্কুলে জয়ার মায়ের বেশ প্রতিপত্তি ছিল। জয়া কলকাতা থেকে ফিরে এসে স্কুলের প্রাইমারী বিভাগে অবৈতনিক শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দেয়। সেই সময় থেকে ওর সঙ্গে আমার আলাপ। স্কুলটা ও জয়াদের বাড়ী শহরের বাঙ্গালী পল্লী থেকে বেশ কিছুটা দূরে শহরের এক-

উপন্যাস

মোহিনী আড়ম

চিত্তরঞ্জন মাইতি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ভোরবেলা দেখা হল ললিতার মেয়ে তুষ্পির সঙ্গে। এমন নাম এখানে আসা অব্দি ইন্দ্র কানে শোনে নি। সবিতাকে কথাটা বলতেই ও তুষ্পিকে বেশ খানিকটা আদর করে নিল। তারপর ইন্দ্রের দিকে চেয়ে বলল, এ ধরনের নাম কেউ কখনো রাখে না এখানে। তুষ্পি হল ফোটা। ও ললিতার চোখে বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে এসেছে। তাই ললিতাই ওর অমনি একটা নাম রেখেছে।

ইন্দ্র চেয়ে চেয়ে অনেকক্ষণ দেখল তুষ্পিকে। সুন্দর দেখতে মেয়েটি। অবিকল মায়ের মুখখানা কে যেন ছাঁচে তুলে বসিয়ে দিয়েছে। বড় বড় উদাসী দুটো চোখ।

অপরিচিত ইন্দ্রের দিকে চেয়ে রইল কতক্ষণ।

সবিতা ইন্দ্রকে দেখিয়ে বলল, ও কে বলতো?

তুষ্পি লজ্জা পেয়ে সবিতার মুন্ডির একটা প্রান্ত ধরে নিজের মুখখানাকে আড়াল করে নিল।

সবিতা লুঙ্গিখানাকে টেনে নিয়ে ইন্দ্রের দিকে আঙুল তুলে মোলায়েম গলায় বলল, বল কে?

অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে সবিতার গলা জড়িয়ে কানের কাছে মুখ রেখে তুষ্পি বলল, আপুপা।

ইন্দ্র কথাটা শুনতে পেল না, কিন্তু সবিতার বড় বড় চোখ দেখে বুঝল, মেয়েটি রহস্য কিছু বলে ফেলেছে।

ললিতাকে ঠিক সেই মুহূর্তে ওদের দিকে আসতে দেখা গেল। সবিতা তুষ্পিকে বলল, চেবি-আচ্চন। তোমার কাকামণি।

ইন্দ্র বুঝল, তুষ্পির দারুণ রকম একটা ভুলকে তাড়াতাড়ি শুধরে দিল সবিতা। এখন ইন্দ্রের সঙ্গে তুষ্পির হল কাকা-ভাইঝি সম্পর্ক।

ললিতা একটা প্লেটে খানিকটা হালুয়া এনেছিল। ইন্দ্রের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, খান।

ইন্দ্র অমনি বলে উঠল, একটু আগে চা জলখাবার খেলাম। আধ ঘন্টাও পেরোয় নি। এ-রকম খাওয়ালে এ জায়গা থেকে আর কিন্তু নড়াতে পারবেন না।

ললিতা হাসল। ওর চোখ দুটো কেমন করুণ করুণ। হাসলেও মেঘ ভাঙা রোদের মত মনে হয়।

বলল, বেশ তো থাকুন না। কে আপনাকে চলে যেতে বলছে। তবে সবিতা চলে গেলে আপনি কি আর থাকতে পারবেন।

কথাটা বলেই চোখের কোণে তাকাল সবিতার মুখের দিকে। দুষ্টুমির হাসি ঠোঁটে লেগে আছে ললিতার।

ইন্দ্র বুঝল, গত রাত দু' বান্ধবীতে মনের কথা উজাড় করে বলা হয়ে গেছে। ললিতার চোখে ইন্দ্র এখন আর কোন অপরিচিত মানুষই নয়।

ইন্দ্র বলল, আপনার বান্ধবী আমার মালিক। তাঁর মর্জির ওপর আমার থাকা না থাকা নির্ভর করছে। সবিতা সম্মতি দিলেই আমি থেকে যাই।

সবিতা বলল, খুউব খুব যে। থাকাই না। এক্ষুনি সই করে দিচ্ছি ছুটির দরখাস্তে। যদ্দিন খুশী থেকে যাও ছুটি নিয়ে।

ইন্দ্র ললিতার দিকে চেয়ে বলল, দেখছেন তো, আপনার বান্ধবীটি কি রকম দয়ালু। ছুটি চাইতে না চাইতেই মঞ্জুর।

ললিতা বলল, সবিতার বন্ধুটি মালিকের প্রতি অনুগত বলেই তাকে এতটা ফেভার দেখানো হচ্ছে।

তিনটে হলুদ প্রজাপতি নেচে বেড়াচ্ছিল হাওয়ায় তিনটে আধফোটা বিঙে ফুলের মত। তুষ্পি তাদের পেছন পেছন ছুটছিল। সে প্রজাপতিগুলোকে ধরার কোন চেষ্টাই করছিল না। শুধু সারা বাগান ওদের সঙ্গে ছুটে ছুটে ওদের নাচ দেখছিল অবাক চোখে। দুটো কচি কচি হাত পেছন দিকে বেঁধে চোখ দুটো ওপরে তুলে যখন দাঁড়িয়েছিল তুষ্পি তখন তাকে শ্রেষ্ঠ কোন চিত্রকরের পুরস্কার পাওয়া ছবি বলে ভ্রম হচ্ছিল।

এই মুহূর্তে কি মনে করে ইন্দ্রের কাছে দৌড়ে এল তুষ্পি। কচি গলায় কলকলিয়ে বলে উঠল, আপুপা প্রজাপতিরা কোথায় থাকে?

ইন্দ্র ততক্ষণে সংকোচে নুয়ে পড়া লতার মত হয়ে উঠেছে। ললিতা আর সবিতা দুজনে চোখে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

ললিতা এগিয়ে এসে বলল, উনি তোমার আপ্যায়ন তুচ্ছি। ইন্দ্রর দিকে চোখ তুলে পরিষ্কার বাংলায় বলল, মামাবাবু।

তুচ্ছি তার কচি আঙুল তুলে মাকে শাসানোর ভঙ্গীতে বলল, খোকামী করে না উনি আমার চেরি-আচ্ছন।

কথাটা বলেই সে একটা বিজ্ঞের হাসি হেসে সবিতার দিকে তাকাল।

অস্বস্তিকর পরিস্থিতিটা হঠাৎ লঘু হয়ে গেল। সবিতা অমনি হেসে বলল, ভেরি গুড ভেরি গুড।

ললিতা আবার পায়ে পায়ে পেছনে সরে গিয়ে দাঁড়াল সবিতার পাশে।

ইন্দ্র তুচ্ছির দুটা হাত ধরে বলল, তোমার প্রজাপতিরা সবুজ বনে সোনা আম কুপোর তৈরী ঘরে রাত দিন ঘুমিয়ে থাকে। হঠাৎ কোনদিন ওরা স্বপ্ন দেখে নীল নীল জলের ওপর চাঁদের আলো ঝিলমিল নাচ নাচছে। হাওয়ার ঘায়ে দোল খাচ্ছে ফুলের ডাল।

অমনি ঘুম ভেঙে যায় ওদের। তখন হুড়মুড়িয়ে ঘরের দরজা ভেঙে বেরিয়ে আসে। আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে দেয় ওদের স্বপ্নে দেখা সেই নাচ।

বড় বড় চোখ মেলে অবাক হয়ে তুচ্ছি শুনল প্রজাপতিদের গল্প।

অমনি বায়না হল, আরও গল্প বল।

ইন্দ্র বলল কিসের গল্প শুনতে চাও?

তুচ্ছি ভেবে ভেবে বলল পুতুলবীদের গল্প জান তুমি?

ইন্দ্র বলল, জোনাকীদের মায়ের বড় বেজায় কালো। তাই দিনের বেলা আলোর সামনে বেরোয় না। দিন ফুরোলে সে ঘুরে বেড়ায় সব জায়গায়। যেখানে যায় সেখানকার গাছপালা ঘর-বাড়ী নদী-নালা সবকিছু তার রঙের ছোঁয়ায় অন্ধকার ঘুরঘুটি হয়ে যায়। যেদিন রাতে চাঁদ ওঠে সেদিন সে লুকিয়ে থাকে ঝোপেঝাড়ে, বনের গভীর আর পাহাড়ের গুহার ভেতর।

সে যখন পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায় তখন লোকজন বড় একটা কেউ বেরোয় না। তার কালো রঙের ছায়ায় পথ দেখা যায় না তাই।

লোকে জোনাকীদের মাকে বড় একটা পছন্দ করে না, কিন্তু তাতে কি এসে যায়। তার ছেলেমেয়েগুলো একেবারে হীরের টুকরো। পথ দিয়ে চলে গেলে সবাই তাকিয়ে থাকে তাদের দিকে। আলোর ফুলকির মত তাদের মাসির নাকের ঐ হীরেটার মত ঝলমল করে ওঠে তারা।

আর কি নাচের ঘটা তাদের। বনে বনে পথে পথে, ঝিলেরিলে ঘুরে ঘুরে নেচে বেড়ায় মনের খুশীতে। ভাই-বোনেদের কি ভাব! যেখানে যাবে এক সঙ্গে যাওয়া চাই।

লোকে পুতুলবীদের মা নিশিরাত্যাকে পছন্দ না করলেও তার হীরের টুকরো ছেলেমেয়েগুলোকে খুব ভালবাসে। আর তাই নিয়ে মায়ের গর্ব যেন ধরে না। কচি-কচি ছেলেমেয়েরা তুচ্ছির মত ফুটফুটে সুন্দর আর লক্ষ্মী হলে কোন মায়ের না ভাল লাগে বল?

এমনি করে সুন্দর ছেলেমেয়েদের পেয়ে নিজের দুঃখ ভুলে গেছে পুতুলবীদের মা।

শুধু যখন দিনের আলো জ্বলে ওঠে তখন মা তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঢুকে পড় গাছের ফাঁক ফোকরে অথবা কোন গুহা গর্তে। পুতুলবীরা কিন্তু দিনের আলোয় বাইরে বেরোবে বলে কোন রকম বায়নাই ধরে না। ওরা মাকে খুব বেশী ভালবাসে। তুচ্ছির চেয়েও বেশী, তাই না তুচ্ছি?

তুচ্ছি এবার জোরে জোরে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানাল। তারপর ইন্দ্রের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

ললিতা বলল, আপনি কিন্তু মহা-মুশকিলে পড়লেন। গল্পের নেশা যেভাবে ধরিয়ে দিলেন তাতে তুচ্ছি আপনাকে সহজে নিষ্কৃতি দেবে বলে মনে হয় না।

ইন্দ্র বলল, আমি কচিকাচাদের দারুণ পছন্দ করি।

ললিতা অমনি সবিতার দিকে আড় চোখে চেয়ে বলল আর কাঁচাদের ভাণ্ডা মাসিগুলোকে পছন্দ করেন না?

ইন্দ্র বলল, অনেক মাসিকে এক সঙ্গে পছন্দ করতে হলে আমাকে মিশরের ফারাও বা আরবের বাদশা হতে হয়।

সবিতা ললিতার দিকে চেয়ে মন্তব্য করল, যেমন বলতে গিয়েছিলি।

তুচ্ছি কখন বাইরে চলে গেছে। এখন ঘরের পেছন দিক থেকে তার পরিত্রাহি চীৎকার শোনা গেল।

সবাই হুড়োহুড়ি করে সেখানে পৌঁছে দেখা গেল, গাইগরু একটা বাঁধা রয়েছে নারকেল গাছের সঙ্গে। সে গাছের বাকেড় জড়ান গাদা থেকে খড় টেনে টেনে চিবুচ্ছে। ধবধবে সাদা বাচ্চাটা পুষ্ট পটলের মত দুধের বাঁট প্রাণপণ শক্তিতে টেনে টেনে চুষছে। বাছুরটার পাশে মাটিতে আধশোয়া অবস্থায় পড়ে হাপুস চোখে কাঁদছে তুচ্ছি। চীৎকারটা উঠেছিল পড়ে যাওয়ার মুহূর্তে।

সবিতা দৌড় গিয়ে তুলে নিল তুচ্ছিকে।

ললিতা বলল, এ আবার এক নতুন খেলা শুরু হয়েছে, তুচ্ছির। পাশুকুটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ও বাঁট চুষে দুধ খাবে। যত না দুধ খায় তার চেয়ে চাঁট খায় বেশী।

সবিতা শঙ্কিত গলায় বলল, কোনদিন দেখ আবার দারুণ রকম চোট পেয়ে না বসে।

ললিতা বলল, পাশুটি কিন্তু খুব শান্ত। শুয়ে থাকলে ওর গলায় হাত বুলিয়ে দেয় তুচ্ছি। পাশুটিও তুচ্ছির মাথার ওপর মুখ তুলে দেয় আদরের ভঙ্গীতে। সে এক দৃশ্য। কিন্তু ও যদি পাশুটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সবকিছু করতে চায় তাহলে চোট ওকে পেতেই হবে।

মধ্যাহ্নভোজে বসেছে ওরা। এতটুকু আড়ষ্টতা নেই ললিতার মধ্যে। সে যেন অনেক দিন পরে জেলখানার দমবন্ধ করা একটা সেল থেকে বেরিয়ে এসেছে। তার করুণ করুণ দুটো চোখ যেন ভোরের মতো আলোর জোয়ারে ভরে উঠছে। সপ্রতিভ ললিতা বার বার ইন্দ্রকে বলল, আপনার খেতে খুব অসুবিধে হচ্ছে। আমাদের দেশী খাবার বাঙালীদের মুখে রোচে না আমি জানি। আর একটুখানি সম্বর দেব? কালন ওলন আবিয়েল? কিছু চাই না? বুঝেছি দেখব পেট ভরে নয়, তোমরা নিজের খুশী মত বানিয়ে খান তো।

ইন্দ্র বলল, যা চাইব দেবেন?

বলুন—আডবোলার ওয়াদিল ধর দাঁতের মুখে হাসির ঝিলিক তুলে বলল ললিতা।

ইন্দ্র বলল, পর্দামন। সত্যি আপনার পায়েসের তুলনা হয় না।

সরিতা বলল পেতে পার, তবে পায়সম্ তৈরীর আদ্দেক উপাদান অন্ততঃ বলতে হবে তোমায়।

ইন্দ্র ভেবে ভেবে বলল, আধসেদ্ধ ডালের সঙ্গে কাজুর গুঁড়ো কিসমিস নারকেলের দুধ দিয়ে ঘন করে ফোটান হয়েছে বলে মনে হয়।

অন্ধ গোবিন্দন হা হা করে হেসে উঠে বললেন, প্রায় ফুল মার্কস পেয়ে পাশ করে গেলে ইন্দ্র। ললিতা হেরে গেছ তুমি। বাকী সবটুকু পায়সম্ কিন্তু ইন্দ্রেরই প্রাপ্য।

ইন্দ্র বলল, তা হলেই হয়েছে। সবটুকু এখন খেতে হলে তৃপ্তিটা হয়ে উঠবে শাস্তি।

সরিতা বলল, এখন দেখছি প্রেমা যোগ্য লোকের হাতেই হোটেল চালাবার ভার দিয়েছে।

ললিতা বলল, তুই কি এতকাল ওঁকে অযোগ্য ভেবেছিলি নাকি?

সরিতা চারটে আঙুলের ডগা ঠোঁটের মাঝখানে ছুঁইয়ে মাথাটা বড়োবুড়ি পুতুলের মত ওপর নীচে দোলাতে লাগল।

দুপুরে বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় একটা বইয়ের ভেতর ডুবে গিয়েছিল ইন্দ্র। জামাইকা ইন। নাড়া পাহাড় আর জলাভূমি চলে গেছে সমুদ্রের খাঁড়ি অব্দি। জনপদ থেকে অনেকখানি দূরে পাহাড়ী পথের ওপর অদ্ভুত একটা সরাইখানা। প্রবল বর্ষার রাতে সেখানে এসে পৌঁছল তরুণী একটি মেয়ে। সরাইখানার মালিক মেয়েটির মেসো, ভয়াবহ চরিত্রের লোক। মাসি সদাই ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। খুনজখম চোরাকারবারের পীঠস্থান সেই রহস্যময় সরাইখানাটি। কিন্তু সবচেয়ে যা ইন্দ্রের ভাল লাগছে তা হল নায়িকার চরিত্র। এমন, বিপদের মাঝখানেও কি আশ্চর্য নির্ভীকতা। একা একা জলাভূমির মাঝখানের রাস্তার ওপর দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে পায়চারি করে চলেছে। কখনও বা ন্যাড়া পাহাড় বেয়ে অনেকখানি ওপরে উঠে চেয়ে চেয়ে দেখছে প্রকৃতির ভীষণ শূন্যতা।

সরিতা ঘরে ঢুকতেই চমকে তাকাল ইন্দ্র। মগ্নতা ভেঙে গেলে এমনি একটা চমক লাগে শরীরে। সরিতার দিকে চেয়ে ইন্দ্রের হঠাৎ মনে হল, সে জামাইকা-ইনের দুরন্ত সাহসী স্বচ্ছন্দ বিহারিণী সেই মেয়েটিকে তার সামনে দেখছে।

সরিতা এসে বলল, আমি যাচ্ছি আম্মাওয়নকে নিয়ে আরণমুলায় পার্থসারথির মন্দিরে।

ইন্দ্র বলল, আরণমুলাটা কোথায়?

আলেপ্পি জেলার চেংগানুর তালুকের একটা গ্রাম।

তুমি এতদূরে যাবে?

সরিতা বলল, অন্ধ মানুষ একটা ইচ্ছে হয়েছে তাঁকে কি না বলা যায়।

ইন্দ্র বলল, চল আমিও তোমার সঙ্গী হই।

সরিতা বলল, তাহলে তো ল্যাঠা চুকে যেত। কিন্তু ইয়ংম্যান তোমাকে আজকের রাতটা থাকতে হবে বাড়ী পাহারায়।

ইন্দ্র বলল, ভয়ডর আমার নেই কিন্তু তোমরা রাত কাটাবে ওখানে?

আম্মাওয়নের ইচ্ছেটা তাই। মন্দিরে সন্ধ্যা আর প্রভাত আরতির সময়টুকু কাটিয়ে তবে ফিরতে চান।

ইন্দ্র বলল, আমার কোন অসুবিধে হবে না তোমরা নিশ্চিন্তে যেতে পার। খাবার ব্যাপারে চিন্তা করো না একটা রাত শুকনো যা হোক কিছু খাবার খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারব।

সরিতা বলল, তা কেন ললিতা আর তুমি তো থাকছেই। ইন্দ্রের গলায় বিস্ময়ের সুর বাজল ওঁরা থাকছেন না?

সরিতা বলল পাশু, পাশুকুটি রয়েছে না তাদের ফেলে ও যাবে কি করে। তোমাকে শুকনো খাবার অব্দি দেওয়া যেতে পারে কিন্তু তা বলে পাশুদের পরিচর্যার ভার তো আর দেওয়া যায় না।

ইন্দ্র বলল, বেশ থাকতে পারব তবে একটা রাত একজন কাছপিঠে থাকবে না ভাবলেই বুকখানা কেমন খালি খালি লাগবে।

সরিতা বলল, ফিরে এসে না হয় খালি বুকখানা ভরে দেওয়া যাবে।

ওরা চলে গেল। দূরের পথ কেলা থাকতে থাকতেই চলে গেল ওরা। গাড়ীটা পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে একবার থামল। সরিতার সুগঠিত শ্যামলা হাতখানা বেরিয়ে এল গাড়ীর বাইরে। পাঁচটা আঙুল একটি শাখার মাথায় পাঁচটি পাতার মত কেঁপে কেঁপে উঠল। পরক্ষণেই হাতটা অদৃশ্য হল। গাড়ী বেরিয়ে গেল চোখের বাইরে।

ললিতা ইন্দ্রের পাশেই দাঁড়িয়েছিল তুঙ্গিকে ধরে। হঠাৎ ইন্দ্রের দিকে ফিরে বলল, মন খারাপ হয়ে গেল তো?

ইন্দ্র হেসে তাকাল ললিতার দিকে। বলল বান্ধবীর বান্ধবী তো রইলেন। তাই বা কম কি।

ললিতা বলল, কার সঙ্গে কার তুলনা করছেন! সরিতা, সরিতা।

ইন্দ্র বলল আর ললিতা ও ললিতা।

ললিতা এক মুখ হাসি ছড়িয়ে বলল, তা সত্যি কারু সঙ্গে কোন দিক থেকেই আর কারু মিল নেই। এক একজন আকারে স্বভাবে সবদিক থেকেই আলাদা।

তুঙ্গি খেলতে খেলতে কোথায় চলে গেল।

ললিতা বলল, আসুন ভেতরে বসে গল্প করা যাক।

ললিতার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র এসে ঢুকল ললিতার ঘরে।

বসুন।

ইন্দ্র ঘরের ভেতর পড়ে থাকা টুকটি টেনে নিয়ে বসতে যাচ্ছিল ললিতা বলল বিছানার ওপরেই বসুন। কোন সংকোচ নেই আমার।

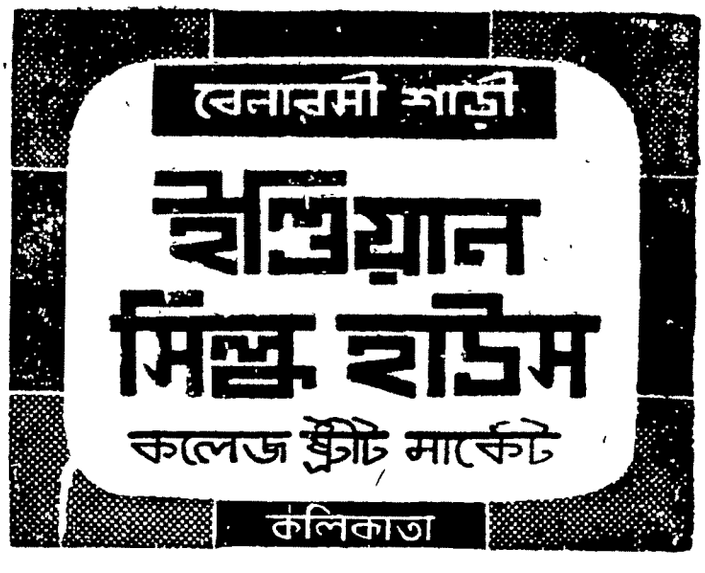

বাচ্চাদের বড়সড় করে গড়ে তুলুন ইন্‌ক্রিমিন* দিয়ে

খেলাধেলার দিন—
হেসে খেলে ঠিকমত বেড়ে ওঠার দিন। এই সময়ে ওকে ইন্‌ক্রিমিন সিরাপ নিশ্চয়ই খেতে দেবেন। তারপর দেখবেন ওর খাওয়ার আগ্রহ! খাওয়া নিয়ে জ্বালাতন তো দূরের কথা, খিদে বেড়ে গিয়ে যেমন খুশি হয়ে যাবে তেমনি চটপট বেড়ে উঠবে। ইন্‌ক্রিমিন উপকারী ভিটামিন আর আয়রনে ভরপুর তো বটেই, তার চেয়ে বড় কথা— এতে যে বিশেষ অ্যামিনো অ্যাসিড, লাইসিন আছে—তা আপনার বাচ্চাকে আহারের পুরো পুষ্টি গ্রহণ করতে সাহায্য করে।

ইন্‌ক্রিমিন* টনিক

ড্রপস্ — ২ মাস থেকে ২ বছরের বাচ্চাদের জন্যে
সিরাপ — ১৪ বছর পর্যন্ত বয়সের বাচ্চাদের জন্যে

বাড়তি আহারকে বাড়তি বৃদ্ধিতে পরিণত করে

ডাক্তারের কাছে নির্ভরযোগ্য নাম Lederle সায়নামিড ইণ্ডিয়া লিমিটেডের একটি বিভাগ
*আমেরিকার সায়নামিড কোম্পানীর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

Sista s INC-362 I R/75 Ben

ইন্দ্র বিছানায় বসতেই সামনের দেয়ালে চোখ গিয়ে পড়ল। বৃদ্ধের ভাষায় সেই প্রত্যাবক ডাক্তার ছেলেটির ফ্রেমে বাঁধান ছবিটা তার দিকে জ্বল জ্বলে চোখ মেলে চেয়ে আছে।

ইন্দ্রের প্রথম ইম্প্রেশানটা ভাল হল না। হয়ত আগে থেকে বিরূপ একটা ধারণা থাকার জন্য লোকটা দেখতে শুনতে আর পাঁচটি যুবকের মত হলেও কেমন যেন চতুর চতুর বলে মনে হল।

ললিতা বলল, এটি আমার স্বামীর ছবি।

ইন্দ্র বলল ফটো দেখে মনে হয় আপনার স্বামীর ভেতর দারুণ একটা শার্পনেস আছে। ঠান্ডা মাথায় খুব কঠিন কঠিন কাজ করে ফেলতে পারেন বলে মনে হয়।

ললিতা বলল, হ্যাঁ বেশ ধীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন উনি। বেশী কথাবার্তা বলতে ভালবাসতেন না। কাজের মানুষ কাজ নিয়েই থাকতেন। বলতে পারেন স্বভাবে আমার ঠিক উল্টোটি ছিলেন। অবশ্য কতটুকুই বা আমার জানাশোনা ওঁর সম্বন্ধে।

ইন্দ্র বলল, আপনার ট্রাজিক কনজুগাল লাইফের জন্য সত্যিই দুঃখিত।

ললিতার বুক থেকে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। বলল, জীবনটা শুরু হতে না হতেই শেষ হয়ে গেল।

ইন্দ্র বলল জীবন কখনো শেষ হয়ে যায় না মিসেস নায়ার। মৃত্যু যদি আসে তাহলে তো সব চুকেবুকেই গেল। কিন্তু যতক্ষণ তা না আসে ততক্ষণ লাইফ একটা সুদর্শিত পাহাড়ী নদীর মত এগিয়ে চলবেই। সে ভেঙেচুরে ক্ষয়ে তছনছ করবে তেমনি তার বুকের ভেতর জমে থাকা সবটুকু এনার্জী বিলিয়ে দেবে সবাইকে।

ললিতা অনমনস্ক হয়ে পালঙ্কের বাজুতে হাত রেখে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। এক সময় স্বগতোক্তির মত উচ্চারণ করল, আমি হেরে গেছি মিঃ রায়। জীবনটা চলতে চলতে হঠাৎ বড় বেশী পিছিয়ে পড়েছে। ওকে টেনে নিয়ে যাবার কোন উৎসাহই আর পাই না।

ইন্দ্র বলল, এ ধরনের মেন্টাল ডিপ্রেশান অন্তত আপনার মত মেয়ের কাছ থেকে আশা করি না। আপনি যদি এডুকেটেড না হতেন কোন দূর গ্রাম্য এলাকার অন্ধকার অন্দরের একটি মেয়ে হতেন তাহলে এসব কথা তোলার কোন মানেই হত না। সে ক্ষেত্রে চেষ্টা করলেও আপনার ডিপ-রুটেড সংস্কারগুলোকে কেউ ভাঙতে পারত না। কিন্তু আপনার রুচি, আপনার প্রাণশক্তি সবকিছুই যে আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। সেখানে থেমে থাকলে চলবে কেন।

ললিতা হঠাৎ ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল। ইন্দ্রের সেই মুহূর্তে মনে হল এইটুকু সময়ের ভেতর তার এতখানি কথা বলে ফেলা হয়তো ঠিক হয় নি।

অনেকটা সময় নিঃসঙ্গ থেকে যখন ইন্দ্র নিজেকে অপরাধী ভাবতে শুরু করেছে ঠিক তখনই হাতে কফির কাপ নিয়ে ঢুকল ললিতা।

ইন্দ্রের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, ভয় নেই খাবার দিচ্ছি না, কফি সব সময়েই চলতে পারে।

ইন্দ্র বলল, আপনার?

আনছি বলেই বাইরে বেরিয়ে গিয়ে নিজের কাপটা নিয়ে এল ললিতা।

ললিতাকে এখন বেশ সহজ স্বাভাবিক বলে মনে হল। ইন্দ্র কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে তাকাচ্ছিল ললিতার দিকে।

ললিতা বলল, কফির নিন্দা কিম্বা প্রশংসা করলেন না তো?

ইন্দ্র বলল, বা রে সবটুকু খেতে দেবেন তো।

ললিতা কাপের কাণায় ঠোঁট ছুঁইয়ে বলল প্রথম চুমুকেই বোঝা যায়। সবটুকু শেষ করে যে প্রশংসা, তা হোস্টেসের মনরক্ষা ছাড়া কিছু নয়।

ইন্দ্র বলল আপনি কিন্তু দারুণ রকম ইনটেলিজেন্ট। আমার অনুমানের মাত্রাকেও ছাড়িয়ে গেছেন।

ললিতা বলল, আর বেশী প্রশংসা করবেন না। মাথা বিগড়ে যাবে।

ইন্দ্র এক সময় কফি খেতে খেতে বলল সত্যি আপনার কফির হাত খুব সুন্দর।

ললিতা অমনি বলল, শুধু আমার কফির হাত সুন্দর? আর কিছু ভাল নয় বুঝি?

ইন্দ্র কাপ থেকে মুখ তুলে বলল তাহলে তো হাত দেখতে হয়। ভালমন্দ সবই ঐ হাতে লেখা আছে।

ললিতা কফিটুকুতে চুমুক দিয়ে কাপটা টিপয়ের ওপর নামিয়ে রেখে হাত বাড়িয়ে দিল ইন্দ্রের দিকে। বলল, সত্যি আপনি হাত দেখতে জানেন? দেখুন না আমার হাতটা।

ইন্দ্র তার পাশে সাদা বিছানার ওপর পেতে দেওয়া স্থলপদ্মের মত রক্তাভ হাতখানার দিকে চেয়ে দেখল। কফির কাপটা নীচে নামিয়ে রাখতে গেলে ক্ষিপ্র হাতে সেটা ধরে নিল ললিতা। কাপটা টিপয়ের ওপর রেখে আবার ফিরে এল সে। এবার বিছানার এক কোণায় উঠে বসে হাত পাতল ইন্দ্রের সামনে।

ইন্দ্র ললিতার হাতের রেখাগুলোতে মাঝে মাঝে নিজের আঙুল বুলিয়ে মনে মনে কি যেন ভেবে নিচ্ছিল। এক সময় ললিতার হাতটা নিজের বাঁ হাতের পাতায় তুলে নিয়ে ডান হাত দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল।

ললিতা তন্ময় হয়ে চেয়েছিল তার নিজের হাতের দিকে। অজস্র ভাঙাচোরা আঁকাবাঁকা রেখা প্রাচীন কোন নগরীর অপরিচিত পথচিত্রের মত ছড়িয়ে পড়েছিল। তার চোখ সেই গোলকধাঁধার আবর্তে অগাধ কৌতূহল নিয়ে ঘুরে ফিরছিল।

ইন্দ্র কথা বলল, আপনার হাত বিস্ময়কর।

মুহূর্তে ললিতার দুটো বাদামী চোখের তারা মধুসন্ধানী মৌমাছির মত উড়ে গিয়ে বসল ইন্দ্রের মুখের ওপর।

ইন্দ্র আবার বলল, সত্যি আপনার হাতের রেখায় রেখায় ভাগ্য দেবতার আশ্চর্য খেলার ছকটি পাতা হয়ে আছে।

ললিতা বলল, সে খেলার ছক খেলতে খেলতে বার বার আমাকে হার মানতে হয়েছে।

ইন্দ্র বলল, হার আপনার হয় নি। কপট পাশায় ছল করে আপনাকে হারান হয়েছে।

ললিতার গলায় কৌতূহলের সুর বাজল, কি রকম?

ইন্দ্র অনেকক্ষণ হাতের রেখার দিকে চেয়ে থেকে বলল, সত্যি ললিতা আপনি প্রতারিত হয়েছেন। আচ্ছা আপনার কি ভালবেসে বিয়ে হয়েছিল? অবশ্য যদি আপনি কিছু মনে না করেন তাহলে অসংকোচে উত্তর দেবেন।

হ্যাঁ।

শরৎ জন্মশত বার্ষিকীতে বহু তথ্যসমৃদ্ধ সশ্রদ্ধ অর্ঘ্য-
শরৎচন্দ্র — মণি বাগচি — ১৮৲
রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খেয়াম • কাজী নজরুল ইসলাম • ২০৲
দেশবন্ধু • মণি বাগচি • ২০৲
মহানায়ক মুজিবুর-অরবিন্দকুমার ঘোষ-১০৲ মহাজীবন-অরবিন্দকুমার ঘোষ-২০৲
মোহন লাইব্রেরী : ৩৫ এ, সূর্যসেন স্ট্রীট • কলিকাতা ৯
ফোন : ৩৫ ০৬৩৩

আপনার ভালবাসা কি শুধু মিঃ নায়ারকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল না তার আগেও আপনি কাউকে ভালবাসতেন?

একটু থেমে আবার বলে উঠল ইন্দ্র অবশ্য উত্তর দেওয়া না দেওয়া আপনার মর্জি। ডাক্তারের কাছে গেলে যেমন রোগ গোপন করতে নেই ঠিক তেমনি পামিস্টের কাছে গেলে তার প্রশ্নকে এড়িয়ে যেতে নেই।

ললিতা একটু চাপা গলাতেই বলল আপনি তো আগেই আমার হাতের লেখা পড়ে নিয়েছেন এখন সিক্রেট বলে কিছু নেই। হ্যাঁ আমি কলেজে পড়ার সময় একটি ছেলেকে ভালবাসতাম। তাকে আমি বিয়ে করব বলে কথাও দিয়েছিলাম।

ইন্দ্র বলল তারপর কথা যে রাখতে পারেন নি তা তো আপনার হাতের রেখাতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ললিতা মাথাটা নীচু করে কি যেন ভাবল। হয়ত সে তার অতীতের অপরাধটাকেই স্মরণ করছিল।

এক সময় বলল, ঐ অন্যায়ের জন্যেই হয়ত আমি আমার স্বামীকে হারিয়েছি।

ইন্দ্র বলল, আমি জানতে চাই না আপনি কেন কথা দিয়ে কথা রাখতে পারেন নি। তবে আপনার স্বামীর সঙ্গে বিয়ের কতদিন আগে থেকে আপনার পরিচয় ছিল সে কথাটা জানা আমার দরকার।

ললিতা বলল, সামান্য কয়েকটা দিন মাত্র।

ইন্দ্র বলল ব্যস তাতেই ভালবাসা আর বিয়ে?

ললিতা বলল আমি ছোটখাটো একটা অপারেশনের জন্যে মেডিক্যাল কলেজের সার্জিকাল ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছিলাম। মিঃ নায়ার অপারেশনের আগে দু' একবার আমাকে দেখে গিয়েছিলেন। ইয়ং ডাক্তার নার্সদের সঙ্গে কথা বলছিলেন বেশ ডিগনিফায়েড ওয়েতে। আমার প্রথম দেখাতেই বেশ ভাল লেগে গিয়েছিল।

অপারেশনের দিন আমার কাছে এসে একটু হেসে বললেন অ্যানাসথেসিয়া দিলে আপনি গভীর ঘুমে ডুবে যাবেন তখন জানতেও পারবেন না কখন আপনার অপারেশন হয়ে গেল।

আমি হঠাৎ বলে উঠলাম লোকাল অ্যানাসথেসিয়া দিয়ে অপারেশন করা যায় না?

ডাক্তার নায়ার বললেন যায় কিন্তু আপনি কষ্ট পাবেন।

আমি তখন খানিকটা জেদের সঙ্গেই বললাম তা হোক আপনি লোকাল অ্যানাসথেসিয়া দিয়ে যদি সম্ভব হয় তাহলে অপারেশনটা করুন।

আমার কথা উনি বুঝেছিলেন আর আমিও ওঁর দিকে চেয়ে চেয়ে আমার কষ্ট ভুলেছিলাম।

অপারেশনের শেষে উনি এক মুখ হাসি উপহার দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

বিকেলে যখন উনি রাউন্ডে এলেন তখন আমি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলাম। উনি আমার মাথায় হাত রাখলেন। কপালে সে হাতটা সরে এল। আমার শরীরে তখন দারুণ এক ধরনের রোমাঞ্চ। আমি ভুলে গেলাম যন্ত্রণা।

বাড়ীতে ফিরে আসার পরেও উনি আসতে লাগলেন আমাদের এখানে। আমাকে বলতেন ব্রেভ ইয়াং লেডি। বুঝতেই পারছেন এর পর আমাদের কাছাকাছি এগিয়ে আসতে আর বেশী সময় লাগে নি। বাবাও এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু তুমি জন্ম নেবার আগেই উনি এফ আর সি এস করতে চলে গেলেন লন্ডনে। আর ফিরতে পারলেন না।

শেষ কথাটি বলার পরে ললিতাকে বিষণ্ণ আর অন্যমনস্ক দেখাল।

ইন্দ্র ললিতার হাতটা ধরে নাড়াচাড়া করল। এক সময় সোজা ললিতার মুখের ওপর চোখ ফেলে বলল আমি এখন আপনার হাতের রেখা বিচার করে যা বলব তা কি আপনি বিশ্বাস করবেন?

ললিতা বলল বিশ্বাসই যদি না করব তাহলে হাতটা বাড়িয়ে দেব কেন।

ইন্দ্র বলল সত্যটা বড় কঠিন আপনি আঘাত পেতে পারেন।

ললিতার মুখে শেষ বেলাকার আলোর মত একটা বিষণ্ণ হাসি খেলা করে গেল। আস্তে বলল কত আঘাত আর পাব। আঘাত সইবার ক্ষমতা আমি ধীরে ধীরে অর্জন করছি মিঃ রায়।

ইন্দ্র সোজাসুজি বলল আপনার হাতে বৈধব্যযোগ দেখতে পাচ্ছি না মিসেস নায়ার।

হঠাৎ ঘরখানাতে কোন নর্তকী যেন তার নূপুর দ্রুত লয়ে বাজিয়ে গেল। ভেঙে ভেঙে সুরেলা একটা হাসি সারা ঘরে ছড়িয়ে দিল ললিতা।

কথাটা শুনতে খু-উ-ব ভাল কিন্তু মিঃ রায় কথাটা শোনার পর আমার কি মনে হচ্ছে জানেন?

ইন্দ্র জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে রইল ললিতার মুখের দিকে।

ললিতা বলল কর্পূরের গন্ধ পাচ্ছিলাম এতক্ষণ: খুব মিষ্টি লাগছিল কিন্তু স্থায়ী হল না উবে গেল।

ইন্দ্র আস্তে ললিতার হাতখানা নামিয়ে রাখল বিছানার ওপর। ম্লান একটুখানি হাসল ললিতার দিকে চেয়ে।

ললিতা একটু হেসে বলল অমনি জ্যোতিষীমশায়ের রাগ হয়ে গেল।

হাতখানা ইন্দ্র ফিরে বাড়িয়ে দিয়ে বলল বলুন তো এ লাইন থেকে সরে যাবার যোগটা কখন আসবে।

(ক্রমশঃ)

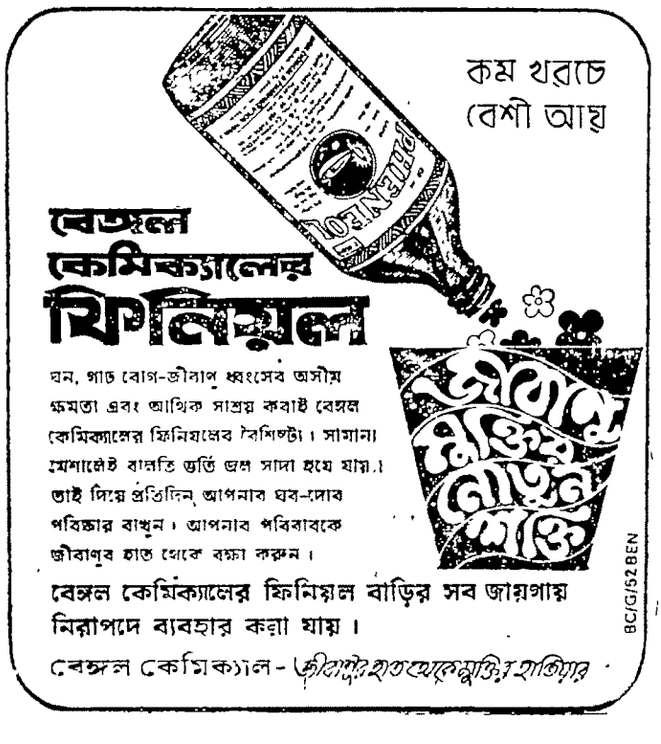

রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা

সুশান্তকুমার মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি' প্রবন্ধই রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি' (পৌষ ১৭৯৬ শক= পৌষ ১২৮০ বঙ্গাব্দ=ডিসেম্বর ১৮৭৩ পাতা ১৬১—৬৩) প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গদ্য রচনা। মাত্র একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হলেও এটি একটি বড় প্রবন্ধের ধারাবাহিক অংশ বিশেষ। 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' প্রবন্ধের মতই এটিও অনামে রচিত 'ক্রমশঃ প্রকাশ্য' রচনা। কিন্তু রচনাটিকে রবীন্দ্র রচনারূপে প্রমাণ করবার আগে প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করা যাক। এটি এখনও অপ্রকাশিত রচনার পর্যায়ভুক্ত।

।। গ্রহগণ জীবের আবাস-ভূমি ।।

কোন মেঘ-বিনির্মুক্তা তারকা-সমুজ্জ্বলা রজনীতে গৃহের বাহির হইয়া গগন মণ্ডলের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই মনে কতকগুলি চিন্তার উদয় হইবেই হইবে। যে সকল অগণ্য জ্যোতিষ্ক মণ্ডল প্রভা নভস্তল বিভূষিত হইয়া রহিয়াছে, তাহারা কি শূন্য না আমাদের ন্যায় জ্ঞান-ধর্ম-প্রেম-বিশিষ্ট উন্নত জীবদ্বারা পূর্ণ? প্রাণ-স্বরূপ পরমেশ্বরের বিচিত্র অনন্ত রাজ্যের মধ্যে এমন কি কোন স্থান থাকিতে পারে যেখানে প্রাণের চিহ্ন নাই? এই সকল বিষয় সম্বন্ধে যাহাদের জ্ঞানের গভীরতা নাই, তাহারা হয়তো মনে করিবে যে দূরবীক্ষণের সাহায্য অবলম্বন করিলেই এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহা ভ্রম মাত্র। এই যন্ত্রের প্রবল শক্তি সত্ত্বেও, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই প্রকার প্রশ্ন সকলের উত্তর দেওয়া এখনও উহার সাধ্যাতীত। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের এখনও এতদূর উন্নতি হয় নাই যে ইহার সাহায্যে আমরা অতি দূরস্থ লোকের অতি ক্ষুদ্রতম পদার্থ পর্যন্ত জ্ঞাজ্বল্যমানরূপে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হই। দূরবীক্ষণের এক্ষণে এই পর্যন্ত ক্ষমতা হইয়াছে যে অতি দূরস্থ বস্তুকে অপেক্ষাকৃত নিকটে আনিয়া দিতে পারে। মনে কর তুমি সহস্র-মাত্রা শক্তি সম্পন্ন একটি দূরবীক্ষণ দ্বারা চন্দ্রলোক পর্যবেক্ষণ করিতেছ। চন্দ্র সৌরজগতের মধ্যস্থিত সমস্ত গ্রহ মণ্ডলী অপেক্ষা পৃথিবীর নিকটস্থ। পৃথিবী হইতে চন্দ্র প্রায় ১২০,০০০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত—এক্ষণে, এই দূরবীক্ষণের সাহায্যে, ১২০,০০০ ক্রোশ—১২০ ক্রোশে পরিণত হইতে পারে এই মাত্র। তথাপি এই ১২০ ক্রোশ দূরে হইতে চন্দ্রলোকের মনুষ্য, ঘোটক, হস্তী অথবা অন্য কোন প্রাকৃতিক পদার্থে আমাদের কি দৃষ্টিগোচর হইতে পারে? কখনই না।

এই পৃথিবীর ন্যায় অন্যান্য গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি কিনা যদিও বিজ্ঞান-শাস্ত্র এ পর্যন্ত এই প্রশ্নের উত্তরে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারেন নাই তথাপি আনুমাণিক প্রমাণ এতৎ সম্বন্ধে এত রাশি রাশি সংগ্রহ করিয়াছেন, যাহা প্রত্যক্ষের ন্যায় সমান বিশ্বাসযোগ্য, তদপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন নহে।

যে সকল গ্রহ পৃথিবীর সহিত সাদৃশ্য থাকা প্রযুক্ত পার্থিব গ্রহ বলিয়া উক্ত হয়, আমরা প্রথমে সেই সকল গ্রহ সম্বন্ধে এই প্রশ্নটি বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

এই পার্থিব গ্রহ তিনটি বুধ, শুক্র এবং মঙ্গল। ইহারা সৌরজগতের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য গ্রহগণ অপেক্ষা সূর্য হইতে কম দূরে অবস্থিত হইয়া তাহার চতুর্দিকে পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে পরিভ্রমণ করে। সৌরজগতের অন্যান্য দূরবর্তী গ্রহগণের বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করিব।

কিরূপে আমাদের এই পৃথিবী মনুষ্য এবং অন্যান্য ইতর প্রাণীর বাসযোগ্য হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমে দেখিতে পাওয়া যায় যে পরম কারুণিক পরমেশ্বর পৃথিবীকে আমাদের বাসযোগ্য করিবার জন্য বিবিধ প্রকার পরস্পর উপযোগী ব্যবস্থা সকল পূর্ব হইতে নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, সেই ব্যবস্থা-গুলি এমন কোন সাধারণ যান্ত্রিক নিয়ম হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না যাহা দ্বারা সাধারণতঃ জড় জগতের গতিবিধি পরিবর্তন নিয়মিত হইতেছে। জড় জগতে কেবলি গতি ও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় যন্ত্রের ন্যায় চক্র সকল কেবলি ঘূর্ণিত হইতেছে। কিন্তু যে নিয়মের বশবর্তী হইয়া এই পরস্পর বিরোধী অসংখ্য চক্র সকল পরস্পর উপযোগী হইয়া প্রাণিপুঞ্জের সুখ সৌকর্য্য বিধান করিতেছে, সেই নিয়মটি স্রষ্টার অতুল সাক্ষাৎকার মত স্পষ্ট পরিচয় দেয়, এমন আর কিছুই নহে। মনে কর, এক্ষণকার ন্যায় তোমার নৈসর্গিক অভ্যাস এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞান রহিয়াছে— মনের প্রবৃত্তি সকল সমান রহিয়াছে—সুখ দুঃখ বোধ জাগরূক রহিয়াছে—অর্থাৎ এক্ষণকার ন্যায় সর্বাবয়ব-সম্পন্ন মনুষ্যই রহিয়াছে— আর হঠাৎ তুমি এই শোভাপূর্ণ পৃথিবীতে পদার্পণ করিলে। তুমি দেখিবে সুখস্পর্শ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে—স্বচ্ছ নির্মল জলরাশি প্রসারিত রহিয়াছে—প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ জীবনসৌন্দর্য্যে পূর্ণ রহিয়াছে—পৃথিবীর এতটুকু আকর্ষণিক শক্তি তোমার শরীরের উপর রহিয়াছে যে তাহাতে তোমার শরীরের প্রয়োজনীয় স্থায়িত্ব বিধান হইতেছে অথচ তাহার স্বাধীন গতিবিধির কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইতেছে না— তোমার শরীরের মাংস-পেশির গঠন প্রণালী অনুযায়ী, পরিশ্রম এবং বিশ্রামের প্রয়োজন অনুসারে আলোক এবং অন্ধকার পর্যায়ক্রমে যাতা-য়াত করিতেছে—তোমার শরীরের প্রয়োজন অনুসারে, ছয় ঋতু যথা সময়ে পরিবর্তিত হইতেছে—এই সমস্ত উপযোগিতার নিদর্শন পাইয়া, তুমি কি ক্ষণকাল মাত্রও সন্দেহ করিতে পার, যে তোমার বাসের জন্যই এই পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে?

তবে যদি আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে জানিতে পারি যে আমাদের এই পৃথিবীর ন্যায় প্রত্যেক গ্রহই, নিয়মিত কাল মধ্যে সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে—পৃথিবীর ন্যায় আলোক উত্তাপ বায়ু এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, প্রভা সংস্থান—এই নিয়ম তথায় আলোক অন্ধকারের পর্যায় উপস্থিত হইতেছে—ঋতুর পরিবর্তন হইতেছে – শীতোত্তাপের বিভিন্নতা হইতেছে—জলভূমির সঞ্চার বিভাগ সম্পাদিত হইতেছে—তখন কি ঐ সকল গ্রহগণ সর্বপ্রকারে আমাদেরই মত জীব-পুঞ্জের যে আবাসভূমি এ বিষয়ে আর সংশয় হইতে পারে?

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সুতরাং বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদনে এই প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি থাকা কিছু বিচিত্র নয়।

এই প্রবন্ধটি বালক রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা। কারণ—

– ১। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তাঁর জ্যোতিষ বিষয়ক প্রবন্ধে কাঁচা হাতের ছাপ ছিল (তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড়ো প্রবন্ধ লিখেছি—বিশ্বপরিচয়)। এই কাঁচা হাতের ছাপ শুধু 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি' প্রবন্ধেই আছে 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' প্রবন্ধে নেই। কাঁচা রচনা বলেই তত্ত্ববোধিনীর একটি সংখ্যায় প্রকাশের পর 'ক্রমশঃ প্রকাশ্য' থাকা সত্ত্বেও তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র এত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও জটিল রচনা যে ছটি সংখ্যায় প্রকাশিত হবার পর তত্ত্ববোধিনীর পাঠকদেরও (এঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে আগ্রহী) তা আর আকর্ষণ করতে পারছিল না বলেই সম্ভবত প্রবন্ধটির প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রবন্ধের শেষ দুটি কিস্তিতে এ কথার ইঙ্গিত আছে।

২। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমি একটা বড়ো প্রবন্ধ লিখেছি। জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা।' সেদিক থেকে 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি' প্রবন্ধটির দাবী রবীন্দ্র বক্তব্যের স্বপক্ষে। এটি একটি বড়ো প্রবন্ধ এবং তত্ত্ববোধিনীর একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হলেও প্রবন্ধের শেষে 'ক্রমশঃ প্রকাশ্য' শব্দটির দ্বারা এর ধারাবাহিকতা তথা বড়ত্বকে ইঙ্গিত করে। প্রবন্ধটি পড়লে বোঝা যায় এর পরবর্তী অংশে অন্যান্য গ্রহ সম্পর্কে আলোচনা ছিল। ('অন্যান্য দূরবর্তী গ্রহগণের বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করিব')। পক্ষান্তরে "ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' প্রবন্ধটি উপন্যাস আকারের একটি সুদীর্ঘ অসমাপ্ত প্রবন্ধ। এটিকে নিছক বড়ো প্রবন্ধ বললে বোধহয় লঘুভাব করে দেখানো হবে।

৩। **প্রকটরের প্রভাব আছে ঃ** রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তিনি প্রকটরের বই অবলম্বনে জ্যোতিষ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি' প্রবন্ধে প্রকটরের লেখা 'হাফ-আওয়ার্স উইথ দ্য টেলিসকোপ' (প্রকাশিত ১৮৬৮) এবং 'দ্য অরবস এ্যাবাউন্ড আস' (প্রকাশিত ১৮৭২) গ্রন্থ দুটির যথেষ্ট প্রভাব আছে। এই বই দুটি অবলম্বনে যে 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি' প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

৪। গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি প্রবন্ধে রবীন্দ্র গদ্যরীতির প্রতিফলন ঘটেছে। সমকালীন গদ্যের অর্থাৎ ভুবনমোহিনী প্রতিভা—অবসর সরোজিনী দুঃখসঙ্গিনী গ্রন্থ সমালোচনা (জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব ঃ কার্তিক ১২৮৩) ও মেঘনাদবধ কাব্য সমালোচনার (ভারতী ঃ শ্রাবণ থেকে কার্তিক পৌষ, ফাল্গুন ১২৮৪) সঙ্গে তুলনা করলে বহু বিষয়ে সাধর্ম্য চোখে পড়বে। প্রথম যুগের গদ্য রচনারীতিতে মহর্ষির প্রভাব আছে। আবার এই প্রবন্ধে রবীন্দ্র গদ্যরীতির ত্রুটিগুলিও বর্তমান। যেমন ভাবোচ্ছ্বাসে বক্তব্য বিষয় সর্বত্র সময় অস্পষ্ট হয়ে গেছে। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে যাবার প্রবণতাও আছে। এগুলি রবীন্দ্র-গদ্য রীতির অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট্য। গ্রহগণ জীবের আবাস ভূমি প্রবন্ধে রবীন্দ্র চিন্তা-ভাবনা কবি কল্পনা ও ঈশ্বর ভক্তির প্রতিফলন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ একে কবি, তার ওপর অসীম মহাকাশের অনন্ত মহিমার কথা বলতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে কবিকল্পনা মিশে গেছে বালকের বিস্ময় ব্যাপ্ত হয়েছে বাল্য রচনার তথ্যের ফাঁকে ফাঁকে। পরিণত রবীন্দ্র কাব্যে আমরা চিব—'এক' এর সন্ধান পেয়েছি। এ প্রবন্ধেও বিজ্ঞান ও বিস্ময়ের প্রাণকেন্দ্রে আছেন পরমেশ্বর—স্রষ্টা। 'প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বর' 'পরম কারুণিক পরমেশ্বর' 'স্রষ্টার মঙ্গল সংকল্প' প্রভৃতি ভাষণ মহর্ষির আত্মশিখারই আজ্য দীপান্তরে প্রজ্জ্বলন। এই প্রবন্ধটি রবীন্দ্র সাহিত্যে ঈশ্বর উপলব্ধির সূচনাপর্ব।

৫। জীবনস্মৃতির তথ্যপঞ্জীর টীকায় প্রশ্নবোধক চিহ্ন কেন?

জীবনস্মৃতির ৫১ পাতায় রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিষ বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার কথা বলেছেন। জীবনস্মৃতির তথ্যপঞ্জীর টীকাকার কবির বক্তব্যকে স্পষ্ট করতে ১৬৮ পাতায় লিখেছেন—'তু ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধ গ্রহগণ জীবের আবাস ভূমি (?)—তত্ত্ব পত্রিকা শক ১৭৯৬ পৌষ পৃ ১৬১—৬৩।' কিন্তু এত সন্দেহ-দ্বিধা দ্বন্দ্ব কেন? কেন প্রশ্নবোধক চিহ্ন পৃষ্ঠভ্রংশের মত? জীবনস্মৃতির টীকার সন্দেহ সমালোচকদেরও সন্দিগ্ধ করেছে। একমাত্র ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ প্রথম খণ্ডে এ তথ্যকে মেনে নিয়েছেন বিনা প্রশ্নে।

।। প্রবন্ধের কবির গদ্যচর্চা ।।

রবীন্দ্র গদ্যরীতি তার চলার পথে বহু-বার বাঁক নিয়েছে। বিষয়বস্তু ও ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তার শব্দ ছন্দ রীতি বিচিত্ররূপিনী হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রথম গদ্য রচনা থেকে আবিষ্কার করা যায় বালক কবির মনোভঙ্গি ও গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য। গ্রহগণ জীবের আবাস-ভূমি অসম্পূর্ণ প্রবন্ধটি রবীন্দ্র রচনাবলীরূপে প্রতিষ্ঠিত হলে পূর্ণ হবে রবীন্দ্র-গদ্যের ক্রমবিকাশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস, মূল্যায়ন করা যাবে বালক কবির ঘুরিপাকে চিন্তাধারা, বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের কবিদৃষ্টি গদ্য রচনায় কবি মানস অর্থাৎ আদি কবির প্রথম কবিতার সুরধ্বনি কতটা তিনি প্রকাশ করতে সক্ষম, তথ্য ও কল্পনার প্রকাশে গদ্যছন্দ ও ভাষার বিভিন্নতা ইত্যাদি বিষয়।

।। রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রথম গদ্য রচনার কালানুক্রমিক স্থান নির্ণয় ।।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে সর্বপ্রথম প্রকাশিত রচনা একটি কবিতা—ভারতভূমি। বঙ্গদর্শন ও অমৃতবাজার পত্রিকায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয় মাঘ ১২৮০ জানুয়ারী ১৮৭৪। কিছুকাল আগে অমৃত সাপ্তাহিক পত্রিকায় (পরে গ্রন্থাকারে) প্রকাশিত আমার এই আবিষ্কারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ডঃ সুকুমার সেন শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞরা। ভারতভূমি প্রকাশের দশমাস পরে অভিলাষ নামে আর একটি কবিতা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (অগ্রহায়ণ ১২৮০ নভেম্বর ১৮৭৪)। রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রকাশিত রচনার কালানুক্রমিক বিচারে এটির স্থান দ্বিতীয়। অভিলাষ প্রকাশের ঠিক পরের মাসে ঐ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি প্রকাশিত হয়। এটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গদ্য রচনা এবং প্রকাশিত রচনার তালিকায় প্রবন্ধটির স্থান তৃতীয়।

।। সিদ্ধান্ত ।।

ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা তো দূরের কথা সেটি আদৌ রবীন্দ্র-রচনাই নয়— এই আমার সিদ্ধান্ত। একথা জানিয়ে আমি শান্তিনিকেতনে শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলুম। কিন্তু উনি তা মানতে রাজি নন, কারণ বিদগ্ধ পণ্ডিতেরা এটাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন বলে এবং রবীন্দ্রনাথও নাকি এ রচনাকে তাঁর রচনা বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু এ যুক্তি যে কত অসার তা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছি আলোচ্য প্রবন্ধে।

বিদগ্ধ সমালোচক ও পণ্ডিতেরাও অনেক সময় ভুল করে থাকেন, সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু যেখানে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে খেয়াল খুসি মত ব্যাখ্যা করা হচ্ছে সেটাই দুঃখের। রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা আজও তত্ত্ববোধিনীর পাতায় অবরুদ্ধ। অথচ যা বিচার বিশ্লেষণ করলে রবীন্দ্র সাহিত্যের সচনা-পর্বে রবীন্দ্র মানসিকতা, রবীন্দ্র চিন্তা-ভাবনা-রীতি-নীতি ইত্যাদি সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্যের হদিশ মিলবে। কিন্তু আমরা যদি দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রূণাবস্থে বুঝি তবে সত্য প্রবেশ করবে কোন পথ দিয়ে? তাই মৃত্যু দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়েই শেষ করি—হৃদয়ের দুই দ্বারই সমান খুলিয়া রাখো। প্রবেশের দ্বার দিয়া সকলে প্রবেশ করুক, প্রস্থানের দ্বার দিয়া সকলে প্রস্থান করিবে। সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি নিয়ে সমস্যার গভীরে চোখ মেলে সত্য-মিথ্যা ধরা দেবে তার আপন স্বরূপে।

(শেষ)

উপন্যাস

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আদ্য শেষ রজনী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অমিয়কে চুপ করে থাকতে দেখে রজনী আবার বলল, ওরা যেন বলতে চায়—মা তোমার জন্যেই—মা তোমার জন্যেই—মানে?

তোমার জন্যেই বাবা বাড়ি থাকে না! আশ্চর্য। মা হয়ে ওদের বলি কি করে—ওদের বাবা কীরকম লোক। শুধু—

শুধু—

আমার বড় মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে এলে আমার সুখদুঃখ নিয়ে কথা বলে। সেদিন ব্যাসন দিয়ে আমার মাথা ঘষে দিল। আমার দুঃখ ও বোঝে। বাকিগুলোর মন বিষিয়ে দিয়েছে শশাঙ্ক।

তুমি তো শশাঙ্কর জন্যে চিন্তা করো।

করতাম একসময়। এখন ছেড়ে দিয়েছি। ও আমার আয়ের ওপর বাঁচতে ভালবাসে। কিন্তু আমাকে উঠে দাঁড়াতে দেখলেই পেছন থেকে টেনে ধরতে ভালবাসে। আমাকে বোধহয় হিংসেও করে।

সন্দেহ করে তোমাকে।

জানি।

আমাকে জড়িয়ে সন্দেহ করে তোমাকে রজনী। সেই সন্দেহে জলপাইগুড়ি গিয়ে এলোপাথাড়ি কাণ্ড করে বসে।

জানি। কিন্তু করার কিছু নেই। আজকাল ওর ওপর আমার কোন রাগ নেই। ঘেন্নাও নেই অমিয়। আমি ধরেই নিয়েছি—শশাঙ্ক ওরকম।

তোমার চেয়ে আমার প্রবলেম অনেক বড় রজনী। লীলা নিজে চাকরি করে। এতকাল আমার নাটকে শরীর দিয়ে পয়সা দিয়ে আমাকে তাজা রাখতে চেয়েছে। আর এখন!

রজনীই বলে দিল। এখন আমার সঙ্গে জড়িয়ে তোমাকে ভেবে নিবে কষ্ট পায়। ভুল করে। পাগলামি করে। হয়ত অপমানও করে তোমার—

হ্যাঁ। আমার মুশকিল—আমি লীলার কাছে কৃতজ্ঞ—

ভালবাসো না লীলাকে?

বাসি রজনী। তোমাকেও বাসি।

আমার কথা বাদ দাও। আমার মায়ের কথা ভেবে দ্যাখো। আমার দিকে তাকাও। তোমাদের দুজনের ভাগ্যটাই অদ্ভুত। মা বাবার জন্যে গয়না বন্ধক দিয়ে আমেরিকা গিয়েছিলেন। ফিরে এলেন বড়বাবুর পরের ভাই—বাবাকে বিয়ে করে। বাবা অনেকটা তোমার মত ছিলেন। লম্বা, কঠিন সুন্দর, মনখোলা—

এতগুলো অ্যাডজেকটিভ একসঙ্গে আমাকে দিও না।

তোমার মধ্যে কিন্তু সত্যি আমার বাবার ভাব আছে। আমি পরিষ্কার দেখতে পাই অমিয়।

তুমি আমায় ভালবাসো না রজনী।

বাসি। কিন্তু এতো প্রথম বয়সের ভালবাসা নয়। মেয়েদের ভালবাসার সঙ্গে শরীরটা থেকে যায়। দুঃখ হয় খুব। তোমার কাছে যখন এলাম—তখন এ শরীরটা পুরনো হয়ে গেল। আমার আর দেওয়ার কিছু নেই। এমন সময়েই দেখা হল তোমার সঙ্গে।

অনেক দিয়েছো তুমি আমায়।

কিছু না অমিয়। আরেকটু আগে দেখা হলে কত দিতে পারতুম।

স্টেজে তুমি আমায় জাগিয়ে তোলো রজনী। আমার ভেতর থেকে আরেকজন অমিয় বেরিয়ে সে তোমার সঙ্গে লড়াই করে। বেশির ভাগ দিনই আমি স্টেজে তোমার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারি না।

এখন কবিতার ভাষা পূর্ণিমা। ভাষা অমাবশ্যা হলেও কোন অসুবিধা ছিল না। পাশাপাশি বসে থাকা দুজনের মাঝখানে অদৃশ্য বাতাসে যা ভাসছিল—তার নাম কৃতজ্ঞতা, ভালবাসা, আরো অনেক কিছু। এ জিনিসগুলোও চোখে দেখা যায় না। অদৃশ্য। ফিল করা যায় শুধু। রজনী জানে না—এর চেয়ে ভালোবাসা ব্যাপারটা আরও বড় কিছু কি না।

আরও অনেক রাতে নদীর বুক থেকে ঠান্ডা বাতাস পিচ রাস্তা পেরিয়ে কবিতার এসে ঢুকতে লাগলো। ওরা দুজন তখন আচ্ছন্নের মত ডবল সাইজের ঘরে ঢুকে ডানলপিলোতে এলিয়ে পড়ল। একবারও একজনেরও মনে এল না—এখন আরেক-জনকে জড়িয়ে ধরলে গা গরম হয়ে যাবে। ভাল লাগবে। বরঞ্চ ঘুম সারাটা ঘরে একচ্ছত্রভাবে শাসন করতে লাগল।

সকালবেলার বেড টি সেরে তৈরি হতে হতে আরও ঘণ্টাখানেক গেল। তারপর রওনা হওয়ার কথা। দুজনই রোদ জোরালো হওয়ার আগে কলকাতা পৌঁছতে চায়। কিন্তু নদীর পাড়ে জেলেদের কাছে টাটকা মাছ কিনতে গিয়ে সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। দুজনেই যে যার বাড়ির লোকের জন্যে খুব মন দিয়ে মাছ কিনলো। বেশ দরাদরি করে।

রওনা হওয়ার মুখে রজনী হেসে ফেলল। আমাদের যে দুটো আলাদা সংসার আছে—সে আমাদের মাছ কেনা দেখেই জেলেরা বুঝেছে।

তা বলে ভাইবোন ভাবেনি নিশ্চয় আমাদের।

বন্ধু ভাবতে পারে অমিয়।

এত ভোরে বন্ধুরা ডায়মন্ডহারবার পৌঁছতে পারে না। ওরা আসলে ভেবে ভেবেও কোন সম্পর্ক বের করতে পারেনি।

আমরাই কি পেরেছি অমিয়?

সত্যি তুমি আমার কে?

আমিই বা তোমার কে অমিয়?

আমি তো বলতে পারবো না।

আমিও পারবো না অমিয়।

শশাঙ্কবাবু থাকলে এসব কথা শুনে হো হো করে হেসে দিতেন পিতৃসুলভ মানুষ।

লীলাও হয়তো ভাবতো কিছু একটা ভাবে।

অতটা না হলেও কিছুটা তো বটেই। আজ ফিরলে একটা ঝগড়াও বাধিয়ে দিতে পারে।

সত্যি কথা বলবে।

এসব সময় আমি চিরদিন যা বলার কথা বলি। না বললে জানি—ভিতরে ভিতরে হাঁফিয়ে ওঠে সব কিছু।

বাড়ি ফিরতেই লীলা নিজের সব কিছু জটিল করে দিল। আমাদের দুজনের বেলা দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে গিয়ে হাজির হল।

খুশি হওয়া দূরে থাক, লীলা অনিচ্ছের ভাগ। আমরা যে বারোটায় হাওড়া থেকে ছাড়ব—সেটা ওকে বলা ছিল। কাউন্টারবেলের টিকিট আমার জন্যে ওরা তখনো বসে।

আমি তো তখন [illegible] পৌঁছে গেছি।

আমার তো [illegible] আজ সকালেও জানাগাটার কথা বলতে পারতাম।

সকালে? সকালেও চণ্ডীদা ফোন করেছিল?

না। মিসেস দত্তর বড়ছেলের ফোন এসেছিল। মা কাল রাতে ফেরেননি—

কি বললে?

আমি কিছু জানিনে বলব? শুনছি তো এখন।

তবু কি বললে?

মিস্টার ব্যানার্জিও ফেরেননি। ফিরলে ফোন করব।

করার দরকার নেই। আমরা একসঙ্গেই ফিরেছি। রজনীও অনেক মাছ কিনেছে ওর ছেলেমেয়েদের জন্যে।

তোমরা মাছ কিনতে গিয়েছিলে!

না তো। কেন?

ভাবলুম ভোরবাতে সস্তায় কিনতে রাত থাকতে চলে গিয়েছ!

অনু, বিল্টু, ছোটোন বিকেলের দিকে বাড়ি ফিরে দেখলো, বাবা একঘরে উপুড় হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। মা আরেক ঘরে কুকড়ে মুসড়ে ঘুমিয়ে আছে। কবিতার একটা বড় ভেটকি শুকিয়ে কাঠ। তার ওপর লাল পিঁপড়ের লাইন পড়েছে। তোলা কাজের সন্ধ্যা মেয়েটি তখনো এসে পৌঁছয়নি।

ছেলেমেয়েদের পায়ের দুপদাপে দু-জনেরই ঘুম ভেঙে গেল। ওদের সামনে দুজনই স্বাভাবিক হয়ে উঠতে লাগল। সন্ধ্যা এসে পড়তে মাছ কোটা, ভাজা—কিছুই আর থেমে থাকলো না।

সন্ধ্যের দিকে আবার উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল অমিয়। শুয়ে শুয়ে দোতলার জানলা দিয়ে নিচের রাস্তা দেখা যাচ্ছিল। তার গায়ে করাতকলের মোটা মোটা কাঠের গোলাই টাল দেওয়া। তারপরেই শহর কলকাতার প্রান্তিক খাল। সে জল পচ গিয়ে নীল হয়ে আছে বহুকাল।

ওরা এখন হইচই করে মাছভাজা খাচ্ছে। অমিয় একসময় আলতা, কালির ব্যবসায় ফেল মেরে সারাদিনে পাউরুটি আর টিউ-বয়লের জল দিয়ে ক্ষিদে মিটিয়েছে। এই শোবার ঘরের দেওয়াল কেটে এযারকুলার বসানো হবে। শংকর বলেছিল, দাদা। মাস গেলে আটখানা একশো টাকার নোট দিদির হাতে তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত। অভিমানে রজনী ফস করে পুরী চলে যেতে পারে। সবই চলছে, সুজাতা নাটকের হাউসফুলের ওপর।

অমিয় পরিষ্কার জানে—সে এখন একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান নতুন করে ভাবতে গেলে সব ভেঙে পড়বে। নতুন নাটকের ঝুঁকি নিতে কেউ রাজি হবে না। সবাই চায় নিরাপদে থাকি। বাড়ি ভাড়া বেশন হাউসফুল একসট্রা চেয়ার নিয়মিত পাবলিসিটি কলশো। কেউ চায় না, এই একই অভিনয়ের এক'ঘয়েমি ভেঙে ফেলে দিয়ে আরও কঠিন কিছুর জন্যে প্রাণপাত করি।

তা করতে হলে সবার আগে বাহুল্য বর্জন করা দরকার। কী কী বাদ দেওয়া যায়। ভালো বিছানা। দুখানা মোটর গাড়ি। ছোট ছোট অনেকগুলো আরসি। বেহিসেবী অভ্যেসগুলো।

আয়ের ভেতর বাস করতে শেখা দরকার। দরকার পরিশ্রম করে পথ খুঁজে পাওয়া। আগেকার মত ধাক্কা খেতে খেতে।

এখন লীলাকে সবিস্তারে যদি বোঝাতে বসে—আমি আর রজনী খুব বন্ধু। আমরা কাল রাতে ক্লান্ত শরীরে পাশাপাশি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভেঙেছে সেই ভোরে। তাহলে লীলা মুখিয়ে উঠে বলবে কৈফিয়ৎ কে চেয়েছে তোমার কাছে?

তার চেয়ে এই ভাল। মনে মনে লীলা এখন অদৃশ্য সব শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। ওর একনম্বর শত্রুর নাম: সন্দেহ। অথচ ও কোনদিন এরকম ছিল না।

আচমকাই বেরিয়ে পড়ল অমিয়। পাঁচ-মাথার মোড় দিয়ে হাঁটতে ভীষণ ভাল লাগতে লাগল। সে নিজে তো আসলে রাস্তার লোক। এই অপরিমেয় নাটক লেগে গিয়ে চারদিকে অনেক রকমের বে-নিয়ম শুরু হয়ে গেছে।

বাইরের লোক এখন সোজা তার সঙ্গে এসে দেখা করতে পারে না। আগে শংকরের সঙ্গে এসে দেখা করতে হয়। শংকর উপযুক্ত মনে করলে দু-একজনকে তার কাছে পাঠায়। তারা গ্রীশবাবুর পেছনদিককার বড় পর্দা তুলে তবে তার কাছে আসতে পারে। তাও অনেকের মুখের দিকে না তাকিয়েই কথা বলে অমিয়। তাতে পুরুত্ব বাড়ে। এ জিনিসটা অভ্যেস করে বশ্যু করতে হয়েছে অমিয়কে। কিছুদিন হল এক আর্টিস্ট এসে তার পোর্ট্রেট আঁকছে। সপ্তাহে গড়ভীর রাত্রে কাজ সিটিং দিতে হয় মাঝে মাঝে। নিজের ঠোঁটটা ভেংচাতে বেরিয়ে এল—অবনকমার।

চাঁদিতে চাঁটাতে ভরত চলে গেছে। দারোয়ান উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম দিতেই খচ করে লাগল অমিয়র। আমি তোমাকে মাসের শেষে পনের টাকা মাইনে দিচ্ছি। ছিঃ! ছিঃ!! দারোয়ান অবাক হয়ে-ছিল। বলল গাড়ি কোথায় বড়সাব?

কোন উত্তর না দিয়ে অমিয় হন হন করে ভেতরে ঢুকে পড়ল। অমিয় পান রজনীর গোছালো হাতে পড়ে কেতাদুরস্ত হয়েছে এখন দোপাটি ফুটছে। ঘর সবসময় ঝাঁ করা দুর্বো ঢাকা ছোট জমিটুকু চোখ কেড়ে নেয়। সাজঘরের দরজাটা খোলা। আজ কোন শো নেই।

সে ভেবেছিল, চণ্ডীদা একা রয়েছে। কিন্তু একা একা কি করছে? মানুষটা অনেকক্ষণ হল অমিয়র সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। সেই 'অথ মালতী কথা' অমিয়র সময় থেকে। পঞ্চমুখের একদম গোড়ার দিককার লোক। দল পাল্টায়নি একবারও। বিট বোল করে আসছে এতকাল। বিয়ে থা করার সময় পায়নি বলে ভরত চলে সাজ-সরঞ্জাম পাহারা দিতে চণ্ডীদাই থাকে। এখানেই খায়। শোয়। ক্যান্টিন বান্না চড় আলাদা করে ওর জন্যে। সুজাতা নাটকে মাত্র একটা সিনে অ্যাপিয়ার হতে হয়। তার-পর শো চলার সময়েই উদয়াস্ত ইস্ত্রি করে চলে চণ্ডীদা। এতগুলো রোলের অতগুলো পোশাক। সবগুলো ইস্ত্রি করে তুলে রাখা। পরের শোয়ে বোড়ি পাওয়া যাবে।

অমিয় সাজঘরে ঢুকে দেখলো চণ্ডীদা গুণ গুণ করে গান গাইতে গাইতে ইস্ত্রি করে যাচ্ছে।

অমিয়কে দেখে অবাক। তুমি? এখন দেখতে এলাম। কেমন কাজকর্ম করছ। ফাঁকিটাকি দিচ্ছ কিনা।

একখানা সিগারেট দাও।

আমি তো আজকাল আর সিগারেট খাচ্ছি না।

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শের
জ্বালা-যন্ত্রনা
থেকে
দ্রুত আরাম
পেতে হলে
হ্যাডেনসা
মলম
ব্যবহার করুন!

ভালো। ছাড়তে পারলে ভালো। তোমার দুটো পাগারী কথা দরকার। থার্ড সিন স্যার লাস্ট সিনের জন্যে। ঘামে ইস্ত্রিতে একদম ফেসে যাওয়ার দশা।

সে তো বুঝলাম চন্ডীদা। তুমি এই ছুটির দিনে একা একা ইস্ত্রি করে মরছো কেন ?

বাঃ ! কাল শো আছে না ? তখন আমায় আনরেডি পাবে না।

বেড়াতে বেরোতে পারতে।

প্রায়ই তো কলশোতে বেড়াতে বেরোই। তারপর থেমে চন্ডীদা বলল গ্রুপ ফেলে কোথায় যাব ?

ধর গ্রুপ যদি ভেঙ্গে যায়।

অভাবের দিনেই গেলাম না কোথাও। আর এখন হাউসফুলের সময় কাটবো ?

হাউসফুলের সময়েই তো গ্রুপ ভেঙ্গে যায় চন্ডীদা।

সন্ধেবেলা খারাপ খারাপ কথা বোলো না। ক্ষণে অক্ষণে যদি ফলে যায়।

এক্ষুণি নাটক তুলে নিলে গ্রুপ ভেঙ্গে যাবে। পয়সা শর্ট পড়লেই দল পাল্টাপাল্টি শুরু হয়ে যাবে।

নাটক তুলবে কেন অমিয় ! হাজার রজনী হবেই দেখো।

হবে তো জানি। কিন্তু এটাই কি আমাদের লক্ষ্য ছিল চন্ডীদা ?

আমরা কি এতকাল দর্শক চেয়ে আসিনি ?

কিন্তু এভাবে কি চেয়েছিলাম ! রোজ শোয়ের পর কাউন্টার মিলিয়ে টাকা গোনা। মালদা ইটাচুনা বনগাঁ—সর্বত্র খেপ মেরে বেড়াচ্ছি। বাস বোঝাই দিয়ে দুশো মাইল চলে যাচ্ছি। দূরের দূরের পার্টির বায়না নিচ্ছি। এখন আমাদের দুখানা গাড়ি। দুটো ফিক্স। কতরকমের সাউন্ডের জিনিস। আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি চন্ডীদা।

কেন ? দর্শক তো আমাদের নিয়েছে। আর জিনিসপত্তরের কথা বোলছো। ওগুলো তো দরকারী।

দরকার রোজ বোঝ বেড়ে যাচ্ছে না চন্ডীদা ?

অন্যদিন এই সাজঘর গমগম করে। আজ মেন শো নেই। বাইরেও কোন কলশো নেই। ইলেকট্রিক ইস্ত্রিখানা নামিয়ে রেখে চন্ডীবাবু টুলে বসলেন। নিভু আলোতেও পশুদুখের সাজঘর ঝকঝক করছে। এক একজন আর্টিস্টের কারুর স্টেপ করে পোশাক।

আমার কথা যদি বলো অমিয়—আমি তো নিজের জন্যে কিছু বাড়াইনি। যে কটা পরে বসে আছি—সে ফতুয়া গামছাই সিনে ঢুকি। থাকি এই সাজঘরে। খাই ক্যান্টিনে। আমি তো আর শিশির ভাদুড়ি কিংবা ছবি বিশ্বাস হতে আসিনি। আমি হলাম গিয়ে চন্ডীচরণ দাশ।

নতুন নাটক ধরলে কেমন হয় চন্ডীদা।

এ নাটক গোটাও আগে।

অমিয় চুপ করে গেল। এতদিন জানতো নাটক লাগানো কঠিন। এখন জানতে হচ্ছে—গোটানো তার চেয়েও কঠিন। বিশেষত নাটক যেখানে সফল। থিয়েটারের ভাষায় যাকে বলে—দর্শকধন্য কিংবা মঞ্চজয়ী। আর কিছুকাল এ নাটক চালিয়ে অমিয় স্বচ্ছন্দে পাবলিসিটিতে নিজের নামের আগে নটশেখর কিংবা নটচন্দ্র বসিয়ে নিতে পারে। আপত্তি করার কেউ নেই। কিন্তু আসলে সেটা নন্ট-চন্দ্র হয়ে দাঁড়াবে।

নাটক তুমি তুলে দাও অমিয়। একদম একঘেয়ে লাগছে।

অন্য সবাই যখন বলবে—বাই দি পপুলার ডিমান্ড !

আমি তোমার পেছনে আছি। যাতে ঝুঁকি নেই—তাতে আরাম কোথায় ?

তুমি তো আমার চেয়ে বড় চন্ডীদা। বিয়ে করার ঝুঁকিই নিলে না। নাটকের ঝুঁকি তোমার সইবে ?

এই ঝুঁকির সঙ্গে দুলতে দুলতেই তো এতটা পথ এসেছি।

সাজঘরের বড় ফিজটর মোটর থরথর করে শব্দ তুলেই চুপ করে গেল। ওর ভেতরে বার্লি-লেমন সিরাপ ব্রান্ডি নানা রকমের ফল মজুত আছে। ক্লান্তি এলে লড়াই করার সব অস্ত্র ওখানে পাওয়া যাবে। গলা ভিজানোর জিনিসপত্রও বেশি। এই ঢালাও ব্যবস্থা তাকে চারদিক থেকে চেপে ধরেছে—সেটা আজকাল টের পায় অমিয়।

এখন বেরিয়ে আসার একটা গলি খুঁজে পাওয়া দরকার। যে-গলি দিয়ে আবার বড় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ানো যায়। সেখানে সাধারণের ভিড়ের ভেতরে মিশে যেতে পারলে এই বিশেষ হয়ে ওঠার জেলখানাটা ভেঙ্গে ফেলা খুব সহজ। তখন খোলা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে অনেক নাটক মাথায় আসে অমিয়র। কতকাল যে ভাল কোন বই পড়া হচ্ছে না।

লুঙ্গি আর বুট পায়ে খলিফা এসে হাজির। দিদি কুথায় ? হাতে এক বান্ডিল ব্লাউজ।

রজনী তো আসেনি।

জিনিসগুলো রেখে দিন।

রজনীর অনেক দিনকার দরজি।

নাও। তুলে রাখো চন্ডীদা। এখার ইস্ত্রি কর বসে বসে। সাকসেসফুল নাটকের সাকসেসফুল হিরোইনের এক ডজন ব্লাউজ !

—সতেরো—

গোটানো যত সহজ ভেবেছিল অমিয়—দেখলো, আসলে তত সহজ নয়। বেলা এগারোটা বাজতেই তিন জায়গা থেকে কলশোয়ের পার্টি বায়না করতে চলে এসেছে। শংকর সাজঘরের ভেতর দিকে অমিয়র আরাম কেদারার সামনে এসে দাঁড়াল। মার্চ মাসে ডেট দিতে পারবে দাদা ?

কোন ডেট নেই শংকর। সেহু আঠাশে মার্চ শুধু।

ওই দিনটা দাও তাহলে। বাকি দু জায়গাকে এপ্রিলে ডেট দেওয়া যাবে।

কি ভেবেছো শংকর। আমাদের কোন বিশ্রাম নেই ? হলে সাধা মাসে কম করেও কুড়িটা শো। তারপর দোলের দিন তবল শো আছে। অন্য ছুটিছাটা থাকলে তবল শো হবে। এছাড়া সারা মাস জুড়ে বাইরে শো। একটা দিন হাতে রেখেছিলাম—চুপচাপ শুয়ে শুয়ে থাকবো বলে।

শোবার অনেক সময় পাবে দাদা ! তুমি তো আমাদের নারায়ণ। অনন্ত শয়নেই শুয়ে আছো।

(ক্রমশ)

সতীনাথ মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীতের গতিবিধি সমুদ্রের ঢেউয়ের মত। কখনও উঠছে আকাশ পানে। আবার কখনও পড়ছে মাটির টানে। এই ওঠা-পড়ার গতি বিবর্তনই হোলো বাংলা গানের ইতিহাস। অবক্ষয় এসেছে বলেই ঝড়ের দিনে আশ্রয় পাবার আকুলতা নিয়ে আমরা আজ সারা শক্তি দিয়ে পঙ্কজ মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দে, শচীন দেববর্মণ, সায়গল, কানন দেবী, শৈল দেবী—এ'দের আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইছি।

ঘটনার দৃশ্যপট চুঁচুড়া। খুব সম্ভব সেটা ১৯৪২ সাল। একদিন স্কুলের টিফিনের সময় টিচার্স কমনরুম থেকে কানে এলো রেডিওতে বেজে ওঠা একটি গানের কলি 'ভুল করে যদি ভালবেসে থাকি ক্ষমিও সে অপরাধ'।

গানটা সুন্দর। গায়কের গলাটিও ছাবী মিষ্টি (এর চেয়ে বেশী তলিয়ে ভাববার মত ক্ষমতা তখনও হয়নি)। কিন্তু এ গান শোনার জন্য স্কুলসুদ্ধ ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীর এ-হেন আকুলি-বিকুলির কারণ কি? রেডিওতে রোজই বাজে। পরে শুনলাম এই গায়কের নাম সতীনাথ মুখার্জি। ইনি স্থানীয় হুগলী কলেজের ছাত্র এবং সেই ছাত্রের রেকর্ডই রেডিওতে বাজছে। আশ্চর্য ব্যাপার বই কি? তখনকার দিনে রেকর্ডের আর্টিস্ট। তার ওপর আবার হিজ মাস্টার্স ওয়েস। শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র ছাত্রী মহলের 'হিরো' হয়ে ওঠবার অধিকার ও'র নিশ্চয়ই আছে।

একটি মেয়ে সগর্বে বলল 'সতীনাথ মুখার্জী আমার দাদার বন্ধু। আমরা ত ও'কে 'বাদলদা' বলি' বলেই তেরছা চোখে আমাদের দিকে তাকালো। যেন সে মস্তবড় গৌরবের অধিকারিণী ঐ একটি কারণেই। পরে বাড়ী ফিরে ভাইয়ের কাছে সবিস্তারে সংবাদ পাই। সতীনাথ মুখার্জি কলেজের নাম-করা ভালো ছেলে। ম্যাট্রিক ও ইন্টার-মিডিয়েট স্কলারশিপ পেয়ে বি-এ পড়ছেন। গান তাঁর প্রাণ বলেই অধ্যাপকদের ইচ্ছে সত্ত্বেও অনার্স নেন নি। কারণ সব ব্যাপারেই তাঁর 'ডিস্টিংগুইশড' পোজিশন চাই। নাম থাকলে থাকবে প্রথমের দিকে। নৈলে একেবারেই নয়। এবং অনার্স নিয়ে প্রথমের দিকে নাম রাখবার জন্য গানের ক্ষতি করতে ইনি একেবারেই রাজী নন।

তারপর একদিন আমরাও কলেজে ঢুকলাম। কলেজের সোস্যালে 'দুই পুরুষ' নাটকে সুশোভনের চরিত্রায়ণে অভিনয় ও গানে শুধু কলেজের ছাত্রছাত্রী অথবা অধ্যাপকদেরই নয়, শহরের জ্ঞানী গুণী ও রসিকের চিত্ত জয় করলেন যিনি তিনিই সেই সতীনাথ মুখার্জী, কলেজের সোস্যাল সেক্রেটারী। কলেজের এক অধ্যাপকের বিদায়-সংবর্ধনার অর্গানাইজেসনের পক্ষ থেকে ছাত্রীদের একজনকে গান গাইবার অনুরোধ জানাতে এসে আমাদেরই ক্লাশের সুগায়িকা এবং সুদর্শনা একটি মেয়েকে বললেন 'প্রিন্সিপাল বলেছেন আজ মনোজবাবুর ফেয়ার-ওয়েলে মেয়েদের তরফ থেকে আপনি একটা গান গাইবেন।' ঝড়ের বেগে কথা ক'টা বলে হনহন করে চলে গেলেন। কারো দিকে একবার চেয়েও দেখলেন না।

আমরা সমস্বরে হেসে উঠলাম। একজন মন্তব্য করলো 'এমন কাঠখোট্টা বেরসিক লোক কি করে যে শিল্পী হোলো? মেধাবী এবং বিনীত ছাত্র সতীনাথ ছিলেন অধ্যাপকদের প্রিয়। আর প্রতিভাবান, সুশ্রী ও সুরসিক 'বাদলদা'—ছিলো ছাত্রদের 'হিরো'।

একালের গান

সেদিন কলেজের সোস্যালে কোরাস গাইবার জন্য সরিৎদা কয়েকটি ছেলেকে ও'র কাছে গান শেখাতে নিয়ে এলো। দু'চারবার তাদের গাইয়ে তারপর 'ঠিক আছে, কোরাস হবে কিনা কাল ফাইনাল্যাইজড হবে' বলে তাদের ভাগিয়েই সবিৎদার পিঠে এক ঘুঁষি দিয়ে বললো 'এসব ভূষি মাল-গুলো আমার ঘাড়ে না চাপালে চলছিল না? এদের একটাকেও সুরে গাওয়াতে হলে যে পরিমাণ পরিশ্রম লাগবে তার অর্ধেকে একটা যুদ্ধ জয় করা যায়। এখন ভদ্রভাবে কি করে এদের বাদ দেওয়া যায় সেই চিন্তা করতে হবে।'—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই বছরই ডিস্টিংশন নিয়ে বি এ পাশ করে সতীনাথ মুখার্জী এ জি বেঙ্গলে জয়েন করছেন বলে শুনলাম। তারপর দীর্ঘকাল আর কোনো খবর জানি না। পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে পড়ার সময় হঠাৎ একদিন 'পাষাণের বুকের হিরণ্ময়রূপে'

সতীনাথবাবুকে দেখলাম নানা পাবলিক জায়গায়। ঘরে ঘরে ছেলে-মেয়েদের মুখে এবং মাইক্রোফোনে শোনা যাচ্ছে ঐ একটি গান। একদিন মুগ্ধ হয়ে গেলাম 'কোথা তুমি ঘনশ্যাম' শুনে। নন্দকোষ রাগের ওপর প্রতিটি স্বর ও অলংকারের প্রয়োগনৈপুণ্যে সরগমের বিদ্যুৎগতির চমকের পর গানের মুখে ফিরে আসায় শুধু পরিশীলিত কণ্ঠের সুর ও কারুকলাই নয়, শিক্ষা ও গায়কীর মুন্সীয়ানার স্বাক্ষরকে অস্বীকার করবার উপায় কই?

নজরুলের 'চিরতরে দূরে সরে যাব' ও 'শাওন রাতে যদি অন্য কারো কণ্ঠে শোনার কথা ভাবা যায়? আর কি মধুর ছবিখানি হয়ে উঠছে 'সোনার হাতে সোনার কাঁকন কে বাঁধ অলংবাঁধ' গানটি। অজস্র বৈচিত্র্যে ইনি গানের ডালি ভ'রে দিয়েছেন। কিন্তু শাস্ত্রীয় সংগীতের শিক্ষা ও অনুশীলন যেন তাঁর প্রতিটি গানের শহনসঞ্চারী রসের উৎস। একটু মন দিয়ে সতীনাথবাবুর যে কোনো একটি গান শুনলেই এ সত্যে পৌঁছতে দেরী হয় না। মনে পড়ে লালা শ্রীধরের বাড়ী একটি ক্লাসিক্যাল গানের আসরে ওঁর সঙ্গে দেখা হতেই রবিশংকর ওঁকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন 'সতীনাথবাবু আই অ্যাম অলসো ইওর ফ্যান'।

একদিন সতীনাথবাবুর সঙ্গে গানের আলোচনা প্রসঙ্গে জানলাম যে গান তাঁদের পারিবারিক ঐতিহ্যের অঙ্গ। শৈশব কেটেছে লক্ষ্ণৌতে। ঠাকুর্দা রামবাহাদুর রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কুশলী বেহালাবাদক ছিলেন। তাই সুরে অভ্যস্ত কান ও মনের গ্রহণ ক্ষমতা শিশুকাল থেকেই প্রখর। বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করতো ক্লাসিক্যাল গান। এই ক্লাসিক্যাল বিহাইণ্ড অফ মাইণ্ড' থাকার দরুনই সজ্ঞানে সংগীতশিক্ষার সময় যখন এলো ইনি উচ্চাঙ্গ সংগীতকেই বেছে নিলেন আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে। 'প্রবোধচন্দ্র ঘোষালের কাছে খেয়াল ও ঠুংরীর তালিম গ্রহণ, ১৯৪০-৪৭ অবধি ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কাছে ঐ ধারারই অনুসরণ এবং ১৯৪৭ থেকে আজ অবধি চিন্ময় লাহিড়ীর কাছে ইনি রাগসংগীত শিক্ষা করছেন। ১৯৪৩-এ ছাত্রাবস্থাতেই গোপেন মল্লিকের সুরে কাজী নজরুলের 'ভুল করে যদি ভালবেসে থাকি' গানটি গ্রামোফোন কোম্পানীতে রেকর্ড হোলো। ১৯৪৭ সাল থেকে সুরু করে দশবার রেডিও অডিশনে ফেল করে এগারবারে ইনি পাশ করেছিলেন। ১৯৫৯ সালে বোম্বের সংগীত পরিচালক রামচন্দ্র পালের সঙ্গে পরিচয় ও যোগাযোগ ঘটলো।

এই সময়ই এ জি বিব বাক্স ছেড়ে দিয়ে তাঁর সহকারীরূপে মুগদেবতা, মর্যাদা, পথছাড়ার বাহিনী ইত্যাদি অনেকগুলি ছবিতে কাজ করেছিলেন।

আমার প্রথম প্লে-ব্যাক হলো 'যুগদেবতা' ছবিতে। স্বামীজীর কণ্ঠে আমার সবকটি গানই খুব জনপ্রিয় হয়। এর সময় প্রচুর ফিল্মসং গেয়েছি। রাতভোর পংকজ মল্লিকের সুরে, নমা আসর অনুপম ঘটকের সুরে, 'রাণী রাসমণি' রবীন চ্যাটার্জির সুরে গোধূলি, হরিলক্ষ্মী, কৃষ্ণসুদামা পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সুরে, ময়লা কাগজ, পুরীর মন্দির, শ্যামলী (কালীপদ সেন), স্বর্গমর্ত্য, যুগদেবতা (রাম পালের সুরে) ইদানীং তপনবাবুর ছবিতে এবং উত্তমকুমার পরিচালিত 'বনপলাশীর পদাবলী' তেও গেয়েছি। সব ছবির নাম মনে আসছে না। নন-ফিল্ম? 'বল ভুলছে কি মোরে ভুলেছ'—তারপর একে একে 'ভুলে গেছ তুমি', 'খেলায় মেতে থাকব তবু তোমায় ভাকা ভুলব না'। এ-গানটা প্রথমে তেমন বিক্রী হয়নি। পরে ১৯৫০ সালে আশ্চর্য রকম সেল পেয়েছি। পঞ্চম রেকর্ড 'পাষাণের বুকে লিখো না আমার নাম' শুধু আমার প্রথম হিট সং-ই নয়—এ গান আমায় সংগীতজগতে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

একটু থেমে হঠাৎ যেন অতীত স্মৃতিতে জেগে উঠে সতীনাথবাবু বলেন 'এই সময়ের একটি সন্ধ্যার সুখস্মৃতি আমার জীবনের শেষ দিন অবধি মনে থাকবে। বাজভবনে স্টাফস অফ ইণ্ডিয়ার বিরাট জলসা। পরিচালনায় ছিলেন বিমান ঘোষ ও উৎপলা সেন। ধনঞ্জয়দা ও হেমন্তদা ছাড়া প্রায় সবাই-ই ছিলেন বোম্বের আর্টিস্ট। আমি সেখানে গান শুনতে গেছি। বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেবের পর লতা মংগেশকারের গাইবার কথা। কিন্তু উনি শিল্পীসুলভ বিনয়বশতই বোধ হয় ঠিক বড়ে গোলাম আলি খাঁর পর গাইতে রাজী হলেন না। উদ্যোক্তারা তখন ইন বিটুইন বড়ে গোলাম আলি খান ও লতার মধ্যে আমায় বসিয়ে দিলেন। আমি ডেসপারেট হয়ে আহির ভৈরব রাগের ওপর আমার নিজের সুরের একটা গান সুরু করে দিলাম 'না যেও না'। তখনও ও গান রেকর্ড হয়নি। গান শেষ হতে না হতেই চারিদিক থেকে উঠলো হাততালির ঝড়। মনে হোলো সবাই বলছে 'নো মোর নো মোর'। লজ্জায় অপমানে কান গরম হয়ে উঠলো। যেন বক্সম উঠে পালাতে যাচ্ছি। দু পাশ থেকে বিমান ঘোষ ও উৎপলা সেন ধরে বসিয়ে দিলেন 'ও কি? অত করে রিকোয়েস্ট করছে আবার গাইবার জন্য। উঠছ কেন? গাও।'

তখন কান পেতে শুনলাম অডিয়েন্স না মোর বলেন নি। বলছেন 'এনকোর'। শুনেই উদ্দীপ্ত হয়ে আরো বিগুন তান বোল বিস্তার দিয়ে গাইলাম। গানের পর ডায়াসের বাইরে আসতেই বড়ে গোলাম আলি খাঁসাহেব আমায় কোলে টেনে নিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন 'সতীনাথ নয় তোমার নাম হওয়া উচিত শিউনাথ (অর্থাৎ শিবনাথ)।

সেই প্রোগ্রামই আমায় যেন এভাবনাইট পপুলারিটি এনে দিল। পরদিন সব কাগজই আমার প্রোগ্রাম 'বেস্ট প্রোগ্রাম অফ দি নাইট' হেডলাইন দিয়ে বেরুলো। তারপর। রেকর্ড বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে সবাই যেন লুফে নিল। রাগাশ্রিত গান লোকে নেয় না কে বলে? তারপর থেকে যত জায়গায় গেয়েছি 'না যেও না' গানটি শ্রোতাদের অনুরোধ তালিকার পুরোভাগে থেকেছে।

এই প্রসঙ্গেই জানাই আমার শিল্পীজীবনের সাফল্যের মূলে দৈনিক সংবাদপত্র ও অন্যান্য পত্রপত্রিকার সহমর্মিতার একটা উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। সাংবাদিকদের কাছে আমার কিছু পাবার নেই আমার প্রতিভাই সব—এ কথা বলার মত মূর্খতা যেন কখনও না হয়। ঈশ্বরের কাছে এই-টুকুই আমার প্রার্থনা। তোমরা জান কোন দিন নিজের কৃতিত্বের জন্য সংগীতজগতের হর্তাকর্তাদের দুয়ারে দুয়ার ঘোরবার মত মনোবৃত্তি বা সময় কোনোটাই আমার হয়নি। হয়তো সেই জন্যই তোমাদের মত শিক্ষিত সাংবাদিকদের ভালবাসা এত বেশী করে পেয়েছি। আমার ওপর এটা গুরুর আশীর্বাদ ছাড়া আর কি বলব?

রেডিওতে এগারবারের অডিশনে পাশ করেছি সে তো আগেই বলেছি। তারপরও বছরের পর বছর দূরদর্শনের শিল্পীতালিকাভুক্তই থেকেছি। একদিন বিমান ঘোষ আমায় ডেকে আলাপ করে খুব উৎসাহ দিলেন এবং ইনিই দূরদর্শনের কবল থেকে আমায় উদ্ধার করে সন্ধ্যা ও রাত্রির শিল্পী-তালিকাভুক্ত হওয়ার আশ্বাস নিয়ে এলেন।

এদিকে রামদা কতকগুলি ছবি করেই বোম্বে চলে গেলেন। তখন ইণ্ডিপেন্ডেন্টলি অনুরাগ, শরৎবাবুর হরিলক্ষ্মীর সংগীত পরিচালনা করেছি। প্লে-ব্যাকের প্রথম হিট-সং বাণী রাসমণির গান। অগ্নিপরীক্ষার 'জীবন নদীর জোয়ার-ভাঁটায়'। মায়াবিনী লেন কেদার রাজা হারানো প্রেম এবং অতিথি ছবিতে তপন সিংহের সুরে 'মায়ের নদী বয়'ও আমার প্লে-ব্যাক তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

আধুনিক গানের ক্রিয়েটিভ শিল্পীরূপে আপনার একটি বিশেষ স্থান আছে বলে আমি মনে করি। এবং এ বিষয়ে অনেক সমঝদার সংগীতরসিক ও শিল্পী আমার সঙ্গে একমত। এ সম্বন্ধে আপনার মুখ থেকেই আপনার সংগীত-ভাবনার খবরটি শুনতে ইচ্ছা করে—শিল্পীকে প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়ে বললাম।

পিপলস সং বলতে যা বোঝায়—সে-ধারা আধুনিক গানই বজায় রেখেছে বলেই আমার বিশ্বাস। এর মধ্যে ফিল্মের গানও পড়ে। কিন্তু আধুনিক গান নাম শোনা-মাত্রই উচ্চাঙ্গ সংগীতের শ্রোতাদের চোখে যে অবজ্ঞার ছায়া দেখেছি সংগীত চেতনার শুরু থেকেই তার বিরুদ্ধে আমার মন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

মানুষের মনের অশ্রু বেদনা সুখ-দুঃখের সহজ সরল রূপ মানুষের কাছেই কেন অবজ্ঞাত হবে? আধুনিক গানের অগভীর হাল্কামো ও রুগ্ন ভাববিলাসিতা বর্জন করে এ গানকে এমন একটা ডিগনিফায়েড ব্যাকেটের দেব যা বিশ বছর বাদের রসিক শ্রোতার কাছেও সমাদর পাবে। এই রকম একটা প্রতিজ্ঞা নিয়েই আমি গাইতে শুরু করি। এদিক দিয়ে আমার আদর্শ ছিলেন পংকজ মল্লিক শচীন দেববর্মণ কৃষ্ণচন্দ্র দে কানন দেবী শৈল দেবী। এঁদের নামে আজও তু মানুষ শ্রদ্ধায় মাথা নত করে।

যুগের তাৎক্ষণিক উচ্ছ্বাসের কাছে কোন দিন মাথা নত করব না এই ছিল

আমার গণ। আমার ক্ল্যাসিক্যাল গানের অভিজ্ঞতার পটভূমিকা দিয়েই সুর ও প্রকাশভঙ্গির বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার চেষ্টাই সারা জীবন ধরে করে এসেছি এবং এখনও করে চলেছি।

শ্রোতাদের সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে তাঁদের অন্তর সত্যিই সৌন্দর্যপিপাসু। তাঁরা যদি তা না হতেন না য়েও না রাধিকা-বিহনে কাঁদে, মনোবীণা কাঁদে কিংবা ময়ূরী নাচে (মিঞা মল্লার) গজলের ঢঙে গাওয়া ব্রোঞ্চোনা কেন আমি যে কত একা কিংবা কে সজনী দিনরজনী (কেদার রাজা) এইরকম সব উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ঘেঁষা গান এমন করে নিতে পারতেন না। তবে গভীর-বোধের স্পর্শে তাঁদের মনে বড় কিছুর চাহিদা সৃষ্টি করার দায়িত্ব নিশ্চয়ই শিল্পীর।

গানের কমার্শিয়াল দিকটি আমার কাছে কোনদিনই বড় হয়ে ওঠেনি। যদিও একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে এ সাক-সেস না এলে শিল্পীর জীবনের সমাধি ঘটে। কিন্তু আমি কোন দিনই বাণিজ্যিক দিকটির সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করতে পারিনি। কারণ যখন কম্প্রোমাইজ করার চেষ্টা করেছি দ্বন্দ্বের যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে বুঝেছি ওটা আমার স্বধর্ম নয়। তাই স্বধর্মে নিধন-শ্রেয় নীতি অবলম্বন করে চলেছি।

সতীনাথবাবুর প্রথম থেকে শুরু করে আজ অবধি প্রকাশিত রেকর্ডগুলি সিরিয়াল অর্ডারে শুনলেই তাঁর সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া।

...(১) সহজ ও মিষ্টি গানের মধ্যে পাষাণের বুকে, যেদিন জীবন তুমি বালুকাবেলায়, বাধিকাবিহনে; ময়ূমিয়া তুমি দুটি জলে ভেজা আঁখ রাতজাগা মোর আজ তুমি নাই বলে, জীবনে যদি দীপ (২) তুলসী দাস ও কবীরের ভজন কাশ্মীর পুণ্য ও বোম্বের রেডিওতে খুব বাজে (৩) রাগপ্রধান কোথা তুমি ঘনশ্যাম (নন্দকোষ) কেন জানি না (পটদীপ) ময়ূরী নাচে (মিঞামল্লার) ওগো শ্যাম, মিনতি জানাই (জট তাল কাফি ঠুংরী) মনোবীণা কাঁদে কে গো গাগরীভরণে যায় না যেও না তোমারে ভুলিতে ওগো। (৪) ভক্তিমূলক এবং (৫) নজরুলগীতি। ১৯৫৮ সালে প্রথম রেকর্ড করছেন আমি চিরতরে দূরে চলে যাব তুমিসুন্দর তাই, শাওন রাতে যদি গভীর নিশীথে রুমঝুমা (এল পি) বসিয়া বিজনে আর একটি কথা জানাই। সতীনাথ-বাবু বললেন আমার অধিকাংশ রেকর্ডই নিজের সুরে যদিও নিজের সুরে গান করবার জন্য আমায় ১৯৪২-৫২ মানে প্রায় দশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। তারপর রেকর্ড হলো পাষাণের বুকে—এরপর হিজ মাস্টার্স ভয়েসের ট্রেনার হয়েছিলাম। আমার সুরে হেমন্তদা (তোমার আমার কারো মুখে কথা নেই) ধনঞ্জয়দা (শূন্য ঘরে ফিরে এলেম কতদিন দেখা হয়নি দুজনে কাল সারা রাত চোখে ঘুম ছিল না) লতা মঙ্গেশকর (আকাশ প্রদীপ জ্বলে ও কত নিশি গেছে) শ্যামল (তুমি আর আমি শুধু এত আলো আর এত হাসি) মানব (আমার হৃদয় লয়ে) দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় দীপক মৈত্র সবাই রেকর্ড করেছেন।

আর উৎপলা মুখার্জী (সেন)?

আমার প্রশ্নের উত্তরে সতীনাথবাবু একটু হেসে মাথা নীচু করলেন। তারপর বললেন 'আমিও অনেকের সুরে গান গেয়েছি।' তার মধ্যে বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় গান আমারও মনে আছে। বলব?

'বলুন, এতক্ষণ সতীনাথ অনেক বকবক করলো। এবার তোর স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা হোক।'—বললেন উৎপলাদি।

সুধীন দাসগুপ্তর সুরে সোনার হাতে সোনার কাঁকন, আকাশ এত মেঘলা ঐ আকাশ প্রদীপ তারা। তারও আগে অনেক আগে—যদি আসে কভু বিশ্ববরণের বেলা, নির্মল ভট্টাচার্যর সুরে আমি খেলাঘর মেতে (শৈলেশ দত্তগুপ্ত) বাতের আকাশ তারায় বয়েছ ঘিরে (শ্যামল মিত্রের সুরে)। আর মনে পড়ছে না। তবে আপনার নিজের সুরেরই কয়েকটি গান মনে আছে সুরের নতুনত্বের জন্য। যেমন এখনো আকাশে চাঁদ ঐ জেগে আছে বনের পাখী গায়, হারালো সে যে কোথায়, তুমি চলে গেলে একথা কখনো এলায় শুধু, যদি কোনো দিন এ জীবনে আমি যারে চেয়েছি।

মেগাফোন কোম্পানীর লেবেলে জানি একদিন, সব কিছু ফেলে যদি কত না হাজার ফুল কে প্রিয়া বলে ডাকে, এমন অনেক কথাই বল, তোমরাই বলেছ নূতন কিছু যদি সহেলী আমার, মাঝির কাজল যতদূরে থাক, ভেবেছ তোমারই একার আছে জলসাঘর এ পৃথিবী আজে যতদিন—এসব রোমান্টিক গান ছাড়াও রাগপ্রধান একটি ই পি ত কল্যাণী মাধব টোডি ভৈরো বিবাগী।

স্মৃতিশক্তির তারিফ করতে হয়। উৎপলাদির মন্তব্য।

শেষেরটির কথা মনে আছে—এই জন্য গানটি একটা বিশেষ প্রেজেন্ট করবার জন্য (বের-করে সতীনাথবাবুর ভক্ত বলে) কিনতে গিয়ে শুনি এক মাসের মধ্যেই সব সিল্ড হয়ে গেছে। দ্বিতীয় লটের অর্ডার দিয়েও পাওয়া যাচ্ছে না। রাগপ্রধান গান আরও করুন না?

এবার পঙ্কজের শুনতে পারে। সেই যে তুমি বাজিয়েছিলে উল্টোদীক বাজে না বাঁশী কেন—ক্ল্যাসিক্যাল ছাঁচে অন্তরা অঙ্গ টপ্পার ঢঙে গেয়েছি। ই পি ও একটি করব তবে এখনও কি কি রাগ করব ভাবি নি। গজলও করতে পারি।

গজল? হঠাৎ মনে পড়ে গেল একটি ঘটনা। যখন আমার মত আরও অনেকেই জেনেছিলেন সতীনাথবাবুর নিজের সুরে অথেনটিক গজলের রীতিমত ওয়াকিবহাল শিল্পী। রঞ্জি স্টেডিয়ামে গালিব শতবার্ষিকী উৎসবের গজলের আসরে সতীনাথবাবুকে শ্রোতাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে কান-পুরের সুবিখ্যাত কবি শ্যাম নিগম বলে-ছিলেন 'সতীনাথবাবুর সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে ওঁর বিশুদ্ধ উর্দু ভাষায় কথা বলা এবং গুনগুনিয়ে গাওয়া গজল শুনে ওঁকে লখনৌবাসী ভেবেছিলাম এবং ওঁর মাতৃভাষা যে উর্দু এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলাম ওঁর নামের সঙ্গে পরিচিত হবার পর জান-লাম উনি বাঙ্গালী।'

ভক্তিমূলক গানেও সতীনাথবাবুর যথেষ্ট খ্যাতি আছে।

উৎপলা সেনের সঙ্গে ওঁর দ্বৈতকণ্ঠের গান গাওয়ার আসর নাকে বলে একেবারে হটকেক। বিহার ঝুমুর ও দ্বৈতকণ্ঠের পূর্ব-বাংলার লোকগীতি রেকর্ড দুটির গান না গেয়ে কোনো গানের আসর থেকে ওদের ওঠবার উপায়নেই।

সতীনাথবাবুর সুর রচনা ও প্রকাশ ভঙ্গির বৈচিত্র্য তাঁর সৌন্দর্যানুভূতির বিকাশ থেকেই।

'আপনি চিত্রজগত থেকে একটু বিচ্ছিন্ন অনেকে বলেন ফিল্মের উপযোগী গান হয়তো আপনার রুচিমাফিক নয় বলেই আপনি এসব থেকে দূরে থাকেন। তাই কি?'

ম্লান হেসে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে সতীনাথবাবু বলেন, 'সিনেমার গানকে যে একেবারে লাইটলি হতে হবে একথা আমি মানি না। তাছাড়া সিচুয়েশন প্রয়োগকৌশল ইত্যাদি নানান ব্যাপারের ওপর ফিল্মের গানের সাফল্য নির্ভর করে। অনেক সময় গান ভাল হলেও ছবি ফ্লপ করলে তার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত পরিচালকও ডুবে যান। নন-ফিল্ম লঘুসুরের গান আমি প্রচুর করেছি এবং তা হিটও করেছে।'

যথা?

উৎপলার গাওয়া ঝিকমিক জোনাকীর ময়ূরপঙ্খী, দোলা দিয়ে যায় এলো বরষ মহুয়া বনে। আমার গাওয়া 'জীবনে যদি দীপ' গানের রেকর্ডটি ষোলো হাজার কপি বিক্রী হয়েছে।

আমার শিল্পীজীবনের অপূর্ণতার বেদনা হোল যে গান শোনতে চাই হয়না গাওয়া'। এ অপূর্ণতার কিছুটা ক্ষতিপূরণ ঘটেছে রবিশঙ্কর আলি আকবর (এঁর ছবি নূপুর-এ গেয়েছি) লতা ও বড়ে গোলাম আলি খাঁর এ্যাপ্রিসিয়েশনে।

আর জীবনে যখন কোনো প্রতিষ্ঠা সম্মান স্বীকৃতি পাইনি তখন সবার অলক্ষে আমার প্রকৃতি অনুযায়ী গান গাইবার প্রেরণা যুগিয়েছেন তখনকার প্রথিতযশা শিল্পী উৎপলা সেন। বর্তমান আমার স্ত্রী আজ অবধি আমার সকল গানের আদি ও অকৃত্রিম ফ্যান আমার ছোটো ভাই-এরও অধিক একটি ছেলে। বর্তমানে ইংরাজীর অধ্যাপক—শিশির সেন। আমার এমন কোন রেকর্ড নেই যা ওর বাড়ীতে নেই।'

আধুনিক গান এবং তার এখনকার রূপ ও প্রবণতার সম্বন্ধে আপনি কিছু বলবেন না?

বেশ কয়েক বছর আগে ধনঞ্জয়দার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। এবিষয়ে উনিও আমার সঙ্গে একমত। উচ্চাঙ্গ সংগীতের সাধ্য সমস্তরাল ছন্দে বয়ে চলেছে সাধারণ মানুষের গান—একে আধুনিক গান মাস-সং যাই বল। সাধারণ মানুষের আনন্দ বেদনা প্রকাশের তাগিদেই এ গানের জন্ম। এ গান কে করে প্রথম সৃষ্টি করলেন নিশ্চত করে বলা মুস্কিল।

আধুনিক গানের সূচনা রবীন্দ্রনাথে হলেও এ গান জনপ্রিয় হতে দেরী হয়েছে। কেন দেরী হয়েছে সে কথা ধনঞ্জয়দাও বলেছেন এবং এমৃতের সরের আগুন' ফিচারেও এ বিষয় পর্যাপ্ত আলোচনা হয়েছে।

আমার বক্তব্য হল এই—রবীন্দ্রনাথের গান জনমানসের দুয়ারে পৌঁছবার আগে তারা শুনেছে প্রধানতঃ কাজী সাহেবের গান তবে নজরুলগীতি নামে নয়। আমাদের বড়দীতেই দেখেছি কাজীদার গানের অসংখ্য রেকর্ড ছিল—জানদাসুন্দরী আশ্চর্যময়ী দাসী কে মল্লিক ধীরেন দাস ইন্দুবালা আঙ্গুরবালা থেকে শুরু করে সুপ্রভা সরকার অবধি।

আধুনিক গান যাকে অন্য ভাষায় চলতিকালের গান বলা যায় সেটা খাপছাড়া উদ্ভট শোনা জিনিস নয়। আমাদের প্রতিদিনের জীবনের কান্নাহাসির দোলা আনন্দের হাসির নানান অনুভূতির মধুর প্রকাশ। এতে কখনও লাগে বিভিন্ন প্রদেশের এমন কি মহাদেশেরও মাটির বুকের সুর কখনও ক্লাসিকাল সংগীতের ছোঁয়াও এতে থাকতে বাধা নেই। কারণ এ গান কোন নিয়মের নিগড়ে বাঁধা নয় এ হোল মানুষের হৃদয়াবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ। সকল দেশের সুরের ছোঁয়া প্রকাশভঙ্গির নকসা এ গানে স্থান পেতে পারে—কিন্তু এ গানকে ভারতীয় ভাব ও আবেগের রঙে ডুবিয়ে রাঙিন করতে হবে। নইলে নানা রং-এর ঘটই বাহার থাক সে রং পাকা হবে না। কারণ নকল কবা জিনিস কোন দিন টেকে না। টিকবেও না। ভারতীয় চরিত্র না থাকলে এ গান আমাদের মনে কোন দিন চিরন্তন আবেদন রাখতে পারবে না। ক্লাসিকাল ভাটিয়ালী ফোক যাই থাক বাংলা দেশ ও বাঙালী চিন্তার ছাপ তাতে থাকবেই। এ গানে কিছু মনে রূপ বা উপাদান হয়ত থাকবে (ত্রুটীহীনভাবে আশাই বা সবসময় করব কেন?) কিন্তু বলের কষ্টিপাথরে আপনা থেকেই যাচাই হয়ে যেটুকু থাকবার থাকবেই। যা থাকবার নয় গানের জোরে তা রাখা যায় না।

কাজী সাহেব এবং সমসাময়িক আরো যারা সুরসাগর হিমাংশু দত্ত রবীন চ্যাটার্জি কমল দাসগুপ্ত, শৈলেশ রায় সুধীরলাল নির্মল ভট্টাচার্য সুবল দাশগুপ্ত অজয় ভট্টাচার্য অনিল ভট্টাচার্য প্রণব রায় বাণী-কুমার এবং আরো যেসব গুণীরা তাঁদের সারা জীবনের স্বপ্ন, ধ্যান ও সাধনা দিয়ে বাংলা গানের ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন তাদের কি আমরা বাংলাগানের ইতিহাস থেকে বাদ দিয়ে দেব?

আজ দ্বিজেন্দ্রগীতি নজরুল গীতি রজনীকান্তর গান অতুলপ্রসাদের গান বলে এঁদের গানকে আলাদা একটা গোষ্ঠিভুক্ত করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। আমি একটু প্রশ্ন করছি আজ থেকে দশ বছর বা কুড়ি বছর বাদে অজয়-গীতি অনিল-গীতি কমল-গীতি কিংবা সুধীরগীতি রূপে এইসব গান চিহ্নিত হবে কি? এরা আধুনিক গান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দ্বীপান্তরে বন্দী থাকবে? না আধুনিক গানের মাঝেই একটা চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে?

এখানে ভাল মন্দর বা ছোট বড়র প্রশ্ন ওঠে না। একটা বড় ক্যানভাস অনেক রং অনেক ছবি একটা প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্য প্ল্যাটফর্মে পৌঁছানো। ক্লাসিকাল লোক-সংগীত টপ্পা সব কিছুই এতে আছে। তবু এ গান কোন বোন বিশেষ কাটাগরীর অন্তর্ভুক্ত না। কারণ আগেই বলেছি এ গান হোল সর্ববন্ধনমুক্ত।

ভালমন্দর প্রশ্ন কেন ওঠে না? আগে কোন তরুণ নিধুবাবুর টপ্পা গাইলে তার অভিভাবকরা তাকে বয়ে-যাওয়া ছেলের দলে ফেলে দিতেন। আর এখন? এ গানের একটা আলাদা আভিজাত্য। টপ্পার জন্য লোক আজ পাগল।

তাই বলছিলাম কোনটা ভালো কোনটা মন্দ কোনটা স্থায়ী হবে কোনটা হবে না সে বিচার এত তাড়াতাড়ি হবার নয়। তার জন্য অপেক্ষা করতে হয়, ধৈর্য ধরতে হয়।

আধুনিক গানের প্রথমের যুগে যে মল্লিক, কে সি দে এঁরা সব ভক্তিমূলক বাগশ্রয়ী গান গাইতেন। খেয়াল ঠুংরীর ছায়া থাকলেও ক্লাসিক্যাল থেকে খেয়াল-ঠুংরীর চেয়ে সেসব গান অনেক সহজ। তার পরের যুগের গান আরো সহজ হয়ে এলো। উচ্চাঙ্গ সংগীত বহুদিনের শিক্ষা ও সাধনাসাপেক্ষ। কিন্তু সহজাত একটা সংগীতবোধ থাকলেই সাধারণ মানুষ এসব গান গাইবার আনন্দের অধিকারী হতে পারে।

কমলদা (দাশগুপ্ত) আবার এ গানকে এমন সহজ করে দিলেন যে রাগের মধুরতাটুকু থেকে গেলো। বর্জিত হোলো তার কাঠিন্য। তখন নিউ-থিয়েটার্স এমনকি বোম্বের হিন্দীছবির গানও ছিলো উচ্চাঙ্গ বা ঠুংরী-ঘেঁষা।

তারপর বোম্বের ছবিতে আস্তে আস্তে স্থূল অশালীন দাপাদাপি শুরু হোলো (১৯৫১-৫২) এবং ক্রমে ক্রমে বাংলা গানেও তার ছায়া পড়লো। তখন হিন্দীঘেঁষা সুর না হলে কোনো রেকর্ড বিক্রী হোতো না। কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পী অবশ্যই এর ব্যতিক্রম ছিলেন।

কিন্তু এ যুগও স্থায়ী হোলো না। কিছুদিন বাদে তারও প্রতিক্রিয়া শুরু হোল। কারণ বাঙালী এমনই একটা জাত যে প্রাণ দিতে পারে কিন্তু কৃষ্টিকে ছাড়তে পারে না। গত দু বছর ধরে দেখা যাচ্ছে বাংলাগানের গতি মোড় নিচ্ছে সিবিয়াস সুর ও কথার দিকে। আমার অভিজ্ঞতার এজাহার হোলো এই যে সংগীতের গতিবিধি সমুদ্রের ঢেউ-এর মত। কখনও উঠছে আকাশপানে। আবার কখনও পড়ছে মাটির টানে। এই ওঠাপড়ার গতিবিবর্তনেই হোলো বাংলা গানের ইতিহাস। অবক্ষয় এসেছে বলেই বলেই ঝড়ের দিনে আশ্রয় পাবার আকুলতা নিয়ে আমরা আজি সারা শক্তি নিয়ে পঙ্কজ মল্লিক কৃষ্ণচন্দ্র দে শচীনদেব বর্মন সায়গল কানন দেবী শৈল দেবী এদের আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইছি। হিন্দুস্থান কোম্পানীর নীরদবাবু সেদিন বলছিলেন উৎপলা সেনের 'বিনাম লিখে দিও অংগার এখনও কি রবুণ ডিমান্ড ভাবা যায় না।'

শ্রোতাদের প্রসংগে সত্যনাথবাবু বললেন বাংলাদেশে এত অশান্তি এত সমস্যা তবু বিদগ্ধ ও রসগ্রাহিতায় এ দেশের শ্রোতাদের জোড়া কোনো দেশে নেই। আমাদের ভরসা ঐখানেই।

সন্ধ্যা সেন

সুনীলমাধব সেন

অনেক মানুষের ভীড়েও তাঁকে চিনে নেওয়া যায়। এক লহমায়। বেঁটে খাটো শীর্ণকায় চেহারা। বাবরীকাটা চুল। মাথায় টুপী। গায়ে উজ্জ্বল গাঢ় লাল রঙের জামা: যেন মনের উষ্ণ উত্তাপের প্রতীক। বুকখোলা কোর্টের মাঝখানে ঝকঝকে এক সাব বোতাম। মুখে চুরুট। চিত্ররসিকরা সবাই জানেন এই মানুষটির নাম শিল্পী সুনীলমাধব সেন। আসলে সেনগুপ্ত। নাম পদবী দুই মিলেমিশে বড় বলে গুপ্ত বাদ দিয়ে শুধু সেন লেখেন।

বাড়ীতে পার্থক্যের মধ্যে মুকুটহীন রাজার মত টুপীহীন। পরণে লাল জমির ওপর সাদা কালোর লাইন টানা ঢল ঢল জোব্বা। কোমরে দড়ির ফাঁস। নগ্ন পদযুগলের দিকে দৃষ্টি পড়তেই সুনীলমাধব বললেন—হাঁ বাড়ীতে খালি পায়েই থাকি।

দাদামশায় বলতেন—মাটির সংগে দেহের যোগসাধন হওয়া দরকার। তাতে দেহ ভাল থাকে।' তিনি প্রত্যহ খালি পায়ে মিনিট পনের হাঁটতেন মাটিতে। পাকা বাড়ীর এই দোতলার মোজাইক করা মেজেতে মাটির সংগে যোগ হয় না জানি। তবুও বোধ হয় যেন তৃপ্তি পাই খালি পায়ে।

সুনীলমাধব প্রথম মাটির গন্ধ পেয়েছিলেন ১৯১০ সালে ২৭ আগষ্ট। জন্মছিলেন পুরুলিয়ার দাদামশায়ের বাড়ীতে। দাদামশায় হরিনাথ রায় ছিলেন পুলিশ অফিসার। বাবা ঋতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ডাক্তার। কর্মসূত্রে পালঙ্ক তাঁকে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে হত। জন্মের মাত্র পাঁচ বছর পরে সুনীলমাধব মাকে হারিয়েছেন। মা মারা যাওয়ার পর থেকে বাবার সংগে আসক্তি প্রায় ছিল না বললেই চলে। সেই অবধি তাঁর বৈশব কেটেছে দাদামশায়ের স্নেহচ্ছায়ায়।

কয়েক যুগ পরে আবার সেদিন শিল্পী গিয়েছিলেন পুরুলিয়ায়। বাস্তবে এবং ধ্যানে হঠাৎ মাটির গন্ধমাখা নেমে পড়লেন। এক মুঠো পাথর গুলো তুলে মাথায় ঘষতে লাগলেন বিভিন্নমত সংগীসাথীদের সুনীলমাধব বললেন—এই মাটিতেই মা আমায় [illegible]

প্রথম আলো দেখেছিলাম। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'

পুরুলিয়ার অস্পষ্ট স্মৃতি নিয়ে ৭ বছর বয়সে সুনীলমাধব গেলেন বাঁকুড়ায়। কারণ পুলিশ অফিসার দাদামশায় বদলী হয়ে গেলেন। ভর্তি হলেন বাঁকুড়ার জেলা স্কুলে।

একদিন কি যেন এক কারণে স্কুল ছুটি হয়ে গেল দুপুরে একটায়। ক্লাসের এক বন্ধুর সংগে মোটরে চড়ে গেলেন তার বাড়ী ত। গাছগাছালি পোষা পশুপাখী দেখতে দেখতে বাগান পেরিয়ে গেলেন খিড়কি দরজার দিকে। থমকে দাঁড়ালেন। খড়ের চাউনীর তলায় কুমার মূর্তি গড়ছে। গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জী। ফোকলা দাঁত। চোখে কাপোর সরু ফ্রেমের চশমা। ডাঁটি দুটো সুতো দিয়ে বাঁধা। মিহিগলায় গান গাইতে গাইতে মূর্তি

গড়ছিল 'যাও যাও গিরী আনিতে গৌরী উমা আমার অনেক কেঁদেছে। চলু চলু নয়নে শিব পার্বতীকে কোলে নিয়ে বসে আছে। কি অসাধারণ অভিব্যক্তি। মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখছিলেন। চমক ভাঙল বন্ধুর ডাকে। পরে জেনেছিলেন কুমোরের নাম অনন্ত পটুয়া। বাড়ী বিষ্ণুপুরে।

বকুনি খাবার ভয়ে দিনের আলো নিভে যাবার আগে বাড়ী ফিরলেন। তখনও দাদামশায়ের ফিরতে অনেক দেরী। দোতলার লম্বা নির্জন বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। মধ্যাহ্নের স্মৃতি ছবি হয়ে উঠতে চাইছিল। দাদামশায় ইজিচেয়ারের হাতলে উঠলেন। বারান্দার একদিকের ঝকঝকে সাদা দেয়ালে গায়ে গড়গড়ার কাঠকয়লা দিয়ে আঁকতে শুরু করলেন দুপুরে দেখা শিব পার্বতীর চেহারা। খানিকক্ষণ পর কানে টান পড়ল। পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখলেন দিদিমাকে। তিনি ধমক দিয়ে বললেন—দেয়াল নোংরা করা হচ্ছে কেন? যাও শিগগির এখান থেকে। বদমাস ছেলে। দাদামশায় আসুক। তারপর তোমার বিচার হবে।

ঘন্টাখানেকের মধ্যে দাদামশায় ফিরতেই দিদিমা নালিশ পেশ করলেন। কিন্তু ফল হল উল্টো। একবস্তি ছেলের ড্রইং দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে পরের দিন স্কুলের ড্রইং মাস্টার অসিত দাশগুপ্তকে গৃহশিক্ষকরূপে নিযুক্ত করলেন। একনাগাড় বাড়ীতে ছোটরা নাটক মঞ্চস্থ করল। সিন আঁকলেন অসিতবাবু। বড় বড় পেঁচোয়া টানে দ্রুত রঙ থুবড়ে থুবড়ে একের পর এক এঁকে দিলেন বন জঙ্গল আকাশ মানুষ মেঘ পশু পাখি ইত্যাদি। শক্ত বোর্ডের ওপর হরিণ এঁকে কাঁচি দিয়ে কেটে দাঁড় করিয়ে দিলেন স্টেজে। হঠাৎ দেখলে হরিণটিকে গতিশীল বলে মনে হয়। এসব দৃশ্য শিশু সুনীলমাধবের মনে গভীর ছায়াপাত করত।

তবে অনন্ত পটুয়ার স্মৃতিই মনে স্থায়ী হয়ে বাসা বেঁধেছিল। কিছুকাল পর খবর পেয়ে ছুটে গেলেন বাঁকুড়ার শেষ প্রান্তে তারামার মন্দিরে। সেখানে অনন্ত [illegible]

তিনি গিয়ে দেখলেন অনন্ত পটুয়া একটা ছবি তুলসীর সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে মুখের মধ্যে গুঁড়ো গুঁড়ো গাছ-গাছড়া কী সব চিবিয়ে খাচ্ছে। ওষুধ খাওয়া হলে ভাতারমারা বলল—তোরে, তারা মাতা বলব না। অনন্তদার কাছ থেকে মাটি চেয়ে এনেছেন সুনীলমাধব পুতুল গড়বেন বলে। কিন্তু কিছুতেই মনের মতন হচ্ছে না। পরের দিন ফিরে গিয়ে বলছেন অনন্তদা, তবে তোমার মাটি গড়তে পারবে? অনন্তদা বলছেন—যাও, ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে এসব ছোটলোকি কাজ করবেন না। মাটি গড়া কাজ নেই।

এই অনন্ত পটুয়ার দৃষ্টান্তেই সুনীল মাধবের শিল্প চেতনা জাগরণ এবং তাকেই প্রাণ পাথেয় করে পথ চলতে শুরু করেছিলেন। কথায় কথায় শিল্পী বললেন—বৈশাখে দেখা সেই তারামোহিনী মূর্তি এখনও ভুলতে পারিনি। ছেষট্টি বছর বয়স হল। এত কাজ দেখছি। তবুও সেসব কাজের তুলনা নেই। বাঁকুড়ার যা বছরের স্মৃতি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে তাদের সুনীলমাধব সেন।

কলকাতায় হরিনাথ বাবুর মৃত্যুর পর ১৯১২ সালে বাড়ী ছেড়ে কলকাতায় ভূপেন্দ্রনাথ বসু রোডের বাড়ীতে চলে এলেও বাড়ীর পাট সহজে মিটিয়ে আসতে পারেন নি। শিল্পী হরিনাথ স্বপনে প্রেরণাও জুগিয়েছিলেন অনেকখানি। ১৯২০ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউশন চার্চ কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হলেন। ছবি আঁকার কাজও চলতে থাকে। বেশীর ভাগই পেন্সিলে স্কেচ।

সেটা ১৯২১-২২ সাল হবে। এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে চলে গেলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর দক্ষিণের বারান্দায়। দেখলেন আরও অনেক ছোট ছোট ছেলে বসে অবনীন্দ্রনাথকে ঘিরে। তিনি সবারই হাতে ডিজাইন ছিঁড়ে কাগজ দিচ্ছেন। তারপর ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে বসালেন—পনের মিনিট সময়। যার যা খুশী আঁকো। এক সময় এলার্মের ঘণ্টা বেজে উঠল। ইনি কাগজ এক এক করে ফিরিয়ে দিচ্ছেন।

সুনীলমাধব একটা স্কেচ এঁকেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ এক নজর দেখেই বললেন—বেশ হয়েছে। এঁকে যাও। তোমার হবে। শিল্পী মনের ঠাকুর কথায় উৎসাহিত হয়ে বললেন—আপনি শুনেছি সাধনার জন্মদিন। আমি জন্মেছি জন্মাষ্টমীর দিন। অবনীন্দ্রনাথ একগাল হেসে জবাব দিলেন—তাহলে তুমি নিশ্চই আমার ভাই শিল্পী হবে। এই ঘটনার পর সুনীল মাঝে মাঝে ছবি এঁকে নিয়ে যেতেন ঠাকুরবাড়ীতে। তবে ছবি এঁকে নিয়ে যাওয়া হলে নিত্য অসুবিধা দেখা দিতো।

অনীহা সত্ত্বেও বাড়ীর ইচ্ছে চরিতার্থ

— শিল্পীর একটি স্কেচ

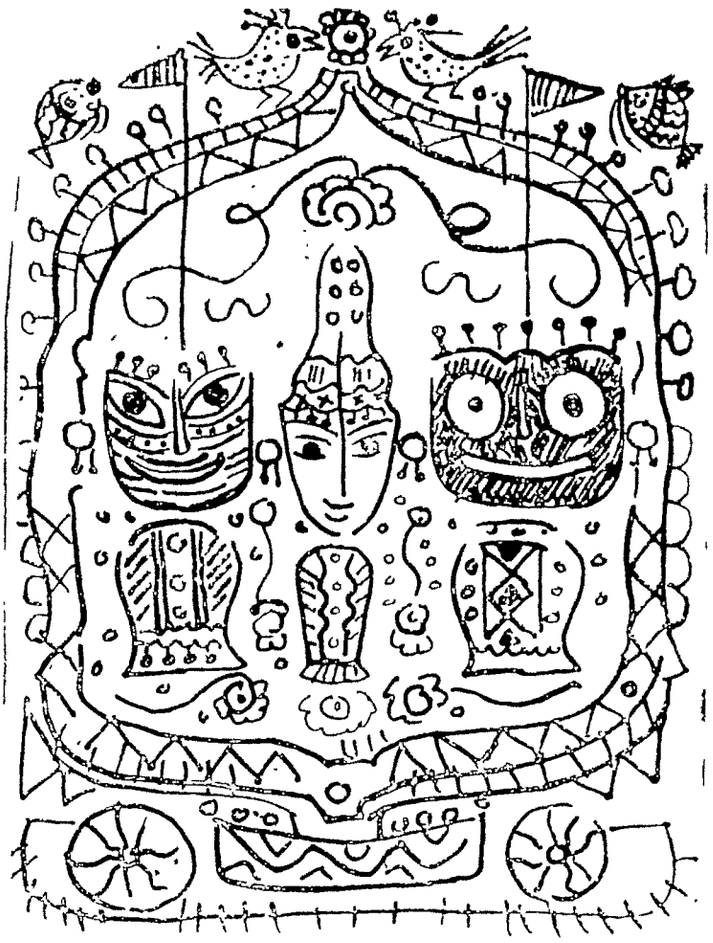

করতে ভর্তি হলেন। এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে পাস করে বেরিয়ে এসে ব্যবসাতেই জীবিকা বেছে নিলেন। ঘরে বাইরে তে বসে আবগুঁফোর বদলে ছবি এঁকে হাত নিশপিশ করত। যাত্রার বন্দীবেশ পাখীর মত ঝাঁকড়া চুলের বেলা কোর্ট কাটিং কাঁচি সিরে সন্ধেবেলায় ছবির জগতে নিজেকে খুঁজে পেতেন। মেজদা দু বছর পর আইনজীবিকায় ইস্তফা দিয়ে পুরো-পুরি শিল্পসাধনায় মেতে গেলেন।

সুনীলমাধব লা প্রাকটিশ করতেন আশু ঘোষ মধ্যেপাড়ার ছেলে বসন্তপ্রসন্ন মধ্যেপাড়ার জমিদার ছিলেন। তিনিই শিল্পীর পাঠালেন অহল্যাবসুর স্টুডিওতে। পরে সতীশ সিংহ ও হরিপদ মজুমদারের কাছেও কিছুকাল শিল্পের পাঠ নিয়েছিলেন। কিন্তু কোন শিক্ষাতেই তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না। কোনো মডেলের দিকে বিছু ছবি নিয়ে। জামিনী রায় ছবি দেখে বললেন—পোর্ট্রেট সাহেবদের মত এঁকো না। নিজের মত আঁকো। নতুন পথ খোঁজার চেষ্টা কর।

কিন্তু পথ খুঁজে পাওয়া কি এত সহজ? তারওপর যত মত তত পথ। তবে চলতে লাগলেন আপনভিত্তির সঙ্গে। চার বছর দশ বছর পেরিয়ে গিয়ে তিনি অনুভব করলেন একক পথ। এবং পথ খুঁজে নিতে হলে মোটা দাগ নয়।

এই সময়কাল উল্লেখযোগ্য একটা পোর্ট্রেটের কথা বলা। তেল রঙে আঁকা প্রতিকৃতি। শিল্পী স্বয়ং অগ্রদেবীর। সম্ভবতঃ ১৯৪৪ সালে অ্যাকাডেমির প্রেসিডেন্সি তখনকার ব্রিটিশ গভর্নর বারোজ সাহেব ছবি কিনে নেন। শিল্পীর বাড়ীতে দুইংরুমে ফ্রেম আটকানো আলোকচিত্রটি দেখেছিলাম। কথা প্রসঙ্গে শিল্পী স্ত্রী মৃণালা দেবী প্রসঙ্গত বললেন—ইংরেজের সাহেবরা ছবি কিনলেও তাদের মনে হত এঁকা না। নিজের মত আঁকো। নতুন পথ খোঁজার চেষ্টা কর।

বিশ্বাস করতে ভুলে গেছে। কারণ প্রথম কয়েক বছর ছবির চোখে একটা চাপিয়ে পাখা বন্ধ করে [illegible] একটা সেলোফিন দিয়ে। এই সময়ের কথা বলতে শুরু করলে চোখে ঈষৎ হাসির ভাব ফুটে ওঠে। অগত্যা

শেষ হল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম পরে ঐ ছবির মর্যাদা দেখে এখন মনে হয় ভাগ্যিস ওনার কথামত বসেছিলাম!

অবুণা দেবীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শিল্পী সহাস্যে স্ত্রীর দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বললেন —শিল্পী হবার পথে চোদ্দ আনা অনুপ্রেরণা পেয়েছি ওর কাছ থেকে। সী ইজ মাই ইনসপিরেসন অ্যান্ড এনার্জী। গাইডিং ফোর্সও বটে। শিল্পী জীবনের চরম স্ট্রাগলিং পিরিয়ড ওর ভরসা সাহস ও উৎসাহবাণী আমাকে পথ চলতে সাহায্য করেছিল অনেকখানি।

শিল্পীদের সম্পর্কে জনশ্রুতি শোনা যায় তাঁরা নাকি ভীষন খেয়ালী। সুনীল-মাধব এর ব্যতিক্রম নন। তাঁর চলা-বলা পোষাক-পরিচ্ছদ সবই অন্যের থেকে স্বতন্ত্র। তাঁর স্ত্রীর কথা দিয়ে বলি—বাচ্ছা ছেলেরও অধিক। এত ইনোসেন্ট যে বলে বোঝান যায় না। ধরুন ফুলশয্যার রাতের কথা। রাত গভীর। আমি একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। তন্দ্রা কাটতে দেখি উনি পিট পিট করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। চোখা-চোখি হতেই লজ্জা পেয়ে বললেন—পাবস-পেকটিভ দেখছিলাম। ভাবুন ত নতুন বৌ হিসেবে তখন আমার কি মনের অবস্থা!

একদা যামিনী রায় এই নব দম্পতিকে এক পত্রে আশীর্বাদ করে লিখেছিলেন—অল্পে স্কুলে ছেলে পড়ে শুনলে মেয়ের বাপ মুখ বেঁকিয়ে চলে যায়। স্বামী ছবি আঁকে। স্ত্রীর সংগে সে বিষয়ে কোন যোগ নেই। এটাই এ দেশের বর্তমান সমাজ। আজ এই দম্পতিকে দেখে আনন্দ পেলাম। দেখা যাক শিল্পী সুনীলমাধব কতখানি সাহায্য পান তাঁর স্ত্রী কল্যাণীয়া অবুণার কাছ থেকে।

শ্রীযামিনী রায়
৪-১১-৫৩

যামিনী রায় আজ আর বেঁচে নেই। থাকলে সুখী হতেন। কল্যাণীয়া অবুণার শিল্প-প্রীতি ও স্বামীকে শিল্পকর্মে উৎসাহিত করা দেখে।

সুনীলমাধবের শিল্পীমানসে ভারত শিল্পের অবদান কম নয়। রাজপুত কিংবা মোঘল মিনিয়েচার তাঁর মনের অবচেতন নতুন রঙের রোশনাই এনে দিয়েছিল। আবার বাঁকুড়ার লোক শিল্প সংস্কৃতির শৈশব স্মৃতি বুকের বাবাদায় স্থায়ী হয় বাসা বেঁধেছিল। অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিল্পের রচনারীতি ও তার বিবর্তন শিল্পীর মনে গভীর ছায়াপাত করেছিল। এক কথায় বলতে গেলে দেশী ও বিদেশী চিত্রশৈলীর সামঞ্জস্যপূর্ণ অথচ সুন্দর সংমিশ্রণ সুনীলমাধবের চিত্রচেতনার প্রাণ। তবে মুখ্যত বাংলার লোকায়ত শিল্পের সৌরভই পাওয়া যায় তাঁর অধিকাংশ শিল্পের শরীরে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বৈত ধারার ঐকতানও শুনতে পাওয়া যায় স্তব্ধ; মাছ- রমনী; দুর্গা ইত্যাদি আরও অনেক চিত্রকলায়।

বিদেশী শিল্পীদের মধ্যে রেনি- রেম-ব্রান্ট- রুবেনস; এল গ্রেকো; ব্যাফেল; মদি-গ্লানি সুনীলমাধবের প্রিয় শিল্পী। এক সময়ে রেনি ওর ক্রিংপট্টা ও ব্যাফেলের মাডোনা এত সুন্দর রূপ করেছিলেন যে পাশাপাশি রাখলে বোধহয় কোনটি আসল কোনটি নকল বোঝা শক্ত হত। এদের দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছিলেন যথেষ্ট।

তবে কোন কিছুতেই দীর্ঘদিন আত্ম-তৃপ্তি পাননি। ১৯৬৭ সালের পর সুনীল মাধবের চিত্র রীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ছাপ সুস্পষ্ট। মূর্ত থেকে নিমূর্তের পথে পদচারণা করেছেন। পুরোপুরি এ্যাবস্ট্রাক্ট নয়। যেন চেনা-অচেনা দেখা-অদেখার লুকো-চুরি খেলা। অ্যাবস্ট্রাকট আর্ট সম্পর্কে শিল্পীর অভিমত হল এ ওয়ার্ক অফ আর্ট শুড বী এপ্রিসিয়েটেড বাই দোজ ফর হুম ইট ইস ইনটেন্ডেড। বাই পেন্টিং অ্যাব-স্ট্রাকটস আওয়ার পেন্টার আর বিগিং দেম-সেলভস আইসোলেটেড ফ্রম দি জেনারাল পাবলিক। প্রোফাইল বিউটি; সিটেড গার্ল; স্নেক চারমার; হেস্টি গার্ল প্রভৃতি ছবি দেখলে শিল্পীর এই মন্তব্যের তাৎপর্য বোঝা যায়। নুড স্টাডি হিসেবেও ছবিগুলো সার্থক ও সুন্দর।

সত্তর দশকের দোরগোড়ায় এসে সুনীল মাধব পিকাসোর কিউবিক ফর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। ফলে তাঁর চিত্রকলার গতি, ছন্দ ও বিন্যাসে রূপান্তর ঘটে। এই পর্যায়ের ছবির মধ্যে দি গোটস, ডান্সার, দি কিস; বার্ড-সেলার প্রভৃতির নাম মনে পড়ে আবার সেজান মাতিস ক্লী প্রভৃতি শিল্পীদের অংকন পদ্ধতির প্রতি শিল্পীর অপরিসীম শ্রদ্ধার ফলে এঁদেরও ছায়াপাত সুনীল-মাধবের চর্চায় অনুপস্থিত নয়।

তবে এসব প্রভাব একান্তই বাইরের। কারণ তাঁর শিল্প প্রেরণায় সবচেয়ে বেশী কাজ করেছে ভারতের সনাতন শিল্পের ঐতিহ্য ও প্রাচীন বাংলার লোকশিল্প। খাজুরাহো অজন্তা ইলোরা কিংবা কোনা-রকের শিল্প নিদর্শনের সন্ধান মেলে শিল্পীর চিত্রকর্মে। তবে কোন কিছুকেই তিনি হুবহু প্রয়োগ করেননি। দেশী বিদেশী চিত্রধারার সঙ্গে স্বকীয় সৌন্দর্য সুষমার সংমিশ্রণে এক নতুন রূপলোক সৃষ্টিতে প্রয়াস পেয়েছেন।

সুনীল মাধবের ছবির বৈচিত্র্য সম্পর্কে সবিস্তারে এই ছোট লেখায় সবকিছু ধরে রাখা সম্ভব নয়। তবুও সংক্ষেপে এ পর্যন্ত তাঁর কাজকে মোটামুটি তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। ১৯২৭—১৯৪৭ পর্যন্ত মূলতঃ প্রতিকৃতি অংকনের কাল। এবিষয়ে বেশ দক্ষও ছিলেন। উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ; আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র; সরোজিনী নাইডু, রাজা রামমোহন; বড়ে গোলাম আলি .....ইত্যাদি প্রতিকৃতির নাম করতে হয়। ১৯৪৮—১৯৫৮ পর্যন্ত ফ্রোক আর্টের ভেংগেচুরে নিজের মত করে বোর্ডের ওপর অজস্র অয়েলের কাজ করেছেন। বাউল, ওম্যান উইথ ফিস, মাদার উইথ চিল্ড্রেন, গার্ল উইথ পীচার; শিব পার্বতী, দুর্গা প্রভৃতি এই পর্বের তেলরঙের কাজও অসাধারণ। ১৯৫৮ সালের পর থেকে সদ্যতাকিত নিদর্শনগুলো ক্রমশঃই যেন ভারত শিল্প-শৈলীকে পাথেয় করে গড়ে উঠেছে। অলং-কারণ সমৃদ্ধ; বলিষ্ঠ রৈখিক বেষ্টনীতে এবং উষ্ণ লাল; হালকা বাদামী; শীতল সবুজ বা হালকা সাদার সমাহারে এসব চিত্রকলা রসোত্তীর্ণ। রেখাকে খেয়াল খুশীমত সাব-লীল গতিতে চলতে দিয়েছেন। কোথাও জড়তা নেই। ভাব বিনাস সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। তবে আগের চিত্রকর্মের বিষয় ছিল জীবন ও তার পরিমন্ডল। এখন শিল্পী জাগতিক জীবন থেকে আর এক জগতের যাত্রী। সে জগৎ দীপের আলো; ধূপের ধোঁয়া; পুষ্প সুবাস ও চন্দনের সুগন্ধে ভরা।

রাত ভোর হওয়ার আগে সুনীলমাধব বিছানা ছেড়ে যান স্টুডিও ঘরে। পূজায় বসেন নিমীলিত নেত্রে। অন্তরের অন্তঃস্থলে এক একদিন অনুভব করেন এক এক দেবতার অস্তিত্ব নতুন রসে, নতুন বর্ণে; নতুন রূপে। বেলাশেষে ঐ ধ্যানলব্ধ রূপকে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেন আত্মমগ্ন সাধনায় ক্যানভাসের বুকে ফুটে ওঠে দুর্গা শিব বিষ্ণু গণেশ জগন্নাথ কিংবা একান্নপীঠের চিত্র।

প্রশান্ত দা

সহজ ছন্দের হৃদয়স্পর্শী
কবিতার সংকলন

কাব্য সুষমা

ইন্দু দা

দাম—দশ টাকা
প্রাপ্তিস্থান : "কবিনিবাস"—"মমতা"
৫৯, পামার রোড, শান্তিনিবাস
উত্তরপাড়া, হুগলী

ওকে নিয়ে পাঁচ জন

মানবেন্দ্র পাল

টেবিলের ওপর চিঠিখানা রয়েছে। সামান্য চিঠি—বড়জোর ছত্রের চিঠি। পোস্টকার্ডে লিখলেই চলত। তবু চিরদিনের অভ্যাসমতো রমেন খামেই চিঠি লিখেছে।

অবশ্য চিঠি দেওয়ার সুযোগ দীর্ঘকাল ছিল না। কর্মজীবনের এই প্রান্তদেশে বিটায়ার করার মুখে হঠাৎ একটা বুড়োকর্মীর প্রমোশন বিনিময়ে রমেনকে কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হল দিল্লি। রমেনের ইচ্ছে ছিল বীথিকাকেও সঙ্গে নিয়ে যায়। কিন্তু বীথিকা রাজি হয়নি।

অগত্যা রমেনকে একাই চলে যেতে হল।

রমেন এবা গেল—কিন্তু বীথিকাকে একা রেখে যায়নি।

চমকে উঠল বীথিকা। তাড়াতাড়ি চিঠিখানা লুকিয়ে (লুকোবার কি সত্যি কোনো কারণ ছিল?) পিছন ফিরে তাকালো।

—কিছু বলছ?

—ও কিন্তু আজও টিফিন নিয়ে যায় নি।

—সেকী! তুমি দাওনি?

—দিয়েছিলাম বৌদি। কৌটোটা ব্যাগে ঢুকিয়েও রাখল। তারপর এখন দেখছি টেবিলের কোণে লুকিয়ে রেখে গেছে।

বীথিকা লক্ষ্য করল এই কথাটুকু বলতে বলতে ষোড়শীর অমন মুখখানি ব্যথায় ম্লান হয়ে গেছে।

অহীন কেন টিফিন নিয়ে যেতে চায় না তা বাড়ির সবলেই জানে। কিন্তু কী হাস্যকর ঘটনা। অফিসের বন্ধুরা ওর টিফিন কেড়ে খায়। এ ছেলেমানুষি তো স্কুলের ছেলেদের মধ্যেই ঘটে। বড়োরা কেউ করে? ওরা খাবার ক্যান্টিনে—তারাও তো টিফিন আনে। তবু মনে রাখছে বলে অহীনের টিফিনটাই কেড়ে খাবে নিশ্চয় ক্ষিধেয় জন্যে নয়। আসল কারণ অহীনকে ক্ষেপিয়ে তোলা।

এত লোক থাকতে অহীনকে ক্ষ্যাপানো কেন? নিশ্চয় অহীনের স্বভাবে চালে-চলনে এমন কিছু আছে যা ঠিক আর পাঁচজনের মতো নয়।

একথা মনে হলেই দুশ্চিন্তায় বীথিকার ঘুম হয় না। এইরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলেই বীথিকা লক্ষ্য করে ষোড়শীকে। তার মনে কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে—সেকি অহীনকে ধিক্কার দিচ্ছে মনে মনে? এই পৌরুষহীনতায় কোন স্ত্রীর না লজ্জা হয়?

কিন্তু বীথিকা অবাক হয়ে দেখেছে এইরকম ঘটনা শুনলে ষোড়শীর মুখটা ব্যথিয়ে ওঠে মাত্র। রাগ প্রকাশ পায় না। অহীনকে ধিক্কার দেবার বদলে উপদেশ দিয়ে বলে—তুমি মিশো না ওদের সঙ্গে।

না মিশলেও যে এদের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই ষোড়শী তা ভাবতে পারে না।

শেষপর্যন্ত বেচারি অহীন এই পথ নিয়েছে—টিফিন নিয়ে যায় না।

টিফিন না নিয়ে যে ওখানে কিছু কিনে খাবে সেও ওর দ্বারা হয় না। তার চেয়ে কিছু না খেয়েই কাটিয়ে দেবে সারাদিন। একি সহ্য করা যায়?

—বৌমা।

—যা—ই—

—কোথায় তুমি?

বীথিকা ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ধবধবে সাদা বেড়ালটাকে কোলে নিয়ে ষোড়শী আদর করছে।

ওকী! ওটাকে অত আদর দিয়ো না। শেষে ঘরে বাচ্চা দেবে।

ষোড়শী বেড়ালটার গায়ে গাল ঘষে দ্বিগুণ আদর করে বললে বেশ তো—ভালোই তো। দিক আমার ঘরে বাচ্চা।

বীথিকা মনে মনে হাসল। এও এক পাগল মেয়ে। কে বলবে হায়ার সেকেন্ডারি পাস। কে বলবে বয়েস বুড়ি ছাপিয়ে গিয়েছে!

—শোনো বৌমা টিফিনটা দিয়ে রাঙাদাকে ওর অফিসে পাঠাও। তাড়াতাড়ি থাক লইলে টিফিন আওয়ার শেষ হয়ে যাবে।

ষোড়শী এগিয়ে এসে বললে ওকে আপনি বলুন মা। আমি বললে শুনবেন না। উল্টে ধমকাবেন। আমি বরঞ্চ ডেকে দিচ্ছি।

বলেই ডাকতে ডাকতে ছুটল—রাঙাদা রাঙাদা—

রাঙাদা! আশ্চর্য! বীথিকা রাঙাদা ডাকে, রমেন রাঙাদা ডাকে, অহীন রাঙাদা ডাকে অতএব ষোড়শীকেও রাঙাদা ডাকতে হবে। রাঙাদা অবশ্য এ নিয়ে এতটুকু মাথা ঘামায় না। সে আছে আপনার জগতে আত্মহারা হয়ে।

বীথিকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

রাঙাদা এদের নিজের কেউ নয়। তার আসল নাম বিভাস। বীথিকা যখন ক্লাস সেভেনে পড়ে তখন ঘটনাচক্রে মা-বাপমরা আশ্রয়হীন ছেলেটি এসে পড়ে বীথিকার বাবার কাছে। ছেলেটি তখনকার দিনে ম্যাট্রিক পাস—ফার্স্ট ডিভিসনে। পয়সার অভাব আর পড়াশোনা করতে পারেনি। তাছাড়া ভালো গাইতে পারত—আর বেহালায় ছিল পাকা হাত।

বীথিকার বাবা সেদিন বিভাসকে আশ্রয় দিয়েছিলেন নিজের খরচে কলেজেও পড়িয়েছিলেন। বিনিময়ে বিভাস পড়াত আর গান শেখাত বীথিকাকে।

তারপর বীথিকা বড় হল। বি-এ পাস করল।—বিয়েও হয়ে গেল। বিভাসের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। যেহেতু স্বদেশী ছিল বলে চাকরি জোটাতে পারেনি। তাই

বীথিকার বাবা একরকম দয়া করেই তাকে ছেড়ে দিলেন না। বিভাস থেকে গেল এই সংসারেরই একজন হয়ে। থায়দায় থাকে, আর টিউশনি করে হাতখরচা চালিয়ে নেয়। সংসারের যেটা সবচেয়ে অনাসৃষ্টি কাজ - ছোটাছুটি আনাআনি কোর্টকাছারি থানা-পুলিশ করা কিম্বা ডাক্তারবদ্যি ডাকা সেইসব কাজেরই ঝক্কি রাঙাদা স্বেচ্ছায় তুলে নিল। বাকি সময় কাটে রাজনীতি করে।

হায়রে। কোথায় গেল সেই রাজকুমারের মতো চেহারা—কোথায় গেল গান—কোথায় গেল বেহালাখানা! সব খুইয়ে এখন রাজ নীতির বসে বুঁদ হয়ে আছে। তবু মাঝে মধ্যে ডাক নেই—নিমন্ত্রণ নেই, রাঙাদা চলে আসে বীথিকার এখানে। সকলেই খুশী হয়। সবচেয়ে খুশী হয় বোধহয় রমেন। বাড়ি আগলাবার ভারটা ভার ওপর দিয়ে বীথিকাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

—ডেকেছ?

থমথমে গলায় রাঙাদা জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ ঘুমুচ্ছিলে নাকি?

ঘুমোবার কি উপায় আছে? যা হাঁক-ডাক।

বীথিকা মুখটিপে হাসল।

অহীন তো আজও টিফিন ফেলে গেছে।

—ও পাগলের কথা বাদ দাও।

—না ও পাগল নয়; ওকে পাগল করে তোলা হচ্ছে। বুঝেছ?

—আচ্ছা তাই না হয় মানলাম। এখন বলো কী করতে হবে। টিফিনটা ওর অফিসে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে বোধহয়?

বীথিকা সসঙ্কোচে বললে তুমি আছ বলেই বলতে পারছি। নইলে আর কে আছে? শুধু আমরা দুটি মেয়ে—।

বিভাস কড়া রোদের দিকে ছোট ছোট চোখে তাকিয়ে নিয়ে যেন স্বগতই বললে, এই রোদে। —আচ্ছা দেখি।

বলে একান্ত অনিচ্ছায় টিফিন বক্সটার সন্ধানে ষোড়শীর কাছে গেল।

যাক আপাতত সমস্যার সমাধান। টিফিন পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ষোড়শীও বোধহয় নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়েছে। বীথিকাও এবার নিশ্চিন্ত হয়ে চিঠিটায় মন দেয়।

আহা বেচারি রমেন। চিরকাল একসঙ্গে থেকে আজ এই প্রৌঢ় বয়েসে একলা থাকতে হচ্ছে সুদূর দিল্লিতে। কেন যে সে রমেনের সঙ্গে গেল না। রমেন কি তা এতটুকু আঁচ করতে পেরেছে? কক্ষণো না ওতো বোকার মতো জিজ্ঞেস করেছিল—ছেলে-বৌকে ছেড়ে যেতে বুঝি ইচ্ছে করছে না?

আবার অভিমান করে বলা হল—আমার চেয়ে এখন ওরা তোমার বেশি আপন।

এমনও বললে তুমি ওদের ছেড়ে থাকতে পারছ না কিন্তু ওরা হয়তো মনে মনে চায় আমরা কেউ না থাকি। ওরা ওদের মতো করে থাকবে।

শুনে রাগও হয় হাসিও পায়। কিন্তু তবু কিছু বলেনি বীথিকা। বুঝবে না। বীথিকা চিঠিটা আবার পড়ল। সেই এক কথা—ভালো লাগছে না—ভালো লাগছে না। তোমাদের নিয়ে সব সময়েই চিন্তা করি। পত্রপাঠ উত্তর দিয়ো।

শেষটুকু কিন্তু অন্যরকম।—শরীর ভালো নেই। প্রেশারটা আবার খেয়ালিপনা শুরু করেছে। দুরাত ঘুমোতে পারিনি। ভাবছি ছুটি নিয়ে চলে যাই। কিম্বা একেবারেই ইস্তফা।.....

চিঠির এই অংশটুকুই ভাবনার। তারপর পুনশ্চ দিয়ে আর-একটু লেজুড়—বাণী মুর্শিদাবাদে দেশের বাড়িতে যাবে। কলকাতায় তোমার ওখানে দুদিন আতিথ্য নেবে। ওর হাত আমার বায়োকেমিকের ওষুধগুলো পাঠিয়ে দিতে ভুলো না—একান্ত তুমি নিজে যদি নাই আস।.....

এমনি সময়ে একটা হৈ-চৈ কানে এল। কার গলা? অহীনের না? অহীন কি। আজও টিফিন পালিয়ে এল?

—ষোড়শী—ষোড়শী— এই দেখো কাকে এনেছি।

ষোড়শী দেখার আগেই বীথিকা নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পর্দার আড়ালে দাঁড়াল। দেখল অহীন কে এক ভদ্রলোকের হাত ধরে টানতে টানতে একেবারে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। ইস! মেয়েটাকে ভালো করে কাপড়-চোপড় ঠিক করে নেবার সময়টুকু পর্যন্ত দেয়নি। ইডিয়ট।

—এই দেখো আমার সেই সমরদা। এর কত গল্প তোমার কাছে করেছি বলো।

সমর দুহাত তুলে নমস্কার করল। ষোড়শীও হেসে প্রতি নমস্কার করল।

আশ্চর্য। বৌমা হাসতে পারল? না না ওর হাসা উচিত হয়নি। অন্তত সে নিজে হলে তো কিছুতেই হাসতে পারত না। বলা নেই কওয়া নেই এরকম হঠাৎ বেডরুমে ঢোকা!

অহীন বললে একী দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

বলে সমর্থনের আশায় ষোড়শীর দিকে তাকালো। ষোড়শীও হেসে বললে, বসুন না।

সমর বললে, আমরা বরঞ্চ বাইরের ঘরে বসে কথা বলি চলো।

অহীন চেঁচামেচি শুরু করে দিল।—এখানে বসতে আপনার আপত্তি কি? আমাদের অমন পর ভাবছেন কেন? কোনো সঙ্কোচের দরকার নেই। আমার ওয়াইফ খুব ফরোয়ার্ড। ও ওসব কিছুই মনে করে না। নিন বসুন।

সমর তবু ইতস্তত করে খাটের এক-পাশে বসে বললে, তার জন্যে নয়। বিজনেস টক হবে। সেটা কি ওর ভালো লাগবে?

অহীন বললে, খুব লাগবে। হায়ার সেকেন্ডারি পাস মেয়ে।—পার্টনার অফ লাইফ। ওরও পরামর্শ চাই।

পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে বীথিকা জ্বলতে লাগল।—ফরওয়ার্ড! স্বামী যে টিফিন খায়নি সেদিকে পর্যন্ত হুঁশ নেই। বসতে বলল—অমনি বসে পড়ল দুজনের মাঝখানে। কী বাহার ছিরি! যেন থিয়েটারে রিহার্সাল দিচ্ছে।

বীথিকা আর থাকতে পারল না। ঘরে ফিরে গিয়ে যেন কিছুই জানে না এইভাবে ডাকল—অহীন— অহীন—

অহীন ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘরে এসে ঢুকল।

—ডাকছ?

হ্যাঁ, ডাকছি।

—অত ছটফট করছ কেন? ঐ ছেলেটি কে?

—চেন না? সমরদা।

—না, চিনি না। কিন্তু যেই হোক ভেতরের ঘরে কেন?

অহীন মহাকোলাহল তুলে বললে বাঃ রে! ও যে সমরদা। আমি যখন কলেজে পড়তাম তখন উনি পড়তেন এক ক্লাস ওপরে। আজ রাস্তায় হঠাৎ দেখা।

—রাস্তায় দেখা বলেই অফিস কামাই করে বাড়ি এনে একেবারে ঘরে তুলতে হবে? সময় নেই—অসময় নেই!

—না না তুমি বুঝতে পারছ না মা, বিজনেস টক। সমরদা আমায় ওর বিজনেসের পার্টনার করতে চায়। এ তো গোল্ডেন অপরচুনিটি।

—বেশ তো। তা বলে শোবার ঘরে?

অহীন স্খলিত স্বরে বললে সমরদা তো নিজের লোকের মতো। তাছাড়া ষোড়শীও আলাপ করুক। ওরও পরামর্শ দরকার।

বীথিকা একটু আদেশের সুরেই বললে যা খুশি কর কিন্তু বেডরুমে বসে নয়। বাইরের ঘর নিয়ে গিয়ে বসাও।

অহীন একটু অপ্রসন্ন মুখেই আদেশ পালন করতে চলে যাচ্ছিল বীথিকা ডেকে বললে, আর বৌমাকে একটু ভেতরে পাঠিয়ে দাও।

ষোড়শী ভেতরে এলো।—মা!

—কে না কে বাইরের লোক—তার সামনে অমন জাঁকিয়ে বসে গল্প করা কী?

ষোড়শী পড়া-তৈরি-না-করা মেয়ের কৈফিয়তের মতো বলল আমি কী করব? ও-ই তো ভেতরে এনে বসালো।

বীথিকা বললে তোমার উঠে আসা উচিত ছিল।

—আমি তো উঠেই আসতে চেয়েছিলাম ও-ই বললে বৌমা পরামর্শ আছে।

উঠে আসবার ইচ্ছেটা যে কতখানি মিথ্যে তা বীথিকার অজানা ছিল না। কী একটা বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ কানে এল অহীন বলছে—চলো সমরদা বাইরের ঘরে গিয়ে বসি। মাতো আবার কনসারভেটিভ মানুষ!

ইস। বীথিকার দুকান লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

—বৌমা—বৌমা—ঐ দেখো অহীন কী কাণ্ড করে বসল। ওকে চুপিচুপি বললাম বাইরের ঘরে বসাতে—সেতো সাত-বাহন করে বলে আমার মুখেপাত করে সমরকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বাইরের ঘরে বসাতে। তুমি যাও—শিগগির গিয়ে ওকে ভেতরেই বসাও যেন ভদ্রলোক কিছু বুঝতে

না পাবেন। তারপর চা জলখাবারের ব্যবস্থা করো। অহীনও তো কিছু খায়নি।

আদেশ করেই বীথিকা নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল।

—এই তো অবস্থা! দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে স্বগতোক্তি হল।—বৌটা সত্যিই ছেলেমানুষ। দেখো কী খুশী হয়ে সমরবাবুকে আবার ঘরে ডেকে বসাচ্ছে। এই খুশীটা মৌখিক হলে বীথিকা নিজে খুশী হত।

আসলে মেয়েটা ছেলেদের সঙ্গে মিশতে ভালোবাসে। সে যে বাড়ির বৌ এটা ভুলে যায়। কিন্তু এটা কি উচিত?

এমন তো প্রায়ই ঘটে। এই তো সেদিন হৈ হৈ করে দুটো বন্ধু নিয়ে ঘরে ঢুকল।—ষোড়শী—ষোড়শী— চট্ করে রেডি হয়ে নাও। সিনেমায় যাব।

শুনে বীথিকা চমকে উঠেছিল। কাদের সঙ্গে সিনেমায় যাবে বৌমা? ঐ ছেলে-দুটোর সঙ্গে? ওরা তো ঐ মোড়ের চায়ের দোকানটায় দিনরাত আড্ডা দেয় আর খিস্তি করে।

সেই ছেলেদুটোকে নিয়ে অহীন ঢুকল একেবারে বেডরুমে। আর কী আশ্চর্য—বৌমা দিব্যি হাসিমুখে তাদের অভ্যর্থনা করল।

বীথিকা পর্দার আড়াল থেকে লক্ষ্য করতে লাগল।

—কী বই গো?

—ও বাবা! বউ তো সিনেমায় যাবার জন্য পা বাড়িয়ে রয়েছে।

—যে বইই হোক। তাড়াতাড়ি রেডি হও। সময় নেই।

তার মানে—ভালো বই বলে দেখতে যাওয়া নয় অন্ধকার ঘরে কিছুক্ষণ বৌ আর এয়ার বন্ধুদের নিয়ে বসে থাকার জন্যেই যাওয়া!

ষোড়শী খুব ব্যস্ত হয়ে বলল, দাঁড়াও, আগে মাকে বলি।

অহীন বললে, একেবারে রেডি হয়ে মাকে বোলো। তাহলে আর মা আপত্তি করবে না।

শুনে ছেলের ওপর রাগে বীথিকার গা জ্বলে উঠল।

—না, তা হয় না! তাতে মা আরো রাগ করবেন। আর মা শুধু শুধু আপত্তি করবেনই বা কেন?

ঐ নাচতে নাচতে মেয়ে এগিয়ে আসছে। বীথিকা তাড়াতাড়ি পর্দার কাছ থেকে সরে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

সিনেমায় যেতে দিতে আপত্তি নেই, কিন্তু তা বলে ঐ দুটো বাজে ছেলের সঙ্গে? হ্যাঁ, অহীনও যাবে ঠিকই। কিন্তু অহীনের তো কাণ্ডজ্ঞান নেই। তার স্ত্রী যে কত 'ফরওয়ার্ড' তা প্রমাণ করবার জন্যে হয়তো নিজে বৌয়ের পাশে না বসে দু বন্ধুকে ছেড়ে দেবে। ভাবতেও বীথিকার সর্বাঙ্গ আতঙ্কে শিউরে উঠল।

—না, কোনোমতেই এদের সঙ্গে সিনেমায় পাঠান যায় না।

—মা!

ঐ এসেছে।

—এসো। কঠিন মুখে বীথিকা উঠে বসল। ষোড়শী ঘরে ঢুকে সসংকোচে বললে, ও বলছে সিনেমায় যেতে।

—আর কে যাবে?

ষোড়শী এক নিশ্বাসে বললে, ভোম্বল আর টগা। ভুরু কুঁচকে উঠল বীথিকার।—ওরা আবার কে?

—ওরা ওর 'টি ক্লাবের' বন্ধু।

—তুমি চেন?

ষোড়শী মাথা দুলিয়ে হেসে বললে, হ্যাঁ। আপনিও চেনেন। ঐ তো মোড়ের চায়ের দোকান—ওইটেই 'টি ক্লাব'। ওখানেই এরা সবাই চা খায়।

বীথিকা গম্ভীরভাবে বললে, না, আমি চিনি না! কোন চায়ের দোকানে কারা চা খায় তা আমি লক্ষ্য করি না।

খোঁচাটা ঠিক জায়গায় বিঁধল কিনা বীথিকা বুঝতে পারল না।

সে ছেলেমানুষের মতো আবদার করে বললে, যাই মা।

এমনভাবে বললে যে বীথিকা আপত্তি করতে পারল না। ভাবল যাক গে সবুক গে—সঙ্গে না হয় সে নিজেও যাবে। তা হলে আর ভাবনা থাকে না। কিন্তু সে প্রস্তাব দিতে ভারি লজ্জা করল। তার আর যাওয়া হল না।

মহাখুশী হয়ে ষোড়শী চলে যাচ্ছিল বীথিকা ডেকে লজ্জার মাথা খেয়ে আকুল স্বরে বললে, শোনো বৌমা, এমনভাবে বোসো যাতে কেউ কিছু ভাবতে না পারে।

ষোড়শী এত সহজেই মাথা নেড়ে সায় দিল যে, এ ব্যাপারে কিছুমাত্র গুরুত্ব দিয়েছে তা মনেই হল না।

তারপর চলল সাজের ঘটা। বীথিকা দেখতে লাগল—আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কতরকম ভঙ্গি করে শাড়ি পরছে। কিছুতেই যেন পছন্দ হচ্ছে না। তারপর টিপ আঁকার পালা। শাড়ির সঙ্গে কোন টিপ ম্যাচ করবে সে যেন কিছুতেই বুঝতে পারছে না।

বীথিকার কেবলই খচখচ করতে লাগল—এই যে নিজেকে এত সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা এর প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যটা কি? বাইরে যখনই বেরোয় তখনই কি এমন ঘটা করে সাজে?

বলতে গেলে এখন বীথিকার কাজ হয়েছে পাহারা দেওয়া। চঞ্চল কুমারী মেয়েকে পাহারা দিতে হয় অনেক ম্যাকে, অল্পবয়সী বৌদেরও তাদের স্বামীর অবর্তমানে শাশুড়িকে অনেক সময়ে লক্ষ্য রাখতে হয়। কিন্তু একটি শিক্ষিত বধূর ওপর তার স্বামীর উপস্থিতিতেই লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে এমন দুর্ভাগ্য বোধ হয় বীথিকা ছাড়া আর কোনো শাশুড়ির হয় না।

অথচ ষোড়শী সত্যিই হয়তো খারাপ মেয়ে নয়। তার সবচেয়ে দুর্বলতা হচ্ছে তার সরলতা। আর সেই সরলতার সুযোগ নেবার মতো দুর্বৃত্তের অভাব তো নেই। কতকগুলো পরিস্থিতি আছে যেখানে মেয়েদের তাকে স্বীকার করেও মেয়েদের শক্ত হতে হয়। সেরকম শক্ত হবার ক্ষমতাটুকুও বোধহয় ষোড়শীর নেই। আবার, দরকার হলে ভদ্রতাকে খাটো করেও স্বামীদের হুঁশিয়ার হতে হয় স্ত্রী সম্বন্ধে। অহীনের মেরুদণ্ডও সেরকম শক্ত নয়। নইলে কেউ স্ত্রীর সঙ্গে রঙ খেলার জন্যে বন্ধুকে নেমন্তন্ন করে এনে জোর করে ঢুকিয়ে দেয় নিজের ঘরের ভিতর?

হ্যাঁ, তেমন ঘটনাও ঘটেছিল গতবার। তারপর যখন বীথিকা ধমক দিল তখন হুঁশ হোড থামল। নইলে রঙ মাখামাখি করতে করতে কতদূরে—

যাক সে কথা। এইতো সংসারের চেহারা। এই সংসার থেকে তার মুক্তি আছে? এসব খবর রমেন কোনোদিন রেখেছে? চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও রমেন কিছুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে বলেছে—তোমার যত সব আজগুবি কল্পনা।

আজগুবি কল্পনা! ঐরকম বাপ বলেই ঐরকম ছেলে হয়েছে।

রানা এল দিল্লি থেকে। রানাকে দেখে বীথিকা অবাক হয়ে গেল। সেই দেওবাটি এত বড়ো হয়ে গিয়েছে! বাংলাদেশের বাইরে থাকে বলেই চেহারায় একটা কাঠিন্য আছে—বাঙালি ছেলের মতো নরম নরম নয়। তার ওপর রঙটা যেন ফেটে পড়ছে।

সবচেয়ে খুশী ষোড়শী। সে এত খুশী হয়েছিল যে প্রথম প্রথম রানার সঙ্গে কথা বলতেই পারত না। শুধু মুখে চোখে দেখত। সম্পর্কে রানা তার কাকা। তাই প্রথম প্রণামটি সেরে যখন ষোড়শী পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় রাখল তখন তার মুখে যে একটি তৃপ্তি আর আনন্দ ফুটে উঠেছিল বীথিকার তা লক্ষ্য এড়ায় নি। অহীনকেও তো সে প্রণাম করেছে—কিন্তু সে যেন দায়সারা গোছের। তারপর দুটো দিন না যেতেই ভাব হয়ে গেল দুজনের। রানা যেমন উচ্ছল, চঞ্চল ষোড়শীও তেমনি। দিনরাত শুধু কাকু—কাকু—কাকু—

রানাও বেশ জমে গেছে মনে হল। কথা ছিল—দুদিন থেকে রানা মুর্শিদাবাদ চলে যাবে। কিন্তু দুদিন ছেড়ে চার দিন হয়ে গেল রানার যাবার নাম নেই। রানা যেতে চায়—ষোড়শী বড়ো বড়ো চোখে সব আন্তরিকতাটুকু ঢেলে পথ আগলে দাঁড়ায়। —না, আর একটা দিন থাকতেই হবে।

তা থাকুক। কিন্তু বীথিকার খচখচ করে যখন দেখে, সারা দুপুর ষোড়শীর ঘরে রানা গল্প করছে। এত কী গল্প! বীথিকা কতবার রানাকে বলেছে একটু ঘুমিয়ে নিতে।

রানা হেসে বলেছে, আমার ঘুমটুম আসে না বৌদি।

—বৌমা, একটু বিশ্রাম করো। তোমার তো দুপুরে একটু গা গড়িয়ে না নিলে শরীর ভালো থাকে না।

শাশুড়ির আদেশে ষোড়শী দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়ে। ঠিকই কিন্তু আধঘণ্টাও যায় না—বীথিকা দেখে ষোড়শীর ঘরে কখন রানা গিয়ে নিঃশব্দে লুডো খেলা শুরু করে দিয়েছে। রানাই

গিয়েছে, না ষোড়শীই ডেকে এনেছে কে জানে!

বলার কিছুই নেই—রানা নিজের লোক। একেবারে এদের 'কাকু'। বলা যায় না কিছুতেই নির্বিবিলি দুপুরে সমান-বয়সী ষোয়ান ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে থাকা অশোভন।

কিন্তু এর চেয়েও জটিল সমস্যা দেখা দিল দুদিন পরে।

রানা বললে, তোমরাও আমার সঙ্গে দেশের বাড়ি থেকে ঘুরে আসবে চলো।

ষোড়শী আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

—অমন লাফালেই চলবে না। সত্যি যেতে হবে। কী বল অহিনচন্দ্র?

—না—না যাবই আমরা।

—তুমি? রানা চোখের একটা বিশেষ ভঙ্গি করে তাকাল ষোড়শীর দিকে।

ষোড়শী বললে, আমি তো যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে আছি। আপনি মাকে রাজি করান।

—হ্যাঁ, নিশ্চয় রাজি করাব।

রানা এসে বৌদিকে বলল। বীথিকার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। এই মুহূর্তে কী যে উত্তর দেবে বুঝতে পারল না।

—না না মুখটা তুমি অমন কোরো না প্লিজ।

বীথিকা অতি কষ্টে হাসবার চেষ্টা করে বললে, তোমার সঙ্গে ওরা যাবে তাতে আমার আপত্তি করার কী থাকতে পারে? তবে অহীনের তো এখন ছুটি-টুটি নেই—

—সে ও ম্যানেজ করবে বলেছে।

বীথিকা এবার কী বলবে ভেবে পেল না। ঢোক গিলে বললে, তা ছাড়া ওরা চলে গেলে বাড়িতে আমাকে একা থাকতে হবে। যা দিনকাল তাতে—

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ বললে, কেন রাঙাদা তো রয়েছেন।

সামান্য কথা—যথার্থ কথা—তবু কেন যে বীথিকা থতমত খেয়ে গেল ওরা তো তা বুঝতে পারল না।

সেই সুযোগে রানা বলে উঠল, প্লিজ বৌদি, পারমিশান দাও। কালই আমরা স্টার্ট করি।

হঠাৎ বীথিকা বলে ফেলল, তবে চলো আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই।

বলেই বীথিকা একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল। কেননা এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে তারা নিশ্চয় এতদূর খুশী হবে যে শেষ পর্যন্ত তার আর পিছিয়ে আসা চলবে না।

কিন্তু আশ্চর্য—তার যাবার কথাটা বলা মাত্র ওদের উৎসাহে কেমন যেন ভাটা পড়ে গেল।

রানা জোর করে হাসি টেনে বললে, বেশ—বেশ—তাহলে তো খুবই ভালো হয়।

বীথিকা মাথা নেড়ে খনখনে গলায় বললে, পাগল! আমার আবার যাওয়া! বলেই অন্য ঘরে চলে গেল।

অগত্যা রানাকে একলাই মুর্শিদাবাদ যেতে হল। শেষ চেষ্টা করেছিল ওদের নিয়ে যাবার জন্যে। পারে নি। যখন রানা পরিষ্কার জানতে চেয়েছিল ওদের যেতে না দেওয়ার আসল কারণটা কি তখন অগত্যা বীথিকাকে একটি মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। রানার কানে কানে বলেছিল, ওর বাচ্চাকাচ্চা হবে কিনা সেইজন্যে এখন নড়াচড়া ঠিক হবে না।

তারপর সাবধান করে বলেছিল, দেখো একথা আবার ষোড়শী জানতে না পারে। ছেলেমানুষ—নার্ভাস। শুনলে আরো নার্ভাস হয়ে যাবে।

যাক, এ যাত্রাতেও খুব ঠেকানো গেছে। কিন্তু এমনি করে কতদিন—আর কতদিন? ভগবান কবে এদের বুদ্ধিসুদ্ধি দেবেন?

এমনি সময়ে এল টেলিগ্রাম দিল্লি থেকে। রমেন গুরুতর অসুস্থ। এখনি রওনা হতে হবে।

বীথিকা স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিন্তু ভাবনার সময় নেই। যে দিল্লিতে যাবার জন্যে রমেন সেই প্রথম থেকে জোর করছিল আজ বাধ্য হয়ে বীথিকাকে সেখানে যেতেই হবে। কিন্তু—

কিন্তু এই দুই নাবালক-নাবালিকার কী হবে?

ভাবতেও শিউরে উঠল বীথিকা। অহীনের সেই সমরদা ইতিমধ্যে দুদিন ঘুরে গেছে, টি ক্লাবের সভ্য দুটি হয়তো সিনেমা দেখার রিটার্ন দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, রানা বোধহয় দেশের বাড়ি থেকে কলকাতায় ফিরবে দু-একদিনের মধ্যেই।

সব সত্য—সব সত্য—সবই সম্ভব। কিন্তু উপায় নেই। বীথিকাকে যেতেই হবে।

অবশেষে ছেলেকে, বৌকে সব বুঝিয়ে, নিজেদের কর্তব্য-দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে এবং বিভাসের মতো আত্মভোলা মানুষকেও একটু বিশেষ নজর রাখার অনুরোধ করে বীথিকা যাত্রা করল।

ট্রেন ছাড়তে আর বেশি দেরি নেই। বীথির মনটা ছটফট করছে। একদিকে রমেনের অসুখের চিন্তা, অন্যদিকে চিন্তা নির্বুদ্ধি ছেলে আর বৌটাকে নিয়ে।

এমনি সময়ে প্ল্যাটফর্মের ওপর থেকে কে যেন ডাকল—বীথি।

চমকে উঠল বীথিকা। দেখল বিভাস হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়িয়েছে।

—রাঙাদা! কী ব্যাপার?

বিভাস একটা কাগজের প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বললে, তোমার স্কার্ফটা।

—স্কার্ফ! স্কার্ফ কী হবে?

—বুঝতে পারছ না দিল্লিতে এখন ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। তোমার তো, আবার একটুতেই ঠাণ্ডা লাগে।

প্যাকেটটা দিয়েই উত্তরের অপেক্ষা না করে বিভাস যেমন এসেছিল তেমনি হুড়মুড় করে চলে গেল।

যে মানুষটার কথা দিনান্তে একটিবারও মনে পড়ে না—মন যখন আজ নানা সম্ভব-অসম্ভব ব্যাপারে ক্ষতবিক্ষত তখন হঠাৎ সেই মানুষটারই এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব বীথিকার সব চিন্তাভাবনাকে ওলোট-পালোট করে দিল।

দূরে - ক্রমশ - অদৃশ্য - হয়ে - যাওয়া বিভাসের সেই শীর্ণ তীক্ষ্ণ চেহারাখানির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বীথিকা যেন নিজের সঙ্গে থা বলে উঠল—আশ্চর্য! আশ্চর্য!

মনে পড়ল অনেদিন আগের এক-একটি কথা। এই মানুষটার সঙ্গে তাকে জড়িয়ে সেদিন সংসারে কী প্রচণ্ড অশান্তি দেখা দিয়েছিল। বিভাস ছিল তাদের আশ্রিত। কিন্তু বীথিকা তাকে বাইরের লোক বলে মনে করত না। সে যেন ছিল তার নিজেরই রাঙাদা। কতদিন—কত নির্জন দুপুরে তাদের দুজনের কেটেছে নির্বিবিলি পড়ার ঘরে। এটা মা ভালো চোখে দেখতে পারতেন না। তিনি কেবলই ভয় পেতেন। ভাবতেন অনাত্মীয় এই ছেলেটির সঙ্গে অবাধ মেলামেশার পরিণতি একদিন ভয়ংকর হয়ে দাঁড়াবে। তাঁর ধারণা ছিল—মেয়ে তাঁর খুবই সরল সহজ। প্রয়োজনের সময়ে শক্ত হতে পারবে না। সেই জন্যে তিনি এমনও চেয়েছিলেন যেন বিভাস চলে যায়। বিভাসকে চলে যেতে হতই। শুধু ব্যবার জন্যই বিভাসের যাওয়া হয়নি। তিনি এমনভাবে বিভাসকে আঁকড়ে থাকতেন যাতে এইসব তিক্ততা তাকে স্পর্শ পর্যন্ত না করে।

তারপর কত বাচ্ছরই তো কেটে গেল। সেই বিভাসও রয়েছে—সেও বদলেছে। কোনো মালিন্য কি স্পর্শ করেছে তাদের? তারা নিজেদের যতটা জানে তার চেয়ে বড়ো প্রমাণের তো দরকার নেই। ক্ষয় হয়েছে বাবার মহত্ত্বেরই।

শুধু বাবা কেন? রমেন? সে তো আরো দূরের মানুষ। একটা দিনও কি সে বিভাসকে 'রাঙাদা' ছাড়া আর কিছু ভেবেছে? সেও তো জানত কতদিন একই ছাদের নীচে ওরা দুজনে একসঙ্গে সময় কাটিয়েছে যখন হয়তো বাড়িতে আর তৃতীয়জন কেউ ছিল না তাদের ওপর নজর রাখার।

হাই বীথিকা আবিষ্কার করল অনেক ব্যতিক্রম সত্ত্বেও প্রথম যৌবনের বীথিকা আর আজকের নোডশী বোধহয় একই চরিত্রের। যেমন তার মা আর আজকের বীথিকার মধ্যে প্রভেদ নেই এতটুকু।

ট্রেন ছেড়ে দিল। ভারমুক্ত মন নিয়ে বীথিকা খোলা জানলা দিয়ে আজ অনেক দিনের পর আকাশের দিকে তাকাল। কেমন আকাশটা অনেক উঁচু—অনেক নির্মল—অনেক উদার।

অঙ্গনা

বিবাহ বিচ্ছেদ \ ভরনপোষণ

প্রাচীনকালে হিন্দু বিবাহকে পবিত্র সংস্কার হিসেবে মনে করা হতো। এই সংস্কার বিবাহবন্ধনকে কঠিন সুতোয় বেঁধে রাখতো। সে সূত্র ছিন্নভিন্ন হওয়ার কথা পর্যন্ত কেউ চিন্তা করতে পারত না। বাবামা স্বামী-পুত্র ছাড়া নারীর অন্য কোন অবলম্বন ছিল না। এদের নিয়েই গড়ে উঠত মেয়েদের ভবিষ্যৎ। পিতা ও পুত্রের স্নেহ ও ভক্তি এবং স্বামীর ভালবাসা মেয়েদের সামাজিক জীবনকে সুস্থ ও সুন্দর করে তুলত। বিশেষ বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া নারী-স্বাধীনতার কথা শাস্ত্রকারেরা পর্যন্ত চিন্তা করতেন না। তবে মহিলারা যাতে স্বামীর অবর্তমানে অসহায় অবস্থার সম্মুখীন না হন সেজন্য বিভিন্ন সময় মেয়েদের অর্থ ও সম্পত্তির অধিকার নিয়ে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইন সবসময়েই যে খুব কার্যকরী হতে পেরেছে তা নয়। কার্যকরী করার নানারূপ প্রতিবন্ধকতা এসে পড়েছে। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে হাজার হাজার বছর আগে থেকে 'স্ত্রীধন' কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই শব্দটি নিয়ে টীকাকারদের মধ্যে নানা-রকম বাকবিতন্ডার সূত্রপাত হয়েছে। কিন্তু মিতাক্ষরা ও তাঁর ভাষ্যকার বিজ্ঞানেশ্বরের মতে সেই ধন-ই 'স্ত্রীধন'—যা মেয়েরা পান বাবা মা স্বামী অথবা ভাইদের কাছ থেকে। মামাবাড়ী থেকে পাওয়া অর্থ কিংবা বিবাহের সময় যজ্ঞের প্রাক্কালে যে উপহার দেওয়া হয় অথবা দ্বিতীয়বার বিবাহের ক্ষেত্রে যে অর্থ কন্যাকে দেওয়া হয়ে থাকে তাও 'স্ত্রীধনের' অন্তর্ভুক্ত। মোটামুটিভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া কেনা সম্পত্তির ভাগ দখল ও অন্যান্য সূত্রে পাওয়া সব মিলিয়েই হচ্ছে এই স্ত্রীধন যার ওপর ভিত্তি করে স্ত্রীলোকের অর্থনৈতিক অধিকার, প্রতিষ্ঠা ও সম্মান দাঁড়িয়ে আছে। ১৯৫৬ সালে বিবাহ আইন পাশ হওয়ার ওপর অবশ্য এই স্ত্রীধন শব্দটির অর্থ ও পরিধি অনেক বদলে গেছে। এখন মহিলারা উত্তরাধিকার ও অন্যান্যসূত্রে যে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারিণী হন তাকেই 'স্ত্রীধন' আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

কালের গতিতে বিবাহের নানারূপ জটিলতা দেখা দিতে লাগলো, শাস্ত্রকার ও আইনপ্রণেতারা পুনর্বিবাহের এই জটিলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য এবং স্ত্রী অধিকারকে আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এগিয়ে এলেন। বিবাহবিচ্ছেদ পুনর্বিবাহ প্রভৃতি আইন প্রণয়ন করা হল। বর্তমানে এই আইনের মাধ্যমে স্ত্রীলোকের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহের অধিকার আছে। আমাদের অনেকের ধারণা যে হিন্দুবিবাহ এক পবিত্র সংস্কার। এই সংস্কারকে সকলেই রক্ষা করার জন্য বদ্ধ-পরিকর। সংস্কারকে পবিত্র ততক্ষণ মনে করা যায় যতক্ষণ বিবাহে উভয়পক্ষ সংস্কারের ওপর শ্রদ্ধাপরায়ণ। এর মধ্যে একপক্ষ এই সংস্কার ভঙ্গ করলে অপরপক্ষ এককভাবে তা আর রক্ষা করতে পারেন না ফলে বিবাহবিচ্ছেদ হতে বাধ্য। ১৯৫৫ সালে হিন্দুবিবাহ আইন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বিবাহ সংস্কার হলেও এটা একটা চুক্তির বিষয়। কোন আইনসঙ্গত চুক্তিতে যে সমস্ত নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ হয় বিবাহের আইনও সেইরকম। কোন অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে যদি কোন পক্ষ চুক্তির অবমাননা করেন তবে এই চুক্তি আর আইনসঙ্গত থাকে না। বিবাহের চুক্তি ভঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় বিবাহবিচ্ছেদের পালা। বিবাহবিচ্ছেদের আগে অবশ্য উভয় পক্ষকে বহুবার সুযোগ দেওয়া হয় এই চুক্তি যথাযথভাবে রক্ষা করার জন্য। একান্ত অনন্যোপায় ও সহবাস অসম্ভব জেনেই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে থাকে।

বিবাহবিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে বহু পরিবারের বাঁচা মরার সমস্যা নির্ভর করে। শিক্ষাদীক্ষাহীন অসহায় স্ত্রীর পক্ষে সন্তান-দের ভার নিয়ে অন্ধকারে এগিয়ে চলা অসম্ভব। তাই বিবাহ বিচ্ছেদের পরে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় স্বামী নতুন করে ঘর বাঁধার সখ মেটে থাকেন। ছেলেমেয়েদের ভার বাধ্য হয়ে বইতে হয় মাকে। তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার দায়িত্ব তাঁর। এজন্য চাই প্রয়োজনীয় অর্থ। সেই অর্থ কিভাবে মায়েরা জোগাড় করবেন সেজন্য আইনে তাঁদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৫৫ সালে বিবাহ আইনে বলা আছে যে স্বামী বা স্ত্রী যে কোন একজনের যদি কোন আয় না থাকে এবং যদি এদের মধ্যে কেউ অপরকে ছেড়ে চলে যান তবে স্বামীপরিত্যক্তা অথবা স্ত্রী-পরিত্যক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা নিজস্ব কোন অর্থ বা আয় না থাকে তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব বইতে হবে স্বামী অথবা স্ত্রীকে। অবশ্য স্ত্রীকে স্বামীর জন্য ভরণপোষণ বইতে হচ্ছে এ ঘটনা বিরল। যদিও আইনে ভরণপোষণের ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রীতে কোন ভেদাভেদ নেই। তবুও আইনটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এতে স্ত্রীর পাশাপাশি স্বামী-চরিত্রটিও স্ত্রীলোক পরি-বর্তিত না করলে স্বামীর কাছ থেকে উপযুক্ত ভরণপোষণ পাবেন। যদি স্ত্রীর কোন ক্ষেত্রে স্বামী আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করেন তবে তাকে স্ত্রীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণ করতে হবে যে স্ত্রী অসতী। আবার কোন স্বামীর কোন ক্ষেত্রে যদি স্ত্রী বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে চান তাহলেও স্বামীকে স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রমাণিত করতে হবে যে স্বামী ধর্মান্তরিত হয়েছে। আমাদের থেকে যদি দেখা হয় যে স্বামী ভরণপোষণের ব্যয়ভার নিতে অক্ষম তখন নিষ্পত্তি হবে বিচারকের রায়ের ওপর।

অনেকক্ষেত্রে বিচারক স্বামীর এবং স্ত্রীর অর্থনৈতিক অবস্থা খতিয়ে দেখেন। যদি তিনি মনে করেন স্বামীর অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ এবং স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের ভরণপোষণের জন্য কোন অর্থ সাহায্য করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব সেক্ষেত্রে বিচারক তাঁর সুবিবেচনা প্রয়োগ করেন। কোনো কোনোসময় বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করলেই বিবাহবিচ্ছেদ হয় না। বিচারক স্বামী-স্ত্রীকে তাদের ভুল বোঝাবুঝি থেকে বিরত হয়ে আবার নতুন করে সুখের সংসার গড়ে তোলার বায় দেন। এক্ষেত্রে আদালতে ভরণপোষণের আবেদনের কোন প্রয়োজন হয় না।

আদালতের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী স্থির হয় এই ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রতি মাসে প্রতি বছরে কিংবা এককালীন দেওয়া হবে কিনা। তবে এই ক্ষতিপূরণ পূর্বস্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়। পূর্বস্বামীর কোন উত্তরাধিকারী ভরণপোষণের এই অর্থের জন্য দায়ী নয়।

দিন দিন বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা যে হারে বাড়ছে তাতে ভরণপোষণের প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ভবিষ্যৎ বংশধরেরা বাবামায়ের বিবাহবিচ্ছেদের শিকার হয়ে অনাহার অর্ধা-হার অশিক্ষায় ও উপযুক্ত পুষ্টির অভাবে কঙ্কালসার হয়ে বেড়ে উঠলে দেশের পক্ষে হবে খুব অশুভ। এদের জন্মদাতাদের অনেকেরই আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নাও থাকতে পারে। এই অস্বচ্ছলতাজনিত অব-হেলায় দেশের ভবিষ্যৎকে নষ্ট হতে দেওয়া কোন উন্নতিকামী দেশের লক্ষ্য নয়। ইউরোপের প্রগতিশীল দেশগুলি এ সমস্যার সম্মুখীন অনেক আগেই হয়েছে ফলে সেসব দেশে এ সমস্যাকে মোকাবিলা করার জন্য সরকার এগিয়ে এসেছেন সহানুভূতিশীল মন নিয়ে। সরকারের প্রচেষ্টায় আজ সেসব দেশে অসহায় শিশুরা স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়নি। তাদের দেশ হয়ে উঠেছে শক্তিশালী। অবহেলিত শিশুদের অন্ধকারে ফেলে রেখে দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠন করা কোনমতেই সম্ভব নয়। ইউরোপের ঢেউ আমাদের দেশেও এসে পড়েছে। এই সমস্যাকে প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের বিশেষভাবে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে—এ ব্যাপারে সরকারের বিরাট দায়িত্ব। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকেও সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে সরকারের সহযোগিতায় এক সুস্থ ও স্বাভাবিক সমাজ জীবন স্বাচ্ছন্দের গঠনের দিকে। যতদিন এই সমস্যার সমাধান না করা যাবে ততদিন দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কোনমতেই সম্ভব নয়।

অঞ্জলী চৌধুরী

স্মৃতি দিয়ে ঘেরা

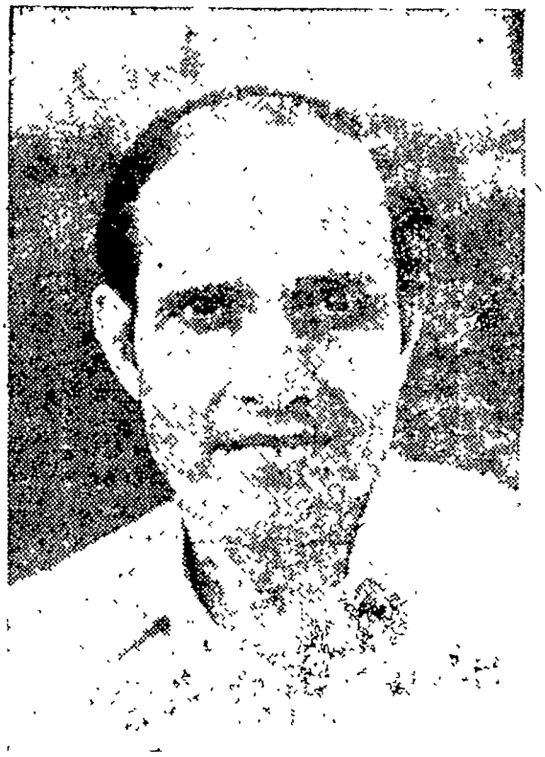

পছনের দিকে তাকিয়ে স্মৃতিচারণ করছিলেন সমর ব্যানার্জি।

সমর ব্যানার্জি ? তিনি আবার কে ? চিনতে হয়তো অনেকেরই অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু পোষাকী নামের উত্তরীয় গা থেকে ঝেড়ে ফেলে মানুষটি যদি বদরু ব্যানার্জির চেহারা ধরে, তাহলে বোধকরি তাঁকে চিনতে আর কারুরই কোনো ভুল হবে না।

পোষাকী নয়, ডাক নামেই বদরু কলকাতা তথা ভারতীয় ফুটবল সমাজে পরিচিত। নিজেকে চিনিয়ে দেবার মতো অনেক গুণে তাঁর ছিল। চটপটে, গতিময়। মেহনতী, বুদ্ধিমান। পায়ের কাজ সূক্ষ্ম-তিসূক্ষ্ম। গায়ের রংটিও ধবধবে। বাহারি খেলার জলুষে বদরু ছিলেন ঝকঝকে। খেলতেন যখন, মাঠকে মাঠ ঝলমলিয়ে উঠতো।

বিশ্ব অলিম্পিক ক্রীড়ার মূল আসরে ভারতীয় ফুটবল দল এবারই মোট চারবার আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছে। সেই চারবারের একবার জাতীয় দলের নেতৃত্বভার পড়েছিল বদরু ব্যানার্জির ওপর। বাকি তিনবার টি আও, শৈলেন মান্না ও প্রদীপ ব্যানার্জির কাঁধে।

মোট চারবারে ভারত খেলেছিল আটটি ম্যাচ। তারমধ্যে জিততে পেরেছিল একবারই, যেবার বদরু ছিলেন জাতীয় ফুটবল দলের কর্ণধার। ঘটনাটি ১৯৫৬ সালের। সেবার মেলবোর্ণ অলিম্পিক ফুটবলে ভারত চতুর্থ শ্রেষ্ঠের স্বীকৃতিও পায়। কাজেই বলা যায় যে, অলিম্পিক প্রতিযোগিতার ফলাফলের মূল্যায়নে বদরু ব্যানার্জি পরিচালিত ভারতীয় দলের রেকর্ডই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

স্মৃতির পাতা ওলটাতে গিয়ে বদরুর তাই প্রথমেই মনে পড়ছিল ১৯৫৬ সালের কথা

সে বছর বিজয়া দশমীর দিনে, বেতার বার্তায় যখন ভারতীয় দল নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণার সময় বলা হোল যে, জাতীয় দলের নেতৃপদ দেওয়া হয়েছে আমাকেই, তখন চমকে উঠেছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, এতো বড় সম্মানের প্রত্যাশী ছিলাম না। চমকের ঘোর কাটতে উপলব্ধি করলাম যে, কি গুরুভারই না আমার কাঁধে চাপানো হয়েছে। চার বছর আগে হেলসিঙ্কিতে সুগোশ্লাভিয়ার কাছে ১—১০ গোলে হেরে যাওয়াতে আন্তর্জাতিক ফুটবলে ভারতের প্রতিচ্ছবি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। ভারতীয় ফুটবলের টলমলে মূর্তিটিকে কি খাড়া পায়ে দাঁড় করানো সম্ভব হবে ?

মনে হাজারো প্রশ্ন। ভবিষ্যতের ছবি অনিশ্চিত। তবু কোচ বাহিম সাহেবের তত্ত্বাবধানে অনুশীলন প্রশিক্ষণ আমরা প্রাণ ঢেলে দিলাম। হেলসিঙ্কির তিক্ত কাহিনীর খোঁচাতেই বোধহয় আমরা উজ্জীবিত হতে পেরেছিলাম। শেষ চেষ্টা করার তাগিদ জানায় ওই হেলসিঙ্কির বিপর্যয়েই। বিপদের গন্ধেই আমরা সবাই আপনা থেকেই এককাট্টা হয়ে ওঠার প্রেরণা পেয়েছিলাম। সেবার দলগত সংহতি যে গড়ে উঠেছিল তা হেলসিঙ্কির কথা ভেবেই।

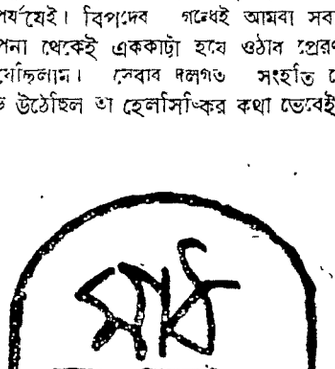

আর এই সংহতিই যে উত্তরণের পথ তা বুঝতে পারলাম মূল আসরে খেলতে নেমে। প্রথম খেলা সংগঠক রাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। ফুটবলে অস্ট্রেলিয়া যে খুব নাম করা দল তা নয়। তবে প্রথম রাউণ্ডে শক্তিশালী এশীয় প্রতিনিধি, জাপানকে দু গোলে হারিয়েছিল বলে অস্ট্রেলিয়াকে আমরা কখনো ছোট নজরে দেখতে চাই নি। না চেয়ে ভালই করেছিলাম। সমীহ জানিয়ে খেলতে খেলতে যখন বুঝলাম যে জেতা আমাদের সাধ্যাতীত নয়, তখনই আক্রমণ শানিয়ে প্রতিপক্ষের বেড়া টপকে গেলাম। জিৎ হলো ৪—২ গোলে।

পরের খেলা যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে। তখনকার দিনে ভারতীয় ফুটবলের কাছে যুগোশ্লাভিয়া তো জুজুবুড়োর মতো। চার বছর আগে এই যুগোশ্লাভিয়া আমাদের গুণে গুণে দশটি গোল উপহার দিয়েছিল। কাজেই তারস্থাটি অনুমেয়। কিন্তু বিশ্বাস করুন, সেদিন আমরা কেউ ভয় পাই নি। বরং বুক চিতিয়ে আক্রমণাত্মক মেজাজে প্রথম পর্ব খেলেছি। সমানে পাল্লা দিয়ে বিরতির আগে গোল করে এগিয়েও থেকেছি প্রায় সত্তর মিনিট। পরে অবশ্য এক গন্ডা গোল করে যুগোশ্লাভিয়া জিতে যায়। কিন্তু অমন বাঘা এক দলকে বহুক্ষণ ধরে খাঁচায় আটকে রাখা কি কম কথা ? আমাদের সান্ত্বনা তো ওই কীর্তিতেই।

এর পর তৃতীয় স্থান নির্ধারণে যে খেলা হয় তাতে আমরা হারি বুলগেরিয়ার কাছে পরিষ্কার তিন গোলে। এ হারে অফশোষ করার কিছুই ছিল না। যেহেতু বুলগেরিয়া ছিল সত্যিকারের এক শক্তিশালী দল।

পণ্ডিতদের বিচারে, ইওরোপের অন্যতম সেরা দল এবং "ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন রাশিয়ার সঙ্গে বুলগেরিয়ার ক্রীড়াগত পার্থক্য কিছুই নয়।' রুশীরা সেমিফাইনালে অতিরিক্ত সময়ে গোল করে তবেই বুলগেরিয়ার বাধা ডিঙোতে পেরেছিল। ফুটবল বিশেষজ্ঞ ডঃ উইলি মিজলস লিখেছিলেন হেরে গেলেও বুলগেরিয়া আমার বিচারে, এবারের প্রতিযোগিতায় সেরা দল। প্রায় সর্বাঙ্গীন দক্ষতায় যে দল পরিপুষ্ট। বুলগেরিয়ার খেলোয়াড়েরা তেমন সট নিতে পারেন নি—এ ছাড়া তাঁদের সম্পর্কে কারুর কোনো অভিযোগ উঠতে পারে না। অতিরিক্ত সময়ে কিঞ্চিৎ শিথিল হতে চাওয়াই হলো বুলগেরিয়ার কাল। সেই ফাঁকে রাশিয়া জয়সূচক গোলটি করে বসে।'

ভারতীয় দলের ক্রীড়াধারা ও অনুসৃত প্রশিক্ষণগত পদ্ধতি ডঃ মিজলসের প্রশংসা আদায় করেছিল। বদরু বলছিলেন,

ডঃ মিজলস প্রকাশ্যে বলেছিলেন, মেলবোর্ণ অলিম্পিকের ফুটবল আসরে ভারত যেন এক বিস্ময়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত যাদের সঙ্গে বুটের সম্পর্ক ছিল না এবং এখনও যাঁরা স্বদেশে নব্বই মিনিটব্যাপী ফুটবল খেলতে অভ্যস্ত নন, সেই ভারতীয়রা মেলবোর্ণের মাঠে যেভাবে, কম নিরুত্তাপ করেছেন এবং পরিচ্ছন্ন ক্রীড়াপদ্ধতি তাকডে ধরেছেন তা দেখবার মতো। সব মিলিয়ে, ভারতীয় ফুটবলের মান মধ্য ইওরোপীয় ক্রীড়ামানের সমতুল্য। ভারতীয় কোচ রাহিম নিশ্চয়ই ইওরোপীয় ফুটবলের খুঁটিনাটি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন।

বদরু ব্যানার্জিকে আমরা তিনি ফুটবল খেলোয়াড় এবং জাতীয় দলের এক সফল নেতা হিসেবে। তাঁর যা কিছু পরিচিতি ও খ্যাতি তা ওই ফুটবল খেলেই। অথচ মজা এই যে ভবিষ্যতে কোনোদিন তিনি যে ফুটবল খেলোয়াড় হতে পারবেন এমন তকোর কোনো আভাই পাওয়া যায় নি বৈশাখেও। বৈশাখ যেন তাঁর কাছে দুঃস্বপ্নের মতো। খেলার সুযোগ পাওয়া দূরের কথা, ফুটবলের নামাজোচ্চারণের অধিকার পর্যন্ত ছিল না। সেদিনের কথা মনে পড়তে বদরু বলছিলেন :

ছেলেবেলায় ফুটবল খেলা ছিল আমাদের বাড়ীতে নিষিদ্ধ। নিষেধাজ্ঞা জারির মতো এক কারণও ছিল। আমার দাদা ফুটবল মাঠে চোট পেয়েই প্রাণ হারিয়েছিলেন। দাদার কিছু কদিন পরেই এই মারাত্মক দুর্ঘটনা। বাড়ির অভিভাবকদের তখন মনের অবস্থা যে কী তা সহজেই বোঝা যায়। পরিবারের কর্তা বাবা শোক সামলে নিয়েই হুকুম দিলেন, এ বাড়ির আর কেউ যেন ফুটবল মাঠ মুখো না হয়।

বাবার হুকুম। নড়চড় হবার উপায় নেই। অমান্য করার সাহস নেই। তবে ছেলেবেলার দুষ্টুমি যাবে কোথায়! লুকিয়ে চুরিয়ে বয়সের টানে মাঠের দিকে যেতেই হতো। আর জানাজানি হয়ে গেলে পিঠে নিশ্চিন্ত বেতদণ্ড সইতে হোত। এমনি করেই আমার কৈশোর কেটেছে। পরে একটু আবটু নাম হওয়া সত্ত্বেও বাবা আমার ফুটবল খেলার সাধকে অনেকদিন ক্ষমার চোখে দেখতে পারেন নি। দেখতে চানও নি। তাঁর কাছে তখন পিতৃস্নেহ আর সন্তানদের শুভাশুভ চিন্তাই ছিল বড়। ছেলেবেলায় বাবার এই মুখ ফিরিয়ে থাকার দৃষ্টান্ত দেখে অভিমান হোত। কিন্তু পরে বুঝেছি, ওঁর পক্ষে এইটিই ছিল স্বাভাবিক।

বদরুর কথায়, ওঁর খেলোয়াড় জীবনের বাঁক ফিরলো ১৯৫৪। তখন তিনি আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। বালীতে খেলার পাট চুকিয়ে খেলার জন্যে বি এন আরের চাকরি নিয়েছেন। পাশে খেললেনও বি এন আরের পক্ষে। কিন্তু শীল্ড খেলতে নামলেন মোহনবাগানের জার্সি গায়ে চড়িয়ে। সেদিনে আই এফ এর নিয়ম কানুন ছিল কিঞ্চিৎ শিথিল। বিশেষ ব্যবস্থাক্রমে একই মরশুমে দুটি দলের পক্ষে খেলা চলতো।

মোহনবাগানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বরাত গেল বদলে, দক্ষতা ছিল। কিন্তু তার পরিচয় ছিল যেন অনেকেরই অজানা। এবার ক্রমশঃই সেই পরিচয় দিনের আলোর মতো সাধারণের দৃষ্টিতে ধরা দিতে লাগলো। শীল্ড মোহনবাগান এক একটি ধাপ ডিঙোয় আর বদরুর খ্যাতি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে। ফাইনালের দিন বদরুর অধিষ্ঠান তো একেবারে তুঙ্গে। তাঁর একটি সটেই সেদিন হায়দরাবাদ পুলিশের কপাল গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। আর মোহনবাগানের ঘরে ঠাঁই পেয়েছিল ঐতিহ্যমণ্ডিত আই. এফ. এ শীল্ড—ভারতীয় ফুটবলারদের কাছে যে শীল্ডের মর্যাদা সোনার চেয়ে দামী। বদরু বলছিলেন, আমার সান্ত্বনা, হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে গোলটি করে আমি আবার আমার বাবাকে ফুটবল মাঠে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলাম। সেইদিনই তাঁর সঙ্গে ফুটবলের বিরোধ মিটে যায় এবং আমাকেও তিনি চিরদিনের মতো ক্ষমা করেন। শীল্ড ফাইনাল দেখতে অথবা বলি, ছেলের খেলা দেখতে বাবা নিজে সেদিন মাঠেও গিয়েছিলেন। যে ফুটবল তাঁকে জীবনের সবচেয়ে বড় শোক দিয়েছিল সেই শোক আমিই ভোলাতে পেরেছি, হ্যাঁ ফুটবল খেলেই।

বালী, বি এন আরের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে মোহনবাগানে এলেন কি করে? প্রশ্ন শুনে হাসতে হাসতে বদরু বললেন,

সে এক ইতিহাস। মোহনবাগানে আমায় টেনে নিয়ে আসেন সুলালদা, মানে বিখ্যাত অভিনেতা জহর গাঙ্গুলী। সুলালদা ছিলেন মোহনবাগান বলতে পাগল। রঙ্গমঞ্চ ও ছায়াছবির ডাকে সদাই ব্যস্ত থাকলে কি হবে, প্রতিদিন বিকেলটুকু তাঁর মোহনবাগান তাঁবুতে কাটানো চাইই চাই। যেন কিছুদিন সব কাজ ফেলে সুলালদা মোহনবাগান ক্লাবের হকি সম্পাদকের কাজকর্ম নিজের কাঁধে তুলেও নিয়েছিলেন। সে কাজে ঝক্কি, ঝামেলা কিছু কম ছিল না।

সুলালদাই প্রথমে মোহনবাগানে আসার প্রস্তাব দেন। আমাকে বাগাতে তিনি আমার কলেজ পর্যন্ত ছোটেন। অরোরা এবং আরও কয়েকটি ফিল্মে স্টুডিওতে নিয়ে যান। সুলালদা এখন বাংলা ছায়াছবি জগতে এক মস্তো মানুষ। আমাদেরও হিরো। ওঁর কথা ফেলি কি করে। কাজেই রইলো চাকরি। আমি ওঁর কথাতেই চলে এলাম মোহনবাগানে। এসে ভুল করি নি নিশ্চয়ই। মোহনবাগানে আসার পরই তো খেলোয়াড় হিসেবে স্বীকৃতি, প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পথ প্রশস্ত হয়।

সুলালদার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ঘটে যাওয়া, তাঁর সঙ্গ সান্নিধ্য পাওয়ার, দৌলতে বদরু সব দিক থেকেই লাভবান হতে পেরেছেন। সুলালদার সঙ্গে স্টুডিও চত্বরে মাঝে মাঝে ঘোরাঘুরির ফাঁকে চিত্রতারকা তপতী ঘোষের সঙ্গে আলাপ হতে বদরু জীবনসঙ্গিনীর সন্ধানও পেয়ে যান। একজন ছায়াছবির শিল্পী, অন্যজন ফুটবল মাঠের শিল্পী। শেষ পর্যন্ত দুটি শিল্পসত্তা বহত্তর জীবনে একাত্ম হয়ে যায়। সুলালদা ঠিক সময়ে ওর জীবনে এসে না পড়লে এমন সার্থক ঘটকালি করা কি এতো সহজে সম্ভব হোত।

বিশ্ব ওলিম্পিক ক্রীড়ার পরের বছরেই বদরু যুব উৎসবে যোগ দিতে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। সেখানে লুজনিকিস্থে লেনিন স্টেডিয়ামে রাশিয়া বনাম চেকোশ্লোভাকিয়া এবং আর কটি আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলা দেখেন। সেবার যুব উৎসবে ভারত থেকে একা তিনিই যান সোভিয়েত দেশে। তাঁকে পেয়ে মস্কো বেতার কর্তৃপক্ষ এক অনুষ্ঠানে ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ বেতারে প্রচারও করেন।

খেলোয়াড় জীবনেও বদরু ফুটবলের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে চুকিয়ে দিতে পারেন নি। ইচ্ছে ছিল, কোচিং করাবেন। সেই উদ্দেশ্যে পাতিয়ালায় নেতাজী সুভাষ জাতীয় ক্রীড়া শিক্ষায়তনে অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করেছেন। কিন্তু পুরো সময়ের জন্যে প্রশিক্ষণে নিয়োজিত থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। সব সময়ের জন্যে কোচ হতে হলে, ব্যক্তিটিকে পেশা হিসেবে নিতে হয়। বদরুর সে সময় নেই। তাছাড়া ফুটবল মাঠের, আবহাওয়া কেমন বদলে উগ্র হয়ে যাচ্ছে তাও। প্রশিক্ষণে জড়িয়ে থাকার ইচ্ছেও নেই তাঁর। এখন ফুটবলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শুধু ভেটারেন্স ক্লাবের খেলাধূলার সূত্রে। অনুরাগীদের ডাকে ভেটারেন্স দল এখানে ওখানে গেলে বদরু প্রবীণদের সঙ্গ নেন। পেড়াপেড়ি এড়াতে না পারলে কখনো সখনো হাফপ্যান্ট পরে মাঠে নামেন। খেলেন স্মৃতি থেকে। আর একালের দর্শকেরা বড় বড় চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন এই আশায় যে যদি কোনো বিক্ষিপ্ত লম্বা দৃপ করে জ্বলে উঠে আজকের নিবুনিবু শিখাটি তার অতীতে ফিরে যেতে পারে। এতোটুকু আশা। তার জন্যেই মন-প্রাণ সঁপে পথ চেয়ে বসে থাকা। কিন্তু বয়স যে নেই। আশা তাই তো ছলনাময়ী।

অজয় বসু

খেলাধুলা

দর্শক

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত ২৪শে মে থেকে ফোর্ট উইলিয়াম অঞ্চলের মযদানে কলকাতার প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলা শুরু হয়েছে। বর্তমানে লীগ তালিকার শীর্ষস্থানে আছে মোহনবাগান (পয়েন্ট ১৭), দ্বিতীয় স্থানে ইস্টবেঙ্গল (পয়েন্ট ১৭), এবং তৃতীয় স্থানে মহমেডান স্পোর্টিং (পয়েন্ট ১৫)। এই তিনটি দলই ৯টা করে ম্যাচ খেলেছে। বাটার বিপক্ষে মোহনবাগান তাদের লীগের প্রথম খেলাটি গোলশূন্য ড্র করে একটা পয়েন্ট নষ্ট করেছিল। তারপর অবিশ্যি একনাগাড়ে আটটা খেলায় জিতে সমর্থকদের মনে আশার সঞ্চার করেছে। মোহনবাগান লীগের ৯টা খেলায় ২৮টা গোল দিয়ে একটাও গোল খায়নি। এই ভাল গোল এভারেজের দরুন তারা ইস্টবেঙ্গলকে দ্বিতীয় স্থানে রেখে উপস্থিত প্রথম স্থানে রয়েছে। মোহনবাগানের এখনও তিনটে বড় খেলা বাকি—ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং এবং এরিয়ান্সের সঙ্গে। গত ৬ বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল এ পর্যন্ত মাত্র একটা পয়েন্ট নষ্ট করেছে। ১—১ গোলে এরিয়ান্সের সঙ্গে খেলা ড্র করে। ইস্টবেঙ্গল তাদের ৯টা খেলায় ২২টা গোল দিয়ে ৩টে গোল খেয়েছে। ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে তিনটে গোল করেছে যথাক্রমে ক্যালকাটা জিমখানা এরিয়ান্স এবং মহমেডান স্পোর্টিং।

লীগের তৃতীয় স্থান অধিকারী মহমেডান স্পোর্টিং তাদের ৯টা খেলায় ১৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। সমান খেলে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলের থেকে তাদের দু পয়েন্ট কম। মহমেডান স্পোর্টিং এ পর্যন্ত তিনটে পয়েন্ট নষ্ট করেছে—ওয়াড়ীর সঙ্গে গোলশূন্য ড্র এবং ইস্টবেঙ্গলের কাছে ১—২ গোলে পরাজয়। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের এখনও দুটো বড় খেলা বাকি—মোহনবাগান এবং এরিয়ান্সের সঙ্গে। অপরদিকে ইস্টবেঙ্গলের বাকি মোহনবাগানের সঙ্গে।

প্রথম বিভাগের লীগের ২৩টি দলের মধ্যে এখনও অপরাজিত আছে এই তিনটি দল—মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং এরিয়ান্স। এবং লীগের খেলায় এখনও গোল খায়নি একমাত্র মোহনবাগান। লীগের চতুর্থ স্থান অধিকারী এরিয়ান্স ৮টা খেলায় ১৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। তারা ৮টা খেলায় ১০টা গোল দিয়ে মাত্র একটা গোল খেয়েছে ইস্টবেঙ্গলের কাছে। এরিয়ান্স লীগের খেলায় তিনটে পয়েন্ট নষ্ট করেছে এইভাবে—আর্টিলারী বেজিমেন্টের সঙ্গে ০—০ গোলে, ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ১—১ গোলে এবং লীগ তালিকার নীচের দিকের চন্দ্র মেমোরিয়াল দলের সঙ্গে ০—০ গোলে খেলা ড্র করে।

প্রথম বিভাগের লীগের খেতাব নিয়ে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহমেডান স্পোর্টিং এবং এরিয়ান্সকে নিয়ে। বর্তমানে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল পয়েন্ট সংগ্রহের দিক থেকে সমান সমান যাচ্ছে। অপরদিকে মহমেডান স্পোর্টিং এবং এরিয়ান্স কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। তবে এই দুটি দলের সঙ্গে এখনও মোহনবাগানের খেলা বাকি। ফলে এদের পক্ষে লীগ তালিকার মাথার দিকের অদল-বদল করার সুযোগ এখনও হাতছাড়া হয়নি। ইস্টবেঙ্গল গত ৬ বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান। তারা এ পর্যন্ত মোহনবাগানের সমান ১৪ বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। এর মধ্যে ইস্টবেঙ্গল অপরাজিত অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ৬ বার, যা প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য রেকর্ড। সুতরাং ইস্টবেঙ্গলের মনোবল তাদের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান, মহমেডান স্পোর্টিং এবং এরিয়ান্সের থেকে অনেকগুণ বেশী।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের খেলায় মোহনবাগান শেষ লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ১৯৬৯ সালে এবং মহমেডান স্পোর্টিং ১৯৬৭ সালে। এরিয়ান্সের ভাগ্যে লীগের খেতাব এখনও জুটেনি। তারা ১৯৭৪ সালে রানার্স আপ হয়েছিল। এবছরের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের খেলায় সর্বনিম্ন স্থান নিয়ে রীতিমত আত্মরক্ষার লড়াই চলেছে। লীগ তালিকার সর্বনিম্ন স্থান আছে পুলিশ। এপর্যন্ত তারা মাত্র একটা পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে কালীঘাটের সঙ্গে গোলশূন্যভাবে খেলা ড্র করে।

অলিম্পিক সমাচার

অলিম্পিক গেমসের একই বছরের আসরে একজন এ্যাথলীটের পক্ষে ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ের স্বর্ণপদক জয় নিঃসন্দেহে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয়। এপর্যন্ত পুরুষ বিভাগে ৭জন এবং মহিলা বিভাগে ৪ জন অ্যাথলীট এই দুর্লভ ডাবল খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেছেন। পুরুষ বিভাগে সাতজনের মধ্যে আছেন আমেরিকার পাঁচজন কানাডার একজন এবং রাশিয়ার একজন অ্যাথলীট। অপর দিকে মহিলা বিভাগের এই তালিকায় আছেন অস্ট্রেলিয়ার দুজন এবং একজন করে নেদারল্যান্ডস এবং আমেরিকার অ্যাথলীট।

পুরুষ বিভাগ

১৯০৪ : আর্চি হ্যান (আমেরিকা)
১৯১২ : আর সি ক্লেগ (আমেরিকা)
১৯২৮ : পার্শি উইলিয়ামস (কানাডা)
১৯৩২ : এডি টোলান (আমেরিকা)
১৯৩৬ : জেসি ওয়েন্স (আমেরিকা)
১৯৫৬ : বব মরো (আমেরিকা)
১৯৭২ : ভ্যালেরী বোরজোভ (রাশিয়া)

মহিলা বিভাগ

১৯৪৮ : ফ্যানি ব্ল্যাঙ্কার্স-কোয়েন (নেদারল্যান্ডস)
১৯৫২ : এম জ্যাকসন (অস্ট্রেলিয়া)
১৯৫৬ : বেটি কাথবার্ট (অস্ট্রেলিয়া)
১৯৬০ : উইলমা রুডলফ (আমেরিকা)

ইথিওপিয়ার আবেবে বিকিলা উপর্যুপরি দুটি অলিম্পিক গেমসের আসরে

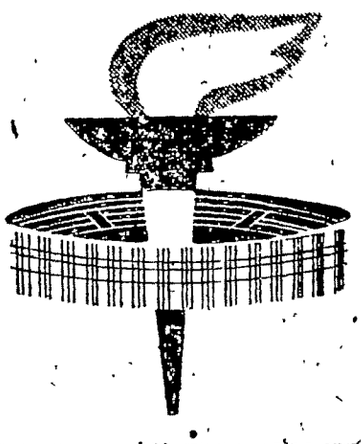

(১৯৬০ ও ১৯৬৪) ম্যারাথন দৌড়ে স্বর্ণপদক জয়ী হন। একমাত্র তিনিই অলিম্পিক ম্যারাথন দৌড়ের ইতিহাসে দুবার স্বর্ণপদক জয়ের নজির সৃষ্টি করেন।

মেয়েদের ১০০ মিটার দৌড়ে আমেরিকার নিগ্রো অ্যাথলীট কুমারী উইমা টিয়াস উপর্যুপরি দুবার (১৯৬৪ ও ১৯৬৮) স্বর্ণপদক জয়ের সূত্রে এক অসাধারণ নজির সৃষ্টি করেন। তিনি ছাড়া অপর কোন মহিলা বা পুরুষ অ্যাথলীটের পক্ষে অলিম্পিকের ১০০ মিটার দৌড় এমনকি মোট দুবার স্বর্ণপদক জয় সম্ভব হয়নি, উপর্যুপরি স্বর্ণপদক জয় দূরের কথা।

রুমানিয়ার আইয়োল্যান্ডা ব্যালাস মেয়েদের অলিম্পিক হাইজাম্প উপর্যুপরি দুবার (১৯৬০ ও ১৯৬৪) স্বর্ণপদক জয়ের সূত্রে অসাধারণ নজির সৃষ্টি করেন। তিনি ছাড়া অপর কোন মহিলা অথবা পুরুষ অ্যাথলীটের পক্ষে অলিম্পিক হাইজাম্পে এমনকি মোট দুবার স্বর্ণপদক জয়ও সম্ভব হয়নি।

১৯৪৮ সালের অলিম্পিক গেমসের অ্যাথলেটিকস আসরে দুই সন্তানের জননী শ্রীমতী ফ্যানি ব্ল্যাঙ্কার্স কোয়েন (নেদারল্যান্ডস) এই চারটি অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক জয়ের সূত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন—১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়, ৮০ মিটার হার্ডলস এবং ৪×১০০ মিটার রীলে দৌড়।

৭৯,০০

'এখন আমি রীতিমত সিরিয়াস। অনেকের সংগে পাল্লা দিয়ে মাঠে অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে। বড়ো হতে হলে নিরলস অনুশীলন চাই, চাই বিশ্বস্ততা, আত্মবিশ্বাস। ফুটবল খেলোয়াড় মাত্রেই তা জানেন, বোঝেন কিন্তু অনেকেরই অতোটা ধৈর্য্য নেই'।

মাঠের নায়ক

প্রশান্ত ব্যানার্জি

গড়ের মাঠে ফুটবল খেলবো এমন স্বপ্ন ছোটবেলায় দেখতাম বৈকি! কিন্তু বড়ো ক্লাবে খেলবো এমন স্বপ্ন কোনদিনই দেখিনি। মাঝখান দিয়ে কি যে হয়ে গেল। রীতিমত সিরিয়াস হয়ে পড়লাম। ছোট ক্লাবের বেড়া ডিঙিয়ে বড়ো ক্লাবের চত্বরে হাজির হলাম। যে ক্লাব থেকে আমি এসেছি সে ক্লাবও অবশ্য ছোট নয়। প্রাক স্বাধীনতা পর্বে কালীঘাটেরও বিলক্ষণ নাম-ডাক ছিল। অনেক দিকপাল খেলোয়াড় ওখানে খেলে গেছেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়ও এককালে এই ক্লাবেরই জার্সি গায়ে দিয়ে ফুটবল মাঠে নেমেছেন। কিন্তু সে প্রসঙ্গ থাক। সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। তবে আমি আমার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। জানি অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পাল্লা দিতে হবে। ধৈর্য ধরে পাল্লা দিতে হবে।'

কালো ছোটখাটো পেটানো পেটানো শক্ত সমর্থ চেহারার প্রশান্তর সংগে কথা হচ্ছিল সেদিন সকালবেলা ইস্টবেংগল তাঁবুর ভেতরে বসে। প্রশান্ত পোষাকী নাম ডাক নাম ডোমলা। জন্ম ১৯৫৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী টালিগঞ্জের আজমল খান রোডে। বাবা জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জি ঢাকার মানুষ চাকরী ইণ্ডিয়ান টিউবে। প্রশান্তরা তিন ভাই দু বোন। ভাই বোনদের মধ্যে প্রশান্ত মা (বাসন্তী দেবী) বাবার চতুর্থ সন্তান। স্কুলের পড়াশুনো দেশপ্রাণ স্কুলে এবং শেষের দিকে পাইকপাড়া কুমার আশুতোষ ইনষ্টিটুশনে। ওখান থেকেই ১৯৭৫ সালে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় পাশ করেছেন। বর্তমানে নেতাজীনগর কলেজে কমার্সের সেকেণ্ড ইয়ারের পড়ুয়া।

প্রশান্তর পজিসন লেফট হাফ। ইষ্ট-বেংগলে তাকে ঐ পজিসনেই খেলতে হবে। কাজটি রীতিমত শক্ত। সমরেশের শূন্য স্থান পূরণ করা কি সোজা কথা। সমরেশকে কি এত সহজেই ভোলা যায়। দেখলাম প্রশান্ত এ সম্পর্কে রীতিমত অবহিত রীতিমত সজাগ। এবং সজাগ বলেই নিজেকে যোগ্য করে তোলার জন্য নিরলস অনুশীলন চলছে সকাল সন্ধ্যা দুপুরে। রিসিভিং নিখুঁত করার জন্য হেডিং নিখুঁত করার জন্য ট্যাকলিং নিখুঁত করার জন্য মেহনতের অন্ত নেই। প্রশিক্ষক অমল দত্তের অনেক আশা প্রশান্তকে ঘিরে। জায়গা আগলানো প্রতিপক্ষের আক্রমণকে অংকুরে বিনাশ করে দিতে প্রশান্ত সিদ্ধহস্ত। মস্ত বড়ো হাতিয়ার তাৎক্ষনিক ট্যাকলিং। প্রশান্ত এটুকু জানে এটুকু বোঝে যে সেয়ানা ফরওয়ার্ডকে এক মুহূর্ত সময় দিলেই সে রক্ষণ ব্যবস্থার গোটা ভিতটা নড়িয়ে দেবে। সুতরাং প্রতিপক্ষকে কোনক্রমেই বাড়তে দেওয়া তার কাছে মানা।

প্রশান্ত ব্যানার্জির ফুটবলে হাতে খড়ি হয়েছিল ১৯৭২ সালে দক্ষিণ কলকাতার হোয়াইট বর্ডার ক্লাবে। শিক্ষাগুরু অশোক গুহ অর্থাৎ বাবুদা। এভিনিউ সম্মিলনী থেকে এই বাবুদাই ওঁকে এনে তুলেছিলেন হোয়াইট বর্ডার শিবিরে। সেখান থেকে ১৯৭৪-৭৫-এ কালীঘাটে টেনে আনলো মৃণাল চক্রবর্তী। বছর দুই ওখানে সুশীল ভট্টাচার্য ও মৎসুদ্দির কাছে ফুটবলের আরও কিছু তালিম মিললো। কিছু অভিজ্ঞতা হোল ফুটবল সেন্সটা উসকে দিলেন তাঁরা। সেখান থেকে ১৯৭৬ সালে ইষ্টবেংগলে এনে তুললেন ডাঃ নৃপেন দাস। পুত্র স্নেহে লালন করছেন তিনি প্রশান্তকে।

১৯৭৪ সালে প্রশান্ত জুনিয়ার বাংলা দলের নেতৃত্ব দিলে কোয়েম্বাটুরে। বাংলা চ্যাম্পিয়ন হোল। আগ্রায় অনুষ্ঠিত সর্ব-ভারতীয় স্কুল ক্রীড়ার আসরেও ঐ বছর প্রশান্ত চ্যাম্পিয়ন বাংলা দলে খেলেছেন। ১৯৭৫ সালে মনিপুরের জাতীয় জুনিয়ার ফুটবলে তিনি ছিলেন বাংলার দল নেতা। সেবারও বাংলা সব পেল চ্যাম্পিয়ন হোল হারালো শুধু প্রবীরকে। ১৯৭৬ সালে গিয়েছিলেন ব্যাংকক এশীয় যুব ফুটবলের আসরে ভারতের প্রতিনিধিরূপে। এরই ভেতর সুব্রত ট্রফিতে খেলেছেন ১৯৭৩—৭৪ সালে রাজধানী দিল্লীতে। ৭৪ সালে তিনি ছিলেন চ্যাম্পিয়ান কুমার আশুতোষ স্কুলের সার্থক অধিনায়ক। ঐ বছরই ডাক পড়লো ভারতীয় স্কুল দলের ট্রায়ালে। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রশান্ত খেলেছেন ১৯৭৫ সালে মহীশূরে। বলা বাহুল্য কলকাতার কামিজ গায়ে দিয়ে। ফাইনালে পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলো না কলকাতা। সেমি ফাইনালেই বিদায়। কলকাতা বিদায় নিলেও প্রশান্ত কিন্তু সবার নজর কেড়েছিলেন। সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দলের ট্রায়ালে যোগ দেবার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য যাওয়া হয়নি। এমন সুযোগ জীবনে আর হয়তো আসবে না।

বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গশ্রী
হাওড়া
৪১/১, জি, টি, রোড, হাওড়া
• বেনারসী
• জোড় • সিল্ক
• তাঁত • মিল
• পোষাক
• সাটিং • সুটিং
• ছিট কাপড়

নিখিলেশ সর্দার/নন্দিতা বসু অমৃত ফটো

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তারপর সত্যজিৎ রায় পথের পাঁচালী-র শুটিং করতে নামলেন। বংশী চন্দ্রগুপ্ত আর্ট ডিরেকটার হিসাবে যোগ দিলেন সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে। বাংলা ছবিতে শিল্প-নির্দেশনা সংক্রান্ত ব্যাপারটা বোধ হয় সেই প্রথম মর্যাদা পেল। বংশী চন্দ্রগুপ্ত এখন আর কলকাতায় থাকেন না। ওঁর কর্মক্ষেত্র এখন বোম্বের সুসজ্জিত শিল্পে বিস্তৃত। কিন্তু সেই অসাধারণত্ব বোধহয় আর নেই সেটা বাংলা ছবিতে শোভন সুন্দর, তা কি বোম্বের গ্লামারাস হিন্দী ছবিতে মানায় কখনও! বংশী চন্দ্রগুপ্ত নিশ্চয় আক্ষেপ করেন এখন।

এত পায়তাড়া কষে, মশা মারতে কামান দাগার মত সুখভঙ্গী করে সূর্য শেষ পর্যন্ত বলল—তাস!

—আস? আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম।

—হ্যাঁ তাস। তাস-ই শেষ পর্যন্ত আমাকে উদ্ধার করেছিল সেই বিপদের রাতে। সূর্য খুব কনফিডেন্টলি বলল আমাকে—মাইরি বলছি—

—ভ্যাট!

—বিশ্বাস কর ভাই, একটুও বাড়িয়ে বলছি না.

জেনে রাখুন ফিল্ম লাইনে সবচেয়ে পপুলার প্যাসটাইম হচ্ছে তাস। আউটডোর শুটিং-এর প্রথম রিকুইজিশান হচ্ছে—তাস। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর ক্যাম্পে ফিরে বেশীর ভাগ আর্টিস্ট টেকনিশিয়ান চায়ের মগ হাতে করে যে জিনিষটি নিয়ে দম করে বসে যায় খেলতে —তা হচ্ছে তাস। ব্রিজ, টুয়েন্টিনাইন নয় —রীতিমত ফ্লাশ, রামী বা ফিস খেলা। অবশ্য খেয়োড়দের মধ্যে ক্লাসিফিকেশন থেকে থাকে। স্টিল-ক্যামেরাম্যান তরুণ গুপ্ত তো তাসের পোকা। শুটিং হতে হতে হঠাৎ মেঘলা আকাশ এসে শুটিং-এর বারোটা বাজাল—তো কুছ পরোয়া নেহি—তরুণ অমনি পকেট থেকে তাসের প্যাকেট বের করে বসে গেল ইন্টারেস্টেড পার্সনসদের নিয়ে। তরুণ বরাবর জেতে। হার জিনিষটা ও জানে না। কারও পকেট হাল্কা করতে হবে—তরুণ এমনি এক পাত্রে খাড়া। তবে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত হার-জিতে সীমাবদ্ধ থাকে না—সমস্ত পয়সা দিয়ে মিষ্টি-ফিষ্টি কিনে খেয়ে ফেলাও ফিল্ম লাইনের একটা রেওয়াজ।

কিন্তু খেলতে বসে তাৎক্ষণিক হার-জিতের ব্যাপারে অনেকেরই অনেক রকম গোঁড়ামী গোয়ার্তুমী থাকে দেখেছি। উনি ছবির পরিচালক—উনি কেন ওর অধীনস্থ লোকের কাছে হার স্বীকার করবেন? ওকে প্রতি বাজিতেই জিততে হবে। এর ফলে খেলার স্পিরিট অনেক ক্ষেত্রে সরে গিয়ে ব্যক্তিগত রেষারেষিতে দাঁড়ায়। তাসে হেরে গিয়ে পরে অন্যভাবে প্রতিশোধ নিয়েছে—এমন ঘটনা ভূরি ভূরি। অথচ মুখে স্বীকার করবে না—এই হচ্ছে মুস্কিল।

ছবি বিশ্বাস তাসে হেরে গেলে ভীষণ চটে যেতেন। তিনি বলেই ফেলতেন। একবার এক প্রযোজককে দারুণ বিপদে ফেলেছিলেন, তার কাছে হেরে গিয়ে। সেই প্রযোজক ভদ্দরলোকের যখন চৈতন্য হল—তখন অনেকটা ড্যামেজ হয়ে গেছে। গ্রেট-ম্যানদের কাণ্ডকারখানাই সব আলাদা।

ফিল্ম লাইনের তাস খেলার সাইকো অনেকটা এই রকম। তাই সূর্য যখন বলল —তাস আমায় বাঁচিয়েছে—আমি সঙ্গে সঙ্গে একটা স্টোরির গন্ধ পেলাম। তারপর এটু মদত দিতেই সূর্য কাহিনীটা বলল। যেটা ঘটেছিল তখন সিংহর ছবি 'হাটেবাজারের' ভূটান আউটডোর শুটিং উপলক্ষে। যে আউটডোরের হাইলাইট হচ্ছে বোম্বের অশোককুমারের হার্ট অ্যাটাক।

সালাখে'/শশী কাপুর - সুলক্ষণা পণ্ডিত

তপনদা তাঁর বিরাট ইউনিট নিয়ে ক্যাম্প করেছিলেন রেড ব্যাঙ্ক টী এস্টেটে। ওখানে উঠেছিলেন অশোককুমার আর বৈজন্তীমালা। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন ছায়া দেবী, অজিতেশ ব্যানার্জি, ভানু ব্যানার্জি, সমিত ভঞ্জ, পার্থ মুখার্জি রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রমুখ। এই সব আর্টিস্টদের নিয়ে তপনদা ভুটানের শামচি বাজারে নিয়মিত চিত্র গ্রহণ করছিলেন। এই শিডিউলের মধ্যেই ছিল বৈজন্তীমালার একটা নৃত্যের দৃশ্য। তপনদা তাঁর লোকেশনও দেখে রেখেছিলেন। চামুরচি টী এস্টেটের মধ্যে এক ঘন জঙ্গলের মধ্যে ড্যান্স পিকচাইজেশানের স্পট। তপনদা সূর্যকে (সূর্য তখন সহকারী শিল্প-নির্দেশকের কাজ করছে খ্যাতনামা আর্ট ডিরেক্টার কার্তিক বসুর সঙ্গে) ডেকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। পাহাড়ী এলাকায় ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটা সমতল জায়গায় বনবাদাড় কেটে সাফ করে নিতে হবে—ছবির প্রয়োজন অনুসারে। মূল ক্যাম্প থেকে তার দূরত্ব প্রায় পনের মাইল। জনমানবশূন্য পাহাড়ী জঙ্গল।

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তপন সিংহর তদানীন্তন প্রধান সহকারী শ্যামল চক্রবর্তী সূর্যকে গাড়িতেকরে স্পটে নামিয়ে দিয়ে গেল। বনবাদাড় সাফ করবার জন্যে কিছু লোকাল কুলী আগেই ওখানে হাঁটা-পথে পৌঁছে দিয়েছিল। তারা সূর্যকে দেখে সেলাম ঠুকল।

শ্যামল বলে গেল, সূর্য তুমি কাজ চালিয়ে যাও, আমি দুপুর বেলায় তোমার লাঞ্চ যাতে এখানে পৌঁছে যায়, তার ব্যবস্থা গিয়েই করছি, চিন্তা করো না।

চারিদিকের এত ঘন জঙ্গল দেখে সূর্য সামান্য নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। বলল, দেখ শ্যামল, সময়মত আমাকে এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো কিন্তু...

—হ্যাঁ হ্যাঁ, কোন চিন্তা নেই, তুমি কাজ চালিয়ে যাও—বলে শ্যামল গাড়ী রেস করে বেরিয়ে গেল। তাকে এখুনি শামচি বাজারে গিয়ে তপনদাকে অ্যাসিস্ট করতে হবে। শ্যামলের ওপর অনেক দায়িত্ব। পাকা ড্রাইভার শ্যামল, পাহাড়ী রাস্তায় যেভাবে ড্রাইভ করে বেরিয়ে গেল—তাতে মনে মনে শ্যামলের তারিফ না করে পারল না সূর্য।

তারপর মুখে জর্দা পান গোটাকতক ফেলে দিয়ে সূর্য ড্যান্স লোকেশন তৈরী করার কাজে লেগে পড়ল পরোদস্তুর।

তবে ওই পাহাড়ী জঙ্গল সাফ করা কি সহজ কথা! ছজন পাহাড়ী কুলী পর্যন্ত হিমশিম খেয়ে যাবার দাখিল বুলে বন্ধু, পাথর ফুড়ে যে গাছ আকাশ দেখে—তাকে মাটিতে শোয়ানো মানুষের কাজ নয়।

এই করতে করতে ধাঁ করে একটি পাহাড়ী সাপ মানুষের দিকে রুখে দাঁড়াল। ব্যস, কুলীরা কাঠারি ফেলে দে চম্পট। আইবাপ।

সূর্য একটু দূরে দাঁড়িয়ে কি যেন গুলিগাঠি করছিল, কুলীরা পড়িমরি ছুটছে দেখে সে-ও খানিকটা দৌড়ে নিল। তারপর ওদের জিগ্যেস করল —কেয়া হুয়া?

—সাঁপ।

সূর্য তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল —কিধার?

ওরা স্পট দেখিয়ে বলল—ওধার।

ব্যস, খেল খতম। কে আর ওখানে যায়? সূর্য ওদের অনেক করে বোঝাল, আরে বৈজন্তীমালার ড্যান্স হোগা, চল ভাই, এখন সে ব্যাটা পালিয়ে গেছে—নে ভাই তোরা সিগ্রেট খা—বলে সূর্য ওদের দু প্যাকেট চারমিনার দিল। ওদেরই জন্যে আনা এগুলো।

যাই হোক, খুঁজে দেখা গেল সাঁপ ভাগলবা হয়ে গেছে। সে নিশ্চিত বুঝে গেছে য, এখানে বাঁয়েকোপের লোকেরা কারবার করবে—ফালতু হাঙ্গাম করলে হয়ত ফোকটে আর শুটিং দেখা যাবে না।

আবার জঙ্গল পরিষ্কারের কাজ আরম্ভ হল। ইতিমধ্যে সূর্যদেব মধ্য-গগনে পৌঁছে গেলেন। মতলব সূর্যর পেটে মোচড় পড়ছে ক্ষিদেয় অথচ প্রতিশ্রুতি লাঞ্চ পৌঁছাবার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ মোচড় সহ্য করার পর সূর্য হঠাৎ চটে গেল। কুলীদের লাঞ্চের কোন ব্যাপারই নেই। ওরা সকালে খেয়ে কাজে বেরোয়—আর রাতে বাড়ী ফিরে গিয়ে খায়।

এদিকে বেলা গড়াতে গড়াতে সাড়ে তিনটে হয়ে গেল। সূর্য তখন লাঞ্চের আশা ছেড়ে দিল। মনে মনে শ্যামলকে কিছু ব্লাংগুয়েজ দিল। পাহাড়ে দিনের আলো এর পর থেকে নিষ্প্রভ হতে থাকে। সূর্য প্রমাদ গুনল—এই রেটে আলো পড়তে থাকলে তো আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে অন্ধকার হয়ে যাবে।

সাড়ে চারটে নাগাদ কুলীরা জঙ্গল সাফ করে দিয়ে বিদায় নিল। ওরা এখন পায়ে হেঁটে দশ মাইল দূরের পাহাড়ী গ্রামে ফিরে যাবে। ওদের লিডার বলল—বাবু তুমি যাবে না থাকবে?

সূর্য ফ্যাসাদে পড়ল। তারপর হঠাৎ ডাঁট দেখিয়ে বলল—না আমাকে থাকতে হবে। আমার গাড়ী আসবে।

—তাহলে আমরা চলি...ইয়ে, এটু সাবধানে থেকো বাবু, জঙ্গল এলে এটা কথা...

—কেন কেন? ভয়টয় আছে নাকি ইয়ের?

—না তেমন কেন ভয় নেই, তবে হোঁশিয়ার থাকাই ভাল ....চলি সাহাব—

কুলীরা সেলাম করে ওদের হাতিয়ার কাঁধে তুলে নিয়ে কোরাসে গান গাইতে গাইতে পাহাড়ের ঢালু রাস্তা দিয়ে নেমে চোখের আড়ালে চলে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে।

অমনি পৃথিবীর সমস্ত নির্জনতা সূর্যকে যেন গ্রাস করল।

পাহাড়ের ওপর ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসছে। সূর্য রাস্তার দিকে চেয়ে হা-পিত্যেশ করে বসে আছে। দূর জঙ্গল থেকে অজানা সব জন্তু-জানোয়ারের ডাক ভেসে আসছে। ফলে সূর্যের গায়ের লোম খাড়া।

এমন সময় দূর থেকে মোটরগাড়ীর আওয়াজ ভেসে এল। সূর্যর অভিমান তখন কানায় কানায় যেন উপচে পড়ছে। মুখ ফিরিয়ে গোঁসা করে বসে রইল। আসুক একবার শ্যামল—দিচ্ছি আজ ওকে ভাল করে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঘ্যাঁচ করে গাড়ীর ব্রেক কষার আওয়াজ হল। সূর্য তবুও মুখ ফেরাল না। অথচ—

—হোয়াট ইউ আর ড়ুয়িং হিয়ার? হু আর ইউ? পেছনে বাজখাই গলার ইংরাজী ধমক শুনে সূর্য আঁৎকে উঠে মুখ ঘুরিয়ে দেখে দশাসই চেহারার এক ইংরেজ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছে—কোমরে হাত রেখে। ওর মুখে সহসা কোন জবাব জোগাল না।

আবার ধমক—আনসার মী...ইউ...

সূর্য কোঁতো। বলল—সার, আই আম সুরিয়া (সূর্য ভাবল এই উচ্চারণ ইংরেজের পছন্দ হবে)...।

—সুরিয়া? হোয়াট সুরিয়া? হু সুরিয়া?

—আই আম সুরিয়া মানে সূর্য চ্যাটার্জি—অ্যাসিসটেন্ট আর্ট ডিরেকটার—মানে আমরা এখানে শুটিং করব তো, তাই জায়গাটা এটু পোস্কার করতে এয়েছিলাম—

জানা গেল—এই সাহেবই হচ্ছে চামুরচি টী এস্টেটের ম্যানেজিং ডিরেকটার। কোথায় যেন গিয়েছিল, এখন বাগানে নিজের বাংলোয় ফিরছে। আকণ্ঠ গিলে এসেছে।

সাহেব বলল,—লিসিন সুরিয়া, খুব বে-আইনী কাজ করেছ তুমি। এটা আমার প্রোটেকটেড এলাকা। বিনা অনুমতিতে তুমি এখানে ঢুকেছ—তোমাকে জেল দিতে পারি!

—এ্যাঁ জেল! সূর্য ঢোক গিলল।—সাহেব, তোমার বাগানের ম্যানেজারের পারমিশান নিয়েছি আমরা—

—কই দেখি পারমিশান পেপার?

—ক্যাম্পে আছে। রেড ব্যাঙ্ক টী-এস্টেটের বাংলোয়...যাই হোক, অতি কষ্টে সাহেবকে বোঝাল সূর্য যে সে কোন অন্যায় কাজ করেনি। ফিল্ম কোম্পানীর কথা শুনে সাহেব জানতে চাইল কী ধরনের শুটিং হবে। সূর্য বলল, সাহেব তুমি বৈজয়ন্তী-মালার নাম শুনেছ? সে এখানে নাচবে। এ গ্রেট ইণ্ডিয়ান ড্যান্সার। সাহেব খুশী। বলল আমি নিশ্চয় সে নাচ দেখব। ড্যান্সারের সঙ্গে আলাপ করারও ইচ্ছে রইল। তারপর সাহেব অকস্মাৎ প্রশ্ন করল—তা তুমি একলা এখানে বসে রয়েছ কেন—

—আমি আমাদের গাড়ীর জন্যে অপেক্ষা করছি।

—গুলি মারো গাড়ীর। তুমি আমার সঙ্গে চল আমার বাংলোয়। তুমি আর্ট ডিরেকটার, আমিও ম্যানেজিং ডিরেকটর। আমার সঙ্গে খানাপিনা করবে—

—সরি সার, রাত্রে আমার অন্য কাজ আছে।

—তাহলে আর কি, আমি চলি। আর তুমি চিতাবাঘের পেটে যাবার জন্য তৈরী হও—বলে সাহেব গাড়ী স্টার্ট দিয়ে চলে গেল। বলে গেল—ভালুক যদি অ্যাটাক করে—আমার কথা বলো—রেহাই পেয়ে যাবে—গুড নাইট—

মাতাল সাহেব ফুলস্পীডে গাড়ী রেস করে চলে গেল।

আর ভাবল আমার হয়ে গেল আজ। চিতাবাঘ নয়তো ভালুক! নাঃ, আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে মশার কামড় খাবার কোন অর্থ হয় না। চলি। সূর্য হাঁটতে আরম্ভ করল সামনের পনর মাইলের দিকে। তখন রেডিয়াম দেওয়া হাতঘড়িতে ইণ্ডিয়ান স্টাণ্ডার্ড টাইম—পাক্কা সোয়া সাতটা রাত্তির।

আর ঠিক সেই সময় রেড ব্যাঙ্ক টী গার্ডেনের বাংলোর একটা ঘরে তপন সিংহ তাঁর সহকারীদের নিয়ে তাস খেলতে বসেছেন। খেলতে খেলতে হঠাৎ তিনি তাস থেকে মুখ তুলে জানতে চাইলেন—শ্যামল সূর্যকে দেখছি না কেন? কাল ফেরেছে বলে সেকি মনের দুঃখে আজ আমাদের বয়কট করেছে? তাকে ডাকো—

এক মুহূর্ত নীরবে কাটল। তারপর শ্যামল হাতের গ্রাস্থ জিতে যাওয়া কার্ড গুলো ফেলে দিয়ে বিদ্যুৎবেগে সটান উঠে দাঁড়াল।

তপন সিংহ অবাক।—কী হল?

শ্যামল নিজেকে তৎক্ষণাৎ সংযত করে নিয়ে বলল—না কিছু না তপনদা...ইয়ে হয়েছে মানে...এক সিকিউজ মী, তপনদা, আমি একটু আসছি—বলে কাউকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই শ্যামল দ্রুত-গতিতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

(চলবে)

রঞ্জন মজুমদার

লোকেশন থেকে

রাত দুপুরে দিলীপ রায়ের ঘুম ভাঙিয়ে ওঁর ঘরে যখন আমাদের বাকি রাতটুকু শোবার তোড়জোড় চলছে, তখন ঘুম জড়ানো চোখ দুটো আধখোলা করে তিনি বলে উঠলেন; 'আর জ্বালাইও না, হুইয়া পড়, কাউলকা হকালে সুটিং আছে।'

সকালবেলা ঘুম ভাঙালেন পরিচালক গুরু বাগচী নিজে। ঘুম থেকে ঠেলে তুলে বললেন—চটপট উঠে পড়ুন, স্পটে যাবেন তো!'

চোখ রগড়াতে রগড়াতে বাইরে এসে দেখি চোখের সীমানা অব্দি জনমনিষ্যির চিহ্ন নেই কোথাও। চতুর্দিকে ছোট ছোট টিলার ভিড়। ধূ ধূ পাথুরে মাঠের ওপরে দিগন্তরেখায় উঁচু পাহাড়শ্রেণী পুব থেকে পশ্চিম অব্দি ছড়ানো।

এই সেই বিভূতিভূষণের ঘাটশিলা। তাঁর জীবনের ঘটনাবহুল অনেকগুলো স্মৃতির পাতা এই পাহাড়ী এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে। (পরে শুনেছি আমাদের আস্তানাটির সঙ্গেও নাকি বিভূতিভূষণের স্মৃতি জড়িয়ে আছে।)

বেলা তখনও ছটা ছাড়িয়ে সাতে পৌঁছয়নি। কিন্তু সূর্যতপ্ত মধ্যাহ্নের তীব্রতায় উপস্থিত। একটু বাদে আবার ডাক এলো পরিচালকের কাছ থেকে। সুটিংয়ে যেতে হবে।

সুটিং স্পট সামনেই। ন্যাশনাল হাই-ওয়ের কাছে এক মিঃ মিত্রের সুন্দর সাজানো বাড়ীটাই সেদিন সকালের সুটিং স্পট। গেটের কাছে গিয়ে দেখি ক্যামেরাম্যান মনীশ দাশগুপ্ত তাঁর সহকারী শংকর গুহকে নিয়ে লাইটিং টাইটিং করে একবারে রেডি। পরিচালকও ব্যস্ত হয়ে ঘুরছেন।

আমাদের ভ্যান থেকে দিলীপ রায় আর সুলতা চৌধুরী নামতেই ওঁদের নিয়ে যাওয়া হোল সুটিং জোনে। কয়েকবার রিহার্সালের পরই দিলীপবাবু হয়ে গেল সৌমেন।

যে বাবার অমতে গোপা নামে একটি অসবর্ণের মেয়েকে বিয়ে করে। ফলে তাঁকে বাড়ী ছাড়তে হয় একদিন। এবং কয়েক বছর বাদেই সৌমেন গোপার ভালোবাসার

ফসল জয় হয় পিতৃমাতৃহীন। কিশোর জয়ের মনে পিতৃস্মৃতি অম্লান। সে স্থান পায় আধুনিকা পিসি মিসেস রায়ের কাছে। সেখানে তার সঙ্গী হয় পিকলু যে স্বভাব-চরিত্রে জয়-এর একবারে বিপরীত। সকালের সুন্দর শিশিরমাখা ফুলের মত তাজা জয় পদে পদে বাধা পেতে থাকে এই নতুন জীবনে। অ-সম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পিকলু কখনই পেরে ওঠে না জয়-এর সঙ্গে।

দুজনের দুটি দল তৈরী হয়। স্কুলে এবং স্কুলের বাইরে জয়কে অপদস্ত করাই পিকলুর দলের কাজ। ইতিমধ্যে পিসি আর পিকলুর কাছ থেকে জয় ভালো ব্যবহার না পেয়ে স্থানীয় এক কিপটে বুড়োর কাছে মন দিয়ে বসে আছে। ফুলের মত সরল কিশোর জয় কিপটে বুড়োকে দিয়েছে আমলে বদলে। বাড়ীতে ঠাকুরমার রাখী ঝি শঙ্খমণী (ছায়া দেবী) ভালবাসে জয়কে। স্নেহে আদরে তাকে সময়ে-অসময়ে কাছে টেনে নেয়।

অপদস্তের চূড়ান্ত ঘটে যেদিন পিকলু জয়কে চোর সাব্যস্ত করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। হলোও তাই। ঘটনাচক্রে প্রমাণিত হোল জয় নির্দোষ। মিসেস রায় নিজের ভুল বুঝতে পারলেন, পিকলুও শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে ছোটভাইকে কাছে টেনে নিল একদিন।

এইমাত্র আমাদের চোখের সামনে দিলীপ রায় সৌমেন সেজে, অসুস্থ পিতাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। বোন আটকাতে চেষ্টা করলো, পারল না। পিতার জেদের কাছে আত্মসমর্পণ না করে স্ত্রী গোপার কাছে চলে গেল সৌমেন।

রোদ্দুরের তাপ বাড়ছে। ঘাটশিলার পাথুরে জমি দাউ দাউ করছে যেন। আমরা মিঃ মিত্রের ঘরের মধ্যে বসে টের পাচ্ছি না বটে কিন্তু শট দিয়ে শিল্পীর ঘর্মাক্ত দেহে ক্লান্ত শরীরে যেভাবে ফিরছেন তাতে বুঝতে পারছি অবস্থাটা।

ক্যামেরা পজিশন বদলে জয়কে নিয়ে একটা দৃশ্য গ্রহনের পর লাঞ্চ ব্রেক। দুপুর এগারটা তখন। বেস-ক্যাম্প বিভূতি সংস্কৃতি ভবনে ফিরে এসে গুরুবাবু বললেন—বিকালে সুবর্ণরেখায় শুটিং আছে। চটপট একটু বিশ্রাম করে নিন।

এই ফাঁকে জেনে গেছি এস-বি পিকচার্সের ব্যাপারে এই 'জয়' ছবির কাহিনীকার হচ্ছেন আনন্দ মুখার্জি.. কয়েকখানি গানও লিখেছেন তিনি এবং সুরও দিচ্ছেন। গানগুলি গাওয়ানো হয়েছে শ্রাবন্তী মজুমদার, হৈমন্তী শুক্লা ও হেমন্ত মুখার্জিকে দিয়ে।

দুর্ভাগ্য, ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হোল না। উনি নাকি সেদিন কলকাতায় গিয়েছেন বিকাশ রায় ওরফে কিপ্টে বুড়োকে আনতে। পরদিন আসবেন।

ভর-দুপুর রোদে ধুলোর ঝড় তুলে সুবর্ণরেখার পাড়ে গিয়ে দেখি নীরবে সে পড়ে আছে। ছোট বড় পাথরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ছোট সরু জলের রেখা লুকোচুরি খেলতে খেলতে দূরে কোথায় যেন হারিয়ে

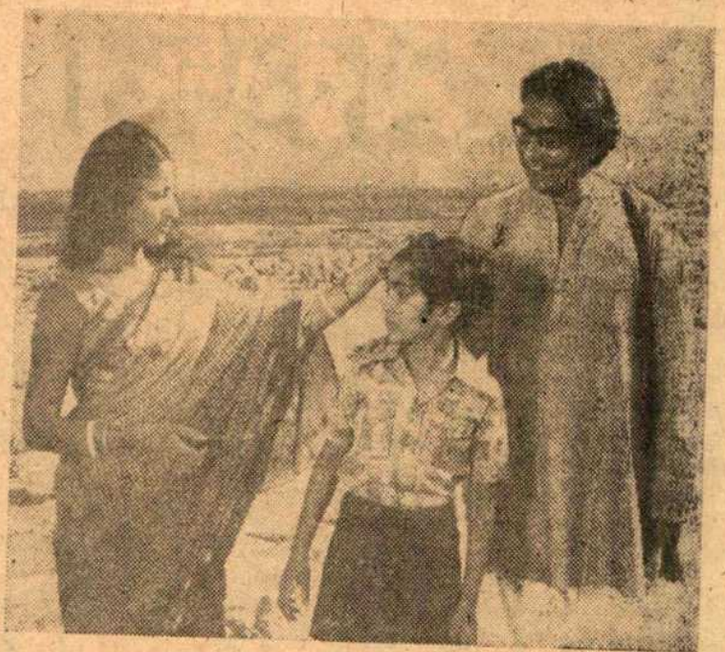

জয়/বুলবুল চৌধুরী, পার্থ দাশগুপ্ত ও দিলীপ রায়। অমৃত ফটো

গেছে। ওপারে ধূ ধূ বালিয়াড়ি। এপারে ইঁটের পাঁজায় কাজ করছে কিছু স্থানীয় মেয়ে-পুরুষ।

পরিচালক ক্যামেরা বসিয়েছেন একবারে নদীর পাড়ে। গাছগাছালির ছায়ায় আমরা সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কম্পোজিশান ঠিক করে রিহার্সাল দেওয়াচ্ছেন গুরুবাবু তাঁর শিল্পীদের।

এই শটের শিল্পী হচ্ছেন দিলীপ রায়, বুলবুল চৌধুরী অর্থাৎ গোপা আর জয় মানে মাঃ পার্থ। রুমন গোপাকে চেঞ্জ নিয়ে এসেছে সৌমেন। জয় আছে সঙ্গে। আশ-পাশে কোথায় যেন গাধীর বাচ্চা দেখে সেগুলো নিয়ে আসবার আবদার জানায় বাবার কাছে জয়।

বাবা বুঝিয়ে বলেন, 'তোমায় যদি একটা ঘরে বন্ধ করে খেতে দেয় পোষ মানাতে চায়, তোমার 'ভালো লাগবে?'

জয়—না, তা লাগবে কেন?

সৌমেন—তাহলে। এই যে আকাশে কেমন সুন্দর পাখীরা উড়ে বেড়াচ্ছে, ওদের খাঁচায় বন্ধ করলে কষ্ট হবে না?

জয়—সত্যিই তো! খাঁচায় ওদের অনেক কষ্ট তাই না বাবা!

পরবর্তী জীবনে পিতাকে নিয়ে এই স্মৃতিগুলো মনে পড়বে জয়ের। বাবাই তার কাছে হবে আদর্শ পুরুষ।

কাটা কাটা শটে এই দৃশ্যটি গ্রহণ করার ফাঁকে একসময় উঠলো ধূলোর ঝড়। কাপড়ে ক্যামেরা মুড়ে হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে সময় কাটল কিছুক্ষণ। সূর্যদেবও ততক্ষণে অস্তাচলের পথে। দিনের কাজও শেষ।

ইউনিটের সবাই হুড়মুড় করে তখন নেমে এলেন সুবর্ণরেখার বুকে। কাজ না থাকলেও সুলতা চৌধুরী, পদ্মা দেবী চলে এসেছেন স্পটে। সংক্রামিত উৎসাহ নিয়ে বৃদ্ধা পদ্মা দেবীকেও সুবর্ণরেখায় নামতে দেখে দিলীপবাবু বলে উঠলেন, 'মা, ওমা, তুমি নামছ কেন উঠতে পারবে না।'

হেসে পদ্মা দেবী বললেন—'এতগুলো ছেলে রয়েছে, একটা মাকে তুলতে পারবে না? কি ছেলেগো তোমরা!' গলায় আদরের সুর।

এই সুর আর আদরের ছোঁয়া পদ্মা দেবীর কাছ থেকে সবাই পেয়েছে সর্বক্ষণ। সস্নেহে বসিয়ে রাত্রে সবাইকে খাইয়েছেন। ভোরবেলা জলখাবার পেলাম কিনা তার তদারকি করেছেন। এমনকি পরদিন ফেরার সময় এক ঠোঙ্গা বিস্কুট হাতে দিয়ে বলেছেন, 'পথে খেয়ে নিও, না খেয়ে যাচ্ছো।'

ও'র ব্যবহারটাই অমন। মুহূর্তে আপন করে নেন অপরিচিতকে।

পরদিন ভোরে কলকাতা থেকে এলেন বিকাশ রায় ও পিকলু ওরফে মঃ বাপ্পা। শুটিং হবে স্টেশনের কাছে এক আমবাগানে। কিপ্টে বুড়োর বাগান থেকে আম চুরির সিন। বিকাশবাবু সারা রাতের পথশ্রান্তিতে সকালে শুটিং করতে পারেনি। চলে এলাম আমরা দুপুরে। ইউনিটের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়ীতে ওঠবার সময় প্রযোজক কৈলাস বাগচী বললেন—আমি ছিলাম না। কেমন আদরযত্ন হয়েছে জানি না।'

তখন বার বার মনে পড়ছিল সকলের মা পদ্মা দেবীর কথা। ভ্যানে ওঠার সময় বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—'কলকাতায় গিয়ে দেখা করো।'

এখনও ও'র সঙ্গে দেখা করা হয়ে ওঠেনি।

মুসাফির

কয়েকজন

তারকনাথ রায়

ঢাকার রায় বাড়ীতে এর আগে কেউ কোনোদিন চাকরী তো করেই নি ব্যবসাও নয়। অবশ্য স্বাধীনতার শেষভাগে জমিদারীর সূর্য প্রায় অস্তমিত চাকরী না হোক ব্যবসা ছাড়া চলবেই বা কি করে। তাই শেষ জমিদার ঢাকা ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট জমিদারের ছেলে তারকনাথ রায় স্থির করলেন চাকরী ব্যবসা দুটোই করবেন।

তখন এপার বাংলার ছবি ওপার বাজারে বেশ রমরমা চলছে। কলকাতার আগমনী প্রিন্টার্সের কর্মকর্তা হাটখোলার কে কে দত্ত বিজনেস বাড়াবার জন্য ঢাকায় ডিস্ট্রিবিউশনের আলাদা অফিস খুলতে চলেছেন সেখানেই তরক রায়ের সঙ্গে পরিচয় হোল তাঁর। স্মার্ট-সপ্রতিভ যুবক তারকবাবুকেই তিনি দায়িত্ব দিলেন ঢাকার অফিসের। প্রথম দেখাতেই বুঝেছিলেন ছেলেটির এলেম আছে দাঁড়াবে একদিন।

ব্যবসা মন্দ চলছিল না। অফিসের ম্যানেজারী ছাড়াও কোনো কোনো ছবির লভ্যাংশ বাবদও কিছু পেতেন তিনি। কিন্তু লক্ষ্মীতো চঞ্চল! বাহান্ন সাল নাগাদ রাজনৈতিক কারণে দুদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য হোল বন্ধ। কলকাতার ছবি আর ঢাকায় যায় না।

বছর দুই অপেক্ষার পরও দেখলেন অবস্থার কোনো পরিবর্তন নেই। চুয়ান্ন সালে এলেন কলকাতায়। ব্যবসায়িক কারণে অবশ্য আসেননি। এক বন্ধুর বিয়েতে এসেছিলেন। কে কে দত্তের সঙ্গে দেখা হতে তিনি বললেন—'ঢাকায় তে আর বিজনেস করা যাচ্ছে না। এবর এখানেই শুরু করুন তাহলে?'

তারকবাবু তো বিস্মিত। এই প্রায় অচেনা-অজানা শহরে ব্যবসা তিনি করবেন কি করে? তাও আবার ফিল্মের ব্যবসা! মুশকিল আসান করলেন দত্তবাবুই! ও'র হাতে কিছু ছবি ছিল সেগুলোই তারকবাবুকে দিলেন পুঁজি হিসাবে।

সবগুলোই হিন্দী ছবি। চার-পাঁচখানা ছবির পরিবেশন নিয়ে জন্ম হোল এস বি ফিল্মসের। তখন ঠিকানা ছিল ৬ মাডান স্ট্রীট। বাবর্চী; শাহী মেহমান; সালতানাৎ রাজদরবার; সীতারামগড় ছবিগুলো দিয়ে বিজনেস চলছিল ভালই।

পরিবেশক হিসাবে এই পূর্বাঞ্চলে তখন এস-বি ফিল্মসের নাম সবেমাত্র হতে শুরু করেছে।

প্রোডাকশনে হাত দেবেন কিনা ভাবছেন। বললাম—'বাংলা ছবি নিচ্ছিলেন না এখন?'

সেকথাই বলছি শুনুন। প্রমথেশ বড়ুয়ার চিত্রনাট্যে নীরেন লাহিড়ী 'মধুমালতী' ছবিটা করলেন। প্রোডাকশান আমার নয় যমুনা বড়ুয়ার। স্টার ছিলেন তখনকার সব নামকরা শিল্পী। কাবেরী বসু-অভি ভট্টাচার্য বসন্ত চৌধুরী তখন বাজারের টপ ফেভারিট। ডিস্ট্রিবিউশন নিলাম আমি।

দুর্ভাগ্য ছবিটা চলল না। কি কারণে ঠিক বলতে পারব না।

প্রথম বাংলা ছবিতেই মার খেয়ে বেশ দমে গিয়েছিলেন তারকবাবু যারারই কথা। পরবর্তী কয়েক বছর আর বাংলা ছবির নাম মুখে আনেনি।

বললেন—'একটা ছবি মার খেলে তার ধাক্কা সামলাতে গিয়ে অনেকটা পিছিয়ে যেতে হয়। সেই দায়িত্ব বা রিস্ক নেবার মতো ক্ষমতা এবং সাহস আমার নেই।

অকপট স্বীকারোক্তি।

এপর্যন্ত এস বি ফিল্মস যেসকল ছবির সঙ্গে নানাভাবে জড়িত হয়েছে তার কোনটিকেই চলতি অর্থে পরীক্ষামূলক বা আর্ট ফিল্ম বলা যাবে না। নতুন ধরনের কোনো ছবি করার চেষ্টাও তাই নেই তারকবাবুর ফর্মুলামাফিক কমার্শিয়াল ছবির কথাই চিন্তা করেন তিনি। যাক সে কথায় পরে আসছি।

'মধুমালতী' তো ফ্লপ করলো।

এস বি ফিল্মস ফিরে গেল হিন্দী ছবির ব্যবসায়। ছবির তালিকায় স্মৃতির জাল ফেলে তিনি অনেকগুলো নাম তুলে আনলেন।

তারকনাথ রায়ের চেহারায় ব্যক্তিত্ব সুপ্রকট। কথার ফাঁকে ফাঁকে ফোন অ্যাটেন্ড করছেন আর দুদিন বাদেই ছবি রিলিজ হবে তাই ভীষন ব্যস্তও এখন। আগের রাতে ছবির ট্রায়াল-শো দেখেছেন।

জিজ্ঞেস করলাম—'কেমন বুঝছেন?'

হাসিমুখে বললেন—'পাবলিকের মর্জি বোঝা মুশকিল।'

সত্যিই তাই। ফিল্মের ব্যাপার কেউ কোনদিন নিশ্চিত করে বলতে পারে না কোন্ ছবি লাগবে আর কোন ছবি লাগবে না।

অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশায় দুলতে দুলতে আবার চৌষট্টি সালে এস বি ফিল্ম এলো প্রোডাকশনে। প্রথম ছবি 'জয়া'। হিট। পরবর্তী ছবি 'হঠাৎ দেখা'ও মন্দ চলেনি। তিন নম্বর ছবি 'প্রস্তর স্বাক্ষর'ও একই রকম। চতুর্থ ছবি 'বৌদি' হিট করল। পরের ছবি কলঙ্কিত নায়ক সুপার সুপার হিট।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা। ফিল্ম ব্যবসার বেশীরভাগ ডিস্ট্রিবিউটর শুধুমাত্র ছবিই পরিবেশন করেন না ছবি নির্মাণে

স্ত্রী/উত্তম—আরতি

সময়ে প্রোডিউসারকে টাকাও ধার দেন অবশ্যই স-সুদ। এই কাজটিকে ব্যবসায়িক পরিভাষায় বলে ফাইনান্সিং অর্থাৎ ডিস্ট্রিবিউটর মাত্রেই ফাইনান্সিয়ারও বটে। এস বি'র পরিবেশিত অধিকাংশ বাংলা ছবিতে তাই তারকবাবুর ইনভেস্টমেন্ট কম ছিল না। কখনও কখনও ছবি শেষ হবার পর এস বি সেটি কিনেও নিয়েছে।

জানতে চেয়েছিলাম হিন্দী ছবির নির্ভাবনার ব্যবসা ছেড়ে বাংলা ছবির জগতে আবার ফিরে আসার কারণ?

কোনো ভনিতা না করে পরিষ্কার ভাষায় তিনি বললেন—'ঐ সময় থেকেই রঙীন ছবি তৈরী শুরু হয় বোম্বাইয়ে। ছবির কস্ট হায়ার যেতে লাগল প্রায় চারগুণ। এক একটা ছবির ডিস্ট্রিবিউশন রাইট কিনতে দর পড়তে লাগল প্রায় আট-দশ লাখ টাকা। অত টাকার রিস্ক তিনি নিতে চাইলেন না। তাই অল্প টাকা দিয়ে শুরু করলেন বাংলা ছবির ফাইনান্সিং এবং ডিস্ট্রিবিউশন।

সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে তরতরিয়ে তিনি ওপরে উঠে এলেও দু একটা ছবির অসাফল্য নিয়ে তাকে কম বিব্রত হতে হয়নি। ফেলিওরকে তিনি উইথ অল অ্যাসপেক্ট বিশ্লেষণ করেছেন। 'ছন্দপতন'-এর কারণ তাঁর মতে—'শিল্পীদের মিস কাস্টিং। আর 'প্রস্তর স্বাক্ষর' সম্পর্কে তারকবাবুর স্পষ্ট মন্তব্য : ছবির সাসপেন্সটাই তো প্রথমে দর্শকরা জেনে ফেলল সে ছবি আর ধরে।

পূর্ববর্তী পর্যায়ে গল্প নির্বাচন—আর্টিস্ট সিলেকশন সব ব্যাপারেই তিনি খুব সাবধানে করেন। প্রযোজক - পরিচালকদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা চলে। তবুও ছবির ভাগ্য কে বলতে পারে?

এস বি ফিল্মস অবশ্য থেমে নেই। প্রফুল্ল রায়ের কাহিনী অবলম্বনে 'আকর্ষণ' খুব শিগগির ফ্লোরে যাচ্ছে। তারকবাবু বিশ্বাস করেন—'ছবি লাগানোর আসল চাবিকাঠি হোল গল্প। একটা নিটোল গল্প ঠিকমত বলতে পারলে দর্শক নেবেই।' শংকরের সম্রাট ও সুন্দরী'ও করবেন এস বি ফিল্মস।

ফিল্ম ব্যবসায়ের উত্থান পতনে দুলতে দুলতে আজ তারকনাথ রায় সিজনড হয়ে গেছেন।

আগামী অর্ডিনান্স নিয়ে আলোচনায় আসতে দেরী হয়নি। বাংলা ছবির আর্থিক দুরবস্থার কথা প্রসঙ্গে যখন বললাম—'অর্ডিনান্স তো আসছে এবার বোধহয় কিছু সুরাহা হবে।'

স্থিমত হলেন না তিনি কিন্তু অর্ডিনান্সের বিশদ টেকসট না পাওয়া পর্যন্ত আশঙ্কা আর আনন্দের মাঝখানে। কি হবে না হবে সেই কথাটা এখন ভাবছেন সবাই। বিগ বাজেটের ছবি করিয়েরা একটু অসুবিধেয় পেতে পারেন হয়তো।

তারকবাবুই বললেন—'আমার ছবি কোন চেনে রিলিজ হবে এদ্দিন ছবি তৈরীর শুরুতেই তা জানা যেত। ফ্লোরে আনেক সময় সেইসকল হল মালিকও প্রোডাক

হঠাৎ দেখা চিত্রের দৃশ্য

সনে টাকা খাটাতেন ভায়া ডিস্ট্রিবিউটর অর্ডিনান্সের মূলে সেন্সরওয়াইজ রিলিজ হলে কোন চেনে ছবি পড়বে বোঝা যাবে না.....ইত্যাদি' আরও কিছু অসুবিধের কথা তুলে তারকবাবু আশার সুর বললেন—'কলকাতার মেইনলি রিলিজ হাউসগুলো সরকারের এখুনি নেওয়া দরকার। আর হাউসের সঙ্গে ভাগ-বাটোয়ার ব্যাপার নিয়ে 'নিখুঁত পরিষ্কার' আইন হওয়া প্রয়োজন। তাহলেই সত্যিকার কিছু কাজ পাব আমরা।'

সিনেমা একদিকে যেমন আর্ট তার অন্যদিকে রয়েছে কমার্স। দুয়ের মিলন না হলে কারও পক্ষেই সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকা অসম্ভব। আর্টের চর্চায় দিন কাটালে চর্চাই হয়তো যাবে বন্ধ হয়ে। আর কটর কমার্শিয়াল ভাবগতে ছবি করলে সিনেমার শিল্পের দিকটাও অবহেলিত থাকতে পারে।

তারকনাথ রায় এই দুয়ের সাযুজ্য রেখে ছবি তৈরীর পক্ষপাতী। তাঁর মতের প্রমাণ রয়েছে নগর দর্পণে; স্ত্রী; দারী ইত্যাদি ছবিতে। আগামী ছবিগুলিতেও তিনি অন্য পথে যাবেন বলে মনে হয় না। কারণ এস বি ফিল্মসের দুর্নাম সুনামের ভাগীদার তো এখন তিনিই।

নিরীক্ষিত

দর্শক—এ কাহিনীরও যে মঞ্চ-রূপায়ণ সম্ভব, না দেখলে তা' বিশ্বাস হয় না। পত্র-পত্রিকা — মঞ্চকৌশলের সম্পূর্ণ নতুনত্ব এবং চলমান ঘটনার দৃশ্য বিন্যাস— সব মিলিয়ে এ এক নিখুঁত মঞ্চমায়া। সকলের ভাল লাগা একটি প্রযোজনা।

রঙ্গনায় ৬ই জুলাই সন্ধ্যা ৭টায়

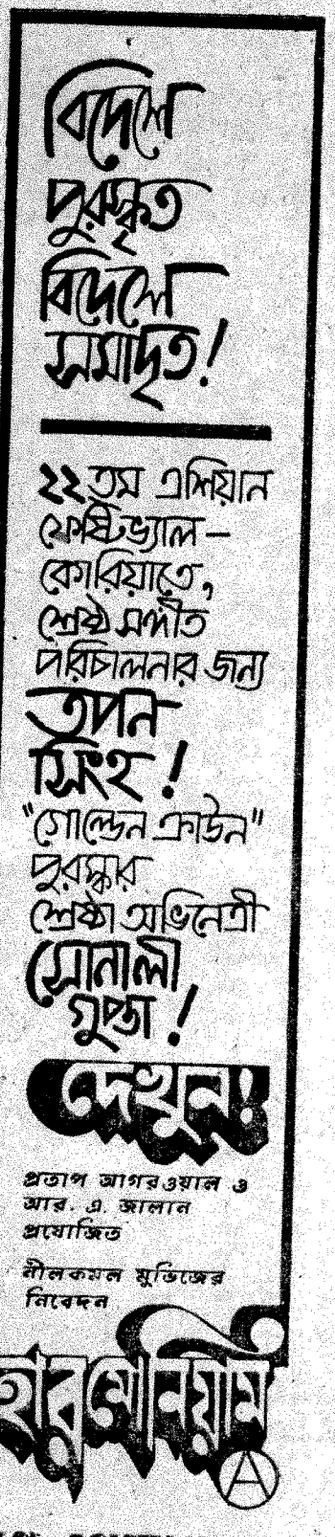

নাটমঞ্চ

মিনার্ভায় ব্যভিচার

প্রযোজনা : অনিমা ব্যানার্জি। নাটক ও নির্দেশনা : সমর মুখার্জি। মঞ্চ : শৈলেন দে। আলো ও শব্দ : মিনার্ভার কর্মীসঙ্ঘ। অভিনয়ে : কমল মিত্র, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়; ঠাকুরদাস মিত্র; বঙ্কিম ঘোষ, অজয় গাঙ্গুলী; সুখেন দাস; মনু মুখার্জি; সন্দীপ; মঞ্জু দে; শিপ্রা মিত্র; সোমা গাঙ্গুলী; শিখা; সুমিতা আরো অনেকে এবং গৌরীশংকর ব্যানার্জি।

সমাজের বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যভিচার ও তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের সুরে ঝঙ্কৃত মিনার্ভা মঞ্চের বর্তমান নাটক ব্যভিচার। বিভিন্ন ব্যভিচার সম্পর্কে সমাজকে সচেতন করতে গিয়ে ব্যভিচার সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ ঘটনা মঞ্চে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যার আকর্ষণ দুর্বার। এবং এই আকর্ষণে নাট্যামোদীরা নাটকটি দেখতে যে ভিড় করবেন তা সুনিশ্চিত করে বলা যায়।

ধনী ব্যবসায়ী মিঃ ব্যানার্জি—অংশীদার মিঃ পাকড়াশীর সহযোগিতায় বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারী। সৎপথে এই অর্থ উপার্জিত হয়নি। তাই মিঃ ব্যানার্জির দ্বিতীয়া স্ত্রী এবং প্রথমার কনিষ্ঠ পুত্র শুভ মিঃ পাকড়াশীর সংস্রব পরিত্যাগ করতে বলে। ব্যানার্জির মনেও ভাবান্তর দেখা দেয়। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর মিঃ ব্যানার্জি পুনরায় বিবাহ করেন। প্রথমার দুই পুত্রের জ্যেষ্ঠ আনন্দ—বৈরাগ্যের আড়ালে ব্যভিচারে লিপ্ত। শুভ বিমাতাকে ভুল বুঝলেও শেষপর্যন্ত তার সুপ্ত মাতৃত্বে মুগ্ধ হয় এবং বিমাতার পৃষ্ঠপোষকতায় একদল আদর্শবাদী ছেলেকে নিয়ে 'বর্ণ-পরিচয়' সম্প্রদায় গড়ে তুলে গরীব শ্রমিকদের শিক্ষার আলোকে আলোকিত করে তোলার কাজে নামে। নানান বিপর্যয় চক্রান্তজাল ভেদ করে এরা জয়ী হয়। পুলিশ পাকড়াশী ও অন্যান্যদের গ্রেপ্তার করে।

ভেজাল বেবীফুড; বিদেশে দেবদেবীর মূর্তি পাচার; ধর্মের নামে ব্যভিচার প্রভৃতি অসামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে মদ এবং মেয়েমানুষের সর্বনাশ সাধনের অপকীর্তি যেমন নাটকটিতে দেখানো হয়েছে—তেমনি এগুলির বিরুদ্ধে প্রচন্ড প্রতিবাদের চড়া সুরেও নাটকটি বিধৃত। প্রেম-ভালবাসা-জিঘাংসা সবকিছু আবর্তে নাটকটি আবর্তিত। নাটকার হিসেবে সমর মুখার্জির যতটা না প্রশংসা করবো—তার চেয়ে বেশী প্রশংসা করবো নাট-ঘটনা চয়নের মালাকার এবং নাটপরিচালক হিসেবে। চিকিৎসাবিদ্যায় 'গ্রাফটিং' কথাটির সঙ্গে আমরা পরিচিত। দেহের এক স্থানের ত্বক নিয়ে আর এক স্থানে মিশিয়ে দেবার কাজে আমাদের দেশে বিভিন্ন শল্য চিকিৎসকরা যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে থাকেন। বর্তমান নাটকটিকে, দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে নাটকার বিভিন্ন বক্তব্যের বিভিন্ন ঘটনাকে সুন্দরভাবে সংযোজনা করেছেন। প্রতিজন শিল্পী চরিত্রানুযায়ী সুঅভিনয় করেছেন। কিন্তু ঠাকুরদাস মিত্র (ব্যানার্জি) কমল মিত্র (পাকড়াশী) কানু বন্দ্যো (সৎ কর্মচারী) মঞ্জু দে (বিমাতা) শিপ্রা মিত্র (সন্ধ্যার মা) প্রভৃতি খ্যাতনামা শিল্পীরা স্ব স্ব চরিত্রা-ভিনয়ে এমন কোন সুযোগ পাননি যাতে তারা দর্শকমনে বিশেষ ছাপ আঁকতে পারেন। স্বামীর মন জুড়ে প্রথমা স্ত্রীর স্মৃতি এবং বুকভরা স্নেহ থাকা সত্ত্বেও সপত্নী পুত্রদের মা হতে না পারার বেদনার অন্ত দ্বন্দ্বের সংঘাত ফুটিয়ে তোলার যতটুকু সুযোগ আছে মঞ্জু দে তা ফুটিয়ে তুলছেন অন্যান্য চরিত্রে বিন্দুমাত্র নাটসংঘাত পরি-লক্ষিত হয়নি। অজয় গাঙ্গুলী আনন্দ চরিত্রে খুব স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন। সুখেন দাসের পানতুয়া দর্শকদের কৌতুকরসে মাতিয়ে নিলেও—অস্বাভাবিক চরিত্র। সোমা গাঙ্গুলীর সন্ধ্যা সুন্দর। এই চরিত্রটিরও প্রশংসা করবো। আদর্শবাদী নায়ক শুভর চরিত্রে তরুণ নায়ক গৌরীশংকর ব্যানার্জি চরিত্রটির মর্যাদা রেখেছেন। আগামী দিনের তরুণ নায়করূপে তার প্রতিষ্ঠার পথ চেয়ে থাকবো। নায়কের মামা চরিত্রে বঙ্কিম ঘোষ মূল অভিনেতা হলেও তার অনুপস্থিতিতে মনু মুখার্জির অভিনয় যথাযথ। শুভর বন্ধু অটল এবং বড়দার চরিত্রের শিল্পীরাও প্রশংসনীয়। শিখা এবং সুমিতা তাদের চরিত্রে সুঅভিনয় করেছেন।

বস্ত্রহরণ নাচে দৃশ্যে দুটি যৌবনোচ্ছলা নগ্নবাস পরিহিতা নৃত্যশিল্পীরা স্থিতধী দর্শকদের কাছে ধিকৃত হলেও—শিল্পীরা যেমন সার্থক তেমনি তাদের দুর্বার আকর্ষণে নাটকটিকে বর্তমান দর্শকদের কাছে জনপ্রিয় করে তুলতে যথেষ্ট সহায় হবে।

'বর্ণপরিচয় সম্প্রদায়ের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে—এদেশের মাটিতে কারার আশাআকাঙ্ক্ষা মূর্ত হওয়া সম্ভব নয়—এমনি ভাবধর্মী একটি সংলাপ—যা দেশ-দ্রোহিতার পরিচায়ক। তাই এই ভাবধর্মী সংলাপটিকে বাদ দিতে অনুরোধ করবো।

আলো শব্দ মঞ্চ সংগীত ও নৃত্য প্রেম ভালবাসা জিঘাংসা ও ব্যভি-চারের নাটক ব্যভিচারকে বর্তমান বাংলা রঙ্গমঞ্চের গতি - প্রগতির অন্যতম প্রতীক হিসেবে স্বাগত জানাই।

শীলভদ্র

রবীন্দ্র সদনে রবীন্দ্র পক্ষের নাটক

গত আট মে থেকে তিরিশে মে পর্যন্ত রবীন্দ্র সদন আয়োজিত রবীন্দ্র

১৯৭৬ খৃঃ দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতীয় চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ ধীরেন গাঙ্গুলি

ভরে দেহগো আমি রূপসাগরে ডুব দিয়েছি' মনে যে আশা লয়ে এসেছি' ও 'না হয় তোমার যা হয়েছে'। শ্রীজেন মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সুগীত চারখানি গান হোলো প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে, শতবার আলো জ্বালাতে চাই, আর নহে, আর নহে ও মনোমন্দিরে সুন্দরী।

নীলিমা সেন ভক্তিভাবাশ্রিত শান্ত রসের পূজারিণী। সেই পরিচয়ই মূর্ত হয়েছে তাঁর কণ্ঠের শুভ্র প্রভাতে, ডেকেছেন প্রিয়তম, কত কথা তারে ছিলো বলিতে ও সে যে বাহির হোলো—গানগুলিতে।

সাগর সেনের সুপরিচিত হৃদয়াবেগের উত্তাপ পাওয়া গেল যে গানগুলিতে সে-গুলি হোল ওরে ঝড় নেমে আয়, এসো এসো হে তৃষ্ণার জল, জানি জানি তুমি এসেছ এবং যেয়ো না যেয়ো না।

সুমিত্রা সেন তাঁর সহজিয়া দরদেই গেয়েছেন আমি যখন তাঁর দুয়ারে, ছিন্ন-পাতার সাজাই তরণী, গহনরাতে শ্রাবণধারা এবং অনেক কথা বলেছিলেম।

বাকী তিনটি ডিস্কে শোনা যাবে দুটি করে গান। বীথিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গম্ভীর-মধুর কণ্ঠে তোমার প্রেমে ধন্য করে, সারে এবং অলকে কুসুমে না দিও—মনকে আকৃষ্ট করে। নমিতা ঘোষাল গেয়েছেন ওগো শোনো কে বাজায় ও মম চিত্তে নিতি নতো।

শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের গান অনুভূতির গভীরতায় সব সময়ই চিত্তস্পর্শী। এবারের গানও তার ব্যতিক্রম নয়। গান দুখানি হল এ পথ গেছে কোনখানে গো ও গানগুলি মোর শৈবালেরই দল। মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দর করে গেয়েছেন বাহিরে ভুল হানবে যখন এবং আজ আকাশের মনের কথা।

মঞ্জরীলাল নবীনাদের মধ্যে এক বিশেষ আকর্ষণ। এবারের গান (মধুর রূপে বিরাজো ও মধুর মধুর ধ্বনি বাজে) সে আকর্ষণ আরো বাড়িয়েছে।

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠ এবারেই বোধ হয় গ্রামোফোন কোম্পানীর লেবেলে প্রথম শোনা গেলো। আমার ব্যথা যখন এবং আমার শেষের গানের রেশ—তাঁর উজ্জ্বল আগমনকেই ঘোষণা করেছে। গীতা ঘটক এবং সুমিত্রা বসু উভয়েরই পরিবেশনায় নিজেদের বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ। গীতা ঘটকের কণ্ঠে সময় যে আর নেই এবং আমি যে আর সইতে পারি না—এ ধরনের রসে মনকে আপ্লুত করে। বিভিন্ন ধরনের ভাবের অনুরণন। সুমিত্রা বোসের দুখের বেশে এসেছ বলে এবং এই যে তোমার প্রেম।

প্রদীপ ঘোষের উদাত্ত কণ্ঠে, ভাব অনুযায়ী স্বরের ওঠাপড়ায় রূপায়িত 'দেবতার গ্রাস' আবৃত্তি শোনবার মত।

চিত্রাঙ্গদা

বিবিধ সংবাদ

ছোটদের চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যাভিনয়

নাটাগড় ত্রিশক্তি সংঘের ছোটদের দ্বারা সম্প্রতি অভিনীত চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। সঙ্গীতে: উমা রায় উমা ভট্টাচার্য অশোক ভট্টাচার্য বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শম্ভু সরকার নৃত্যে: দীপ্তি রায় রূপশ্রী চৌধুরী কণিকা সাহা রত্না রায় বাসন্তী দে লক্ষ্মী কুণ্ডু মিতা সাহা শিবানী সাহা কৈয়া চক্রবর্তী সম্পা পাল মিনু সাহা প্রমুখ। পরিচালনায় কৃতিত্ব নৃত্যশিল্পী মন্টু দেবনাথের। নৃত্যনাট্যের প্রারম্ভে ৬ বছরের ছোট্ট মেয়ে চন্দ্রা রায়ের একক নৃত্য তারিফ করার মতো।

গেজেটিয়ার্স রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী: গত ১৯ জুন বিকেল আড়াইটায় রাজ্য সরকারের জেলা গেজেটিয়ার্স অফিসের কর্মচারীবৃন্দ তাদের ২৩ রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি রোডস্থ কার্যালয়ে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উদযাপন করেন এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ডাঃ বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল বিষয়ে স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। সঙ্গীতাংশে ছিলেন সর্বশ্রী গৌতম বসু অভয় দাশগুপ্ত ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র ও রমা বারিক। কবিতা পাঠ করেন শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণ দত্ত কণিকা স্বরচিত গল্প পাঠ করেন শ্রীআলোকনাথ লাহিড়ী। অনুষ্ঠানের সভাপতি কবি শ্রীকিরণশংকর সেনগুপ্ত স্বরচিত রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। স্বাগত ভাষণ দেন শ্রীতারাপদ পাল। এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গীতায়নের রবীন্দ্রজন্মোৎসব: গত ২৫ জুন বরানগর পৌর প্রাঙ্গণে গীতায়নের রবীন্দ্রজন্মোৎসব ও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গীতায়নের শিক্ষার্থী শিল্পীরা একক দ্বৈত ও সম্মেলক গান পরিবেশন করেন। এদের গাওয়া ব্রহ্মসংগীত নেপথ্য কাহিনীযুক্ত রবীন্দ্রসংগীত রবীন্দ্রনাথের হাসির গান ও রবীন্দ্র কাব্যগীতির (নৃত্যসহ) অনুষ্ঠান-গুলি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। প্রতিটি অনুষ্ঠানের আগে সুলিখিত গ্রন্থনা পাঠ করা হয়। ব্রহ্মসংগীত শীর্ষক অনুষ্ঠানে এরা গেয়ে শোনা রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মোট পাঁচজনের রচনা।

অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য ও কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করেন শৈলাল চট্টোপাধ্যায়। সমগ্র সংগীতানুষ্ঠান পরি-চালনা করেন গীতায়নের সংগীত শিক্ষক অমল মুখোপাধ্যায়। ঘোষণায় ছিলেন অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়।

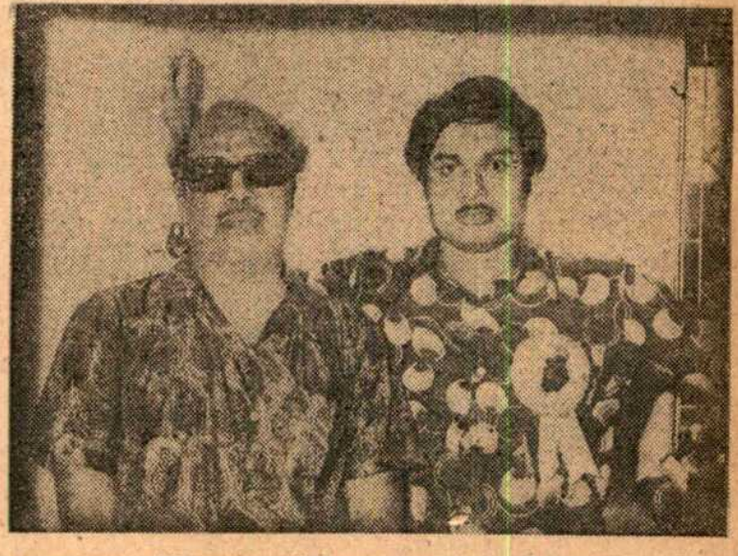

মান্না দের সঙ্গে ভাইটি সরকার। ভাইটি সরকার প্রযোজিত রবীন্দ্র সদনে এক মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আরতি মুখোপাধ্যায় এবং মান্না দে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের নতুন বই

চিত্র বিচিত্র

একাল-সেকালের বিচিত্র কথা ও রসমধুর কাহিনী-সমারোহ দাম ঃ সাত টাকা

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১৩৮১ সালের মৌচাক পত্রিকা কর্তৃক
সুধীরচন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ রচিত
ছোট বড় সকলের মনের মত
বাংলা সাহিত্যের দু'খানি আশ্চর্য বই

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য ঃ—চার টাকা

(সপ্তম সংস্করণ চলছে)

ছোটদের উপযোগী সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী লেখা হয় নি। বিশেষ করে নানাবিষয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ছোটদের মনের মত বিচিত্র রোমাঞ্চকর লেখা খুব সহজ নয়। 'বিচিত্র কাহিনী'তে লেখক সত্য ঘটনাগুলিকে নিজের সরস মুন্সিয়ানা দিয়ে এমন জীবন্ত আর আকর্ষণীয় করে তুলেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রচনাই অনবদ্য রস ও রোমাঞ্চে টইটম্বুর। মোট পনেরোটি কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রসের ফল্গুধারায় সিক্ত, বর্ণনায় মনোমুগ্ধকর।

'আরও বিচিত্র কাহিনী' বইটি কিশোর ও বয়স্কদের জন্য সমভাবে রচিত। লেখক শুধু ছোটদের জন্যই রস পরিবেশন করেননি, বড়রাও এই অমৃত আস্বাদন করে পুলকিত হবেন। অনবদ্য রস রচনাশৈলী এবং প্রতিটি কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ চুম্বকের মত পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে। এই বইটিতে দশটি বিভিন্ন রসের কাহিনী রয়েছে এবং লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি এমন সুন্দরভাবে রসযুক্ত করে উপস্থিত করেছেন যে পাঠককে বিমুগ্ধ করবে।

আরও বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য ঃ—চার টাকা

(চতুর্থ সংস্করণ চলছে)

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড. ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ঃ ফোন ৩৪-১৭৮২

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 9th July, 197
Phone 55-5231 (14 lines)

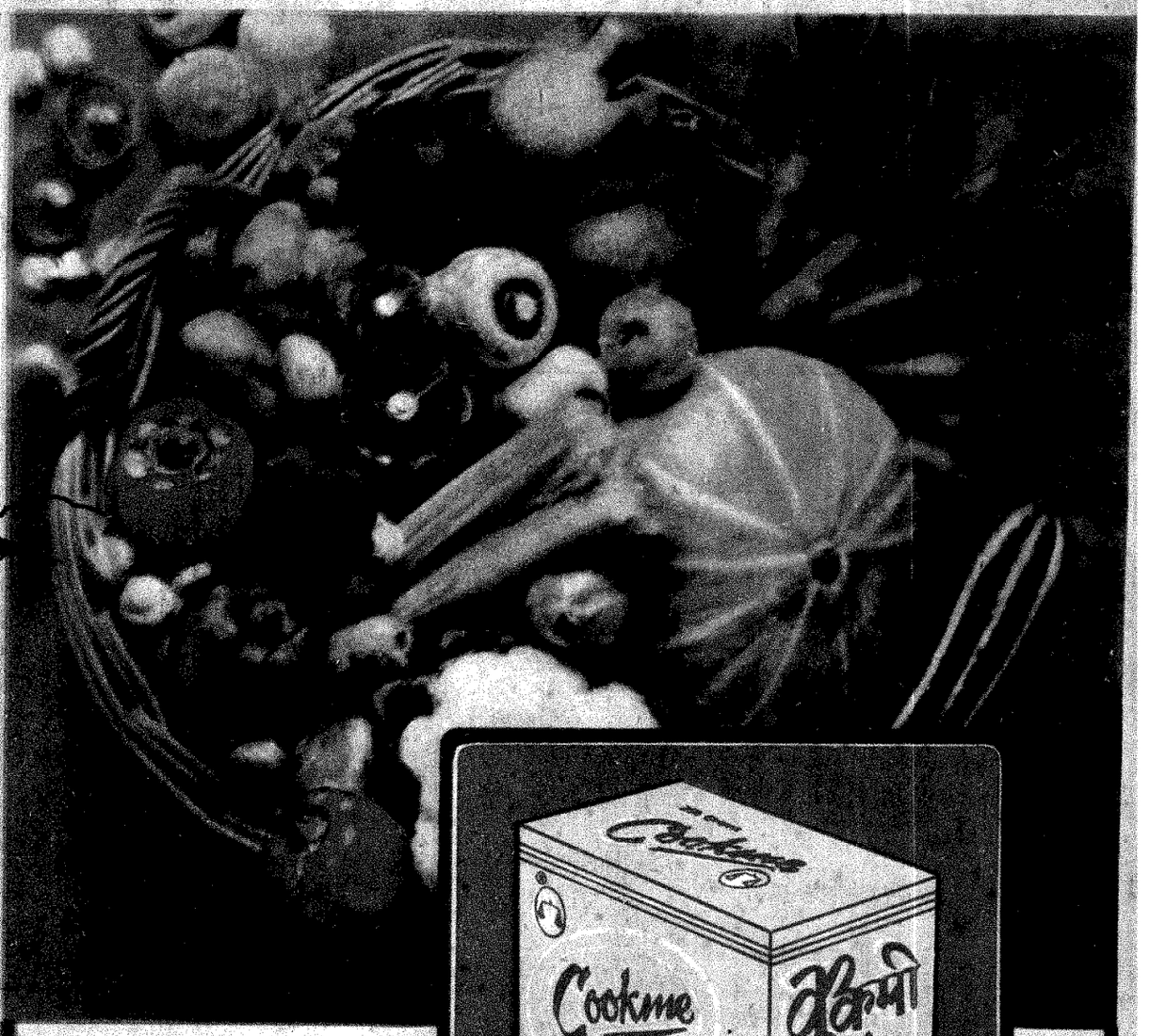

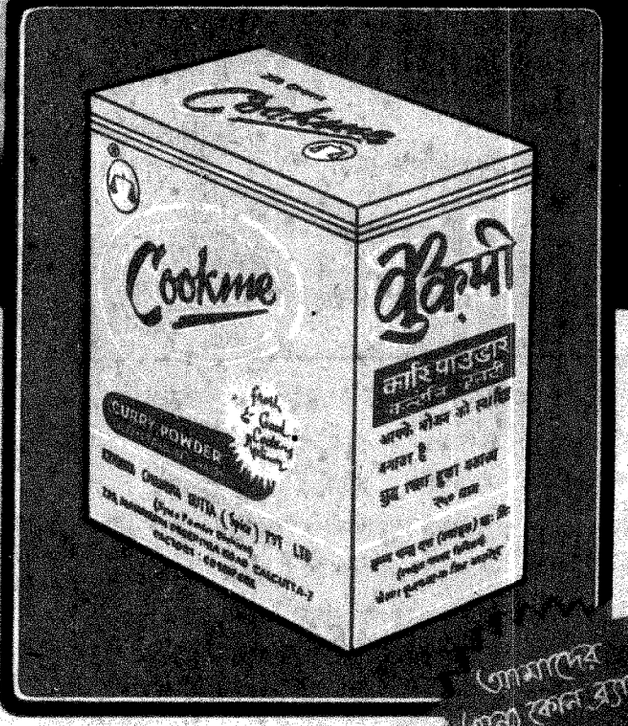

১২৭ বছরের অভিজ্ঞতায়
কুকমী গুঁড়ো মশলা
জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চ
শিখরে

কুকমী
গুঁড়ো মশলা

আমাদের
এছাড়া কোন ব্র্যান্ড
ও
প্রোডাক্ট নেই

প্রস্তুতকারক :
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
(স্পাইস পাউডার ডিভিশন)
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা- ৭০০০৭০
পোষ্ট বক্স নং :- বড়বাজার ৬৮৮৫

aaa/KCD-178

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ /

১৬ জুলাই ১৯৭৬ ॥

মূল্য ৭৫ পয়সা
অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা

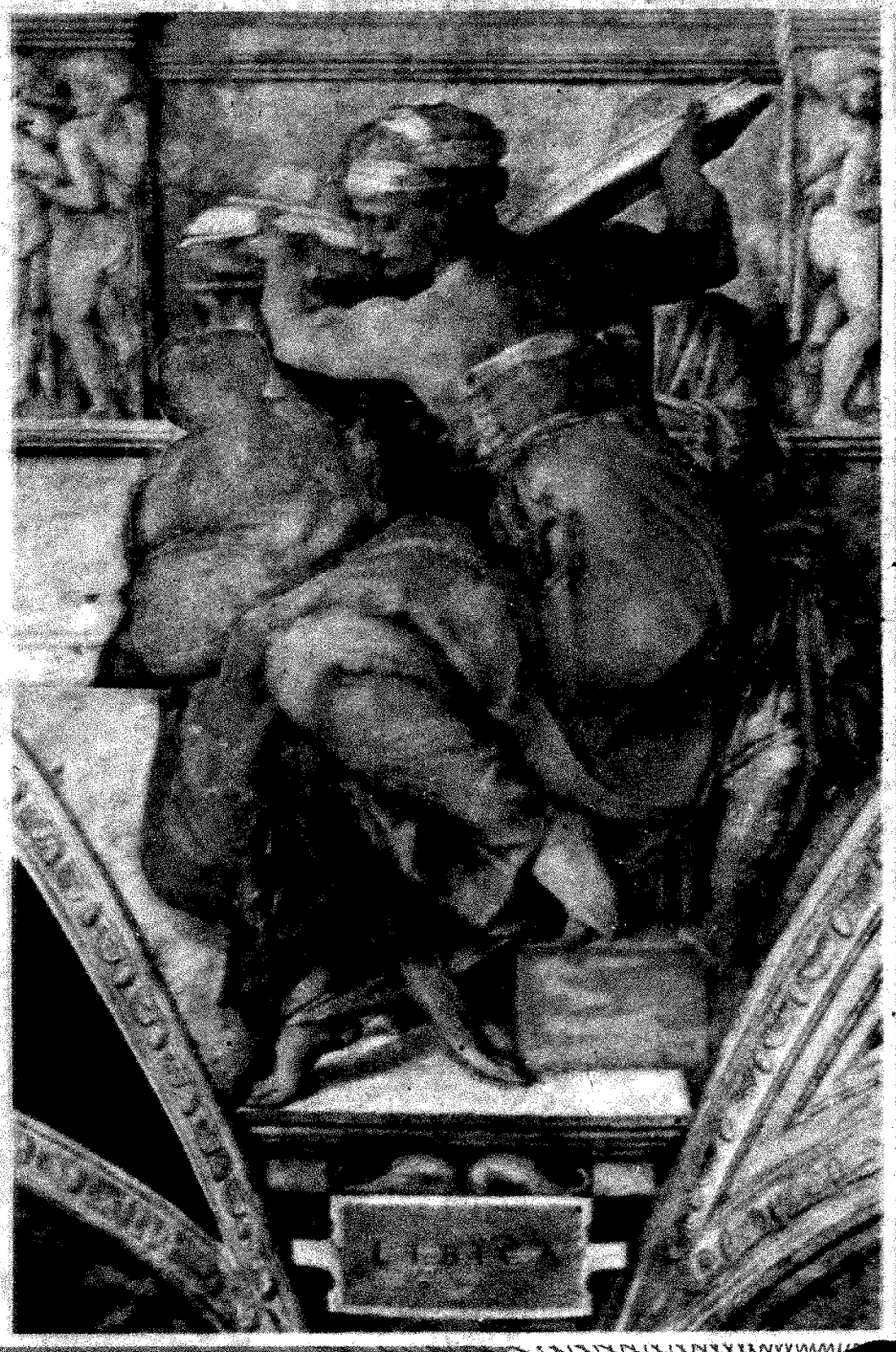

...ারোলীন যার সহায়
...র ভয় কি?

...ারোলীন মুখমণ্ডিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম আপনার ত্বককে সুন্দর ও ...
...ে ফিরতে হবে। শরীরের উন্মুক্ত অংশগুলো সূর্য
...উলাসে যাবে। সেবা দেবে কোড়া, ফুসকুড়ি ও ...
...ত অস্বাচ্ছন্দ্য। অনেক সময় এই সব অসুখের মূলে
...ওঠে বাইরের ধুলো-(ধোঁয়া বা রোদ-জনে...

...লীন মুখমণ্ডিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম আপনার ত্বককে সুন্দর ও ...

অস্পৃশ্য পায়খানা!

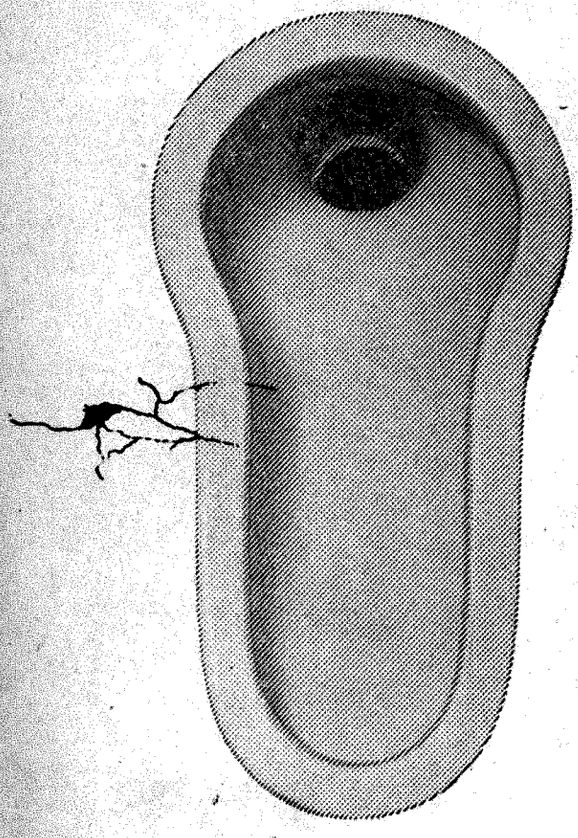

ভারতে কথাটা বলতেও ঘেন্না! কিন্তু তা হওয়া উচিত নয়।

অধিকাংশ লোক তাঁদের পায়খানা সত্যিই দারুণ অপরিষ্কার রাখেন। বাড়ীর অন্যান্য ঘরের তুলনায় সবচেয়ে কম নজর শুধু ওই পায়খানার বেলায়। ভাবটা—না দেখলেই মাথা ঘামাতে হবে না। কিন্তু মাথা ঘামবে কারণগুলো দেখলে:

ময়লা পায়খানা শুধু দেখতে বিশ্রী আর দুর্গন্ধময় তাই নয়—তা যেমন অস্বাস্থ্যকর আর স্বাস্থ্যবিধির প্রতিকূল তেমনি দারুণ বিপজ্জনক।

এটাই হল সরল সত্য কথা। একটুও কমিয়ে বা বাড়িয়ে বলা হচ্ছে না। তাহ'লে আপনার নিজের মনকেই জিগ্‌গেস করুন তো···

আপনার পায়খানা আপনি যেমন পরিষ্কার চান সেই রকম কি?

উত্তরটা ভাল ক'রে জেনে রাখা দরকার একজনার—আপনার।

রোজ সকালে পরিষ্কার করার জন্য মেথর রাখলেও সে কি ঠিক মত কাজ করছে, না নম-নম ক'রে কাজ সেরে পালাচ্ছে? উত্তরটা আপনার যদি খারাপ লাগে একটা জিনিসের বিষয় জেনে রাখলে আপনি সুখী হবেন···স্যানিফ্রেশ

স্যানিফ্রেশ জিনিসটা কি?

স্যানিফ্রেশ হল পায়খানা পরিষ্কার করার পদার্থ.যা সব ময়লা সাফ ক'রে পায়খানা ঝকঝকে রাখে। প্রথমে পায়খানায় জল ঢেলে দিন। তারপর পায়খানার গামলার মধ্যে প্রচুর স্যানিফ্রেশ ছিটিয়ে দিন। ৩-৪ ঘণ্টা তাকে কাজ করতে দিন। আরও ভাল হয় যদি একরাত অবধি রেখে দেন। তারপর আবার জল ঢেলে দিন। তাতে যদি ভাল পরিষ্কার হচ্ছে না দেখেন, তাহলে একবালতি জল জোরে ঢেলে দিন। বস্! আপনার পায়খানা পরিষ্কার রাখার সব ঝামেলা দূর।

স্যানিফ্রেশ ৩ ভাবে কাজ করে

১. স্যানিফ্রেশ পুরোপুরি পরিষ্কার করে।

এতে রয়েছে অত্যন্ত কার্যকর পরিষ্কার করার পদার্থ যা দারুণ শক্ত দাগও উঠিয়ে দেয়। ব্রাশ যেখানে পৌঁছয় না সেখানেও স্যানিফ্রেশ সাফ করে।

২. স্যানিফ্রেশ বিপজ্জনক রোগজীবাণু বিনাশ করে।

পায়খানায় রোগজীবাণু জন্মাতে পারে। তাতে অসুখবিসুখের সম্ভাবনা খুব বেশী। যে কাজ সাধারণ 'ফিনাইল' করতে পারে না সে কাজ স্যানিফ্রেশ করে—আপনার স্বাস্থ্য রক্ষা করে। তাই আপনার পায়খানা যে একেবারে নিরাপদ সেবিষয়ে আপনি একদম নিশ্চিন্ত।

৩. স্যানিফ্রেশ বিরক্তিকর দুর্গন্ধ দূর করে

কখন কখন পায়খানার দুর্গন্ধে প্রাণ অতিষ্ঠ। পায়খানায় হাওয়াবাতাস খেলার পথ না থাকলে দুর্গন্ধ আটক থাকে আর তখন যাকে বলে গোদের ওপর বিষফোড়া! স্যানিফ্রেশে এমন দুর্গন্ধনাশক পদার্থ আছে যা সব বদগন্ধ দূর ক'রে বাতাস নির্মল ক'রে তোলে।

স্যানিফ্রেশ কতবার ব্যবহার করা দরকার? পায়খানা পরিষ্কার রাখার গুরুত্বের কথা চিন্তা করলে এ প্রশ্নের উত্তর একটাই—প্রত্যেক দিন।

স্যানিফ্রেশ সব ময়লা দূর ক'রে আপনার পায়খানা পরিষ্কার রাখে।

বালসারা
উন্নততর জীবনযাত্রার আধুনিক সহায়ক
BALSARA বালসারা অ্যাণ্ড কোম্পানী (প্রা.) লি.
৩৩ নরিমান পয়েন্ট রোড বোম্বাই ১··· ০২১।

CHAITRA-BLS-82 BEN

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর সর্বশেষ রচনা

মহাপুরুষ শ্রীঅরবিন্দর পুণ্য জীবনকথা

ভূমাপুরুষ শ্রীশ্রীঅরবিন্দ ১০.

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

চতুর্থ খন্ডের পুনর্মুদ্রণ বেরোল ॥ সাড়ে বারো টাকা

নারায়ণ সান্যালের

নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা ১৪.

বিমল মিত্রের

যে অঙ্ক মেলেনি ১২.

আশাপূর্ণা দেবীর

পলাতক সৈনিক ৭॥

সৈয়দ মুজতবা আলীর

পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয় ৯.

বাণী রায়ের

জনারণ্যে একমুখ ১২.

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

বন্ধনে ফেরা ৭॥

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

মনে মনে খেলা ৬॥

সমরেশ বসুর

সূর্যতৃষ্ণা ৯.

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

হায়নার দাঁত ৬.

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের

রঙিন সাঁকো ১০.

সুমথনাথ ঘোষের

মরণের পরে ৩.

বিভূতি রচনাবলী

দশম খন্ড পুনর্মুদ্রণ বেরিয়েছে

॥ পঁচিশ টাকা ॥

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

উল্লেখযোগ্য উপন্যাস

দুই বাড়ী

প্রকাশিত হয়েছে।

সাত টাকা

অন্নদাশঙ্কর রায়ের

পথে প্রবাসে

পেপার ব্যাক সংস্করণ

দ্বিতীয় মুদ্রণ শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

॥ দাম পাঁচ টাকা ॥

সন্ন্যাসিনী আশাপূরী লিখিত

বিরাট মহাপুরুষের মহত্তর জীবনী

অমর জীবন ১২॥

বিশ্বপূজ্য সাধক মহাপুরুষ শ্রী শ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারীর পুণ্য জীবনকথা

পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত, পুনর্লিখিত দ্বিতীয় সংস্করণ

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলি-১২ ৩৪-৩৪৯২
৮৬।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯ ৩৪-৮৭৯১

NESCAFE
Instant coffee
Nescafe
The finest coffee
বিশ্বের সর্বাধিক বিক্রীত কফি

১৬ বর্ষ

অমৃত

১০ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 16th July, 1976 শুক্রবার, ৩২ আষাঢ়, ১৩৮৩

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৬	সম্পাদকীয়	
৭	লেবেনচুস	(গল্প) শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
১০	কালভুজঙ্গ	(") "
১৮	কথায় কথায়	শ্রীতারাপদ রায়
১৯	বিজ্ঞাপন বিচিত্রা	শ্রীআনন্দ রায়
২১	গোধূলিয়া	(উপন্যাস) শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
২৩	মনের অসুখ	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
২৬	নতুন বই	
২৭	সাহিত্যের নেপথ্যে	শাণ্ডিল্য চতুর্বেদী
৩০	ভ্রমণ	(কবিতা) শ্রীকালীকৃষ্ণ গুহ
৩০	সুদূর পাহাড়ী অঞ্চলে	(") শ্রীরুদ্রেন্দু সরকার
৩০	ইচ্ছা কৌটোয় জমা	(") শ্রীনয়নকুমার রায়
৩১	মোহিনী আটুম	(উপন্যাস) শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি

বাহির হইল ! নতুন বই !

নিজে পড়ুন, বাচ্চাদের পড়ান ও প্রিয়জনদের উপহার দিন। সংগ্রহে রাখার মত একটি ঐতিহাসিক প্রমাণিক দুর্লভ পুস্তক। এতে পাবেন ভারতের তেরটি ঐতিহাসিক বিচার।

চিরঞ্জীব সেনের

স্মরণীয় বিচার

আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার, গান্ধী হত্যা মামলা, আলিপুর বোমা মামলা, মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা, ভগৎ সিং-এর বিচার, বাহাদুর শাহের বিচার প্রভৃতি তেরটি ঐতিহাসিক বিচার গ্রথিত করে এই বই প্রকাশিত হলো। ১৬৲ টাকা।

এই লেখকের আরেকটি অসাধারণ বই 'স্ক্যাল্যাণ্ড'

মৌসুমী সাহিত্য মন্দির ১৫বি টেমার লেন, কলিকাতা--

অভিনব

ডিস্‌কাউণ্ট কুপন সংগ্রহ করুন

আপনাকে আর বিশেষ বিশেষ বই-এর জন্য পৃথক পৃথক ভাবে নতুন করে গ্রাহক হতে হবে না।

একটি ডিস্‌কাউণ্ট কুপন কিনুন—দশ টাকা দাম দিয়ে। আপনি আগামী তিন বছরের মধ্যে আমাদের প্রকাশিত ছোটদের বা বড়দের প্রতিটি বই-এর উপর শতকরা ২৫% কমিশন পাবেন। যে-কোনও বই এক কপি বা একাধিক কপি কিনুন—যত খুশী কিনুন নিত্য-নতুন প্রকাশিত গ্রন্থরাজি।

তবে, প্রতিটি কুপনে আপনি এককালীন অথবা পাঁচ বছরের মধ্যে মোট পাঁচশত টাকার বই কিনতে পারবেন।

তার চেয়েও বড় কথা আগেভাগে গ্রাহক হবার জন্য আপনি বিশেষ কোন বই কিনতে বাধ্য থাকছেন না। বই প্রকাশের পর আপনার রুচি ও চাহিদা মতো যাচাই করে কিনুন— এশিয়ার নিত্য-নতুন গ্রন্থরাজি।

সাপ্তাহিক সাময়িক পত্রিকাগুলির মাধ্যমে আপনাকে আমরা নতুন প্রকাশিত গ্রন্থের সংবাদ পৌঁছে দেব। এ ছাড়া মাঝে মাঝে ডাকযোগেও গ্রন্থতালিকা পৌঁছে যাবে আপনার হাতে। তারপর আসুন আমাদের বিক্রয় কেন্দ্রে অথবা কার্যালয়ে।

এ সুযোগ মাত্র ছয় মাসের জন্য। তবে, তারও আগে বন্ধ হয়ে যেতে পারে আমাদের নির্ধারিত সংখ্যা পূরণ হয়ে গেলে।

॥ এ ছাড়া বিশেষ আকর্ষণ ॥

। বিক্রিত কুপনের উপর লটারী ।

প্রথম পুরস্কার : বিজয়ীর পছন্দমত ৫০৲ টাকার বই

দ্বিতীয় পুরস্কার : বিজয়ীর পছন্দমত ৩০৲ টাকার বই

তৃতীয় পুরস্কার : বিজয়ীর পছন্দমত ২০৲ টাকার বই

তা ছাড়াও বেশী টাকার বই কেনা কার্ডে বিশেষ পুরস্কার

এশিয়া পাবলিশিং কোং

এ/১৩২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা-৭ ॥ ফোন : ৩৪-২৩৮৬

প্রগতির নতুন প্রেরণায় ভারত

১৯৭৫-৭৬

উৎপাদন ও কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি

** অর্থনৈতিক বিকাশের হার ১৯৭৪—৭৫'এর ০·২% এর তুলনায় ৫·৫% হয়েছে।

** ১৯৭৪—৭৫ এর ২·৫% এর তুলনায় শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার ৪·৫%।

** খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১১৪ মিলিয়ন টনের মাত্রায় পৌঁছবার আশা রয়েছে।

** সরকারী শিল্প সংস্থাগুলির মোট উৎপাদন প্রায় ৩৬% বৃদ্ধি পেয়েছে।

** রেল চলাচল ডাক ও তার ব্যবস্থায় সময়নিষ্ঠা, কাজে তৎপরতা সৌজন্য ও জনসেবার আগ্রহ লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ডিএভিপি : ৭৬/১৩

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৩৭	একালের চিত্রশিল্পী		শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৩৯	একলের গান		শ্রীসন্ধ্যা সেন
৪২	পুনশ্চ		ক্ষপণক
৪৩	অদ্য শেষ রজনী	(উপন্যাস)	শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
৪৭	রঙ বদল	(গল্প)	শ্রীমিতা দে বিশ্বাস
৫০	মাঠ থেকে বলছি		শ্রীঅজয় বসু
৫৩	মাঠের নায়ক		শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৪	খেলাধুলা		দর্শক
৫৬	সিনেমাটিক টক		শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৫৯	কয়েকজন		নিরীক্ষিৎ
৬১	নাটমঞ্চ		নাট্যসমালোচক
৬২	শতবর্ষের স্মরণীয়		শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়
৬৩	জলসা		চিত্রাঙ্গদা

প্রচ্ছদ শিল্পী : মিকেল্যাঞ্জেলো। সিস্টাইন চ্যাপেলের ব্র্যাকেটে আঁকা একটি চিত্রের প্রতিলিপি থেকে মুদ্রিত। ছবিটির নাম—দি লিবিয়ান সিবী। [আগের সপ্তাহে চিত্র-পরিচয়ে মুদ্রণ প্রমাদ ঘটে গেছে। ছবির নাম হবে—প্রফেট জেরিমিয়া।]

প্রেম অমৃত ঃ যৌবন-যজ্ঞ

শ্রীকরুণাসিন্ধু পালিত।

ভাষার অপূর্ব ইন্দ্রজালে, চিন্তার গভীরতায় সাহিত্যিক অনুভবে, অনুপম প্রেমের মাধুর্যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি। বিবাহে উপহার।

নাথ ব্রাদার্স, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

কর্তৃক গ্রন্থিত

শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত

(১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড)

প্রতি সেট—মূল্য ২৪-০০

কালাচাঁদ গীতা

প্রতি কপি—মূল্য ১-৫০

নরোত্তম চরিত

প্রতি কপি—২-০০

LORD GOURANGA (Vol. 2)
Per Vol. Rs. 6.00

LIFE OF
SISIR KUMAR GHOSH
Per Copy Rs. 6.50

প্রাপ্তিস্থান ঃ

পত্রিকা হাউস (হিসাব বিভাগ)

১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩

বিখ্যাত ডাটা গুঁড়ো মশলার প্রস্তুতকারক কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ এখন আপনাদের দিচ্ছেন একটি নতুন অতি সুদৃশ্য টিনের কৌটায় সবরকম গুঁড়ো মশলার অপূর্ব সংমিশ্রণ

এক কৌটো ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাক কিনলে আর কোনরকম মশলা এমন কি পেঁয়াজ, আদা, রসুন প্রভৃতি আলাদা করে জোগাড় করতে হয় না। ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাকএ মাছ, মাংস, ডিম ও সবরকম মুখরোচক তরিতরকারি অল্প সময়ে চটপট রান্না করা যায়। আপনার সবরকম রান্নায় আজই ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার (কিচেন কুইন প্যাক) ব্যবহার করুন।

ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার কিচেন কুইন প্যাক

প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ

২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭, পোষ্ট বক্স নং ৬৭৭৪.

ফোন : ৩৩-১৩৩৭, ৩৪-১৭০৮

PAM—KCD-74

সম্পাদকীয়

শিল্পপ্রীতির কুম্ভিরাশ্রু

আমরা, ভারতীয়রা, নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্য নিয়ে গর্ববোধ করি, এবং তা খুব সঙ্গত কারণেই। কিন্তু এই আত্মগরিমা মুখে যতোটা চিৎকৃত, কাজের মধ্যে ঠিক ততোটাই প্রতিফলিত হয় কিনা তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়ে গেছে। অন্তত একটি ক্ষেত্রে তো স্পষ্টই দেখা যায়, বাক্যে ও কর্মে সত্য-আত্মীয়তা অর্জনের দিকে বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই আমাদের।

ভারতীয় পুরা-দ্রব্যের ব্যাপারটাই আজকের প্রসঙ্গ। স্বীকার করতে খুবই লজ্জা হলেও, অস্বীকার করারও উপায় নেই যে এ ব্যাপারে আমরা নানাদিকে অনেকরকম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এখন পর্যন্তও রয়ে গেছি—হয় অজ্ঞ, না হয় উদাসীন, অথবা প্রবঞ্চক। কিম্বা এমনও হতে পারে যে, এই ত্রিদোষ একসঙ্গেই আক্রমণ করেছে আমাদের।

ভারতীয় পুরাদ্রব্য নির্বিবেকে বিদেশে পাচার করা থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় এর যথেষ্ট।

বলা বাহুল্য ব্যাপারটা ঠিক নির্বুদ্ধিতা বা উদারতার জন্যে ঘটে না, বিস্তর আর্থিক অনুপ্রেরণাও কাজ করে এর পেছনে। এবং স্বাধীনতার পর বিদেশের সঙ্গে যাতায়াত অনেক সুগম হবার ফলে এই ধরনের গোপন লেনদেনের পথও অনেক মসৃণ হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য প্রথম থেকেই বাধা দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাতেও এই চৌর্যবৃত্তিকে ঠেকানো যাচ্ছে না দেখে ১৯৭২ সালে পাশ করেন অ্যান্টিকুইটিস অ্যান্ড আর্ট ট্রেজারস অ্যাক্ট, এবং কিছুকাল আগে একটি অর্ডিনান্স পাশ করে নিয়ম চালু করেছেন যে—এধরনের পুরাদ্রব্য ও শিল্পসম্পদ কারো ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকলে সেগুলির ফোটোগ্রাফসহ একটি তালিকা পেশ করতে হবে সরকারের কাছে।

মুখে এর যৌক্তিকতাকে স্বাগত জানালেও অনেকেই একে ঠিক অন্তর দিয়ে মেনে নিতে পারেন নি। এবং দুঃখের বিষয়, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন, যাঁরা এ ব্যাপারে বোদ্ধা ও বিশেষজ্ঞ হিসাবে সুপরিচিতও।

আপত্তি তাঁদের অনেক রকম। এবং অনেক সময়ই একটি আরেকটির গোড়া কেটে দেয়। এই ধরনের পরস্পর-বিরোধিতার কারণ অবশ্য অননুমেয় নয়। স্থিতাবস্থাকে বজায় রাখার ইচ্ছাই এ ধরনের আত্মদ্বন্দ্বের গোপন উৎস।

তাঁরা বলেন, ব্যক্তিগত সংগ্রহে যেসব পুরাদ্রব্য ও শিল্পসম্পদ আছে তার বিবরণ কি ঐসব জিনিসের অধিকারীরা জানেন? তাছাড়া অতি প্রাচীন পুরাদ্রব্য যদি সরকারী সংগ্রহশালায় জমা দিতে হয় তবে তো সেখানে অব্যবস্থার পরিমাণ আরো বাড়বে। কেননা, এমনিতেই সরকারী এবং আধাসরকারী সংগ্রহশালাতে যেসব জিনিস আছে তার তালিকা অসম্পূর্ণ, এবং সংরক্ষণের পদ্ধতিও অবৈজ্ঞানিক।

কিন্তু এর চেয়েও গভীরতর আপত্তির কারণ রয়েছে অন্যত্র। এবং সেইটেই একেবারে হতবাক করে দেবার মতো।

তাঁরা বলতে চান, শিল্পসম্পদের এই যে লেনদেন, এর ফলে ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের বিষয়ে সচেতনা বাড়বে বিদেশে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়, লেনদেন কথাটির মানে কী? ভারতের শিল্পদ্রব্য যেমন বিদেশে যাচ্ছে, বিদেশের শিল্পদ্রব্য কি সেইভাবে ভারতে আসছে? মোটেই তা নয়। ভারত যেহেতু ইউরোপ আমেরিকার থেকে গরিব রয়ে গেছে এখনো, শেষোক্ত দেশগুলির ধনী ব্যক্তিদের কাছে তাই টাকার বিনিময়েই নির্বিচারে পাচার হয়ে যাচ্ছে শিল্পসম্পদগুলি। এবং ব্যাপারটা এখন যেহেতু বেআইনী তাই বিক্রি যারা করছে দাম পাচ্ছে তারা নামমাত্র।

ঠিক এই প্রক্রিয়ায় যদি চৌর্য ও অপহরণের কাজ চলতে থাকে তাহলে, বিদেশে ভারতশিল্পের জয়ধ্বনি কী পরিমাণ উঠবে তা ভবিষ্যতই বলতে পারবে, কিন্তু এই মুহূর্তেই যা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট তা হল—ভারতে পুরাদ্রব্য ও শিল্পসম্পদ বলতে তাই শুধু অবশিষ্ট থাকবে যা মাটি থেকে উপড়ে কিম্বা দেয়াল থেকে চেঁছে তোলা যায় না—যেমন সারনাথ স্তূপ বা তাজমহল, কিম্বা অজন্তা ইলোরার গুহাচিত্রগুলি।

আসলে গ্রাম গ্রামান্ত বা দুর্গম জায়গা থেকে শিল্পসামগ্রীগুলি সংগ্রহ করা হয় জলের দামে, কিন্তু সেগুলি জমা পড়ে এসে শহুরে রাঘববোয়ালদের কুক্ষিতে। এবং এঁরা, এইসব গণ্যমান্য পাচারকারিরা ঐসব গ্রাস করা শিল্পরত্নকে উদ্গার করেন বেশ মোটা রকমের কাঞ্চন-বিনিময়েই।

কাজেই তাঁদের উকিল পেতেও দেরি হয় না।

সৌভাগ্যের বিষয়, এইসব অতি বুদ্ধি শিল্পপণ্ডিতদের কুম্ভীরাশ্রুর দিকে বিন্দুমাত্র দৃকপাত না করে ভারত সরকার সঠিক সময়েই সঠিক আইন পাশ করেছেন।

ভারতশিল্পের সঙ্গে পরিচিত হবার তৃষ্ণা যাঁদের অত্যন্তই প্রবল তাঁরা—যেহেতু তাঁরা প্রায়শই হন সঙ্গতিবান ব্যক্তি—এদেশে এসে তাঁদের সাধ মোতে পারেন; অথবা যদি তা নিতান্তই অসম্ভব হয়, প্রতিলিপি দেখেই তৃপ্ত থাকুন।

আমরাও তো সেইরকমই করি, তাই না?

একই লেখক

দুই গল্প : দুই সময়

লেবেনচুস

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সংসারে সে খুবই একা মানুষ। একটা চালাঘর, এক চিলতে জমি, সামান্য রোদ, আর রাতের জ্যোৎস্না লোকটার বেঁচে থাকার সম্বল। নক্ষত্রের আলো দেখতেও সে আজকাল ভালবাসে। ইদানিং কটা কুমড়োর চারা পুঁতেছে। সকালবেলার রোদ এসে পড়লে তার খুশীর অন্ত থাকে না। ঘুম থেকে উঠেই সে জল দেয় গাছগুলোতে। যেন এটা তার কাছে নাওয়া খাওয়ার মতো। গাছের পরিচর্যা করে সে সুখ পায়। তার বৌ নেই, পাঁচ সাত সাল আগে একজন তালের ব্যাপারীর সঙ্গে চলে গেছে। বৌটার খুব একটা দোষ নেই। পুরুষ মানুষের কাজই সংসার আগলে রাখা। সে সেটা পারেনি। কোলের ছেলেটা এখন বড় হয়েছে। কোথায় কখন থাকে সে নিজেও ঠিক বলতে পারে না। কাঁচা বয়সেই বেঁচে থাকার ফন্দিফিকির জেনে ফেলেছে।

তার বাঁ হাতটাই সব। ডান হাতটা শরীরে লতার মতো ঝুলে থাকে। নিষ্কর্মা হাত। ডান হাতটার খুব একটা দরকার হয় না তার। কখনও কখনও সে ভুলেই যায় ডান হাতটা তার আছে। এমন সব কায়দা সে শিখে ফেলেছে, অথবা স্বভাব গড়ে উঠেছে, বিনা দ্বিধায় তার সব কাজ-কর্মই হয়ে যায়। প্রথম যে-বারে টের পেল হাতে বল পাচ্ছে না, কবিরাজী ওষুধের কিছু হচ্ছে না, হাতটা ক্রমে লতার মতো শুকিয়ে যাচ্ছে শরীরে সে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলেছিল। বৌটার যোয়ান বয়স, বাপ খুব মেজাজ দেখিয়ে বলেছিল, নিছি মিস্তিরির বেটা বাপের কাজ করে খাওয়ালেও তোর মতো দু গণ্ডা বৌ পুষতে পারে। এত বড় অহংকার নিয়ে এসেছিল রাধা, অহংকার জল হয়ে গেল দুকাল যেতে না যেতেই। লোকটার উদাস উদাস কথাবার্তা। কাজকর্মে বেশি মন নেই। বাঁ হাতে ভাল একতারা বাজাতে পারে। সারাদিন রাজ্যের কাজ করে কোথায় কেন আখড়ায় চলে যায় গাঁজাভাঙ খেতে ভালবাসে, নিশুতি রাতে ঘুরে মাঠের ভেতর লোকটা গলা ছেড়ে একতারা বাজিয়ে গান গাইছে। অ মন মনারে.....।

এই অ মন মনারে—কুল কিনারা পাই না তর মনারে তারপরই থাকত, বটবৃক্ষের কথা শুক পাখির কথা, কখনও সে গাইত, আমার ভাইয়েরে কইয় নাইষব নিতে আইয়া আরও কি সব কথাবার্তা সুর মাঠের নিশুতি রাত মিলি রাধাকে স্তব্ধ করে রাখত। গা শির শির করত, এসেই সাপ্টে ধরবে। বলবে পায়ে ধরে, রাধা বিনে বাচিনে, তরে লইয়া যামু কোন সুদূরের মাঠে...সেই লোকটা এখন একা, কটা কুমড়ো গাছ আর চালা ঘরটা—একটু পরেই একতারা হাতে সে বের হয়ে পড়বে। যাবার সময় বিন্দার মাকে বলে যাবে, দেখিস বৌ, গাছগুলান দেখিস। বড় মায়া পড়ে গেছে। আর তারপরই দরাজ গলা লোকটার—সে গেয়ে ওঠে, রাধার ভাবে কালা হইলা গোরা। রোদ উঠে যায়। সে বের হয়ে পড়ে। বাঁ হাত ওপরে তুলে বাজায়। মাথায় ছেঁড়া কাপড়ের রং বেরংয়ের ফেটি। দু পায়ে দু রকমের জুতো। লম্বা আলখাল্লা গায়ে।

সকালের রোদটা ভীষণ তেবিয়া গোছের। সে এরই ভেতর দিয়ে বড় রাস্তায় উঠে এল। রাস্তাটা দিয়ে বাস যায়। ওটা সে পার হয়ে গেল। তারপর একটা খাল, সাঁকো পার হয়ে গেলেই গঞ্জের মতো জায়গা। আমের মরশুম চলছে। ভন ভন করছে নীল রংয়ের মাছি। সে এতটা রাস্তা হেঁটে এসেছিল একতারা বাজিয়ে, দূরে দূরে যাবার আগে নলিনীর চায়ের দোকানে এসে বসে। দুটো একটা দেহতত্ত্ব গাইলেই নলিনীর ছোঁড়াটা এক ভাঁড় চা দেয়। সে মৌজ করে খায়। এবং ঋতুর উষ্ণতা তখন টের পায়। চোখ বুজে খেতে খেতে ডাকে, ও গৌরহরি কোন দিকে তোমার পথ এবারে বল। এবং এ-ভাবেই নিজের সঙ্গে তার নিজের কথাবার্তা হয়। কেমন একটা জীবন, জীবনের ভাব। ভারি রসিয়ে রসিয়ে খাওয়া যাচ্ছে জীবনটা।

তখনও একটা ছোঁড়া বলল, ও কানুদা শুনেছ আর নাকি ভিক্ষে করা যাবে না।

কথাটা সে কালও শুনেছে। সে শুনে ভীষণ মুষড়ে পড়েছে। একটু চুপ করে থেকে বলল, ও গৌরহরি কি কর—শুনছ। তাহলে—

সে হয়ত কথাটা শুনে ছোঁড়াটাকে প্রহারও লাগাতে পারত। এটা তার মাঝে মাঝেই ইচ্ছে হয়। কত লোককে যে বেদম প্রহার করতে ইচ্ছে হয় তার। পারে না। তখন মনে মনে গাল পাড়ে। নিজের নাম কানু, কিন্তু সে কখনও নিজকে কানু বলে ডাকে না। ডাকতে ভাল লাগে না। নিজের সঙ্গে কথা বলার সময়, কেবল বলে,

গৌরহরি চালাকি পেয়েছ, বললেই হল, কতটা যে কষ্ট মানুষের কে বুঝবে বল। আমার মতো নোলা লোক তবে খায় কি করে।

পাশের লোকটার নাম কালীচরণ। কালীচরণ সকালের দিকেই চলে আসে পাউরুটির গাড়ি নিয়ে। কানুর গান শুনতে তারও ভাল লাগে। সেও কথাটাতে সায় দিয়ে বলল, হ্যাঁ কানু, এমনই লেখা আছে কাগজে।

সকাল বেলায় মনটা ছিল ভারি প্রসন্ন। কমড়োগাছগুলো বেশ নধর হয়ে উঠেছে। ঘরের শেকল তোলা। সে ভিক্ষে করে জোলা চাবি সংগ্রহ করেছিল, কেউ আদর করে রুটি গুড় খেতে দিলেই যেমন একটা বেশি গান গেয়ে ফেলে তেমনি সংসারের নানারকমের সুখ দুঃখের কথাও বলে ফেলে। ছেলেটা মানুষ না। মাসে দু মাসে একবার চলে আসবে। উৎপাত যত রকমের আছে সবই করে যায়। লাফিয়ে বেড়ায়। সন্তান স্নেহ কি যে অবুঝ। এলে মনটা ভারি খুশি হয় তার। যাবার সময় লাথি কষাতে মন চায়। যেখানে যা কিছু তার সঞ্চয় সব উজাড় করে নিয়ে যেতে চায়। দিন দিন সব বুঝে সেও সেয়ানা হয়ে উঠেছে। ঘরে এখন তালাচাবি ঝুলিয়ে দেয়। মাঘে-ফাল্গুনে এসেছিল, টোকা থেকে লুকানো রেজকি কখন হাত সাফাই হয়ে গেল টেরই পায়নি।

এখন ঘরে তালা ঝুলছে। ঘর আলগা নেইবে বাপ, হুট হাট যা খুশি নিবি। সে উঠে দাঁড়াল। একতারাটা বগলে রেখে যে কোনো একটা বাসে উঠে পড়া। তারপর পছন্দমতো একটা রাস্তার মোড়ে নেমে যাওয়া। এবং গলায় সেই মাঠাল গান যেন কানু পৃথিবীর সব লোককে গানে কি আছে যাদু, কি প্রবল দুঃখহারক এই গান. সংসারের ঝামা ঘসতে ঘসতে কানে সুর লেগে গেলেই বুকটা আতকে ওঠে। কি যেন এতদিনেও পাওয়া হয় নি। এইসব বুঝিয়ে দিতে চায়। এবং সে এমনভাবেই গায়, যেন এটা তার ভিক্ষে না, যায় খুশি হয় দাও, না দিলেও কিছু ক্ষতি নেই, কানু গানতো শুনিয়ে গেল। সেটাই বা কম কি!

রোজ একটা পথ ধরে সে কখনও যায় না। হিসেব মতো মাসের তারিখ বুঝে কোনো মোড়ে নেমে যাওয়া। রোজ রোজ সে এক জায়গায় যায় না। এক জায়গায় মাসে এক আধবার। এতে বাবুদের, গেরস্থ মানুষদের আপ্যায়ন হওয়া যায়। অনেকদিন পর দূর থেকে কানু যখন গেয়ে যায় তখন পাড়াপড়শীরা টের পায় সেই বাউল লোকটা আবার এসেছে। ওর গলায় স্বর অনেকদূর থেকে তখন শুনতে পাওয়া যায়। যেন এক নির্জন মাঠে একতারা হাতে বাউল গেয়ে চলেছে, সংসারী মানুষের গলার গান শুনে খুবই তখন ভাল মানুষ হয়ে ওঠে। দরজায় দাঁড়ালেই গিন্নিমা বলবে, আর একটা গাও। সংসারে খুব তাপ সে বুঝতে পারে তখন।

কেউ গান শুনতে চাইলে তার খুব ভাল লাগে। সে বসে যায়। পর পর গেয়ে যায় সব মুসাফিরদের গান। যৌবনের নেশা, এই বয়সেও তার ষোল আনা, এখন সেই নেশাটাই সংসারে তাকে টিকিয়ে রেখেছে। সে বলেছিল, দিন, আপনাদের রদ্দি তালা-চাবি ঝড়তি পড়তি থাকে দিয়ে দিন। কানু নিবাসে তার তালা ঝোলাবে।

—ও সাধু তোমার বৌ নেই বুঝি!
—ছিল একটা...
—কি হল!

কানু বৌর কথায় এলে চুপ মেরে থাকে। বুকটা ছ্যাঁত করে ওঠে তার। সে বলে, ওর দয়া।

কার দয়া বোঝে না বাবুরা, গিন্নিমারা। তবু এমনভাবে কথা বলে যেন মরেটরে গেছে। তার বলতে ইচ্ছে হয়, গিন্নিমারা, এই যে গান গেয়ে যাই সেতো তারই ইচ্ছে গো।

সেটা কে, সেই ঈশ্বর না, মতো স্ত্রী, না কোনো এক অপার অলৌকিক কিছু, ঘর পালানো বৌ কার সাধ্যি আছে টের পায়। কানু মাঝে মাঝে এমন সব কূট কথা বলে, থ মেরে যায়। কে বলায় তাকে এমন সব কথা। আবার কখনও মনে হয়, সে গাইছে, দূর দূরান্তে গানের ঢেউ ভেসে ভেসে যাচ্ছে, যেন কোনো হেঁসেলে বসে গেছে রাধী লোকটার গান শুনে কিছু তার আর ভাল লাগছে না। মনটা কি যে অবুঝ রোজই মনে হয়, ঘরে গিয়ে দেখবে বাবাদাস বসে আছে কাঙালীর মা। দেখা হলে বলত, এলি সনাতন কবে নে। বিকেলে রথের মেলায় যাব। চাকি-বেলুন কিনে দেব, জিলিপীভাজা খাব। ফেরার পথে জ্যোৎস্নায় মাঠে ঘুম খাব।

কাঙালীর মা যে তার সঙ্গে বচসা করত, না খেতে পেলে মাথা ঠিক রাখতে পারত না, প্রায় উলঙ্গ হয়ে আচড়ে-কামড়ে দিত, কিছুই মনে পড়ে না আর। তখনই মনে হল, বেশ দুটো আমগাছ একটা সোঁদিন বাবুদের রাস্তা, হাড়ি পাতিলের দোকান, চায়ের দোকান, মনিহারি দোকানের সামনে বাসটা থেমে পড়েছে। অনেকদিন

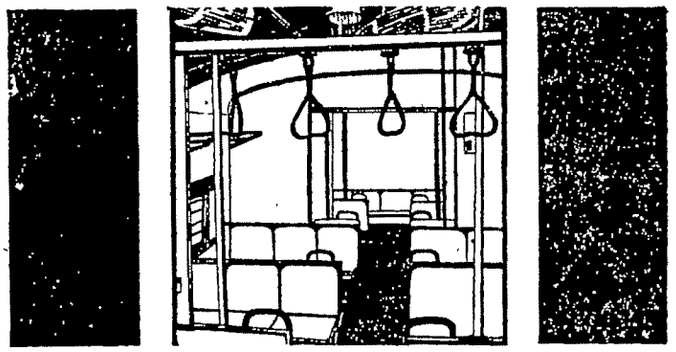

শহরতলী ট্রেন-এ ধূমপান নিষিদ্ধ

জ্বলন্ত সিগারেট বা বিড়ি থেকে অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে; তা ছাড়া, যাত্রীবোঝাই কামরায় ধূমপানে অন্যদের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সেইজন্য শহরতলী ট্রেন-এ ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

যাত্রিসাধারণের কাছে একান্ত অনুরোধ, বাস, ট্রাম ও সিনেমা হল-এর মতো শহরতলী ট্রেন-এও তাঁরা যেন ধূমপান না করেন।

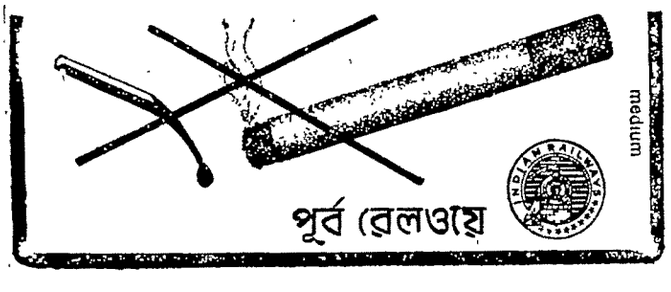

পূর্ব রেলওয়ে

এদিকটায় যাওয়া হয়নি। নেমে মনে হল, আসেইনি কোনোদিন। নতুন নতুন জায়গায় সে চলে যেতে ভালবাসে। শরীর না দিলে, নিবাসের কাছাকাছি থাকা, শরীর ভাল থাকলে দূরে দূরে চলে যাওয়া. আজকাল শরীর ভাল থাকা সত্ত্বেও খুব দূরে একটা যেতে পারছে না, কিছুদিন থেকেই মাথায় কি যে হয়েছে, কুমড়োগাছগুলো যত বড় হয়ে যাচ্ছে, তত মনে হচ্ছিল, কাঙ্গালীর মা ঠিক চলে আসবে। কুমড়োর ফুলের বড়া খেতে কাঙ্গালীর মা খুব ভালবাসত।

এতসবের ভেতরও মনটা বেতাল হয়ে যাচ্ছে। ঘর থেকে এমন প্রসন্ন মেজাজে বের হয়ে রাস্তায় আবার একই কথা শুনতে পাবে ভাবতে পারেনি। তবে সত্যি ভিক্ষেটা বন্ধ হয়ে যাবে! সে তো ভিক্ষে করে না। নামগান করে। কেউ দেয়, কেউ দেয় না। কার যে অনিষ্ট হয় এতে সে বুঝতে পারে না। এটাতো চুরি-চামারি না, এটা ধর্মকাজ। সে নেমেই বলল, ও বাবু-মানুষ, একটা সুলুক দিতে পারেন।

লোকটা ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

কি করব বলতি পারেন!

লোকটার সঙ্গে দুটো কাচ্চাবাচ্চা রাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। দু'বেনি দুলিয়ে ফ্রক গায় মেয়েটাও ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

সে ইচ্ছে করেই শতরকমের তালিমারা জোব্বা পরতে পছন্দ করে। একবার এক বাবুমানুষ গান শুনে নতুন পিরাণ দিয়েছিল একটা। ঘরে ফিরে সারারাত পিরাণটার ওপর তালি লাগিয়েছে। নতুন পিরাণে কানুর স্বভাব ঠিক থাকবে না। গলায় গান ফুটবে না। নতুন পিরাণ দেখলেই কানুর চরণের ভয় হয়। পিরাণ পরলে যদি কানুকেই চেনা না যায়, তবে গলায় গান ভাল লাগবে কেন। তাই কানুর পোশাক অতি তালিমারা, জোব্বার মতো সারা গা ঢাকা, দু' পায়ে দু' মনুষ্যের বুট জুতো, দু' জুতোর দু' মুখ দুদিকে। এতসব মিলেই কানু নিজেকে মাঝে মাঝে গৌরহরি বলতে ভরসা পায়—তখন সেই ফ্রক গায়ে দেখা মেয়েটা কেমন ভীতু চোখে তাকিয়ে আছে দেখে কানু ফিক করে হেসে দিল চটপটির মতো সঙ্গে সঙ্গে তিরবিড় করে ফুটে উঠল যেন, একতারা তুলে ও ভোলা মন বলে ঘুরে ঘুরে গান জুড়ে দিল গলায়। আসলে এক ক্ষেপা ফেরে এই জীবনে। তার কত যে মন্দ স্বভাব, কত ধান্ধা দুটো পয়সা ভিক্ষার জন্য এই যে নড়ে ওঠা, এই যে গেয়ে ওঠা, ও ভোলা মনরে, যেন কানু সত্যি এক বাবাজী মানুষ, অকাল-আকাল কিছু নেই তার, একটু নাম নেওয়া শুধু—রাস্তার গাছপালা, মানুষজন, দোকানী এবং কুকুরদের মতো সুলুক সন্ধানে সেও আছে কে আর বুঝতে পারে। সে গেয়েই চলেছে। ঘুরে ঘুরে তার উথালপাতাল নিত্য দেখে মানুষের মনেই হবে না ভব পারে নব ভেক—শুধু জীবন, জীবনরে!

আর এই সবই কানকে ভাবায়। সে একজন চতুর তস্করের মতো, গানের গলা দরাজ করে দেয়, গেয়ে চলে, মানুষের মন বিগলিত হলে পয়সা, সে নানাভাবে মানুষের মন বিগলিত হোক চেষ্টা করে যায়। এবং যখন সেই বাসযাত্রী খুশি হয়ে দশটা পয়সা দেয় তখন মনেই হয় না, সকালে তাকে কেউ বলেছে কানু তোমার ভেক আর চলবে না। তুমি বাচ্চা জাত ভিখিরী। সং সেজে বেশ দিনকাল কাবার করে দিলে।

বাবুরা দশ দুয়ারে যাই নামগান করি ভিক্ষা করি না। কেউ দিলেও সুখ না দিলেও সুখ। সেই তালের ব্যাপারী লিখে গেল কাঙ্গালীর মাকে সেই থেকে বের হয়ে পড়েছি খুঁজছি যেন যত গোলেমালেই থাকি বুঝি সে কোথাও না কোথাও বসে আছে। আচ্ছা বাবুরা সে শুনতে পায় না? এই রসের হেতু কোনটা সে জানে না? চলে আসতেই হবে। বুঝবে কানুর ক্ষেমতা আছে। পেটটা আছে বলেই পটে গেছি একেই বুঝি বলে বন্ধন—হাজার চৌড়াশি যোজন ঘুরে মার দুঃখ থাকে না।

সে হাঁটে। গায়। নিজের সঙ্গে কথা বলে। দুয়ারে দুয়ারে একতারা হাতে হেঁটে যায়। কোনো সন্ত মানুষের মতো লাগে তাকে। কাঙ্গালীটার খোঁজখবর নেই মাসের ওপর। কোথাও ঠিক বেঁচে আছে। আবার না জানি কবে চড়াও হবে। টোফা ভেঙ্গে জমানো বেজকি নিয়ে ভাগবে শালা। ভাল হবে না রে এলে ঠাং ভেঙ্গে দেব। তারপরই সে ডেকে ওঠে ও গৌরহরি ভাবনা এত খারাপ দিকে যায় কেন? গাও না পরান খুলে গেয়ে ওঠো বলি ও রাধে জীবন যৌবন ফারাক পরি কি করি উপায়!

—কাঙ্গালীর বাপ না!

কানু বলে হে কত্তা কাঙ্গালীর বাপ! আপনি ইদিকটাতে কিসে!

—ইদিকটাতে কুটুমবাড়ি।

—হ্যাঁ কত্তা খবর বাখেন।

লোকটা বলল কিসের খবর! আজকাল তো কেবল খারাপ খবরই থাকে!

—ভারি খারাপ খবর কত্তা। ধম্মকম্ম আর থাকল না। রসিকজনার নাম নিতে পারব না থাকবটা কি নিয়ে বলতে পারেন!

লোকটা কিছু না বুঝে হাঁটা দিল। কাঙ্গালীর বাপের কথাবার্তা শুনে সে অভ্যস্ত। যখন রাজের কাজ করত হাত সবল ছিল এ-ধরনের কথাবার্তা একদম বলতে জানত না। হাতটা নোলা হয়ে যাবার পরই অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলতে শিখেছে।

প্রত্যেক বাঙালীর সম্পদতুল্য একটি স্মরণীয় গ্রন্থ .....

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

বিনয় ঘোষ

১৯৪৯ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বিনয় ঘোষ ভৌগোলিক পশ্চিমবঙ্গে হেঁটে অথবা সাইকেলে প্রায় তিন শতাধিক গ্রাম পর্যটন করে স্থানীয় পুরাকীর্তি লোকশিল্প উৎসব পার্বণাদির ইতিহাস রচনা করেন। এ রকম সাংস্কৃতিক কর্মের তিনি অন্যতম পথিকৃৎ।

১৯৬০ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে বিনয় ঘোষ আরও অনেক গ্রাম ভ্রমণ করেছেন। অনেক নতুন বিবরণসহ এই অমূল্য গ্রন্থের পরিবর্ধিত সংস্করণ তিন খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। বহু চিত্র ও মানচিত্রে সমৃদ্ধ। প্রথম খণ্ড কম-বেশী ৫০০ পৃষ্ঠা। ম্যাপ লিথো কাগজে ছাপা। দাম : ৪০-০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের **বলাকার মন** ৫ম মুদ্রণ : ৭-০০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের **বরযাত্রী ও বাসর** নতুন মুদ্রণ : ১২-৫০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের **কাশীনাথ** দাম : ৭-৫০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের **পুতুল নাচের ইতিকথা** ১২শ মুদ্রণ : ১২-৫০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের **আরোগ্যনিকেতন** ১১শ মুদ্রণ : ১৫-০০

জরাসন্ধ-র **উত্তরাধিকার** ২য় মুদ্রণ : ১২-০০

দেবল দেববর্মার **বাড়ি** দাম : ৮-০০

প্রকাশ ভবন ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২

রহস্যময় কথাবার্তা। সময় সময় / বড্ড ভাবায়।

—ও কর্ত্তা জবাব দিলেন নি যে!

—কি বলিস মাথামুণ্ডু বুঝি না।

কানু গড়িয়ে পড়ত হেসে। অথবা সেই যে ভেতরে দম দেওয়ার কি একটা চাবি আছে ওটা কে যেন ঘুরিয়ে দেয় সঙ্গে সঙ্গে হাত ওপরে উঠে যায় ঘুরে যায় শরীর নেচে বেড়ায় গেয়ে বেড়ায় সে সে একতারাটা ওপরে তুলেও শেষ পর্যন্ত গেয়ে উঠতে পারল না। দৌড়ে গেল। বলল খবরটা কি ঠিক!

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা দরকার। বোধহয় ধমকেই উঠত কানুকে। পথ আগলে দু' হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাধ্য হয়ে বলল কিসের খবর।

লোকটা অগত্যা বলল, তোর বৌ-য় আর কোনো খবর পেলি!

কানু মুখটা সহসা ভারি দুঃখী দেখাল। কিছু বলল না।

—পেটাতিস শুনছি খুব।

—না বাবু। আঁচড়ে কামড়ে দিলে কি করি বলেন! না পেটালে ওর রাগ পড়তনি কর্তা।

আসলে লোকটা সব পুরোনো খবর দিয়ে ভেগে পড়তে চায়। —বেঁচে গেছিস। পাঁচ সাত মাস আগে বলে বেঁচে গেছিস নইলে খবরটা কি ঠিক বের হয়ে যেত।

কানু কেমন অন্য রহস্যময়তা টের পায়। সে বলল, কেন বাবু আমি তো দোষ করিনি। তালের ব্যাপারীর সঙ্গে ভেগে গেলত আমি কি করব।

—আসলে তালের ব্যাপারী না অন্য কিছু কে জানে!

বলল, ও কথা বলবেননি কর্তা। কাঙ্গালীর মা নেই ও-কথা বলবেননি। আমি তবে নিত্য দিন গান শুনাই। ঘুরে ঘুরে গেয়ে গেয়ে, সব কষ্ট বাবু ওর লাগি। কাঙ্গালীর মা না থাকলে গান কিসে, সব কচু কচু!

লোকটার এত কথা শোনার সময় নেই। বাস রাস্তার দিকে হন হন করে হাঁটা দিল। পুরোনো ধান্দা আবার মাথার ভেতর গুড়ে গুড় করে উঠছে কানুর। কাঙ্গালীর মা চলে যাবার পর সে কত এমন ফিসফাস কথা-বার্তা শুনেছে। সে দাওয়ায় খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে থাকত। শুনত চার পাশে সব ফিস ফাস শব্দ, যা গোঁয়ার, গলা টিপে কোথায় পুঁতে রেখেছে কে জানে! বিশাল দু হাতে সে যথার্থই গলা টিপে ধরলে কেউ টের পেত না। মাঝে মাঝে কাঙ্গালীর মার অসদাচরণে এমন ইচ্ছেও হয়েছে তার, কিন্তু সে পারে নি। সোহাগের কথা মনে পড়ত তখন। দজ্জাল মেয়েছেলেটার যে হয়ড়ে মজ্জায় যৌবন!

ও গৌরহরি ভাবছটা কি। হাঁটো। গেয়ে ওঠো জোরে। দ্যাখো সামনে কত মানুষের আবাস, রসিক জনার কাণ্ড দ্যাখো গৌরহরি। বাজার হাট দ্যাখো, সওদা করে নিয়ে যাচ্ছে দ্যাখো। নাচারি ব্যারামি মানুষ বসে আছে দ্যাখো। বালকবালিকাদের বিদ্যাভ্যাস দ্যাখো! ছুটো ছুটি হুড়ো-হুড়ি খাওয়াখায়ি কি না আছে ভবের হাটে বলেই সে গেয়ে উঠল, ও গোলেমালে পাঁরিত কইর না.....আ.....আ।

সংসারী মানুষেরা নায় চড়ে বসে। দূরে কোথাও কেউ গাইছে, এবং বেশ সুরেলা গলা, সহজেই মজে যাওয়া যায়। বুকে ধুকপুকুনি ওঠে। কাজে হাত সরে না। দরজা জানালায় ছায়া নড়ে ওঠে। হাত বাড়িয়ে কেউ দেয় কেউ দেয় না। সে হেঁটে

আগের গল্প : রচনা—১৯৬৭

কাল-ভুজঙ্গ

নিশি ফিসফিস করে ডাকল, সোনামণি অ সোনামণি!'

সোনামণি কোন উত্তর করল না। মানুষটা বারান্দায় বসে সোনামণিকে ডাকছে। সোনামণি উঠোনে কচু সেদ্ধ করছে। দু' মেয়ে সোনামণির। অঙ্গি বঙ্গি দুই ছানা-পোনা। উনুনের ধারে কচু সেদ্ধ হবার আশায় বসে রয়েছে। উদোম গায়ে বসে আছে। আর অভাব সোনামণির নিত্যদিনের। সারা অঞ্চল জুড়ে খরা আর খরা। বর্ষা নেই। বৃষ্টি হচ্ছে না। বৃষ্টির আশায় মানুষটা বারান্দায় বসে আকাশ দেখছিল। বর্ষা এলেই ফসল ফলবে। ঝোপে-জঙ্গলে শাক-পাতা গজাবে। অন্ন নেই পেটে মানুষের অন্ন না থাকলে মাথা ঠিক থাকে না। সুতরাং নিশির ডাকে সোনামণি বিরক্ত হচ্ছিল।

'কিছু বলছিস নাকে সোনামণি' খুব গলায় ফের ডেকে উঠল নিশি।

তবু সোনামণি জবাব দিল না। মানুষটা খাবার লোভে অমন করছে।

'আমি কি তুর কেউ হই না রে সোনা-মণি?'

এবার সোনামণি ক্ষেপে গেল। 'তু আমার ভাতার নিশি।' রাগলে সোনামণির কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। মরদকে ভাতার, আলসে ভাতার অথবা গালাগাল—মরে না কেন যম কি নেই হা ঈশ্বর তুর মুখে আগুন—এ সব বলে সোনামণি কেমন সুখ পায়। সুখ পেলে তখন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। হাঁটুর উপর কাপড় তুলে কটুবাক্য বর্ষণ। বারান্দা থেকে অপ্রস্তুত জ্যোৎস্নায় নিশি টের পেল—সোনামণি এবার হাঁটুর উপর কাপড় তুলে কটুবাক্য বর্ষণ করবে। ভয়ে নিশির গলা প্রায় কাঠ হয়ে গেল। সে ভয়ে ভয়ে বলল 'রাগ করিস না সোনামণি। তুকে একটা কথা বললে রাগ করে দিবি না ত!'

'মরণ'—সোনামণি মুখের উপর ঝামটা মারল একটা। মাঠে এখন আগুন জ্বলছে প্রেট আগুন—মানুষটার চোখে আগুন। সোনামণি এই প্রখর খরার দিনে নিশির চোখে আসঙ্গলিপ্সা দেখে ভয় পেয়ে গেল।

'মরণ বলছিস সোনামণি! মরণ বলতে নাই রে। মরণ বললে স্বামীর ঘরে আগুন লাগে। ঢোল বাজায় যে মানুষ যে মানুষ বাড়ি বাড়ি পুজো-পার্বণে ঢোল বাজায়, কাঁসি বাজায় তারে মরণ বলতে নাই।' তারপর বারান্দা থেকে সন্তর্পণে নেমে খোলা মাঠের দিকে মুখ করে বলল, 'তুই সোনামণি নিশির সঙ্গে মাঠে যাবি। বড় মাঠ। মাঠের দক্ষিণ সামুতে সরকারী খামার। খামারে বাবুরা বীজের ধান্য বুনেছে। সোনামণি রে সোনামণি কি ধান্য কি ধান্য!' বলে নিশি একটা ঢোক গিলল। নিশি যে ঢোল বাজায় পুজো-পার্বণে যে কাঁসি বাজায় পুজো-পার্বণে মুচিরাম হিঁদে যার বাপ ছিল পাঁচ কাঠার জমির উপরে যার ঘর ছিল যার এখন কিছুই নেই—সব বন্ধক নিয়েছে ভালমানুষের ছা শশী। শশী এখন বাবু, বাবু শশী খামারে এখন দারোয়ানের কাজ করছে।

সোনামণি বলত—'নাগর আমার!'

সেই নাগরের বিয়েতে কন্যার অন্নপ্রাশনে ঢোল বাজিয়েছে নিশি। পাপ মুছে পুণ্য তুলে দিয়ে এসেছে, আর ধান্যদূর্বা ঢোলের উপরে—নিশি কত মঙ্গলকামনা করেছে শশীর। সেই শশীবাবু দু' গন্ডা টাকায় জমি বন্ধক রেখে সোনামণি সহ নিশিকে বিবাগী করে দিল।

নিশির দুই মেয়ে অঙ্গি বঙ্গি। ওরাও পুজো-পার্বণে নিশি ঢোল বাজাতে গেলে ছোট গামছা পরে সঙ্গে সঙ্গে যায়। বাপের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি কাঁসি বাজায়। কিন্তু খরা প্রবল খরা। এখন আর কে কার পাপ মুছে

বার ঘরে ঘরে, রাস্তায় রাস্তায় মাঠের অভ্যন্তরে। ছোট্ট বালিকা দুষ্টুমী করে ডাকে ভিখিরী ভিখিরী।

কানু থামে। সে বলল, নামদিই পয়সা নিই। ভিখারী না।

বালিকা খুশী মনে হাত নেড়ে দেয়, পয়সা নেবে?

কানুর কি যেন মনে হয়! বলে, না। তারপর বলে খুকুদিদিমণি, পোকা নড়ে পোকা!

—পোকা কি গো আবার।

—পোকার বড় খারাপ স্বভাব। কি যে চায়। কামড়ায় টের পাও না।

—ধুত্তোরি, বাবা আসুক বলব।

তোমার বাবা কোথায় থাকে? মা আছে। মা, জননী। জননী কবে হবে তুমি জান না!

—ও ভিখারী আমাদের বাড়ি চল। গান করবে।

কানু কেমন লোভী হয়ে পড়ে। প্রকৃতির কুটে খেলার কথা টের পায় কিনা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে। সে দাঁড়ায়। এবং তারপর পায়ের কাছে বসে পড়ে। প্রায় কাশ্গালীর বয়সী, কেমন টান ধরে যায়! বলে লেবেনচুস খাবে। এনে দিতে পারি।

এবং ইচ্ছে হয় কেন জানি, কাশ্গালী আবার ফিরে এসে সব তার লোপাট করে নিয়ে যাক। দরজা ভেঙ্গে, টোফা ভেঙ্গে নিয়ে গেলেত ভালই—কার জন্য আর রাখা! সে যতই গালমন্দ করুক, পাড়া মাথায় করে একে ওকে ডেকে আনুক, গভীর নিশীথে টের পায় বড় সুখ, সুখের জন্য চোখ ভেসে যায়। বলে ওরে হাভাতের বেটা, চাইলেই পারতিস, আমি কি তোকে দিতাম না।

মেয়েটা বলল, তোমার বৌ নেই?

কানুচরণ বলল, আছে।

—তোমার ছেলে নেই?

কানুচরণ বলল, আছে।

—তবে ভিক্ষা কর কেন?

তখনই ধুমসো মতো লোকটা ধেয়ে আসছে। ও পারুল লোকটার সঙ্গে কোথায় যাচ্ছিস!

—লেবেনচুস দেবে বলেছে!

—কি কাণ্ড, তোমরা কে কোথায় আছ, তারপর কানু দেখল লোকটা যা খুশি বলে যাচ্ছে। লেবেনচুস দিয়ে ভোলানো। কানু যত বলে, না আমি ভালমানুষ, গান গাই, পয়সা কেউ দেয়, কেউ দেয় না, কে কার কথা শোনে। পঙ্গপালের মতো ধেয়ে আসছে সব মানুষেরা। ছেলে বুড়ো, উত্তম মধ্যম, নবীন গরীব, প্রবীন ধনবান, একসঙ্গে একাট্টা হয়ে কি যে প্রকাণ্ড লাগছে না! ছাস চামড়া ঠিক ঠাক আছে কি নেই যখন সে সামান্য ফুসরত পেয়ে দেখতে গেল তখন কোনো হুকার বাতাস ভেসে এল। বলল জোর খবর, জোর খবর। কে রাস্তা পার হয়ে চলে গেল। পৃথিবীতে এত খবর মানুষের তবে থাকে— সে কোন বকমে টেনে হিঁচড়ে শেষমেষ বাস রাস্তার গাছের নিচে পড়ে থাকল। হাত পা অসাড় মনে হচ্ছিল, গিঁটে গিঁটে ব্যাথা। গাল মুখ ফুলে সত্যি গোব-হরি বানিয়ে দিয়েছে তাকে। শুকনো হাড় মাস কেমন ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে যাচ্ছে।

সকাল বেলায় আবার খবর, নিত্য দিনের মতো খবর কোনো ছেলেধরার কথা, কোনো পারুলের কথা, কোনো রহস্যজনক মৃত্যুর কথা। মোক্ষম সব দাওয়াই পাওয়া গেছে মানুষ ভুলিয়ে রাখার।

বটতলার একটা মৃত লোকের পাশ কাটিয়ে হুকারটা চিৎকার করতে করতে যাচ্ছিল, জোর খবর। কিন্তু বটতলার সত্যি একটা মরা মানুষ দেখে কেমন আটকে গেল সব কথা। ফ্যাস ফ্যাসে গলায় বলল, তুমি কেন মরে পড়ে আছ হে ভালোমানুষ! ভালোমানুষ কোনো জবাব দিল না।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

পুণ্য নেয়। তাই অল্পি বল্পি দুই মেয়ে কচু সেদ্ধ পাতে তুলে খুব তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে।

বোধ হয় দুই মেয়ের তারিয়ে তারিয়ে খাওয়া দেখেই নিশি আগুন হয়ে উঠেছিল। পেটে আগুন, পিঠে আগুন সারা মাঠময় শুধু আগুন ছড়িয়ে আছে—ক্ষুধার আগুন। নিশি ক্রমশ ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিল—'অ সোনামণি, শুনতে পেছিস!'

দুই মেয়ের খাওয়া দেখে সহ্য হচ্ছে না মানুষটার। সোনামণিও আগুন হয়ে আছে ভিতরে ভিতরে। সে দাঁত শক্ত করে বলল, 'শুনতে পেছিস নাগর!'

সব শুনতে পেয়েছে, তবে। সে এবার গলে গলে পড়ল। 'অরে সোনামণি অ সুমি তবে দে দুটা খেয়ে লিলে শান্তি পাই।

'হা আমার মানুষ রে!' বলে সোনামণি কপালে করাঘাত করল। প্রায় বিলাপের মত সুর ধরে বলতে থাকল, 'হায় ছান্দপোনা পাখ-পাখালির হয়; গাছের পাতা মাছের মাথা হেথা-হোথা যা মিলে লিয়ে আসে, ছানা-পানার কণ্ঠে পাখ-পাখালীর ঘুম থাকে না চোখে—আর তু এক মনুষ্যের ছানা মেয়ে দুটা খেয়ে লিচ্ছে তর সহ্য হচ্ছে না!'

অরে সোনামণি অরে সুমি তুই এমন কর রেতের বেলা বিলাপ করিস না। বিলাপ করলে মাঠে-ময়দানে মড়ক লেগেছে ভেবে সকলে ছুটে আসবে। আমি এক মানুষ দুলী মানুষ আমার দুই মেয়ে অল্পি বল্পি। দুলী মানুষের অমঙ্গল বইতে নাই।' নিশির ইচ্ছা হল, ঘরে ঢুকে ক্ষুধার জ্বালায় ঢোলটা কাঁধে নিয়ে মাঠে নেমে যায়। মেয়ে দুটো কচু কদু সেদ্ধ খাচ্ছে। সোনামণি কাঠের হাতা নিয়ে বসে রয়েছে ওরা পাতেরটুকু শেষ করে ফেললেই বাকিটুকু ঢেলে দেবে। নিশির ঢোল নিয়ে ছুটতে ইচ্ছে হল মাঠে তারপর ঢোলের উপর বোল তুলে ছররা ছুটিয়ে মাঠে-ময়দানে আগুন ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছা হল। ক্ষুধার আতঙ্কে সোনামণির গলা টিপে ধরতে ইচ্ছা হল।

বড় দুঃসময়। না আছে পূজা না আছে পার্বণ। দেশের লোক আকালে আকালে গেল। কি করবে কাকে দোষ দেবে সে ভেবে পেল না। তাছাড়া মনে হল রেগে গিয়ে লাভ নেই। বরং ঠান্ডা মাথায় পেটে হাত রেখে বসা যাক। উঠোনের উপর চুপচাপ বসে থাকলে সোনামণির দয়া হতে পারে। সে সোনামণিকে সেজন্য আর বিরক্ত করল না। উঠোনের উপর সে হাঁটু গেড়ে বসে থাকল। মনে হল শশীর কথা। শশীর জমির কথা। সরকারী খামারে বীজের জন্য ধান ছড়িয়ে রেখেছে শশী। ধানের কথা মনে পড়তেই নিশির সবটুকু জ্বালা মুহূর্তে উবে গেল। সে এবার গিয়ে হাত পেতে দাঁড়াল সোনামণির কাছে। দে একটু দে। পেটের জ্বালা নিবারণ করি। দে দোহাই তুর বাপের সোনামণি দে একটু দে পেটের জ্বালা নিবারণ করি দিলে তুর আয়ু বাড়বে সোনামণি। পুণ্য হবে তুর। সতীলক্ষ্মী হবে মরবি।' তারপর খুব কাছে গিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'যাবি তু যদি যাস তবে সোনার ধান্য তুল্য লিব। শশী কাদামাটিতে বীজের ধান্য ছড়িয়েছে। যাবি তু! তু আর আমি দু' পাখিতে সারা রাত ঠুকরে ঠুকরে সব ধান্য তুলে লেব।' সোনামণিকে বড় তাজা মনে হচ্ছে এখন। স্বপ্ন দেখছে যেন। নিশি এবার সুযোগ বুঝে বলে ফেলল 'দে সোনামণি, দে একটু খাই। খেয়ে পেটের জ্বালা নিবারণ করি। সঙ্গে সঙ্গে সোনামণি কেমন জেগে গেল। শক্ত হয়ে বসে থাকল। সারা দিনমানে এই কচু সেদ্ধ সম্বল। সে নিশিকে আড়াল দেবার জন্য হাঁড়িটা পেছনের দিকে টেনে নিল।

বড় দুঃসময়। বড় বেহায়া নিশি। সে ঘরে গিয়ে সামনে বসল। তারপর সে

আগের মত হাত বিছিয়ে বলল, 'আমি চুলী মানুষ সোনামণি আমারে তু ছোট করে লিচ্ছিস। তু আর আমাতে এত ভালবাসা তু আমারে ছোট করলে ধম্ম সইবে না।'

তখন অঙ্গি ডাকল 'বাপ।' বাঙ্গি ডাকল, 'বাপ।'

তখন সোনামণি টিনের ভাঙা থালায় অবশিষ্ট কচু সেদ্ধ দু' ভাগ করে নিশির পাশে খেতে বসে গেল। 'লে খা। ইবারে কি বুলবি বুল।'

'সোনার ধান্য আছে গ মাঠে।' নিশি কচু সেদ্ধ মুখে আলগা করে দেবার সময় কথাটা বলল। এমন করে বলল, যেন স্বপ্নে দেখা গুপ্তধনের খবর দিচ্ছে।

'কোথায়?'

'শশীর খামারে।' নিশি দুলে দুলে এত বড় খবরটা ভাল করে এবার শোনাল, সোনামণিকে।

অঙ্গি বলল 'আমি যাব বাপ।'
বাঙ্গি বলল 'আমি যাব বাপ।'

'দেখাল ত!'

সোনামণি ঢকঢক করে জল খেল। তারপর এনামেলের তোবড়ানো ঘটিটা পাশে রেখে বলল, 'গেলে কি অধর্মটা হবে শুনি।'

'ধরা পড়ে যাব।'

চুপি চুপি যাব। কেউ টেরটি পাবে না। ওরা খুঁটে খুঁটে ধান তুলে লিবে।'

অঙ্গি বঙ্গি দুই মেয়ে। সুদিনে দুর্দিনে এই দুই মেয়ে। সুদিনে ফসল কাটা হলে মেয়ে দু'টো মাঠময় ঘুরে বেড়ায়। কোন্ মাঠের কোন্ সামুতে ইঁদুরে গর্ত করে ধান চুরি করে নিয়েছে তার খবর বয়ে আনে মেয়ে। তখন নিশি আর ঢোল কাঁধে লয় না। মাথায় ফেটি কাঁধে কোদাল। নিশুতি রাতে দুই মেয়ে সঙ্গে দেয়। সরু হাতে অঙ্গি বঙ্গি দুই মেয়ে গর্তের ভেতর থেকে গুচ্ছ গুচ্ছ ধান তুলে আনে অথবা ওরা পাহারা

দাঁতের ডাক্তাররা বলেন

নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করলে আর মাড়ি মালিশ করলে মাড়ির গোলযোগ ও দাঁতের ক্ষয় রোধ করা যায়

নিয়মিত ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট ব্যবহার করেন এমন অনেকে অযাচিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে লিখেছেন :

"... আমার স্ত্রী দাঁতের গোলযোগে ভুগছিলেন···টুথপেষ্ট বদলে ফরহ্যান্স ব্যবহার করতে শুরু করলেন·· এমন সুফল পেলেন, যে এখন অন্য কারো মাড়ির গোলযোগ হলেই উনি তাঁকে ফরহ্যান্স ব্যবহার করতে জোর করেন। আমার ভাই যিনি ইংল্যাণ্ডে, তিনিও ভাবতে তৈরী ফরহ্যান্সের ৬টি টিউব পাঠানোর জন্যে পীড়াপীড়ি করে লিখেছেন।

(স্বাঃ) টি. জি. এম. ডি'সুজা
বম্বে

"বাজামুস্তির এক ডেন্টিস্ট···দাঁত আর মাড়ির জন্যে আমাকে ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট ব্যবহার করতে বললেন। আমি অবিলম্বে ওঁর উপদেশ পালন করলাম, আর অল্প সময়ের মধ্যেই আমার নিঃশ্বাস আর মাড়ি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো। সেই থেকে আমি ফরহ্যান্স ছাড়া আর কিছু জানি না। আমার সারা পরিবার (আমরা ৯ জন!) ফরহ্যান্স ব্যবহার করি, আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই অভ্যাস আর বিশ্বাস আমাদের পরিবারে পুরুষানুক্রমে চলবে।"

(স্বাঃ) পি জে ল্যাজার
চিত্তালা, অন্ধ্র প্রদেশ

(এই প্রশংসাপত্রের প্রতিচ্ছবি (ফটোস্ট্যাট জেফ্রি ম্যানার্স এণ্ড কোম্পানী লিঃ-এর যেকোনো অফিসে দেখতে পারেন।)

৯৯% জন বয়স্ক ভারতীয়র মাড়িতে গোলযোগ পাওয়া গেছে

কোলকাতায়, পৃথক দুটি পরীক্ষায় ৪··· জন ১৫-৩০ বছর বয়সের লোকের দাঁত পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ৯৯% থেকে ১···% জন লোকের দাঁতে গোলযোগ আছে।

দাঁতের সঠিক যত্ন নিতে হলে, রাত্রে আর সকালে আপনার দাঁত ব্রাশ আর মাড়ি মালিশ করার জন্যে ফরহ্যান্স ব্যবহার করুন।

ফরহ্যান্স
দাঁতের ডাক্তারের তৈরী টুথপেষ্ট

বিনামূল্যে! দাঁত আর মাড়ির যত্ন সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ রঙীন পুস্তিকা। অনুগ্রহ করে ডাক খরচ বাবদ ২৫ পয়সার ডাকটিকিট সমেত এই ঠিকানায় লিখুন : ফরহ্যান্স ডেন্টাল অ্যাডভাইসরী ব্যুরো, ডিপার্টমেন্ট নং T 129, পোষ্ট ব্যাগ ১১৪৬৩, বম্বে ৪০০ ০২০। যে ভাষায় চান জানাবেন।

IGIE.193 BEN.

দেয়। মাঠময় চোখ সজাগ করে রাখে—বাপ কে যেন আসে! বাপ ওটা কি? বাপ কোদালে যেন কি লেগে আছে—অস্ত লেগে আছে। অস্ত মানে, কিসের অস্ত। ইঁদুরের। তখন হেই হেই করে নিশির চিৎকার না রে না, ইঁদুর-বাদুড় কিচ্ছু লয় মা বসুন্ধরার কন্যা মা মনসার বাহন ভুজঙ্গ। কালো রঙের ভুজঙ্গ—চিকচিক করছে আর মাথাটা দোলাচ্ছে। কিন্তু সেবারে কি হল বাপ। কোদাল মেরে মেরে হয়রান নিশি কোন্ সুদূরে ইঁদুরে ধান টেনে নামিয়েছে টেরাট পাওয়া যাচ্ছে না। কোথাও ধানের গুচ্ছ নেই একটা। হায় হায় পরিশ্রম বৃথাই গেল। রাগে দুঃখে গান ভেসে এল নিশির গলায় সম্বরে ওটা সুখের গান ছিল—হায় মা কে কার তরে চুরি করে হে মা ঈশ্বরী। কিন্তু নেই ধান গর্তের ভিতর কোথাও নেই—প্রায় মাঠ চষে ফেলেছে নিশি, নিশুতি রাতে অঙ্গি বঙ্গির ভয় ধরে গিয়েছিল তখন নিশির নজর হক করে থেমে গেল। গর্তের মুখে আলিসান ভুজঙ্গ। কালো রঙের ভুজঙ্গ। কোদাল মারলে সামান্য লেজটুকু কাটা যাবে। গোটা শরীর গর্তের ভিতরে। হায় তরে সব যাবে। ভিতরে সোনার ধান্য আছে গ মা জননী। তবে ইবারে কি করি। বলে এক হ্যাঁচকা টান লেজ ধরে। হাত বিশেক দূরে আলিসান ভুজঙ্গটা ছুঁইয়ে পড়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর যায় কোথায়। নিশি দেখল ভুজঙ্গটা ওকে তেড়ে আসছে। ঠিক মনে হল সোনামণির মত তেড়ে আসছে। নাকে নথ ছিল সোনামণির বালির চরে সোনামণি হক করে কাকে কামড়ে দিয়ে ছিল—বুঝি শশীকে বুঝি নিশিকে এখন কামড়ায় নিশি ছুটতে থাকল যুবতে থাকল। নিশি এঁকেবেঁকে চলতে থাকল। আর হাঁকতে থাকল—অঙ্গি বঙ্গি ধান তুলে লে। আমি ভুজঙ্গরে ডাঙ্গায় তুলে আড়াল করে লিচ্ছি। নিশি আলের উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে ছুটতে থাকল।

অঙ্গি বঙ্গি নাছোড়বান্দা। ওরা যাবেই মৃগয়াতে বাপ যাবে, সঙ্গে মা সোনামণি যাবে—ওরা যাবে না কেমন করে হয়।

সুতরাং অঙ্গি গেল, বঙ্গি গেল। সঙ্গে মা সোনামণি এক কাপড়ে মাঠে নেমে গেল। কিছু আর সম্বল নেই সোনামণির। এক কাপড়ে এক আঁচলে ওকে সব-সংগ্রহ করে আনতে হয়। নিশি কাঁধে গামছা ফেলে কোমরে নেংটি এঁটে সকলের আগে আগে চলল। আর গান ধরল সুখের গান। কে কার তরে চুরি করে হে মা ঈশ্বরী।

গহন মাঠ। দূরে লণ্ঠন নিয়ে শশী খামারে উঠে যাচ্ছে। সে মাঠের ভিতর একটা ভাঙ্গা টিন বেঁধে রেখেছে। টিনটা থেকে থেকে বেজে উঠছিল। একটা দড়ি লম্বা দড়ি মাথার উপর দিয়ে টেনে নিয়ে গেছে খামারে। শশী থেকে থেকে টিনটা বাজায়। নদী থেকে, বিল থেকে পাখ-পাখালি উড়ে আসার সম্ভাবনা। বীজধান বুনে শশীর চোখে ঘুম নেই। যখন দেশে আকাল, যখন দেশে শস্য মিলছে না— ইঁদুরে-বাদুড়ে শস্য খেয়ে নিতে কতক্ষণ। শশী খামারে বসে এখন শুধু টিন বাজাবে। নিষুতি রাতে শব্দটা বড় ভুতুড়ে মনে হয়—মনে হয়, কেউ যেন মাঠময় আকালের ঘন্টা বাজাচ্ছে। পাখ-পাখালিরা আকালের ভয়ে আর নদী বিল থেকে উড়তে সাহস পায় না।

ওরা তখন তারকাঁটার বেড়টা পার হচ্ছিল। ঠিক তখনই টিনটা বেজে উঠল। অরকর করে বেজে উঠল। মাথার উপর দড়িটা অনেক দূরে টেলিগ্রাফের তারের মত চলে গেছে। শশী খামারে বসে দড়ি টানছে। নিশি পায়ের উপর ভর করে দেখল—'ঐ যে হোথা, ছুঁইয়ে সোনার ধান্য।'

অঙ্গি বলল 'কোথা রে বাপ?'

বঙ্গি বলল কুনঠিতে?

নিশি বলল, 'হুই যে দেখতে পেছিস না।'

ওরা পা টিপে টিপে হাঁটছিল। শশীর দড়ি ওদের মাথার উপর। বীজধানের জমিতে বাঁশের খুঁটি। খুঁটির মাথায় ভাঙা টিনটা ঝুলছে। জ্যোৎস্না ছিল সামান্য। কোথাও একটা পাখি ডেকে ডেকে তেপান্তরে হারিয়ে যাচ্ছে। সোনামণির বড় ভয় করছিল শশীর জন্য। দড়ি ধরে শশী বসে আছে। ভয়ে সোনামণির বুকটা শুকিয়ে উঠছে। নিশি ফিসফিস করে ডাকল কোন কথা লয় সোনামণি, কথা বললে শশী টের পাবে। ধরা পড়লে জেল হাজত-বাস। গেরস্থের ঘরে চুরি লয় সরকারী ধান্য বীজধান' ধান্য থেকে হোথা হোথা সব পুণ্য উঠবে।'

অঙ্গি ডাকল—'বাপ।'

বুদ্ধদেব বসুর

আমার যৌবন

কবিতা উপন্যাস প্রবন্ধ নাটক অনুবাদ মিলিয়ে বুদ্ধদেব বসুর বইয়ের সংখ্যা আজ প্রায় দেড়শো। কিন্তু তিনি সোজা-সুজি আত্মজীবনী লিখতে শুরু করেন 'আমার ছেলেবেলা'। 'আমার যৌবন' এই পর্যায়ের দ্বিতীয় বই। বই, দৃশ্য মানুষ প্রকৃতি, সুখ-দুঃখ যা কিছু তাঁর মনে দোলা দিয়েছিলো সবই স্থান পেয়েছে এখানে। মূল্য চার টাকা।

॥ তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ ॥

মহাভারতের কথা : কুড়ি টাকা ॥ কবিতার শত্রু ও মিত্র : পাঁচ টাকা ॥ যে আঁধার আলোর অধিক : চার টাকা ॥ আয়নার মধ্যে একা : পাঁচ টাকা ॥ মেঘদূত : পনেরো টাকা ॥ আধুনিক বাংলা কবিতা : দশ টাকা ॥

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

নির্বাচিতা

বর্তমান শতাব্দী নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের সুবর্ণ যুগ। বিশেষ করে, স্মরণীয় কিছু বাংলা ছোট গল্প এ শতাব্দীতে শ্রেষ্ঠ বিশ্বসাহিত্যের উৎকর্ষ-সীমায় পৌঁছেছে। গত অর্ধ-শতাব্দী ধরে লেখা প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোট গল্পের এই নির্বাচিত সংকলনের প্রত্যেকটি গল্প তাই। মূল্য : কুড়ি টাকা।

এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা—১২

বঙ্গি ডাকল 'বাপ!'

আর সঙ্গে সঙ্গে ওরা চারজনই আলের উপর উপুড় হয়ে গেল। টিনটা ঝরঝর করে বাজছে। আকালের ঘন্টা বাজাচ্ছে শশী। ঘন্টাটা ক্রমাগত বেজে চলেছে। শশী কি ট্রের পেল—পাখ-পাখালি উড়ে এসে বসেছে। আকালের ঘন্টাও পরানে ডর ধরাচ্ছে না! যেন শশী শরীরের সমস্ত শক্তি জড় করে দড়ি টানছিল। যেন প্রাণপণ ঘন্টাধ্বনি করছিল। ভয়ঙ্কর শব্দটা গ্রাম মাঠ পার হয়ে বিলের দিকে নেমে যাচ্ছে। তখন কে যেন কেবল বলছিল হুই হোথা নিশি রে সোনার ধান্য পড়ে আছে রে! ওরা হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছিল। শুধু একটু খেতে পাবলেই হয়। ওরা প্রাণপণ হামা গুড়ি দিতে থাকল গোসাপের মত ওরা হাঁটছে। শুকনো জমি উত্তাপে সব ঘাস জলে পুড়ে গেছে। ওদের হাঁটু থেকে কনুই থেকে রক্ত ঝরছিল। ওদের হুঁশ ছিল না ওরা বীজধানের জমি নাগাল পাবার জন্য অধীর এবং বীজধানের ডুই নাগাল পেয়ে নিশি আনন্দে প্রায় কিছুক্ষণ জমিতে হাত রেখে মড়ার মত পড়ে থাকল।

সোনামণি ডেকে উঠল মানুষটা কতকাল অন্নের মুখ দেখে নি কতকাল ওরা অন্ন ভোজন করেনি সোনামণি ভয়ে ডেকে উঠল 'হেই!' মাথার চুল ধরে টানল। 'হেই কি হয়েছে তুর?' সোনামণির ভয় নিশি দুরন্ত নিশি এত দূরে আসতে গিয়ে ফুসফুসটা জখম করে ফেলেছে। ফুস করে হাওয়া বের হয়ে গেলে আর কি থাকল।

'নিশি। অঃ নিশি।' সোনামণি ফের ডেকে উঠল।

নিশি এবার চোখ মেলে তাকাল এবং খপ করে হাতটা ধরে ফেলল সোনামণির, তারপর ডুইয়ের ভিতর কাদা জমির ভিতর ঢুকে গেল। ওরা প্রায় চারটা পাখির মত খুঁটে খুঁটে যেন ধান খেতে থাকল। খুঁটে খুঁটে খুব সন্তর্পণে—আলগোছ হাত বাড়িয়ে তুলে আনল ধান। একটা ধান দুটো ধান এক সঙ্গে পাঁচটা সাতটা ধান তুলতে পারছে না। পাঁচটা সাতটা ধান তুলতে গেলে এক মুঠো কাদা উঠে আসছে। জ্যোৎস্না প্রায় মরে আসছিল। ওরা ধানের চেয়ে কাদা তুলে ফেলছিল বেশী। শশী খামারে বসে দড়ি টানছে ত টানছেই। এক মুহূর্তের ক্ষন পামছে না। থামলেই ওরা চারটা পাখি ডুইয়ের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। হাতে পায়ে কাদা শরীরে কাদা—সর্ব অঙ্গে কাদা লেগে আছে। চোখ মুখ দেখলে এখন কে নিশি কে সোনামণি আর কে অঙ্গি বঙ্গি বোঝা দায়।

ঠিক পাখির মত ওরা এক পা দু পা করে এগুচ্ছিল। কাদার ভিতর হামাগুড়ি দিচ্ছিল। ধান খুঁটে খে যার গামছায় রাখছে। সোনামণি ধান তুলে আঁচলে রাখছে। ধানের সঙ্গে কাদা আর জমি থেকে জল শুষে আঁচলটা ক্রমশ ভারি হয়ে উঠছে। ধান সামান্য কাদা-জলে গামছা ভরে গেল নিশির। সে কি করবে ভেবে পেল না। ধীরে ধীরে সোনামণির কাছে বুদ্ধির জন্য উঠে গেল। কাছে গিয়ে দেখল সোনামণি গোসাপের মত কাদা হাটকাচ্ছে। শরীরে কোন বাস রাখে নি। সোনামণির অঙ্গ ছোলা মুরগীর মত। গোটা শরীরটা ডুইয়ে বিছিয়ে রেখেছে। সে তাড়াতাড়ি ধান তুলে নিচ্ছে। কারণ শশীকে বড় ভয় সোনামণির। শশী বড় চেনা মানুষ। কঠিন মানুষ। মনে হতেই দাঁত শক্ত হয়ে গেল সোনামণির। কাপড় হাঁটুর উপর তুলে কটুবাক্য বর্ষণ করতে ইচ্ছা হল। বেইমান শশী নেমকহারাম শশী। লজ্জা শরম মানুষটার দিন দিন উবে যাচ্ছে। পয়সা হাতে আসতেই শশী তরলা ডুগী কিনে বোলানের একটা দল করে ফেলল। ওস্তাদ শশী সোনামণিকে তাড়ি খাবার লোভ দেখাল। সোনামণির সোনার ধান্য চুরির লোভে নিশি বাড়ি না থাকলে শশীর ঘুরঘুর করা বেড়ে যেত। 'শশী—তুমি গোলাম হে শশী।' সোনামণির চোখে আগুন জ্বলছিল জিভ ভয়ে শুকিয়ে আসছিল আর সেই এক সিংহের খেলা দেখানের চোখ সোনামণির। সামান্য দূরে অঙ্গি বঙ্গি। সেচের জলে বাঁজের ধান সেই ধান তুলে এদিকেই এগিয়ে আসছে অঙ্গি বঙ্গি। আর সেই মানুষ নিশি কুঁড়ে মানুষ বসে বসে সোনামণির তামাশা দেখছে। সোনামণি থ্যাক করে উঠল।

নিশি আমতা আমতা করে বলল, 'গামছাটা ভরে গেল সোনামণি। ধান লেবটা কিসে!'

'হা রে আমার মরদ।' সোনামণি ফের দুঃখে দাঁত শক্ত করে ফেলল। এখন বচসার সময় নয়। নাচন-কোদনের সময় নয়। এখন শুধু ধান তুলে নেবার সময়। নিশিকে বসে থাকতে দেখে আগুনের মত ওর শরীর জ্বলে উঠছিল। সে কি ভাবল কি দেখল নিশির তারপর সহসা নিশির নেংটিটা হৃৎপিণ্ড টানে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। ঠিক যেন এক ভুজঙ্গ এখন ডুইয়ে মাঝে পড়ে আছে চিত হয়ে।

নিশি বলল 'হ্যা লো সোনামণি হ্যা লো সুমি, আমি নিশি, আমি ঢোল বাজাই পুজা-পার্বণে আমারে তুই উলঙ্গ করে দিলি!'

'মরদের কথা শুন!' সোনামণি ধান রেখে শাড়িতে মুখ তুলে কথা বলল। 'আমার সাধু রে।' সুমি ফের সাঁতার দিল কাদার ভিতর। কিছু জানে না মরদ।' খুঁটে খুঁটে কিছু ধান তুলে আনল। 'অঃ আমার গাঙ্গুনে সন্ন্যাস লিয়েছে রে, জয় মহাদেবের বাচ্চা রে! যা যা ওটা বিছিয়ে যা পারিস তুলে লেনা' সোনামণি আর তাকাল না নিশির দিকে। মাথার উপর এখন আর দড়িটা নাড়ছে না। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। শশী তুমি বড় চতুর হে। তুমি নিশিকে টাকা দিয়ে বশ করেছ। আর তখন চারিদিকে খরা, আগুনের মত ঝিলি মাঠময়, গরু বাছুর জলের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। আর শশী তুমি বড় চতুর হে। তাড়ির খোঁজে তুমি শশী বন-বাদাড়ে ঘুরঘুর করছিলে।

নিশি সেদিন বাড়ি ছিল না। অঙ্গি বঙ্গি নিশির সঙ্গে ঢোল বাজাতে চলে গিয়েছিল দূর গাঁয়ে। তখন সোনামণি, একা সোনামণি বন-বাদাড়ে, ঝোপে-জঙ্গলে কচু কদু খুঁজে মরছে। তখন হনুমানটা গাছ থেকে লাফ দিয়ে একেবারে সামনে নেমে ভূতের মত পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকল। আর যায় কোথায় সোনামণি। সে ঝোপের ভেতর থেকে বলল, 'অঃ ভালমানুষের ছা, দেখত গাছে, ওটা কি?' আর যখন লোকটা গাছ দেখতে গিয়ে বলল, কে কোথাও ত কিছু দেখতে পেছি না রে সোনামণি, কই রে, কি দেখালি তুই, কি দেখাবি তুই আমারে।' তখন সোনামণি তাড়াতাড়ি ঝোপ থেকে বের হবার ফাঁক খুঁজছে। বের হবার

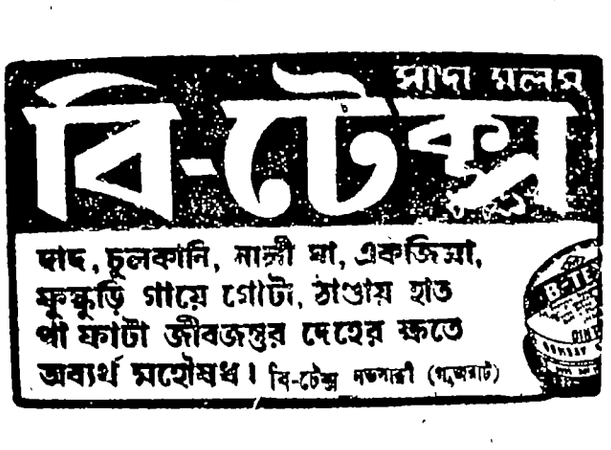

গ্রাহক নেওয়া হচ্ছে

দুর্লভ সেই মহাভারত আবার প্রকাশিত হচ্ছে

মহামহোপাধ্যায়-মহাকবি-ভারতাচার্য

শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য-এর

মহাভারতম্

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-এর

মূল শ্লোক

দর্শনাচার্য শ্রীমন্নীলকণ্ঠের টীকা

শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য-এর

টীকা, পাঠান্তর, প্রতি পর্বের ভূমিকা, ভারতযুদ্ধের কালনির্ণয়, বৃহৎ সূচীপত্র এবং

গদ্যে বঙ্গানুবাদ

আনুমানিক ৪০ খণ্ডে প্রকাশিত হবে।

রয়াল সাইজের এই শোভন সংস্করণ রেক্সিনে বাঁধাই ও প্রচ্ছদে সোনার জলে নাম লেখা। এই শোভন সংস্করণের প্রতি খণ্ডে আনুমানিক ৫৫০ পৃষ্ঠা থাকবে। প্রতি খণ্ডে শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের বিভিন্ন সময়ের দুষ্প্রাপ্য ছবি থাকবে।

প্রতি খণ্ডের আনুমানিক মূল্য ৩০৲ টাকা। ৪০ খণ্ডের মোট মূল্য ১২০০৲ টাকা।

কিন্তু যাঁরা ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬-এর মধ্যে অগ্রিম ২৫৲ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হবেন, তাঁরা প্রতি খণ্ড ২২৲ টাকায় পাবেন অর্থাৎ ৯০৫৲ টাকায় ৪০ খণ্ডের ফুল সেট পাবেন। কলকাতার বাইরের গ্রাহকদের বই পাঠাবার রেজিস্ট্রি ডাক খরচ আলাদা।

যাঁরা এককালীন ৭০১৲ টাকা দিয়ে গ্রাহক হবেন তাঁরা সমগ্র মহাভারতটিই খণ্ডে খণ্ডে পাবেন। আমরা মাত্র ৪০০ জন এককালীন গ্রাহক নেবো।

এককালীন গ্রাহকরা কী কী সুবিধা পেতে পারেন ঃ

৪০ খণ্ডের বেশী হলে বা মোট ধার্যমূল্য বাড়লেও এককালীন গ্রাহকরা ঐ ৭০১৲ **টাকাতেই সমগ্র মহাভারতটি খণ্ডে-খণ্ডে পাবেন। আপনার বাঁচবে ৫০০৲ টাকা।**

প্রথম খণ্ডটি শুভ মহালয়ার আগেই শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত হবে। পরবর্তী খণ্ডগুলি আনুমানিক দু'মাস অন্তর প্রকাশিত হবে।

নির্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হচ্ছে

M.O. ব্যাঙ্ক ড্রাফট, পোস্টাল অর্ডার বা চেক পাঠিয়ে গ্রাহক হতে পারেন। পাঠাবার ঠিকানা ঃ

Biswabani Prakashani 79/1B, Mahatma Gandhi Road Calcutta-9

॥ কোন বিকৃত, সংক্ষিপ্ত বা পরিমার্জিত সংস্করণ নয় ॥

॥ সম্পূর্ণ মূলানুগ সংস্করণ ॥

বিশ্ববাণী প্রকাশনী

৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলকাতা-৯

জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। সব লতাপাতার ঝোঁপ। কোনরকমে লতাপাতা গা থেকে সরিয়ে মাঠে নেমে যাবার চেষ্টা করছে। এবং বলছে, 'দ্যাখ দ্যাখ গাছের মাথায় পাখি. পাখিটা ডিম পাড়ছে দ্যাখ।' কিন্তু হায়, মানুষটা গাছ দেখছে না. সে সোনামণিকে দেখছে—আমি বলি ঝোপর ভিতর কি খচখচ করে, দেখি নিশির বউ সোনামণি। বলে মুখটা ঝোঁপের কাছে নিয়ে হা হা করে হেসে উঠল। কথা শুনে সোনামণি বলল, 'অত হাসা ভাল লয় শশী।' কেমন শুকনো গলায় কথাটা বলল এবং ঝোঁপের ভিতর একটা পাখি হয়ে বসে থাকল। চীৎকার করতে পারল না। কেউ কোথাও নেই। এই ভর দুপুরে এত বড় মাঠে খবা বলে কেউ নেই। আগুন জ্বলছে মাঠে. শশীর সুদের কথা মনে হল। সঙ্গে. সঙ্গে শশী সেই যেন এক আলিসান ভুজঙ্গ —হামাগুড়ি দিয়ে ঝোঁপের ভিতর ঢুকতে চাইছে। সোনামণি বলল, 'অ মা গ।' বলে ফুড়ুত করে মাঠের ভিতর উড়ে যেতেই খপ করে আলিসান ভুজঙ্গটা ওর একটা পা কামড়ে ধরল যেন। পাখি গাছে ডিম পাড়ে. বড় বড় ডিম, মুরগীর মত ডিম।' তারপর সোনামণির শরীরের ভিতর কোথাও না কোথাও ডিম আছে, মুরগীর ডিম লুকানো আছে, সোনামণি শরীরে মুরগীর ডিম লুকিয়ে রেখেছে—আর যায় কোথায় শশী ডিমের জন্য, বের করার লালসায় ওকে তছনছ করে দিতে গিয়ে দেখল, সোনামণি ওর হাতে কামড় বসিয়ে দিয়েছে।

সোনামণি চোখ দুটো কাল ভুজঙ্গের মত ফোঁস ফোঁস করছিল তখন। সোনামণির কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। কচু কদু ফেলে সোনামণি একসময় ছুটতে থাকল।

নিশি এখনও পাশে বসে রয়েছে। ওকে সোনামণি টান মেরে উলংগ করে দিল। সে রাগে দুঃখে প্রায় কথা বলতে পারছিল না। সোনামণিকে বড় ভয় তার। তবু কাতর গলায় বলল, 'আমি ঢোল বাজাই, পাপ ফেলে পুণ্য আনি, তু আমারে সোনামণি উলংগ করে দিলি।'

সোনামণি ধান দেখে রসে বশে আছে। ওর সব দুঃখ কষ্ট এই ধান, এত ধান হরণ করে নিয়েছে। সে উল্লাসে প্রায় নীচু গলায় গান ধরে ছিল; হায় মা, কে কার তরে চুরি করে হে মা ঈশ্বরী।' তারপর বলল, কত সোনার চান্দে পরান কান্দে...অঃ নিশি তু আমারে মেবে ফেল রে।'

কিসে কি কথা হয়, নিশি বোঝে না। সোনামণি এখন প্রায় পাগলের মত হাসছে। কথা বলছে। কথা ত নয়, যেন সুর ধরে চড়ক পূজার দিনে মেশার শুনিমাসীর মত কণ্ঠ খুলে দিয়েছে। বিরক্ত হয়ে নিশি বলল তর পরান এত উথাল-পাথাল করে যেন রে সোনামণি?'

তখনই খামারবাড়িতে কার গলা যেন হেঁকে উঠল, 'ও সামুতে কার গলা পাই হে। এত রাতে কার গলা পাই হে।

সোনামণি গলা চিনতে পেরে বলল 'হেই, হেই নিশি, কি বুলছে শুনে লিচ্ছিস।'

'কি বুলছে?'

বুলচে কার গলা পাই হে।

নিশি, দুবলা নিশি তাড়াতাড়ি করে মাথায় পোঁটলা তুলে ছুটতে থাকল। মেয়ে দুটো বাপের পেছনে ছুটতে থাকল। যাবার সময় নিশি বলছিল, বুলেছি না অত হাসা ভাল লয়।'

'ও সামুতে কে কথা বলে হে? জবাব সেই কেন হে।

অন্ধকারে মনে হল শশী দানবের মত থপথপ করে খামারবাড়ি থেকে নেমে আসছে। আকালের ঘন্টা ওর হাতে এখন বাঁধা নেই। অথবা মনে হল কালো কুচকুচে এক ভুজঙ্গ পাখি ধরার জন্য নেমে আসছে। সে খুব জোরে হাঁকছিল না। কারণ ফাঁদের ভেতরে পাখি ধরা পড়েছে—ও যেন গলা শুনে আকালের ঘন্টা বাজাতে বাজাতে সব টের পাচ্ছিল। সুতরাং সে চোর চোর বলে জোরে পর্যন্ত চেঁচাল না।

চাঁদের আলোটুকু পর্যন্ত মরে গেছে। নিষুতি রাতের অন্ধকার ভেমন ভয়াবহ। বিলে সেই এক পাখি এখনও ডাকছে। আর কাদাজলের ভিতর সোনামণির পায়ের শব্দ ভেসে বেড়াচ্ছিল। সে নিশির সঙ্গে ছুটে যেতে পারল না। নিশি ছোট এক পুটলি মাথায় করে দ্রুত চলে গেল। কিন্তু সোনামণির পুটলি ভারি, সে কিছুতেই বোঝাটা মাথায় তুলতে পারল না। দূরে নিশি ছুটছে। অংগ বংগ ছুটছে। সোনামণি মাথায় তুলে নেবার জন্য আরও দুবার চেষ্টা করল। বার বার চেষ্টা করল। বার বারই জলে কাদায় পড়ে যাচ্ছে সোনামণি, পা হড়কে যাচ্ছে, পা শক্ত করে কাদার ভিতর দাঁড়াতে পারছে না। পালাবার জন্য বোঝা নিয়ে কে টানাহ্যাচড়া করতে থাকল—টনে টেনে বোঝাটা ভুঁইয়ের এক পাশে নিয়ে আসার চেষ্টা করল—পারল না। চোখ মুখ ক্রমশ শুকিয়ে আসছে ভয়ে। ক্রমশ সোনামণির হাত দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। শশী এখন সেই এক দানবের মত অথবা সেই এক আলিসান ভুজঙ্গ খাব খাব করছে। যেন বড় উল্লাস শরীর আর হ্যায় সোনামণি সামান্য এক প্রাণ কাদার ভিতর পাখির মত ধরা পড়ে গেল।

শশী রসিকতা করে যেন হাঁকল. সাহস ত বড় কম লয়.হে! জবাব দিচ্ছ না কানে।'

সোনামণি বুঝল, এত বড় বাঝা ওর তুলে নেবার ক্ষমতা নেই। বুঝল, এত কষ্টের সংগ্রহ, প্রাণের চেয়েও মূল্যবান পুটলিটি ফেল গেলেও রেহাই পাবে না। এখন ছুটতে গেলেও ধরা পড়ে যাবে।

শশী এখন হাত দশ দূরে দাঁড়িয়ে আছে। সে আর এগুল না। সে বোধ হয় দাঁড়িয়ে পাখিটার তামাশা দেখছিল। কাদার ভিতর হুটোপুটি দেখছিল। শেষে দরাজ গলায় যেন পাখি আর পালাতে পারবে না, এমন এক দবাজ গলায় হাঁকল। কে ভুঁইয়ের ভিতর হুটোপুটি করছে হে।'

অন্ধকারে সোনামণি কি করবে ভেবে পেল না। ভয়ে উত্তেজনায় অস্থির সোনামণি তবু ছুটে একবার দেখতে পারে। এখনও সময় আছে। যখন আর উপায় নেই, শশীই ওর কাল শশী.....ওকে ধরে ফেলবে দুবলা নিশিকে নিয়ে পর্যন্ত টানাটানি হবে তখন মাঠের ভিতর দিয়ে ছোটাই ভাল। সে ওর সোনার ধান্য ফেলে ছুটতে থাকল।

'কে আছ হে। দ্যাখ, চোর পালাচ্ছে। খামারে চোর পড়েছে।' শশী এই বলে হাসা ছড়াল। তারপর শশী চোর ধরার মত অন্ধকারে সোনামণির পেছনে পেছনে ছুটতে থাকল। সোনামণি আপ্রাণ ছুটছে, অন্ধকারে ছুটছে। তাবকাঁটার বেড়া সামনে। বেড়াটার সামনে সোনামণি পথ পেল না পালাবার। শশী চোরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কিন্তু সোনামণির গা পিছল, কাদাজলে গা পিছল। পাকাল মাছের মত সোনামণি শশীর শক্ত বাহু থেকে হড়কে গেল। হড়কে গিয়ে দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য সোনামণি। সোনামণি অন্ধকারে ছুটছে, যেদিকে ভুঁই আছে সেদিকে ছুটছে সেই অন্ধকার মাঠের ভিতর দাঁড়িয়ে দু' হাত উপরে তুলে জনহীন প্রান্তরে শশী চীৎকার করে উঠল, 'তুমি সোনামণি, তুমি জান না আমি

শরৎ অমনিবাস বার্ষিকীতে বহু তথ্যসমৃদ্ধ অপ্রকাশিত অংশ-
শরৎচন্দ্র—মণি বাগচি—১৮৲
রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম • কাজী নজরুল ইসলাম • ২০৲
দেশবন্ধু • মণি বাগচি • ২০৲
মহানায়ক মুজিবুর-অপ্রকাশিত অংশ-১৫৲ মহাজীবন-অপ্রকাশিত অংশ-২০৲
মোহন লাইব্রেরী: ৩৫ এ, সূর্যসেন স্ট্রীট • কলিকাতা-৯ ফোন: ৩৫ ০৬৩৩

শশী, কাল-শশী। তোমাকে আমি ফাঁদে ফেলেছি হে সোনামণি।' ফাঁদের কথা শুনে সোনামণি আর ছুটতে পারল না। হাত-পা অসাড় হয়ে গেল। চারিদিকে অন্ধকার, চারিদিকে তার কাঁটার বেড়া আর সেই আকালের ঘণ্টা কে যেন কেবল বাজিয়ে চলছে। 'হা মা ঈশ্বরী, আর ছুটতে লারছি।' বলেই সে ভুঁইয়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। জমির পাড়ে দাঁড়িয়ে শশী হা হা করে সেই এক হাস্য ছড়াল। খাকী হাফ-প্যাণ্ট পরা শশী কাদার ভিতর নেমে গেল। উদোম গায়ে শশী সোনামণিকে সাপটে ধরল। কিন্তু হড়কে যেতেই শুকনো জমি থেকে ধুলো মাটিতে হাত শুকনো করে এল। তারপর ফের কাদার ভিতর নেমে সোনামণিকে মরা মাছের পাখনা ধরে টানার মত একটা হাত টেনে তুলল উপরে। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'আমার ভুঁইয়ে খোলা গায়ে মুরগী ওড়ে, এ কি তাজ্জব হে!' কিন্তু কোন জবাব নেই। কাদার ভিতর মড়ার মত পড়ে আছে সোনামণি। শশী শরীরের ভিতর হাত দিয়ে কি খুঁজল, শেষে হাঁটু গেড়ে পাশে দু' হাত রেখে কাদা থেকে টেনে তোলার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখল, বড় পলকা শরীর সোনামণির। সে তাকে কাঁধে তুলে নিল। দূরের মজা দিঘিতে ধুয়ে পাকলে নেবার জন্য শশী হাঁটছিল। দু' পা যেতেই সোনামণি কাঁধ থেকে হড়কে নীচে পড়ে গেল। আর শশী শক্ত করে ধরতেই সোনামণি যেন প্রাণ পেয়ে গেল। সে আবার ছুটছে। শশীর শরীর ভারি, সে কাদার ভিতর ছুটতে পারছিল না। সোনামণির পলকা শরীর সে সামান্য আয়াসে প্রাণ পেয়ে গেল সে উড়ে উড়ে পাখির মত ভুঁইয়ে খেলা দেখাতে থাকল শশীকে। সে প্রায় উড়ে উড়ে ছুটতে থাকল। সে এই কাদার ভিতর শশীকে ঘুরিয়ে মারছে। সেই যেমন নিশি একদিন এক মাঠে এক ভুজঙ্গ নিয়ে ঘুরে ঘুরে খেলা করছিল, মাঠের ভিতর তেমনি সোনামণি এক ভুজঙ্গ নিয়ে কাদায় ভুঁইয়ে লড়ছে। কিন্তু হায়, এ-খেলা বিষম খেলা। ভুজঙ্গ পাখি ধরার জন্য লড়ছে, পাখি প্রাণ বাঁচানোর জন্য লড়ছে। ফাঁদের ভেতরে পাখি। শুধু ছট-ফট করা যায়। সোনামণি খেলার শেষ পর্যন্ত হেরে গেল। কারণ পা হড়কে পড়ে গিয়ে সে কাদার ভিতর আটকে গেল। শশীরও তর সইছে না। সে হাঁটু মুড়ে কাদার ভিতর বসেই বলে উঠল, 'খোলা গায়ে মুরগী ওড়ে, হায় কত সুখ রে।'

সোনামণি জবাব দিল না। মরা গোসাপের মত চিৎ হয়ে পড়ে থাকল। কারণ এতটুকু শক্তি আর সোনামণির অবশিষ্ট ছিল না। সামান্য যেটুকু শক্তি সে শুধু বিলাপের জন্য, সে নীচে পড়ে শুধু বিলাপ করতে থাকল, হ্যাঁ রে নিশি, তুই আমারে ফাঁদে ফেলে চলে গ্যালি রে। হ্যাঁ রে নিশি আমার সোনার ধান্য চুরি যায় রে।

'শশী বলল, সোনার ধান্য আমার।'

সোনামণি বলল, 'সোনার ধান্য আমার। তু আমার সোনার ধান্য চুরি কবে লিচ্ছিস।' বলেই হক করে শশীর গলাটা কামড়ে ধরল। ভালমানুষের ছা শশী মুরগীর মত, জবাই করা মুরগীর মত উঠে দাঁড়াল। দু-তিনটে বড় লাফ দিল কাদা ভুঁইয়ে, পাগলের মত দু হাত উপরে তুলে ঘুরে ঘুরে শেষে এক আলিসান ভুজঙ্গের মত লুটিয়ে পড়ল। সোনামণি, সামান্য এক প্রাণ-পাখি শশীর মত দানবের, যে আকালের ঘণ্টা বাজাত, প্রাণ হরণ করে চলে গেল। তখন থেকে থেকে পাখির ডাকটাও কমে গেছে, থেকে থেকে শুধু হ্যারিকেনটা খামারে দপদপ করে জ্বলছিল, শুধু জ্বলছিল। তেপান্তরের পাখিটা শূন্যে তখন উড়ছিল, ঘুরছিল আর বুঝি বলছিল—আকালের ঘণ্টা কে বাজায় দেখ।

প্রফুল্ল রায়ের 'অগ্নের গল্পের' রচনাকাল হবে ১৯৬৫ খৃঃ।

॥ বিশেষ সংবাদ ॥

কাগজের মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও পঞ্চম মুদ্রণেরও দাম মাত্র কুড়ি টাকাই রাখা হয়েছে।

সন্তোষকুমার ঘোষ-এর

আকাদেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস

শেষ নমস্কার

শ্রীচরণেষু মা-কে ২০·০০

পঞ্চম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে

প্রকাশিত হলো

কি হয়েছিল সেদিন কয়লাখনিতে? শুধুই কি লেন-দেন? না আরও কিছু। কয়লাখনি জাতীয়করণের উত্তেজনার মুহূর্ত-গুলোকে কয়েকটি প্রাণবন্ত চরিত্রে এই প্রথম উপন্যাসাকারে প্রকাশ করলেন লেখক তাঁর নিপুণ রচনাভঙ্গীতে।

প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীর

নতুন উপন্যাস

টেক ওভার ৭·০০

দে'জ পাবলিশিং C/o দে বুক স্টোর

১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট ॥ কলিকাতা ১২, ফোন : ৩৪-৫০৩৫

কথায় কথায়

হেরিডিটি

হেরিডিটি মানে সাদা বাংলায় যাকে বলে বংশের ধারা, এ-নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। চোরের ছেলেও কি চোর কিংবা ডাকাত হবে? উকিলের ছেলে উকিল না হোক ব্যারিস্টার হবে অন্ততঃ বাগ্মী হবে? ঘুঁটেকুড়ুনির ছেলে যদি জীবনে উন্নতি করে তাহলে কয়লার দোকানি কিংবা হিটারের কারখানার কর্তা হবে? প্রশ্নের ও গবেষণার শেষ নেই। কোথাও মেলে, কোথাও হিসেব মেলে না। তর্কবাচস্পতির বোবা সন্তান কিংবা কবির ছেলে ফুটবলার এসব একটু খুঁজলেই চোখে পড়বে।

এই সম্পর্কে আরো কিছু বলার আগে আসল গল্পটা প্রথমেই জেনে নেওয়া ভালো। অল্পদিন আগে একটি প্রতিযোগিতামূলক চাকরির পরীক্ষায় প্রশ্ন ছিলো, হেরিডিটি কাকে বলে। আমার এক বিশেষ বন্ধু ছিলেন সেই পরীক্ষার অন্যতম পরীক্ষক। তাঁর বাসায় গিয়েছি এক রবিবারের সকালে কিছু গল্পগুজবের পর তিনি বললেন, 'একটা চমৎকার জিনিস দেখাচ্ছি।' একটি উত্তরপত্র খুলে তিনি দেখালেন একটি পরীক্ষার্থী লিখেছে হেরিডিটি অর্থাৎ বংশের ধারা কাকে বলে। পরীক্ষার্থী ছেলেটি চমৎকার প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছে বংশের ধারা মানে হলো কারোর পিতামহ যদি নিঃসন্তান হয় তবে তার বাবাও নিঃসন্তান হবে।

দেখলাম পরীক্ষক বন্ধুটি এই প্রশ্নের উত্তরে নম্বর দিয়েছে জিরো। যদিও এ ব্যাপারে আমার কিছু বলা একান্তই অনুচিত, তবু আমি বললাম একে ফুল-মার্কস দেয়া উচিত। চমৎকার বুঝিয়ে বলেছে ব্যাপারটা, এর মধ্যে ভুল হলো কোথায়? বন্ধুটি আপত্তি করলেন না তর্কও করলেন না কিন্তু নম্বর সেই জিরোই রেখে দিলেন। তা তিনি রাখুন। এ বিষয়ে আমাদের কিছু বলার অধিকার নেই। কিন্তু আমি আমার নিজের মত করে বংশের ধারা ব্যাপারটি একটু সোজা করে ব্যাখ্যা করতে চাই। যেমন আমি আমার ছোট বেলায় দেখেছি আমার বাবা আমার বন্ধুদের নাম কিছুতেই মনে রাখতে পারেন না, তাদের সাধারণত তাদের দাদার বা কাকার নামে ডাকেন কারণ বোধহয় ওদের চেয়ে ওদের দাদা-কাকাদের নাম তিনি আগে থেকে জানেন এবং পুরোটা এক অনিবার্য রাসায়নিক মিশ্রণে মনের মধ্যে ঘুলিয়ে ফেলেন। এ নিয়ে আকৈশোর বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে আসছি। কিন্তু অল্প কিছুদিন হঠাৎ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলুম আমার ছেলেও ঠিক একই অভিযোগে আমার উপর উত্তেজিত আমি নাকি তার সখাসখীদের নাম একদম উল্টোপাল্টা করে বলি তারা এই নিয়ে হাসাহাসি করে এবং এই সামান্য কারণে আমার ছেলে বন্ধুদের মধ্যে মুখ দেখাতে পারছে না।

এ বিষয়ে আমার জ্যাঠামশায় একটি সমাধান বার করেছিলেন, তিনি সমস্ত অর্ধ-পরিচিত নাম-মনে-করা-কঠিন ভদ্রলোকদের কানাইবাবু নামে ডাকতেন, সমস্ত গৃহভৃত্যের নাম ছিল তাঁর কাছে রামদয়াল। এবং আশ্চর্যের বিষয় ভদ্রমহোদয় এবং গৃহভৃত্যগণ যথাক্রমে সমভাবে এই আহ্বানে সাড়া দিতেন।

এই রকমভাবে আমিও চলবো কিনা কে জানে বংশের ধারা ব্যাপারটি আমার উপর বেশ চেপে বসেছে। অন্যের দুঃখের কাহিনী শুনতে শুনতে আমি যে অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ নিজের মনে মুচকি হেসে উঠি যা চোখে পড়লে কাহিনীকার পাগলের মত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন সেটা আমার একার ব্যাপার নয়। আমার বাপ-ঠাকুর্দা চৌদ্দ পুরুষ হেসে আসছেন ঐ ভাবে শতাব্দী ধরে।

কিন্তু এসব তবু ভালো, অন্যের পক্ষে না হোক অন্ততঃ আমাদের পক্ষে কিছু খারাপ নয়, কিন্তু আমাদের বংশের ধারায় অবো দুটি ভারি গোলমেলে ব্যাপার রয়েছে। একটি হলো পাগলামি আরেকটি হলো সমস্ত শরীর বাঁদিকে হেলিয়ে চলাফেরা। আমাদের পাগলামি সম্পর্কে অহংকার করা আমার নিজের পক্ষে উচিত হবে না লিখতে গেলে মহাভারত, আসলে এ-বিষয়ে লেখার কথা ভাবাটাই নিশ্চয় পাগলামি। সুতরাং দ্বিতীয় গোলমালটি অর্থাৎ ঐ বাঁদিকে ঝুঁকে থাকা ব্যাপারটা, কেউ কেউ সুরসিক যার জন্যে আমাদের লেফটিস্ট বা বামপন্থী বলেন, সেটা একটু বলি।

কোনোদিন কোনো রাস্তাঘাটে বারান্দায় যদি কোনো লোককে দেখেন, বাঁদিকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কাৎ হয়ে ছুটে যাচ্ছে না হেঁটে যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না তা হলে বুঝবেন সেই হলাম আমি কিংবা আমাদের বাড়ির কেউ। আমাদের সবাই এমনকি আমাদের দশ বছরের ছেলেটি পর্যন্ত এই বিশেষ কায়দায় হাঁটে খুব সম্ভব আমাদের পরিবারে সকলের বাঁ পাটি ডানেরটা থেকে একটু ছোট।

এই নিয়ে আমার একটি অহংকারি গল্প আছে। আমার এক উপরওয়ালা পার্থিব কৌতূহল বশত আমাকে একদা প্রশ্ন করেছিলেন, 'আচ্ছা মশায় আপনার বাঁ পা কি ডান পায়ের চেয়ে ছোট? আমি বিনীতভাবে বলেছিলাম, 'হুজুর, আপনি উপরওয়ালা, আপনি যদি একথা বলেন সে বড় দুঃখের ব্যাপার হবে। আপনি হুজুর আমার বাঁ-পাটিই ছোট দেখলেন আমার ডান পাটি যে বড় সেটা দেখলেন না।'

তারাপদ রায়

শান্তিকুমার বসু
জন সংযোগ অধিকর্তা

ইস্টার্ণ রেলওয়ে

ইস্টার্ন রেলওয়ের জনসংযোগ অধিকর্তা শ্রীশান্তিকুমার বসু জানালেন—'বর্তমানে আমরা সড়ক পরিবহণের সঙ্গেএক জোর দার প্রতিযোগিতাব মধ্যে আছি। এই পবিস্থিতিতে খুব স্বাভাবিকভাবেই দেশের ব্যবসায়ী মহল এবং আমাদের পৃষ্ঠপোষকদের বোঝানোর দবকার আছে যে, কত নিবাপদে, কত কম খরচে এবং কত তাড়াতাড়ি আমবা তাদের পণ্য বা জিনিসকে সথাস্থানে পোঁছে দিতে পারি। তাই অনিবার্যভাবেই সেই বোঝানোর দায়িত্বটা অর্থাৎ প্রচারের ব্যাপারটা আমার দপ্তরের ওপর।'

পূর্ব রেলওয়েকে তাই এ ধরনের বিজ্ঞাপন দিতে হয়—

"That's how it moves — our Container Service which now operates daily, from Calcutta area to New Delhi, Kanpur and Varanasi. And see, how well it suits you, both operationally and economically. A super-fast service with a guaranteed transit time but without any extra cnarge.

The containers move directly to destinations daily, from Howrah by the super Express Goods to New Delhi in 4 days and to Kanpur or Varanasi in 3 days. Secure and exclusive as locker. No risk of damage. No naadling on route."

একটু রসিক ধরনের কর্মচঞ্চল মানুষ শ্রীশান্তি বসু। ভাষণ অমায়িক। সব কথা বেশ হাতের মুদ্রা সহযোগে বোঝাচ্ছিলেন আমায়। চা আসতে আমার দিকে কাপ এগিয়ে দিলেন। তারপর নিজের কাপ নিয়ে বললেন—এ ছাড়াও অন্যান্য দিক তো আছেই। সাধারণ মানুষ অর্থাৎ যাঁরা নাকি আমার ট্রেনের যাত্রী, তাঁদের সুখ-সুবিধার কথা চিন্তা করেও আমাকে প্রচুর সামাজিক শিক্ষার ও নৈতিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞাপন করতে হয়। রেলপথে দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য, নানা অসামাজিক এবং রেলওয়ের পক্ষে ক্ষতিকর কাজ বন্ধ করার জন্যও প্রচার চালাতে হয়। শুধু তাই নয়, এত বড় একটা বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সব কর্মীই যাতে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মঙ্গলকর কাজে নিজেদের মনপ্রাণ এবং সর্বশক্তি নিয়োগ করেন, তাঁদের সেই সচেতনতাকে আরো ভালোভাবে উদ্বুদ্ধ করার দিকটাও আমাদের দেখতে হয়।

চা খেতে খেতে বিজ্ঞাপনের পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। একটা পাতায় এসে থেমে গেলাম। পূর্ব রেলওয়ের খুবই সাম্প্রতিক বিজ্ঞাপন এটি। প্রতিষ্ঠানের কর্মীর আদর্শনিষ্ঠার এবং আত্মত্যাগের ঘটনাকে তুলে ধরে তার সঙ্গে রেলপথে চলাচলের সতর্কতা বিষয়ের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে বিজ্ঞাপনটিতে। যাতে ভবিষ্যতে এরকম ঘটনা আর না ঘটে। ফলিত মনস্তত্ত্বের গূঢ় 'সংমিশ্রণ' ঘটানো হয়েছে এই বিজ্ঞাপনে। যাকে বলা যেতে পারে 'পেথোজ'-এর সঙ্গে 'অ্যাপার্টনেস-এর সমন্বয়। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে বিজ্ঞাপনের বয়ানটা তুলে ধরতে চাইছিলাম, কিন্তু না করে বিজ্ঞাপনটিই দেখানো হল। তার শিরোনামা—'হাঁরা মেলে হরিলাল মেলে না'।

এবার আর একটার কথা বলি। এতে জানোনো হয়েছে বিনা টিকিটে ভ্রমণ এক অপরাধ। এই ধরনের অন্যায় কাজ বন্ধের জন্যও পূর্ব রেলওয়ে বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। ট্রেনে

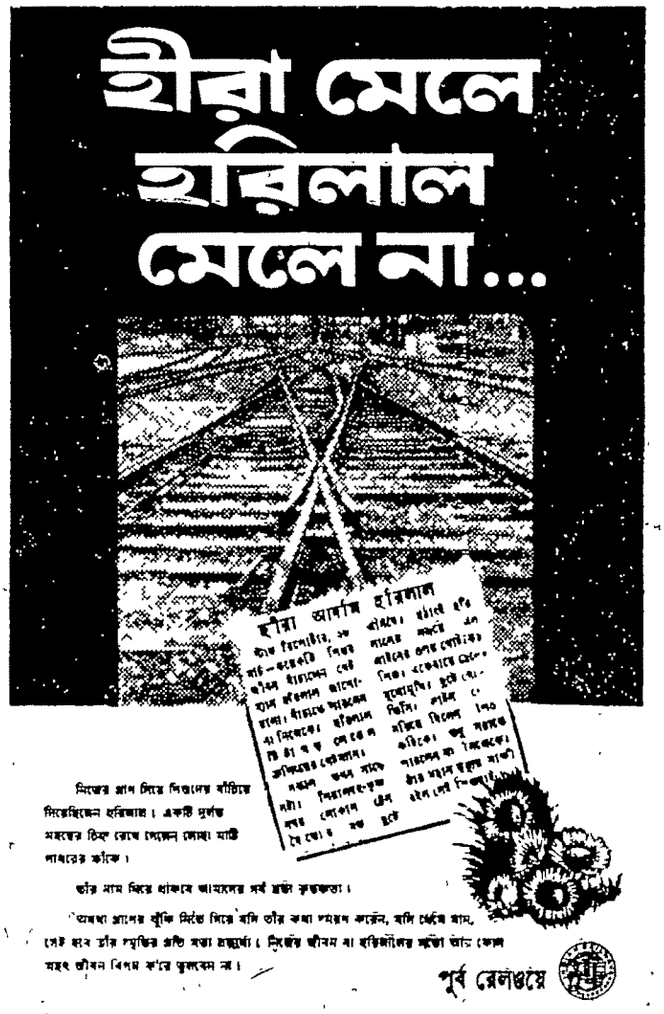

অথবা শিকল টানার বিরুদ্ধেও। মাথার ভিতর ঘুর-ঘুর করা প্রশ্নটা। এবার মুখ দিয়ে বলেই ফেললাম—আচ্ছা শান্তিবাবু, এইসব অপরাধ, অসামাজিক কাজ বন্ধ করার জন্য তো আপনারা নীতিশিক্ষা বিষয়ক অনেক বিজ্ঞাপনই প্রকাশ করেন। তাতে প্রচুর খরচও করেন। কিন্তু তাতে এই ধরনের অপরাধের সংখ্যা বা পরিমাণ কি কমেছে? আপনারা এই ধরনের বিজ্ঞাপনের ফলাফল, প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কোনো সার্ভে করেছেন?

একটু গম্ভীর হয়ে যান শ্রীবসু। পরক্ষণেই বললেন—না, সেটা কখনোই সম্ভব নয়। যেখানে এত অজস্র লোককে নিয়ে কাজ, সেখানে এই ধরনের সমীক্ষা নেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া এটা পিওরলি অবজেকটিভ্ নট সাবজেকটিভ।

—গ্রামের অধিকাংশ নিরক্ষর সাধারণ মানুষগুলোকে কিভাবে আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম কিংবা উপযোগিতা সম্বন্ধে বোঝাবেন? অথচ তাঁরাও তো আপনার ট্রেনের যাত্রী?

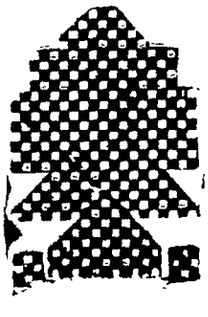

—খুবই সময়োপযোগী প্রসঙ্গ। ইদানীং আমিও এ বিষয়টা নিয়ে খুবই ব্যাপকভাবে ভাবছি। তার মধ্যে একটা চিন্তার কথা আপনাকে বলি, সেটা হলো, আমি স্থির করেছি এবার থেকে গ্রামাঞ্চলের যতদূর সম্ভব প্রায় অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য মেলাগুলোতেই আমরা পূর্ব রেলওয়ের প্রদর্শনী-স্টল খুলবো। মনে রাখবেন, শহরের ফ্যাশনেবল মেলার কথা কিন্তু আমি বলছি না।

আবার প্রশ্ন বাখি—আরো ভালো মাধ্যম অডিও-ভিসুয়াল পদ্ধতির কথা ভাবছেন না কেন?

শান্তিবাবু বললেন—কথাটা ঠিকই বলেছেন। এই মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে সবচেয়ে ব্যাপক প্রচার চালানো যায় এবং প্রচারটা কার্যকরীও ছয় বেশি। এগুলো জনশিক্ষার ব্যাপারে যেমন ধরুন পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতিতে প্রয়োজন। আমার ব্যাপারটা তো পুরোপুরি জনশিক্ষা নয়।

—জনসংযোগের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা?

—না, আমাদের সেরকম কোনো সমস্যা নেই।

কয়েকটি দেশ ঘোরার অভিজ্ঞতা আছে শান্তিবসুর। সঙ্গে রয়েছে সেইসব দেশের বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতাবও সংকলন। সেই প্রসঙ্গেই জিগ্যেস করেছিলাম—ভারতীয় বিজ্ঞাপনের মান কিরকম?

শ্রীবসু বললেন—অন্যান্য দেশে বিজ্ঞাপন ছাড়া ভাবাই যায় না কি করে চলবে। সকালে ঘুম থেকে ওঠে রাত্রে শুতে যাওয়া পর্যন্ত—বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপন। সেইসব দেশে প্রতিযোগিতার বিশাল ব্যাপকতার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনও প্রচণ্ডভাবে বাড়ছে। আমাদের দেশও আগে সেই স্তরে আসুক, তবে তো 'মানি'এর প্রশ্ন। অতএব, এ-বিষয়ে আমাদেরও ভবিষ্যতে হচ্ছে। আমরাও সম্মিলিত-ভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছি, যতদূর সম্ভব উন্নতমানের আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন ও প্রচার কৌশল প্রয়োগ করা যায়।

আনন্দ রায়

গোধূলিয়া

উপন্যাস নিমাই ভট্টাচার্য

—তেইশ—

আলপনা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মনটা বেদনায় ভরে গেল কিন্তু কেন? কেন এই ব্যথা? এই বেদনা? কেন এই বিষণ্ণতা?

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে বসে ভাবলাম। সঠিক কোন কারণ খুঁজে পেলাম না, কোন যুক্তি আবিষ্কার করতে পারলাম না। বার বার শুধু মনে হলো আলপনা আমার শুভাকাঙ্খিনী। সে আমার কল্যাণ কামনা করে, শ্রীবৃদ্ধি চায়। ভাবতে ভাবতে মনে হল, বোধহয় ওকে দুঃখ দিয়েছি, আঘাত দিয়েছি। তা নয়ত ওর সেই মুখের হাসি অমন ম্লান দেখলাম কেন?

কাকাবাবুর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় ও কি দুঃখিত? নাকি অপমানিত?

কিন্তু ও নিজেও ত কাকাবাবুকে দেখতে পারে না। ও ত বার বার করে আমাকে দূরে সরে যেতে বলছে। তবে?

যত ভাবছি তত জট পাকিয়ে যাচ্ছে মাথার মধ্যে। আমি যেন কোন কূল-কিনারা পাচ্ছি না। হঠাৎ মনে হল তবে কি মনে মনে আশা করেছিল আমি কাকাবাবুর প্রস্তাব মেনে নেব? ও কি স্বপ্ন দেখছিল ..

না, না,.. সে অসম্ভব। ও সুন্দরী, শিক্ষিতা। ধনীর ঘরের দুলালী। আমি? জন্মার ঘরে শুধু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানা সার্টিফিকেট। তাছাড়া আমার ত আর কিছু নেই।

সারাটা দুপুর শুধু আলপনার কথাই ভাবলাম। একবার মনে হল হয়ত অসুখাই ভাবছি। এই ভাবনা-চিন্তার কোন কারণ বা যুক্তি নেই। হয়ত প্রয়োজনও নেই। কিন্তু তবু না ভেবে পারলাম না।

পটুয়াটোলা থেকে ছাত্র পড়িয়ে কল্পনাদের বাড়ী যেতে লজ্জায়, দ্বিধায় পা দুটো কেন চলছিল না কিন্তু তবু গেলাম। না গিয়ে পারলাম না। কিন্তু কেন? বোধহয় শুধু কর্তব্যের তাগিদে নয়, হৃদয়ের তাগিদেই গেলাম। মনে হল, আর কিছু না হোক অন্ততঃ একবার ওকে দেখতে পাব।

দরজায় কড়া নাড়তে আলপনা বা কল্পনা দরজা খুলল না। যে মহিলা ওদের বাড়ীতে কাজকর্ম করেন, তিনি দরজা খুলে দিয়ে বললেন, মা দিদিদের নিয়ে একটু দোকানে গিয়েছেন। এখুনি আসবেন।

আচ্ছা।

আমি সোজা কল্পনার পড়ার ঘরে চলে গেলাম। চেয়ারি টেনে বসলাম। কল্পনার হোম টাস্কের খাতাটা টেনে নিয়ে দেখতে শুরু করলাম। পাঁচ-দশ মিনিট পরেই ভদ্রমহিলা নিঃশব্দে আমার সামনে এক কাপ চা রেখে গেলেন। চায়ের কাপে চুমুক দিতেই চমকে উঠলাম—

আপনি অনেকক্ষণ এসেছেন?

হঠাৎ আলপনাকে দেখে খুশী হলেও জিজ্ঞাসা করলাম, কল্পনা আসেনি?

ওরা একটু পরে আসবে।

আপনি আগে চলে এলেন কেন?

এক গাদা প্যাকেট নিয়ে আর ঘুরতে পারছিলাম না বলে চলে এলাম। তাছাড়া..

ও একটু থামল। আমার দিকে দেখল। বললো, তাছাড়া ভাবলাম আপনি বসে আছেন নিশ্চয়ই, তাই ..

হাসতে হাসতে আমি বললাম, তাই কি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে এলেন আমি কি করছি?

দুদিন পরেই ত চলে যাচ্ছেন। তবু এখনও ঝগড়া করছেন?

কাল দুপুরে আসছেন?

আসব?

আপনি বলেছিলেন আসবেন, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

আমি বলেছি ঠিকই কিন্তু আপনি ত কিছু বলেন নি।

আমি মুখ নীচু করে বললাম, আমি অনেক কিছুই বলতে পারি না।

কী বলতে পারেন না?

যা ভাবি, যা বলতে চাই।

কেন?

সারা জীবনে ত কারুর সঙ্গে মনের কথা বলিনি, তাই অভ্যাস নেই।

আমাকে কিছু বলতে চান?

অনেককেই অনেক কিছু বলতে চাই।

সেই অনেকের মধ্যে আমিও আছি?

নিশ্চয়ই।

আমার কথা শুনে আলপনা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে বললো, কাল দুপুরে নিশ্চয়ই আসব।

হঠাৎ অসতর্ক মুহূর্তে বলে ফেললাম, শুধু আপনার জন্যই কলকাতা ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না।

ও সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইল, কিন্তু কেন? আমি আপনার কে?

জানি না।

আর কোন কথা বলার আগেই কল্পনা আর ওর মা ফিরে এলেন। আলপনা ভেতরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ কল্পনাকে পড়াবার পর ওর মা এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কবে বেনারস যাবে?

হাতে কিছু কাজকর্ম আছে। সে সব শেষ হলেই চলে যাব।

কাল-পরশু যাচ্ছো কি?

কাল যাচ্ছি না। তবে পরশু যেতেও পারি।

তুমি ত ওখানে পিসীর কাছেই থাকবে?

হ্যাঁ।

ঠিকানাটা রেখে যেও। যদি আমরা এর মধ্যে কাশী যাই তাহলে...

আপনারা কাশী যাবেন?

অনেক দিন ধরেই ত যাবার ইচ্ছা। তাই ভাবছিলাম এর মধ্যে কদিনের জন্য ঘুরে আসব।

কিন্তু এখন ত কল্পনার স্কুল খোলা।

কিন্তু এর পরে গেলে ত তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।

আমি হেসে বললাম, আমাকে আর নতুন করে দেখার কি আছে?

আর কিছু নয়, তুমি থাকলে তোমাকে নিয়ে একটু ঘোরাঘুরি করা যাবে।

আমি কাশীর বিশেষ কিছুই চিনি না।

তুমি যা চেনো, আমরা ত তাও চিনি না।

আমি আর কিছু বলি না।

এবার উনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আজ মাস্টার মশায়ের ওখানে যাবে?

কলকাতা ছাড়ার আগে একবার নিশ্চয়ই দেখা করব।

করবে।

উনি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই একবার মনে হল, উনি আবার আলপনার সম্পর্কে কিছু বলবেন না ত? যদি বলেন, তাহলে আমি কি জবাব দেব? আবার মনে হল, না, না, ঐ বিষয়ে নিশ্চয়ই কিছু বলবেন না। হয়ত অন্য কিছু বলবেন। অথবা এ-মাসের মাইনে দেবেন।

পড়ান শেষ হবার পর কল্পনাকে বললাম, মাকে বলো আমি বসে আছি।

একটু পরে কল্পনার মা এসে কয়েকটা দশ টাকার নোট আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এটা ধর। আর একটা কথা বলব।

আমাকে আর টাকা দিতে হবে না।

উনি অবাক হয়ে বললেন, সে কি?

যে কদিন পড়িয়েছি তার চাইতে বেশী দিন ত কামাই করেছি।

তুমি ত আর ইচ্ছে করে কামাই করনি। উনি আমার হাতের মধ্যে টাকাগুলো গুঁজে দিয়ে বললেন, আর বলছিলাম আমার উপর রাগ করো না। যদি কোন কারণে...

না, না, রাগ করব কেন?

যদি কোন কারণে দুঃখ দিয়ে থাকি, ভুলে যেও।

আপনি এসব কথা বলছেন কেন?

কেন বলছি তা ত তুমি জানো। তোমাকে ভাল লেগেছে বলেই মনে মনে অনেক কিছু ভেবেছিলাম। তাছাড়া...

আমি মুখ নীচু করে ওর কথা শুনছিলাম। উনি হঠাৎ থামতেই আমি এক মুহূর্তের জন্য ওর দিকে তাকালাম।

তাছাড়া তোমাকে বোধহয় আলপনার খুব পছন্দ।

ওর কথাটা শুনেই আমার মাথাটা ঘুরতে শুরু করল। মনে হল ঘরের সবকিছু দুলছে, কাঁপছে।

তোমাকে জোর করব না। তবে আমাদের কথাটা একটু ভেবে দেখো।

আমি কোন কথা না বলে হঠাৎ ওকে একটা প্রণাম করেই ঘর থেকে প্রায় ছিটকে বেরিয়ে পড়লাম।

প্রায় মাতালের মত টলতে টলতে মেসে ফিরলাম। খাবার ইচ্ছা না থাকলেও খেলাম। তারপরই শুয়ে পড়লাম কিন্তু কিছুতেই ঘুম এলো না। প্রায় সারা রাতই জেগে রইলাম। বোধহয় একেবারে শেষ রাত্তিরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোরের দিকে স্বপ্ন দেখলাম, আমি আর আলপনা কলেজ স্কোয়ারের পুকুরে সাঁতার কাটছি। ঐ স্বপ্ন দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। আর ঘুমুতে পারলাম না।

আজ মাসের শেষ দিন। ইচ্ছে না থাকলেও পড়াতে বেরুলাম। আজ বিদায় নেবার পালা। বিশেষ পড়ালাম না। মামুলি কিছু উপদেশ দিলাম। ওদের বাবা-মার কাছ থেকেও বিদায় নিলাম। একজন মাইনেও দিয়ে দিলেন। শিউলির বাবা বললেন, কাল তোমার মেসে মাইনে পাঠিয়ে দেব। শিউলি আমাকে প্রণাম করল। আমি আশীর্বাদ করলাম।

দায়িত্ব কর্তব্য সামাজিকতা করলাম ঠিকই কিন্তু মনে মনে সব সময় শুধু আলপনার মার কথাই মনে পড়েছিল, তোমাকে আলপনার খুব পছন্দ।

জাপানী পুতুলের মত নির্দিষ্ট পথে মেসে ফিরে এলাম। নিজের ঘরে এলাম, বসলাম, শুয়ে পড়লাম। তাও ঐ একই চিন্তা। একই ভাবনা।

কী এত ভাবছেন?

ভূত দেখার মত চমকে উঠে দেখি, আলপনা। তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললাম আসুন, আসুন।

কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে আছি জানেন? আলপনা হাসতে হাসতে আমাকে জিজ্ঞাসা করল।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন?

দশ-পনের মিনিট।

দশ-পনের মিনিট?

চেয়ারে বসতে বসতে ও শুধু মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

ডাকলেন না কেন?

এত বিভোর হয়ে ভাবছিলেন যে...

জিভ ফসকে বলে ফেললাম, আপনার কথাই ত ভাবছিলাম।

কথাটা বলেই ভীষণ লজ্জিত বোধ করলাম কিন্তু—।

আলপনা বেশ একটু বিস্মিত হয়ে বললো, আমার কথা ভাবছিলেন?

হ্যাঁ।

আমার এই সৌভাগ্যের কারণ?

কেন আমাকে আরো লজ্জা দিচ্ছেন? হঠাৎ আমি গম্ভীর হয়ে ওর দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললাম, কাল আপনার মার কাছ থেকে কথাটা শোনার পর শুধু আপনার কথাই ভাবছি। সারা রাত্তির ঘুমুতে পারিনি।

সে আপনার চোখ-মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি।

একেবারে শেষ রাত্তিরের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কিন্তু তাও এক স্বপ্ন দেখে ভেঙ্গে গেল।

অত ভাববেন না।

কিন্তু না ভেবে যে পারছি না।

ভেবে আর লাভ কি? আপনি ত আপনার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু যখন সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিলাম তখন ত আপনার সিদ্ধান্তের কথা জানতাম না।

কিছুক্ষণ দুজনের কেউই কোন কথা বললাম না। চুপ করে বসে রইলাম। তারপর আলপনা বললো, আপনার জন্য আমার বড় চিন্তা হয়।

কেন?

আমার বয়স বা অভিজ্ঞতা বেশী না হলেও সংসার দেখে দেখেই এতগুলো বছর কাটালাম কিন্তু আপনি এ সংসারে বাস করেও সংসার দেখার সুযোগ পেলেন না।

তা ঠিক।

আপনার মত সহজ সরল মানুষের জায়গা এ সংসার না।

তাই বুঝি আমার জন্য চিন্তা হয়?

চিন্তা হবে না?

কিন্তু আমার মত একজন অতি সাধারণ ছেলেকে নিয়ে চিন্তা করা কি আপনার উচিত?

জানি না।

আপনারা কবে কাশী যাচ্ছেন?

ঠিক জানি না, তবে মা দু-পাঁচ দিনের মধ্যেই যেতে চান বলে মনে হয়।

আমার বুঝতে অসুবিধা হল না পিসীর দরবারে আর্জি পেশ করার জন্যই ওর মা কাশী যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ওরা জেনে গেছেন এই সংসারে পিসী ছাড়া আমার কোন আপনজন নেই, কিন্তু মনে মনে ভাবলাম ওরা ত জানেন না ঐ কাশীতেই আরেকটি বিধবা আছে যে হরসুন্দরীর ধর্মশালায় আমার মার বিদেহী আত্মার সামনে আমার সমস্ত ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। তার ভালবাসার কথা আমি কাউকে বলতে পারব না, বোঝাতে পারব না কিন্তু আমি ত জানি তার গভীরতা, আন্তরিকতা। আলপনার মত সুন্দরী শিক্ষিতা দরদী মেয়েকে নিশ্চয়ই আমার ভাল লাগে। ওর মত স্ত্রী পেলে আমি নিশ্চয়ই সুখী হবো কিন্তু দেবীকে প্রতারণা করে কিভাবে আমি ওকে বিয়ে করব? না, না, প্রতারণার উপর ভিত্তি করে আমি নতুন জীবন শুরু করতে পারি না।

কবে কাশী যাচ্ছেন?

সামনের সাদা কাগজে হিজিবিজি কাটতে কাটতে বললাম ভাবছি কাশী যাব কিনা।

তার মানে?

ঠিক বুঝতে পারছি না কাশী যাওয়া ঠিক হবে কিনা।

আপনার পিসী, দেবী, দিদি কিভাবে আপনার পথ চেয়ে বসে রয়েছেন আর আপনি বলছেন যাব কিনা ঠিক নেই।

ওরা অত্যন্ত বেশী ভালবাসেন বলেই ত.....

নানা পাগলামী করবেন না। আপনি কাল-পরশু রওনা দিন।

কিন্তু আপনি জানেন না...

আমি কিছু জানতে চাই না। আমি হলে দেবীদির ঐ মণি-অর্ডার পাবার দিনই রওনা হতাম।

ওর কথা শুনে আমি একটু হাসি।

আপনি হাসছেন? কিন্তু মণি-অর্ডার কুপনে ঐ এক লাইন লেখার মধ্যে কি অদ্ভুত আন্তরিকতা ছিল, তা ভেবে দেখেছেন কি?

আমি কি জবাব দেব ভেবে পেলাম না। শুধু বললাম, ওর আন্তরিকতার কোন তুলনা হয় না।

তবে?

আমি আর কোন কথা বলতে পারলাম না। চুপ করে মুখ নীচু করে কাগজে হিজিবিজি কাটছিলাম।

কিছুক্ষণ পরে আলপনা বললো, আপনি না গেলেও আমাকে কাশী যেতেই হবে।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম কেন?

দেবীদিকে দেখতে।

কেন?

সারা কাগজে হিজিবিজি কেটে কি লিখেছেন জানেন?

আমি চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি সারা কাগজে শুধু দেবীর কথা লিখেছি। নানা কথা। মনের কথা, প্রাণের প্রশ্ন। অনেক কিছু। আমি লজ্জায়, দ্বিধায়, সঙ্কোচে হতবাক হয়ে ওর দিকে তাকাতেই ও হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েই আমাকে প্রণাম করে বললো, চলি।

আমি রাত্রেই বোম্বে মেলে চড়লাম কিন্তু মোগলসরাইয়ে নামলাম না। মোগলসরাই পেরিয়ে চলে গেলাম এলাহাবাদ।

(ক্রমশঃ)

মনের অসুখ

(নয়)

'Only a wise man knows how to love' (Seneca)

—আমি ভালবাসতে জানি না, ভালবাসতে শিখিনি। আমি কোনোদিনই আমার স্ত্রীকে ভালবাসিনি। না, আমি ভালবাসতে চাই না। ভালবাসতে শিখতে হয়, এই বয়সে নতুন কিছু শেখবার আমার ক্ষমতা নেই, ইচ্ছেও নেই। আমি জানি জ্ঞানীগুণীরাই শুধু ভালবাসতে পারেন। আমি অপদার্থ আমি কোনোদিন আমার স্ত্রীকে ভালবাসতে পারব না। তবে আপনার কাছে কেন এসেছি? আমি 'ভয়েস' শুনছি আমাকে কারা সব শাসাচ্ছে, ভয়ে আমি সারা রাত জেগে থাকি। সকাল বেলায় ট্রামবাসের শব্দে ওদের কণ্ঠস্বর ঢাকা পড়লেও, একেবারে থেমে যায় না। আমার অফিস যাওয়া বন্ধ, লেখাপড়ার কাজ বন্ধ। এ-বিষয়ে আপনি আমাকে সাহায্য করুন—এই আমার অনুরোধ।

দীপকবাবুর বয়স পঁয়ত্রিশ, রোগা-পাতলা চেহারা, চোখে 'হাই-পাওয়ারের' চশমা। ছোটভাই আমার কাছে এনেছেন। কয়েকদিন হল অফিসে যাচ্ছেন না, বাড়ীর বাইরে যেতে চান না, কারুর সঙ্গে কথাও বলেন না। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে বিছানায় উৎকণ্ঠিতভাবে বসে থাকেন। অনেক সাধ্যসাধনা, জোরজবরদস্তি করে ঘর থেকে বের করা হয়েছে। ভদ্রলোকের লেখায় হাত আছে বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অনেকেই সাহিত্যিক। তাঁদেরই একজন আমাকে ওঁর ইতিহাস কিছুদিন আগে জানান। সংক্ষেপে তাঁর কথাতেই এখানে বিবৃত করছি।

—দীপকের বিয়ে হয়েছে বছর দশেক আগে। স্ত্রী বরুণাকে ভালবেসে বিয়ে করেছে। দীপক বছর দুয়েক আগে এম-এ পাশ করে তখন চাকরীর চেষ্টা করছে। বাবার আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবারের দায়-দায়িত্ব ওর ওপর পড়েছে। মা আগেই গত হয়েছিলেন। আমার দূরসম্পর্কের ভাইঝি বরুণা সেবার বি-এ পরীক্ষা দেবে। তার কোচিং-এর কাজে দীপককে লাগিয়ে দিলাম। কিছু দিনের মধ্যেই প্রেমে পড়ে দীপক কয়েকটা ভাল কবিতা লিখে ফেলল। আমাকে সব কথাই ও খোলাখুলি বলল, আর বিশেষভাবে অনুরোধ করল দাদাকে বলে বরুণার সঙ্গে ওর বিয়েটা ঘটিয়ে দিতে। বরুণার সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম তার বিশেষ অমত নেই। দাদা-বউদি প্রথমটায় একটু-আধটু আপত্তি জানালেন। কিছু দিনের মধ্যেই দীপকের চাকরী হল, কাজেই তাঁদের আপত্তির কারণ রইল না। বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর প্রথম বছর কয়েক দীপক খুব উৎসাহ সহকারে চাকরী ও সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করল। আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হত। এরপর সাহিত্যচর্চার উৎসাহে ভাঁটা পড়তে লাগল। বরুণার সঙ্গে দেখা হলে শুনতাম অফিস থেকে এসে অনেক রাত অবধি পড়াশুনো করে দীপক। আলো জ্বালা থাকায় বরুণার ভালো ঘুম হয় না। বেশির ভাগই মনস্তত্ত্বের কেতাব পড়ে, বই থেকে খাতায় কি সব লিখে রাখে। আর এই সব নোট সন্তর্পণে ফাইলবন্দী করে নিজের ড্রয়ারে চাবিবন্ধ করে রাখে। বরুণা দেখতে চাইলে দেখায় না। এ নিয়ে কোনো আলোচনাও করতে চায় না। নিজের কাজে বছর দুয়েক বাইরে থাকার পর কলকাতায় এসে দীপকের খোঁজ নিতে গিয়ে ব্যাপারটা প্রথম জানলাম। মাস ছয়েক হল চার বছরের বাচ্চা নিয়ে বরুণা বর্ধমানে তার বাপের বাড়ীতে গিয়ে উঠেছে। বলা উচিত, দীপক তাকে যেতে বাধ্য করেছে। দীপকের সঙ্গে কথা বলে কোনো কিছুই বুঝতে পারলাম না। মনে হল, ওর মাথার গোলমাল ঘটেছে। বর্ধমানে গিয়ে বরুণার কাছে শুনলাম যে, দীপক স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়ে দিয়েছে যে ওদের আর একসঙ্গে থাকা চলবে না। দীপক ওকে ভালবাসতে পারছে না, পারবেও না। বরুণার বাবা খুবই অর্থকষ্টে আছেন, সব জেনেও দীপক নিজের ছেলে-বৌ-এর খোরপোষ বাবদ এক পয়সাও দিতে রাজী নয়।

বন্ধুর চাপে আর ভাই-এর সাধ্যসাধনায় দীপক আমার কাছে এসেছেন। স্ত্রীর কথা উঠতেই তিনি আমাকে জানালেন, তিনি ভালবাসতে জানেন না, স্ত্রীকে ভালবাসতে পারবেন না। তবে নির্যাতনমূলক 'হ্যালুসিনেশন' থেকে তিনি মুক্ত হতে চান, আমার চিকিৎসাধীন হতে তাঁর আপত্তি নেই।

এবার বরুণার কথা শুনুন ঃ উনি যে বদলে যাচ্ছেন, আমি বুঝতে পারছিলাম। খোকনের জন্মের পর থেকে আমার ওপর ওঁর বিতৃষ্ণা বেড়ে গেল। ঘুম ওঁর অনেক দিন ধরেই হচ্ছিল না, অনেক বলে-কয়ে ডাক্তার দেখাতে পারিনি। অফিসে নিয়মিত যেতেন, গাদাগাদা বই নিয়ে বাড়ী ফিরতেন। সব বইই 'লাভ' আর 'সেক্স' সম্পর্কিত। হ্যাঁ, 'উইমেনস লিব' সম্পর্কে কিছু কিছু বইও ওঁর টেবিলে দেখতাম। আমেরিকার

বড় বড় সমাজতাত্ত্বিক মনস্তাত্ত্বিকদের লেখা ঐ সব বই থেকে প্রায় সারা রাত জেগে নোট নিতেন। ও'র নোটগুলো ড্রয়ারে চাবি-বন্ধ থাকত। শেষের দিকে উনি প্রায় ড্রয়ারে চাবি দিতে ভুলে যেতেন। সেই সুযোগে আমি ও'র কিছু কিছু নোট দেখার সুযোগ পাই। বেশির ভাগ নোটই দুজন লেখকের রিপোর্ট থেকে নেওয়া। না, নাম আমার মনে পড়ছে না!... ও'র পরিবর্তন আমাকে ভাবিয়ে তুলছিল। আমার ওপর বিতৃষ্ণা ক্রমে সন্দেহ অবিশ্বাসে পরিণত হতে লাগল। বাচ্চাটাকে কোনো দিন আদর করেননি, একটা মিষ্টি কথা বলেননি, একটা জিনিস কিনে দেননি। মাঝে মাঝে দেখতাম ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। এক রাতে ঘুম ভেঙে দেখি একটা টর্চের আলো পড়েছে খোকনের মুখে, আর উনি নীচু হয়ে ওকে দেখছেন। আমি ভয়ে অসাড় হয়ে গিয়েছিলাম। আমার মুখে আলো ফেলে বুঝতে পারলেন যে আমি জেগে আছি। তক্ষুনি টর্চ নিভিয়ে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি পরদিনই বাবাকে চিঠি লিখলাম আমাকে দিন কয়েকের জন্য নিয়ে যেতে। কয়েক দিনের মধ্যেই বর্ধমানে এলাম। না, ও'র কাছে ফিরে যাবার আমার ইচ্ছে নেই আর খোরপোষের দাবীতে মামলা দায়ের করতেও চাই না। একটা মাস্টারি জুটিয়ে নিয়েছি, যেমন করে হোক খোকনকে আমি মানুষ করে তুলব।

বরুণা মেয়েটি স্থির ধীর বুদ্ধিমতী। নিজের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস বলতে গিয়ে কোনো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল না, খুব অল্প কথায় স্বাভাবিক গলায় আমাকে স্বামীর সন্দেহবাতিকের কথা শোনাল।

—আমার স্বামীর ভালবাসায় প্রথম প্রথম উচ্ছ্বাস ছিল অতিরিক্ত; একটি রাতও আমাকে ছাড়া ও'র চলত না। আমি কোনো রকম ওজর আপত্তি না জানিয়ে ও'র দাবী মেটাতাম। উনি তাতেও যেন তৃপ্ত হতেন না ও'র ক্ষুধা কিছুতেই যেন মিটত না। মায়ের অসুখ করলে একবার কয়েক দিনের জন্য ও'কে সঙ্গ দিতে পারিনি। তার জন্যে ও'র অভিযোগের অন্ত ছিল না। অবশ্য সে-অভিযোগে কোনো তিক্ততা বা সন্দেহের ছোঁয়া থাকত না। হ্যাঁ আমি ও'কে ভালবেসেছিলাম, উনি আমাকে তখনই নানা ধরনের বই থেকে প্রেমের গল্প পড়ে শোনাতেন আর বলতেন, বেশির ভাগ স্বামীস্ত্রী বিয়ের পর বছর দুয়েকের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আর আকর্ষণ অনুভব করে না, আমাদের যেন সে রকম না হয়, সে-রকম আমি কিছুতেই হতে দেব না। আমিও স্বামীর মতে মত দিয়ে তাঁর নির্দেশমত নিত্য নতুন মিলনোৎসবে তাঁর সহযোগিতা করতাম। তখনও বুঝিনি উনি 'মরবিড'; ও'র ভালবাসা অসুস্থ পুরুষের দেহলিপ্সা মাত্র। যখন প্রথম জানলেন যে আগন্তুকের আসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তখন থেকেই ও'র ভাবান্তর। প্রথমটায় বিশ্বাস করতে চাইলেন না। বললেন—এত সব নিরোধের ব্যবস্থার পর ওসব হতেই পারে না, তুমি ভুল সন্দেহ করছ। ডাক্তারী পরীক্ষায় যখন সন্দেহের অবকাশ রইল না, তখন থেকেই ও'র যৌন মনস্তত্ত্বে আগ্রহ ও সন্দেহ। শেষ পাঁচ বছর যে অসহ্য অপমান সইতে হয়েছে, সে-কথা কাউকে বলা যায় না, বলতে চাইও না।... এই প্রথম ওঁকে সামান্য উত্তেজিত দেখলাম।

কয়েক দিনের মধ্যে দীপকবাবুর কাছ থেকে তাঁর সন্দেহ অবিশ্বাসের বিস্তারিত বিবরণ শোনা গেল।

বরুণার সঙ্গে দেখা হবার আগেও দীপকবাবু প্রেমে পড়েছেন দু-একবার। তবে সে নেহাৎই রোমান্টিক ধরনের প্রেম; কবিতা লেখার অনুপ্রেরণা মাত্র। সহপাঠিনীর সঙ্গে অথবা পাশের বাড়ীর জানালায় দাঁড়ানো মেয়ের সঙ্গে মনে মনে প্রেমে পড়তেন, আর তাদের নিয়ে কবিতা লিখতেন। তারা সেসব কিছুই জানত না। তাদের সঙ্গে মিলনের স্পৃহা, তাদের কাছে পাবার ইচ্ছে পর্যন্ত ও'র কোনো দিন মনে জাগেনি। বরুণার সান্নিধ্যে তিনি প্রথম উপলব্ধি করলেন প্রেমের তীব্র আকর্ষণ। মনে হল, এই মেয়েটিকে তাঁর চাইই, নইলে জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে। বিবাহের কিছু আগে থেকে কিছু কিছু যৌনশাস্ত্রের বই পড়ে স্ত্রী-পুরুষের মিলন রহস্য জানলেন। আগে তাঁর যৌন-মিলনের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। প্রথম রাত থেকেই তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কাজে উঠে-পড়ে লেগে গেলেন। বন্ধুরা বলেছিল এবং পুঁথিপুস্তকেও নাকি পড়েছিলেন যে, মেয়েদের মনে কামনা ঘুমিয়ে থাকে, কামনা জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব পুরুষের। সময়মত না জাগালে কামনার ফুল না ফুটে অঙ্কুরেই শুকিয়ে যেতে পারে। পুরুষের দায়িত্ব পালনে তৎপর হয়ে উঠলেন তিনি। কবিরাজী ও হাকিমী দাওয়াই এবং কিছু কিছু মাদকদ্রব্যের সাহায্যে দায়িত্ব পালনের কর্তব্য ঠিক মতই সমাধান করে চলছিলেন। গোলমাল বাধল শেষের দিকে, যখন জানলেন স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও কি করে এটা সম্ভব হল? তিনজন ডাক্তারের অভিমত নিলেন; তাঁরা সবাই বললেন, এরকম হতে পারে। তবু তাঁর বিশ্বাস হল না। হঠাৎ একদিন মনে হল বরুণাকে তিনি বোধহয় অতিমাত্রায় কামাতুর করে তুলেছেন। ও বোধহয় ওর প্রেমতৃষ্ণা মেটাবার অন্য কোনো সঙ্গী খুঁজে পেয়েছে। তাই বা কি করে হবে? বরুণাতো আজকালকার মেয়েদের মত বাইরে বাইরে ঘোরে না, এমন কি সিনেমা বা মার্কেটেও দীপকের সঙ্গে ছাড়া আর কারুর সঙ্গে যায় না। পুরুষ বন্ধু কেউ আছে বলে তো মনে হয় না। তবে? বিশ্বখ্যাত মনস্তাত্ত্বিকদের বই পড়তে আর নোট নিতে লাগলেন। একজন বলেছেন—যৌনপ্রবৃত্তি বলে কিছু নেই—সবটাই কল্পনা; অন্যজন লিখেছেন—যৌনবোধ মস্তিষ্কের ধর্ম, সহজাত প্রবৃত্তি নয়, সুতরাং যৌনাবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা চলে। তবে তিনি এবং বরুণা নিয়ন্ত্রণ করেননি কেন? এরপর কিনসে এবং মাস্টারস ও জনসনের পরিসংখ্যান ও প্রতিবেদন নিয়ে মেতে উঠলেন দীপকবাবু। তাঁরা এই যুগের বাৎস্যায়ন। হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষের ইন্টারভিউ নিয়ে তাঁরা প্রতিবেদন তৈরী করেছেন। এই প্রতিবেদনের প্রতিটি অক্ষর ধ্রুবসত্য বলে ভাবলেন দীপকবাবু। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ রইল না যে মিলনের তৃপ্তি ছাড়া কোনো বিবাহই সুখের হতে পারে না। মোট বিবাহ-বিচ্ছেদের

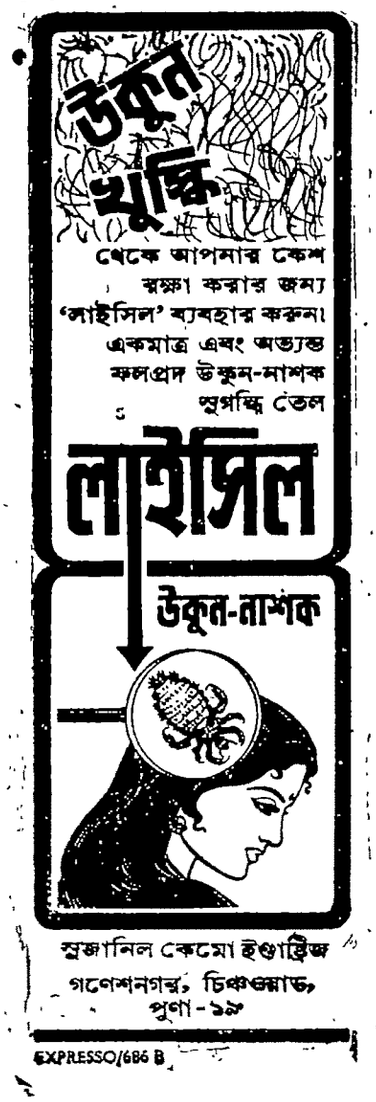

চার ভাগের তিনভাগ ঘটে অসম্মিলিত মিলনের দরুণ। এ-সবই তাঁর ধারণার সঙ্গে মিলে যেতে লাগল, কিন্তু তিনি আর আগের মত বরুণার দেহের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলেন না। কেন? ঐসব রিপোর্টস্থ তাঁর এই বিতৃষ্ণার কারণ। তাঁর ড্রয়ারে রক্ষিত নোট বই থেকে তিনি আমাকে অনেক কিছু পড়ে শোনালেন। কিছু কিছু উদ্ধৃতি তাঁর প্রায় মুখস্থ। ঐ দুটি প্রতিবেদনে এবং এ্যালবার্ট এলিস জুলিয়া শারম্যান প্রমুখের লেখা থেকে তিনি জানলেন যে মেয়েরা স্বভাবত যৌনমিলনে অনীহ, পুরুষের তুলনায় তাদের দেহের ক্ষুধা অনেক কম। অনেক সাধাসাধনার পর প্রথম মিলনে মেয়েদের রাজী করানো যায়। প্রথম মিলনের কথা তাঁর বেশ মনে আছে। বরুণাকে রাজী করাতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। তাহলে? তাহলে কি বিয়ের আগেই ওর অভিজ্ঞতা ঘটেছে?—এই চিন্তা ভদ্রলোকের মনে আগুন জ্বালিয়ে দিল। তাঁর মিলনের ডাকে সব সময়েই সাড়া দিয়েছে বরুণা। তাহলে নিশ্চয়ই বরুণা স্বাভাবিক মেয়েদের দলে পড়ে না। দীপকবাবু যতই পড়তে লাগলেন ততই তাঁর মনে সন্দেহ অবিশ্বাস দানা পাকিয়ে উঠতে লাগল। প্রথম যৌবনে যখন অন্যান্য বন্ধুদের প্রেমের গল্প শুনতেন, তখন থেকেই তাঁর ধারণা যে তাঁর মধ্যে পৌরুষের অভাব আছে। তা না হলে, কোনো মেয়ে তাঁকে প্রেম জানায়নি কেন? তাঁর একবারও মনে হয়নি যে, বন্ধুরা বানিয়ে গল্প বলছে। অথবা ছোট একটা ঘটনাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বাহাদুরী নেবার চেষ্টা করছে। নিজের এই দৈন্যবোধ দূর করার জন্যে তিনি বিবাহের পর থেকে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। পর্ণোগ্রাফি ও মাদকদ্রব্যের সাহায্য বরুণার কাছে নিজের পৌরুষ জাহির করতে চেয়েছেন। ক্রমশ তিনি নিঃসংশয় হলেন যে তিনি বরুণাকে তৃপ্তি দিতে পারেননি, সে নিশ্চয়ই অন্যভাবে তার দেহের ক্ষুধা মিটিয়েছে। বরুণার দেহে তিনি অন্য পুরুষের গন্ধ পেতে লাগলেন। সন্তান যে ওঁর নয়, এ-বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ রইল না। এর পর সেদিনকার লেখা পড়লেন Only a wise man knows how to love.

তখন থেকে 'ভয়েস' শোনা সুরু হল। জলদগম্ভীর স্বরে অনেক দূরে থেকে, মনে হয় হিমালয়ের কোনো গুহা থেকে কে যেন তাঁকে ডাকছে। কিন্তু জীবন ছেড়ে চলে আয়, সংসারের মোহত্যাগ করে বেরিয়ে আয়, নারীদেহের আসক্তি থেকে মুক্ত করে তাকে ভালবাসতে শেখার চলে আয়। বরুণার দেহের প্রতি আকর্ষণ কমল। ছেলেটার প্রতি ঘৃণা বাড়ল। দীপকবাবু ঠিক করলেন বরুণাকে বনবাসে পাঠাতে হবে; না হলে তাঁর মুক্তি নেই। এমনি সময় বরুণা নিজেই বর্ধমানে চলে গেল। তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, বরুণার সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই, তার গর্ভজাত সন্তানের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই তিনি স্বীকার করবেন না। এর পর থেকে তাঁর অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে উঠল। 'ভয়েস' শুনে আগে তাঁর রোমাঞ্চ হত, নিজেকে অনালোকের উচ্চতর জীব কল্পনা করে তাঁর দেহমন পুলকিত হত। কিন্তু সেই কণ্ঠস্বর আর শুনতে পাচ্ছেন না, সেসব কথাও কানে আসছে না। এখন কর্কশ কণ্ঠে সব সময় কে যেন তাঁকে শাসাচ্ছে, অনবরত ভয় দেখাচ্ছে। কী যে তাঁর অপরাধ তা বলছে না, অথচ শাস্তি দেবে বলছে। এবার মনে হচ্ছে বাড়ীর পাশের অন্ধকার কানাগলিটা থেকে যেন কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। কর্কশ-রুঢ় স্বরে তাঁকে তিরস্কার করছে, গালমন্দ দিচ্ছে। দরজা-জানালা বন্ধ করেও নিস্তার নেই ঐ কর্কশ স্বর কানে আসবেই। সারা রাত ধরে তিনি ঐ ভয়েস শোনেন। দিনের বেলায় টায়ারাসের শব্দে, মানুষের কোলাহলে কণ্ঠস্বরটা চাপা পড়ে যায়। কিন্তু একটা স্থির হয়ে যখনই কোনো কিছুতে মন বসাতে যান তখনই শুনতে পান--সাবধান! পালাবার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই, শাস্তি তাকে পেতেই হবে। আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ করলেন দীপকবাবু এই ভয়েস শোনার যন্ত্রণা থেকে তাঁকে বাঁচাতে।

ঐসব প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা চলল কয়েকদিন ধরে। ঐসব অভিমত যে ভ্রান্ত সত্য নয়, এইটে তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। অন্য দলের দু-চারজন পণ্ডিতের লেখা তাঁকে পড়ে শোনালাম। যৌনতৃপ্তি না হলেই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটবেই, একথা ঠিক নয়। ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছাড়া দৈহিক মিলনে তৃপ্তি আসতে পারে না। স্ত্রীকেও মানবিক মর্যাদা দিতে হবে, তবেই স্ত্রীর সঙ্গে মিলনে আনন্দ পাবেন। বরুণা তাঁকে সুখী করবার জন্য তাঁর অসুস্থ কামনার বহ্নিতে ইন্ধন জুগিয়েছে, এতে তার অন্তরের সায় ছিল না। সে আর পাঁচটা ভাল মেয়ের মতই স্বামীকে ভালবাসতে সুখী করতে চেয়েছিল। তবে তাঁর মরবিডিটিকে প্রশ্রয় দিয়ে সে মারাত্মক ভুল করেছে—একথাও জানালাম। ক্রমশ তাঁর সন্দেহ অবিশ্বাসের তীব্রতা কমতে থাকল। একজন নামকরা মনোবিদের কথা উদ্ধৃত করে বললাম

Bad marriage leads to bad sex adjustment

এই কথাটাই ঠিক। উল্টোটা অর্থাৎ

Bad sex adjustment leads to bad marriage — এই কথাটা ঠিক নয়।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সাহিত্যের খবর

পরিমল গোস্বামী

শিল্পী হরিপদ রায় গেছেন, গায়ক অনাদি দস্তিদার গেছেন, গেলেন লেখক মুজতবা আলী এখন রইলাম আমি আর অনিল চন্দ'। মুজতবা আলীর মৃত্যুর পর যুগান্তরে ওপরের কথাগুলি লিখেছিলেন পরিমল গোস্বামী। 'আমি আর অনিল চন্দের' মধ্যে অনিল চন্দও চলে গেছেন। বাকী ছিলেন পরিমল গোস্বামী; সম্প্রতি তিনিও চলে গেলেন। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর সেই প্রথম যুগে প্রাক কুটিরে থাকতেন যে পাঁচটি বিশিষ্ট প্রতিভা—তার শেষ প্রতিনিধিও চলে গেলেন।

পরিমলবাবুর জীবন নেহাতই সাদা কালোর ছবি নয়। তাঁর উনআশি বছরের জীবন ছিল অসংখ্য বর্ণ সমাহারে বৈচিত্র ময়। এক সময় রং তুলিতে ছবি লিখবেন এই বাসনায় শান্তিনিকেতন গেলেন ছবি আঁকা শিখতে। দুর্বল শরীর বাদ সাধলো তাঁর সে প্রয়াসে। বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা শনিবারের চিঠির সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন কিছুকাল। 'সচিত্র ভারত'-এর সম্পাদক ছিলেন এক সময়। তারপর যোগাযোগ ঘটল যুগান্তর' পত্রিকার সঙ্গে। ১৯৪৫ থেকে '৬৪ পর্যন্ত ছিলেন ঐ কাগজের সাময়িকীর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। দীর্ঘকাল এই দায়িত্বে থেকে কত লেখককে দিয়ে লিখিয়েছেন, সম্পাদনার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন

পরিমল গোস্বামী

এবং সেই সঙ্গে সরস লেখা যুগিয়েছেন পাঠকদের। 'এককলমী' নামের আড়ালে পরিমলবাবুরই জোরালো কলম কাজ করে যেত।

তাঁর লেখা স্মৃতি চিরণ', দ্বিতীয় স্মৃতি, পত্র স্মৃতি, 'আমি যাদের দেখেছি' 'যখন সম্পাদক ছিলাম', প্রচুর তথ্য আর অসংখ্য কাহিনীর ভিড়ে ভরা—সেই সঙ্গে জমাট আড্ডা কৌতুক রসের। 'ট্রামের সেই লোকটি এবং ঘুঘু' ব্যঙ্গ রচনায় তাঁর ক্ষমতার পরিচয় দেয়। তিনি ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর ফটোগ্রাফার। আলোকচিত্র সম্বন্ধেও তাঁর বই আছে। বার্টান্ড রাসেলের একখানা বই তিনি অনুবাদ করেছিলেন। প্রবন্ধ, গোয়েন্দা কাহিনী, হাসির গল্প, ভূতের গল্প—সব ধরনের লেখাতেই ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

ত্রিবৃত্ত পুরস্কার

উত্তর বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা 'ত্রিবৃত্ত'-এর পক্ষ থেকে অন্যান্য বছরের মতো এবারও পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। শ্রেষ্ঠ কবিতা, গল্প, উপন্যাস, লোকসংস্কৃতি এবং লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনার জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯৭৫ সালের জন্য এই পুরস্কার পেয়েছেন শংকর চট্টোপাধ্যায় 'কেন জন্ম তেন নির্যাতন' কাব্যগ্রন্থের জন্য। 'বন্যার পরে বাড়ি ফেরা' গল্প সংকলনের জন্য পুরস্কৃত হচ্ছেন সমীর রক্ষিত। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় পুরস্কৃত হচ্ছেন তাঁর 'নয়ন শ্যামা' উপন্যাসের জন্য। লোকসংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থ 'টোটো কাহিনী'র জন্য সুকুমার ভট্টাচার্য পুরস্কার পাবেন। 'দরবারী' পত্রিকার সম্পাদক কল্যাণ চক্রবর্তীকে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে কৃতিত্বপূর্ণ সম্পাদনার জন্য। ইতিপূর্বে ত্রিবৃত্ত পুরস্কার পেয়েছেন অমিয়ভূষণ মজুমদার, কৃষ্ণ ধর, দেবেশ রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, হরিশচন্দ্র পাল, জীবন সরকার এবং শিশির ভট্টাচার্য।

চার্বাক

নতুন বই

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম : অশোক গুহ। পপুলার লাইব্রেরী; ১৯৫।১বি বিধান সরণী কলিকাতা ৬। পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

অশোক গুহ কিশোর কিশোরীদের জন্যই 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' নামে বইটি রচনা করেছেন। লেখক পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে বিভিন্ন অসামান্য আন্দোলনের কথা; ভারত ছাড়; আগষ্ট বিপ্লব; নেতাজীর কথা; কংগ্রেসের জন্ম ইত্যাদির বিচার দিয়েছেন। সুন্দর সহজ সবল অথচ তথ্য রসপুষ্ট গল্পে ইতিহাস লিখেছেন। সব সকলেরই পাঠোপযোগী হয়েছে।

এই গান তোমার আমার : অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়। অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস; ৮১ সিমলা স্ট্রীট কলকাতা-৬। আট টাকা।

যাঁরা রবীন্দ্রসংগীত ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের গান করেন তাঁদের জন্য অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায় একটি গানের বই উপহার দিয়েছেন— নাম : 'এই গান তোমার আমার'। এতে আধুনিক; রাগপ্রধান; পল্লীগীতি; শ্যামাসংগীত; হোলি; ভক্তিমূলক; দেশাত্মবোধক ও বিবিধ—এই কটা অধ্যায়ে রচিত গান স্থান পেয়েছে। প্রত্যেকটি পর্যায়ের গানে রচয়িতার হৃদয়ের আবেগ যেমন গভীরভাবে মিশেছে তেমনি বিষয়ের উচ্চ কল্পনাও সুস্পষ্ট হয়েছে।

মূক বধির শিক্ষার প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস। অমলোকুমার মুখোপাধ্যায়। রায় এন্ড চৌধুরী, ৮।২, হেস্টিংস স্ট্রীট, কলকাতা—১। ছ' টাকা।

মূক-বধিরদের শিক্ষাদান প্রয়াস যেমন জটিল তেমনি দুরূহ ও কষ্টসাধ্য। তবু এদের শিক্ষাদানের প্রয়াস প্রতি দেশে ও কালে অক্ষুন্ন আছে। মানবিকতার চরমতম প্রমাণ এই মূক-বধিরদের শিক্ষাদান। অমলোকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত আলোচ্য গ্রন্থে তার ইতিহাস অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায়, প্রামাণ্য তথ্য দিয়ে লিখিত। পৃথিবীর মূক-বধিরদের ইতিহাস, তাদের উদ্ধারকদের প্রসঙ্গ এ গ্রন্থে আলোচিত হওয়ায় গ্রন্থটি এই সংক্রান্ত গবেষকদের সংগ্রহযোগ্য হয়ে উঠেছে।

সহজ ছন্দের হৃদয়স্পর্শী
কবিতার সংকলন

কাব্য সুষমা

ইন্দু দাঁ

দাম—দশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : "কবিনিবাস" — "মমতা"

৫৯, পার্বমান রোড লক্ষ্মীজলা

উত্তরপাড়া, হুগলী

শেখর সান্যাল

সাঙ্গুইন থেকে রামায়ণী—থেকে চিরন্তনী

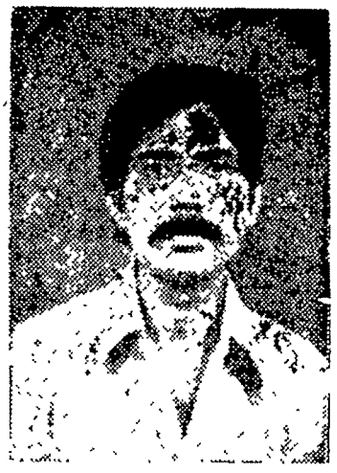

হোলসেলাররা যেভাবে ক্রমশঃ প্রকাশক হয়ে যাচ্ছেন তাতে শুধুমাত্র বই প্রকাশ যাঁরা করেন তাদের একটু চিন্তা হবারই ব্যাপার কারণ তাঁরা নিশ্চয়ই চাইবেন অন্য প্রকাশকের থেকে তাদের নিজেদের বই বাজারে বেশী থাক। বিদেশে এমনটি নেই।

●

ট্যাকসিটা দু-চারবার ঘুরপাক খেয়ে যেখানে এসে দাঁড়ালো সেখানে দাঁড়িয়ে বিশ্বাসই করতে পারি নি এটাই সাঙ্গুইন পাবলিশারস মানে 'রামায়ণী'র মত নামকরা প্রকাশকের সেলস কাউন্টার। এ পথ দিয়ে অনেকবার গেছি। চোখে পড়ে নি এই আবছা রঙের এই সাইনবোর্ডটা। অথচ এই ক'বছরে রামায়ণীর ব্যানার আর দশটা পাবলিশারের কাছে খানিকটা চমকে দেবার মতো ঘটনা। হাতে গোনা যায় এমন কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর প্রকাশকের পাশাপাশি বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো যৌবনের আরেক নাম 'রামায়ণী'।

যৌবন? না শৈশব?

বয়স হিসেব করলে তা প্রায় শিশুই বলা যায়। কারণ ১৯৭৩ থেকে '৭৬ বাদ দিলে দাঁড়ায় এই তিন বছর। আর এই তিন বছরেই রামায়ণী বের করেছেন প্রায় ৬৬টা বই। ভাবা যায়? কিন্তু গোড়ার ব্যাপারটা তো ছিল 'সাঙ্গুইন'। 'রামায়ণী'র কথা আসছে কি করে? আবার রামায়ণীর পেছন পেছন দেড় বছরের 'চিরন্তনী' গুটি গুটি পায়ে ঢুকছে কি করে? তার সঙ্গে কয়েকটা ডালপালা কি করে জড়িয়ে রেখেছে সাঙ্গুইনএর শরীর। সে এক মনে রাখার মতো কথা।

[illegible] বলতে গেলে আর একটু পিছিয়ে যেতে হয় সেই টেবিলের সামনে যেখানে বসে আছেন—শ্রদ্ধেয় শান্তিরঞ্জন সান্যাল। সাঙ্গুইনের প্রতিষ্ঠাতা। এবং হাতে পিঠে মানুষ করে গড়ে তোলা তাঁর প্রতিষ্ঠান।

শান্তিবাবু রাইটার্সে শিক্ষা বিভাগের টেকনিকাল এ্যাসিস্টেন্ট ছিলেন। তাকে স্কুল পরিদর্শনের কাজে ঘুরতে হোতো ফলে স্কুল বইয়ের ব্যাপারটার তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর। আজ থেকে ১৪।১৫ বছর আগে হঠাৎ একদিন ঠিক করলেন কিছু স্কুল বই বের করা যাক। ৫।৬টা বই নিয়ে শুরু হোলো প্রকাশনী। নাম হোলো সাঙ্গুইন পাবলিশারস কনসান। বইগুলো ছিলো—এডুকেশন বেসিক ট্রেনিং-এর ওপরে। সরকারী চাকরীতে থেকে নিজের নামে ব্যবসা করা যায় না। ফলে একটা বাছতেই হবে। শান্তিবাবু ঠিক করলেন—ব্যবসা তিন নম্বর রমানাথ মজুমদার স্ট্রীটে একটা ঘর নেওয়া হোলো। ঝকঝকে সাইনবোর্ড পড়লো সাঙ্গুইনের।

এরপর সাঙ্গুইনের কথা বলতে গেলে আমাকে স্কুল বইয়ের দিকে চলে যেতে হয়। কিন্তু আমার ফিচার তো তা নয়। ফলে শান্তিবাবুর কথা আমাকে এখানেই শেষ করতে হচ্ছে।

এবার আনছি শেখরবাবুকে। পুরো নাম যাঁর শেখর সান্যাল শান্তিবাবুর প্রথম পুত্র। বুঝতে পারছিলুম এ সম্পর্কে সাক্ষাৎকার দিতে ওঁর লাজুক ব্যাপারটা।

ছিপছিপে চেহারা। বুদ্ধিদীপ্ত দুটো চোখ দেখে একবারো আপনার মনে হবে না। এই ভদ্রলোক গ্লা লোক বলবো না বলা যায় এই ভদ্র যুবকটি এখন রামায়ণী চালাচ্ছেন। শুধু কি রামায়ণী? তার সঙ্গে 'শিক্ষা ও সভ্যতা' 'শিশুতীর্থ' 'চিত্রপ্রভা' কাগজ কি নেই।

—চিত্রপ্রভা তো বেশ নাম করেছিলো শেখরবাবু ওটাকে বন্ধ করলেন কেন।

: বন্ধ করলুম তার কারণ হোলো—যাঁদের নিয়ে করেছিলুম তাঁদের খানিকটা গলদ আর বিজ্ঞাপনের খামতি, এমন কি যাঁরা বিজ্ঞাপন দিতেন বিশেষ করে সিনেমার বিজ্ঞাপন হলে তো কথা নেই, ছাপা হবার পর টাকা আদায় করতে করতে জুতোর শুকতলা ছেঁড়বার জোগাড়। সুতরাং পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।

—আচ্ছা সাঙ্গুইনে থেকে হঠাৎ রামায়নীর কথা ভাবতে গেলেন কেন যদি ব্যবসার কথা, অর্থাৎ টাকার ব্যাপারটা যদি মুখ্য ছিল, তাহলে তো সাঙ্গুইনই তো যথেষ্ট, অন্ততঃ চলে যাবার পক্ষে যথেষ্ট

সাহিত্যের নেপথ্যে

তো বটেই, সুতরাং নতুন কোনো প্রকাশনীর কথা ভাবতে গেলেন কেন?

: দেখুন, একটা কথা স্কুল বইয়ের প্রকাশন সংস্থাকে ভাবতেই হয় যে অসৃ সিজনে কি করবো। সিজন টাইম হলে ঠিক আছে। কিন্তু মধুসূদনের বাইবে এদের মাছি মারা আর মশা তাড়ানো ছাড়া অন্য কোনো কাজ বলতে কিছু থাকে না। সুতরাং ভাবলুম একটা প্রকাশনী করা যাক। ইতি-মধ্যে অতীনবাবুর সংগেও যোগাযোগ হয়ে গেল। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগে লেখকদের যোগাযোগ আছে। নিজেও খ্যাতি-মান তরুণ সাহিত্যিক ফলে যোগাযোগটা শুভ বলেই মনে হোলো। তাছাড়া আরেকটা ব্যাপার মনে হয়েছিল যে—যেহেতু অতীন-বাবু, একজন প্রতিথযশা সাহিত্যিক, উনি অ্যাপ্রোচ করলে অন্যান্য পুরোধা সাহিত্যিকরা এক কথায় ওঁকে নাকোচ করতে পারবেন না এবং শেষ পর্যন্ত তাই হোলো।

—প্রথম কার কার উপন্যাস পেলেন।

: প্রথমেই ছাপলাম পাঁচটা বই।

—কার কার?

: ধরুন রমাপদ চৌধুরীর 'আমরা সবাই এক সংগে'। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'নয়ন শ্যামা' সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'বিমূর্ত পাপ' আর অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডাক বাংলো' এই চারটি উপন্যাস এবং একটি কবিতার বই।

—কেমন রেজাল্ট পেলেন।

: নিঃসন্দেহে ভালো। এবং ভালো হবেই, কারণ এঁরা বাজারের বকস-লেখক।

ডাঃ হেমলতা বসু এম বি, ডি ডি ও
ডাঃ এস এন পাণ্ডে এম.বি. বি এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য-৮৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও বহুচিত্রে
চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী ৩৫এ, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯
অগ্রিম ৮৲ টাকা পাঠাইলে ভেলিগুলি ফ্রি

ঘড়ি
ও
গ্যারান্টিসহ ঘড়ি মেরামত
রায় কাজিন এণ্ড কোং
জুয়েলার্স এণ্ড ওয়াচ মেকার্স
৪, বি, বি, ডি বাগ, কলি-১
ওমেগা ও টিসট ঘড়ির
অফিসিয়াল এজেন্টস্

এবং এখানেই একটা কথা বার বার আমার মনকে পীড়া দেয়। যদিও কথাটা শুনতে ভালো লাগবে না, তবু বলি—দেখুন বাজারের হাতে গোনা কমবেশী বাবোজন কমার্শিয়াল রাইটার আছেন আর তাঁদের পেছনে ঘুরছেন ১২০০ পাবলিশার। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁরাও কপি দিতে দেরী করবেন কারণ তাঁরা তো আর মেশিন নয় যে কাগজ কালি মন আর প্লট এক সংগে ঢুকিয়ে দিলে হুড হুড় করে টাটকা উপন্যাস বেরিয়ে আসবে। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। বাজে জিনিস বাজারে উপন্যাস হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া তাঁদেরও তো আর পালাবার উপায় নেই। ফলে নতুন লেখক দরকার। একেবারে টাটকা তাজা সবুজ সব্জির মতো। আমরাও যে সে রকম চেষ্টা করি নি তা নয় ধরুন কুমার মিত্র, শৈলেন রায় শংকর দাশগুপ্ত। কিন্তু বিশ্বাস করুন উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমরা যে খুব একটা ভালো রেজাল্ট পেয়েছি তা আমরা বলতে পারি না। তবুওতব লেখকদের বাজার বোধহয় ঠিক সেভাবে এখনো আসে নি, অন্ততঃ সেভাবে আসা উচিত ছিল। এক্ষেত্রে নামী সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর অবশ্যই কিছু করণীয় থাকতে পারে। তাঁরা যদি তরুণতর লেখকদের ঠিক সেভাবে তুলে ধরেন তাহলে আমরাও এগোতে পারি। সংগে সংগে তাঁদের বইও বেশ কিছুটা কাটে। একটা কথা ঠিক আমরা চাই তরুণতর প্রতিভার বিকাশ হোক, কিন্তু সংগে সংগে এটাও তো ভাবতে হবে এটাই আমাদের একমাত্র রুজি-রোজগারের পথ। কতটা রিস্ক বাববার নেওয়া যায়। সুতরাং নেই নেই করেও প্রতিথযশা কাগজগুলোর এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকার কথা আমরা ভুলে যেতে পারি না।

তবুও আমরা বিক্রি বা সে রকম বাজারের কথা না ভেবে আরেকটা প্রকাশনী গড়েছি যার নাম 'চিরন্তনী'। চিরন্তনী প্রকাশনী করেছি ক্লাসিক সাহিত্যকে জন-সমক্ষে উপস্থিত করার অংগীকারে। এ ব্যাপারে আমাদের সহযোগিতা করছেন বজেশ্বর রায়।

—কি কি বই এ পর্যন্ত আপনারা প্রকাশ করেছেন।

: প্রথম বই হোলো—'থেবীয় নাটক গুচ্ছ'—অনুবাদ করেছেন রোবের আতোয়ান। এছাড়া বিশিষ্ট গ্রন্থ হিসেবে বলতে পারি নীরেন্দ্র গুপ্তের 'পরম প্রেমের কথা'। এছাড়া 'কাউন' 'নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য' বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' জয়দেবের গীত গোবিন্দ ফাউন্ড ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে।

—আচ্ছা, একটা কথা শেখরবাবু এইসব ক্লাসিক বইগুলো তো সে অর্থে জনপ্রিয়তা হতে পারে না। আর এই হতে পারে না জেনেও আপনারা কদ্দিন এটা চালাবেন?

: দেখুন একটা কথা আমাদের ভাবতে হবেই যে কিছু কিছু বই সমাজ এবং জীবনের স্বার্থেই প্রকাশ করতে হবে। প্রকাশকদেরও মাঝে মাঝে সমাজের সংগঠকের ভূমিকা নিতে হয়। এই সামাজিক দায়িত্বের কথা গল্প উপন্যাসের বাজারে ভুলে গেলে চলে কি করে। তাছাড়া এর যে একেবারে বিক্রি নেই, সে কথাও আমরা বলি নে। এরও প্রচার হচ্ছে। তবে ধীরে ধীরে। এ বইগুলো ধর্মই তাই। ফলে আমাদের 'চিরন্তনী'ও চলবে অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত আমরা চালিয়ে যাবো।

ছোট এক ফালি ঘর। এ পাশে রাস্তা—রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, ওপাশে একটুকরো বারান্দার পাশেই প্রেস চলেছে। ঘট ঘটাং আওয়াজে গলাটাকে একটু চড়িয়ে কথা বলতে হচ্ছিল। যতবার দরজা বন্ধ করি, দমকা হাওয়ায় খুলে যায়। পাশে দুফুট বাই এক ফুটের এক চিলতে টেবিল। চেয়ার ঠিক করি তো কাগজ উড়ে যায়, কাগজ ঠিক করতে চেয়ার সরে যায়।

—আচ্ছা, শেখরবাবু, এই ঘরে এই বিরাট কর্মকাণ্ডের কথা ভাবছেন কি করে।

: সত্যি আমাদের এখন জায়গার ভীষণ অসুবিধে। দেখছেন না কিভাবে বইগুলো মেঝেতে টাল খাওরানো রয়েছে। ওপরে কাঠের সিলিংএ বোঝাই বই। ঘর খুঁজছি এপাড়ায়। পেলেই সংগে সংগে নিয়ে নেবো। কিন্তু বোঝেনতো এপাড়ায় ঘর পাওয়ার কি ঝামেলা।

—কিন্তু কাজকর্ম চলে কি করে?

: আমাদের কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ঘরেই অফিস। ওখানেই লেখকরা আসেন। অতীনবাবুও ওখানেই বসেন। মাঝে মধ্যে দুপুরের দিকে এদিকে এসে একবার ঢুঁ মেরে যান। প্রুফ রিডিং, কাগজ পত্তর সবই ওখানে। এখানে শুধু সেলস কাউন্টার। এখান থেকেই হোল সেলাররা বই নিয়ে যান।

হোল সেলারদের যখন কথা উঠলো, তখন আপনাকে একটা কথা বলে ফেলাই ভালো। আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন—আগে বইপাড়ায় যাঁরা শুধু মাত্রই হোল—সেলার ছিলেন তাঁরা সবাই ক্রমে ক্রমে প্রকাশক হয়ে যাচ্ছেন। ফলে আগে যাঁরা অন্য প্রকাশনীর বই শুধুমাত্র কমিশন হিসেবে বিক্রি করতেন, এখন তাঁদের বইয়ের লিস্টে বই বাড়তে থাকায় তাঁরা

খদ্দেরের বিশেষ প্রয়োজনের বাইরে অন্য প্রকাশনীর বই সম্বন্ধে খুব স্বাভাবিকভাবে খানিকটা নিরুৎসাহী হয়ে পড়েছেন। ফলে শুধুমাত্র বই প্রকাশ করেন, আমাদের মতোন এমন যে কজন আছেন। তাঁরাও ভবিষ্যতের জন্যে একটু চিন্তিত হয়ে পড়ছেন। বিদেশে দেখুন প্রকাশকদের এমন অবস্থার মধ্যে পড়তে হয় না। তাঁরা নিজেদের পছন্দ মতো বই ছেপে ডিস্ট্রি-বিউটারদের হাতে ছেড়ে দেন, তাঁরা বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন দিয়ে বই সেল করে, কমিশন বাদ দিয়ে টাকাটা আবার যথারীতি প্রকাশকের ঘরে পাঠিয়ে দেন। কষ্টসৃষ্ট করে বই বের করার পর প্রকাশকদের যদি আবার বিক্রির চিন্তা করতে হয় তাহলে অতি উৎসাহ ক্রমশ উৎসাহে, তারপর নামতে একসময় ঝপ করে থেমে যায়।

—কিন্তু যাই বলুন শেখরবাবু, আমার কাছে আপনাদের বইয়ের তালিকা খানিকটা অবাক করে দিয়েছে। অলজ ম্যাটপাড়ায় নতুন দু-একজন বাদে এরকম কলজের জোর বোধ হয় আর কারো নেই। প্রথম ইনভেস্টমেন্টটা কি ভাবে করলেন?—বাবাকে রামায়ণীর প্ল্যানটা বলতে উনিও উৎসাহিত হলেন, তারপর যেরকম বই ছাপা হয় খেপে খেপে গোড়ার দিকটায় ঐ সাপ্লাইন থেকেই খরচটা উঠে আসতো। তারপর দেখলুম একসঙ্গে চার-পাঁচটা বই না বের করলে বিজ্ঞাপন দেওয়ার খরচও বেড়ে যাচ্ছে। তাছাড়া একসঙ্গে কয়েকটি নামীদামী লেখকের, সঙ্গে নতুন লেখকদের বই চালিয়ে দেয়া যায়। এ প্রসঙ্গে একটা গর্বের ব্যাপার হোলো—নতুন প্রকাশনী হওয়া সত্ত্বেও সবাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ধরুন রমাপদ চৌধুরী, সন্তোষ-কুমার ঘোষ, সমরেশ বসু, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিমল কর, গৌরকিশোর ঘোষ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী থেকে অপেক্ষাকৃত তরুণ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মুস্তাফা সিরাজ যজ্ঞেশ্বর রায় কবিতা সিংহ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকরা। আর অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়তো আছেনই।

তবে আমাদের উপন্যাস ছাড়া দুটো বই সম্বন্ধে একটু গর্ব আছে। প্রথমটা হোলো—যজ্ঞেশ্বর রায়ের 'লেখকের লেখক দস্তয়ে ভস্কি' এই বইটা সোভিয়েট ল্যান্ড নেহেরু পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে। আরেকটা 'রামায়ণী বাংলা অভিধান' যা অন্যান্য বাংলা অভিধানের থেকে একটু আলাদা মর্যাদা দাবির আশা রাখে। এছাড়া জগদ্বন্ধু ভট্টাচার্যের 'মহাকাশ-মহাকাল' বইটি। এছাড়া চিরন্তনীর প্রতিটি বইয়ের জন্যে আমরা গর্বিত।

: এখন আর বাবা আসেন না?

—না, বাবার প্রেসারের ব্যাপার। তাছাড়া বিশেষ প্রয়োজন হলে ওঁর পরামর্শ নিই।

: সাপ্লাইনএর ব্যাপারেও?

—হ্যাঁ সবটাইতো একটা, তবে বাবা বেলেঘাটার বাড়িতে আমাদের অফিসে এসে প্রয়োজনীয় ফাইলপত্তর কাগজ টাগজ দেখেন।

: আর কাউকে আনার কথা ভাবছেন?

—আমার আরো দুজন ভাই আছে। শঙ্কর, আর সমর। একজন কস্ট এ্যাকাউনটেন্সী পড়ছে, আরেকজন হায়ার সেকেণ্ডারী দিয়েছে। শঙ্কর আমাদের হিসেব টিসেবর দিকে সাহায্য করবে। আর সমরকে ভাবছি এখানে নিয়ে আসবো।

: বাজার কি রকম বুঝছেন।

—খারাপ নয়। স্কুল বইয়ের জন্যে সরকার থেকে ইতিমধ্যেই কাগজ দেওয়া শুরু হওয়াতে আমরা এখন খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি না। প্রকাশনীর ব্যাপারেও এস, এল, সির কাগজ পেলে বইয়ের ব্যাপারেও প্রকাশকেরা খুব একটা অসুবিধের মধ্যে পড়বেন না। তাছাড়া কি হবে না হবে ভেবে তো এ লাইনে এগুনো যায় না। যেমন একটা কথা, দেখুন যেন নকশাল আন্দোলনের ফলে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় বিপর্যস্ত হবার মুখে কোথাও ক্লাস হচ্ছে না পরীক্ষা বন্ধ শিক্ষা ব্যবস্থাকে বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থা বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। ঠিক সেই সময় এই শিক্ষার যে প্রয়োজনীয়তা আছে এবং তাদেরও কিছু বলার আছে এই মনে করে আমরা 'শিক্ষা ও সভ্যতা' প্রকাশ করলাম। বর্তমান জীবনে শিক্ষার স্থান, শিক্ষা সম্পর্কিত সামাজিক দায় দায়িত্বের উপর বিশেষ প্রবন্ধে অলংকৃত পত্রিকাটি এখনো চলছে। এর আগে একমাত্র এ. বি. টি এর শিক্ষক ছাড়া ডি. পি. আই অনুমোদিত কোনো পত্রিকা ছিল না। পরে আবার শিশুদের কথা ভেবে আমরা 'শিশুতীর্থ' প্রকাশ করেছি। এখনো তা চলছে।

এছাড়া একালের বাংলা গল্প সিরিজের কয়েকটা ভাগ বের করেছি এবার এ থেকে প্রেড পর্যন্ত ধরে শেষ করবো। এটা একটা কাজের মতো কাজ করেছি বলে দাবী করতে পারবো। তাছাড়া ভবিষ্যতে আমরা আরো ছোটদের বইয়ের কথা ভাবছি ইতিমধ্যেই কয়েকটার কাজ শেষ হয়েছে।

ক্রমশঃই আমার সামনের চেয়ারে বসা ছিপছিপে শ্যামলা শেখরবাবু একটার পর কাজের হিসেব দিয়ে প্রায় আমার সামনেই বিশাল চেহারা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, যাঁর মুখে শুধু চলার গল্প।

চলার চলার আর চলার।

শাণ্ডিল্য চতুর্বেদী

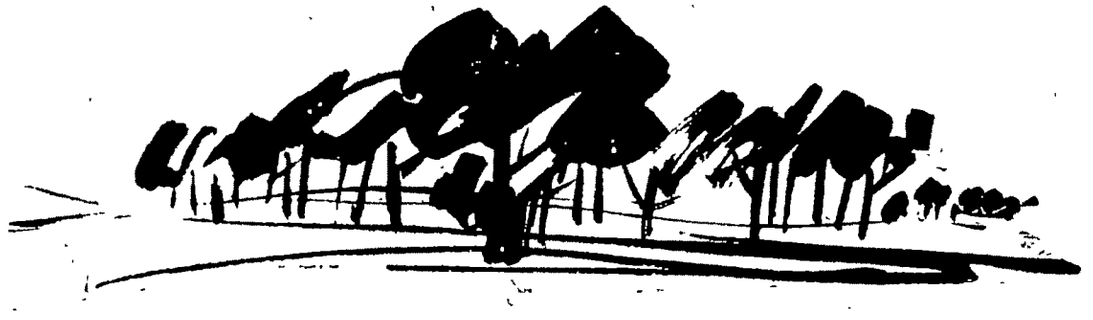

ভ্রমণ ॥

কালীকৃষ্ণ গুহ

সেদিন তোমাদের সঙ্গে আমিও কিছুক্ষণ ভ্রমণ করেছিলুম।

তোমাদের কোলাহলের মধ্যে চারপাশের ধানের ক্ষেতের থেকেও
অনেক বেশি সৌন্দর্য ছিলো—
বাসের ভিতরে অনেক বেশি চৈত্র মাস সূচিত করেছিলে তোমরা।
তোমরা কেন কথা বলেছিলে? কি বিষয়ে কথা বলেছিলে?
বড়ো দীর্ঘকাল পৃথিবীতে কথা-বলা আছে, স্মৃতি আছে,
অশ্রুপাত আছে, ক্ষমা-প্রার্থনার মতো পরিশুদ্ধ অভিমান আছে।

তোমাদের শুদ্ধ অন্তর্বাস সুবর্ণ ছাড়া আর কেউ স্পর্শ করে নি,
এই গর্ব নিয়ে
রৌদ্র-দগ্ধ স্টেটবাস বিষ্ণুপুরের দিকে ঘুরে গেল যখন
আমি ঝুলি-কাঁধে একা একা ডাকবাংলোর দিকে এগোতে লাগলুম।

রৌদ্র-দগ্ধ স্টেটবাস তোমাদের সমস্ত শরীর-ভরা তৃষ্ণা নিয়ে, পূজা
নিয়ে, ধুলোবালি নিয়ে বিষ্ণুপুরের দিকে ছুটে গেল।

ইচ্ছা কৌটোয় জমা ॥

রুদ্রেন্দু সরকার

যে সব ইচ্ছা
কালরাত্রির কৌটোয় জমা হয়ে যায়.....
তুমি কি ভেবেছিলে বলো
ভেবেছিলে কি রাত্রি দিন—
তোমার আমার হয়ে
গান গাইবে জ্যোৎস্না!

আমি তো বলেছিলাম
স্বপ্নে দেখো না আমাকে,
শিল নোড়ায় হলুদ বেটে দেখো
তোমার হাতে কেমন সুন্দর রঙ উঠবে।

তুমি তো বলেছিলে
আমার জানালার চারায় ফুল ফুটবে।
এখন অনেক ফুল,
অথচ তুমি তুলবে না কেন?
এখন তো অনেক গান
তবু তুমি শুনবে না কেন?

আমি রোজ তোমাকে দেখি
তুমিও দেখো—
তোমার পুরোন পরিচিত দৃষ্টি নিয়ে দেখো
এখনও তুমি মধ্যদিনের মহুয়ার ফুল।

সুদূর পাহাড়ী অঞ্চলে ॥

নয়নকুমার রায়

ভালবাসার সীমানা নির্ণয় আর হবে না কোনোদিন
কেননা জীবিকের লোকেরা অবসর বিনোদনের জন্য
ছুটি কাটাতে যাচ্ছে সুদূর পাহাড়ী অঞ্চলে।
সুতরাং আমরাই আমাদের সীমানা নির্ণয় করে
দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি করে সন্ধি স্থাপন করি
ভালবাসা প্রকাশের ইচ্ছায়।

ভালবাসার সীমানা নির্ণয় আর হবে না কোনোদিন
যদি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন না হয় এরপর
কেননা জীবিকের লোকেরা অবসর বিনোদনের জন্য
ছুটি কাটাতে গেছে সুদূর পাহাড়ী অঞ্চলে।

উপন্যাস

মোহিনী আট্টম

চিত্তরঞ্জন মাইতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইন্দ্র ললিতার হাতটা ধরল না। শুধু বলল—আমি হেরে গেছি। যে মুখোশটা এতক্ষণ পরেছিলাম সেটা মিথ্যে। আমি প্রামিস্ট নই।

ললিতা ইন্দ্রের হাতের ওপর হাতটা রেখে দিয়ে বলল—দেখুন না বাবা একটুতেই এত রাগ।

ইন্দ্র ললিতার হাতটা নিজের দুটো হাতের ভেতর চেপে ধরে বলল—বিশ্বাস করুন আমি জ্যোতিষী নই। এতক্ষণ মিথ্যে জ্যোতিষীর অভিনয় করেছিলাম। তবে আপনার স্বামী যে মারা যাননি এটা ধ্রুব নক্ষত্রের মত সত্য।

ইন্দ্রের হাতের মুঠোর ধরা ললিতার হাতখানা থর থর করে কেঁপে উঠল।

ইন্দ্র দেখল ললিতার মুখের রং মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল।

এক সময় ললিতা যেন তার শেষ শক্তিটুকু সঞ্চয় করে বলল—আপনি জানলেন কি করে মিঃ রায়?

ইন্দ্র বলল? কথা দিন আমার কাছ থেকে যে শুনেছেন তা কাউকে বলবেন না।

ললিতা শব্দ করল না কিন্তু মাথা নেড়ে জানাল সে কাউকে কথাটা বলবে না।

ইন্দ্র বলল—যে বিশ্বাস নিয়ে আপনি ডাক্তার নায়ারকে ভালবেসেছিলেন তার মর্যাদা রাখার মত মানুষ ছিলেন না তিনি। আপনাকে তাঁর শুধু কাছে পাবার দরকার ছিল মনের ভেতর ধরে রাখার মত প্রেরণা ছিল না।

ইন্দ্র দেখল ললিতার চোখ বিছানার ওপর স্থির হয়ে গেল।

ইন্দ্র একটু থেমে বলল—আপনার কষ্ট হয় কোন কিছুতে এটা আমি চাই না। যতটুকু শুনেছেন তার বেশী শোনার দরকার নেই আপনার।

মুহূর্তে ললিতা চোখ তুলে চাইল ইন্দ্রের দিকে। বলল—না না আমার কিছু হবে না। দয়া করে আমাকে অন্ধকারে রাখবেন না। সবটুকু ঘটনা খুলে বলুন।

ইন্দ্র দেখল ললিতার দুটো চোখে অস্বাভাবিক এক ধরণের দৃষ্টি।

ইন্দ্র বলল—বিচলিত হবেন না মিসেস নায়ার সারাজীবন একটা মিথ্যের বোঝা বইবার চেয়ে সত্য যত কঠিন হোক তার মুখোমুখি দাঁড়ান ভাল।

ললিতা বলল—আমি সব শুনতে চাই। সইবার শক্তি ঈশ্বরই আমাকে দেবেন।

ইন্দ্র বলল—ডাক্তার নায়ার এখন জার্মানীতে প্র্যাক্টিস করছেন। ওখানকার সিটিজেন উনি। ওখানেই নতুন সংসার পেতেছেন। মৃত্যুর খবর একটা ভাঁওতা।

ললিতা বলল—আপনি কোথা থেকে এ খবর পেয়েছেন তা আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করব না তবে আপনার কথা যে সত্যি একথা বুঝতে আমার একটুও অসুবিধে হয়নি।

ইন্দ্র বলল—আপনার বাবা এ খবর জানেন তিনিই আমাকে জানিয়েছেন।

আমি কিছুদিন থেকে সে রকম একটা সন্দেহ করছিলাম বলল ললিতা। তুলি তার দাদুর কাছে যখন তার বাবার কথা জানতে চাইত তখন একটু রূঢ়ভাবেই আমার বাবা সে প্রসঙ্গ চেপে যেতেন। কিছু বিরূপ মন্তব্যও করতে শুনেছি তাঁকে। উনি অন্ধ তাই বুঝতে পারতেন না যে আমি তাঁর আশপাশে দাঁড়িয়ে সবকিছু লক্ষ্য করছি।

ইন্দ্র বলল—জার্মানী থেকে ওঁর এক বন্ধু ওঁকে সবকিছু জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন।

ললিতা বলল—বাবা অন্ধ হয়ে যাবার আগে সে চিঠি এসেছিল। আমি ছেঁড়া চিঠির সামান্য একটুখানি টুকরো কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। কিন্তু তখন সেইটুকু থেকে কোন সত্যে পৌঁছতে পারিনি। কেবল ঐ মানুষটার নামের একটা উল্লেখ দেখেছিলাম।

ইন্দ্র বলল—আমি জানি না আপনাকে আজ একথা বলে আমি ভুল করলাম কিনা। আপনি আপনার স্বামীর স্মৃতি নিয়ে যে পবিত্র একটা শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করে

নিয়েছিলেন তা ভেঙে দিয়ে গিয়ে আমি হয়ত আপনার জীবনে অনেকখানি অশান্তি ডেকে আনলাম।

ললিতা বলল—আজ সত্যিকার যদি কোন বন্ধু আমার পাশে থাকে তাহলে সে আপনি। সারাজীবন যে ভুলটা বয়ে বেড়াতাম তাকে আপনি সত্যিকার বন্ধুর মত শুধরে দিলেন।

ইন্দ্র বলল—ললিতা আপনার ভাগ্যের কথা ভেবে সত্যিই আমি দুঃখিত।

কিছুক্ষণ কোন কথা বলল না ললিতা। নীচের ঠোঁট বড়ো আঙুলটা ঠেকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল।

হঠাৎ এক সময় ইন্দ্রর চোখে চোখ রেখে বলল—কিছুদিন আগে আমি এলোরায় গিয়েছিলাম সেখানে একটা ছবি দেখেছিলাম। ছবিটা এসেছিল কলিকা সিনেমায়। ছবির নাম 'সান ফ্লাওয়ার'। ছবি দেখে আসার পর রাতের বিছানা আমার চোখের জলে ভেসে গিয়েছিল। আজ ভাবছি সে ছবির সঙ্গে আমার জীবনের যেন কোথায় একটা মিল আছে। অবশ্য সে ছবির নায়কের ভেতর কোন প্রত্যাবর্তন ছিল না।

ইন্দ্র বলল—বলুন কিছুদিন আগে আমিও সে ছবি দেখেছি। পরিস্থিতিই নায়কাকে নাকি করেছিল বিদেশে নতুন সংসার রচনা করতে।

ললিতা বলল—জানেন আমি পাগলের মত তুলির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতাম। ডাক্তার নারায়ের অতুল প্রতাপের সাম্রাজ্য ওর ভেতর। একটুখানি মিল খুঁজে পেলেই আনন্দের আবীর ছড়াতাম। এখন এই মুহূর্তে ঐ মিল দেখলে হয়ত আমার ভাল লাগত। আমি এসে আর সময় নষ্ট করতে বলতে বলতে হঠাৎ এসে ললিতার গলা। সে নিজের টাকা-পয়সাকে বুকে চেপে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল।

ইন্দ্র বসে বসে ভাবতে লাগল একটা নিরপরাধ শিশুকে কি করে অস্বীকার করতে পারল লোকটা। আর মানী হিসেবে ললিতা সে কোন পুরুষেরই চোখে পড়ার মত। এমন একটি কায়া তরুণীকে সন্ন্যাসিনী হতে মানার সময়ের আর বাই থাক ডাক্তার নারায়ের রুচির পরিচয় ছিল না।

অনেকখানি সময় ঘরের ভেতর একা একা কাটিয়ে যখন বাইরে মানার জন্য ইন্দ্র উঠবে কিনা ভাবছে ঠিক সেই সময় ললিতাকে ঘরের দরজার সামনে দেখা গেল।

ললিতার মুখে শোকের কোন চিহ্ন ছিল না। সে হাতের ইশারায় ইন্দ্রকে ডাকল। ইন্দ্র ললিতার দিকে এগিয়ে যেতেই ললিতা পেছন ফিরে চলতে শুরু করল। ইন্দ্র তাকে অনুসরণ করে চলল।

পশ্চিমের কলতলার জলপ্রপাত ঝরিয়ার ঘেরা এক বাগান ঘরের পেছনে না কেন বাগানের সামনে।

ললিতার প্রসারিত আঙুলটিকে অনুসরণ করে ইন্দ্রের চোখ এক জায়গায় এসে স্থির হয়ে গেল।

আশ্চর্য ছবি। নারকেল গাছের তলায় প্রথম অপরাহ্নের আলোছায়ার বিছানায় শুয়ে অলস মন্থর ভঙ্গীতে জাবর কাটছে ললিতাদের গাইগরুটি। আর ঠিক তার কোলের কাছটিতে নিশ্চিন্ত আরামে মাথা রেখে মুখে গুঁজে অকাতরে ঘুমচ্ছে দুটি অবোধ শিশু। একটি পশু শিশু অন্যটি মানবশিশু। তুলির কাছে গিয়ে দাঁড়াল দুজনে। কতক্ষণ ওরা চেয়ে রইল ওর দিকে।

ইন্দ্র বলল—শিশুর কোন জাত নেই ললিতা শিশু তাই সবার প্রিয়। আর তুলির সঙ্গে কোন তুলনাই নেই। ও এক অসাধারণ শিশু।

ললিতা বলল—জানেন কিছুদিন আগে এক আত্মীয়ের বাড়ী নিমন্ত্রণে যাচ্ছিলাম। তুলি তার আদরের পুতুলটাকে সঙ্গে নেবেই। কোন বারণেই কান দিল না। বাকে চেপে ট্রেনে উঠল। আমি পথ যেতে যেতে সুন্দর সুন্দর দৃশ্যগুলো দেখাতে লাগলাম। ঐ দেখ তুলি কাবেরীর জল কেটে স্রোতে একটা ভালুক চলেছে সাঁতার পাল তুলে নিয়ে। ঐ দেখ পাহাড়টা কেমন ধাপে ধাপে নেমে এসেছে।

এমনি অনেক কথা বলতে বলতে এক-সময় ক্লান্ত হয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। হঠাৎ কানে কান্নার একটা শব্দ এসে লাগতেই সোজা উঠে বসলাম। আমার সঙ্গে সঙ্গে তুলি তার পুতুলটাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। ঐ দেখ দেখ কার সাধ্য পাখী জানা স্বপ্নে উড়ছে। ঐ যে জানালার ধারের সীটে ভদ্রলোক বসে আছেন তুলি তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে ধরবে আর সমানে মানুষকে করে ফেলছে। ঐ যে

GaCunha/LE/5 E BEN.

খাওয়ানো গান গেয়ে ঘুম পাড়ানো এই হবে তার সারাদিনের কাজ।

ইন্দ্র বলল—রান্না করলেন এতগুলি পদ কিন্তু নিজের পাতে নিলেন না তো কিছুই। সবই তো দেখছি উজাড় করে দিলেন অতিথির পাতে।

ললিতা বলল—জানেন নিজেকে উইডো বলে ভেবেছিলাম যখন তখন সেরকম করে পোষাক পরেছি খাবারও খেয়েছি। এখন আর আমার সে সব সংস্কার নেই তবু অনেকদিনের অনভ্যাসে আমিষ খাবার প্রবৃত্তিটা হারিয়েছি। আর সাদা পোষাক পরতে আমি সব সময়েই পছন্দ করি তাই সাদার ওপর গোল্ডেন একটা পাড় বসিয়ে নিলেই চলবে ওতেই আমার বৈধব্যের বেশটা পাল্টে যাবে।

ইন্দ্র বলতে চাইল তাহলে নতুন করে এবার আর একটি সংসার গড়ে তুলুন।

কথাটা কিন্তু ইন্দ্রের মুখ দিয়ে বেরুল না। সে শুধু বলল—পাঁচ বছরের অভ্যেস কি একদিনে ঝেড়ে মুছে ফেলা যায়।

কিছুক্ষণ ওরা কোন কথা না বলে খেতে লাগল। হঠাৎ একসময় ইন্দ্রের দিকে চেয়ে ললিতা বলল—আপনি আমার বন্ধুর ঘনিষ্ঠজন তাই আপনাকে কতকগুলো হাল্কা প্রশ্ন করলে নিশ্চয় কোন কিছু মনে করবেন না।

ইন্দ্র খাওয়া থামিয়ে বলল—মেনন পরিবারের সঙ্গে আমার এমপ্লয়ার এমপ্লয়ীর সম্পর্ক। সরিতার কাছ থেকে যদি কোন ভালবাসা পেয়ে থাকি তাহলে সেটা আমার পাওনার অতিরিক্ত বলে আমি মনে করি।

ললিতা বলল, সরিতার কথা থেকে মনে হল সে আপনার দারুণ গুণগ্রাহী। ভক্তও বলতে পারেন।

ইন্দ্র বলল, অতটা বাড়িয়ে বলবেন না। ওতে আমার বিপদ ঘটতে পারে। চাকরী রক্ষা দায় হয়ে উঠবে। তবে মিথ্যে বলে লাভ নেই, আপনার বান্ধবী আমাকে সুনজরে দেখেন।

ললিতা হেসে বলল, আপনি নজর কেড়ে নিয়েছেন বলুন।

ইন্দ্র ললিতার হাসিতে যোগ দিয়ে বলল, নজর কেড়ে নেবার মত কোন যোগ্যতাই আমার নেই। আপনার বান্ধবী বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ওপর একটু কৃপার দৃষ্টি ফেলে থাকেন।

ললিতা বলল, অপনি কিন্তু বন্ধু হিসেবে বেশ নির্ভরযোগ্য।

ইন্দ্র বলল, ঐ ধরনের কমপ্লিমেন্ট দেবার কারণটা জানতে পারি কি?

মনের কথাকে কেমন চেপে রাখতে পারেন,—বলল ললিতা।

ইন্দ্র হঠাৎ বলে বসল, মনের সব কথাকেই কি আর খোলাখুলি বলা যায়, আপনিই বলুন? কোন মানুষের ভেতরের মনটাকে যদি দেখা যেত তাহলে তার চেয়ে বড় বিস্ময় পৃথিবীতে আর কিছুই থাকত না।

ললিতা কি ভেবে বলল, সত্যি।

ইন্দ্র বলল, আজ চাঁদ উঠবে কখন?

ললিতা ইন্দ্রের দিকে চেয়ে বলল, কাল রাতে ঘুমুতে যাবার আগে চাঁদ পেয়েছিলেন, আজ আপনার স্বপ্নের ভেতর চাঁদ উঠবে।

ইন্দ্র বলল, যদি জেগে থেকে চাঁদের প্রতীক্ষা করি তাহলে কি চাঁদ উঠবে না?

ললিতা হেসে বলল, কাল অব্দি জেগে কাটিয়ে দিন, পূর্ণিমার চাঁদের উদয় আপনার ঘরেই হবে।

ইন্দ্র বলল, ওটি আমার অমাবস্যার চাঁদ।

ফোঁস করে উঠল ললিতা কেন আমার বান্ধবী কি এতই কালো?

ইন্দ্র বলল, আপনার কিংবা প্রেমার কাছে না দাঁড়ালে শ্যামলী বলা যায়।

ললিতা বলল, মনে হচ্ছে কিছু উদ্দেশ্য আছে।

ইন্দ্র বলল, এ কথা কেন?

এই যে আমার রঙের তারিফ করে বসলেন।

ইন্দ্র বলল, আপনার প্রশংসা শুরু করলে তো আর শেষ করা যাবে না। পায়ের আঙুল থেকে মাথার চুল অব্দি একটি একটি শ্লোক লিখে বর্ণনা করতে হবে।

ললিতা বলল, কপাল আমার, এমন একজন কবিকে কাছে পেয়েও চিরদিনের করে ধরে রাখতে পারলাম না।

কথাটা শেষ করেই ললিতা খিলখিল করে হেসে উঠল।

ইন্দ্রের কিন্তু ললিতার শেষ কথাটায় কেমন এক ধরনের ঘোর লাগল। কি বলতে চায় ললিতা? কবিকে ধরে রাখতে পারল না বলে সত্যিই কি তার আক্ষেপ, না এটা উড়ো হাওয়ার মত একটা কথার কথা।

ললিতাও থেমে গিয়েছিল। সে হয়ত তলিয়ে দেখছিল হঠাৎ বলা কথাটার গুরুত্ব।

এরপর খাওয়ার পর্ব চুকল। একটা কম পাওয়ারের বাল্ব সন্ধ্যে থেকে জ্বলছিল ভেতরের বারান্দায়। তার খানিকটা অনুজ্জ্বল ছটা ভেতরের উঠোনটাকে কোনরকমে অন্ধকারের গ্রাস থেকে বাঁচাচ্ছিল। ধারে কাছে ওৎ পেতে ছিল অন্ধকার। সুইচটা অফ হলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে উঠোনের ওপর।

ললিতা বারান্দার ভেতর কি কাজে যেন ঢুকতে গিয়ে বলল, আপনি উঠোনে বসুন গিয়ে, আমি এই আসছি।

ইন্দ্র উঠোনে নেমে দেখল পাশাপাশি দুটো বেতের চেয়ার পাতা। গত রাতে মিঃ পিল্লাই আর সে ঐ দুটো চেয়ারে বসে গল্প করছিল। পিল্লাই বলছিলেন তাঁর মেয়ে জামাইয়ের কাহিনী। প্রায় অপরিচিত একটি যুবকের কাছে হৃদয় উজাড় করে কথাগুলো বলে যেতে কোন দ্বিধা আসেনি তাঁর। কি পরিমাণ ভার তিনি বুকের ভেতর অনুভব করছিলেন, যে কারণে পারিবারিক জীবনের গোপন কথাগুলো আর একটি হৃদয়ের কাছে বলে বেশ খানিকটা লঘু হতে চেয়েছিলেন।

ইন্দ্র লক্ষ্য করে দেখেছে, এ দেশের নারীপুরুষের ভেতর মেলামেশার ব্যাপারে যেমন দ্বিধা নেই, তেমনি মনের কথাকে উজাড় করে দিতে কার্পণ্যও নেই।

ইন্দ্র একটা চেয়ারে বসল। আকাশের দিকে চেয়ে দেখল নক্ষত্ররা অন্ধকার পৃথিবীর দিকে তারই মত নির্নিমেষ চেয়ে আছে। পৃথিবী যখন সৃষ্টি হয়নি তখনও এরা অনাগত কোন কিছুর আবির্ভাবকে দেখবে বলে চেয়েছিল। রহস্যের কুহেলি ঢাকা তরুণী পৃথিবী ধীরে ধীরে যখন ঘোমটা খুলল তখন অপার বিস্ময়ে নিষে দেখল তাকে। তারপর একে একে ধরিত্রীর গর্ভ থেকে জন্ম নিল জল স্থল, প্রকৃতির নানা বৈভব বৈচিত্র্য। সেই সমান ঔৎসুক্য নিয়ে নক্ষত্ররা চেয়ে দেখল সৃষ্টির এক একটি পরিণতি, বিবর্তন। এখনও তারা চেয়ে আছে পৃথিবীর নতুন নতুন রহস্যকে দেখবে বলে।

ইন্দ্রের হঠাৎ মনে হল, এক তরুণী যাদুকরী যেন একটি একটি করে বিস্ময়কর যাদুর খেলা দেখিয়ে চলেছে, আর সারা নক্ষত্রলোক অবাক চোখে তাই চেয়ে চেয়ে দেখছে। আশ্চর্য এই তরুণীর খেলা যার কোন রহস্যই তারা ভেদ করতে পারছে না।

ললিতা পাশে এসে দাঁড়াতেই চমক ভাঙল ইন্দ্রের। ললিতা তার দিকে ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছে। মুখে কোন কথা নেই। ঠিক যেন রহস্যময়ী তরুণী যাদুকরী।

ইন্দ্র অস্পষ্ট আলোয় দেখল, ললিতা মুঠি করে কিছু যেন এনেছে তার জন্যে। সে মুঠি সমেত ললিতার হাতখানা তার চওড়া ডান হাতের মুঠোয় চেপে ধরল।

ললিতা বলল, বান্ধবীর হারে মণিমাণিক্য নেই ওতে, ছাড়ুন, ছাড়ুন, দেখাচ্ছি।

ইন্দ্র হাত ছেড়ে দিয়ে চেয়ে রইল ললিতার দিকে। ললিতা কপট ক্রোধে বলল, না, দেখাব না।

ইন্দ্র বলল, হাত ছাড়িয়ে নেবার সময় কথা দিয়েছিলেন, দেখাবেন।

ললিতা বলল, জানেন তো, গল্পের শেয়াল কুমীরের কামড় থেকে পাখানাকে বাঁচাবে বলে নিজের পা-কে লাঠি বলেছিল। আমিও বাঘের থাবা থেকে হাতখানাকে ছাড়িয়ে নিলাম কৌশলে।

ইন্দ্র বলল কিন্তু আপনি মিথ্যের দায়ে পড়লেন।

ললিতা মুখখানা দোলাতে দোলাতে বলল, না মশায়, প্রাণে বাঁচতে মিথ্যের আশ্রয় নেওয়াটা কোন অন্যায় নয়।

ইন্দ্র মুখ নীচু করে বসে রইল।

ললিতা ইন্দ্রের মুখের অনেক কাছে সরে এসে বলল, আহা বান্ধবীর বন্ধু আপনি, আপনার সঙ্গে এমন ছলনাটা করা ঠিক হয়নি। বান্ধবী শুনলেই বা কি বলবে। এখন হাঁ করুন তো দেখি।

ইন্দ্র ইজিচেয়ারে ঘাড় কাৎ করে একটু-খানি হাঁ করল। ললিতা ইন্দ্রের মুখের ভেতর একখিলি পান ভরে দিল। তারপর বাঁ হাতের ভেতর থেকে ওদের দেশের রীতি অনুযায়ী একখণ্ড কাঁচা সুপুরী বের করে ইন্দ্রের মুখের ভেতর দিতে যেতেই ইন্দ্র দাঁত দিয়ে ললিতার আঙ্গুল চেপে ধরল। ললিতা উঃ করে একটা আওয়াজ তুলতেই ইন্দ্র ওর আঙ্গুল ছেড়ে দিল।

ললিতা ব্যথা পাওয়া আঙ্গুলটা সঙ্গে সঙ্গে নিজের মুখে পুরে চুষতে লাগল।

ইন্দ্র বলল, ক্ষমা করবেন, আপনার কুমীরের গল্পটা মনে পড়ে গিয়েছিল।

ললিতা বলল, সরিতা আসুক, আপনার কুমীরের গল্পের ডেমনোস্ট্রেশন দেওয়া বের করব।

ইন্দ্র বলল, অন্যায় যদি করে থাকি তাহলে তার শাস্তি আপনার হাতেই হোক, বান্ধবীকে আবার এর ভেতর টানা কেন।

ললিতা বলল, আমি কি বলেছি, আপনি অন্যায় করেছেন? শুধু কুমীরের মত আপনি কামড়ে ধরেছিলেন আর আমি কৌশলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছি, এ-কথাটুকুই বলব।

ইন্দ্র বলল, কি ভীষণ নিষ্ঠুর আপনারা। মানুষকে ভয় দেখিয়েও আনন্দ পান।

ললিতা পাশের চেয়ারে বসে পড়ল। ইন্দ্রের মনে হল, আবার কি নতুন খেলা দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেবে বাদুকরী।

ললিতা বেতের চেয়ারের চওড়া হাতলে কনুই ঠুকে অঞ্জলি করা হাতের পাতায় নাক মুখ গুঁজে বসে রইল।

কিছু পরে মুখটি কাৎ করে ইন্দ্রের দিকে চেয়ে বলল, চাঁদ উঠতে এখনও প্রায় তিন কোয়ার্টার বাকী। ইচ্ছে করলে ঘুমুতে যেতে পারেন।

কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য

কারণ তাঁরাই বেশী দায়ী

'রসগোল্লা খান' বা 'রসগোল্লা মিষ্টি' বলে কোন বিজ্ঞাপন চোখে পড়েছে কি? আর বিজ্ঞাপন না দিলেও, রসগোল্লা যে মিষ্টি সে আমরা সবাই জানি। তাহলে কলকাতার 'জয়ঢাক পেটানো' বিজ্ঞাপনের মানেটা কি?

কেবল বিজ্ঞাপন দিয়েই কি শহরটা ভাল করা যায়? প্রশ্নটা নিজেদেরই করছি। বিজ্ঞাপন দিচ্ছি, লোকে পড়ছে, আবার ভুলেও যাচ্ছে।

এই দেখুন না, "জল নষ্ট করবেন না, এটা এই 'হতভাগা' শহরে বিজ্ঞাপন দিয়ে বোঝাতে হয়। কলকাতা কর্পোরেশন থেকে বেশ কতগুলি রাস্তার কলে যন্ত্র বসিয়ে দেওয়া হোল, কুট করে কতজন বন্ধ করলেন? যদি শাস্তি হিসেবে জল বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে আবার চেঁচামেচি শুনবো। জানেন কি যে সিঙ্গাপুরের সঙ্গে তুলনা আমাদের মাঝে মাঝে শুনতে হয়, সেখানে রাস্তায় সিগারেট এর টুকরো ফেললে জরিমানা হয়?

রাস্তার সময় নেই, অসময় নেই, স্থান-কালপাত্রভেদ নেই, পেচ্ছাপ পায়খানা করতে বসে গেলেই হোল। এ যেন চরম ব্যক্তিস্বাধীনতা। আর পুলিশ যদি কলার চেপে ধরে, তখন তার পায়ে ধরে পাঁড়া-পীড়ি, দু-পাঁচটা টাকা ঘুষ দিয়ে পরিত্রাণের চেষ্টা। অথচ রাস্তার ধারে না বসলেই কি নয়?

বহু জায়গায় বহু মানুষ লাইন দিয়ে পুরো ভাড়ার টিকিট কিনে বাসে উঠছেন। তবু ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলা ভাঙ্গলে পঙ্গপালের মত যাঁরা বাস-ট্রাম অধিকার করে বসলেন, তাঁদের কাছে বিজ্ঞাপনের আবেদন পৌঁছাল না।

সতিকারের হকারদের বলা হচ্ছে—"ফুটপাতে দোকানের দিন শেষ হয়ে এসেছে।" শুনছে কজন? তাঁদের ধারণা 'যেমন চলছে তেমনি চলবে'। চলবে না। সারা কলকাতা বলছে চলবে না। ফুটপাত "ফুটচারীদের" জন্য। রাস্তা গাড়ীর জন্য। বাজার কেনা-বেচার জন্য। ডাস্টবিন ময়লা ফেলার জন্য। আর পুলিশ? নিশ্চয় রাস্তায় পেচ্ছাপ করলে ধরবার জন্য। পুলিশের পায়ে ধরে পাঁড়াপীড়ি করবার দরকারটা কি? আরও প্রশ্ন আছে—কলকাতার ভবিষ্যৎটা কি? বিজ্ঞাপনের কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। জানেন কি যে সি এম ডি এ'র বিজ্ঞাপন পড়ে লোকে যেমন গালাগালি দিয়েছে, তেমনি কয়েক-জন ইঞ্জিনীয়ার এগিয়ে এসেছেন কলের জলের অপচয় বন্ধ করবার জন্য নতুন 'মেশিন' নিয়ে। জেনে রাখুন, এই 'মেশিন' ভাঙ্গলে রাস্তার কল থেকে এক ফোঁটা জলও পড়বে না। "অটোম্যাটিক" বন্ধ হয়ে যাবে।

এই বিজ্ঞাপন পড়েই শিল্পীরা এগিয়ে আসছেন কলকাতাকে আর একটু সুন্দর করতে। আবার এই বিজ্ঞাপন বোধ হয় না পড়েই যুব সমাজ জঞ্জাল পরিষ্কার অভিযানে নামছেন।

কিন্তু আগেই বলেছি বিজ্ঞাপন পড়েও রাস্তায় পেচ্ছাপ বন্ধ হয় নি, জঞ্জাল ফেলা বন্ধ হয় নি, বাস ভাড়া ফাঁকি দেওয়া বন্ধ হয় নি, আর কলকাতা সম্বন্ধে 'নাক সেঁটানি' বন্ধ হয় নি। এখনও বোধ হয় সবাই প্রতীক্ষায় আছেন, গুঁতো যদি পড়ে, আইনের বজ্রমুষ্টি যদি ধরে, তখন হয়তো পাঁড়াপীড়ি করে বাঁচার ব্যবস্থা করা যাবে। একটু দেরি হয়ে যাচ্ছে নাকি?

দেরিতে ভয় পাই কেন জানেন? এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। যে উন্নয়নমূলক কাজগুলি পুনেরো কুড়ি বছর আগে হওয়ার কথা, সেগুলি আজ হাতে নেওয়া হয়েছে। যেগুলি শেষ হচ্ছে, সেগুলিও সংরক্ষণ-এর অভাবে খারাপ হচ্ছে।

আরও ভয় পাই কেন জানেন? কল-কাতার সুনামটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে। অথচ গুঁতো না খেয়ে বিজ্ঞাপন না পড়ে শুধু যদি খারাবের দোকানগুলির সামনে একটা ঝুড়ি রাখা হয় যাতে চায়ের ভাঁড় আর শালপাতা ফেলা হবে, যদি কর্পোরে-শনের জঞ্জাল গাড়ী আসবার ঠিক আগে রাস্তায় জঞ্জাল জমা করা হয়, ডাস্টবিন থাকলে তার ব্যবহার হয়, দোতালা-তেতলা থেকে জঞ্জাল না ছোঁড়া হয়, ট্রামে-বাসে পুরো টিকিট কাটা হয়, বিদেশী বা কলকাতা দেখতে অভিলাষী-দের একটু সাহায্য করা হয়, ভিড়ের মধ্যে অক্ষম এবং মহিলাদের একটু সুবিধে করে দেওয়া হয়, এমন কি যদি থুথুটা বাইরে না ছিটিয়ে গিলে ফেলা হয়, তাহলেই দেখবেন কলকাতার সুনাম ছড়াচ্ছে। এতে পয়সা খরচ নেই বা নামমাত্র।

হাওড়া স্টেশন এলাকার ব্যবহার-কারীরা এত অসুবিধা সহ্য করেছেন বলেই সেখানে সাবওয়ে সম্ভব হয়েছে, আগামী দিনে বেলওয়ের সহযোগিতায় শিয়ালদহে উড়ালপুল আর কাছারি বাড়ীর পুনর্বিন্যাস যখন আরম্ভ হবে, তখনও লক্ষ লক্ষ যাত্রী, হকার অনুরূপ-ভাবেই আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আস-বেন, এটা আমরা জানি। এর জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হবে না। সাধারণ লোক কলকাতার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করবেন, অথচ যাঁদের ক্ষমতা আছে তাঁরা কল-কাতার জন্য কিছুই করবেন না, যে সব প্রতিষ্ঠান কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত অথচ শহরের ভালর জন্য কিছুই করছেন না, তাঁদের আমরা "খোঁচা" দেবই। দেখি চৈতন্য হয় কিনা। তাঁরা এই শহরকে কটা হাসপাতাল, স্কুল, ডিসপেনসারী, পার্ক, জঞ্জাল সরাবার লরী দিয়েছেন? তাঁদের পেল্লাই অফিস ঘরে বা বাইরে শিল্পনিদর্শন কিছু রেখেছেন কি?

আসল কথাটা কি জানেন? বিজ্ঞাপনটা সবসময় সি, এম, ডি, এ, বা তার চেয়ার-ম্যান শ্রীভোলানাথ সেনকে জাহির করবার জন্য নয়। যদি কলকাতার একটু ভাল হয়, তাহলেই লাভ। যদি একজনও আসেন, সেটাই লাভ।

আর অন্যদের কাছে যদি প্রমাণ করা যায় যে কলকাতাটা জাহান্নামে যাচ্ছে বা যাবে, তাহলে সেটাই বা কম লাভের কি? না হলে আমরা আর "কলকাতা-প্রেমী" হলাম কেন?

ইন্দ্র বলল, চাঁদকে দয়া করে জাগতে দিন আগে, তারপর ঘুমুতে যাওয়া যাবে। আপনি যান, শুতে তুলি একা শুয়ে রয়েছে। আমার জন্যে আপনি যদি বসে থাকেন তাহলে আমার খুব খারাপ লাগবে।

ললিতা বলল, নিজের ইচ্ছায় যদি বসে থাকি, তাহলে খারাপ লাগবে না তো আপনার?

ইন্দ্র হেসে উঠল, সত্যি আপনি সরিতার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। দুজনে একই স্কুলে বোধ-হয় কথা শিখেছিলেন।

ললিতা বলল, ও কথা বলবেন না, আমার বান্ধবীর তুলনা সে নিজেই। কারো সঙ্গে তুলনা দিতে গেলেই ওর কৃতিত্বকে ছোট করা হয়।

হঠাৎ ললিতা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বসুন, আসছি।

ললিতা চলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের আবছায়া থেকে বেরিয়ে এল কতকগুলো ভাবনার জোনাকী। ওরা চুমকীর পোষাক পরে ইন্দ্রের চারদিকে নেচে নেচে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ললিতা চার্মিং। ললিতা দারুণ সবস। একটা জীবনকে ভরে দেবার মত যথেষ্ট কোয়ালিটির সঞ্চয় আছে ওর ভেতর। রুপোলী মাছের মত ও জল কেটে কেটে খেলা করে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ একটা ঘূর্ণির পাকে পড়ে কিছু সময়ের জন্যে জলের অন্ধকার তলায় তলিয়ে গিয়েছিল। এখন আবার উঠে এসেছে অনেক ওপরে। কাচের মত স্বচ্ছ জলের ভেতর দেহের ঝিলিক তুলে তুলে খেলা করছে।

অনেকখানি সময় পার করে উঠোনে ইন্দ্রের পাশে এসে দাঁড়াল ললিতা।

যাবেন এক জায়গায়?

কোথায়?

চাঁদ দেখতে।

ইন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চাঁদ উঠেছে বুঝি, চলুন দেখি।

ললিতা বারান্দার বাতিটা নেভাতে গিয়েও নেভাল না। সে করিডোরের ভেতর দিয়ে পেছনের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। হাত দিয়ে ঠেলে দিতেই দরজার পাল্লা বাইরের দিকে খুলে গেল। ইন্দ্র দেখল অন্ধকার তখনও জমে আছে। ললিতা যে আগে থেকে দরজাটা খুলে রেখে গিয়েছিল সেকথা তার মনে হল। ললিতা কি তাহলে একরকম ধরেই নিয়েছিল যে তাকে ডাকলেই সে চলে আসবে।

ললিতার সঙ্গে ও বাইরে এসে দাঁড়াল। ললিতা দরজাটা ভেজিয়ে বাইরের থেকে তালা দিয়ে দিলে। ইন্দ্রের দিকে ফিরে বলল আপনি আমার হাত ধরুন। সামনের জংলা রাস্তাটা অন্ধকারে চিনে পেরোতে পারবেন না।

ইন্দ্র ললিতার হাত ধরে অন্ধের মত তাকে অনুসরণ করে চলল।

একসময় ললিতার পথ চলার নির্দেশ থেমে যেতেই ইন্দ্র নীচের দিক থেকে চোখ তুলে সামনে তাকাল। বোঝা গেল একটা ক্যানেলের ধারে ওরা এসে পৌঁছেছে। এতক্ষণ গাছপালার জটিল জটাজালের ভেতর অন্ধকার বড় বেশী প্রশ্রয় পেয়েছিল, এখন মনে হল ধুলোমাখা একটা কাচের ভেতর দিয়ে যেমন সবকিছু আবছাভাবে দেখা যায় ঠিক তেমনি চারদিকটা দেখা যাচ্ছে। ক্যানেলের ওপারে নারকেল গাছের অজস্র সমাবেশ। তার ওপারে দিগ্‌বলয়ের একটি বিশেষ জায়গার আকাশে হালকা একটা আলো ফুটে উঠেছে।

ললিতা বলল, আসুন এই গাছের তলাটায় বসা যাক। বালিমাটি জমে শক্ত হয়ে আছে।

ওরা পাশাপাশি বসে দিগন্তের দিকে চেয়ে রইল। লাল চাঁদটা দূর দিগন্তরেখা ঢেকে ওপরে উঠছে। গাছের ফাঁকে ললিতা দেখতে পেলেও ইন্দ্র শুধু বনের মাথায় দেখছে তার জেগে ওঠার দীপ্তিটুকু।

ঐ যে চাঁদ, দেখতে পাচ্ছেন? নারকেল বাগানের দিকে আঙুল তুলে দেখাল ললিতা।

ইন্দ্র এদিক ওদিক মাথা নাড়তে লাগল।

ললিতা অসংকোচে ইন্দ্রের মাথাটা টেনে আনল নিজের দিকে। বাঁ হাতে মাথাটা বেষ্টন করে ডান হাত তুলে দেখাল চাঁদের উদয়। হৃদপিণ্ডের মত রক্তাভ চাঁদ নারকেলের দীর্ঘ শাখার ফাঁকে আটকে আছে।

ইন্দ্রের মনে হল কৃষ্ণবর্ণের লৌহশলাকার মত নারকেলের পাতায় কার যেন হৃদপিণ্ড বিদ্ধ হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণের ভেতরেই চাঁদের রঙ পাল্টে গেল। লাল থেকে হলুদ আবার হলুদ থেকে সাদায় রূপান্তরিত হল চাঁদ। নারকেল বনের মাথার জেগে ওঠা চাঁদ ক্যানেলের বুক লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তে লাগল। যত আঘাত তত জ্বলে ওঠা। কিছু সময়ের ভেতরেই পটটা একেবারে পাল্টে গেল। চারদিকে চাঁদের আলোর পাতলা দুধের তরঙ্গ বইতে লাগল।

ইন্দ্র আর ললিতা আশঙ্কাজনকজনক সান্নিধ্যে বসে চাঁদ দেখছে। ললিতার স্তন আবৃত করে কটি পর্যন্ত নেমে এসেছে সাদা নেবিয়দ। ইন্দ্র দেখছে নেবিয়দের সোনালী পাড় যুবতীর পূর্ণ যৌবনের মত জ্বলে আছে। রাতের খাবার আসনে ললিতার দেহে ছিল আগের বৈধব্য বেশ। এখানে আসার সময় ললিতা তার পাঁচ বছরের পরিত্যক্ত সুখীজীবনের পোষাকটা নতুন করে বুকে জড়িয়ে নিয়েছে।

ললিতা বলল চাঁদ চাঁদ করে পাগল হয়ে উঠেছিলেন এখন দেখুন চাঁদ। বিয়ের আগে প্রায়ই এখানে পালিয়ে এসে একা বসে আমি চাঁদ দেখতাম।

ইন্দ্র কোন কথা না বলে চেয়ে রইল পূর্বদিকে। নারকেলের তরঙ্গিত অরণ্য এখনও আদিম রহস্যে ভরা। অদূরে সমুদ্রের আছড়ে পড়া ঢেউগুলোর চাপা কান্না গুমরে গুমরে উঠছে। চাঁদ তার সবকটি রুপোলী অলঙ্কার সাজিয়ে দিয়েছে তরুণী তরঙ্গিনীকে। ইন্দ্র আর ললিতা বসে আছে পাশাপাশি।

এই ধরনের মুহূর্তগুলো যখন আসে তখন বর্তমান পেছন ফিরে দাঁড়ায়। তারপর যাদুর পাদুকা পরে চোখের পলক পড়তে না পড়তেই পৌঁছে যায় আদিম অতীতে। সেখানে বিশ্বের প্রথম মানব মানবী পাশাপাশি বসে বিহ্বল চোখে চাঁদের দিকে চেয়ে থাকে।

ললিতার মুখে ইন্দ্র সেই আদি মানবীর আদল দেখে শিউরে শিউরে উঠতে লাগল।

(ক্রমশঃ)

নূতন সিলেবাস অনুসারে যোগব্যায়ামের চার্টসহ
শ্রীদ্বিজেশ ভট্টাচার্য প্রণীত
কর্মশিক্ষার দিনপঞ্জী লিখন কর্মশিক্ষার সেরা বই।
মাধ্যমিক পরীক্ষার উপপাঠ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভট্টাচার্য-কৃত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
জীবন স্মৃতির এবং কথা ও কাহিনীর বোধিকা
Prof. S. Bhattacharyya's
STEAM & LOGARITHM TABLE
শিক্ষক মহোদয়গণ দয়া করিয়া নমুনা পুস্তকের জন্য লিখুন ঃ
দি হিন্দুস্থান পাবলিশিং কোং
৮২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯

গণেশ পাইন

একালের চিত্রশিল্পী

এক আশ্চর্য রকমের নিস্তব্ধতা ও নৈঃশব্দ বিরাজমান গণেশ পাইনের চিত্রের পরিবেশে। কখনও বা এক স্নিগ্ধ প্রশান্তি ছড়িয়ে থাকে ছবিতে। আবার কখনও হতাশ বিষণ্ণতার ছোঁয়ায় ছবি হয়ে ওঠে ছায়া-মলিন। একক অস্তিত্ব অধিকাংশ ক্যান-ভাসে। সঙ্গে ফুল, পাখি, তুলসী মঞ্চ, বৃক্ষ, নরকঙ্কাল মৃতের অস্থি, সরীসৃপ ইত্যাদির কোন একটির উপস্থিতি। ছবিতে মানুষের অবয়ব প্রথাগত আকৃতির মত হুবহু এক নয়। অথচ তাদের চিনে নিতেও অসুবিধে হয় না। তবে বড় নির্জন। একক। নিঃসঙ্গ পটভূমিতে সত্য-দ্রষ্টা ঋষির মত ধ্যানগম্ভীর। আত্মমগ্ন। নির্বাক। মৌন। কিন্তু প্রাণময়। অর্থপূর্ণ এবং গভীর ইঙ্গিতময়তায় আকীর্ণ।

সাধারণতঃ উষ্ণ ও শীতল রঙের আলো-আঁধারির আলোছায়ায় গণেশের চিত্রের চরিত্রগুলো আধিভৌতিক কিংবা কাব্যময় স্বাপ্নিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে তাঁর ফিসারম্যান দি ফ্লাই আন্ডার দি ফাউনটেন, দি মেসেঞ্জার, ভয়েজ, ক্যাপটিভ, দি সারপেন্ট, হেড, দি এফিগি প্রভৃতি ছবির কথা মনে পড়ে।

গণেশ পাইনের জন্ম কলকাতার কবিরাজ রোডের বাড়িতে ১৯৩৭ সালে জুন মাসের ১১ তারিখে। শৈশবেই শিল্প-প্রেরণা জন্মেছিল বুকের মাটিতে কতিপয় পার্থিব ও অপার্থিব বিষয়বস্তুকে একান্ত নিজের করে পাওয়ার আকৃতি থেকে। যেমন গতিশীল কুকুর, ভাসমান মেঘ, বহমান নৌকা নিস্তব্ধ বৃক্ষ প্রভৃতিকে হাতের কাছে অন্তরঙ্গভাবে না পাওয়ার আকুলে আর্তি থেকেই মডেলিং করার সূত্রপাত। দৃশ্যরূপকে নরম মাটি দিয়ে বেঁধে রাখতে চাইতেন। গড়তেন হরেক রকমের মূর্তি। আবার কালো শ্লেটের ওপর চক দিয়ে কল্পনার ছোপ মাখিয়ে আঁকতেন প্রাকৃতিক চিত্র-বিচিত্র। কিংবা শোনা কোন ঘটনাকে দেখার আকাঙ্ক্ষায় তার চিত্ররূপ ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করতেন সাদা কাগজের পাতায়। ইচ্ছে পূরণের পর ফর্মের ভাঙাগড়ায় হত দৃশ্যরূপক আবার নবকলেবরে দেখার বাসনায়। ফলে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়ার মত রূপ থেকে রূপান্তরে যাওয়া একটা খেলার মত পেয়ে বসেছিল। গণেশ পাইনের নিঃসঙ্গ শৈশবে এইভাবেই ছবি আঁকা নেশায় পরিণত হয়েছিল।

বাড়ির সামনে গৌরাঙ্গের মন্দির। পুরোহিতের খড়মের শব্দে সকালে ঘুম ভাঙত। কাঠের গৌরাঙ্গকে দেখে অমানুষিক ফর্ম বলে মনে হত। তার উদাস চাউনি, ঊর্ধ্বে বাহু, হলুদ গায়ের রঙ, অথচ মানুষের মত বেশভূষা আকৃতি, মনের অবচেতনে একটা আবেশ সৃষ্টি করত বটে তবে অতিকায় বলে বোধ হত।

বাড়ির পেছন দিকে আর একঠাকুর-বাড়ির দৃশ্য গণেশ পাইনের স্মৃতিতে এখনও সজীব। ঠাকুরদালানে দুর্গোৎসব। ধুনোর গন্ধ, ঢাকের আওয়াজ। আলোর বন্যা। প্রতিমার শরীরে সোলা-সলমা-জরির সাজের ওপর আলো পড়ে ঠিকরে পড়ছে দেবীমূর্তির পেছনে দেয়ালের গায়ে কাঁচ বাঁধানো রঙীন ছবি—এক বিশাল মুখ থেকে অজস্র, বহু, যোদ্ধা স্রোতের মত বেরিয়ে আসছে। ছবিটা শিল্পীকে অসম্ভব রকম পেয়ে বসেছিল। কেবলই নিরীক্ষণ করতেন। কিছুই বোধগম্য হত না। বিস্ময় ও কৌতূহলের ছায়া প্রতিফলিত হত মনে। আজ বেশ বুঝতে পারেন ছবিটা বিশ্বরূপ দর্শনের। ছবির অলৌকিক এবং অতি-প্রাকৃত বিষয়টি আকর্ষণ করত শুধু তাদের বিস্ময়কর রূপ-ঐশ্বর্যের জন্যে। কোন ধর্মীয় ভাবনা বা অনুভূতির স্থান সেখানে ছিল না। এসব অভিজ্ঞতা এখনও শিল্পীকে ছেলেবেলার সেই দিনগুলোতে ফিরিয়ে নিতে চায়। বস্তুতঃ তাঁর আজকের চিত্রকলাতেও জীবন প্রভাতের অনুভূতির স্পর্শ সুস্পষ্ট। শিশু মনের অজস্র ইমেজ ময়ূরের পেখম মেলার মত ছড়িয়ে পড়েছে শিল্পীর সদ্য অঙ্কিত চিত্রের ক্যানভাসেও।

সিটি কলেজিয়েট স্কুল থেকে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৫৫ সালে গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে ভর্তি হতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটল। ড্রইং-এর নমুনা দেখে কর্তৃপক্ষ শিল্পীকে এডভান্স কোর্সে দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি করে নিলেন। শিল্পীর জীবনে দুর্ঘটনাই বটে। কারণ, স্কুলের ড্রইং প্রতিযোগিতায় দু'-একবার পুরস্কার পেলেও, বৃহত্তর শিল্প-অঙ্গনে তুলনামূলক বিচারে নিজের কাজের ভাল-মন্দ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার এই প্রথম সুযোগ। এতটা স্বীকৃতির জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না বলেই এ-ঘটনা শিল্পীর কাছে আজও দুর্ঘটনা বলে বোধ হয়।

আর্ট কলেজে শেখার সময় শিল্প-জগতের বৃহত্তর ক্ষেত্রের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ওই সব বাল্য অভিজ্ঞতাগুলো তলিয়ে যায়। অন্যদিকে শিক্ষায়তনে পাশ্চাত্য রীতিতে ব্যাকরণসম্মত শিল্প শিক্ষণ-পদ্ধতিকে আপন বলে স্বীকার করে নিতে পারছিলেন না। কারণ, তাঁর চিত্ররীতি, কল্পনা, ধ্যান-ধারণা সবই ছিল ভাবতন্ত্রীয় ধাঁচের। ইউরোপের চিত্রকলার ছাত্র হলেও কাজের ধরণ পাশ্চাত্য রীতি অনুসারী ছিল না। ক্লাসের বাইরে এই দ্বিবিধ ধারাকে আত্মীকরণ করে চিত্রাঙ্কনের প্রয়াস পেয়েছেন। এই দোটানার মধ্যে ১৯৫৭ সালে এক আশাতীত প্রাপ্তি শিল্পীর চলার পথে পেলেন। মুণিন্দ্রমল্লিক আনেকখানি। এই বছর সিপাহী বিদ্রোহের শতবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতার অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টসে আয়োজিত এক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার শিল্পী-অঙ্কিত ছোট জল রঙের মিনিয়েচার 'মেরী ঝাঁসী নেই দুর্গিণ' শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে। সমধর্মী আর একটি কাজ 'ডেথ অফ এ ড্রিম'-ও উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল।

১৯৫৯ সালে আর্ট কলেজ থেকে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে শিল্পের আসনে

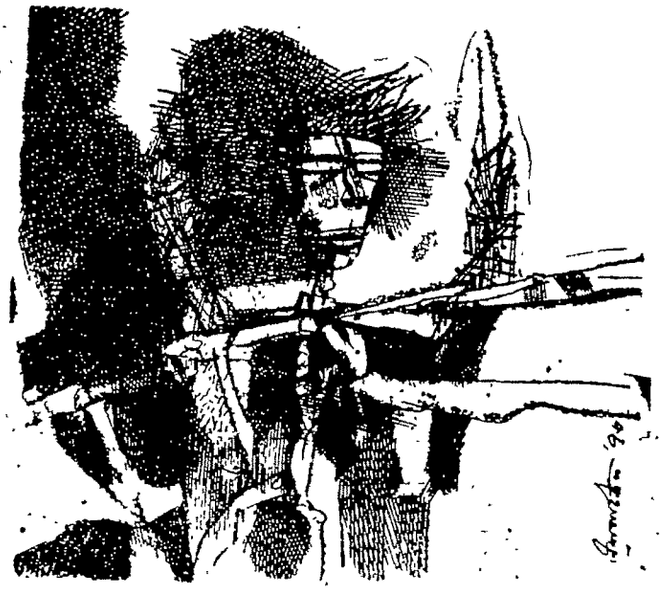

অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই শুরু হয়। কোনরকমে কাজ চালানো গোছের অল্প আইনের একটা চাকরিও জুটে যায়। চার-চারটে বছর কাটে শিল্পের গোলকধাঁধার পথ হাতড়ে। ১৯৬২-৬৩ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত সাদা-কালোর কাজে আত্মনিয়োগ করলেও, আত্মতৃপ্তি ছিল না। তখন প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি ত দূরস্বপ্নের ব্যাপার।

কয়েক বছর ধরে কয়েকশ' ছোট ছোট কাগজে ফর্ম ভাঙ্গাগড়া ও নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর খুঁজে পেলেন নতুন পথের সন্ধান। ১৯৬৮ সাল থেকে টেম্পেরায় চিত্রিত চিত্রগুলোতে এল অভিনব বর্ণ। অমোঘ বক্তব্য। এবং নিজস্বতা। নেচারে যেমন ছিল তেমন করে আঁকা। অভিজ্ঞতা নির্ভর করে আঁকা। বৃক্ষের স্তব্ধতা, জলের তরলতা, মেঘের দূরত্ব প্রভৃতি প্রাকৃতিক অমোঘ ব্যাপারগুলোই ছবি হয়ে উঠছিল। সত্যিকারের রঙের ছবি আঁকার এই সূত্রপাত। মূলতঃ সোনালী হলুদের সমাহারে (১৯৬৮—১৯৭১) এই পর্যায়ের চিত্রমালায় একটা ইনটিউটিভ অথচ রিচুয়ালিস্টিক এ্যাটিচিউড চোখে পড়ে। এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা-চর্চার আগে থেকে বাল্যস্মৃতি ও রূপগত অভিজ্ঞতাগুলো ক্রমশই চেতন মনে সক্রিয় হয়ে ক্যানভাসে ফুটে উঠতে থাকে।

গণেশ পাইন ইমেজের চিত্রকর। জীবনানন্দের মত অতি তুচ্ছ সামান্য অনুভবকে গভীর ও ব্যাপকতর করে অসামান্য করার প্রয়াস গণেশের রূপকল্পে স্পষ্ট আভাসিত। ছেলেবেলায় কবিতা লিখতেন। এখন লেখেন,—রঙ-তুলি দিয়ে। তবে কবিতা পাঠ করেন নিয়মিত। তাঁর চিত্রে খতটা কবিতা থাকে, ততটা নিয়মনির্দিষ্ট বিজ্ঞান থাকে না। কবিতার মত তাঁর চিত্রকল্পের শরীরে, মনন ও অনুভূতির মধ্যে দিয়ে একটা বিস্তৃত পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস আমাদের বোধে ধরা দেয়।

এ সম্পর্কে শিল্পীর বক্তব্য—কবিতার মধ্যে একটিক চিত্রকল্পের উত্তর আর বিলয়ের ক্রমান্বয় প্রক্রিয়ার শেষে একটি অখণ্ড মননের সূচনা হয়। কবিতার এই বিশেষ সচল বিষয়টি যে ছবিতে প্রতিফলিত করা যায় না, সেটা বুঝেছি। চিত্রকল্পকে সরাসরি অনুসরণ করতে গিয়ে। মনে হয় ছবির চরিত্রগত স্থাণুত্বই সেই ব্যর্থতার কারণ। ইদানীং ছবিতে তার নিজস্ব ভাষার ব্যক্ত করার চেষ্টা করি। কবিতার সমগ্র রূপটিই এ-কাজে বেশি সহায়ক বলে মনে হয়। জীবনানন্দের কবিতা সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে। ওঁর কবিতার দার্শনিক দিকটা ভাবায়। জীবনানন্দের যে রূপমুগ্ধতার মধ্যে থেকে জীবন দর্শন গড়ে উঠেছে, আমি নিজের মধ্যেও তা অনুভব করি।

শ্রীপাইন চিত্রকল্পের কবিতাকে ঈর্ষা করেন। কারণ একই কবিতার মধ্যে একটি চিত্রকল্প আর একটি চিত্রকল্পকে অতিক্রম করে যেতে পারে অনায়াসে। কিন্তু একটা ছবিতে মাত্র একটাই চিত্রকল্প গড়ে ওঠে। তিনি তাই একটার পর একটা ছবি এঁকে এই অতৃপ্তি থেকে মুক্তি পেতেক চান। তাই দেখি অনেক সময় একই রূপকল্প বিচিত্র রঙে বসে ঘুরেফিরে আসে তাঁর চিত্রমালায়। যেমন একটি পীতাভ মুখ বারবার ফিরে আসে কখনও বসন্তে রমণী হিসেবে, কখনও নৃত্যরতা ভৈরবীর চেহারা নিয়ে কখনও বা বর্ষার চিরবিরহীর রূপ নিয়ে। একটি স্তম্ভকে প্রদক্ষিণ করার মত এসব দৃশ্য দর্শকের কাছে পুনরাবৃত্তি বলে বোধ হতে পারে। অনেক সময় হয়ও। জিজ্ঞেস করলে শিল্পী তাঁদের বলেন—চিত্রে প্রতিপাদ্য বা গঠনতান্ত্রিক কোন কিছু প্রশ্ন করতে বসিনি। যদি আমার প্রিয় ইমেজ ও পুতুলগুলো বারবার আমার ছবিতে ফিরে আসে ত ক্ষতি কি?

গণেশ পাইনের চিত্রকলা সাধারণত দ্বিমাত্রিক। সাদৃশ্যধর্মী। প্রাকৃতিক বিষয় আমরা যেভাবে দেখে থাকি অর্থাৎ—আমাদের চিত্রে যেমন দৃশ্যপটে বিস্তৃত অন্তরীক্ষ আর পৃথিবী, ঊর্ধ্বে রেখায় নির্দিষ্ট বৃক্ষ গৃহ পথচারী পশু প্রভৃতি। এই সামান্য লক্ষণগুলি নিয়েই ছবির মূলে গঠনকর্ম। রঙ রেখায় আবদ্ধ আকারগুলো ডাইনে-বাঁয়ে কিম্বা ওপরে-নীচে সঞ্চারিত হয় পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের নিয়মে। ছবির অন্তরালে থাকে জ্যামিতিক নকসার শীতলতা যা একটি মূলগতিরেখাকে প্রতিষ্ঠিত করে বিপরীত অথবা সম্পূরক রেখার সাহায্যে। মিশ্র আঙ্গিকে ছবি বিকশিত হয়ে ওঠে ক্যানভাসের বুকে। কোন একটি বিশেষ শৈলীকে গবাক্ষ লণ্ঠনের মত অন্ধভাবে অনুসরণ করে নয়। কিউবিস্টদের বা ফভিস্টদের মত কোন বিজ্ঞানসম্মত ব্যাকরণ নির্ভরতা বা প্রমাণের বিষয় ছবির প্রতিপাদ্য নয়। ১৯৭১ সালের পর থেকে সোনালী হলুদ বর্ণলেপন পরিবর্তিত হয়ে ক্রমশই ছবি যেন নীলে নীল হয়ে উঠতে চাইছে বর্তমান পর্যায়ে।

শ্রীপাইনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ওল্ড মাস্টারসদের কার কার ছবি ভাল লাগে। একটু ভেবে বললেন—এ প্রশ্নের জবাব ত মশাই লম্বা একটা ফর্দ। বিশ্ববিখ্যাত আর অমর সব শিল্পীদের সঙ্গেই মনে পড়ে যায় অনেক নাম গোত্রহীন শিল্পীর কাজ। এই শহরের দেওয়ালে রোয়াকে ফুটপাতে প্রেসের ফেলে দেওয়া কালি, রঙগীন খড়ি, কিংবা কাঠকয়লায় আঁকা কোন কোন ছবি চোখে ভেসে ওঠে। তা ছাড়া ধরুন, জানি না তো কার আঁকা অজন্তার সেই দর্পণ ...ধারিণী মধ্যযুগের ক্ষুদ্র চিত্রমালা কাদের হাতে সম্ভব হল কেই বা এঁকেছেন কালীঘাট ঘরানার সেই বাউন্ডুলে শিবঠাকুরটিকে? সে সব ছবি কেন ভাল লাগে তা বিশ্লেষণ করতে বসাটা আপাততঃ ঝকমারি হবে। প্রভাবের কথা বলছেন? পূর্বসূরীদের প্রভাব এড়ানো যায় না। অবনীন্দ্রনাথের ছবি যখন ভাল লাগত তখন ছবির ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতা আমার ছিল না। ফলে ভালো লাগাটা ছিল অহেতুক। হয়ত ওঁর ছবির সহজ আন্তরিকতা লৌকিক অলৌকিকে মেশা একটা মনোরম আবহাওয়া আমার মুগ্ধ করেছিল। সুতরাং প্রভাব এড়ানো যায়নি। ওয়াশের আলো আঁধারিতে মজে যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল খুবই। পরে আর্ট কলেজের লাইব্রেরীতে দেখি রেমব্রান্টের ছবি। সে এক অবাক বিস্ময়। সে সময়ে এ দুই শিল্পীর কাজ আমায় পেয়ে বসেছিল। বলা যায় আমার আরাধ্য হয়ে উঠেছিলেন এঁরা।

গণেশ থামতেই প্রশ্ন করি আপনার ছবিতে প্রেরণার অবদান কতখানি? উত্তরে বললেন—প্রেরণা! কি জানি মশাই, সচেতন ভাবে প্রেরণার কোন প্ররোচনা অনুভব করি কিনা বলতে পারব না। কখনও মনে হয় বেঁচে থাকার কারণেই যে সব প্রিয় অপ্রিয় অভিজ্ঞতার কবলে পড়তে বাধ্য হই, ছবি সে সব অভিজ্ঞতারই দলিল। কখনও মনে হয় ছবি আঁকি ছবির কারিগরী শিখতে হয়েছে বলে নেহাৎই ব্যক্তিগত কারণে। কখনও মনে হয় ছবি আঁকা মানে আত্মসংস্কারের শৃঙ্খলা ক্রম অভিনিবেশের চর্চা।

প্রশান্ত ঘোষ

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

অনেক সময় ছোটোদের কাছেও অনেক কিছু শেখা যায়। আমার অনেক ছাত্রও জানে না, —যে আমি তাদের ছাত্র। এইখানেই আমার জোর। এই আমার অহংকার।

গত ১৯ জুন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ (ইউনি-ভার্সাল জ্ঞানদা) এবং ললিতা ঘোষ আমে-রিকা যাত্রা করলেন প্রধানতঃ আলি আকবর কলেজে অধ্যাপনার আমন্ত্রণে। এ ছাড়াও অন্যান্য সাংস্কৃতিক পরিকল্পনাও কিছু আছে। তবে কার্যকরী না হওয়া পর্যন্ত এ সম্বন্ধে কিছু কবুল করতে তিনি রাজী হননি। 'একালের গান' সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে বললেন বিরাট সাবজেকট। এত অল্প সময়ে এবং চারিদিক তাকিয়ে বল-লেন এই পরিবেশে এটা কি আলোচনা করা যাবে? না হয় ফিরে এসে.....

"না, না, না"। আঁতকে উঠে বলি সে ত দু'বছরের ধাক্কা। ততদিনে একালের গান-এর ফিচার ধরে আবার কোন কালে পাড়ি দেব তা কে বলতে পারে? যতটুকু হয় আজই এবং এখুনি বলুন নইলে আর হবে না।

প্রেসিডেন্সী কোর্টের একটি ঘরে জ্ঞানদার বিদেশ যাত্রার ঠিক আগের দিন সকালে কথা হচ্ছিলো। ঘরের অবস্থা ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মের মত। কিছু তল্পি-তল্পা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে আগের দিন। বাকী সবের মধ্যে কিছু যাবে কিছু থাকবে। প্যাকিং চলছে। অগণিত বন্ধুবান্ধব, ছাত্রছাত্রী দলে দলে দেখা করতে আসছেন। কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ এখানে ওখানে এটা ওটা টেনে নিয়ে খানিকক্ষণ বসে চলে যাচ্ছেন। বেয়ারা ঘর সাফ করতে এলো। আমরা দু-আঙ্গুলে উঁচুতে শুনো পা তুলে বসলাম। ঘর মুছে চলে গেলো। ঠিক এই রকম অবস্থায় টুকরো টুকরো যেটুকু আদায় করতে পেরেছি তাই তুলে ধরছি। ত্রুটি হলে সহৃদয় পাঠকের মার্জনা ত পাবই। অতএব মাভৈঃ।

আমার জ্ঞান হবার পর থেকেই দেখেছি মোটামুটি দুটি ধারা বাংলা গানে চলে আসছে। ঘুমপাড়ানী-গানের ছায়া সাকে লালবাই সং বলা যায়, লোকসংগীত, বাউল, ভাটিয়ালী তথা একেবারে মাঠ ও ঘাটের গান। সভ্যসমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে যে গানের ধারা চলছিলো সে হোলো থিয়েটার সিনেমার গান। বৈঠকী আসরে বহুদিন ধরে পাঞ্জাবী টপ্পা, নিধুবাবুর টপ্পা এবং তার পরবর্তী যুগেও টপ্পা প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেছে।

সাধারণ স্তরের চলতি গানের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের গান একটা বড় জায়গা দখল করে ছিল তার সহজ, সরল, মানবিক আবেদন আর ছন্দ সুর ভাব এত মধুর। আর হৃদয়ের অত্যন্ত কাছের বলে।

বিপরীত ধারায় যেন এলো গিরিশচন্দ্রের গান। থিয়েটারের প্ল্যাটফরমে দুজনের গানেরই প্রবল সমাদর ছিলো।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা আদান-প্রদানের পালা চলছিলো যাত্রা ও থিয়েটারের মধ্যে এবং ফোক (লোকসংগীত) ও রাগসংগীতের মধ্যে। যাত্রা থেকে থিয়েটার এবং থিয়েটার থেকে যাত্রা সুর, কথা এমন কি গানও গ্রহণ করতো। লোকসংগীত ও রাগসংগীতের মধ্যে লেনদেনটা ছিলো অন্য ধরনের। লোক-সংগীতের সুরের ধারা নিয়ে আরোহী অব-রোহী বাদী সম্বাদী তথা পেশাদার ছকে ফেলে তাকে রাগসংগীতে পরিণত করা এবং রাগসংগীতের তান, বাট, ঘসকিরী বর্জন করে শুধু সুরটুকু নিয়ে উচ্চাঙ্গ সংগীত অনু-ভবের মানসের গাইবার উপযোগী করে— চলল এক ধরনের গান। এ গান যাত্রা থিয়েটারে গাওয়া হোতো এবং তাই থেকেই মাস্-সং হয়ে উঠেছিলো।

দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশীগান, জাতীয়গান, হাসিরগান, ভাবগীতি ইত্যাদি নানাধরণের গান রচনা করেছেন এবং সবগুলিই শুধু অসাধারণ জনপ্রিয়ই হয়ে ওঠেনি, জন-সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়েছিলো।

রবীন্দ্রসংগীত-নামাঙ্কিত হয়ে তখনও এমন বিপুল গৌরবে প্রতিষ্ঠিত না হলেও—এ গান রচনা আরও আগের ঘটনা। তবু এসংগীত জনসমাজে আসতে দেরী হয়েছে এবং তার চেয়েও অনেক বেশী সময় গেলেছে সমাদৃত হতে।

কারণ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বহুমুখী এবং সংগীতপ্রতিভার স্রোত নানামুখী হলেও তার শাখাপ্রশাখা কম। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ সমাজের উঁচু মহলের মানুষ তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিধি বিরাট। তাঁর গানের বিষয়বস্তু যেমন উঁচুদরের প্রকাশভঙ্গী এবং রিফাইন-মেন্টও তেমনই অসামান্য। এই মানসিক আভিজাত্য তাঁর গানেও প্রতিফলিত হয়েছে। আর ত্রুটিহীন গানের তিনি সার্থক স্রষ্টা।

এই অতিসংস্কৃত, অতিমার্জিত গান গ্রহণ করার মত শিক্ষা মানসিকতা তখনও সমাজের সাধারণ স্তরের মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। এই কারণেই দ্বিজেন্দ্রলালের হাসি, কান্না, স্বদেশীভাবের সাদামাটা কথা ও সুরের গান তাদের কাছে অনেক আপনার বলে মনে হয়েছিলো।

প্রকাশভঙ্গীর ধরণ, সংগীতধর্ম দুদিকেই দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের চেয়ে স্বতন্ত্র। বরং নজরুলের সঙ্গে তাঁর মিল বেশী। নজরুলের গানকাব্যসংগীতের মাঝে মাঝে সাহিত্যধর্মী থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল সিরি-য়াস গান থেকে সুরু করে হাসির গানের ডগি অবধি অনায়াসে জয় দিয়েছেন, কিন্তু সাহিত্য গৌরব সেখানে অম্লান।

রবীন্দ্রনাথ ট্রাডিসন অক্ষুণ্ণ রেখেও গতানুগতিকতার থেকে আলাদা একটা সংগীত চিন্তা সৃষ্টি করেছিলেন কিন্তু মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই এ গান সীমাবদ্ধ ছিলো।

নজরুলের গান সাধারণ স্তরের কিন্তু এর বৈচিত্র্য এবং এত আবেগ ও রংয়ের প্রাচুর্যের কারণে জনসাধারণ খুব সহজেই এ গান নিয়েছে। তখন লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিলো এ গান।

কিয়াংশু বহু কালী [illegible] সাময়িক। ছাত্রাবস্থায় আমি তাঁকে পুজো

একালের গান

করেছি। পরে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মনটা পরিণত বোধে পৌঁছতে মনে হয়েছে ওঁর সম্বন্ধে হয়ত একটু বেশীমাত্রায় উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছিলাম তরুণ মনের স্বপ্নাবেগে।

ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে অনেক সুর-স্রষ্টার আগেই হিমাংশু দত্তের স্থান। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মননশীলতায় তথা সমৃদ্ধিতে এবং সুরসৃষ্টিতে ওঁর চেয়েও বড় কম্পোজার সে যুগেই ছিলেন। ওঁর বৈশিষ্ট্য কোথায়? ওঁর নিজের লিমিটেশনটাই ওঁকে বৈশিষ্ট্য স্বাতন্ত্র্য দুই-ই দিয়েছে। শিক্ষা একসপেরিমেন্টের অভিজ্ঞতা, এবং বহুদর্শিতার অভাব সত্ত্বেও আপন সৃষ্টিতে তিনি সম্পূর্ণ সার্থক, কারণ এখানে তাঁর নিজস্বতা বজায় রেখেছেন পূর্ণ মাত্রাতেই। তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ ছিলো কি জানো? আজেবাজে অপ্রয়োজনীয় এলিমেন্ট্‌ক বাদ দিয়ে উনি একেবারে নিউক্লিয়াস্‌ ধরতে জানতেন। সুপারফ্লুয়াস্‌ ছিলেন না বলেই হিমাংশুবাবুর সুর বা রচনায় কোনো ফ্লাওয়ারিং নেই। সুন্দর বা চিত্তস্পর্শী কিছু শুনলেই তিনি অভিভূত হতেন তাঁর মনটা যেন দুলে দুলে সাড়া দিয়ে উঠতো। তিনি গ্রহণশীল অন্তরের মানুষ, কিন্তু নকলনবীশ ছিলেন না। এইখানেই ছিলো তাঁর শক্তি এবং এই শক্তির জোরেই তিনি রসিকচিত্তে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন।

নজরুল এবং তাঁর সমসাময়িক (বয়সের তারতম্য অবশ্যই আছে) গীতিকার এবং সুরকার রবীন্দ্রনাথ, দিলীপ রায় ক্লাসিক্যাল কাঠামোকে ভিত্তি করেই আধুনিকতার প্রবর্তন করলেন। কিন্তু এমনই তাঁর ওজস যে স্রষ্টার ব্যক্তিত্বকে চিনে নিতে ভুল হোতো না।

এই যুগেই (একটু আগে পরে হতে পারে) কমল দাসগুপ্ত, সুবল দাসগুপ্ত, সুধীরলাল, রবীন চ্যাটার্জি প্রমুখ সঙ্গীত-স্রষ্টাও তাঁদের সাধনার আনন্দে মেতেছিলেন। ওঁদের সুরে এতরকম উপাদান, এত সঙ্গীত সম্ভার ছিলো বলেই গানের চেহারার একটা অন্য সৌন্দর্য আনতে পেরেছিলেন। ফিল্মের গানও এঁরা প্রচুর করেছেন এবং করেছিলেন তার চঞ্চল ঢেউকে সংহত, সংযত করে নিয়ে।

এঁদের গানে আমাদের ধারাবাহিক সঙ্গীতের ধারাকে ভাঙবার কোনো প্রতিষ্ঠা ছিলো না—ছিলোনা ট্রাডিশনকে নস্যাৎ করার চিন্তা। আর করলেও সেটা তখন চলতো না। কারণ তখনও সেরকম কোনো পারিপার্শ্বিক কালচার এবং এই বিপ্লবকে গ্রহণ করবার মত বিদগ্ধ মন সঙ্গীত সমাজে গড়ে ওঠেনি। এনেছে এখনকার জীবনের মধ্যে বৈচিত্র্য (যদিও বেশীরভাগই মন্দ বা অসুন্দর মনোবৃত্তিজাত)। এই বৈচিত্র্যের জন্ম যথেচ্ছাচারের প্রবণতা থেকে এবং সমাজ, পারিপার্শ্বিক শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সঙ্গীতজগত অবধি ঘটেছে এর বহুধাবিস্তৃতি। এখানে কোনো যোগ্যতার বিচার নেই শিক্ষারও বালাই নেই। কিছুটা প্রকৃতিদত্ত কণ্ঠ কিছু প্রতিভা কিছু নকল করার দক্ষতা। এইটুকু সম্বল করেই এরা বড় হয়ে উঠতে চায়। এরা ডিসিপ্লিন মানতে নারাজ। নিজেকে তৈরী করবার ধৈর্য নেই। তবু যশ-প্রতিষ্ঠা সবই চায় ইনসণ্ট্যান্ট কফির মত এক নিমেষেই।

এই প্রসঙ্গেই বলি অতুলপ্রসাদ ছিলেন অনেকখানিই রবীন্দ্রনাথের ছায়া যেমন রজনীকান্তে ছিলো দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব। কিন্তু অগ্রজ স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য বজায় রেখেও এঁরা স্বল্প পরিসরে নিজেদের ধ্যান ও চিন্তার ছাপ রেখেছেন তাঁদের গানে। অতুলপ্রসাদের নিজস্ব অবদান হোলো তাঁর ঠুংরী। এইখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেছেন। রজনীকান্তের গানে ডি এল রায়ের প্রভাবকে ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর ভজন বা আরাধনার ভাব। এইখানেই তাঁর গান রজনীকান্তের গান বলে চিহ্নিত হবার দাবী রাখে।

দিলীপ রায়ের গান আপন স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্বে অনন্য। কিন্তু উমা বসু ছাড়া এ গান যথাযথভাবে কেউ গাইতে পারেননি। কারণ প্রথমতঃ পুরো ক্লাসিক্যাল বেসড্‌ কণ্ঠ ছাড়া এ গান গাওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ একটা সম্পূর্ণ নতুন এবং বৈপ্লবিক ধারাকে গ্রহণ করার মত প্রস্তুতি তখন কারো ছিলো না। আমি ব্যক্তিগতভাবে মন্টুদার (দিলীপ রায়) বন্ধু, ভক্ত, অনুযায়ী সেইজন্যই তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবার এবং সমালোচনা করবার অধিকার এবং সাহস দুই আমার আছে।

মন্টুদা এক অসাধারণ প্রতিভা, কিন্তু চঞ্চল। কারণ এতবেশী ক্ষমতা থাকাটাও একটা বিপদ। এই প্রচণ্ড সর্বগ্রাসী প্রতিভাই তাঁকে কোনো বিষয়ে স্থির থাকতে দেয়নি। তা ছাড়া যৌবন ক্ষণস্থায়ী এবং কোনো স্রষ্টা তিনি যত অসামান্য শক্তিত্ব-সম্পন্নই হোন যৌবনেই প্রায় হয়ে উঠবেন এত সোজা জিনিস সঙ্গীত নয়।

ওয়েস্টার্ণ মিউজিক? বাংলা গানে এ একসপেরিমেন্ট আমি প্রথম করেছি বললে অত্যুক্তি হয় না। তার আগে? সুস্থিতানাথ, দক্ষিণারঞ্জন সেন—তাকেস্টায় এর সূচনা করছিলেন।

আমরা বিলিতি সভ্যতার আওতায় মানুষ। সাদা চামড়া দেখলেই মনে হোতো এরা আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। গান বাজনাতেও সেই ধারার ছায়া পড়লো।

দক্ষিণারঞ্জন সেন ব্রজেন্দ্রকিশোরের (বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বাবা) কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। তারপর কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তালিম নিলেন। এই কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম ওয়েস্টার্ণ মিউজিকের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করলেন। কৃষ্ণধনবাবুর থেকেই পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সূত্র। তাঁর কাছ থেকে শিখেই দক্ষিণাবাবু প্রথম পাশ্চাত্যসঙ্গীত গ্রহণ এবং প্রচলনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

আমি তখন ষ্টার থিয়েটারে যেতাম। ওখানের ষ্টেজ মিউজিকের দায়িত্ব ছিলো দক্ষিণাবাবুর ওপরে। গিয়ে দেখতাম পুরো-পুরি ওয়েস্টার্ণ টেকনিকে এবং ওয়েস্টার্ণ ইনস্ট্রুমেন্টে উনি অর্কেস্ট্রা হার্মোনাইজ করতেন।

আমাদের ডোয়াকিন্‌সের বাড়ীতে নানারকম বাদ্য ছিলো। আমার দাদা পাশ্চাত্য-সঙ্গীত শিখতেন মিঃ মন্টিজোর কাছে। তিনিই আমায় বললেন ভোন্ট ট্রাই ওয়েস্টার্ণ মিউজিক অন ভায়োলিন।'

আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়েও অর্কেস্ট্রা করেছি ইণ্ডিয়া ব্রডকাস্টিং কোম্পানীতে। আমাদের ফ্যামিলি অর্কেস্ট্রার নাম ছিলো বাণীসঙ্ঘ। পঙ্কজ মল্লিকের অর্কেস্ট্রা পার্টির নাম ছিলো চিত্রা সংসদ।

ফিল্মে ওয়েস্টার্ণ মিউজিকের রীতি অনুসারে বোম্বেতেই আমিই প্রথম এই ধরণের সঙ্গীত সৃষ্টির দিকে মন দিয়েছিলাম। ইণ্ডিয়ান ফিল্ম মিউজিকে সেই প্রথম পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সূচনা। বাজনাও আছে তার সাক্ষী।

এই একসপেরিমেন্ট করতে গিয়েই বুঝেলাম ওটা শেখার জিনিস। চালাকী করে জোড়াতালি দিয়ে কিছু করা যায় না। করলেও সে বস্তু স্থায়ী হবে না।

আমি বোম্বেতে পাশ্চাত্য সঙ্গীতে

নারায়ণ দত্ত

জন কোম্পানীর বাঙালী কর্মচারী

সুতানুটি—কলকাতা—গোবিন্দপুরের ইতিহাসে এক অনন্য সংযোজন

প্রকাশিত হ'ল ॥ ২০.০০

শ্রীমতী ভক্তি বিশ্বাস

অপরিচিত প্রতিবেশী ভূটান

বাংলা ভ্রমণ-সাহিত্যে এক অনন্য সংযোজন।

প্রকাশিত হ'ল ॥ ১৫.০০

এই লেখিকার

নেপাল হিমালয়ে ॥ ১২.০০

নবপত্র প্রকাশন : নবপত্র প্রকাশন : ৫৯ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯.

অভিজ্ঞ মিউজিশিয়ান নিয়েই কাজ আরম্ভ করেছিলাম। এঁদের মধ্যে যাঁদের ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা ছিলো তাঁরা বলতেন 'ইণ্ডিয়ান মিউজিক ইজ সো বিউটিফুল' অর্থাৎ ভারতীয় সঙ্গীত। যথাযথভাবে আয়ত্ব করলে অন্য কোনো সঙ্গীতের দিকে মন দেবার প্রয়োজন আছে কি?

আমি কি ভাবে ওয়েস্টার্ণ মিউজিক হার্মোনাইজ করেছি? আমার কম্পোজিশনে সাতটা পার্ট থাকতো। ফার্স্ট ভায়োলিন, সেকেণ্ড ভায়োলিন, থার্ড ক্লারিওনেট ফোর্থ চেলো। এই প্রত্যেকটি পর্যায়ের মিউজিক সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা ভারতীয় বাংলা গানের সুরে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুর চিন্তা করতাম চেম্বার মিউজিক কিংবা সিম্ফনী মিউজিকের ইডিয়মকে আদর্শ রেখে।

আর এখানকার পাশ্চাত্য ঢং-এর সুর পপে এসে পৌঁছেছে এবং সেই পপ সঙ্গীতের সঙ্গে সত্যিকারের পপের কতটা মিল সে সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। কতকগুলো সেট-প্যাটার্ণ, সেট-রিদম, সেট-কার্ড-এর সমন্বয় হোলো এখনকার তথাকথিত পাশ্চাত্য সুর। সিমফনী অথবা চেম্বার মিউজিকের চিন্তা এতে নেই এবং চিন্তা করবার মত শিক্ষাও নেই।

রবিশঙ্করকে অনেকে পাশ্চাত্য সঙ্গীতঘেঁষা বলে মনে করেন। কিন্তু ওয়েস্টার্ণ মিউজিক এ্যাজ সাচ তাঁর সঙ্গীতকে কখনও ইনফ্লুয়েন্স করেনি। তিনি শুধু তাঁর ডিসিপ্লিনড প্রিন্সিপ্যালকে গ্রহণ করেছেন এবং এরই ফলশ্রুতি হালো তাঁর বাজনার অসাধারণ সুসংবদ্ধতা"।

"আচ্ছা তালকাছাড়ি ও আপনার আইডিয়া?" হ্যাঁ আমারই আইডিয়া। নানারকম তালযন্ত্র দিয়ে নানান ছন্দে যে কি ড্রামা হতে পারে সেটার প্রতিষ্ঠা করাই ছিলো আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু এর ব্যাপক প্রচার হোলো না, কারণ যাঁদের দিয়ে এ বস্তুর রূপায়ণ ঘটাব তাদের মধ্যে শিক্ষা ও চর্চার অভাব। জনপ্রিয়তাই সবসময় শ্রেষ্ঠতার মানদণ্ড নয়।"

বাংলাদেশে বর্তমান তবলিয়া-গোষ্ঠী সৃষ্টিতে আপনার একটা অনস্বীকার্য অবদান রয়েছে। আগে কোনো বড় বাজিয়ে কিংবা নাচিয়ের সঙ্গে তবলা বাজাতে হলে বেনারস থেকে তবলচি আনতে হোতো। এখন কোলকাতার তবলিয়ারাই সুন্দর সঙ্গত করতে পারেন। আপনার ক্লীকরো-এর বাড়ী এক সময় কোলকাতার শিল্পী ও সঙ্গীতরসিকতদের খুব আনন্দের জায়গা ছিলো। শেখা, শোনা, বড় বড় শিল্পীদের সংস্পর্শে আসা এইরকম নানাভাবে কোলকাতার শ্রোতাদের সঙ্গীতরুচি গড়ে তোলায় আপনার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে বলে শুনেছি।"

"গানকে আমরা ভালবেসেছি, তাই যখন যেভাবে তার গতি আমাদের টেনে নিয়ে গেছে গেছি। আনন্দের হাটের সঙ্গীতের কাছে আনন্দ দেওয়া-নেওয়া দুই-ই হয়েছে। কিন্তু আমি নিজেকে কখনও মিউজিশিয়ান বলে মনে করি না। আমি আজও সঙ্গীতের ছাত্র। এইখানেই আমার অহংকার। কেন? এদেশের নাম-করা সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীতস্রষ্টা, শিল্পী সকলের ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আসবার সুযোগ ঘটেছে। যাঁরা বড় তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলব তাঁদের দুর্বলতার খবরও আমি যতটা জানি ততখানি বোধহয় তাঁরা নিজেরাও জানেন না। অনেক বড় বড় শিল্পী আছেন, যাঁরা সঙ্গীতের কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিস্ময়কর রকমের বড় কিন্তু যতখানি প্রতিষ্ঠা তাঁরা পেয়েছেন ঠিক ততখানি প্রতিষ্ঠা পাবার যোগ্যতা তাঁদের আছে বলে আমি মনে করি না। কারণ তাঁদের ত্রুটি সম্বন্ধে হয় তাঁরা সচেতন নন, নয় তাঁরা ইচ্ছান্ধ হয়ে থাকেন। দৃষ্টি খোলা রেখে, নিজেদের দোষত্রুটি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে শিক্ষা দিয়ে যাঁরা নিজেদের অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করবার মত উদাম রাখেন তাঁদের আমি সেলাম করি। কিন্তু যাঁদের সেটুকু মনের প্রসারতা নেই, বড় প্রতিভার অধিকারী হয়েও তাঁরা নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেননি বলেই আমার ধারণা।

এখনকার সঙ্গীত? ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঐ এক কথাই বলব। কিছু প্রতিভা, কিছু দক্ষতা নিয়ে মোটামুটি একটা সার্থকতায় এঁরা পৌঁছে যান। তারপর এখান ওখান থেকে উপাদান নিয়ে জোড়াতালি দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছেন। আন্দাজের তীর কখনও লক্ষ্যভেদ করে, কখনও করে না। সব জিনিষই শিক্ষা সাপেক্ষ। সেটা যে এঁরা বোঝেন না তাও নয়। কিন্তু বুঝলেও প্রফেশ্যানালিজমের খোলস ছেড়ে নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা স্বীকার করবার মত নমনীয়তা সবার নেই—এবং একবার খ্যাতিতে প্রতিষ্ঠিত হলে থাকাটা সহজও নয়। অতএব একটা বড় কিছু ওলটপালট না হওয়া অবধি এমনই চলবে। তা যদি নাও হয় আপন নিয়মে আস্তে আস্তে এ-ধারার ওপর শিক্ষিত মনের অনীহা আসবে। তখন পরিবর্তন নিশ্চয় আসবে সবই চক্রবৎ পরিবর্তন্তে।

নিজের সম্বন্ধে আমি খুব্ই অহংকারী এই জন্য যে আমি আমার দক্ষতা এবং এবং অজ্ঞতা দুটো দিক সম্বন্ধেই সমান সচেতন। এবং সেই জন্যই বড়দের গুণের প্রতি আমি যতখানি নম্র যতখানি শ্রদ্ধাশীল ঠিক ততখানিই আলোচনা করার মত মনের জোর রাখি তাঁদের ত্রুটিগুলিরও। বেশী সমালোচনা করি এইজন্য যে এতবড় ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তাঁরা কেন নিজেদের ঘাটতির দিকটি সন্ধানী মন নিয়ে বিচার করবেন না? এ ঔদাসীন্য অমার্জনীয় অপরাধ। অনেক সময় ছোটদের কাছেও অনেক কিছু শেখা যায়। আমার অনেক ছাত্রও জানে না যে আমি তাদের ছাত্র। এইখানেই আমার জোর।"

সন্ধ্যা সেন

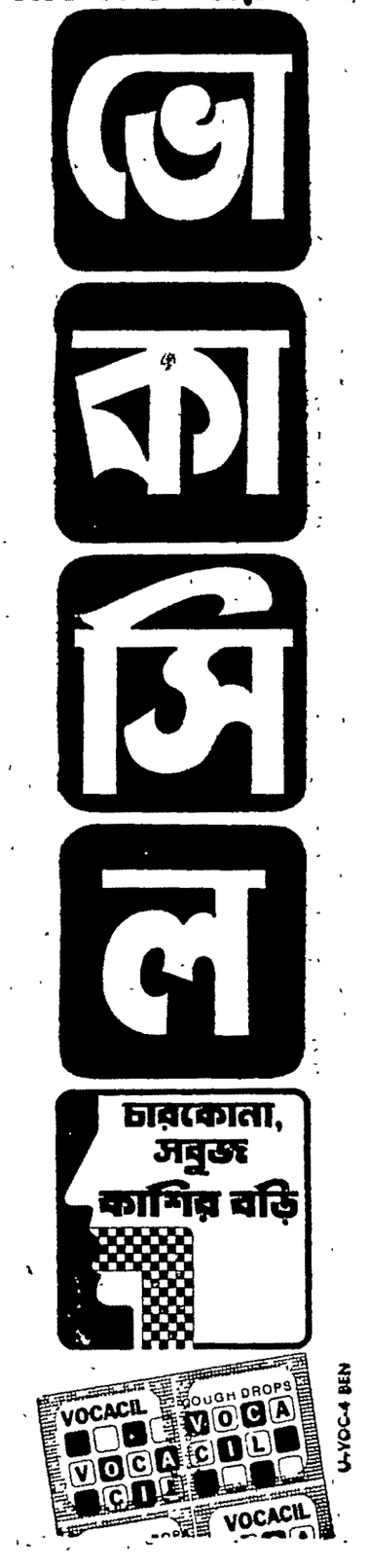

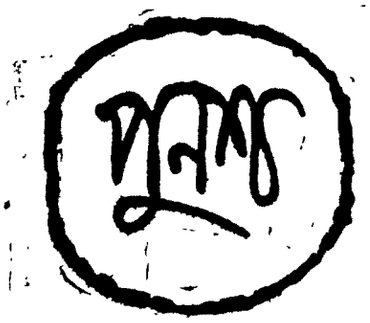

"প্রাচীন কলিকাতা"

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বাণিজ্য বিস্তারের প্রারম্ভ হইতে প্রাচ্য প্রদেশে ১৬২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজদিগের ভারতের সহিত কোনও বাণিজ্য সংসাধিত হয় নাই। তৎকালে তাঁহারা পূর্ব্বদ্বীপ ও তন্নিকটস্থ দ্বীপসমূহে কুঠি স্থাপন করিয়া রেশম, নীল ও সুগন্ধী মসলা ইত্যাদির বাণিজ্যে ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে যবদ্বীপস্থ কুঠি হইতে সংবাদ আইসে যে, ভারতের প্রস্তুত বস্ত্র এ-স্থানের লোকের বিশেষ প্রিয়। সুতরাং ঐ কঠিন অনুরোধে সুরাটে ও কলম্বে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করিয়া ভারতজাত বস্ত্রের বিনিময়ে এদেশে বহুলাভে দ্বীপসমূহে উৎপন্ন দ্রব্যসকল বিক্রয় আরম্ভ হইল।

এইরূপে ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হইল এবং বাণিজ্য উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজগণ শনৈঃ শনৈঃ ভারতের দক্ষিণপ্রান্ত ভাগে মান্দ্রাজে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করিলেন।...

এই সময়ে (আনুমানিক ১৫৬০ খৃঃ) বালেশ্বরের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ তদ্দেশে দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন বাণিজ্য কার্য্য একরূপ অসম্ভব স্থির করিয়া বঙ্গদেশে বাণিজ্যার্থ অগ্রসর হইবার নিমিত্ত ইংলণ্ডস্থিত প্রভুগণের আদেশের অপেক্ষা করিতেছিলেন। ...১৬৫১ খৃঃ দুইজন ইংরাজ হুগলীতে কুঠি নির্ম্মাণার্থ আগমন করেন এবং তৎপরবর্ত্তি মাত্র তিন সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে ইংরাজগণ বঙ্গদেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। এই সময় হইতে ১৬৫৭ খৃঃ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে বিশেষ অসুবিধা ও গৃহবিসম্বাদে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া মান্দ্রাজস্থিত কোম্পানীর উচ্চতর কর্ম্মচারীগণ বঙ্গদেশ হইতে চিরদিনের মত বাণিজ্য সম্বন্ধ পরিত্যাগ করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন। কিন্তু এই অব্দে প্রথম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও পরবর্ত্তী অন্য সম্প্রদায় উভয়ে মিশিয়া এক নূতন সম্প্রদায় পরিবর্ত্তীত হওয়ায় এই সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষগণ ক্রমওয়েলের অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়া বঙ্গদেশস্থ কুঠিসমূহের পুনঃ গঠনে প্রবৃত্ত হন এবং তাহার ফলে হুগলীর কুঠির অধীনে বালেশ্বর ও কাশিমবাজারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠির সংস্থাপিত হয়।

ইতোমধ্যে স্থানীয় শাসনকর্ত্তাগণের সহিত ইংরাজদিগের কুঠির কর্ম্মচারীগণের কিঞ্চিৎ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সংঘর্ষের ফলে কাশিমবাজারের কুঠির অধ্যক্ষ জব চার্ণকের উপর মুসলমান শাসনকর্ত্তার দৃষ্টি নিপাতিত হয় তিনি সৈন্যগণকে জবচার্ণকের উপর দৃষ্টি রাখিতে আদেশ করেন।

কিন্তু চার্ণক কোনক্রমে পলায়নকার্য্য শেষ করিয়া হুগলীর কুঠির আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইতঃপূর্ব্বে এই বিসম্বাদের সংবাদ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষগণ স্থানীয় শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিয়া, কতকগুলি পোতে সৈন্য প্রেরণ করেন। সৈন্যগণ ১৬৮৬ খৃঃ বঙ্গদেশে উপনীত হয় হুগলীর নিকটে সংস্থাপিত হয়। এদিকে সবিশেষ সংবাদ অবগত হইয়া, নবাব হুগলী নগর রক্ষার্থ তিন সহস্র পদাতিক ও তিন সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এই উপলক্ষে হুগলীতে দু'একটি ক্ষুদ্র সংঘর্ষ উপস্থিত হয়।...

বিসম্বাদের পর প্রায় দুই মাসকাল পর্য্যন্ত ইংরাজ হুগলীতে অবস্থান করিয়া অবশিষ্ট দ্রব্যাদি স্থানান্তরে প্রেরণ করিয়া অবশেষে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিলেন। হুগলী পরিত্যাগ করিয়া জবচার্ণক সুতানুটী গ্রামে উপস্থিত হইলেন ও নবাব সায়েস্তা খাঁর নিকট সন্ধির নিমিত্ত পত্রাদি প্রেরণ করিতে লাগিলেন। একজন সঙ্গতিপন্ন হিন্দু তাঁহার এই কার্য্যে সহায় হওয়ায়, তাঁরই সাহায্যে চার্ণক নবাবের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিতে সমর্থ হন। এই সন্ধিপত্রে চার্ণক দুর্গ ও টাকশাল নির্ম্মাণার্থ উপযুক্ত পরিমাণ ভূমি, মালদহের নষ্ট কুঠির পুনঃ নির্ম্মাণ, তাঁহাদিগের নিকট হইতে যে সকল অর্থ লওয়া হইয়াছে তাহার প্রত্যার্পণ, তাঁহাদিগের ঋণ পরিশোধ বিষয়ে সাহায্য ও বিনা শুল্কে নির্ব্বিবাদে বাণিজ্য করিবার অনুমতি দাবী করিয়া পাঠাইলেন।

এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া নবাব তিন ব্যক্তির উপর উক্ত বিষয় সকলের বিচক্ষণভাবে আলোচনা ও পর্য্যবেক্ষণের ভারার্পণ করিলেন ও ইংরাজদিগকে নির্ব্বিবাদে বঙ্গদেশে বাস করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন।...ইতোমধ্যে চার্ণক গার্ডনরীচের দুর্গ অধিকার করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ও কাপ্তেন নিকলসন হিজলী আক্রমণ করিয়া নিজ অধিকারে আনয়ন করিলেন। কিন্তু পরিশেষে নবাব সায়েস্তা খাঁর অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়া ইংরাজগণ পুনর্ব্বার সুতানুটী গ্রামে আসিয়া বাসস্থান স্থাপন করেন।

এদিকে ইংলণ্ডস্থিত কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ জনকয়েক কর্ম্মচারীর প্ররোচনায় চট্টগ্রামকে বঙ্গদেশের বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিণত করিতে বিশেষ সচেষ্ট হন। কিন্তু চার্ণক ভাগীরথীর তীরস্থ কোনও স্থান প্রধান কেন্দ্র হইবার উপযোগী বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। তিনি উলুবেড়িয়া, হিজলী ও হুগলী এই তিনটি স্থান বঙ্গদেশের বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হইবার পক্ষে কতদূর উপযুক্ত তাহা পরীক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনও না কোনও কারণে কোনটিই তাঁহার নিকট সুবিধাজনক বলিয়া মনে হয় নাই। অবশেষে চার্ণক সুতানুটীকেই প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রের উপযুক্ত স্থান বলিয়া স্থির করেন।

তিনি নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন যে, প্রথমতঃ ঐ স্থান আক্রমণকালে মুসলমানদিগকে ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইতে হইবে, সুতরাং বণতরী সহায়ে ইংরাজগণ তাহাদিগের গতিরোধ করিতে সক্ষম হইতে পারেন, এবং দ্বিতীয়তঃ তৎকালে এই স্থানের নদীর জল গভীর থাকাতে তথায় বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবজান সকলের লঙ্গর করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে।

এই সকল কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া চার্ণক সুতানুটীকে প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত সবিশেষ ইচ্ছুক হন। হুগলীতে অবস্থান করিবার পক্ষে এক প্রধান অন্তরায় এই যে, এ স্থান, স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ দ্বারা এত পূর্ণ যে, তথায় অবস্থান করিলে কোনও না কোনও বিষয়ে পুনরায় বিসম্বাদের সম্ভাবনা, এবং নদীতে এত জল নাই যে জাহাজ সকল তথায় অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে।

কিন্তু হীথ প্রমুখ কর্ম্মচারীগণের সনির্ব্বন্ধ চেষ্টায় বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ চার্ণককে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া চট্টগ্রামকে বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত করিতে আদেশ করেন ও তারই ফলে ইংরাজদিগকে দিনকয়েক বহু স্থান ঘুরিয়া ও বিশেষ কষ্ট ভোগ করিয়া অবশেষে মান্দ্রাজে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ইংরাজদিগের এই ব্যবহারে সম্রাট আরংজেব প্রথমে বিশেষ বিরক্ত হন, কিন্তু তাঁহাদিগের বাণিজ্যের ফলে মোগল রাজকোষের উন্নতি প্রভৃতি স্মরণ করিয়া নবাব সায়েস্তা খাঁকে পত্র লেখেন।

কিন্তু তৎকালে সায়েস্তা খাঁ বঙ্গের নবাব ছিলেন না। তিনি ইতঃপূর্ব্বে পদত্যাগ করিয়াছিলেনও তৎপরিবর্ত্তে বাহাদুর খাঁ অস্থায়ীভাবে ঐ পদে কার্য্য করিতেছিলেন। মোগল দরবারী প্রশংসা প্রাপ্তির আশায় বাহাদুর খাঁ ইংরাজদিগের কতিপয় কুঠি বাজেয়াপ্ত ও কর্ম্মচারীদিগকে বন্দী করিয়া রাখেন। এক্ষণে সম্রাটের পত্র প্রাপ্তি মাত্রে তৎপরবর্ত্তী সহৃদয় নবাব ইব্রাহিম খাঁ তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া মান্দ্রাজস্থিত ইংরাজগণকে কলিকাতা প্রত্যাগমন করিতে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান (১৬৯০ খৃঃ) তাঁহার আমন্ত্রণ অনুসারে ইংরাজগণ ঐ সালে ২০শে আগষ্ট তারিখে কলিকাতায় পুনরায় পদার্পণ করেন এবং ১৬৯১ খৃঃ ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সম্রাটের নিকট হইতে যে অনুমতি-পত্র আইসে, তাহাতে ইংরাজগণ বার্ষিক তিন সহস্র মুদ্রা প্রদানে বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন।

এইরূপে ইংরাজগণ কর্ত্তৃক বর্ত্তমান কলিকাতা সংস্থাপিত হয়।

ক্ষপণক

উপন্যাস

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আদ্য শেষ রজনী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যাতায়াত, খাই-খরচ—সবই ওদের।

বিলকুল রাজি।

মেনু বলে দিয়েছো?

হুঁ। তোমার জন্যে ঝিঙ্গে দিয়ে ডাল সেদ্ধ। নিমবেগুনে—

শুধু আমার জন্যে নয়। সারা গ্রুপের জন্যে। রাত জেগে তেতেপুড়ে বাসে গিয়ে হাজির হতে হবে। তখন ঘাল রান্না খেলেই শরীরটি যাবে।

সব বলেছি দাদা।

নগদ আড়াই হাজার টাকা গুণে আগাম দিয়ে যেতে হবে। ফুল পেমেন্ট—তবে গ্রুপ যাবে।

ফুল নিয়ে এসেছে।

ক্যাশতো?

সব ক্যাশ। ওরা একটা কথা বলছিল দাদা। ওদের প্রাইমারি স্কুল বিল্ডিং হবে। কিছু কনসেসন চাইছে।

শো হয়ে যাবার পর আমাদের নামে ডোনেশন অ্যানাউন্স করা হবে স্টেজে। তার আগে নয়।

তাই হবে দাদা।

পেপার পাবলিসিটি একদম বন্ধ করে দাও শংকর।

তবু রেহাই পাবে না দাদা। অন্তত দশ লক্ষ লোক আমাদের নাটক দেখেছে। তারাই মুখে মুখে পাবলিসিটি দিয়ে বেড়াচ্ছে। কি করে তাদের রুখবে?

সব কন্ত্রু দেখে এগ্রিমেন্টে সই করবে।

শংকর চলে যেতে অমিয় মনে মনে হিসেব করে দেখলো। হাউজের শো আর কলশো মিলিয়ে তা লাখ দশেক লোক দেখেছে। সত্যি তো এদিকটা ভাবেনি অমিয়। লাভপুরে শীতকালের রাতে শো করতে স্টেজে উঠে দেখে—কম্ফটা আর র‍্যাপারে মুড়ে হাজার হাজার মানুষ টুক টুক করে এসে ত্রিপলে বসে পড়ছে। এরা যদি গাঁয়ে-গঞ্জে 'সুজাতার' কথা বলে বেড়ায় তাহলে পাবলিসিটি কে আটকে রাখবে। প্রত্যেকে এক-একজন মোবাইল পাবলিসিটি অফিসার। কেউই খবরের কাগজের প্রেফ বিজ্ঞাপনের টাইপ বা লেখা নয়। ওদের তো থামানো যাবে না। আর আছেন—হাওড়া শেয়ালদার নিত্যযাত্রীরা। এরা নাটক দেখে ফেরার পথে কামরায় বসে গল্প করে। বাকিরা শোনে।

যাতায়াত খাই-খরচা বাদে নগদ ছয় হাজার টাকা। আগে ছিল এই রেট। অসুখ থেকে উঠে অমিয় ভিড় কমাবার জন্যে, নাটক তুলে দেয়ার মতলবে এক লাফে পার নাইট রেট বাড়িয়ে আট হাজার করেছিল। ভেবেছিল, চড়া রেট দেখে অনেকেই কেটে পড়বে। কিন্তু সেরকম কোন লক্ষণ তো দেখা যাচ্ছে না।

রজনী এল বারোটা নাগাদ। আজকাল অমিয়র জন্যে ডাক্তারের কথা মত ডায়েট তৈরি করে আনে বাড়ি থেকে। লাঞ্চও একই ধরনের খাবার দিয়ে দেয় অমিয়র গাড়িতে। শো না থাকলে—বেলা এগারোটা থেকে দেড়টা দুটো অবদি খুচরো কাজগুলো সেরে ফেলে দুজনে মিলে। একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবপত্র দেখে দেন। ইনকাম ট্যাকসের জন্যে হিসেবপত্র তৈরি করতে হয়। তাছাড়া থাকে রিহার্সেল। পুরো মিউজিক হ্যান্ড সমেত স্টেজ রিহার্সেল। সাধারণত বুধবার হয়ে থাকে ব্যাপারটা। তখন দর্শকহীন অডিটোরিয়ামের সামনে খোলা মঞ্চে পুরো অভিনয়। এটা চালু করতে হয়েছে দুটো কারণে। এক : সফল নাটকে সবচেয়ে বড় দোষ যা—সেই ওভার কনফিডেন্সের নেশায় অনেকেই স্টেজে উঠে ভীষণ চড়া পর্দার অভিনয় করতে শুরু করেছে। এমন কি ডায়ালগের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে ডায়ালগ দিচ্ছে। অ্যাকশনেও বাড়াবাড়ি চলছে। দুই : গলার মডুলেশন নিয়মিত চর্চার ভেতরে না রাখলে স্টেজে উঠে যে যার ইচ্ছেমত করতে থাকে। তার ফলে কোন সিনেই পূর্ণ কমপোজিশনের চিহ্ন থাকে না। ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় ঢিলেঢালা।

এছাড়া থাকে আলো, সাউন্ড ঠিক করার কাজ। রজনী মাঝে মাঝে মিউজিক-এর সঙ্গে গলা মিলিয়ে দেখে। অন্যদের নাচের দুটি সিকোয়েন্স মাঝে মাঝে রিহার্সেল দিয়ে দেখা হয়।

একটি পুরোদস্তুর প্রতিষ্ঠানকে চালু রাখতে সব সময় নজর রাখতে হয় সবদিকে। অমিয়র মনে হচ্ছিল—সে একটা জমিদারি সেরেস্তায় বড় নায়েব সেজে ইজিচেয়ারে শুয়ে আছে। হাফ রিটায়ার্ড। কেননা, সুজাতা নাটকে তার মাথার পরিশ্রমের দিন ফুরিয়ে গেছে। এখন স্নাতের মত দিব্যি গড়িয়ে এ-নাটক চলবে। এই চলায় তার কোন কেরামতি নেই। ভালো টিমওয়ার্ক আর টাকার জোগান থাকলেই সব চালু থাকবে।

কথামত বিকু দত্ত এল ঠিনটে নাগাদ।

রজনী সাজঘরেই বসালো বিকুকে। লেমন-বার্লির সরবৎ দিয়ে বলল, আজ তৈরি হয়ে আসেনি মনে হচ্ছে।

ওরে বাবা! তা হয় নাকি। জিনিসপত্র খেয়ে কি নতুন নাটক শোনা যায়।

একথা বলায় সে চোখ নামিয়ে ফটনয়হর'

আজ শোনাবে ঠিক করেছো? অমিয়কে একথা বলায় সে চোখ নামিয়ে বোকালো, হ্যাঁ।

নিউ রামকৃষ্ণ ভাণ্ডার

• বেনারসী • জোড় • ফ্যান্সী শাড়ী ও সর্ব ভারতীয় তাঁত বস্ত্র

৫৪৫/১, জি. টি. রোড (সাউথ) হাওড়া।

ফাঁকা স্টেজে সুজাতা নাটকের বেড-সিনের বিছানা পালংক মজুত। তাতে বসলো অমিয়। হাতে 'সম্রাট' নাটকের মোটা বাঁধানো খাতা নিয়ে পড়তে লাগলো। উল্টো দিকে বিষ্ণু। সাধারণ ইজিচেয়ারে। সামনে কয়েকশো ফাঁকা চেয়ার। যেগুলো অন্য দিন দর্শকে ভর্তি থাকে।

সম্রাট নাটকের সময়—প্রাচীনকাল।

পাত্রপাত্রী—সম্রাট, সম্রাজ্ঞী, মন্ত্রী, সেনাপতি, শ্রেষ্ঠী, কবি, নটী, গুপ্তচর, দূত ঘাতক।

বিষয়বস্তু—সম্রাটের স্বেচ্ছাচার, নৃত্যলিপ্সা, সঙ্গীতপিপাসা।

অভিনয়ের সময় প্রায় পৌণে তিন ঘন্টা।

শুনতে আরেকটু বেশি সময় লাগলো। একটানা পড়ে গিয়ে অমিয় হাঁফাচ্ছিল। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। গরম। বিষ্ণু গায়ের জামা খুলে ফেলল। এখানে অভিনয় কর কি করে? এ যে একদম ফারনেস।

হয়তো এয়ারকণ্ডিশন করে ফেলা যেত। কিন্তু শ্রীরাম ট্রাস্ট পারমিশন দেবে না। ওরা আমাদের তুলে দিতে উঠে পড়ে লেগেছে।

ভাড়া পাচ্ছে তো।

আরও বেশি ভাড়ার লোভে। আগে কেউ ভাড়া নিত না। আমরা ঝুঁকি নিয়ে জায়গাটা চালু করলাম। তারপরই ওদের চোখ খুলে গেছে। আরেকটা কথা বলি বিষ্ণু। এরকম গরমেই তো আমরা চিরকাল অভিনয় করে আসছি। বাহুল্য বলবো না। কিন্তু জিনিস বাড়ালেই বাড়ে। এই ফারনেসই আমাদের অন্তত দশ লক্ষ টাকা দিয়েছে—

দুজনই খানিক চুপ করে থাকলো। এমন সময় রজনী নীলদর্পণের সেই গানের কলি গলায় তুলে উইংসের পাশ দিয়ে স্টেজে ঢুকলো। হাতে বড় প্লেটে ক্যান্টিনের দুটো পেস্তা আইসক্রিম।

তুমি নেবে না?
গলা ভালো নেই।

চেটেপুটে আইসক্রিম শেষ করে বিষ্ণু বলল, নাটক তো দুর্দান্ত হবে। কিন্তু স্টেজ, কসটিউম, সাউন্ড, ভয়েস—

ভরত হাউসের স্টেজে এ-জিনিস হবে না। আরও বড় স্প্যান চাই। কলামন্দির দরকার।

সুজাতা ছেড়ে কখন করবে?

সুজাতা একদম ছেড়ে দিলেই ভালো হয়। কিন্তু পারছি কোথায়? আরও জড়িয়ে যাচ্ছি। ভেবেছি—বুধবার বুধবার ডেট নিয়ে কলামন্দিরে করব। কিন্তু আজকাল তো বুধবারও কলশো থাকে। না রেখেও উপায় নেই। এতজন লোকের মাইনে, মেডিকাল বিল, পেট্রল, ড্রাইভারদের ওভারটাইম, ট্যাক্স, পারমিসিটি!

শুনলে বিষ্ণু! সুজাতা নাটক তুলে দিতে চায় অমিয়।

বিষ্ণু রজনীকে বলল, এরাবতো তোমরা বলবে—তাহলে আমরা খাবো কি!

জায়গাটা গম্ভীর হয়ে গেল। অতখানি নাটক একটানা পড়ে যাবার ধকলে অমিয় চুপচাপ রেস্ট নিতেই চাইছিল। মনে মনে বলল, গ্রুপ থিয়েটার আসলে জিনিসটা কি? অভিনয়? না, যশোলিপ্সা? ভাবত হলের লনে টবে টবে দোপাটির পাশাপাশি কাঁচালঙ্কা লাগানো হয়েছে। কয়েকটা গাছের পাতা কেন যে কুকড়ে যাচ্ছে।

রজনী এতক্ষণে কথা বলল। সম্রাট নাটক স্টেজ হলে অমিয় যে কোথায় উঠবে কে জানে। চিরকাল ওর নাম থাকবে। আমি পড়েছি। এত কাজের ভেতরেও কখন যে টুক টুক করে লিখে ফেলেছে। ভাবলে অবাক লাগে। আর ওরকম নাটক।

সম্রাটের কসটিউম ভেবেছি—মাথায় এলোমেলো চুল কপালে এসে পড়েছে। গায়ে সোনালী সুতোর কাজ করা শাদা কুর্তা। হাঁটুর শেষ থেকে চামড়ার পটি মোড়া জুতো। মনিবন্ধে একটা বড় পাথর। মুখে হাসি। হাতে কাঠের বিরাট সরাবদানী। চোখে আচ্ছন্নভাব। গমগমে গলা। ঘাতককে হত্যার আদেশ দিয়ে ইচ্ছে হোল তো এক পাক নেচে নেবে। ক্ষমতাপ্রিয় খেয়ালী একজন মানুষ যেমন হয়।

এই রোলে তাহলে তোমাকে আর জুলপি লাগাতে হচ্ছে না।

বিষ্ণুর একথায় অমিয় হাসলো শুধু। অভিনয়ের সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়তেও কোন বাধা নেই। কি বল?

সম্রাট চরিত্র এ নাটক পণ্যমুখ গ্রুপেরও নিয়তি।

রজনীর একথায় অমিয় সোজা হয়ে বসল। বোজ আমরা পশুর মত একটা বাসি নাটকের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি। সেই সুবাদে দুটো ভালো খেতে পাই। খানিক গাড়ি চড়তে পারি। নিজেদের শিল্পীও ভাবি। দিনের শেষে টাকাও গুনি। বিষ্ণু আজকাল আমার কণ্ট হয় ভীষণ। আমি আর পারছি না। একঘেয়ে ক্লাপ। একঘেয়ে কলশো। তার আবার বায়নাপত্র! আমাদের ভালো কবে বাঁচা দরকার বিষ্ণু। অন্তত একদিনের জন্যেও—

বলতে বলতে হাঁফাচ্ছিল অমিয়। এমন সময় স্টিল ফটোগ্রাফার হরিহর এসে হাজির। তার সঙ্গে কমার্শিয়াল আর্টিস্ট অবনী সান্যাল। অবনীর নালিশ, হিন্দি কাগজের জন্যে স্টিল ছবি নিয়ে সে যেসব বিজ্ঞাপনের ডিজাইন দিয়েছে—তার ভেতর ছবির নিচে হরিহর ছোট হরফে তার নাম দিতে চাইছে। এটা কি চলে?

সব শুনে অমিয় বলল, তুমিই রায় দাও বিষ্ণু। এই বাসি নাটকের বিজ্ঞাপন মেটিরিয়ালে ছবির জন্যে নাম দেওয়ার হ্যাংলামিও মানুষের থাকে?

নাম জিনিসটা বড় দুর্বল ব্যাপার। এ দুর্বলতা কাটানো কঠিন অমিয়।

রজনী বলল, হরিহরদা তুমি তো আজ আমাদের ছবি তুলছো না। আমিই তোমাকে এনেছি এখানে।

সুজাতা নাটকের অ্যাড ডিজাইনে নাম থাকলে দিদি আমার দুটো কাজ পেতে সুবিধে হয়।

অবনী মুখিয়েই ছিল। তাহলে আমারও নাম যাবে ম্যাট্রিকসের নিচে।

অমিয় বলল, যার যত ইচ্ছে নাম দিয়ে নাও। এ-নাটক যদি আমি তুলে না দি তবে আমি বাপের সুপুত্তুরই না।

কিছুই বুঝতে না পেরে হরিহর অমিয়কে তোয়াজ করতে গেল। এ নাটক দাদা আপনার পাঁচ বছরেও তুলতে হবে না। দিব্যি গড় গড় করে চলে যাবে। আপনি জায়গা দেখুন। হাউস বানান। সুজাতা নাটকই সব করে দেবে।

সেইটেই বাকি আছে হরিহর। তুমি এখন যাও। আমাদের এখন এখানে একটু কথা আছে।

ওরা চলে যেতে রজনী বলল, তুমি হঠাৎ করে বাসি নাটক বলে চেঁচিয়ে বেড়াচ্ছো কেন?

বাসি লাগলে বাসি বলব না?
কিসে বাসি?

সবটাতেই। এখন এই পৃথিবীতে সুজাতা নাটকের মোদ্দা কথাটা খুব পুরনো নয়কি? পৃথিবী কি অনেক এগিয়ে যায়নি? লোকের ভালো লাগছে তাই। নইলে নাটক হিসেবে এমন কি নতুন কথা বলতে পেরেছি এ নাটকে। নেহাৎ তোমার মত অভিনেত্রী রয়েছে তাই। নইলে কবে এ-নাটক ভেসে যেত।

তাহলে এ-নাটক করবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিলে কেন?

তখন তো রজনী আমার রয়ে বসে ভাববার সময় ছিল না কোন। পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছি। কোন্ ফরমুলায় গেলে বকস অফিস জাগতে পারে—সে-পথই খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম। দাঁড়াবার জায়গা খুঁজছিলাম। সুজাতা নাটকের বছর ঘুরে গেল। এখন আমরা দম নিতে পারি। ভাবতে পারি রয়ে বসে।

তাহলে এতদিন আমরা খারাপ ধরনের কমার্শিয়াল কাজ করে আসছি?

তা বলব না রজনী। ইন্টারপ্রিটেশনের ওপর অনেকটা নির্ভর করে। খুব সাধারণ ডায়ালগ বলার গুণে ভেতর থেকে নতুন নতুন মানে টেনে বের করবে। দর্শকের চোখের সামনে উঁচুদরের অ্যাকটর সাধারণ সংলাপ থেকে অসাধারণ কথা তুলে ধরেন। আমাদের নাটকে গত এক বছরে সেই ব্যাপারটা হয়েছে। আমাকে আগাগোড়া তোমার সঙ্গে লড়াই করতে করতে স্টেজে

টিকে থাকতে হয়। তোমার ডেলিভারি রজনী কারও সঙ্গে তুলনা হয় না।

আমার কথা বাদ দাও অমিয়।

বাদ দেবার নয় রজনী। বাঙ্গালী জানে, তাদের চোখের সামনে ভরতহলে বাঙ্গালীর শেষ বড় স্টেজ অ্যাকট্রেস অভিনয় করে যাচ্ছেন। তোমার সাইজের অভিনেত্রী এখন স্টেজে আর কেউ নেই। অথচ আমাদের কিন্তু আরও ভালো নাটক দিয়ে তোমাকে কাজে লাগানো উচিত। এখনো তোমার ভেতরকার সবটুকু দর্শক পায়নি। তেমন নাটক হলে তুমি জেগে উঠবে। তোমার ভেতরকার ঘুম পুরোপুরি ভাঙবে। তখন তোমার সঙ্গে এঁটে ওঠার মত লোক স্টেজে পাওয়া যাবে না।

আমি খুব ফ্ল্যাটার্ড বোধ করছি।

করার কোন কারণ নেই রজনী। দেশটা ভালো নাটক এখন পায় না বেশি। তাই ভুল জায়গায় পদক, মানপত্র, নৈবেদ্য চড়াচ্ছে। তাতে অবশ্য কোন ক্ষতি নেই তোমার। ক্ষতি ওদেরই। দেশের লোক তো তোমাকে নিয়েছে। গায়েগলে দশ-বিশ হাজার মানুষ তো হ্যাজাকের আলোয় চোখের পলক না ফেলে তুমি কি কর তাই দেখে রজনী। কী বল তাও শোনে।

আমার কথা থাক। আসল কথা হল—সম্রাট যদি না চলে? তখন?

তখন? আবার রাস্তায় দাঁড়াব।

এতখানি সিকিউরিটি থেকে বেরিয়ে আবার রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে পারবে?

কী ছিল আমাদের রজনী। কিছু স্বপ্ন। এবং কিছু দেনা। এখন কী আছে? বন্দীর নিরাপত্তা! আর বিপুল পরিমাণে স্বপ্নহীনতা। কোন কল্পনা নেই। কোন আবিষ্কার নেই। কোন অনুসন্ধান নেই। উন্মোচনও নেই। আজকাল আমি স্বাধীনের রোলে যা ইচ্ছে ভাড়ামি করি—তাই-ই পাবলিক খায়। ডবল এনকোর দেয়। ক্ল্যাপ পড়ে। আসলে জনপ্রিয়তার অন্য নাম তো—কবন্ধ দৈত্য।

এখানে বিকু একাই ক্ল্যাপ দিয়ে উঠলো। একটা টেপ রেকর্ডার থাকলে খুব ভালো হোতো অমিয়। তোমাদের দুজনের এই ডায়ালগগুলো তুলে দিয়ে আমি একখানা নাটক লিখে ফেলতে পারতাম। রাতারাতি নাট্যকার হয়ে যেতাম।

এসব প্রশ্ন লেখক, নাট্যকার, অভিনেতা, গাইয়ে, ছবি আঁকিয়ে—সবাইকেই কুরে কুরে খাবে বিকু। সফল না-হওয়ার যন্ত্রণা যেমন আছে—সফল হওয়ার যন্ত্রণাই তেমনি থাকবে। যে হাইজাম্পের রেকর্ড করে—সে নিজে নিজেই রেকর্ড ভাঙতে তৈরি হয়। সে নিশ্চিত জানে, ভাঙতে না পারলে জরা এসে তাকে ধরবে।

এত জেনেশুনে তুমি অভিনয় কর কি করে? অসুবিধা হয় না।

তুমি এ প্রশ্ন করছো কি করে রজনী? স্টেজে উঠেও কি তুমি ভুলতে পারো—তুমি আসলে একজন অন্য লোক—যার নাম রজনী দত্ত। যার মা ছিলেন—নীহার। যার বাড়ি গিরীশ পার্কের উল্টোদিকে। যার বাবা একটুর জন্যে বম্বে ছবির পৃথ্বীরাজ কাপুর কিংবা জাগীরদার হতে পারেনি। যে শৈশবে শ্রীরঙ্গমের সাজঘরে সিনটানার ছেলেদের সঙ্গে খেলে বেড়াতো। যার স্মরণে এখনো অন্তত তিরিশখানা বিখ্যাত বাংলা নাটকের সংলাপ গানসমেত ধরা আছে। আসলে রজনী অভিনয় মানে বোধহয়—নিজের স্মৃতি, নিজের সংস্কার ফুটলাইটের সামনে দাঁড়িয়ে মুহূর্তে ভুলে যাওয়া। বিপুল বিস্মৃতির নামই অভিনয়। কিংবা অন্যের চরিত্রে সাময়িক বাসা বাঁধাই সম্ভবত অভিনয়।

হবে। আমি অতশত বুঝি না। উইংসের পাশ দিয়ে স্টেজে ঢুকেই আমি অন্য লোক হয়ে যাই।

না জেনেই রজনী তুমি তোমার এতদিনকার স্মৃতি থেকে ভ্রষ্ট হও। তাই অত সহজে সুজাতা হয়ে যাও। অত সহজে ঠাকুরঝি হয়ে যেতে পারো।

বিকু উঠে দাঁড়ালো। আজ খুব জ্ঞান হোল অমিয়। আমায় তোমাদের দলে নাও না। অনেক কিছু শিখে ফেলবো তাহলে।

ফর্ম ফিল-আপ করে দিয়ে যাও। রিহার্সেলে কিন্তু সময় মত আসতে হবে। টিফিন পাবে। গাড়িভাড়া পাবে।

কোন্ রোল দেবে?

সম্রাটে সম্রাট কর।

মানাবে কেন অমিয়।

খুব মানিয়ে যাবে।

সেইটেই বাকি আছে। আজ আসি রজনী।

তোমার গিন্নির খবর কি? তাকে তো আনলে না।

আনবো একদিন। সময়ই হচ্ছে না। অমিয় তোমার ড্রাইভারকে একটু বলে দাও। আমায় ছেড়ে আসবে।

আমাকে বলতে হবে না। তুমি বললেও যাবে।

ফাঁকা স্টেজে দুজনে মুখোমুখি বসে থাকলো। সেই লক্ষ্মী পায়রা দুটো আবার অনেক দিন পরে পাখা ঝাপটে ভরত হলের আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল।

অমিয় বলল, আমার গিন্নির তো তুমি কোন খোঁজ নাও না?

লীলা? বড় ভাল মেয়ে।

প্রোটেই ভালো না। তোমায় খুব হিংসে করে।

লীলার জায়গায় আমি হলে—আমিও করতুম। তারপর একটু থেমে থেকে রজনী বলল, ওকে জানিয়ে দিও—আমাকে নিয়ে হিংসে করার কিছু নেই। তুমি তো এখন আমাকে অনেকটা জানো। তুমিই লীলাকে বলতে পারো।

কি বলব?

তোমার সঙ্গে আমার কিছু হবার নয়। জীবনের এত দেরিতে দুজনের দেখা। এখান থেকে আর কিছু শুরু হয় না। এখন যা হয়—তা হল, খানিকটা ইন্টে, খানিকটা কন্টে।

তবু বলে দাও কি বলব রজনী?

এই তো বললাম। তুমি ডায়ালগ লেখো। তুমিই এসব কথা সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে লীলাকে বুঝিয়ে বোলো।

আমি যে তোমায় ভালবাসি রজনী।

আমিও হয়তো। আর কি কর আমাকে?

অভিনেত্রী হিসেবে শ্রদ্ধা না করে পারিনে রজনী।

লীলাকেও তো ভালোবাসো?

তাও বাসি। সেকথা কেন অস্বীকার করবো।

অস্বীকার করতে বলছে কে? এজন্যই তো তোমাকে ভালো লাগে। তুমি পরিষ্কার লোক বলে তোমাকে অমিয় আমার আরও ভালো লাগে।

একজন কি দুজনকে ভালবাসতে পারে না রজনী? দরকম করে?

কেন পারবে না। তুমিই তো তার প্রমাণ। যদি আগে দেখা হত তোমার সঙ্গে।

কি হত তাহলে? কিছুই হত না রজনী।

জীবনটা অন্যরকম হয়ে যেত।

(ক্রমশঃ)

আজকের বিশ্বে কোন দেশই একা
নিজের অস্তিত্ব রক্ষা ক'রতে পারে না।
প্রত্যেক দেশকেই তার বিবেকসম্পন্ন
সহযোগীর অবিচ্ছিন্ন বিনিময়ের উপর আস্থা
রাখতে হয়। রাষ্ট্রের সংগে রাষ্ট্রের এই
সহযোগিতার মধ্য থেকেই সৃষ্টি হয়
পারস্পরিক বোঝাপড়া, বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব
এবং তখনই বিশ্বে গড়ে ওঠে
প্রগতি আর শান্তি।
সহযোগিতা ও বন্ধুত্বই হচ্ছে সাগর
পেরিয়ে দেশ-দেশান্তরের মধ্যে
মজবুত সেতু।
ফেডারেল প্রজাতন্ত্রী জার্মানী—
এক নির্ভরযোগ্য সহযোগী।

সহযোগিতা
মৈত্রী
গড়ে তোলে

ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানী
—এক নির্ভরশীল সহযোগী

ফেডারেল রিপাব্লিক অফ জার্মানীর কনসুলেট জেনারেলের তথ্য ও সংবাদ বিভাগ
৯, হেস্টিংস পার্ক রোড, কলিকাতা-২৭ কর্তৃক প্রচারিত।

রঙ বদলায়

মিতা দে বিশ্বাস

সন্ধেবেলা বাড়ী ফিরে সামনের ছোট বারান্দাটায় গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল পিংকি। এইমাত্র ও ফিরেছে বাড়ীতে। আজ ফিরতে বেশ দেরী হয়ে গেছে। তাই মার কাছে বকুনীটাও কিছু কম খেতে হয়নি। ওঃ মা যা বকতেও পারে। অথচ মা যে কেন ওকে এত বকে তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না পিংকি। কৈ দিদিতো কতদিন অনেক রাত অবধি বন্ধুর বাড়ী যাচ্ছি বলে দিব্যি কাটিয়ে আসে। মা তো তখন কিছু বলে না? যত দোষ যেন সব পিংকির বেলায়। দিদির কথা মনে পড়তেই মনে মনে একটা ভেংচি কাটল পিংকি। বেশ আছে দিদিটা দেখলে ভীষণ হিংসে করতে ইচ্ছে করে ওর। কেমন রতনদার হাত ধরে দিব্যি বেড়িয়ে বেড়ায় এখানে-ওখানে। কেউ কিছু বলে না ওকে। আর পিংকি? একদিন সামনের বাড়ীর তনুর সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিল শুধু মা ওকে। বাবাঃ তারপর যা বকুনী খেতে হয়েছিল ভাবলে এখনো যেন কান্না পায়। আর তারপর থেকেই মা ওকে সব সময় চোখে চোখে রাখতে চায়। একটু চোখের আড়াল হলেই সঙ্গে সঙ্গে হাজির কৈফিয়ৎ। কেন রে বাবা আমি কি দোষ করলাম? তনুর কথা মনে হতেই একটা শিহরণ খেলে গেল পিংকির শরীরে। আর ওপর যে রাগটা এতক্ষণ জমা হয়েছিল সেটা যেন একমুহূর্তেই উড়ে গেল পিংকির মন থেকে। ইস তনু নামটা কি সুন্দর এই নামটা কেন যে এত ভাল লাগে পিংকির!

ঝর্ণাদি সেদিন ওকে বলেছিল, তনুকে তুই আসলে খুব ভালবাসিস তাই ওর নামটা তোর এত ভাল লাগে। সত্যিই কি তাই? কি জানি? পিংকি একবার নিজেকে প্রশ্ন করল, তাহলে এরই নাম কি ভালবাসা? আমি কি তাহলে তনুকে ভালবাসি?

অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে পিংকি ঠোঁট নেড়ে অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করল একবার ভালবাসা শব্দটা। কি যেন একটা আকর্ষণ আছে এই ছোট্ট শব্দটার মধ্যে কেন এমন লাগে তা নিজেই বুঝতে পারে না পিংকি শব্দটা তবু যেন ওকে অন্ধের মত টানে। আকর্ষণটাকে সে কিছুতেই এড়াতে পারে না।

আজ সিনেমাটা দেখতে দেখতে তনু ওকে খুব কাছে টেনে নেবার চেষ্টা করেছিল। ইস তনুটা যেন কি? ওপাশে-এপাশে কত লোক বসে। তার মধ্যে যাঃ! হঠাৎ লজ্জা পেয়ে দু হাতে মুখ ঢাকল সে। এই মুহূর্তে অন্ধকারটাকেও ওর যেন ভীষণ লজ্জা করতে লাগল। পিংকির মনে হল ও যেন একেবারে বুকে ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে একটা পুরুষের। আর সেই পুরুষটা যেন অন্ধকার।

তনু ওকে প্রায়ই বলে তুমি ভীষণ লাজুক মেয়ে পিংকি। এত লাজুক হলে চলবে কি করে? আমার মোটেই এত লাজুক মেয়ে ভাল লাগে না। পিংকি তাই অনেকবার ওর লজ্জা কাটাবার চেষ্টা করেছে। খুব চালাক চতুরের মত কথা বলার চেষ্টা করেছে। তনুর সঙ্গে। কিন্তু তনুর সামনে গেলেই একরাশ লজ্জা ঘিরে ধরে পিংকিকে। কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারে না।

সেবার রাসের মেলায় গিয়ে তনু ওকে একটা খুব সুন্দর জিনিস কিনে দিয়েছিল মনে পড়ল। একটা ছোট কানের দুল। পিংকি খুব সাবধানে সেটা তুলে রেখে দিয়েছে ওর একান্ত নিজের ছোট হাত বাকসটার ভেতরে।

কতদিন তনু ওকে জিজ্ঞাস করেছে সে দুলটা পিংকি পরেনি কেন একদিনও? একথা সেকথা বলে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে পিংকি। মা দেখলে খুব বকবে একথা তো বলা যায় না। লজ্জা করে বলতে তনু হয়তো বলে বসবে, তুমি খুব ছেলেমানুষ পিংকি। আর তখন খুব লজ্জা করবে পিংকির।

পিংকি অনেক সময়ই দেখেছে তনু ওকে খুব ছেলেমানুষ মনে করে কথা বলে। এজন্য খুব রাগ হয় পিংকির আহা, তনু যেন খুব বড় র সবে তো এ বছর হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করে কলেজে ঢুকেছে।

পিংকি এখন এইটে পড়ে, কিই বা এমন ছোট পিংকি তনুর চেয়ে? অথচ তনু এমন বিজ্ঞ ভাব দেখায় যেন কত বড় হয়ে গেছে ও।

পিংকির কানে এল দিদির গলা দিদি মাকে ডাকছে তাহলে নিশ্চয়ই রতনদাও

'উজ্জ্বল' শুভ্রতার জন্যে

সুপ্রীম ডেট ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার কেক

নতুন উন্নততর ডেট কেক বাজারের সেরা ডিটারজেন্ট কেক।

এতো পরিষ্কার করার ক্ষমতা, এতো ফেনা ও সুগন্ধকে হার মানায়,কাপড় ধোয়ার এমন কোন কেক আর নেই।

ব্যবহার করে দেখুন। তফাৎ বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, 'উজ্জ্বল' শুভ্রতার জন্যে সুপ্রীম ডেট কেক।

ধবধবে সাদা, ডেটের সাদা

Shilpi DM 7A/76 Ben

সঙ্গে এসেছে। দিদিকে জমা করে দিয়ে তবেই তো রতনদার ছুটি। আর এও পিংকি লক্ষ্য করেছে মা রতনদাকে যত্ন করে খুব। কেন?

আমি যেন কিছু বুঝিনা না? আমি সব বুঝি বুঝলে সব বুঝি? দিদিকে উদ্দেশ্য করে মনে মনে কথাগুলো বলল পিংকি। আর কেন চাপা দেওয়া বাবা? ও ঘরে বসে তুমি আর রতনদা কি গুজ-গুজ কর আমি কি জানি না? আমি সব জানি। রতনদা যদিও আমাকে খুব অবুঝ মনে করে। তা ভাবুক। তাতে তো আর আমার কিছু এসে যাচ্ছে না। আমি বেশ ছেলেমানুষ সেজে থাকি তোমাদের সামনে মন্দ কি? তোমরা তো আর জান না তনুর কথা। জানলে বোধহয় রতনদা তুমি আর দিদি আঁতকে উঠবে এক্ষুনি।

রতনদাকে অবিশ্যি খুব একটা খারাপ লাগে না পিংকির। যদিও অনেক সময়ই ও লক্ষ্য করেছে রতনদা কেমন ভেজা ভেজা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। দৃষ্টিটা যেন কেমন অদ্ভুত লাগে পিংকির তখন। আর ঠিক সেই সময় রতনদাকে ভারী বোকা বোকা মনে হয়।

তনুও মাঝে মাঝে ওরকম বোকা বোকা চাউনীতে চেয়ে থাকে ওর দিকে, পিংকি দেখেছে। ভীষণ অস্বস্তি হতে থাকে ওর তখন ভেতরে ভেতরে। মনে হয় বুঝিবা এখনই কিছু একটা ঘটবে।

রতনদার কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎই— তনুতে চলে গিয়েছিল পিংকি হঠাৎই আবার মনে পড়ল আগের কথাটা। মনে পড়ে গেল রতনদাকে। এমনিতে তা না হলে মানষটা বেশ ভালই, পিংকিকে খুব ভালবাসেন। উনি। বাস্তবিক এজন্য দিদির কি কিছু কম হিংসে? কতদিন রতনদাকে ঠুকে ঠুকে বলে। ওকেই তো তোমার বেশি পছন্দ সব সময় কেবল পিংকি আর পিংকি? অবশ্য কথাগুলো দিদি কোনদিনই ওর সামনে বলেনি তবু সব শুনতে পায় পিংকি আড়াল থেকে। দিদিটা সত্যি ভারি হিংসুটে।

ঝোড়ো হাওয়াটা একটু একটু বেড়ে চলেছে বুঝতে পারল পিংকি। এই একটু আগেও হাওয়ার গতিটা বেশ কম ছিল। পিংকির খোলা রুক্ষ চুলটাই শুধু একটু একটু দুলছিল তখন ও বাড়ীর ঝর্ণাদির মত। খুব ভাল লাগছিল পিংকির নিজেকে। মনে হচ্ছিল ও যেন হঠাৎ ও বাড়ীর ঝর্ণাদির মত বড় আর সুন্দর হয়ে গেছে। কিন্তু এখন বাতাসের গতি ক্রমশ বেড়ে চলেছে। পাতলা শরীরটা পর্যন্ত এমন দুলছে হাওয়ায় টের পেল পিংকি কিছুতেই নিজেকে বশে রাখা যাচ্ছে না।

তনুদের বাড়ীটা এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। পিংকি দেখল তনুর ছায়া ছায়া শরীরটা সিঁড়ি দিয়ে এখন ওপরে উঠছে। একটু পরেই ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল তনু। ওদের ঘরে আলো জ্বলছে তাই তনুর কালোছায়াটাকে বেশ ভালভাবেই অনুসরণ করতে পারল পিংকি। তনু নিশ্চয়ই আমাকে দেখতে পাচ্ছে না। দেখতে পেলে বেশ হত। একবার ভাবল বাবান্দার আলোটা জ্বালিয়ে দেবে কিন্তু তারপরেই মার বকুনীর কথা মনে হতেই থেমে গেল ও।

আচ্ছা তনু কি আমার কথা ভাবছে এখন? নাকি অন্য কোন কথা ভাবছে? নিজের মনেই উত্তরটা খুঁজল ও বার কয়েক। কি জানি! একটু আনমনা হয়ে গেল ও। ঝর্ণাদি বলেছিল শ্রীরাধা নাকি আজকাল তনুকে কিসব রঙ্গীন রঙ্গীন চিঠি লেখে খুব সুন্দর করে। তবে তনু নাকি সেসব পড়ে না। শ্রীরাধাকে তনু নাকি ভালবাসে না। ঝর্ণাদির কাছে তনুর মতটা জেনে সেদিন খুব আনন্দ হয়েছিল পিংকির। মনে মনে তনুকে আরো বেশি করে ভালবেসেছিল তখন। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে হঠাৎ পিংকির কেন জানি না মনে হল, তনু হয়ত এখন শ্রীরাধার কথাই ভাবছে। একটা অজানা ভয়ে ও যন্ত্রণায় গলা অবধি কুঁজে এল পিংকির। সত্যি ই যদি তাই হয়? কিন্তু তাই বা কি করে হয়? ঝর্ণাদি যে বলল তনু আমাকেই চায়? ভাবল ও। কিন্তু শ্রীরাধা? শ্রীরাধা আমার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর যে। এই মুহূর্তে শ্রীরাধার সুন্দর চেহারাটার কথা মনে হতেই ভীষণ হিংসে হল পিংকির। ও শুনেছে শ্রীরাধা নাকি খুব সুন্দর করে চিঠিও লিখতে পারে। তনু সেদিন ওকে কথায় কথায় বলেছিল যে চিঠি নাকি তনুর খুব পছন্দ। সেইদিন থেকে চিঠি লেখার অনেক চেষ্টা করেছে পিংকি। শ্রীরাধার চেয়েও ভাল চিঠি। কিন্তু পারেনি। আসলে ওসব চিঠি লেখাটেখা ওর ঠিক আসে না কোন-দিনই ওসব পারে না পিংকি। তাই কালি আর কাগজই শুধু নষ্ট করেছে মনের মতন লেখা আর হয়ে ওঠেনি। নিজের অক্ষমতার কথা ভেবে নিজের ওপরই রাগ হল পিংকির। কি করে যে মানুষ অত ভাল ভাল চিঠি লেখে?

বৃষ্টি নেমেছে ফোঁটা ফোঁটা পিংকির খোলা ঘন চুলটাতে এখন বৃষ্টির ফোঁটা-গুলো পুঁতির মতন চিকচিক করছে। ও হাওয়ার তালে তালে চুলটাকে আরো একটু দুলিয়ে দিল দু হাত দিয়ে। এই মুহূর্তে অকারণেই হঠাৎ নিজেকে খুব ভালবাসতে ইচ্ছে করল পিংকির। হঠাৎই ভাল লেগে গেল ও ছড়ানো অন্ধকারটাকে, মেঘে ঢেকে আসা পূর্ণিমার চাঁদ আর আকাশের বুকে সেলাই করা রুপোর চাকতিগুলোকে। নিজেকে আর ওর এই ছোট্ট জীবনটাকে ভীষণ ভাল লেগে গেল পিংকির।

এই মন জিনিসটা যে খুব অদ্ভুত তা এই বয়সেই বুঝতে পেরে গেছে পিংকি। কখন যে ভাল লাগে আর কখন লাগে না তা যেন কত সময় নিজেও বোঝা যায় না। এই একটু আগেও শ্রীরাধার কথা মনে হতে কতই না খারাপ লাগছিল কিন্তু এখন আর লাগছে না। আসলে আমি বোধহয় এই মুহূর্তে তনুকে খুব একটা ভালবাসছি না। আবার যখন বাসব তখন আমাকে আবার তোমার অনেক কিছুই দুঃখ দেবে কিন্তু এখন আমি তোমাকে ভালবাসছি না।

সত্যি বলে কি কিছু নেই নাকি তাহলে? কি জানি। ওমা বলে আমি নাকি তনুকে খুব ভালবাসি আর আমারও মনে মনে তাই মনে হয়। কিন্তু কই এখন তো আর তেমন মনে হচ্ছে না। কেন? অন্ধকারকেই শ্রোতা হিসাবে ধরে নিয়ে পিংকি বলল—আসলে ওসব ভালবাসাটাসা সত্যি নয়। তাই যদি সত্যিই হবে তাহলে তিন বছর ধরে প্রেম করার পরেও রতনদা তুমি এখনো আমার দিকে অমন খারাপভাবে তাকাও কেন। আমার তো খুব খারাপ লাগে।

আসলে কি জান রতনদা? তুমি না একটা বাধনে পড়ে গেছ। ঠিক যেন সেই ইঁদুরের গর্তে পড়ে যাওয়ার মত। এখন যতই চেষ্টা কর না কেন কিছুতেই তুমি আর গোলকধাঁধা থেকে বেরোতে পারবে না। দিদি তোমায় যেতেই দেবে না।

আমি বাবা ওসবের মধ্যে নেই। বলল পিংকি। আমি তো জেনেই গেছি যে আসলে সব মিথ্যে। এই মুহূর্তে যাকে আমি আপন ভাবব সেই আসলে আমার আপন আবার পরমুহূর্তে হয়ত সেই সবচেয়ে পর।

তনুও কি আমার পাশে থাকবে নাকি সারাজীবন ধরে? কি জানি? নাকি আমিই থাকব ওর কাছে? বিশ্বাস কি? হয়ত কোনদিন আমাকেই মনে হবে ও আমার কেউ না ওকে আমি আর চাইছি না। আর সেই অনুভূতিটা যে কখন আসবে তা কি কেউ বলতে পারে?

আসলে আমি বোধহয় অনেক বেশি জেনে গেছি তাই না রতনদা? সত্যি বোধহয় আমার এতটা বোঝা উচিত হয়নি আর এতটা জেনে গিয়েছি বলেই বোধহয় জীবনটা আমার কাছে হয়ে গেছে ঘষা কাঁচের মত নতুনত্ব পাচ্ছি না কোথাও। অথচ নতুন কী একটা কি যেন আমি পেতে চাই সত্যিই পেতে চাই।

এই মুহূর্তে শুধু এই মুহূর্তে তোমাকে আমার কাছে পেতে খুব ইচ্ছে করছে রতনদা তুমি বিশ্বাস কর। আমি এতটুকুও বানিয়ে বলছি না। তুমি বিশ্বাস কর। শুধু এই মুহূর্তে।

আমার এই জলপাই রঙের জীবনটায় বিভিন্ন রকমের ইচ্ছেগুলো এক এক করে জড় হতে শুরু হয়েছে। আমি তা জানি। কিন্তু কেন হচ্ছে তা জানি না।

জলপাই রঙা জীবনটা এত কিছু চায় কেন!

স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ॥ ৩

সাত্তার

কলকাতার ফুটবল মাঠের দর্শকদের মধ্যে যাঁদের চুলে আজ পাক ধরেছে তাঁরা নিশ্চয়ই রহমতের খেলার স্মৃতি মনের গভীরে পাকাপাকিভাবে খোদাই করে রেখেছেন। অমন বুদ্ধিদীপ্ত পরিচ্ছন্ন ক্রীড়াশৈলী কি সহজে ভোলা যায়! না কেউ সাধ করে ভুলতে চায়? কেনই বা ভুলতে চাইবে? রহমতের খেলার ঐশ্বর্য সে তো স্বর্ণালংকারের মতো চিরায়ত বৈভব। তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করার সামগ্রী। মনের কোঠায় সাজিয়ে রাখতে পারলে বারে বারে তার চোখ ঠিকরানো রূপের দিকে ফিরে ফিরে তাকানো চলে।

রহমত খেলতেন ত্রিশের দশকে মহামেডান স্পোর্টিং দলের লেফট ইনসাইড ফরোয়ার্ড হিসেবে। মহামেডান স্পোর্টিং তখন ভারতীয় ফুটবলে এক ডাকসাইটে নাম। পরপর পাঁচবার চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়ে কলকাতায় ফুটবল লীগে রেকর্ড গড়েছে। চল্লিশের দশক আরম্ভের মুখে একই বছরে বোম্বাইয়ের রোভার্স আর সিমলার ডুরান্ড কাপ জয় করেছে। তাদের আগে আর কোনো ভারতীয় দল শৈল শহর সিমলায় হানা দিয়ে গোরা দলের মঠো থেকে ডুরান্ড কাপ ছিনিয়ে আনতে পারেনি।

নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন ও মেহনত ছাড়া ফুটবলে দক্ষতা অর্জনের বিকল্প কোনো উপায় যে নেই এই তত্ত্বটি পরীক্ষিত সত্যের রূপ নিয়েছিল মহামেডান স্পোর্টিং অনুসৃত আচরণে। এক হিসাবে মহামেডান দলই হলো ভারতীয় ফুটবলে আধুনিক চিন্তাধারা ও নতুন যুগের প্রবর্তক।

সেই যুগে মহামেডান দলে ছিল অনেক জাত খেলোয়াড়ের জমায়েৎ। বিশেষত ফরোয়ার্ড লাইনে। একধারে অবিস্মরণীয় সামাদ ফুটবলের যাদুকর রূপে যিনি আঘাত। অন্য প্রান্তে ক্ষিপ্র কর্মক্ষম তবে সতীর্থদের অনুপ্রাণিত নেহাৎই ছাপোষা খেলোয়াড় আব্বাস অথবা ছোট নুর মহম্মদ। মাঝখানে রহিম রসিদ ও রহমত। তিনজনের নামের আদ্যক্ষর এক হলেও ত্রয়ীর ক্রীড়ারীতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। রহিমের গতি দুরন্ত বল পেলে যেন সেই গতি আরও বেড়ে যেতো। হাফিজ রসিদ বুঝি বুলডজার। সামনের সব কিছু বাধা গায়ের জোরে কিকের জোরে এবং গতির ধাক্কায় চুরমার করে দিতেই তিনি ব্যস্ত। আর তাঁর পাশে রহমত সূক্ষ্মধর্মী ক্রিয়া-কলাপে প্রতিনিয়তই আত্মস্থ। খেলছেন যতো ভাবছেনও ততো। ভাবতে ভাবতে নতুন করে নিজের ঘুঁটি সাজিয়ে এক একটি চাল চেলে অপরপক্ষকে কি বিপদেই না ফেলে দিচ্ছেন।

মাথা ভর্তি রাশি রাশি কাঁকড়ানো চুল। ওপরে যতো চুল মাথা ভেতরে

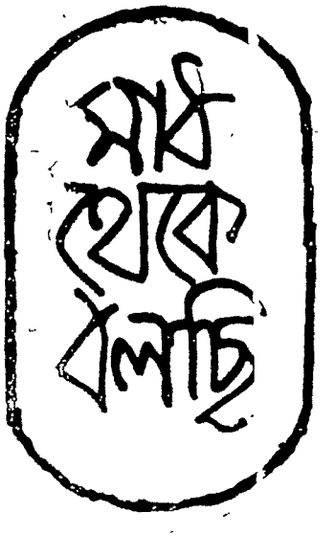

ততোই ফুটবল প্যাচের ঠাসবুনানি। আকৃতিতে এতোটুকু। কিন্তু মাঠে নামলেই রহমতের ছোটখাটো চেহারা কি বিশাল মূর্তিই না ধরে বসতো। এই রহমত ছিলেন মহামেডান দলের ফরোয়ার্ড লাইনে সিকমার। এক একটি থ্রু পাশে তিনি বিপক্ষের রক্ষণ ব্যবস্থা ফালাফালা করে দিতেন। লোক কাটাতেন হেসে খেলে। সাজিয়ে গুছিয়ে বল তৈরি করে দিতেন কী সহজেই না! কখন যে তিনি কি করবেন বিপক্ষ দলের পক্ষে তার ঠাওর পাওয়া ছিল দুষ্কর। আড়চোখে তাকাতে তাকাতে উল্টো দিকে বল ঠেলতেন যেখানে বাধা দেওয়ার কেউই নেই অথচ নিজের সাথসংগী থাকতেন একেবারে ফাঁকায় দাঁড়িয়ে। বল নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। মাঠের কে কোথায় কখন দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন এ তথ্য ছিল মুখস্থ বিদ্যার মতো। আশপাশে অনেক নামী খেলোয়াড়। কিন্তু সবার ভিড়ে থেকেও রহমত ছিলেন স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট।

সামাদ সাহেবকে ছেড়ে রাখছি। তিনি তো ছিলেন প্রতিভার বরপুত্র। প্রকৃতির বিস্ময়। তাঁর সঙ্গে কারুরই তুলনা চলে না। কোনো পংক্তিতেই তাঁকে ফেলা যায় না। তিনি শুধু তুলনীয় নিজের সঙ্গেই। কিন্তু আমার দেখা অগুন্তি প্রতিভাধর ইনসাইড ফরোয়ার্ডের মধ্যে রহমতকে আমি সর্বোত্তমের পিঁড়িতে বসাতে আদৌ কুণ্ঠিত নই। তাঁর আগের কালের কথা জানি না যেহেতু প্রত্যক্ষ দর্শনের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। রহমতের আমলে (এবং তার পরে দীর্ঘদিন পর্যন্ত) ভারতীয় ফুটবলে তিন চার ব্যাকে খেলার প্রথা অনুসৃত হোত না। ফলে তাঁর পক্ষে হয়তো শানিত থ্রু পাশের ধারে বিপক্ষের রক্ষণব্যূহকে চিরে ফেলা সহজ ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। এই কথা বলে কেউ যদি একালের নামী ইন-

সাইড ফরোয়ার্ডের সঙ্গে রহমতের তুলনা করতে চান তাহলে ভুল করা হবে। যেহেতু সর্বকালের সব জাত খেলোয়াড়েরই বাস্তব পরিস্থিতিকে নিজের প্রয়োজনে খাটিয়ে নেওয়ার মন্ত্র জানা থাকে। সেদিন প্রু পাশ বাড়াবার সুযোগ ছিল পর্যাপ্ত। রহমত সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নিয়েছেন। একালে সেই সুযোগ সীমিত বলে কি রহমত হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবেন নাকি? না নিশ্চয়ই তিনি নিষ্ক্রিয় থাকতেন না। উল্টে তিনি বিকল্প রাস্তার ঠিকানা জেনে নিয়ে ফুটবলের অন্য তরকিব সিদ্ধকর্ম হয়ে উঠতেন। যেহেতু তিনি ছিলেন বড় খেলোয়াড়। সঠিক মূল্যায়নে ফুটবলের সৃষ্টিধর্মী শিল্পী। এই উপলব্ধি একালের জাত ফুটবলারদের সম্পর্কেও সাচ্চা বলে মনে করি। একালে যাঁরা আড়া-আড়ি পাশে পাঁচিলে (ওয়াল) বল ঠেলে বল ফিরে পেতে এবং পর্দার (স্ক্রিন) ঘেরা-টোপে বাধাদানকারীদের আড়াল রেখে এগিয়ে যেতে অভ্যস্ত তাঁদেরই যদি সেকালের পরিস্থিতি মোকাবিলায় ডাক পড়তো তাহলে একালের নায়কেরাও নিশ্চয়ই বিফল হতেন না। যেহেতু ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে তারাও কুলীন। বাস্তব অবস্থা সামলাতে তাঁরাও নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করে নিতে পারতেন। তবে এ কাজ সাধ্যায়ত্ত একমাত্র তাঁদেরই যারা সৃজনধর্মিতায় উজ্জীবিত। আফশোষের কথা এমন খেলোয়াড়ের সংখ্যা ভারতীয় ফুটবল সমাজে ক্রমশঃই কমে আসছে। প্রদীপ-চুনী-বলরাম উত্তরকালে সেই সংখ্যা এক আঙ্গুলের অর্ধেকে এসে আটকে পড়েছে। জানি না অদূর ভবিষ্যতে সংখ্যাটি আমাদের ফুটবল মাঠ থেকে একেবারে মুছে যাবে কিনা? এই আশঙ্কা নেহাৎ অহেতুকও নয়। যেহেতু টিম ওয়ার্ক বা দলগত সংহতির ওপর জোর দিতে গিয়ে আজকাল ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যকে জবাই করার চক্রান্ত চলেছে। এই প্রয়াসে যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁরা বুঝি এক পরীক্ষিত সত্যের মর্মার্থ ভুলতে বসেছেন। সেই সত্য হলো ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য ছাড়া দলগত বৈশিষ্ট্যের পরিমান বাড়তে পারে না। কাজেই ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের সংগতি বাড়াতে হবে এবং অবশ্যই সেই সংগতিকে দলীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে। একজন খেলোয়াড় দলের একটি অংশ মাত্র। এগারোটি অংশ নিয়ে একটি পুরো দল। এক একটি অংশের উৎকর্ষ বাড়লে তবেই মূলে কাঠামোর মূল্যধন বাড়ে। পেলে গ্যারিনচা রেজেলিনো ববি চার্লটন জার্ড মুলার ইউ সিলার ডি স্টেফানো পুসকাস ইউসেবিও জর্জ বেস্ট প্রমুখেরা ছিলেন ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। তাদের বৈশিষ্ট্যে ঈর রেখেই ব্রেজিল ইংলন্ড পশ্চিম জার্মানী স্পেন হাঙ্গেরী পর্তুগাল এক এক সময়ে জগৎ বরেণ্য দক্ষতার অধিকারী হতে পেরেছে। ওঁদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের গোড়ায় কুঠারের কোপ বসিয়ে প্রতিভার সহজ প্রবেশের পথ যদি রুদ্ধ করে দেওয়া হোত তাহলে ব্যক্তিগতভাবে ওঁরা যতোটা না ক্ষতিগ্রস্ত হতেন তার চেয়ে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যেতো ওঁরা যেসব দলের খেলোয়াড় সেই সব দলেরই। কাজেই বক্তব্য শুধু দলগত সংহতির দোহাই পেড়ে ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যকে হাঁড়ি কাঠে চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। যে খেলোয়াড় ড্রিবলিং করতে পারেন পাবেন লোক কাটিয়ে বিপক্ষের রক্ষণব্যূহ ফাটল ধরাতে তাঁকে সেই কাজে উৎসাহ যোগানো উচিত। তবে সেই খেলোয়াড় যেন বাড়াবাড়ির প্রশ্রয় না দেন। সস্তা হাততালি পাওয়ার মোহে গ্যালারির দিকে নজর না রাখেন। এক কথায় তাঁরও পরিমিতবোধ থাকা চাই। শুধু ওয়াল পাশে বল ঠেলার নির্দেশ দেওয়া আর পাশ পাশ বা চিপ চিপ করে তথাকথিত দলগত সংহতি রচনার স্বপ্ন দেখা বিড়ম্বনা মাত্র।

আফশোষের কথা আমাদের ফুটবলের নেতারা আজ এই নিরর্থক স্বপ্নেই বুঁদ হয়ে আছেন। তাই দেশের মাটি থেকে জাত ফরোয়ার্ডরা ক্রমশই বিদায় নিতে চলেছেন। সৃজনশীল শিল্পীরা সরে যাচ্ছেন নির্দেশনার চাপে পড়ে। আর তাঁদেরই জায়গা কেড়ে নিচ্ছেন আক্ষরিক অর্থে যাঁরা কারিগর। দক্ষতা ক্রীড়া নিপুণতা যাঁদের একেবারেই সীমায়িত।

চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের সন্ধিক্ষণটি ছিল ভারতীয় ফুটবলের যুগসন্ধিক্ষণ। তখনও খালি পায়ের ফুটবল এদেশের মাঠ ময়দান থেকে একেবারে বিদায় নেয়নি। অথচ বুটবলের যুগ প্রবর্তনের কাল অত্যাসন্ন। এই কালে কলকাতার মাঠে বেশ কজন জাত ইনসাইড ফরোয়ার্ডের সমাবেশ ঘটেছিল। তাঁদেরই মধ্যে এক বিশিষ্ট চরিত্র ছিলেন সত্তার।

বেতার অনুষ্ঠান স্মৃতি দিবে ঘেরায় সেদিন তিনিই ছিলেন কথক। সত্তার বড়ই মুখচোরা। প্রশ্নকর্তা অনেক মেহনত করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাঁর কাছ থেকে কথা বার করে নিচ্ছিলেন।

প্রশ্নকর্তার ধারণা সত্তারের খেলার মধ্যে পূর্বসূরী রহমতের কিছুটা ছাপ ছিল। তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত ক্রীড়াপদ্ধতি। মেজাজ তেমনি শান্ত। আচরণ পরিশীলিত। গা বাঁচিয়ে খেলার চেষ্টা সর্বক্ষণের। অথচ কাজের কাজটি করে তোলায় সিদ্ধকর্ম।

প্রশ্ন শুনেই সত্তার বললেন সেইটিই তো স্বাভাবিক। আমার ফুটবলে গুরু হলেন যে রহমত। বাঙ্গালোর মুসলিম দলের পাঠশালায় আমি রহমতের কাছেই ফুটবল খেলা শিখি। খুব ছেলেবেলাতেই ওঁর নজরে পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমাকে স্নেহ করতেন খুব। উৎসাহ দেবার জন্যে কতোদিন নিজের পাশে দাঁড় করিয়ে খেলিয়েছেনও। ভারতীয় ফুটবলে প্রথম সাবির আসরে গুরু-শিষ্যের একজোটে

অফিস এবং ইনজিনীয়ারিং-এর
নিখুঁত সরঞ্জাম
এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

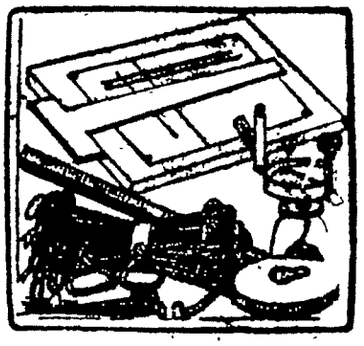

সার্ভে, ড্রইং, নানা রকম কাজের
খাতা, লেজার, ক্যাশবই, কালি ও
উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য
অন্যতম প্রতিষ্ঠান
কুইক ষ্টেশনারী ষ্টোর্স
৬৩ই, রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিঃ-১
ফোন : ২২-৮৫৮৮ ৬৭-৪৬৬৯
গ্রাম : স্বাবাপিন, পোষ্ট বক্স—৩৮ হাওড়া
পরিবেশক : কর্মাজিম প্রডাক্টস
(ষ্টেশনারী বিভাগ)

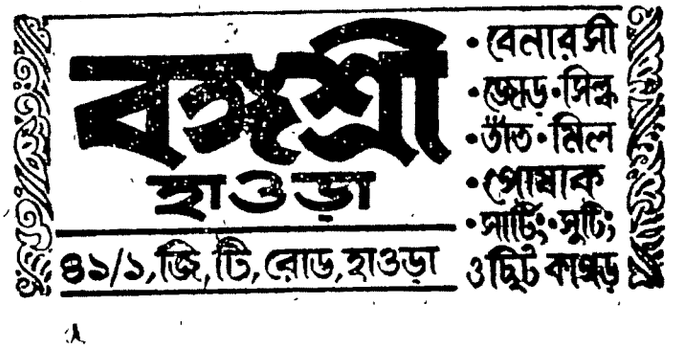

খেলার নজীর বোধহয় খুব বেশি নেই। সেদিক দিয়ে আমি সত্যিই ভাগ্যবান।

ওই বাঙ্গালোর মুশ্তিমের আর এক খেলোয়াড় মহিউদ্দিন সত্তারকে কলকাতায় নিয়ে আসেন মহামেডান স্পোর্টিংয়ের পক্ষে খেলার জন্যে। মহামেডান স্পোর্টিং সম্পর্কে মহিউদ্দিনের স্বাভাবিক ও সঙ্গত দুর্বলতা ছিল। যেহেতু তিনি নিজেও বেশ ক'বছর মহামেডান দলে খেলেছেন ফুলব্যাক হিসেবে। চল্লিশের দশকের দর্শকদের অনেকেরই হয়তো মহিউদ্দিনের কথা মনে আছে। হালকা পাতলা আকৃতি। লম্বা। আর মাথার টাকটি যেন ক্রমশই প্রসারিত হচ্ছে। তবে টাক দেখে মহিউদ্দিনের ক্রীড়াগত সামর্থ্যের ঠাওর পাওয়া যেতো না। মাথার অবস্থা যাই হোক না কেন মহিউদ্দিনের সারা শরীরে অফুরন্ত প্রাণশক্তি এবং মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল সঞ্চিত।

কিন্তু মহিউদ্দিন সত্তারকে কলকাতায় নিয়ে এলে কি হবে মহামেডান তাঁকে দলে ধরে রাখতে পারেনি। কলকাতার ক্রীড়া-সমাজের ছিল জরুরী চোখ। এক পলকে সত্তারকে দেখেই কলকাতা তার মধ্যে জাত খেলোয়াড়ের সন্ধান জেনে নিশ্চিন্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে চাকুরি নেওয়ার আমন্ত্রণ আসে কলকাতার কাস্টমস দপ্তর থেকে। সত্তার কলকাতায় আসেন ১৯৪৯ সালে। সেই বছরেই তাঁর চাকরি হয়। কিন্তু চাকরি পাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে নিয়ে টানাটানি চলতে থাকায় পরের বছরেই তিনি মোহনবাগান দলে যোগদান করেন কাস্টমসের চাকরি ছেড়ে দিয়ে। উত্তরপর্বে মোহনবাগানের সত্তার সারা ভারতেরই সত্তার হতে পেরেছেন।

ওলিম্পিকে খেলেছেন। খেলেছেন এশীয় ক্রীড়ায়। এবং সেই সঙ্গে সে আমলে চতুর্দলীয় ফুটবল সমেত তাবৎ আন্তর্জাতিক ফুটবলে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। সত্তার সাধারণত খেলতেন লেফট ইনসাইডের পজিসনে। কিন্তু সমসাময়িক কালে আর এক লেফট ইনসাইড ইস্টবেঙ্গলের আমেদ খাঁ অনুরূপ সক্রিয় থাকায় সত্তারকে সরে গিয়ে জাতীয় দলের রাইট ইনসাইড ফরোয়ার্ডের ভূমিকা গ্রহণ করতে হোত। আমেদ খাঁ ও সত্তার দুজনেই জাত ফরোয়ার্ড। কাউকে বাদ দেবার জো ছিল না। তবে সত্তারের সুবিধে ছিল এই সে তিনি রাইট ইনসাইডেও নিজেকে মানিয়ে নিতে পারতেন। যেমন পারতেন আমেদ খাঁ লেফট উইংয়ের পর্যায়ে খেলতে। সত্তার বলছিলেন আমেদ ও আমি প্রায় এক সঙ্গে বাঙ্গালোর মুশ্লিম দলে খেলতে খেলতে বড় হয়েছি। দুজনের মধ্যে কাকে কোথায় খেলানো যায় তা নিয়ে বাঙ্গালোর মুশ্লিম দলের কর্তাদেরও মাঝে মাঝে সমস্যার সামনে পড়তে হোত। তাঁরা সে সমস্যার সমাধান করতেন আমেদকে লেফট উইংয়ে ঠেলে দিয়ে। তবে আমেদ আর আমি যখন যেখানেই খেলে থাকি না কেন বোঝাবুঝির বিষয়ে আমাদের কখনো অসুবিধে হয়নি। ছেলেবেলা থেকেই এক-সঙ্গে খেলেছি বলেই সমঝোতার সুতোয় আমরা বাঁধা পড়ে গিয়েছিলাম।

তবে কলকাতার মাঠে সত্তার আর আমেদ একসঙ্গে খেললেনই বা কদিন? সত্তার খেলতেন মোহনবাগানে। আর আমেদ ইস্টবেঙ্গলে। ছেলেবেলার ওঁরা ছিলেন এক ঘাটেই। আর যৌবনে পরস্পরের শত্রু শিবিরে। দুজনেই ভিন দেশী মানুষ। এসেই কলকাতার বাসিক চিত্তে নিজেদের ঠাঁই পাকা করে নিতে পেরেছিলেন। আমেদ খাঁ দেশে ফিরে গেলেও সত্তার কিন্তু কলকাতাতেই পাকাপাকিভাবে থিতু হয়ে গেছেন। কলকাতার দর্শকরা এমনই ভালবেসেছেন যে আর ছেড়ে দিতে চাননি। সত্তারও এই শহরকে ছেড়ে চলে যেতে পারেননি। স্মৃতি চিরণকালে সত্তার বলছিলেন কলকাতায় না এলে কোনো ভারতীয়ের ফুটবলের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। এখানকার সংগঠন ও দর্শককুলের সহযোগিতায় ফুটবলারদের এগিয়ে যাওয়ার পথ প্রশস্ত হয়। দল সমর্থকদের পৃষ্ঠপোষকতা, তো তুলনাবিহীন। তবে পারস্পরিক রেষারেষিতে সময় সময় এক শ্রেণীর মনোভাবটিও বড্ড মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কলকাতার ফুটবল সমাজ যদি কিঞ্চিৎ নিরপেক্ষ হতে পারতো তাহলে বোধহয় অভিযোগ তোলার কিছুই থাকতো না। কিন্তু ফুটবলে তা বুঝি হওয়ার নয়। অন্য কি হয়? কে জানে।

আপনার খেলোয়াড় জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা কোনটি? এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে সত্তার নিজের খেলার কোনো কাহিনীর উল্লেখ করেননি। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ছবিও তাঁর স্মৃতি পটে উঁকি দেয়নি। বিকল্পে বল্লেন আমি হাঙ্গেরীর খেলা দেখেছি। দেখেছি ফেরেঙ্ক পুসকাসকে পঞ্চাশের দশকের হাঙ্গেরী সব হিসেবেই দুধর্ষ দল। ফরোয়ার্ড লাইনের মধ্যমনি হিসেবে মাঠে হাজির ছিলেন লেফট ইনসাইড পুসকাস। তাঁর বাঁ পা ছিল বেশি চালু। কিন্তু বল নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অসাধারণ। যেমন বুদ্ধি তেমনি তরকিব। আর কিক করার ক্ষমতাই বা কি। পুসকাসকে দেখে মনে হচ্ছিল দশবার সুযোগ পেলে তিনি অন্ততঃ নবারই গোলের মধ্যে বল ঠেলে দেবার ক্ষমতা ধরেন। আর যতোই নিরীক্ষণ ততোই নিজের কাছে নিজেই ছোট হয়ে যাওয়া। আমরাও খেলি। আর পুসকাসও খেলেন। আমরা খেলি কেন। কি সান্ত্বনা পেতে। এই সব প্রশ্নই সেদিন মনকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছিল।

পুসকাসের জয়ধ্বনি তোলার সময়েই সত্তারের খেলোয়াড় চরিত্রের ঠিকানা সঠিক-ভাবে জানতে পারা গেল। খেলোয়াড়দের ক্রীড়াগত গুণাবলী এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মূল্যায়ণে অধুনা বাছা বাছা ফুটবলারকে মাথায় বর্ষশ্রেষ্ঠের শিরোপা তুলে দেওয়া হয়। সত্তারের কালে এইভাবে অভিনন্দন জানানোর বেওয়াজ ছিল না। থাকলে অনেককে ডিঙিয়ে সত্তার যে অভিধায় অভিনন্দিত হতেন সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কারণ অনেকের মতো আমি তাঁকে খুব কাছে থেকেই দেখেছি। একই সঙ্গে খেলতে খেলতে চিনেছিও।

অজয় বসু

মাঠের নায়ক

আত্ম বিশ্বাস থাকা খুব ভাল দরকারও। কিন্তু বেশী ভাল নয়। আমি হোলাম প্রতিরোধের শেষ প্রাচীর। এক মুহূর্তের একটি ভুলে দলের বিপর্যয়। ঐ কথা স্মরণ রেখেই খেলি। প্রত্যেক দায়িত্বশীল গোলরক্ষকেরই অভি-মত বোধ হয় তাই'। প্রশান্ত মিত্র॥

প্রশান্ত মিত্র

•

কথা হচ্ছিল মোহনবাগানের অধিনায়ক গোলরক্ষক শ্যামনগরের ছেলে প্রশান্ত মিত্রের সঙ্গে। প্র্যাকটিস সবে শেষ। দর দর করে ঘামছিলেন। পরণে সর্টস গা খালি। ঋজু সবল দেহ, স্বভাব নম্র, ...বিনয়ী। প্রশান্ত বললেন : গোলে দাঁড়িয়ে কায়দা দেখানো সবার সাজে না। হ্যাঁ সনৎদা, খগরাজ, নারায়ণ বা হালের তরুণ বসু কায়দা দেখালে মানাতো, মানায় কারণ ওঁদের শারীরিক সক্ষমতা প্রশ্নাতীত, মনের জোর (কনফিডেন্স) অসাধারণ। ফুটবলে হাতে খড়ি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কেউ যদি আজ সনৎ শেঠ বা খগরাজ হতে চান—তাহলেই বিপদ। আমার নীতি হচ্ছে—আমি অপোনেন্টের কাউকে চান্স দেবো না, রিস্ক নেবো না। প্রথম সুযোগেই বল ক্লিয়ার করবো'।

আমার প্রশ্ন : গোলে খেলার বাতিক হোল কেন'?

'সে বেশ মজার ঘটনা'—জবাব দেন প্রশান্ত। স্কুলে পড়ার সময় নানা পজিসনে খেলতাম—ফরওয়ার্ড, হাফব্যাকে। একদিন গোলরক্ষক এল না। সবাই ধরে বললেন—মিলন (প্রশান্তের ডাক নাম) তুই আজ চালিয়ে দে। সেই থেকে আজও চালিয়ে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে শ্যামনগর অঞ্চলে এখনও স্ট্রাইকার পজিসনে খেলি। শ্যাম-নগরেই প্রশান্তর জন্ম ১৯০৫ সালের ১০ জুন। চাকরী লিভার ব্রাদার্সে। বাবা নলিনীরঞ্জন মিত্রের আদি বাড়ী ওপার বাংলার ফরিদপুরের গোপালগঞ্জে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের পাশের গাঁয়ে। নলিনীবাবুর মস্ত বড়ো সংসার। স্ত্রী, চার ছেলে, তিন মেয়ে।

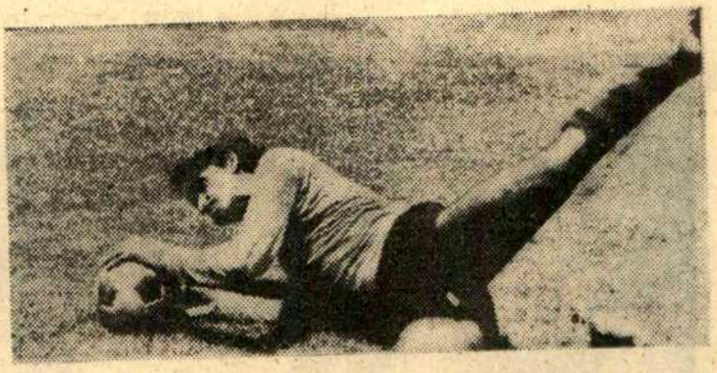

প্রশান্ত মিত্র

ফুটবলে হাতে খড়ি, শ্যামনগর যুগের প্রতীক ক্লাবে। কলকাতায় গড়ের মাঠে এনে-ছিলেন ১৯৬৭ সালে বেহালা ইউথের নির্মল ঘোষ। ১৯৬৮ সালে খেলেন ইষ্টবেঙ্গল জুনিয়ার টিমে। '৬৯ সালে অচ্যুতবাবুর প্রশিক্ষণের টানে খেলেন খিদিরপুরে। রইলেন '৭১ সাল পর্যন্ত। ৭২ সালে যোগ দিলেন মোহনবাগানে। মোহনবাগানে প্রশান্তকে নিয়ে এসেছিলেন শ্যামসুন্দর মান্না। ইতিমধ্যে রোভার্স, ডুরান্ড, ডি সি এম, বরদলুই ট্রফিও খেলা হয়ে গিয়েছিল ওঁর। সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার হয়ে প্রথম খেললেন '৭৩ সালে এর্ণাকুলামে, ৭৪ জলন্ধরে, ৭৫-এ চ্যাম্পিয়ন বাংলা দলে। ভারতের হয়ে প্রথম খেলেছেন এশীয় যুব ফুটবলে ব্যাংককে (১৯৭৪)। ভারত সে বছর হয়েছিল যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন। ঐ বছরই খেললেন মারদেকা। (ভারত ষষ্ঠ) এবং তেহরাণে এশীয় ক্রীড়া। তেহরাণের আসরে চীনের কাছে শোচনীয় পরাজয়ের কাহিনী শোনাতে গিয়ে প্রশান্ত বললেন : 'ওঁদের দারুণ স্পীড দারুণ স্টামিনা দারুণ স্কিল। কোন দিক দিয়েই সেদিন মাঠে আমরা দাঁড়াতে পারিনি। প্রতিপক্ষকে সেদিন মনে হচ্ছিল—এগারোটি দম দেওয়া কলের পুতুল।' প্রশান্ত এবারও কাবুল ও কোয়ালালামপুর সফরকারী ভারতীয় দলের ট্রায়ালের আসবে ডাক পেয়েছেন। অপ্রত্যাশিত কিছু না ঘটলে দলে স্থানও হবে নিশ্চয়।

ঘরে, বাইরে ছোট বড় অনেক ফুটবল খেলেছেন প্রশান্ত। অনেক খেলার অনেক মধুর স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে তাঁর মনে। থাকবেও সারা জীবন। ঢাকায় ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর সেই স্নেহ ভালবাসার কথা কি ভোলা যায়। মোহনবাগানের হয়ে খেলতে গিয়েছিলেন প্রশান্ত। পরিচয় পর্বের পর দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরলেন বঙ্গবন্ধু মুজিবর প্রশান্তকে। বললেন : 'তুমি আমাগো ঘরের ছাওয়াল, মেহমান না। রইয়া যাও কয়দিন। হাওয়া বাতাসে শরীরে জোর পাইবা।' তারপর সহধর্মিণী বেগম মুজিবকে ডেকে বললেন : 'আরে দেখ দেখ, প্রশান্ত আমাগো দ্যাশের পোলা। যে কয়দিন আছে ধারে কাছে থাইক্যা, দেইখ্যা শুইন্যা বাবারে খাওয়াইও, যত্নের যেন কম না হয়।' ঐ আমার জীবনের সর্বোত্তম স্মৃতি, সর্ব-শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ গৌরব।'

বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রশান্ত ব্যানার্জী

গত সংখ্যায় ভুল করে প্রশান্ত ব্যানার্জীর ছবির পরিবর্তে প্রশান্ত মিত্রের ছবিটি ছাপা হওয়ায় আমরা দুঃখিত।

পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় লবণ হ্রদ অঞ্চলে প্রস্তাবিত স্টেডিয়ামের শিলান্যাস করছেন। ছবির বাঁ-দিকে ক্রীড়া ও খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ।

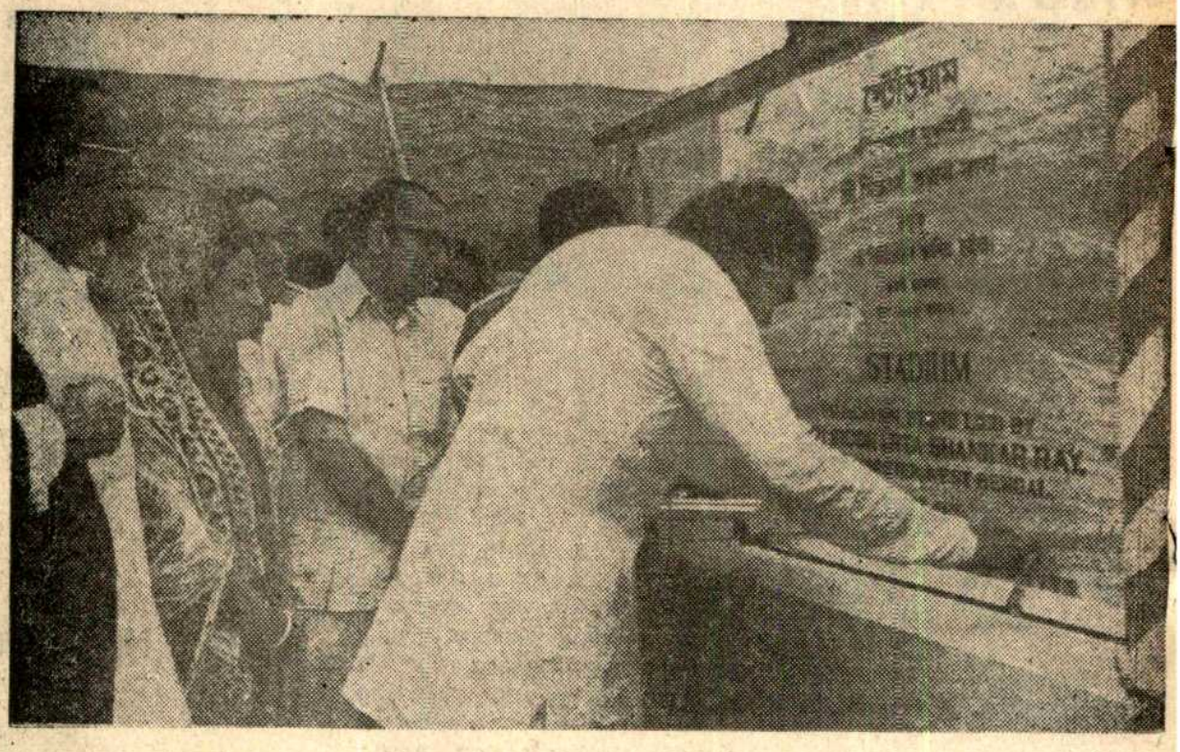

খেলাধূলা

দর্শক

কলকাতায় স্টেডিয়াম

কলকাতার ক্রীড়ামোদীদের সুদীর্ঘ-কালের লাজ-লজ্জা ক্ষোভ এবং অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট দূর হতে চলেছে। তাঁদের জন্যে আজ বড় খোশখবর—খেলা দেখার বিশাল-কায় সর্বার্থসাধক স্টেডিয়াম তৈরী হচ্ছে। কোথায়? কলকাতার পূর্বদিকে লবণ হ্রদ অঞ্চলে। বিস্তীর্ণ ১২৬ একর জমি জুড়ে এই স্টেডিয়াম এলাকা। গত ২৮শে জুন সোমবার মহাধুমধামের সঙ্গে প্রস্তাবিত স্টেডিয়ামের ভিতপূজা হয়ে গেছে এবং পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় আনুষ্ঠানিকভাবে স্টেডিয়ামের শিলা-ন্যাস করেছেন। তাঁর কথা থেকে জানা গেছে কাজকর্ম ঠিকমত চললে আগামী ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে স্টেডিয়াম সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে যাবে। আরও খবর ১৯৭৯ সালের এশিয়ান গেমসের আসর এই লবণ হ্রদ স্টেডিয়ামে যাতে বসে তার প্রস্তাব করা হবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই লবণ হ্রদ স্টেডিয়ামের দ্বারোদ্ঘাটন করবেন। ক্রিকেট খেলা বাদ দিয়ে ফুটবল অ্যাথলেটিকস এবং অন্যান্য বড় খেলার সুব্যবস্থা এই স্টেডিয়ামে থাকবে। স্টেডিয়ামে এক লক্ষ লোক আরাম করে বসে খেলা দেখতে পারবেন। দর্শকদের রোদে জলে কষ্ট পেতে হবে না মাথায় থাকবে পাকাপোক্ত আচ্ছাদন।

উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতা

১৯৭৬ সালের ৯০তম উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতার আসরে পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন সুইডেনের বিয়রণ বর্গ এবং আমেরিকার কুমারী ক্রিস এভার্ট মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছেন। এই আসরে বর্গের এটা প্রথম সিঙ্গলস ফাইনাল খেলা। শুধু তাই নয়, তাঁর আগে সুইডেনের কোন খেলোয়াড় এই আসরে পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে খেলেন নি। অপরদিকে কুমারী এভার্ট এই নিয়ে তিনবার ফাইনালে খেলে দ্বিতীয়বার সিঙ্গলস্ খেতাব পেলেন। তিনি সিঙ্গলস খেতাব প্রথম পান ১৯৭৩ সালে র‍্যাশিয়ার ওলগা মোরোজোভাকে হারিয়ে। এর আগে ১৯৭৩ সালের ফাইনালে তিনি স্বদেশের শ্রীমতী বিলি জিন কিংয়ের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।

এবছরের পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে বর্গ স্ট্রেট সেটে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নাস্তাসেকে পরাজিত করেন। এখানে উল্লেখ্য, বর্গ এবছরের সারা খেলায় একটা সেটও হারেন নি। এই আসরে এইরক অসাধারণ নজির শেষ করেছিলে আমেরিকার চাক ম্যাকিনলে ১৯৬৩ সাল তাছাড়া উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতা সুদীর্ঘ ৯০ বছরের খেলায় যাঁরা পুরু বিভাগের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছে তাঁদের মধ্যে বর্গ অন্যতম কনিষ্ খেলোয়াড়। তাঁর বর্তমান বয়স ২০। খেতা জয়ের তালিকায় তাঁর থেকে কম বয়সে খেলোয়াড় মাত্র দুজন আছেন—১৮৯০ সা উইলফ্রেড ব্যাডলি (ইংল্যান্ড) এবং ১৯৩ সালে সিডনি উড (আমেরিকা) তাঁদের ১৯ বছর বয়সে সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান হয়ে ছিলেন। বর্গ বনাম নাস্তাসের ফাইনা খেলাটি মাত্র এক ঘন্টা ৫০ মিনিট চলেছিল বর্গের থেকে নাস্তাসে ছিলেন ৯ বছরে বড়। এর আগে ১৯৭২ সালে নাস্তা সিঙ্গলস ফাইনালে আমেরিকার স্ট্যা স্মিথের কাছে হেরে যান। গত বছর বর্গ কোয়ার্টার ফাইনালে ১৯৭৫ সালে সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান আর্থার অ্যাশের কা পরাজিত হয়েছিলেন।

পুরুষদের সিঙ্গলসের সেমি-ফাইনা খেলেছিলেন ৩নং বাছাই ইলি নাস্তা (রুমানিয়া), ৪নং বাছাই বিয়রণ বর্গ (সুইডেন) ৭নং বাছাই রাসকো টানা (আমেরিকা) এবং ৮নং বাছাই প র‍্যামিরেজ (মেকসিকো)। গত বছরে সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান এবং এ বছরের ১ বাছাই আমেরিকার নিগ্রো খেলোয়াড় আর্থ অ্যাশ অপ্রত্যাশিতভাবে প্রায় তিন ঘন্ট

লড়াই করে চতুর্থ রাউন্ডে অবাছাই খেলোয়াড় আমেরিকারই ভাইটাস গেরুলেটিসের কাছে হেরে যান। এবছরের ২নং বাছাই জিমি কোনার্স (আমেরিকা) কোয়ার্টার ফাইনালে পরাজিত হন ৭নং বাছাই স্বদেশের রোসকো ট্যানারের কাছে। কোনার্স গত বছরের ফাইনালে আর্থার অ্যাশের কাছে হেরেছিলেন।

মেয়েদের সিঙ্গলসের সেমি-ফাইনালে প্রথম চারজন বাছাই খেলোয়াড়ই খেলেছিলেন—১নং বাছাই ক্রিশ এভার্ট (আমেরিকা), ২নং বাছাই ইভোনে গুলাগং কলে (অস্ট্রেলিয়া), ৩নং বাছাই ভার্জিনা ওয়েড (ইংল্যান্ড) এবং ৪নং বাছাই মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা (চেকোশ্লোভাকিয়া)। মেয়েদের সিঙ্গলস ফাইনালে ১নং বাছাই ক্রিশ এভার্ট অস্ট্রেলিয়ার উপজাতি টেনিস খেলোয়াড় শ্রীমতী ইভোনে গুলাগং কলেকে পরাজিত করে দ্বিতীয়বার সিঙ্গলস খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেন। তাছাড়া তিনি মেয়েদের ডাবলস খেতাবও পেয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য, এই নিয়ে এভার্ট তিনবার ফাইনাল খেললেন অপর দিকে গুলাগং চার বার। ১৯৭১ সালে উইম্বলডন টেনিস আসরে তাঁর যোগদানের প্রথম বছরেই ইভোনে গুলাগং সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হন। এরপর তিনি ১৯৭২ ও ১৯৭৫ সালের সিঙ্গলস ফাইনালে শ্রীমতী বিলি জিন কিংয়ের কাছে হেরে যান।

১৯৭৬ সালের উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতায় আমেরিকা চারটি বিভাগের ফাইনালে খেলে শেষ পর্যন্ত তিনটি খেতাব জয়ী হয়—এককভাবে মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব এবং যুগ্মভাবে পুরুষ ও মেয়েদের ডাবলস খেতাব। এরপর অস্ট্রেলিয়ার সাফল্য উল্লেখযোগ্য। অস্ট্রেলিয়া তিনটি বিভাগের ফাইনালে খেলে যুগ্মভাবে মাত্র একটি খেতাব পেয়েছে—ফ্রান্সের সঙ্গে মিকসড ডাবলস খেতাব। একটি করে খেতাব জয়ী হয়েছে সুইডেন (পুরুষদের সিঙ্গলসে)। মেক্সিকো (যুগ্মভাবে পুরুষদের ডাবলসে), চেকোশ্লোভাকিয়া (যুগ্মভাবে মেয়েদের ডাবলসে) এবং ফ্রান্স (যুগ্মভাবে মিকসড ডাবলসে)। ফাইনালে রানার্স-আপ হয়েছে রুমানিয়া (পুরুষদের সিঙ্গলসে), অস্ট্রেলিয়া (মেয়েদের সিঙ্গলস ও পুরুষদের ডাবলসে), আমেরিকা (মিকসড ডাবলস এবং যুগ্মভাবে মেয়েদের ডাবলসে) এবং নেদারল্যান্ডস (যুগ্মভাবে মেয়েদের ডাবলসে)।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস ঃ ৪নং বাছাই বিয়রন বর্গ (সুইডেন) ৬-৪, ৬-২ ও ৯-৭ গেমে ৩নং বাছাই ইলি নাস্তাসেকে (রুমানিয়া) পরাজিত করেন।

মেয়েদের সিঙ্গলস ঃ ১নং বাছাই কুমারী ক্রিস এভার্ট (আমেরিকা) ৬—৩, ৪-৬ ও ৮-৬ গেমে ২নং বাছাই শ্রীমতী ইভোনে গুলাগং কলেকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

১৯৭৬ সালের উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতায় মেয়েদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান কুমারী ক্রিস এভার্ট (আমেরিকা)। তাঁর হাতে জয়লাভের পুরস্কার।

পুরুষদের ডাবলস ঃ ১নং বাছাই জুড়ি পল র‍্যামিরেজ (মেকসিকো) এবং ব্রিয়ান গটফ্রিড (আমেরিকা) ৩-৬, ৬-৩ ৮-৬ ২-৬ ও ৭-৫ গেমে অবাছাই জুড়ি রস কেস এবং জিওফ মাস্টার্সকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মেয়েদের ডাবলস ঃ কুমারী ক্রিস এভার্ট (আমেরিকা) এবং মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা (চেকোশ্লোভাকিয়া) ৬-১, ৩-৬ ও ৭-৫ গেমে শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা) এবং বেটি স্টোভকে (নেদারল্যান্ডস) পরাজিত করেন।

মিকসড ডাবলস ঃ টনি রোস (অস্ট্রেলিয়া) এবং কুমারী ফ্রাঁসোয়াজ দুর (ফ্রান্স) ৬-৩, ২-৬ ও ৭-৫ গেমে ডিক স্টকটন এবং রোজি ক্যাসলসকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

ভারতীয় খেলোয়াড়দের খেলা

এ বছরের উইম্বলডন টেনিস খেলার আসরে এই চারজন ভারতীয় খেলোয়াড় খেলেছিলেন—বিজয় অমৃতরাজ আনন্দ অমৃতরাজ শশী মেনন এবং জে রয়আপ্পা। এঁদের মধ্যে আনন্দ অমৃতরাজ মূল প্রতিযোগিতায় উঠতে পারেননি প্রাথমিক পর্যায়ের খেলায় বিদায় নিয়েছিলেন। জে রয়আপ্পা প্রতিযোগিতায় তাঁর প্রথম যোগদানের বছরে প্রথম রাউন্ডেই বুটেনের মার্ক ফ্লেরেলের কাছে হেরে যান। ভারতের জাতীয় চ্যাম্পিয়ান বিজয় অমৃতরাজ এবং শশী মেনন প্রথম রাউন্ডে জিতে পরবর্তী দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় বিদায় নেন। বিজয় পরাজিত হন চার্লস পাশারেলের কাছে এবং শশী মেনন হেরে যান দক্ষিণ আফ্রিকার বার্ণি মিটেনের কাছে। তবে মেনন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন দিনে প্রথম রাউন্ডেই বুটেনের একমাত্র ভরসা রোজার টেলরকে ৫-৭ ৬-২ ৯-৮ ২-৬ ও ১০-৮ গেমে হারিয়ে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। খেলাটা তিন ঘন্টার কিছু বেশী সময় চলছিল। এখানে উল্লেখ্য এই রোজার টেলর উইম্বলডন টেনিস আসরে তিনবার সেমিফাইনাল পর্যন্ত খেলেছিলেন। সিঙ্গলস খেলার থেকে ভারতীয় খেলোয়াড়রা ডাবলসে খুবই ভাল খেলেছিলেন। পুরুষদের ডাবলসে দুই অমৃতরাজ ভাই বিজয় ও আনন্দ সেমিফাইনাল পর্যন্ত খেলেছিলেন। ডাবলসের প্রথম রাউন্ডেই তাঁরা প্রাক্তন উইম্বলডন ডাবলস চ্যাম্পিয়ান বব হিউইট এবং ম্যাক-মিলনকে (দক্ষিণ আফ্রিকা) হারিয়ে দারুণ বিস্ময়ের সাড়া জাগিয়ে ছিলেন। মিকসড ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনালে বিজয় অমৃতরাজ এবং কাথি মে (আমেরিকা) হেরে যান ম্যাকমিলন (দক্ষিণ আফ্রিকা) এবং বেটি স্টোভের (নেদারল্যান্ডস) কাছে। এখানে উল্লেখ্য উইম্বলডন টেনিস আসরে অমৃতরাজ ভায়েরাই প্রথম ভারতীয় খেলোয়াড় হিসাবে পুরুষদের ডাবলসের সেমি-ফাইনালে খেললেন।

ভাগ্যলিপি

অঞ্জনা ভৌমিক

বাইরের বারান্দায় স্বল্প আলোয় পায়চারী করছিলেন ছবির তরুণ প্রযোজক অসীম দত্ত। শ্যামল তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

অসীমবাবু অবাক।—কী হয়েছে শ্যামলবাবু?

—সূর্য—

বলেই দেখে অসীমবাবুর মুখও থমথমে হয়ে উঠেছে।—এই রেঃ!

ছবির প্রযোজক অসীম দত্ত অবাক।

—সে কি সূর্যবাবুকে জঙ্গল থেকে গিয়ে কেউ নিয়ে আসে নি?

ভুল একটা মস্তবড় ভুল হয়ে গিয়েছে। শ্যামল দ্রুত কণ্ঠে বলল—কপাল আর কাকে বলে বলুন তপনদা সূর্যর খোঁজ করতেই তবে মনে পড়ল। আমি এক্ষুনি গিয়ে ওকে নিয়ে আসছি—

বলে শ্যামল চক্রবর্তী আর দাঁড়াল না। একটা আম্বাসেডর গাড়ী নিয়ে ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে পড়ল। যাবার সময় অসীমবাবুকে বলে গেল—আপনি তপনদাকে একটু ম্যানেজ করুন, ওকে বলি নি আমি ঘন্টাখানেকের মধ্যে আসছি।

অসীমবাবু কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। তপনবাবু জানতে পারলে আজ কেলেঙ্কারী হবে। শ্যামল ভুলে গেছে বললেও রেহাই নেই। একটা জলজ্যান্ত মানুষ—তার কথা সবাই ভুলে গেল? অথচ ইউনিটে এতগুলো লোক। কারো একবার সূর্যর কথা মনেই পড়ল না! তপন সিংহ শান্তশিষ্ট মানুষ, কিন্তু একবার রেগে গেলে কেউ আর সাহস করে সামনে দাঁড়াতে পারে না।

নিবিড় জঙ্গল। দিনের বেলায় তার এক চেহারা। আর রাতে আরেক চেহারা। জঙ্গলে যাদের রাত্রি বাসের অভিজ্ঞতা নেই তাঁরা ঠিক বুঝতে পারবেন না এটা। নিচ্ছিদ্র জমাট অন্ধকার। এক হাত দূরের মানুষ পর্যন্ত ঠাহর করা যায় না।

অন্যান্য দিনের মত এদিনও চামুরচি টি এস্টেট পাহাড়ী জঙ্গলে রাত ঘন হয়ে নেমেছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার উৎকট আওয়াজে কানে তালা লাগার দাখিল। চারিদিকে হিংস্র শ্বাপদ বেরিয়েছে আহারের সন্ধানে। রয়েছে বুনো ভালুকের ত্রাস। থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে জন্তু-জানোয়ারের গর্জন হুঙ্কার। ভয়ে সূর্যর শরীরের রক্ত যেন জল হয়ে এলো।

এই ঘন নিবিড় জঙ্গলে আজ সূর্য সম্পূর্ণ একা। নিরস্ত্র। সারা দিনের উপোষে দেহ যেন আর চলতে চায় না। তারপর একটা অনিশ্চয়তার দরুণ মন অবসন্ন, ক্লান্ত।

সূর্য সেই অন্ধকার পাহাড়ী রাস্তাতেই যথাসম্ভব দ্রুত সামনের দিকে পা চালিয়ে দিল। সামনে অন্ধকারের মজবুৎ দেয়াল। পথের দু'পাশে গভীর খাদ আর ঘন জঙ্গল। মৃত্যু যে কোথায় ফাঁদ পেতে রেখেছে—কে জানে! অথচ পালাবার কোন পথ নেই। সূর্য ক্রমে ক্রমে মরিয়া হ উঠতে লাগল। যা আছে আজ বরাতে। যে ভাবেই হোক সমস্ত বাধা বিঘ্ন পার হ তাকে রেড ব্যাঙ্ক টী এস্টেটের নিরা আশ্রয়ে আজ পৌঁছাতেই হবে। মনে ম সে ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করল। ঠিক জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে।

সূর্য ভাবল—এই যে চারপাশের জঙ্গল গাঢ় রাত—এটা স্বয়ং ঈশ্বর-সৃ একটা বিরাট সেটআপ। অন্ধকারের ম শুটিং চলছে। অদৃশ্যে পরিচালক দাঁড়ি সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। অভিনেত আসছে যাচ্ছে সংলাপ বলছে—ঠিক ফ্লো মধ্যে যা যা হয়।

কটা বাজে এখন? সূর্য কব্জি উ ঘড়ি দেখল—রেডিয়াম দেওয়া ঘড়িতে ত রাত ন'টা। হঠাৎ সেই গাঢ় অন্ধকার করে সূর্য বেশ কিছুটা দূরে এ আলোর মত কি দেখতে পেল। সঙ্গে স থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। এত রাত্রে ওখা আলো জ্বালাল কে? নাঃ, আলোটা স্থি হয়েই জ্বলছে। তাহলে নিশ্চয়ই লোকাল হয়ত কোন পাহাড়ী গ্রাম। সূর্য আ লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিল

এর মধ্যে টিপ টিপ করে বৃষ্টি শু আরম্ভ করেছে। সূর্যর শীত শীত কর লাগল। তারপর এসে দাঁড়াল একটা কু ঘরের সামনে। ছিটে বেড়ার ফাঁক থে আলোর রেখা বেরিয়ে আসছে।

গায়ত্রী মুখার্জি । ফটো ঃ অমৃত

সূর্য ঘরের দরজায় ধাক্কা দিল—কে আছ ভাই ভেতরে একটু খুলবে?

ভেতর থেকে প্রথমে কোন জবাব এল না। সূর্য আবার দরজায় ধাক্কা দিল।

এবার দরজা খুলে গেল। একজন পাহাড়ীয়া মুখ বাড়িয়ে ওকে দেখে অবাক। আপাদমস্তক ভাল করে দেখে নিয়ে বলল—এখানে কি করে এলে বাবু? এত রাত্রে?

সূর্য বলল—সে অনেক কথা। পরে বলব। আগে আমাকে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দাও—

লোকটি তাড়াতাড়ি দরজা ছেড়ে দাঁড়াল। —আসুন আসুন।

সূর্য ঘরে ঢুকে বুঝল এটা একটা ছোট্ট চায়ের দোকান। পথের ধারে একটা টিলার ওপরে কোনগতিকে তৈরী করা ঘর। মাথায় ঠেকে যায় চাল। কোনার দিকে অনেকগুলি বড় বড় হাড়ি। সেখান থেকে উৎকট গন্ধ বেরুচ্ছে। সূর্য বুঝল এটা চোলাই মদেরও আড্ডা। বড় রাস্তার পাশে এই রকম দু' একটা দোকান তার আগেও চোখে পড়েছে।

বেঞ্চিটা সাফ করে দিয়ে লোকটা ওকে বসতে দিল। তারপর জানতে চাইল—বাবু চা খাবে?

—চা? নিশ্চয় নিশ্চয়—আর কিছু পাওয়া যায়? বড্ড ক্ষিদে লেগেছে ভাই।

—চা আর ডোলাই মদ ছাড়া আর কিছু নেই বাবু। সব বিক্রি হয়ে গেছে।

—আচ্ছা তাহলে শুধু চা দাও।

লোকটা উনুনে ঠান্ডা হয়ে যাওয়া চায়ের নোংরা কেটলীটা ঝট করে বসিয়ে দিয়ে বলল—এখানে কীভাবে এলে বাবু? তোমার গাড়ী বিগড়েছে নাকি?

সূর্য বলল—না ভাই, আমি হাঁটা পথে যাচ্ছি। এখান থেকে রেড ব্যাঙ্ক টী এস্টেট কতটা দূর ভাই? আমি ওখানে যাচ্ছি।

—সে প্রায় দশ-বারো মাইল রাস্তা। কিন্তু রাত্রে পায়ে হেঁটে তুমি তো সেখানে যেতে পারবে না।

—কেন?

—পথে অনেক বিপদ আছে। আমরাই যেতে সাহস করি না আর তুমি যাবে! তাহলে সকালে লোকে দেখবে তোমার লাশ পড়ে আছে খাদানের মধ্যে—

রক্ত যেন ঠান্ডা হয়ে গেল আর একবার। তখন সূর্য লোকটাকে সব খুলে বলল।

সব শুনে লোকটি বলল—ঠিক আছে তুমি রাতটা এখানেই থাক, কাল সকালে আমি তোমাকে ওখানে যাবার ব্যবস্থা করে দেব। এই রাস্তা দিয়ে সকালে হরদম গাড়ী যাতায়াত করে। কোন চিন্তা নেই।

লোকটি গরম চায়ের কাপ তুলে দিল সূর্যর হাতে।

সেই কাপে সূর্য সবে চুমুক দিয়েছে, হঠাৎ তার মনে হল দূর থেকে একটা গাড়ীর আওয়াজ আসছে যেন। সূর্য কান খাড়া করে শুনল—হ্যাঁ, গাড়ীরই আওয়াজ। লোকটাও শুনল। বলল—হ্যাঁ একটা গাড়ী এদিকেই আসছে। কিন্তু তুমি তো উল্টো দিকে যাবে—

সূর্য তাড়াতাড়ি চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। অনেক দূরে মোটরের হেড লাইটের আলো দেখতে পাওয়া গেল। কিন্তু একটা বাঁক ঘুরে গাড়ীটা আবার চোখের আড়ালে চলে গেল।

লোকটি বলল—কোন চিন্তা নেই, গাড়ী এদিকেই আসছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ীটা এসে সূর্যর পাশে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ভেতরে ড্রাইভিং সীটে স্টিয়ারিং ধরে শ্যামল বসে আছে ওর দিকে তাকিয়ে।

আর সূর্য পাথরের মত গাড়ীর পাশে রাস্তায় দাঁড়িয়ে।

কোন কথা নয়।

হঠাৎ রাজ্যের অভিমান সূর্যর চোখে যেন জল এসে গেল। হঠাৎ করে সে কথা বলতে পারল না।

শ্যামল তাড়াতাড়ি নেমে এসে ওর কাঁধে হাত রাখল। তারপর আস্তে আস্তে বলল—সূর্য কিছু মনে করিস্ না ভাই আমার দোষেই আজ এটা ঘটল.....

সূর্য কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর নিঃশব্দে গাড়ীতে গিয়ে বসল। শ্যামল গাড়ী ব্যাক করিয়ে নিয়ে রেস্ করল রেড ব্যাঙ্ক টী এস্টেটের পথে।

বাংলোর গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন অসীম দত্ত। সূর্যকে দেখে তিনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বললেন—সূর্যবাবু ফরগট অল অ্যাভ ফরগীভ্।

সূর্য ম্লান হাসল।

তারপর রাত্রে খাবার সময় তপন সিংহ সূর্যকে দেখে বলে উঠলেন—কোথায় ছিলে সূর্য? খেলার সময় তোমায় যে দেখলাম না। শরীর খারাপ হয়েছে নাকি!

সূর্য আমতা আমতা করে বলল—হ্যাঁ, তপনদা, না মানে...

সেই রাত্রেই ক্যাম্পে একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটল।

গভীর রাত্রে সূর্যর হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখে বারান্দা দিয়ে অনেকে ছোটাছুটি করছে। দারুণ উত্তেজনা।

সূর্য একজনকে জিগ্যেস করে জানল যে দাদামণির (অশোককুমার) হার্ট স্ট্রোক হয়েছে—

—সেকি!

শ্যামল ছুটছিল পাগলের মত। সূর্য গেল তার পেছন পেছন। চা বাগানের ডাক্তার তখন বলছেন, ওঁকে এক্ষুনি কলকাতার বড় ডাক্তার দিয়ে চেক্ করা দরকার—

অশোককুমারের স্ত্রী শোভাদেবী সঙ্গে ছিলেন। অশোককুমার ওঁকেই প্রথম অসুস্থতার কথা জানান। তারপর একে একে সবাই জেনেছে। তপন সিংহ তখুনি ট্রাংক কল বুক করলেন কলকাতায়। নেপাল দত্তকে ফোনে পাওয়া গেল। উনি জানালেন, আমি দেখছি কি ব্যবস্থা করা যায়।

তারপর যোগাযোগ করা হল প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে। উনি তখন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকে অত রাতে ঘুম ভাঙ্গিয়ে অশোককুমারের হার্ট স্ট্রোকের কথা বলা হল। প্রফুল্ল সেন বিব্রত হয়ে তৎক্ষণাৎ ফোন করলেন হেলথ মিনিস্টারকে। হেলথ মিনিস্টার যোগাযোগ করলেন এশিয়ার অন্যতম বিখ্যাত হার্ট স্পেশালিস্ট ডাক্তার মণি ছেত্রীকে।

ডাঃ মণি ছেত্রী সিকিমে যাবার জন্য তখুনি রেডি হয়ে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট সহকর্মীকে ফোন ঘুম ভাঙ্গিয়ে বললেন, রেডি হও, সিকিম যেতে হবে। অশোককুমারের হার্ট স্ট্রোক হয়েছে—

কলকাতা আর সিকিমের ফোন লাইনে সারাক্ষণ খবরাখবর দেওয়া নেওয়া চলছে। প্রফুল্ল সেন বললেন—যেমন ভাবেই হোক অশোককুমারকে সুস্থ করে তোলা চাই, উনি আমাদের গেস্ট। চিকিৎসার কোন ত্রুটি না হয় যেন।

তপন সিংহ ফোন ধরেই বসে আছেন। কলকাতা তাঁকে জানাল, চিন্তা নেই, দেড় থেকে দু ঘন্টার মধ্যে ডাক্তার মণি ছেত্রী ওখানে গিয়ে পৌঁছাচ্ছেন। ওঁর সঙ্গে একদল স্পেশালিস্টও যাচ্ছেন।

কিন্তু গন্ডগোল বাধল প্লেন সার্ভিস নিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রফুল্ল সেন সিভিল অ্যাভিয়েশনকে বললেন, এটা এমার্জেন্সী।

প্রাবন্ধিক সত্যজিৎ রায়

বালা ।. সত্যজিৎ রায়

'ছবি করা খুব সহজ নয়। ফিল্মটাকে রক্তের মধ্যে চিন্তার সঙ্গে ছড়িয়ে দিতে না পারলে ভালো ছবি করা যায় না। সেই সঙ্গে এই মাধ্যমটি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানেরও দরকার। নাহলে ভালো ছবি হবে কি করে?

কথাগুলো বলেছেন সত্যজিৎ রায়। জনৈক সাংবাদিক যখন তাঁকে সাম্প্রতিক বাংলা ছবির গুণগত দুর্দশা সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলেছিলেন তখন।

দর্শকের রুচি-পরিবর্তন সম্পর্কেও তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন—'শহরাঞ্চলেই সামান্য কিছু দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই কিন্তু একটা ছবির সাফল্য তো মাত্র সেই কটি মুষ্টিমেয় দর্শকের ওপর নির্ভর করে না। বাকি দর্শকরা তো এখনও সেই তিমিরেই।' দর্শকের রুচি পরিবর্তনের দায়িত্ব অবশ্য প্রযোজক - পরিচালকদের কম নয়—সেকথা তিনি অস্বীকার করেননি।

সাংবাদিকদের সঙ্গে সত্যজিৎ রায় কথা বলছিলেন গত ২৮ মে। উপলক্ষ ছিল—তাঁর নতুন প্রবন্ধের বই (সম্ভবতঃ ইংরেজীতে প্রথম) 'আওয়ার ফিল্মস দেয়ার ফিল্মস' ওরিয়েন্ট লংম্যানের ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত হচ্ছে। আগামী নতুন অর্ডিনান্স সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বললেন—'আমাদেরও এখন ছবি করে বসে থাকতে হয়। অর্ডিনান্স হয়তো সে ব্যাপারে কোনো কাজে লাগতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হোল ছবির সংখ্যা এবং প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা অচিরে বাড়ানো। নইলে কি হবে বলা মুশকিল।'

সেন্সরশিপের কড়াকড়ি সম্পর্কে সত্যজিৎ রায় অবশ্য বিশেষ চিন্তিত নন। পশ্চিম বাংলার ছবি এই কড়াকড়ির ফলে খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। সেই সঙ্গে তিনি এও বললেন যে সেকস এবং ভায়োলেন্সের টোটাল ব্যান—নিশ্চয়ই হবে না। বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনানুযায়ী নিশ্চয়ই আইন শিথিল হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনের অব্যবহিত পূর্বে আকাদেমি হলে বইটির মুক্তি উপলক্ষে ভাষণ দিতে গিয়ে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় সত্যজিৎ রায়ের শিল্পচিন্তা ও সংগীত চেতনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সুনীতি চট্টোপাধ্যায় শ্রীরায়ের তিন পুরুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের উল্লেখ করেন। এবং স্বভাবসিদ্ধ হালকা ভঙ্গিতে তাঁর ভাষণ উপভোগ্য হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মৃণাল সেন ও ওরিয়েন্ট লংম্যানের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান মিঃ টি আবদাল্লা।

অনুষ্ঠানের পরবর্তী আকর্ষণ ছিল সত্যজিৎ রায়ের দুখানি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ডকুমেন্টারী ছবির প্রদর্শনী। এক : ইনাব আই; দুই : তাঁর নতুন ছবি খ্যাতনাম্নী নৃত্যশিল্পী বালা সরস্বতীর ওপর তোলা 'বালা'।

নি খ

ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের যে প্লেন আছে—ডাক্তাররা তাতেই ফ্লাই করবেন। আপনারা সব ব্যবস্থা করে রাখুন—

স্বয়ং চীফ মিনিষ্টার ফোন করছেন, অতএব সঙ্গে সঙ্গে সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল। ডাক্তার ছেত্রী ও অন্যান্য চিকিৎসকেরা তখন দমদম এয়ারপোর্টের পথে ছুটে চলেছেন মোটরে। কলকাতা সিকিমকে জানান, ওঁরা রওনা হয়েছেন...

একজন চলচ্চিত্র অভিনেতার জীবনরক্ষায় এমন ব্যবস্থা সম্ভবতঃ এর আগে কোন দেশে নেওয়া হয়নি। এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। একটা গভর্ণমেণ্ট তোলপাড় হয়ে গেল সেই রাতে। চতুর্দিকে ফোনের পর ফোন গেল। এবং রাত আড়াইটার মধ্যে দমদম এয়ারপোর্ট থেকে প্লেন আকাশে উড়ল। এদেশের একদল শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক নিয়ে—অশোককুমারকে বাঁচাতেই হবে।

ভোরের আলো ফোটবার আগেই ডাক্তার মণি ছেত্রী পৌঁছে গেলেন অশোককুমারের শিয়রে। সঙ্গে সঙ্গে ই, সি জি করা হল। রিপোর্ট দেখে আশ্বস্ত হলেন ডাক্তার ছেত্রী। না, ভয়ের কিছু নেই। উনি সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ দিলেন অশোককুমারকে। শোভা দেবীর দুর্ভাবনা ঘুচল কিছুটা। কলকাতা বলেছিল—দরকার পড়লে অশোককুমারকে নিয়ে কলকাতায় ফিরবে প্লেন, কিন্তু তার প্রয়োজন পড়ল না। ডাক্তার ছেত্রী প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে সকালে কলকাতায় ফিরে গেলেন।

সূর্য অবাক। একটা আশ্চর্য রাত কাটল যেন। দু দুটো দুর্ঘটনা কানঘেঁষে বেরিয়ে গেল। চামুরচী টি এস্টেটের গভীর জঙ্গলেই তো তার শেষ হয়ে যাবার কথা। কিন্তু ঈশ্বরের কি অভিপ্রায়—সে নিরাপদেই সেখান থেকে ফিরে এল কল্লোলিত জীবনের আঙিনায়। আর অশোককুমার? তাঁকে কেন্দ্র করে যা ঘটল, তাতেই তো একটা রোমাঞ্চকর ছবি করা যায়।

রঞ্জন মজুমদার

কে এল কাপুর প্রোডাকসন্স

বিজ্ঞান ভবনে অনুষ্ঠিত জাতীয় পুরস্কার বিতরণ উৎসবে **আপনজন** ছবির প্রযোজক হিসাবে পুরস্কার নিচ্ছেন কে এল কাপুর প্রোডাকসন্সের রাজা কাপুর।

বছর আষ্টেক আগে নভেম্বরের এক সন্ধ্যায় পরিচয় হয়েছিল কে এল কাপুর প্রোডাকসন্সের স্বত্বাধিকারীদের সঙ্গে। ভাই রাজা কাপুর, বিনোদ কাপুর আর ওঁদের মামা রবীন্দ্রনাথ কাপুরই হচ্ছেন এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। ফিল্মপাড়ায় কথা রবীন্দ্রনাথ কাপুর মামাজী নামেই বেশি পরিচিত। এবং তিনিই এই প্রোডাকসন্স কোম্পানীর প্রধান কর্তা। আমি তাই যখন সাক্ষাৎকারের আর্জি নিয়ে মামাজীকে ফোন করেছিলাম, তিনি বিনম্র হাসিতে বলেছিলেন—'আমিতো একা নই, রাজা ওরাও রয়েছে!'

—হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, ও'রাতো আছেনই, তবে আপনিতো ওঁদের গাইড! সেইজন্যে আর কি?

সাক্ষাৎকারের সময়ও কথার ফাঁকে ফাঁকে বলেছেন—'দেখবেন লেখায় রাজা-বিনোদের নাম যেন বাদ না পড়ে!'

মামাজী একথা বলেছিলেন ভাগ্নেদের প্রতি গভীর ভালবাসার তাগিদে, প্রফেশন্যাল কোনো ফর্মালিটি নয়। ক'দিন বাদে রাজাবাবুর সঙ্গে দেখা হতেও লক্ষ্য করেছি ও'রা কতখানি শ্রদ্ধা করেন মামাজীকে।

রাজা কাপুর বলেছিলেন—'মামাজীই তো আমাদের সব। ফিল্মের ব্যবসা, হোটেল ব্যবসা সব কাজেই মামাজী আমাদের ফ্রেন্ড ফিলসফার অ্যান্ড গাইড।'

* * *

প্রথম পরিচয়ের দিন পরিচালক তপন সিংহ তাঁর 'আপনজন' ছবির প্রযোজক হিসাবে মামাজীকে সাংবাদিকদের সামনে হাজির করতে গিয়ে বলেছিলেন—'প্রথম যখন এঁরা আমার কাছে ছবি করার প্রোপোজাল নিয়ে আসেন, আমি বারন করেছিলাম। ফিল্ম লাইন বড় রিস্কের লাইন। তা ও'রা শুনলেন না। ছবিটা আমাকেই করতে হোল। কী জানি হয়তো, এটিই ওঁদের প্রথম ও শেষ ছবি।' বলে তিনি হাসলেন।

মামাজী নিজেও এই কথার প্রতিধ্বনি করেছিলেন সেদিন। 'ফিল্ম আমাদের ব্যবসা নয়। একটা ছবি করলাম, আর করবো না।'

কিন্তু আনন্দ সংবাদ—আটষট্টির সেই কথা তাঁরা রাখতে পারেননি। এই ছিয়াত্তর সালে তাঁদের হাতে দু-দুখানা ছবি। প্রথমে ছিলেন প্রযোজক, এখন পরিবেশনার কাজও করছেন। মূলত নিজেদের ছবিই পরিবেশন করেন। মোদ্দা ব্যাপার ফিল্ম ব্যবসার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে জড়িয়ে গেছেন। বাংলা ছবির জগতে কে এল কাপুর ব্যাপারটি এখন এক উচ্চপ্রশংসিত প্রতিষ্ঠান।

প্রথমেই তাই মামাজীকে যখন জিজ্ঞেস করলাম—'আপনজনে'র পর আরো ছবি করবেন। মতের এই পরিবর্তন কেন হোল?' তিনি কি উত্তর দেবেন ভেবে পেলেন না। আসলে এই ছবির রাজ্যে কি এক নেশা যেন আছে! বোধহয় সৃষ্টির নেশা। যিনি আসেন তিনি আর ফিরে যান না, ফিরতে পারেন না।

সেই টানেই জড়িয়ে গিয়েছিলেন মামাজী আর তাঁর ভাগ্নেরা। স্টুডিওর পথে গাড়ীতে যেতে যেতে যেদিন তাই অরুন্ধতী দেবী 'মেঘ ও রৌদ্র' ছবি করার প্রস্তাব করেছিলেন, মামাজী স্ক্রিপ্ট না শুনেই বলে দিয়েছিলেন 'ছবি করুন, আমি আছি।'

ইতিমধ্যে ছায়াবাণীর পরিবেশনায় 'আপনজন' রিলিজ করল। সুপার হিট ছবি। 'এক পয়সা ইনভেস্ট না করেও পরিবেশক মোটা টাকা কমিশন বাবদ পেলেন। ভেবে দেখলাম—সব পয়সাই যখন আমার, তখন অন্যকে ডিস্ট্রিবিউশন দিয়ে অত টাকা কমিশন দিই কেন?'

সুতরাং পরবর্তী ছবি 'মেঘ ও রৌদ্র' থেকে শুরু করলেন কে এল কাপুর ডিস্ট্রিবিউটররা। 'আপনজন' তাঁদের শুধু মাত্র পয়সাই দিল না, খ্যাতি দিল, সম্মান দিল। বি এফ জে এ থেকে পেলেন একটি পুরস্কার, দিল্লী থেকে জাতীয় সম্মান নিলো সেরা বাংলা ছবি হিসাবে। রাজা কাপুর ভি ভি গিরির হাত থেকে পুরস্কার নিয়ে এলেন।

ক বছরে ছবির ব্যবসায়ে হাত পেকেছে। স্বর্গত প্রযোজক হেমেন গাঙ্গুলীর সঙ্গে ফিফটি-ফিফটি শেয়ারে হিন্দী 'আপনজন' করবেন ঠিক হোল। এও ঠিক হোল হিন্দী সাগিনাতেও এঁদের আধা-আধি শেয়ার থাকবে। গুলজারের করা হিন্দী স্ক্রিপ্ট রেডি।

কিন্তু বম্বেতে আর্টিস্ট কন্ট্রাক্ট করতে গিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরলেন রাজাবাবু। মামাজীকে সব বলতে তিনি বললেন—'ওসব পার্টনারশিপে বিজনেস দরকার নেই। হিন্দী ছবিও করব না।' ড্রপড্ হোল প্ল্যান দুটো।

ইতিমধ্যে বেশ কিছু টাকা খরচও হয়ে গেছে। তপন সিংহই তখন মামাজীকে বললেন 'দেখুন মামাজী, আপনার কিছু টাকাতো খরচ হয়েইছে, হিন্দীতে করছেন না। আসুন আরেকটা ছবি করে দিই।' তপনবাবুর সঙ্গে মামাজীদের সম্পর্ক তখন ঠিক প্রফেশন্যাল নয়, ঘনিষ্ঠতা হয়েছে।

কে এল কাপুরের ব্যাপারে তপন সিংহের দ্বিতীয় ছবি তৈরী হোল 'এখনই'। এটিও হিট। বলতে বাধা নেই এই 'আপনজন' এবং 'এখনই' ছবি দুটি তপনবাবুকে নতুন রূপে হাজির করলো। আধুনিক যুবসমাজ আর যুগযন্ত্রণার টুকরো টুকরো চিত্র তুলে ধরে দর্শকের কাছে পরিচালকের নতুন ইমেজ তৈরি হল।

এই ছবির পর তপনবাবু দুটি হিন্দী ছবি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ইচ্ছে

থাকলেও মামাজীরা তপনবাবুকে দিয়ে ছবি করাতে পারলেন না। নতুন পরিচালকের কাছে যেতে হোল তাঁদের। পীযূষ বসুকে দিয়ে করালেন 'বিকালে ভোরের ফুল'। এই প্রথম এঁদের ছবি ফ্লপ করলো। আগেকার ছবিগুলিতে তথাকথিত স্টার না থাকা সত্ত্বেও সুপার হিট হয়েছিল ছবিগুলো। কিন্তু এ ছবিতে স্টার নিয়েও বাঁচা গেল না। সুমিত্রা মুখার্জি, উত্তমবাবুর সপ্রশংস অভিনয় সত্ত্বেও ছবিটা চললো না। এই ধাক্কা সামলাতে প্রায় বছরখানেক চুপচাপ রইলেন।

—এ ছবির এই ফেট হোল কেন—অ্যানালাইজ করেছেন? মামাজীকে এই প্রশ্নটা করতে তিনি বললেন, 'স্ক্রিপটে গণ্ডগোল ছিল। লেখা শুনেই আমরা বলেছিলাম কিছু কিছু জায়গায় বদল করতে। উত্তমবাবুও বলেছিলেন পীযূষ বসুর সঙ্গে আলোচনা করে স্ক্রিপট পাল্টাবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়নি।'

রাজা কাপুরেরও সেই এক কথা। ছবির শেষটা দেখে বলেছিলেন—'ভালো লাগছে না পীযূষবাবু।' তিনি ওঁদের কথায় কান না দিয়ে ভরসা দিলেন বরং। জোর দিয়েই পীযূষ বসু-উত্তমকুমার বলেছিলেন—'ভাববার কিছু নেই, দেখুন না কি হয়!'

যা হবার তাই হোল। সকলের আশা ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করে 'বিকালে ভোরের ফুল' সকালেই শুকোলো। এই ছবির একটা লাভ—নায়িকা সুমিত্রা মুখার্জির তারকায় রূপান্তর।

* * *

তপন সিংহ তখনও ব্যস্ত হিন্দী ছবি নিয়ে। তাই তরুণ মজুমদারের সঙ্গে যোগাযোগ করে শুরু করলেন নতুন ছবি 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ'। রুচিশীল পরিচ্ছন্ন ছবি করিয়ে হিসাবে তরুণবাবু নিজের দক্ষতা আবার প্রমাণ করলেন এই ছবিতে। আর বাংলা ছবি পেল নতুন নায়িকা মহুয়া রায়-চৌধুরীকে। সুপার সুপার হিট ছবি।

কে এল কাপুর ব্যানার-এর জয়-জয়কার চারদিকে। 'আপনজন' 'এখনই'এর দেশ-বিদেশে খ্যাতি এবং পরবর্তী ছবিগুলির ব্যবসায়িক সাফল্য তাঁকে ঘরে-বাইরে সসম্মানে প্রতিষ্ঠা করলো।

বিকালে ভোরের ফুল
উত্তম । সুমিত্রা

এখন মামাজীরা দুখানি ছবি প্রযোজনা করছেন। এক—তপন সিংহের 'এক যে ছিল দেশ', দুই—অরবিন্দ মুখার্জির 'মন্ত্রমুগ্ধ'। দুখানিই হাসির ছবি। প্রথমটি সম্ভবত এ বছরেই রিলিজ করবে। মন্ত্রমুগ্ধের কাজ এখনও চলছে।

* * *

বাংলা ছবির ব্যবসা, অর্ডিন্যান্স, রিলিজ, হাউস, ভালো ছবির অভাব, হিরোইন সমস্যা ইত্যাদি হাজারো আলোচনার ফাঁকে মামাজীর যে বক্তব্যটুকু বের করতে পারছি সেটুকু হোল—(ক) শুধু অর্ডিন্যান্স করে কিছু হবে না। বাংলা ছবির সংখ্যা না বাড়ালে অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী কাজ পাওয়া যাবে না। (খ) ছবি ভালো হলে যে কোন হলেই তাকে রিলিজ দেয়া যেতে পারে। হল কোনো বিরাট ফ্যাকটর নয়। (গ) প্রদর্শকদের মডেল টার্মসে রাজী করানো সম্ভব হবে কি? (ঘ) প্রমোদ করের অন্তত পক্ষে অর্ধেক ছবির প্রযোজককে ফিরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। (ঙ) টিকিটের দাম বাড়াতে হবে (কলকাতাতেই নাকি সবচেয়ে কম মূল্যের টিকিট রয়েছে। (চ) প্রদর্শকের সঙ্গে রিজনেবল প্রোটেকশন এবং পার্সেন্টেজ বসিয়ে চুক্তি হওয়া দরকার। (ছ) বাংলা ছবির ব্যবসা যেভাবে সংকুচিত হচ্ছে তাতে আর কতদিন ফিল্মের ব্যবসা চালাতে পারবেন সন্দেহ। (জ) এ সত্ত্বেও হিন্দী ছবি পরিবেশনা বা প্রযোজনার কথা মামাজী ভাবছেন না। (ঝ) ছবির আর্থিক সাফল্য-অসাফল্য নিয়েই মামাজীর যত ভাবনা। পুরস্কারের ব্যাপারে তিনি নেই। সেখানে বড় ভাগ্যে রাজা কাপুরই যান সর্বদা। (ঞ) জন্মসূত্রে পাঞ্জাবী হলেও এই কলকাতা মামাজী এবং ওঁর ভাগ্নেদের প্রিয় শহর, প্রাণের জায়গা। এখানে থাকলে চিরদিন বাংলাতেই ছবি করবেন—এমন বাসনা রয়েছে।

সুতরাং বাংলা ছবির রাজ্যে কে এল কাপুর প্রোডাকসন্সের অস্তিত্ব অবশ্য প্রয়োজন।

'চরস'

প্রযোজনা—সাগর এণ্টারপ্রাইজ

এই ছবির নায়ক এক বিত্তবান প্রবাসী ভারতীয়ের একমাত্র পুত্র। বিদেশে বসবাস করার অসুবিধা থাকায় ভারতে ফিরে আসতে চাইলেন পুত্র ও কন্যাকে নিয়ে। কিন্তু ভারতে ওর বাড়ী, সম্পত্তি, মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী দেখাশোনার দায়িত্ব যার ওপর দিয়েছিলেন, সেই কুচক্রী সমস্ত কিছুই চড়া দামে বিক্রী করে সেই টাকায় বিদেশে ভারতীয় চরস স্মাগলিং করার কাজে ব্যয় করেছে। সুতরাং বিদেশে থাকতেই নায়ক, তার পিতা ও ভগিনীকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা হোল। পিতা মারা গেলেন, কন্যা অপহৃত হলেন কিন্তু পুত্র বেঁচে ভারতে ফিরে এসে জানতে পারলেন কীভাবে তাদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিকে গ্রাস করেছে। সুতরাং পুলিশের সহযোগিতায় কুচক্রীদের গ্রেপ্তার করার দায়িত্ব উনি নিতে রাজী হলেন। ওখানে এক সুন্দরী নর্তকী তাকে কুচক্রীদের হাত থেকে জীবন রক্ষা করেছিলো।

বিদেশে গিয়েও ওর ভারতীয় নৃত্য ও গীত দেখে অভিভূত হয়ে পড়লেন এবং ঘনিষ্ঠতাও বেশ বেড়ে চললো। কুচক্রীরা এই নর্তকীর নৃত্য ও গীতের আসবাবের মধ্যে বিদেশে লক্ষ লক্ষ টাকার চরস পাঠিয়েছে সকলের অলক্ষে। বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে নায়ক কুচক্রীকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হলেন এবং ভগিনীকে উদ্ধার করলেন, দয়িতাকেও ফিরে পেলেন।

'চরস' স্মাগলিং কেন্দ্র করে এদেশে ও বিদেশের একাধিক ছবি মুক্তি পেয়েছে। সুতরাং লেখক ও পরিচালক রমানন্দ সাগর সেদিক থেকে কোন নতুন পথ নির্দেশ করতে পারেন নি। ছবিতে অ্যাকশন দৃশ্যে উত্তেজনার বদলে নৃত্যগীত ও হাস্য কৌতুকের মধ্যে দিয়ে ডরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। এ ছবির অন্যতম সম্পদ বহির্দৃশ্যের আলোকচিত্র গ্রহণ, সম্পাদনা ও অন্যান্য আঙ্গিকের কাজ। লক্ষ্মীকান্ত ও পেরেলালের সঙ্গীত পরিচালনাও সুন্দর। অভিনয়ে নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় ধর্মেন্দ্র ও হেমা বেশ সাবলীল। অন্যান্য চরিত্রে নাজির হুসেন (বাবা), অরুণা ইরানী (বোন), অজিত (কুচক্রী), আমজাদ খাঁ (সহযোগী) সুজিত-কুমার আসরাণী মমতা ও অন্যান্যরা চিত্রনাট্যর দাবী মিটিয়েছেন।

মৃগয়া

মিঠুন চক্রবর্তী

প্রাক-স্বাধীনতা সময়ে সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলে স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর সামন্ত তান্ত্রিক ব্যবস্থায় জোতদার - জমিদারদের অত্যাচার - অবিচারের একটি উপকাহিনী নিয়ে মৃণাল সেনের নতুন ছবি 'মৃগয়ার গল্প। রাতের আঁধারে ক্ষেতের ফসল নষ্ট করতে আসে পাশের জঙ্গল থেকে ভালুকের দল আর দিনের আলোয় আসেন জমিদার সঙ্গে হাঁ-হুজুর জো-হুজুর নায়েব মাথার ঘাম পায়ে ফেলা ফসলের সিংহভাগ কেড়ে নিতে। টিন বাজিয়ে আগুন জ্বালিয়ে রাতের ভালুককে তাড়ানো যায় বটে কিন্তু দিনের আলোয় জমিদারের লোলুপ দৃষ্টিকে এড়ানো মুশকিল। মাঝে মাঝে তাঁদের চোখ ঘরের কোণেও ঘোরাফেরা করে।

ছবির নায়ক জাত শিকারী দুখিয়া এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সক্রোধে জমিদারকে খুন করে। কারণ তার স্ত্রী ডুংরি লাঞ্ছিতা হয়েছিল জমিদার হাতে। দুখিয়ার ফাঁসি হয়। কিন্তু ঐ জাতির মধ্যে প্রতিবাদের ভাষা যেন জেগে ওঠে সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

এ ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন মৃণাল সেন ও মোহিত চট্টোপাধ্যায় (কাহিনী : ভগবতীচরণ পানিগ্রাহী)

এই ছবির প্রধান আকর্ষণ হবে নতুন দুই শিল্পী মিঠুন চক্রবর্তী ও মমতা শংকর। প্রথমজন পুনা ইনস্টিটিউটের ছাত্র। শুনলাম দারুণ কাজ করেছেন। (বম্বের দু-তিনটি ছবিতে ওঁর কাজের কথা চলছে আর কলকাতায় অজিত লাহিড়ীর ছবিতে অবশ্যই থাকছেন)। দ্বিতীয়জন উদয়-অমলা কন্যা নৃত্যশিল্পী মমতাশংকরের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। ডুংরি চরিত্রে তাঁর অভিনয়ের প্রশংসায় ইউনিটের সবাই মুখর। এছাড়াও শিল্পী তালিকায় আছেন জ্ঞানেশ মুখার সাধু মেহের অনুপকুমার সজল রায়চৌধুরী অসিত ব্যানার্জি প্রমুখ। কে কে মহাজনকৃত ছবির রঙীন ফটোগ্রাফী নাকি দর্শনীয় হয়েছে। সাঁওতাল পরগণার বর্ষিত অঞ্চলের চেহারাটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর হাতে: আর সলিল চৌধুরীর সংগীত সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই।

নাটমঞ্চ

লাইম লাইট-এর 'ধ্বংস'

পাহাড়ী অঞ্চলের একটি আধুনিক ও বিলাসবহুল বাঙ্গলো প্যাটার্ণের বাড়ির কয়েকটি সুখী, বিলাসী, স্বার্থপর এবং সেই সঙ্গে একজন লেখক (বাড়ির মালিকের ছোট ছেলে), প্রেম বিহ্বল, পাহাড়ী পরিবেশ দেখে পুলকিত একটি রূপসী মেয়ে (বিপরীত স্বভাবের মানুষ লেখকের বড় ভাইয়ের শালী, বৌদি যার সঙ্গে দেবরের বিয়ে দিতে ইচ্ছুক), বৌদি, ক্রীতদাসেরও অধম পাচক ও চাকর ইত্যাদি কয়েকটি চরিত্র লাইম লাইট-এর 'ধ্বংস' নাটকের কুশীলব। এক ঝড়-জলের রাত ধ্বংস নামার ফলে যে অসহায় অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাই নিয়ে এই নাটকের কাহিনী বিস্তার (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নিশি-যাপন' গল্প অবলম্বনে)।

ঝড় জলের পরের সকালে দেখা গেল ধ্বংস নামার ফলে সেই বাড়িটি সমস্ত সভ্য পৃথিবী থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। সেই থেকে যত দিন যেতে লাগল তত লাঞ্ছিত খাদ্য শূন্য হয়ে আসতে লাগল, তার সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে লাগলো আধুনিক কালের সভ্যতার মুখোশধারী মানুষগুলির রূপ, খসে পড়তে লাগল স্বার্থপর, খনী, অসৎ মানুষগুলির মুখোশ—এমনি করেই কয়েকটি মানুষ স্বীকারোক্তি করে যখন সেই দুঃসহ অবস্থার হাত থেকে বাঁচতে চাইল তখন কণামাত্র খাদ্যও নেই সঞ্চিত।

এ কাহিনী, বলা যায় প্রতীক ভাবনায় চিহ্নিত। তাই মূল বক্তব্যটিও অন্য—এই অভিশপ্ত সভ্যযুগ ও তার মানুষকে ব্যঙ্গ করা। তাই স্বভাবতই সমাজ ও যুগ সচেতন দর্শককে এমন কাহিনীর বক্তব্য চঞ্চল করে তোলে। শেষের দিকে এমন একটা সময় আসে দর্শক যখন স্তব্ধ হয়ে যেন তারই মর্মান্তিক পরিণতি লক্ষ্য করে।

নাটকের শুরু ও শেষে প্রাক স্বাধীনতা-কালের অত্যাচারী, বিলাসী, ভোগী ও শোষক বৃটিশের একটি করে প্রতীক দৃশ্য দেখানো হয়েছে। নাটকার পরবর্তীকালের চরিত্রগুলির সঙ্গে যার একটা মানসিকতার দিক থেকে যোগসূত্র আবিষ্কারের প্রয়াস পেয়েছেন (নাটক, প্রয়োগ ও সংগীত শ্রীঅজিত সান্যাল)। তার বোধহয় বক্তব্য বৃটিশ এ-দেশ থেকে চলে গেলেও তার প্রেতচ্ছায়া রেখে গেছে স্বাধীনতার পরবর্তী মানুষদের একশ্রেণীর শোষক, স্বার্থপর, বিলাসী ও লোভী মানুষের মধ্যে।

সেদিক থেকে নাটকের উদ্দেশ্য অনেকটাই সফল। উত্তর ক্ষেত্রেই মোটামুটি একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য কাহিনী চুম্বকও রক্ষিত হয়েছে 'ধ্বংস' নাটকে। আর তাকে প্রায় স্বাভাবিক অভিনয় দিয়ে ফুটিয়েও তুলেছেন শিল্পীরা। তাই আলাদা করে কোন চরিত্রকেই যেন চিহ্নিত করা যায় না।

অভিনয়ে ছিলেন পুরুষের ভূমিকায় দিলীপ রায়, হিন্ময় পাল, দীপক সেনগুপ্ত, অজিত সান্যাল, নানীগোপাল ব্যানার্জি, প্রবীর নন্দী, শঙ্করব্রত মুখার্জি (এঁর রামবাহাদুর একটি সুন্দর টাইপ চরিত্র সৃষ্টি), টিনু গোস্বামী, শ্যামল দাস, কমল বসু ও গৌরহরি দাস। নারী চরিত্রে সুচেতা দাস সুচেতাচুঃ স্তুতব্রথত ধ্বজফতুজ তুরুকুশ্রীর তুশ্রী

শেষের দিকে সীতা সুন্দর, প্রতিমা দাস প্রায় আগাগোড়াই স্বচ্ছন্দ।

দ্বিতীয় মঞ্চের ভূয়সী প্রশংসা করতে হয়, আর প্রশংসা করতে হয় শ্রীপতি দাসের (শব্দ প্রক্ষেপণে)। অজিত মিত্রর আলোর কাজও সুন্দর।

এমন একটি ভিন্ন স্বাদের নাটক উপহার দেবার জন্য লাইম লাইটকে ধন্যবাদ।

পাইকপাড়ায় নাট্যানুষ্ঠান

পাইকপাড়ায় জাগৃতি সংঘের উদ্যোগে সম্প্রতি রাজা মণীন্দ্র রোডস্থিত রেডিও অফিস ময়দানে দুদিনব্যাপী এক উৎসব অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

স্বাধীনতা বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রথম দিন ব্যবস্থা হয় বিচিত্রানুষ্ঠানের এবং দ্বিতীয় দিন পরিবেশিত হয় মন্টু গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'আর্তনাদ' নাটকটি।

উভয় দিনের অনুষ্ঠানই দর্শক ও শ্রোতাদের প্রচুর আনন্দ দেয়।

সারকারিনা

কলকাতায় এমন একটি মঞ্চ উদ্বোধনের অপেক্ষায় ছিল, যার তুলনা শুধু ভারত বা এশিয়া নয়, উদ্যোক্তা ও স্রষ্টা অমর ঘোষের মতে পৃথিবীতেও বিরল। সম্পূর্ণ নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী একে তিনি দীর্ঘ দিন ধরে তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন।

এই মঞ্চটির বৈচিত্র্য হোল, এর চতুর্দিকে দর্শক বসে অভিনয় দেখবে আর শিল্পীরা মাঝখানের একটি গোলাকার মঞ্চে অভিনয় করবেন। মঞ্চটির আর এক বৈশিষ্ট্য এর দৃশ্য পরিবর্তন ঘটবে পুরো মঞ্চটি নিচে চলে গিয়ে। আর শিল্পীরা নিচে থেকে আসা ছাড়াও চারদিকের খোলা প্যাসেজ, দর্শক আসনের পিছনের দরজা ইত্যাদি দিয়ে মঞ্চে আসা যাওয়া করবে।

গত ২৯ জুন রথের দিন সারকারিনার শুভ সূচনার দিন নির্ধারিত ছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ঠিক তার আগের দিন রাত্রে রিহার্সাল দেবার সময় নাট্যকার পরিচালক অমর ঘোষ এক দুর্ঘটনায় পড়ে গুরুতরভাবে আহত হওয়ায় সাময়িকভাবে সারকারিনার উদ্বোধন বন্ধ থাকে।

শ্রীঘোষের আঘাত গুরুতর হলেও, তিনি বিপদমুক্ত বলে জানা গেছে।

সারকারিনার প্রথম নাটকের নাম 'তুষার যুগ আসছে।'

বল্লভপুরের রূপকথা

প্রখ্যাত বিজ্ঞাপন সংস্থা গ্যান্ট এডভারটাইজিং-এর রিক্রিয়েশন ক্লাব গত ২৮ মে কলামন্দিরে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন বাদল সরকারের জনপ্রিয় নাটক বল্লভপুরের রূপকথা'।

আপাতে সিরিওকমিক নাটক হলেও 'বল্লভপুরের রূপকথা' আসলে স্যাটায়ারধর্মী। হাসির আড়ালে উঁকি দেওয়া সেই ইঙ্গিতটুকুই নাটকের সার কথা।

হাসির নাটক এমনিতেই জমানো মুস্কিল, তার ওপর আবার এমন নাটক। কিন্তু মুক্ত কণ্ঠে বলতে হয় নির্দেশক পিকলু নিয়োগী। সম্পূর্ণ অ্যামেচার শিল্পীদের দিয়ে যেন অসাধ্য সাধন করিয়েছেন। প্রত্যেকটি চরিত্রকেই এক একটি টাইপ চরিত্র রূপান্তরিত করলেও টোটাল এফেক্ট তার ভালই হয়েছে।

এ নাটকের যে চরিত্রটি দর্শকদের সর্বাধিক প্রীত করেছেন তিনি পবনরূপী তিমিরবরণ দাস।

এ ছাড়া চুণী ব্যানার্জীর ভূপতি ও অরুণ ঠাকুরের সজীব এবং ধীরেন রায় ও বটকৃষ্ণ মন্ডল সুন্দর অভিনয় করেছেন।

অন্যান্য চরিত্রে নারায়ণ ঘোষ প্রভাস দাস ভক্তকৃষ্ণ নন্দী শিবানী ভট্টাচার্য ও চন্দনা চক্রবর্তী অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ। আবহসঙ্গীত নাটককে জমিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

—নাট্য সমালোচক

টেলিভিশন মানেই
"টেলিকিং"
অর্থাৎ
টি ভির রাজা।
আজই আসুন দেখুন শুনুন ও
কিনে খুসী হোন।
এ-ছাড়া আমাদের রয়েছে রেকর্ডার রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার, রেকর্ড চেঞ্জার স্টেরিও, টেপ রেকর্ডার, ট্রানজিস্টার রেডিও, টেপ রেকর্ডার, ট্রানজিস্টার রেডিওগ্রাম ইত্যাদি ইত্যাদি।
মেরামতের সুবন্দোবস্ত তো আছেই।
রেডিও এণ্ড ফটো স্টোরস্
৬৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিঃ-১৩
ফোন ঃ ২৪-৪৭৯৩

শতবর্ষের স্মরণীয়

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ২৪ জুলাই শিশির সম্প্রদায়ের অন্যতম স্তম্ভ শৈলেন চৌধুরী পরলোকগমন করেন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর বেলা ৪-৩০ ঘটিকায় প্রথম মঞ্চস্থ হয় তুলসী লাহিড়ী রচিত দুঃখীর ইমান। অভিনয়ে ছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (মাস্টার), কালী সরকার (ধর্মদাস), নীতীশ মুখোপাধ্যায় (জমিদার), কানু বন্দ্যো (গোমাল), ললাবতী (বিলাসী) প্রভা (ক্ষীরোদা) প্রভৃতি।

১৯৪৩-এর পটভূমিকায় রচিত দুঃখীর ইমানের মত নাট্যপ্রযোজনা শিশিরকুমারের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল।

শ্রীরঙ্গমে নতুন নাটকের মধ্যে জিতেন মুখোপাধ্যায় রচিত পরিচয় এবং গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের নবরূপায়ণ। তাছাড়া প্রেমাংশুর অতিথির তখৎ-এ-তাউস-এ জাহান্দার শা চরিত্রে শিশিরকুমারের অভিনয় বিশেষভাবে স্মরণীয়। পেশাদার রঙ্গমঞ্চে যোগদান করে শ্রীরঙ্গমে বা শ্রীরঙ্গমের বাইরে মফঃস্বলে যে সব নাটকে শিশিরকুমার প্রায়ই অংশ গ্রহণ করতেন সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য চন্দ্রগুপ্ত সীতা প্রফুল্ল সাজাহান আলমগীর রঘুবীর রিজিয়া সোমরথ ষোড়শী রমা বিজয়া অচলা জনা নরনারায়ণ প্রতাপাদিত্য সধবার একাদশী চিরকুমার সভা (চন্দ্র) বিরাজ বৌ রীতিমত নাটক মাইকেল মধুসূদন পান্ডবের অজ্ঞাত বাস প্রভৃতির।

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৭ জানুয়ারী শ্রীরঙ্গম থেকে বিদায় নেন। এখানেই গড়ে ওঠে বর্তমান বিশ্বরূপা। আবার শুরু হয় সেই নাট্য-পরিক্রমা। ভ্রাম্যমান সম্প্রদায় নিয়ে এখানে সেখানে অভিনয় করে বৃদ্ধবয়সে বুঝিরোজগরের ব্যবস্থা করেন।

১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারী ভারত সরকার পদ্মভূষণে ভূষিত করেন। তিনি তা প্রত্যাখান করেন।

১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের ৮ ও ১০ মে মহাজাতি সদনে যথাক্রমে আগমগীর ও রীতিমত নাটকে আলমগীর ও অধ্যাপক দিগম্বর চরিত্রে শেষ আত্মপ্রকাশ।

চলচ্চিত্রে নির্বাকযুগে তাজমহল পিকচার্সের 'আঁধারে আলো' চিত্রখানির পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন এবং অভিনয় করেন। পরিচালনা দায়িত্ব অসমাপ্ত রেখে ম্যাডান কম্পানীতে যোগদান করলে চিত্রখানি সমাপ্ত করেন নরেশচন্দ্র মিত্র। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে 'আঁধারে আলো' মনমোহন থিয়েটারে মুক্তি পায়।

ম্যাডান কোম্পানীর একাদশী বা মোহিনী চিত্রখানি কর্নওয়ালিশ থিয়েটারে মুক্তি পায় ১৯২২ খৃষ্টাব্দে। শিশিরকুমার চিত্রখানি পরিচালনা করেন এবং অভিনয়াংশে থাকেন। শিশিরকুমার পরিচালিত অভিনীত ম্যাডানের কমলেকামিনী ১৯২২ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয় এবং মুক্তিলাভ করেন ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে। সবাক যুগে নিউ থিয়েটার্সের পল্লীসমাজ; সীতা; কালী ফিল্মের দস্তুর মত টকীজ এবং চাণক্য শিশিরকুমার পরিচালনা করেন এবং প্রধানাংশ অভিনয় করেন। কেবলমাত্র পৌষ্যপুত্র চিত্রেই সতীনাথ দাশগুপ্তের পরিচালনায় শিশিরকুমার অভিনয় করেন। চলচ্চিত্রের প্রতি শিশিরকুমারের কোন আস্থা ছিল না।

নাট্যাচার্য অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—১

পেশাদার রঙ্গশালায় নাট্যাচার্য অপরেশচন্দ্র শিশিরকুমারের বহু পূর্বে যোগদান করলেও দুজনে যেন ঠিক একই সময়ে দীপ্তিভাত হন নাট্যগগনে। নট, নাট্য-প্রযোজক এবং নাট্যাচার্য হিসেবে শিশির-প্রতিভা যেমন অনন্য তেমনি এই তিনটি গুণে গুণান্বিত অপরেশচন্দ্রের দক্ষতাও অনস্বীকার্য। তবু দুজনের তুলনা করা যায় না। নাট্যশিক্ষক হিসেবে শিশির

প্রতিভাকে সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে প্রদীপ্ত হতে দেখেছি। অপরেশচন্দ্রের শিষ্যরা ছিলেন সমগ্র নাট্য-জগতে ছড়িয়ে। অপরেশ-চন্দ্র সরাসরি গিরিশচন্দ্র-অর্ধেন্দুশেখরের সংস্পর্শে আসেন। শিক্ষাক্ষেত্রে মহেন্দ্রলাল বসু, অর্ধেন্দুশেখর এবং গিরিশচন্দ্রের প্রভাবই তার মধ্যে বেশী পরিলক্ষিত হয়। শিশিরকুমার ছিলেন গিরিশচন্দ্রের একলব্য শিষ্য। গিরিশচন্দ্রের শেষ জীবনের অভিনয় সম্পর্কেই তার অভিজ্ঞতা ছিল। সেই অভিজ্ঞতার ধ্যানধারণা থেকে তিনি গিরিশ-চন্দ্র প্রবর্তিত অভিনয়ধারাকে নবপরিবেশে নতুন রূপে রূপায়িত করেন।

অপরেশচন্দ্র নাট্যশালার প্রয়োজনে গিরিশচন্দ্রের মত বহু নাটক রচনা করেছেন। শিশিরকুমার নাট্যকার ছিলেন না। কিন্তু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আর মরমী শরৎচন্দ্রের নাটকের ওপর তিনি মুন্সীয়ানা করেছেন। শিশিরকুমারের নাট্য-প্রতিভার সঙ্গে তাঁর তুলনা করা চলে না। নাট্যশালার শতবর্ষের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রের পর যদি পাশাপাশি কোন নাট্য-প্রতিভার নামোল্লেখ করতে হয় —তা একমাত্র শিশিরকুমারের। তবু অপরেশচন্দ্রের সামগ্রিক প্রভাব এবং অবদান শিশিরকুমারের চেয়ে কম ছিল বলে মনে হয় না। নট, নাট্যকার, পরিচালক, শিক্ষক ও সর্বাধ্যক্ষরূপে বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অম্লান-দ্যুতিতেই ভাস্বর থাকবেন।

১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে এক মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের অপরেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। আদি বাস যশোহর জেলার মহেশপুর গ্রামে। শৈশবকালেই অপরেশচন্দ্রের মাতৃ-বিয়োগ ঘটে এবং পিতার স্নেহযত্নেই লালিত-পালিত হতে থাকেন। এই সময়েই পিতা বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কলকাতায় চলে আসেন। অপরেশচন্দ্রের পিতাও ছিলেন একজন সুলেখক। তাঁর রচিত পাক-প্রণালী, মিষ্টান্ন পাক, রন্ধন শিক্ষা প্রভৃতি একসময় বহুলভাবে প্রচারিত ছিল। নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে অপরেশচন্দ্রের বাল্য ও কৈশোরের দিনগুলি অতিবাহিত হয়। নানান বৈচিত্র্যে তাঁর জীবন ছিল ভরপুর। প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার সময় অপরেশচন্দ্র শেষ পর্যন্ত আর পরীক্ষা দিতে পারেন নি। অঙ্ক পরীক্ষার দিন অঙ্কের প্রশ্নপত্রে দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী নাটকের নিমচাঁদের সমস্ত ইংরেজী বুকনিগুলি টুকে দিয়ে আসেন। তখন অপরের পক্ষে দূরের কথা—তিনি নিজেও বুঝতে পারেন নি যে, পরবর্তীকালে তারই নাটকের এমনি কোন বুকনি তারই মত অনেকেই আওড়াবেন।

মনমোহন পাড়ের পিতা স্বর্গত বীরেশ্বর পাড়ে মহাশয়ের সঙ্গে অপরেশচন্দ্রের পিতার খুব বন্ধুত্ব ছিল। এই সূত্রেই মনমোহন বাবুর সঙ্গে অপরেশচন্দ্রের সখ্যতা গড়ে ওঠে।

(ক্রমশ)

কালীশ মুখোপাধ্যায়

পয়সে কী গুড়িয়া
নাজ/নবীন নিশ্চল

ছলসা

বর্ষার গান
শান্তিদেব ঘোষ

'যাঁরা রবীন্দ্রনাথের গানের কাব্যরস ও ভারতীয় সংগীতের রাগিনীরসের একত্র অনুভূতির উৎকর্ষের দ্বারা পূর্ণ গান হিসেবে একে হৃদয়ে গ্রহণ করতে পারবেন তাঁরাই হবেন এর প্রকৃতি রসিক। তখনি বলতে পারব, এতোদিনে গানের পথে রবীন্দ্রনাথকে সত্যি করে চিনলাম।'

রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনা সম্বন্ধে শ্রীশান্তিদেব ঘোষের সারা জীবনের সাধনা ও চিন্তা হোল এই। সেই ধ্যানের রূপই তিনি মেলে ধরেছিলেন রবীন্দ্রসদনে বিশ্ব-বীণা পরিবেশিত তাঁর একক সংগীত আসরে।

শান্তিদেব একাধারে রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পী এবং গুরু। শিল্পীজীবনের প্রথমের দিকে তিনি যৌবনের সমস্ত শক্তি, আবেগ, রং ও রসের সমারোহে রবীন্দ্রনৃত্যে প্রাণ-প্রবাহই শুধু সৃষ্টি করেননি, গানের ডালিও ভরে দিয়েছেন অকৃপণ ধারায়। তরুণকণ্ঠের সেই সুর, শক্তি ও উদ্দীপনা সে যুগের শ্রোতাদের মনে অক্ষয় হয়ে আছে। কারণ তখন তিনি এগিয়ে যাবার স্বপ্নবিভোর শিল্পী।

আজকের গান তাঁর প্রৌঢ়ত্বের ফসল। এ গানে শিল্পীর চেয়েও বড় স্রষ্টা এবং গুরু। জীবনব্যাপী পরিক্ষানিরীক্ষা এবং ধ্যানের পথ বেয়ে তিনি আজ পূর্ণতায় পৌঁছেছেন। সেদিনের সান্ধ্য আসরের গানে ছিলো তারই গভীর স্পর্শ।

ইনি গেয়েছিলেন বর্ষাঋতুর গান। সব-শুদ্ধ আটাশটি। বর্ষার নানান রূপ কবি-কল্পনাকে যে অন্তহীন ছন্দে উদ্দীপ্ত করেছিল, তারই তুলনাবিহীন প্রকাশ তাঁর বর্ষার গানে। সেই কথাটিই শান্তিদেববাবুর মনে করিয়ে দিলেন। যৌবনের শক্তি আজ

সানাই
সোনালী/ঝুলন

তাঁর গানে খুঁজতে গেলে তাঁর সৃষ্টিমুখর অধ্যায়টির প্রতি সুবিচার হবে না! বর্ষার নানান রূপ সুর ও ছন্দের রেখায় কেমন করে ছবি হয়ে ওঠে সেই অনুভবই তিনি শ্রোতাদের চিত্তে সঞ্চার করেছিলেন। বর্ষার আগমনের আগে তার শ্যামছায়াঘন প্রস্তুতিকে আহ্বান, মৃদু মধুর সমাদরে ('এসো ওগো শ্যামছায়াঘন দিন') তারপর প্রচন্ড গর্জনের হুহুংকার—এই দুটি ভাবকেই তিনি সজল সুরের আলতো ছোঁওয়ায় এবং গর্জনের দীপ্ত গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করে তুললেন এক নিমেষেই। তাঁর হৃদয়ে ছায়া ফেলেছে বলেই তিনি এই ভাবের ভাবুক হয়ে উঠেছেন।

তারপর বজরে গর্জনে তাঁর বাঁশী শোনা, বর্ষামাতনে চিত্তহারানো, নীপবনে স্নানের আবেশ, এক ছুটে আষাঢ়ের আগমনে, কখনও মন উধাও, কখনও স্মৃতির বিষণ্ণতা, কখনও নিরুপমার চরণে হৃদয়াবেগ উজাড় করার উতলতা—তথা একটা মস্তবড় ক্যানভাসে অনেক রংয়ের, অনেক ভাবের ছবি—কিন্তু প্রত্যেকটি ছবি স্বয়ংসম্পূর্ণ। এবং এই সবকটি মিলেই বাদলধারার উচ্ছাস জেগে উঠে একসময় মিলিয়ে যায় শরলক্ষ্মীর আগমন আশ্বাসে মন দুলিয়ে দিয়ে।

অতি নাটকীয়তা সৃষ্টি না করেও গানের ড্রামা, বিভিন্ন মল্লারের চকিতস্পর্শে কবি-কল্পনার রং লেগে কেমন করে রবিমল্লার হয়ে উঠলো। প্রতিটি স্বর ও সুরের ভূমিকা কেমন করে বর্ষার পূর্ণাঙ্গ রূপ সৃষ্টি করলো—এতগুলি দিক তিনি অনায়াস দক্ষতায় উদ্গামিত করলেন। এইটে শুধু শোনার নয় তাঁর অনুষ্ঠানে শেখারও বস্তু। এই পরিপ্রেক্ষিতে এ অনুষ্ঠানের মূল্য অপরিসীম।

দাদরা, কাহারবা, সুরফাঁকতালের ছন্দ-বৈচিত্র্যে বিনীত সংগত করেছেন সুজিত সাহা। অন্যান্য যন্ত্রসংগতে ছিলেন নির্মলকুমার নন্দী, প্রভাতকুমার পাল, বিজয়কুমার সিংহ, মণি বিশ্বাস, পি রায়, শীতল গঙ্গোপাধ্যায়।

বিবিধ সংবাদ

জ্যোৎস্না দত্ত নাইট

যাত্রা জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেত্রী যাত্রা-সম্রাজ্ঞী জ্যোৎস্না দত্তর যাত্রায় অভিনয়ের সাতাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে তাঁর সম্মানার্থে সম্প্রতি 'জ্যোৎস্না দত্ত নাইট' হয়ে গেল মহাজাতি সদনে। চারদিনব্যাপী এই উৎসব অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হোল যথাক্রমে বিবি আনন্দময়ী, নটী বিনোদিনী, মাদার ইণ্ডিয়া ও সোনাই দীঘি।

প্রতিটি পালারই জ্যোৎস্না দত্তর অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করে রাখে।

এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন যাত্রা দলের পক্ষে বৈদ্যনাথ শীল ও দীনেশ নন্দী।

আর একটি শিশু অনুষ্ঠান

শিশুনাট্য নিকেতন তাঁদের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এবারও শিশুদের নাচ, গান ও নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন।

আশাপূর্ণা দেবী রচিত এদের অভিনীত নাটক 'কৈলাসে চা পান' দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেয়। এবং দেবাশীষ রায়বর্মণ (শিব), সুলিপি দে (দুর্গা) ও জয়রূপী প্রশান্ত বসু দর্শকদের প্রশংসাও কুড়িয়েছে। এটি পরিচালনা করেন সত্যদেব ইন্দু।

এছাড়া আর একটি উপভোগ্য অনুষ্ঠান ছিল 'কথক—এক যে ছিল রানী'। কাহিনী রবিরঞ্জন চ্যাটার্জির ও পরিচালনায় অলোক বর্মণ। মূল কথক দেবাশীষ রায়বর্মণ ও গায়েনরূপী বীথি দে, রুচিরা ঘোষ ও লীনা দাস রীতিমত মুন্সিয়ানা দেখিয়েছে।

নাচের অনুষ্ঠানে বাসু কাপুর (বাউল), সুলিপি সংগীত কুমকুম শর্মিলা বনিতা ও রঙ্গনার গরবা নাচ অশোকা, চৈতালী, শ্রাবণী ও নমিতার ভাংড়া নাচ দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে। এর জন্য নৃত্য পরিচালক লক্ষ্মণ নন্দীর পরিশ্রম সার্থক।

ময়না : ইউনাইটেড মিশন নিবেদিত অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'ময়না' ছবির কাজ প্রায় শেষ। বহির্দৃশ্য গ্রহণের কাজও সমাপ্ত হয়েছে। কাহিনী ও চিত্রনাট্য পরিচালক অসীমবাবু নিজেই রচনা করেছেন। চিত্রগ্রহণে আছেন বিজয় দে। শিল্প-নির্দেশনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে বিশু দাশগুপ্ত ও রাসবিহারী সিনহা।

হারমোনিয়ামের দুটি পুরস্কার

দক্ষিণ কোরিয়াতে অনুষ্ঠিত ২২তম এশীয় চলচ্চিত্র উৎসবে তপন সিংহের হারমোনিয়াম ছবিটি গত সপ্তাহে দুটি পুরস্কার পেয়েছে। শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছেন তপন সিংহ। অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন সোনালী গুপ্ত। ছবিটি প্রযোজনা করেছেন প্রতাপ আগরওয়ালা এবং আর এ জালান।

—অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের নতুন বই

চিত্র বিচিত্র

একাল-সেকালের বিচিত্র কথা ও রসমধুর কাহিনী-সমারোহ দাম : সাত টাকা

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১৩৮১ সালের মৌচাক পত্রিকা কর্তৃক
সুধীরচন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ রচিত
ছোট বড় সকলের মনের মত
বাংলা সাহিত্যের দু'খানি আশ্চর্য বই

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য :—চার টাকা

(সপ্তম সংস্করণ চলছে)

ছোটদের উপযোগী সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী লেখা হয় নি। বিশেষ করে নানাবিষয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ছোটদের মনের মত বিচিত্র রোমাঞ্চকর লেখা খুব সহজ নয়। 'বিচিত্র কাহিনী'তে লেখক সত্য ঘটনাগুলিকে নিজের সরস মুন্সিয়ানা দিয়ে এমন জীবন্ত আর আকর্ষণীয় করে তুলেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রচনাই অনবদ্য রস ও রোমাঞ্চে টইটম্বুর। মোট পনেরোটি কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রসের ফল্গুধারায় সিক্ত, বর্ণনায় মনোমুগ্ধকর।

'আরও বিচিত্র কাহিনী' বইটি কিশোর ও বয়স্কদের জন্য সমভাবে রচিত। লেখক শুধু ছোটদের জন্যই রস পরিবেশন করেননি, বড়রাও এই অমৃত আস্বাদন করে পুলকিত হবেন। অনবদ্য রস রচনাশৈলী এবং প্রতিটি কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ চুম্বকের মত পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে। এই বইটিতে দশটি বিভিন্ন রসের কাহিনী রয়েছে এবং লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি এমন সুন্দরভাবে রসযুক্ত করে উপস্থিত করেছেন যে পাঠককে বিমুগ্ধ করবে।

আরও বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য :—চার টাকা

(চতুর্থ সংস্করণ চলছে)

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ : ফোন ৩৪-১৭৮২

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 16th July, 1976
Phone 55-5231 (14 lines)

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ /

২৩ জুলাই ১৯৭৬ ।।

মূল্য ৭৫ পয়সা
মাশুল ৭ পয়সা

অতিরিক্ত পরিমাণে

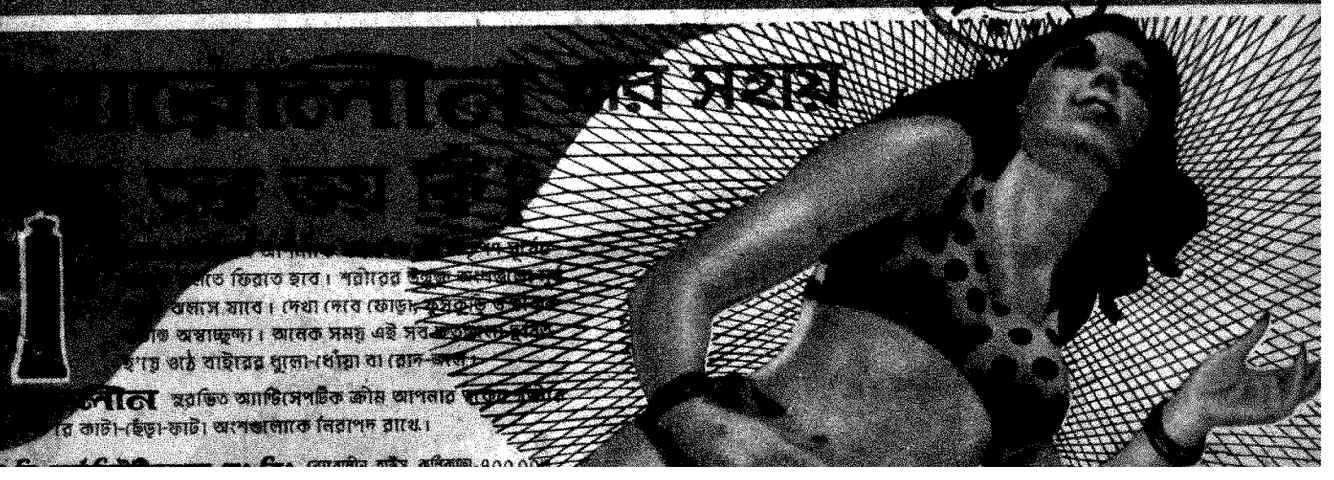

প্রগতির নতুন প্রেরণায় ভারত

১৯৭৫-৭৬

ক্রেতা ও গ্রাহকদের স্বার্থরক্ষার্থে

* খুচরো বিক্রীর দোকানে দামের টিকিট ও মূল্য তালিকা টাঙাবার নির্দেশের ফলে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে এসেছে। দুস্থ লোকের হাতে সব জিনিষ পৌঁচচ্ছে

* বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে মাল চলাচলের পথে বাধা সরিয়ে নেওয়া সরকারী বন্টন ব্যবস্থা সুষ্ঠু হয়েছে ঃ মাল অবাধে আসছে যাচ্ছে। এ কাজে গ্রাহক সমবায়গুলির সাহায্যও নেওয়া হচ্ছে

* কয়েকটি অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্য শিল্পে 'একমাত্র-বিক্রেতা' প্রথা বিলুপ্ত

* সমবায় ও অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান মারফত সুসম বন্টনে, দিল্লী পথ দেখিয়েছে। এখন কোচিন, কোইম্বাটুর দুর্গাপুর ও নৈনিতালও ঐ পথ অনুসরণ করছে।

ডি এ ভি পি ৭৬।১৫২

একসেটে অভিনয়োপযোগী আমাদের প্রকাশিত মঞ্চ-সফল কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। অন্যান্য পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক নাটকের তালিকার জন্য আমাদের নিকট লিখুন।

যশস্বী নাট্যকার মন্মথ রায়ের নতুন নাটক

শরৎ-বিপ্লব (৪ নারী) ৫-০০

দেবনারায়ণ গুপ্তের নতুন নাটক

নাট্যকার (৩ নারী) ৫-০০

রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের নতুন নাটক

কেষ্টধনের কেরামতি (৩ নারী) ৫-০০

মনোজ মিত্রের নতুন নাটক

পরবাস (১ নারী) ৫-০০

শিবের অসাধ্য (২ নারী) ৫-০০

নেকড়ে (২ নারী) ৪-০০

অগ্নিমিত্রের নতুন নাটক

পটভূমি দৃশ্যমান (১ নারী) ৫-০০

উপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন নাটক

ব্রেকজার্নি (১/২ নারী) ৫-০০

রামারমণ ঘোষের নতুন নাটক

রণ-দুন্দুভি (১ নারী) ৫-০০

শতাব্দীর পদাবলী (১ নারী) ৪-০০

জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্থক নাটক

ইস্তাহার (১ নারী) ৪-০০

চিতাভস্ম (৩ নারী) ৩-৫০

নিহত নিয়তি (২ নারী) ৩-০০

গঙ্গাপদ বসুর নাটক

নহমাতা (১ নারী) ৩-৫০

একটি স্বপ্নের জন্যে (২ নারী) ৩-৫০

প্রবোধবন্ধু অধিকারীর নাটক

জনক-জননী (৩ নারী) ৩-৫০

বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীর নাটক

আমি ক্রীতদাস (৩ নারী) ৪-০০

কিরণ মৈত্রের নাটক

শেষ কোথায় (২ নারী) ৪-০০

বিজন ভট্টাচার্যের নাটক

দেবী গর্জন (৫/৬ নারী) ৩-০০

বর্তমানের সর্বাধিক জনপ্রিয় নাট্যকার রতনকুমার ঘোষের

এই দশকের মঞ্চে (২ নারী) ৫-০০

সীতাহরণ (২ নারী) ৫-০০

সকালের জন্য (৫ম সং ॥ ১ নারী) ৫-০০

নাটকটির ৪ বছরের জীবনে পাঁচবার সংস্করণই এর জনপ্রিয়তার সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

অমৃতস্য পুত্রাঃ (৩য় সং ॥ ৩ নারী) ৫-০০

ভোরের মিছিল (২য় সং ॥ ১ নারী) ৫-০০

দোহাই ! হাসবেন না (২ নারী) ৫-০০

২য় সংস্করণ

সিঁড়ি (২য় সংস্করণ ॥ ১ নারী) ৫-০০

ফেরা (২য় সংস্করণ ॥ ১ নারী) ৩-৫০

অগ্নিদূতের কালজয়ী নাটক

অন্ধকারের নীচে সূর্য (২ নারী) ৫-০০

৩য় সংস্করণ

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সফল নাটক

ক্যাপ্টেন হুররা (১ নারী) ৪-০০

পার্থপ্রতিম চৌধুরীর নাটক

মলাটের রং মুহূর্ত (২ নারী) ৩-০০

খাঁচা (২ নারী) ৩-০০

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্চ সফল নাটক

জনপদবধূ (৫ নারী) ৫-০০

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক

এরিণা (৫/৬ নারী) ৩-০০

আদিম (২ নারী) ৩-০০

V. P. P. -তে নাটক পেতে হলে অগ্রিমসহ অর্ডার পাঠাবেন। অগ্রিম ছাড়া V. P. P. পাঠানো হয় না।

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা—৭০০০১২ ॥ ফোন : ৩৪-৮৩৫৬

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য অমৃত কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে অমৃত কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মাশু-অর্ডারযোগে অমৃত কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

সংশোধিত চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৮-০০	টাকা ৪৪-০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১৯-৫০	টাকা ২২-৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-৫০

অমৃত কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৩৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান

প্রধান সম্পাদক : ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। সম্পাদক : শ্রীঅঞ্জলি বসু। ঐতিহাসিক কাল থেকে ফেব্রুয়ারি '৭৬ পর্যন্ত বাঙলার সংস্কৃতি জগতের কোন-না-কোন ক্ষেত্রে উল্লেখ্য দান আছে এমন প্রায় সাড়ে-তিন হাজার বাঙালীর জীবন-চরিত সঙ্কলিত হয়েছে। ৬৪৮ পৃষ্ঠা, ঝরঝরে লাইনো হরফে ছাপা, মজবুত বাঁধাই। [টাঃ ৪০-০০]

তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ

সম্পাদক : অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য। তারাশঙ্করের সমগ্র ছোটগল্প (প্রায় ২০০) কালানুক্রমিক সাজিয়ে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। ১ম ও ২য় খণ্ড প্রকাশিত, ৩য় খণ্ড যন্ত্রস্থ। [প্রতি খণ্ড টাঃ ৪০-০০, একত্রে অগ্রিম মূল্য টাঃ ৮০-০০]

স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন

কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ শঙ্কর ঘোষ কর্তৃক উক্ত বিষয়ের তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা। [টাঃ ২০-০০]

প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য

ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ। সংস্কৃত ও ভারতীয় ভাষার সাহিত্য বিশেষভাবে আলোচিত। [টাঃ ২৫-০০]

সংস্কৃত নাটকের গল্প

অধ্যাপিকা অমিতা চক্রবর্তী কর্তৃক ১০টি সেরা প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের সাবলীল গল্পরূপ। [টাঃ ৮-০০]

সাহিত্য সংসদ ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা ৯ [৩৫-৭৬৬৯]

বিশ্বের দুর্ধর্ষতমা তরুণী গুপ্তচর মার্থা ম্যাক্‌কেনা রচিত

I was A Spy-এর সফল অনুবাদ

স্পাই মেয়ে মার্থা

১০.০০

ভাষান্তর : শ্রীইন্দুভূষণ দাস

কোর্ট মার্শালের বিচার শেষ। রায় বেরোবে আগামীকাল। রাতে কারাকক্ষের সেলে ঘুমিয়ে পড়েছে মার্থা। স্বপ্ন দেখছে সে। তাকে দাঁড় করানো হয়েছে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে। হাত দুখানা পেছনের দিকে হাতকড়া দিয়ে বাঁধা। সামনে দাঁড়িয়ে আছে দশজন রাইফেলধারী সৈনিক। রাইফেলগুলোর নল তাক্ করা রয়েছে তার বুকের দিকে। একজন অফিসার দাঁড়িয়ে আছে পাশে। হঠাৎ সে বজ্রগম্ভীর স্বরে আদেশ দিলো—ফায়ার!! — রুদ্ধনিঃশ্বাসে পড়বার মতো বই।

প্রাপ্তিস্থান : জ্ঞান নিকেতন :

১৮-এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১৬ বর্ষ

অমৃত

১১ সংখ্যা

"ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 23rd July, 1976. শুক্রবার, ৭ শ্রাবণ, ১৩৮৩

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়		
৭	ইয়াদ উবাচ		শওকত ওসমান
১০	উদ্বৃত্ত		"
১৩	কথায় কথায়		শ্রীতারাপদ রায়
১৪	মঙ্গল গ্রহ বিজয়		শিশিরকুমার ঘোষ
			অনুঃ শ্রীসুহৃদগোপাল দ
১৭	বিজ্ঞাপন বিচিত্রা		শ্রীআনন্দ রাস
১৯	গোধূলিয়া	(উপন্যাস)	শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
২২	নিজ দেশে পরবাসী		শ্রীদিলীপ মালাকার
২৩	মনের অসুখ		শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যা
২৬	নতুন বই		
২৭	সাহিত্যের নেপথ্যে		শান্ডিল্য চতুর্বেদী
২৯	মোহিনী আট্টম	(উপন্যাস)	শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি

কলকাতা সম্পর্কিত যে গ্রন্থগুলি অনাচিত জয় করেছে

অমরেন্দ্র দাসের (সম্পাদনায় শিউলী দাস)

রাজনারায়ণের কলকাতা ২৫-০০

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের

ডিহি কলকাতা ছাড়িয়ে ১৩-০০

বাবু গৌরবের কলকাতা ১৬-০০

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের আর একখানি কালজয়ী গ্রন্থ

নবজাগরণ ও মানবিকতাবাদের ভূমিকায় দীনবন্ধুর নাটক ২২-০০

সমরজিৎ কর ... জাঁ-ব্রুস ...

সমুদ্রের চোখ ডেড লাইসেন্স

সম্রাট সেন

সপ্তদুর্গার উদয়াস্ত (১ম) ১৮-০০

নিশীথ দে

জয়প্রকাশ ৬-০০

কৃষানু বন্দ্যোপাধ্যায়

টাওয়ার অফ সাইলেন্স ১৫-০০

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

টুকুনের অসুখ ১৫-০০

চিরঞ্জীব

পদ্মা আমার মা, গঙ্গা আমার মা ১২-০০

খেলাধুলোর নেপথ্যে ১০-০০

বরুণ সেন

চট্টগ্রাম '৭১ ১২-০০

গরিবী হঠাও ১৫-০০

কালো টাকা ১০-০০

চিরঞ্জীব সেন

হেডলাইন ১২-০০

ইলেকট্রো যৌবনা ১০-০০

হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আমার উনি ৬-০০

সম্রাট সেন

নেপথ্যে নাটক ১১-০০

রূপ শংকর

প্রথম দিনের সূর্য ১০-০০

বীরু চট্টোপাধ্যায়

নীল প্রতিহিংসা ১০-০০

বার্ষিক রায়

কালো গান ৭-০০

মণীন্দ্র ঘটক

পতঙ্গ নয় ১২-০০

প্রভাত চট্টোপাধ্যায়

টম সাহেবের গল্প ৭-০০

সামুয়েল

আমার স্বর্গ আমার মুখ ৮-০০

কা হিয়েন ছো

কুহকিনী কুগতি ১১-০০

গোবিন্দ বর্মণ

স্নান ঘর ১০-০০

ইন্দ্রনীল চৌধুরী

ইন্দিরা গান্ধী ও সমাজতন্ত্র ১২-০০

পিটার রণগনাথন্

সুইসাইড স্কোয়াড ১০-০০

দূরে মালবে ১০-০০

বর্ণালী ॥ ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলকাতা—৭০০০০৯

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ কর্তৃক গ্রন্থিত

শ্রীশ্রীময়ানমাই চরিত LORDGOURANGA

(১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড)

প্রতি সেট—মূল্য ২৪·০০ (vol. 2)

Per Vol. Rs. 6.00

কালাচাঁদ গীতা

প্রতি কপি—মূল্য ১·৫০ LIFE OF SISIR

নরোত্তম চরিত KUMAR GHOSH

প্রতি কপি—২·০০ Per Copy Rs. 6.50

প্রাপ্তিস্থান :

পত্রিকা হাউস (হিসাব বিভাগ)

১৯, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা ৩

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৩৫	একালের গান		শ্রীসন্ধ্যা সেন
৩৮	সামান্য	(কবিতা)	শ্রীমানস রায়চৌধুরী
৩৮	অন্য খেলা	(")	শ্রীজয়ন্তী রায়
৩৮	আমি	(")	শ্রীবটকৃষ্ণ দে
৩৯	একালের চিত্রশিল্পী		শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৪২	পুনশ্চ		ক্ষণিক
৪৩	অদ্য শেষ রজনী		শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
৪৬	অজানা		শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৪৭	সে আমি অন্য আমি		কামাল হোসেন
৫১	মাঠ থেকে বলছি		শ্রীঅজয় বসু
৫৩	খেলাধুলা		দর্শক
৫৪	সিনেমা টক টক		শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৫৭	কয়েকজন		নিরীক্ষিৎ
৫৯	শতবর্ষের স্মরণীয়		শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়
৬২	নাটমঞ্চ		নাট্যসমালোচক

প্রচ্ছদ পরিচিতি : ক্রুশবিদ্ধ আমানাস
শিল্পী মিকেল্যাঞ্জেলো

অফিস এবং ইনজিনীয়ারিং-এর
নিখুঁত সরঞ্জাম
এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

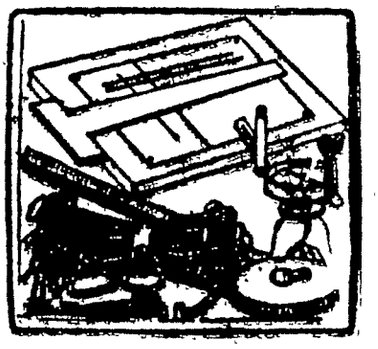

সার্ভে, ড্রইং, নানা রকম কাগজ
খাতা, লেজার, ক্যাশবই, কালি ও
উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য
অন্যতম প্রতিষ্ঠান
কুইক ষ্টেশনারী ষ্টোর্স
৬৩ই, রাধাবাজার স্ট্রীট কলিঃ-১
ফোন : ২২-৮৫৮৮, ৬৭-৪৬৬৪
গ্রাম : অয়ারপিন, পোষ্ট বক্স—৩৮ হাওড়া
পরিবেশক : কামানির প্রডাক্টস
(ষ্টেশনারী বিভাগ)

বিখ্যাত ডাটা
গুঁড়ো মশলার
প্রস্তুতকারক
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত
(কুকমী) প্রাঃ লিঃ
এখন আপনাদের দিচ্ছেন
একটি নতুন অতি
সুদৃশ্য টিনের কৌটায়
সবরকম গুঁড়ো মশলার
অপূর্ব সংমিশ্রণ

এক কৌটা ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন
কুইন প্যাক কিনলে আর কোনরকম
মশলা এমন কি পেঁয়াজ, আদা, রসুন
প্রভৃতি আলাদা করে রান্নায় দিতে হবে না।
ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাকের
মাছ, মাংস, ডিম ও সবরকম মুখরোচক
তরিতরকারি অল্প সময়ে চটপট রান্না
করা যায়। আপনার সবরকম রান্নার
আজই ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার
(কিচেন কুইন প্যাক) ব্যবহার করুন।

ডাটা
রেডিমিক্সড কারি
পাউডার
কিচেন কুইন প্যাক

প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ
২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭, পোষ্ট বক্স নং ৬৭৭৪,
ফোন : ৩৩-১৩৩৭, ৩৪-১৭০৮

PAIN—KCD-74

সম্পাদকীয়

মৎস্য সমাচার

মনে পড়ে, রাজশেখর বসু একবার বলেছিলেন যে, বাঙালির খাদ্যতালিকায় ঘাটতি আছে নানাদিকেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও এ জাত যে টিঁকে আছে, তা শুধু ইলিশের জন্যে—কেননা এই মাছে কেবল প্রোটিন নয়, কডলিভার তেলে যে সব ভিটামিন পাওয়া যায়, তারও বিকল্প রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে।

মনে রাখা ভালো, রাজশেখর বসু শুধু যে পরশুরাম নামের আড়ালে একজন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকই ছিলেন তা নয়, রসায়ন-শাস্ত্রেরও একজন সর্বোচ্চ ডিগ্রি-প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক ছিলেন।

কিন্তু শুধু ইলিশই নয়, বেশির ভাগ মাছই এখন অগ্নি-মূল্য। এদিনে এমন খাদ্যবিলাসী বিরল, কোনো একধরনের মাছ—তা ইলিশই হোক বা চিংড়ি—অন্য মাছ যিনি মুখে তুলবেন না। কিন্তু দুবেলা নাহোক একবেলা এক টুকরো মাছ তাঁর পাতে চাই-ই। একে নিছক বিলাস ভাবলে অবিচার করা হবে, এ হল অভ্যাস। এবং নীতিবাক্য আমাদের অভ্যাসের দাস হতে নিষেধ করলেও, সকলেই এটা জানেন—অভ্যাসকে কাটিয়ে ওঠা বড়ই শক্ত।

বিশেষ করে সেইসব অভ্যাসের বেলায় কাজটা হয় আরো কঠিন, যখন তা হয়ে ওঠে পুরুষ-পরম্পরার ব্যাপার। বাঙালির মৎস্যপ্রীতির ইতিহাস বহু প্রাচীন। কত শতাব্দীর অভ্যাস তা নিশ্চয় করে বলা শক্ত।

প্রাকৃত পৈঙ্গলের রচনকাল চতুর্দশ শতক বলে ধরা হয়। এর একটি পদে প্রায় ছ'শ বছর আগে মেটামুটি একজন সাধারণ বাঙালির খাদ্যতালিকার বিবরণ পাওয়া যায়। তাতে আছে—ওগরা চালের ভাত, পাকা কলা, গাওয়া ঘি, দুধ, মৌরলা মাছ এবং নালতে শাক। পদটির শেষে বলা হয়েছে, এইসব বস্তু কান্তা (অর্থাৎ স্ত্রী) পরিবেশন করছেন এবং পুণ্যবান (অর্থাৎ স্বামী) খাচ্ছেন।

কাজেই ছ'শ বছরের মাছ খাওয়ার অভ্যাস রাতারাতি ছেড়ে দিতে না পারলে দোষ দেওয়া যায় না কাউকে।

তর্কের খাতিরে অবশ্য বলা যায়, পূর্ব ভারত বাদ দিলে প্রায় বেশির ভাগ উত্তর ভারতের মানুষই মাছ খায় না, এবং তাতে যে তাঁদের স্বাস্থ্যের যে খুব ক্ষতি হয়েছে এমন প্রমাণ নেই। কিন্তু তর্কের খাতিরেই তখন যদি বলা হয়, তাঁদের যা খাদ্যাভ্যাস তা বদলে বাঙালির মতো খেতে বললেই কি তাঁরা শুনবেন? কিন্তু গত কড়ি বছরে বাঙালিরা তো তাঁদের চিরাচরিত দুবেলা ভাতের অভ্যাস ছেড়ে ইতিমধ্যেই বেশ রুটি খেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন।

কিন্তু একবেলা রুটি খেতেও বাঙালির আপত্তি নেই, তবে দুবেলাই যদি মাছ না জোটে এবং তা দিনের পর দিন, তাহলে বাঙালি কিছুতেই প্রসন্ন মনে সে আহার মেনে নিতে পারেন না।

মাছের জোগান অতএব যে-ভাবেই হোক, বাড়ানোর চেষ্টা করা দরকার। এবং কাজটার ভার নেওয়া প্রয়োজন সরকারেরই, কেননা মাছের কারবারীরা যে ভদ্রলোকের চুক্তিকে খুব একটা মর্যাদা দেন এমন নজির নেই। বরং অভিজ্ঞতা আমাদের অন্য রকমেই। এরকম সমঝোতা আগেও কয়েকবার করার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু ঘটনার গতি তাতে কিছুমাত্র বদলায় নি।

কলকাতার বাজারে মাছের জোগান কম হবার একটা কারণ দেশবিভাগ। আগে পূর্ববঙ্গ থেকে মাছ আসত যথেষ্টই, পূর্ব পাকিস্থান কায়েম হবার পর তা কমতে কমতে প্রায় বন্ধই হয়ে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রথমে কিছু বেড়েছিল জোগান, এখন কমের দিকে এবং অনিশ্চিত হয়ে উঠছে।

কাজেই প্রধান নির্ভর এখন স্থানীয় জোগানের উপর। বাকি চাহিদাটুকু মেটাবার চেষ্টা হয় অন্য রাজ্য থেকে মাছ আমদানী করে।

কিন্তু এই দুই ব্যবস্থাই আয়ত্তের বাইরে। কেন্দ্রীয় ফিশারিজ কর্পোরেশন এ রাজ্যের ভেড়ীগুলি থেকে মাছ কিনে বাজারে বাজারে তা দোকান মারফৎ ন্যায্য দামে বিক্রির চেষ্টা যে না করেছেন তা নয়। কিন্তু কোনো ফল দেখা দেয়নি।

যাই হোক, এখন যা সমস্যা তার দীর্ঘস্থায়ী ও কার্যকর সমাধানের সূত্র আবিষ্কার করা অপরিহার্য হয়ে উঠছে। পশ্চিম-বঙ্গে ভেড়ীর সংখ্যা কম নয়—সরকারী কাগজপত্রে যা আছে, তার চেয়েও যে বহুগুণ বেশি সে সংখ্যা, এ কথা নাকি সরকারী এক কমিটির রিপোর্টেই বলা হয়েছে। যদি তাই হয়, তাহলে এ সন্দেহ আর অমূলক থাকে না যে, জোগান-দার ও আড়ৎদারদের যৌথ কৌশলেই কলকাতার বাজারে মাছের দাম এত বেশি।

কাজেই কেন্দ্রীয় ফিশারিজ কর্পোরেশনই হোক বা রাজ্য ফিশারিজ কর্পোরেশনই হোক, যে সংস্থাই মৎস্য সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসুন, শুধু ভেড়ী থেকে মাছ কিনেই তাঁরা অপেক্ষাকৃত সহনীয় দামে মাছ জোগাতে পারবেন না বেশিদিন। তার জন্য দরকার কঠোরতর ব্যবস্থা, যাতে ভেড়ীওয়ালারা তাদের ভেড়ী থেকে পতিদিনই নির্দিষ্ট পরিমাণে মাছ নির্ধারিত দামে দিতে বাধ্য হয়।

এরকম কোনো ব্যবস্থা কি একেবারেই অসম্ভব? বিশেষ করে সরকার আজ নানাদিকেই বলিষ্ঠ কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলেই এ প্রত্যাশা আজ আরো বেশি।

একই লেখক

দুই গল্প ঃ দুই সময়

ইয়াদ উবাচ

শওকত ওসমান

আদিগন্ত বিস্তৃত একটি জরতী মুখ।

বৃদ্ধার কপালে বলি-রেখার ভেতর শত-শত শাণিত ছুরির ঝিলিক্ বিদ্যুতের মত চকিত-প্রসারে দীপ্যমাণ যার দপ্‌দপ্‌ রেশ আর শেষ হয় না।

অনন্তকাল হয়ত এমনই মুহূর্তের মধ্যে জন্মলাভ করে।

কিছু দূরে, সম্মুখে মেঘনা নদী নীল শাড়ীর চওড়া পাড়ের মত আওড়ে-আওড়ে স্তব্ধ। যদিও জানা, তার তরঙ্গমালার চল মানতা ভগবানের ভ্রূকুটির তোয়াক্কা রাখে না। শব্দ আছে বৈকি। শব্দ, শব্দ। কলনাদ অথবা লয়-ফেরতা ইঁশাবাব ফিস্‌ফিস-ধ্বনি। শুধু তলায় এবড়োখেবড়ো ডাঙ্গা-ডহর সেখানে গমক বা তানের কারিগর। সুরের ছড়ি তাদেরই হাতে নাচে, কাঁপে, উত্থান-পতনে দিশেহারা স্থৈর্যের সন্ধানে তৎপর হয়।

বৃদ্ধার দুই দিকের কাঁধের ফাঁকা-সমতল ভেদ করে উঠেছে গাছপালার সারি, কোথাও নিঃসঙ্গ কোন তরু, চাষীদের পর্ণপ্রাসাদ, অন্তহীন মাঠ, উবুড় আকাশ, বকের পংক্তি অথবা আকাশ-সফরে প্রতিযোগী অন্য কোন বিহঙ্গ। গাঙচিলের ডানা সাদা ঝলকে হঠাৎ-হঠাৎ অপবিত্র রক্তের প্রতি বিদ্রূপ হেনে যায় অথবা মহাশূন্যের খিলান-অনুকরণে পাখ্‌সাট দিতে থাকে অহার্যের লোভে। উদ্দেশ্যের মাত্রা হয়ত আরো বিস্তৃত।

নরসিংদি বন্দর।

ঢাকা জেলার অঞ্চল-লগ্ন মেঘনার দুরন্তপণার সঙ্গে পাল্লা দিতেই যেন এই ব্যবসা-কেন্দ্রের পত্তন। রাগী জলের শিং পাকড়ে-পাকড়ে টিকে আছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। নদী এবং নর-লীলার পারস্পরিক সংগ্রাম এখানে জীবন সম্পর্কে কাউকে হতাশ করতে অক্ষম। চর ডুবে যায়, আবার তেমন মাথাচাড়া দিয়ে দাঁড়ায়। এই আস্তবাকা এখানে মাটীর সঙ্গে পোঁতা। অথৈ জল ছাড়া সাঁতারুর উৎসাহ খোলে না। এমনই এলাকার সব মানুষ। মেঘনার পেটে বাড়ীর উঠান এবং একদিকের দেওয়াল সেঁধিয়ে গেছে। বাকী অংশে জীবনের শোরগোল থামে না, যেন নদীর জল-ক্রেঙ্কারেরই বিস্তার। প্রতিপক্ষের সঙ্গে পাল্লা-দান বা পাল্লা লড়ার এই ছবি কী কখনও জীবনের প্রতিভাস মুছে ফেলার রীতি হতে পারে?

না।

তবু চন্দ্রে কলঙ্ক থাকে।

বৃদ্ধার শন-চুল কোন তুমুল ঝড়ের আক্রোশে দিগন্ত-অভিমুখী, চকিতে গোটা আকাশ চোখ থেকে কেড়ে নেয়, যখন তার চীৎকারও বায়ু-আর্তনাদ ছাপিয়ে সকল কানের গহ্বর আঁচড়াতে থাকে, 'শেয়াল গোস্ত (মাংস) খায়, শেয়াল...সিপাই গোস্ত খায়...সিপাই ..শেয়াল, শেয়াল ..।'

পরমুহূর্তে নিশা ঘোষের স্ববানুকরণ শোনো ঃ হুক্কা হুয়া...হুয়া...কিয়া হুবা?

সঙ্গে সঙ্গে বিকট হাসির হেষা, হুয়া ...হুয়া...কী অইল? ...কিয়া হুয়া...?'

এই বৃদ্ধাকে, নাম আয়েশা বিবি, নরসিংদি বন্দর গত পাঁচ বছর থেকে চেনে কেউ তার হাসির ছোঁয়াচে আক্রান্ত হয় না। বালক-বালিকার কুঁচোপালও চেয়েচেয়ে দ্যাখে। ওদের হাতে ঢেলা যুগিয়ে দাও, কেউ বিদ্রূপের অঙ্গরূপে নিক্ষেপ করবে না। বুড়িকে ওরা দেখবে শুধু। পিছু নেবে না। তাদের দৃষ্টি কৌতূহলমাত্র। আর কী, ওদেরই ভাল জানা।

ব্যতিক্রম নদীর বাঁকের মত, তদীয় প্রবাহমানতার বিশিষ্ট উপাদান। তাই কলঙ্ক থাকে।

'কিয়া হুয়া?...কী অইলো?'

এই স্বত-প্রশ্নের পর বৃদ্ধার দুই ঠোঁট যথাস্থানে, তখন তাদের স্পন্দন পর্যন্ত গায়েব। দুই চক্ষু তা গ্রহণ করে। সেই তরঙ্গকম্পনে খণ্ড-খণ্ড ছবি কি চোখের মালিক দেখতে পায়? হয়ত পায় বা পায় না। কিন্তু নরসিংদি এলাকার মানুষ পট-ভূমি-জাত দৃশ্যের পর দৃশ্য স্তব্ধ দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে। এবং এক সময় তারাও দুই অনাগ্রাহী চক্ষু বুজে নেয়। কিন্তু রেহাই পায় না। কারণ, অক্ষিপটের শিকড় অভ্যন্তরে কতোখানি মৃত্তিকা-পিয়াসী —পরিমাপ কঠিন।

বৃদ্ধা উন্মাদিনী। চেয়ে থাকে।

হঠাৎ উৎকর্ণ হয়।

কারো পদশব্দ? কারো হাসি? কোন আশঙ্কা?

মানুষের সটান গ্রীবাদেশ মাড়িয়ে এক ধরণের বিপদ আসে। কানের প্রতিটি উপশিরা তখন হাজার বক্তার মধ্যে ঋজু। প্রাক-

দংশন মুহূর্তে স্ফীতচক্ষু কোন হিংস্র সর্পিণী।

আকাশ চীৎকার করে থেমে গেল।

অজস্র পদধ্বনি আছে পৃথিবী ভরে। উৎকর্ণতার হেতু মাঝে মাঝে শব্দভেদী বাণ অথবা নিজেই শব্দ। বিপদেরও স্বয়ম্বর-সভা বসে। তখন শীকার-নির্বাচন তার নিজস্ব প্রকৃতিয়ার।

বাংলাদেশী রমণী চরণধ্বনি শোনার লোভে অভ্যস্ত। কিন্তু যখন পায়ে বুট থাকে?

উৎকর্ণ, কিন্তু ঈষৎ দিক-পরিবর্তনের পর বৃদ্ধা আয়েশা বিবি স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকেন।

নির্বিকার মেঘনা ঢেউয়ের ঝিনাকি ছুটিয়ে দৌড়ের প্রতিযোগিতা ধরেছে কারো সঙ্গে। হু হু বাতাসের শূন্য উন্মাদিনীর কেশভার হাল্কা করে দিতে টানাটানি শুরু করেছে, যার পরিণাম—দিকচক্রবালে নৃত্যমান বিস্রস্ততা।

নরসিংদি বন্দরের চতুর্দিকে মেঘনার দুই পারে নানা গ্রাম ইতঃক্ষিপ্ত হয়ে আছে সড়কের কোল ঘেঁষে, কোথাও ক্রোশ-বিস্তারী মাঠের প্রান্ত ছুঁয়ে। তাদের আদলে তফাৎ সামান্য। বাঁশের ঝাড়, কিছু তরুবীথি অথবা পূর্ণচ্ছেদের মত সহসা কোন নিঃসঙ্গ বৃক্ষ। প্রায় এক নকশার মধ্যে ফেলা যায় সমস্ত গ্রাম। নদী কেবল যোগ-বিয়োগের দণ্ডধারী।

নতুন পরিকল্পনায় রকমারী রচনায় সমৃদ্ধ

সকলের উপযোগী মননশীল বাংলা পাক্ষিক

ধনধান্যে

নিয়মিত পড়ুন ও দেশকে জানুন

আকর্ষণীয় কয়েকটি নতুন সংযোজন :—

মুখোমুখি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, যুবমানস, জেলার সংবাদ, মহিলা মহল, খেলাধুলো, সিনেমা, বিশেষ সংবাদ ও গ্রন্থ আলোচনা।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা, দু বছরের ১৭ টাকা এবং তিন বছরে ২৪ টাকা। চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা :—

সম্পাদক
ধনধান্যে
পাবলিকেসন্স ডিভিশন
৪নং এসপ্ল্যানেড ইস্ট
কলিকাতা-৭০০০৬৯।

সহজ সর্তে বিক্রয় এজেন্সী দেওয়া হয় এবং বিজ্ঞাপন নেওয়া হয়। উপরের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

ধনধান্যে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি শুধু নয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিবর্তনের বার্তাবহ পাক্ষিক।

ডিএভিপি ৭৬।১৯২

দরিদ্রও এখানে সমান ভাগের শরীক। লাউয়ের মাচাঙ বা লাল আলুর ক্ষেত-শাকসব্জীর ফারাক ঋতুসব্জার লেফাফা ধরে থাকে। লাল টালি, করোগেটেড টীন, এ্যাস-বেস্টাসের চাল কি ইমারতের ছাদ—দু'এক জায়গায় বিত্তের নিশান উড়োতে পারে। কিন্তু বন্দর ছাড়লে হঠাৎ ব্যতিক্রম ছাড়া যেন প্রতিটি গ্রাম একই সমতলে পংক্তি-ভোজন বা অনাহার-ভোগে বসে গেছে—যদিও গ্রীষ্মের দু-এক হপ্তা বাদ দিলে, এলাকায় শ্যামশ্রী ঈশ্বরের মতই চিরবিরাজমান।

তাই আয়েশা বিবিকে যে কোন গ্রামেই খুঁজে পাওয়া যেত।

১৯৭১। সেপ্টেম্বর মাস। বাংলাদেশের জন্মের তখনও চার মাস দেরী। প্রসূতির নানা যন্ত্রণাই তৎকালীন প্রাত্যহিকতার আসল কাহিনী।

আয়েশা বিবি উঠানে বারোমেসে শশার বীচি পুতেছিলেন। দুটো মাত্র তেজী চারা বাড়ন্ত। তারই পরিচর্য্যা-রত তিনি। বিকেল বেলা। ছেলে আলী বাড়ী থেকে সকালেই বেরিয়ে গিয়েছিল কোথাও মজুরে-কামীন-রূপে রোজগারের ধান্দায়। বাড়ীতে বসে-বসে ত দিন চলে না। গঞ্জ প্রায় বন্ধ। দুপুরেই জনশূন্য হয়ে যায়। নিকটে মিলিটারী ক্যাম্প। কখন ধরে বেগার খাটায় বা অবমাননার জুতো কষায়—কিছু বলা যায় না। তাই সকলেই গঞ্জের রাস্তা এড়িয়ে চলত। খুব ধারেকাছের গ্রামগুলোও প্রায় জনশূন্য। দু-চারজন মুসলীম লীগের পাণ্ডা, রাজাকার বা ঐ জাতীয় মহাত্মারাই ছিল, এলাকা দাপিয়ে গরম করতে।

সেই ছেলেবেলা থেকেই আয়েশা বিবি কাজে গাফিলতি শেখেন নি। পাশে পোঁতা বাবলা ডালের সাহচর্য্য পেতে মদৎ দিচ্ছিলেন। অন্য কোন দিকে খেয়াল ছিল না।

হঠাৎ ছাগলের ডাক—চীৎকারে সচকিত তিনি পেছন দিকে চোখ ফেরান।

একদম হুমড়ি খেয়ে উঠোনে এসে পড়ল, এতক্ষণ যে-জীব আর্ত ব্যা-ব্যা-শব্দে বাঁশবনসমাহিত এই পাড়া মাথায় তুলেছিল। কার ছাগল, চিনতে আয়েশা বিবির এতটুকু দেরী হয়নি। সংসার দশ রকম কাঠ-খড় গোঁজা দিলে, তবে চলে। অন্যান্য সন্তান ছিল। তারা ছেলেবেলায় সরে পড়েছে। বেঁচে আছে একমাত্র শুধু বিশ বছরের আলী। তার রোজগার ঠাঁই-ঠিকানাহীন। কখনও হাজা, কখনও শুকো। তাগড়া জোওয়ান নৌকার মাঝি হতে পারত। কিন্তু নাওয়ের পয়সা কোথায়? মনে মনে সিদ্ধান্ত ছিল, সংসারে টানাটানি পড়লে তাজা খাসী বিক্রী করে দিলে ভালই দাম পাওয়া যাবে।।

কিন্তু উঠানময় এত রক্ত কেন?

কাজে মশগুল। আয়েশা বিবির কানে কোন গুলির আওয়াজ যায় নি। নচেৎ কিছু বুঝতে তার দেরী হত না। আগেই তিনি শুনেছিলেন, এহিয়া খানের মিলিটারীরা গাঁ থেকে মাঝে মাঝে ছাগল মুর্গী হাঁস ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু গঞ্জ থেকে এই গ্রাম দু' মাইলের ধাক্কা। ভয় অনেক কম। নিশ্চিন্ত ছিলেন আয়েশা বিবি।

তাই জোর ধাক্কা লাগে। বুঝে উঠতে পারেন না আয়েশা বিবি, এখন কী করবেন। ছোট্ট দৌড় দিয়ে উঠানে ছাগলের পাশে তিনি উবু বসে পড়লেন। তখনও ব্যা ব্যা চীৎকার উঠছে। কিন্তু তেজ ক্রমশঃ মন্দীভূত। পিঠের উপরে গুলি লেগেছে আলতো-ভাবে। লোম উড়ে গেছে। কিন্তু একটা ছাগল কাহিল বা ঘায়েল করার মত, জখম যথেষ্ট। রক্ত যথারীতি ঝরছে পেট বেয়ে।

অবলা জীবের গায়ে হাত বুলোতে থাকেন আয়েশা বিবি।

ছাগলটা মনিবের দিকে তাকায় এবং মাথা তোলার চেষ্টা পায়। কিন্তু অক্ষম। জন্তু-চোখ ক্রমশঃ বুজে আসে।

ছাগলটার দিকে কেউ গুলি ছুঁড়েছিল, যে কোন কারণেই হোক, তা বুঝার জন্যে—অন্তক কষাব দরকার নেই।

বাংলাদেশের রমণী চরণ-ধ্বনি শোনাব আগ্রহে অভ্যস্ত। কিন্তু যখন চরণ বুটের পেটে সেঁধিয়ে থাকে?

আয়েশা বিবি হঠাৎ কান খাড়া করেন। কারা যেন আসছে। দু-তিন মিনিট পরেই চোখে পড়ল তিনজন খান-সেনা উঠানে হাজির আদাড়-পাঁদাড় ভেঙে। বুটে গুচ্ছোর কাদা আর আবর্জনা।

বৃদ্ধা দ্রুত চোখ ফিরিয়ে অবলা জীবের দিকে মনোযোগী হন। ছাগলটা জোর ব্যা-ব্যা করে উঠল। বোধ হয়, শেষ চীৎকার। বুকের ধুকধুকি তখনও বর্তমান।

নিস্তব্ধ বৃদ্ধা।

সম্মুখে তিনজন সিপাই খাড়া। এই কয়েক মিনিট দৃশ্য উপভোগ করছিল যেন। হঠাৎ তিনজনে একসঙ্গে হেঁকে উঠল, 'এ-ই বুঢ্ঢি কিয়া হুয়া?'

ছাগলের গায়ে হাত বুলানো থেমে গেছে। যথাস্থানে অনড় বসে আছেন আয়েশা বিবি। কী বা জবাব দেবেন। ভাষার সঙ্গে ত পরিচয় নেই।

—কিয়া হুয়া?

—কিয়া হুয়া?

—কিয়া হুয়া?

ছাগলটা যেন জবাব দিতে ক্ষীণ ব্যা শব্দ করলে।

কিন্তু তখনই এক সিপাই আয়েশা বিবির কাঁধে আলতোভাবে রাইফেলের কুঁদো ঠেকিয়ে জিজ্ঞেস করলে অতি-শশব্যস্তে, 'এ-ই এই বুঢ্ঢি, তোমরা ঘর মে ছুরি হ্যায়—ছুরি, ছুরি—ছুরি?'

অন্যপক্ষ নিরুত্তর।

—আ রে শুনতি নেহি? ছুরি হ্যায়—ছুরি?

জবাব না পেয়ে সিপাই বুট তুলেছিল লাথি দিতে। অন্য সঙ্গী বাধা দিয়ে বললে, 'আ রে ছোড়ো ইয়ার। ও ত জবান নেহি সমঝতি।'

জবান অর্থাৎ ভাষা।

সুমথনাথ ঘোষের

ওখানে পদ্মা এখানে গঙ্গা ৫৲

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

কুয়ারী গিরিপথে ১০৲

আশাপূর্ণা দেবীর

কখনো দিন কখনো রাত ৩০৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

তিনে একে চার ২০৲

শঙ্কু মহারাজের

গিরিকান্তার ৯৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তর

রাত্রি নিশীথে ৭৷৷০

প্রবোধকুমার সান্যালের

তিন কন্যার ঘর ৭৷৷০

মহাশ্বেতা দেবীর

অজানা ৪৷৷০

অমর সাহিত্য প্রকাশন ৭, টেমার লেন, কলি-৯

হতাশায় ঝামটা দিয়ে উঠল ছুরি-অন্বেষী, 'আ রে সব মেহনৎ বরবাদ হো যায়ে গা।'

ছাগলের তখন মানুষের মতই শ্বাস উঠেছিল। মৃত্যুর সড়কে অজ-আমীর সমান।

এতক্ষণ নীরব, তৃতীয় সৈনিক সমর্থন দিলে, 'আফশোষ, সব মেহনৎ বরবাদ।'

বৃদ্ধার চোখ কেবল ছাগলের উপর নিবদ্ধ। পৃথিবীতে আর কিছু ঘটছে তিনি ওয়াকিবহাল নন।

হাতিয়ার-অন্বেষী গভীর হতাশায় শেষ দ্রুত আবেদন নিক্ষেপ করলে, আ রে কুছ ত বাতাও। উধার শালা মামলা খতম হোনে-ওয়ালা।'

অন্যদিকে মামলা শেষ হওয়ার রাস্তায়।

কিসের মামলা?

চতুর্দিকে বাঁশবন। আয়েশা বিবির খড়ো ঘর বাইরে থেকে সহজে চোখে পড়ে না। গাঁয়ে মিলিটারী হাজির। সেই অবস্থায় উঁকি মারার কেউ আছে কি না সন্দেহ। বৃদ্ধার মনে কোন্ সওয়াল বারবার ঘাই তুলছিল, কারো জানার কথা নয়।

'উশ্ শালা মেহনৎ বরবাদ।' একটা সিপাই যেন ককিয়ে উঠল।

'কিউঁ?' আর একজনের প্রশ্ন।

'জবেহ্ ত করনে হোগা।'

অর্থাৎ জবাই ত করতে হবে।

এতক্ষণে মামলার হদিস পাওয়া গেল।

শাস্ত্র অনুযায়ী ছাগল-জাতীয় প্রাণী জবাই করা বাধ্যতামূলক। নচেৎ হারাম (নিষিদ্ধ) হয়ে যায়। গ্রীবাচ্ছেদ-মারফৎ ছাগলের পরলোক-প্রস্থানের ব্যবস্থা না করলে, মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। পাপ হয়।

মামলা সেইখানে।

বুঝা যায়, প্রথমে খাসী জ্যান্ত ধরার চেষ্টা ব্যর্থ গেছে। তেজী ছাগল। তাই শেষে অস্ত্রের সাহায্য। কিন্তু গুলি ঠিকমত লাগেনি যে অকুস্থলেই শীকার পড়ে থাকবে। জখম জন্তু কোন রকমে মনিবের স্নেহাশ্রয়ে এসে প্রাণ ফিরে পেতে চেয়েছিল।

চুপচাপ সৈনিক বহু ভেবেছে, বুঝা গেল, যখন বললে, 'ছুরি নেই হ্যায়, চলো শালা বেয়নেট সে কাম খতম করো।'

একজন চট করে রাইফেল থেকে সঙীন খুলে ফেললে।

কিন্তু বাংলাদেশী অজ ওদিকে চিরতরে নীরব হয়ে গিয়েছিল। হাজার পেটালেও আর রা কাড়ত না।

'শালা মেহনৎ বরবাদ। ইয়ে পহলে কিউ নেহি বাতায়া?'

এই সৈনিকের কেউ যেন গ্রীবাচ্ছেদ করে দিয়েছিল! শব্দগুলো বড় মুষ্টে-ঘুষ্টে বেরুচ্ছিল গলা থেকে।

বিরক্তির চোটে মরা ছাগলের উপর এক-একটা লাথি কষিয়ে তিনজনে বধ্যভূমি ত্যাগ করলে।

এক মাসের মধ্যে, আলী, আয়েশা বিবির একমাত্র জীবিত সন্তান, প্রায় একই ভাবে নিজের জীবনঘটে চুরমার লাথি মেরেছিল।

ব্যাখ্যান সহজ।

স্বাধীনতার যুদ্ধে বাংলাদেশের অর্থ-নৈতিক জীবন বিপর্যস্ত। গ্রামের মজুর-কামীনদের উপর দিয়ে তার রগড়ানি বিশেষ-ভাবে বয়ে গেছিল। কেউ কেউ খান-সেনাদের সাহায্যক হিসেবে রাজাকার দলে যোগ দিয়ে মিটিয়েছিল নিজেদের ভাত-কাপড়ের সমস্যা। কিন্তু সেখানেও ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। সকলের কপালে তা জোটে নি। অনেকের কাছে আবার জনের ঊর্ধে মানের স্থান। তারা অনাহারে থেকেছে, তবু মিলিটারীদের অনুগ্রহ ভিক্ষে করেনি।

আলী এমন বিপাকে পড়েই একদিন নরসিংদি বন্দরের দিকে পাড়ি মেরেছিল। সেখানে একটা হিল্লে হবেই। কোন না কোন ধান্দা জুটে যাবে। মিলিটারী ক্যাম্পেও ত কাজের মানুষ লাগে। আলীর এহেন ধারণায় কোন খাদ ছিল না। মিলিটারী ক্যাম্পেই সে কাজ পেয়েছিল। পাশে রেল লাইন থেকে মাল-খালাস। দরদস্তুর করার প্রয়োজন হয়নি। পয়সা-কড়ি কিছু পাওয়া যাবেই। বেলা চারটের দিকে কাজ শেষ হয়। আট-দশ জন কুলী। ছুটি পাওয়া গেল। তখনই গোল বাধল। বেগার খাটলে কিছু খেলে না, তা আলী বা অন্যান্য সহকর্মী-দের মাথায় ঢোকেনি। মজুরী চাওয়া মাত্র ফ্যাসাদ বাধল। তখন শুরু হয়—বেতনের জায়গায় কেত। লাথি চড় রদ্দা থাপ্পড় কীল ঘুষি—যোগ করলে বেতের চেয়ে কিছু কম হয় না। সকলেই তাগড়া জোওয়ান। তাই আলী অকুস্থলে প্রাণ হারায় নি। অক্ষত

আগের গল্প ॥ রচনা ১৯৪৯ খৃঃ

উদ্বৃত্ত

'আল্লা যেন তরে দ্যাহে।'

আল্লা যেন তোকে দেখে।

মা ছাড়া দুই হাত তুলে কে আর দোয়া (আশীর্বাদ) মাগুকে? চোখের পানীর স্যাতসেতে ছোঁয়াচে ভেজা কথা-গুলো বুকের অনেক, অনেক অথই গহন থেকে উঠে আসে। 'আল্লা যেন তরে দ্যাহে।' তার আগেই মা আমার দিকে চেয়ে দেখেছে। কী দেখেছে? মেয়েটার চেহারায় কেমন জেল্লা লেগেছে! শাড়ী পরার ধরনটা কী সোন্দর! গাঁয়ের মানষে কী ছাই কাপড়-পিন্ধন জানে? কোন রকমে গতর ঢাকলেই সারে। মধ্যা পাড়ার শফী কেরানী সাবের মাইয়া, কউয়ে ত শহরের রঙীন রঙীন কাপড় পায়। হেরা-ও (তাহারাও) আমাগো লাহান (আমাদের মত)। একটু ফিডফাড এ-ই যা। খাইতা পায় বালা বালা (ভাল ভাল) চিজ। হের লাই (সেই জন্য) শরীলডা মোজতাজা। নইলে ছিরি নাই, ডউল নাই। আহা, আমার গরীবের মাইয়াডা (মেয়েটা) শহরে থাইক্যা খালি তন্দুরস্ত না, অইছে কী সোন্দর! জোয়ান কালে গোরা—অহন মাজা রঙ একদম পালিশ-পালিশ লাগে।

মা আমার দিকে চেয়ে থাকে। দৌড় মেরে দরদ-বিস্ময় সেখানে জমা হয়।

বাপজান কী করলেন? বা-জান। চিঠি দিয়েছিলাম। তাই না জানলেন, আমি। নচেৎ কী বুড়ো চোখে আমাকে আর চিনতে পারতেন? বোরখা ত আগেই খুলে ফেলেছিলাম। বড় পীরের দর্গার কাছে। ছেলেবেলা এখানে কতোদিন মানৎ শুধতে এসেছি। মা ক্ষীর রেঁধে দিয়েছেন। আল্লা বাপজানের বুজিরোজগারে যেন বরকত (বাড়) দেন। দর্গা ভেঙে গেছে। অশথের মোটা মোটা শিকড় ঢুকেছে ফাটলের মধ্যে। ভাঙাচোরা ফাটল—এখানে একমাত্র কথা। এখন জঙ্গল। আগে দর্গার উঠানে কতো দৌড়াদৌড়ি করেছি। ফকীর সাহেব বড় পেয়ার করতেন আমাদের। আমার বুকও আজ দর্গার মত ভাঙাচোরা.....।

বোরখা খুলে হঠাৎ মনে হয়েছিল, ঠাণ্ডা ঝিরিঝিরি হাওয়ায় বুড়িগঙ্গার ধারে হাঁটছি। তফাৎ—হাতে বোরখা রয়েছে, সেখানে যা থাকে না। ঠাণ্ডা বাতাস, গিসগিস ভিড়, চেঁচামেচি। এখানকার নির্জনতায় ঘুমন্ত কল জেগে ওঠে ঝাঁকুনি খেয়ে। বাপজান হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে দেখলেন। যেই কদমবুসির (প্রণাম) জন্যে নীচু হলাম, তিনি আমার দুই বাজু ধরে আবার দেখলেন, আমার চোখের ভেতর কী আছে—তারই সন্ধানে তৎপর। তারপর আমাকে বুকে চেপে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। আমার আমীরণ—মা রে আমীরণ। আইছস বুকের ধন ফিরা আইছস। গোডা কহৎ (দুর্ভিক্ষ) গ্যালো। তর লগে শহর গঞ্জ কথা-কথা না-বরলাম, দুই মুডা ভাতের লেইগ্যা। তবে আর পাইলাম কুই? কুথা যে গেলি! মা-রে বুকডা ফাইট্যা চৌচির অইয়া আছে। আদিখ্যেতা, আদিখ্যেতা। কান্না দেখলে, খোদার কসম আমার কিছু হয় না। লবণ-জল কতো কামে লাগে। সর্দি কাশি, বদহজমে। চোখের পানী কী কাজে লাগে, আমার জানা নেই। আমার চোখে আর দু ফোঁটাও জমা ছিল ব'লে মনে হয় না। বাপজান আমার বুকে তাঁর মাথা রাখতে, চোখে এত ঝরঝর পানী কোথা থেকে এলো?

ভিটার নীচে জমিনের উপর ভিড় জমে গিয়েছিল। এক বুক থেকে আর বুকে আমাকে নিয়ে লোফালুফি চলে। ঢাকার সদরঘাটে বুড়িগঙ্গা মুছে রাত্রি নামে। বাদশাহী আমলের কামানটা মুনিসি-প্যালিটি এখান থেকে সরিয়ে ফেলবে। তাহলে কমলাদি আর কিসে দেবেন সিঁদুর? মা আমাকে অনেক চুমু খেলেন

ঘরে। তারা কুপোকাৎ হতে পারত। কিন্তু আর যা-ই হোক, সারাদিন ভেড়ার মত যারা মেহনৎ দিয়েছে, গতর খাটিয়েছে—তাদের হত্যা বীরের কাজ নয়। মনুষ্যত্ব নিঃশেষে মরতে অক্ষম। তাই বোধ হয়, আলী রেহাই পেয়েছিল। তারপর সারা-দিনের অভুক্ত, ভাঙ্গাচোরা দেহ টেনে-টেনে এগোনো। একবার গ্রামে পৌঁছে মার সম্মুখে মৃত্যু-বরণের উদগ্র বাসনা আলীকে পেয়ে বসেছিল নিশ্চয়। নচেৎ যতই তাগদ থাক, অত ঘণ্টানির পর কী কেউ পাঁচ-ছ' মাইল রাস্তা ভ্যাপ্সা গরমের মধ্যে নিজের গতর বয়ে নিয়ে আসতে পারে?

বাড়ী পৌঁচেছিল আলী। খাসী ছাগলের মত 'মা' চীৎকার দিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল উঠানের উপর। ছেলের কাছে এসে জুটতে আয়েশা বিবির দেরী হয়নি। পুতের শ্বাস উঠেছিল। মা পানী আনতে দৌড়ান। ফিরে এসেছিলেন বৈকি তিনি পাত্র হাতে।

কিন্তু জলের প্রয়োজন তখন ফুরিয়ে গিয়েছিল।

বন্ধার দিকে তাকাও।

উপবিষ্ট উন্মাদিনী। মাথা নুয়ে পড়েছে।

কোল এবং বুকের মধ্যস্থিত এখন ভরাট। যেন এবড়োখেবড়ো মাংসের বস্তাকার এক বৃহৎ পিণ্ড। তবু দক্ষিণ হাত ধীরে ধীরে উত্থিত—যখন শীর্ণ আঙ্গুলগুলো ধাবমান তীর-চিহ্নের মত সিলুয়েট-ধারায় অনড় কোন ব্যাখ্যাতীত নির্দেশনার সাক্ষী।

নেপথ্যে শোনা যায় দৈব-ডাকের রব, 'কিরা হুয়া?...শেয়ালে গোস্ত খায়, শিপাই গোস্ত খায়?...'।

শৃগাল অজহারী। সৈনিকও অজহারী। ভূক্তদ্রব্যের পংক্তিতে সমান। তবুই কী কোন অভেদ অনুষঙ্গের বেড়ী?

না।

সাবেক কাহিনী।

গ্রামের লোক বলত : পরী।

আয়েশা বিবির স্বামী তখন বেঁচে। যে-সালে দেশ ভাগ হয়, সে বছর কি দেড় বছরের মধ্যে এই কৃষক-দম্পতির একটি মেয়ে হয়েছিল। ফুটফুটে গৌর গড়ন। তাই কল্পনার অত দৌড় গ্রামবাসীর। যখন মেয়েটির বয়স দু'বছর, রোগে ধরল। ঘুষঘুষে জ্বর। পরে দেখা গেল, কণ্ঠনালীর উপর লাল-লাল গোটা। বিদ্‌ঘুটে কোন রোগ। শহরের হাসপাতালে গেলে চিকিৎসা হতে পারে। দুধ তেল এবং রাধা-নৃত্য কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটল।

একদিন মগরীবের (সন্ধ্যার) অন্তে দু' বছরের পরী মরে গেল। কবর দিতে বেশী সময় লাগেনি। ছোট্ট গোর খুঁড়তে আর ক'ঘণ্টা লাগে? সকল গ্রামবাসির সহানুভূতি শেষকৃত্য আরো ত্বরান্বিত করেছিল। কারণ, পরীকে কে না আদর জানাতে কোলে নিয়েছে? সেই সরল দ্যুতিময় চক্ষু, আধ-আধ বুলির আকর্ষণ বর্বরও এড়াতে অক্ষম।

কিন্তু পরদিন ভোরে দেখা গেল, এক রাত্রের মধ্যেই শেয়াল পরীর লাশ তুলে নৈশভোজ সমাধা করেছে। গলা-কাটা অক্ষত মাথা পড়ে আছে ভিটে-সংলগ্ন রাস্তার পাশে। গলা থেকে দক্ষ শল্যবিদের মত যেন ছুরি চালিয়েছে শেয়াল। মাথাটি অক্ষত। চোখ জ্বলজ্বল বিস্ফারিত। সমর পারেনি, ভোরের আলোয় ভয়ে শেয়াল পালিয়েছিল।

কয়েকজন প্রতিবেশীনীর হাতে বন্দী, সংবাদ পেয়ে আয়েশা বিবি ছুটে এসেছিলেন এবং পরীর চোখের দিকে চেয়ে আহা-জারী জুড়েছিলেন উন্মাদিনীর মত। প্রতিবেশীনীদের জন্যে হাত বাড়িয়ে মুখটু বুকে তুলে নেওয়ার যো ছিল না। জীবন্ত এবং নিষ্পন্দ ধার চক্ষুর দৃষ্টি-আলিঙ্গনে কেউ বাধা দিতে পারেনি।

বন্ধা উন্মাদিনী হঠাৎ খাড়া, দুই হাত নেড়ে বিবর্তিত হতে লাগলেন।

বিকেলের বর্ণালি বুকে তরঙ্গিত মেঘনা বেহুঁশ।

তারস্বর অট্টহাস্য শোনো।

তারপর স্তব্ধতা। তারপর বন্ধার দুই পাটি দাঁত কড়মড় একত্রে মেশার চেষ্টা পায়। সব দাঁত নেই। দাঁতের সাদা এবং ফোগলা-ফাঁকের অন্ধকার—উভয়ে মিলে ক্রমশঃ দিগন্তের দিকে ধাবমান। প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে সৃষ্টি সুমেরু-কুমেরু অবধি বিস্তার কোন বিশাল তিমি যেন চোখের জল প্রশ্বাসের সমস্ত ফেলে দিয়ে রসদ-বোঝাড়ে দুই মাড়ি একত্র করছে যার মধ্যে আটক দেখা যায়—শৃগাল, সৈনিক শিশু ছাগল—নদনদী—আর্ত নরনারীর মিছিল।

শওকত ওসমান

চোখের পানী সহ। আমাদের গাঁ-খানা আজব। তিরিশ মাইলের মধ্যে এক ইঞ্চি রেল-লাইন নেই। গাঁয়ে আসতে পুরো একদিন দুই রাত্তি চলে যায়। আমার গালটা শিরশির করছিল। অভ্যাস, মড়ার অভ্যাস। মা যেন আমার গায়ের সমস্ত দগদগে ঘা এক নিমেষে মুছে নিলেন। সবাই আমার দিকে চেয়ে থাকে। গোটা গাঁ। চেনা অচেনা সবাই। ছোট, বড়। ছোট যারা ইতিমধ্যে সাবালক হয়ে গেছে, তাদের কাছে সব ভোজবাজির মত ঠেকে কী নসীব, আবার তবে দেইখ্‌লাম। আয়ার নজ্‌দিগ কতো পোয়া মাঙছি না? আহা মাইয়াডা বড় বা'লা মাইয়া ছিল। কহতে (দুর্ভিক্ষে) সব দরিয়ার লাহান (মত) ভাসাইয়া নিলো। আমারিণ রে, তোর দশী-ভৈন (বোন), দুই দাদা ত মরছে। কহতের পর ফির আইছিল, তহন নিলো ব্যারামে। কহতে নিলে ত বা'লই আছিলো। কতো মানুষের বল্লিজা ফাইড়া নিছ, অমাবডাও নিতা। হেতে (তাহাতে) আর কওয়ার কিছু ছিল না। অল্লা আশা দিসা নৈরাশ কইছন। শহরে আছস, মা। আল্লা যেন ভুল দাহে। চাচি কইলো ইয়ার বদিস। চাচির [illegible] আর কেউ নেই। এক চোপে ছানি পড়েছে। তেতুল তলার দিকে ঝুপড়ি ঘরে কোন একটা আধুলি গুঁজে দিলাম। কী খুশী যে হলো! মা বললেন, কত আর দিবার পারবি, মা। বহু মানুষের পোলা আছে। হগগলের বাড়াইন্যা হাত। মা রে এ জংগলে হব আপন-আপন। কে কারে দ্যাহে?

দু'তিন দিন পরে আমি টের পাই, সবাই আমার দিকে চেয়ে আছে। আল্লার জন্যে বান্দা অপেক্ষা করে না। শরীফা কাছে এসে নিজের কাহিনী বলে। বাপের ভিটায় জামাই নিয়ে আছে। নচেৎ সাঁঝবাতি কে দেবে? বাপ-মার ভিটা অন্ধকার থাকতে দিলে গোনা (পাপ) হয়। ইতিমধ্যে পড়শীরা এসে জোটে। কথায় কথায় শরীফা আমার শাড়ীর পাড় ছুঁয়ে জিজ্ঞেস করে, বড় সোন্দর দামী। তাঁতের বারো টাকা দামের শাড়ী সুন্দর না হলে বেনারসী শাড়ী অত কম বিক্রী হয় কেন? কমলা-দিদিকে এরা দেখেনি। তার মুর্শিদাবাদী রেশমের শাড়ী দেখলে এদের মৃগী রোগ দেখা দিত।

'জামাইয়ে এ শাড়ী কিইন্যা দিছে বুঝি?

'জামাই কুই পাইলি, পাগলী? হে ত করে মরছে! হায় রে কবাল্ল তা অইলে কী আর সাব'র (সাহেবের) বাড়ী গতর খাডাই?'

'জামাই নাই?. কী অইছিল?'

'কলেরা।'

'সাব'র বাড়ী কী কাম?'
'আয়া'
'পোলাবান দ্যাখা লাগে?'
'হ।'
'কত মাইনা?'
'পঁচিশ।'
'আরে মা। এক কুড়ি আর পাঁচ-'
'হ।'
'তাশ্বম বুঝি বাপজান-কে বিশ ট্যাহা দাও?'
'হ।'
'চাচা তা-ই কন। মাইয়ার জন্যে বুড়াকালে বাঁইচ্যা গেলাম। চাচা তোমারে দেখার তরে শহরং যাওয়ার চান। তুমি নাকি লিখছ, পরের বাড়ী থাকনের জায়গা নাই। বড়া মানুষ এত তকলীফে দরকার কী?'
'হ। রেলেও ট্যাহা লাইগব দশ-বারোডা। এমন বেফজুল খরচে কী নাফা (মুনাফা)?'
'হ। তা ত ঠিগই। ফের নিকা বস না ক্যান?'
'ক্যান বসুম? পিটটি ফস। তা-ও ইয়াদ থাকে না। তার থেইক্যা গতর খাডামু—খামু। কারো বাঁদী না।'
'হ। ঠিগ কইছস ভৈন। আমাদের ত পিঁজরার ময়না বানাইছে। তুমি শহরে থাইক্যা কথা শিখছ। কী সোন্দর তুমি
সুন্দর?

কমলাদিকে দেখলে খোদা মালুম এরা কী করত! সেই টানা চোখ, উদ্ধত-উচ্ছল বুক, মাটী-কাঁপা চলন। এদের বক্ষে ভূমিকম্প দেখা দিত বৈকি। আর লতিফা ভাবী (বৌদি)? সে-ই ত বোরখা দান দিয়েছে। বললে, খামখা কেন কিনবি? পাড়াগাঁয়ে কটা দিনের জন্যে ত দরকার হবে। অন্ততঃ বদ নজর থেকে রেহাই পাবি। লতিফার কথায় কতো মরদ মূর্ছা যায়, হেসে লুটিয়ে পড়ে। মুখে কথা হাউই-বাজির মত ফোটে, ছোটে। আমি আবার সুন্দর? হুঁহ।

যখন কেউ আমাকে দেখে না, তখন এরা আমাকে চেয়ে-চেয়ে দেখে। পুকুর-ঘাটে তিনচার জনে গুজগুজ, ফিসফিস করে। আমাকে দেখলে, থমকে থেমে যায়। সদর-ঘাটের ভিড়ে হাজার চোখের বল্লম ত বেঁধে না, যদিও বেঁধার জন্যে সদা উদ্যত। শান্ত এখনকার সব চোখ অথচ কতো তীক্ষ্ণ মনে হয়। কিরাতের তীরের মত আগা বিষ-মাখা।

বাপজান আমার দিকে চেয়ে থাকে। শুধাই, কিছু বলবেন বা-জান? না রে পাগলী, তরে দেহি। কতোদিন দেহি নাই, মা। কী দেখেন বাপজান? সাঁঝের অন্ধ পেরুলে দাওয়ায় বসে হুকা টানেন, কাশতে থাকেন। আমি ডিপার পাশে বসে মার সংগে চাউলের কাঁকর বেছে দিই। বাপজান চুপচাপ বসে থাকেন। চুপচাপ বসে থাকেন কেন? ডিপার আলো আমার মুখে পড়ে। বা-জান আমাকে দেখতে পান। আমাকে যে দেখেন, তা নিশ্চিত। কিন্তু কথা বলেন না কেন? মা-মণি কুলোর পাশে কাঁকর ফেলে রাখতে রাখতে আমার দিকে চেয়ে হঠাৎ থমকে চিবুক ধরে চুমু খায়। সদরঘাটের সিনেমাগুলোর পর্দায় মেয়ে-মরদের জড়াজড়ি চলছে। রাজা পাটোয়ারী ফিলিমের কারবার খুলবে বলেছিল। বাইরে বাঁশবনের শনশন হাওয়া বা-জানের কাশি ছাপিয়ে আমার কানে পড়ে। বুড়িগঙ্গার উপর গ্রীনবোটে মাঝরাত্রে ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ কেমন ভুতুড়ে-ভুতুড়ে ঠেকে। কমলাদি তখন গান গায়, তবলচীর সংগে বাজি ধরে। ফারার ব্রিগেডের দরওয়ান পহর বাজায়। নদীর উপর দূরে কোন নৌকায় কারা হল্লা করছে। হঠাৎ চোখে পড়ে মা কাঁকর বাচছে না, হাত বন্ধ করে চেয়ে আছে আমার মুখের দিকে। কী আছে এই মুখে...?

পাশের পাড়ার মেয়েরা কালও এসেছিল। বহুদিন পরে দেখা। একথা, সেকথা। আমার জখমে প্রায় মুখ ঢিপে-টিপে ওরা হাসছিল, চাপা হাসি। ওরা কী ভাবে? আমার হাত হাতে নিয়ে রুবু, আমির মেয়ে কুলসুম আঙুলগুলো দেখে।

—আমারণ, তোমার নখ হলুদ ক্যান?
—হলুদ বাইট্যা নখ হলুদ অইছে।
—না রে, এ ত মেহদীর দাগ মনে লয়।
—না, কুলসম।
—জামাই বুঝি মেহদীর খোশবু পাছন্দ করে?
—জামাই ত কবেই মরছে, পাগলী।

ওরা চেয়ে চেয়ে দ্যাখে, হাসে। চাপা হাসির ওস্তাদ কমলাদি—লতীফা-ভাবী।

—কাল ফের আইস্যো, কুলসম। কথা কইমু। ক'দিনধন বিকাল-বিকাল মাথা ধরে।
—শহরথন আইলা একডা মলম আইনসে বাংলা কুরতা। এহানে দাওয়াই মেলে না। শহরে খুব বাংলা মলম পাও না?
—হুঁ তা পাই বৈকি। সেহানেও পুইসা লাগে, ভৈন্।

ওরা চলে যেতে-যেতে পেছন ফিরে আমাকে দেখলে এবং হাসলে। আমাকে দেখলে কুলসম, কুলসমের চাচি, রজবালির বউ। ওরা পান খেয়ে গেল। মা পান কিনেছেন আমার জন্যে। ঠোঁটে রং দিলে সুন্দর দেখায়। একবার আভাসের পর বন্ধ কবলে কালসিটে ফিকে বিচ্ছির দেখায়। পান খেলে কিছুটা সারে। কুলসম আমার ঠোঁট দেখার প্রত্যাশী নয়। সে ত মরদ নয়...

চোখের ছায়ায় বুক ঠান্ডা হয়। জোড়া-জোড়া চোখ যখন ছায়া করে, বুক যেন ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে কাঠের মত জ্বলে। ছেলে-বেলার ছবিগুলো হারিয়ে যায় না কেন মন থেকে? কাল নদীর ধারে গিয়েছিলাম পানী আনতে। কালো কলস-খানা মা বইতে দিতে চায় না। দু' দিনের জ্বরে আইছস বাছা, একছু জিরা। আমাগো পোড়া প্যাডের দহনেই ত শহরং রাখছি তবে গতর খাডাতে। তবু মার কথা কানে নিলাম না। চাঁদনী রাতে কলে পানী না থাকলে বুড়ি-গঙ্গার ধারে কতো বার ছুটে গেছি। নদীর কাজ-সামাল বুকে বুক ডুবিয়ে যেন ভেতরটা অনেক দূর অব্দি দেখা যায়, যেখানে আকুলি-বিকুলি ভাবনা কেন দিন পৌঁছতে পারে না। ভিড়ে কতো লোকের চোখ খোলা অথচ কারো চোখে কেউ জমাট নয়; সব পিছলে-পিছলে সরে যায়। এই জন্মভূমি গাঁয়ে আমাকে সবাই দ্যাখে...

বাপজান বললেন, কবে যাবি রে, মা? বাপজান চুপ করে যান আমার দিকে চেয়ে। কী যেন বলার থাকে, আর বলা হয় না—ও'র মুখ দেখে আমি বুঝতে পারি। পাঁচদিন ত এসেছি। চেনাশোনা গাছ-গাছালি ঝোপ-লতা, মাটী, হাওয়ার সংগে সংগে বোঝাপড়া আমার এখনও দেখা হয় নি। বাপজান বলেন, কবে যাবি রে মা? কেন?, কেন? ওরা কী আমাকে দেখে টের পায়, সদরঘাটে সেই ছেলেটা যেমন চিনেছিল আর পিছু নিয়েছিল। দু' দিন আরো থাকুম। কতো দিন বাদ আইছি। বাপজান আর কিছু কইলেন না। আমার জন্যে কী ওঁর কোন দরদ নেই? মিছামিছি কী ভাবছি? ছিঃ। কমলাদি' বলে, মেয়েমানুষের একমাত্র দরদী নাকি যম। দিদি বড় অলুক্ষুণে কথা কয়। আহ, মরব ত একদিন। তা নিয়ে এত আদিখ্যেতা কেন?

মাঠের দিকে চেয়ে মন হু হু করে। কতদিন গেছি মাঠে নাড়া কাটতে, পাট-কড়াই ক্ষেত থেকে শাক তুলতে। একদিন বাদ আবার এই বেবহা জমিন পাড়ি দিতে হবে। বা-জান হয়ত সংগে যাবেন নদীর ঘাট পর্যন্ত। লতীফা ভাবীর বোরখাটা বড় কাজে লাগল। আসার দিনও কম কাজে লাগে নি। আমি মাঠ পার হবো, মা ভিটের কিনারায় খাড়া কাঁদবেন। কাঁদবেন। আমি পেছন ফিরে ফিরে কতবার দেখব। জানি, চোখের পানীতে সব ঝাপসা হয়ে যাসবে। তবু দেখব। পোড়া চোখ। ফুল-ফসলে সবুজ জমিন। তরতরে নদী ওইখানে বাঁক নিয়েছে—যেখানে নৌকার মাস্তুলের বাঁশ সারাসারি আকাশ-পানে উঁচোনো। বাপজান সংগে হাঁটতে হাঁটতে জানি কত গরম টানা-টানা নিঃশ্বাস ফেলবেন। তারি ফাঁকে হঠাৎ বলে ফেলবেন দুঃখ-ঢাকার লজ্জা সহ, 'মা রে, আবাদের সুমাই পাঁচ দশ ট্যাহা যদি বেশী দিবার পারিস—তুই আমার মাইয়া ন'স—মরদ পোলা—ব্যাডা—র‍্যাডা। বিদ্যাশে আল্লা যেন তরে দ্যাহে—

সাদা-দীল বা-জান। তিনি ত জানেন না, আমি ভারী-পাছা কমলাদি নই যে গানে বাজনায় পটু বা লতীফা-ভাবী নই (প্রতি-দিন রাত্রে আমার চার-পাঁচজন মিয়া-ভাই, দাদা যোগাড় করে) যে লেখাপড়ার গুণে রঙ্গরসে মানুষকে ডুবিয়ে ছাড়ব। আমার খরিদ্দার কতো কম! বয়সে গতরে পুষিয়ে যায়। বাড়ীওলা, বাড়ীওলী আর গুন্ডাদের থাই মিটিয়ে ক'টাকা আর বাঁচে? খামখা আন্দেশা (আশঙ্কা) বাপ-জানের। আমাকে দেখার লোকের অভাব হয় না। সাহেববাবু, দালাল ঠিকাদার আড়তদার বাচনদার—বহু আছে আমার অভিভাবক। সব সময় আছে বাদামতলীর যাত্রা পার্টোয়ারী—শরীফার চোখে খুব সোন্দর শাড়ীখানা যে কিনে দিয়েছিল। যে দেয় নেওয়ার অধিকার তারই থাকে, সে ত বস্ত্র কেড়ে নিয়ে আমাকে রোজই দেখে। ঘন্টার পর ঘন্টা...

কথায় কথায়

ইঁদুর

ঘরের মধ্যে টুকটুক করে ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকটা ইঁদুর, কয়েকটা মানে বেশ কয়েকটা। আমাদের সঙ্গে বেশ মানিয়ে নিয়েছে, মোটেই ভয় পায় না। আমাদের খাওয়ার সময় টেবিলের চারপায়ের কাছে ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়ায়, যেন পোষা জীব, আরাদের খাবারে ওদের অংশ নির্ধারিত হয়েই আছে।

তা যদি হতো, যদি কুকুর-বিড়ালের মত আমাদের খাবারের ভাগ খেয়ে ইঁদুরেরা পরিতৃপ্ত থাকতো তা হলে ইঁদুর পোষা সত্যি সম্ভব ছিলো। কেউ কেউ হয়তো ভালই বাসতেন ইঁদুর পুষতে। সাদা ইঁদুর, গিনিপিগ বা খরগোশ, সে তো অনেকেই পোষেন। ইঁদুরের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা না থাকলে, তার দাঁতে তরবারি-লাঞ্ছিত ধার না থাকলে কত গৃহস্থই হয়তো শখ করে ইঁদুর পুষতেন। কি সুন্দর দেখতে, ঝলমল করছে চোখের মনি, গায়ের রং বর্ষায় শেফালি পাতার মত ঘন কালো-সবুজ। হয়তো আদর করে এদের গলায় কেউ কেউ ছোট ছোট ঘুঙুর বেঁধে দিতেন। এরা যখন-তখন নৃত্য ভঙ্গিতে খাটের নিচে ছুটোছুটি করতো তখন ঘরের ভিতর টুনটুন শব্দ উঠতো, জলতরঙ্গের মধুর আওয়াজের মতো।

নেংটি ইঁদুর, মেগো ইঁদুর, এমন কি খেড়ে ইঁদুর সবই খুব সুন্দর দেখতে কিন্তু হুলো বেড়ালের মত বিরাট, কুৎসিৎ-দর্শন ছুঁচো ইঁদুর তাদের কি কেউ পুষতো? নিশ্চয়ই পুষতো, লোকে কত কদাকার কুকুর পোষে, হায়েনা পোষে। অজগর সাপ রেখেছি কাঁচের বাকসে গৃহস্থের বাড়িতে, গলায় শিকলবাঁধা বনবেড়াল সেও যত্ন করে লোকে পোষে। তবে ছুঁচো পুষবে না কেন?

বিশেষ করে ছুঁচোর মত হিংস্র জন্তু পৃথিবীতে বিরল। কলকাতার এক-একটা পুরানো বাড়ির বস্তিতলা, উঠোন পাইখানা চারদিক ঘিরে রাজত্ব করে ছুঁচো ইঁদুরেরা। তাদের দেখে কুকুর-বিড়াল ভয় পায়। তারা শিশুদের হাত থেকে রুটি কেড়ে নেয়, বাসন মাজবার সময় বাঁধা দাসীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় হাতা বা চামচ এবং সঙ্গে সঙ্গে নর্দমায় নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

সত্যিকথা বলতে কি ছুঁচোদের দুঃসাহসের কোনো তুলনা নেই। এই কলকাতা শহরে আজ পর্যন্ত, যত লোককে কুকুর-বিড়ালে কামড়িয়েছে বলে শুনেছি তার চেয়ে অনেক বেশি লোককে শুনেছি ছুঁচো কামড়িয়েছে। একবার আমাদের কালীঘাটের পুরনো বাড়িতে রান্নাঘরে বাসন চুরি করতে গিয়ে এক চোর ছুঁচোদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। প্রথমে সে পরিস্থিতির গুরুত্ব না বুঝতে পেরে একটি ছুঁচোশিশুকে মাথি মারে, তারপর তার সেই 'জাতির বাড়ি ব্যাংয়ের বাসা' ছড়ার বর্ণিত কাহিনীর নায়কের মত অবস্থা দাঁড়ায়। মুহূর্তের মধ্যে ড্রেন ও সুড়ঙ্গ নিবাসী এক দঙ্গল যুবক ও প্রবীণ ছুঁচো তাকে ঘিরে ধরে, প্রচন্ড আক্রমণ করে, শরীর থেকে প্রায় আধ-কেজি মাংস খুবলিয়ে নেয়। চোরের আর্ত এবং পরিত্রাহি চীৎকারে আমরা সবাই জেগে উঠে রান্নাঘরে ছুটে যাই এবং তাকে উদ্ধার করি।

এ তো গেলো ছুঁচো ইঁদুরের সমবেত বীরত্বের কথা। কিন্তু কোনো কোনো ছুঁচো একক বীরত্বেও অতুলনীয়। আমাদের পাড়ায় এক ভদ্রমহিলা ধানবাদ থেকে দুদিনের জন্য বোনের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। প্রথম দিন রাত্তে বাথরুমে যাওয়ার সময় অচেনা লোক বলেই হোক, বা গায়ে পা পড়ার জন্যেই হোক, একটি মধ্যবয়সী ছুঁচো তাঁর পা কামড়ে ধরে, পাকা আঠারো ঘণ্টা এই ছুঁচোটি অতিথি ভদ্রমহিলার পা কামড়িয়ে ধরে পড়ে থাকে, তাকে শিক দিয়ে খুঁচিয়ে, সিগারেট দিয়ে ছ্যাঁকা দিয়ে বা অন্য কোনো রোমহর্ষক উপায়েও তার নির্দিষ্ট কর্তব্য থেকে চ্যুত করা যায়নি।

ছুঁচোদের সম্পর্কে এতটুকু লেখার পর আমার একটা কথা জানতে ইচ্ছে করে। এই প্রবল পরাক্রমশালী, দুঃসাহসী, পরিশ্রমী এবং স্বাস্থ্যবান জানোয়ারকুলের কে বা কারা ছুঁচো নামকরণ করেছিলেন? এদের চেহারার বা চরিত্রে, এদের আচার-আচরণে কোথাও সেই ছাপ নেই যাকে লোকে ছুঁচোপনা বলে। এরা অনেক বেশি স্পষ্ট, সরল, হয়তো বা একটু বেশি সচেতন কিন্তু যাকে ছুঁচোপনা বলে এদের চরিত্রে সেটা কোথায়?

তবু ছুঁচোদের কথা থাক। বরং নেংটি ইঁদুরের কথা বলি, যাদের অত্যাচারে এখন আমি অতিষ্ট। কাল রাত্তে খুট খুট শব্দ শুনে জেগে উঠে আলো জেবলে দেখি, চারপাতা কথায় কথায় লিখে রেখেছিলাম তাই নিয়ে হৈ হৈ কাণ্ড হচ্ছে টেবিলের উপরে। অন্তত দশটা (আরো গোটা তিনেক আলো জ্বালাতে পালিয়েছিলো) অকুতোভয় নেংটি ইঁদুর কাগজের টুকরোগুলো আরো আরো টুকরো টুকরো করছে। কিন্তু সবচেয়ে সাংঘাতিক অবস্থা অন্যত্র, সেখানে তাকের উপর আমার বহুসাধের বিয়ের ঘড়িটি আর প্রিয় পুরনো ফাউন্টেন পেনটি নিয়ে খেলা করছে কয়েকটি শিশু নেংটি, মানিব্যাগের উপরে ডিগবাজি দিচ্ছে দুজন এবং করুণতম অবস্থা আমার বহুমূল্য গন্ধতেলের শিশিটির, ঈশ্বর বোধহয় আমার এটুকু বিলাসিতা, সহ্য করতে পারছেন না তাই এইসব সাপভ্রষ্ট দেবদূতদের প্রেরণ করেছেন মহার্ঘ শিশিটি ধ্বংস করে ফেলার জন্যে।

আমি চারদিকের অবস্থা দেখে হাহাকার করে ছুটে গেলাম। কিন্তু কিসের ছোটাছুটি। এদিকে এক দলকে তাড়াই ওদিকে আরেক দল ফিরে আসে, এবা কলম নিয়ে দৌড় দেয়তো, ওরা লেখা নিয়ে ছোটে।

এবং আমিও ছুটছি। ছুঁচো ইঁদুরদের পালাকীর্তন লেখা বহুকষ্টে শেষ করে এখন নেংটি ইঁদুরদের পিছনে ছুটছি। কিংবা তারাই আমার পিছনে ছুটছে। আমাকে ছোটাচ্ছে। এখন আমার জুতোর মধ্যে নেংটি ইঁদুর, মোজার মধ্যে, আলনায়, বিছানায়। আমার স্ত্রীর পায়ের উপর দিয়ে তারা নির্ভয়ে চলে যায়, আমার কুকুরের পিঠে উঠে খেলা করে। একটা বারোয়ারি বেড়াল ছিলো সেও এদের অত্যাচারে আজ কয়দিন হলো নিরুদ্দেশ। আমিও ভাবছি, সেটাই শেষ গতি কিনা?

তারাপদ রায়

মঙ্গলগ্রহ বিজয়

শিশিরকুমার ঘোষ

মহাকাশ অভিযানের আদিপর্বের কথা। পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে দূর-দূরান্তরের গ্রহ-উপগ্রহে যাবার পরিকল্পনায় পশ্চিমী বিজ্ঞানীরা সবে মনোনিবেশ করছেন। ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে বেশ রেষারেষি চলছে। এশিয়া এবং অন্যান্য সভ্যদেশের বিশেষজ্ঞরা মনপ্রাণ দিয়ে উন্নত ধরনের বেলুন তৈরী করতে শুরু করেছেন। সকলের সব প্রচেষ্টাকে ম্লান করে দিয়ে সুসভ্য ও উন্নত রুশরা সর্বপ্রথম বেলুন অভিযানে সফলকাম হল। কিন্তু সাফল্যের আনন্দে মত্ত না হয়ে সমস্ত ব্যাপারটিকে খুব গোপনে রেখে অন্যান্য দেশের অজ্ঞাতসারে তারা মঙ্গলগ্রহে অভিযাত্রী পাঠাবার আয়োজন করতে থাকল।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তিনটি মাঝারী আকারের বেলুন তৈরী করে তারা বিশেষ কৌশলে সেগুলিকে জুড়ে নিয়ে একটি উন্নত ধরনের মহাকাশযান তৈরী করে ফেলল। মহাকাশযান তৈরী হয়ে যাওয়ার পর তাদের একটি বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। পৃথিবী এবং মঙ্গলগ্রহের মাঝখানে হাজার হাজার মাইল বায়ুহীন মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে যাবার সময়ে অভিযাত্রীদের নিঃশ্বাস নেওয়ার বিষয়টি তাদের বিশেষ ভাবিয়ে তুলল। অবশেষে অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে তাদের দেশের বৈজ্ঞানিকরা বড় বড় জার ভর্তি করে মানুষের উপযোগী খাতাস মহাকাশযানের সঙ্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিল। রুশরা আত্মনির্ভরশীল। সুতরাং মহাকাশ-অভিযানে ক্ষেত্রেও তারা এমন ব্যবস্থা করল যাতে অন্য কোন প্রতিবেশীর কাছে কোন বিষয়ে নির্ভর না করতে হয়। অবশেষে রুশ অভিযাত্রীদের নিয়ে মহাকাশযান মঙ্গলগ্রহে যাত্রা করল। কিন্তু পথে হল বিপদ। মাঝ রাস্তায় অভিযাত্রীদের নিঃশ্বাস নেবার বাতাস ফুরিয়ে গেল। রুশদের নীতির ব্যতিক্রম ঘটিয়ে অভিযাত্রীরা বাঁচার তাগিদে পৃথিবী আর মঙ্গলগ্রহের মাঝখানে অবস্থিত একটি ছোট প্রতিবেশী গ্রহের সাহায্য নিতে বাধ্য হল। ঐ ছোট গ্রহে নেমে ওরা ওদের জারগুলিতে আবার হাওয়া ভর্তি করে নিয়ে ওদের লক্ষ্যপথে এগিয়ে চলল। বেশ কয়েকদিন চলবার পর রুশদের বেলুন দিয়ে তৈরী মহাকাশযান মঙ্গলগ্রহে গিয়ে পৌঁছল। সেখানে গিয়ে অভিযাত্রীরা দেখল যে মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দারা ঠিক তাদেরই মতন,—শুধু ওদের চামড়া বাদামী রংয়ের।

মঙ্গলীরা দূর থেকে বেলুনগুলোকে মেঘ মনে করেছিল। অবশ্য পরে বুঝতে পেরেছিল যে ওগুলো মেঘ নয়—অন্য কিছু। ওরা অবাক হয়ে দেখছিল, কিভাবে নীচে থেকে তাদেরই মত দেখতে কিছুসংখ্যক লোক অদ্ভুত উপায়ে ওপরে উঠে এল (বিশেষ করে যে সময়ে রুশরা সদর্পে ও সগর্বে তাদের বেলুনবন্দন থেকে বেরিয়ে মঙ্গলগ্রহে অবতরণ করছিল)। রুশদের চালচলন দেখে সহজ, সরল, ধর্মভীরু মঙ্গলীরা ভাবল যে এরা নিশ্চয় দেবতা, বোধহয় ওদের ডাকে সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করতে এসেছে। যেমন ভাবা, তেমনি কাজ,—মঙ্গলীরা আগন্তুকদের সামনে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ল। পৃথিবীর মানুষের ভাবনা একটু ভিন্ন গোত্রের। তাই রুশরা যা ভেবেছিল, তা হল না। ওরা ভেবেছিল যে মঙ্গলীরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে এবং ওরা সেইমত প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। ওরা নানারকম অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত; কিন্তু মঙ্গলীদের সম্মুখীন হয়ে বেশ বোকার মত চেয়ে রইল। কারণ মঙ্গলীরা ওদের দেখে যুদ্ধও করল না, আবার ভয়ে পালিয়েও গেল না। মঙ্গলীরা ভয় কাকে বলে জানত না। তার কারণ, ওদের তখনো পর্যন্ত কেউ কোনদিন ভয় দেখায়নি, বা কোন অনিষ্ট করেনি। কি আশ্চর্য !!

মহাত্মা শিশিরকুমার

কিছুদিন মঙ্গলগ্রহে থাকবার পর অভিযাত্রীরা বুঝতে পারল যে মঙ্গলীরা অত্যন্ত ভদ্র এবং অতিথিপরায়ণ। চাষ-আবাদের ওপর নির্ভর করে ওরা সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনেই অভ্যস্ত। রক্তপাত ঘটানো মঙ্গলীদের কাছে নিতান্তই ঘৃণ্য বিবেচিত হওয়ায় মাংসের প্রতি ওদের কোন স্পৃহা ছিল না। মাংসকে সুখাদ্য হিসাবে ওরা কোনদিন ভাবতেই পারত না। যুদ্ধ-বিগ্রহের সঙ্গে ওদের কোন পরিচয় না থাকায় মঙ্গলীদের সমাজ চিন্তায় বা সংস্কৃতিতে 'হানাহানি' যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যার অযোগ্য ছিল। ওদের ইতিহাসের কোন পাতায় রক্তপাতের কলঙ্কের দাগ ছিল না। পৃথিবীর অধিবাসীদের মত মঙ্গলীরা পরলোকে বিশ্বাস করলেও ওদের ধর্মচিন্তা খুবই সরল ছিল। ওদের দেশের শিক্ষকদের শেখানোর পদ্ধতি এতই সহজ ছিল যে রুশদের মধ্যে কয়েকজন প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যেই মঙ্গলীভাষায় পড়তে, লিখতে ও কথাবার্তা বলতে শিখে গেল। মঙ্গলীদের দর্শন এতই সাদাসিধে যে রুশ অভিযাত্রীদের মধ্যে যারা ওদের ভাষা শিখতে পেরেছিল, তারা মঙ্গলীদের 'সবেধন নীলমণি' নামে যে একটি মাত্র দর্শনের বই ছিল, তা পড়ে শেষ করে ফেলল। ওদের দর্শনে দুর্বোধ্য কিছুই ছিল না। সুতরাং বুঝতেও কোন কষ্ট হল না। অভিযাত্রীদের মতে মঙ্গলীদের দর্শনের সার কথা হল,—'শুদ্ধাচারে জীবনযাপন করা এবং যে কোন উপায়েই হোক শান্তিতে জীবনধারণ করা।' মঙ্গলগ্রহে পশুর সংখ্যা খুব বেশী না হলেও বিভিন্ন ধরনের নিরামিষভোজী পশুপাখীর অভাব ছিল না। মঙ্গলীরা তাদের ছেলেমেয়েদের এমনভাবে গড়ে তুলত যাতে তাদের আচার ব্যবহারে পশুপক্ষীদের আচরণ বৈশিষ্ট্য কখনও না

(মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের ইংরাজী ব্যঙ্গ-রচনা 'কঙ্কোয়েস্ট অফ মার্স' অবলম্বনে রচিত)

সুহৃদগোপাল দত্ত

ফুটে ওঠে। কারণ ক্ষণিক আনন্দের জন্য নিজের বা অপরের শান্তিকে নষ্ট করা ওদের ধর্মে বা দর্শনে নিষিদ্ধ ছিল। এইসব সহজ, সরল নীতি ও অনুশাসনের প্রচলন থাকা সত্ত্বেও গড়ে দশ বা পনেরো বছর অন্তর একজন অপরাধী ধরা পড়ত। অপরাধী ধরা পড়লে ওখানকার সকলেই বেশ দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত হয়ে উঠত, যতক্ষণ না একটা ব্যবস্থা হয়। ওদের শাস্ত্রে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার বদলে তাদের বিশেষ পদ্ধতিতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া ছিল। অবশ্য পৃথিবীর মানুষের তুলনায় ওদের বুদ্ধি কতটা কম ছিল, তা মাপবার সুযোগ অভিযাত্রীরা পায়নি।

রুশদের সঙ্গে মঙ্গলীদের প্রথম সাক্ষাৎ যেমন প্রীতিপূর্ণ হয়েছিল, তেমনি অতিথি হিসাবে অভিযাত্রীরা মঙ্গলগ্রহে প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে রাজার হালেই ছিল। ঐ সময়ে অভিযাত্রীরা মঙ্গলগ্রহের অবস্থান সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করার সঙ্গে সঙ্গে বহু মূল্যবান জিনিস নিদর্শন হিসাবে সঙ্গে নিয়ে যাবার অনুমতি পেল। মঙ্গলী-দের আদর্শ অতিথি পরায়ণতা এবং মধুর ব্যবহারের বিনিময়ে অভিযাত্রীদের তরফ থেকে শুভেচ্ছা জানানো ছাড়া আর কিছুই দেওয়ার মত ছিল না। কিন্তু নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করবার প্রলোভন সম্বরণ করতে না পেরে ঠিক আসবার সময়ে অভিযাত্রীরা এমন একটি গর্হিত কাজ করে ফেলল যা মঙ্গলীরা কল্পনাও করতে পারেনি। অবশ্য কাজটা অভিযাত্রীরা কতকটা বিজ্ঞানের খাতিরেই করেছিল। অভিযাত্রীদের মধ্যে কয়েকজনের একটা মঙ্গলী 'স্যাম্পেল' পৃথিবীতে নিয়ে যাওয়ার ভীষণ ইচ্ছে হয়ে-ছিল। সেইজন্য ওরা একজন নিরীহ মঙ্গলীকে আপ্যায়নের অছিলায় বেলুন-যানের মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাকে খুব কড়া এক ডোজ পানীয়ের সহিায্যে সংজ্ঞাহীন করে ফেলল। মঙ্গলীটি সংজ্ঞাহীন হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করে মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দাদের অনু-মতির অপেক্ষা না করে বেলুন-যানের নঙ্গরটি তুলে নিয়ে পৃথিবীর পথে পাড়ি দিল। মঙ্গলীরা অবাক হয়ে অভিযাত্রীদের এই অভিনব ভদ্র এবং মার্জিত আচরণ দেখে গেল। অবশ্য অভিযাত্রীরা যে একজন মঙ্গলীকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, এটা তারা কল্পনাই করতে পারেনি। ওরা ভাবল যে নিশ্চয় ওদের আতিথেয়তায় কোন ত্রুটি হয়েছিল। তাই অতিথিরা রুষ্ট হয়ে ওদের কোন আশীর্বাদ না করে আবার দেবলোকে ফিরে গেল।

রুশ অভিযাত্রীদল নির্বিঘ্নে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। ওদের এই সাফল্যে সমস্ত দেশ উৎসবমুখর হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে অভিযাত্রীদের বিরাট অভিনন্দন জানাবার আয়োজন হল। বিশিষ্ট নাগরিকদের উপ-স্থিতিতে এক বিশাল জনসভায় অভিযাত্রীরা সকলের অভিনন্দন পাবার সঙ্গে অসংখ্য প্রশ্নবানে জর্জরিত হয়ে উঠল। সকলেরই হাতে সময় বেশী না থাকার জন্য স্থির হল যে একটি বিশেষ জনসভায় অভিযাত্রী দলের নেতা মঙ্গলগ্রহ অভিযানের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেবেন। ঐ জনসভার উদ্যোক্তারা যথারীতি চড়া দামে বেহিসাবীর মত প্রচুর প্রবেশপত্র বিক্রয় করল।

নির্দিষ্ট দিনে অভিযাত্রীদলের নেতা জনসভায় বক্তৃতামঞ্চে (নিজের ডানদিকে) সেই মঙ্গলীকে একটা বিশেষ আসনে বসিয়ে রেখে তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে লাগলেন। শ্রোতারা সেই বিচিত্র কাহিনী শোনবার সময় মুগ্ধ হয়ে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর করতালি দিয়ে তাদের উচ্ছ্বাস জানা-বার ফাঁকে ফাঁকে সভাকক্ষের কিছু আসবার-পত্রের ওপর তাদের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের স্বাক্ষর এঁকে দিতে থাকল। যতক্ষণ না পর্যন্ত উদ্যোক্তারা নেতাকে বক্তৃতা থামাতে বললেন ততক্ষণ পর্যন্ত একটানা বক্তৃতা দেওয়ার পর অভিযাত্রীদলের নেতা শ্রোতাদের জানালেন যে তিনি তাদের যে কোন প্রশ্নের জবাব দিতে প্রস্তুত আছেন। এরপর শুরু হল প্রশ্নোত্তরের পালা।

সর্বপ্রথম একজন কাপড়ের কলের মালিক প্রশ্ন করলেন : 'মঙ্গলীরা (স্ত্রী ও পুরুষ) যে ধরনের বেশভূষা করে, সেই চাহিদা মেটানোর জন্য রুশদের কাপড়ের কলে তৈরী জামাকাপড় মঙ্গলগ্রহে চড়া দামে বিক্রয় করার সুযোগ-সুবিধা কি রকম? মঙ্গলগ্রহে বিদেশীদের বাণিজ্য করবার জন্য শুল্কের হার কি রকম?

উত্তরে অভিযাত্রীদলের নেতা বললেন : জাতির শিল্প প্রগতির স্বার্থে এই ধরনের প্রশ্নের গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করতে পেরে-ছেন এবং এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করাই তাঁদের অভি-যানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সময়া-ভাবে এবারের অভিযানে তিনি ঐ সব তথ্য সংগ্রহের সুযোগ পাননি। তবে আগামী অভিযানে তিনি শিল্প প্রগতির স্বার্থ-সংক্রান্ত যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য নিশ্চয় সংগ্রহ করে আনবেন। অবশ্য তিনি প্রশ্ন-কর্তাকে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করার জন্য বিশেষ প্রশংসা করলেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন বিখ্যাত ভাঁটি-খানার একমাত্র স্বত্বাধিকারী : ওদেশের লোকেরা পানীয়ের কদর দেয় কিনা। সেখানে ওর ভাঁটিখানার তৈরী 'বীয়ার' কি রকম সমাদৃত হবে?

(অভিযাত্রীদলের প্রত্যেকেই অভিযানের সময় ঐ বীয়ারের মূল্যায়ন করার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন।)

তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রশ্নটি করলেন দেশের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ খনিমালিক : 'মঙ্গলগ্রহে সোনা পাওয়া যায় কিনা? ওখানে কয়লা এবং খনিজ তেলের প্রচলন আছে কিনা?'

দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিয়ে অভিযাত্রীদলের নেতা বললেন : প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য তিনি আগ্রহী। কিন্তু এই ধরনের তুলনামূলক তথ্য সরবরাহ করার আগে তাঁকে মঙ্গলীদের উপদেষ্টা পরিষদের অনুমতি নিতে হবে। কারণ উভয় গ্রহের মধ্যে এইরকম একটা চুক্তিতে সই করতে মঙ্গলীরা তাঁকে বাধ্য করেছে। সুতরাং ইচ্ছা থাকলেও চুক্তিভঙ্গ করে তিনি কোন উত্তর দিতে পারেন না। তবে মঙ্গলীদের অনুমতি পাবার পর তিনি নিশ্চয় এই বিষয়ে আলো-চনা করবেন।

তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন : প্রশ্ন দুটি শুনে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। কারণ তিনি মঙ্গলগ্রহে থাকার সময় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঐ সম্পর্কে বিজ্ঞান-

সম্মত উপায়ে তথ্য সংগ্রহে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং সংগ্রহের কাজ শুরুও করেছিলেন। একজন নভোচর হিসাবে তাঁর স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে কয়েকটি অপ্রত্যাশিত বাধার সম্মুখীন হওয়ায় তিনি অনুসন্ধানের কাজ শেষ করতে পারেননি। তবে এই অভিযানে যা করা সম্ভব হয়নি, আগামী কয়েকটি অভিযানে তিনি তা নিশ্চয় সুসম্পাদিত করবেন।

এইভাবে পর পর অসংখ্য প্রশ্নের প্রত্যেকটির জবাব তিনি খুব সতর্কভাবে সংগে এবং সন্তোষজনকভাবে দিতে লাগলেন। সবশেষে তিনি বললেন : সবদিক বিচার করে তিনি এই সিদ্ধান্তেই এসেছেন যে (ভদ্রই হোক, সভ্যই হোক, আর অতিথি-পরায়ণই হোক), মঙ্গলীরা গেঁয়ো চাষার জাত। তাদের দেশে দুর্গ নেই, যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম নেই, বন্দুক, কামান বা উন্নত ধরনের কোন আগ্নেয়াস্ত্রের জ্ঞান তাদের নেই। দেশের আভ্যন্তরীণ শৃংখলা বজায় রাখবার জন্য সেখানে না আছে পুলিশ, না আছে কয়েদখানা। সেখানে চিকিৎসক এবং শিক্ষকদের অভাব না থাকলেও উকীল, ব্যারিস্টার, এ্যাটর্ণী বা আইনজীবী সম্প্রদায়ের সৃষ্টিই হয়নি,—অর্থাৎ দেশের আইন শৃংখলা ইত্যাদি বলবৎ রাখার প্রয়োজনীয়তা মঙ্গলীরা কখনও উপলব্ধি করেছে কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

এইসব চাঞ্চল্যকর তথ্য পরিবেশিত হবার পর পৃথিবীর মানুষ হিসাবে রুশ মানবপ্রেমীরা মঙ্গলীদের উন্নত করবার জন্য বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠলেন এবং কয়েকজন অত্যুৎসাহী সভাকক্ষেই হাঁটু গেড়ে বিধাতার কাছে প্রার্থনা শুরু করলেন। ক্রমশঃ সবাই সেই প্রার্থনায় যোগ দিয়ে সভার কাজ শেষ করলেন।

এরপর বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে রুশরা তাদের দ্বিতীয় অভিযানের আয়োজন শুরু করে দিল। সর্বসাকুল্যে পাঁচ হাজার লোক প্রস্তুত করা হল। কারণ এইবার শতাধিক মহাকাশযান একসংগে মঙ্গলগ্রহের পথে পাড়ি দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এই অভিযানে অভিযাত্রী হিসাবে গেলেন একজন ভূ-বিজ্ঞানী, একজন জীববিজ্ঞানী, একজন খনিজ-পদার্থ বিশেষজ্ঞ এবং তাঁদের গবেষণার কাজে সাহায্য করার জন্য পনেরো ডিভিসন পদাতিক সৈন্য, দুই রেজিমেন্ট অশ্বারোহী সৈন্য, বারটি টর্পেডো বোট এবং প্রয়োজনীয় নারকীয় অস্ত্রসম্ভার। এ ছাড়া মঙ্গলীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য এক হাজার বোতল অত্যুৎকৃষ্ট 'রাম' (উৎকৃষ্ট পানীয়) এবং বার হাজার ধর্মপুস্তক। শুভক্ষণে এই বিরাট অভিযান মঙ্গলগ্রহ অভিমুখে যাত্রা শুরু করল এবং ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ায় অভিযাত্রীরা বিনা বাধায় পূর্ব নির্দিষ্ট পথে মঙ্গলগ্রহের একাংশে নিরাপদে অবতরণ করল।

মঙ্গলগ্রহের অধিবাসীরা রুশদের দ্বিতীয় অভিযাত্রীদলকে অভ্যর্থনা জানাবার আগেই মঙ্গলগ্রহকে উন্নত করবার সদিচ্ছা নিয়ে অভিযাত্রীরা তাদের সুবিধামত মঙ্গলগ্রহের কিছু অংশ অধিকার করে নিল। মঙ্গলীরা নিতান্তই গেঁয়ো চাষার জাত বলে রুশীয়ানদের ঐ মহৎ উদ্দেশ্যকে ভুল বুঝল। ওরা সহিংস আক্রমণে অনভ্যস্ত থাকায় অসহযোগ আন্দোলনের পদ্ধতিতে রুশ অভিযাত্রীদের প্রায় কোনঠাসা করে রেখে দিল। অবশ্য রুশদের সংগে প্রচুর মজুদ রসদ থাকায় ওরা বহাল তবিয়তে নিজেদের ছাউনীর মধ্যে বসে মঙ্গলীদের বাগে আনবার জন্য নানা রকম জল্পনা কল্পনা করতে লাগল। এদিকে পৃথিবীতে তখন মঙ্গলগ্রহের স্বত্ব-স্বামীত্ব নিয়ে বিভিন্ন সভ্য জাতির মধ্যে স্নায়ু-যুদ্ধের সূত্রপাত হয়ে গেছে রুশদের মঙ্গলগ্রহ বিজয়ের পরিকল্পনার কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ার ফলে।

একজন রুশ পদস্থ কর্মচারী এক হাজার মুদ্রার বিনিময়ে মঙ্গলগ্রহ বিজয়ের সম্পূর্ণ পরিকল্পনার নকসাটি প্রতিবেশী হের্মানদের কাছে বিক্রী করে দেওয়ার পরই যত গোলমাল শুরু হল। হের্মানদের মঙ্গলগ্রহে অভিযান শুরু করার কিছুদিন বাদেই তাদের প্রতিবেশী মাঁসিয়ে জাতিও একদল অভিযাত্রী পাঠাবার ব্যবস্থা করল। এইভাবে প্রায় প্রত্যেকটি পশ্চিমী দেশ থেকে মঙ্গলগ্রহের

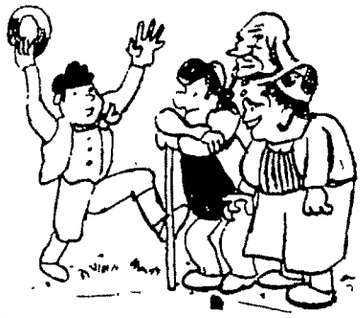

উন্নতিকল্পে অভিযাত্রীদল নিজস্ব মহাকাশযানে চড়ে মঙ্গলগ্রহের কিছু কিছু জায়গা দখলে এনে ফেলল। ফলে বেশ কিছু মঙ্গলী বিনাদোষে নিহত হল এবং ওদের ধর্ম ও সংস্কৃতির সব কিছু বৈশিষ্ট্য প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেল। সবশেষে সকলের ওপর টেক্কা দিয়ে ওখানকার সবচেয়ে ভাল জায়গাটি দখল করে নিল লালরাজার দেশের অভিযাত্রীরা। এরপর মঙ্গলগ্রহে মঙ্গলীদের কল্যাণে বিভিন্ন পশ্চিমী জাতির অভিযাত্রীদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ চলতে লাগল এবং সেই যুদ্ধের রসদ জোগাতে গিয়ে তাদের স্ব-স্ব উদ্বৃত্ত রাজস্বে যখন ঘাটতি দেখা গেল, তখন লালরাজার দেশের মধ্যস্থতায় একটি শান্তির চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হল। ঐ চুক্তিপত্রের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হল যে, প্রত্যেক অভিযাত্রীদলের মুখ্য উদ্দেশ্য হল মঙ্গলীদের সভ্য করে তাদের সংগে মেলামেশা করবার উপযুক্ত করে তোলা। এর পরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত।

মঙ্গলগ্রহ কিছুদিনের মধ্যে বিভিন্ন পশ্চিমী জাতির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সভ্য হয়ে উঠল। তাদের উন্নত দৃষ্টিভংগী এবং যাত্রীরা বুঝতে পারল যে মঙ্গলীরা অত্যন্ত সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ওখানে আইন-আদালত প্রতিষ্ঠিত হল,—যেখানে শুধু মঙ্গলীদের বিচার হবে (অবশ্য বিচারক হবার অধিকার কেবল অভিযাত্রীদেরই থাকবে)। আইন ও আদালতের চাহিদা মেটাবার জন্য কারাগার ও বধ্যমঞ্চ তৈরী করার পর আদালতকে সক্রিয় রাখবার জন্য প্রতি একশ গজ অন্তর পুলিশ পাহারার ব্যবস্থাও করা হল। (অবশ্য অভিযাত্রীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় কিছু মঙ্গলীকে পুলিশের কাজে নিযুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল)। উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর মধ্যে সমস্ত গ্রহ জুড়ে সুসজ্জিত জনপদবধূদের আস্তানা গড়ে দেওয়ার সংগে ধর্মপ্রচারকদের বাসস্থান রুচিসম্মতভাবে নির্মাণ করাবার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকায় ঐগুলি অচিরেই বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল। 'দুঃস্থ-মঙ্গলী' নামে (অভিযাত্রীদের সদিচ্ছায় ও আন্তরিক প্রচেষ্টায়) একটি নতুন সম্প্রদায় সৃষ্টি হওয়ায় তাদের পুনর্বাসনের জন্য বেশ কয়েকটি বিশ্ব-কল্যাণ সংস্থার দপ্তর তাদের নিজস্ব প্রতিনিধিদের মাধ্যমে কতকগুলি প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন।

সম্মিলিতভাবে অধিকৃত মঙ্গলগ্রহে বিভিন্ন জাতির উপনিবেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হল,—যেমন আমেরিকায় পর্তুগীজদের, আফ্রিকায় ইউরোপীয় জাতিগুলির, ভারতবর্ষে... ইত্যাদি। ইতিহাসের পাতায় কিন্তু লেখা রইল অভিযাত্রীদের কৃতিত্বের কথা—যেমন যুগে যুগে লেখা হয়ে এসেছে।

বিঃ দ্রঃ—মূল ইংরাজী রচনাটি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে লিখিত এবং অমৃতযাত্রার পত্রিকায় প্রকাশিত।

মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

নীহাররঞ্জন দাশগুপ্ত

জনসংযোগ অধিকর্তা
এম-টি-পি

'এদেশের মাটি, জল, হাওয়া এবং সর্বোপরি এদেশের মানুষের সঙ্গে এদেশেরই একজন নাগরিক হিসাবে আমার গভীর আত্মিক টান আছে। এ জিনিসটা সব সময়েই আমার মনে আসে। এদেশে আমি জন্মেছি, যদি শহরের কথা ধরেন, তাহলেও এই শহরে আমার জন্ম, এই শহরেই ছাত্র-জীবন, কলেজজীবন এবং মধ্যবয়স অতিক্রম করে এখনও এই শহরেই টিকে আছি। জীবনের এই পর্যায় পর্যন্ত সবরকম লোকের সঙ্গেও মিশেছি। তাই খুব সহজেই এই শহরের সেন্টিমেন্টটা আমি বুঝতে পারি, যেমন বুঝতে পারি তরুণদের সমস্যা, ঠিক সেইভাবেই বুঝতে পারি নাগরিকের সমস্যা, কষ্ট। তাই এদেরকে ঘিরেই আমার মমত্ব-বোধ, ভালবাসা যা কিছু বলতে পারেন। আমার দেশের মানুষের জন্য, তাঁদের বোধ-গম্যের জন্য এদেশের মাটি, জল এবং বাতাসের সঙ্গে মিল রেখেই আমি তাই বিজ্ঞাপনের বয়ান তৈরি করি। এদেশেরই শিক্ষা, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিকে আমি বিজ্ঞাপনে প্রাধান্য দিই। পাশ্চাত্য ধারার বিজ্ঞাপন পদ্ধতি অনুকরণ করে সেই হিসাবে প্রচার মাধ্যমে আমি একদম বিশ্বাস করি না। আমি বাঙালী। বাঙালী-ঘরানা মাফিক বিজ্ঞাপনই আমি প্রকৃষ্ট মাধ্যম বলে বিশ্বাস করি, বিশেষত যেখানকার উন্নতির জন্য আমাকে কাজ করতে হচ্ছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে।'

কথাগুলো আমায় বুঝিয়ে দিলেন মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্ট প্রোজেকট্-এর পাবলিক রিলেসনস অফিসার শ্রীনীহাররঞ্জন দাশগুপ্ত। সত্যি কথা বলতে কি, কথা-গুলো ভীষণ মুগ্ধ করেছিল আমায়। আজকের দিনে সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে, দেশীয় কথকতার রীতিতে প্রচারধারা সম্পর্কে এদেশে যে কজন ভাবছেন, চিন্তা করছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীনীহাররঞ্জন দাশ-গুপ্ত একটি অগ্রগণ্য নাম।

'আপনি ভাবতে পারেন শ্রীরায়? ভেবে আমার দুঃখ হয়, রাগে ছটফট করি যখন দেখি বাঙ্গালীদের জন্য বাংলায় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবে তার জন্য বিজ্ঞাপনের বয়ান করছেন সাহেববাবুরা, যাকে বলা হয় 'মাস্টার কপি', আর তার 'অ্যাজপটেশন কপি' হলো —বাংলা!'

একজন যথার্থ পাবলিসিটি বা পাবলিক রিলেসনস অফিসারের কর্তব্য কি? প্রশ্ন করি আমি।

শ্রীদাশগুপ্ত আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। তারপর বললেন—খুব যথার্থ প্রশ্ন। জানেন, কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী ছিলেন তখন শ্রীগিরি। সবেমাত্র তখনই আমি রেলের প্রচার বিভাগের চাকরীতে যোগ দিয়েছি। এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে, সেই সময় ভি ভি গিরি লেবার অফিসারদের সম্পর্কে অনেক কথার মধ্যে এরকম একটি কথাও বলেছিলেন যে, একজন যথার্থ লেবার অফিসারের কর্তব্য হলো শ্রমিকদের সমস্যার প্রতি, কষ্টের প্রতি সেই পরিমাণ মমত্ববোধ এবং সহানুভূতি প্রদর্শন করা যাতে তারা তাঁকে নিজের লোক বলে মনে করে আমারও কথা ওইরকমই। আমি যদি এই চেয়ারে বসে মানুষের দুঃখকষ্টের কথা, সমস্যার কথা না শুনি, না উপলব্ধি করি, শুধু তাই নয়, তার প্রতিবিধানেরও চেষ্টা না করি তবে আমি কিসের পি-আর-ও? এটা আজ ভাব-বার বিষয়।

প্রসঙ্গত পাঠকদের বলে রাখা দরকার, নীহারবাবু এখানে যোগদানের আগে পূর্ব রেলের জনসংযোগ অধিকর্তার পদেও ছিলেন। সেখানে ছিলেনও বেশ কয়েক বছর। তাই প্রশ্ন রাখলাম—নতুন পদে এসে বর্তমান প্রচার পদ্ধতির সঙ্গে আগেকার প্রচার-পদ্ধতির কোনো পার্থক্য বুঝতে পারছেন কি?

—অবশ্যই। এটা আরো চ্যালেঞ্জিং কাজ। পূর্ব রেলওয়ে কিংবা দক্ষিণপূর্ব রেল-ওয়েতে ওঁদের কতগুলো নির্দিষ্ট সমস্যা আছে। তার গতিপ্রকৃতি এবং গভীরতাও প্রতি বছরই প্রায় একই ধরনের। যেমন ধরুন —বিনা টিকিটে ভ্রমণ, অযথা ট্রেনের শিকল টানা ইত্যাদি। কিন্তু আমার? একেবারে নতুন কাজ, ভারতবর্ষের বুকেই এই প্রথম। কাজ করতে হচ্ছে কাদের নিয়ে? এই শহরেরই প্রতিটি মানুষকে নিয়ে। সত্যি কথা বলতে গেলে, এই শহরের প্রতিটি মানুষ থেকে শুরু করে এমনকি প্রতিটি সংস্থা যদি আমাদের সমর্থন না করে, তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা এবং শুভেচ্ছা যদি আমরা লাভ না করি, তবে আমাদের কাজ বাধা পাবে। তাই প্রতিটি লোককে আমাদের বোঝাতে হচ্ছে, তাঁদেরই অদূরভবিষ্যতের উন্নতির জন্য আমরা কি করছি, এই শহর তাঁদেরই, তাঁদেরই আরো সুষ্ঠু যানবাহনের জন্য পাতালরেলের প্রয়োজন ছিল এবং সেই-টাই এখন তৈরির পথে। তৈরি করতে প্রয়ো-জন সময়ের, সেই সময়টুকুর জন্য সাময়িক কষ্টই কিন্তু আমাদের সুখ এনে দেবে। 'যন্ত্রণাই আমাদের মন্ত্রণা।' মানুষকে এই বাস্তব সত্যিটাই বোঝাতে হচ্ছে আমাদের। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, 'ইফ আই ফেইল, দি হোল প্রোজেকট্ উইল ফেইল।'

—তা এই প্রচার পদ্ধতির প্রতিক্রিয়া শহরবাসীদের উপর কিরকম হয়েছে? ফলা-ফল সম্পর্কে কোনো পরীক্ষামূলক সমীক্ষা করেছেন?

—না, সেরকম কোনো সার্ভে করিনি। যথার্থভাবে করা সম্ভবও নয়। তবে কয়েকটা দিক থেকে বুঝেছি যে আমরা চূড়ান্তভাবে সফল। যেমন, আজ পর্যন্ত আমরা শহরের কোনো অংশ থেকেই কোনো প্রকার বাধা বা কোনো প্রতিবাদ পাইনি, বরং উল্টে সর্বত্রই মানুষের সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছি। দ্বিতীয়ত সেটা আরো ভালোভাবে বুঝেছি,

আমাদের ট্রাফিক মহড়ার সময়ে। সাতদিন ধরে কয়েকটা রাস্তা বন্ধ করে যানবাহনের মহড়া দেওয়া হলো। ট্রামবাস ঘুরিয়ে দেওয়া হলো। আমরা তো জানি, কত অজস্র লোকের কত অসুবিধা, কত কষ্ট হয়েছে! কিন্তু আশ্চর্য, সব কষ্ট সহ্য করে মানুষ আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে, কোথাও কোনো বিরক্তি দেখিনি। আমাদেরও তো চোখ-কান খোলা রেখে কাজ করতে হয়। বরং বলতে গেলে, সেটাই প্রধান কাজ। তৃতীয়ত কলকাতার নানা প্রদর্শনীতে আমরা স্টল খুলি। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে সেখানে গিয়ে আমার স্টলের এককোণে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছি। মজার জিনিসও দেখেছি। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে শুনেছি, ছবিগুলো দেখতে দেখতে কোনো লোক হয়তো বলেছে—পাতাল রেল! কবে শেষ হবে এর কাজ? ততদিনে হয়তো পাতালে চলে যাবো। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের কথার প্রতিবাদ এসেছে কিন্তু অন্যান্য লোকদের কাছ থেকেই। এইসব নানা দৃষ্টান্ত, ঘটনা থেকেই বুঝেছি আমাদের প্রতি শহরবাসীর শুভেচ্ছা, সহযোগিতা কতখানি!

নানা পর্যবেক্ষণের ভিতর থেকে আমি একটা জিনিস খুব ভালোভাবে দেখেছি এবং গর্বের সঙ্গে আমি এ-কথা বলতে পারি যে, সারা ভারতবর্ষে কলকাতার মানুষের মতো সহনশীল লোক আর কোথাও নেই।

চা এসে গেছে। সুদৃশ্য কাপ। আমাকে একটা কাপ এগিয়ে দিয়ে, নিজে কাপ হাতে নিয়ে নীহারবাবু বললেন—আসলে ব্যাপারটা কি জানেন? এ শহর আপনার, আমার, সকলের। এই শহরের সঙ্গে এখানকার মানুষের মনের এই 'আইডেনটিফিকেশন' করিয়ে দেওয়াটাই আমার উদ্দেশ্য।

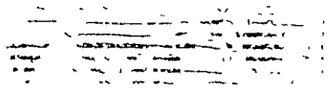

চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে আমি জানতে চাই—অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে আমাদের এখানকার বিজ্ঞাপনের অবস্থাটা কি?

—খুব শোচনীয় পর্যায়ে আছি। আমরা বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসাবে এদেশে শুধুমাত্র দৈনিক পত্রিকাগুলোকেই ধরে নিয়েছি। তারপর হয়তো রেডিওর কার্যকারিতা কিছুটা আছে। ব্যস! আর নেই। তার অর্থ এই যে আমরা অন্য মিডিয়ামগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য সেভাবে সাপোর্ট করিনি। কিন্তু অন্যান্য দেশগুলোতে দেখুন, সেখানে কিন্তু বিভিন্ন পিরিয়ডিক্যালসগুলোই শক্তিশালী মাধ্যম।

—ছোটো ছোটো পত্রিকাগুলোকে তো অজস্র বিজ্ঞাপন দেন?

—হ্যাঁ দিই। আমার চিন্তায়, একজন জনসংযোগ বিভাগীয় প্রধানের অন্যতম দায়িত্ব এবং কর্তব্য হলো দেশের সাহিত্য, সংস্কৃতির প্রচেষ্টাকে সাহায্য করা। আমি তো জানি, এক একটা লিটল ম্যাগাজিনের পেছনে চার-পাঁচটি তরুণের কি আন্তরিকতা, কতখানি পরিশ্রম থাকে। তাদের একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে যদি একটু সুরাহা করতে পারি এবং সেই কমিউনিটির কিছু লোককেও যদি আমি আমার বিজ্ঞাপনের সঙ্গে পরিচিত করাতে পারি, তাতে ক্ষতির চেয়ে লাভই বেশি।

প্রসঙ্গত বলে রাখি শ্রীদাশগুপ্ত এককালে নিয়মিত লিখতেন। খ্যাতিও অর্জন করেছিলেন। ভালো আবৃত্তিও করতেন। এককথায়, সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন বলেই, বাংলা সংস্কৃতি জগতের সমস্যা, ও প্রচেষ্টা তিনি ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। চেষ্টাও করেন যথাসাধ্য সাহায্য করতে। লিটল ম্যাগাজিন প্রসঙ্গে আলোচনার সময় তাঁর মুখভাবই আমায় বুঝিয়ে দিয়েছিল এ বিষয়ে তাঁর মমত্ববোধ, সহানুভূতি কতখানি!

প্রচার মাধ্যমে শ্রীনীহাররঞ্জন দাশগুপ্ত যে কত সফল এবং কৃতিত্বের অধিকারী তার প্রমাণ পাওয়া যাবে পৌর প্রশাসক শ্রীশিব-প্রসাদ সমাদ্দারের মন্তব্যে—

> "It has brought out a brilliantly conceived and neatly executed sequence of advertisements on Calcutta'

বম্বের একটি কাগজের কলমে সাংবাদিক লিখেছিলেন,

> I nevertheless of reading the ads in the Calcutta Series run by the Metropolitan Transport Project (Railways) I am fascinated by the delightful drawings and by the MTP emblem'.

আনন্দ রায়

গোধূলিয়া

উপন্যাস নিমাই ভট্টাচার্য

(চব্বিশ)

একটু ঘোরাঘুরি করার পরই একটা ভাল জায়গা পেয়ে গেলাম। প্রথম কটা দিন নিজেকে নিয়ে বেশ মেতে ছিলাম। প্রয়াগে গেলাম। স্নান করলাম। পাতাল-পুরীর মন্দির দেখলাম। অক্ষয় বটের নীচে বসলাম। আকবরের ফোর্ট দেখলাম। একদা যেখানে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম ছিল, সেই ঐতিহাসিক জায়গায় গড়ে ওঠা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় দেখলাম। চলে গেলাম খসরু বাগ। সম্রাট জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠপুত্রের এই সমাধি দেখতেই পুরো একটা দিন কেটে গেল।

শহরের যত্র-তত্র বিচরণ করে আরো কটা দিন কেটে গেল।

তারপর?

পনেরই এর আগে পাটনা পৌঁছবার কোন প্রয়োজন বা তাগিদ নেই কিন্তু তার ত এখনও দশ দিন দেরী। এক-একটা দিন যেন এক-এক যুগ মনে হচ্ছিল। আরো দশ দিন এখানে থাকার কথা ভাবতে গিয়েই গা শিউরে উঠল কিন্তু মনে মনে সঙ্কল্প করে এসেছি, কাশীতে যাব না। এলাহাবাদ থেকেই সোজা পাটনা যাব। পিসীকে আর দেবীকে একটু কাছে পাবার জন্য মনে মনে ছটফট করলেও কাশী যেতে ভয় করছে। সঙ্কোচ হচ্ছে। এতদিনে আলপনা নিশ্চয়ই মার সঙ্গে কাশী এসেছে। পিসী বা দেবীর সঙ্গেও দেখা হয়েছে। হয়ত...

ভাবতে গিয়েও আমি থমকে দাঁড়াই। হঠাৎ মনে হল কলকাতা থেকে পিসীকে, দেবীকে জানিয়েছিলাম কাশী আসছি কিন্তু তারপর কোন খবর না দিয়ে এলাহাবাদ এসেছি। ওরা নিশ্চয়ই আমার জন্য খুব চিন্তা করছে। আলপনারা কাশী গিয়ে যখন বলবে আমি ওদের আগেই রওনা হয়েছি, তখন দুশ্চিন্তায় হয়ত পিসী ঠিক মত খাওয়া-দাওয়াও করতে পারবে না। আর দেবী? সে তার বেদনার কথা কাউকে জানাতে পারবে না। শুধু রাতের অন্ধকারে চোখের জলের বন্যা বইয়ে দেবে। হয়ত হরসুন্দরী ধর্মশালার ঐ ঘরে গিয়ে..

না, না, ওদের কাউকে এভাবে যন্ত্রণা দেবার অধিকার আমার নেই। সঙ্গে সঙ্গে জামাটা চড়িয়ে পায়ে চটি দিয়েই পোস্টাফিস গেলাম। খাম কিনে এনেই চিঠি লিখতে বসলাম। পিসীকে লিখলাম, অনেক আশা করেছিলাম কটা দিন তোমাদের ওখানে কাটিয়ে পাটনায় চাকরি করতে যাব কিন্তু তা আর হোল না। পারলাম না। প্রতিটি মুহূর্ত তোমাদের জন্য ছটফট করছি কিন্তু তবু যেতে পারছি না। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। দিদিকে বলো তিনি যেন রাগ না করেন। আর দেবীকে বলো, হরসুন্দরী ধর্মশালার ঘটনা আমি ভুলি নি, ভুলব না।

একবার মনে হল ঠিকানা দেব না। পরে মনে হল, অন্তত একটা চিঠি লেখার সুযোগ ওদের দেওয়া উচিত। তাই শেষ পর্যন্ত চিঠির উল্টো দিকে ঠিকানাটা লিখেই দিলাম।

দেরী করলাম না। চিঠিটা পোস্টাফিসের ডাকবাকসে ফেলার জন্য তক্ষুনি বেরুলাম। চিঠিটা পোস্ট করেই খোঁজ করলাম, কাশীর চিঠি কবে পৌঁছবে। জানলাম কাল দুপুরের মধ্যে নিশ্চয়ই পৌঁছবে। মনে মনে হিসেব করে নিলাম যে পরশু বা তার পরের দিন নিশ্চয়ই একটা চিঠি আসবে। চিঠিতে কি লেখা থাকবে তা আমি জানি। জানি সে চিঠি পেয়েই আমাকে কাশী ছুটতে হবে। না গিয়ে পারব না। কিন্তু...

ঐসব কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়েছে। চৌকিদার বারান্দার আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। কিছুক্ষণ অন্ধকার ঘরেই শুয়ে রইলাম কিন্তু তারপর ঘরের আলোটা জ্বালাবার জন্য উঠতে গিয়েই মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল। তাড়াতাড়ি বিছানার উপর বসে পড়লাম। বেশীক্ষণ বসতে পারলাম না। শুয়ে পড়লাম। এতক্ষণে বুঝলাম আমার জ্বর হয়েছে। সপ্তাহ দুয়েক আগেই প্যারা-টাইফয়েড থেকে উঠেছি। এ কদিন ধরে এত রোদ্দুরে ঘোরাঘুরি করা ঠিক হয়নি। একবার মনে হল মাথা ধরার বা গা হাত ব্যাথার একটা ট্যাবলেট এনে খাই কিন্তু কিছুতেই উঠতে পারলাম না। ঐ অন্ধকার ঘরে বেহুঁস হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

এই নির্জন ধর্মশালার দোতলায় একলা একলা কিভাবে যে রাত কাটিয়ে দিলাম, তা আমি জানতেই পারলাম না। পরের দিন সকালবেলায় বুড়ো চৌকিদারের কাছে শুনলাম আমি নাকি সারা রাত চিৎকার করেছি। ও তিন-চারবার আমাকে জল খাইয়ে গিয়েছে। আমি নাকি এক গেলাস দুধও খেয়েছি কিন্তু আমার কিছু মনে নেই।

নূতন সিলেবাস অনুসারে যোগব্যায়ামের চার্টসহ

শ্রীনিরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রণীত

কর্মশিক্ষার দিনপঞ্জী লিখন কর্মশিক্ষার খেরো বই।

মাধ্যমিক পরীক্ষার উপযোগী বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভট্টাচার্য-কৃত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

জীবন স্মৃতির এবং কথা ও কাহিনীর বোধিকা

Prof. S. Bhattacharyya's

STEAM & LOGARITHM TABLE

শিক্ষক মহোদয়গণ দয়া করিয়া নমুনা পুস্তকের জন্য লিখুন :

দি হিন্দুস্থান পাবলিশিং কোং

৮২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯

সকালবেলায় চৌকিদারের কাছে এসব শুনে আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। মনে হল, যদি আরো বেশী অসুস্থ হয়ে পড়ি তাহলে কে আমাকে দেখবে? কে আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে? চৌকিদারকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখান থেকে বাসে কাশী যাওয়া যায়?

বাস ত ঘন্টায় ঘন্টায় যায় কিন্তু এই জ্বর নিয়ে তুমি যাবে কি করে?

কিন্তু ভাইসাব, যদি শরীর আরো খারাপ হয় তাহলে এখানে আমাকে কে দেখবে? এখানে ত আমার কেউ নেই।

কাশীতে কোন রিস্তেদার আছেন?

আমার সব আত্মীয়-স্বজনই কাশীতে।

তাহলে সেখানে চলে যাওয়াই ভাল কিন্তু তুমি কি যেতে পারবে।

তুমি যদি বাসে বা ট্রেনে চড়িয়ে দাও তাহলে আমি ঠিক পৌঁছে যাবো।

তোমাকে ট্রেনে বা বাসে চড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দেব কিন্তু...

বুড়ো চৌকিদারের আর কোন কিন্তু আমি শুনলাম না। কোন মতে নিজের বিছানাটা বেঁধে নিয়ে আর জামা-কাপড়-গুলো বাকসে ফেলেই রওনা দিলাম। যে লোকটি আমাকে বাসে চড়িয়ে দিতে এসেছিল সে কন্ডাকটর ছাড়াও আশে-পাশের ক'জন প্যাসেঞ্জারকে আমার অসুস্থতার কথা বলে গিয়েছিল। কিভাবে যে তিন-চার ঘন্টা বসে ছিলাম তা জানি না। শুধু জানি অসহ্য যন্ত্রণায় সারা রাস্তা ছটফট করেছি। কাশীতে পৌঁছবার পর কন্ডাকটর আর দু-তিনজন প্যাসেঞ্জার আমাকে রিকসায় বসিয়ে দিলেন। গোধূলিয়ায় নেমে পৌঁছবার পর মনে হল আর এক মুহূর্তও রিকসায় বসে থাকতে পারব না। এবার নিশ্চয়ই আমি পড়ে যাবো। একবার ভাবলাম, হরসুন্দরী ধর্মশালায় গিয়ে শুয়ে পড়ি কিন্তু না, নামলাম না। বাঙ্গালীটোলার গলির মুখে অবধিই গেলাম। একটা কুলির মাথায় আমার বাকস-বিছানা চাপিয়ে রিকসা-ওয়ালা আমাকে ধরে ধরে কোন মতে পিসীর বাড়ীর দরজায় পৌঁছে দিল।

আমাকে দেখেই সুধাপিসী চমকে উঠলেন, কি সর্বনাশ! তোমার গায় ত ভীষণ জ্বর।

পিসী কোথায়?

সুধাপিসী কিছু বলতে গিয়েও যেন বললেন না। এক মুহূর্তের জন্য কি ভেবে বললেন, দেবীদের বাড়ী আছেন।

সুধাপিসী বারবার বলা সত্ত্বেও আমি দাঁড়ালাম না। ঐ রিকসাওয়ালাকে সম্বল করেই দিদির বাড়ীর দরজায় পৌঁছেই প্রায় অজ্ঞান হয়ে সিঁড়ির উপর বসে পড়লাম। রিকসাওয়ালার ডাকাডাকিতে দেবী নেমে এসেই একটা চিৎকার করেছিল মনে আছে কিন্তু তারপর আর কিছু মনে নেই। তবে অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে পিসী আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদেছিলেন।

অনেক রাতে একবার ঘুম ভেঙেছিল। ভীষণ পিপাসা পেয়েছিল। কে যেন আমাকে জল খাইয়ে মাথায় হাত দিয়ে আবার ঘুম পাড়িয়ে দিল।

সকালবেলায় যখন চোখ মেলে তাকালাম তখন বেশ বেলা হয়েছে। জানলার পর্দা টানা থাকলেও রোদ্দুরের তেজ বুঝতে কষ্ট হলো না। দেবী আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়তেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমার কি খুব জ্বর হয়েছে?

খুব জ্বর নিয়ে এসেছিলেন কিন্তু এখন বেশী জ্বর নেই।

রাত্রে খুব জ্বালাতন করেছি?

ও একটু ম্লান হাসি হেসে মাথা নেড়ে বললো, না।

কিন্তু জ্বর হলে আমি ত খুব চিৎকার করি।

কে বললো, তুমি চিৎকার করো?

এটা কি পিসীর বাড়ী?

না, এটা আমাদের বাড়ী।

আমি পিসীর বাড়ী যাই নি?

এখন এত কথা বলো না। আমি মুখ ধুইয়ে দিচ্ছি। তারপর চা-বিস্কুট খেয়ে ওষুধ খেয়ে নাও।

কি ওষুধ? আমার সঙ্গে তো কোনো ওষুধ ছিল না।

আমার কথা শুনে দেবী হাসল। বললো, না, ডাক্তারবাবু যে ওষুধ দিয়েছেন সেই ওষুধ খাবে।

দেবী দরজার কাছে গিয়ে বামুনদিদিকে ডেকে কি যেন বললো। একটু পরেই বামুন-দিদি আমার মুখ ধোবার জলটল এনে দিলেন। দেবী পেস্ট দিয়ে আমার দাঁত মেজে মুখ ধুইয়ে দিল। চা-বিস্কুট খেতে খেতেই পিসী ঘরে ঢুকে দেবীকে জিজ্ঞাসা করলেন, জ্বরটা ছেড়েছে?

দেবী বললো, একেবারে না ছাড়লেও খুব সামান্য জ্বর আছে।

পিসী আর কোন কথা না বলে আমার মাথায় কতকগুলো ফুল বেলপাতা, দুর্বাঘাস মনে মনে অনেকক্ষণ বিড়বিড় করলেন। তার-পর ফুল-বেলপাতা আমার মাথায়, কপালে, বুকে ছুঁইয়ে বালিশের তলায় রাখতে রাখতে আপনমনে বললেন, বাবা, জ্বেস্টকে তাড়াতাড়ি ভাল করে দাও।

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম.বি, ডি.জি.ও
ডাঃ এস এন পাণ্ডে এম.বি.বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য-৮৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও রুচিত্রে চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী • ১৫ শ্যামাচরণ স্ট্রীট কলিকাতা-৭৩
অগ্রিম ৮৲ টাকা পাঠাইলে ডাকমাশুল ফ্রি

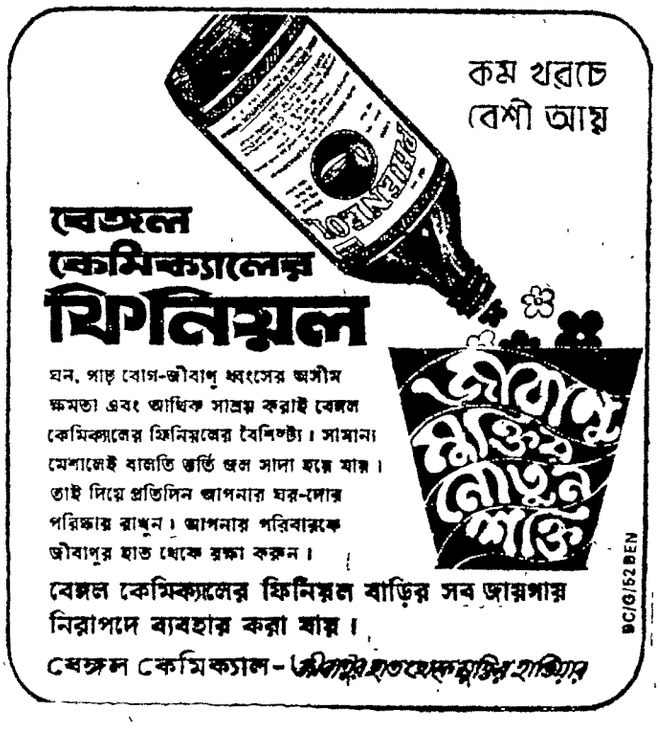

আমি একটু শুকনো হাসি হেসে দু' হাত দিয়ে পিসীর গলা জড়িয়ে ধরতেই ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। আমারও দুটো চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। বললাম, পিসীমা, তোমাকে ছেড়ে আমি আর কোথাও যাব না।

আর তোকে আমি ছাড়ছি?

দেবী হঠাৎ উঠে যেতেই আমি বললাম, পিসী, দেবী আমাকে ছেড়ে গেল কেন?

না, না, ছেড়ে যাবে কেন? ও ওষুধ দিতে উঠেছে।

পিসীর উৎকণ্ঠা দেবীর সেবা, ডাক্তারবাবুর চিকিৎসা দেখেই বুঝলাম আমার অসুখটা বেশ কঠিন। জ্বরে বেহুঁস হয়ে থাকলে আমি কিছুই জানতে পারি না কিন্তু জ্বর কমলেই দেখতে পাই পিসী আর দেবী আমাকে নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ও চিন্তিত। কোথা দিয়ে কেমন করে যে দিন-রাত্রি কেটে যায় তা টের পাই না। কখন ডাক্তারবাবু ইনজেকশন দিয়ে যান, তাও সব সময় জানতে পারি না, তবে পাশ ফিরে শুতে গেলেই ব্যথা লাগে। কখনও কখনও বাচ্চা ছেলের মত কেঁদে উঠি। পিসী তাড়াতাড়ি বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আদর করে দেবী আস্তে আস্তে ব্যথার জায়গা মালিশ করে দেয়। আমি আবার ঘুমিয়ে পড়ি।

দিন বা রাত্রে শরীর একটু ভাল লাগলে আমি কত কথা বলি, পিসী, দিদি কোথায়?

উনি কলকাতায় গিয়েছেন।

কবে ফিরবেন?

ফিরতে দেরী আছে।

হঠাৎ কলকাতায় গেলেন কেন?

অনেককাল যান না, তাই একটু ঘুরতে গিয়েছেন।

তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না ত?

না, না, আমি তোকে ছেড়ে কোথাও যাব না।

আমি পিসীর একটা হাত নিজের দুটো হাতের মধ্যে নিয়ে বলি, তোমার চাইতে কেউ আমাকে বেশী ভালবাসে না।

পিসী চুপ করে থাকেন।

পিসী, দেবী কোথায়?

ও একটু ঘুমুচ্ছে।

আচ্ছা পিসী, ও কি সারারাত জাগে? তুই সারারাত এত ছটফট করিস যে ওকে প্রায় সারারাতই জাগতে হয়।

আমার জন্য তোমাদের কত কষ্ট করতে হচ্ছে!

খুব কষ্ট করছি। তুই এবার চুপ কর।

বোজ বিকেলের দিকে সুধা পিসী দলবল নিয়ে আমাকে দেখতে আসেন। কিছুক্ষণ আমার গায়-মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। তারপর যাবার সময় সামান্য কিছু ফল রেখে দিয়ে বলেন, আজ চলি, কাল আবার আসব। ওরা চলে যাবার পরই পিসী আহ্নিক করতে বসেন।

দেবী আমার পাশে বসে মাথায় হাত দিতে দিতে বলে, ডাক্তারবাবু বলেছেন আর তিন-চারদিনের মধ্যেই তুমি ভাল হয়ে যাবে।

না, না, টাইফায়েড কখনও এত তাড়াতাড়ি সারে না। তোমার কপালে আরও কষ্ট আছে।

কে বলল আমার কপালে আরও কষ্ট আছে?

আমি বলছি।

কেন, তুমি বুঝি আবার পালিয়ে গিয়ে এলাহাবাদে...

সত্যি ভেবেছিলাম পালিয়ে যাব কিন্তু ভগবান ত তোমার কাছেই ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

কোনমতে হাসি চেপে একটু গম্ভীর হয়ে ও বলল, এবার তোমার একটা বৌ এনে দেব। তাকে ছেড়ে তুমি আর...

আমি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলি আলপনার কথা এসেছিল বুঝি?

কে আলপনা?

আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলি তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করো না। আমি আলপনাকে বিয়ে করতে পারব না।

কেন, আলপনাকে তুমি ভালবাস না?

কচু ভালবাসি।

দেবী হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করে, তবে তুমি কাকে বিয়ে করবে?

তোমাকে।

আমার যে বিয়ে হয়ে গেছে।

তা হোক।

কেন, আলপনা কি দোষ করল?

কিছু দোষ করে নি।

তবে তুমি ওকে বিয়ে করবে না কেন?

তুমি জোর করে আমার বিয়ে দিতে চাও?

বিয়ে যখন তোমাকে করতেই হবে তখন...

এইসব আজেবাজে কথা বললে আমি সত্যি এখান থেকে চলে যাব।

কোথায় যাবে?

যেখানে ইচ্ছে চলে যাব। আর কোনদিন তুমি আমাকে দেখতেও পাবে না।

দেবী আলতো করে আমার কপালের উপর মুখখানা রেখে বলল তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। তুমি আমার কাছেই থাকবে।

সত্যি তুমি আমার কাছ থাকবে?

সত্যি। তোমাকে হাত বলছি আমি তোমার কাছেই থাকব। হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে দেবী বলল এতদিন ন হয় দিদি ছিলেন কিন্তু এখন ত তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।

দিদি কোথায়?

দিদি নেই।

নেই?

না। গত পয়লা দিদি হঠাৎ হার্টফেল করে...

সে কি?

হ্যাঁ দীপ, দিদি নেই। তাই ত তোমাকে সত্যি আর ছাড়তে পারব না।

আমি তাড়াতাড়ি ওর দুটো হাত টেনে নিয়ে আমার বুকের উপর চেপে ধরে বললাম, আমি ত তোমারই।

আমি তা জানি দীপ।

(ক্রমশঃ

বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ

প্রাথমিক উদ্যান-বিদ্যা ১০·০০

শাক-সব্জি চাষের কথা ৭·০০

নারায়ণ সান্যাল

অপরূপ অজন্তা ১৫·০০

SHAKUNTALA DEVI
Astrology for the Millions 8.00

সুখময় মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-সাহিত্যে নবরাগ ১৫·০০

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময় ১০·০০

পরিতোষ দাস

চৈতনোত্তর প্রথম চারটি সহজিয়া পুঁথি ১৫·০০

শুকদেব সিংহ

শ্রীরূপ ও পদাবলী সাহিত্য ২০·০০

নিরঞ্জন চক্রবর্তী

বিদ্যাপতি-সমীক্ষা ১৫·০০

ভারতী বুক ষ্টল
৬, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা—৯ ফোন : ৩৪-৫১৭৮

নিজ দেশে পরবাসী

দিলীপ মালাকার

সব-ছত্র-সংস্কৃতিবান জাত ইউরোপীয়রা আমেরিকায় উপনিবেশ গড়ে সেই মহাদেশের আদিবাসীদের নির্মূল করেছে গত দুই শতাব্দী ধরে। সেই সঙ্গে তারা অস্ট্রেলিয়ায় আদিবাসীদের নির্মূল করে আরেক উপনিবেশ গড়েছেন।

উত্তর আমেরিকার অধিবাসী 'ইন্ডিয়ান'রা আর নেই। সেখানে উড়ে এসে জুড়ে বসা ইউরোপীয়রা হয়েছেন, আমেরিকান। দক্ষিণ আমেরিকায় কিছু কিছু আদিবাসী তখনও রয়েছেন। হয়ত তাঁদের নির্মূল করার সময় পায়নি তারা।

সেই একই ইউরোপীয় সন্তানরা আফ্রিকার বুকে দক্ষিণ আফ্রিকায় চেপে বসে আছেন। আমেরিকার সঙ্গে তফাৎ দক্ষিণ আফ্রিকার আদিবাসীদের তারা সমূলে উচ্ছেদ অথবা নির্মূল করতে পারেনি। তাই আজ চলছে স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর নিপীড়ন। এখনও দক্ষিণ আফ্রিকায় কালো রঙের স্থানীয় সন্তানরা নিজ দেশে পরবাসী। ইস্কুলে - কলেজে - আদালতে-অফিসে তার নিজের মাতৃভাষা অচল। সে আজ পদে পদে অপমানিত লাঞ্ছিত। উপনিবেশবাদী ইউরোপীয় প্রভুরাই সব। তাদের অন্যায়—অত্যাচারই কালো মানুষের জন্যে আইন। দক্ষিণ আফ্রিকায় কালো মানুষের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ—প্রথম আন্দোলন গড়ে তোলেন এই ভারতবর্ষেরই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তখন তিনি মহাত্মা গান্ধী হননি। সেটা ছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে।

আফ্রিকার মধ্যে এই দক্ষিণ আফ্রিকা দেশটা পাহাড়ে ঘেরা। আবহাওয়া ইউরোপের মতন ঠান্ডা ও মনোরম। তার ওপর প্রচুর খনিজ সম্পদ। বিশ্বের সবচেয়ে বড় হিরের খনি, ইউরেনিয়াম, সোনা, তামা, ক্রোমিয়াম, সিসা, দস্তা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ আরও কত কি রয়েছে ওখানে। তার ব্যবসা করে শ্বেতাঙ্গরা ফেঁপে উঠেছে। এই ব্যবসা ছেড়ে লুণ্ঠন ভান্ডার ছেড়ে নড়বার পাত্র নয় শ্বেতাঙ্গরা। তার জন্য প্রয়োজন হলে তাঁরা হাজারে হাজারে স্থানীয় সন্তানদের হত্যা করতে প্রস্তুত। কিন্তু একালের আফ্রিকা সজাগ। অত সহজ এখন তা সম্ভব হবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকার লোকসংখ্যা এখন দুই কোটির মতন। মাত্র পঞ্চাশ লাখ হল উড়ে এসে জুড়ে বসা শ্বেতাঙ্গ। বাকী দেড় কোটি মানুষ আফ্রিকার আদিবাসী। দেশটাও বিরাট। আয়তনে এক কোটি বাইশ লাখ এক হাজার সাঁইত্রিশ বর্গ [illegible]।

খনিজ পদার্থে যেমন সমৃদ্ধ দক্ষিণ আফ্রিকা তেমনি কৃষিতে। এক কথায় ধনধান্যে পুষ্পেভরা। কিন্তু ঐশ্বর্য ভোগ করে কারা? দেড় কোটি আফ্রিকান নয়। মাত্র পঞ্চাশ লাখ শ্বেতাঙ্গ ঐশ্বর্য লুটেপুটে খাচ্ছে। শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে বেশীর ভাগ মানুষ এসেছে হল্যান্ড জার্মানী আর ইংলন্ড থেকে। অন্য ইউরোপীয় দেশের মানুষের সংখ্যা অনেক কম। দক্ষিণ আফ্রিকার শিল্প সংস্থায় নিয়োজন এসেছে ২৫ শতাংশ ভাগ বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। সুতরাং তারাই অর্থনীতি ও রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে।

বছরে সাত হাজার কোটি টাকার সোনা তোলা হয় সোনার খনি থেকে। তারপর হিরের ব্যবসা করে ডিবিয়ার্স কোম্পানী। ডিবিয়ার্স একটি আন্তর্জাতিক কোম্পানী। মূলধন এখন আমেরিকানদের হাতে। আর আছে ডাচ এবং ইংরেজদের কাছে। এ্যাটম বোমা এবং আণবিক শক্তি প্রস্তুতে লাগে ইউরেনিয়াম। খুব ভাল ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় দক্ষিণ আফ্রিকায়। এই ব্যবসাও পরিচালনা করে পরোক্ষে আমেরিকানরা। এখন দক্ষিণ আফ্রিকায় মোটর গাড়ি নির্মিত হচ্ছে। এই শিল্পে নিযুক্ত আছে বৃটেন, ইতালি ও জাপান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী ধনী রাষ্ট্রগুলিই দক্ষিণ আফ্রিকার আসল পৃষ্ঠপোষক।

বর্ণবৈষম্য জোর কদমে চলছে বহু যুগ ধরে দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ায়। বর্ণবৈষম্য দূর করার জন্যে জাতিসঙ্ঘ প্রস্তাব পাশ করে ১৯৬২ সালে। সে প্রস্তাবকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে আসছে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং রোডেশিয়া সেই প্রস্তাব পাশ হওয়ার সময় থেকে। এশিয়া, আফ্রিকা ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো বহু প্রতিবাদ জানিয়ে, বয়কট করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা রোডেশিয়াকে। তা সত্ত্বেও ওই দুই ছোট রাষ্ট্রের এত স্পর্ধা হলো কোথা থেকে? খোঁজ নিয়ে দেখা গেল কয়েকটি বৃহৎ এবং শক্তিশালী শ্বেতাঙ্গ রাষ্ট্র আড়ালে-আবডালে এবং লুকিয়ে তাদের সমস্ত্র থেকে সব রকমের আর্থিক সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী মিঃ ফোরেস্টারকে সম্প্রতি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কিসিঞ্জার সাক্ষাতে এই নিয়ে বহু আলোচনা করেছেন। কিন্তু আলোচনা, আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার আদিবাসীদের ওপর তারপর একটুও অত্যাচার কমে নি।

ওদিকে রোডেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ ইয়ান স্মিথ সে তার যা খুশী তাই করে যাচ্ছে এক যুগ ধরে। কমনওয়েলথ ত্যাগ করেছে। কিন্তু তাতে রোডেশিয়ার জল্লাদগিরি কমাতে পারে নি বৃটেন। বৃটেনের শিল্পপতিরা ঠিকই জোগান দিয়ে যাচ্ছে রোডেশিয়াকে। বর্ণবিদ্বেষ ওখানে যা ছিল। তাই আছে। আমেরিকা মাঝে-মধ্যে নীতিবাদের খাতিরে রোডেশিয়াকে হয়ত একটু বকে। কিন্তু ওই পর্যন্ত। সামনে বকুনি কিন্তু পেছনে চলে রোডেশিয়ায় "জল্লাদ ইয়ান স্মিথের তোয়াজ। সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির গৌরব এখানেই।

সমস্ত জুন মাস ধরে দক্ষিণ আফ্রিকার আদিবাসীদের ওপর গুলীগোলা চালান হয়। এক ১৬ জুনেই মরেছে দেড়শজন। কিন্তু কেন? কি তাদের অপরাধ? অপরাধ? সোয়েতোর আদিবাসীরা ইস্কুলে শ্বেতাঙ্গদের ভাষা 'আফ্রিকানস'-এর জায়গায় তাদের মাতৃভাষা শেখাতে চেয়েছিল। এই তাদের অপরাধ। নিজ বাসভূমে পরবাসী আর কাকে বলে।

আফ্রিকানস ভাষা হচ্ছে জার্মাণ, ডাচ আর ইংরেজী মিশিয়ে এক জগাখিচুড়ি ভাষা। ওই ভাষায় কথা বলে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গরা। শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের হুকুম এই আফ্রিকানস ভাষা ইস্কুলে শিখতে হবে। নইলে খুন। একে বলা চলে ভাষার আন্দোলন। আফ্রিকায় মূলে অধিবাসীদের মাতৃভাষার আন্দোলন এই প্রথম সেখানে দেখা দিল। আফ্রিকায় বৃটিশ, ফরাসী, বেলজিয়াম উপনিবেশে তাদের ভাষার সঙ্গে আফ্রিকার আঞ্চলিক ভাষাও চলছিল স্কুল-কলেজে, কোর্ট-কাছারীতে। কিন্তু তারা কখনো জুলুম করে নি। দক্ষিণ আফ্রিকায় জুলুমটাই সার। এবং এই জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে রক্তপাত।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এই প্রথম রক্তপাত নয়। মাত্র ষোল বছর আগে ১৯৬০ সালে শার্পভিলে আরেকবার রক্তপাত হয়। সেবারও সত্তরজন আফ্রিকাবাসীকে হত্যা করা হয়। বর্ণবিদ্বেষে বলি হয় কয়েকশ আফ্রিকান। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে যে সব আফ্রিকান রাষ্ট্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে হুমকী দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী মিঃ ফোরেস্টার, প্রয়োজন হলে আমরা আণবিক অস্ত্র ব্যবহার করব।'

দক্ষিণ আফ্রিকা তার বর্ণবিদ্বেষ ও আদিবাসীদের ওপর অত্যাচার না থামালে ভবিষ্যতে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাতে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। আর যদি যুদ্ধ বাধেই তাহলে আফ্রিকার অন্য সব রাষ্ট্র ও এশিয়ার বহু প্রগতিবাদী রাষ্ট্র কখনই হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। তখন কি তাহলে দুই বৃহৎ শক্তি রাশিয়া এবং আমেরিকা চুপ করে থাকবে? ভারত সরকার কঠোর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। করেছে সেই সঙ্গে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সব কটি সদস্য।

মনের অসুখ

(দশ)

'আমি চলে যাব তীর্থপথিক তিমির তমসা-তীরে'—অচিন্ত্যকুমার

—আমার স্বামী অবসর নিয়েছেন, ছেলে দুটি ভাল কাজ পেয়েছে—স্ত্রীপুত্র নিয়ে সুখে আছে। মেয়ে দুটিরও ভাল ঘরে বিয়ে দিয়েছি—তাদের জীবনে কোনো জটিলতা নেই, এবার আমি অবসর চাই। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কি খুঁজে পেলেন আমার স্বামী? আমি আপনার রোগী নই। আমাকে ছেড়ে দিন। একটা বয়সে সবাইকে অবসর নিতে হয়।

—আমি আপনাকে তো ধরে আনিনি, ধরে রাখছিও না। মিঃ গোস্বামী বললেন, বললেন, আপনি গত কয়েক মাস ধরে ধীরে ধীরে সংসার থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন, কোনো ব্যাপারে আর আপনার মন নেই। আপনাদের নতুন বাড়ী হল, দুদিন বাদে গৃহপ্রবেশ, বিদেশ থেকে বড় ছেলে ছুটি নিয়ে এসেছে, হায়দ্রাবাদ থেকে মেয়ে-জামাই এসেছে অথচ আপনি নাকি একেবারে নির্লিপ্ত। তাছাড়া ঘুম হচ্ছে না, খিদে নেই, অম্বেপতে রেগে যাচ্ছেন...

বাধা দিয়ে মিসেস গোস্বামী বলে উঠলেন ঃ বাজে কথা বলেছেন মিঃ গোস্বামী। ঘুম হবে না কেন? আমি কাজ করছি, হাতে জরুরী কাজ আছে, ঘুমোবার সময় পাচ্ছি না। আমার স্বামী, এইতো কয়েক মাস আগেও, গাদাগাদা ফাইল অফিস থেকে বাড়ীতে এনে রাত দুটো অবধি জেগে কাজ করতেন। তখন কি আমি তাঁকে ধরে মনের ডাক্তারের কাছে নিয়ে এসেছিলাম?

মিসেস গোস্বামীর বয়স পঞ্চাশের ওপারে, রোগা ছিপছিপে লম্বা চেহারা, দাঁত পড়েনি, চুল পাকেনি। দেখে মনে হয় না যে তিনি চারটি সন্তানের জননী, চারটি নাতি-নাতনীর-দিদিভাই। গোস্বামী বছর-খানেক হল চাকরী থেকে অবসর নিয়েছেন, ঘাটের কোঠা ছুঁয়েছেন, শতসমর্থ দোঁহারা চেহারা দেখে মনে হয় 'একসটেনশন' পেলে আরো বছর দশেক বাদুড়ঝোলা হয়ে অফিসে যাতায়াত করতে পারেন। স্ত্রীর কথার উত্তর তিনিই দিলেন ঃ আহা সেতো দরকারী কাজ, আর আমি বহু বছর ধরেই তো ফাইল বাড়ী নিয়ে আসছি। আর তুমি সারা রাত ধরে যে-সব কাজ কর, তা আগে কোনোদিন করতে না; ওগুলো বাজে, আই মিন, সংসার কাজ, ওগুলো রাত জেগে করবার কাজ নয়।

—তোমার কাছে বাজে হতে পারে কিন্তু আমার কাছে দরকারী, খুবই দরকারী। তোমার সঙ্গে আমার রুচি মিলছে না, তোমার মনের মত হয়ে আমি চলছি না, তার মানে এই নয় যে, আমি মনের অসুখে ভুগছি।—বেশ ঝাঁঝালো সুরেই কথাগুলো বললেন মিসেস গোস্বামী। তার পরই হঠাৎ গলা নামিয়ে অন্য সুরে বললেন ঃ আমি যে পারি না, ঐ সব না করে পারি না। ভেতর থেকে কে যেন তাগিদ দ্যায়, আমাকে বাধ্য করে, আমাকে তাড়িত করে। আমি পারছি না, তোমাদের এই সংসারে আমি আর থাকতে পারছি না, আমাকে ছুটি দাও। চৌত্রিশ বছর ধরে তোমাদের জন্যে। তোমাদের ইচ্ছে-মত কাজ করেছি, এবার আমাকে ছুটি দাও, আমার রুচিমত কাজ করতে দাও, আমাকে নিজের ইচ্ছেমত চলতে দাও।

—তোমার কোনো কাজ, কোনো অভি-লাসে আমিতো কখনও বাধা দিইনি। যখন যখন যা চেয়েছ, তাই পেয়েছ। যা বলেছ, তাই করেছি।

—কারণ, এতদিন তুমি যা চাও আমি তাই চেয়েছি, তুমি যা বল আমি তাই বলেছি, তুমি যা বিশ্বাস কর আমি তাই বিশ্বাস করেছি। তোমার ইচ্ছে-অনিচ্ছে, চাওয়া-পাওয়া, বিশ্বাস অবিশ্বাস দিয়ে আমাকে ঘিরে রেখেছিলে। এতদিন আমি জানতাম না আমি কে, আমি কি চাই, আমার জায়গা কোথায়। তাই বাধা দাওনি। আজ আমি জেনেছি আমি কে, আজ আমি টের পেয়েছি আমি কি চাই। আমার ইচ্ছেমত চলতে যাচ্ছি তাই বাধা দিচ্ছ, আমার রুচিমত কাজ করছি তাই পাগল বলছ।

স্ত্রীর কথার কোনো জবাব না পেয়েই বোধহয় গোস্বামী হতাশ হয়ে আমার দিকে তাকালেন। আমি তাঁকে বাইরে যেতে বললাম। তিনি বেরিয়ে যেতে মিসেস গোস্বামীকে প্রশ্ন করলাম ঃ কি আপনার ইচ্ছে মিসেস গোস্বামী? কোথায় আপনি বাধা পাচ্ছেন?

মিসেস গোস্বামী চোখ বন্ধ করে কয়েক সেকেণ্ড, কি যেন ভাবলেন, তার পর নরম গলায় থেমে থেমে বলতে লাগলেন ঃ আমি 'রিটায়ার' করতে চাই। আমি ছুটি চাই। অনেক অনেক বছর ধরে ঘানি টেনেছি, পাথর ভেঙেছি, সবজিবাগানের জন্য জল তুলেছি। এই দেখুন, আমার দু হাতে কড়া পড়ে গেছে; এই দেখুন, আমার পায়ে বেড়ির দাগ। আমি কয়েদখানা থেকে ছাড়া পেতে চাই, সংসার থেকে মুক্তি চাই। সেই মুক্তি, ছেলে মেয়ে স্বামী, কেউই দিতে চান না। তাঁরা বলেন, আমি নাকি প্রলাপ বকছি। আমার আর ভাল লাগছে না।

—আপনি বিশ্রাম চান—এইতো? গৃহ-প্রবেশ হয়ে যাক, তারপর কর্তাগিন্নী দুজন বেরিয়ে পড়ুন। মাস ছয়েকের একটা প্রোগ্রাম করে যেখানে খুশী ঘুরে বেড়ান। এখন তো আর আপনার জন্যে কিছু আটকে থাকবে না।

সুন্দর এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল ওঁর পাণ্ডুর মুখে। —দুজনে বেড়াতে গেলে বন্ধন থেকেই যাবে: মিঃ গোস্বামীই বেড়া-বেন, আমি তাঁর খেয়াল মেটাব আর তৃপ্তী বইব। না, সে আমি চাই না।

—তবে ছেলেদের কারুর সঙ্গে তাদের চাকরীর জায়গায় চলে যান। তারা কি আপনাকে নেবে না।

—তাদের কথাই তো আপনি বলছেন। একজন বলছে কানাডায় চল, অন্যজন বলছে আসছে মাস থেকে ছুটি নিয়ে সে আমার পছন্দমত যে কোনো জায়গায় যেতে রাজী। বউমাদেরও আপত্তি নেই। মেয়ে বলছে হায়দ্রাবাদের মত শহর নাকি ভারতে নেই।

—ছেলেমেয়ে আপনাকে খুবই ভালবাসে। তাহলে। আপনি কোন জায়গা পছন্দ করেন?

আবার সেই হাসি। খুবই করুণ দেখাল মিসেস গোস্বামীকে। এখনও তাঁকে আমি বুঝতে পারছি না। গোস্বামীর কাছে যা শুনেছি ওঁর সঙ্গে কথা বলে তা সত্যি মনে হচ্ছে না। মিসেস গোস্বামীকে অসুস্থের পর্যায়ে ফেলা যায় কিনা!—ভেবে ঠিক করতে পারছি না। একটি মহিলা বিয়ের পর দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর সংসার করেছেন, চারটি ছেলেমেয়েকে বড় করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন, বিয়ে দিয়েছেন। তারাও বেশ সুখেই ঘরসংসার করছে। মাত্র কয়েক বছর আগে একটা শোক পেয়েছিলেন—ওঁর দাদার একমাত্র ছেলে স্কুলে যাবার পথে হারিয়ে যায়, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। মা-হারা ছেলেটি পিসীর কাছে মানুষ হয়েছিল। সেই সময় কয়েক সপ্তাহ মিসেস গোস্বামী নাকি স্নানাহার ছেড়ে দরজাজানালা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে বসে থাকতেন। সে-সময় অনেক অল্পবয়সী ছেলে রাস্তাঘাট থেকে হঠাৎ হাওয়ায় মিলিয়ে গেত; কারুর কারুর মৃতদেহ পাওয়া যেত, কারুর আবার কোনো সন্ধানই মিলত না। সে শোক তিনি কাটিয়ে উঠেছেন, তার পর ছোট মেয়ের খুব ঘটা করে বিয়ে দিয়েছেন, জাঁকিয়ে সংসার করেছেন। তাঁর জীবনে আর কোনো দুঃখ শোকের ইতিহাস নেই। মা-বাবা শৈশবেই মারা যান; তাঁদের কথা ভাল করে মনেই পড়ে না। জ্যাঠামশাই বিয়ে দিয়েছেন। বিয়ের পর থেকে একটানা স্বামীর ঘর করছেন। সরকারী চাকরী করতেন গোস্বামী, ধাপে ধাপে উন্নতি হয়েছে, বিভাগীয় বড়কর্তা হয়ে কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন। ভদ্রলোককে অমায়িক বন্ধুবৎসল কর্তব্যপরায়ণ বলেই সকলে জানে। তবে অফিসার হিসেবে বেশ বড়ো এবং মতামতের দিক থেকে বেশ গোঁড়া। হিন্দুশাস্ত্র, লোকাচার, তন্ত্রমন্ত্র ইত্যাদি নিয়ে অনেক পড়াশুনো করেছেন; অবসর নিয়ে অথর্ববেদের বাংলা অনুবাদ লেখায় ব্যস্ত। নিজের বিভাগে এবং নিজের পরিবারে যতদূর সম্ভব নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখার দিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এ-ব্যাপারে কোনো বাধা পেলে তিনি মানতে চাইতেন না। ছেলেমেয়ের মতামত তিনি তা-বলে উড়িয়ে দিতেন না; বেদ-পুরাণ উপনিষদের উদ্ধৃতি দিয়ে নিজের অভিমতের সপক্ষে তিনি এমন জোরালো যুক্তি খাড়া করতেন যে তারা শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারত যে তারা ভুল করেছে। স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় সব ব্যাপারেই তিনি একমত ছিলেন। তাঁর অসাক্ষাতে ছেলেমেয়েরা মাকে বলত—হিজ মাস্টারস ভয়েস। ছেলেমেয়ে কি পড়বে, কোন চাকরী নেবে, কার কোন দিকে উন্নতির সম্ভাবনা—এ সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। অবশ্য ছেলেমেয়েরা জেনেছে মায়ের সঙ্গে বিশদ আলোচনা করেই বাবা পথ নির্দেশ করেছেন। তারা প্রতিবাদ করেনি, আর তাদের এখনও মনে হয় বাবা সঠিক পথই তাদের জন্যে বেছে দিয়েছেন। বিয়ের ব্যাপারেও পিতার মতই যুক্তিযুক্ত মনে করে তাদের সায় দিতে হয়েছে। এজন্য তারা দুঃখিত নয়, তাদের কোনো ক্ষতি হয়েছে বলেও তারা মনে করে না। এ পর্যন্ত এই রকমই চলে এসেছে। একনায়কত্ব পারিবারিক শান্তিরক্ষার সহায়ক হয়েছে, কোনো দিকে বিদ্রোহ-অসন্তোষের চিহ্ন দেখা যায়নি। গোলমাল ঘটেছে মাত্র কয়েক মাস আগে। মাঝারী ধরনের বাড়ীর নকসাটা ছোট ছেলে পছন্দ করেছে। স্ত্রীর সামনে ধরে গোস্বামী তাঁর অভিমত চাইলেন। নকসার দিকে না তাকিয়ে চা ছাঁকতে ছাঁকতে তিনি যে জবাব দিলেন, তার জন্যে গোস্বামী আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। অবাক হয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন: কিন্তু তুমি তো পেন্সিল স্কেচটা পছন্দ করেছিলে, তাইতো আমি ব্লুপ্রিন্ট তৈরী করে মিউনিসিপালিটিতে জমা দিলাম। এখন তা বদলাতে গেলে অনেক হাঙ্গামা।

বদলাবার কথা বলিনি, পছন্দ হয়নি তাই বলেছি। এই বলে চায়ের কাপটা নিয়ে তিনি অন্য ঘরে চলে গেলেন। উঁচু গলায় ঘর থেকে বললেন, শুধু নকসা নয়, নামটাও পছন্দ হয়নি।

—কিন্তু তখন তো ছেলেমেয়ে সবার সামনে এই নামই ঠিক হল, তুমিও তো মত দিলে।

—মত দিইনি, তুমি জোর করে আদায় করেছ। যেমন এ-যাবত অন্য সব বিষয়ে করে এসেছ।

এ ধরনের প্রতিবাদ এই প্রথম শুনলেন গোস্বামী। চায়ের কাপটা মেঝেতে ছুঁড়ে

দাঁতের ডাক্তাররা বলেন

নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করলে আর মাড়ি মালিশ করলে মাড়ির গোলযোগ ও দাঁতের ক্ষয় রোধ করা যায়

নিয়মিত ফরহ্যান্স টুথপেস্ট ব্যবহার করেন এমন অনেকে অযাচিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে লিখেছেন:

"...আমার স্ত্রী দাঁতের গোলযোগে ভুগছিলেন... টুথপেস্ট বদলে ফরহ্যান্স ব্যবহার করতে শুরু করলেন...এমন সুফল পেলেন, যে এখন অন্য কারো মাড়ির গোলযোগ হলেই উনি তাঁকে ফরহ্যান্স ব্যবহার করতে জোর করেন। আমার ভাই মিসি ইংল্যাণ্ডে, তিনিও তাবতে তৈরী ফরহ্যান্সের ৬টি টিউব পাঠানোর জন্যে পীড়াপীড়ি করে লিখেছেন।"

(স্বাঃ) ডি. জি. এম. ডি'সুজা
বম্বে

"রাজামুন্দ্রির এক ডেন্টিস্ট...দাঁত আর মাড়ির জন্যে আমাকে ফরহ্যান্স টুথপেস্ট ব্যবহার করতে বললেন। আমি অক্ষরে অক্ষরে ওঁর উপদেশ পালন করলাম, আর অল্প সময়ের মধ্যেই আমার নিঃশ্বাস আর মাড়ি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো। সেই থেকে আমি ফরহ্যান্স ছাড়া আর কিছু জানি না। আমার সারা পরিবার (আমরা ৯ জন।) ফরহ্যান্স ব্যবহার করি, আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই অভ্যাস আর বিশ্বাস আমাদের পরিবারে পুরুষানুক্রমে চলবে।"

(স্বাঃ) পি. জে. রাজায়
চিরালা, অন্ধ্র প্রদেশ

(এই প্রশংসাপত্রের প্রতিলিপি (ফটোস্ট্যাট) জেফি ম্যানার্স এণ্ড কোম্পানী লিঃ-এর যেকোনো অফিসে দেখতে পাবেন।)

দাঁতের সুরক্ষিত মজবুত ভিত্তি হলে, রাত্রে আর সকালে আপনার দাঁত ব্রাশ আর মাড়ি মালিশ করার জন্যে ফরহ্যান্স ব্যবহার করুন।

বিনামূল্যে! দাঁত আর মাড়ির যত্ন সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ বইটির পুস্তিকা। অনুগ্রহ করে ডাক খরচ বাবদ ২৫ পয়সার ডাকটিকিট সমেত এই ঠিকানায় লিখুন: ফরহ্যান্স কেমিক্যাল অ্যাডভাইসরী ব্যুরো, ডিপার্টমেন্ট নং T 75 পোস্ট ব্যাগ ১১৪৪৩, বম্বে ৪০০ ০২০। যে ভাষায় চান জানাবেন।

PIN CODE FOR FAST MAIL

ফরহ্যান্স
দাঁতের ডাক্তারের তৈরী টুথপেস্ট

160F-152 BN

মারলেন। ঘর থেকে কোনো সাড়া এল না। আগে হলে মিসেস গোস্বামী ছুটে এসে কাপের টুকরোগুলো কুড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করে জোড়া লাগানোর কথা ভাবতে বসতেন। স্ত্রীর এই ঔদাসীন্য গোস্বামীর সহ্য হল না। তিনি এবার ঘরে ঢুকে চড়া গলায় বললেন : তোমার নামে বাড়ীর নাম হবে—এতো অনেক দিন ঠিক হয়ে আছে। এতে তোমার আপত্তি কেন? না, এ আপত্তি মানতে রাজী নই, আর নকসা পাল্টানোও এখন ত সম্ভব নয়। কথার কোনো জবাব এল না ঐ তরফ থেকে। মিসেস গোস্বামী তখন ছোট মেয়ের সেতারটা টেনে নিয়ে পশ্চাসনে বসে চোখ বন্ধ করে টুং টাং সুরু করেছেন। তাঁর চড়া গলায় আকৃষ্ট হয় ছোট ছেলে, ততক্ষণে ওপরতলা থেকে নেমে এসেছে। ছোটবউ রান্নাঘর থেকে সব শুনছিল, সেও এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে। সবাই বিস্মিত, হতবাক। এ-দৃশ্য ছেলে বউ কোনো দিন দেখেনি। গোস্বামীর মনে পড়ল, বিয়ের পর প্রথম প্রথম এইভাবে মীনাক্ষী মিসেস (গোস্বামী) সেতার বাজাতেন। স্বামী বা শাশুড়ীর কাছ থেকে উৎসাহ পেতেন না, তাঁরা ভাবে ভঙ্গীতে জানিয়ে দিলেন যে বিবাহিত মেয়েদের এইসব বাজে কাজ তাঁরা পছন্দ করেন না। যদিও বিয়ের কনে পছন্দ করার পর্বে মীনাক্ষীকে সেতার বাজানোর পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। এরপর শাশুড়ী গত হলেন, একের পর এক আগন্তুকদের শুভাগমন হতে থাকল, সেতার বাকসবন্দী হয়ে ক্রমশ শোবার ঘর থেকে সিঁড়ির তলার আজেবাজে জিনিষের মধ্যে ঠাঁই পেল। বাড়ীর নকসা দেখানোর দিন থেকে মিসেস গোস্বামীর কিছু কিছু অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ করতে লাগলেন বাড়ীর সকলে। রান্না ও ভাঁড়ার ঘরের চাবি খুলে ছোটবউ-এর আঁচলে বেঁধে দিলেন, স্বামীপুত্রের খাওয়ার সময় অনুপস্থিত হতে লাগলেন, চা জল-খাবার খাওয়া ছেড়ে দিলেন। গৃহস্থালীর জোয়ালটা কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখলেন। (তিনি ঠিক এই ভাষাই ব্যবহার করেছিলেন, এই ইতিহাস মিসেস গোস্বামী কিছুটা বলেছিলেন, আর কিছুটা শুনেছিলাম পুত্রবধূর মুখে। একটানা সংসার চালিয়ে যদি তিনি হাঁপিয়ে উঠে থাকেন, তাহলে ব্যাপারটাকে ঠিক অস্বাভাবিক বলা যায় কি? এবার মিসেস গোস্বামীর কথা শুনুন।

—হ্যাঁ, ভাল আমাকে সবাই বাসে। ছেলে-মেয়ে স্বামী সবাই। দাদা বুড়ো হয়েছেন, তবু সপ্তাহে অন্তত একদিন ব্যারাকপুর থেকে আমাকে দেখতে আসেন। অভাব-অনটন কোনো দিনই ছিল না, এখনও নেই। যেখানে যেতে চাই ছেলে জামাই সেখানেই নিয়ে যেতে রাজী। কিন্তু ওরা পারবে না।

—কি পারবে না?

—আমি যেখানে যেতে চাই সেখানে ওরা নিয়ে যেতে পারবে না।

—অনেক দূরে বুঝি? কতদিন লাগবে যেতে। জায়গাটা কোথায়?

কাঁধের ঝোলা থেকে খানকয়েক কাগজ বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন : জায়গাটা ওরা চেনে না। আমি জানি জায়গাটা কেমন কিন্তু কোথায় কিভাবে যেতে হয় তা জানি না। জায়গাটার কয়েকটা স্কেচ এঁকে রেখেছি। দেখুন তো, আপনি যদি চিনতে পারেন, পথ বলে দিতে পারেন। —কাগজে আঁকা ছবিগুলো নানা দিক থেকে দেখবার ও বোঝবার চেষ্টা করলাম। ছবি আঁকার হাত আছে মিসেস গোস্বামীর; কিন্তু কেমন যেন উদ্ভট, অদ্ভুত ছবিগুলো। সব কটা ছবিতেই দুটো জিনিস স্পষ্ট আর সবই অস্পষ্ট কাপসা। মরুপথ দিয়ে একটি মেয়ে হেঁটে চলেছে, কাঁধে ঝোলা, পরণে কালো রং-এর শাড়ি, হাতে একখানা পর্যটকের লাঠি। তার লক্ষ্য দূরের একটা পাহাড়, ধূসর পাথরগুলো সূর্যাস্ত আভায় ঈষৎ রক্তাভ। কিন্তু সব থেকে বেশি করে চমক জাগায় একটা বিরাট গুহা, ভেতরটা অন্ধকার। খানিকক্ষণ লক্ষ্য করলে বোঝা যায় পাহাড় থেকে নেমে আসা কয়েকটা জলধারা গুহাপথে অদৃশ্য হয়ে গেছে। স্কিজোফ্রেনিকের আঁকা কিছু ছবি আমি দেখেছি; কিন্তু সেগুলোতে এমন নিপুণ তুলির আঁচড় নজরে পড়েনি। গুহাটা দেখলে সত্যিই ভয় হয়—যেন একটা বিরাট জন্তুর মুখগহ্বর।

—তমসা বলে একটা নদী আছে, তাই না? নদীটা কোথায় আপনি জানেন কি? জানেন না! না, আপনাকে গুরু করা হল না। আমি গুরু বাদে বিশ্বাস করি না। আমার পথ আমাকেই খুঁজে বের করতে হবে। তমসার তীরে আমাকে যেতে হবে, একা একা পথ খুঁজে। আমি এই সব ছবি আঁকি, তাই ওরা বলে আমি পাগলা। আচ্ছা পাগলে কি ছবি আঁকে?

—সারা রাত ধরে ছবি আঁকলে আর সেতার বাজালে লোকে ও-রকম ভাবতে পারে। অনেক মহান শিল্পীকে তাঁদের জীবদ্দশায় সাধারণ মানুষ পাগল ভেবেছে।

—আমি বে না এঁকে পারি না। না বাজিয়ে পারি না। তবে সারারাত নয় ভোর পাঁচটা অবধি। ছোটঘরে দরজা জানালা বন্ধ করেই বাজাই। আমি ছাড়া সেতারের শব্দ আর কেউ শোনে না। যত আঁকছি তত আমি অভীষ্ট পথে এগিয়ে চলেছি, জায়গাটার চেহারা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। গভীর রাতে যখন বাগেশ্রী বাজাই, তমসা তখন আমার খুব কাছে চলে আসে। তার ছলছল কলকল শব্দ আমি স্পষ্ট শুনতে পাই। মিলনের জোয়ার তমসার বুক থেকে আমার বুকে এসে ধাক্কা মারে। আমাকে যেতে হবে সেখানে, যেখানে তমসা পাহাড় থেকে উঠে আবার পাহাড়ী গুহার অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। সাগরে যাবার চেষ্টায় মরুভূমির বালিতে গিয়ে পথ হারায়নি। আমার মত ভুল করেনি। আপনি চেনেন তমসা? তবে ছবিগুলো দিন। আমি ক্রমশ পথ দেখতে পাচ্ছি। দুচার দিনের মধ্যে ঠিক পথ খুঁজে পাব। তখন বেরিয়ে পড়ব।

একটানে ছবিগুলো আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ঝোলায় পুরে মিসেস গোস্বামী বেরিয়ে গেলেন। মিস্টার গোস্বামী এবার ঘরে ঢুকে খুসীমনে বললেন : ও চিকিৎসা করতে, ওষুধ খেতে রাজী হয়েছে। কবে আবার আসতে হবে জানতে চেয়েছে। সপ্তাহ খানক বাদে? দশদিন হলে কি কোনো ক্ষতি হবে? তা হলে তাই আসব। রথযাত্রার দিন গৃহপ্রবেশ করব ভাবছি। 'মীনাক্ষী ভবন' নামের প্লেটটা আজ বসানো হবে। —তৃপ্তির হাসি হেসে গোস্বামী বিদায় নিলেন।

রথের দিন খবর পেলাম, আগের দিন ভোর থেকে মিসেস গোস্বামীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ছোট নাতিটাকে বলে গেছেন, তার জন্যে তমসার জল আনতে চলেছেন। জল নিয়েই ফিরে আসবেন। আমার দেওয়া ওষুধগুলো তাঁর ব্যাগের মধ্যে পাওয়া গেছে, একটা বাড়িও তাঁর পেটে যায়নি। এতদিনে তিনি ইচ্ছেমত পথে বেরিয়ে পড়েছেন। মুক্তির ডাকে সংসারের সব বন্ধন ক্রমশ আলগা হয়ে ছিঁড়ে পড়েছে। নাতির বিশ্বাস, দিদিভাই তমসার জল নিয়ে ঠিক একদিন ফিরে আসবেন।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর
৪ খণ্ডে প্রকাশিতব্য
পাভলভ পরিচিতি
তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে
এই খণ্ডে আছে মনোরোগের কারণ নির্ণয়, রোগীদের ইতিহাস ও চিকিৎসা প্রণালীর সাধারণ বোধ্য বিবরণ : দাম—৯-০০
প্রথম খণ্ড (সৃষ্টি স্বপ্ন স্মৃতি সম্মোহন) — ১৩-০০
দ্বিতীয় খণ্ড (পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্তভিত্তিক মনস্তত্ত্ব) — ৮-০০
চতুর্থ খণ্ডে থাকবে পাভলভ; ফ্রয়েড, স্কিনার প্রমুখ বিভিন্ন স্কুলের তুলনা-মূলক সমালোচনা ॥ ২৫% কমিশনে এখনও অল্প কিছু গ্রাহক নেওয়া হচ্ছে।
পাভলভ ইনস্টিটিউট
১৩২।১এ, বিধান সরণি । কলিকাতা—৪ (৫৫-৩২২৯)

দুরন্ত দশক—নির্মল সেনগুপ্ত। ভোলানাথ প্রকাশনী। ৩৭।১১ বেনিয়াটোলা লেন। কলকাতা—৯। দাম পনের টাকা।

ভারতীয় জনজীবনে সব থেকে উল্লেখযোগ্য দশক হল ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৫ খৃ। রাজনীতি অর্থনীতি ও সামগ্রিক জীবনধারায় এই দশ বছরের মধ্যবর্তী কালে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলী ব্যাপক প্রভাব ফেলে গেছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতের স্বনির্ভরতার পথে এত এগিয়ে যাওয়ার কাহিনী যেমন বিস্ময়কর তেমনি স্মরণযোগ্য। সেই ইতিহাসই বিস্তৃতভাবে উপস্থিত করেছেন লেখক।

গ্রন্থখানি তখনই হয়ে উঠেছে এই দশকের এক মূল্যবান দলিল চিত্র। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জীবন কাহিনী দিয়ে শুরু করে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অবদান, কংগ্রেস বিভাজন, বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশে শ্রীমতী গান্ধীর গৌরবময় অবদান এবং ভারত পাকিস্থান যুদ্ধ ও সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করেছেন শ্রীসেনগুপ্ত। নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচী আমাদের ইতিহাসের ধারাকে কিভাবে প্রভাবিত করছে। গ্রন্থকার সুন্দরভাবে তা বিশ্লেষণ করেছেন। বইটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এটি তথ্যনির্ভর ও সংবাদধর্মী। একটি দেশ ও জাতির অতীত ইতিহাসকে জানবার পক্ষে এই জাতীয় গ্রন্থের ভূমিকা অপরিসীম। বেশ কয়েকখানি মূল্যবান আলোকচিত্র আছে।

সাম সংগীত : অনুবাদ — অমলকান্তি ভট্টাচার্য। দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

বিশিষ্ট খৃস্টান ধর্মগ্রন্থ 'ওল্ড টেস্টামেন্টে'র একাংশকে বলা হয় 'বুক অব সামস' বা 'ভজন গীতিপর্ব'। এই অংশে আছে ১৫০টি 'সাম'-গান, অতীতে ভক্ত হিব্রুরা এই সাধন-সংগীতগুলিকে পাঁচটি স্বতন্ত্র পর্যায়ে (বুক) বিন্যস্ত করেছিলেন, কয়েক শতাব্দী ধরে, নানা সূত্র থেকে নানা উপাদান সংগ্রহ করে বহু গীতিকারের মিলিত চেষ্টায় এই গীতমালা গ্রথিত হয়েছে। কিংবদন্তী অনুসারে চতুর্ভুই ঐ সংগীতমালার সংগ্রাহক, কারও ধারণায় রাজা সলোমন। কাব্য হিসাবেও ঐ সামগীতি অনবদ্য ও কালাতিশায়ী। ঐ সংগীতসমূহ বাংলায় তর্জমা করা সহজ নয়। প্রথমত ইস্রায়েল জাতির ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে অনুবাদকের যথেষ্ট পরিচয় থাকা প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়ত প্রতীকী ও সংকেতময় হিব্রু শব্দগুচ্ছের বাংলা প্রতিশব্দ নির্বাচন যথেষ্ট ভাষাজ্ঞানসাপেক্ষ। অনুবাদক সেই দুরূহ কর্মে সার্থকতা লাভ করেছেন বলেই মনে হয়। কেননা তার অনুবাদ স্বচ্ছন্দ ও মূলানুগ হয়েও বাংলাভাষার স্বাভাবিক অন্বয়-রীতির অনুসারী। ফাদার দ্যতিয়েনের লেখা 'পাঠ সহায়িকা' বহু তথ্য সমৃদ্ধ এবং সুরচিত। অনুবাদক গ্রন্থের ভাষান্তরণে যথেষ্ট যত্ন নিয়েছেন। ভাষা আধুনিক হলেও গাম্ভীর্য ও প্রসাদগুণ কোথাও ব্যাহত হয় নি।

মীরার ভজন : নীহারবিন্দু চৌধুরী। সাম্প্রতিক প্রকাশনী, পোষ্ট বকস ১৬২২৬, কলকাতা—২৯। ছ' টাকা।

ভক্তি জগতের একজন শ্রেষ্ঠ সাধিকা মীরাবাঈ। তিনি বৃন্দাবনে সিদ্ধভক্ত ও সংগীতগুরু হরিদাস স্বামীজীর আশ্রমে যেতেন ও ভজন গান শোনাতেন। তাঁর ভজনে বহু সংগীতগুণী মুগ্ধ। এমন কি মিঞা তানসেনও তাঁর ভজন গানে বিভোর হয়ে যেতেন। এই মীরার ভজন বলে প্রচলিত গানগুলি পরবর্তীকালে সংগীতগুণীরা নিজ নিজ সুরে গাইতেন। মোটকথা মীরার গানগুলি বাংলায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত হলেও সার্বিক প্রয়োজন সেগুলি মেটাতে অক্ষম। সংগীতাচার্য অধ্যাপক নীহারবিন্দু চৌধুরী 'মীরার ভজন' নাম দিয়ে গান ও সেগুলির স্বরলিপিসহ আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। নির্বাচিত এই পদাবলীতে সুর সংযোজনা গ্রন্থকারের নিজস্ব। গ্রন্থকার গানের পুরো পদ, পদের মর্মানুবাদ ও তাল উল্লেখসহ বিস্তৃত স্বরলিপি গ্রন্থে সংযোজিত করেছেন। সংগীত সমাজে পরিচিত আলোচ্য লেখকের স্বরলিপি রচনায় সারল্য ও অনায়াস প্রযত্ন আছে। শিক্ষার্থীদের এই গ্রন্থটি কাজে লাগতে পারে।

হাবড়ার কথা—গৌরীশঙ্কর দে। সুবর্ণরেখা। ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা—৯। দাম একটাকা।

পশ্চিমবাংলার প্রায় প্রতিটি গ্রামেরই আছে ঐতিহ্য ও ইতিহাস। সে সম্পর্কে গবেষকদের উৎসাহ একান্তই সীমাবদ্ধ। কিছু বিখ্যাত শহর বা গ্রামকে ঘিরেই আলোচনার পর আলোচনা চলে আসছে। অপরিচিত অখ্যাত বা অধুনা জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলিকে নিয়ে বিশেষ আলোচনা চোখে পড়ে না। এ ক্ষেত্রে গৌরীশঙ্কর দের 'হাবড়ার কথা' একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজনা। এই অঞ্চলেরও যে একটি হারান ইতিহাস আছে, তা এই পুস্তিকাটি পড়ে জানা গেল।

যে কোন নিশীথে (গল্প সংকলন)। অশোককুমার সেনগুপ্ত। গ্রন্থমিতা, ৫৭ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯। পাঁচ টাকা।

মোট এগারোটা ছোট গল্প সংকলিত করে লেখক অশোককুমার সেনগুপ্ত তাঁর সদ্যপ্রকাশিত 'যে কোন নিশীথে' নামের গল্পের বইটি আমাদের উপহার দিয়েছেন। নাম গল্পটিই লেখকের গ্রন্থে সংকলিত প্রথম গল্প। অশোককুমার সেনগুপ্ত তাঁর গল্পের বিষয় ভাবেন নিম্নবিত্ত মানুষদের মধ্যে বসে। তাদের মনের অভাব-অভিযোগ, সুখ-দুঃখ-আর্ত এসবের সঙ্গে তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার কথাটা ভুলে যান না। তাই সুনাচাঁদ, গুপ্পা, রহিতদের কথায় আসে খেটে খাওয়া মানুষদের দীনহীন অবস্থার ছবি। 'ছাগল' গল্পের ধরম, 'ভুবন, 'পাথর' গল্পের লেখা, 'সাপ' গল্পের ফটিক ইত্যাদি চরিত্রের ভিড়ে আমরা লেখকের সশরীর উপস্থিতি ও সযত্নে অভ্যর্থ চোখ দেখতে পাই। আবার সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের কথাও তিনি বলতে অক্ষম নন। 'অনুসন্ধান', 'সুখের কথামালা', 'ঝুল বারান্দায় সাদা পায়রা' ইত্যাদি গল্পে সেইসব জীবন, ছোটখাটো অনুভব ও সংঘর্ষের কথা লেখক শিল্পীর সযত্নে এঁকে গেছেন। লেখকের গদ্য তাঁর নিজস্ব। কোথাও তাঁর আসক্তিতে দেখা দেয়নি বরং চরিত্র ন্যায়ের ভাষা হয়েছে বলেই আলোচ্য সংকলনের গল্পগুলি লেখককে যথার্থ গল্পকারের মর্যাদা দেয়।

নগর প্রান্তর বনস্থলী (কবিতা) : উত্থানপর্ব বিজলী প্রকাশক : আলফা-বিটা পাবলিকেশনস লিমিটেড; ৫৫-১ কলেজ স্ট্রীট কলকাতা-১২ দাম : সাড়ে তিন টাকা।

হৃদয় আছে বলেই মানুষ কবিতা লেখেন কবি হন। অনুভূতি আর কল্পনাকে সুন্দর-শিল্পসম্মত রূপ দিতে পারলেই কিন্তু সবসময় সেই লেখা কবিতা হয় না সেই সঙ্গে চাই গভীর অন্তর্দৃষ্টি। আলোচ্য সংকলনটিতে সেই গভীর অন্তর্দৃষ্টির বড় অভাব। নগরের যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতি যত বিরূপতাই কবির থাকুক না কেন, কোনো লাইনেই তা স্পষ্ট নয়। প্রান্তর-বনস্থলীর কয়েকটি ছায়াসুনিবিড় চিত্রকল্প অবশ্য তিনি বেশ মুন্সিয়ানার সঙ্গেই এঁকেছেন কিন্তু গ্রামের সেই হৃদয় মন্থরে দেখয়া আকুলতা কই।

বেহুলা, ভাসাও ভেলা। অমরেন্দ্র গনাই। ইউ এন ধর এন্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট কলকাতা—১২। তিন টাকা।

অমরেন্দ্র গনাই-এর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বেহুলা, ভাসাও ভেলা'। লেখকের গভীর গোপন আত্মসাক্ষাৎকার এর প্রতিটি কবিতায় নানাভাবে ব্যক্ত। এ যুগের জটিলতা, যন্ত্রণা ও নিরাশার হাত ধরেই তিনি তাঁর কাব্য-বিষয়-পরিক্রমায় নেমেছেন। হারানো প্রেম ও সৌন্দর্যের জন্য কবির বিষন্ন বেদনা বার বার এ কাব্যে বেজেছে।

সাহিত্যের নেপথ্যে

কল্যাণব্রত দত্ত

তুলি কলম

আগে কাগজ কালি ছাপার দর কম ছিল তখন বই বের করতে এতটা অসুবিধে হোতো না। আজকাল দর বাড়লেও পাঠকের সংখ্যাও বেড়েছে। বেড়েছে ক্লাসিক বই এবং রচনাবলী সংগ্রহের পাঠক। দাম বেশী হলেও ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখার মতো পাঠক আজ অনেক বেশি।

দাদা মণীন্দ্র দত্ত ইতিহাসের লোক। ধুগান্তরে সহকারী সম্পাদক তখন এই সূত্রে স্বপনবুড়োর সঙ্গে আলাপ। দাদা বরাবরই ছোটদের জন্যে নানা জায়গায় লিখতেন পাততাড়িতে তো বটেই। দাদার বইটই বেরুতো তখন কমলা বুক ডিপো আশুতোষ লাইব্রেরী কমলা বুক ডিপো অভয় প্রকাশ মন্দির এই সব তখনকার নামজাদা প্রকাশনী থেকে।

ভাই দাদার কাছেই থাকে। শুধু টাইম-মতো পড়াশুনো করে পাশ করে যাওয়া ছাড়া মাথার উপর খুব একটা চিন্তা ছিল না। আর এ বয়সে তখনকার ছেলেদের খুব একটা বাড়তি চিন্তা না থাকারই কথা সুতরাং স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে যেতে খুব একটা অসুবিধে হোলো না। স্কুল ফাইনাল পাশ করে কল্যাণবাবু মানে কল্যাণব্রত দত্ত আর দশটা ছেলের মতো কমার্স নেবেন ঠিক করলেন। ভর্তি হলেন সিটি কলেজ অব কমার্সে রাতে।

দাদার তখন দু-চারটে বই বেরিয়ে বেশ ভালো বিক্রি হয়েছে। আর চাকরী ছেড়ে উল্টবপাড়া কলেজে অধ্যাপনা করছেন, এদিকের বই পাড়ায় আসার খুব একটা সময় হয় না। ইতিমধ্যে দাদা ঠিক করেছেন নিজেই এবার কিছু বই বের করবেন। তা বই বের করাতো আর এমনি হয় না। প্রেস-প্লেস বাইন্ডার কম্পোজ প্রুফে-রিডিং এসব নানা ঝামেলা। ভাই-কে বললেন—তুই তো এদিক বাস একটু ব্যবস্থা-ট্যবস্থা করিস তো। কল্যাণবাবু দাদার বই বের করতে করতে ভাবলেন—একটা বইয়ের স্টল করলে কেমন হয়। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কলেজ স্ট্রীট আর কলেজ রো-এর মুখে একটা ছোট স্টল পাওয়া গেল। স্টলের নাম হোলো—'তুলি-কলম'। মালিক ১৯।২০ বছরের কল্যাণবাবু। সালটা বোধ হয় তখন ছিল ১৯৫৬। কলেজ স্ট্রীটের বই পড়ায় বিনা অভিষেকে আড়ম্বরহীন ছোট একটা প্রকাশনীর দোকানের মালিক হলেন সবে মাত্র গোঁফের রেখা উঠছে এমন একজন কলেজ পড়ুয়া।

তা স্টল তো হোলো। বই কি হবে? দাদার তো দু-একটা বই ছিলো। এবার মনীন্দ্রবাবু একটা বড়দের বই লিখলেন 'উত্তম পুরুষ'। টাকা নেই তবোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার প্রকাশনীর মালিক তো হওয়া গেল বই বেরোয় কি করে। তখনতো আর আজকের অবস্থা ছিল না যে সব ক্যাশ পেমেন্ট করতে হবে। এই কম্পোজ হলো মেক-আপ প্রুফ নিয়ে প্রেস তাগাদা দিল তো দাও চষেচিন্তে কষেক রিম কাগজ ফেলে। ছাপার ফর্মা তখন ছিল ২২ টাকা আর ৫ রিম কাগজ হলেই মোটামুটি একটা বই হয়ে যায়। দাদাই কিছু কিছু করে টাকা দিয়ে দিতেন।।

তখন নীহারবাবু মানে নীহাররঞ্জন গুপ্তর বই--এর কাটতি বেশি। দাদার বন্ধু ছিলেন রুক্ষিণীবাবু। রুক্ষিণীবাবুর সঙ্গে আবার নীহারবাবুর খুব দহরমমহরম ছিলো। ঐ রুক্ষিণীবাবুকে ধরে কল্যাণবাবু একদিন পারে পায়ে হাজির হলেন নীহার গুপ্তের বাড়িতে। ছেলেটিকে দেখে কি জানি কি মনে হোলো নীহারবাবু বই দিতে রাজী হলেন। শুধু রাজীই হলেন না বিনা অ্যাডভান্সেই বই দিলেন। তখন বাজারে নীহারবাবুর অ্যাডভান্স আর টাকার মাপ নিয়ে বাজারে জল্পনা-কল্পনা অল্প না। আমি মানে এই শ্যাংডলই লোক পরম্পরায় শুনেছিলাম অ্যাডভান্স যাই হোক প্রথম পাণ্ডুলিপি যেদিন প্রকাশক নেবেন সেদিন নাকি একটা গিনি দিতে হবে। গুজব বা সত্যি জানি না কিন্তু বাজারে এটা বেশ চাউড় হয়ে গিয়েছিল আর সেহেতু আমিও একজন বাজারের লোক ফলে আমার কানে আসতেও বেশী সময় নেয়নি। নীহার-বাবু একের পর এক বই দিলেন। এবং তখন নীহাররঞ্জন গুপ্তের পর পর বই বের করা মানে বাজারে রীতিমতো একটা খবর।

—বিশ্বাস করুন তুলি-কলম দাঁড়াবার মূলে নীহারবাবুর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তারেকটা মজার ব্যাপার কি জানেন? তখন বাজারে দামী বই বিশেষ ছিল না বিয়ের উপহারের জন্যে বই তৈরী হোতো। বেশ কিছু লোক তখন দামী বই চাইতেন, তখন দামী বইয়েরও একটা বাজার ছিল কারণ

তৎকালীন পূর্ববঙ্গ মানে আজকের বাংলাদেশে তখন দামী বইয়ের একটা চাহিদা ছিল। আমরা একটু লেটে বুঝেছিলাম। ফলে যখন চাহিদা ছিল তখন নিলাম পরিকল্পনা আর যখন বই বের করলাম তখন বাজারের চাহিদাটা ঝপ করে কমে গেল।

আবার দামী বই তখন চলছে মানে গ্রন্থাবলীর দিকে মানুষের ঝোঁক এসেছে। পাঠক বা লাইব্রেরীতে আজকাল লিটেরারী অর্থে ক্লাসিক বইয়ের দিকে নজর এসেছে। ফলে উপন্যাসের ঠিক সেরকম চাহিদা নেই অন্ততঃ গত পাঁচ বছর আগে যেমনি প্রকাশকেরা উপন্যাস সম্পর্কে ভাবতেন ঠিক তেমনিভাবে আজ আর ভাবছেন না। সকলেই এখন গ্রন্থাবলী বা পুনর্মুদ্রণ ক্লাসিক নতুন অঙ্গিকে পরিবেশন করছেন।

ঃ আচ্ছা কল্যাণবাবু এখন আপনাদের বইয়ের সংখ্যা কতো হবে।

—তা ধরুন ২০০।

ঃ শুধু উপন্যাস?

—না তার মধ্যে রচনাবলীও আছে। আর আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না যখন রচনাবলী নিয়ে বাজারে এত হিড়িক ওঠেনি তখন আমরা পরিকল্পনা নিয়েছিলাম রচনাবলী প্রকাশ করার। আমাদের কল্পনা ছিল শেকসপীয়ার কে নিয়ে তবে ভুল আমাদের একটা নিশ্চয়ই হয়েছিল যে আমরা কাগজে বিজ্ঞাপন করিনি। ফলে ব্যাপারটা চাপা থাকলো না। এবং আমাদের আগেই তিন খণ্ড সম্পূর্ণ বলে কোনো প্রকাশক বিজ্ঞাপন দিলেন। পাবলিকের ব্যাপার তো। তাঁরা দেখলেন আমরা যেখানে বের করছি পাঁচ খণ্ড ৫০ টাকা সেখানে তাঁরা পেয়ে যাচ্ছেন তিন খণ্ডে সমগ্র শেকসপীয়ার। ফলে যা হবার তাই হোলো। প্রথম পর্যায়ে ওঁরা বেশী গ্রাহক পেলেন।

ঃ প্রথম পর্যায় মানে?

—আরে মশাই বিজ্ঞাপন মানেইতো আর বই বের করা নয়। গ্রাহক তো হোলো। দিন যায় দিন আসে বই আর বেরোয় না। শেষ পর্যন্ত সেভাবেই বেরুলো।

ঃ কি ভাবে??

—সেই রকম প্রোডাকশন। আর সেখানে কম-বেশী ৩৬।৩৭টা নাটক সেখানে ওঁরা ১৫।১৬টার বেশী নাটক দিতে পারেনি। তাই প্রথম পর্যায়ে যাঁরা ভেবেছিলেন সম্পূর্ণ তাঁরা পরবর্তী পর্যায়ে আবার আমাদের কাছে অনেকে এসেছেন। আমাদের ৫টার মধ্যে ৪টি বেরিয়েছে আর একটা বেরুবে জুলাইয়ের শেষে।

ঃ আচ্ছা কল্যাণবাবু এত বড় ঝুঁকি নিতে একটু ভয় করেনি। মানে সাড়ে সুন্দো নিয়ে মান গুছিয়ে তুলতে পারবেন তো

—ঠিকই বলেছেন প্রথম ধাপে একটু ভয় ভয় যে করেনি তা নয়, তবে গ্রাহক হতে শুরু করলে সে ভয়টুকু কেটে যায় তবে গ্রাহকরা ইমপ্রেস্ড হলে আমাদের পরবর্তী প্রকাশনা সম্বন্ধে একটা অবস্থা এসে যায়।

ঃ আপনারা কার কার রচনাবলী বের করছেন।

—আমরা বের করেছি এখন হোমার রচনা সমগ্র যা এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। শেকসপীয়ারের কথাতো আগেই বলেছি। তারপর ধরুন মপাসাঁ রচনাবলী যা চার খণ্ডের মধ্যে আমরা পুরোটা আনতে পেরেছি।

ঃ মোটামুটি আপনারা কার কার বই বের করছেন।

—তা ধরুন— অবধূতের গোটা সাতেক এছাড়া প্রেমেন্দ্র মিত্র তারাশঙ্কর মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় শৈলজানন্দ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত জরাসন্ধ আশাপূর্ণা দেবী হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এরা তো আছেনই তাছাড়া আমাদের ভিন্ন স্বাদের গ্রন্থ বলতে গেলে বেদুইনের মাংসে-ডুংএর কিছু বই কৌটিল্য গাস্তের কিছু বই এবং তার সঙ্গে বহুরূপী অনিল রায় অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ শৈলেশ দে সুধাংশুরঞ্জন ঘোষের কিছু বইয়ের নাম করা যায়।

ধরুন তারাশঙ্করের কথা। তখন তারাশঙ্করের যা নামডাক তাতে আমাদের মতো প্রকাশনীর তাঁর কাছে যাওয়াই ছিল বিরাট বামনের। কিন্তু তারাশঙ্করবাবু মাত্র দুশো টাকা অ্যাডভান্স আমাদের 'দীপার প্রেম' দিয়েছিলেন। জানি না আমরা কি ব্যবহার করছিলাম। পরে তারাশঙ্করবাবু আমাদের বেশ কয়েকখানা বই দিয়েছিলেন।

ঃ আপনারা কবিতার বই বের করেন না কেন?

—করি না মানে কবিতার বই আগে সেরকম বিক্রি হোতো না। শুধু কবিতা কেন নাটকের কথাও বলা যায়। আজকাল শুনছি কবিতার বই খুব ভালো বিক্রি হচ্ছে। আমাদের কোনো পরিকল্পনা নেই।

আমাদের দুজনের কথার মধ্যে তুলি-কলম-এর প্রায় পুরো ইতিহাসটা আরেক জনের মুখে শোনা যাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলুম—ইনি কি তুলি কলমের সঙ্গে যুক্ত?

—কে? বীরেনবাবু? আরে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি। ইনি হলেন সৌরেন নাগ আরতি প্রকাশনীর কর্ণধার। তা আরতি প্রকাশনী করলে কি হবে তুলি কলমের বেখা শোনার ভার ওঁর উপরই দিয়ে নিশ্চিন্ত আছি। এবেবারে প্রায় গোড়া থেকেই তুলি কলমের সঙ্গে আছেন।

ছোট মানে একেবারেই ছোট একফালি ঘরটা জিজ্ঞাসার ঠিক তলায়। আমি আগেই বলেছি যে এ পাড়ায় লোড শেডিং হলে সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসা ছাড়া উপায় নেই। দুটো টেবিল ফ্যান এপাশ ওপাশ থেকে ঘুরছে। ঘুরলে কি হবে। তার মধ্যে ঘেমে-নেয়ে একাকার। আর তার মধ্যে বসেই কল্যাণবাবু একের পর এক পরিকল্পনা নিচ্ছেন। দাঁতে কেবুবে তার হিসেব। বাইন্ডারের কাছ থেকে পুরো বই তুলে নিতে হবে তার সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত। সব মিলিমিশি করেই কল্যাণবাবু ওস্তর তুলি কলম। এখন এই ব্যবসা যেন একটা নেশায় এসে দাঁড়িয়েছে। শহরতলীতে ছোট একটা বাড়ি করেছেন। নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্ন সংসার। এখন আর কোনো ঝামেলা নেই। চলছে আর চলবে ফাড়া।

এক বিন্দু কাগজ আর প্রেসে টাকা ধার করে দাদার বই নিয়ে যে প্রকাশনী শুরু হয়েছিল আজ কল্যাণবাবু না বললে কেউ বুঝতে পারি অন্তত চতুর্বিংশের সাজানো বং-বেরঙের কড়ায় মোড়া সেই গোকো দেখে বুঝতে পারি এখন-বানিং কাপিটাল কতো। একজন একক প্রচেষ্টায় সবলকালীন পাঠকের অন্তরঙ্গের প্রথম জীবনের নিজের মধ্যে নিজেকে গড়ে ওঠার স্বপ্ন আজ সার্থকতার পথে।

এখনো অনেক কাজ বাকী।

কাজ বাকিই থাকে। তা না থাকলে জীবনটাই কবে একদিন থেমে যেতো।

শান্তিলতা চট্টোপাধ্যায়

C. F. Advtg/76

উপন্যাস

মোহিনী আড়ম

চিত্তরঞ্জন মাইতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিছানার বালিশে মাথা রেখে শুতে গিয়ে ইন্দ্র একটা সুন্দর গন্ধ পেল। কোন একটা ফুলের তীব্র সুগন্ধ। সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরের দরজার ছিটকিনি বন্ধ করার শব্দ শুনল সে। দুটা শোবার ঘর পাশাপাশি। নাকে পরেনো দিনের পরাদ দেওয়া একটা বড় জানালা। বাইরের ঘরে বসে আসা হাওয়া যাতে ভেতর ঘরেও খেলতে পারে তারই ব্যবস্থা। জানলার কোন পর্দা ছিল না। এ ঘরে গত রাতে শোয় নি ইন্দ্র। সম্ভবতঃ আজ মিঃ পিল্লাই নেই বলে তাঁরই শোবার ঘরে আজ কর রাতে তার শোবার ব্যবস্থা হয়েছে। একেবারে বাইরের ঘরে আজ তাকে শুতে পাঠিয়ে দিতে ললিতার বোধহয় বাধ বাধ ঠেকেছে।

ইন্দ্র আড় চোখে দেখল পুবের জানালার ভেতর দিয়ে বাইরের জ্যোৎস্নার যে ফেনা-টুকু পরের অন্ধকারে গড়িয়ে পড়েছে তাতে ঘরের ভেতরের সবকিছু চেনা যাচ্ছে।

ললিতা শরীরটাকে শিল্পীর মডেলের মত নানা ভঙ্গীতে ভেঙে ভেঙে শুয়ে পড়ল। পাতলা একখানা চাদর পায়ের ওপর বুকে টেনে নিল বুক অব্দি। ডান হাতখানা মেলে তুলির ওপর একবার রাখল। কি যেন ভেবে পাশ ফিরে তুলিকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে আদর করল। তুলির নড়নচড়ন নেই। ঘুমে একেবারে নাতা হয়ে পড়ে আছে। আধ-বসার ভঙ্গীতে উঠে তুলিও গায়ের চাদর ভাল করে টেনে দিল ললিতা। তারপর ডানহাতখানা পড়ে রইল কপালের ওপর।

বাইরের এক ঝলক হাওয়ায় গন্ধটা আরও তীব্র হয়ে উঠল। ইন্দ্র বুঝল ভিকটোরিয়া রোজের গন্ধ। কিন্তু ফুলটা কোথায়। মনে হল বালিশের ভেতর থেকে যেন গন্ধটা আসছে।

ইন্দ্র গন্ধের উৎসের খোঁজে উঠে বসল। খাটের পাশে হাত বাড়াতে গিয়ে হাতে ঠেকল একগুচ্ছ গোলাপ। টিপয়ের ওপর ফুলদানীতে সাজান। মুখটাকে গোলাপ গুচ্ছের কাছে নিয়ে গিয়ে শুঁকল। খাটের লেভেলের খানিকটা নীচে রাখা অথচ দক্ষিণ হাওয়ার দাক্ষিণ্যে গন্ধটা ভেসে আসে। ইন্দ্র পরিকল্পনাকারিণীর প্রশংসা করল মনে মনে।

শুতে গিয়ে হাতে ঠেকল আর একটি গোলাপ। বালিশের ঢাকার এক কোণায় ক্লিপ দিয়ে আটকানো। তরতাজা গোলাপটা হাতে নিয়ে ইন্দ্র আর ঘুমোতে পারল না। সে শুয়ে শুয়ে গোলাপটার গন্ধ নিতে লাগল।

ইন্দ্রর মনে হল গোলাপটা যেন এক তরুণীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। পিঙ্ক রঙের শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে যৌবনের প্রতিটি রেখা স্পষ্ট। ঠিক যেন ফুটন্ত গোলাপ পাপড়ির সুষমা।

ইন্দ্র উঠে বসল। কি মনে করে জানালার ফাঁকে ছুঁড়ে দিল গোলাপটা। অমনি অব্যর্থ লক্ষ্যে ফুলটা এসে পড়ল ললিতার বুকের ওপর।

ললিতা কি ঘুমোয় নি! কপালের ওপর ফেলে রাখা হাতটা সরে গেল তার। বাঁ হাতের কনুইতে ভর দিয়ে মাথাটা তুলে আধশোয়ার ভঙ্গীতে পাশ ফিরল ললিতা। ইন্দ্র দেখল বুকের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়া গোলাপটা তুলে নিয়ে উঠে বসল সে।

চুলগুলো খুলে গেছে ললিতার। চরাচরের অন্ধকার যেন ঘন হয়ে আশ্রয় নিয়েছে ওর কালো চুলের গভীরে।

ললিতার কোন দিকে তাকাল না। সে জানালার দিকে পাশ ফিরে আবার শুয়ে পড়ল। ইন্দ্র দেখল কণ্ঠাগ্রে আর তর্জনীর মাঝ বরাবর বোঁটাটি ধরে আছে মনে ললিতা দোলাচ্ছে।

কত কথা মনে পড়ে গেল। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত শরীরের রক্ত কণা আলোড়িত করে বেলাভূমিতে কিন্তু কোন প্রতিশ্রুতি ঘটনা ঘটল না।

কতক্ষণ এমনি কেটে যাবার পর স্থির নিশ্চল ললিতার দিকে চেয়ে ইন্দ্রর মনে হল ললিতা ঘুমিয়ে পড়েছে।

তখনও ইন্দ্রর খেলার সখ মেটে নি। সে একটি একটি করে গোলাপ ফুলদানী থেকে তুলে নিয়ে ললিতার বিছানায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলল।

ললিতা ঘুমিয়ে আছে মনে করে তার শরীরটাকে লক্ষ্য করে আর ফুল ছুঁড়ল না। ভোরে উঠে ললিতা দেখবে সে ফুলের বিছানায় শুয়ে আছে।

সব কটা ফুল ললিতাকে উপহার দিয়ে সে দারুণ খুশী হয়ে উঠল। যা ভাবে ভাবুক ললিতা। বালিশের ঢাকায় ক্লিপ দিয়ে সদি ললিতা ফুল উপহার দিতে পারে তাহলে সে কেনই বা অভিযুক্ত হবে গোলাপের খেলা খেলতে গিয়ে।

অনেক রকম এলোমেলো ভাবনা আর উত্তেজনার ভেতর কখন চোখ দুটো বন্ধ হয়ে এল ইন্দ্রর।

রাত কত ঠিকানা নেই। ঘুম ভেঙে গেল সমুদ্র থেকে বয়ে আসা এক

ঝলক দমকা হাওয়ায়। সে উড়ে যাওয়া চাদরখানা টেনে নিয়ে পাশ ফিরে শুতে গিয়ে দেখল ললিতা দাঁড়িয়ে আছে দুটো পরের মাঝের জানালার বেলিঙ ধরে। চেয়ে আছে তারই দিকে। শ্যাম্পু করা চুলগুলো প্রপাতের মত নেমে গেছে পিঠ পেরিয়ে নিতম্বের দিকে। কতকগুলো এলো চুল কাঁধের ওপর দিয়ে উছলে নেমে এসেছে বুকের দুটো নিটোল শিলাস্তূপের গা বেয়ে।

বাইরে চাঁদের আলোয় এখন যৌবনের জোয়ার। তার একফালি সাদা আঁচল জানালার ফাঁকে লুটিয়ে পড়েছে ললিতার ঘরের ভেতর। ললিতা এখন আর অস্পষ্ট নয়।

ইন্দ্রকে জাগতে দেখে ললিতা চোখের দৃষ্টি ইন্দ্রের মেঝের ওপর নামিয়ে নিল।

ইন্দ্র উঠে দাঁড়াল। সে এগিয়ে গেল জানালার দিকে। একপাশে মুখখানা ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ললিতা।

ইন্দ্র জানালার একেবারে কাছ মুখ এনে ডাকল ললিতা!

তার গলার স্বর অস্পষ্ট হয়ে গেল।

ললিতা এখন তার রহস্যময় চোখের গভীর থেকে চেয়ে আছে ইন্দ্রের দিকে।

ইন্দ্র উত্তেজনায় কাঁপছিল। সে তার সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে ডাকল ললিতা।

লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে ললিতা তার দুটো হাত বাড়িয়ে দিল ইন্দ্রের দিকে।

ইন্দ্র দেখল ললিতার অঞ্জলি করা দুটো হাতে তারই ছুঁড়ে দেওয়া গোলাপ।

ইন্দ্র ফুল সমেত ললিতার দুটো হাত নিজের হাতের পাতায় চেপে ধরল। অজস্র চুমুতে ভরে দিল ললিতার হাত।

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শের
জ্বালা-যন্ত্রনা
থেকে
দ্রুত আরাম
পেতে হলে
হ্যাডেনসা
মলম
ব্যবহার করুন!

ললিতা হাত সরিয়ে নিল না। কোন কথাও বলল না। শুধু পলকহীন দুটো চোখ মেলে চেয়ে রইল।

ইন্দ্র ললিতার হাত নিজের বুকের কাছে টেনে এনে তাকাল তার দিকে।

সাদা সেমিয়দখানা বুকের ওপর কৌশলে বাঁধা। নাইটির মত সে কাপড় দেহ আবৃত করে নেমে এসেছে পা অব্দি। ললিতা দাঁড়িয়ে আছে না কোন শ্রেষ্ঠ ভাস্করের কেবী শ্বেত পাথরের একটি নারী মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে তা বোঝা গেল না।

ইন্দ্র ললিতার হাত শিথিল করে দিতেই ওর হাত থেকে সব কটা ফুল ইন্দ্রের ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল।

ইন্দ্র ফুল কুড়োনোর খেলা খেলল না। একটা পাহাড়ের মাথায় জমে থাকা সাদা বরফের স্তূপকে নিয়ে সূর্য যেমন গলিয়ে ঝরিয়ে দেবার খেলা খেলে ইন্দ্রের ভেতর থেকে একটা দুরন্ত উত্তাপ তেমনি সামনের শ্বেত মূর্তিটাকে গলিয়ে ঝরিয়ে দিতে চাইল।

ইন্দ্র দুটো হাত বাড়িয়ে ধরল ললিতার মোমের মত মসৃণ মুখখানা। কিন্তু নিজের মুখ নিয়ে যেতে পারল না সেই দূরত্বে যেখানে ললিতা নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে একটা বিপদমুক্ত ব্যবধানে। সে কিন্তু চেয়ে আছে তেমনি স্থির চোখ মেলে। ইন্দ্রের হাতের পাতায় ধরা তার মুখখানা।

এক সময় ইন্দ্রের আকুতি-ভরা চোখ যখন আছড়ে পড়ল ললিতার বন্ধ ঘরের দরজার ওপর তখন নিজের হাত দিয়ে ইন্দ্রের হাতখানা চেপে ধরে বলল ললিতা প্লিজ ইন্দ্র আমাকে তুমি দুর্বল করে দিও না। আমি তোমাকে ফুল দিতে এসেছিলাম।

ইন্দ্র একটা চাপা শ্বাস ফেলে বলল শুধু গোলাপ দিতে এসেছিলে আর কিছু নয়?

ওধার থেকে ললিতা বলল মিথ্যে বলব না তোমাকে ভাল লেগেছিল।

তাহলে ললিতা?

সব তা হলের জবাব নেই ইন্দ্র।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইন্দ্র বলল যদি তোমাকে স্পর্শ করে অন্যায় করে থাকি তাহলে।

ইন্দ্রের হাত শিথিল হল। সঙ্গে সঙ্গে সে হাত শক্ত করে বুকের কাছে তুলে ঠোঁটে চেপে ধরল ললিতা।

বলল আমরা বন্ধু ইন্দ্র। আজ থেকে দুজনের দুঃখ আমরা দুজনে বোঝার চেষ্টা করব। অনেক দূরে চলে গেলেও আমরা বন্ধু। অনেক অদেখা দিনেও আমরা ভাবব দুজনের কথা।

ইন্দ্র বলল আমরা দুজনের অনেকটা কাছে আসতে পারি না ললিতা? যেখানে ঘ্রাণে পাওয়া যায় দেহের আশ্চর্য এক ধরনের গন্ধ আর মনের অনেকখানি জুড়ে আত্মীয় কারুর আনাগোনা।

কেন চঞ্চল করে দাও ইন্দ্র কেন নতুন জীবনের লোভ দেখাও। আমি নিঃশেষ হয়ে গেছি। আর তাছাড়া আমি তো প্রতারণা করতে পারব না।

প্রতারণার কথা কেন ললিতা?

তুমি কি কোনদিন মনের থেকে ভালবাস নি সরিতাকে?

সেই মুহূর্তে কোন কথা জোগাল না ইন্দ্রের মুখে। একটু পরে নিজের দুটো হাত ললিতার হাতের বাঁধন থেকে টেনে নিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়াল। জানালার ফাঁকে মুখখানা রেখে বলল আজ এই মুহূর্তে একটা সত্য তোমাকে বলি সরিতাকে তোমার চেয়ে একটুও বেশী ভালবাসি না ললিতা আবার তোমাকেও সরিতার চেয়ে বেশী ভালবেসে ফেলেছি একথা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারব না।

ললিতা বলল তার মানে দুজনকেই তুমি ভালবাস।

জানি না ললিতা একে ভালবাসা বলে কিনা তবে এ যে ভাল লাগা অসহ্য ভাল লাগা তা বলতে পারি। কাল সন্ধ্যায় অন্ধ-মুদি লেকের জলে যার পাশে বসে ভালবাসার কথা বলেছি তার সঙ্গে আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ললিতার কোন তফাৎ আমি দেখছি না আজ। বিশ্বাস কর ললিতা আমি কাউকেই প্রতারণা করি নি।

ললিতা বলল তোমার ভাবনার সঙ্গে আমার সংস্কারের হয়তো অনেক গরমিল আছে তবু তোমাকে ভাল না বেসে পারা যায় না ইন্দ্র। এই একটি দিনের ভেতর সম্পূর্ণ অপরিচিত দুজনের এত কাছে সরে আসা সম্ভব হয়েছে শুধু তোমার চার্মিং পার্সোনালিটির জন্য।

ইন্দ্র বলল আমার ভেতর যদি কোন আকর্ষণ তুমি খুঁজে পেয়ে থাক তাহলে তোমার ভেতরও আছে দুরন্ত এক আকর্ষণ। একবার তোমাকে দেখলে তোমার কাছে এলে কেউ সহজে ফিরে যেতে পারবে না ললিতা। আমি নিজেকে দিয়েই এ সত্যটুকু যাচাই করে নিয়েছি।

ললিতা বলল তা নয় ইন্দ্র চোখ সবার সমান নয়। নায়ার আমাকে যে চোখে দেখেছিল সে চোখের সঙ্গে তোমার চোখের কোন মিল নেই। তাই সে আমাকে পেয়ে হারিয়েছে আর তুমি আমাকে না পেয়েও পেলে।

ইন্দ্র হতাশ গলায় কৌতুকের সুরে বলল এ যে দুয়ার বন্ধ করে বলছ ঘরের সব ধনরত্ন তোমার।

ললিতা বলল সব ধনরত্নই তোমার তবে খোলার চাবিটা সরিতার হাতে। ও যখন ঘর খুলবে তখন তুমি দেখতে পাবে, ললিতা সরিতা হয়ে গেছে। অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু তো।

খিল খিল করে হেসে উঠতে গিয়ে মুহূর্তে তুহিন দিকে চেয়ে দু হাতে মুখখানা ঢেকে ফেলল ললিতা।

হাত বাড়িয়ে ললিতাকে ধরল ইন্দ্র। মুখ থেকে হাতটা সরিয়ে দিতেই ইন্দ্রের হাত দুটো ভিজে উঠল ললিতার চোখের জলে।

'টেরীন' কাপড় কেনা মানে— আপনার পয়সার সতিকারের সদ্ব্যবহার।

তার কারণ, আপনি যাতে পয়সা খরচ ক'রে সেরা কাপড় পান তার জন্যে আমরা কাপড় নানা ভাবে পরীক্ষা করতে কোন কসুর রাখি না। আমরা শুধু কাপড়ের ভাঁজের দাগ প্রতিরোধ করার শক্তিই পরীক্ষা করি না, কাপড়ের ঘষাঘষি সহ্য করার ক্ষমতা, কাপড় যাতে কুঁকড়ে না যায় তার পরীক্ষা, আরও অনেক পরীক্ষা করি আমরা। এর মধ্যে যে-কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে কাপড়ে 'টেরীন' ট্রেডমার্ক পড়ে না।

আমরা কাপড় বিশেষভাবে পুঙখানুপুঙখ পরীক্ষা করি বলেই আপনি 'টেরীন' ট্রেডমার্ক লাগানো একমাত্র বাছাই বাছাই কাপড়ই পান। এসমস্ত কাপড় তৈরী করেছে কয়েকটি নির্বাচিত উৎকর্ষ সচেতন মিল—সেই সব মিল যারা ডিজাইন আর বুনটের ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছে নতুন রেওয়াজ আর হাল ফ্যাশানের কাপড়। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা—এসব মিলের কাপড় উত্তীর্ণ হয়েছে কঠোর গুণমান পরীক্ষায়—আমাদের।

কাপড়ে 'টেরীন' ট্রেডমার্ক দেখে নেবেন— আপনারই স্বার্থে।

TERENE

®'টেরীন'—কেমিক্যালস অ্যাণ্ড ফাইবার্স অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড-এর (ক্যাফি) রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

CHAITRA-CAFI-458 BEN

সরিতা কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে ইন্দ্রের গায়ে মৃদু ঠেলা দিয়ে বলল, তোমার কি হয়েছে বলতো? আম্মাওয়নের বাড়ী থেকে বেরিয়ে অবধি মুখে কথা নেই।

ইন্দ্র বলল, এখানে না আসাই বোধহয় ভাল ছিল সরিতা। ফিরে গিয়ে একটু ও কাজে মন বসবে না। তুমি থাকবে স্বপ্নময় চোখে চোখে আর আমি এই দু' একটা দিনের স্মৃতি নিয়ে যন্ত্রণায় কাটাব।

সরিতা ইন্দ্রের থাই-এর ওপর হাত রেখে বলল, তুমি দারুন সেন্টিমেন্টাল ইন্দ্র। সবকিছুকে বেশ স্পোর্টিংলি নাও না কেন? আমরা তো আর হারিয়ে যাচ্ছি না।

একটু থেমে ইন্দ্রের হাঁটুতে চাপ দিয়ে বলল, আমরা অনেক কাছে সরে এসেছি, তাই না ইন্দ্র?

ইন্দ্র তাকাল সরিতার দিকে। মুখে একটুখানি হাসি ফুটিয়ে বলল, খুব কাছে সত্যি এসেছি কি? একেবারে দুজনে মিলে যাকে বলে এক হয়ে যাওয়া।

ইন্দ্রের থাই-এর ওপর তিন চারটে কীল মেরে সরিতা বলল, তুমি ভীষণ অসভ্য হয়ে গেছ ইন্দ্র। মনে হচ্ছে, এরপর মালিককে আর তেমন মান্য করে চলবে না।

ইন্দ্র গাড়ীতে স্পীড দিয়ে বলল যে ডালে বসে আছি সে ডালটাই কাটব, অন্তত এমন বোকা আমাকে ভেব না সরিতা।

ইন্দ্রের বাঁ হাতে নিজের গালটা চেপে রেখে সরিতা বলল, বড় কষ্ট হচ্ছে ললিতার জন্য, তাই না?

এমন আকস্মিকভাবে প্রশ্নটা করে ফেলল সরিতা যে হঠাৎ কোন কথা জোগাল না ইন্দ্রের মুখে। মনে হল যেন চারদিকে আগুন, পালাবার কোন পথই নেই।

ইন্দ্রকে চুপচাপ থাকতে দেখে সরিতা বলল, বিলিভ মি, আমি কিছু মনে করিনি।

গাড়ীটা থামিয়ে ইন্দ্র সরিতার একখানা হাত নিজের হাতের ভেতর ভরে নিয়ে বলল, তোমার কাছে অপরাধ করেছি, ক্ষমা চাইবার মুখ নেই আমার।

সরিতা খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, তুমি এমন আপসেট হয়ে পড়ছ কেন, ডিসকাস করে ললিতার মত একটি মেয়ের কাজ-লাভ এলে সহজে কারু পক্ষে ফেরা কি সম্ভব! এটুকু সাধারণ জ্ঞান আমার আছে ইন্দ্র।

ইন্দ্র কাতর গলায় বলল তুমি যদি জানতে তাহলে এমন করে একা তার কাছে আমাকে ফেলে দিয়ে গেলে কেন?

হাসল সরিতা। বলল, একটা পরীক্ষা করা হল। পরীক্ষায় বসলে অভিজ্ঞতা হয়, জ্ঞান বাড়ে। পাশ ফেলের প্রশ্নটা এখানে টানা উচিত বলে মনে করিনি।

ইন্দ্র বলল, আমি চঞ্চল হয়েছিলাম সরিতা, কিন্তু এমন কিছু করিনি যাতে ফেরা যায় না।

সরিতা বলল, তুমি কতদূর এগিয়েছ আমি তো তা জিজ্ঞেস করিনি। ভালবাসার দু' একটা কথা বলতে পার, আবার দেহসম্পর্কের একস্ট্রিমেও যেতে পার, ও দুয়ের গায়েই কিন্তু সমান। উপেক্ষা করলে দুটোকেই করতে হয়, আবার দাম দিলে দুটোই কিন্তু সমান দামী।

ইন্দ্র চুপচাপ সরিতার দিকে চেয়ে আছে দেখে সরিতা বলল, ভালবাসা একটা খেলা ইন্দ্র। কখনো হার, কখনো জিৎ। খেলার ভেতর কখনো মন বসে যায়, আবার কখনো বা বারে বারে ভুলের জালে জড়াতে হয়। খেলোয়াড়কে সব সময় সব পরিস্থিতির জন্যে তৈরী থাকতে হয়।

ইন্দ্র সরিতার হাতখানা জোরে চেপে ধরে বলল, প্লিজ সরিতা, আমাকে বরং শাস্তি দাও, কিন্তু এ ধরনের নিরাসক্ত মন্তব্য করোনা।

সরিতা হেসে বলল, আচ্ছা ও কথা থাক, এখন বলতো দেখি, ব্যাপারটা আমি কি করে জানলাম?

ইন্দ্র সহজ হল, ললিতা কিছু বলে থাকবে।

তাহলে তুমি খুব বুঝেছ ললিতাকে। বিশ্বাস কর, ও বিশ্বাসঘাতকতার কোন কাজই করেনি।

ইন্দ্র বলল, আর ও তোমার সঙ্গেও কোনরকম প্রতারণা করেনি। যদি ও তোমাকে ঠকাতে চাইত, তাহলে ও গতরাতে অনেকখানি এগিয়ে আসতে পারত। ও তোমার বন্ধুত্বের মর্যাদা রেখেছে সরিতা।

সরিতা দারুণ একচোট হেসে নিয়ে বলল, ললিতা কি তোমাকে উকিল নিযুক্ত করেছে নাকি? এতক্ষণ তার পক্ষ নিয়েই সওয়াল করে যাচ্ছ।

ইন্দ্র চুপ করে রইল দেখে সরিতা বলল, আচ্ছা তোমরা দুজনে এত বোকা কেন বলতে পার!! শোন, আমি ওর ঘরে ঢুকে প্রথমেই দেখলাম ওর স্বামীর ফটোটা যেখানে থাকত, সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তারপর চোখ পড়ল পাশের ঘরের দিকে। বালিশের নীচ থেকে আধখানা সিগারেটের প্যাকেট উঁকি দিচ্ছে। বুঝলাম, তুমি কাল রাতে আম্মাওয়নের ঘরেই শুয়েছিলে।

তখনই মনে হল কিন্তু কেন বাইরের ঘর থেকে ইন্দ্র এখানে শুতে এল কেন।

তারপরেই চোখ পড়ল, জানালার এপার ওপারে ছড়িয়ে পড়ে থাকা নানারঙের কতকগুলো গোলাপের ওপর। এ যে তৃষ্ণির সংগ্রহ করে আনা গোলাপের খেলা নয় তা বুঝতে একটুও কষ্ট হল না। তাহলে একটিও আসত থাকত না আর বহু রঙের গোলাপেরও আমদানী হত না।

সবশেষে চলে আসার আগে আমার অনুমান সত্য হল। বাইরের ঘর ললিতাকে সন্তর্পণে দৌড়ে যেতে দেখলাম। মিনিট দশেক পরে ও যখন ফিরে এল তখন ওর চোখ দুটো টকটকে লাল। বুঝলাম, অনেক শোক বুকে নিয়ে ও তোমার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

ঐ অবস্থায় ও আমাকে থেকে যাবার জন্যে অনুরোধ করল আর সঙ্গে সঙ্গে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। এরপর নিতান্ত তুচ্ছি ছাড়া আর কারো পক্ষে ব্যাপারটা বুঝে নিতে কি খুব অসুবিধে হয় ইন্দ্র।

ইন্দ্র বলল, একটুও মিথ্যে নেই তোমার অনুমানে, তবু বলব ললিতা অসাধারণ সংযমী মেয়ে। তার স্বামীর যে মৃত্যু হয়নি, সে যে একটি প্রতারক, এ খবরটুকু পাবার পরই সে ঘর থেকে মিঃ নায়ারের ফটোটা সরিয়ে ফেলেছে।

সরিতা বলল, তাও আমি জানি। আম্মাওয়ন কাল রাতে আমাকে সেকথা বলেছেন। তুমিও যে ব্যাপারটা জান, সেটা তাঁর মুখ থেকেই শুনেছি। কিন্তু ললিতাকে তিনি এ বিষয়ে কোন কথাই বলেন নি। তাই ফটোটা ওর ঘরে নেই দেখেই বুঝেছিলাম, তুমি কোন এক অবসরে ওকে ওর স্বামীর কথা বলেছ। মিঃ নায়ার সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ওর মন স্বাধীন হয়ে গেছে। তখন যে কোন সূত্র ধরেই হোক, তোমাদের মিলতে অসুবিধে হয়নি।

ইন্দ্র বলল, আমার ইচ্ছার আগুনে ওকে টানতে চেয়েছিলাম সরিতা কিন্তু ও তোমার বন্ধুত্বের মর্যাদা নষ্ট করে রাতে ওর ঘরের দরজা আমার জন্যে খুলে দেয়নি।

সরিতা বলল, আবার বলছি ইন্দ্র আমি তোমাদের এই অ্যাফেয়ারটাকে খুব স্পোর্টিংলি নিয়েছি। আমার মনে এখন একটুও যন্ত্রণা নেই। আর আমি তোমার চেয়ে অনেক ভাল করে জানি ললিতাকে। মানের দিক থেকে ও অনেক বড়। সাময়িক উইকনেস আসতে পারে কিন্তু তাকে জয় করতেও ওর বেশী সময় লাগে না।

ইন্দ্র বলল, এখন থেকে একটি মানুষ তোমার কাছে সন্দেহের পাত্র হয়ে রইল।

সরিতা এবার ইন্দ্রের হাতখানাকে বুকে জড়িয়ে ঠোঁট ছুঁইয়ে আদর করতে করতে বলল, আমি ঈশ্বরপুত্র ক্রাইস্টকেও চাই না আর গার্ডেন অফ ইডেনের স্যাটানাকেও চাই না। আমি চাই তোমার মত একটি মানুষ। যার দুরন্ত পাগলামি আছে যে ভুল করে, আবার ভুল স্বীকারও করে নেয়। তুমি যদি নিজের ইচ্ছায় না চলে যাও আমি তোমাকে কোনদিনও ছাড়তে পারব না ইন্দ্র।

সরিতাকে একটা ছোট পাখির মত বুকের ভেতর জড়িয়ে নিয়ে আদর আদর ভরে দিতে দিতে ইন্দ্র বলল তোমাকে যদি আমি কোনদিন ডিসিড করি তাহলে জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ থেকে আমি বঞ্চিত হব সরিতা।

(ক্রমশ

তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা গানের আজ যত দুর্দিনই আসুক—তার স্থায়িত্ব চিরায়ত হতে পারে না। রাত্রির অন্ধকার অনেক সময় অসহনীয় মনে হয়। কিন্তু এ অন্ধকারও কেটে যায়। ওঠে ভোরের সূর্য।

একালের ও গান

নাম আর মানুষ মিলেমিশে যেখানে একাকার এমনই ব্যক্তিত্ব হলেন তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তারুণ্য শুধু তাঁর গানেই নেই। আছে চেহারা হাবভাব কথাবার্তা চাল-চলন সব কিছুতেই। সবসময় যেন আনন্দে উচ্ছল হয়ে রয়েছেন। সেই উচ্ছলতার ঢেউ অথবা খুশির জোয়ার হাওয়ার মতই ছড়িয়ে পড়ে তাঁর আশেপাশে যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যেও। শিশুর মত সরলতায় তাঁর জুড়ে। সহজ সরল বিনম্র এবং সব মিলিয়ে ভারী স্মার্ট।

ওঁর সঙ্গে গান-বাজনার আলোচনা করতে খুব ভালো লাগছিলো ওঁর খোলা-মেলা মতামত মুক্ত হাওয়ার মতই মনকে জুড়িয়ে দেয়। সরল বলেই নির্ভীক এবং আন্তরিকতার কারণেই স্পষ্টবাদী।

'জনেন সন্ধ্যাদি' এখনকার গানের আবেদন এত ক্ষণস্থায়ী কেন? অনেকে দোষ দিয় লাভ নেই। এর জন্য দায়ী আমরা, আর বিবিধ ভারতীতে হরদম আজেবাজে হিন্দী গান বাজাবার বেওয়াজ। শ্রোতাদের রুচি বিকৃত হয়ে পড়েছে এই দুটি কারণেই।

নই ল আগেকার তুলনায় গান-বাজনা শেখবার পরিবেশ এখন কত অনুকূল শেখবার সুযোগও বেশি কত পাড়ায় পাড়ায় গানের স্কুল— উপরন্তু শিক্ষাকেন্দ্র এমন কি মিউজিকে শিক্ষাবিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রী পাবার পথও প্রশস্ত। তবু কই? সেরকম কোনো যুগান্তকারী অগ্রগতির যুগ ত বাংলা গানের ক্ষেত্রে এলো না? বা গ্রামের মানুষ যেমন মুগ্ধ বিস্ময়ে রাজধানীতে এসে রাজবাড়ীর দিকে তাকিয়ে থাকতো (ছোটবেলায় গল্পের বই-এ পড়েছি)— আমরা আজকের শিল্পীরাও তেমনি কবেই যেন তাকিয়ে থাকি সংগীতের অতীত গৌরবের দিকে। পঙ্কজ মল্লিক কৃষ্ণচন্দ্র দে দিলীপ রায় শচীন দেববর্মন সায়গল কানন দেবী শৈল দেবী সুপ্রভা সরকার ইলা ঘোষ যূথিকা রায় রেণুকা সেনগুপ্ত এবং তারও পরের সঙ্গে ধনঞ্জয় হেমন্তদা জগন্ময় মিত্র উৎপলাদি কি দর্জাক্ষ সব শিল্পী বলুন ত? আর কি সব গান? যেমন তার কথা তেমনই সুর।

এর কারণ? আমার কি মনে হয় জানেন সন্ধ্যাদি? তখনকার দিনে গান শেখবার, গাইবার বাধা ছিল অনেক। কোনো ছেলে স্কুল কলেজে পড়তে পড়তে গান গাইলেই তার অভিভাবক ভয় পেতেন; ভাবতেন ছেলেটা বাঁয়ে গেলো। তাই গান গাইবার ইচ্ছে থাকলেও কেউ চট করে গাইবার সাহস পেতো না বড়দের নজর এড়িয়ে ধূমপান করার মতই লুকিয়ে-চুরিয়ে গান গাইতো।

কিন্তু এর অন্যদিকও আছে। বাধা ছিলো বলেই সত্যিকারের সংগীতোপাসনার আগ্রহ ছিলো এত দুর্বার এবং যাঁরা তাদের উৎসাহ দিতেন তাঁদের সংগীতের প্রতি অনুরাগ ছিল এতই নিখাদ যে নিষেধের প্রাচীর ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে যাঁরা সুরের ঝর্ণা ঝরাতে পেরেছিলেন তাঁরা সবাই সত্যিকারের শিল্পী হয়ে উঠতে পেরেছেন। এখন বিনা আয়াসে সামান্য ব্যয়ে গান শেখবার সুযোগ আছে এবং অল্প একটু শিখেই মঞ্চে গাওয়া ইত্যাদি অত্যন্ত সহজ সাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠেছে বলেই সাধনার সেই একাগ্রতা খোঁজার ব্যাকুলতা এখনকার শিল্পীদের মধ্যে নেই। প্রতিভার অভাব নেই। কিন্তু মেড-ইজি যুগের শিল্পীদের নেই চিন্তার অবকাশ এবং সেই কারণে না সম্ভবতঃ প্রতিভার যথার্থ বিকাশ হতে পারে না।

আমার মামার বাড়ী ছিলো প্রগতিশীল সে যুগেই ও বাড়ীতে গান-বাজনার রীতি মত চর্চা ছিলো। মা সুন্দর রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন এবং শিক্ষিত কণ্ঠে। বাবা ও মা মধ্যে একটা ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং গড়

উঠেছিলো গান-বাজনার ক্ষেত্রে। হয়তো বাবার মত অনুরাগী শ্রোতাই ছিলেন মার সংগীত প্রেরণার উৎস। ছোটোবেলার অনেক স্মৃতির মধ্যে একটি স্মৃতি আজও মনের মধ্যে মিষ্টি একটি ছবি হয়ে আছে। আমাদের বাড়ীতে বসত প্রতিদিনের সান্ধ্য আসর। সারাদিনের কাজ-কর্মের শেষে মা গাইছেন আর বাবা বসে তন্ময় হয়ে শুনছেন।

মাকে হারালাম খুব ছোটোবেলাতেই। আর বাবা কেন বুকভরা স্নেহ নিয়ে এগিয়ে এলেন সে অভাব ভোলাতে। মার গান ও গানের করুণ কোমল স্মৃতিকে আমার সত্তার সংগে মিশিয়ে দিয়ে বাবা আমারই মধ্যে যেন ওঁদের দুজনের গানের স্বপ্নকে জাগিয়ে রাখতে চাইলেন। বাবা আমায় ছোট্ট বয়সেই একটি হর্মোনিয়ম কিনে দিয়েছিলেন। চিনিয়ে দিয়েছিলেন সারে গামার পর্দা। একটু বড় হতেই (আমি যখন পনের বছরের) আমার গান শেখাবার জন্য গুরু রাখলেন। আমি শিখতে সুরু করলাম ননীগোপাল আচার্যর কাছে। শিখেছিলাম দশ বছর ধরে।

ভাবতে পারেন সন্ধ্যাদি? পনের বছর বয়স। যে সময়টা অভিভাবকরা ছেলেদের পড়াশোনার দিকেই কড়া নজর রাখেন সেই সময়ে বাবা আমায় সংগীত শিক্ষকের হাতে সমর্পণ করলেন। গান-বাজনাকে তিনি কত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং সেই আরাধনার ভাবকে কত নিষ্ঠার সংগে লালন করতেন উনি রোজ নিজে বসে থেকে আমায় রেওয়াজ করাতেন। কোনোদিন যদি রেওয়াজে ফাঁকি দিতাম খাওয়া বন্ধ করে দিতেন। আমার প্রতি খুব স্নেহপ্রবণ হলেও এদিকে খুব নির্মম ছিলেন। আর তখনকার গুরুরাও ছিলেন সত্যিকারের সাধক এবং শিষ্যদেরও কি করে সেইভাবে গড়ে তুলবেন এইটেই ছিলো তাঁদের ধ্যান-জ্ঞান আর জপমন্ত্র। আমার গুরুর সদাসজাগ দৃষ্টি থাকতো যেন আমার শিক্ষায় কোনো গলদ না থাকে।

তারপর অল বেংগল মিউজিক কম্পিটিশনে খেয়াল ও ঠুংরিতে ফার্স্ট হতে সংগীতসমাজের সবাই নামটা জানলেন। তখন ত এত রেডিওতে প্রোগ্রাম করা বা ফাংশনের চল ছিলো না? এই সব কম্পিটিশনেই নিজেদের দক্ষতা দেখিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হোতো। আর রেডিওয় গাইবার কথা তখন স্বপ্নেও মনে আনতে পারিনি। কারণ গান গাইতাম গানকে ভালোবাসতাম বলে। গাওয়ার আনন্দেই মন ভরে থাকতো।

রেডিওর সংগে যোগাযোগ তাহলে হোলো কেমন করে?

১৯৪৬ সালে রেডিওতে একটা প্রোগ্রাম করবার আমন্ত্রণ পেলাম। কিন্তু ঐ একবারই একটা ফিচার প্রোগ্রাম (স্লেট আর সিংগ টুগেদার) —গাইবার পরই বহুদিন বন্ধ হইলো। ওধার থেকে আর কোনো সাড়া শব্দ পেলাম না। তারপর প্রথম স্বাধীন প্রোগ্রাম করলাম ১৯৪৭ সালে। ১১-৪৫-এর সময় দুর্গা সেনের সুরে 'গগনে ছিলো মোর গগন ঘনঘোর'। বাংলা গান? হ্যাঁ দুর্গা সেনের কাছেই বাংলা গান শিখতে সুরু করেছিলাম। অনুপম ঘটকের কাছেও শিখতাম। ননীবাবুর তিরোধানের পর গিরিজাবাবুর কাছে ক্লাসিক্যাল শিখতে সুরু করেছিলাম।

এই সময়ের একটা ঘটনা আজও সুখ-স্মৃতি হয়ে আছে। একদিন রাত ১১টার প্রোগ্রাম শেষ করে ফিরছি। স্টুডিও থেকে বেরিয়ে দেখি তিনজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন। এঁরা হলেন হেমন্ত মুখার্জি অজিত চ্যাটার্জি ও জহর রায়। তিনজনেরই তখন দারুন নামডাক। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় যখন কাছে এসে পিঠ চাপড়ে বললেন 'খুব ভালো গলা তোমার' আমি এমন অভিভূত হয়ে পড়ছিলাম যে কোনো কথা বলতে পারিনি। অজিত চ্যাটার্জি জিজ্ঞেস করলেন কোথায় থাক বললাম হাওড়া।

হেমন্তবাবু বললেন—ছেড়ে দে বেচারাকে। অনেক দূর যাবে।

পঙ্কজদার স্নেহ পাবারও সৌভাগ্য হয়েছিলো উনি ফিচার প্রোগ্রামে আমার কোরাস গাইতে নিয়েছিলেন। সর্বপ্রথম প্লে-ব্যাক গেয়েছি বিন্দুর ছেলের হিন্দী ছোটি মাতে। সে সুযোগও ওঁর কাছেই পাওয়া। তখন রেডিওর মাধ্যমে শ্রোতাদের কত চিঠি যে পেতাম। সেসব চিঠি আসতো যেন প্রেরণার উৎস হয়ে। এখন রেডিও থেকে সেসব পাট উঠে গেছে। ওরা বোঝেন না শিল্পীরা এত কত উৎসাহিত হন।

ছোটি মা ছবিতেই প্রথম প্লে-ব্যাক করেছি সে তো বললামই। রেকর্ড হয়েছে তারও আগে ১৯৪৯ সালে। আমার এক আত্মীয়র সংগে গ্রামোফোন কোম্পানীর যোগাযোগ ছিলো। তিনিই রেকর্ড করবার প্রস্তাব করলেন। বাবা প্রথমটায় একটু ইতস্তত করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিলো আমি ক্লাসিক্যাল গানের চর্চায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করি। গান আমার পেশা হয়ে উঠুক উনি সেটা একেবারেই চাননি। তাই হোক আমার প্রবল ইচ্ছে দেখে উনি রেকর্ড করবার অনুমতি দিয়েছিলেন।

পড়াশোনা শেষ করে আমি চাকরীতে ঢুকলাম। কিন্তু সারাদিন অফিসে আনকটা সময় যেতো বলে গান-বাজনার বড় ক্ষতি হচ্ছিলো। এবং এই কারণেই চাকরীতে ইস্তফা দিলাম।

গানকেই পেশা করতে চাইলাম। কারণ শুধু গান নিয়ে থাকতে হলে এ ছাড়া কোনো উপায় ছিলো না। বাবা বুঝলেন সে কথা। উনি আমার ইচ্ছায় বাধা দেননি। শুধু সাবধান করে দিলেন? পথের একদিক যেমন সংগ্রামের মালো বিবাট সাফল্য অন্য দিক ঠিক তেমনই অসমতল এবড়ো খেবড়ো। পথে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবার ভয়ও রয়েছে প্রতিপদেই। এই কথাটি মনে রেখে সাবধানে চলো।

বাবা ছিলেন আমার গানের সবচেয়ে অনুরাগী শ্রোতা এবং নিরপেক্ষ সমালোচক। আমি প্রতিবার রেডিও প্রোগ্রাম করে এসেই তাঁর সামনে দাঁড়াতাম তাঁর মতামতের জন্য।

খুব সম্ভব ১৯৪৯ থেকে ৫০ সালেই আমি শৈলেশ দত্তগুপ্তর সুরে একটি কাহিনীগীতি রেকর্ড করলাম। পুজোর দুটি ট্রাইটেল দিয়েছে শৈলেশ দত্তগুপ্তর সুরে কথা শ্যামল গুপ্ত। সেন্টিমেন্টাল সং বলেই বোধহয় এত জনপ্রিয় হয়েছিলো। ঐ একটি গানেই আমি প্রতিষ্ঠা পেলাম।

গ্রামোফোন কোম্পানীতে আমার রেকর্ডিং-এ অডিশন নিয়েছিলেন কমল দাশগুপ্ত নিমেষ ঘোষ। ঐ বিভাগের কর্তা ছিলেন ধীরেন দাস। হিন্দী গান রেকর্ড করবার আগে উচ্চারণ শিখে নিতাম মাস্টার সাহেবের কাছে। স্বয়ংসিদ্ধা ছবির হিন্দী ভার্সনে আমি প্লে-ব্যাক গেয়েছিলাম।

কোনো বিশেষ ধরণের গান নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে আমি সবরকম গানই গাইতাম যাতে আমার গানে কোনো মানারিজম এসে না পড়ে। এমন কোনো সুরকার অথবা গীতিকার নেই যাঁর কথা ও সুরে আমি গাইনি। আমার বাবার নির্দেশ ছিলো মনকে সবরকম গোঁড়ামি থেকে মুক্ত রাখতে হবে। কোনো গানের সম্বন্ধে বায়াসড মনোভাব যেন না থাকে। বাবার এই কথাটি আমি আজও মনে রাখি। সকল শিল্পী ও গানের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে।

কমল দাশগুপ্তর সুরে ঝুমঝুম ঝুম গেয়েছি। ওঁর ট্রেনিংএ হিন্দী ছবিতে প্লে-ব্যাকও করেছিলাম রবীনদা (চ্যাটার্জির) সুর সহাদর; দ্বীপের নাম টিয়ারং; জলেজঙ্গলে ছবিতে গান গেয়েছিলাম। রবীনদার শেষ ছবি দুরন্ত জয় ছবিতেও গেয়েছি। গ্রামোফোন কোম্পানীতে অধীর সেন শ্রীরাধার মানভঞ্জনের বিষয়বস্তু নিয়ে একটি এল-পি ডিস্ক করেছিলেন। তাতে আমরা সবাই (এখনকার সমসাময়িক শিল্পীবৃন্দ) গেয়েছি।

রবীন্দ্রসংগীতের ওপর আমার নিজের অসম্ভব একটা দুর্বলতা আছে। যখনই সুযোগ পাই গাই। যে কোনো আসরেই গাই না কেন একটি রবীন্দ্রসংগীত আমার অনুষ্ঠান তালিকায় থাকবেই। রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড? তা আছে কয়েকটি সুবিনয় রায়ের ট্রেনিং-এ আজি দখিন দুয়ার খোলা; গ্রামছাড়া ঐ রাঙ্গা মাটির পথ রেকর্ড করেছি। নীহারবিন্দু সেনের ট্রেনিং-এ বাদল ধারা হোলো সারা আজি বরিষণ মুখরিত। রবীন্দ্র সেন্টিনারীতে সুচেতাবাবুর (সেনগুপ্ত) ট্রেনিং-এ বিরহ মধুনী আমি যেন তার ও আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। সুধা গুপ্ত ও কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের সংগে আলাদা আলাদা পৃথক পৃথক ধারা সারে রেকর্ড করেছি।

এই রবীন্দ্রসংগীতের প্রসংগেই একটি ঘটনা মনে পড়ে। একবার রেডিওতে বারের সিটি-এ যা পেয়েছি প্রথমদিনে শেষ বাড়ী ফিরেই গেলাম পঙ্কজদাবুর কোন এটা 'পূজা' শেষ পর্যায়ের গান। এখন এ গান তুমি গাইলে কেন? বুঝিয়ে দাও।

সংগে সংগেই মুখ দিয়ে উত্তরটা বেরিয়ে এলো পঙ্কজদা আমি যখন জন্মেছিলাম মা-বাবা ছাড়াও আত্মীয়-স্বজন পরিচিত সবার কাছেই প্রাণঢালা স্নেহ ভালবাসা পেয়েছি। স্নেহ পাওয়ার সেইসব মানুষ-গুলো এখন নেই। স্নেহের সেই মধুর স্মৃতিও আমি বিসর্জন দিয়েছি। তাই গানের সুরে এই পৃথিবীকেই রাখলাম—পৃথিবী থেকে চলে যাবার সময় সেই স্নেহমাখা মুহূর্ত-গুলি যেন আমার বিদায়কালের অঞ্জলি পূর্ণ করে দেয়। পঙ্কজদা খুশী হলেন আমার ব্যাখ্যা শুনে। বললেন—বেঁচে থাক।

সন্তোষদার পরিচালনায় শ্যামা নৃত্যনাট্যে কোটালের গান গেয়েছি। রবীন্দ্রসংগীত আমি শিখেছি জর্জদার কাছে। কণ্ঠ এক্সপ্রেশন—সবদিক দিয়ে জর্জদাকেই আমি শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে মনে করি।

নজরুলের গানের একটা আলাদা রস আছে। হৃদয়বেগের দরদ প্রকাশ। নজরুলের গানও আমি রেকর্ড করেছি ধীরেন দাসের ট্রেনিং-এ। আজ ভারতের নব যাত্রাপথে দুই দোল উদ্দ গজলও গেয়েছি মালেক সাহেবের সাজেশন এ বিষয়ে আমার খুব সহায়ক হয়েছে।

তখনকার গান —এখনকার বিদগ্ধ শ্রোতাদের কাছেও মহামূল্য বস্তুর মতই। কিন্তু এখনকার গান মনের মধ্যে সে আবেশ সৃষ্টি করতে পারে না কেন —

এ বিষয়ে আমিও আপনার সংগে একমত। তখনকার গানের কথা ও সুরের গভীরতা থাকতো। কারণ তার জন্ম রচয়িতা ও সুর স্রষ্টার উপলব্ধি থেকে। তাদের গানে ছিলো না অর্থোপার্জনের আয়োজন। কারণ এ ছিলো তাদের ধ্যানের ধন।

আর তখনকার ট্রেনার বা সংগীত পরিচালকও ছিলেন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন। কোন শিল্পীর কণ্ঠে কোন গান মানাবে সে সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন ছিলেন। শিল্পীর বৈশিষ্ট্য ও শক্তিকে তারা কাজে লাগাতে জানতেন। এখন? শিল্পীর চেয়ে বড় হচ্ছে অর্কেস্ট্রা। সুদক্ষ অর্কেস্ট্রেয়ান হ্যান্ডস-দের দাম অনেক বেশী। কারণ গাইবার দোষ-ত্রুটি তাঁরা বাজনার চটক ভুলিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু তখনকার গানে শিল্পীই ছিলেন প্রধান। সুরের ধারাকে অনাহত রেখে শিল্পীর মেজাজ তৈরী করার জন্য যতটুকু অর্কেস্ট্রার প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই ছিলো তার ভূমিকা। তার চেয়ে শিল্পীর কণ্ঠকেই সেইভাবেই নিজেকে তৈরী করতে হোতো।

অনেকে আমার ওপর বিরক্ত হবেন জানি একটা কথা না বলে পারছি না। আধুনিক গান যতদিনই উন্নতমানের ছিলো ততদিন গ্রামোফোন কোম্পানী বিশেষ যত্ন নিয়ে বাংলা গানের সমৃদ্ধ ধারাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। এখন তাঁদের মনোযোগের প্রায় সবটাই দখল করে আছে বাণিজ্যিক দিকটি তথা হিন্দী গানের পৃথিবীব্যাপী চাহিদা পূর্ণ করা বিষয়টি।

বাংলা গানের কি অবস্থা? কিছু গীতিকার কিছু সুরকার কিছু সংগীত পরিচালকের পিছনে সবাই ছুটছেন। কেন? না অমুক অমুক ছবিতে এঁদের গান হিট করেছে।

তখনকার দিনের সে ভাষ্টনেস ডি এল রায় অতুলপ্রসাদ নজরুল রজনীকান্ত থেকে সুরু করে সুবিনয় সুধীরলাল কমল দাশ-গুপ্ত রবীন চ্যাটার্জি দুর্গা সেন নির্মল ভট্টাচার্য কালীপদ সেন প্রণব রায় বাণী-ঠাকুর অজয় ভট্টাচার্য অনিল ভট্টাচার্য আর কত নাম করব—এখন কই।

তাছাড়া তখন প্রায় সারা বছর ধরেই বাংলা গান রেকর্ড হোতো। শিল্পীরা তাতে নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ পেতেন। এখন বছরে একবার (পুজোর সময়) আধুনিক গানের রেকর্ড হয়। যদি সে রেকর্ড ভালো সেল না দেয় শিল্পীর শিল্পীজীবনের ইতি। তাই ইচ্ছে থাকুক না থাকুক কমার্শিয়াল সাকসেসের মুখ চেয়ে শিল্পীকে কিছুটা জনরুচির সংগে কমপ্রো-মাইজ করতে হয়। শ্রোতাদেরও সৌন্দর্যের প্রতি সে ঐকান্তিক ভালবাসা নেই এবং তার জন্য দায়ী আমরা যাঁরা তাঁদের সেই ভালবাসাকে আঘাত দিয়েছি অনবরত নকল করা পপ-সুরের হুল্লোড় তুলে।

প্রথমেই বলেছি এখনকার রুচিবিকৃতির একটা মস্তবড় উৎস হোলো বিবিধ ভারতীতে হরদম হিন্দী ফিল্মের গানের প্রচার। একবার দিল্লীতে একটা চ্যারিটি শোতে গিয়েছিলাম। তখন আমরা সব শিল্পীরা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর (সময়কার বেতার মন্ত্রী রঙ্গরাজন) কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম বিবিধ ভারতীতে যেন বাংলা গানও প্রচার করা হয়। তিনি আমাদের কথার যৌক্তিকতার সাধুবাদ জানিয়ে-ছিলেন। কারণ তিনি একজন অসাধারণ বিদগ্ধা মহিলা।

এখন? যদি গ্রামোফোন কোম্পানী একটু মনোযোগী হন বাংলা গানের পক্ষে সেই হারানো স্বর্ণযুগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু এঁরা যে ঝুঁকি নিতে চান না। কোনো বাংলা গানের রেকর্ডের একবার প্রিন্ট ফুরিয়ে গেল তো একেবারেই ডেড স্টক অফ মার্কেট হয়ে গেলো। সে গান আর ফিরে হবে না। কিন্তু হিন্দী গানের ক্ষেত্রে এই ভয় নেই। কারণ গ্রামোফোনী বিক্রি নিতে নারাজ। আবার প্রিন্ট করলে যদি সে ডিমান্ড না থাকে?

সতি বারের ভালো গানের প্রতি আমার এই আকর্ষণের কারণ? প্রথমজীবনে আমার বাবার শিক্ষা এখনকার জীবনে আমার স্বচ্ছ মার্জিত রুচি প্রকৃতি এবং গানের প্রতি অনুরাগ। আমার যত প্রোগ্রাম থাক কাজ থাক ও আমাকে প্রত্যেকদিন রেওয়াজে বসাবেই। আর পুরো একখানা খেয়াল আলাপ বিস্তার বিলম্বিত দ্রুত ওকে গেয়ে শোনাতে হবে। শ্রোতা হিসেবে ও আমার গানের চড়া সমালোচক। এতটুকু এদিক-ওদিক হলেই টুকবে।

বহুদিন আগে স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকে শুনেছিলাম আপনার একটি হিট সং ওগো কন্যা ঘুমাও কত আর? কয়েক বছর আগে শুনেছি কাজল নদীর জলে। গত বছরও সলিলবাবুর সুরে 'আর দেরী নয়' আমি আসছি খুব ভালো লেগেছিলো এই-জন্য যে বাংলা গানের বৈশিষ্ট্য এতে ছিলো। এবারের পুজোয় কি গান করছেন?

আলতা পায়ের আলতা ছোঁওয়ায় এবং উড়ন্ত ঐ মেঘটাকে বিশ্বাস নেই। পুলকের লেখা আপনার ভালো লাগবে।

বাংলা গানকে আগের মত সুন্দর সুস্থ রূপে ফিরিয়ে আনতে পারে তার প্রচার মাধ্যমগুলি—ফিল্ম রেকর্ড রেডিও। হারা সবু নদী, তোমারে হারাতে পারি না, আমারে ভুলিয়া যেও মনে রেখো মোর গান পাখী আজ কোন কথা কয়—এসব গান আজও মনে হয় নতুন।

সন্ধ্যাদি আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সেইসব গান আবার ফিরে আসছে। তাদের আগমন ধ্বনি আমি শুনতে পাই। শ্রোতাদের চিত্তেও রয়েছে সেইসব গানকে বরণ করার আকুল আগ্রহ। ডাউন মেমোরি লেন এল-পি ডিস্কে অতীতের সেই বিখ্যাত গাইয়েদের গান গেয়েছেন এখনকার কালের শিল্পীরা। আমি গেয়েছি স্বপন যদি মধুর এমন এবং পৃথিবী আমারে চায়। এ গানের সমাদর আমার দৃষ্টি খুলে দিয়েছে বাংলা গানের অতীত বৈভবের এবং শ্রোতাদের রুচির সম্বন্ধে। এখন বাংলা গানের যত দুর্দিনই আসুক তার স্থায়িত্ব চিরকাল হতে পারে না। রাত্রির অন্ধকার অনেক সময় অসহনীয় মনে হয়—কিন্তু এ অন্ধকারও কেটে যায়। আবার ওঠে ভোরের সূর্য।

সন্ধ্যা সেন

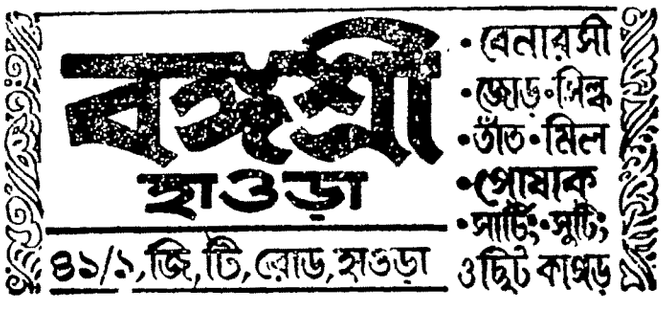

সামান্য ॥

মানস রায়চৌধুরী

আমাকে কি দেবে দাও, বৎসামান্য আলো পড়ে আছে
বৎসামান্য রঙ আছে তাতে ক্ষতি নেই—
এই কথা বলে আমি নিলাম বিদায়।
বাগানে সামান্য আছে সবুজ ওতেই ঢের হবে
তাছাড়া তাকিয়ে দ্যাখো সবুজ নেবার মত আঁচল কোথায়
পাতা, সবই বরাপাতা, চুল সবই ধবল এখন
এই কথা ভাবি যেই অমনি এক দ্বার খুলে যায়—
চলে যেতে যেতে ভাবি দুই পাশে পাথর ও গবাক্ষ
কিছু শাদা কিছু রাঙা অস্তিত্ব ও অভাবের হাত ধরে আছে
আমাকে কি দেবে দাও, আমি তো রয়েছি,
সরীসৃপ ও প্রাগৈতিহাসিক কিছু ডালপালা নিয়ে

আমি ॥

বটকৃষ্ণ দে

কখনো কখনো—তা কেন, প্রায়শই, কী যেন কী হয়
যখন আমাকে মনে হয় আমি-না, তোমাকে তুমি-না, তাকে সে-না।
চিন্তার চেহারাগুলি ঘুরে-ঘুরে গোল হয়ে ধোঁয়া হয়, মেঘ হয়
তারপর সিংহের কেশর, কিংবা উদ্ধত যুবতী, অর্থাৎ
নিরাকার থেকে আকারিত। এই সব, তা কেন, অনেক মুহূর্তেই
যখন তোমাকে তোমার মত করে ভাবতে, পেতে চেয়েছি,
তক্ষুনি,—শালিক পাখি কি ? — হঠাৎ উড়ে গিয়ে আকস্মাৎ
হয়ে গেলে তুমি-না, অমনি আমি আমি-না, সে সে-না!

এই হওয়া-না-হওয়া, বা উধাও-হওয়া, তোমার, আমার আর তার—
এই একত্বে, একাকীত্বে একাকার দূরবিস্থিত নক্ষত্রময়তায়,
বেপরোয়া, অকারণ উত্তরন ঃ কীসের পাগল!
কী সে পাগলামি, কেন মুখে রঙ মাখি, মঞ্চে উঠি,
মুহূর্তে মুহূর্তে গড়ি সংসার, চাওয়া ও পাওয়ার আকুলতায়
পরম আশ্চর্য অনুভবে, রঙীন রঙীন রমনীয়তায়—
সব ভুলে যাই, ভুলে গিয়ে হয়ে যাই নিবোধ পাগল
জীবনের প্রেমে—যখন আমি-ও আমি, তুমি-ও আমি, সে-ও আমিই।

অন্য খেলা ॥

জয়ন্তী রায়

এসো আজ অন্য কোন খেলা খেলি—
কৃষ্ণচূড়ার রঙে উজ্জ্বল দিগন্তের
উদ্ভাসিত আরনায়
মুখ দেখি সহাস্য কৌতুকে;
আবাল্য বিষন্ন চেতনায়
বড় বেশী ম্রিয়মাণ আমি,
রক্তাগত ভাবনার ঊর্ণনাভ জালে
জড়াতে জড়াতে,
পৃথিবীর সব কিছু ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ
একরোখা চিন্তায় ছড়াতে ছড়াতে
নিজেকে নিজেই এক রৌদ্রের দুপুর ক'রে
মাটির ফাটলে নগ্ন
স্থিতিহীন বৈরাগী ভীষণ ঃ
এ সোনা হঠাৎ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত হ'য়ে
বেজে উঠি নীল শূন্যে,
অথবা অবাধে সাঁতার শিখি
সুখময় হাঁসদের কাছে—
পাখায় জল না মেখে
অনায়াসে দীঘিটাকে পার হ'য়ে যাই।

চিত্রনিভা চৌধুরী

বাংলার চিত্রশিল্পী

ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও প্রস্তর কঠিন প্রাণশক্তির প্রভাবে অবনীন্দ্র শিল্প আবহাওয়ায় যে কয়েকজন মহিলা শিল্পী ক্যানভাসের বুকে রং ও রেখার আঁচড়ে তীব্র আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন চিত্রনিভা চৌধুরী তাঁদের অন্যতম। চিত্রনিভার দোসরদের মধ্যে অধিকাংশই হারিয়ে গেছেন বিস্মৃতির গভীরে। নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও একটানা প্রাণচঞ্চল সৃষ্টির অবদানে চিত্রনিভার শিল্পী-সত্তা এই তেষট্টি বছর বয়েসেও গতিশীল।

চিত্রনিভার জন্ম ১৯১৩ সালে মুর্শিদাবাদে মামারবাড়ীতে। কৈশোরের কয়েকটা বছর কেটেছে মানভূম জেলার গোমো বলে একটা জায়গায়। পিতা ভগবানচন্দ্র দাস ছিলেন রেলওয়ের ডাক্তার। তাঁর কর্মস্থল ছিল এই গোমো জেলা। একদিকে পিপড়ের সারির মত পাহাড়ের পর পাহাড়। তার গা বেয়ে অজস্র ঝর্ণা। অন্যদিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। আকাশ মাটি মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। সন্ধেবেলায় মহুয়ার গন্ধে মন মাতাল হয়ে উঠত। কোঁচড়ে করে মহুয়া ফুল কুড়িয়ে আনতেন। এই মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকেই চিত্রনিভার শিশুমনে নিসর্গ ছায়া ফেলে। এই সময় থেকেই তাঁর মনে সৌন্দর্য চেতনার উন্মেষ হয়েছিল। মনের গভীরে এই প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো এত স্থায়ীভাবে উৎকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল যে জীবনের উত্তরপর্বের চিত্রফলকে তা প্রতিফলিত হয়েছে।

পিতার মৃত্যুর পর চিত্রনিভা ফিরে আসেন মুর্শিদাবাদে মামার বাড়ীর গান, বাজনা, ছবি আঁকার পরিবেশে। মা শরৎকুমারী দেবী ভাল ছবি আঁকতে পারতেন। চিত্রনিভার দিদিও মার হাত পেয়েছিলেন। বড়দের দেখাদেখি চিত্রনিভা সানবাধানো মেঝেতে খড়ি দিয়ে কত কিছু আঁকতেন। দুইং কিছুটা রপ্ত হওয়ার পর চোখের সামনে যেসব ছাপানো ছবি পেতেন তাকেই রংয়ের বাহারে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করতেন কাগজের পাতায়।

বাড়ীতে নিত্যনৈমিত্তিক সংগীত চর্চার রেওয়াজ ছিল। চিত্রনিভা ছেলেবেলা থেকেই লাজুক প্রকৃতির। গান গাওয়া ত দূরের কথা কোনদিন কারুর সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতেন না। অভিনিবেশ সহকারে রেওয়াজ শুনতেন। পরে নিভৃতে ছাদের কোণে একা একা গাইতেন। 'ফুল তো আমার ফুরিয়ে গেছে' 'শেষ হল মোর গান' কিংবা 'দোর খোল দোর খোল ভিখিরী এসেছে দ্বারে' ইত্যাদি। গানের গলা ছিল। কিন্তু লজ্জার মাথা খেয়ে কোনদিন সবার মাঝে গাইলেন না বলে সংগীতশিল্পী হিসেবে চিত্রনিভার পরিচয় অনেকের কাছেই অজ্ঞাত। শান্তিনিকেতনে কিছুকাল সংগীতের পাঠ নিয়েছিলেন দীনেন্দ্রনাথের কাছে। দীনু-ঠাকুরের কাছে পাঠিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর কণ্ঠের মিষ্টত্ব ও সংগীত মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে। কিন্তু সেখানেও বাদ সেধেছে 'লজ্জা' নামক বস্তুটি। চিত্রনিভার সংগীত পিপাসার অতৃপ্তি ষোলকলায় পূর্ণ হয়েছে পুত্র-কন্যার মাধ্যমে। মেয়ে চিত্রলেখা চৌধুরীর সংগীত সাধনায় চিত্রনিভার অনুপ্রেরণা কাজ করছে সবচেয়ে বেশী। এই লজ্জা লক্ষ্য করে ও চিত্রাঙ্কনে মুগ্ধ হয়ে দীনু ঠাকুর এই বলে চিত্রনিভাকে আশীর্বাদ করেছিলেন—অক্ষয় অমর হোক তোমার সাধনা। বর্ণবৈখা তব নৈবেদ্য। চিত্রে উঠুক ফুটি তাঁর সাধনা।

মামার বাড়ীতে মা জ্যেঠিমাদের সংস্পর্শে এসে শিখলেন আলপনার কারুকার্য। জ্যোৎস্নারাতে তারব্রত উপলক্ষে সারা আঙিনা আলপনায় ভরে উঠত। সেইসব আলপনার ওপর চাঁদের আলো পড়ে অপরূপ ঠেকত। মাঘ মাসের ভোরের বেলায় মাঘমণ্ডল ব্রত হত। তার আলপনায় ছিল এক অপূর্ব রংয়ের খেলা। মা ঠাকুরমা দেশীয় প্রথায় নিজ হাতে রং তৈরী করতেন। ইটের গুড়ো, কাঠকয়লার গুড়ো, আবীর প্রভৃতি দিয়ে কি অদ্ভুত ছিরি তাদের রং মেলাবার কৌশল। বাড়ীতে এইসব লৌকিক ব্রত ও গ্রামীণ শিল্প থেকেও তাঁর শিল্পী সত্তা অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল অনেকখানি।

রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল এই শিল্পটির নতুন রূপ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই শিল্পকে সমস্ত উৎসবের ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ঋতু উৎসবে এখনও সেখানে আলপনার স্থান কোন মতে কম নয়। শান্তিনিকেতনে এসে চিত্রনিভা প্রভৃতি ও আলপনার ব্যবহার নতুন রূপে দেখলেন। চাল ডাল দিয়ে আবার নতুন করে আলপনা দিতে শিখলেন। পুরাতন ও নতুনের সঙ্গে মিলন হল। তাই চিত্রনিভার আলপনায় বিবিধ ধারার যথার্থ সংমিশ্রণে এক নতুন কারুকার্যের সূত্রপাত হয়েছে।

১৯২৭ সালে দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করে চিত্রনিভা চৌধুরী শ্বশুরবাড়ী নোয়াখালিতে চলে যান। কিন্তু চিত্রাঙ্কন ও আলপনার উৎসাহ দেখে স্বামী নিরঞ্জন চৌধুরী ও শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা তাঁকে এক বছরের জন্য (১৯২৮ সালে) শান্তিনিকেতনের কলাভবনে পাঠিয়ে দেন।

তখন আশ্রমের ছুটি। বোর্ডিং বন্ধ। এসব খোঁজখবর না নিয়েই চিত্রনিভা অকস্মাৎ শান্তিনিকেতনে হাজির হয়েছিলেন। 'উত্তরায়ণের' কোনাকে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়ে রবীন্দ্রনাথ চিত্রনিভার থাকার সমস্যার সমাধান করলেন। যে কয়দিন ঐ বাড়ীতে শিল্পী ছিলেন সে-কয়দিন রবীন্দ্রনাথ প্রত্যহ প্রত্যূষে ফুলের বাগানে পায়চারি করে ফেরার পথে শুভাশুভ জিজ্ঞেস করতেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আল্পনা কষিয়ে দিলেন দীনেন্দ্রনাথ ও নন্দলালের সঙ্গে। এই সুবাদে কলাভবনে ভর্তিরও ব্যবস্থা হয়ে গেল।

চিত্রনিভা দেবীর একটি শিল্পকর্ম

কিন্তু কলাভবনে গিয়ে ধাক্কা খেলেন। চিত্রাঙ্কনের স্বপ্ন প্রায় মুছে যাবার উপক্রম। সেদিনের আশা নিরাশার আলো ছায়ায় ভরা ঘটনাগুলো শিল্পী স্মরণ করলেন। স্মৃতির সুতোয় টান দিয়ে তিনি বললেন—প্রথম যখন আমি কলাভবনে ভর্তি হই তখন ছবি সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ ছিলাম। মনে করেছিলাম বিষয়টা এক বছরেই শিখে ফেলব। আমাকে বাড়ী থেকে এক বছরের জন্যেই পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কলাভবনের মাসীমা (সুকুমারী দেবী) আমাকে নিরাশ করে দিলেন। তিনি বললেন, আমরা যে কাজ দশ বছরেও শিখতে পারলাম না, তুমি এক বছরে শিখবে? তার চেয়ে তুমি বরং বাড়ী গিয়ে ঘর-সংসার কর। একথা শুনে আমি একেবারে হতাশ হয়ে পড়লাম। ক্ষুণ্ণ মনে একথা মাস্টার মশায়কে (নন্দলাল বসুকে)) জানালাম। তিনি সব কথা শুনে দ্বিগুণ উৎসাহ দিয়ে বললেন, আমি তোমাকে এক বছরেই শিখিয়ে দেব। তাঁর ঐটুকু কথার জোরেই আমার মন উৎসাহে ভরে গেল। আমি পূর্ণ উদ্যমে কাজে লেগে গেলাম। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই বুঝতে পারলাম শেখার শেষ নেই। শান্তিনিকেতনে আসার আগে নিজে ঘরে বসে যেটুকু আঁকতাম তাতেই সন্তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু শান্তিনিকেতনে গিয়ে মনে হল আমি কিছুই জানি না। এত শেখার ও জানবার আছে যা এক-জীবনে শেষ করা যায় না। এক বছরের জন্যে এসে শেষ পর্যন্ত পাঁচ বছরে কলাভবনের কোর্স শেষ করে নোয়াখালিতে ফিরে গেলাম।

কলাভবনের শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর হাতেই চিত্রনিভার শিল্পশিক্ষার হাতেখড়ি এবং ব্যাকরণগত শিল্প সাধনার সূত্রপাত। নন্দলাল শিক্ষক হিসেবে ছিলেন আদর্শ। কোনদিন কাউকে নিরাশ করতেন না। স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে চিত্রনিভা বললেন—মাস্টারমশায় কারোর ছবিতে হাত দিতেন না। অন্য খাতায় এঁকে দেখাতেন। তিনি বলতেন, 'কারোর ছবির ওপর হাত দিলে তার নিজস্ব জিনিস হারিয়ে যায়। আর একটা কথা প্রায়ই বলতেন—'প্রকৃত শিল্পী খুব কমই হয়। হাজারে একজন। যেমন হাজার হাজার সৈন্যের মধ্যে একজন সেনা-পতি থাকে। আর একবার আমাদের সবাই-কার ছবি শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় এক প্রদর্শনীতে গিয়েছিল। আমার ছবি বুপোর মেডেল পেয়েছিল বলে দুঃখ হয়েছিল। মাস্টার মশায় সেকথা বুঝতে পেরেছিলেন। একদিন বললেন—'দুঃখ কোর না। একে যাও। আমিও ত কোনদিন সোনার মেডেল পাইনি। স্টাডি করার জন্যে মাস্টার মশায় আমাদের ফল ফুল লতা পাতা পশু পক্ষীর কাছে নিয়ে যেতেন। কত যত্ন করে গল্প বলে বুঝিয়ে শেখাতেন। বলতেন, 'ওদেরও প্রাণ আছে। সেটা অনুভব করার চেষ্টা কর।' সেই থেকে সামান্য তৃণকেও তুচ্ছ করতে পারি না।

জীবন স্মৃতির পাতা ওলটাতে ওলটাতে এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালেন চিত্র-নিভা। বললেন—আমরা প্রায়ই গুরুদেবের ছবি আঁকা দেখতে যেতাম। শেষ বয়সে বেশীর ভাগ সময়েই তিনি ছবির মধ্যে ডুবে থাকতেন। সব সময়ে তাঁকে দেখেছি একটি কলম বা তুলি দিয়ে ছবি এঁকেই চলেছেন। কাগজের কোন বাছবিচার না করে। হাতের কাছে যা পেতেন ছবি আঁকার নেশায় তার ওপরই এঁকে ফেলতেন। কত সময় দেখেছি তাকে ফেলে দেওয়া খবরের কাগজের পাতায় ছবি আঁকতে।

একদিন চিত্রনিভা অলংকরণ সমন্বিত একটা ডিজাইন দেখাতে গিয়েছিলেন কবি-গুরুর কাছে। ডিজাইনের চৌকো আকৃতির ফাঁকে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা ছিল। ডিজাইন দেখে খুশী হয়ে মিনি মাস্থানের ফাঁকা জায়গায় লিখলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতাটি—যখন ছিলেম অন্ধ সুখের খেলায় বেলা গেছে। পাইনি তো আনন্দ। কবিতার শেষ প্রান্তে কবিগুরুর স্বাক্ষরের তলায় লেখা আছে ৭ই বৈশাখ, ১৩৩৮। এই মূল্য-বান পাণ্ডুলিপিটি তিনি চিত্রনিভাকেই দিয়ে ছিলেন। এখনও দেখলাম তাঁর কাছেই রয়েছে।

বসন্তকালের এক মধ্যাহ্নে শুকনো পাতা ঝরে ঝরে পড়ছে। কবির অন্তরে বিদায়ের সুর বেজেছে। তিনি তন্ময় হয়ে লিখে চলেছেন—'ঝরাপাতা গো আমি তোমারি দলে'। ঘরে ঢুকে চিত্রনিভা এ দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেলেন। কবিগুরুর ধ্যানভঙ্গ না করে সেই ভাবগম্ভীর মুখটি ধরে রাখলেন পেন্সিল স্কেচে। পরে কবিগুরু ছবিটির প্রশংসা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য চিত্রনিভার আসল নাম নিভাননী। কবিগুরু তাঁর চিত্রকলায় মুগ্ধ হয়ে চিত্রনিভা নামকরণ করেছিলেন। সেই অবধি নিভাননী হয়ে গেলেন চিত্রনিভা।

রবীন্দ্রনাথের নামকরণ সার্থক হয়েছে। চিত্রনিভা চিত্রজগতে নিজের আসন করে নিয়েছেন। কলাভবন থেকে ১৯৩৩ সালে পাস করে চলে যান ঢাকাতে সেগুন বাগান অঞ্চলে শ্বশুরের বাড়ীতে। সেখানে বাড়ীর দেওয়ালে আঁকলেন বড় বড় ওয়াল স্ক্রেস্কো। এ কাজগুলো চিত্রনিভাকে প্রচুর প্রশংসা এনে দিয়েছিল। দেওয়াল চিত্র চিত্রনে উৎসাহ পেয়েছিলেন এবং শিখেছিলেন শান্তিনিকে-তনে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর কাছে। তাঁর সঙ্গে একজোটে অনেক কাজও করেছেন। কলাভবনে কালো মাটির বাড়ীর গায়ে মাটির রিলিফ কাজ এবং শ্রীসদনের দেওয়ালে যে অনিন্দ্যসুন্দর, শিল্পকর্ম এখনও শোভা পাচ্ছে তার পেছনে চিত্রনিভার অবদান কম নয়।

এরপর নোয়াখালিতে কিছুকাল অতি-বাহিত করে পুনরায় শান্তিনিকেতনে ফিরে যান নন্দলালের ডাকে। টানা আট দশ বছর

বছর কাটিয়েছেন 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়' শান্তিনিকেতনের কোলে। বছরখানেক কলাভবনে শিক্ষকতাও করেছেন। এই সময়ে দুটি বাচ্চা নিয়ে সংসার সামলেছেন আবার সঙ্গে সঙ্গে গৃহকোণে বসে অজস্র পাস্টেল ও জলরংয়ের ছবি এঁকেছেন। পরবর্তী কালে তাঁর কাজের অবিরাম গতি এবং বৈচিত্র্য দেখে বিস্মিত হতে হয়।

জলরংয়ের কাজে অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নব্য বঙ্গীয় চিত্রশৈলীর প্রভাব চোখ পড়ে।

চিত্রনিভা চৌধুরীর ছবির বিষয় সহজ। প্রকাশভঙ্গীও সরল। চোখে দেখা বাস্তবতার হুবহু রূপান্তর চিত্রফলকে। ছবির প্রতিপাদ্য বিষয় প্রকৃতি ও জীবন। শৈশব, শান্তিনিকেতন এবং পূর্ববঙ্গের স্মৃতি ছবি হয়ে উঠেছে ক্যানভাসের বুকে। গুণটানা পালতোলা নৌকো; বিয়ের উৎসব; প্রতিমা বিসর্জন; হাটবাজার, পালাপার্বন; শ্রমিক; কৃষক প্রভৃতির জীবনকথা রূপ নিয়েছে চিত্রাবলীতে। সাঁওতাল জীবনের নানাদিকও বাঙ্ময় হয়েছে মরমী শিল্পীর দরদী তুলির টানে। সাঁওতাল বিয়ের গোটানো ছবিটি তারই একটি সুন্দর নমুনা।

পেন্সিল প্রতিকৃতি অঙ্কনেও চিত্রনিভা চৌধুরী বেশ পটু। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন মনীষীর পেন্সিল প্রতিকৃতি এঁকেছেন স্মৃতি থেকে। প্রতিটি স্কেচের ওপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষর ও তারিখ উল্লিখিত হয়ে এগুলো ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, বিনোদবিহারী, জওহরলাল, ইন্দিরা গান্ধী, উদয়শঙ্কর, আলাউদ্দীন খান ইত্যাদি আরও অনেক খ্যাতিমানের ব্যক্তিত্ব সার্থকভাবে বিকশিত হয়েছে চিত্রনিভার বলিষ্ঠ গতিময় রেখার স্পর্শে। কেবল ১৯৪৯ সালে কয়েকশ পোর্ট্রেট স্কেচ করেছেন শান্তিনিকেতনে পীস-কনফারেন্স উপলক্ষে আগত অভ্যাগতদের নিয়ে। এ ছাড়া সিমলা, পণ্ডিচেরী, কাশ্মীর, অজন্তা, শান্তিনিকেতন, পূর্ববঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে শিল্পী যে কতিপয় নিসর্গ চিত্র রচনায় প্রয়াস পেয়েছেন তাতেও শিল্পীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি।

আগেই বলেছি শিল্পীর অলঙ্করণের প্রবণতা আশৈশব। শান্তিনিকেতনে এসে আলপনা আঁকার হাত আরও পাকা হয়েছিল এবং রং সম্পর্কে আগের তুলনায় আরও সচেতন হয়েছিলেন। আলপনার কারুকার্যে ভরা কিছু পিঁড়ে, কুলো, মঙ্গলঘট ও তার কিছু প্রতিলিপি দেখলাম। কাপড়ের ওপর সূক্ষ্ম সূচ সুতোর কাজ দেখে গ্রামবাংলার নকসী, কাঁথার কথা মনে পড়ে যায়।

চিত্রনিভার বাড়ী থেকে ফেরার পথে একটা চিন্তাই মনের গভীরে ওঠা-নামা করছিল। সস্তা বাহবা নেবার যুগে যখন অ্যাবসট্র্যাকট্, পপআর্ট, সুরিয়ালিজম প্রভৃতি নিয়ে মাতামাতি তখন ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী ঐ ধরনের কাজ দেখে মনে হয় আমাদের শিল্পের শরীরে এখনও প্রাণ আছে। কিন্তু কতদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে কে জানে?

প্রশান্ত দাঁ

আরো অনেক মহিলার মত ইনিও বলেন,
"ভিনকোলা-১২ আমার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিল!"

কল্পনা কত ক্লান্ত থাকতেন সারাদিন। কাজের নামেই বিরক্তি আসত।

কল্পনা প্রতিদিন ২ বার করে ভিনকোলা-১২ খেতে শুরু করলেন। শীঘ্রই বুঝতে পারলেন তাঁর জীবনে এক পরিবর্তন আসছে।

আজ ওঁর মধ্যে কত উৎসাহ। সারাদিন হাসিমুখে কত কাজ করেন।

কতনা শক্তি, কতনা উৎসাহ! খুশীতে কল্পনা বলেন, "ভিনকোলা-১২ আমার জীবনে এক পরিবর্তন এনে দিল।"

ভিনকোলা-১২
ভিটামিন বি-১২ যুক্ত আয়রন টনিক

Standard

স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাস্যুটিক্যালস্ লিঃ
কলিকাতা ৭০০ ০১৬
ভারতে পেনিসিলিন ও অন্যান্য আধুনিক ঔষধাদির অগ্রণী প্রস্তুতকর্তা। স্থাপিত ১৯৩৪ সাল।

Shilpi SPL 4A/75 ben

পুনশ্চ

নটরাজ, তথা রসের সাগর বসরাজ অমৃতলাল বসুর তিরোধন ঘটে এই ইংরেজী মাসের ২রা জুলাই তারিখে, ১৯২৯ সালে। সত্যি কথা বলতে কি, কি গদ্য-পদ্য রচনার দিক থেকে কি অভিনয়ের দিক থেকে, একত্রে দ্বিবিধ বিষয়ে এমন একজন বিশেষ পারঙ্গম প্রাণবন্ত ধুরন্ধর ব্যক্তি বাঙালী সাহিত্যে ও রঙ্গমঞ্চে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়েছে। অমৃতলালের বাঙ্গ-কৌতুক বা শ্লেষাত্মক নাটিকা-বলী ও প্রহসনগুলির সঙ্গে যাঁরা সম্যকভাবে পরিচিত, তাঁরাই অবগত আছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী পদক' প্রদানে সম্মানিত করে, তাঁর প্রতি যথোচিত কর্তব্যই পালন করেছেন।

রসরাজ শ্লেষাত্মক নাটকের অভিনয়ে যেমন অনন্যসাধারণ ছিলেন, তেমনি ব্যঙ্গ-কৌতুকপ্রদ গদ্যরচনা ব্যতীত পদ্য রচনাতেও তাঁর জুড়ি ছিল বিরল। পূর্বে কলকাতার বহুবাজারের অঞ্চল থেকে প্রতি বছর হৈলে-পাড়ার যে সঙ পথ-পরিক্রমা করত, সেই সঙের ছড়া লিখতেন অমৃতলাল। সেগুলি পথে গীত হত এবং সঙেরা অঙ্গভঙ্গি-সহকারে মুখে ছড়াতে-ছড়াতে পথের দুধারে অগণিত দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দিয়ে যেত।

আজ কলিকাতার বুক থেকে সেসকল আনন্দের বেশ ঊবে গেছে। কিন্তু যেকালে ভাঁড়ু দত্ত (অমৃতলালের ছদ্মনাম) তাঁর রচনার সাহায্যে রসের ফল্গুধারা বহিয়ে বাঙালীকে রসাপ্লুত করেছিলেন, হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিয়েছিলেন, সেই কালেরই দু-একটি সঙের গান ও কবিতার দৃষ্টান্ত এখানে আমরা পুনশ্চ উদ্ধৃত করে দিলাম।

—সঙের গান—

কুলের বোয়ের গতর গেছে
এখন কাতর তারা কাজে।
জল-গেলাসটি এগিয়ে দিতে শঙ্কা সবার
লঙ্কা কথার মাঝে।।

কেউ এলো চুলে চেউ তুলে,
নভেল খুলে বসেন,
কেউ মিষ্টি মিষ্টি চিঠি লিখে,
ইষ্টি বসে রসেন,
কারো কোমল সুরে মধু ঝরে,
ঘরে হারমোনিয়া বাজে।।

কারো কচি ছেলের ঠোঁটে,
দুধ জোটে না মোটে,
বিকিয়ে আছে মাথার চুল,
বাজার-দেনার চোটে,
তবু জাঁক ফলাতে পাকশালাতে
মুচি ঠাকুর তেলে লুচি ভাজে।।

এমন মনিব-বাড়ী ছেড়ে
পাড়ী দিয়ে বিয়ের দল।

খেলার ঘরে খিল্‌টি এঁটে
বাজায় গিল্‌টি করা মল।।

বাঁধা-বাড়া ছেড়ে বামুনি
পাছা-পেড়ের সাজে।
মাথায় ফুলের খোপা বেনে খোঁপা
জলাঞ্জলি লাজে।।

—মান (কবিতা)—

বারো মাসে একবার যদি করো মুখ ভার
বড়ই বাহার হয় ও বধূ-বদনে।
রাগে গাল লাল ফোটে
ঈষৎ ফোলান ঠোঁটে,
রাঙ্গা হয়ে ওঠে চোখ নীরব রোদনে।।
ধূলিয়া ফেলায় হার,
গলা যেন আর কার,
হাতছাড়া হয়ে চুড়ি গড়াগড়ি যায়।
গলিত চুলের ভার,
পিঠ করে অন্ধকার,
বসন বসাতে শিরে খসে খসে যায়।।
সাধিতে ধরিতে কর,
রাগে হয়ে গরগর,
ছুটিয়া পালাতে চাও ঘরের বাহিরে।
আঁচল টানিয়া ধরে,
চেপে রাখি বুক ভরে;
আঁখিতে-অধরে চুমো চাপ ধীরে ধীরে।।
কলহে কলিত সন্ধি,
বাহুতে বাঁধিয়ে বন্দী
শয্যায় বসিয়ে কোলে বসাই কৌশলে।
কুলাতে কুলাতে চুল,
পরাই কানের ফুল;
চুড়ি হাতে দিতে দিতে পাড়ি পদতলে।।
'ছাড় ছাড় ছেড়ে দাও,
যাও না যেখানে যাও,'
প্রথমে ফোটাই বুলি ভৎসনার ছলে।
ফোয়ারা ফুটিয়ে উঠে,
মিঠেকড়া যারা ছোটে,
করুণ কুহুরকণ্ঠে আঁখি ভেসে জলে।।
আঁচল গুছায়ে তোর,
মুছাতে নয়ন-লোর,
বিভোর হইয়া দেখি নূতন মাধুরী।
কাঁদিতে কাঁদিতে ভুলে,
হেলিয়া পড়লো ঢলে,
আদর জানাতে জানে আমার আদুরী।।
আলিঙ্গন সোহাগীর,
অভিমান গলে যায়,
প্রেম-নিবেদন ভাষে বেদনার ধ্বনে।
ইঁদি-ছুঁদে তুই তরী,
তোর তরে বাঁচি-মরি,
অধরে স্বাক্ষরি কবি অধর মোহনে।।
কভু মনে মেঘ হলে,
প্রণয়-জাহ্নবীজলে,
বৈশাখ-বৈকালে ভাল লাগে লো তুফান।
তরী করে টলমল,
ডুবিলে জানুতে জল,
নিকটে মিলন ঘাট আশার সোপান।।
কিন্তু যদি রোজ রোজ,
থাকো মুখ করে গোঁজ
ঝড়ের আগে যেন বিসর্কে সাগর।
তবে দীন কর্ণধার,
ফেলে হাল-পাল তার,
ঝাঁপ দিবে জলে গলে বাঁধিবে পাথর।।
অবিরত ঝঞ্ঝাঘাতে,
তরঙ্গের ঘাতে ঘাতে,
তরি-অঙ্গ জীর্ণ হয় মাঝি ভগ্নমন;
পর্বতপ্রমাণ ঢেউ,
পারে কি তরিতে কেউ,
প্রতিদিন করে যদি বলে আস্ফালন।।
মানের কবিত্বে আর,
থাকে নাম মধুর তার,
বাঁধাবাঁধি সাধা-কাঁদা মাদা সেরে যায়।
নিত্য নিত্য এক পালা,
করে কোন ঝিলোপাখা,
গোবিন্দের সাধ্য নয় সে গান গায়।
নূতনত্ব কোথা—নিত্য চরণ-ধরায়।।

রূপধর

উপন্যাস

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আদ্য শেষ রজনী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আজ যদি শশাঙ্কবাবু ফিরে আসেন—

আমি তাকে ফেলতে পারব না। আমার ছেলেমেয়েদের বাবা। কিন্তু তাকে আমি আর নিতেও পারবো না।

এজন্যে আমি দায়ী।

কেউ দায়ী নয়। দায়ী আমার ভাগ্য।

দায়ী আমার মন। আমার আগেকার সে মন তো আর নেই অমিয়। শশাঙ্ককে একসময় আমি খুব ভালবাসতাম। ও যে ইচ্ছে করে অসহায় স্নেহ থেকে আমার ভালোবাসা কুড়োতো সে তো তখন আমি জানতাম না।

শশাঙ্কবাবু কিন্তু তোমায় ভালোবাসেন।

বাসতে দাও। আমার জীবনটা তছনছ করে দিলো লোকটা। তৃপ্তির সঙ্গে কী বলে যে হাত মেলালো তা বুঝি না। আমি ওর বিবাহিত স্ত্রী। ওর ছেলেমেয়ের মা। অথচ তৃপ্তিকেই ও মদত দিয়ে গেল।

ওইটেই হয়তো শশাঙ্কর ভালোবাসার রাস্তা ছিল।

হবে। কিন্তু রাস্তাটা খুব খারাপ ছিল।

অন্ধকার সন্ধ্যা খালি চেয়ারগুলোতে সিট নিয়ে বসে গেল। মঞ্চে অভিনেতা এবং অভিনেত্রী দুজনই চুপচাপ। কোন সংলাপ নেই। লাইট নেই। মিউজিক নেই। রজনী সোজা লাস্ট রোয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। অমিয় রজনীর দিকে।

রজনী খানিক বাদে উঠে গেল। যাবার সময় বলল তুমি এগোবোটা কলশেয়ের হিসেবপত্র চেক করে তার বাড়ি যাবে। নয়ত আবার হিসেব জমে যাবে।

তুমি কোথায় চললে?

আজ একটু বাড়ি যাব তাড়াতাড়ি। ছেলেমেয়েরা আমায় একদম পায় না। ভেবেছি ওদের জন্যে আজ ভালমন্দ কিছু রাঁধবো।

তোমার গাড়িটা নিয়ে যাও। কাল এক-বারে হাউসে ফিরবে।

না দরকার নেই! ট্যাকসি নিয়ে নেব। ওরা গাড়ি দেখলে বিরক্ত হয়।

রজনী বাড়ি ফিরে দেখলো বসবার ঘরে বড় আলোটা জ্বলছে। শশাঙ্ক দোরের দিকে পেছন ফিরে বসে গল্প করছে। বড় ছেলে মেজো আর ছোট মেয়েকে নিয়ে জমিয়ে বসে গল্প হচ্ছে। গল্পের বিষয় সম্ভবত ওদেরই মা। লোকটাকে ফিরে আসতে দেখে রাগে রজনীর গা রী রী করে উঠলো। এই লোকটা। এই লোকটাই তার জীবনটাকে থেতলে দিয়েছে। একদম বাস্তার একটা গালাগালি তার ঠোঁটে উঠে এল।

রজনী ঘরে ঢুকতেই দপ করে সব কথা বন্ধ হয়ে গেল। ছেলেমেয়েরা প্রায় মাথা নিচু করে ভেতরে চলে গেল। এখন রজনী শশাঙ্ক একদম মুখোমুখি। মাঝখানে কাচের টেবিলে শুধু একটা কাপ প্লেট। চা খাওয়া হয়ে গেছে শশাঙ্কর।

আজ আমি চলে যেতে বলিনি।

রজনী কোন জবাব দিল না।

আমি এখানে থাকবো। ওরা আমারই ছেলে। আমার মেয়ে। তুমি আমার স্ত্রী।

দাঁড়িয়েছিল রজনী। একথা শুনে চেয়ারে বসলো। আচ্ছা তাই নাকি!

ঠাট্টার কথা নয় রজনী। এ বাড়ি আমারও।

কোন সংবাদে? ভাড়া দাও তুমি? না। রেশন আনো তুমি? না। সংসার চালাও তুমি? না। ই ক্ষমতা উপরও হওয়া আবার ফিরে আসা। এর মাঝে আরও একটা বড় কাজ করে এসেছ!

বুঝতে না পেরে শশাঙ্ক তাকিয়ে আছে। নিজের স্ত্রীর নামে সত্যমিথ্যে কলঙ্ক রটাও।

আমি রটাইনি কোনদিন।

যারা রটায় তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকো। যারা আমার ক্ষতি করেছে তাদের সঙ্গী তুমি অস্বীকার করতে পারবে?

তৃপ্তির ভালোবাসা তুমি অস্বীকার করতে পারো?

মরে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে। থাকলে না জানি আরও কত কি করতো। আমার স্বামী হয়ে তার ভালবাসার কথা বলতে তোমার লজ্জা করে না?

আমার যারা ক্ষতি করেছে—তাদের সঙ্গে মিশতেও তো তোমার আটকায়নি রজনী। অমিয়র সামনে তুমি আমায় অপমান করনি?

এসব মিথ্যে কথা বোলো না। তুমি তোমার ব্যবহার আমায় অন্যত্র ঠেলে দিয়েছো। আমি ইচ্ছে করে কোথাও যাইনি। তোমার স্বভাব আমায় যেতে বাধ্য করেছে শশাঙ্ক। অমিয় ওরা কেউ কোনদিন আমার বন্ধু ছিল না। তুমি ওদের আমার বন্ধু করে দিয়েছো। নাও। এবার ওঠো। আর কোন কথা বলে লাভ নেই। রাত হয়ে যাচ্ছে—

এমন কিছু রাত হয়নি। এর চেয়ে তো অনেক রাতে তুমি ফেরো। আমি তো ওদের খোঁজ নিতে এখানে আসি মাঝে মাঝে। তোমার তো এখন রজনী সন্ধ্যে সার!

সে হিসেবে কোন দরকার নেই। লুকিয়ে লুকিয়ে এসে আমার ছেলেমেয়েদের মন আমারই বিরুদ্ধে বিষিয়ে যাও—তা আমি জানি। তারপর টুক করে পালিয়ে যাও। নাও। এখন ওঠো। আমি একটু হাত-পা ছড়িয়ে শোব। বাজে ঝামেলা আর ভাল লাগছে না।

ওরা আমারও ছেলেমেয়ে রজনী।

সে তো কুকুর বেড়ালেরও থাকে! যাও ওঠো এখন। বিচ্ছিরি লাগছে।

সহজ ছন্দের হৃদয়স্পর্শী
কবিতার সংকলন

কাব্য সুষমা

ইন্দু দা

দাম—দশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : "কবিনিবাস"—"মমতা"
৫৯, পারমার রোড, ভদ্রকালী
উত্তরপাড়া, হুগলী

ঠিক এই সময় রজনীর বড় ছেলে ঘরে ঢুকলো। বোঝাই যাচ্ছিল—ওরা পাশের ঘরে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। সে দিব্যি তেরিয়া হয়ে বলল না। বাবা আজ থেকে এখানে থাকবে।

রজনী ঠাণ্ডা গলায় বলল না। তুমি ছোটো। তুমি এখন ভেতরে যাও।

না। আমি যাব না। আমার বাবা—

আমি তোমার মা। তুমি ভেতরে যাও।

শশাঙ্ক এগিয়ে এল। রজনী পরিষ্কার বুঝলো ছেলেমেয়েদের চোখে তার ওপর টেক্কা দিতেই শশাঙ্ক বলছে ছিঃ! তোমাদের মা হন। তুমি ভেতরে যাও বাবা। আমিও চলে যাচ্ছি—

কাউকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই শশাঙ্ক বেরিয়ে গেল।

রজনীর মুখে এসে গিয়েছিল মুরোদ জানি! কিন্তু সেকথা উচ্চারণও করল না। করতে পারল না। কারণ ঠিক এই সময়েই তার বড় ছেলে সনৎ দোতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল একছুটে। একবার বোধহয় জোরে ডাকলো। বাবা। বাবা—

সারাটা শরীর রাগে ঘেন্নায় অবশ হয়ে আসছিল রজনীর। বসার ঘরে সোফা-কাম-বেডে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়েই মেজো মেয়েকে ডেকে বলল আলোটা নিবিয়ে দে। আমি খাচ্ছিনে রাতে। তোমরা খেয়ে নাও।

দুই মেয়ে যে তারই ভয়ে এতক্ষণ আসতে পারেনি—একথা রজনী জানে। জানে বলেই মনে আরও কষ্ট পেল। ওরাও শাড়ি পরছে কয়েক বছর। রজনী যা নিজে কিনে দেয় ওদের। নয়ত ওরা পছন্দ করে কেনার সুযোগ বা সময় পায় না। হাতে টাকা দিয়েও দেখেছে। পারে না। বড় মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে ছোট বোন দুটিকে নিয়ে

ব্যবহার করুন
লিচেপ্সা

বাজারে বেরোলে তবে ওদের ঠিক কেনাকাটা হয়। নয়তো নয়।

মেজো মেয়ের নাম মনো। মনোরমা নাম দিয়েছিল মা। ছোটজনের নাম সরমা। তাকে রজনী সরী বলে ডাকে। বড় মেয়ের অনেক নাম। রজনী তাকে শুধু 'বড়' বলেই ডাকে। ছেলের ডাক নাম—সন্তু।

আলো নিবিয়ে দিয়ে মনো চলে যাচ্ছিল। রজনী ডাকলো। বিকেলে খেতে দিয়েছিলি সন্তুকে?

খায়নি মা। খাতাপত্তর কী বিজনেস করবে। তাই বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে কদিন।

পড়াশুনোটা করলো না একদম। তোরা খেয়েছিস?

হুঁ। বাবার জন্য মুড়ি মেখেছিলাম। আরো আছে। তোমায় দেব মা।

মুখটা আবার কালিতে ভরে গেল রজনীর। তোদের বাবা এলে বুঝি মুড়ি মাখিস?

মনোর সঙ্গে সঙ্গে সরী এসেছিল। সে বলল কোনদিন সিঙ্গাড়াও আনা হয়।

এ পয়সা পাস কোত্থেকে?

কেন? বাবা দেয়—

কোথায়? বিয়ে হয়ে তক আমার হাতে তো কোনদিন একটা পয়সা দেয়নি।

কেন মা? বাবার মানিব্যাগে তো পয়সা থাকে। আজ তো অনেক নোট দেখলাম।

তাই বুঝি। আমি তো কোনদিন দেখিনি। তাহলে ওদের ফড়েপুকুরের বসত বাড়ি বিক্রি হয়েছে। ভাগের টাকা তোদের বাবার হাতে এসেছে বোধহয়।

সরী বলল একটা কথা বলব মা? তোমার সঙ্গে বাবার কিসের ঝগড়া?

কিসের নয় মা! যতদিন এখানে পাকা-পাকিছিল—তোমাদের জন্মের অনেক আগে—বিয়ের পর থেকেই আমি সংসারটা টেনে আসছি। কোনদিন তো তোমাদের বাবাকে মানিব্যাগ থেকে টাকা বের করতে দেখিনি।

বাবার এখন বয়স হয়েছে মা।

আমার বয়স বসে আছে? বলতে বলতে রজনী কেঁদে ফেলল। স্টেজে কোনদিন রজনী এত তাড়াতাড়ি কাঁদতে পারেনি।

মনো চুপ করে গেল। সরী চুপ করে গেল।

এতক্ষণ অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না রজনী। যা দেখছিল—তা অন্ধকার। এখন সেটুকু আপসা হয়ে গিয়ে অনেক বড় অন্ধকার তার চোখের সামনে মাথা ঠেলে দাঁড়ালো।

কোন কথা না বলে রজনী মনো আর সরীর গায়ে হাত বোলাতে লাগল। এক-জায়গায় হাত থামতে রজনী বুঝলো, এটা মনোর বাঁহাতের কনুই। খুব রোগা লাগছে। সারাদিন সে নিজে ভরত হাউসেই কাটায়। মেয়েটা রান্না করে। বেশন আনায়। ছোটবেলা থেকেই ওরা ভাইবোনেরা মায়ের আদরযত্ন পায়নি। পাবে কোত্থেকে। বিয়ের পর থেকেই তো রজনী থিয়েটারের খেপ ধরে সংসার টেনে আসছে।

হাবে। তোরা আজ রাতে কি দিয়ে খাবি?

কেন? সকালের মাছ রয়েছে তো মা। তুমি তো খাওনি। খাবে আমাদের সঙ্গে?

দুই বোন নাচতে নাচতে ভেতরের ঘরে ছুটলো।

সন্তু এলে একসঙ্গে খেতে বসবো।

সরী বলল দাদার ফেরার ঠিক থাকে না মা। তার চেয়ে এসো আমরা বসে পড়ি।

— আঠারো—

সন্তু কিছুতেই শশাঙ্ককে ধরতে পারছিল না। ফুটপাথে ভিড়। তার বাবা এক-একবার ভিড়ে হারিয়ে যায়। আবার দেখা যায় তাকে। সন্তুর বুকের ভেতরটা লাফাচ্ছিল। এভাবে সে কিছুতেই তার বাবাকে চলে যেতে দেবে না। মা যা বলে বলুক। পায়ের স্যান্ডেলটা কাঁচা চামড়ার। জোরে হাঁটছে আর পায়ের ছাল উঠে ফোস্কা পড়ছে। খুব ছোটবেলায় বাবা তাদের এক-বার হেদোর ওখানে চৈতসংক্রান্তির মেলায় নিয়ে গিয়ে তরমুজ কিনে দিয়েছিল। তখন বড়দির বিয়ে হয়নি। দুবার 'বাবা' বলে চেঁচিয়ে ডাকলো সন্তু।

কলকাতার রাস্তায় কত লোকই তো বাবা বলে ডাকে। শশাঙ্ক ফিরেও তাকালো না। সম্ভবত শুনতে পায়নি। সন্তুও নিজের বাবাকে শশাঙ্কবাবু বলে চেঁচিয়ে ডাকতে পারল না। এ রাস্তা সে-রাস্তা করে শশাঙ্কর পেছন পেছন হাঁটতে হাঁটতে সন্তু যখন তাকে প্রায় ধরে ফেলেছে—তখন দুজনই কলেজ স্ট্রীটের এক এঁদোগলি ধরে দেওয়াল-ফেঁপে ওঠা একটা বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

ড্যাম্প। অন্ধকার। দুধারে প্রেসবাড়ি। একটাতে ট্রেডলে অনবরত লেবেল ছাপা হচ্ছে। ঘটাং, ঘটাং। তার ভেতরেই শশাঙ্ক তালা-আঁটা দরজাটা খুলে ফেলে ভেতরে ঢুকলো। অন্ধকারে হুট করে আলো জ্বালালো। তারপর পাঞ্জাবি খুলে দড়িতে মেলে দিতে দিতে মেঝেতে দেখলো—তার ছায়ার পাশেই আরেকটা ছায়া।

সঙ্গে সঙ্গে শশাঙ্ক রীতিমত চমকে চেঁচিয়ে উঠলো, কে?

আমি বাবা।

ওঃ! ধড়াস ধড়াস শব্দ হচ্ছিল বুকে। কী করে চিনে এলি? ঠিকানা কে দিল?

তোমার পেছন পেছন ছুটতে ছুটতে আসছিলাম। কত ডাকি তোমায়—তুমি শুনতে পাও না। তাই না তোমার ভেরা চিনলাম।

বোস। আমি এখানে থাকি।

এত খারাপ ঘরে? কেন বাবা? তুমি বাড়ি চল।

ও বাড়ি তোদের মায়ের।

এখন কী কথা বলতে হয় সন্তু জানে না। অনেক কথা একসঙ্গে মনে আসছিল। চুপ করে গেল।

খেয়ে আসিসনি তো। বোস। এখুনি হোটেলের ছেলেটা ভাত নিয়ে আসবে। আরেকটা মিল বলে দেব।

সন্তু বুঝলো, সে রসলেই তার বাবার খাট দুলে উঠবে। নোনা ধরা দেওয়াল। মেঝে মাটির নিচে এক বিঘৎ সেঁধিয়ে গেছে। আগেকার কড়িবর্গা লাগানো বাড়ি। দোতলা, তেতলার চাপে যেকোন মুহূর্তে এ-ঘর মাটির নিচে তলিয়ে যেতে পারে। লেবেল ছাপানোর পাশের প্রেস থেকে ময়দার আঠার গন্ধ উঠে এসে গা গুলিয়ে দিল সন্তুর। তুমি বাড়ি চল বাবা। আমরা আগের মত থাকবো।

তা হয় না সন্তু। তুমি এখন সব বুঝবে না।

বাবা তাকে 'তুমি' বলছে দেখে সন্তু আরও ঘাবড়ে গেল। তখন তার সতেরো-আঠারো হবে। তার স্কুলের বন্ধুরা কেউ কেউ স্কটিশে পড়ে। একদল ঘায়ু বঙ্গবাসী। পাশ করলে সেও আজ কলেজে যেত।

ছেলের মুখ গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে দেখে শশাঙ্ক বলল, আয়। বোস না এখানে। ঘরটা কিন্তু গরমের দিনে দুপুরে ঠাণ্ডা হয়ে থাকে।

শীতে তো দার্জিলিং। তুমি এখানে থাকো কি করে বাবা?

কেনরে সন্তু। বেশ তো জায়গা। কোন ঝামেলা নেই।

সন্তুর মনে এসেছিল, একবার জানতে চায়, বাবা তোমার চলে কি করে? কিন্তু একথা বাবাকে জিজ্ঞাসা করা যায় না। হাজার হোক বাবা। বাবার বয়স কত সন্তু জানে না। চল্লিশ পঞ্চাশ হয়ে গেছে। ব্যাকব্রাশ কালো চুল। তাতে দু-একটা শাদা। চেহারা বেশ ছিপছিপে। মায়ের মত এখনো ভারি হয়ে যায়নি। গেরুয়া খদ্দরের পাঞ্জাবি। চোখে চশমা। ময়লা ধুতির নিচে পায়ের কালো কাবলি চিক চিক করছে। ফ্রেমের ভেতর থেকে বাবার তাকানো সন্তুর আশ্চর্য সুন্দর লাগলো। তাকেই বাবা মন দিয়ে দেখছে। কী একটা লজ্জায় সন্তু চোখ নামিয়ে নিল।

হ্যাঁরে! তুই খুব বড় হয়ে গেছিস না? সবাই আমায় লম্বু বলে।
ও কি কথার ধারা? দাড়ি কামাস?
মাঝে মাঝে। না কামালে চুলকোয়।

শশাঙ্ক দেখলো, ছেলের বাঁদিকের গালে আলো না পড়ায় আরো সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। দু-একটা কথা আরও বলতো শশাঙ্ক। কিন্তু হোটেলের ছেলেটা ভাত নিয়ে এসেছে। তাকে টাকা দিয়ে বাখতে বলে আরেকটা মিলের অর্ডার দিল শশাঙ্ক। রুই মাছ থাকলে দিও।

দুজনে খেতে খেতে রাত প্রায় এগারোটা হয়ে গেল। তুই আজ আর যাসনে সন্তু। এখানেই শুয়ে থাক।

বেশি রাত তো হয়নি। দিব্যি হাঁটতে হাঁটতে চলে যাব বাবা।

কেন? মা চিন্তা করবেন?

মা তো অনেক রাতে ফেরে। আমার সঙ্গে বিশেষ দেখা হয় না বাবা।

কতো রাত?

তা এক একদিন বেশ রাত হয়। আমরা ঘুমিয়ে থাকি।

দরজা কে খোলে?

মানো। নয়তো আমি কিংবা সরী।

দুজনে একই সঙ্গে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলো। তারপর শশাঙ্কই বলল, এতরাতে ফেরার দরকার নেই। রাস্তাঘাট ভালো নয়। কাল ভোরে গিয়ে বলবে—বাবার কাছে ছিলাম।

তোমার এতটুকু খাটে দুজনে শোব কি করে! বারোর যে ঘুম হবে না বাবা।

একটা রাত তো। ওই বেশ হয়ে যাবে। সন্তু! তুই এক খিলি পান নিয়ে আয়তো আমার জন্যে। খয়ের দিতে বারণ করবি। দরজা আলাদা—

সন্তু বেরিয়ে যেতে শশাঙ্ক তাড়াতাড়ি উবু হয়ে মেঝেতে বসলো। আগেকার মোটা চাদরের স্যুটকেস। তাতে জোড়া তালা। ট্রাঙ্ক খুলে শশাঙ্ক একবার ভেতরে তাকালো। ভেতর থেকে ন্যাপথলিনের কড়া গন্ধ নাকে উঠে আসতেই ভীষণ নিশ্চিন্ত লাগলো শশাঙ্কর। তাক থেকে গ্যামক্সিনের কৌটোটা এনে সাবধানে অল্প একটু ছিটিয়ে দিল। তারপর ট্রাঙ্ক বন্ধ করে একখানা দশটাকার নোট বিছানার ওপর চাবির গোছা দিয়ে চাপা দিয়ে রাখলো। পান নিয়ে ফিরে সন্তুর নিশ্চয় এ দৃশ্যটা ভালো লাগবে।

পান চিবিয়ে শুতে শুতে প্রায় বারোটা। শশাঙ্ক লুঙ্গি পরে শুয়ে পড়ল কাৎ হয়ে। কী হল? শুয়ে পড় বাবা।

সন্তু বলল, শুচ্ছি। তোমার একখানা দশটাকার নোট পড়ে রয়েছে বাবা।

ওখানা তোমার সন্তু। তোমার জন্যে রেখেছি।

আমার!

হ্যাঁ সন্তু। এই দশ টাকা কাল তুমি তোমার ইচ্ছেমত খরচ করবে।

নোটখানা এক লাফে তুলে নিয়ে সন্তু গায়ের জামা খুলে ফেলল। আলো নিবিয়ে দি বাবা?

দে।

শুয়ে শুয়ে দুজনে তখনই ঘুমোতে পারল না। দুজনেকেই কাৎ হয়ে শুতে হয়েছে। এতক্ষণ লেবেল ছাপানোর ট্রেডল মেশিনের আওয়াজও সন্তুর ভাল লাগছিল শুনতে। অল্পবয়সে সে বিভূতি-ভূষণের 'পথের পাঁচালী' পড়েছিল। তাতে বাবার সঙ্গে অনু কী একটা পাখী দেখতে বেরিয়েছিল। কুঠীর মাঠে।

এখন সন্তুর পরিষ্কার মনে হচ্ছে, সে আর তার বাবা কালো নদীর ভেতর দিয়ে গভীরভাবে নৌকোয় এক জায়গায় যাচ্ছে। গলুইয়ের ভেতর এক বিছনায় তারা শুয়ে। নৌকোটা দুলছে। এভাবেই লোকে রাতে পারাপার করে।

এর আগে শশাঙ্ক কোনদিন সন্তুর কাছাকাছি গা ঘেঁষে এতক্ষণ একসঙ্গে থাকেনি। হ্যাঁ থেকেছে। সন্তুর সেই ছোটবেলায়। এখন ছেলে তার যুবক হয়ে যাচ্ছে। গায়ে আলাদা রকমের গন্ধ। এক সময় শশাঙ্কর মাঝখান থেকে ছেলেমেয়ে-গুলো বড় হয়ে গেল। শশাঙ্কর ভীষণ কষ্ট। এটাকেও আর কোলে নেওয়া যায় না। লাফিয়ে লাফিয়ে বড় হয়ে যাচ্ছে সব। আর কেউ কোনদিন রাতে তার আর রজনীর মাঝখানে অযেলক্লথ পেতে শোবে না। এই বড় হয়ে যাওয়াটা সেই সময় শশাঙ্কর ভীষণ বিচ্ছিরি লাগতো।

তুই আর পরীক্ষা দিলি না কেন সন্তু?

অন্ধকারে সন্তু বলল, আমার যে ক্যাপিসিটি নেই বাবা।

ক্যাপিসিটি?

ক্যাপিবার। যোগ্যতা।

কী করে বুঝলি?

আমি যে ঘ্যাম্ বাবা।

ঘ্যাম্?

ঘ্যাম্ মানেও জানো না বাবা! ঘ্যাম্ মানে—যে টুকতে গিয়ে ধরা পড়ে। তাই আমি পুদু হয়ে গেলাম।

পুদু? পরিষ্কার করে বল।

পুদু হল—যার আর কিছু হবে না।

অন্ধকারেও শশাঙ্কর মুখখানা কালো হয়ে গেল। তার একমাত্র ছেলে সন্তু। ও যখন হামাগুড়ি দিও—একদিন রজনী তখন বলেছিল— ওকে ডাক্তারি পড়াবো।

শশাঙ্ক বলেছিল, মাসে দু'তিনশো টাকা লাগে। পাবে কোত্থেকে?

অনেক আগে থেকে জমাতে শুরু করব।

এখন সেই সন্তু! সেই রজনী! সেই নিজেই বা কোথায়!

(ক্রমশঃ)

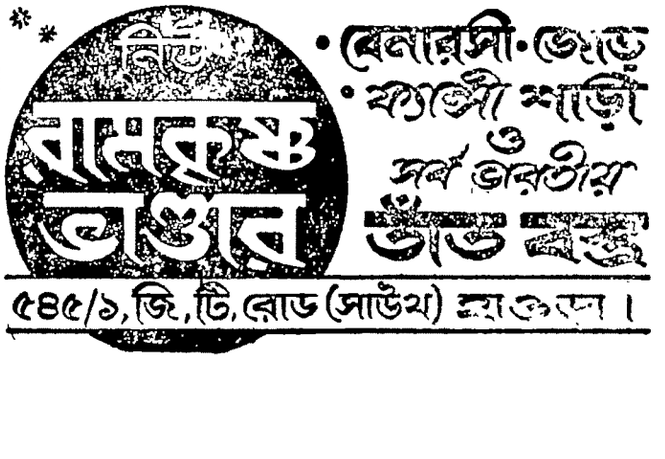

সুখী সংসার ও সুগৃহিণী

দাম্পত্য জীবনকে সুখী করার বাসনা সর্বকালের ও সকলের। এ বাসনাকে সার্থক করার জন্য দরকার স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টা। অসুখী জীবনের জন্য অধিকাংশ সময় একে অপরকে দোষী সাব্যস্ত করে শান্তি পায়। নিজের ভুল কেউ বড় একটা স্বীকার করতে চায় না। অথচ উভয়ে যদি উভয়ের প্রতি বিশ্বাসে অটুট ও আন্তরিক ভালবাসায় পবিত্র থাকেন তবে অশান্তিই বা হবে কেন?

সুখী জীবনের জন্য চাই স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সুষ্ঠু বোঝাপড়া। স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে যদি অবিশ্বাসের চোখে দেখেন কারো প্রতি কারো যদি সহানুভূতি না থাকে তবে কোন বোঝাপড়াই তাদের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করতে পারে না। বিচ্ছেদ না হলেও উভয়ের জগত হবে বিচ্ছিন্ন। দিনগত পাপক্ষয়ের মত তাদের জীবনযাত্রা ঘোরতর হতাশার মধ্য দিয়ে একদিন হয়তো বার্ধক্যের সীমানায় এসে পৌঁছবে। কিন্তু এ জীবনযাত্রা শুধু ক্লান্তি আর গ্লানির পুঞ্জীভূত বোঝা। এ জীবনের মধ্য দিয়ে যে উত্তর পুরুষের জন্ম হবে তাদের ও শৈশবকাল হবে বিষময়। প্রাক্ত বয়স্করা এদের সামনেই হয়তো একদিন নিজেদের কলহ ও অশান্তির কৈফিয়ৎ দিতে হবে। তাই স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বিয়ের পর গভীরভাবে ভাবতে হবে কেমন করে জীবন কাটালে নিজেদের সুখের সঙ্গে পরিবারের অন্যান্যদেরও সুখী করা যায়।

যুগের হাওয়াকে উপেক্ষা করে ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশার ওপর কঠোরতা আরোপ করা সম্ভব বা কাম্য নয়। অবাধ মেলামেশায় মানুষের মন কিছুটা প্রসারিত হতে পারে ছেলেমেয়েরাও আর নিজেদের মিথ্যার অন্তরালে লুকিয়ে রাখার প্রয়োজন বোধ করে না। কিন্তু দাম্পত্য জীবন যদি একবার এই অবাধ মেলামেশাকে কেন্দ্র করে কোন জটিল পরিবেশের সৃষ্টি হয় তবে সে সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া প্রায়ই সম্ভব হয় না। সন্দেহের বিষে একে অপরকে জর্জরিত করেন। এই বিষের জ্বালা উভয়ের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয় সারা-জীবন অথচ একটু খতিয়ে দেখলে বোঝা যায় একের প্রতি অপরের ভালবাসা অসীম দুজনে দুজনের ওপর নির্ভরশীল। তবুও শুধুমাত্র ভুল বোঝাবুঝির ফলে নিজেরা অসুখী হচ্ছে।

স্বামীকে সুখী করতে পারলেই পারিবারিক জীবন শান্তিময় হয়ে ওঠে না। স্বামী ছাড়াও পরিবারে থাকে শ্বশুর-শাশুড়ী, দেওর-ননদ তাদের সঙ্গে মানিয়ে চলাও স্ত্রীর কর্তব্য। অবশ্য পরিবারের সকলকে কখনই সমানভাবে খুশী করা যায় না। যিনি স্বামীকে যতটা সুখী করতে পারেন শাশুড়ীকে ততটা নয়। তবুও যতটা সম্ভব মানিয়ে চলা। আবার শ্বশুর বাড়ীর সকলেরও বৌয়ের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। শুধুমাত্র খুঁত ধরে বেড়ালে তার পরিসর ক্রমশঃ প্রসারিত হতে থাকে।

পারিবারিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সমস্যা এক বিরাট সমস্যা। একে কেন্দ্র করে সুখ-দুঃখ ও নানা পরিবর্তন হতে থাকে। অনেক সময় স্ত্রীকে সুখী করতে স্বামী পরিবারের আর সকলের কাছ থেকে দূরে সরে নিজস্ব একটা ছোট সংসার গড়ে তোলেন। আর পাঁচজনের কাছে সে তখন স্বার্থপর। অথচ একথাও ঠিক একান্নবর্তী পরিবারে বসবাস করে অশান্তির বীজ বপন করার চেয়ে ছোট সংসারের শান্তি অনেক কাম্য। বিষয়টি অনেকে তলিয়ে না দেখে আবেগের বশে হয়তো দোষ দেবেন নববিবাহিতা বৌটিকে। আবার সদ্য বিবাহিতার ও নতুন সংসারের প্রতি যথেষ্ট বিরাট দায়িত্ব। একান্নবর্তী পরিবারের অসহায় ব্যক্তিদের ছেড়ে সুখের সন্ধানে নতুন ঘর বাঁধার স্বপ্নও তার যুক্তিযুক্ত নয়। পরিবারের সকলকেই আপনভাবে নিজের করে নিতে হবে তাদের একান্ত আপনজন।

নিজের মেয়ের দোষ যেখানে মায়েরা দেখেন না সে ক্ষেত্রে ছেলে-বৌয়ের দোষ অমার্জনীয়। অশান্তির কিন্তু সেটাও একটা বিরাট কারণ। অন্যায় জেনও নিজের মেয়ের সে বাজে মা সায় দেন শুধু মেয়ের সুখের দিকে চেয়ে সেই কাজ পুত্রবধূর যতটা নিন্দনীয় ততটা তাদের চোখেই অপরাধের। পুত্রবধূর অপরাধে তারা যতটা প্রচারে সরব শাস্তি দানেও তারা ততটাই তৎপর! এইভাবে পারিবারিক অশান্তির প্রাচীর দ্রুত গড়ে উঠতে থাকে যেটা গোড়াতেই সতর্ক হলে হয়তো খুব বেশী বাড়তে পারতো না।

প্রত্যেক পরিবারে মা কিম্বা স্ত্রী গৃহ-কর্ত্রী। সংসারকে কিভাবে সুষ্ঠু পরিচালনা করা যায় সে দায়িত্ব তাদের। সে সংসারে পুরুষের সংসার খরচের টাকা দিয়ে খালাস। সামান্য আয়ে সংসার পরিচালনা করা বা দরকার মত ব্যয় সংক্ষেপ করার দায়িত্ব তখন গৃহকর্ত্রীর। অথচ গৃহকর্ত্রীদের অপরিণামদর্শিতার ওপর সংসার পরিচালনায় বিশেষ করে খরচ বাড়ার চাপে সংসারের শান্তি নানাভাবে ক্ষুন্ন হয়। আর সংসারের অপরিহার্য খরচের দায়িত্ব যদি পুরুষের কাছে ন্যস্ত থাকে তবে ভুল বোঝাবুঝির মাত্রা ক্রমশঃ বাড়ে। অতিথি আপ্যায়ন থেকে সংসারের যাবতীয় কাজ ঘরের মেয়েরাই করে তাই তারাই বুঝে শুনে নির্দিষ্ট আয়ের মধ্যে খরচ করতে পারেন যদি সংসার খরচের অর্থ তাদের হাতে তুলে দেওয়া যায়। এই ব্যবস্থা পুরুষের কাছে থাকলে বোঝাবুঝির জন্য মা ও ছেলে কিম্বা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ বাধতে পারে। স্বচ্ছল পরিবার না হলেও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে এক নিত্য কার দৃশ্য। মা ও স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত সংসারের আর্থিক দায়িত্বের বোঝা নিজেরা গ্রহণ না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত তারা আর্থিক অনটনের অংশীদার হবার সুযোগ পান না। তাই বিচক্ষণ অনেক পুরুষ মানুষ মাসের প্রথমেই সংসার খরচের অর্থ মা কিম্বা স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে একবারে দায়িত্বমুক্ত হন কিছুদিনের জন্য।

যে পরিবারে মায়ের অবর্তমানে স্ত্রীকেই সংসার পরিচালনা করতে হয় সেখানে স্ত্রীর মানসিক চাহিদার দিকেও স্বামীকে নজর দিতে হবে।

যে পরিবারে মহিলাদের কর্মব্যস্ত শুধু কায়িক শ্রমের ওপর সেখানে তারা বিরক্ত অসন্তুষ্ট ক্ষিপ্ত। সে সংসারে কেমন করে শান্তি আসবে? স্বামী-স্ত্রী ও পরিবারের আর সকলের সুষ্ঠু বোঝাপড়া সহযোগিতা ও সহানুভূতি একটা সমৃদ্ধ পরিবার গড়তে সাহায্য করে। স্ত্রীর আমোদ-আহ্লাদ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নজর দিয়ে স্ত্রীকে যেমন স্বামী আনন্দে ভরে দিতে পারেন তেমনি নিজেও সুখী হতে পারেন। সংসার পরিচালনায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দায়িত্ব হবে সমান তারই চাহিদা ও সামর্থ্যের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব।

অঞ্জলি চৌধুরী

কামাল হোসেন

জয়দেব আমাকে বলল—তোর গল্পোটা পড়লাম। বিচ্ছিরি হয়েছে'

আমি ঠিক ধরতে পারিনি প্রথমটা। মুখ তুলতেই ওদিকের চেয়ারে বসে থাকা বুচিরার গভীর—দুটি চোখ আমাকে বিব্রত করল। ও আজ ঘন নীল রঙের জর্জেট শাড়ি পরে এসেছে। এপাশে তরুণ ঘোষ, ওদিকে অমল আর সিদ্ধার্থ নিজেদের মধ্যে আলোচনায় ব্যস্ত।

হাসবার চেষ্টা করে বললাম—কোন গল্প? কী গল্প?

—যেতে দে—যেতে দে—এক আধটা ছাপা হতে না হতেই রেলা বেড়ে গেছে। তরুণ ঘোষ গম্ভীরভাবে বলল।

জয়দেব বলল—কেন, তোর গল্পো!

আমি যথার্থই 'বিস্মিত' তখন। শাশ্বতী বদরুন-নাহার আর রুচি সামনের চেয়ার-গুলিতে এসে বসল। মেয়েদের সামনে কেউ বাড়িয়ে চাড়িয়ে বললে মন্দ লাগে না, বিশেষতঃ 'লেখক' ইত্যাদি বিশেষণ শুনতে কার না ভাল লাগে? তবু যেন আমি বুঝতে পারি, এদের সঙ্গে একটা ভীষণ প্রতারণা করে চলেছি...

এবং অন্যমনস্কভাবে সত্যি সত্যি পাঠার মতো হাটের মাঝে হাঁড়ি ভেঙে বসলাম—কী যা তা বলছিস। আমি আবার গল্প লিখতে পারি নাকি? সে অন্য কেউ হবে।

জয়দেব এবার দারুন রেগে গেছে মনে হল—খুব হয়েছে। গল্পোটা আমার বিচ্ছিরি লেগেছে হাজার বার বলব, কিন্তু লিখেছিস তুই, এটা অস্বীকার করবি কেন?

—বলছি তো সে অন্য কেউ।

—ফের বাজে কথা। তুই কামাল—তোর নাম' জানি না?

—নামে নামে মিলে গেলেই আমাকে অন্যের সনাম দুর্নাম মাথায় তুলে নিতে হবে জয়দেব?

তরুণ ঘোষ মাঝখান থেকে বলল—যেতে দে বাবা—দর বাড়াচ্ছে'

আমি যে কী ভাবে বোঝাব, যদি কেউ থাকে আমার নামে, তার দায়-দায়িত্ব আমি নিতে যাব কেন?

মুখ তুলে চাইতে লজ্জা করছিল। মেয়েরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছিল। হতে পারে অন্য কারণে। কতো রকম কৌতুকের বিষয়বস্তু থাকে। কিংবা আমি নিজেই হঠাৎ সত্যি কথা বলতে গিয়ে ওদের কাছে হাসির খোরাক হয়ে গেলাম।

প্রফেসর সমর মিত্রের বাড়িতে আমরা নোট নিতে এসেছি। আমি তো এদেরই মতো একজন সাধারণ ছাত্র। পড়াশুনো, হাসি ঠাট্টা, আড্ডা, ইয়ার্কি... যেমনটা স্বাভাবিক। আমার বন্ধুদের কেউ কেউ সাহিত্য করে, কেউ কেউ সিনেমা থিয়েটার এসব অনেক কিছুর সঙ্গে যুক্ত। রেডিও টিভিতেও অনেকে অংশ গ্রহণ করে থাকে। খেলা-ধুলোতে ন্যাশনাল টিমে কেউ কেউ ঠাঁই করে নিয়েছে। এদের জন্য আমি গর্বিত। অন্য অনেকের কাছে এদের নিয়ে আলোচনা করে থাকি:

ওদের তুলনায় আমি যে কতো সাধারণ, কীটস্য কীট .নিজেকে জানি ভালভাবে—হঠাৎ কেন কে জানে কেউ কেউ তাদের আলোচনার মধ্যে আমাকে উল্লেখ করলে স্বাভাবিকভাবেই অড়ষ্টতা বোধ করি।

আমার চেহারাতে খুব একটা বিশেষ কিছুও নেই। বেটে কালো মোটা—বিশেষণ হিসেবে এসব ব্যবহার করা যেতে পারে। আসলে এত কিছু আত্মবিবরণ দেওয়ার অর্থ, আমি যা বলতে চাই, নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে রাখতে সর্বক্ষণ ব্যস্ত আমি, অন্য কারোর মুখে নিজের নাম শুনলে চমকে উঠি, বুঝে উঠতে চেষ্টা করি, সেই নামধারী লোকটি কে? কেমন দেখতে?

প্রফেসার মিত্র ঘরে ঢোকার আগে গম্ভীর-ভাবে জয়দেব বলল—লিখছিস, খুব ভাল কথা। শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিস না। এবার একটু বিদেশী সাহিত্য-টাহিত্য পড়—ফ্রেঞ্চ ম্যারিকান রাশ্যান—জস্টে ভস্কি পড়েছিস? হেমিংওয়ে?

আমি আরো দিশাহারা হয়ে গেলাম। আমার সকরুণ স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও জয়দেবের মনে তাহলে সেই ভ্রান্তি দারুনভাবে জীবিত। অর্থাৎ কোথায় কে গল্প-টল্প লিখেছে, তার ভালো-মন্দের দায়িত্ব আমার কাঁধে চাপাতে চায়। আমি ক্রমশ বিভ্রান্ত হচ্ছিলাম—আমি কি তাহলে জয়দেবের কথা মতো ডস্টয়েভস্কি বা হেমিংওয়ে নামের ভদ্রলোকদের বইয়ের সন্ধানে কোন লাইব্রেরীতে নাম লেখাব? অথচ সেই অপরিচিত অজানা মানুষটি আমার কাছে কোনো দিন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে আসবে না।

প্রচন্ড রাগ হয়। ইচ্ছে হয়। ইচ্ছে হয় সেই লোকটাকে সামনে দাঁড় করিয়ে তার চোয়ালে বুকে পেটে দমাদম ঘুষি চালিয়ে নক আউট করে দিই। বিশ্বের বাইরে থেকে ছুটে এসে কোন মিনি স্কার্ট মহিলা আমার গণ্ডি রাঙিয়ে দিক...। 'সোসাইটি'তে ঋত্বিক ঘটকের 'কোমল গান্ধার' দেখতে গিয়ে যেমন দেখেছিলাম, কয়েকজন তরুণী সাজা মধ্য-তিরিশের মহিলা সত্যজিৎ রায়ের সামনে কাগজের টুকরো সাজিয়ে অটোগ্রাফ নিচ্ছিলেন; একজন পৃথিবীখ্যাত মানুষের নাম তার স্বহস্তে অঙ্কিত হয়ে সংখ্যাহীন মানুষের কাছে ছুটে ছুটে যাচ্ছিল, পরিচয়-লিপি—কারো ভুল করবার উপায় নেই। অর্থাৎ যার যা প্রাপ্য সে ভোগ করুক, সেই অদৃশ্য মানুষটি আমার ঘাড়ে চেপে বসবে কেন?

এরকম ছোটখাটো ভ্রান্তিবিলাস বহুবার আমার জীবনে উপভোগ করেছি। উপভোগ করেছি বলা ভুল, দুপুর বোদে খোলা মাঠে কোথায় লুকিয়ে থাকা একটি শুকনো বাবলা কাঁটা পায়ের গোড়ালিতে ঢুকে যায়, এরকম অনর্থক অনধিকার প্রবেশে শরীর মন বিষিয়ে যায়, অভিমানে নিজের অক্ষমতাকে ক্ষত-বিক্ষত করে নিজেকে ব্যঙ্গ করা ছাড়া উপায় থাকে না।

আমাদের পাশের ফ্ল্যাটের রেজাউল করিম চৌধুরী একদিন আমাকে বলেছিল—গুরু, ওটি কে ছিল? কলেজ-কলিগ?

আমার অবাক চোখের দিকে তাকিয়ে ও বলল—মেট্রোর সামনে, কাল বিকেলে। বেশ ফাইন জিনিস বড়শিতে গেঁথেছ গুরু।

রেজাউল আমার সমবয়েসী। একই বয়েসের সব রকম হাস্য-পরিহাস আমাদের মধ্যে চলে থাকে। তবু কেন আমি কথা খুঁজে পাই না? কোন রকমে বলি—আমি? কাল বিকেলে? মেট্রোর সামনে? সঙ্গে জিনিস? কি জিনিস?

—আহা যৌবনভরা যুবতী নারী। কিন্তু আমার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলে কেন? পাছে আলাপ করতে চাই? তা দিন-দুপুরে প্রেমিকা নিয়ে চৌরঙ্গী দিয়ে হাঁটছ, লোকের চোখে ধুলো দওয়া তো সম্ভব নয়!

বাঃ বেশ মজাতো! সুন্দরী, তাই যুবতী! আমার পাশে পাশে। মেট্রোর সামনে দিয়ে। দৃশ্যটা কল্পনা করতেও ভাল লাগে। চারপাশে ব্যস্ত লোকজন, আরো অনেক অনেক প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে দিয়ে যেন লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ওরা দুটিতে হেঁটে চলেছে। আমার বুকের ভিতরে জেগে ওঠে বহু দিনের ঘুমিয়ে থাকা দৈত্য! কে ছিল সেই মায়াবী যাদুকর? যে হুবহু আমার চোখ-মুখ চেহারা চুরি করে পথের লোককে ধাঁধায় ফেলে দিব্যি তার প্রেমিকাকে নিয়ে কতো সুখ অনুভব করতে করতে চলে গেল; আর যত অপবাদের দায় চাপল আমার মাথায়!

চোখ নাচিয়ে রেজাউল বলল—লাভারের নামটি জানতে পারি না গুরু?

—টুসুয়া!

—বেশ মিষ্টি নাম তো!

আমার মনের পর্দায় ধর্মতলা স্ট্রীটের অজস্র ট্রাম বাস লরি টেম্পোর দ্রুত চলাফেরার যন্ত্রগর্জন আক্রমণ করতে থাকল। কে ছিল সেই অদৃশ্য প্রম্পটার, যে আমার মুখে ঠিক এই মুহূর্তটিতে 'টুসুয়া' নামটি তুলে দিল? আপন-নির্বুদ্ধিতায় নিজের উপর রাগ হতে থাকল। আমি কি ওর এই মজার খবরটাতে নিজেকে নায়ক হিসেবে ভাববার অবকাশ খুঁজে পেয়েছিলাম? তাই লোভ সামলাতে পারলাম না? কে টুসুয়া? ও নামে আদৌ কোন চেনা-অচেনা মেয়েকে কখনো দেখেছি আমি? মনে তো পড়ে না। তাহলে কি ভাবে বুঝব ও নামের কোন মেয়ের প্রতি আমার অবদমিত তৃষ্ণা অবচেতনের অন্ধকারে ওঁৎ পেতে থাকা বাগিয়ে চুপিসাড়ে বসেছিল। তাই ঠিক সময়টিতে কাঁপ দিল তার অস্তিত্ব সচেতন?

পরিহাসের হাসি রেজাউল বলল—বেশ প্রেম-ট্রেম করছ, খুব সুখের কথা! দেখো, যাতে চিরস্থায়ী হয়, সেদিকে চেষ্টা কর। অ্যাদ্দিন ধরে ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়াচ্ছ, নেহাৎ কম মেয়ের সঙ্গে তোমার অ্যাফেয়ার চোখে পড়ল না।

ওর সঙ্গে আমার বছর চারেকের পরিচয়। আমার নিজের আদৌ কোন প্রেমিকা আছে কিনা ওর জানার কথা নয়। এটা ঠিক, অনেক সময় বন্ধু মহলে দর বাড়াবার জন্য এক-আধটি সস্তা প্রেমের ঘটনা বানিয়ে বলবার চেষ্টা করে থাকি। সে সময় কেউ সেগুলো গুরুত্ব দেয় না বলেই এতদিন জানতাম। আমি যে প্রচন্ড রকমের গুলবাজ, এটা কারোর অজানা নয়। অথচ আমার মত দেখতে কোথায় কে একটি মেয়ের হাত ধরে পথ হাঁটছিল, আর রেজাউল দিব্যি বিজ্ঞের মত আমার সমস্ত জীবনটা উল্টে পাল্টে দেখে নিয়ে বলে গেল—এতদিন আমি বহু মেয়ের সঙ্গে খেলাধুলো করে আসছি। এবং একজন পাকা ওস্তাদের মতো।

গত বছর পুজোর ছুটিতে ট্রেনে করে পশ্চিম ভারত যাচ্ছিলাম। অন্যমনী কোন স্টেশন থেকে এক যুবক উঠল। বেশবাস ঝকঝকে। উজ্জ্বল। চোখে ভারী ফ্রেমের চশমা। আমাকে দেখেই সে সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল—আরে কামাল, কেমন আছিস? সব খবর ভাল তো?

আমি কিন্তু তাকে একদম চিনতে পারলাম না। আমার অলস চোখের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ বাঁকা কণ্ঠে সে বলল—তোর মনে নেই কামাল। আমি উমাশংকর রে! ছেলেবেলা থেকে আমরা বন্ধু। মনে করে দেখ, আমাদের সেই প্রাণঢালা অদ্ভুত ছট-ফটে কৈশোর—সেই মফস্বল শহরের পথে-পথে রাতদিন ঘুরে বেড়াতাম। নতুন পাওয়া বড় বড় চোখ মেলে মেয়েদের দিকে তাকাতাম—সেই যে নদীর ধারে সেই সব সুন্দর সুন্দর মেয়েরা—ব্রততী, মহুয়া, জয়শ্রী, নার্গিস, ফিরোজা—

ভীষণভাবে চটে যাচ্ছিলাম আমি। কী সব আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছে এই যুবক? একে আমি কখনো দেখেছি? ইচ্ছে হল রাধা দিয়ে বলি—মশাই, কামাল নামে বা এরকম চেহারার অন্য কারোকে আপনি চিনতেন। আর কৈশোর? বিশ্বাস করুন, আমার ছেলে-বেলায় কবে আমি প্রাইমারী ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম, রচনা লেখার খাতায় সেই বিশেষ স্মরণীয় দিনটির কথা আমি হাজার চেষ্টা করলেও এখন মনে করতে পারব না। ব্রততী মহুয়া জয়শ্রী নার্গিস ফিরোজা—এ ধরনের নামগুলো শুনলে স্বাভাবিকভাবেই সুন্দর সুন্দর মোমের পুতুলের মতো সব মিষ্টি মেয়েদের কথা মনে এসে যায়। কিন্তু এরকম নামের কাউকে আমি কখনো চিনতাম? ক্ষমা করুন স্যার, সত্যের অপলাপ হবে, কোন মফঃস্বল শহরে নদীর ধারে এরকম সদা পরিবর্তনের হাওয়া গায়ে লাগা কিশোরী-দের পিছু পিছু নিছক খেয়ালখুশী হেঁটে

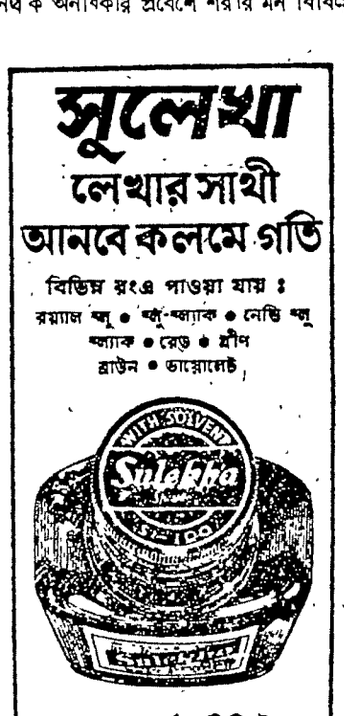

যেতাম, ভাবতে দারুন রোমান্টিক লাগে, কিন্তু সত্যি সত্যি ওরকম কোন বুপকথার জগতের বাসিন্দা হবার সৌভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করিনি। কৈশোর জিনিসটাই আদৌ কী আমার কাছে ধোঁয়াটে ঠেকে। এই তো কবে যেন ছোট ছিলাম, তারপর দিব্যি ঝট-পট হাত-পা মেলে বড় হয়ে গেছি।

অনেক গল্প করে গেল উমাশংকর। সদ্য পরিণীতা স্ত্রীর সঙ্গে ওর যে একটি নিতান্ত ব্যক্তিগত জটিল সমস্যা উপস্থিত হয়েছে, ইচ্ছে না থাকলেও চুপচাপ কান পেতে শুনে যেতে হল। এ রকম কতো ভাবেই না পরস্পরকে ঠকিয়ে গেলাম। আমার স্মৃতিতে ওর কোন স্থান নেই, তবু উমাশংকর কী সুন্দর সাজিয়ে গুছিয়ে কেমন একটা নস্টালজিয়ার ছায়া এনে দিল গতিময় ট্রেনের কামরায়।

চোখের চশমা খুলে ফেলল ও। চোখে-মুখে অদ্ভুত বিমর্ষতা। যেন এতক্ষণ পরে একটা প্রচণ্ড মিথ্যাচারের পাপবোধ ওকে গ্রাস করল। গলা নামিয়ে হঠাৎ উদাসভাবে ও বলতে থাকল—সেই বৃষ্টিভরা বিকেলের কথা মনে আছে তোর? আমরা বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। ব্রততীরাও বেড়াচ্ছিল। বৈশাখ মাসের শেষ বিকেলের হঠাৎ বৃষ্টি। ওরা এক ছুটে ঠাকুরবাড়িতে ঠাঁই করেছিল। আমাদের তখন কিন্তু কোথাও মাথা গোঁজার চিন্তা একবারও হয়নি। ঝরঝর করে ঝরে চলেছিল বৃষ্টির ফুল। ঠিক যেমন ফুটবল খেলার মাঠে খেলা শেষ হয়ে যাবার পর পরাজিত দলের সমর্থকরা মাথা নীচু করে বাড়ি ফেরার পথে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে যাবার অপেক্ষায় মনে মনে প্রস্তুতি নেয়; ওই সব মেয়েরা—ব্রততী ফিরোজারা—যারা কোন দিন আমাদের গ্রাহ্যের মধ্যে আনে নি, যার ফলে সব সময় এক অসম্ভব পরাজয়ের গ্লানি আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখত, ঠিক সে সময় প্রকৃতিতে টালমাটাল বৃষ্টির বন্যতা এক ভিন্ন স্বাদের সহানুভূতি এনে দিয়েছিল আমাদের মাথার উপরে। আমরা পাগলের মতো সেই বৃষ্টির ঝরনার তলায় ছুটে ছুটে বেড়াতে থাকলাম। কিছুক্ষণের জন্য বোধ হয় পুরনো বটগাছের ছাতার নীচে দাঁড়িয়েছিলাম। আবার সেই পথে পথে ছোটাছুটি— পথে ঘাটে লোকজন কেউ তেমন ছিল না, হয়ত সত্যি-কারের পাগল ভিখারী কেউ বেউ। সেদিন বুকের ভিতরে যে নির্বোধ উল্লাস অনুভব করেছিলাম, এখনো কোন বৃষ্টিঝরা বিকেলে তুই মনে মনে কেঁপে উঠিস না কামাল?

ট্রেনের কামরায় আরো অনেক অবাঙালী যাত্রীদের চোখ-মুখ বেশবাস কথাবার্তা দেখে যাচ্ছিলাম। উমাশংকরের বেশীর ভাগ কথাই কানে ঢুকছিল না। ও একটি বিকেল বেলার কথা বলে যাচ্ছিল। বর্ষাক্রান্ত কতো অপরাহ্ণ নিশীথবেলা কেটে গেছে। ভুলিব না' এরকম শপথ করার মতো কটা বিকেলের দেখা পেলাম এ জীবনে? যৌবনের মেয়াদ আর কদিন? মস্তিষ্কের কোষে কোষে কতো লঘু পায়ের আওয়াজ চলে ফিরে বেড়ায়। দুঃখ দুশ্চিন্তা ম্লান করে। মনে হল, উমাশংকরের কৈশোরের ওই সব মোহময় বৃষ্টিভরা উচ্ছাস-জড়ানো রঙিন অভিজ্ঞতার এক টুকরো অংশ যদি আমার সেই কবে হারিয়ে যাওয়া কৈশোরে উপভোগ করে নিতাম, আমার মতো সুখী বোধ হয় কেউ থাকত না।

উমাশংকরের গলায় স্মৃতিচারণের মোহ —আমরা ছেলেবেলায় নাটক করতাম, মায়েদের শাড়ি দিয়ে ঘরের ভিতরে স্টেজ করতাম। পাউডার কাজল দিয়ে মেকাপ হত। মাঝে মাঝে পাড়ার সমবয়েসী ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের আঁকা ছবি নিয়ে সবাই মিলে একজিবিশান করতাম।

হঠাৎ কেন জানি না বলে ফেললাম—তবলা?

—একজ্যাকটলি! উমাশংকর এতক্ষণে যেন হাতের কাছে স্পর্শ করার মতো কিছু পেয়ে গেল।—তোর মনে আছে দেখছি! না-রে, তবলা এখনো ছাড়তে পারিনি। ওই নেশাটা নিয়েই তো আমি বেঁচে আছি।

সেবার সারাটা ভ্রমণপথ ধরে ভেবে মরেছি, কেন আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল ওই বাদ্যযন্ত্রের সংজ্ঞা? ওই উমাশংকর নামে যুবক, তার অনর্গল কথাবার্তার সঙ্গে আমি কখনো খাপ খাওয়াতে পারি নি। বস্তুত জাতিস্মর-তত্ত্বে আমার বিশ্বাস নেই। তবু মুখে মাঝে কারা যেন আমার কাছে এসে অন্য কোন মানুষ অন্য জীবনের গল্প শুনিয়ে যায়; এসব থেকে এক মারাত্মক ভ্রমের মায়াজাল আমার চারপাশে বিস্তার করে।

এ গল্পের প্রথম থেকেই আপনি নিশ্চয়ই অস্বস্তি বোধ করছেন, কিংবা আমোদ পাচ্ছেন—কী এমন একটা হাতি ঘোড়া ব্যাপার। এই ভুবনজোড়া পরিব্যাপ্ত চরাচরে অসংখ্য গ্রাম-গঞ্জ নগর বন্দরে কতো বিচিত্র জাতি-উপজাতির মানুষই না বসবাস করছে; তার মধ্যে অন্ততঃ 'সম্ভাবনার' হিসেব মাফিক কোন দুটি মানুষের পা থেকে মাথা পর্যন্ত পুরোপুরি মিলে যাওয়া অবাস্তব কিছু নয়। এমন কি তাদের নাম-ধামটাও।

এ পর্যন্ত ঠিকঠাক কল্পনা করে নিতে অসুবিধা নেই। জীবন বিস্তৃত, কতো রকম জটিলতা, জাগরণে নিদ্রায় কতো যে ব্যথা বেদনা-দুঃখ অপমানের গ্লানি আমাদের বহন করে পথ চলতে হয়, সেক্ষেত্রে এরকম ছোট-খাটো ব্যক্তিগত সমস্যার কথা লোককে ডেকে শোনানো অবশ্যই এক ধরনের নির্বুদ্ধিতা। কিন্তু সামান্য কষ্ট স্বীকার করে একবারটি ভেবে দেখুন, এই যে আমাদের বেঁচে থাকা, এরকম মুখ থুবড়ে চার দেয়ালের মধ্যে দিনযাপন, যন্ত্রের মতো নিজের নিজের কাজ করে যাওয়া, নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতার নিয়ত দ্বন্দ্ব, এসব কিছুতে ঠিক নতুনত্ব কোথায়?

দয়া করে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে একেবারে একাকী এখন বাইরের পোশাক-আশাক খুলে ফেলুন। ভেবে দেখুন, আপনি কে? যে রাম শ্যাম যদু মধুর নামের আড়ালে আপনি অধ্যাপক, চিকিৎসক, সমাজসেবী, শিল্পী, শ্রমিক অথবা নিতান্ত একজন মাতাল কিংবা ভাঁড়, সেই বিশেষ চরিত্র কি এখন খুঁজে পাচ্ছেন? তাহলে আপনার নিজের বলতে পরিচয় কী দাঁড়াচ্ছে? আপনার কি ঘৃণা হবে না, একজন পাজি বা মহৎ মানুষের নামের আড়ালে লোকের চোখে ধুলো দেওয়ার কী তুখোড় অভিনয় করে যেতে হচ্ছে আপনাকে? একদিন নয়, দুদিন নয়, ঘরে থেকে বুঝতে শিখেছেন এ-পৃথিবীতে বেঁচে থাকার এটাই মূলমন্ত্র, মুহূর্তেই অভিনয়ের বেশবাস পরে নিতে দ্বিধা করেন নি। ভেবে দেখুন, যে লোকটি বউক বাকিয়ে অফিসের তরুণী টাইপিস্টের সঙ্গে সিনেমা দেখে আসেন, বেশ্যাবাড়ি মদ্যপান ইত্যাদি সাঙ্গ করে রাতদুপুরে বাড়ি ফিরে একটা হাবাগোবা লোভী স্ত্রীলোকের কাছে আধো জড়ানো গলায় আগামী মাসে ফ্রিজ কিংবা গোদরেজ আলমারী কেনার প্রতিজ্ঞা করেন, কার্যক্ষেত্রে ঘুষ নিতে বা উপরতলার সিঁড়ি বেয়ে আর এক ধাপ উঠবার মোহে মিথ্যা বলতে দ্বিধা করেন না, চারপাশে অনেক ভণ্ডামী কিংবা মিথ্যার দম্ভ শুনেও বিচলিত হন না; একজন জলজ্যান্ত মানুষ আপনি একা একা অতিনিপুণ-ভাবে এতগুলো ভূমিকা স্বচ্ছন্দে পালন করতে পারেন, আজ্ঞে না, আমি বিশ্বাস করি না। অর্থাৎ আপনার আমার প্রত্যেকের পরি মুহূর্তের জন্য কোটি কোটি 'ডামি' ঠিক সময়টিতে নিজেদের কাজ করে চলেছে। অস্বীকার করতে চান? ঠিক আছে, নিজের খেলামেলা শরীরের দিকে তাকিয়ে বলুন তো কতখানি সৎ আপনি? আর এত সব বদমায়েসী করার কারণটা কী? উত্তর তো আপনার মুখেই ধরা আছে—বেঁচে আছি। নিজের বলতে কিছুই নেই। আপন শরীরটাও একটা প্রচণ্ড ধাপ্পা, কবে যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে যাবে, আপনার ভিতরে সত্যিকারের 'আমি' বলে যদি কোন পদার্থ আদৌ থেকে থাকে শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে; আপনার একখানা আলোকচিত্র আত্মীয়-পরিজন হয়ত বাঁধিয়ে যত্ন করে দেয়ালে সাজিয়ে রাখতে পারেন, কিন্তু সেটা যে কী মর্মান্তিক পরি-হাস আশাকরি আপনি বুঝতে পারছেন।

শরৎ জন্মশত বার্ষিকীতে বহু তথ্যসমৃদ্ধ সুশ্রদ্ধ অর্ঘ্য—
শরৎচন্দ্র—মণি বাগচি—১৮৲
রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম • কাজী নজরুল ইসলাম • ২০৲
দেশবন্ধু • মণি বাগচি • ২০৲
মহানায়ক মুজিবুর—অরুণকুমার সরকার • ১০৲ মহাজীবন—অরুণকুমার সরকার • ২০৲
মোহন লাইব্রেরী : ৩৫ এ, সূর্যসেন স্ট্রীট • কলিকাতা ৯
ফোন : ৩৫-৩৬১৩

তাহলে দেখুন কী রকম উদ্দেশ্যহীন বেঁচে আছি; আসল মানুষটা অন্য কোথাও কোন জলপ্রপাতের তলায় দাঁড়িয়ে আর এক নতুন খেলার মতলব আঁটছে দিব্যি ভরতাজা বেঁচে আছে নিজের বাস্তব অস্তিত্ব নিয়ে, সে ইচ্ছে মতো গল্প লেখে বা ছবি আঁকে, প্রেমিকার ওষ্ঠে ওষ্ঠ ছুঁইয়ে কবিতার মধুহীন স্বাদ খুঁজে পায়—আর আমি হতভাগা একটা ডামি হয়ে অন্যজনের বোঝা নিজের কাঁধে চাপিয়ে নিয়েছি। আমার চারপাশে এই ভিড়ে ভিড়ে অসহ্য পরিবেশ, বাতাসে মৃত মানুষের দেহ থেকে উঠে আসা দুর্গন্ধ, স্বপ্নের অন্য কোন জগতের বীভৎস চেহারার অশরীরী প্রেতাত্মাদের ইতস্ততঃ নিঃশব্দে চলাফেরা.....

হঠাৎ ঠিক হয়ে গেল বাইরে বেশ কিছু দিনের জন্য আমাকে চলে যেতে হবে। এ শহর ছেড়ে। আমার উদ্দেশ্যে পাঠানো কোন মানিঅর্ডার, রেজিস্ট্রি কে জানে কোন দিন যদি ফেরত চলে যায়, সেজন্য স্থানীয় পোস্ট অফিসে আমাকে যেতে হল। আমার নাম পাঠানো সব কিছু গ্রহণ করার অধিকারার্থে ভাইয়ের নামে অথোরাইজ করে দেবার জন্য।

পোস্টমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করলাম। সদাশয়, ব্যক্তি। তিনি আমার দরখাস্ত গ্রহণ করার আগে জানালেন, নিয়মমাফিক আমার রাস্তার পোস্টম্যানের কাছে আইডেনটিফাই করে নিতে হবে যে আমি মানুষটা কামাল হোসেন। নরম্যাল অ্যাটেনটেশন।

সত্যি কথা বলতে কী, ছোটবেলায় ডাকঘরের অমলের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যই হোক, বা অন্য কোন কারণে পোস্টম্যানদের প্রতি আমার মনে একটা অভিমানবশতঃ দূরত্ববোধ চিরকাল রয়ে গেছে। কতো দিন ধরে প্রতীক্ষা করে আছি, তবু তারা কোন দিন আমার হাতে পৌঁছে দিয়ে গেল না সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত মহারাজার চিঠিখানি।

মুখে হাসি এনে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে পোস্টম্যান ভদ্রলোককে অনুরোধ করলাম।

অদ্ভুত ধূর্ত চক্ষু মেলে তিনি বললেন—আমি কী ভাবে জানব যে আপনি কামাল হোসেন?

আমি খুব সহজভাবে বললাম—আজ্ঞে হ্যাঁ মাস্টার, ব্যাপারটা তাই আমার নাম।

সহানুভূতিহীন কোন অভিব্যক্তির পরিচয় নেই এরকম মুখোশ মুখের উপর ভালো করে এঁটে নিয়ে তিনি বললেন—যে বাড়ির নম্বর নিয়ে এসেছেন, সে বাড়িতে কখনো কাউকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। লেটার বাকসোতে চিঠি ফেলে আসি.. হ্যাঁ, কখনো হয়ত একটা কাঁচা বয়সের মেয়েমানুষকে জানলায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি।

—দেখুন, আপনি আমাকে দেখবেন সেজন্য দরজা আলো করে সারা দিন ধরে দাঁড়িয়ে থাকা তো সম্ভব নয়, কতো রকম কাজকর্মে ব্যস্ত থাকি,...তবু বিশ্বাস করুন আপনি কখন চিঠি দিতে আসবেন, সর্বক্ষণ দারুন উৎকণ্ঠায় প্রস্তুত থাকি...বুঝতে পারছি, এসব নিয়ম কানুনের ব্যাপারে... তবু যদি একটু কনসিডার করে...

যেন লোকটিকে এখুনি উৎকোচের লোভ দেখালাম, সেই মহাপুরুষ ব্যক্তি গলার স্বর সামান্য উঁচু করে বললেন—আপনাকে কোন দিন চোখে দেখলাম না, নাম জানি না, আমাকে একটা পাঁড়মাতাল ঠাউরে নিলেন নাকি মশাই? আমি একটা গাধা না খচ্চর? জোচ্চুরির জায়গা পান নি? প্রমাণ—প্রমাণ চাই সব কিছুর।

আমি বিনীতভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলাম—আসলে সত্যি সত্যি হয়ত কোন মানি অর্ডার বা রেজিস্ট্রি পার্সেল এসব কিছুই আসবে না, কে ওসব পাঠাবে বলুন—তবু অনেক দিনের জন্য চলে যাচ্ছি বলতে পারেন—একটা নিছক ইচ্ছে হল তাই এসে পড়েছি। কতো কিছু আশাই তো আমাদের বুকের মধ্যে লুকোনো থাকে...

পোস্টমাস্টার মশাই নির্বিকার দৃষ্টিপাত করে বললেন—আপনার বুথের পোস্টম্যান আপনাকে চিনতে পারল না, এখন আমরা দায়িত্ব নিতে যাব কেন বলুন? আইনকানুন বলে এদেশে কিছু নেই ভাবছেন? জঙ্গলের রাজত্ব পেয়েছেন? তখন আসল কামাল হোসেন এসে আমাদের বিপদে ফেলুক...

আমার শিরদাঁড়া বেয়ে শ্রেফ উপত্যকার রাশি রাশি তুষার স্তূপের হিমেল প্রবাহ। বুঝতে কষ্ট হল না সেই অন্য কেউ আবার অন্য কোন রসিকতায় মেতে উঠেছে। সে তার নিজের নিন্দা প্রশংসা অবলীলাক্রমে যেমন এতদিন আমার ঘাড়ের উপরে চাপিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল, তেমনি আবার খেয়াল-খুশী মতো আমার নিজের বাবা-মার দেওয়া নামটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে সকলের মাঝখানে পরিচয়হীন অনাথ করে ছেড়ে ছিল। সামান্য নাম হারালে মানুষ এত অসহায় হয়ে যায়, আগে জানা ছিল না।

কানের কাছে পোস্টমাস্টার মশাইয়ের অসংলগ্ন বিড় বিড় কথাবার্তা ভেসে আসছিল...রেসপনসিবল লোকাল জেন্টলম্যানদের ধরে নিয়ে আসতে হবে..কিংবা এম এল এ বা এম পি—জনগণের প্রতিনিধিদের কাউকে...ইত্যাদি ইত্যাদি...

কীভাবে ঘটনার আকস্মিকতায় নিজের আইডেনটিটি হারিয়ে ফেলে আমি একজন নামহীন মানুষ মাথা হেঁট করে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। চতুর্দিকে কলকাতা মহানগরীর লক্ষ লক্ষ মানুষ গর্বিত পা ফেলে ফেলে নিজেদের পথ ধরে হেঁটে চলেছে। এরা প্রত্যেকেই এখন থেকে আমাকে উপেক্ষার চোখে দেখবে। উমাশংকর নামে কোন যুবক কোন দিন আমার কাঁধে হাত রেখে নিজে থেকে বহু যুগ আগের সেই দুটি কিশোরের বেদনাঘন কৈশোরের রোমাঞ্চময় কাহিনী শোনাতে বসবে না। রেজাউল কোন দিন বলবে না—চৌরঙ্গীর ব্যস্ত কোলাহলে বা লোকচক্ষুর আড়ালে নির্জন সমুদ্র সৈকতে টুসুয়া নামের কোনো জ্যোৎস্নার পবিত্র আলোয় ধোয়া মায়াবী রমণীর হাত ধরে পথ হেঁটেছিলাম কিনা। কিংবা জয়দেব আর কোন দিন নতুন উৎসাহে আর একটি নতুন গল্পো লেখার অভিনন্দন জানাবে না।

বেশ বুঝতে পারছি আমার সেই পুরনো খোলসের প্রতি একটা অমোঘ মোহ জন্মে গেছল। আমি যে একটা সামান্য ডামি ছাড়া কিছু নই, অন্য একজনের দ্বারা নিযুক্ত ছিলাম, ক্ষণকালের জন্য হলেও সে সব ভুলে যেতে ভালো বেসেছিলাম; তাই বোধ হয় এরকম ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছে। এতদিন পর হঠাৎ আমার প্রতারণা সকলের সামনে ধরা পড়ে যাবার পর উলঙ্গ অবস্থায় এই অভিনব মুক্তি বা স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েও কেমন যেন অপমানিত বোধ করছি, গোটা পৃথিবীর নামধারী মানুষদের চরম শত্রু মনে হচ্ছে; হায়, ওই সব ডামিদেরও এখন থেকে আমি ঈর্ষা করে যাব।

আসলে কখন কার হাতে তার নিজস্ব 'ডামি' চরিত্রের অভিনয় পালা শেষ হয়ে যাবার 'ছাটাইপত্র' সেই অন্য কারোর প্রতিনিধি চুপিসাড়ে এসে হাতে গুঁজে দিয়ে চলে যাবে এক মুহূর্ত আগেও তা টের পাবার উপায় নেই। সেই ভয়ানক খবরটুকু এসে পৌঁছুবার আগে পর্যন্ত প্রত্যেকের ঘর ঘরে জায়া-পুত্র পরিজন নিয়ে আপাততঃ উৎসবের সানাই বেজে চলুক।

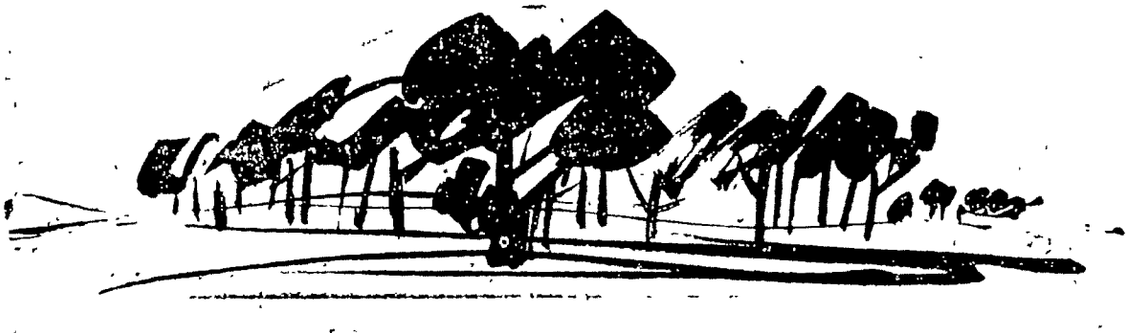

স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ॥ ৪

সুকুমার সমাজপতি

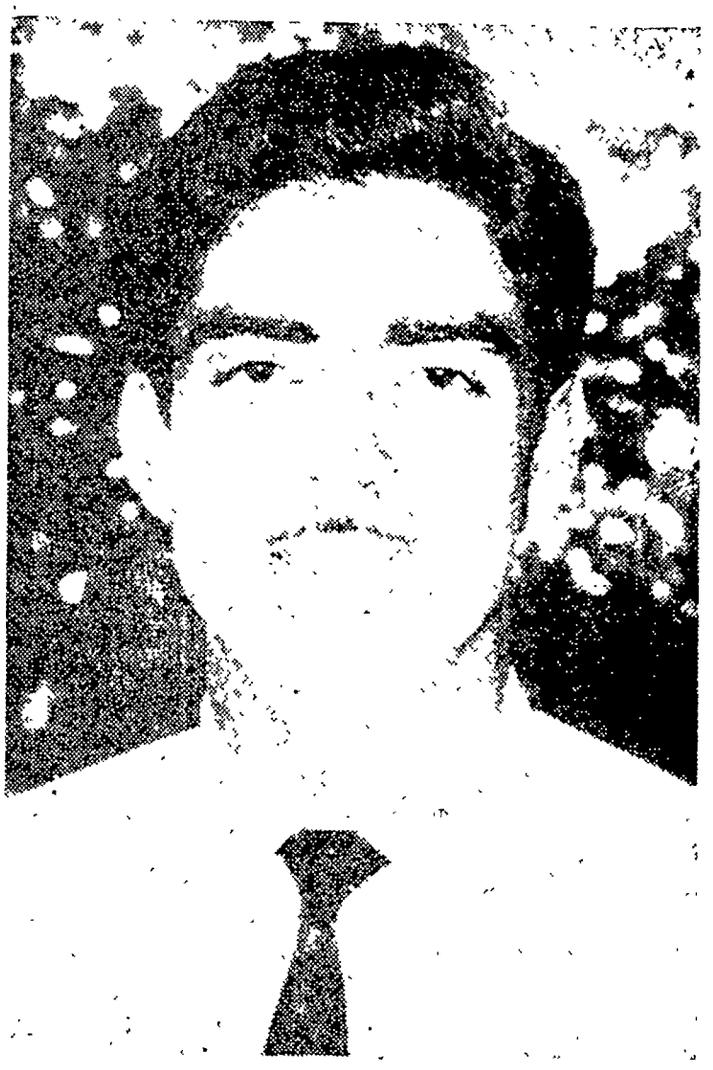

ফুটবল পাগল কলকাতায় অনেকেই সমাজপতিদের চেনেন। কালীপদ, শ্রীপদ, কৃষ্ণপদ, বিভূপদ—এক পরিবারের এইসব সন্তান ত্রিশ-চল্লিশের দশকে হ্যাফপ্যান্ট ও সার্ট এঁটে মরশুমী ফুটবল উপলক্ষে কলকাতার মাঠে ময়দানে ছড়িয়ে থাকতেন। সকলেরই নামডাক হয়েছিল। কলকাতার সিনিয়ার ফুটবলের আসরে তাঁরা ছিলেন এক একটি জীবন্ত চরিত্র।

এক বাড়ীতে এতোগুলি খেলোয়াড়। সুতরাং বাড়ীর আবহাওয়াও অনুমেয়। আলাপে গুঞ্জনে, বৈঠকে গালগল্পে ফুটবলই অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসতো। নিজেদের খেলা থাকলে তো কথাই নেই, অন্যদের খেলা ঘিরেও প্রতিদিন চুলচেরা বিশ্লেষণে আলোচনা শুরু হয়ে যেতো। কে ভাল খেললো, কার খেলা খারাপ হলো। কে দল জেতালো আর কার দোষে দলের হার হয়ে গেল, খুঁটিনাটি নানান আওয়াজে সারা বাড়ী গমগম করতো। নিরন্তর আলোচনা নেহাৎ নিরুত্তাপও হোত না। মাঝে মাঝে তর্কের ঝড় উঠতো। মতের পিঠে মত এসে পড়ে উত্তাপও জমতো। চড়া গলার চীৎকার। পাড়ার মানুষেরা সকচিত হয়ে উঠতেন। আর অন্তঃপুরবাসিনী মাঝে মাঝে বার বাড়ীতে ছুটে আসতেন ভায়েদের ঝগড়া মেটাতে। বলতেন, মাঠের ঝগড়া তোমরা বাপু চৌকাঠের বাইরেই রেখে এসো না।

কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। মেয়েদের কথা নেয়েলী ভাষ্য জ্ঞানে উপেক্ষা করে ওঁরা ওঁদের নিত্যকার কাজ সেরে তুলতেন। বৈঠকখানায় মস্তো বড় একটি গোল টেবল ছিল। তারই চারপাশে গোল হয়ে বসে ওঁরা প্রতিদিনই ফুটবলের গুলতানি পাকাতে পাকাতে সন্ধে পেরিয়ে নিশুতিরাতে পৌঁছে যেতেন।

গোল টেবলে বক্তা অনেকেই। শুধু শ্রোতা বলতে একজন। এতোটুকু দুধের বাচ্চা। বয়স বছর সাত আট হবে। ওই পরিবারেরই এক সন্তান। গোল টেবলের মাঝখানে চুপটি করে বসে থাকতো। আর হাঁ করে গিলতো বাবা কাকাদের কথা। শুনতে শুনতেই সে মনের পাখা মেলে ফুড়ৎ করে উড়ে চলে যেতো কলকাতার গড়ের মাঠে। খেলা দেখতো। নামী নামী খেলোয়াড়দের মনের সুখে দেখে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে ভাবতো, আমি কবে ওঁদের মতো মাঠে নেমে খেলতে পারবো!

বাড়ীতে ফুটবলের গরম গরম হাওয়া বইছে। খেলাধুলোয় কিশোরটির জন্মযোগও সহজাত। কাজেই আবহাওয়ার আঁচ সে যে এড়িয়ে থাকতে পারে নি, তা বলাই বাহুল্য। বাবা-কাকাদের গল্পে প্রেরণা পেয়ে সে বাড়ীর ঘর চত্বরকে ফুটবল মাঠ বানিয়ে ববারের বল নিয়ে নিজের কাজে নিজের সংসারে মসগুল হয়ে থাকতে সেও দেরি করে নি। এমনি করেই সেদিনে। সেই কি শারদীয় ফুটবলে প্রথম পাঠ শুরু হয়ে যায়।

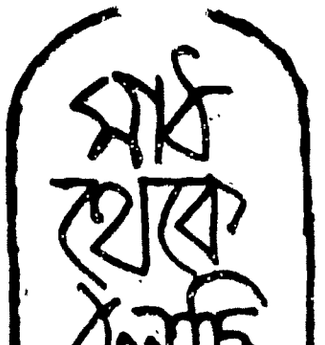

শুরুতে পারিবারিক আনুকূল্য পাওয়া গিয়েছিল খেলোয়াড় বাবা-কাকাদের কাছ থেকে। কিন্তু প্রতিকূলতা এসেছিল পরিবারের গৃহিণীদের তরফ থেকে। ঘরকে মাঠ বানাবার চেষ্টার পরিণামে এক এক সময় বলের ধাক্কায় জানালার শার্সি, কাঁচের পেয়ালা, আলমারির কাঁচ ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যেতো। আর সঙ্গে সঙ্গে মা-কাকীমারা চোখ রাঙ্গিয়ে ছুটে আসতেন। কর্তারা না হয় ফুটবল অন্ত প্রাণ। কিন্তু গৃহিণীরা ফুটবলের অতোসতো বোঝেন না। তাঁরা বোঝেন গোলাকার একটি চামড়ার বলের চেয়ে ঘর গৃহস্থালির প্রয়োজনে কাচের পেয়ালা, শার্সির দাম অনেক বেশি। কাজেই ভাংচুর হলে চলবে কেন? কাচ ভাঙ্গলেই অপরাধীদের মাথা ভাঙ্গবার দাবি উঠতো। তবে এসব দাবিদাওয়ার দায় মেটাতে হোত বাবা-কাকাদের। ঝড় ঝাপটা কিশোরটিকে সইতে হোত না। যেহেতু ঘরের ফুটবলে ছেলেটি থাকতো একদিকে। অন্যপক্ষে তাঁর কোনো না কোনো পিতৃব্য। বয়স্কের উসকানিতে ছেলে ঘরের মধ্যে খেলেছে, ভাংচুরও করেছে। সুতরাং দোষ তার কি!

একদিন হয়েছে কি, গৃহিণীরা বাড়ী নেই। আছে শুধু কাকা-ভাইপো। খেলার নির্বিঘ্ন সুযোগ। অতএব ঘরের মধ্যেই বল পেটাপেটি শুরু করে দেওয়া হল। খেলতে

খেলতে দুজনেই ঘর্মাক্ত কলেবর। এমন সময় কাকার এক জোরালো সটে র‍্যাবেটে সাজানো কাঠগড়াসে গড়া এক দুর্মূল্য জগ ছিটকে পড়ে। ছিটকে একেবারে মাটিতে আছড়ে পড়ে আর কি। এমন সময় চোখের পলকে একদিকে ঝাঁপিয়ে, যাকে বলে ডাইভ দিয়ে ক্ষুদে ভাইপো জগটিকে আঁকড়ে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে কাকাও আনন্দে কাঁকিয়ে বলে ওঠেন 'ওয়েল ডান্ ডেভিস্'। ভেবি ওয়েল ডান।' তখনকার দিনে ডালহৌসীর ডেভিস ছিলেন এক ডাকসাইটে গোলরক্ষক। এপাশ ওপাশে ঝাঁপিয়ে পড়ায় ওস্তাদ। কৃতিত্ব দেখে কাকা তাই সোচ্চারে ডেভিসকে স্মরণ করে ক্ষুদে ভাইপোর পিঠ চাপড়ে দিলেন।

ক্ষুদে খেলোয়াড়টির প্রাথমিক ইচ্ছা ছিল গোলরক্ষক হওয়া। বয়স কম। পাঁ দুখানি এতোটুকু। গতিই বা কী। এই স্বল্প সম্পদ নিয়ে ফুটবল মাঠে তেমন পাত্তা পাওয়া যাবে কি? তাই সাত পাঁচ ভেবে বুদ্ধি খাটিয়ে সে একদিন নিজের হাত দুটিকে ফুটবলের কাজে লাগাতে চেয়েছিল। ডেভিসের গল্প শুনে চিন্তায় ও কর্মে তাকেই চেয়েছিল অনুসরণ করতে। কিন্তু বয়স বাড়ার পর যেদিন সে যথার্থ ফুটবলার হতে পেরেছিল সেদিন কিন্তু তাকে গোল-পোস্টের নীচে দাঁড়াতে কেউ দেখে নি। তখন তার ধ্যানজ্ঞান হয়ে দাঁড়িয়েছিল গোলরক্ষকদের ঠকিয়ে কি করে গোল-পোস্টের মধ্যে বল গলিয়ে দেওয়া যায়। সে চিন্তার তাগিদে ফুটবলার হওয়ার মানে ভাল খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি পাওয়ার সময় থেকে মাঠ ছেড়ে চলে যাওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত সে খেলেছে শুধু ফরোয়ার্ড হিসেবে। কখনো সেন্টার ফরোয়ার্ড, কখনো উইং ফরোয়ার্ড। বেশির ভাগ সময়েই রাইট উইংয়ের জায়গায়। রাইট উইংয়ে সে বেশি সাবলীল ও কার্যকর। ফুটবলে দুর্লভ খ্যাতি সে অর্জন করেছে রাইট উইংয়ে খেলতে খেলতেই।

ময়দানী আসরে তার আবির্ভাব ইসং বেঙ্গলের একজন হিসেবে। তারপর মোহন-বাগানের খেলোয়াড় রূপে। মাঝপর্বে এরিয়ান্সের ও ইস্টবেঙ্গলের প্রতিনিধি। আর ইস্টবেঙ্গলে থাকতে থাকতেই খ্যাতির সিঁড়ি বেয়ে একেবারে তুঙ্গে পৌঁছে যাওয়া।

বুঝতে পারছেন যে কার কথা বলছি। বলছি, সুকুমারের কথা—সমাজপতি পরিবারের আর এক ফুটবলার। বলতে পারি যে ওই পরিবারের সেরা খেলোয়াড়। যার নামডাক শুধু কলকাতার গড়ের মাঠেই সীমায়িত থাকে নি। ছড়িয়ে পড়েছিল সারা দেশ জুড়ে। স্বদেশের প্রতিনিধি রূপে যিনি বিদেশে গিয়েছেন। বিদেশীদের সঙ্গে স্বদেশী আসরে জাতীয় দলের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেছেন। এক কথায়, সুকুমার ভারতের পক্ষে মাত্র তেরোবার, ইজরায়েলে এশীয় ও প্রাক্ ওলিম্পিক ফুটবলে খেলেছেন। ভারত পরিভ্রমণরত বুশ দলের বিরুদ্ধে বাছাই মধ্যপ্রদেশ রাজ্যপালের দলের নেতৃত্বও করেছেন। তাছাড়া জাতীয় আসরে বাংলার এবং অন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে কলকাতার পক্ষে হাজির থাকার বিষয় তো আছে। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৫, একটানা এই ন'বছর সুকুমার ছিলেন ভারতীয় ক্রীড়ানুরাগীদের নয়ন জুড়ে।

সুকুমার সেদিনের স্মৃতিচারণ করছিলেন বেতার অনুষ্ঠানে। খেলার কথা ফুরোতেই তিনি আরম্ভ করলেন মজার গল্প বলতে। গল্প মানে নিছক গল্পো নয়, তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া দু-একটি মজার ঘটনা। যথা:—

সেবার (১৯৬৪) এশীয় ফুটবলে খেলতে ইজরায়েলে গেছি। অনেক দেশের খেলোয়াড়েরাই হাজির। কিন্তু আমাদের মানে ভারতীয়দের সম্পর্কে ওদেশের সাধারণ মানুষের কৌতূহল যেন বেশি। রাস্তাঘাটে আমরা একত্রে বেরোলেই দেখতে পেতাম যে এক ঝাঁক ইজরায়েলী আমাদের পিছু নিচ্ছে আর তাদেরই ভাষায় জিজ্ঞাসা করছে যে আমরা ভারতীয় কিনা। প্রশ্ন শুনে হ্যাঁ বলতেই ওরা সব সমস্বরে হেঁকে উঠতো ইচুকদানা, ইচুকদানা। ইচুকদানা। সে আবার কী। কী যে ওরা বলতে চায় প্রথম প্রথম বুঝতে পারি নি। পরে দোভাষীর সহায়তায় জানতে পারলাম যে বিখ্যাত ভারতীয় অভিনেতা রাজকাপুরের একটি ছায়াচিত্র কিছুদিন আগে প্রদর্শিত হয়েছে। আর তাতে ইচুকদানা, ইচুকদানা বলে একটি গান ছিল সংযোজিত। গানটি যাকে বলে একেবারে হিট সং। ওরাও সেই গানের সুরে এমনই মজে গেছে যে আমাদের দেখতে পেলেই গানটি গাইবার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছে।

দোভাষীর ব্যাখ্যায় অবস্থার রহস্যভেদ হতে আমিও স্থির করলাম যে সুযোগ পেলে গানটি ওদের গেয়ে শোনাতে হবে। ওই গান তখন ভারতে লোকের মুখে চলছে। কয়েক কলি আমার নিজেরও জানা ছিল। কাজেই অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। সুযোগও এলো। পরের দিন বাসস্তায় বেরোতেই ওরা আমাদের পিছু নিলে যেই না ইচুকদানা, ইচুকদানার দাবি জানালো আমিও আমনি গলা ছেড়ে গানটি গাইতে শুরু করে দিলাম। কি গান গাইলাম জানি না। তাল, লয় সুর কেটে জগাখিচুড়ি হয়ে গেল হয়তো। কিন্তু তাতে ওদের কী! ওরা মহানন্দে আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে একই গান গাইতে আরম্ভ করে দিল। শুধু গলা তই গাওয়া নয়, ছায়াছবির দৃশ্যটি অনুসরণে অঙ্গভঙ্গী, নর্তন কুর্দন কিছুই বাকী রইল না। এমন ওদের উৎসাহ, এমনই জমজমাট ভিড় যে কিছুক্ষণের জন্যে যানবাহন আটকে বড় রাস্তায় রীতিমতো জ্যাম। সেদিনেই বুঝেছিলাম যে ভারতীয় ছায়াছবি বিশেষ করে রাজকাপুরের ফিল্ম ওদেশে কিরকম জনপ্রিয়। তারপর যে কদিন আমি ইজরায়েলের মাঠে নেমেছি সেই কদিনই গ্যালারি থেকে ইচুকদানা গাইবার অনুরোধ এসেছে। আর আমি বল ধরলে তো কথাই নেই। ইচুকদানার আওয়াজে কান ঝালাপালা হওয়ার উপক্রম আর কী! খেলা শেষে ভিড় ঠেলে ওরা আমাদের সাক্ষাৎকারও হানা দিতো।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি যে ফুটবল খেলোয়াড় সুকুমার সমাজপতি নিজেও একজন সঙ্গীতরসিক। সাধা গলা তাঁর ভরাট ও মিষ্টি। রীতিমতো চর্চা করেন। মূল শিক্ষা রাগসঙ্গীতের। পেড়াপেড়ি এড়াতে না পারলে বৈঠকে ও আসরে মাঝে গেয়েও থাকেন। সেদিন বেতার অনুষ্ঠানে আত্মকথা শোনাবার ফাঁকে যেই না তাঁর সুরেলা কণ্ঠে ইচুকদানার কলি গুণ গুণিয়ে উঠলো অমনি প্রশ্নকর্তা ধরে বসলেন, আরেকটি গান শুনিয়ে দিন না। সুকুমার বললেন, সে কি, খেলোয়াড় জীবনের কথা কইতে এসেছি। এখানে গান গানাবে কেন? কিন্তু প্রশ্নকর্তা নাছোড়বান্দা। উপরোধ, অনুরোধ, রীতিমতো পেড়াপেড়ির চাপে সুকুমারকে শেষ পর্যন্ত গাইতেই হলো। রাগাশ্রিত একটি গান। গলার আওয়াজ খোলা। সুরের কাজ তৈরী। বুলিও মিঠে। সব মিলিয়ে স্মৃতিচারণের অনুষ্ঠানটি সুকুমার দারুণ জমিয়ে তুললেন। এমনই জমেছিল যে সুকুমারের স্মৃতি দিয়ে ঘেরার অনুষ্ঠান যে অনেক রসগ্রাহী শ্রোতা ওই অনুষ্ঠানটির পুনরাবৃত্তির জন্যে বেতার কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত পত্রে অনুরোধ রেখেছেন বলেও শুনেছি।

খেলোয়াড় জীবনে মেলামেশার সুবাদে তিনি অনেকেরই শুভেচ্ছা, সহযোগিতা পেয়েছেন। কৃতজ্ঞচিত্তে কারুর কারুর নামোল্লেখও করলেন। সেই সঙ্গে জানাতেও ভুললেন না একজনের কথা যিনি বিনা কারণে ও বিনা প্ররোচনাতেই তাঁর খেলোয়াড় জীবন খতম করতে চেয়েছিলেন। সুকুমারের অভিযোগ, আমি নাকি চোখে দেখতে পেতাম না, আমার বাঁ পাটি নাকি কাঠের তৈরী—এসব মিথ্যে অভিযোগ তুলে তিনি ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলীকে এমনই ফুঁসলে ছিলেন যে সেবছর রাইট উইং হিসেবে সারা ভারতে প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় দলে আমার ঠাঁই হয় নি। অথচ আমার দৃষ্টিশক্তি কেমন তার সাক্ষী তো দর্শকমণ্ডলী। আর কাঠের বাঁ পা? তাই নাকি? আমি তো বাঁ পায়ের সটেই বেশি গোল করেছি। তার সাক্ষীও দর্শক-মণ্ডলী। কিন্তু কথায় বলে, চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। এ যে শুধু কথার কথা নয় সেকথা সেদিন মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছিলাম। জানি না ওঁর কাছে আমি কী দোষ করেছিলাম। ওই ভদ্রলোক আজ কলকাতার ফুটবলে একজন কেউকেটা। কথায় কথায় খেলোয়াড়দের বন্ধুর ভেক ধরেন। চরিত্র গঠনে তাদের উপদেশ দেন। কিন্তু নিজের আচরণে তিনি কেমন আদর্শনীয় ও অনুসরণীয় তা জানায় যদি তিনি নিজেকে আয়নার সামনে দাঁড় করাতে পারতেন তাহলে নিজের পরিচয় নিজের কাছে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠতো। সত্যি কথা বলতে কি, আলোর আশীর্বাদেই আমার জীবন ভরপুর। শুধু এই অন্ধকারের ক্রিয়াকলাপের কথা মনে পড়তেই মনটা কেমন ভারি হয়ে ওঠে!

অজয় বসু

খেলাধুলা

দর্শক

অলিম্পিক গেমস

১৯৭৬ সালের মন্ট্রিল অলিম্পিক গেমস শুরু হতে আর মাত্র সাতদিন বাকি। জুলাইয়ের ১৭ তারিখে মন্ট্রিল অলিম্পিক গেমসের শুভ উদ্বোধন। কিন্তু এদিকে তাইওয়ানের যোগদান নিয়ে মন্ট্রিল অলিম্পিক গেমস সম্পর্কে দারুণ অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

কানাডা সরকারের অতি সাম্প্রতিক দুটি সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির কর্মকর্তাদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। অলিম্পিক কমিটিতে দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। কানাডা সরকার একদিকে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটিতে প্রজাতন্ত্রী চীনের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করেছেন এবং অপরদিকে আসন্ন মন্ট্রিল অলিম্পিক গেমসে তাইওয়ান অলিম্পিক দলের যোগদান সম্পর্কে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন। তাইওয়ানের পক্ষ প্রজাতন্ত্রী চীনের নাম জাতীয় পতাকা এবং সংগীত ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই সরকারী নিষেধাজ্ঞা পালনের প্রতিশ্রুতি পেলেই তাইওয়ানকে অলিম্পিক গেমসে যোগদানের ছাড়পত্র দেওয়া হবে। কানাডা সরকারের এই সিদ্ধান্তে কানাডা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সভাপতি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন সরকারের সিদ্ধান্ত খুবই দুঃখজনক। তিনি নিজ দেশের সরকারকে তাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সকল সদস্য দেশকে অলিম্পিক গেমসে যোগদানের প্রয়োজনীয় সরকারী প্রবেশপত্র দেওয়া হবে—কানাডা সরকারের কাছ থেকে এ রকম প্রতিশ্রুতি পেয়েই তো মন্ট্রিলে অলিম্পিক গেমসের আসর পাতার আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছিল। কানাডার বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের জনৈক মুখপাত্র কিন্তু অন্য সুরে কথা বলেছেন। তিনি বলেন ১৯৬৯ সালে কানাডা সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল কানাডা সরকারের অনুসৃত নীতি অনুযায়ী মন্ট্রিল অলিম্পিক গেমসে দেশগুলিকে আমন্ত্রণ করা হবে। এ বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যার প্রস্তাব দিলে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি কোনরকম প্রশ্ন উত্থাপন করে নি। তাইওয়ান প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির ফরাসী সদস্য বলেছেন কানাডার দাবী স্বীকার করলে অলিম্পিক আন্দোলনের সর্বনাশ করা হবে। এখানে উল্লেখ্য কোন্ দেশ কি নামে অলিম্পিক গেমসে যোগদান করবে তা একমাত্র আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষ অপর কারও নয়।

এদিকে গত ৯ই জুলাই মন্ট্রিলে আয়োজিত আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির ত্রিপাক্ষিক সম্মেলনে তাইওয়ান ব্যাপারে কানাডা সরকারের বর্তমান নীতির কড়া সমালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে তাইওয়ান অলিম্পিক দলকে কানাডায় ঢুকতে না দিয়ে কানাডা সরকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। যদি তাইওয়ানকে প্রজাতন্ত্রী চীন নামে মন্ট্রিল অলিম্পিক গেমসে অংশ গ্রহণ করতে না-দেওয়া হয় তাহলে মন্ট্রিল অলিম্পিক গেমস বাতিল করা হবে। এই সম্মেলন যোগদানকারী ২৬টি বিশ্ব ক্রীড়া ফেডারেশনের মধ্যে মাত্র দুটি সংস্থা (ওয়েটলিফটিং ও বাস্কেটবল ফেডারেশন) তাইওয়ানকে স্বীকার করে নি তারা প্রজাতন্ত্রী চীনের সমর্থক।

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি লর্ড কিলানিন বর্তমানে মন্ট্রিলে অবস্থান করছেন। তিনি বলেছেন দুই চীনের রাজনীতিতে আমি আগ্রহী নই। আমার আগ্রহ অলিম্পিক গেমসে। তিনি আরও বলেছেন কোন দেশের অলিম্পিক দল কি পতাকা বা সংগীত ব্যবহার করবে তা ঠিক

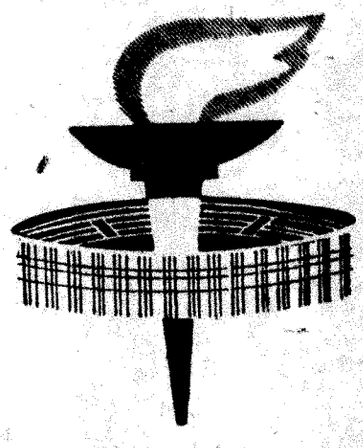

করবে সেই দেশই। এটা তাদের ঘরোয়া ব্যাপার। অপর কোন গভর্ণমেন্ট অথবা আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির এ বিষয়ে কিছু বলার নেই।

বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রজাতন্ত্রী চীনের বক্তব্য তাইওয়ান চীনেরই অংশবিশেষ। সুতরাং আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটিতে তাইওয়ানের পক্ষে চীনের প্রতিনিধিত্ব করা রীতিমত বেআইনী কাজ।

মন্ট্রিল অলিম্পিক গেমসের আসরে নিউজিল্যান্ডের যোগদান নিয়ে প্রতিবাদ এবং বিক্ষোভ বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে। খেলাধুলার আসরে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বর্ণ বৈষম্য নীতির ফলে দক্ষিণ আফ্রিকাকে অনেক আন্তর্জাতিক খেলাধুলার আসরে একঘরে করে রাখা হয়েছে। একই কারণে অলিম্পিক গেমসের আসরেও তার প্রবেশ পথ বন্ধ। খেলাধুলার আসরে সেই দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে নিউজিল্যান্ডের গলায় গলায় ভাব। বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকায় নিউজিল্যান্ড জাতীয় রাগবী দলের সফর নতুন করে বিক্ষোভের ইন্ধন জুগিয়েছে। আসন্ন মন্ট্রিল অলিম্পিক গেমসের আসরে নিউজিল্যান্ড যোগদান করলে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্রগুলি অলিম্পিক গেমস বর্জন করবে বলে হুমকী দিয়েছে।

আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির উদ্দেশ্যে আফ্রিকান সংহতি সংস্থা (অরগানিজেশন অব আফ্রিকান ইউনিটি) মন্ট্রিল অলিম্পিক গেমস বর্জনের যে ডাক দিয়েছে তাতে সর্বপ্রথম সাড়া দিয়েছে তানজানিয়া। ১০ই জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ মন্ট্রিল অলিম্পিক গেমসে নিউজিল্যান্ডের অংশ গ্রহণের প্রতিবাদে তানজানিয়া মন্ট্রিলের অলিম্পিক গেমস থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে। ফলে তানজানিয়ার ১৫০০ মিটার দৌড়ের বিশ্ব রেকর্ডধারী অ্যাথলীট ফিলবার্ট বায়ি অলিম্পিক পদক জয়ের সুবর্ণ সুযোগ হারালেন। খবরে প্রকাশ একই কারণে আরও আফ্রিকান রাষ্ট্রের মন্ট্রিল অলিম্পিক গেমস বর্জনের সম্ভবনা আছে। তাইওয়ান এবং নিউজিল্যান্ড বর্তমানে মন্ট্রিল অলিম্পিক গেমসের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একমাত্র মানুষের শুভ বুদ্ধির জাগরণেই বর্তমানের কঠিন সমস্যার সমাধান হতে পারে।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত সপ্তাহে (জুলাই ৫—১০) প্রবল বারিবর্ষণে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের অনেকগুলি খেলা ভন্ডুল হয়েছে। শুধু তাই নয় শনিবার ১০ই জুলাই তারিখে মোহনবাগান - মহমেডান স্পোর্টিংয়ের খেলা দেখতে যাওয়ার পথে বজ্রাঘাতে পাঁচজন ক্রীড়ামোদীর মৃত্যু ঘটে এবং একশোজন আহত ও সংজ্ঞাহীন হন। তাঁরা লাটসাহেবের বাড়ীর সামনে রেডরোডের ধারে একটি শহীদ স্মরণ স্তম্ভের চত্বরে প্রচন্ড বাতাস ও বৃষ্টির ঝাপটা থেকে আত্মরক্ষার জন্য কয়েকশত লোকের সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কলকাতায় বজ্রাঘাতে এরকম মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে লোকের স্মরণে নেই।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের তালিকায় উপস্থিত প্রথম স্থানে আছে মোহনবাগান—তাদের ১৩টা খেলায় ২৪ পয়েন্ট উঠেছে। অলোচ্য সপ্তাহে মোহনবাগান ৩-০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংকে হারিয়ে একটা শক্ত বাধা অতিক্রম করেছে। দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ইস্টবেঙ্গল ১২টা খেলায় ২৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। পোর্ট কমিশনার্স দলের বিপক্ষে তাদের খেলা বৃষ্টির জন্য বন্ধ হয়ে যায় খেলা আরম্ভের নির্দিষ্ট সময়ের ২০ মিনিট আগে। এই সময় ইস্টবেঙ্গল ২-০ গোলে এগিয়ে ছিল। মহমেডান স্পোর্টিং ১২টা খেলায় ১৯ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। অপরদিকে এরিয়ান্স ১৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে ১০টা খেলায়। লীগের খেলায় এখনও অপরাজিত আছে এই তিনটি দল—মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল এবং এরিয়ান্স।

সিনেমাটিক

ছবিতে রয়েছেন ভিক্টর ভেরা শর্মা ও সুমিত্রা মুখার্জি পরিচালনা : সরিৎ ব্যানার্জি।
ফটো অমৃত

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে আমরা শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মীপূজা নাম একটি ভক্তিমূলক পৌরাণিক ছবি করেছিলেন ওড়িয়াভাষায়। পরিচালনা করেছিলেন বিশ্বনাথ নায়েক। ভদ্রলোক সম্প্রতি গত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা দরকার—বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের কলা-কুশলীদের একটা বড় অংশ ছিল কিন্তু উড়িষ্যাবাসী। এখন অবশ্য ওরা সংখ্যায় কম গেছেন। বিশ্বনাথ নায়েক এসেছিলেন উড়িষ্যা থেকে। উদ্দেশ্য ছিল ফিল্মের কাজকর্ম শিখবেন। কিন্তু কিছুতেই আর সুযোগ পান না। এমনিতেই বরস খবে অল্প কে আর ডেকে কাজ দেয়। তাছাড়া বাংলা ভাষাটাও তখন ভাল রপ্ত হয়নি। হঠাৎ একটা সুযোগ জুটে গেল। একদিন ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে এডিটিং রুমের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন একজন বিখ্যাত এডিটার ওর পাশ দিয়ে চলে গেলেন। কিছুদূর গিয়ে ভদ্রলোক হঠাৎ থমকে ঘুরে দাঁড়ালেন বিশ্বনাথের দিকে।

—কি চাই খোকা?

বিশ্বনাথ নীরব।

ভদ্রলোক আরও কিছুটা এগিয়ে এলেন। তারপর কোমল কণ্ঠে জানতে চাইলেন—তুমি কাকে খুঁজছো?

বিশ্বনাথ আমতা আমতা করে বললেন—কাউকে না...আমি কাজ খুঁজছি?

এডিটার ভদ্রলোক ওর আপাদমস্তক ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন—তোমার দেশ কোথায়?

—আজ্ঞে উড়িষ্যায়—

—এখানে তোমাকে কে নিয়ে এসেছে?

—কেউ না। আমি নিজেই এসেছি—

—হুঁম...মানে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছ!...ঠিক আছে তুমি আমার সঙ্গে এস...

সেইদিন থেকে বিশ্বনাথ নায়েক ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর একজন বিখ্যাত চলচ্চিত্র সম্পাদকের ঘরে চা জলখাবার দেবার চাকরী পেলেন। মাসে সোজা বর বেয়ারার চাকরী। নামমাত্র বেতন। সেই সম্পাদক ভদ্রলোক শুধু বললেন—আমিও একদিন এইভাবে

[প্রণয় পাশা/মহরতে সৌমিত্র চ্যাটার্জি ও সুচিত্রা সেন। | ফটো অমৃত

লাইফ শুরু করেছিলাম। তারপর সম্পাদনার কাজ শিখে আজ নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি। কী পারবে না?

বিশ্বনাথ নীরব। সেই মুহূর্তে কোন কথা তাঁর মুখে জোগাল না। তারপর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। বিশ্বনাথবাবুর পদোন্নতি হয়েছে ক্রমে ক্রমে। লোকে আসল নাম ভুলে ওঁকে 'ভগবান' নামে ডাকতে অভ্যস্থ হয়েছে। তারপর উনি একদিন চিত্র-সম্পাদক হলেন। হলেন পরিচালকও। সে এক বিচিত্র ইতিহাস। পরে বলছি।

ফিল্ম লাইনে ভাগ্যই বড় কথা। এতদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি লোকে এখানে ভাগ্যের জোরে করে খায়। ভাগ্যের দোষে দারুণ কাজ জানা মানুষেরও অন্ন জোটে না। আবার কোন গুণ নেই এমন মানুষ লাখ লাখ টাকা অনায়াসে রোজগার করছে এই ইন্ডাস্ট্রীতে। এটা ভাগ্য ছাড়া হতে পারে না। গত সপ্তাহে একটা আউটডোর শুটিং-এ রঞ্জিত মল্লিকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। উনি হঠাৎ শৈলেন মুখার্জির প্রসঙ্গ তুললেন। রঞ্জিতের মতে শৈলেন মুখার্জির মত অভিনেতা এ-দেশে বিরল। সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা' ছবিতে শৈলেন মুখার্জির অভিনয় রঞ্জিত আজীবনকাল মনে রাখবেন।—আচ্ছা শৈলেনবাবুর ছবি নেই কেন?

এই প্রশ্নের সদুত্তর আমারও জানা নেই।

শৈলেন মুখার্জির দেহে খাঁটী শিল্পীর রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। উনি হচ্ছেন সেজুগের খ্যাতনামা শিল্পী ইন্দু মুখার্জির ছেলে। অথচ গোড়ার দিকে শৈলেনবাবু ফিল্মে আসতে চাননি। উনি হতে গিয়েছিলেন টেকসটাইল ইঞ্জিনীয়ার। পড়াশুনো শেষ করে ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে উনি চাকরী করার পরিবর্তে ব্যবসা করতে নামলেন। সেখানে দারুণ লোকসান দিয়ে বাড়ী ফিরলেন। তারপর সেই ভবিতব্য: এলেন অভিনয়ের লাইনে বিখ্যাত পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। আমি যখন ফিল্মে আসি তখন শৈলেনবাবুকে শুধু উকিল ব্যারিস্টার আর বিচারকের ভূমিকায় বেশীর ভাগ ছবিতে অ্যাকটিং করতে দেখেছি। তারপর ওঁর অভিনয়ে আসল পদোন্নতি হ'ল সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার পর। সত্যজিৎ রায় ওঁকে অভিনেতা হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন চলচ্চিত্র শিল্পে। কিন্তু তাতে কি হ'ল। শৈলেনবাবুর ছবি কোথায়? ছবি যদি-বা দু'একটি হ'ল তেমন পার্ট কোথায়?

রঞ্জিত বড় আক্ষেপ করতে লাগলেন—আশ্চর্য মশাই আমাদের এই ফিল্ম লাইন! আমরা গুণী মানুষের যোগ্য সম্মান দিতেও জানি না।

আলোচনার সময় মেকআপ রুমে অনুপকুমার বসেছিলেন। উনি একটা কথাও বলালেন না। মনে হয় অনুপকুমারও উপেক্ষিত। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে এখন ওঁর চেয়ে প্রবীণ আর কোন অভিনেতাই নেই এই যে ওঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি দর্শকদের এন্টারটেনমেন্টে দিলেন—তার বিনিময়ে কী পেলেন?

অনুপকুমার এই প্রসঙ্গ উঠলে শুধু মুচকি মুচকি হাসেন কোন মন্তব্য করেন না।

অনুপমা বিয়ে করেননি। কেন তা ভগবান জানেন। ভাই-বোনদের মানুষ করে সব সেটল করে দিয়ে আর অবসর পেলেন না বলে?

রঞ্জিতের কেস আরও খারাপ। বেচাবিক্রি ফিল্মের কাগজওয়ালারা বার তিনেক ইতিমধ্যেই কাগুজে বিয়ে দিয়ে সেরেছে কিন্তু ইনু রিয়ালিটী আজও মালাবদল হলো না।

আমি বললাম—মশাই ঝট্‌পট্ সেরে ফেলুন। নইলে ফিল্মের হিরোইনরা আপনার জীবন বিষময় করে তুলবে—

—তুলেছে—রঞ্জিতের ছোট্ট সহাস্য উত্তর।

দেখুন তারপর হয়েছে কী একদিন সন্ধ্যেবেলা ছোঁড়া সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে ধর্মতলা স্ট্রীটের নিউ সিনেমার সামনের ফুটপাতে একটা বড় বাড়ীর সিঁড়ির ওপর ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ একজন ওর ঘাড়ে জুতা সমেত পা দিয়ে মাড়িয়ে দিল—অন্ধকারে ঠাহর করতে না পারার জন্যে।

আর ঘাড়ে পা পড়তে ছোঁড়া ধড়মড় করে ঠেলে উঠে বসেই মুখ খারাপ করে গালাগালি দিয়ে বসল। বাস সঙ্গে সঙ্গে মুখে এসে আছড়ে পড়ল একটা বিরাট থাপ্পড়—আর গাল দিবি বল্?

ছেলেটির কি কান্না! দেখে ভদ্রলোকের মায়া হল আহারে একেবারে বাচ্চা ছেলে—অ্যাই কোথায় থাকিস তুই?

কোন জবাব নেই শুধু অঝোরধারায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না।

ভদ্রলোক বললেন—বল্ কোথায় থাকিস? অন্ধকারে এই যাতায়াতের সিঁড়িতে ঘুমোচ্ছিলিস কেন?

ছেলেটি কোন জবাবই দেয় না।

আর ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা।

শেষ পর্যন্ত ছেলেটি বলল—আমি অনাথ। আমার কেউ কোথাও নেই। আমি রাস্তায় থাকি।

অথচ মুখ অন্যকথা বলছে। ভদ্রলোক ভাবলেন এ ছোঁড়া নিশ্চিত বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে। একমাথা রুক্ষ চুল মুখে একপুরু ময়লা জমেছে। পরণের শার্ট প্যান্ট যেমন নোংরা তেমনি ছেঁড়া-খোঁড়া। অথচ তার মধ্যে থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে সে ভদ্র পরিবারের ছেলে উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত এক-জোড়া চোখ।

বয় ঈন ঘনঘয়গ সক ত বশ

ভদ্রলোকের কেমন যেন মায়া পড়ে গেল—যাবি আমার বাড়ী?

—নাঃ।

—কেনরে চল্ আমার বাড়ীতে গিয়ে থাকবি—

ছেলেটি কিছুতেই রাজী হল না।

তখন ভদ্রলোক ওর হাতে একটা টাকা দিয়ে বললেন—তাহলে এটা রেখে দে তোর কাছে। কিছু কিনে খাস্। আমি প্রায় রোজই এই অফিসে বিকেলের দিকে আসি। যদি আমার বাড়ীতে গিয়ে থাকতে চাস্ তো বলিস কেমন তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

বলে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

আর ছেলেটি টাকা হাতে করে ভাবল—উঃ কতদিন পেটভরে ভাত খাইনি...যাই আজ হোটেলে থেকে ভাত খেয়ে আসি...

ভেবেই দে-দৌড়।

দেখুন আমি একে একে সব বলে যাচ্ছি; আপনারা মনে রাখুন। আমি একটা সময় নিশ্চিত আপনাকে খেই ধরিয়ে দেব তখন একটা টানা কাহিনীর আস্বাদ পাবেন। এখন যেটা বিক্ষিপ্ত মনে হচ্ছে।

একটি মেয়ে অল্পবয়সী এর-ওর সঙ্গে প্রায়ই স্টুডিওতে আসে। ওর ফিল্মে নামার ভারি সখ। কিন্তু কেউ পাত্তা দেয় না। ফিরেও তাকায় না একবার। আর যারা তাকায় সেই সব পুরুষের দৃষ্টি মেয়েরা ভাল চেনে। তাই সে তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

মেয়েটি দেখতে পায় স্টুডিওর গেট খুলে দারোয়ান সসম্ভ্রমে স্যালুট করে দাঁড়াবার পর যে গাড়ীটি স্টুডিওয় ঢুকল তাতে বসে আছেন বিখ্যাত নায়ক। মৃদু হাসতে হাসতে তিনি গাড়ী থেকে নেমে ভেতরে চলে যাচ্ছেন।

একদিন স্টুডিওর বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী দারোয়ান মেয়েটিকে ডেকে বলল—মাঈ তুম রোজ রোজ কিউ আয়া ইয়া?

মেয়েটি আমতা আমতা করে বলে—আমি ছবিতে পার্ট করতে চাই।

—ও লেকিন তুমাকে কে পার্ট দিবে মাঈ? স্টুডিও বড়া খতরনাক জাগাহ্ তুমি সুন্দরী লড়কী আসবে না ইয়া মৎ আও তোমার ভালর জন্যে বলছি...

মেয়েটি ফ্যাল ফ্যাল করে ওর দিকে তাকায়।

—হুঁ আমি ঠিক বলছি। আমার মানা শুনো মাঈ—

—কিন্তু আমি তো কারও ক্ষতি করছি না আমি পার্ট করতে চাই...

বুড়ো দারোয়ান জানে খারাপ মানুষ চট্‌পট্ ধরে ফেলা যায় কিন্তু অন্য জায়গার খারাপ মানুষকে চট করে ধরা শক্ত। তবু সে চোখের সামনে এই বনহরিণীকে বাঘের শিকার হতে দেবে না। বজরংবালীর কৃপায় সে এই লাইনের অনেক নুন খেয়েছে অনেক ভাল-মন্দ দেখেছে এখন আজ বাদ কাল সে রিটায়ার হয়ে যাবে তবে আগে যদি পারে তো এই ফুলের মত মেয়েটির একটা উপকার করে যাবে।

বৃদ্ধের মানা সত্ত্বেও মেয়েটি আবার আসে।

দারোয়ান ওকে দেখে আর হাসে। —কী আবারো এসেছো!

—হ্যাঁ দাদু—

—তুমি বড় দুষ্টু মেয়ে। ...ঠিক আছে আমি একজন ডিরেকটরের কাছে তোমায় নিয়ে যাব। বড় ভাল আদমী তিনি। তোমার কপাল ভাল হলে পার্ট পেয়ে যাবে—

মেয়েটি আহ্লাদে প্রায় নেচে ওঠে।

দারোয়ান বলে—দাঁড়াও আগে তাঁর কথা বলি। তিনি যদি তোমাকে দেখতে চান তাহলে নিয়ে যাব। এখন কী!

বিখ্যাত পরিচালক মানুষ হিসাবে দারুণ সজ্জন। যৌবনে যখন তিনি প্রথম ছবি করতে আসেন স্টুডিওতে এই দারোয়ানের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশের এই বলিষ্ঠ যুবককে ওঁর প্রথম দিন থেকেই ভাল লেগেছিল। বুক টান টান করে দাঁড়ায়। মুক্তোর মত একসারি দাঁত। বয়স বলিষ্ঠ চেহারা।

—সেলাম হুজুর...

—উহুঁ হুজুর নয় আমাকে হুজুর ফুজুর চলবে না...

—লেকিন.....

—দেখ ভাই আমি একজন মানুষ তুমিও মানুষ শুধু তফাৎটা আমাদের কাজের। আমরা কেউ কারো হুজুর নই বন্ধু দোস্ত...

সেইদিন থেকে ওঁরা দোস্ত। মুখের নয় অন্তরের।

ফিল্ম কেরিয়ারে অনেক ঝড় ঝাপ্টা এসেছে সেই বিখ্যাত পরিচালকের কখনও সামলে নিয়েছেন কখনো পড়ে গিয়েছেন কিন্তু ওঁদের বন্ধুত্ব রয়ে গেছে সেই প্রথম দিনেরই মত। অবসর সময়ে ঘরে বসে গল্প-গুজব করেছেন অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে। কত লোক কত কথা বলেছে কিন্তু পরিচালক তা কানে নেননি। একবার স্টুডিওর মালিক দারোয়ানকে ডেকে জানতেও চেয়েছিলেন ব্যাপারটা কিসের এত মাখামাখি সেই পরিচালকই স্টুডিওর মালিককে যা বোঝাবার বুঝিয়েছেন। (চলবে)

রঞ্জন মজুমদার

সলাখে

প্রযোজক — ঈগল ফিল্মস

চারিত্রাই মানুষকে অমানুষ করে তোলে রামলাল তার একমাত্র শিশুকন্যাকে প্রতিপালন করার জন্যে চুরি করতো। একবার লোভে পড়ে এ শেঠজীর সিন্ধুক থেকে মূল্যবান হীরাজহরৎ ও মূল্যবান দ্রব্য চুরি করে। একটি শিবমন্দির সংলগ্ন গাছের নিচে সেই মূল্যবান হীরাজহরৎ লুকিয়ে রাখে রামলাল। পুলিশ হীরা জহরৎ চুরির অপরাধে রামলালকে গ্রেপ্তার করে। রামলালের দীর্ঘ মেয়াদের জেল হয়ে যায়। 'গুজ্জীকে' নাচগান শেখাবার জন্যে ওর মামা ওকে নিয়ে যায়। রাজু ওদের এক প্রতিবেশীর ছেলে ওখানকার একজন মাস্তান ব্যক্তি হয়ে দাঁড়ায়। আচমকা রাজু ও গুজ্জীর দেখা হয়। ওরা একে অপরকে না জেনেই ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা শুরু করে' রামলালের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় ইনসিওরেন্সের লোকেরা যেমন হীরা জহরৎ ফিরে পাবার জন্যে একদল কুচক্রীকে নিয়োগ করে তেমন অপর একদল রাজুকে লক্ষ টাকার বিনিময়ে জেল থেকে রামলালকে অপহরণ করে আনতে বলে। রামলালকে নিয়ে রাজু উপস্থিত হলে ওকে ওরা হীরের সন্ধান দিতে বলে। হীরা গুপ্তস্থান খুঁজে বের করার পর হীরাকে কেন্দ্র করে দুদলে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। পুলিশ এসে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে। রাজুও গ্রেপ্তার হয় হীরা চুরি করার অপরাধে। জেল থেকে আবার ফিরে আসার অঙ্গীকার নিয়ে গুজ্জীকে অপেক্ষা করতে বলে রাজু সকলের কাছ থেকে বিদায় নেয়।

কল্পনাপ্রসূত কাহিনী : পরিচালক দুর্বল কাহিনী এবং চিত্রনাট্যকে বাস্তবভাবে পরিচালনা এবং অভিনয় ও আঙ্গিকের দিকে নজর দেওয়ায়। ছবিটি দেখতে খুব বিরক্তিকর লাগে না। বরং একটি উপভোগ্য অ্যাকশন ছবি হিসাবে আনন্দ দেয়। অভিনয় রাজু : শশী কাপুর; গুজ্জী : সুলক্ষণা পন্ডিত; রামলাল : সজ্জন; কুচক্রী : রমেশ দেও; অপর কুচক্রী দলের নেতা : অমরেশ পুরী; মেহমুদ; তরুণ ঘোষ; অঞ্জনা প্রভৃতি প্রত্যেককেই সুন্দর অভিনয় করার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্র জৈন-এর সংগীত সুন্দর।

চিত্রদূত

কয়েকজন

দীনেশ চিত্রম

বাংলা ছবির প্রযোজক দীনেশ দের কথায়-কাজে কোন ফারাক নেই। কথা বলেন বেশ ঋজু ভঙ্গিতে। স্পষ্টবক্তা হিসাবে সুনাম-দুর্নাম দুই-ই আছে। কাজও করেন সোজাসুজি। প্রায় কুড়িটা বছর এই ছবির রাজ্যে কাটিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা বলে—'নিজে সৎ থাকলে কোনো দিন কারও ক্ষতি হয় না।'

এই বিশ্বাসটুকু নিয়ে এখনও তিনি রয়েছেন। সেই চুয়ান্ন সাল থেকে এই অব্দি দীনেশ দে'র ওপর দিয়ে কম ঝড় ঝাপটা যায়নি। কখনও বা মুষড়ে পড়েছেন বেশ, কিন্তু এ লাইন ছাড়ার কথা কখনও মনে আসেনি। বন্ধু-বান্ধব পরিচিতের কাছ থেকে বিশ্বাসের বদলে পেয়েছেন উল্টো ব্যবহার, কিন্তু তিনি দমেননি। দ্বিগুণ উৎসাহে সেই আঘাতের প্রতিঘাত দিয়ে তবে তিনি ক্ষান্ত হয়েছেন। প্রথম ছবি 'অশ্রু দিয়ে লেখা' রিলিজের সময় একটি সিনেমা হলের—সংগেও তাঁর বিবাদ-কান্ড টালিগঞ্জ পাড়ায় সর্বজনবিদিত। এহেন দীনেশ দে এখন কলকাতার চলচ্চিত্র মহলে একটি প্রিয় নাম। শুধু প্রযোজক হিসাবে নয়, পরিবেশক হিসাবেও দীনেশ চিত্রম ভালো ব্যানার।

টালিগঞ্জের প্রায় প্রতিটি শিল্পী কলা-কুশলী 'দীনেশদা'কে শ্রদ্ধা করে। তন্ধকতার কোনো অভিযোগ কেউ আনতে পারবেন না তাঁর বিরুদ্ধে।

এও শুনেছি যে সুনন্দা ব্যানার্জির মৃত্যুর পর 'অশ্রু দিয়ে লেখা' ছবিতে তাঁর কাজের পারিশ্রমিক দীনেশবাবু নিজে গিয়ে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়েছিলেন। অবশ্য 'সুনন্দাদি'র কাছে দীনেশবাবুর ঋণও কম নয়। অল্প পুঁজি নিয়ে শুরু হয়েছিল প্রথম ছবির কাজ। শিল্পী কলাকুশলী অনেকেই তখন তিনি ঠিকমত পারিশ্রমিক দিতে পারেননি। সুনন্দা দেবী আর অনিল চ্যাটার্জি দীনেশ দে-কে সেই সময় নানাভাবে সাহায্য করেছেন। নিজেরা তো পারিশ্রমিক নেনইনি, অন্যান্য আর্টিস্টদেরও বুঝিয়ে রাজী করিয়েছিলেন।

অতীতের সেই সব ছেঁড়া পাতাগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে দীনেশবাবু বললেন—এক অর্থে আমার স্ট্রাগল কিন্তু এখনও চলছে। বোধহয় চলবেও চিরদিন। তবে এইটুকু আমার ভরসা—ইন্ডাস্ট্রির বহু লোকের কাছ থেকে নানাভাবে নানা সময়ে সাহায্য আমি পেয়েছি। এঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।'

—আমরা যদি আরও একটু দূর অতীতে ফিরে যাই, তাহলে দেখব দীনেশ দে তখন

সোনা বৌদি/সুখেন দাস ও সাবিত্রী চ্যাটার্জি

দীনেশ দে

ময়মনসিংহে পড়াশুনোর পাট চুকিয়ে জামসেদপুরে এসেছেন দিদির বাড়ীতে। ওখানেই দিন গুজরান হচ্ছিল মন্দ নয়।

প্রায় হঠাৎই ফিল্ম ব্যবসার পোকা ঢুকল মাথায়। কলকাতা থেকে ছবি নিয়ে বসন্ত, জামসেদপুর টকীজ ইত্যাদি হলে মার্ণিং শো চালাতে শুরু করলেন, কয়েক মাস বাদে রেগুলার শোর জন্যও ছবি নিতে শুরু করলেন। হাতে কিছু পয়সা এলো। স্থানীয় বন্ধু-বান্ধবরা তো কাছেই ছিলেন সব। কয়েকজন মিলে বাষট্টি নম্বর বেন্টিংক স্ট্রীটে এক পরিবেশক সংস্থা গড়লেন। নাম—গুডলাক ফিল্ম। বম্বের সব বি-গ্রেড স্টার্ট ছবি কম পয়সায় নিয়ে চালাতে লাগলেন। বেশ কয়েক বছর গুডলাকের ভাগ্য খারাপ গেল না। কিন্তু স্টান্ট ছবি দেখিয়ে তো তেমন তৃপ্তি নেই। বড় আর্টিস্ট নিয়ে ভালো ছবি নেবার ইচ্ছে তখন মনের কোণে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। কিন্তু আর্থিক সামর্থ্য কই?

ইতিমধ্যে পার্টনারদের সংগে মতের অমিল হওয়ায় বেরিয়ে এলেন দল ছেড়ে। আর্থিক অবস্থা আরও খারাপ হোল।

টাকা চাই, টাকা।

সুতরাং আবার আগের মতো টাটায় এবং টেলকোতে ওপেন এয়ার শোর জন্য ছবি সাপ্লাইয়ের কাজে ফিরে যেতে হোল। হাতে কিছু পয়সা আসতেই চিত্রভানু নামে নতুন কোম্পানী খুললেন। আবার পার্টনারশিপ কনসার্ন। বম্বে থেকে জনৈক মিঃ সদানন্দের সহযোগিতায় তিনখানা ছবি নিয়ে এলেন কলকাতায়। হেমন্ত মুখার্জির সুর দেওয়া

'হামভি ইনসান হ্যায়' ছবিখানির পরিবেশনা নিয়ে অংশীদারদের সঙ্গে আবার গণ্ডগোল।

অভিজ্ঞতার অভাবে ভেঙ্গে গেল চিত্রভানু। দমলেন না দীনেশ দে। ইণ্ডিয়া ফিল্মসের ব্যানারে 'সপ্তর্ষি' ছবিখানি তৈরী করলেন পকেটের প্রতিটি পয়সা দিয়ে। তখন নাকি এমনও দিন গেছে যে রাতে কিভাবে খাবেন তারও ঠিক ছিল না, পকেটে একটি পয়সাও নেই। এই ছবি ফেল করায় দীনেশবাবু বেশ পিছিয়ে পড়লেন।

অংশীদারী ব্যবসার তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও বন্ধুবান্ধব এসে যখন আবার ধরল দীনেশ দে আবার শুরু করলেন নতুন ছবি—'অশ্রু দিয়ে লেখা।' কিন্তু প্রতিশ্রুত সাহায্য বন্ধুদের কাছ থেকে তিনি পাননি। বহু কষ্টে নানাজনের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে শেষ হোল ছবিটি। তারপর আবার রিলিজের গণ্ডগোল! সেকথা তো আগেই বলেছি। লিখিত চুক্তি না থাকার দরুন নাকি প্রদর্শক অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন ও'র ছবি দেখাতে।

কথার খেলাপ দীনেশবাবুর চরিত্রে নেই, নিজেও করেন না, সহ্য করতেও পারেন না। শেষে ঋণমূর্তি নিয়ে হাজির হতেই সব ঠাণ্ডা। ছবি রিলিজ হোল। পয়সা তেমন পেলেন না বটে, কষ্ট উঠলো শুধু।

সুসময়ের সেই সব বন্ধুরা হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে লভ্যাংশের ভাগ চেয়ে বসলেন। কিন্তু লাভই হয়নি, তার আবার ভাগাভাগি কি? এই নিয়ে আবার বিরোধ হোল।

দল ছেড়ে দিয়ে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করলেন—'আর পার্টনারশিপে কোনো বিজনেশ নয়! করলে সম্পূর্ণ নিজের পয়সায়, নইলে কখনই নয়।

এরপরই জন্ম নিল সাতাশি ধর্মতলা ষ্ট্রীটে দীনেশ চিত্রম সংস্থাটির। কাজ হোল ছবি প্রযোজনা ও পরিবেশনা করা। প্রথম ছবি—'পান্না হীরে চুনী'। সুপার হিট ছবি। আর এই ছবিতেই কয়েকজন নতুন শিল্পী-কুশলীর সঙ্গে পরিচয় হোল দর্শকের, যাঁরা পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠা পেলেন চিত্রজগতে। এক নম্বর—সঙ্গীত পরিচালক অজয় দাস, দু নম্বর—পরিচালকের ভূমিকায় সুখেন দাস, তিন নম্বর—রত্না ঘোষাল।

এবং পরবর্তী ছবিগুলিতেও এই ধারা বজায় রেখেছেন তিনি। তথাকথিত স্টার দিয়ে ছবি করায় তিনি বিশ্বাস করেন না। দীনেশবাবু বললেন—'গল্প যদি ভালো হয় এবং তাকে যদি সুন্দর করে প্রেজেন্ট করা যায় তাহলে ছবির সাফল্য অনিবার্য।'

এই উপপাদ্যে বিশ্বাস রেখেই তিনি করেছেন 'সোনাবৌদি', 'বহুরূপী', 'হারায়ে খুঁজি', সেলাম মেমসাহেব' আর প্রতিটি ছবিই কম-বেশী সাফল্য তাঁকে এনে দিয়েছে। সর্বশেষ ছবি 'শঙ্খবিষ' অবশ্য ফেল করেছে। কারণটা কি জিজ্ঞেস করতে তিনি

১ পান্না-হীরে-চুনী/জ্যোৎস্না বিশ্বাস

বললেন—ছবিতে আরতির কারেকটারকে বাঙ্গালী দর্শকের পক্ষে নেওয়া মুশকিল। স্ক্রিপ্ট শুনেই মনে হয়েছিল হয়তো লাগবে না। ছবির ট্রায়াল দেখে আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম, এ-ছবি চলবে না। কিন্তু কি আর করা যাবে? যা হবার তাতো হয়েইছে।

এখন থেকে স্ক্রিপ্টের ব্যাপারে তিনি খুব সতর্ক। প্রতিটি খুঁটিনাটি নিজে দেখছেন। তবে দীনেশ চিত্রমের ছবির সাফল্য সম্পর্কে প্রায় নিশ্চিত দীনেশবাবু। ভালো না পেয়ে তিনি এখন ভক্তিমূলক মাইথোলজিক্যাল ছবি করছেন। বেহুলা লখিন্দর। রঙ্গীন ছবি, পরিচালনা করছেন অমল দত্ত, সঙ্গীতে আছেন অভিজিৎ ব্যানার্জি। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, অভিজিৎ ব্যানার্জি ও অমল দত্তকে দীনেশবাবুই প্রথম সুযোগ দিয়েছিলেন।)

যাত্রাপথে এখন জয় যদিও সুনিশ্চিত নয়, কিন্তু আশায় বুক বেঁধে সত্যপথে এগিয়ে যাচ্ছেন দীনেশ দে।

ফিল্ম লাইনের গোলকধাঁধায় নাজেহাল হয়ে দীনেশবাবু এখন ভাবছেন রাজ্য সরকার নতুন অর্ডিনান্সটি জারি করলেই বাঁচা যায়। প্রদর্শকের সঙ্গে টাকা-পয়সার লুকোচুরি খেলাটা তাহলে অন্ততঃ কমে। সেন্সর তারিখ রিলিজ আর মডেল টার্মস হলে বাংলা ছবির উন্নতি আটকাবে কে?

তবে সেই সঙ্গে এই কথাটিও তিনি বললেন 'ভালো ছবি করতে না পারলে শুধু অর্ডিনান্স করে কিছু করা যাবে না!'

—এ পর্যন্ত আপনার ছবিগুলোর মধ্যে কিন্তু তেমন কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রচেষ্টা দেখিনি। তেমন কোনো ইচ্ছে নেই নাকি?

প্রশ্নটা শুনে মৃদু হেসে বললেন—'ঝড়ঝাপটা পেরিয়ে এখনও থিতু হতেই পারলাম না। পরীক্ষামূলক ছবির কথা এ অবস্থায় ভাবি কি করে? মনে মনে তেমন ইচ্ছে প্রচণ্ড রয়েছে। নতুন ধরনের ছবি করতে গেলে পয়সাটা ফেরৎ পাবো ভেবেই করতে হবে। সে সময়টা আসুক, দেখবেন কি দারুণ ছবি করতে পারি।'

নিরীক্ষক

রাজশ্রী এখন কলকাতায়

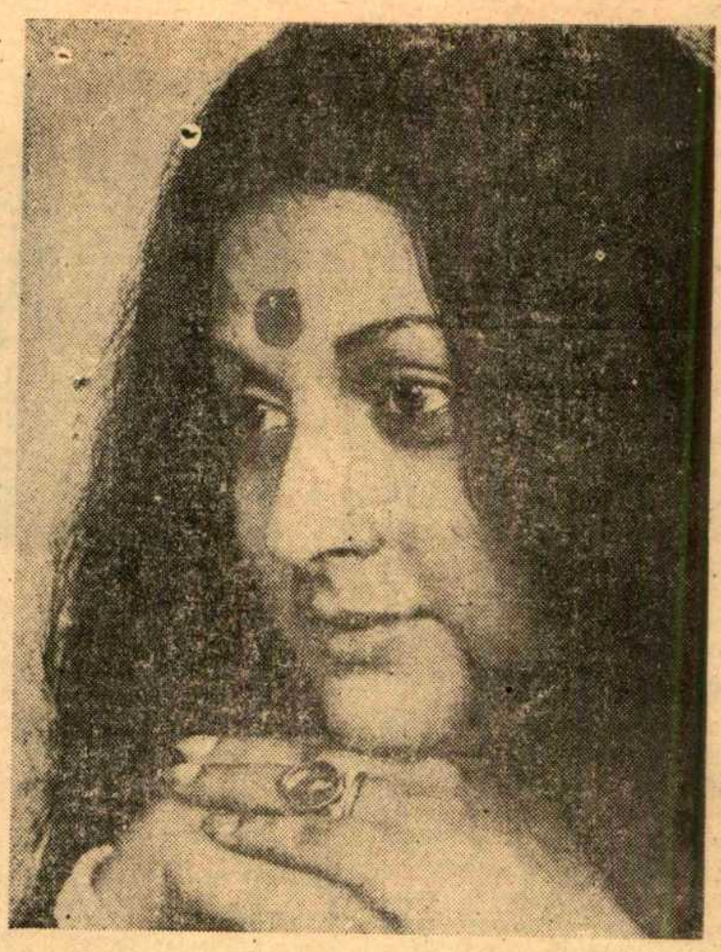

দেশের মাটি ছেড়ে পা তুলেছিলেন গত বছর ইনাডিশে জুলাই। পাক্কা দশ মাস দশ দিন বাদে আবার পা ফেললেন দেশের মাটিতে। গত নয়ই জুন ফিরেছেন কলকাতায় রাজশ্রী বসু। সরি এখন অবশ্য তো তিনি বসু নন দত্ত রাজশ্রী দত্ত। সত্যজিৎ দত্তর স্ত্রী।

সার্কাস রেঞ্জের ছোট্ট বসার ঘরটিতে আলোচনা হচ্ছিল তাঁর বিদেশ থাকার গল্প নিয়ে। কানাডার নিউ ব্রান্সউইকে শ্রীদত্ত কাজ করেন। ওখানেই কেটেছে ওঁদের এই দশটা মাস বললাম—স্টেটসে যাননি?

চোখের তারা নাচিয়ে চটপট বলে উঠলেন যাইনি মানে? নিউইয়র্ক চষে বেড়িয়েছি।

আটাওয়া স্যার মন্ট্রিলও ঘুরেছেন একাধিকবার। রাজশ্রী সত্যজিতের সত্যিকার ভানিমনে হয়েছে আটলান্টিয়াতেই।

চলনে বলনে কোনো পরিবর্তন নেই রাজশ্রীর। ফুরফুরে কবে কথা বলেন কথা বলার সময় নীচের ঠোঁটটা কিঞ্চিৎ ঝোলে এখনও। শুধুমাত্র একটিই পরিবর্তন চোখে পড়ে চেহারার বিবাহোত্তর লালিত্য। যা ওঁকে আরও সুন্দর লাগছিল রাজশ্রীকে।

: ছবিটবি করবেন?

প্রশ্নটা শুনে একটু অস্বস্তি বোধ করলেন বোধ হয়। বললেন অভিনয় শুরু করছিলাম অফার এসেছিল বলে। বিয়ের আগে বা পরে অভিনয় করবো না একথা কখনও বলিনি কাজ পেল না করায় কোনো কারণ নেই।

অর্থাৎ রাজশ্রী বসু এখন কলকাতায় পাকাপাকি থাকার বাসনা নিয়েই ফিরেছেন। অভিনয় তিনি ছাড়ছেন না।

: তাহলে আপনার স্বামীর কানাডার চাকরী? ছেড়ে দিয়েছেন নাকি?

—ন না। ইচ্ছে হলে আবার ফিরে গিয়ে চাকরী নিতে পারে।

অবস্থা সেরকম বুঝলে রাজশ্রীর বিদেশে ফিরে যাওয়াও অসম্ভব নয়। অবশ্য যতদূর জানি জগন্নাথ চাটার্জির শেষ সংবাদ ছবির কাজ এখনও কিছু বাকি। এ ছবির নায়িকা রাজশ্রীই। হয়তো বাকি কাজটুকু শেষ করবেন। ফিল্ম লাইনের কারও সঙ্গে খুব যোগাযোগ এখনও হয়নি। হলে কি হবে বলা মুশকিল।

ঝুঁড়ে আসা দীঘল চুলের গোছা সযত্নে সরাতে কফির কাপটা এগিয়ে দিয়ে বললেন—নিউ ব্রান্সউইকে 'অমানুষ' আর নাগিনসের আন্দাজ দেখেছি। বাংলা ছবি একদম দেখতে পাইনি। বাংলা ছবি নাকি ওখানে তেমন যায় না। কলকাতায় এসে প্রথমেই তাই নিজের ছবি অপরাজিতা দেখেছেন।

: আর মোহনবাগানের মেয়ে?

—ওটা আমি যাবার আগেই দেখে গিয়েছিলাম।

শিল্পীর অভাব টালিগঞ্জে চিরদিনের। রাজশ্রী বসুর আবির্ভাব সেই অভাব পূরণ হয়তো হয়নি কিন্তু মননশীল শিল্প তালিকায় একটি নাম বেড়েছিল বিয়ের পর কানাডায় যাওয়ায় অনেকে ভেবেছিলেন রাজশ্রী বসু বোধহয় বিদায় নিলেন!

না তা হয়নি। অপরিবর্তিত রাজশ্রী বসু এখন রাজশ্রী দত্ত হয়ে কলকাতায় ফিরেছেন। দেখা যাক টালিগঞ্জ তাঁকে এবার কিভাবে অভ্যর্থনা জানায়!

নির্মল্য রে

শতবর্ষের স্মরণীয়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিডন স্ট্রীট অঞ্চলে তখন অপরেশচন্দ্রও থাকতেন। দল গঠন করার আগে বেঙ্গল থিয়েটারে ৭।৮ বছরের সমবয়সীদের সঙ্গে থিয়েটার দেখতে শুরু করেন। অবশ্য পয়সা দিয়ে নয়। চুরি করে। বেঙ্গল থিয়েটারে মৃণালিনী নাটক সর্বপ্রথম দেখেন বলে অপরেশচন্দ্র তাঁর প্রখ্যাত 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বছর' পুস্তকে যে কথা লিখেছেন, তা ভুল। 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বছর' পুস্তকের তিন পৃষ্ঠায় অপরেশচন্দ্র লিখেছেন, 'যতদূর স্মরণ হয়—প্রথম থিয়েটার দেখি বেঙ্গল থিয়েটারে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী'। তখন আমার বয়স বোধহয় আট-নয় বছরের বেশী হইবে না। সে অভিনয়ের মধ্যে দুইটি চিত্র আজও আমার সুস্পষ্ট মনে আছে। এক—মাধবাচার্য, যার যিনি মনোরমা সাজিয়াছেন; তাঁহার 'আমি পরের হাস দেখিগে গো' বলিয়া হাততালি দিয়া চলিয়া যাওয়া। পরে জানিয়াছিলাম, যিনি মাধবাচার্য সাজিয়া-

ছিলেন, তিনি বেঙ্গল থিয়েটারের অধ্যক্ষ স্বর্গীয় বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়; এবং যিনি মনোরমা সাজিয়াছিলেন তিনি বঙ্গের অদ্বিতীয়া অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনী।'

ইতিহাস এবং স্মৃতিকথায় পার্থক্য আছে। স্মৃতিকথা অনুমানের ওপর লিখিত। ইতিহাস সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই কথার ওপর নির্ভর করে যাঁরা ইতিহাস বলতে বা লিখতে যাবেন, তাঁরা ভ্রান্তির সঙ্গেই জড়িয়ে পড়বেন। অপরেশচন্দ্র মৃণালিনীর অভিনয় দেখেননি—একথা ঐতিহাসিক সত্য।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে অপরেশচন্দ্রের জন্ম। পরলোকগমন করেন ২৫ মে, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে, বাংলা ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১ সালে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর দশ মাস। মৃত্যুকালে স্ত্রী শিখরবাসিনী দেবী, একমাত্র পুত্র হরিচরণ মুখোপাধ্যায়, দুই কন্যা, এক জামাতা ও নাতি-নাতনী রেখে যান। হরিচরণ মুখোপাধ্যায় এবং অপরেশচন্দ্রের শিষ্য, সহকর্মী ও বন্ধু স্বর্গত বিজয় মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকেই অপরেশচন্দ্রের জন্ম ও মৃত্যু তারিখ আবিষ্কার করা হয়।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে বিনোদিনী বেঙ্গল থিয়েটার পরিত্যাগ করে গিরিশচন্দ্রের ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগদান করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারে মৃণালিনীর পুনরাভিনয়ে বিহারীলাল এবং বিনোদিনী যথাক্রমে মাধবাচার্য ও মনোরমা চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। অতএব মৃণালিনীর অভিনয় দেখা অপরেশ-চন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হয়নি। দেখলেও ভিন্ন কোন শিল্পীদের অভিনয় দেখেছিলেন এবং বহুআলোচিত বিনোদিনী অভিনীত দৃশ্যটি পরোক্ষভাবে মনের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা থেকেই তিনি অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। তবে ৭।৮ বছর বয়সের সময় থেকেই অপরেশচন্দ্র বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয় দেখতে থাকেন। বেঙ্গল থিয়েটারে সংলগ্ন একজন হরিজন বৃদ্ধার বাড়ীর প্রাচীরের উপর চড়ে সমবয়সী বন্ধুদের নিয়ে থিয়েটার দেখতেন। অনেক সময় এদের নানাভাবে নাস্তানাবুদ হতে হতো।

বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সৌখীন সম্প্র-দায়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। প্রখ্যাত ষ্ট্রাজেডিয়ান মহেন্দ্রলাল বসু যখন এমারেল্ড থিয়েটার লীজ নিয়েছিলেন সেখানেও যাতায়াত করতেন। শ্যামপুকুরের আড্ডা থেকে বীণা থিয়েটারে 'প্যাণ্ডেরা থিয়েটারের' অভিনয় প্রস্তুতি এবং বিভিন্ন সৌখীন সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে আরো বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেন অপরেশচন্দ্র। বীণা স্টেজ পর্যন্ত মনমোহনবাবুর সঙ্গে অপরেশচন্দ্রের যোগ ছিল অচ্ছেদ্য। তারপর প্রায় দশ বছর কোন যোগ ছিল না। মনমোহনবাবু তখন কণ্ট্রাকটরী ব্যবসায়ে মত্ত ছিলেন। অপরদিকে অপরেশচন্দ্র পেশাদার রঙ্গশালায় যোগদানের আশায় সৌখীন বা ভ্রাম্যমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিজের ভাগ্য জড়িয়ে নিয়েছিলেন।

সানাই/ঝুলন বসু, সোনালী গুপ্ত ও পায়েল বসু। পরিচালনা : দীনেন গুপ্ত
ফটো : অমৃত

এই সময় নীলমাধব চক্রবর্তীর দলের সংগেও অপরেশচন্দ্র অভিনয় করেন। নড়াইলের দেবেন্দ্রচন্দ্র রায়ের ইলিলিয়ান থিয়েটার আহ্বানে নড়াইলে গিয়েও অভিনয় করেন অপরেশচন্দ্র। তখন পেশাদার রঙ্গশালার নাট্য-সম্প্রদায়গুলি মফঃস্বলের বিভিন্ন স্থানে বায়না নিয়ে অভিনয় করতে যেত। আবার বিভিন্ন শিল্পী মিলে ভ্রাম্যমান দল গঠন করও বিভিন্ন স্থানে অভিনয় করতে যেতেন। ইলিলিয়াম থিয়েটার গড়ে উঠেছিল নড়াইলের জমিদারদের পৃষ্ঠ-পোষকতায়। স্বর্গতঃ রায়বাহাদুর বৈকুণ্ঠ-নাথ বসুর পুত্র জানকীনাথ বসু ছিলেন ইলিলিয়াম থিয়েটারের অধ্যক্ষ। নাট্যাচার্য অর্ধেন্দুশেখর ছিলেন নাট্য-শিক্ষক। জানকী-বাবুর সংগে অপরেশচন্দ্রের বন্ধুত্ব ছিল। সেই সূত্রে তিনিও ইলিসিয়াম থিয়েটারের সংগে জড়িত হয়ে পড়েন। নীলমাধব চক্রবর্তীও এখানে এসে মাঝে মাঝে অভিনয় করতেন। ইলিসিয়াম থিয়েটারে চন্দ্রশেখর নাটকে চন্দ্রশেখর এবং কপালকুণ্ডলায় নবকুমার চরিত্রে অভিনয় করে অপরেশচন্দ্র খ্যাতি অর্জন করেন।

ক্লাসিক থিয়েটারের সংগে সংগে মিনার্ভা থিয়েটার লীজ নিয়ে ১৯০৩ খৃঃ ৭ নভেম্বর অমরেন্দ্রনাথ রঘুবীর নাটক মঞ্চস্থ করেন। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের পক্ষে দুটি থিয়েটার পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। অমরেন্দ্র-নাথের কাছ থেকে চুণীলাল দেব মিনার্ভা ভাড়া নিয়ে পরিচালনা করতে থাকেন। ২৩ এপ্রিল, ১৯০৪। সংসার এবং ১২ জুন মুরালা নাটক মঞ্চস্থ হবার পর অমরেন্দ্রনাথ মিনার্ভার লীজ মনমোহন পাঁড়ের কাছে হস্তান্তরিত করেন ১৯০৪ খৃঃ ২৭ জুলাই। মনমোহন পাঁড়ে মিনার্ভা থিয়েটারের মধ্য দিয়ে এই প্রথম নাট্যজগতে প্রবেশ করলেন। মনমোহনবাবু মিনার্ভা থিয়েটার লীজ নিয়ে চুণীলাল দেবকেই ভাড়া দিলেন। চুণীবাবুই হলেন মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী ও অধ্যক্ষ। মনমোহন পাঁড়ে মশায় অপরেশচন্দ্রকে মিনার্ভায় নিয়ে আসেন।

২৩ এপ্রিল ১৯০৪ খৃঃ মনমোহনে গোস্বামীর সংসার নাটক প্রথম মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে নাটকার স্বয়ং প্রিয়নাথ চরিত্রে অভিনয় করেন। মনমোহন পাঁড়ে মিনার্ভা লীজ নেবার পর বৈকুণ্ঠ বসুর 'শান্তিধারা' মঞ্চস্থ হয় ৩০ জুলাই। এই সময়ই সম্ভবতঃ সংসার ও কপালকুণ্ডলার অভিনয় প্রিয়নাথ ও নবকুমার চরিত্রে নাটকার মনমোহন গোস্বামীর নাম ঘোষিত হবার পর ব্যক্তিগত কারণেই মনমোহন গোস্বামী অভিনয় থেকে বিরত থাকবেন বলে মনস্থির করেন। শনিবার কপালকুণ্ডলা আর রবিবার সংসার অভিনীত হবে বলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। চুণীবাবু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তখন তিনি স্থির করলেন অপরেশচন্দ্র উক্ত ভূমিকা দ্বারা অভিনয় করবেন। একজন নবাগতকে এই সুযোগদানে অন্যান্য অভি-নেতারা অসন্তুষ্ট হন—এমনকি তারা মিনার্ভা পরিত্যাগ করবেন বলেও হুমকী দেখান। চুণীবাবু দৃঢ়তার সংগেই এই হুমকীর মোকাবিলা করেন। ইলিসিয়াম থিয়েটারের জন্য অপরেশবাবু অর্ধেন্দুশেখরের কাছে চন্দ্রশেখর আর কপালকুণ্ডলার জন্য শিক্ষা-লাভ করেন—পূজোর সময় সেখানে অভিনয় হবার কথা। তার পূর্বেই নবকুমার ও প্রিয়নাথ চরিত্রে কপালকুণ্ডলা ও সংসার নাটকে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে তিনি অভিবাদন জানান। ইলিসিয়াম থিয়েটারের রিহার্সেল কলকাতায় অনুষ্ঠিত হলেও মূল অভিনয় নড়াইলেই অনুষ্ঠিত হতো। বলাই বাহুল্য অপরেশচন্দ্র প্রথম প্রকাশেই সকলের প্রশংসা কুড়িয়ে নিলেন। প্রতিপক্ষ খানিকটা নিষ্প্রভ হলেও গুমরে গুমরে মরতে লাগলো।

(চলবে)

লোকেশন থেকে

শহর থেকে দূরে নয় একবারে শহরের বুকেই দাঁড়িয়ে আছি আমরা। চার তারকা বিশিষ্ট খোদ রিংজ কান্টিনেন্টাল হোটেলের ক্রিস্টাল রুম থেকে লিখছি এই রিপোর্ট।

রাতের মৃদু রঞ্জিন আলো আঁধারিতে এখানে যে স্বপ্নিল পরিবেশ সৃষ্টি হয় গনগনে দুপুরে এখন তা অনুপস্থিত। টেবিলে টেবিলে ফিসফাস গুঞ্জনও নেই। সাপের ছোবল তোলা দেহবল্লরী নিয়ে বিক্ষোভ কটাক্ষিনী নর্তকীও গর হাজির।

তাহলে হচ্ছেটা কি? হাতে রইলো তিন ছবির পরিচালক সরিৎ বানার্জী বললেন—এখনতো লাঞ্চ বুক। একটু বাদেই আবার দেখতে পাবেন সব। সুতরাং অপেক্ষা ছাড়া কিই বা করার আছে।

রিভলভিং স্টেজের চারদিকে সানগান আর কয়েক কিলো আলো বসানো হয়েছে। ক্যামেরাম্যান দীপক দাসের নির্দেশে আলো-গুলোর পজিশন বদল হচ্ছে। একটু আগে সরিৎবাবু পরবর্তী দৃশ্যের শট টেকিং কিভাবে করতে চান তা ওঁকে বলেছেন। সেই মত টেবিল চেয়ার সরিয়ে সব বন্দোবস্ত হচ্ছে।

লাইট সাজানোর পর শ'খানেক একস্ট্রাকে সাজিয়ে গুজিয়ে বসানো হোল সব চেয়ারে। এঁরা সব রাতের ক্রিস্টাল রুমের খদ্দের। কামনা মদির কটাক্ষে এঁরা সবাই একটু বাদে নর্তকী উষা শর্মার নাচ দেখবেন গানও শুনবেন।

ক্যামেরা বসেছে দরজার বাঁদিকে ফ্লোরের ঠিক উল্টো দিকের এক টেবিলে বসে আছেন সুমিত্রা মুখার্জী ওরফে জয়ন্তী—এই হাতে রইলো তিন ছবির নায়িকা। পরণে চটকদারি পোষাক চোখে তার ইশারা। সঙ্গে সঙ্গীও আছে।

এক সময়ে জয়ন্তী ছিল খুব গরীবের মেয়ে ঘরে অন্নের সংস্থানটুকু পর্যন্ত ছিল না।

ক্যামেরার সামনে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন রণজিৎ মল্লিক ওরফে আনন্দ। এক গাল দাড়ি নিয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে। একদা যে জয়ন্তীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল যে মেয়েটির সঙ্গে মন দেয়া-নেয়ার পালা চলেছিল কিছুদিন সে কি এই জয়ন্তী? তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে জয়ন্তীর এমন পরিবর্তন হোল কি করে? ভাবতে পারে না সে!

আমিও হয়তো ভাবতাম কিছুক্ষণ। কিন্তু ভাবতে পারলাম না বেশীক্ষণ। নর্তকী উষা শর্মা স্বচ্ছ পাষাক আহ্বানের ইঙ্গিত নিয়ে ফ্লোরের মাঝখানে গাইতে শুরু করেছেন স্বপ্নের জাল আমি বুনেছি অনেক সোনার খনির কথা শুনেছি অনেক বুঝিনি আমি যে সেই সোনার খনি...ইত্যাদি।

আলোয় সজ্জিত হয়ে ক্রিস্টাল রুমটিতে তখন রাতের আসর জমেছে। সুরের তালে তালে উষা শরীরে ঢেউ তুলে নাচছেন। ক্যামেরা ক্লিক-র-র--র-র শব্দ চলতে শুরু করেছে।

নাচের মাঝখানেই সরিৎবাবুর নির্দেশে জয়ন্তী সাংগকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। রণজিৎ ওরফে আনন্দ সেদিকে অপলক তাকিয়ে। ক্যামেরা নাচ মুহূর্তে সার্টিন্টর জন্য চার্জ করছে নর্তকীর ওপর। বাস! দৃশ্য-গ্রহণ শেষ!

প্রধান সহকারী প্রসাদ বানার্জী বললেন—গল্পের বাকিটুক এখন আর বলব না পরে। তবে তিনি এটুক জানালেন যে বিমল মিত্রর কাহিনী নিয়ে এ ছবির চিত্র-নাট্য লিখেছেন সলিল সেন প্রযোজনা—হরিদাস সান্যাল। আর সঙ্গীত হেমন্ত মুখার্জী।

নিঃ, ধ

বার্লিন উৎসব সংবাদ

উৎসবে ছবির নির্বাচন এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে। প্রতিযোগী বিভাগে হাঁকমধ্যে যে দশখানি ছবি মনোনয়ন পেয়েছে তার মধ্যে সাতখানি ছবির ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়র হবে এই উৎসবে।

ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো ও ফিলিপ কাজালের দুটি ছবি ছাড়াও আরও আটখানি ছবি নির্বাচনের খবর পাওয়া গেছে। সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলির বৃহৎ সংখ্যায় যোগদানের খবর ছাব্বিশতম বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবের জোর খবর বলা যায়। বোলোতবেক মামট-মিভের খেলি পায়োহাড় কিরঘিজ এক যুবকের আশা ও স্বপ্নের কাহিনী নিয়ে তৈরী। স্বদেশে এই ছবি সেরা বিবেচিত হয়েছে। বুলগেরিয়া থেকে পাঠানো রাশ-

য়েল ভালচানভ্-এর **স্লেদোভাভেলিং** গোরাতা গোয়েন্দা চরিত্রের ছবি। এক খুনীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে ছবিটিতে। চেক পোলিশ যুগ্ম প্রযোজনায় আসছে জানুস মাজেওস্কির 'হোটেল পাসিফিক'। হোটেলের এক সাধারণ কর্মচারী অধ্যাবসায়ের ফলে প্রধান কর্মচারী হলো তারই গল্প আছে ছবিতে। গোরান পাস্কাল জেভিকের পরিচলনায় যুগোশ্লাভ ছবিটাতে পিতা-মাতার বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টায় রত এক যুবকের কথা বলা হয়েছে।

ক্রুফোর ছবি ছাড়া ফ্রান্সের দ্বিতীয় ছবিখানি হচ্ছে **এফ কাম ফ্রোমবাঙ্কস** (পরিচালক : ম্যারুস ডুগসন)। ইতালীও পাঠিয়েছে দুখানি ছবি। পাতালিয়া গিনসবার্গের কাহিনী অবলম্বনে একটি পরিবারের পতন-কাহিনী বিধৃত করেছেন 'কারো মাইকেল' ছবিটিতে। গিউসিপ্পি পাত্রানি গ্রিফির **ডিভাইন ক্লিচার** বিশ শতকের পটভূমিতে এক ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনী। অভিনয় করছেন লরা আন্তোনেল্লি, মার্সেলো মান্ত্রোয়ানি ও টেরেন্স ষ্টাম্প। ইরান থেকে এসেছে পারভেজ কিমিয়াভির **বাঘে সাগুই** —এক মেষ পালকের গল্প। কয়েক বছর বাদে আবার সুইজারল্যান্ড অংশ গ্রহণ করছে এই উৎসবে। কুর্ত গ্লোর ছবিটিতে এক বৃদ্ধের বয়সজনিত কিছু সমস্যার চিত্রায়ন ঘটেছে। উৎসবে স্পেনের প্রতিযোগী ছবি হচ্ছে জেম ক্যামিনোর **দি লার্জ ভাকাসিওনস অফ ৩৬**—গৃহযুদ্ধের এক রোমহর্ষক নিয়ে এই ছবি। দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলা থেকে এসেছে মারিও রোবলস এর **একসংপ্রপোরাসি'ও**। আন্দিজের পার্বত্য এলাকায় স্থানীয় অধিবাসীদের আধিপত্য বিস্তার সংগ্রামের রক্তক্ষরা কাহিনী বিধৃত এই ছবিতে।

চীনের পাঠানো ছবিখানি প্রতিযোগী বিভাগে থাকছে না। লি ওয়েন হুয়ার **ব্রোকিং উইথ ওল্ড আইডিয়া-তে** সমসাময়িক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের চিন্তার ছাপ পাওয়া যাবে ছবিখানিতে।

এক যে ছিল দেশ/সোনালী গুপ্ত। ফটো অমৃত

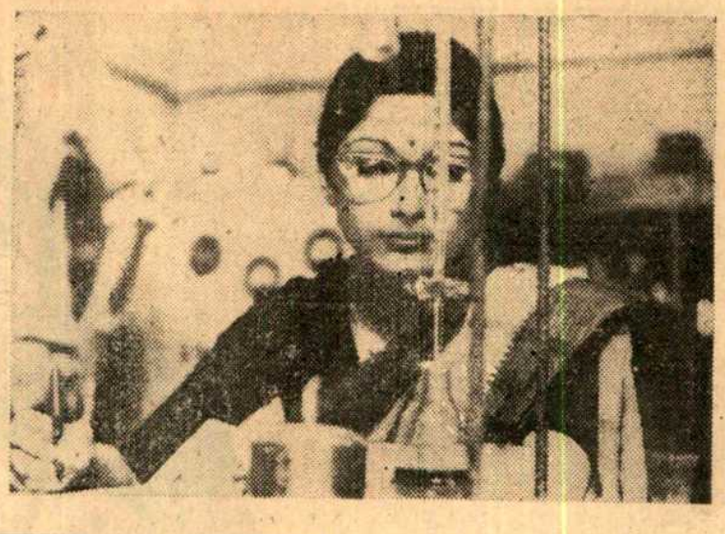

নাটমঞ্চ

এ জি এস-এর 'চে গুয়েভারা'

এ নাটকে চে গুয়েভারার বিচিত্র এবং দুঃসাহসিক রাজনৈতিক কার্যকলাপের কিছু অংশ তুলে ধরা হয়েছে। (কাহিনী-সূত্র জহর দাসগুপ্তর 'চে')। নাটকের মূল উপজীব্য বিপ্লব। যে বিপ্লবের অন্তরালে রয়েছে স্বাধীনতার স্বপ্ন।

চে-র পাশাপাশি এ নাটকে ফিদেল কাস্ত্রোরও উপস্থিত ঘটেছে। তাই স্বভাবতই ধরে নেওয়া যায় যে মোটামুটি সমস্ত ঘটনাই ইতিহাস হিসেবে সত্য। এর প্রমাণ দেবেন যাঁরা এঁদের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তাঁরা। আর এতে যদি কোন অতিরঞ্জিত ঘটে থাকে, তার দায়িত্বও লেখক এবং নাট্যকারের।

তবে সাধারণভাবে এ নাটকের অভিনয় মোটামুটিভাবে ভালই হয়েছে, একথা বলা যায়। এ নাটকে চরিত্র অনেক। এত চরিত্র নিয়ে নাটক করা কম কৃতিত্বের কথা নয়, 'চে গুয়েভারার টিম ওয়ার্ক'ও প্রশংসার যোগ্য।

অভিনয়ে ছিলেন যথাক্রমে সুন্দর রায়-চৌধুরী, অমল দত্তরায়, কুণাল সেনগুপ্ত, দুর্গাদাস ব্যানার্জি, স্বপন মান্না, প্রশান্ত কুমার, দুলাল কর, নরুনবী, শিবেশ চক্রবর্তী, লালমোহন শর্মা, রঞ্জন রায়, শম্ভু দাস মৈত্র, শক্তিপদ অধিকারী, শম্ভু ব্যানার্জি, রঞ্জন সেনগুপ্ত, শ্যামল পাল, শ্যামল সুর, অরুণ গাঙ্গুলী, শুকদেব মুখার্জি, হরাধন চক্রবর্তী, রণেন্দ্র রায়, প্রবীর চক্রবর্তী, সুবীর চিস্থি, পুণেন্দু হালদার (নির্দেশক), লীলা ভট্টাচার্য, মঞ্জু ভট্টাচার্য, রীতা ভট্টাচার্য প্রমুখ।

এ নাটকের সুরকার কিশোর সাহা, মঞ্চ শ্যামল পাল। শব্দ শ্রীপতি দাস, আলো কুণাল সেনগুপ্ত এবং ভাষাকার ছিলেন নীলাদ্রি-শেখর বসু।

সবশেষে একটি কথা সিপাহী বিদ্রোহের কাল থেকে সুভাষ বসু পর্যন্ত ভারতীয় দেশপ্রেমের ইতিহাসে এবং অনেক বিপ্লবী আছেন। যাঁদের সমকক্ষ দেশপ্রেমিক বোধহয় পৃথিবীর ইতিহাসেই খুব কম আছে। বাংলা নাটমঞ্চের দর্শকদের কাছে তাঁদের পৌঁছে দিতে পারলে বোধহয় তার মাধ্যমেও তামাম পৃথিবীর নিপীড়িত জনগণের কথা বলা হবে।

কানাডাতে বাংলা নাটকাভিনয় : টরন্টো শহরের বেঙ্গলী কালচার অ্যাসোসিয়েশন তথা বঙ্গীয় সংস্কৃতি পরিষদ কানাডায় প্রবাসী বাঙ্গালীদের স্বদেশের আস্বাদ এনে দেওয়ার বিষয় সর্বদা সচেষ্ট। নিয়মিতভাবে বেতার ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান শুরু করা ছাড়াও প্রতি বছর দুর্গাপুজো ও সেই উপলক্ষে ভারতীয়, পোলিশ ও হাঙ্গেরীয়ান ছেলেমেয়েদের নিয়ে আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান রবীন্দ্রজয়ন্তী ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন এই সংস্থা। কিছু দিনের মধ্যেই বাংলা শেখার স্কুল ও লাইব্রেরী এরা শুরু করছেন। স্থানীয় বিশ্ব-

বহ্নিশিখা/অলিভিয়া ও রঞ্জিৎ মল্লিক

বিদ্যালয়ে কবিগুরুর নামে চেয়ার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এঁরা অনেকখানি এগিয়েছেন।

এই পরিষদের পক্ষ থেকে গত ২৪ এপ্রিল সমারসেট মমের একটি গল্পের ছায়া অবলম্বনে রচিত 'অবসন্ন প্রজাপতি' নাটকটি অভিনীত হয়। রচনা মনোজ মিত্র। শ্যামল ঘোষালের বলিষ্ঠ পরিচালনায় ও প্রতিটি শিল্পীর স্বাভাবিক নৈপুণ্যে ও টিম ওয়ার্কে নাটকটি দর্শকদের মুগ্ধ করে। মুখ্য চরিত্র মধুমিতার ভূমিকায় ছিলেন অণিমা রায়। মধুমিতার জটিল চরিত্রটি অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলে অনিমা রায়ের অভিনয়। দেবদাসের চরিত্রে শ্যামল ঘোষালের অভিনয় অনবদ্য। অন্যান্য শিল্পীরা তাদের কর্তব্য সুসংযতভাবে পালন করেন। জজসাহেব ও অতীনের ভূমিকায় কৃতিত্বের দাবী রাখেন সত্যরঞ্জন ঘোষ ও প্রভাত মজুমদার। বামাচরণ ও পারিজাতের চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন স্বীপিমান সেনগুপ্ত ও স্বীপেন চক্রবর্তী। ছায়া দেবী ও দীপালির চরিত্রে শিবান ঘোষ ও বাসন্তী ঘোষের অভিনয় অকৃত্রিম। তিনটি টাইপ চরিত্রে সুঅভিনয়ের অধিকারী পানু রায়, অশোক চ্যাটার্জি ও নীলাদ্রি চাকী। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন প্রাণ কর্মকার ও শচীন ঘোষ।

নাটকটির ব্যবস্থাপনায় কৃতিত্ব দীপ্তিমান সেনগুপ্তের।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঃ সম্প্রতি কয়েকটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ্য হয়েছে। রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে ওয়েস্ট বোকারো কোলিয়ারীতে রবীন্দ্র পরিষদ অনুষ্ঠান করেন ও হাজারীবাগে ইউনিয়ন ক্লাব কর্তৃপক্ষ অনুষ্ঠানাদি করেন। 'গীতাঞ্জলি' সংগীত মহাবিদ্যালয়ের কলাকুশলীরা ঋতু উৎসব ও চিত্রাংগদা নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন। নৃত্য ও সংগীত পরিচালনা করেছিলেন যথাক্রমে শ্রীমতী পার্বতী দাসগুপ্ত ও শ্রীরথীন্দ্র সান্যাল।

আনন্দম ড্রামাটিক ক্লাব পরিবেশিত 'পথের দাবী' অভিনয়ানুষ্ঠানও উপভোগ্য হয়। পরিচালনা করেন শ্রীকমলেশ দত্ত। স্ত্রী চরিত্রে শ্রীমতী পার্বতী দাসগুপ্ত, উজ্জলা ঘোষ, ডলি দত্ত ছাড়া অন্যান্য পুরুষ চরিত্রে কমলেশ দত্ত, সরোজ দাসগুপ্ত, পি, কে, নন্দী, সমীরেন্দ্র লাহিড়ী, উদয় মিত্র, পরেশ ঘোষ যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য অমিত পাল মৃণাল বিশ্বাস পি কে তরফদার গণেশ বসু সুধীর বসু প্রভৃতি সুঅভিনয় করেন। শরৎ শতবার্ষিকী উপলক্ষে এই অনুষ্ঠান হয় ও পৌরোহিত্য করেন হাজারীবাগের ডেপুটি কমিশনার দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়।

ইচ্ছাপূরণ

রবীন্দ্র জন্মোৎসবের সময় রবীন্দ্র সদনে অভিনীত উপরোক্ত নাটকগুলির মধ্যে একমাত্র উপভোগ্য (শিশুদের জন্য) নাটকটির নাম 'ইচ্ছাপূরণ'। এটি পরিবেশন করেছেন নবমিলন নাটসংস্থা। এই নাটকে যাঁরা অভিনয় করেছেন, তাঁরা সবাই শিশু অথবা কিশোর (একমাত্র ব্যতিক্রম ইচ্ছে ঠাকুরাণী)।

'ইচ্ছাপূরণ' নাটকটি দর্শকদের যে প্রচুর আনন্দ দিয়েছিল তার প্রমাণ সেদিন প্রেক্ষাগৃহে ঘন ঘন সহর্ষ হাততালি। বলতে কি, বাচ্চারা অভিনয়ও করেছে দারুণ। এবং এদের টিমওয়ার্ক এত সুষ্ঠু ও সুন্দর ছিল যে, অভিনয়ে আলাদা করে কারুর প্রশংসা করাও দুষ্কর।

তবু অভিনয়ে প্রথম সারিতে নাম করা যায় সুদীপ্ত চ্যাটার্জি শান্তনু চ্যাটার্জি ও অভ্রাংশুমৌলি দত্তর।

এছাড়া অমিত হোড়, বরুণ গাঙ্গুলি, সুভাশিস হালদার, প্রদীপ গাঙ্গুলি এবং মেলোনী দাশগুপ্তও সুন্দর।

সংগীতা চক্রবর্তীকে ইচ্ছে ঠাকুরাণীরূপে যেমন মানিয়েছিল, তেমন সুন্দর ছিল তার অভিনয়।

ইচ্ছাপূরণ-এর নাট্যরূপ ও পরিচালনায় ছিলেন তৃপ্তি চ্যাটার্জি এবং নাটকটি প্রযোজনা করেন অমিয় দত্ত।

এমন একটি সুন্দর অনুষ্ঠান উপহার দেবার জন্য উভয়কেই ধন্যবাদ।

বিবিধ সংবাদ

সিনে ইনস্টিটিউট

৪ থেকে ৮ জুলাই পর্যন্ত পাঁচখানি চেকোশ্লোভাকিয়ার ছবি নিয়ে এক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করেছিল সিনে ইনস্টিটিউট সংস্থা। প্রদর্শিত ছবিগুলো হলো ওৎকার ভাভ্রার 'সোকোলভ' আন্তোনিন কাচলিকের 'ড্রাইভার অফ দি রিফ্ক ক্যাটিগরি', স্টেফান হুরের 'গ্রেট লাইট গ্রেট ডে', মারটিন টাপাকের 'দি ডে হুইচ ডাজ নট ডাই' ও স্তানিস্লাভ স্ট্রাল্ডের 'মাই ব্রাদার হ্যাজ এ সুপার ব্রাদার।'

'জন অরণ্য' অস্ট্রেলিয়ায় অভিনন্দিত

সম্প্রতি সমাপ্ত সিডনী এবং মেলবোর্ন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত পাশ্চাত্যের ছবিগুলি ছিল যৌন উপকরণ ও হিংসাত্মক কার্যকলাপে ভরপুর। বৈভবের মধ্য থেকেও শূন্যতার হাহাকার, অনিকেত অস্তিত্বের যন্ত্রণা সেখানে পরিস্ফুট। এইসব ছবির ভিড়ে সত্যজিৎ রায়ের 'জন অরণ্য'এর স্বাদ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা—অনেক বাস্তবনিষ্ঠ জীবনমুখী। আর সেই জীবনধর্মীতার জন্যই নাকি 'জন অরণ্য' বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে ঐ দুটি উৎসবে। সমস্ত শ্রেণীর দর্শকের কাছ থেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পায় ছবিখানি। উৎসব পরিচালকরা 'জন অরণ্য'কে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের স্বীকৃতি দেন।

গত ৭ জুলাই এক ঘরোয়া পরিবেশে সাংবাদিকদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া সফরের

একাঙ্ক নাটক
বোম্মানা বিশ্বনাথমের
সার্কাসের বাঘ/ ২,
অন্বেষণ
দৃশ্যের দর্পণে/
ট্যাক্সমন্ত্রী ২,
প্রতিটি একাঙ্ক একটি সেটের
ও স্ত্রী-বর্জিত মঞ্চসফল নাটক
নবগ্রন্থ কুটির ঃ ৫৪।৫এ, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

কিশোর কবি সুকান্ত/শম্পা চক্রবর্তী

বিবরণ দিচ্ছিলেন ইণ্ডাস ফিল্মসের সুবীর ঘোষ। তিনিই ছবিখানি নিয়ে ও-দেশে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে কদিন আগে ফিরেছেন। 'জন অরণ্য'-এর বিদেশের জনপ্রিয়তায় ও অভিনন্দনে তিনি মুগ্ধ, বিস্মিত। ওখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনেও তিনি যোগ দিয়েছিলেন।

উৎসবের আরেকটি ছবি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল—সেটি ক্রিস্তফ জানুসির 'দি ব্যালান্স'। অন্যান্য পাশ্চাত্য ছবিগুলি থেকে এটি একটু ভিন্নধর্মী'।

এও জানা গেল যে আসছে 'কার্লোভি-ভ্যারি' উৎসবে 'জন অরণ্য' ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছে। কিন্তু সময়াভাবে উৎসবে শ্রীঘোষ যোগদান করতে পারছেন না। সেই জন্য আফশোষ কম নয় তাঁর।

'অগ্নিকন্যা' ছবির শুভ সূচনা : নিতাই ফিল্মসের দেশাত্মবোধক ছবি 'অগ্নিকন্যা'র শুভ মহরত অনুষ্ঠিত হয় ১৪ জুন ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওয় এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীমতী কল্পনা ঘোশী (দত্ত) পশ্চিমবঙ্গের একাধিক মন্ত্রী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এ ছবির কাহিনী রচনা করেছেন অনিল সরকার। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন—শান্তি ঘোষ-দস্তিদার। পরিচালনা খগেন রায়। সংগীত পরিচালনা—নীতা সেন। গীত রচনা গৌরী-প্রসন্ন মজুমদার। চট্টগ্রামের এক অগ্নি-যুগের কাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে 'অগ্নিকন্যা'। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, সুমুর গাঙ্গুলী, শোভা সেন, ছায়া দেবী, রবি ঘোষ, তরুণকুমার, দিলীপ রায়, বিকাশ রায়, শৈলেন মুখার্জি, উৎপল। ছবিটির প্রযোজনা করছেন—অজিত চট্টোপাধ্যায় এবং আকতার হোসেন।

ভাগ্যলিপি : মহামায়া পিকচার্সের দ্বিতীয় নিবেদন 'ভাগ্যলিপি' ছবির সুটিং এখন দ্রুত এগিয়ে চলছে স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ-এ। ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করছেন নিরঞ্জন দে। তরুণ-রঞ্জিত সুরারোপিত এবং পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গানগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত ও শ্যামল মিত্র। চিত্রগ্রহণে আছেন নির্মল গুপ্ত। শিল্প নির্দেশনায় রামচন্দ্র সেখে। সম্পাদনায় মধু বন্দ্যোপাধ্যায়। অঞ্জনা ভৌমিক বেশ কিছু দিন পরে এ-ছবির মাধ্যমে আবার চিত্রজগতে ফিরে আসছেন। অন্যান্য উল্লেখ্য চরিত্রগুলিতে অভিনয় করছেন, বিকাশ রায়, নিরঞ্জন দে, শিবানী বসু, সত্য মৈত্র, বীরে চট্টোপাধ্যায়, জলি বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, অনিল খাঁ, বৈদ্যনাথ কর্মকার, ঝুমকি সিদ্ধেশ্বর সরকার, পদ্মা দেবী ও বিশ্বজিৎ।

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে সংগীত গ্রহণের মধ্যম 'অন্বেষণ' নামে আরও একটি নতুন ছবির মহরৎ হয়েছে। সুরারোপ করেছেন অনল চট্টোপাধ্যায়। ছবিটি স্বরচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্যে পরিচালনা করছেন শরণ দে।

সম্প্রতি ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে 'অভী' নামে একটি নতুন ছবির মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিচালনা করছেন অপূর্বকুমার মিত্র। ছবিটি কিশোর চিত্র হিসাবে নির্মিত হবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমৎ সুদীনকুমার মিত্র এবং শ্রীমতী কনন দেবী।

নহলে পে দহলে

প্রযোজনা : অজন্তা আর্টস

একদল কুচক্রী স্মাগলারকে শাস্তি দিতে গিয়ে নিহত হলেন পুলিশ ইন্সপেকটার হরিশ। তাঁর দুই ছেলের মধ্যে ছোট ছেলেকে কুচক্রীদের একজন গোপনে আশ্রয় দিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র কালক্রমে একজন দক্ষ সি-আই-ডি অফিসার হয়ে ওঠে। সুনীলের দায়িত্ব হোল গোপনে সাধারণ পোষাকে কুচক্রীদের সন্ধান নেওয়া এবং ছোট ভাইকে উদ্ধার করা। কুচক্রীদলের একজন করিম খাঁন সুনীলের ছোট ভাইকে প্রতিপালন করেছিল। সে আজ রহিম নামে পরিচিত। সুনীল কুচক্রীদের শায়েস্তা করবার জন্যে রহিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে রাজী হল। ঘটনাচক্রে সুনীলের সঙ্গে পরিচয় হল এক লাস্যময়ী তরুণীর (মীনা) পরে জানা গেল সেই তরুণীই সুনীলের ছেলে বেলার সাথী মীনা। কুচক্রীদের হাতে সুনীলের পিতা নিহত, মা অন্ধ এবং মীনার পিতা। পাগলা গারদে দিন কাটাচ্ছে। পুলিশ স্মাগলারদের গ্রেপ্তার করে। মৃত্যুর আগে করিম খাঁন জানিয়ে গেল রহিমই সুনীলের ছোট ভাই। সুনীল ও মীনার পুনর্মিলন হল এবং দুই ভাই আবার একত্রিত হয়ে সুখী সংসার গড়ে তুলল, মা, ভাই ও প্রণয়িনীকে নিয়ে।

সাম্প্রতিক মুক্তিপ্রাপ্ত 'চরস', 'সাজাখে" ছবির কাহিনীর সঙ্গে এ ছবির গল্পের বিশেষ কোন তফাৎ নেই। দুর্বল কাহিনীর জন্যে এবং কে কে শুক্লার কাল্পনিক ও অবাস্তব চিত্রনাট্যের জন্যে, পরিচালক রাজ খোলসা তাঁর পরিচিত মেজাজে ছবির সাসটান্সের দৃশ্যগুলিকে উপস্থিত করতে পারেন নি, তবুও পরিচালনার গুণে ছবির আখ্যানভাগ সকলকে আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। অভিনয়ে—সুনীল (সুনীল দত্ত), রহিম (বিনোদ খান্না) মীনা (সায়রা) মা (কামিনী কৌশল) এবং কুচক্রী (প্রেমনাথ) সকলেই চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন, অন্যান্য ভূমিকায়—রণজিৎ বিন্দু, আনোয়ার হোসেন, তিওয়ারী ও ত্রিলোক কাপুর মন্দ নয়। কলাকৌশলের কাজ উচ্চাঙ্গের। আর ডি বর্মনের সঙ্গীতাংশ বেশ উপভোগ্য।

—ত্রিনয়ন

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

JUL 1976

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের নতুন বই

চিত্র বিচিত্র

একাল-সেকালের বিচিত্র কথা ও রসমধুর কাহিনী-সমারোহ দাম ঃ সাত টাকা

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১৩৮১ সালের মৌচাক পত্রিকা কর্তৃক
সুধীরচন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ রচিত
ছোট বড় সকলের মনের মত
বাংলা সাহিত্যের দু'খানি আশ্চর্য বই

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য ঃ—চার টাকা

(সপ্তম সংস্করণ চলছে)

ছোটদের উপযোগী সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী লেখা হয় নি। বিশেষ করে নানাবিষয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ছোটদের মনের মত বিচিত্র রোমাঞ্চকর লেখা খুব সহজ নয়। 'বিচিত্র কাহিনী'তে লেখক সত্য ঘটনাগুলিকে নিজের সরস মুন্সিয়ানা দিয়ে এমন জীবন্ত আর আকর্ষণীয় করে তুলেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রচনাই অনবদ্য রস ও রোমাঞ্চে টইটম্বুর। মোট পনেরোটি কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রসের ফল্গুধারায় সিক্ত, বর্ণনায় মনোমুগ্ধকর।

আরও বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য ঃ—চার টাকা

(চতুর্থ সংস্করণ চলছে)

আরও বিচিত্র কাহিনী বইটি কিশোর ও বয়স্কদের জন্য সমভাবে রচিত। লেখক শুধু ছোটদের জন্যই রস পরিবেশন করেননি, বড়রাও এই অমৃত আস্বাদন করে পুলকিত হবেন। অনবদ্য রস রচনাশৈলী এবং প্রতিটি কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ চুম্বকের মত পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে। এই বইটিতে দশটি বিভিন্ন রসের কাহিনী রয়েছে এবং লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি এমন সুন্দরভাবে রসযুক্ত করে উপস্থিত করেছেন যে পাঠককে বিমুগ্ধ করবে।

এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ঃ ফোন ৩৪-১৭৮২

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003
AMRITA
Friday 23rd July, 197
Phone 55-5231 (14 lines)

iaa/kc0107

অনায়াসে দ্বিতীয়বার সম্মান অর্জন করলো

কুকমী

গুঁড়ো মশলা

ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ
কোয়ালিটী প্রোডাক্টস
কর্তৃক প্রদত্ত
একমাত্র উচ্চমানের অকৃত্রিম
গুঁড়ো মশলা হিসাবে
শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি ও
সম্মানপত্র লাভ।

এই বৎসরের শুরুতেই
কুকমী গুঁড়ো মশলা
নিউ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত
ট্রান্সওয়ার্ল্ড ট্রেডফেয়ার-এ
ক্লাশ—এ
স্বর্ণপদক জয় করেছে।

IQP

TRANS-WORLD TRADE FARE
SERVICE AWARD DELHI

- সর্বোত্তম মান
- ন্যায্য ও নির্দিষ্ট মূল্য
- সঠিক ওজন
- উপাদানের বিশুদ্ধতা
- সমাজ সেবার প্রতি অগ্রাধিকার
- তৎপর ও দ্রুত সরবরাহ ব্যবস্থা

স্বদেশে ও বিদেশে
সকলের সেবায়
আমরা নিজেদের
নূতন করে
নিয়োজিত করছি

প্রস্তুতকারক :
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাইভেট লিমিটেড
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০০৭০, পোষ্ট বক্স নং, বড়বাজার : ৬৮৮৫ ফোন : ৩৩০৯৯৫
ফ্যাক্টরী : কাশীপুর

UNIVERSITY

24 JUL 197

ফটো-কম্পোজ : এন, কে, প্রোসেস এণ্ড কো: প্রাইভেট লিমিটেড

অমৃত
সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ /
৩০ জুলাই ১৯৭৬ ॥
অতিরিক্ত ... পয়সা

CALCUTTA
LIBRARY

...রোলীন আর সহায়
...র ভয় কি?
...রোলীন ঘরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম আপনার ত্বকের ...
...র কাটা-ছেঁড়া-কাটা অংশগুলোকে নিরাপদ রাখে।
...ার্মাসিউটিক্যালস প্রাঃ লিঃ বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

"আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়। শহরে
শ্যাকরা-গাড়ি ছুটছে তখন ছড়ছড় করে ধুলো উড়িয়ে,
দড়ির চাবুক পড়ছে হাড়-বের-করা ঘোড়ার পিঠে।
না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না মোটর-গাড়ি। তখন
কাজের এত বেশি হাঁস-ফাঁসানি ছিল না, রয়ে বসে দিন
চলত। বাবুরা আপিসে যেতেন কষে তামাক টেনে
নিয়ে পান চিবোতে চিবোতে, কেউ বা পাল্কি চ'ড়ে কেউ
বা ভাগের গাড়িতে।"
রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' থেকে

এ কাহিনী গত শতাব্দীর। তারপর সেই রয়ে-বসে
পান-চিবোনো পায়ে-চল্‌তি যুগটাকে রবীন্দ্রনাথ একাই
এগিয়ে নিয়ে গেছেন যুগান্তরে। এগিয়ে চলাই ছিল
তাঁর মন্ত্র। এগিয়ে চলতে হবে আমাদের এই নতুন
যুগকেও। ছ্যাকড়া গাড়ির ছন্দে নয়। আরো জোরে।
কিন্তু যাব কি করে, এ প্রশ্ন শহরবাসী সকলের।

রবীন্দ্রনাথের কলকাতা

কারণ ইচ্ছার গতি যত দ্রুত, যান-বাহনের গতি তার
চেয়ে অনেক মন্থর। মন্থর এবং সংখ্যায় স্বল্প।

আমরা জানি। জানি বলেই খুঁড়িয়ে-হাঁটা এই শহরের
মাটি খুঁড়ছি ভূগর্ভ-রেল পাততে। এর অনেকখানি আজ
এখনও পরিকল্পনা। কিন্তু আগামীকাল এক যুগান্তর।
তখন শুধু মানচিত্র পালটাবে না কলকাতার। পালটাবে
এই জনবহুল শহরের গতি, উন্নতি ও প্রগতির মান।

কলকাতার নতুন মানচিত্র
রচনায় ভূগর্ভ-রেল

MTP

মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট
প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

medium

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর সর্বশেষ গ্রন্থ

ভূমাপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ ১০৲

ভক্ত বিবেকানন্দ ৭॥ ভাগবতীতনু রবীন্দ্রনাথ ১২॥

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

১ম—১২॥০ ২য়—১২॥০ ৩য়—১২॥০ ৪র্থ—১২॥০

নীহাররঞ্জন গুপ্তর

হাসপাতাল ১৮৲
অপারেশন ১৬৲
লালুভুলু ৭৲
অহল্যাঘুম ৭৲
কালোহাত ১২৲
কালোভ্রমর ২৫৲
(দুই খণ্ড)
তালপাতার পুঁথি ২৫৲

সবিনয় নিবেদন,

যাঁরা ৩৲ টাকা জমা দিয়ে আমাদের প্রকাশিত 'বাংলা পকেট বই' ও 'পেপার ব্যাক ক্লাসিকস্'-এর স্থায়ী গ্রাহকভুক্ত আছেন, তাঁদের প্রতি আমাদের অনুরোধ যে, যদি কেহ ইতিমধ্যে তাঁদের ঠিকানা বদল করে থাকেন তো তাঁদের নতুন ঠিকানা আমাদের দপ্তরে জানিয়ে বাধিত করবেন।

শঙ্কু মহারাজের

পঞ্চপ্রয়াগ ১০৲
গহন গিরি কন্দরে ১০৲
তমসার তীরে তীরে ১৬৲

প্রবোধকুমার সান্যালের

বনস্পতির বৈঠক ৩৮৲

প্রকাশিত হলো! ধনঞ্জয় বৈরাগীর নবতম উপন্যাস

রে স কো র্স ৮৲

প্রমথনাথ বিশী

পূর্ণাবতার ২০৲
কেরী সাহেবের মুন্সী ১৫৲
বিপুল সুদূর তুমি যে ৭॥
শাহী শিরোপা ৩॥
বেনিফিট অব ডাউট ১০৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

নগর পারে রূপনগর ২৫৲
পায়ে পায়ে প্রতিধ্বনি ৯৲
সাত পাকে বাঁধা ১০৲
পঞ্চতপা ১৬৲
শতরূপে দেখা ২০৲

প্রকাশিত হলো! নীহাররঞ্জন গুপ্তর নতুন উপন্যাস

রজনী শেষের শেষতারা ৮৲

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২ ৩৪-৩৪৯২
৮৬।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯ ৩৪-৮৭৯১

প্রগতির নতুন প্রেরণায় ভারত
১৯৭৫-৭৬

অধিকতর শৃঙ্খলাবোধ

* সময়নিষ্ঠা ও নিয়মশৃঙ্খলা পালনে লক্ষণীয় প্রগতি

* সরকারী ও বেসরকারী সংস্থায় অবিলম্বে সব কাজ দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হচ্ছে

* নিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধ বৃদ্ধি পেয়েছে

* সহযোগিতার মনোভাব ব্যাপক ঃ দেশের সঙ্গে একাত্মবোধ

ডিএভিপি ৭৬/১৫৩

১৬ বর্ষ

অমৃত

১২ সংখ্যা

"ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 30th July, 1976 শুক্রবার, ১৪ শ্রাবণ, ১৩৮৩

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়		
৭	শশাঙ্কশেখরের জীবনের খুঁটিনাটি	(গল্প)	শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
১২	যুদ্ধ	(গল্প)	ঐ
১৭	কথায় কথায়		শ্রীতারাপদ রায়
১৮	পাপড়ি	(কবিতা)	বনফুল
১৯	গোধূলিয়া	(উপন্যাস)	শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
২২	বিজ্ঞাপন বিচিত্রা		শ্রীআনন্দ রায়
২৪	মনের অসুখ		শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
২৭	মোহিনী আট্টম	(উপন্যাস)	শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি
৩০	নতুন বই		
৩১	সাহিত্যের নেপথ্যে		শাণ্ডিল্য চতুর্বেদী
৩৩	একালের গান		শ্রীসন্ধ্যা সেন
৩৭	স্বপ্ন	(গল্প)	শ্রীহীরক রায়

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ।

অস্কার ওয়াইল্ড রচনাসমগ্র

প্রতি খণ্ড দশ টাকা। অনুবাদ : সুনীলকুমার ঘোষ

হোমার রচনাসমগ্র

প্রকাশিত হয়েছে। এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। পনের টাকা

ইলিয়াড ও ওডিসির পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ। অনুবাদ : সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

শেক্সপীয়ার রচনাবলী

৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ। শেষ খণ্ড প্রকাশ আসন্ন। ৩৭টি নাটক, দীর্ঘ কবিতা ও সনেটের আক্ষরিক অনুবাদ। গ্রাহকমূল্য ষাট টাকা।

অনুবাদ : সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

মপাসাঁ রচনাবলী

৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ। ৩ খণ্ড পাওয়া যাচ্ছে। গ্রাহকমূল্য ৪০ টাকা।

অনুবাদ : সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ, শেখর সেনগুপ্ত ও সুনীলকুমার ঘোষ

দান্তে রচনাসমগ্র

এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। 'ডিভাইনা কমেডিয়া'র তিনটি খণ্ডের আক্ষরিক গদ্যানুবাদ। গ্রাহকমূল্য পনের টাকা। প্রকাশ আসন্ন।

- প্রতিটি রচনাবলীর জন্য ৫্ অগ্রিম দিয়ে গ্রাহক হোন।
- সুন্দর ছাপা, মজবুত বাঁধাই ও মনোরম প্রচ্ছদ।

তুলি-কলম : ১, কলেজ রো, কলকাতা-৯ ফোন : ৩৪-৮১৮০

দশ টাকায় ডিসকাউন্ট কুপন কিনে ২৫% কমিশনে কিনুন

শেখরকুমার রায় রচনাবলী

১ম খণ্ড ২৫.০০ ২য় খণ্ড ২৫.০০ ৩য় খণ্ড ২৫.০০

লীলা মজুমদার রচনাবলী

প্রথম খণ্ড খুব শীঘ্র বের হচ্ছে

হ্যান্স অ্যান্ডারসন রচনাবলী

প্রথম খণ্ড ২৫্ দ্বিতীয় খণ্ড ২০্

গ্রিম ভাইদের রচনাবলী

প্রথম খণ্ড ২৫্

লুইস ক্যারল রচনাবলী

প্রথম খণ্ড ২৫্

উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র রচনাবলী

প্রথম খণ্ড ৩০্ দ্বিতীয় খণ্ড ৩০্

সুকুমার রায় সমগ্র রচনাবলী

প্রথম খণ্ড ২৫্ দ্বিতীয় খণ্ড ৩৫্

এডওয়ার্ড লিয়ার রচনাবলী

এক খণ্ড ১২্

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

কার্যালয় : ৭২/১, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলিকাতা—৬

বিক্রয়কেন্দ্র : এ/১৩২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭ ফোন : ৩৪-২৩৮৬

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য অমৃত কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে অমৃত কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে অমৃত কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৩-০০	টাকা ৪০-০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১৬-৫০	টাকা ২০-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৮-২৫	টাকা ১০-০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন
কলিকাতা—৩

প্রকাশিত হ'ল!

বেদুইনের আলোড়ন সৃষ্টিকারী উপন্যাস

তৃতীয় অধ্যায় ১০৲

[লেখকের এ যাবৎ প্রকাশিত উপন্যাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস]

আমাদের প্রকাশিত আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
প্রশস্ত হলঘরে ৭৲

প্রলয় সেনের
কয়েদখানা ১২৲

বেদুইনের
কার পদধ্বনি ১২৲

২রা আগস্ট প্রকাশিত হবে
চিরঞ্জীব সেনের
সর্বনাশা তেরো ১০৲

সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী, ১৫।৩ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ কর্তৃক গ্রন্থিত

শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত (১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড)
প্রতি সেট—মূল্য ২৪-০০

LORDGOURANGA (vol. 2)
Per Vol. Rs. 6.00

কালাচাঁদ গীতা
প্রতি কপি—মূল্য ১-৫০

LIFE OF SISIR KUMAR GHOSH
Per Copy Rs. 6.50

নরোত্তম চরিত
প্রতি কপি—২-০০

প্রাপ্তিস্থান :
পত্রিকা হাউস (হিসাব বিভাগ)
১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৫৪	পুনশ্চ		রূপদর্শক
৫৫	একালের চিত্রশিল্পী		শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৪৭	অদ্য শেষ রজনী	(উপন্যাস)	শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
৪৯	মাঠ থেকে বলছি		শ্রীঅজয় বসু
৫১	মাঠের নায়ক		শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২	খেলাধুলো		দর্শক
৫৩	সিনেমাটিক টক		শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৫৬	কয়েকজন		নিরীক্ষিৎ
৫৮	নাটমঞ্চ		
৫৯	ক্লোব থেকে বলছি		মুসাফির
৬২	জলসা		চিত্রাঙ্গদা
৬৩	শতবর্ষের স্মরণীয়		শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ লাস্ট জাজমেন্ট — একটি অংশ। সিস্টাইন চ্যাপেলে বেদীর পিছনের দেওয়ালে অঙ্কিত। শিল্পী মিকেল্যাঞ্জেলো।

অফিস এবং ইনজিনীয়ারিং-এর
নিখুঁত সরঞ্জাম
এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

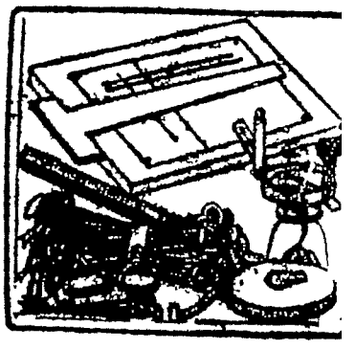

সার্ভে, ড্রইং, নানা রকম কাজের
খাতা, লেজার, ক্যাশবই, কালি ও
উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য
অন্যতম প্রতিষ্ঠান
কুইক স্টেশনারী স্টোর্স
৬৩ই, রাধাবাজার স্ট্রীট কলিঃ-১
ফোন ঃ ২২-৮৫৮৮, ৬৭-৪৬৬৪
গ্রাম ঃ অবারপিন, পোস্ট বক্স—৩৮ হাওড়া
পরিবেশক ঃ কার্মলিন প্রডাক্টস
(স্টেশনারী বিভাগ)

বিখ্যাত ডাটা
গুঁড়ো মশলার
প্রস্তুতকারক
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত
(কুকমী) প্রাঃ লিঃ
এখন আপনাদের দিচ্ছেন
একটি নতুন অতি
সুদৃশ্য টিনের কৌটায়
সবরকম গুঁড়ো মশলার
অপূর্ব সংমিশ্রণ

এক কৌটো ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাক কিনলে আর কোনরকম মশলা এমন কি পেঁয়াজ, আদা, রসুন প্রভৃতি আলাদা করে রান্নায় দিতে হয় না। ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাকের মাছ মাংস, ডিম ও সবরকম মুখরোচক তরিতরকারি অল্প সময়ে চটপট রান্না করা যায়। আপনার সবরকম রান্নায় আজই ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার (কিচেন কুইন প্যাক) ব্যবহার করুন।

ডাটা
রেডিমিক্সড কারি
পাউডার
কিচেন কুইন প্যাক

প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ
২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭, পোস্ট বক্স নং ৬৭৭৪.
ফোন : ৩৩-১৩৩৭, ৩৪-৯৭০৮

PAM—KCD-74

সম্পাদকীয়

সাহিত্য পরিষদের স্থায়িত্ব

উনিশ শতকের বাঙালিরা সংস্কৃতিক চেতনার প্রসার ঘটানোর জন্যে যে প্রতিষ্ঠানগুলি তৈরি করেছিলেন, একশ বছর না পেরোতেই তারমধ্যে ক্রমে সংকট দেখা দিচ্ছে। সেদিনের বাঙালি সাহিত্যিক ও মনীষীদের অতি সাধের সাহিত্য পরিষদ এবং এশিয়াটিক সোসাইটির দিকে তাকালেই সংকটের চেহারাটি স্পষ্ট হবে।

দুটি ক্ষেত্রেই নানারকম গোলমাল ও দলাদলির অভিযোগ দীর্ঘদিনের। তাছাড়া টাকা-পয়সার অপব্যয়েব খবরও না শোনা গেছে এমন নয়। বিদ্যাস্থানে এরকম অবিদ্যার প্রভাব খুবই দুঃখের।

সাহিত্য পরিষদের ব্যাপারটিই ইদানীং নতুন করে চোখের সামনে এসেছে। আচার্য সুনীতিকুমার পরিষদের সভাপতির পদ ছেড়ে দিয়েছেন বলেই নানারকম সন্দেহ আরো সুস্পষ্ট হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু পরিষদের রুগ্নতা রীতিমত ক্রনিক।

বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর প্রমুখ দিকপাল ব্যক্তিরা তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন যে প্রতিষ্ঠান, তার এই হাল খুবই পীড়াদায়ক। কিন্তু তাকে একটা শক্ত বনিয়াদের উপর দাঁড় করানোর জন্যে আমরা কাজেকর্মে কতটা কী করেছি, তাও ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখা দরকার।

কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য সাহিত্য পরিষদকে তার বর্তমান সমস্যা থেকে উদ্ধারের জন্যে সাহায্য করবেন বলে জানিয়েছেন। এটা খুবই সুখের কথা। কেন্দ্রীয় সরকার আগেও যে সাহায্য না দিয়েছেন তা নয়। কিন্তু পরিষদের ব্যাধি কি শুধুই অর্থ দিয়ে সারানো যাবে? যাঁরা সেই অনুদানের বিলিব্যবস্থা এবং খরচের ব্যাপারে কর্তৃত্ব করবেন তাঁদের ওপরেও কি নির্ভর করে না তার সুপ্রয়োগ? এমন তো হতে পারে সর্ষের মধ্যেই থেকে যাবে ভূত।

এ সন্দেহ যে অমূলক নয় তা পরিষদের গ্রন্থাগারটির দিকে তাকালেও স্পষ্ট বোঝা যায়। এ প্রতিষ্ঠান যতোদিনের প্রাচীন যদি ততোদিনের সংগৃহীত বইগুলি সযত্নে রক্ষিত হত, বাঙালির জাতীয় গৌরব একটা ক্ষেত্রে হয়তো অক্ষুণ্ণ থাকত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে। বই নিয়ে যাঁরা গবেষণা করতে আসতেন, তাঁরা তো বটেই, বহুকাল ধরেই অভিযোগ শোনা গেছে, বইয়ের যাঁরা রক্ষক ছিলেন তাঁরাই হয়ে দাঁড়িয়েছেন ভক্ষক। চুরি জিনিসটাকে কেউই ঠিক সমর্থন করেন না, কিন্ত বই নিয়ে ফেরৎ না দেওয়াও যে চুরি, অনেকেই সেটা বুঝতে চান না। শিক্ষিত ব্যক্তিদেব এইসব নির্লজ্জ ব্যাধির ফলে পরিষদের কতো মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বই যে সুড়ঙ্গপথে চলে গেছে কর্তাব্যক্তিদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে তা রীতিমত অনুসন্ধানের বিষয়।

এছাড়া কোনো কোনো কর্তাব্যক্তি বই ছাপানোর ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ প্রেসকেও আনুকূল্য কম বিতরণ করেন নি। খবরে দেখা গেল, এ ব্যাধি এখনও দুর্দণ্ড ভাবেই বিরাজমান।

কত অপচয় যে এভাবে বছরের পর বছর ঘটে গেছে, একটা ভালোরকম তদন্ত ছাড়া তার হদিস পাওয়াও শক্ত।

কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য দেবার আগে এসব বিষয়ে নিশ্চিত হলে টাকাটা সৎপাত্রে পড়বে। নয়তো ফুটাপাত্রে জল ঢেলে তৃষ্ণা মেটাবার আশা আকাশ-কুসুমের মতোই মিলিয়ে যেতে পারে।

আরও একটা কথা ভাবা দরকার এ প্রসঙ্গে। একটা জাতির মতো একটা প্রতিষ্ঠানকেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে হয়। গত শতাব্দীতে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির যে পরিস্থিতি ছিল, এ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেই তা অনেক বদলে গেছে। আজ এই বিশ শতকের শেষ পর্বে দাঁড়িয়ে তো চারদিকেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে একটা আমূল পরিবর্তনের লক্ষণ। কাজেই যে উদ্দেশ্য নিয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তৈরি হয়েছিল একদিন ঠিক সেইভাবে যদি এখনো চলা যায় তো সেটা কি অনেকটাই যাদুঘরের ব্যাপার হয়ে উঠবে না?

একথা আরও বেশি করে ভাবা দরকার এইজন্যেই যে, এ কালের যাঁরা নবীন জ্ঞানকর্মী কিম্বা যশস্বী তরুণ সাহিত্যিক, তাঁদের সঙ্গে সাহিত্য পরিষদের প্রাণের যোগ না ঘটাতে পারলে শুধু টাকা দিয়ে টিকিয়ে রাখা যাবে না এ প্রতিষ্ঠানকে।

সেজন্যেই অনুরোধ, পরিষদের বর্তমান কর্তৃপক্ষ, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার মিলিতভাবে একটি আলোচনাচক্র ও সম্মেলন আহ্বান করেন সর্বস্তরের নবীন সাহিত্যিক ও সাহিত্যকর্মীদের নিয়ে; এবং সেখানেই স্থির হোক পরিষদের নতুন উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রণালী।

না হলে যাকে বলে 'জেনারেশান গ্যাপ', সে সংকট কিন্তু কাটবে না কিছুতেই।

একই লেখক

দুই গল্প : দুই সময়

শশাঙ্ক শেখরের জীবনের খুঁটিনাটি

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

পত্নীবিয়োগের পর প্রায় দশটি বছর কাটতে চলল। শশাঙ্কশেখর এবারও টিঁকে গেলেন। গত শীতেই তিনি ঘোষণা করেন এই শীতটা পেরোতে পারলে আমি বেঁচে যাব।

শীতকে তাঁর ভীষণ ভয়। পঞ্চাশ বছরের ওপর ব্রঙ্কাইটিসের ধাত। একটু বৃষ্টি পড়লেই ফুল হাতার সোয়েটার পরে নেন। তা নয় তো শরীরটা তাঁর এই চুরাশিতেও দিব্যি খটখটে ছিল।

জন্ম মাস আষাঢ়। বৈশাখের মাঝামাঝি লাংসে কী একটা হয়ে মুখ দিয়ে অনেক রক্ত পড়লো। এগারো দিন হাসপাতাল বাস। তিন বোতল রক্ত নিতে হয়েছে শরীরে। অনেক ইঞ্জেকশন। কিছু ট্যাবলেট।

বাড়ি ফিরে পা ফুলেছে। দুখানি পায়ের ভেতর একখানি একটু ছোট। প্রায় বিশ বছর আগে রাস্তায় পড়ে গিয়ে সেবারে সাড়ে তিন মাস হাসপাতালের কেবিনে ছিলেন শশাঙ্ক। ভাঙা হাড় বাদ পড়াতে জোড় মেলানোর সময় পা ছোট হয়ে যায়। তাই খুঁড়িয়ে হাঁটেন শশাঙ্ক। তাঁর বাথরুমের জন্যে একখানি বাতিল চেয়ার কেটে অস্থায়ী কমোড বানাতে হয়েছে।

দ্বিতীয় বিয়ে থেকে চাকরির রিটায়ারের ভেতর তিনি আগেকার যে কোন গৃহস্থের মতই আঠারো বার বাবা হন। সতেরো ছেলে এক মেয়ে। তার মধ্যে এগারোটি ছেলে হামাগুড়ির আগেই বিদায় নেয়। একটি যৌবনে আত্মঘাতী হয়।

এখন পাঁচ ছেলে তাঁকে পেনশন দেয়। মাসের গোড়ায় মাইনে পেয়েই ছেলেরা পঞ্চাশটি করে টাকা দিতে আসে। ন'ছেলের কাছে থাকেন বলে সেই ছেলে ঘরের ভাড়া দেয় পঞ্চান্ন টাকা। ছোট ছেলের শ্বশুরও বিপত্নীক। বৃদ্ধ। তাঁর একমাত্র সন্তানকে বিয়ে করেছে বলে ছোট ছেলের সঙ্গে তার শ্বশুর থাকেন। মাঝে মাঝে তিনি অসুস্থ হন বলে ছোট ছেলে সব সময় তার বাবাকে পেনসন দিয়ে উঠতে পারে না।

শশাঙ্কশেখর তাঁর পেনশন কমুট করে একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে অবশ্য সবটা কুলোয় নি। তা যা হোক সেই সুবাদে কিম্বা অন্য কোন কারণে শশাঙ্কশেখর ছেলেদের প্রায় সবার কাছ থেকেই সময় মত মাসিক পেনসন পান। নিজের অফিসের পেনসনেরও একটা অংশ এখনো পান। সরকারী সিদ্ধান্তে ডি-পেনসনের পরিমাণ গত আটাশ বছরে কিছু কিছু করে বেড়েছে। সেই টাকাটা দ্বিতীয়বার পত্নী-বিয়োগের পর শশাঙ্কশেখর ইউনিট ট্রাস্টে লগ্নী করে ঘরে প্রায় দশ হাজারে টেনে তুলেছেন। তার সুদ কষে কষে অবসর সময় শশাঙ্কশেখরের সুন্দর কেটে যায়। জীবনে এটাই তাঁর প্রথম অ্যাকাউন্ট।

প্রথমবার পত্নীবিয়োগ ঘটে প্রথম মহাযুদ্ধের কিছু আগে। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় যান। প্রায় সত্তর বছর আগেকার কথা। তখন শশাঙ্কশেখর নব-পর্যায়ে বঙ্গদর্শনের পাঠক। বঙ্কিমচন্দ্র বিগত মাত্র কয়েক বছর। শোনা যেত কলকাতায় রবীন্দ্রনাথ নামে একজন কবি ও লেখক—সভা-সমিতি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে নিজের লেখা গান নিজে সুর দিয়ে গান। পরে যে সেই লোকটিই ক্যালেন্ডারের এত ছবি হয়ে দাঁড়াবেন—তখনকার শশাঙ্কশেখররা কেউই বুঝতে পারেন নি। এই তো সেদিনের কথা।

বড়ছেলের কিষের দান সামগ্রীর মধ্যে একখানা বড় ইজিচেয়ারে আজ পর্যন্ত শশাঙ্কশেখর। বড়ছেলে রিটায়ার করে একসটেনশনে আছে। দুজনে একত্রে হলে পেনশন বিষয়ে কথা হয়। কোষ্ঠ পরিষ্কার ও বেলের উপকারিতা নিয়েও দুজনে কথা হয়। আরেকটি কাজ করতে হয় শশাঙ্কশেখরকে।

বেতনভুক পুরোহিত আছে। দু' বেলা এসে বংশের নারায়ণ শীলাকে ঘন্টা বাজিয়ে আরতি করে যায়। পঁচিশ পুরুষের নারায়ণ শীলাটি একই ঘরে শশাঙ্কশেখরের সঙ্গে আছেন। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ন'ছেলের হাতে যাবে এই শীলা। এভাবেই গত পঁচিশ পুরুষ নারায়ণ এ-বংশের সেবা পেয়ে আসছেন। এই সেবা ঠিকমত হচ্ছে কিনা তা দেখতে হয় শশাঙ্কশেখরকে।

দেশবন্ধুর দেহরক্ষার এক বছর আগে শশাঙ্কশেখরের প্রথম ব্রঙ্কাইটিস প্লুরিসিতে চলে গিয়েছিল। তারও দু' বছর আগে থেকেই তিনি কানে কম শোনেন।

ন'ছেলে বিনয়ের বউ তাই শ্বশুর শশাঙ্কশেখরকে শ্লেটে বড় বড় করে লিখে প্রশ্ন করে। কিছু জানতে চাইলে চক দিয়ে লিখেই জবাবও দেয়। বড় করে লিখতে হয়—কারণ শশাঙ্কশেখর চোখে ভালো দেখেন না—তাও প্রায় তিরিশ বছর। ইজিচেয়ারের পাশেই ছোট টেবিলে সব সময় শ্লেট পেনসিল মজুত থাকে।

আরেকটি কথা বলা দরকার। শশাঙ্কশেখরের হাতের লেখা বিষয়ে। আঠাশ বছর আগে নতুন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অফিস থেকে পেনসন নেওয়ার সময় তার সম্বন্ধী বলেছিল শশাঙ্ক। তোমার হাতের লেখার হাত থেকে গভমেন্ট বেঁচে গেল।

লেখা কিছু জড়ানো। তার কারণ দোয়াতে নিব ডুবিয়ে শশাঙ্কশেখর লিখতেন। লম্বা কলমের একদম পেছনের ডগা ধরে তার আঙুল চলতো। শশাঙ্কশেখরের আর একটিমাত্র বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেই গোত্তা মেরে সোজা গল্পে ঢুকে যেতে চাই। গল্প না বলে বলা উচিত শশাঙ্কশেখরের জীবনে। সে এমন একটি মানুষ—যার পেনসন নেওয়ার এক বছর আগে দেশ স্বাধীন হয়েছে। যার প্রথমা পত্নীর কোন চিহ্নই এ বাড়িতে নেই। চেহারাও শশাঙ্কশেখরের মনে পড়ে না। মাঝে মাঝে একটি তেলের বাটির কথা মনে ভাসে। শীতকালে বোদে বসে সে-বাটি থেকে সরষের তেল তুলে গায়ে মাখতেন শশাঙ্কশেখর। তাতে কেটে কেটে লেখা ছিল—সৌরভিনী। সে-বাটি মাত্র বছর কুড়ি আগে দ্বিতীয় পত্নী রেগে গিয়ে বাড়ির সামনের বাগানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। খুঁজে পাওয়া যায় নি। কিম্বা কুড়িয়ে আর হয় নি। প্রথমার মৃত্যুর চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর পরে দ্বিতীয়ার সেই ঈর্ষা শশাঙ্কশেখর উপভোগ করেছিলেন।

যা বলতে চাইছি। দ্বিতীয়ার প্রথম বার্ষিক শ্রাদ্ধে ছেলেরা ঘটা করেই করেছিল। তারপর থেকে ছেলেরা উচ্চবাচ্য করে না জেনে শশাঙ্ক স্বয়ং ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে বছরে ওই একটি দিন মাছ মাংস কেনেন। ছেলে বউমা নাতি-নাতনিদের জন্যে প্রচুর ঘাল দিয়ে মাংস মুগের ডালে মাছের মাথা দিয়ে মুড়িঘন্ট রান্না হয়। সবাই পেট ভরে খেয়েদেয়ে ইদানীংকার গল্পগাছা করে। একবর্ণও শশাঙ্কশেখর শুনতে পান না। তবে ওদের মুখের ভাব হাত নাড়ার ভঙ্গী দেখে বুঝতে পারেন—আর যাই হোক—আলোচ্য বিষয় ওদের মাতৃদেবী কুসুমকুমারী নন্।

এরই মাঝে একমাত্র মেয়ে বেড়াতে এসে একখানা দশ টাকার নোট দিয়ে যায় শশাঙ্কশেখরকে। সঙ্গে শশাঙ্কশেখরের জামাই থাকে। তখন বাড়ির বাইরে জামাইয়ের সেকেন্ড-হ্যান্ড বিলিতি গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে।

কোন ছেলের বউ বা আপেল নিয়ে আসে। কেউ আনে এক বাকস সন্দেশ। নিজেও ল্যাংড়ার সময় ল্যাংড়া কেনেন। তাছাড়া বেল তো কম্পালসারি। সবই থাকে ক্যাশ বাক্সে। সেখানে ক্যাশ বিশেষ থাকে না। থাকে একখানি বঙ্কিম বচনা সংগ্রহ। জগদীশের গীতা। পকেট পঞ্জিকা জামার আলগা বোতাম মিকশ্চারের শিশি ট্যাবলেট আর কিছু ছাপানো আইডেনটিটি কার্ড।

এই কার্ড তাকে ছাপাতে হয়েছে।

শশাঙ্কশেখর দত্ত

ফাদার অফ—

পর পর পাঁচ ছেলের নাম ইংরাজিতে ছাপানো। তারপর ন'ছেলের ফোন নম্বর ও ঠিকানা। বেরোবার সময় এই কার্ড পকেটে নিয়ে বেরোন। বলা তো যায় না—পথে কখন কোথায় কি হয়ে যায়।

পথ বলতে তিন জায়গায় তিনি যান।

ইউনিট ট্রাস্টের টাকা জমা দিতে পোস্ট আফিসে।

পেনসনের টাকা তুলতে ব্যাঙ্কে।

আর ছোট মাছ কিম্বা লাউ শাক কিনতে বাজারে।

দু' এক সময় অবশ্য লাঠি হাতে বাড়ির সামনের ফুটপাথ ধরে ইভিনিং কিম্বা মর্ণিং ওয়াক করেন। তখনো কার্ড থাকে পকেটে।

পাড়ার সদ্য রিটায়ার ষাট একষট্টি বছরের ছোকরারা কানের কাছে মুখ এনে চেঁচিয়ে জানতে চায় হজম হয় দাদা? কি খান? এ-রকম এক ছোকরা তো একদিন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ব্লাড প্রেসারের গল্প করতে এসেছিল। গা জ্বলে যায় শশাঙ্কশেখরের। তিনি আমল দেন নি। শুনেছেন—লোকের ব্লাড প্রেসার নামে একটা রোগ হয়। স্ট্রোকে নাকি আরেকটা ভয়ঙ্কর রোগের নাম।

পেনশনের বই পাশবই থাকে সামনের দেওয়াল আলমারিতে। রেশন কার্ড বউমার হাতে। ছাতা ছড়ি পাম্পসু—ঘরের কোণে। বাংলা ক্যালেন্ডার উল্টো দিকের দেওয়ালে।

নিজের কোন ছবি নেই শশাঙ্কশেখরের কাছে। যা আছে পেনসনের বইতে। সে তো সেই অল্প বয়সের। রিটায়ারের মুখে মুখে তোলা। তার সময়ে পঞ্চান্নতে পেনসন ছিল। নেই কুসুমকুমারীর ছবিও। যা আছে ছেলের ঘরে টাঙানো। পরিণত বয়সের।

ওরা তো কুসুমের অল্প বয়সের চেহারা দেখে নি। বিশেষ করে বউমারা। ন'ছেলের বউকে শশাঙ্কশেখর একদিন বলেছিলেন দু'বার বিয়ে করেছি। দুজনই সুন্দরী লম্বা বড়লোকের মেয়ে ছিল।

বউমাটি সব কথার জবাব দেয় না। একথা সে কথায় মুখ টিপে হাসে। নয় তো মনই দেয় না।

এই মন না দেওয়াটা শশাঙ্কশেখরের খুব অপছন্দ। কিন্তু কিছু করার নেই। কাকে বলবেন? ছেলেরা পেনসন দিতে এসে বাড়ির ভেতরে বসে। যাবার সময় বলে যায়—আসি বাবা।

শুনতে না পেলেও অভ্যেস বসে শশাঙ্কশেখর বলেন, এসো।

ন'ছেলেটি বছর ষোল সতের হল গৃহস্থ। মাঝে মাঝে মদ্য পান করে গুম হয়ে ফেরে। এমনিতে মনটা ভাল। তার সঙ্গে একদিন বিকেলে শ্লেটে প্রশ্নোত্তর চলল। ছেলে প্রশ্ন লেখে। শশাঙ্কশেখর পড়ে নিয়ে মুখে জবাব দেয়। লিখতে যতক্ষণ আর কি। শশাঙ্কশেখরের জবাব পটাপট।

দু' হাজার টাকা ধার দেবে বাবা? এক হপ্তা বাদে ফেরৎ পাবে।

মাথা ব্যথা করে।

কেন? সুদ দেব। টেন পারসেন্ট মান্থলি।

টাকা চাইলে মন খারাপ হয়ে মাথায় ব্যথা হয়।

ফেরৎ দিয়ে দেবো তো বাবা। সুদে আসলে—

না। যদি ফেরৎ না পাই এই ভেবেই মাথার তালুতে ব্যথা করে।

টাকা দিয়ে করবে কি? সবই তো তোমার আছে। কিসের দরকার?

আহা! তুই বুঝবি না। আমার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ করতে তোদের লাগবে। যদি কোন অসুবিধায় পড়িস।

দাহ করার খরচ কি আর জোগাড় হবে না। শ্রাদ্ধও ভালভাবে করতে পারবো পাঁচ ভাইয়ে। তোমার চিন্তা কিসের? টাকা তুলে দু' হাতে খরচ করে যাও। ক'টা দিন আর—

কিছু বলা যায় না। যদি দীর্ঘায়ু হই। যদি তোরা টাকা দিতে না পারিস। সরকারী পেনসন তো নতুন কোন আইনে বন্ধ হয়েও যেতে পারে। তখন? তখন কি হবে?

যদির কথা ছাড়ো তো। টাকাগুলো খরচ করো মনের আনন্দে। নোমিনি করেছো কাউকে?

না। পাঁচজন সমান ভাগে পাবে।

সমান কেন? আমার একটু বেশি দিতে হবে। আমার কাছে থাকো যে—

পঁয়তাল্লিশ বছরের ছেলেকে দাবড়ি দেন শশাঙ্কশেখর। রাখ্। বাজে কথা বলিস না:

বাজে নয় বাবা। শেষে ফ্যাকড়ায় পড়ে আমরা কেউ টাকা তুলতে পারবো না। তোমার কষ্টের টাকা জমা পড়ে থাকবে। সুদ জমবে। কিন্তু কারও ভোগে লাগবে না। শ্লেট ভরে লিখে ফেলে ন'ছেলে।

পটাপট জবাব দেয় শশাঙ্ক। ভবিষ্যতের কথা তো ভাবতে হবে।

তোমার আবার ভবিষ্যৎ! তুমি তো ভবিষ্যতেই বাস করছো। এখন আমাদের ভবিষ্যৎটা একটু দ্যাখো। আমাদের তো এখন অনেক বাকি।

আসলে সেদিন বিকেলে ন'ছেলে কিছুটা পান করে এসেছিল। অন্য সময়ের কঠিন কথা তখন সহজেই বেরিয়ে আসছিল তার মুখ দিয়ে।

শশাঙ্কশেখর কোনদিন টাকা জমান নি জীবনে। জমানোর চান্স পান নি। এতগুলো ছেলের পড়াশুনো। মেয়ের বিয়ে। সংসার। দ্বিতীয়ার বিয়োগের পর প্রথম ঝাড়া হাত পা হয়েই এই অভ্যেসটি রপ্ত করেছেন। নতুন-অভ্যেস। বড় আনন্দদায়ক ব্যাপার। লাফিয়ে লাফিয়ে টাকা বাড়ে। সেই প্রথম জীবন থেকে যদি জমিয়ে আসতেন—তাহলে এখন ভাব কত টাকা। ভাবা যায় না। স্বপ্নের মত।

বউমাদের দু' একজনের আশঙ্কা বেশি বয়সে শশাঙ্কশেখর না শেষে পুত্রশোক পান। ছেলেরা সবাই মোটা মোটা—ভারি ভারি মানুষের ধাতের। স্ট্রোক এসে পৌঁছতে যেটুকু দেরি।

শশাঙ্কশেখর বলেন আমি যা আয় করেছি—ছেলেদের খাওয়ানো পড়ানোতেই ঢেলে দিয়েছি। নয়তো ওরা এমন স্বাস্থ্য পেতো কোথায়? ব্রেন হোত কোত্থেকে? জীবনে দাঁড়াতে পারতো?

বড় বউমা আস্তে বলে, তা ব্রেন বাঁটে আপনার ছেলেদের। খায়দায় ঘুমোয়। পুম থেকে উঠে আবার খায়। খুব ভারি ব্রেন। আপনি তো খাওয়া-দাওয়া করেছেন; আপনার শরীর এমন খটখটে কেন?

এসব কথা শশাঙ্কশেখরের কানে যায় না।

একদিন সকালে সত্তর বছরের এক বৃদ্ধ এসে শশাঙ্কশেখরকে প্রণাম করলো। হাফ-সার্ট ধুতি কেম্বিসের জুতো শাদা চাপদাড়ি হাতে ছাতা। বৃদ্ধ বললেন, আমি আপনার সবচেয়ে ছোট সম্বন্ধী।

বাড়িসুদ্ধ সবাই আকাশ থেকে পড়লো। কুসুমকুমারীর এমন তো কোন ভাই নেই।

ভদ্রলোক বললেন, আমি আপনার প্রথমা পত্নীর ছোট ভাই। আপনার বিবাহের সময় মাতৃক্রোড়ে ছিলাম।

এটুকু শশাঙ্কশেখরকে বোঝাতে ন' বউমার দশ মিনিট সময় গেল। কানের সাউন্ড বক্স খুব খারাপ। ন'ছেলে এসে তার নতুন মামাকে প্রণাম করলো। প্রণাম করতেই নতুন মামা হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন। শেষে বললেন, দিদি বেঁচে থাকলে এ ভাগ্নে তো আমার আপন ভাগনেই হোত। ন'ছেলে বলল, আপনি তো আমাদের আপন মামাই—

শশাঙ্কশেখর প্রায় সত্তর বছর আগের কথা বিশেষ কিছুই মনে করতে না পেরে ভদ্রকে গিয়ে চুপ করে বসে থাকলেন। একে স্মৃতি বিশ্বাসঘাতক। তারপর শোনেন কম। দেখেন তারও কম। মাতৃক্রোড়ের সম্বন্ধীকে এতদিনের ব্যবধানে সনাক্ত করা খুবই কঠিন।

বিকেলে ইভিনিং ওয়াক করে

ফিরছিলেন। বাড়ি থেকে তিন-চার ট্রাম স্টপ দূরে ফুটপাথে বসে পড়ে বড় ঘামি করলেন। পরিষ্কার বুঝলেন ডান দিকের পাঁজর দিয়ে জল ঢুকে যাচ্ছে। সন্ধ্যার কলকাতা আচমকা শশাঙ্কশেখরের চোখের ওপর ঘনিয়ে এল।

পকেটের আইডেনটিটি কার্ড বের করতে ভুলে গেলেন। এক হিন্দুস্থানী রিকসাওয়ালা তাকে চিনতো। তুলে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিল। তার কাঁধে ভর দিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে শশাঙ্কশেখর ন'ছেলেকে দেখে বললেন, এই তামার শেষ—

শৈশবে এর ওর মুখে জন্মের আগেকার শোনা কথার হিসেব ধরলে শশাঙ্কশেখরের প্রায় এক শতাব্দীর স্মৃতিভার। এ স্মৃতির একটা ওজন আছে। তার চাপে তিনি অজ্ঞান হলেন। কিন্তু এগারো দিনের দিন হাসপাতাল তাঁকে ডিসচার্জ করে দিল। তাঁকে নিয়ে যেতে ছেলেদের কিছু দেরি হয়েছিল। স্নান বন্ধ। নার্স পাউডার মাখিয়ে দিয়েছে। মোছা হয় নি। প্রায় শাদা রঙের শশাঙ্কশেখর হাসপাতালের বেডে সোজা হয়ে বসে আছেন। পুটুলি করে সব গোছানো। রেগে টং।

বাড়ি এসে পা ফুলেছে। মুখে অরুচি। একটা সন্দেহ হল শশাঙ্কশেখরের। কেউ তার দিকে বিশেষ মন দিচ্ছে না। সবাই দায়সারা গোছের দেখে যায়। ঘরে ঢোকে না। আমি তো এখনো মরে যাই নি। তোমরা মন দিচ্ছো না কেন? পা ফুলেছে—তাতে হয়েছে কি? শীগগিরি সেরে যাবে।

বড় ছেলেটির বয়স প্রায় ষাট। সেটি একটি গাধা। পেনসনের কাগজপত্রে নতুন নিয়ম হয়েছে। ফটোগ্রাফার দিয়ে এখনকার ছবি তুলে ডাক্তারের সই সমেত ব্যাঙ্কে দেখাতে হবে। এই সামান্য কাজটা বড়ছেলে সম্পূর্ণ করতে পারছে না। ফলে রোজ অন্তত বারো পয়সা করে সুদ হারাতে হচ্ছে। এসব হিসেব তো আর ওদের মাথায় ঢোকে না। দাঁড়াও। বয়স হোক। তখন বুঝবে। কত ধানে কত চাল। জীবনে কিছুই ফেলার নেই। পাখির মতই এক পয়সা দু' পয়সা করে কুড়িয়ে রাখতে হয়। এই অবহেলার দাম দিতে হবে একদিন। তখন দেখবে—সময় বয়ে গেছে। অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমার জীবনে তো আমি তো টের পাই নি। পরে এখন দাম দিচ্ছি।

ডাক্তারের প্রেসক্রপশন মত ওষুধ এল। তাতেও পায়ের ফোলা কমলো না। হাসপাতালে নেওয়ার কথায় দেখা গেল—কোন ছেলেরই সময় হচ্ছে না।

তখন ন'ছেলে তার ক্লাশফ্রেন্ড এক ডাক্তারকে ডাকলো। বড় ডাক্তার। ই সি জি হল। হার্ট ব্লক আছে। এ বয়সে কাটা ছেঁড়া অসম্ভব। বুকের ইনফেকশন কমানোর জন্যে ক্যাপসুল এল। পেচ্ছাপ ফ্লাশ করানোর জন্যে ট্যাবলেট। রক্ত বৃদ্ধির জন্যে টনিক। সঙ্গে ছানা মাংস ফলের ব্যবস্থা হল। ছেলেরা মিটিং করে সাময়িকভাবে পেনসনের পরিমাণ ডবল করে দিল। কিন্তু ঠিক হল, শশাঙ্কশেখরের হাতে দেওয়া হবে না। জিনিসপত্র সব কিনে দেওয়া হবে। দুধ বাড়ানো হল। হাতে দিলে শশাঙ্কশেখর তাঁর ভবিষ্যতের কথা ভেবে সুদের আশায় এ-টাকাও ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেবেন। তাঁর হাত থেকে তো আর কেড়ে নিতে পারবে না ছেলের বউ।

সবই তো হোল। কিন্তু শশাঙ্কশেখর নিজেই একটি সমস্যা। কারণ তার পা ফোলা কমে যাওয়ায়—মুখে রুচি ফিরে আসায়—খিদে বেড়ে যাওয়ায় তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন—আর তাই ছেলে, ছেলের বউদের মনোযোগও আবার হারাতে লাগলেন। পরিণাম মন খারাপ, অস্থিরতা চেঁচামেচি বৃদ্ধি।

প্রথমে খুঁত ধরলেন—ঠিকমত আমার ওষুধ আসছে না। ব্যাংক থেকে টাকা তুলে ওষুধ আনতে হবে। ব্যাংকের উইথড্রল স্লিপ চাই এখুনি।

তদন্তে দেখা গেল ওষুধ ঠিকই আসছে। দু'একটি ট্যাবলেট মাসকাবারির ডাক্তারখানার ফুরিয়ে যাওয়ায় বলেছে—ওবেলা আনিয়ে দেব।

এ-পথে সুবিধা হচ্ছে না দেখে শশাঙ্কশেখর খড়মপায়ে লাঠি হাতে কলকাতার ভাড়াটে বাড়ির একমেব খোলা বারান্দায় সশব্দে পায়চারি শুরু করলেন। দু পাটি খড়মের আওয়াজ। তার সঙ্গে লাঠির ঠক। সে এক অনবরত অর্কেস্ট্রা। কমপোজার—চুরাশির শশাঙ্কশেখর।

আদিগঙ্গার তীরে কলকাতার খাটালগুলোর জন্যে ন' ছেলে খড় কাটার কল বসিয়েছে। সারাদিন আওয়াজের ভেতর থাকতে হয় যাকে। সে এই অর্কেস্ট্রায় ক্ষেপে গেল। ছুটে গিয়ে শ্লেটে খসখস করে লিখলো ফুটপাথে গিয়ে হাঁটো।

যদি স্যান্ডেল পায়ে বাড়ির ভেতরে হাঁটি? কোন আপত্তি আছে?

ন'ছেলে শ্লেটে বড় করে লিখলো না।

শ্লেটখানা ঝুঁকে পড়ে দেখে নিয়েই শশাঙ্কশেখর খড়ম খুলে স্যান্ডেল পরে নিল। এক পা ছোট। তাই একদিকে একটু ঝুঁকে আবার সিধে হয়ে হাঁটেন শশাঙ্কশেখর। সঙ্গে লাঠির সেই ঠক্। আর স্যান্ডেলের ঘষটানি—স্যাচ। স্যাচ। স্যাচ।

এই নতুন ঐকতানে ন' ছেলে ক্ষেপে পাগল হওয়ার জোগাড়। কিন্তু কিছু করার নেই। হাজার হোক—জন্মদাতা বাবা। তাঁর পায়চারি করার অধিকারের ওপর আর কি বলা যায়! হিসেবের খাতাখানা চোখের সামনে মেঝে ধরে ন' ছেলে দু'হাতে নিজের মাথাটি চেপে ধরে বসে থাকলো। আদিগঙ্গায় জোয়ার এলে আরও তিন নৌকো বিচুলি আসবে। কাহন বত্রিশ টাকা।

হাসপাতালে চব্বিশ ঘন্টার অ্যাটেনডান্ট দুজনে মিলে দিনে ষোল টাকা নিচ্ছিল। বাড়িতে এলে দুই নার্স মিলে দিনে অন্তত বত্রিশ টাকা নেবে।

মুশকিল আসান ভবলো একটি বছর বারোর ছেলে। নাম বিপত্তারণ। শশাঙ্কশেখর হাসপাতালে থাকতেই বিপু এ-বাড়িতে বহাল হয়। ফলতার বাপ-মরা ছেলে। অসম্ভব পরিশ্রমী আর ধৈর্যশীল ছেলে। সে-ই শশাঙ্কশেখরের অস্থায়ী কমোড নাড়াচাড়া করে। ভোবে ডবল পাল্টায়। তেল মাখিয়ে দেয় পায়ে।

শশাঙ্কশেখর তাকে 'মধু' নাম দিয়ে ডাকতে লাগলো। রাত বারোটাতেও মধু কপড়চোপড় পাল্টে দেয়। একজনের বয়স বারো। আরেকজনের চুরাশি। সেই চুরাশি একদিন বারোর মাথায় হাতের লাঠির বাড়ি দিল। বেয়াদপ। আমি ডাকি আর শুধু হাসে। জবাব দেয় না।

মধু ক্লান্ত। ক্লান্ত ন'ছেলে।

বাথরুমে যাওয়ার সময় শশাঙ্কশেখর অস্থায়ী কমোড ঠিক টেনে নিয়ে যান। উঠে আসার সময় ঠিক রেখে আসবেন। বাড়িতে বাথরুম একটি।

ন' ছেলে শ্লেটে লিখলো কমোড তুলে আনো না কেন?

শশাঙ্কশেখরের পরিষ্কার জবাব, পারি না।

বাথরুমে যাবার সময় তো নিজেই নিয়ে যাও। তখন কি করে পাবো?

শশাঙ্কশেখরের কোন জবাব নেই। অতএব যাবই বাথরুমের দরকার—তারই বিপুকে ডাকতে হয়।

ফ্রিজে ছানা থাকে। শশাঙ্কশেখরের জন্যে। অন্য খাবারও মজুত। তবু শশাঙ্কশেখর বেলা তিনটে নাগাদ পাউরুটি আর বাজভোগ তার মধুকে দিয়ে কিনিয়ে এনে খেতে লাগলেন।

জিজ্ঞাসা করলে বলেন ভীষন খিদে পায়।

এসব দেখে আর শুনে ন' ছেলের মাথায় আগুন চড়তে লাগলো।

মাসের প্রথম দিককার রবিবার ভোরে শশাঙ্কশেখরকে পেনসন দিতে এল নতুন মেজো ছেলে। রাত থাকতে হাঁটতে বেরিয়ে সে ছুড়ি কমিয়েছে। বয়স পঞ্চান্ন। ভোরবেলা

তার ন'ভাই বলল, মেজদা। আমারও ছিমছাম থাকতে ভাল লাগে। জানলা দরজায় পর্দা টাঙিয়ে।

মেজদা বলল কি করবো বল? আমার বাড়িতে তো মা বাবা থাকতে কোনদিন স্বস্তি পাবনি। বুড়ো মানুষের এখন আর কদিন!

না। ডাক্তার বলেছে হার্ট বন্ধ থাকলেও শীগগির কোন চান্স নেই।

ডাক্তার কি জানে!

বাঃ! ডাক্তারই তো সারিয়ে তুললো বাবাকে।

একমাত্র মেয়ে বেড়াতে এসে শশাঙ্কশেখরের ঘর থেকে চোখ মুছে বেরোলো। ন' ভাইকে দেখে বললো, বাবা বলছে—এখানে থাকে কেউ চায় না।

ন'ভাই বোনকে বলল বাবার কোন ব্যাপারে তো গাফিলতি নেই। কিন্তু তার সঙ্গে বসে থাকবে কে? সঙ্গ দেবার লোক পাবো কোথায়?

তাতো ঠিকই। বড়দা, মেজদা, সেজদা, ছোড়দা তো বছরে দুমাস করে নিয়ে গিয়ে রাখতে পারে বাবাকে। জায়গা বদল হলে বাবারও ভালো লাগে।

ন'ভাই চুপ করে থাকে। গত মাসে বারনা করা ছখানা বিচুলির নৌকোর নদীর ঘাটের মাস্তানরা চাঁদা না পেয়ে মাঝরাতে আগুন লাগায়। ব্যবসার অবস্থা ভালো নয়। সারাদিন হিসেব বায়না আগাম দরাদরি। এক একসময় বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। কিন্তু উপায় নেই। বাবাকে নিয়ে আজ বছর দশেক আছে। শশাঙ্কশেখরের নাড়াচাড়া সম্ভব নয়। তাকে রেখে যাওয়াও সম্ভব হয় না। কে খেতে দেবে? কে মশারি টাঙাবে?

বড়দা আজ ন' বছর মনোমত ফ্ল্যাট খুঁজে পায়নি। তাই বাড়ি পাল্টাতে পারেনি। বাড়ি পাল্টানোর প্রধান অসুবিধা ঃ ওই পাড়া ছেড়ে গেলে একমাত্র ছেলে যে কারখানায় ইঞ্জিনীয়ার—তা দূরে পড়ে যাবে। নাহলে অন্য জায়গায় ফ্ল্যাট কি পায়নি? বাবাকে নিয়েও সেসব বাড়িতে রাখতে কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু সেখান থেকে খোকোনের অফিস দূরে পড়ে যাবে।

তাই বড়বউ একবাটি লাউশাক কিংবা কচুশাক ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে রান্না করে এনে শ্বশুরকে খাইয়ে গেছে।

ন' ছেলে এর নাম দিয়েছে—একবাটি লাউশাকের ভালবাসা।

মাঝে মাঝে বড়ভাই বড়বউ এসে ন' ভাইকে উপদেশও দেয়। ছিঃ! তোমার নিজের বাবা। ওভাবে কি কথা বলতে আছে। উপদেশ দিয়ে তাঁরা নাইট শোতে অ্যাডভান্স ক্যাটা টিকিটে সবকটি নতুন ছবি দেখে ফেলেন মাসের গোড়ায়।

পুজোর ছুটিতে কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়ে মেজোছেলে গুলমার্গ থেকে শশাঙ্কশেখরকে চিঠি লেখে—শ্রীচরণকমলেষু বাবা। আমরা গতকাল এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আবহাওয়া মনোরম।

সেজোভাই ন'ভাই থেকে প্রায় তিন বছরের বড়। তার বসার ঘরে জুতো বাইরে রেখে ঢুকতে হয়। সেজোবউ ডিসের ঝোল খুব ভালো রাঁধে। ব্যাংকে রেকারিং কিউমুলেটিভ সব অ্যাকাউন্ট আছে। একমাত্র মেয়ের জন্য মাপসই বর কিনতে পারে খুঁজে খুঁজে। কখনো কোন জিনিস বাড়তি হয়ে নষ্ট হয় না সেজোবৌদির হাতে।

শশাঙ্কশেখরকে কিছুদিনের জন্যে তার

শারদীয় অমৃত ১৩৮৩

সম্পাদক : শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

প্রতিবছরের মত এবারও শারদীয় অমৃত মহালয়ার অনেক আগেই প্রকাশিত হবে।

৫টি সম্পূর্ণ উপন্যাস লিখছেন

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

নিমাই ভট্টাচার্য

চাণক্য সেন

আনন্দ বাগচী

একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক রচনা লিখছেন

অমিতাভ চৌধুরী

পরবর্তী বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করুন

এবারের সুনির্বাচিত গল্প সংগ্রহের অন্যতম আকর্ষণ ১১ বিশিষ্ট নতুন লেখকদের রচনা সংযোজন

দাম আট টাকা

বাড়িতে নিয়ে রাখার কথায় সেজো ছেলে বলল, বাড়িতে কাজের লোক যোগাড় করি। তারপর নিয়ে যাবো। সত্যিই তো। আমার কিছুদিন নিয়ে গিয়ে রাখা উচিত। ন' ভাইকে বলল, তুই তো একবারও বলিসনি। তাই আমার মাথায় আসেনি। আসা উচিত ছিল।

ছোটভাই সব শুনে ন'ভাইকে বলল ন'দা। আমার কাছে শ্বশুরমশাই থাকেন। তিনি অসুস্থ। বাবাকে নিয়ে গেলে দুজন অসুস্থ মানুষের কাউকেই আমি পুরো মনোযোগ দিতে পারব না।

শশাঙ্কশেখরের স্থান পরিবর্তনের ব্যাপারটি আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকলো। ছোট ছেলে দীঘা, মেজো ছেলে দার্জিলিং সেজোছেলে গোয়া ঘুরে এল। ওদের কলকাতা একঘেয়ে লাগছিল। বাড়ির লোক আর বিপুর রক্ষণবেক্ষণে শশাঙ্কশেখরকে রেখে, ন' ছেলেও চিলকা মেরে এল। ফিরে দেখলো শশাঙ্কশেখর গভীর অসন্তুষ্ট। ইতিমধ্যে বড় ছেলে নতুন রিলিজের ছ'খানি ছবি শেষ করেছে। আরও ছ' মাস একসটেনশন পেয়েছে। গ্রাচুইটির টাকা ফিকসডে ফেলা সারা। উপরন্তু পাঁচশো টাকার ফিকসড ডিপোজিটের দুখানি সার্টিফিকেট কিনেছে। যদি লাগে। তাহলে একসঙ্গে দু লক্ষ টাকা!

ন'ভাই তার স্বামীকে মাঝে মাঝেই বলে, বাবা যদি বিটাবারের মুখে মুখে কলকাতায় একটু জমি কিনতেন—তাহলে তোমরা ভাইরা মিলে বড় একখানা বাড়ি করতে পারতে। বাবা সবার সঙ্গে আনন্দেই থাকতেন। কম তো ভাড়া দাও না পাঁচ ভাই।

তখন আমাদের পড়াশুনো শেষ হয়নি। কোনের বিয়ে বাকি। জমি হবে কোত্থেকে। ন'ভাই বুঝতে পারে তার অন্য ভাইদের অসুবিধে। আসল কারও একখানা একসট্রা ঘর নেই। থাকলে হয়তো ব্যাপারটা অন্যরকম হোত। কিন্তু এটাও তো সত্যি—চেষ্টা করলে কি একখানা অতিরিক্ত ঘর পাওয়া যায় না। আসলে কেউ বোধহয় নড়ে বসতে চায় না। বেশ তো চলে যাচ্ছে—চলুক না—ভাবখানা হোলা তাই।

শশাঙ্কশেখর অস্থির হয়ে পড়লেন। প্রথমে সেজো ছেলের বাড়ি পৌঁছে দিতে বললেন। তারপর ছোটে চাইলেন জামাইয়ের বাড়ি।

ন'ছেলে শ্লেটে লিখলো তোমাকে নিতে ওরা এখন কেউ তৈরি নেই। শশাঙ্কর জবাব বাপকে নিতে তৈরি হওয়া লাগে না।

শ্লেটে লেখা পড়লো, ওরা কেউ আগ্রহী নয়।

আমায় দেখলে আগ্রহ হবে। ওরা আমায় চায়।

ভালো কথা। কিন্তু কমোড নেই ওদের।

সঙ্গে নিয়ে যাবো।

একসট্রা ঘর নেই বাবা।

বারান্দায় থাকবো।

ঢাকা বারান্দা নয় করো।

খাবার জায়গায় শোব।

বিশ্রাম হবে না তোমার। ওরাও অসুবিধায় পড়বে।

বাপের জন্যে পড়লে পড়বে। ঠেলা

আগের গল্প ॥ রচনা ১৯৭৩ খৃঃ

যুদ্ধ

দ্বারিকপোতার জমি বড় আশ্চর্য পৌষধান ওঠার পর সেখানটা খাঁ খাঁ করে। লঙ্কা, বরবটি, সিম কোনোটা লাগাবার উপায় নেই। কারণ, কাছাকাছি কোথাও জল নেই। উপরন্তু ছাড়া-গরুর উপদ্রব। বর্ষাকালে আরও কাহিল অবস্থা। ফাল্গুনে ধান লাগাবার মাসখানেক পরে বৃষ্টি একটু জোর নামলেই আগাগোড়া ডুবে সমুদ্র হয়ে যাবে। জোর বাতাস উঠলে তখন ঢেউ খেলে বাদায়। হাজরা নসকর তখন দ্বারিকপোতার লাগোয়া তাদের মিস্ত্রি-পাড়ার উঠোনে বসে ফি-বছরের মত একই ছবি দেখে। বহু খাটা খাটুনি করে লাগানো ধানচারাগুলো সবে সবলকায় হয়ে উঠেছিল। নিড়েনের সময় আসতে না আসতেই জলে ডুবে গেল। যদি এক আঙুলেও বেরিয়ে থাকত— তাহলেও ধানচারাগুলো জলের ওপরের আলো খেয়ে খেয়ে বেঁচে যেত। মাসখানেক পরেও জল নামলে বিঘে চারেকের এই ভাগচাষের একটা ছিল্লে হয়ে যেত। রোজ রাতে শুয়ে শুয়ে পচা ধচা গোলপাতার ছাউনির ওপর বৃষ্টির একঘেয়ে শব্দ শুনতে শুনতে ভাবে—কাল সকাল থেকে আকাশ যদি জিরেন দেয়—তবে চাইকি ক'দিনের ভেতর জল নেমে গিয়ে চাষটা বাঁচে।

কিন্তু জল নামার কোন লক্ষণই নেই। দ্বারিকপোতা এদিকে সবচেয়ে ঢালু জায়গা। চারদিককার জল এখানে এসেই নামে। তাই ডুবলে সবার আগে ডোবে। আশ্বিন মাসের শেষাশেষি বট অশ্বত্থের মরা ডালেও জল লেগে নতুন পাতা বেরোয় যাতে সবার মনেই আশা জাগে। কিন্তু দ্বারিকাপোতার তখনো বেশ জল থাকে।

নিকাশী খাল একটা কেটেছিল সরকার। কিন্তু ঠিকাদারগুলো জালিয়াত। খাতায় দেখালো কষেক লাখ মাটি। কিন্তু আসল দু'চোরলাখের বেশি মাটি কাটালো না। কলকাতার অফিস কাছারিতে বসে দেনা পাওনা ঠিক হয়ে গেল। হাজরার মত মানুষ মারা পড়ল।

জংগল হাসিল করে এই আবাদ। কে এক দ্বারিকবাবু হাজরার জন্ম বছরের অনেক অনেক আগে এখানে চাষবাসের পত্তন করেন। তাঁর নামেই জায়গার নাম। তাদের বংশপরম্পরায় শরিক—তস্য শরিকে ভাগ হয়ে হয়ে হাত বদলের পর এই চার পাচশো বিঘের মালিকানা এখন নানান টুকরোয় ছড়ানো। হাজরা জানে, মালিকানা তো পাল্টাবেই, জমি শুধু তাঁর জায়গাতেই থাকে।

পৌষমাসে অন্য মাঠের চাষীরা যখন ঝুমঝুমে মলের আওয়াজ তুলে শুকনো পাকা ধানের বোঝা মাথায় করে আছড়ায় বলে খামারে ফেলে—ঝরে পড়া পুষ্ট ফলগুলি পরের বর্ষায় বীজ করবে বলে সযত্নে তুলে রাখে—তখন হাজরা নসকর এই বেলাতেই চার বিঘের ন্যাড়ান্যাড়া কয়েক আঁটি খড় কাটতে মাঠে নামে। পোকায় কাটা সামান্য কিছু ধান জোটে। জল নামার পর যে কটা গোছ বেঁচে ছিল—তারই সামান্য ফসল। তারও আবার ভাগ আছে।

মালিক জলিল গাজি। তিনি ভাগ দিতে গেলেও নেবেন না। কারণ, ভাগচাষী বোর্ডে প্রমাণ করাতে চান—চাষী হাজরা নসকর একটি অপদার্থ। চাষে মন নেই। ধান ফলে না। যেটুকু ফলে তার ভাগ দেয় না। এই বলে তিনি হাজরাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করতে চান, করে নিজে চাষ করবেন

হাজরা মিথ্যেবাদী নয়। যা ফলেছে তার ভাগ দিতে চায়। কিন্তু মালিক নেবে না। নতুন আইনে খুব কড়াকড়ি। ভাগের ধান মালিককে বুঝিয়ে দিয়ে যদি একখানা রসিদ পায়—তাহলে সেই রসিদের বলে ভাগচাষী হিসেবে নাম রেকর্ড করাতে পারে। তখন জমি থেকে তাকে কে সরায়! তাহলে হাজরা নসকর একরকম পাকাপাকি রায়ত হয়ে যায়। চাইকি কোনদিন সরকারের ঘরে খাজনা জমা দিয়ে দাখিলা কেটে নেওয়ার অধিকারও তার ওপর বর্তাতে পারে। এমন কিছু আকাশকুসুম নয়। এমন ব্যাপার তো অনেক জায়গাতেই ঘটেছে।

তার কপাল মন্দ তাই হচ্ছে না। হালের বলদ নেই। একটা এঁড়ে পুষেছে। সেটা এখন বেশ বড় হয়েছে। তার লাগদার আরেকটি বলদ হলেই হাল জুড়তে পারে। কিন্তু তা আর হয়ে উঠছে না। হলে কিন্তু কেউ কিনতে আরও কম রোগাড় করতে পারিত। দুটো ধান আনত ঘরে। এভাবে

ডাকে জে। আমি পেছন পেছন রিকসায় যাবো।

পায়চারির জায়গা পাবে না।

রাস্তায় হাঁটবো।

নারায়ণ?

সঙ্গে নিয়ে যাবো। পুরুতমশায় গিয়ে পুজো করে আসবে।

মধু ওখানে নেই।

জোগাড় হয়ে যাবে।

তোমার প্রেসক্রপশন ওষুধ ডাক্তারের ফোন নম্বর কিছুই জানা নেই ওদের।

জানিয়ে দিয়ে আসবি।

এখানে সব সাজানো থাকলেও অসুবিধা কি তোমার?

সবসময় একজায়গায় থাকতে নেই।

ওদের বাড়িও তো এই কলকাতাতেই।

অনেক তো অন্য বাড়ি। রিকসা ডাক। ঠেলা ডাক।

কোথায় যাবে আগে ঠিক করো। সেজো ছেলে? না; জামাইয়ের বাড়ি?

রিকসা ডাক। ঠিক করছি।

ন' ছেলে শ্লেট রেখে রিকসা ডাকার নামে সিগারেট কিনতে বেরোলো। সেই ফাঁকে বউমাকে দিয়ে সেজো ছেলের বাড়ি ফোন করালো শশাঙ্কশেখর। ছেলে অফিসে। বউমা ধরেছে। শশাঙ্কশেখর বললেন, আমি তোমাদের বাড়ি থাকতে যাচ্ছি। খানিক বাদেই গিয়ে পৌঁছবো। রেডি হও।

ফোনে কোন শ্লেট নেই। বউমা ওপাশ থেকে বলল, কিন্তু বাবা—

শশাঙ্কশেখর কিছুই বুঝতে পারলেন না। বললেন কি?

এভাবে মিনিট পাঁচেক ক্লান্ত হয়ে ফোন রেখে দিলেন।

এবার ফোন করলেন মেয়েকে। সেদিকেও তাই হোল। ফোনে কিছুই শুনতে পান না।

শশাঙ্কশেখরের সন্দেহ হোল ওরা তার কানে শোনার গোলমালের সুযোগ নিচ্ছে। এবার হাসপাতালে গিয়ে তিনি গোড়াতেই নার্সকে বলে নিয়েছিলেন আমি একটু কালা। কানে কম শুনি। একটু জোরে বলবেন।

শশাঙ্কশেখর ওই সন্দেহ মনে নিয়েই নিজের ঘরের দিকে রওনা হলেন। যাবার পথে ন' ছেলের বসার ঘর। সেখানে ছেলে বসে সিগারেট ফুঁকছে। শশাঙ্ক বারান্দায় জোরে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এগোলেন। ঠক। ঠক। সঙ্গে স্যান্ডেলের—স্যাচ স্যাচ।

শৈশবে এর ওর মুখে জন্মের আগেকার শোনা কথার হিসেব ধরলে আজ পর্যন্ত শশাঙ্কশেখরের স্মৃতিভার প্রায় এক শতাব্দীর। এই স্মৃতির একটা ওজন আছে। তার চাপে তিনি এবার কিন্তু অজ্ঞান হলেন না। তবে দু কাঁধে ভার লাগলো। সেই অবস্থায় শশাঙ্কশেখর নিজের ঘরের দিকে চলতে লাগলেন। বুঝলেন ন'ছেলে আদৌ রিকসা ডাকেনি। ঠেলাতো ডাকেই নি।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

জোরে দোরে জন খেটে সংসার নিয়ে খাবি খেতে হত না।

তার মালিক জলিল গাজির বয়স বেশি নয়। পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ। লোহা সিমেন্টের দোকান আছে বাজারে। রমজানের ঈদে একবার উট জবাই করেছিল। সে সময় কাঁচের প্লেট, গ্লাস দপ্তরখানায় বিছিয়ে দিয়ে মেহমানদের দাওয়াত দিয়েছিল। নিজ চাষে ছত্রিশ বিঘে জমি আছে। বাড়ির ভেতর একটা টিউবয়েল—বাইরে একটা টিউবয়েল। তিনটে দিঘি ছাড়াও একখানা লরি আছে। সারা বাজারের হয়ে সে-লরি মঙ্গল আর শনিতে শেয়ালদায় গন্ত করতে যায়। মণ প্রতি ভাড়া দুটাকা। নিজে পার্টি করে। ভোট এলে পাড়ায় পাড়ায় মিটিং-এ যায়। খরার সময় ঠিকেদারি নিয়ে দূরের দূরে রাস্তা বানায়। কালভার্ট বানায়।

হাজরা তার দোকানে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে থেকে শেষে বলেছে, বাবু অভাবী মানুষ আমি। পটের জ্বালায় ধানটা খেয়ে ফেলব। অপানার ভাগ আপনি নিয়ে নিন আমায় একখানা রসিদ দিন।

জলিল গাজি হাজরার চেয়ে সামান্য কিছু ছোট হবে বয়সে। হেসে বলেছে, ও ধান তুমি রাখো। আরও দু'বস্তা ধান নিয়ে গিয়ে ছেলেপুলে নিয়ে এই বর্ষাটা পেটভরে খাওয়া দাওয়া কর। গায়ে তাগদ করে আমার রাস্তার কাজে লেগে যাও। দিন গেলে চার টাকা কোমরে গুঁজে বাড়ি ফেরবা। ও জমি তুমি ছেড়ে দাও হাজরা। আমার পাকা আছে। লোক আছে। আমি চাষ করে দু'টো ধান পাই।

হাজরা গলেনি। ভাগের ধানও ভাঙেনি। গাঁয়ের মাতব্বরদের বলেছে। অন্য সব পার্টির দাদাদের বলেছে। তাদের পরামর্শ: বিনে রসিদে ধান দিও না। দরকার হলে আমরা জে এল আর ও অফিসে যাব। গাজি তোমার জমি ছাড়াতে পারবে না।

খাবার ধান নেই। অথচ ঘরে মালিকের ভাগের ধান। ভাংগা যাবে না।

এক এঁড়েতে হাল চলে না। যতক্ষণ না আরেকটা হচ্ছে ততক্ষণ ওকে বসিয়ে খাওয়াতে হবে।

হাজরার হাসি পায়। তার অবস্থা ঠিক দ্বারিকাপোতার মত। জায়গা আছে ফলে না। বর্ষায় সমুদ্র। খোরোকালে খটখটে ভাংগা।

এক ভরসা পুকুর ভর্তি মাছ। আর খালের চিংড়ি, আর যেমন ট্যাংরা, ধান্যে-পুঁটি, শোল, শাল, সিংগি, মাগুর, বাইন, ন্যাদোস, তাছাড়া কিছু কাঁকড়া। কখনো সখনো দু'একটা কচ্ছপ। কিন্তু তার ভাগ্যে নেই। তার জাল নেই। একগাছি ঘা আছে—তাতে লোহার কাঠি পরানো দরকার। একসঙ্গে দু'কেজি কাঠির দাম যাবো টাকা পাবে কোথায়? খালে পাটা মেরে যে মাছ ধরবে তারও উপায় নেই। অন্তত তিনখানা পাটা কিনতে একসঙ্গে তিরিশ-বত্রিশ টাকা চাই। তাতে একটা মরা মানুষের চিকিৎসা হয়ে যায়।

টিউবয়েল বসায় ঝোড়ো। তার তেমন কাজ নেই। সে একটা পরামর্শ দিল। ব্যাঙ ধরে আন, আমি কিনে নেব।

এই ফাগুন মাসে ব্যাঙ পাব কোথায়?

দেবতা চমকাবে—তারপর ব্যাঙ ধরবি! সেদিন আর নেই!

ঝোড়ো কিছু শহর ঘেঁষা লোক। রেল স্টেশনের দোকানে বসে চা গেলে। চারদিকে টিউবয়েল বসিয়ে বেড়ায়। এবার তেমন কাজ নেই। ওর কথাটা মনে লাগল। বেশ কিছুকল এখানকার দু'চার জন ব্যাঙের আড়ৎ করেছে সেখানে সকালবেলা জ্যান্ত ব্যাঙের পেছনের দুখানা পা কেটে বেঁধে বাকিটা ফেলে দেওয়া হয়। তারপর ধোওয়া-ধুয়ি করে বাকি মাল বরফচাপা দিয়ে কলকাতায় চালান যায়।

ঘরে তার মন বসে না। একদিন ভালো উপায় হলে বউ তার পান্তা, গরম, বাসি করে চালের আণ্ডিল নষ্ট করবে। অথচ আর করে পয়সা তো আর অন্য জায়গায় রাখা যায় না। মাবোর থেকে লাভ—দুটো ছেলে একটা মেয়ে মাসের মধ্যে বিশ দিন কোনরকমে একবেলা খেয়ে থাকে। গরীব ঘরের যে বুঝে চলবে তেমন বউ পায়নি হাজরা।

একই উঠোনে আর দুই ভাইয়ের ঘর। সে বড়। পরের ভাই বজরা কোত্থেকে ভাগিয়ে এনে বিয়ে করেছিল। সে বউ বিষ খেয়ে মরতেই আবার বিয়ে বসেছে। দিনে তার পেটায়—রাতে তার কাটে। ছোট ভাইটা ভালো। ঘটির সংগে বিধবা মা থাকে। ঘটির বয়স বছর ষোল। মাকে গরু দুয়ে দেয়—মা দুধ বেচে। ঘটি নিজে তিনটে তালগাছ কাটে। তার রস বিক্রি হয় গুড় হয়। নিজে

তাড়ি করে খায়—দাদাদের দেয়। মরসুমে খেজুরগাছও কাটে। হাজরাও দুটো তালগাছ কাটে। গাঁয়ের মাথায় বর্ষাকালের মেঘ জুটে গেলে সব ভাই ঘরে ফিরে আসে। যে-যার বারান্দায় বসে তখন কথা বলে। সুখ দুঃখের, —আগড়ার—। কখনো নিন্দের। কচিৎ প্রশংসার।

এইভাবে থানা রায়পুর, গ্রাম মিশ্রিপাড়া, রেলস্টেশন বন্দীপুর, রুক দেকাঠির খগেন নস্করের তিন ছেলের জীবন কেটে যাচ্ছিল। তার ভেতর হাজরা নস্কর নতুন ভাজে নেমে জীবনে প্রথম পয়সার মুখ দেখলো। যার জীবনে কোন দিন হাঁড়ি ছিল না—সে এখন দুপুরে ঘুমোয়। সন্ধের ঘোরে তালগাছের মোচ কেটে কলসি বসায়। সারা দিনের জমানো তাড়িটুকু নামিয়ে উঠোনের দিকে তাকিয়ে বসে চুক চুক করে খায়। কলাসের পর ঘরের ভেতর তাকিয়ে বউকে হাঁক পাড়ে। বেল্পতি! ফতর দে—

খুব সাধারণ জিনিসের ফতর। একখানা ভালো কঞ্চির শক্ত ছিপ। তাতে আড় বঁড়শি লাগানো কাপড়ের দোকান থেকে আনা একটা পলিথিনের মোড়ক। নারকেল মালা চাপা দেওয়া একটা গুড়ের কলসি। হেরিকেন একটা। আরেকখানা দা। ট্রেনে ফিসি চয়—আগুন ধরানোর ছ'আনা দামের পাথর। বিড়ির কৌটো, ব্যাস!

বেল্পতি সুশনি শাকের তরকারি করেছিল। সঙ্গে নুন আর ভাত। ডাবা হাড়িতে হাত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে খেয়ে নিচ্ছিল হাজরা। সন্ধ্যে রাতেই রেল লাইন ধরে বেরিয়ে পড়তে পারলে অনেকটা পথ কাবার করা যাবে। এখনো সেজন্য কোন ভাবনা নেই এই বন্দীপুর স্টেশনের বাজার এলাকায় তো টোপই জোগাড় হয়নি। অনিশ্চিয় যে দোকানেই যাবে—দোকানদার নিজেই তাকে খাতির করে গোলার ঘর খুলে দেবে। হাজরা তখন আলুর বস্তা হোক, মশলার গুদাম হোক—কিংবা কেরোসিনের আড়ৎ হোক—হামা দিয়ে অন্ধকারে ঢুকে যাবে। তারপর যেখানে ফতর আরশোলা পাবে কপাকপ ধরবে আর পলিথিনের ব্যাগে পুরবে। এই হল তার ব্যাঙ ধরার টোপ। দোকানদাররা খুশী। আরশোলা কোত্তলের এমন মাগনা যন্ত্র কোথায় পাবে?

ব্যাঙ ধরা বড় নেশা। বলা ভাল পয়সার নেশা। টপাটপ ধরে কলসি বোঝাই করে ভোর ভোর ফিরতে পারলে চাই বারো-চোদ্দ টাকাও রাত ফুরোলে রোজগার হয়। সাহেব মেমেদের দেদার পিরিত নেই। এমন বন বাদাড়ের জিনিসও খাস কে জানতো। আর কেজি পিছু দরও চড়ছ রোজ রোজ। ব্যাঙ নাকি ফুরিয়ে যাচ্ছে—তাই।

এ তাড়াহুড়োর কাজ নয়। ঘাসের ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে এসেছিল হাজরা। লালাজির ইটখোলা পার হলেই রেল লাইনের দুধারে শুধু অন্ধকার। তখন হেরিকেনটা উসকে নিল। ছোলো ঘাসের আড়ালে আড়ালে গর্ত করে ব্যাঙ বাসা করে থাকে। মেঘ ডাকলে তবে জানান দেয়। নয়ত নয়। রাত বাড়লে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় বেরোবে। কত রকমের খুচরো সব পোকা থাকে ঘাসে। সেগুলো থপথপ করে খুঁজে বেড়াবে। নরম ঘাপটি মেরে বসে থাকবে।

যত রাত বাড়ে সংসার তার কাছে তত পরিষ্কার লাগে। গাঁ গঞ্জের মানুষজন সন্ধের পর বিশেষ জেগে থাকে না। ওঠে ভোর ভোর। এক-এক ভল্লাট তখন তার জন্যে ছবির মত পড়ে থাকে। সে ব্যাঙ ধরতে বেরিয়ে হেরিকেন তুলে তুলে সেসব জায়গা দেখে। গোলাবাড়ি। পুকুরঘাট। কলাবাগান। উঠোন। ধানের গাদা। পোকাপড়া গাই অন্ধকার আকাশের নিচে একঠায় দাঁড়িয়ে অনবরত লেজের ঝাপটায় মশা তাড়াচ্ছে। তার এইসব দেখার সময় অন্য কেউ থাকে না। দিনের বেলা ট্রেনে যাওয়ার সময় এসব জায়গা চোখে পড়েছে—কিন্তু তখন এখনকার মত তন্ন তন্ন করে দেখা হয়নি।

কালকেপুরের রেলপুকুর পেরিয়ে টিনের চালতোলা ঘর পড়ল পথে। গোয়ালঘরের বাইরে দু জোড়া হাল জোয়াল। নিশ্চয় ষোল ষোল থেই বত্রিশ বিঘের চাষ। পরিশ্রমী চাষী একখানা হালে এক নরশুনে ষোল বিঘে জমি কাড়ায় নিশ্চয়। এখন ধানের দর ভাল যাচ্ছে। ভাগের ধানটা বেচে দিয়ে একটা তাগড়াই এঁড়ে বাছুর কেনা যেত। কিন্তু জলিল গাজি তাকে ঝুলিয়ে রেখেছে।

স্কুলবাড়ি, মন্দির, কামারশালা, ক্লাবঘর —কত যে সে এই কমাস দেখল। দিনের বেলায় এমন নির্বিঘ্নে দেখা যায় না। এখন বেশ পরিষ্কার সব দেখা যায়। সে চোর নয় হাতের হেরিকেনে আলো জ্বেলে। ডাকাত নয়। সঙ্গে সম্বল একখানা হাত-দা মাত্র।

হাজরা রোজ নিশুতি রাতে সারা পৃথিবীর একটা আন্দাজ পায়। তখন তার দেখে বেড়ানোর পথে কোন বাধা নেই। ইস্টখোলা ছাড়িয়ে ভিমরুলতলা। এখানে নাকি বিরাট ভিমরুলের চাক ছিল এই বটগাছে। তিনজন সাহেব রেললাইন বসাতে এসে বাবা পঞ্চাননের দাস ভিমরুলের দংগলকে ক্ষেপিয়েছিল। তখনকার সাহেবরা নাকি ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াত। ঘোড়া ছুটিয়েও পার পায়নি সাহেবরা। ভিমরুলের জ্বালায় জ্বর—শেষে ভুল বকে মরে যাওয়ার দশা। ইংরেজের রেল কোম্পানি পঞ্চাননতলার পুজো দিয়ে তবে রেল লাইন বসাতে পেরেছিল। এসব কথা এখনকার সবাই জানে! সে ভিমরুলের চাক এতদিন থাকার কথা নয়। বটগাছটা পচে আছে। সজনেই সাহেবপুরের মাঠ।

হেরিকেনটা লেজের মত ঝুলিয়ে দিয়ে হাঁটতে হচ্ছিল। কাদায় মাটি ওলটানো জায়গা দেখলেই হাজরা দাঁড়িয়ে পড়ে। মাটির চেহারা সাবুদানার মত হলে বুঝতে হবে —এসব মনি কেঁচোর বাস। মাঠের মাঝে এই কেঁচো কেটে বাড়ীঘর গেঁথে দিতে পারলেই মুগেল ধরা দেবেই।

আউলিয়াপুরের মোড়লদের বড়দিঘির বকচরে অনেক কলাগাছ। বেশি রাতে জ্যোৎস্না বেরিয়েছে ফুটফুটে। সঙ্গে দক্ষিণে বাতাস। সে-বাতাসে কলাপাতার বেশির ভাগই ছিঁড়ে ফালি ফালি হয়ে ঝাঁকিল। বাঁধানো ঘাট। তাতে তিজেল হাঁড়ি গোটা দুই ডোবানো। অনন্ত মোড়লের সংসার বিরাট। দু'পক্ষের হিসেব ধরলে কন করেও জনা তিরিশেক লোক। কলাগাছের শুকনো বাসনা সরিয়ে হেরিকেন নামালো। গর্তের চেহারাটা চেনা চেনা। এরকম জায়গাতেই ব্যাঙ থাকে। ভাগ্য ভাল হলে এক সঙ্গে দু-তিনটেও বেরিয়ে পড়ে। কাঁধের ছিপটা নামিয়ে কোমরের ব্যাগ থেকে একটা বড় সাইজের আরশোলা তুলে নিয়ে গেঁথে ফেলল। তারপর ঠিক আন্দাজ মত গর্তের মুখে ছেড়ে দিতেই জখম আরশোলাটা গর্ত পেয়ে পাতালের ভেতর নেমে গেল। সময়টা বড় সুন্দর। এমন মিহি বাতাস। এমন খুনখুনে জ্যোৎস্না। শুধু মোড়লদের সুকুবটা যা-কিছু চেঁচাচ্ছে। আরশোলাটা এখন অনেকক্ষণ ধরে মাটির ভেতরের অন্ধকার গর্তে মাথা খুঁড়বে। তারপর একসময় এ-গলি সে-গলি করে আসল গর্তে গিয়ে পড়বে। সেখানে ছানাপোনা নিয়ে ব্যাঙের সংসার।

বাইরে মাটির ওপরে মোড়লদের গোয়ালঘরে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। মাঝে মাঝেই দড়িবাঁধা গরু কান লটপট করে মশা তাড়াচ্ছিল। উত্তর দিকে ঢেঁকিঘর। তার পাশেই ধানের গোলা। গোলার মাথায় টিনের পারি এক পা শূন্যে তুলে উত্তরে উড়ে চলেছে। কাল কোন ব্রত ছিল বাড়ির মেয়েদের। উঠোনের কোণে মাটির ঘট, তাতে জল, জলে টগর ফুল ভোবানো। উঠোনের মাটি খুবলে দুধ ঢালা হয়েছিল বোধহয়। এ-বাড়ি কোন আইবুড়ো মেয়ে আছে নিশ্চয়। অনন্ত মোড়লের প্রথম পক্ষের বউ নাতনী নয়ত? হাজরা মনে মনে একটা অঙ্ক কষে দেখল। হ্যাঁ। এতদিনে বিয়ের যুগ্যি হয়েছে। হাজরা তাকে একসময় খুকিটি দেখেছে।

এখান থেকে বাদার ভেতর দিয়ে সোজা হেঁটে গিয়ে পিচ রাস্তায় পড়লে দশঘরা গ্রাম। এপথে সোজা গেলে একঘর ব্রাহ্মণ তিনঘর কায়স্থ, ষোলঘর মোড়লের বসতবাড়ি পড়বে। এর ভেতর অনন্ত মোড়লের কলাবাগানই সবচেয়ে পর্যাপ্ত। অনন্তর মত ভাল চাষীও এদিকটায় কম। গোডায় অনন্তর জমি জায়গা হালবলদ কিছুই ছিল না। এখন আস্তে আস্তে তার সংসারটা সোলকলায় ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

আরশোলাটা অনেকক্ষণ পাতালে গেছে। এখনো ওপরে ওঠার নাম নেই।

মাটির দেওয়ালের গায়ে হাল জোয়াল, হাতমই ঠেসান দিয়ে দাঁড় করানো। মোটা মোটা বালদা গাছ কেটে নিয়ে হালের কাঠ তৈরী করেছে অনন্ত। এখানকার জামালাগায় তৈরি সদ্য একখানা ফলা-হাজরা দেখল—অনন্ত কামলা খুলে রেখেছে। আগে তো চোখে পড়েনি! হয়ত গরু জখম হলে

ফলার দোষে—তাই খুলেছে অনন্ত—কামারশালায় পাঠাবে।

যদি ভাই দুটো তার কথা শুনতো—তাহলে দাঁতে কামড় দিয়ে একবার চাষ করে দেখত হাজরা। তার সংসারও ফুলে ফেঁপে উঠতে পারত। এই বেশ ভাল বেঁচে থাক ব্যাঙ। রোদে বেরোতে হয় না। রাতে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় কাজ। ভাত খেয়ে সারাদিন গড়াও। এ হল গিয়ে ব্যবসা। নিজের মালিক নিজে।

এই সময়টা তার বড় ভাল লাগে। এখন সে কত দেশ দেখতে পায়। এক একদিন কত দূর দূর চলে যায় ব্যাঙের খোঁজে। একবার ব্রহ্মডাঙ্গায় গিয়ে চোর বলে ধরা পড়ছিল। ভাগ্য ভাল সে-গাঁয়ে হারান রায়ের বড় খুকির বিয়ে হয়েছিল। সে বেরিয়ে এসে হাজরাকে দেখিয়ে বলেছিল, আমার বাপের বাড়ির দেশের লোক। মেরোনা বলছি—

এখন তার মন বলে সব দেশে এমন চেনা জানা মানুষ আছে তার। এই পৃথিবীটাই তো তার চেনা হয়ে গেল এই ক'মাসে। বড় বড় মাঠের ভেতর দিয়ে নিশুতি রাতে ব্যাঙের জোড়ে জোড়ে ঘুরতে গিয়ে কত জিনিস যে সে দেখছে। দিনের বেলায় যেসব জিনিস খুব জরুরী মনে হবে—রাতের বেলায় তা কেমন অর্থহীন হয়ে পড়ে। এক একজন নিজের জমির আল দিয়েছে। তাতে ঢোল কলমির ডাল বসানো। মাথার ওপর চাঁদ, তারা চোখ মেলে সব দেখে যাচ্ছে। সেখানে দখল রাখা এই আলচিহ্ন কিংবা ঢোল কলমি বসিয়ে নিরিখ ঠিক রাখার চেষ্টা নেহাৎ খোকাপনা। রাতে না ঘুরলে এসব কোনদিন সে টের পেত না।

আজ অনন্তর বাড়ি খুব খাওয়া দাওয়া হয়েছে। জ্যোৎস্নার ভেতর বসে একজোড়া খাড়ি বিড়াল কুচুর কুচুর করে এঁটোকাঁটা খেয়েই চলেছে। বঁড়শিতে টান পড়তেই হাজরা সাবধান হয়ে গেল। গোঁধে গেলে ব্যাঙ ঠিক ওপরে উঠে আসবে। এতো তাই। আস্তে ছিপ সুদ্ধ উঁচু করে ব্যাঙটকে শূন্যে তুলল। প্রায় হাফ কেজি হবে। তারপর আলগোছে বঁড়শি ছাড়িয়ে ব্যাগটাকে চিৎ করে রেখে দিল। কালচে চামড়ার ওপর আধো অন্ধকারে মুখের কাছে আরও কালো রং বেরিয়ে এসে লেগে গেল।

আরে-ব্বাস! আরও একটা বড় ব্যাঙ তড়াক করে গর্ত থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল। এ কি ভাগ্য! কাল বন্দীপুর স্টেশনের লেভেল ক্রসিংএ সবাই দেখতে পাবে—দুলে দুলে একটা লোক পুবের রেললাইন ধরে এগিয়ে আসছে। গালে দাড়ি। কাঁধে ছিপ। ডান হাতে দা। কোমরে কলসি—পলিথিনের ব্যাগ। বাঁ হাতে নেভানো হেরিকেন। মুখ দেখলেই বোঝা যাবে—এ দিনের বেলার লোক নয়। চোখের নিচে কালি। মুখ ভর্তি হাসি। তখন হাজরা রেলের পথটি ধরে দুলে দুলে চলে আসবে বন্দিপুর বাজারে। পঞ্চাননের ব্যাঙ আড়তে। সেখানে সোনা ও কোলা ব্যাঙ—উভয় প্রকারই ক্রয় করা হয়। খোড়ো তার সাইন-বোর্ডে সব লিখে দিয়েছে। সন্ধ্যে হলে তাতে ডুম জ্বলে। নেভে। জ্বলে—

টপ করে চিৎ করানো জখম ব্যাংটা কলসিতে পুরে নারকেল মালা চাপা দিল হাজরা। কিন্তু আরেকটা গেল কোনদিকে। মেটে জ্যোৎস্নার ভেতর দিয়ে একফলা অন্ধকার লাফাতে লাফাতে গোয়ালের কোনে চলে গেল। কলসির ভেতরেরগুলো ছোট ছোট লম্ফ দিয়ে নারকেল মালা খুলে ফেলতে চাইছে। ভেতরে বাতাস নেই। হাজরা জানে খানিক পরেই ওরা আপনা আপনি ঝিমিয়ে পড়বে।

হাজরা হেরিকেন উসকে সেদিকেই গেল। আরেকটু হলেই ধরে ফেলত। ব্যাঙটা বুঝতে পেরেছে। ওইটুকু মাথায় কত যে বুদ্ধি ধরে। ধরতে ধরতে পারল না। আবার ফসকে গেল। হাজরা উবু হয়ে যেই হাত বাড়িয়েছে—অমনি গোয়ালের মোটা তাল-কাঠের গুঁড়ির ওপাশ থেকে একটা কালো বিদ্যুৎ বেঁকে মাথাটা উঁচু করে দাঁড়াল।

হেরিকেন পড়ে যাচ্ছিল। সেই অবস্থাতেই উঠে দাঁড়াল।

মাথায় খড়ম। লাল কেরোসিনের আলো। সব পরিস্কার দেখা যায় না। সারা গা ছাই রঙের। কৃষ্ণান্তক যম। হাজরা নড়লেই ফস করে মাথা নামাবে। নামালে সেখানে তার পা। তাহলে আর কথা নেই। হাসা কেউটে। বেশ বয়স হয়েছে বুঝলো। উনি যে এখানে তা তো হাজরার জানা কথা নয়। মাথাটা দুলছে। সারা পৃথিবী নিশ্চুপ।

শুধু তার ভেতর—খুব খাপ আওয়াজ হচ্ছিল। হঠাৎ উঠে দাঁড়াতে গিয়ে নারকেল মালা পড়ে গিয়েছে। সেই সুযোগে এক একটা ব্যাং কলসির ভেতর দিয়ে লম্ফ দিচ্ছে। খোলা বাতাস পেয়ে জোর হয়েছে গায়ে। কলসি থেকে এক লাফে উঠানের মাটিতে। তার পরেই থুপ থাপ। সেই জখম ব্যাঙটাই বেরুতে পারেনি। একবার লাফিয়ে শূন্যে উঠেছিল। হাজরার বুকে লেগেই আবার কলসির ভেতরেই পড়ে গেল। গায়ে লাগতেই হাজরার বুকখানা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ব্যাঙটার মুখটা বস্তে ভিজে।

সাপের মুখ গায়ে লাগলে আরও ঠাণ্ডা লাগে নিশ্চয়। কিছু করার নেই তার এখন। হেরিকেন দোলাতে পারছিল না। কিছুই আশ্চর্য নয়। হয়ত আলোটাই দেখছে মন দিয়ে। নইলে সাত আটটা ব্যাঙ লাফিয়ে বেরিয়ে গেল—একটার পেছনেও ছুটলো না কেন।

বাবা পঞ্চানন। আমি মিস্ত্রীপাড়ার হাজরা নস্কর। জলিলগাজির ভাগচাষী। রেল স্টেশন বন্দিপুর। তোমার নামে মাসভোর গান দেব। কাংগালি খাওয়াব। এবার আমাকে বাঁচাও।

সাপটা একটুক্ষণ মাথা নামিয়ে আবার তুলে ধরল। এখনো রাত ভোর হতে অনেকক্ষণ দেরি। না হলে লোকজন এগিয়ে আসত। কাছাকাছি গোয়ালের সামনেই কালো গাইটা সব বুঝতে পেরেছে। কান খাড়া করে একবার বড় চোখ দিয়ে হাজরার দিকে তাকালো। হাজরাও তাকালো। কিছু করার উপায় নেই। বাতাস বন্ধ। উঠোনের গা দিয়ে সিমের লতা গোয়ালের ছাদ বেয়ে উঠতে গিয়ে থেমে ছিল। ডগাগুলো তখনো একটু একটু কাঁপছে। অন্য গরুবাছুর কিছু

প্রকাশিত হ'ল

কবিতা সিংহ-র

আজকের উপন্যাস

একটি খারাপ মেয়ের গল্প

"—আমারও উনিশ।.....বলতে ইচ্ছে করছে 'উনিশ বছর বয়স কি দুঃসহ?' ইচ্ছে করছে না তোমার? —আই হ্যাভ্ লস্ট্ মাই নট্‌রাজ, এ্যান্ড দ্যাটস এ ব্যাড্ ওমেন্.....আজ আমার জীবনে একটা অদ্ভুত কিছু ঘটবে। ঘটবেই। আমি চাই তুমিই ঘটিয়ে দাও, কিন্তু তুমি, তুমি এত নিষ্পাপ!"

একই সঙ্গে রাগী ও সংবেদনশীল, তীব্র অথচ ব্যঞ্জনাময়—কবিতা সিংহের এই উপন্যাসটি সরাসরি পাঠকের মর্মমূলে আঘাত করবে। দাম ঃ ৬·০০

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ ৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলকাতা—৯

বুঝতে পারেনি। কেউ কেউ শুয়েছিল। গোবর মাখামাখি অবস্থায় একটা বড় গরু চার পায়ে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। গেরস্থর রাখাল কোথায়? সেও কি কালঘুম ঘুমোচ্ছে? এখনই গোবর কাড়ানো দরকার।

হেরিকেনের আলোটুকুর ভেতর হাজরার জন্যে পৃথিবী থমকে পড়ে থাকল। সেখানে খড়ম আঁকা একটা ছোট্ট ফণা সিধে হয়ে দাঁড়ানো। তার এক হাতের ভেতর হাজরার ডান পা। আঙুলগুলো ভোঁতা। এই ঠাণ্ডা ফুরফুরে হাওয়ার ভেতরেও হাজরা টের পেল—তার ডান পায়ের লোমের ভেতর দিয়ে ঘামের ফোঁটা নিচে নেমে যাওয়ার পথ খুঁজছে। হাঁটু থেকে পায়ের পাতা অবধি চুলবুল করে উঠল। তার পা এখন আর পা নেই। এবার বাঁচলে সে ঝিনুক দিয়ে পা চুলকে রক্ত তুলে ফেলবে। সে যে কি আরাম। সামনের কালো গাইটাও মশার কামড় খাচ্ছিল। কিন্তু তাই বলে লেজ একটুও নাড়াচ্ছে না। দুখানা কানই খাড়া করে রেখেছে। তার পেছনের পায়ের দেড় হাতের ভেতর সাপটা। অত বড় মাথা সুদ্ধ ঘাড় ঘুরিয়ে সব দেখতে হচ্ছে বলে ঘাড়ে ব্যাথা হয়ে গেল গরুটার। ডান চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল।

হাজরা সব দেখেও যেমন ছিল তেমন থাকল। গরুর গা থেকে এক ঝাঁক মশা উড়ে এসে তার খোলা পিঠ পেয়ে বসে গেল। হাত পেছনে পাঠাবার উপায় নেই। গোয়ালের গায়েই হাঁসের ঘর। তারা ধফধফে জ্যোৎস্না দেখে দিন বুঝি শুরু হল ভেবেছে। তাই একবারে একসঙ্গে চাপা গলায় ঘরের ভেতর নড়াচড়া করছিল। হাঁসগুলোর জন্যে ভয় ধরে গেল হাজরার। বড় বোকা জীব। একবার তার নিজের হাঁসঘরে এমন যম ঢুকেছিল। ছোবলায়নি। কিছু করেনি। তবু একটা ধাড়ি হাঁস ভয়ে মরে যায়। না জানি এবার তার নিজের কি হয়?

হেরিকেনের প্রায় নিচে এসে খড়ম আঁকা মাথাটা নামালো—তারপর সাপটা নিজের গলার নিচেটা ঘাসের সঙ্গে, গোয়ালের মাটিতে সামান্য ঘসে আবার ফণা তুলে দাঁড়ালো। এবার সারা শরীরটা আগাগোড়া দেখা গেল। কাছেই কোথাও বাসা বেঁধেছে।

হপ্তা দুই আগে হাজরা নিজে ব্যাঙের গর্ত থেকে একটা সাপ গেঁথে তুলেছিল। আসলে সেটা সাপেরই গর্ত ছিল। গোড়ায় বুঝতে পারেনি। সে এখন হলফ করে বলতে পারে—সাপটাকে সে মারতে চায়নি। কিন্তু জ্যান্ত অবস্থায় বঁড়শি কে খুলবে? নগদ দশ পয়সা দামের বঁড়শিও ফেলে দেওয়া যায় না। সাপটাকে মেরে তবে বঁড়শি বাঁচায়। সেই সাপেই কি আজ তার এই দশা।

আরও কাছে এসে দাঁড়াতে হাজরার সর্বাঙ্গ ঘেমে গেল। ডান পা-খানা থরথর করে কাঁপছিল। অবুঝ হাঁসগুলো কোক কোক করছে। পেছনে আউলিয়াপুরের মাঠ। সামনে সাহেবপুর। শেষকালে তাঁর ভাগ্যে এই ছিল! জখম ব্যাঙটা এবারও লাফ দিয়ে হাজরার বুকে গুতো খেয়ে সেই কলসির ভেতরেই পড়ে গেল। তার সারা শরীর ঘেমে ছিল। চোখের পলক ফেলতে পারছে না। তারই শরীরের একটা বাড়তি টুকরোর মত কোমরে ঝোলানো কলসির ভেতর ব্যাঙটাই শুধু লাফাচ্ছে। কিন্তু থামানোর উপায় নেই।

হাজরার চোখের সামনে মিস্তিপাড়ার উঠোন ভেসে উঠল। রান্নাঘরের পাশেই ছেচতলায় একটা কুমড়ো গাছ লতিয়ে উঠছে। একখানা কঞ্চি বসিয়ে দেওয়া দরকার। ঘরে গোলপাতাও আজ ছবছর পাল্টানো হয়নি। বউ যা অসাবধানী। শেষে ভাগের এক বস্তা ধান চোরে না খায়।

এখন তার আর ছোবল খেতে কোন আপত্তি নেই। মশার ঝাঁক পিঠ খুবলে গেল। ডান পায়ের কাঁপুনি থামেনি। সেখানে লোমের ভেতর সারি সারি ঘামের ফোঁটা নেমে পড়ে জায়গাটা ভিজিয়ে ফেলেছে। ছোবল খেয়ে সবচেয়ে আগে সে মাটিতে বসে পড়ে দুহাতে মনের সুখে পা-খানা চুলকোবে। কেননা এখন তো সে জানে পর পর কি হবে। সাপে কাটা মানুষের বদ ঘুম পায়। সবচেয়ে আগে নাক বসে গিয়ে গলার আওয়াজ খোনা হয়ে যাবে। আহা! বড় আপসোস! সারা রাত ধরে দুটো তালগাছে কলসি বোঝাই হয়ে তাড়ি জমেছে। খাবার লোক সে-ই থাকবে না। দুনিয়ায় এত রস। কচুর শাক। ওলের ডালনা। খেজুর তাড়ির সঙ্গে চিতি কাঁকড়া পুড়িয়ে খেতে কি যে লাগে! তারই নাম স্বর্গ। পাতলা করে কচু কেটে নিয়ে পোড়া পোড়া করে ভাজলে দিব্যি বিস্কুট হয়ে যায়। আর বাঁশের কোড়ের ডালনা! তার তুলনা হয় না। এখনো যদি ছোবল না দেয়—হাজরা তাহলে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে।

খুট করে আগল খুলে কে বেরিয়ে এল। কে ওখানে?

অনন্ত মোড়ল। চোখ তুলেই হাজরা গলা শুনে বুঝলো আমি।

গেরস্থকে সঙ্গে পেয়ে কুকুরটাও বেদম চেঁচিয়ে কাছাকাছি ছুটে এল। তাতে ফনা একটুও নড়ল না। একেবারে সামনে থেকে সব দেখে মাঝের থেকে কুকুরের গলার পর্দা নেমে গেল। শ্রেফ কুইকুই আওয়াজ বেরোতে লাগল তখন।

আমি কে? সাড়া দিচ্ছ না কেন? চলতে চলতে অনন্ত মোড়ল লাঙলের খোলা ফলাটা তুলে নিল হাতে। হাজরা পাশ থেকে সব দেখেও নড়ল না। শুধু বুঝল এখুনি তাকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারবে। কিন্তু নড়বার উপায় নেই তার। সামনের কালো গাইটার চোখে, পেছনের পা দুখানা ফাঁক করে লেজ তুলে দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে মূর্তিমান বিপদ হাজরার সামনে একেবারে বুক খুলে দাঁড়াল।

খুব চাপা গলায় বলল, ছুঁড়বেন না মোড়ল মশাই—

হাত তুলেছিল অনন্ত। আদর করব!

আমার বড় বিপদ—

রাতেভিতে গরু চুরি করতে বেরোলেই বিপদ হয়। গোয়াল থেকে গরু হাবিশ করলে কটা—?

আপনি এসে দেখে যান। আমি গোয়ালে ঢুকিনি। আমি রায়পুর মিস্তিপাড়ার ঈশ্বর খগেন নস্করের ব্যাটা। আমার বড় বিপদ—

চালাকি ছাড়। এদিকে এসো—পালাবার চেষ্টা করলেই ছুড়বো—

যাবার উপায় নেই। দুদিকে চোখ রাখতে গিয়ে হাজরার দুই ভ্রুর মাঝখানে টন টন করে উঠলো। আমার সামনে কি দেখুন—

অনন্তর বয়স হয়েছে। লোকচরিত্র তার অজানা নয়। ধরা পড়লে চোর জোচ্চর পালাবার জন্যে অনেক রকম ফন্দি বের করে। কাছে গেলে কি কিছু ছুঁড়েও মারতে পারে। সাবধানী অনন্ত বলল, এই শেষবার—এদিক তাকাও বলছি—

উপায় নেই। কেউটে ফণা তুলে দাঁড়ানো।

শব্দ, কুকুরের ডাকে অনন্তর বড় ব্যাটা উঠে এসেছিল। টর্চ ফেলেই ছোকরা চেঁচিয়ে উঠল, আরে বাবা!

কড়া আলোয় ফণা নামিয়ে নিল। তারপর কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে গোয়ালের পেছনের নালায় এঁকে বেঁকে নেমে পড়ল।

বাপ ব্যাটা এগিয়ে আসছিল। হাজরা বুঝলো এখুনি তার হাত থেকে হেরিকেনটা খসে পড়বে। কিংবা তার আগেই সে নিজেই জ্ঞান হারাবে। তাই তাড়াতাড়ি কলসির ভেতরে হাত গলিয়ে দিল। আঙুল ভিজে যাচ্ছিল। ছোট জিনিষটা খপ করে ধরেই গায়ে যত জোর ছিল সবটুকু একত্র করে বাদায় ছুড়ে দিল।

কথায় কথায়

মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

একটি বহুপ্রচলিত সংস্কৃত শ্লোকে মিষ্টান্নের সঙ্গে ইতরজনের কি একটা সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। এই শ্লোকটির মানে আমি ঠিক জানি না, তবে অন্য দশজনের মত আশৈশব এটি আমি শুনে আসছি নিজেও বহুবার বলেছি এবং দু' চারবার গল্প-প্রবন্ধে ব্যবহার করি নি তাও বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবো না।

শ্লোকটির অর্থ সম্ভবত বাজে লোকেরা মিষ্টি খাবে কিম্বা বাজে লোকদের মিষ্টি খাওয়াও। এইখানেই ব্যাপারটা আরো গোলমেলে হয়ে পড়েছে। বাজে লোকেরা মিষ্টি খাবে বা তাদের খাওয়াতে হবে কেন?

বাজে লোকেরা গাঁজা খায় ভাং খায় তেলেভাজা খায় ব্যাঙের মাংস খায়, সবশেষ বাটা সজনের ডাঁটার চচ্চড়ি খায় মদ খেয়ে মাতাল হয়ে যায় ঢিনে হোটেলে গিয়ে টিকটিকির লেজের লঙ্কা ঝোল খায় কিন্তু মিষ্টি কখনোই খেতে চায় না। মিষ্টি খায় ভদ্রলোক, ভালো লোক। বাজে লোকদের মিষ্টি খেতে অনুরোধ করলে তারা ভয়ঙ্কর আপত্তি জানায় একবার এক ভদ্রমহিলাকে দুটো সন্দেশ খেতে অনুরোধ করেছিলাম, তিনি এমন চমকে উঠেছিলেন যে আমারই সন্দেহ হয়েছিলো কোনো কুপ্রস্তাব করলাম নাকি?

সবাই জানেন স্যার আশুতোষ মিষ্টি খেতে খুব ভালো বাসতেন। তাঁর মিষ্টান্ন-প্রীতি সম্পর্কে বিখ্যাত সব গল্প এখন প্রায় উপকথায় পরিণত হয়েছে। স্যার আশুতোষ যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর তখন নাকি একবার ভেবেছিলেন মিষ্টান্ন চর্চার একটি বিভাগ করবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পর্যন্ত পড়ানো হবে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ভীম নাগ হবেন প্রধান অধ্যাপক আর রসশাস্ত্রী শ্রীকে সি দাস বিডার। সবই নাকি প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছিলো শুধু মিষ্টান্ন শিল্প হিসেবে পাঠ্য বিষয়টিতে বি-এ এম-এ ইত্যাদি আর্টস-এর ডিগ্রি দেওয়া হবে কিম্বা মিষ্টান্ন-বিজ্ঞান হিসাবে সায়েন্স কলেজে পড়ানো হবে বি এস সি এম এস সি ডিগ্রি দেওয়া হবে এইটুকু সিদ্ধান্ত নেওয়া নিয়ে একটু ঠেকে গিয়েছিলো এবং দুঃখের বিষয় শেষ পর্যন্ত আর কার্যকরী করা হয় নি।

কার্যকরী হলে কি হতো বলা কঠিন। ঘরে ঘরে রসগোল্লার অনার্স গ্রাজুয়েট কিন্তু মহতী সভায় পানতুয়ার ডকটরেট হয়তো আমরা দেখতে পেতাম। তা না পাই এমন কি মিষ্টান্ন কলায় পারদর্শিনী পুত্রবধূ লোকে খুঁজতো অথবা মিষ্টান্ন বিজ্ঞান কৃতী জামাতা, তা নিয়েও এখন আমরা আলোচনার মধ্যে যাবো না; আমাদের চিন্তা অন্যত্র।

পৃথিবীতে বাজে লোকের সংখ্যা যেমন ভালো লোকের তুলনায় ঢের কম, তেমনিই মিষ্টান্ন লোভীর সংখ্যা মিষ্টান্ন বিরাগীর তুলনায় অনেক বেশি। সবচেয়ে দুঃখের কথা অধিকাংশ মিষ্টি পেটুকের অবস্থা অতি অস্বচ্ছল। তার একটা কারণ অবশ্য ঐ মিষ্টির প্রতি লোভ। মদ নয়, মহিলা নয় বাড়ি নয় গাড়ি নয় শুধু মিষ্টি খেয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে এমন একাধিক লোককে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি। সবচেয়ে বড় কথা এই যে মিষ্টি খাওয়ার ব্যাপারটা আবার এক অনুষ্ঠান হলে জমতে চায় না পিসতুত ভাইয়ের শালা মেজ মামিমার শ্যালকস্থানীয় ভাই প্রতিবেশী সহপাঠী সহকর্মী এই রকম বেশ জন কুড়ক সঙ্গপাঙ্গ নিয়ে আবালবৃদ্ধবনিতা সহ সমবেত মিষ্টান্ন ভোজন অনুষ্ঠান খুব জমজমাট হয়।

এই জমজমাট করতে করতেই অনেকে সর্বস্বান্ত হয়ে যান। কিন্তু লোভ তখনো জিভের ডগা ছুঁয়ে থাকে। তখন ফিকির খুঁজতে হয়। শ্রাবণ মাসের ঘোর বর্ষার রাতে কেউ মধ্যগ্রাম থেকে গড়িয়া আসেন বিবাহের নিমন্ত্রণে মিষ্টান্নের গন্ধে। তাঁকে দেখে সবাই খুসি হয়ে প্রশংসা করে সেজো মেসোমশায়ের মত সামাজিকতাবোধ, কর্তব্য জ্ঞান একালে দেখাই যায় না। কিন্তু যদি পাবেন এই বৃদ্ধ কর্তব্যবাদী সেজ মেসো-মশায়কে হিপ্নোটাইজ করে আচ্ছন্ন করে কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করুন, 'কেন এই দুর্যোগে, এত দূরে এসেছেন?' দেখবেন, বৃদ্ধ মহোদয় কি বলেন, তিনি জড়িত কণ্ঠে অবশ্যই উত্তর দেবেন, 'মিষ্টি খেতে।'

সত্যিই, এই দুর্দিনের বাজারে মিষ্টি খাওয়ার আর কি উপায়ই বা হতে পারে? চল্লিশ বছর আগের সেই সোনালি সুদিনে যখন এক টাকায় একশোটি সন্দেশ বা চৌষট্টিটি রসগোল্লা পাওয়া যেতো সেই তখনকার একটি কাহিনী মনে পড়ছে।

কাহিনীটি আমার নয়, কিংবা কারো কাছে সেই অর্থে শোনাও নয়। বাংলা সিনেমার আদ্যিকালের এক হাসির বইয়ে এই ঘটনাটি ছিলো, আমি নিজে দেখেছি কিনা মনে পড়ছে না তবে ছোটবেলায় আমাদের বাড়িতে এই গল্পটা বহুবার আলোচনা হয়েছে, মনের মধ্যে ছায়াছবির মত গেঁথে আছে।

গল্পটা কেউ কেউ হয়তো জানেন, তবু বলি। দুই জোচ্চোর নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে এক সন্দেশের দোকানে গিয়েছে। প্রথমজন আগে গিয়েছে, গিয়ে দোকানের বাইরে টুলে বসে সন্দেশ খাচ্ছে, খুব আস্তে আস্তে খাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় জোচ্চোর এলো, সে এসে ভিতরে বসে খুব তাড়াতাড়ি অনেক মিষ্টি খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল দাম না দিয়েই। দোকানদার তাকে আটকিয়ে দিলো, 'কি মশায়, দাম দিয়ে যান।' দ্বিতীয় জোচ্চোর বললো, সে কি? এই মাত্র দিলাম তো আপনাকে?' মুহূর্তের মধ্যে দোকানদার এবং দ্বিতীয়জনের মধ্যে তুলকালাম ঝগড়া বেধে গেলো, পরস্পর পরস্পরকে মিথ্যাবাদী, জোচ্চোর বলে চীৎকার, চেঁচামেচি। বহু লোক ছুটে এলো। তখনো প্রথম জোচ্চোর টুলে বসে আছে, তার সন্দেশ খাওয়া শেষ। সবাই ছুটে আসতে দোকানদার ও দ্বিতীয় জোচ্চোর তাদের অভিযোগ জানালো। সব শুনে লোকেরা বললো, 'এই ভদ্রলোক তো প্রথম থেকে দেখেছেন সব ঘটনা, ইনিই বলুন।' কিন্তু প্রথম ভদ্রলোক তখন আর কি বলবেন, দেখা গেলো তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে অঝোরে, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ। সবাই অবাক হয়ে গেলেন, 'কি ব্যাপার, কি হোলো?' প্রথম ভদ্রলোক কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'এই ভদ্রলোক আমার সামনে দাম দিলেন, তাই দোকানদার অস্বীকার করছে, আর আমি যখন দাম দিই তখন তো কেউই ছিল না, আমার কি হবে?'

তারাপদ রায়

পাপড়ি

বনফুল

অবগুণ্ঠনবতী ছিলে একদা
আজ তুমি চোখেরও আড়ালে
আজ তুমি আকাশ
সন্ধ্যা, ঊষা, জ্যোৎস্না,
আজ তোমার বার্তা পাই
চিঠিতে নয়, বাতাসে।

সৌরভকে যে ইন্দ্রিয় আস্বাদ করে
তোমরা তাকে বল নাসা
আমি বলি—ভালবাসা
ভালবাসা না থাকলে
নাকও অসাড় হ'য়ে যায়।

ওগো তন্বী, বনস্পতির কাছে যেও না।
ঢাকা পড়ে যাবে।
ওগো বহ্নি, জলের কাছে যেও না,
নিবে যাবে।
নিঃসঙ্গ পটভূমিকাতেই
তোমার মহিমান্বিতা।

ওকি, কার কণ্ঠস্বর?
কার নূপুর?
দৌড়ে দূরে সরে গেলাম
যদি সে না হয়!

গোধূলিয়া

উপন্যাস নিমাই ভট্টাচার্য

।। পঁচিশ ।।

কটা দিন কোথা দিয়ে কিভাবে কেটে গেছে। কিছু জানতে পারি নি। এখনও আমি অসুস্থ হলেও আগের মত অসুস্থ না। এখন আর আমি অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকি না। এই বিছানায় শুয়ে শুয়েই সব-কিছু জানতে পারি, বুঝতে পারি। সত্যি, পিসী আর দেবী যে আমার জন্য কি করছে, তা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি।

সকালবেলায় যখন ঘুম ভাঙ্গে তখন পিসীকে দেখতে পাই না। গঙ্গা স্নান, আহ্নিক, বাবা বিশ্বনাথের মাথায় জল দেওয়া, সব্জী বাজার করা ছাড়াও এই সকালবেলায়ই একবার নিজের বাড়ী যান। আমি চোখ মেলে তাকাতেই দেখি, দেবী আমার মাথায়, মুখে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আমাকে চোখ মেলতে দেখেই ও হেসে জিজ্ঞাসা করে, শরীর কেমন লাগছে?

ভাল।

মুখ ধোবার জল আনি?

না।

কেন?

তোমাকে একটু দেখি।

ও হেসে বলে, পরে দেখো। এখন মুখ ধুয়ে চা-বিস্কুট খাও।

ক'টা বাজে?

সাড়ে সাতটা-পৌনে আটটা হবে।

পিসী ফেরেন নি?

পিসী ত একটু আগেই গেলেন।

এত দেরীতে?

উনি ত তোমার জামা-কাপড় আমাকে কাচতে দেন না। রোজ সকালে বেরুবার আগে তোমার সব ছাড়া জামা-কাপড় কাচা-কুচি করে...

শুনেও লজ্জা লাগে। বলি, ছি ছি, পিসীকে কত কষ্ট দিচ্ছি।

দেবী আমার হাত টিপে দিতে দিতে বলে, তোমার কোন কাজকেই পিসী কষ্ট বলে মনে করেন না। বরং সব সময় বলেন, তোমার জন্য কিছুই করতে পারলেন না।

তোমরা যা করছ তার কোন তুলনা হয় না।

তোমরা মানে...

পিসী আর আমার বউ।

আমি হাসি চেপে বললেও ও না হেসে পারে না। হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করে, দাঁপ, কোথায় তোমার বউ?

তুমি দেখতে পাবে না।

কেন?

একটু অসুবিধে আছে।

কিন্তু কবে তোমার বিয়ে হলো, তা ত জানতে পারলাম না?

বেশ কিছুদিন আগে হরসুন্দরী আশ্রমশালায় আমার বিয়ে হয়েছে।

তাই নাকি?

তোমার বউকে দেখতে কেমন?

একটু মোটা, একটু চাপা রং কিন্তু আমাকে যে কী দারুণ ভালবাসে আর আমার সেবা-যত্ন করে, তা তুমি ভাবতে পারবে না।

তোমার বউ তোমাকে খুব ভালবাসে? খুব আদর করে?

বলছি ত তুমি কল্পনা করতে পারবে না।

এমন বউ তোমাকে কে জুটিয়ে দিল?

কোন আত্মীয়-স্বজন বা ঘটক এ বিয়ের ব্যবস্থা করে নি।...

তবে?

স্বয়ং বিধাতাপুরুষ এ বিয়ের ঘটকালি করেছেন।

এমন বিয়ের কথা ত কখনো শুনিনি।

এমন বউ অন্য কারুর অদৃষ্টে জুটলে ত শুনবে।

দেবী এবার আমার মুখের সামনে মুখ এনে মিটমিট করে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করে, তোমার বউ তোমাকে কি বলে ডাকে?

তাও শুনতে চাও?

ও মাথা নেড়ে বললো, হ্যাঁ।

এমনি আমাকে দাঁপ বলে ডাকে; তবে বেশী আদর করার সময় সোনা বলে ডাকে।

ও হাসতে হাসতে আমার বুকের উপর লুটিয়ে পড়ে বললো, কি অসভ্য! তার মানে তুমি জেগে থেকেও ঘুমের ভান করো?

আমি দু'হাত দিয়ে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে বলি, সত্যি, তুমি আমাকে ভাবিয়ে দিচ্ছ। এই এত বড় পৃথিবীতে আর কেউ নেই যে আমাকে তোমার মত ভালবাসতে পারে।

ও হঠাৎ আমার হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, চলো, বাথরুমে চলো।

একটু পরে।

আর এক সেকেণ্ড দেরী করবে না।

সত্যি, ও আর এক সেকেণ্ড দেরী করতে দেয় না। আমাকে টেনে তুলে দেয়। হাত ধরে বিছানা থেকে নামায়। ঘরে ধরে বাথরুমে পর্যন্ত নিয়ে যায়। বলে, বাথরুম করেই বেরিয়ে আসবে।

আমি এখানেই মুখ ধুয়ে নিই।

না, না, এই ঠাণ্ডা বাথরুমে এক ঘণ্টা কাটাতে হবে না।

কিছু হবে না। আমি ত চটি পায়ে দিয়ে আছি।

অনেক অনুরোধ-উপরোধ করার পর ও রাজী হয় কিন্তু বলে, তাহলে আমি টুল এনে দিচ্ছি। তুমি তার উপর বসে বসে মুখ ধোবে।

আমি বাথরুম করে দরজা খুলতেই দেবী টুল রেখে আমাকে বসায়। ব্রাশে পেষ্ট লাগিয়ে দেয়। আমার দাঁত মাজা হতেই ও অতি সন্তর্পণে আমার হাতে জল ঢেলে দেয়। মুখ ধোয়া হতেই ও আমার হাত-মুখ-পা মুছিয়ে দেবার পর ধরে ধরে ঘরে নিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বামুন দিদি চা-বিস্কুট এনে দেবীর হাতে দিয়ে যান।

আমি চায়ের কাপে চুমুক দিতেই ও বললো, আবার খালি পেটে চা খাচ্ছ? আগে বিস্কুট খাও।

তুমি চা খাবে না?

হ্যাঁ আনছি।

দেবী সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘর থেকে চা এনে আবার আমার পাশে বসল। চা খেতে খেতে বললো, আজ তোমাকে দেখে বেশ ভাল লাগছে।

ভাল লাগছে মানে?

মনে হচ্ছে এবার তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে।

আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, আগে কি মনে হয়েছিল আমি আর সুস্থ হবো না?

তা না তবে ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। আমার হাত থেকে খালি চায়ের কাপ নিয়ে নীচে রেখে বললো, তুমি যখন এসেছিলে তখন তোমার কত জ্বর ছিল জান?

কত?

একশ চার।

এত জ্বর ছিল?

তা না হলে এমনি-এমনি বেহুঁস হয়ে পড়ে গিয়েছিলে?

তুমি আমাকে দেখেই খুব জোরে একটা চিৎকার করেছিলে, তাই না?

হ্যাঁ কিন্তু কি বলে চিৎকার করেছিলাম জান?

না, তা মনে নেই।

বলেছিলাম দীপ অজ্ঞান হয়ে গেছে।...

পিসী জানেন না তুমি আমাকে দীপ বলে ডাকো?

তোমার-আমার কোন কথাই কাউকে বলতে পারি না। দেবী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললো, সেইটাই ত আমার সব চাইতে বড় দুঃখ।

আমার কথা কি সবাইকে বলতে ইচ্ছে করে?

করবে না? দেবী হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে সামনের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে, ইচ্ছে করে সবার সামনে তোমাকে দেখিয়ে বলি, এই হচ্ছে আমার দীপ, আমার সোনা, আমার দেবতা কিন্তু সে সৌভাগ্য ত এ জীবনে হবে না।

সবাইকে দেখিয়ে বা বলে কি লাভ? আমি ত তোমারই আছি, তোমারই থাকব।

লাভ-লোকসান জানি না; তবে সবার সামনে মাথা উঁচু করে তোমার পাশে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে। দেবী আমার সামনে একটু ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল, তোমার ইচ্ছে করে না সবাইকে বল আমি তোমার বউ?

এবার বলব।

একটু বিচিত্র হাসি হেসে ও বললো, পারবে না দীপ, পারবে না। বড় কঠিন কাজ।

নিশ্চয়ই পারব।

কিন্তু কি পরিচয় দেবে?

বলব, আমার বউ।

বিষণ্ণ করুণ সুরে বললো, বউ বললেই কি বউ হওয়া যায়?

শুধু বলব কেন, তোমাকে স্ত্রীর মত ভালবাসব, মর্যাদা দেব।

আমি জানি তুমি আমাকে সবকিছুই দেবে কিন্তু তুমি দিলেই ত আমি তোমার স্ত্রী হতে পারি না। আরো দশজনে স্বীকৃতি না দিলে ত...

আমি ওর হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ডাকলাম, দেবী।

বল।

ভয় নেই আমি তোমাকে বিয়ে করবই।

ও একটু হেসে বললো, তুমি যে বলছিলে হরসুন্দরী ধর্মশালায় তোমার বিয়ে হয়ে গেছে। তবে কি দুটো বিয়ে করবে?

আমার বউকে আমি আবার বিয়ে করব। তাতে তোমার কি?

দেবী হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, খুব ভাল কথা। এবার উঠে বসো। ওষুধ খেতে হবে।

আমি উঠে বসতেই ও আমাকে একটা ক্যাপসুল আর একটা বড়ি দিল। জলের গেলাস মুখের কাছে ধরল। আমি ওষুধ খেলাম।

তুমি শুয়ে থাকো। আমি একটু রান্নাঘর থেকে আসছি।

আচ্ছা।

পাঁচ-দশ মিনিট পরে ও রান্নাঘর থেকে আসতেই ডাকলাম, আমার কাছে বসো।

কেন?

কথা আছে।

ও আমার পাশে বসতেই জিজ্ঞাসা করলাম, পিসী কি আজকাল তোমার কাছেই থাকেন?

দিদি মারা যাবার দিন থেকেই আছেন।

পিসী কি এবার থেকে তোমার কাছেই থাকবেন?

কিছু কথা হয়নি তবে পিসী আমাকে একলা ফেলে যাবে বলে মনে হয় না।

তুমি আমার সঙ্গে পাটনা যাবে না?
তুমি পাটনা যাচ্ছ নাকি?
চাকরি পেয়েছি, যাব না?
কে তোমাকে যেতে দিচ্ছে?

সেকি? চাকরি পেয়েছি তবু যেতে দেবে না?

কি বলছ তুমি?

আমি ঠিকই বলছি।
আমি কি তোমাদের ঘাড়ে বসে বসে দিন কাটাব?

ঘাড়ে বসে কেন দিন কাটাবে? চেষ্টা করলে এখানেও তুমি চাকরি পেয়ে যাবে।
কিন্তু...

শুধু নিজের দিকটাই দেখছ কেন? আমার আর পিসীর কথা ভেবে দেখেছ? তুমি না থাকলে আমরা কিভাবে থাকব বলতে পারো।

আমি হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারলাম না।

একটু চুপ করে থেকেই দেবী বললো, পিসীর শরীরও বিশেষ ভাল না। এখন একলা একলা থাকতে ভয় পান। তাই তো উনি তোমাকে কাছে রাখার জন্য পাগল হয়ে উঠেছেন।

কিন্তু...

আমি কিছু বলবার আগেই দেবী বললো, তাছাড়া এই ক'দিনের মধ্যে তুমি যেভাবে দু'বার টাইফয়েডে পড়লে, তাতে তোমাকে আর আমিও একলা ছেড়ে দিতে পারব না।

আমি ত ভেবেছিলাম আজ পাটনায় টেলিগ্রাম করে জানাব, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছি বলে কয়েক দিন পরে আসছি।

জানিয়ে দাও অসুস্থ হয়েছ কিন্তু যাবার ব্যাপারে কিছু জানাতে হবে না।

দুপুরের দিকে পিসীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে কবে নাগাদ পাটনা যেতে দেবে?

না, না, বাপু, তুই আর একলা কোথাও থাকবি না।

তাই বলে কি আজকালকার বাজারে চাকরি পেয়েও চাকরি করব না?

এখন ত তোকে কিছুতেই ছাড়ছি না।

এখন ছাড়বে না, তা ত জানি কিন্তু কবে ছাড়বে?

তোর বিয়ে না দিয়ে আর...

আমি চমকে উঠে বললাম, তুমি কি আমার বিয়ের ব্যবস্থা করছ?

পিসী হেসে বললেন, বিয়ের কথা শুনে চমকে উঠছিস কেন? আজ না হোক কাল ত তোকে বিয়ে করতেই হবে।

আমি পিসীর দুটো হাত চেপে ধরে বললাম, পিসী, আমি তোমার সব কথা শুনব কিন্তু দোহাই তোমার! তুমি আমার বিয়ের ব্যবস্থা করো না।

কেন রে?

আমি বিয়ে করতে পারব না।

সেকি? বিয়ে করবি না কেন?

তুমি সেকথা জানতে চেও না।

কিন্তু তোর মা-বাবা ভাই-বোন যখন নেই তখন আমার ত একটা দায়িত্ব আছে।

সব দায়িত্ব পালন করো কিন্তু বিয়ের কথা বলো না।

এমন সময় দেবী ঘরে ঢুকতেই পিসী বললেন, তুই প্রদীপের কথা শুনেছিস?

কি কথা পিসী?

পিসী জবাব দেবার আগেই আমি বললাম, আমি বলেছি আমি বিয়ে করতে পারব না।

পিসী বললেন, পাগলের কথা শুনেছিস?

দেবী হাসতে হাসতে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, বিয়ে করবে না কেন?

বিশেষ কারণ আছে।

নিজে কোন মেয়ে পছন্দ করেছ?

করেছি।

পিসী হাসলেন।

দেবী হেসে জানতে চাইল, কে সেই মেয়ে?

বলব না।

পিসী হাসতে হাসতে দেবীকে বললেন, ও আবার নিজের মেয়ে পছন্দ করবে? তাহলে আর দুঃখ কি ছিল।

দেবী একটু গম্ভীর হয়েই আমাকে জিজ্ঞাসা করল, ঠাট্টা না করে ঠিক করে বলো কি ব্যাপার।

বলছি ত একজনকে পছন্দ করেছি কিন্তু তার সঙ্গে বিয়ে হবে না।

কেন?

অসুবিধে আছে।

সে অসুবিধে যদি পিসী সরিয়ে দেন?

পিসী পারবেন না।

পিসী হাসতে হাসতে দেবীকে বললেন, তুই ওর পাগলামী বুঝতে পারছিস না?

আমি বললাম, না পিসী, পাগলামী করছি না।

দেবী বললো, তাহলে বল কাকে তুমি বিয়ে করতে চাও।

বলছি ত তাকে বিয়ে করার অসুবিধে আছে?

কেন?

তাকে বিয়ে করলে পিসী গলায় দড়ি দেবে।

পিসী হাসতে হাসতে বললেন, তুই মুসলমান মেয়ে বিয়ে করলেও আমি তাকে বরণ করে ঘরে তুলতে পারব।

না পিসী, পারবে না। মুস্কিল আছে।

আমি হিন্দু ঘরের বিধবা ঠিকই কিন্তু যতটা গোঁড়া ভাবিস ততটা গোঁড়া আমি না।

তা আমি জানি পিসী কিন্তু যাকে আমি বিয়ে করতে চাই তার সঙ্গে তুমি আমাকে বিয়ে দিতে পারবে না।

একশবার পারব।

বোধ হয় পারবে না পিসী।

ত্রিভুবনে তুই ছাড়া আর কাউকে আপন মনে হয় না। আর তোর জন্য আমি এইটুকু পারব না?

পারবে?

পারব। মেয়েটা কে, তাই বল।

আমি পিসীকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললাম, পিসী, আমি তোমাদের দেবীকে ভালবাসি। আমি আর কাউকে বিয়ে করতে পারব না।

(ক্রমশঃ)

কবি মোহিতলাল স্মৃতি-তর্পণ

২৬ জুলাই কবির চতুর্বিংশতিতম মহাপ্রয়াণ দিবস। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি প্রকাশ করিতে পারিয়া আমরা নিজেদের ধন্য মনে করিতেছি।

॥ কাব্যগ্রন্থ ॥

বিস্মরণী ছয় টাকা ॥

॥ সাহিত্যসমালোচনা গ্রন্থ ॥

আধুনিক বাংলা সাহিত্য দশ টাকা ॥

॥ জীবনীগ্রন্থ ॥

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ পাঁচ টাকা ॥

॥ কবিসম্পাদিত অদ্বৈত-বেদান্ত ব্যাখ্যা ॥

অভয়ের কথা পাঁচ টাকা ॥

[ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত]

[জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত]

জেনারেল বুকস্ এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা ৭০০ ০০৭

সনৎ লাহিড়ী

ডানলপ ইণ্ডিয়া লিমিটেড্

তিনি 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ অ্যাড-ভার্টাইজারস'এর ম্যানেজিং কমিটির চেয়ার-ম্যান। ভারতীয় 'পাবলিক রিলেসনস্ সোসাইটি'র প্রাক্তন চেয়ারম্যান। দু' বছরের জন্যে ইউনাইটেড নেশনস্ এর অন্তর্গত কাফে'র 'কম্যুনিকেশন কনসাল্টেন্ট' নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। সেই সময় সমগ্র এশিয়া থেকে একমাত্র তিনিই এই সাম্মানিক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। জেনিভাতে 'পাবলিক রিলেসনস ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস' সম্মেলনে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব করেছিলেন। শুধু একবার নয়; নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কার্তায়, অনুষ্ঠিত 'এশিয়ান অ্যাড-ভার্টাইজিং কংগ্রেস'এ ভারতীয় প্রতিনিধিদলের। এরকম বহু ঘটনা আছে। শ্রীঅজিত দত্ত কিংবা প্রশান্ত সান্যালের মতোই বর্তমান ভারতবর্ষে প্রচার এবং বিজ্ঞাপন জগতের মানুষই তাঁর নাম জানেন, তাঁকে চেনেন।

এ সম্পর্কিত অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী সেই সৌম্যদর্শন ভদ্রলোকের সঙ্গে যা বলছিলাম। কথা বলছিলাম শ্রীসনৎ লাহিড়ীর সঙ্গে। ডানলপ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পাবলিসিটি ম্যানেজারের ঘরে বসে।

১৯৬৬ সালে বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন শ্রীলাহিড়ী। প্রশ্ন রাখলাম—এসে সর্বপ্রথম কোন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছিলেন?

সনৎবাবু বললেন—আমার সর্বপ্রথম পরিকল্পনা ছিল, আমরা অর্থাৎ আমাদের কোম্পানী কতখানি 'নন-কমার্শিয়াল' অথচ যথার্থ জনগণের সেবার কাজে নিয়োগ করতে পারে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা আমাদের কর্মপ্রচেষ্টায় নেমেছিলাম এবং গর্বের কথা, সমগ্র ভারতে আমরাই সম্ভবতঃ একমাত্র প্রতিষ্ঠান—যারা 'কাস্টোমার এ্যান্ড পাবলিক সার্ভিস'এর জন্যে এতটা করে।

কথাগুলো বলেই ঝটপট ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এসে আমার সামনে রাখলেন অজস্র 'ডানলপ' পুস্তিকা।—'এই দেখুন, রোড সিগন্যালের সম্পর্কে ভালোভাবে শিক্ষিত করে তোলার জন্য আমরা বই বের করেছি। কোন টায়ারের কি উপযোগিতা এবং ক্ষমতা, গাড়ী চালানোর কলাকৌশল এবং প্রক্রিয়া, প্রতিটি ট্যাকসির মিটার চার্জের তালিকা। প্রভৃতি থেকে শুরু করে বিশ্ব টেবিল টেনিসের গাইড বই, প্রতি বছর পুজোর সময় বড় বড় পুজোমণ্ডপকে কেন্দ্র করে কলকাতা পুলিশের সহযোগিতায় যানবাহন নিয়ন্ত্রণের গাইড বই প্রকাশ করা এমনকি কলকাতা চিড়িয়াখানার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে চিড়িয়াখানার পথ পরিক্রমার পরিচিত-পুস্তিকাও আমরা প্রকাশ করেছি। এখানে আপনাকে উল্লেখযোগ্য সামান্য কয়েকখানা পুস্তিকাই দেখালাম। এরকম অজস্র বই আমরা প্রকাশ করেছি।'

শ্রীলাহিড়ীর কথা শেষ হলে আমার সামনে রেখে দেওয়া সামান্য কয়েকখানা পুস্তিকার সংখ্যা গুণে দেখলাম—আটচল্লিশটা।

—এই ধরনের শিক্ষণীয় পুস্তিকা প্রকাশের সঙ্গে অর্থাৎ এই ধরনের প্রচারখাতে এত বিপুল অর্থ ঢালবার সঙ্গে আপনার প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ব্যবসায়িক স্বার্থটা কি রকম? আমার প্রশ্ন।

সনৎবাবু বললেন—এগুলো মূলতঃ আমরা করি গ্রাহক এবং জনগণের সেবার জন্য। জনসংযোগের প্রধান সূত্রই হলো জনগণের জন্য চিন্তা, ভাবনা। শুধু তাই নয়, তাঁদের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করা। আমার প্রতিষ্ঠান যখন এদেশের প্রতিষ্ঠান, তখন স্বভাবতই এদেশের মানুষের সেবায় আমার সংস্থা কতদূর এবং কতখানি নিয়োজিত করতে পারে সেটাও আমাদের দেখতে হবে। জনসংযোগের সেই দৃষ্টিভঙ্গীতেই এগুলো আমরা করি—এদেশের মানুষকে তাদের সুবিধার জন্যই আরো শিক্ষিত ও সচেতন করে তুলতে। 'শিক্ষিত' করে তোলার কথা বললাম। সেই প্রসঙ্গেই আসছি। যেমন ধরুন, 'রোড সেফটি, ট্রাফিক কন্ট্রোল, রোড অ্যাকসিডেন্টস' এদেশের বিরাট সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানে আমরাই সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে সচেষ্ট হই। কিভাবে, তাইতো? আমরা রাস্তায় গাড়ী চালাবার নিয়ম, দুর্ঘটনা এড়াবার পদ্ধতি সম্পর্কে পুস্তিকা, পোস্টার ছড়িয়ে দিয়েছি সর্বত্র। গাড়ী-চালকরা নিশ্চয়ই সে সম্পর্কে পড়াশুনো করে, দেখে, যে বিষয়টা জানতেন না সেটা জেনে এ বিষয়ে আরো শিক্ষিত হয়ে উঠবেন। তারপর ধরুন, পুজোর সময় কলকাতা শহরে, আমরা দেখেছি, অসম্ভব

ট্র্যাফিক জ্যাম হয়। ফলে, সবারই কষ্ট হয়। এই ট্র্যাফিক জ্যাম এড়াবার জন্যই আমরা পথচারীদের, গাড়ীচালকদের প্রভৃতি সবাইকে সুষ্ঠু নির্দেশ পালনে আহ্বান জানাই। পুজোয় ছেলে-হারানোও এক বড় সমস্যা। তার সমাধানের জন্যও আমরা চেষ্টা করি, সাহায্য করি।

আবার প্রশ্ন রাখি আমি—এসবের পিছনেও কি পরোক্ষভাবে আপনার একটা বিশেষ কারণ থাকে না?

একটু হেসে ফেলেন সনৎ লাহিড়ী। তারপর আমার দিকে হাত নেড়ে বলেন—সেটা আপনি ঠিকই ধরেছেন।. হ্যাঁ, জনগণের যথার্থ প্রয়োজনে সেবার হাত বাড়িয়ে আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানের 'গুড-উইল' অবশ্যই বাড়াতে চাই। আমাদের এই কাজের জন্য 'পিপল মে থিংক ডানলপ ইন এ বেটার ওয়ে।' তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও ঠিক যে আমরা এই ধরনের জনসংযোগের মাধ্যমে নিশ্চয়ই জনগণকে ডানলপের উৎপন্ন দ্রব্য কিনতে বলি না। কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে বললে বোধ হয় বলা যায়, ডানলপের উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রির সোজাসুজি দৃষ্টিভঙ্গীতে আমরা এই প্রচার চালাই না। এর মূল উদ্দেশ্য—জনসেবা ও জনসংযোগ।

আমিও বললাম—অবশ্যই।

জনসংযোগের বিষয় ছেড়ে আমরা সরাসরি 'বিজ্ঞাপন' প্রসঙ্গে এলাম এবং শ্রীলাহিড়ীকে অনুরোধ জানালাম এ বিষয়ে বলার জন্য। সনৎবাবু বললেন—দেখুন সত্যি কথা বলতে কি, আমরা এখন বিজ্ঞাপনের জঙ্গলে বাস করছি। সর্বত্র বিজ্ঞাপন আমাদের ঘিরে রেখেছে। সকলেই বলছে 'আমি ভালো জিনিস দিচ্ছি, সুতরাং আমার সব ভালো অতএব আমার প্রতিষ্ঠানের জিনিস কিনুন।' বিজ্ঞাপনের এরকম চরম অন্তর্মুখীনতার গতিপথে দাঁড়িয়ে আমি বিজ্ঞাপন নামক বস্তুটাকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে ভাবছি। আমার মতে—'বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য এখন অন্তর্মুখী না হয়ে বহির্মুখী হওয়া দরকার।' অর্থাৎ আমার বিজ্ঞাপনে আমার কোম্পানী কি দিচ্ছে,

কত ভালো দিচ্ছে ইত্যাদি ব্যাপারগুলোকে যদি জাহির বা প্রচার না করে, কোনে দ্রব্যের জন্য ক্রেতার চাহিদা এবং সমস্যাগুলো কি কি সেই জিনিসটা তুলে ধরে এবং ক্রেতার সেই চাহিদা বা সমস্যা পূরণে আমার দ্রব্য কি করেছে সেটা তুলে ধরি, তবে আমার মনে হয় সেই বিজ্ঞাপনটা আরো কার্যকরী হয়। অন্যান্য কম্যুনিকেশন থেকে বিজ্ঞাপনের একমাত্র পার্থক্যটা কোথায় জানেন? বিজ্ঞাপন একটা 'পারসুয়েসিভ কম্যুনিকেশন।'

শ্রীলাহিড়ী বললেন—আমার বিজ্ঞাপনে এগুলোই করি আমি। স্কুটারের টায়ার তৈরি করি আমরা। স্কুটার যাঁরা চড়েন, তাঁদের কাছে স্কুটারের টায়ারের সবচেয়ে বড় সমস্যা কি জানেন? নিরাপত্তা। আমরা যখন স্কুটারের টায়ারের বিজ্ঞাপন দিই, তখন টায়ারের নিরাপত্তা প্রসঙ্গটাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিজ্ঞাপন দিই। এছাড়া বিজ্ঞাপনের অন্যধারা আমরা অবলম্বন করেছি।

বিশ্ব টেবিল টেনিসে ষ্টেডিওতে পনেরো মিনিটের প্রতিদিনকার প্রোগ্রাম করিয়েছি প্রখ্যাত ক্রীড়াসমালোচক ডিকি রত্নাগর প্রভৃতিকে দিয়ে। প্রচণ্ড পরিমাণে সফল হয়েছি আমরা।

সম্প্রতি আর একটা জিনিস আমরা করেছি যেটা ভারতবর্ষে তো বটেই সম্ভবতঃ পৃথিবীতেও এই প্রথম। ভারতে সর্বপ্রথম এই একটি প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ডানলপ রেডিওর 'জেনারেল সার্ভিস'এর মাধ্যমে ভারতের সব সেন্টারে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বনাম ভারতের টেষ্ট ক্রিকেটের 'বল-টু-বল' ধারা বিবরণীর ব্যবস্থা করেছিল।

সনৎবাবুর কথা শেষ হতেই প্রশ্ন করলাম—এরকম ব্যাপক নিরক্ষরতাসম্পন্ন দেশে বিজ্ঞাপন বা প্রচারের ভবিষ্যৎ কি? বর্তমান ব্যাপকতাই বা কতখানি? গ্রাম্য অঞ্চলের বিজ্ঞাপন নিয়ে, প্রচার পদ্ধতি নিয়ে আমরা এখনও পিছিয়ে আছি। এ কথা ঠিক। ভারতের মতো গ্রামকেন্দ্রিক অধিকাংশ নিরক্ষর জনজীবনকে নিয়ে প্রচারের ধারা বা কলাকৌশল সম্পর্কে আমাদের চিন্তা-ভাবনা অনেক দেরীতে শুরু হয়েছে। আমাদের সচেতনতা নিশ্চয়ই আছে, তবে এ সম্পর্কে আরো গবেষণা হওয়া উচিত।

দীর্ঘ আলোচনা সেরে উঠবো। সব ঠিক করছি। নবমবাবু সিগারেট ধরিয়ে (প্রায় দু ঘন্টার মধ্যে) শ্রীসনৎ লাহিড়ী বললেন—বাংলা পত্রপত্রিকাগুলোতে আজকের দিনে 'পাবলিসিটি এবং পাবলিক রিলেসনস'এর বিষয় নিয়ে আলোচনা, সমীক্ষা হওয়া উচিত। সেদিক থেকে 'অমৃত' পত্রিকার প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই প্রশংসার যোগ্য।

পত্রিকার তরফ থেকে প্রত্যাভিনন্দন জানিয়ে উঠে এলাম।

আনন্দ রায়

মনের অসুখ

॥ এগারো ॥

'আমি তব মনোরঞ্জনের হব মালাকর'

আমার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মেয়েটির ঠোঁট কাঁপল, কথা বেরুল না, গলা দিয়ে বেরিয়ে এল শুধু চাপা কান্নার মত একটা আওয়াজ, মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। সে চেতনা হারাল। মিসেস রায় সখীর সাহায্যে কন্যাকে নিম্নে পাশের ঘরের সোফায় শুইয়ে দিলেন।

মিসেস রায় মফস্বল শহরের এক স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। স্বামী ছিলেন ডাক্তার। বছর দশেক আগে সন্ন্যাস রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। ছেলের বয়স তখন কুড়ি মেয়ের বারো। ছেলে মেয়েকে তিনি বাপের অভাব বুঝতে দেন নি। অনেক দুঃখ কষ্ট, ঝড়-ঝাপ্টার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে তিনি পরিষ্কার হয়ে পড়েছেন। ছেলে ডাক্তারী পাশ করে এখন আমেরিকার এক হাসপাতালে কাজ করছে। মেয়ে গত বছর কলকাতার এক ধনেদী পরিবারের ছেলেকে পছন্দ করে বিয়ে করেছে। পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে পড়বার সময় বীথির সঙ্গে বিক্রমের পরিচয় হয়। বিক্রম একটা বড় ব্যাঙ্কে কাজ করে। দাদার পাঠানো একটা ড্রাফট ভাঙ্গাতে গিয়ে বীথি বেশ মুস্কিলে পড়েছিল, সেই সময় বিক্রম ওকে সাহায্য করে। প্রথম পরিচয়ের তিন মাসের মধ্যেই বীথি মাকে জানায় যে সে বিক্রমকে বিয়ে করতে চায়; মা যেন কলকাতায় এসে বিক্রমের মায়ের সঙ্গে দেখা করে বিয়ের প্রস্তাব জানান। মিসেস রায় চিঠি পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে কলকাতায় ছুটে আসেন। মেয়েকে অনেক বুঝিয়েও নিরস্ত করতে না পেরে অগত্যা বিক্রমের মায়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেন। জাতকুলের কোনো অমিল ছিল না, বীথিকে দেখে কোনো ছেলের বাপ-মায়ের অপছন্দ হবার কথা নয়। তাকে সুন্দরী বলা চলে। তাছাড়া একমাত্র পুত্রের মনোরঞ্জন পণ এই বিয়ে না হলে সে আর কোনো দিন বিয়েই করবে না। অনেক সাধ্য সাধনা করে এতদিন তাঁরা ছেলেকে বিয়ের ব্যাপারে রাজি করাতে পারেন নি, কাজেই তাঁরা বেশ উৎসাহের সঙ্গে রাজি হলেন; বিয়ে হয়ে গেল। মেয়ে হোস্টেল ছেড়ে সিমলের শ্বশুরবাড়ী থেকে ক্লাস করতে লাগল। মিসেস রায় কিন্তু এই বিয়েতে সুখী হতে পারলেন না। বিক্রমকে প্রথম দর্শনেই তাঁর অপছন্দ হয়েছে। চেহারার দিক থেকে বীথির উপযুক্ত না হলেও বিক্রম স্বাস্থ্যবান ও বিত্তবান। চাকরী এমন কিছু খারাপ করে না; তাছাড়া এক সময় তাদের পরিবারের এই নগরীতে খুব নামডাক ছিল। তবু কেন যে তিনি মেয়ের পছন্দ করা স্বামীকে অপছন্দ করলেন, তা তিনিই জানেন না। আজকালকার এই ধরনের বিয়েতে কি তাঁর সায় নেই? না, তা বলা চলে না। এদিক থেকে তাঁর কোনো সংস্কার নেই। ছেলে তো ভিনরাজ্যের এক মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করেছে. তিনি পুত্রবধূকে খুশীমনেই গ্রহণ করতে পেরেছেন। পুত্র-পুত্রবধূ বিদেশে বেশ সুখেই আছে। বিয়ের সময়েই তাঁর মনে হয়েছিল যে বীথি ভুল করছে। আজ তাঁর অনুমান সত্য হতে চলেছে। জামাতাকে তিনি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারছেন না।

মেয়েকে পাশের ঘরে বসিয়ে রেখে মিসেস রায় সংক্ষেপে এই ভূমিকা সেরে বললেন : আমাকে চিঠিতে বরাবর জানাচ্ছে যে সে ভাল আছে। বোর্ডের পরীক্ষার খাতা নিতে কলকাতায় এসে ওকে দেখে চমকে উঠলাম। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর স্বীকার করল যে বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই ফিট হচ্ছে. এ অসুখ তার কোনো দিনই ছিল না। তাছাড়া, খিদে নেই, ঘুম নেই, যা খায় তা হজম হয় না, ক্লাসে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। বেয়ান বললেন—এ রোগের কোন চিকিৎসা নেই; গুরুদেব হোম করেছেন, গ্রহশান্তি করা হয়েছে, কালীঘাটে তারকেশ্বরে মানত করা হয়েছে। একজন দৈবজ্ঞ বলেছেন আরও তিন মাস গ্রহের কোপ থাকবে, ততদিন ভুগতেই হবে। বেয়াই ও জামাই বাড়ি ছিলেন না। ওকে একরকম জোরজবরদস্তি করেই কলকাতা থেকে আমার বাড়ি নিয়ে যাই। মেয়ে কিছুতেই যাবে না, আমিও ছাড়ব না। সে প্রায় আজ দশ দিন হল। আমার কাছে এসে ওর অসুখ আরো বেড়ে গেছে। রোজই এই রকম ফিট হচ্ছে দিনে ৪।৫ বার। স্থানীয় ডাক্তাররা সকলেই ওকে চেনেন, ওকে ভালবাসেন। অনেক চেষ্টা করেও কিছু করতে পারেন নি। তাঁদের পরামর্শ-মত আবার কলকাতায় আসতে হয়েছে। তাঁরা বলেছেন বটে ভয়ের কিছু নেই—হিস্টিরিয়া, কিন্তু আমি একটুও ভরসা পাচ্ছি না। মেয়েকে আমি শ্বশুরবাড়ী পাঠাতে পারব না। ওদের ঐ ঝাড়ফুঁক তন্ত্রমন্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই। প্রথম দু-তিন দিন ও সিমলের বাড়িতে ফিরে যাবে বলে জেদ ধরেছিল, এখন আর সেসব কথা বলছে না।

স্বামী এর মধ্যে দেখতে যায় নি? আপনি জোর করে আনায় জন্যে তারা রাগ করে নি?

—গত রবিবার দুই বন্ধু নিয়ে বিক্রম ওকে দেখতে আসে, নিয়ে যেতেও চায়। কিন্তু সেই সময়ে ওর ঘনঘন ফিট হতে থাকে। ঘন্টা পাঁচেক থেকে ওরা ফিরে আসে। সেই থেকে মেয়ে আর শ্বশুরবাড়ী যেতে চাইছে না। রাগ ওদের নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু আমি মা হয়ে মেয়েটাকেও মেরে ফেলতে পারি না। ওদের রাগের চেয়ে

আমার কাছে আমার মেয়ের প্রাণের দাম বেশী।'

—মেয়ে আপনাকে কোন কিছু বলে নি? স্বামী অথবা শ্বশুরবাড়ী সম্পর্কে? আপনার কাছে অসুখের খবর গোপন করেছে কেন? কি বলছে?

—কোন কিছু জিজ্ঞেস করলেই ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তারপর হয় অজ্ঞান হয়ে যায়, না হয় অঝোরে কাঁদতে থাকে। দেখুন, আপনি যদি কিছু জানতে পারেন। বিয়ে করে ভুল করেছে—একথা আমার কাছে কিছুতেই স্বীকার করবে না; আমি ওকে অনেক মানা করেছিলাম। সব ব্যাপারেই ছোটবেলা থেকে ও একগুঁয়ে আর জেদী।

বীথি মুখ খুলল। কয়েকদিন ধরে, অল্প অল্প করে ওর প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কিত অনেক কথা বলে গেল। বলার সময় প্রথম দিকে কয়েকবার খুব জোরালো ফিট হয়েছিল, ক্রমশ ফিট কমে এল মুখচোখের ভাব অনেকটা স্বাভাবিক মনে হল। ওর কাহিনী যতটা সম্ভব ওর কথাতেই বলছি।

—'লভ এ্যাট ফার্স্ট সাইট্'? হ্যাঁ তাই তো বলা উচিত। কেন ওকে ভাল লাগল? বলতে পারব না। কুতজ্ঞতা বলা চলে না। ড্রাফটটা ক্যাশ করার ব্যাপারে আমাকে যে সাহায্য করেছিল, তার জন্যে ধন্যবাদ জানানোই যথেষ্ট। তবে যেচে আমাকে সাহায্য করেছিল, আমি ওর কাছে সাহায্য চাই নি। হয়তো সেই জন্যে ওকে অন্যান্য ছেলেদের থেকে একটু স্বতন্ত্র মনে হয়েছিল; এর বেশি কিছু নয়। কিছুদিন ধরে ক্লাসের একটি মেয়ে তার প্রেমের গল্প শুনিয়ে আমার কান একেবারে ঝালাপালা করে দিচ্ছিল। তাই কি আমার মনে প্রেমে পড়ার ইচ্ছে জেগেছিল? 'আইডিয়াটা' বেশ 'সিলি' —তাই না? মায়ের অমতে এত বড় ঝুঁকি নিতে গেলাম কেন? আপনি জিজ্ঞাসা করার আগেও এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি, উত্তর খুঁজে পাইনি। বিয়ের পর প্রথম মাস একরকম ভালই কাটল। আপনাকে বলতে লজ্জা করছে না, কিন্তু মাকে কিছুতেই বলতে পারি নি। বিয়ের পর ওর বাবা মা দেশে চলে গেলেন, উদ্দেশ্য বোধ হয় আমাদের কলকাতাতেই মধুচন্দ্রিমা যাপনের সুযোগ দেওয়া। বিয়ের আগে যা যা বলেছিল, বিয়ের পর এক মাস ঠিক সেইসব করল, সেই মত চলল। রোজ রাতে ওদের ফুলবাগানে আমাকে ফুলের সাজে সাজিয়ে আমার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ঘন্টার পর ঘন্টা চেয়ে থাকত। বিরাট বাড়ী ওদের, ছাতটাও মস্ত বড়। তার একপাশে লতাপাতায় ঘেরা কুঞ্জবনের মত একটা জায়গা, সেখানে রোজ আমাদের ফুলশয্যা নয়, ফুলের বাসর বসত। লতাপাতার মধ্যে বিদ্যুতের জোনাকী জ্বলত, উঁচুতে জালের ফাঁক দিয়ে তারারা উঁকি মারত মাঝে মাঝে সুইচ টিপে ছাতের আর এক প্রান্ত থেকে চাঁদের আলো আমদানি করত। ভক্তের বিহ্বল দৃষ্টির সামনে আমি ধীরে ধীরে স্বর্গের দেবী হয়ে যেতাম। মনে হত, আমার দেহ শুধু ফুলে তৈরী; আমার দেহে রক্তমাংস নেই, আছে শুধু ফুলের গন্ধ আর তারার আলো। কোনো রাতে আমাকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করেনি, কোন সময় আমারও মনে হয়নি আমার আর কিছু চাই। সারা রাত ধরে আমার মালঞ্চের মালাকরের স্তুতি শুনতাম। ভোরের আলো ফুটে উঠতেই আমার দেহে প্রাণসঞ্চার হত, হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক শব্দ শুনতে পেতাম, ঘুমন্ত বিক্রমের দিকে না তাকিয়ে দেবীত্ব বজায় রাখতে, সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে গিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়তাম। জেগে শুনতাম, ও অফিসে চলে গেছে। আমার ক্লাসে যাওয়া হত না। ওর সঙ্গে আবার দেখা হত সন্ধ্যার পর সেই ফুলের বাসরে। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি শুধু স্বপ্ন দেখতাম, একটা ঘোরের মধ্যে দিয়ে সময়টা কাটত। ফিট কবে থেকে শুরু? হ্যাঁ, আমার মনে আছে। সব বলব। একটা কথা এখনও বলা হয়নি। সেটা আগেই বলা উচিত ছিল। ঠিক সময়ে মনে পড়েনি, তাই বলা হয়নি। ব্যাঙ্কে যখন ড্রাফট ভাঙানোর ব্যাপারে ও আমাকে সাহায্য করল, আমি যথারীতি ধন্যবাদ জানিয়ে চলে আসছিলাম। ও আমাকে ডেকে কি বলেছিল জানেন? বলেছিল—ধন্যবাদ চাই না, আমি আরো অনেকবার আপনার কাজে আপনার সেবায় লাগতে চাই। আমি বোধ হয় অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়েছিলাম, হয়তো আমার মুখে চোখে সেবা-তৃষ্ণা ফুটে উঠেছিল। তাইতো ও বলতে পেরেছিল, যদি কিছু মনে না করেন, একটু অপেক্ষা করলে আপনাকে আপনার হোস্টেল অবধি একটা লিফট দিতে পারি। তারপর থেকে রোজ দেখা হত, কোন দিন গঙ্গার ধারে, কোন দিন সল্ট লেকে, কোন দিন ফুটবলের মাঠে। একদিন 'প্রোপোজ' করল। সাদামাঠা কথায় নয় কাব্য করে জানল ও আমার মালঞ্চের মালাকর হতে চায়। প্রায়ই ও ঐ কবিতাটার লাইনগুলো আওড়াতো। আমার বুকে দোলা লাগত, চোখকান গরম হয়ে উঠত, সারা দেহে শিহরণ জাগতো। সুন্দর আবৃত্তি করে 'অশোকের কিশলয়ে গাঁথি দিব হার/ প্রতি সন্ধ্যাবেলা, অশোকের রক্তকান্তি/চিত্ত পদতল চরণ-অঙ্গুলি-প্রান্তে / লেশমাত্র লেখা চুম্বিয়া মুছিয়া লব,/এই পুরস্কার।' বিয়ের পর ও কথা রেখেছিল। এক মাস আমি ছিলাম মহারাণী, বাজরাজেশ্বরী, আর ও-ছিল দীনভৃত্য। কিন্তু একদিন নাটকের দৃশ্য পাল্টালো। সেদিন থেকেই আমার ফিট শুরু হল—

আমরা অনেক ধরনের মানুষ দেখি; অনেক অদ্ভুত, অস্বাভাবিক মানসিকতার মোকাবিলা করি। তাই চমক লাগানোর মত ঘটনার, সামনাসামনি হতে হয় খুব কমই, অতি অদ্ভুত চরিত্রের দেখা মেলে কদাচিৎ। সেই অতিবিরল চরিত্রের একজন এই বীথি। কর্তব্যপরায়ণ, নিয়মনিষ্ঠ, দৃঢ়চেতা প্রধান শিক্ষিকা মিসেস রায়ের কন্যার এই বিচিত্র মানসিকতার জন্য মায়ের কঠোর নিয়মানুবর্তিতাও বাস্তবানুগামিতা কতখানি দায়ী বলা কঠিন। তবে মাতা ও কন্যার আপাত বিপরীতধর্মী মানসিকতা যে একই বিশেষ ধরনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ফল একথা অনায়াসে বলা চলে। হয়তো এই বিরোধী চরিত্রের দরুণই তাঁরা একের অপরের কমপ্লিমেন্টারী হতে পেরেছেন। এবার বীথির মুখেই তার ফিটের ইতিবৃত্ত শুনুন

—সেদিন সন্ধ্যার আগেই বিক্রম আমাকে ডেকে নিয়ে ছাতে উঠল। গিয়ে দেখি ও আরো দুই বন্ধু উপস্থিত। এরা সাধারণত বাইরের ঘরেই বসে থাকে। আমাদের মিলন মন্দিরে ওদের দেখে আমার মেজাজ বিগড়ে গেল, কথাবার্তার তাল কেটে যেতে লাগল ওরা তখন 'রম'এর বোতল খুলেছে। এর আধ পেগ মাঝে মাঝে বারে ঢুকে খেলে বিক্রম কোন দিন বাড়ীতে মদের বোতল আনে নি। শ্বশুরশাশুড়ী নেই বলে ও সাহস বেড়ে গেছে। কিন্তু আমি তো রয়েছি আমি তো রাজরাজেশ্বরী। কিন্তু কিছুতে ওই বন্ধু দুজনের সামনে আমি নিজেকে ফুলরাণী বা রাজেন্দ্রাণী ভাবতে পারছিলাম

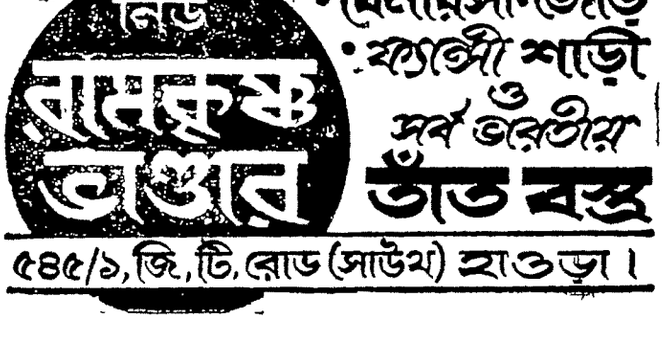

না। ওদের কথাবার্তা ক্রমশ অসংলগ্ন হয়ে উঠছিল, ওদিকে আমার মন ছিল না। শরীর খারাপের অজুহাত দিয়ে উঠে আসব ভাবছি। এমনি সময়ে ওদের একটা কথা আমার কানে ঢুকতেই আমি চমকে উঠলাম। ইংরিজিতে কথা বলছিল, মদের নেশায় ভেবেছিল আমি ইংরেজি বুঝি না। ওদের একজন ডাক্তার, সেই ছিল প্রধান বক্তা। জড়িয়ে জড়িয়ে ভুল ইংরিজিতে সে বিক্রমকে আশ্বাস দিচ্ছিল। বলছিল—বিক্রম দুর্বল নয়, তার যথেষ্ট শক্তি আছে, সে 'কনসামেশনে' (বিবাহকে সহবাসের মাধ্যমে সম্পূর্ণ করা) সক্ষম। বিক্রমের বোধ হয় একটু কম নেশা হয়েছিল, সে কথাবার্তার মোড় ঘোরাবার চেষ্টা করছিল; কিন্তু ওরা বিক্রমের মৃদু আপত্তি ও ইঙ্গিত গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। অন্য বন্ধুটি আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল, বিক্রমের শৌর্যবীর্যের প্রমাণ দাখিল করতে গিয়ে এমন সব অশালীন উক্তি করে বসল, যা শুনে আমার মাথা ঘুরতে লাগল; ওদের সংগ ছেড়িয়ে পালিয়ে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। বুকের ভেতরে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করলাম, চোখের সামনের আলোটা উজ্জ্বল হয়ে উঠে যেন দপ করে নিভে গেল। সেই আমার প্রথম ফিট।

যে অশালীন উক্তি শুনে বীথি চেতনা হারাল, সেই উক্তি বীথির মুখ দিয়ে কিছুতেই বের করা গেল না। এইটুকু মাত্র জানাল যে, সেই সন্ধ্যায় তাকে ফুলসাজে সাজিয়ে বন্ধুদের চমক লাগিয়ে দেবে বলে বিক্রম বীথিকে ডেকেছিল। তার আগেই 'বমেল' প্রসাদে তারা বে-সামাল হয়ে এমন কোন রূঢ় গুপ্ত কথা ফাঁস করে ফেলেছিল, যার আঘাত কল্পনাবিলাসী স্বপ্নলোকবাসী বীথি সহ্য করতে পারে নি। এইরকম ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পার্টি অর্থাৎ স্বামীর সহযোগিতা বিশেষ দরকার। মিসেস রায় কিছুতেই বিক্রমকে খবর দিতে রাজী হলেন না। বীথিও এই সময়ে সম্পূর্ণভাবে মায়ের মতামত দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিক্রমকে খবর দিতে চাইল না। তাদের বাড়ি ফিরে যাবার কোন রকম ইচ্ছাও প্রকাশ করল না। অথচ, প্রথমটায় শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে স্বামীর সংগে আসতে সে রীতিমত আপত্তি জানিয়েছিল। এই ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই গোলমেলে, রহস্যময় মনে হল। সমস্যার সমাধান ঘটল অনেকটা অপ্রত্যাশিত ভাবে। গল্প উপন্যাসে সাধারণত এরকম ঘটে থাকে। অফিস ডাক্তারের নির্দেশে বরুমই রোগী হয়ে মাস দেড়েকের মধ্যে আমার কাছে হাজির হল। তিনি জানালেন, ছেলেটি 'মাইসোফোবিয়াতে (ময়লা লাগার ভয়) ভুগছে।

দিন তিনেকের মধ্যে রহস্য স্বাভাবিক হয়ে গেল। নিজের 'মাইসোফোবিয়া' প্রসংগে বরুম জানাল যে, বছর কিনেক ধরে অল্প — কম ময়লা লাগার ভয় তার মনে ঢুকেছিল। বিয়ের পর থেকে ভয়টা বাড়তে থাকে; গত কয়েক দিনে ভয় একেবারে চরমে উঠেছে। এখন ব্যাঙ্কে গিয়ে কোন ফাইল কোন কাগজপত্র, এমনকি কলিংবেল পর্যন্ত সে ছুঁতে পারছে না।

বিয়ের প্রসংগে বলল :—ময়লা ছোঁবার ভয়েই তিরিশ বছর পর্যন্ত বিয়ে করিনি। বয়ঃসন্ধিকালের কতকগুলো কু-অভ্যাস আয়ত্ত করেছিলাম। তা থেকে মনে নানা রকমের ভয় ঢোকে। মনে হয়, বিয়ে করলে আমি বোধ হয় স্ত্রীকে সুখী করতে পারব না। চিকিৎসা? হ্যাঁ, তা প্রায় সব রকমই হয়েছে। ডাক্তাররা অনেকবার বলেছেন আমার ভয়ের কোন ভিত্তি নেই; ওটা সাইকোলজিকাল। বিয়ে করলেই ভয় কেটে যাবে। আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। ময়লার ভয়টা পরে এসেছে। এক বন্ধু আমার প্রাথমিক ভয় ফাটাবার জন্যে আমাকে খারাপ পল্লীর এক বর্ষিয়সী রমণীর কাছে নিয়ে যায়। আসল ভয় ফাটাবার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হই। সেই দিন থেকে ময়লার ভয় আমাকে পেয়ে বসে। সেই থেকে নারীদেহের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মায়। তবে বিয়ে করলাম কেন? পেছনে একটু ইতিহাস আছে। একজন হোমিওপ্যাথ বন্ধু আমাকে বোঝান যে 'প্লেটোনিক লভ'-এর মাধ্যমে আমার ইন্দ্রিয়জ ভালবাসা জাগিয়ে তুলতে হবে। এ কোথায় এমন মেয়ে পাওয়া যাবে যে 'প্লেটোনিক লভ' পেয়ে তৃপ্তি থাকবে? দৈবক্রমে ব্যাঙ্কে একটি মেয়ের সংগে পরিচয় ঘটল। যাকে দেখেই মনে হল এতদিনে বোধ হয় সেইরকম মেয়ের সন্ধান পেয়েছি। কয়েকদিন মেলামেশার পর বুঝলাম বীথি অন্যজাতের মেয়ে। মনে হল বাস্তব জগতের বাসিন্দা নয় কল্পলোকে বিচরণ করাই ওর স্বভাব। ঠিক আমি যা চাই সব কিছু পেলাম ওর মধ্যে। বিয়ের মাধ্যমে শুধু আত্মিক মিলন ঘটবে কোনদিন আমাদের সম্পর্ক ক্লেদসিক্ত কলুষিত হবে না—এই শর্তে আমাদের বিয়ে হল। মাসখানেক আমি ঠিক ঠিক শর্ত মেনে চললাম। কিন্তু এর মধ্যেই আমার 'প্লেটনিক লভ'-এর মধ্যে ইন্দ্রিয় লালসা অনুভব করতে লাগলাম। ফলে 'মাইসোফোবিয়া' বাড়তে লাগল। স্ত্রীকে কিছু জানাইনি। ডাক্তার বন্ধু বললেন 'কনসামেশনের' সময় এসেছে 'বি বোল্ড এ্যান্ড এ্যাসার্টিভ ইনোবসেলফ'। ময়লার ভয়ের সংগে তখন আর এক নতুন ভয় দেখা দিল বীথির কাছে সম্মান হারাবার ভয়। মনে হল বীথিকে ফুলবাগীর বেশে দেখলে বন্ধুরা আমাকে আর 'কনসামেশনের' ব্যাপারে উত্তেজিত করবে না। তাই একদিন ওকে আমাদের ফুলের বাসরে নেমন্তন্ন করি। সংগে এল আর একজন বন্ধু সেই পতিতালয়ের মেয়েটি আমাকে পুরোপুরি অধিকার করে বসবে। সেই কাল সন্ধ্যা থেকে আমাদের ফুলের বাসর উঠে গেছে। আমি কাছে গেলে ও চিৎকার করে ওঠে তার পরই অজ্ঞান হয়ে যায়। কিছুদিন আগে ওর মা এসে ওকে দেশে নিয়ে গেছেন। আমার মায়ের পীড়াপীড়িতে ওকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছিলাম কিন্তু আমাকে দেখেই ওর ফিট হতে থাকে। ওর মা আমাকে অপমান করেই ওদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। 'প্লেটোনিক লভ' 'সেনসুয়াল লভ' দুই হারিয়ে এখন আমি দেউলে হয়ে গেছি।

প্রেম ও কাম সম্পর্কে ছোটখাটো একটা বক্তৃতার পর বিক্রমকে বিদায় দিলাম। মিসেস রায় বিক্রমের আগমনবার্তা শুনে খুসী হলেন না। বীথির অসুখ সারাতে বিক্রমের সহায়তার প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করলেন না। বাদী প্রতিবাদী দুইপক্ষের মামলা এক উকিল করতে পারে না—এই কথার উল্লেখ করে আমাকে বোঝাতে চাইলেন যে আমার পক্ষে বিক্রমের চিকিৎসার ভার নেওয়া নীতিবিরুদ্ধ। আমি অবশ্য তাঁর সংগে একমত হলাম না। ইতিমধ্যে বীথির ফিট বারে ও তীব্রতায় অনেক কমেছে। শান্তভাবে সে আমার কথা শুনতে ও বুঝতে পারছে প্রেম বিবাহ দেহের মিলন ইত্যাদি সম্পর্কে তার বাস্তব জ্ঞান কিছুটা বেড়েছে। অপরিণত মন কল্পলোক থেকে বাস্তবজগত বিচরণের উপযুক্ত হয়ে উঠছে। বিক্রমের অসুখের কথা ও তার আগের ইতিহাস ধীরভাবে শুনল এবং মনে হল বিশ্বাসও করল। বিক্রমের 'মাইসোফোবিয়া' সারবে কিনা জানতে চাইল। আমি উত্তরে জানালাম তারা দুজনে যদি পরস্পরকে ঠিক মত বুঝতে পারে ও অন্তত কিছুটা বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে তবে দুজনেই সুস্থ হয়ে উঠবে।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

উপন্যাস

মোহিনী আড়ুম

চিত্তরঞ্জন মাইতি

।।২।।

প্রেমা, তুমি তো জান চিরদিনই আমি পুরস্কার আর প্রশংসাপত্রের আওতা থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছি। তাই জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের পুরস্কার বিতরণী সভাতেও আমি যোগ দিতে পারলাম না। নাচ সম্বন্ধে তাঁদের আগ্রহকে আমি শ্রদ্ধা করি কিন্তু পুরস্কার ব্যাপারটাকে কোন দিনই নয়। ঐ যে গোঁয়ো মানুষটি তুলাল নেচে গেল, দেখেছ তার চোখ আর হাত-পায়ের কাজ? আমার পাশে যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের সারাক্ষণ আমি ওকে নিয়ে চাপা গলায় কৌতুক করতে দেখেছি। আমি জানি এই সমস্ত শিল্পী সমাবেশের ভেতর ঐ লোকটিই শ্রেষ্ঠতম শিল্পীর সম্মানের অধিকারী। কিন্তু এও আমার অজানা নয় অজস্র নামী ফুলের মেলায় ও পাতার আড়ালেই থেকে যাবে।

গুরু পানিক্করকে প্রণাম, তিনি এমন এক প্রতিভাকে খুঁজে বের করে এনেছেন দারুচিনি বনের ভেতর থেকে। হ্যাঁ দারুচিনি বনই তো। ইডিক্কির মুনাবে দারুচিনি আর এলাচ বনে লোকটি কাজ করে। বৃত্তিতে একেবারে বনশ্রমিক। লোকটির সংসারে পোষ্য অনেকগুলি, তাই সংসার চলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। তবু লোকটা সদানন্দময়। দুঃখকে ভুলতে জানে। ওযে অনেক বড় সম্পদ পেয়েছে। নাচের আনন্দে ওর সব দুঃখ ভেসে যায়।

এসব খবর আমি লোকটির কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছি।

পুরস্কারবিরতণী সভায় ও হয়ত বসার একখানা আসন পাবে। পুরস্কার প্রাপককে সকলে দেখাদেখি ও হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাবে। তারপর ওর পাহাড়ী পল্লীতে ফিরে গিয়ে চাষী বন্ধুদের কাছে অনুষ্ঠানের গল্প করবে। যারা পুরস্কার পেয়েছে তাদের প্রশংসা করবে শতমুখে। তার চেয়ে যে সবাই গুণী একথা ভেবে মনে মনে লজ্জা পাবে। কিন্তু পুরস্কার না পাবার জন্যে কোন ক্ষোভ থাকবে না তার মনে। কারণ সে জানে না কত বড় সম্পদ সে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে নিজের মধ্যে।

গুরু পানিক্করের সঙ্গে বোধ হয় তোমার দেখা হয় নি। তিনি তোমার নাচের আন্তরিক তারিফ করছিলেন। আমার সঙ্গে উনি একমত যে তুমি নাচের ভাষা বোঝ, নাচের সঙ্গে লীন হয়ে যেতে জান। সবাই জানেন, তুমি মাধবী আম্মার ছাত্রী। তাহলেও গুরু পানিক্করই এই সরকারী আয়োজনের উদ্যোক্তা। যদি পার ওঁর সঙ্গে দেখা কর। তাছাড়া যথার্থ গুণী আর সমঝদার যে কজন মানুষ এখনও দেশে রয়েছেন, তাঁদের শীর্ষে আছেন এই নিরভিমান বৃদ্ধ গুরু পানিক্কর।

অনেক কথা লিখে ফেললাম। কলাকেন্দ্রমে যে কটা বছর একসঙ্গে কাটিয়েছিলাম, সেদিনগুলো হঠাৎ পুরনো পাতার মত আমার চোখের সামনে একটা দমকা হাওয়ায় নাচের খেলা দেখাতে দেখাতে উড়ে এল। তাই সতীর্থকে এতবড় একখানা চিঠি লিখে বসলাম। তুমি জান, আমি ভবঘুরে, তাই ঠিকানা দিতে পারি না কাউকে। শুধু গুরু পানিক্করকে মাসের ভেতর একবার এসে প্রণাম করে যাই।

দেবন।

প্রেমা চিঠিখানা দুবার করে পড়ল। বিশেষ বিশেষ জায়গায় কয়েকবার করে পড়ে পড়ে আবৃত্তি করল। তার হোটেলের স্যুটে বেয়ারা এসে চিঠিখানা দিয়ে যাবার পর থেকেই প্রেমা বিভোর হয়ে আছে। দেবন তাকে চিঠি লিখেছে, এ যেন ভাবাই যায় না। দিবন চিরদিনই কম কথা বলে, তন্ময় শিল্পী। অনুষ্ঠানের ব্যাপারে দু-একবার দেখা হয়েছে মাত্র। অনুষ্ঠানের দু দিন পরে জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের যে টি-পার্টি আর পুরস্কার বিতরণী সভা হবে তাতে সে দেবনকে ধরবে, আর নিয়ে আসবে তার হোটেলে, এই ছিল তার পরিকল্পনা। কদিন নাচের ব্যাপারে ঘোরের ভেতর কেটেছে। তাই দু-একবার দেখা হলেও নিভৃতে আলাপের সুযোগ হয়নি। কিন্তু সব প্ল্যান ভেস্তে গেল দেখে প্রেমার কেমন যেন কান্না পেল। কেন সে অনুষ্ঠানের ফাঁকে বলে রাখল না দেবনকে যে সে যেন চলে যাবার আগে একটিবার তার সঙ্গে দেখা করে যায়।

প্রেমা চিঠিটা হাতে নিয়ে চুপচাপ বসে রইল। খোলা চুলে চিরুণী চালাচ্ছিল সে। চিরুণীটা আটকে রইল চুলের ভেতর। হারিয়ে যাবার দুঃখকে আকুল হয়ে অনুভব করতে লাগল।

কলাকেন্দ্রমের মঞ্চে ও প্রথম যেদিন দেবনকে দেখেছিল সেদিনের কথা মনে পড়ল। মহাভারতের পাতা থেকে যেন মহাবীর কর্ণ নেমে এসেছে।

সারা শরীরে সুবর্ণের শান্ত আর সৌন্দর্যের দীপ্তি। গুরু বালকৃষ্ণ একটি একটি করে নাচের মুদ্রা শেখাচ্ছিলেন তরুণ ছাত্রদের। প্রেমা তার বান্ধবীদের নিয়ে বসেছিল দর্শক আসনে। নিজের ক্লাশ না

থাকলে যে কোন ক্লাশে এসে বসার অধিকার ছিল ছাত্রছাত্রীদের।

গুরু বালকৃষ্ণ একটি মুদ্রা ফুটিয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গেই দেবন তার অবিকল অনুকরণ করে গুরুকে অবাক করে দিচ্ছিল।

নদী বইছে। বালকৃষ্ণ দেখাচ্ছেন। দেবন সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহে তরঙ্গ তুলে হাতের মুদ্রায় বয়ে চলা নদীর ভাবটি অবিকল ফুটিয়ে তুলল।

হাতি চলেছে। গুরুর সঙ্গে সঙ্গে দেবন অভিজাত পদক্ষেপে পরিক্রমা করতে লাগল সারা মঞ্চ। মাথার দুলুনিতে, প্রসারিত হাতের সঞ্চালনে শুঁড় উঁচিয়ে যেন চলেছে দুই হস্তী আগে পিছে।

ফুল ফুটছে। কুঁড়ি পাপড়ি মেলে জাগছে। দুটো হাত দেবনের পদ্মের মুদ্রায় বাঁধা। চোখ মুখ স্থির হয়ে আছে সেই করপদ্মের ওপর। হঠাৎ কেঁপে উঠল হাত থরথর করে। একটি একটি করে পাপড়ি মেলছে পদ্মকলি। চোখে মুখে সেই ফুটে ওঠার আনন্দ ভোরের রোদের মত ছড়িয়ে পড়েছে। ফুল কুঁড়ির বাঁধন খুলে যখন পূর্ণ বিকশিত হল, তখন দেবনের সারা শরীর আনন্দে, রোমাঞ্চে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

ভ্রমর উড়ে আসছে ফুলের সন্ধান পেয়ে। দেবন হাওয়ায় ভাসিয়ে দিচ্ছে হাত। তারপর আঙুলের মুদ্রায় ভ্রমরকে উড়িয়ে আনছে ফুলের ওপর।

এত স্বাভাবিক আর এমন চার্মিং দেবনের কাজ যে দেখতে দেখতে প্রেমার মনে হত, সে ফোটা ফুলের গন্ধ পাচ্ছে। চোখে দেখছে ভ্রমরের উড়ে আসা, কানে শুনছে তার গুঞ্জনগান।

পাঠ শেষ হলে গুরু বালকৃষ্ণ ছাত্রদের বলতেন, তোমরা দেবনকে অনুকরণ করবে।

দেবন কিন্তু মুখ নীচু করে একেবারে মঞ্চপীঠের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। সংকোচের মূর্তিখানাও তার কত সুন্দর। প্রেমা উঠে আসত, কিন্তু তার মনের মধ্যে আঁকা হয়ে যেত দক্ষ শিল্পী দেবনের সসংকোচ ছবিখানা।

দেবনদের যখন ক্লাশ থাকত না তখন ওরাও আসত প্রেমাদের অনুশীলন দেখতে। প্রেমার মনে হত, সে যার প্রতীক্ষায় নিজেকে সাজিয়ে তুলেছে সেই প্রেমিক পুরুষ আজ এসেছে তার কাছে। প্রেমার নাচের মুদ্রায় তখন দুঃখ সুখের ঢেউ উঠত। তিলানার প্রুতলয়ে সে যেন হার থেকে খসে পড়া মুক্তোর দানার মত সারা স্টেজে ছড়িয়ে পড়ত। তার হাস্যে লাস্যে, আমন্ত্রণ মুদ্রায় দর্শকদের সে বিহ্বল করে দিত।

প্রেমার নাচ শেষ হলে কখনো বা দেবন দিত করতালি। মাধবী আম্মা মঞ্চের ওপর থেকে দর্শক আসনের দিকে কঠিন শাসনের চোখে তাকাতেন। তিনি চাইতেন না, শিক্ষা চলাকালে তাঁর কোন ছাত্রী দারুন রকম প্রশংসা পাক। তাঁর মতে এতে দুটো অসুবিধের মুখোমুখি হতে হয়। তরুণ শিক্ষার্থীর মনে অহংকারের বিষ ঢুকে যেতে পারে, আবার সতীর্থরা নিজেদের হীন মনে করতে পারে। তাতে নাচের উন্নাদনায় ভাটা পড়ারই সম্ভাবনা।

গুরু বালকৃষ্ণ ও গুরু মাধবী আম্মার ভাবনার ভেতর ওরা লক্ষ্য করত এমনি ছোটখাট কত পার্থক্য।

গুরু বালকৃষ্ণ যে ছাত্রকে অনুশীলন চলার সময়ে সকলের সামনে শাসন করতেন তাকেই আবার নাওয়া খাওয়া ভুলে শেখাতেন নাচের কঠিন মুদ্রাগুলো।

রাত চারটের সময় ছাত্রাবাসে এসে ঐসব পিছিয়ে পড়া ছেলেদের হাঁকডাক দিয়ে তুলতেন। সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে যেতেন সমুদ্রের ধারে। বলতেন দেখ নারকেল গাছটা কেমন দুলছে। পাতাগুলো কেমন থরথর করে কাঁপছে। দেহটাকে এমনি করে দোলাবি, দরকার হলে পাতার মত শিউরে উঠবি থরথর করে।

ঐ দেখ, সমুদ্রে ঢেউগুলো কেমন প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে একের পর এক আছড়ে পড়ছে তীরে। ফুঁসছে, ফেনিয়ে উঠছে। কথাকলিতে দুজনে যখন যুদ্ধ করবি, তখন এমনি ফুঁসবি, এমনি প্রতিপক্ষের ওপর আছড়ে পড়ার ভঙ্গী করবি।

অন্যদিকে মাধবী আম্মাকে ছাত্রীরা দারুন সমীহ করত। কেউ নিষ্ঠা হারালে তিনি চেঁচিয়ে বকুনি দিতেন না। কিন্তু এমন কঠিন চোখে চেয়ে থাকতেন যা কারো পক্ষেই সহ্য করা সম্ভব হত না।

তিনি বলতেন, মোহিনী আট্টম লাস্য নৃত্য। সারা অঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে হবে চটুল চঞ্চল ভাব, কিন্তু নিজের মনকে কোন দিন চঞ্চল করতে নেই। নিজে স্থির থেকে সমস্ত দর্শক চিত্ত চঞ্চল করে টানতে হবে নিজের দিকে। তবেই শিল্পীর সিদ্ধি লাভ।

প্রেমা তাঁর কাছেই থাকত। মাধবী আম্মা যে প্রেমার মায়ের বান্ধবী ছিলেন একথা কেউ কোন দিন শোনে নি গুরু মাধবী আম্মার মুখ থেকে। কোন ছাত্রী কোনদিন দেখেনি মাধবী আম্মা প্রেমার ওপর অতিরিক্ত নজর দিচ্ছেন। সকলে জানত প্রেমার থেকে তারা অনেক পেছনে পড়ে, প্রেমার সঙ্গে তাদের তুলনাই চলে না। কিন্তু মাধবী আম্মার আচরণে মনে হত, যে কেউ নিষ্ঠার সঙ্গে নাচ শিখলে প্রেমা হতে পারে। চাই কি তাকে অতিক্রম করেও যেতে পারে। মাধবী আম্মা কঠিন শিক্ষাগুরু, কিন্তু সকলে জানত শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি সমদর্শিনী।

এক ছুটির সন্ধ্যায় কলাকেন্দ্রম থেকে গাড়ীতে করে কোডালমে নিজের বাড়ীতে ফিরছিল প্রেমা। পনেরটি দিনের অবকাশ যাপনের জন্যে মন উৎসুক। ড্রাইভারকে ছুটি দিয়ে নিজেই চালাচ্ছিল গাড়ী। হোস্টেলের ছাত্রছাত্রীরা প্রায় সকলেই চলে গিয়েছিল। মাধবী আম্মাও কদিন আগেই চলে গেছেন ত্রিচুরে কোন এক আত্মীয়ার বাড়ী।

সন্ধ্যার সমুদ্রের ঢেউয়ের মত পথঘাট প্লাবিত করে জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে। প্রেমা তার গাড়িখানা উড়িয়ে নিয়ে চলেছে কোভালমের পথে। হঠাৎ রাস্তার এক জায়গায় এসে গাড়ীটা দাঁড়িয়ে গেল ব্রেক কষে। একটি লোক রাস্তার প্রায় মাঝখান দিয়ে হেলতে দুলতে চলছিল। মাথায় একটা বাকস।

গাড়ীটাকে হর্ণ বাজিয়ে ব্রেক কষতে দেখেই লোকটি পায়ে পায়ে সরে গেল রাস্তার ধারে।

গাড়ী থেকে মুখ বের করে প্রেমা ঝাঁঝিয়ে উঠল, মাতাল নাকি, পথ চলতে জান না?

লোকটি যেন গালাগাল গায়েই মাখে না, এমনি নির্বিকারে সে রাস্তার ধার ঘেঁষে চলতে লাগল।

দারুন রাগ হল প্রেমার। লোকটা অন্যায়ের জন্য কোথায় অনুতপ্ত হবে, তা না উল্টে উপেক্ষা করে যেন চলতে লাগল।

প্রেমা গাড়ীখানা একেবারে তার পাশে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বলতে গেল কালা নাকি? কিন্তু গলার স্বর গলাতেই থেকে গেল। সে তাড়াতাড়ি গাড়ীর দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল লোকটির মুখোমুখি।

দেবন! আশ্চর্য!

দেবন ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, তোমার গাড়ীর তলাতেই তাহলে পড়তে যাচ্ছিলাম বল?

প্রেমা বলল, আরে ওঠ ওঠ, কথা হবে পরে।

দেবন বলল, দূর, তোমার গাড়ীতে এখন কে চড়তে যাচ্ছে। হুস্ করে গাড়ী বেরিয়ে যাবে। আমি চাঁদের এমন সুন্দর আলোটাকে গায়ে মেখে নিয়ে পথ চলতে পারব না।

প্রেমা বিমর্ষ হয়ে গেল। বলল, এমনি পায়ে হেঁটে যদি চল তাহলে তো তোমার বাড়ী পৌঁছতে কম সে কম তিনদিন লাগবে।

দেবন বলল, তিনদিন কেন, পাঁচদিন লাগলেও ক্ষতি কি? ছুটি তো পনের দিনের। কি করব সাততাড়াতাড়ি বাড়ী ঢুকে। তার চেয়ে হাটে বাজারে, পথেঘাটে সংসার পেতে পেতে চলব।

একটু থেমে বলল, পারে চলে চারদিকটাকে দেখে দেখে যাবার মত আনন্দ কোথায় পাওয়া যাবে প্রেমা। চোখ কান খোলা রেখে যত হাঁটবে, ততই রোমাঞ্চ। পথে পথে হাজারো অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হবে।

দেবনের কথাগুলো খুব ভাল লাগল প্রেমার। তার মনে হল, সারা রাত সে

দেবনের সঙ্গে এমনি করে হেঁটে হেঁটে মাঠ-ঘাট, বন পাহাড় পেরিয়ে চলে যাবে। নীল সমুদ্রের বুকে চাঁদের অজস্র অভ্রকুচি ছড়িয়ে দেবার খেলা দেখতে দেখতে, নারকেল গাছের পাতার কাঁপন বুকের ভেতর ভরে নিতে নিতে, কায়েলের পাশ দিয়ে কখনো বা নরম বালিতে পা ডুবিয়ে সে চলবে দেবনের সঙ্গে। দেবনের বাকসটাকে সেও মাথায় তুলে নিয়ে পথ চলবে কিছুক্ষণ। কি আশ্চর্য রোমাঞ্চ আছে এ ধরনের পথ চলায়। একেবারে জিপ্‌সী মেয়ে-পুরুষের মত। ঘর বাঁধার ঝক্‌কি নেই। শুধু পথ চলার আনন্দ।

—কি ভাবছ, বলল দেবন।

চমক ভাঙ্গল প্রেমার। সারা শরীরে একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সে যেন থেমে গেল।

প্রেমা বলল, না, তেমন কিছু নয়। এই তোমার পথ চলার কথাই ভাবছিলাম।

দেবন বলল, আর ভেবে কাজ নেই, চটপট উঠে পড় গাড়ীতে। এমনি রাত হয়ে গেছে, অনেক দেরী হয়ে যাবে কোভালম্‌ পৌঁছতে।

প্রেমা অনুযোগের সুরে তুলে বলল, এমন করে তাড়িয়ে দিচ্ছ কেন বাবা?

দেবন হেসে ফেলে বলল, পথটা কি আমার একার যে আমি একাই ভোগ করব। তবে কেউ পথের ওপর জোর কদমে চলে আনন্দ পায়, কেউবা ধীর কদমে। আমি ধীরে চলতেই ভালবাসি প্রেমা।

প্রেমা কথান্তরে গেল, তোমার কি নিজের বাড়ীর ওপর কোন টানই নেই?

থাকবে না কেন! বলল দেবন, তবে বাবাও চিরকাল ভবঘুরে, ছেলেও তাই। মায়ের একা ঘরে থেকে থেকে অভ্যেস হয়ে গেছে। এখন আমরা রুটিন ধরে কাজ করতে গেলেই মায়ের কেমন অস্বস্তি লাগে।

প্রেমা বলল, তোমরা ক'ভাই বোন? দেবন বলল, তুমি আবার বংশপঞ্জী নিয়ে বসলে যে। আমি একমেবাদ্বিতীয়ম্‌।

প্রেমা বলল, বাবা এখন কি করছেন?

দেবন বলল, ঘরে বসে বই লিখছেন।

প্রেমা বিস্ময়ের সুরে বলল, বই! কিসের বই?

দেবন বলল, বাবা আরথ্রাইটিসে প্রায় পঙ্গু হয়ে ঘরে বসে আছেন। দীর্ঘ জীবনে নাচের সন্ধানে সারা দেশের আনাচে-কানাচে ঘুরে ঘুরে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তাই নিয়ে বই লিখছেন।

প্রেমা বলল, তোমার বাবা কি নাচতেন?

না, বলল দেবন।

প্রেমা বলল, তাহলে যে শুনেছিলাম, তুমি নৃত্যশিল্পীদের বাড়ীর ছেলে।

দেবন বলল, বাবা কেরালার সব রকম নাচের উৎপত্তি আর অগ্রগতি নিয়ে সারা জীবন চর্চা করেছেন, কিন্তু নিজে নাচেন নি কখনও। আমার ঠাকুর্দা, তাঁর বাবা, সবাই ছিলেন নাচিয়ে। সেদিক থেকে বলতে পার আমি নাচিয়েদের বাড়ীর ছেলে।

(ক্রমশ)

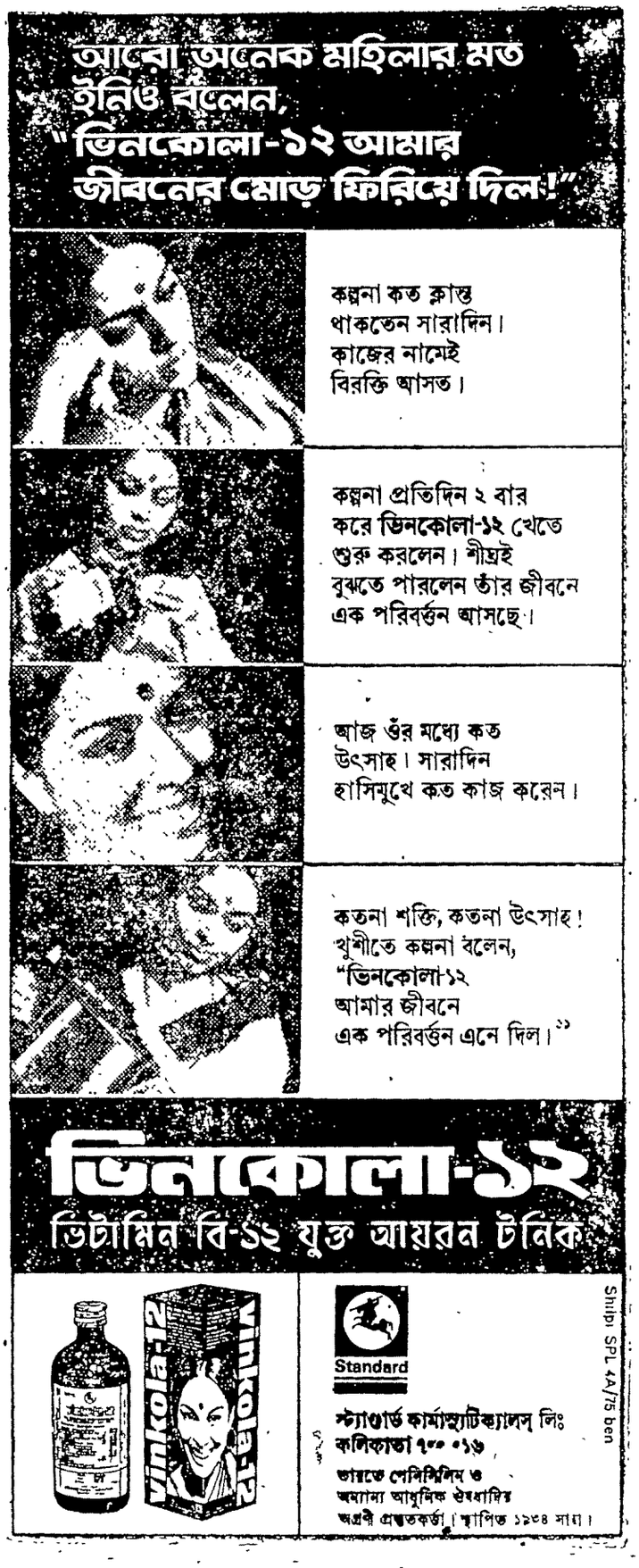

নতুন বই

স্বাধীনতা আন্দোলনে আদিবাসীদের ভূমিকা—গোপীনাথ সেন। আদিবাসী কল্যাণ সমিতি। ৩৩-বি তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রীট। কলকাতা-৭০০০০১। দাম সাত টাকা।

ইংরেজ শাসন বিস্তারের প্রারম্ভ থেকেই বিভিন্ন ধরনের বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহ চলছিল সারা ভারত জুড়ে। সেসব বিদ্রোহের লক্ষ্য ব্যাপকার্থে ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধেরই অঙ্গ। আদিবাসীদের ভূমিকা ছিল সেক্ষেত্রে অগ্রণী। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে আদিবাসীদের ভূমিকা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তারই মূল্যায়ণ করেছেন শ্রীগোপীনাথ সেন! সাঁওতাল, চুয়াড়, টানা ভকৎ আন্দোলন, দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী বিদ্রোহ, মুণ্ডা-বিরসা - নায়্যা - স্যাওড়া - কোল - ভীল বাস্তার-ওয়ারলী বিদ্রোহ এবং দক্ষিণ ভারত আসাম ও উড়িষ্যার আদিবাসীদের বিদ্রোহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার লিখেছেন যে আদিবাসী সংগ্রামীদের '...কোন ইতিহাস নেই, অথবা আদি বাসীদের বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের কাহিনী আজও অজ্ঞাত'—এই বক্তব্যটি সম্ভবত সঠিক নয়। কারণ, অনেক আগেই ভারতের কৃষক আন্দোলন ও বৈপ্লবিক সংগ্রাম সম্পর্কে ২খানি বই লিখেছেন শ্রীসুপ্রকাশ রায়। এই গ্রন্থে আদিবাসী সংগ্রামের আলেখ্য যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু শ্রীসেনের গ্রন্থপঞ্জিতে সে বই দুটির উল্লেখ পর্যন্ত নেই।

গ্রহশক্তি। হরিদাস ভট্টাচার্য। তান্ত্রিক আশ্রম। ৫।২৯, ডি গুপ্ত লেন। কলকাতা-৫০। দাম চার টাকা।

গ্রহের শক্তি অপরিসীম। তারই নিয়ন্ত্রণে জাগতিক অনেক কিছুই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। মানুষের চরিত্র কার্যকলাপ এবং গতি-প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে গ্রহের প্রভাব এবং শক্তি অনিবার্য। 'গ্রহশক্তি' গ্রন্থে হরিদাস-বাবু 'গ্রহ' সম্পর্কিত অনেক জটিল বিষয়ের সহজ আলোচনা করেছেন। 'জন্মলগ্ন' অবস্থানভেদে 'গ্রহবল নির্ণয়', 'গোচরফল' 'দশা বিচার' 'নিত্য দশা' 'ষোটক বিচার' 'আয়ুর্বিচার' ইত্যাদি অংশগুলি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আগ্রহী পাঠকের কাছে মূল্যবান মনে হবে।

বাণীরেখা (বাংলা শর্ট হ্যান্ড) : সুরেন্দ্রলাল রক্ষিত : বাণী রেখা প্রকাশন কার্যালয়, ২১এ, গোকুল বড়াল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২ : মূল্য-১২-৫০।

অধ্যাপক রক্ষিত পিটম্যানের আদর্শ অনুসরণে সম্প্রতি যে বাংলা 'বাণী রেখা' বইটি রচনা করেছেন সেটি তাঁর দীর্ঘ নিরীক্ষা ও গবেষণার ফল। বাংলা ভাষার ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের দিকে তিনি সর্বতোভাবে লক্ষ্য রেখেছেন; স্বরবর্ণের ব্যবহার যৌগিক স্বরের ব্যবহার, বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দুর বিশেষ ধ্বনিব্যঞ্জনা, ব্যঞ্জন বর্ণের সংযুক্ত ধ্বনি প্রভৃতির ক্ষেত্রে ইংরাজি ভাষার সঙ্গে বাংলার তথা নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা সমূহের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অধ্যাপক রক্ষিত সেই পার্থক্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই বাণী রেখার সূত্রগুলি নির্ধারণ করেছেন; একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিত প্রদানের পর স্বল্প পরিসরে (১১১ পৃষ্ঠায়), দশটি পাঠের ও ৫০টি সূত্রের মধ্যেমে শিক্ষণীয় বিষয়টি তিনি এমন সহজভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে শিক্ষার্থীরা বাড়ি বসে অভ্যাস করেই বাংলা শর্টহ্যান্ড শিখে নিতে পারবেন।

একা মানুষ (গল্প সংকলন)। ভোলানাথ শীল। সারবান, ৫৬।১এ, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-১। পাঁচ টাকা।

দুটি বড় গল্পের সংকলন ভোলানাথ শীল রচিত 'একা মানুষ'। নাম-গল্পটি ছাড়া অন্য গল্পটি হল 'উলের সুতো'। মানুষের একাকীত্ব বোধ আগেও ছিল, এখনো আছে। একা হওয়াটা কখনো দার্শনিকতা, কখনো বা শূন্য বিলাস। নিঃসঙ্গ, নির্জন মনের কথাকে ভোলানাথবাবু হরপ্রসাদের নামের এক প্রৌঢ় মানুষের মনের আয়নায় নানাভাবে প্রতিফলিত করে দেখিয়েছেন। তার মৃতা স্ত্রী, দুই মেয়ে মীরা, শোভা আর তিন ছেলে হারু, সত্য, রণেন—এমন অপত্য ও হার্দ্য সম্পর্কের স্মৃতি, সত্তা, সঙ্গ—সব কিছুর মধ্যেও তিনি একা হয়ে যান। সুজয়ের সঙ্গে তাঁর যোগ ঘটে। সমস্ত কিছুর মধ্যে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ভোলানাথবাবু বড় গল্পের শেষ টেনেছেন। 'উলের সুতো' গল্পে আছে নায়ক সুব্রত, নায়কের বৌদি ও বাঁদির বোন সুমা। বৌদির বোনের প্রতি নায়কের প্রেম-ভাবনা এ গল্পে অন্তঃশীল কাহিনী হয়ে ওঠে। সমস্ত সংস্কার মুক্তির কথা সুব্রত-সুমার ভালবাসার উপান্তে লেখক জানিয়েছেন। ভোলানাথ শীলের লেখার ভাষা তাঁর শক্তি। পাঠকদের মুগ্ধ করে না, আফিঙের নেশার মত আবিষ্ট করে না, গল্পকথার মূলে নিয়ে গিয়ে ভাবায়।' 'একা মানুষ'-এ তার পরিচয় আছে।

কাব্য সুষমা। ইন্দু দাঁ। কবি নিবাস—'মমতা'। ৫৯ পারমার রোড। ভদ্রকালী। উত্তরপাড়া। হুগলী। দশ টাকা।

কোন জটিলতার ভিতর না গিয়ে সহজ ভঙ্গিতে কবি তাঁর কাব্যভাবনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটিয়েছেন। শব্দ ব্যবহারে দুর্বোধ্যতা সৃষ্টির প্রয়াস নেই। নেই অনাবশ্যক চমক লাগানোর চেষ্টা। দুটি 'সাদা জুঁই', 'তোমার তরে', 'ঠাঁই ভিক্ষা', 'চিরন্তন আশা', 'সাগরের ডাক', এ সংকলনের ভালোলাগার মত কবিতা। ছাপা এবং প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন।

রকমারি গল্প—বন্দনা গুপ্ত। শৈব্যা পুস্তকালয়, ৮।১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। পাঁচ টাকা মাত্র।

শিশুদের জন্যে এই গল্পগ্রন্থটিতে মোট ১৫টি গল্প আছে। ভূতের, বোকার, রাজকন্যার শেয়ালের সবধরনের গল্পই। সরল পরিবেশনের গুণে গল্পগুলি পুরোপুরিই ছোটদের গল্প হয়ে উঠতে পেরেছে। প্রতিটি গল্প পড়তেই ভাল লাগবে। বিশেষ করে 'সেই লম্বা পুলিশ ম্যানটি' 'দুষ্টু বুদ্ধি ও প্যাঁচালো বুদ্ধি' 'এক যে ছিল বোকা গ্রাম' 'যোগ্য পাত্র' গল্পকটি।

গোধূলি লগ্নে বিয়ে। গৌরী গুপ্ত। প্রকাশক—আশুতোষ গুপ্ত। কালিয় প্রকাশনী ২০বি বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা—৯। সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

তিনটি বড় গল্প আছে এই গ্রন্থটিতে। গোধূলি লগ্নে বিয়ে ভালবাসা: পঞ্জিকা। তিনটির মধ্যে প্রথমটির কাহিনীটি একেবারেই গতানুগতিক। পঞ্জিকা গল্পটির কাহিনীটির মধ্যে কিছুটা নতনত্ব আছে। তবে সাধারণ পাঠকের পক্ষে তিনটি গল্পই সুখপাঠ্য হয়েছে। লিখকের লেখার হাতে মুন্সিয়ানা লক্ষ্য করা গেছে।

স্বনামধন্য কবি হিমালয়নির্ঝর সিংহের

প্রথম কবিতার বই

অমিলে মিল

এক মিনিটে পাঠক-পাঠিকার মন কেড়ে নেবে।

দাম : চার টাকা

প্রকাশক : 'অনন্যা প্রকাশনী' পোস্ট বক্স নং ১৬২০২

রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা-২৯

পরিবেশক : বে বুক স্টোর, কলকাতা—১২

অরুণ পুরকায়স্থ

সাহিত্যের নেপথ্যে

ছাপা কাগজ বা কালির দাম বাড়ার জন্যে বইয়ের দাম বাড়লেও তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নি সেভাবেই প্রকাশন সংস্থা চলছে। তবে একটা কথা আমাদের এখানকার প্রকাশকদের কাছে তাঁরা অন্য প্রদেশের দিকে এগোন, তাতে ভীষণ ভালো রেজাল্ট পাওয়া যাবে। হিন্দি সাহিত্যে তো এক্ষুনি যাওয়া উচিত, ওখানে একটা বিরাট মার্কেট পড়ে আছে।

বই পাড়ার প্রতিটি খোপে যে কত কি আজব ঘটনার গল্প আছে তা না শুনলে বিশ্বাসই হোতো না। বিশ্বাস হেতো না যে এই এই গল্প এই এক একটা খুপরি থেকে বেরিয়ে আসবে।

ধরুন না এই 'শ্রীভূমি'র কথা।

আচ্ছা বলুন শ্রীভূমি পাবলিশিং কি সেই অর্থে ততটা পপুলার? প্রায় একই সময়ে তৈরী মিত্র ঘোষ; বেঙ্গল; বাক বা ডি এম কে যেমন সবাই একডাকে চেনেন। সেভাবে কি আমরা শ্রীভূমিকে জানি?

না।

কিন্তু আপনাকে যদি হঠাৎ বলি—এই কলকাতার মাঝখানে বসে শ্রীভূমি আজ পর্যন্ত আড়াইশো অসমীয়া ভাষার গল্প উপন্যাস কবিতা এবং অন্যান্য বই বের করেছেন, বিশ্বাস হবে?

ঃ আড়াইশো? আমিও একটু নড়েচড়ে বসলুম। আড়াইশোটা বই চাট্টিখানি কথা নয়, তাও বের করেছেন একজন বাঙালী যাঁর নাম অরুণকুমার পুরকায়স্থ কথাটা শুনে আমার চোখের মণিদুটো একটু বড় হয়ে উঠলো।

ঃ আপনার জন্মস্থান কোথায় বলুন তো?

—কাছাড়। আমি সিলেটি। কাছাড় অরুণবাবুর শুধু জন্মস্থান নয় পড়াশোনা মানে স্কুলজীবনটাও ওখানে কেটেছে। আসামে প্রায়ই যেতে হয়, ওখানে ব্রাঞ্চও আছে।

দাদাই শ্রীভূমি নামে একটা বইয়ের দোকান করেছিলেন ওখানে। টিমটিম করে চলতো। দাদা কল্যাণকুমার পুরকায়স্থ অবশ্য এখন বেঁচে নেই। দাদার কাছ থেকে হাজার তিরিশ টাকা কলকাতায় নিয়ে এলেন ব্যবসা করার জন্যে। উঠলেন কাকার বাড়িতে। কলকাতায় এসে তখন আর কোথায় উঠবেন। সালটা বোধহয় তখন উনিশশো পঞ্চাশ একান্ন হবে। এসেই অরুণবাবু হাত দিলেন স্কুল-পাঠ্যপুস্তকে। বাজার তখন হাতে আসবে কিংবা এসে গেছে। ১৯৬০ সাল নাগাদ বের করলেন—অসমীয়া ভাষার গল্প উপন্যাসের বই।

ঃ বাংলার আগে?

—হ্যাঁ

ঃ কেন?

—কারণ আমরা দেখলাম আসামে প্রকাশনার ব্যাপারটা দুর্বল এবং যেহেতু লোকসংখ্যা সীমিত এবং প্রতিযোগীর সংখ্যা কম তখন পুরো বাজারটা মোটামুটি আমাদের এক্তিয়ারে থাকবে বলে একটা ধারণা ছিল। ফলে পুরো ব্যবসাটা শ্রীভূমির আসামকেন্দ্রিক হয়ে গেল। এছাড়া আমরা দেখলাম অসমীয়া ভাষায় বই বের করে শিক্ষিত সমাজের কাছে সে বই পৌঁছে দিতে গেলে সাহিত্য পত্রিকাকে মাধ্যম করতে হবে। কারণ সাহিত্য পত্রিকা যাঁরা পড়েন, বই কেনাবেচা প্রায় ৭৫।৮০ ভাগ তাঁদের মধ্যেই হয়ে থাকে। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে একটা সাময়িক পত্রিকা বের করতে হবে এরকম একটা প্ল্যান নিলাম। এবং বেরুলো অসমীয়া ভাষার সাহিত্যপত্র আমার সম্পাদনায়— 'আমার প্রতিনিধি' এখন এই পত্রিকা আসামে একটা চালু পত্রিকা। ডঃ ভূপেন হাজারিকা যার বর্তমানে সম্পাদক।

ঃ পত্রিকাও চলছে এখান থেকে?

—নিশ্চয়ই। ওই দেখুন না, অফিস দুজন সাব এডিটার; প্রুফ বিভাগ; কর্মচারীবাবী নিয়ে পুরোদস্তুর একটা পত্রিকার দপ্তর। মহাত্মা গান্ধী রোডের মোড়ে বইপাড়ার প্রাণকেন্দ্রে ফোনটোন নিয়ে নিয়মিত একটা অসমীয়া সাহিত্য পত্রিকা। বেরিয়ে যাচ্ছে। আমরা কি কখনো তার খোঁজখবর পেয়েছি।

শ্রীভূমির হাজার হাজার অর্ডার ফর্ম চলে যাচ্ছে লাইব্রেরী বুকস্টলে।

ঃ কিরকম বিক্রি হচ্ছে?

—কোনো বই-ই আমাদের মুদ্রণ পড়ে থাকে না। আমাদের আবার প্রথম মুদ্রণ মানে ১১০০ নয়। তিন হাজারের কমে আমরা কোনো বই ছাপি না প্রতিটি লাইব্রেরী থেকে আমাদের বলেই দেওয়া হয়েছে যে অপনাদের যা বই-ই বেরোক আমাদের এত কপি করে বই পাঠাবেন। সুতরাং বই বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে প্যাকেটটাকেট হয়ে প্লেনে ট্রেনে চলে যায়। লেখক আমরাই নির্বাচন করি।

ঃ যে কোনো লেখক?

—হ্যাঁ, তবে যে কোনো লেখক হলেও তাঁর বই বাজারে কি রকম চলবে এ ব্যাপারে

আমরা একটা সার্ভে করে নিই। তাকে আমরা বাজারটা বুঝতে পারি।

সার্ভে? মানে বই বিক্রির সমীক্ষা?

হ্যাঁ এটা আমার বিদেশ থেকে শিখে আসা। ১৯৬৪ নাগাদ ইউ এস অই এস-এর লিটেরারী একসচেঞ্জ প্রোগ্রামের ভিত্তিতে আমি আমেরিকা যাবার আমন্ত্রণ পাই। বিদেশে গিয়ে স্বভাবতই ওঁদের বই ব্যবসা সম্বন্ধে খানিকটা আইডিয়া নিয়ে আসার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু যা পেলাম তা অভাবনীয়। পুস্তক প্রকাশকের সম্মান, তাঁদের কাজকর্ম বই সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞতার রূপায়ণ দেখে আমার আর চোখের পলক পড়ে না। যেখানে যাই সেখানেই অজস্র শেখার ব্যাপার। আমি নামীদামী প্রায় সব পুস্তক প্রকাশকের একেবারে অন্দরমহলে গিয়ে ঢুকেছি. ....।

কোন প্রকাশক?

—তা ধরুন ..... ম্যাগ্রো হিলস: ডবল্ডে; অ্যাকাডেমিক এইসব নামীদামী প্রকাশক সংস্থায় গিয়ে দেখেছি ওঁরা একটা বইয়ের পেছনে কি সুন্দর প্ল্যানিং-এ এগোয়। ধরুন ৫ বছর পরে কি বই বেরুবে —তার পরিকল্পনা ৫ বছর আগে. কিভাবে হয় দেখুন। ধরুন কোনো একজন লেখকের একটা বই বেরুবে। প্রথমে সেটা দেখে নেওয়া হোলো ক' পাতার হবে। পাতা বাড়লে বা কমলে লেখককে বলে তাকে নির্দিষ্ট সংখ্যক পৃষ্ঠার মধ্যে শেষ করতে অনুরোধ করা হবে। সেটা এবার এডিটিং ডিপার্টমেন্টে এলো। বইটা রেডি হবার পর সেটা এবার পাঠানো হোলো মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে তার বইটা হাতে নিয়ে সার্ভে করে দেখলো বইটার কিরকম চাহিদা। সেখান থেকে রিপোর্ট আসার পর এবার এলো কস্টিং ডিপার্টমেন্টে। এবার ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী ছাপা হোলো। সুন্দর খাতার হিসেব। লেখক তাঁর রয়ালটি বুঝে নিলেন। আমাদের এখানকার প্রকাশকদের সঙ্গে ওদের কি বিস্তর ফারাক। ভাবা যায় না। এভাবেই আমি ইংল্যান্ডে জার্মানীতে ইত্যাদি দেশে গিয়ে নিজের খরচায় দেখে এসেছি ওঁদের পুস্তক প্রকাশনার ব্যাপারে কিরকম মাথা ঘামাতে হয়।

ঃ তা এ অভিজ্ঞতা আপনি কিভাবে কাজে লাগালেন?

—আমার লেখকদের পাওনা হিসেবের খাতার সঙ্গে বইয়ের হিসেবের খাতা আপনি এরকম সিস্টেমে আর কাউকে করতে দেখবেন না। আমাদের খাতা খুললে কত বই ছাপা থেকে প্রতিদিনের হিসেব ছবির মতো লেখা থাকে। প্রত্যেক লেখকের জন্যে আমার আলাদা আলাদা ফাইল থাকে। দেখবেন?

পরপর সাজানো ফাইল থেকে শ্রীপুরকায়স্থ আমাকে কিছু উদাহরণ দেখালেন। এভাবে কোনো প্রকাশন সংস্থা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এত হিসেব রাখতে পারে ধারণার বাইরে। তাছাড়া একটা বইয়ের কস্টিং বিক্রি জেলা-ভিত্তিক সার্ভে বিভিন্ন প্রদেশের সর্বসমেত বিক্রি—বছর হিসেবে তাকে ভাগ; কত কপি ছাপা হতে পারে। এইসব নানা ব্যাপার আমাদের হিসেবের মধ্যে থাকে।

ঃ আচ্ছা অরুণবাবু, ধরলুম—আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সাইডে পাক্কা এবং সেভাবেই কোম্পানিকে দিনকে দিন বাড়িয়ে চলেছেন। তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে এত করেও শ্রীভূমি, শ্রীভূমি হবে উঠলো না কেন? কেন একডাকে মিত্র; ডি এম; নারায়ণী; বিশ্ববাণী; দে রেপ্তালের মতো একডাকে আপনার নাম লোকে জানে না কেন?

—তার কারণ হোলো আমরা গল্প উপন্যাস করি না। দ্বিতীয়তঃ আমরা এসেছি বাংলা বইয়ে এই সেদিন মানে ১৯৭১ সালে।

ঃ তাতো অনেকেই এসেছেন। এ সময়ে এসেও অনেক দুমদাম সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠেছেন। আপনাদের এ অবস্থা হোলো কেন?

—আমাদের সংস্থা অল্প সময়ে এসে গল্প উপন্যাসে না যাওয়াটাকেই তার একমাত্র কারণ বলে ধরে নিতে পারেন।

ঃ আচ্ছা আপনাকেও বলি এত লোক এ লাইনে যাচ্ছেন আপনিই বা উপন্যাস টুপন্যাস ছাপবেন না বলে জিদ ধরে বসে আছেন কেন?

—সত্যি কথা বলি মশায়, সময় নেই। ওই তো ফজন হিট ঔপন্যাসিক। তাঁর পেছনে ঘুরছেন সবাই। কে মশাই অত ধোবাধুরি করে একজন লেখকের কাছে। আমাদের এখানে এত কাজ যে অত ঘোরবার সময় নেই. এটাই হোলো সিধে কথা।

ঃ আচ্ছা বেশ, এটার না হয় লজিক আছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের জন্যে আপনার কিছু করা উচিত ছিল। অন্ততঃ বাংলা শ্রেষ্ঠ উপন্যাস গল্প কবিতার বই অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করে নিশ্চয়ই পাবলিশেন করতে পারতেন। সেরকম কোনো পরিকল্পনা আছে?

—না। কারণ আসামে যাঁরা সাহিত্য পড়েন। বিশেষ করে অসমীয়া সাহিত্য পাঠকেরা তাঁর প্রায় সবাই বাংলা ভাষা জানেন। ফলে অরিজিনাল বইটাই তাঁদের পড়া হয়ে যায়।

ঃ আপনাদের ভবিষ্যতে এরকম কোনো ভাবনা আছে?

—তাও নেই।

তবুও আমরা ভাবছি হিন্দির দিকে যাবার। এখনকার প্রকাশকেরা কেন এদিকে তাকাচ্ছেন না জানি না। এ একটা বিরাট মার্কেট। এদিকে প্রকাশকেরা এগিয়ে এলে নিঃসন্দেহ লাভবান হবেন। আমরা এ ব্যাপারে বেশ কিছুটা এগিয়েছি। ভবিষ্যতে ব্যাপকভাবে এগুবার ইচ্ছে আছে।

—আমরা বিভিন্ন ধরনের বই বের করেছি। কারুর সঙ্গে কারো মিল নেই। ধরুন হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'আবার চীন দেখে এলাম'-এর পাশে কানাইলাল সাহার 'যোগাযোগ্যে যোগ ব্যায়াম' বইটিতে মূল্যবান তথ্য আছে—কারণ রোগ সব সময়ে ওষুধেই সারে না। বহু দুরারোগ্য ব্যাধিও যে যোগাসন ব্যায়ামের দ্বারা সারানো সম্ভব এমন বহু নজীর আছে। সুস্থ সবল হয়ে বেঁচে থাকার কথা সুন্দরভাবে বলা বা শেখানো হয়েছে। বইটি বের করবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম মুদ্রণ শেষ। এখন দ্বিতীয় মুদ্রণ চলছে। তার পাশেই ধরুন আমাদের আরেকটা বই যার নাম বিজ্ঞান ভারতী। এই বইটাকে বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে একটা ডিক্সেনারী বলা যায়। এই বইয়ের সাহায্যে আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চা প্রচারের সাহায্য হবে। সরল জটিল সব কথাগুলো অতি সহজেই বোঝা যাবে। বাংলা গ্রন্থজগতে বিজ্ঞানবিষয়ক এই বইটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এরও তৃতীয় মুদ্রণ চলছে। এর পাশে আছে—নাট্যসমীক্ষা। তার পাশে অশোক সেনের রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা আর চার্লি চ্যাপলিন এরকম ৫০।৬০টা বই নানা অবয়ব নিয়ে বেরিয়েছে। আমরা তো খারাপ বেজাল্ট পাচ্ছি না। সুতরাং উপন্যাস ব করতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

ঃ আপনাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনায় নতুন কিছু আছে।

—এখন আমরা ভাবছি ছোটদের নানা ধরনের বই, বিশেষ করে এ্যাডভেঞ্চারের। এ ব্যাপারে কিছু কিছু বই বেরিয়েছে। আরো অনেক বেশী বই বের করবার আমাদের পরিকল্পনা আছে। এখানে একটা বইয়ের কথা আমার বিশেষভাবে বলতে ইচ্ছে করছে। তা হল—ইন্ডিয়ান কালচিভেশন অফ সায়েন্সের রেজিস্ট্রার ডঃ সমরেন্দ্রনাথ সেনের ছোটদের অদৃশ্য জগৎ এটা একটা মূল্যবান বই।

এখন শ্রীভূমির বইয়ের সংখ্যা প্রায় পৌনে পাঁচশো। এই পরিমাণ বই কলকাতার গোটাকয়েক সবচেয়ে বড় প্রকাশকের আছে। অরুণবাবুর একমাত্র ছেলে ভাস্কর এম-এ পড়ছে। স্ত্রী শিপ্রা পুরকায়স্থ স্বামীকে সর্বসময় সহযোগিতা করছেন। মাঝে মাঝে অফিসেও আসছেন। নিজস্ব বই আছে। আর সবার উপরে আছে তাঁর শৈশবের মনে বাঁচবার মর্মান্তিক লোকের আত্মবিশ্বাস। এ আত্মবিশ্বাস তাঁকে সব দিয়েছে। যিনি যোগাচ্ছেন ২০।২৫টি পরিবারের রুটি রুজির রোজগার। আর নিজে দেখতে পেয়েছেন উজ্জ্বল সোনালী আলোর প্রতিশ্রুতি।

শাণ্ডিল্য চতুর্বেদী

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম.বি.ডি.ও
ডাঃ এস এন পাণ্ডে এম.বি.বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য-৮৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও বহুচিত্রে চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মায়ুন লাইব্রেরী • ৩৫ এ, সুধাসন ষ্ট্রীট কলিকাতা ৯
অগ্রিম ৮৲ টাকা পাঠাইলে ডাকমাশুল ফ্রি

হৈমন্তী শুক্লা

ফিল্মের গান এবং আধুনিক গানের ক্ষেত্রেও একটা বড় কিছু পরিবর্তন আসা দরকার। এ পরিবর্তনটা যে কি তা জানি না। শুধু এইটুকুই জানি এটা দরকার।

বিরাট বট অশ্বত্থের মাঝে মাঝে যুঁই বেল চামেলীর আসর আমায় মুগ্ধ করে। যেমন মুগ্ধ করে সমুদ্রের অন্তহীন বিস্তার দেখার পরও ছোট্ট নদীর কলধ্বনি। সংগীতের ক্ষেত্রেও পঙ্কজ মল্লিক ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য হেমন্ত মুখোপাধ্যায়দের মধ্যেও ভাবীকালের শিল্পীদের আবেগের স্পন্দন। স্বপ্নের ছবিকে অনুভব করতে দেখতে খুব ভালো লাগে। এ যেন সবোবরের বুকে আকাশের স্বপ্ন দেখার আনন্দ। এই আনন্দের তাগিদেই আজ হৈমন্তীকে ডেকেছিলাম। আমার এলোমেলো অগোছালো ঘরের নিভৃত পরিবেশে।

বাণীচক্রেরই একটা ফাংশনে শুনেছিলাম হৈমন্তী শুক্লার গান। নাঃ তারও আগে বোধহয় হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানী থেকে একটি রেকর্ড পেয়েছিলাম এ ত কান্না নয় আমার' ও 'ময়ূরনাচ কে দেখবি আয়।' গান-দুটির রচয়িতা ও সুরকার যথাক্রমে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শৈলেন মুখোপাধ্যায়। রেকর্ডটি দেখেই বাজাবার জন্য বস্ত হয়ে উঠেছিলাম শিল্পীর নামটার মধ্যে যে নতুনত্ব আছে তারই আকর্ষণে। আশা করিনি তার গানের মধ্যেও তাসাগান তার স্বাক্ষর থাকবে। কিন্তু কোনো কিছু আশা না করেও চকিত চমকের মত অবাক করে দিয়েছেন যেসব তরুণ প্রতিভা হৈমন্তী শুক্লা তাঁদেরই একজন। একবার নয়। রেকর্ডটি বেশ কয়েকবার শুনলাম। শুধু সুরেলা কণ্ঠই নয়। স্বরের স্পষ্টতায় অক্ষরের দ্যুতিতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত অনুশীলনের পরিচয় ছিলো বলেই ভুলতে পারিনি হৈমন্তী শুক্লাকে।

সেই হৈমন্তীকেই আরো বিস্তারিত-ভাবে জানবার এবং শোনবার সুযোগ পেলাম বাণীচক্রের কয়েকটি অনুষ্ঠানে। শুনলাম ওর ক্লাসিক্যাল, ঠুংরী গজল ভজন।—প্রত্যেকটি গানই শিক্ষা ও রেওয়াজে পরিমার্জিত। অনেক জায়গায় লতা মংগেশকারের সুরভরা সূক্ষ্ম ছোঁওয়া শ্রোতাদের মনকে অজান্তেই টেনে নিচ্ছিলো।

তারপর অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসে একদিন অবসর সময়ে বসে বসে নানান কাগজের ফাইলে চোখ বোলাতে বোলাতে হঠাৎ চোখে পড়লো দিল্লীর একটি সুবিখ্যাত দৈনিক পত্রিকায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও হৈমন্তীর একটি অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার ছবি। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর স্মৃতি-বার্ষিকী উৎসব—যার উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু। সেই ছবির নীচেই চোখে পড়লো সমালোচকের মন্তব্য—হোয়েন কুমারী হৈমন্তী শুক্লা রেকর্ডারর্ড এ পোর্ট্রেষটিক প্রোব্লেম্ বাই কাজী নজরুল ইসলাম হার মেলিফ্লুয়াস ভয়েস অলমাষ্ট রিচড্ দি এ্যাপীল অফ লতাস্।—

গ্রেট মেন থিংক এ্যালাইক-এর মত—সার্চিং হার্টস থিংক এ্যালাইক কথাটাও বোধহয় সত্যি। নইলে দিল্লী ও পশ্চিমবাংলা তথা দুই বিপরীত রাজ্যের সমালোচকের একই কথা (লতার তুলনা) মনে এলো কেন?

তারপর থেকে যতবার হৈমন্তীর গান শুনেছি মনে হয়েছে ওর শিক্ষা ও অনুশীলনে যদি শৈথিল্য না আসে অথবা কোনো কারণে যদি গান না থামায় তবে প্রতিমা সন্ধ্যা অথবা আরতির মত উচুমানের শিল্পী হয়ে ওঠা ওর পক্ষে অসম্ভব নয়। কারণ হৈমন্তী শুক্লা জাত-প্রতিভা।

ওর স্বভাবটিও ভারী নম্র আর শিশুর মত সরল। অন্ততঃ এখনও আছে। ভাগ্য বিবর্তনের কণ্ঠিপাথরে যাচাই হয়ে এ নম্রতা অবিকৃত থাকবে কিনা সময়ই তার বিচারক।

জানেন সন্ধ্যাদি বা পাওয়া আমি কল্পনারও অতীত বলে মনে করি দেখি কেমন করে তাই-ই এসে যায় আমার কাছে অভাবিতরূপ আর কত সহজে। ভাবলে অবাক লাগে—হৈমন্তী বলে আবেগভরে।

'যথা?'

যেমন কতদিন ইচ্ছে হয়েছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ করতে। অনেক ফাংশনেই উনি আর আমি প্রোগ্রাম করেছি। দূর থেকে ওঁর দিকে সম্ভ্রমভরে চেয়ে থাকতাম। ওঁর গান শুনতাম। তারপর চলে আসতাম। অনেকেই বলেছে ঐত হেমন্তদা

বসে আছেন যাওনা আলাপ করে এসো। উনি খুব ভালো। কথা বলতে গেলে ভালো ব্যবহারই করবেন।

কিন্তু অমন করে আলাপ করাটা আমার মোটেই পছন্দ হোতোনা। দেখা করে নমস্কার বা প্রণাম করলাম। আর উনি একটু হেসে বাঃ বেশ গাও' বলে অন্যদের সংগে কথা বলতে সুরু করলেন এমন আলাপ আমি চাইনি। আমি চেয়েছিলাম ওঁর সংগে অন্তরংগতা হোক। ফর্মালিটির বাইরেও একটা মধুর সম্পর্ক দুজনের মধ্যে গড়ে উঠুক। একদিন হঠাৎই এইরকম একটা যোগাযোগ ঘটে গেলো। একটা ফাংশনে গান গাওয়া শেষ করে আমি সিঁড়ি দিয়ে নামছি উনিও নামছেন। হঠাৎ আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন তোর গান খুব ভালো হয়েছে। থাকিস কোথায়? পরের দিন দেখা করতে বললেন। মনে হোলো স্বপ্ন দেখছি না ত? উনিই নাগাল্যাণ্ডে একটা প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করলেন। সেখানে ওঁর গান ছিলো। সোলো ছাড়াও আমার সংগে নিয়ে ডুয়েটও গাইলেন। সেই প্রোগ্রামের খুব নাম হয়েছিলো।

এরপর নেহেরুর স্মৃতিবার্ষিকীতেও (দিল্লীর ঐ অনুষ্ঠান) উনিই যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানেও ডুয়েট গেয়েছি। এছাড়া হেমন্তদা মান্নাদা ও আমার একক গানও ছিলো। এ অনুষ্ঠানের পর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সংগে দেখা করতে উনি বললেন তোমায় দেখে মনে হয়নি তুমি এত সুন্দর গাইতে পার। সে রাত্রে আনন্দে আমার ঘুমই আসেনি।

আর একটা আশ্চর্য ঘটনা যখন বাণী-চক্রের এক শিক্ষক সুধা সেন আপনাকে যোগাযোগ করতে বলেছেন একটা ইন্টারভ্যুর জন্য—বলে আপনার ফোন নম্বরটা দিলেন।

রেকর্ড সঙ্গীত
গান ও স্বরলিপির পত্রিকা
পূজোর গানের স্বরলিপি, অনেক ছবি, গানের বিষয়ে নানা স্মৃতিকথা, রম্যরচনা, সাক্ষাৎকার প্রভৃতি আর গীটারের জন্য হিন্দি ফিল্মের গানের স্বরলিপি সহ পূজো সংখ্যা মহালয়ার আগেই বেরুবে, দাম মাত্র তিন টাকা
চেক 'কলম্বিয়া গ্রাফোফোন কোং অব ইণ্ডিয়া (প্রাঃ) লিঃ' নামে পাঠাবেন
শারদ অর্ঘ্য
এইচ, এম, ভি ও কলম্বিয়া রেকর্ডে প্রকাশিত পূজোর গানের বই, প্রত্যেক শিল্পীর ছবি। অফসেটে ছাপা।
দাম মাত্র ২.৫০
মহালয়ার আগেই বেরুবে
এজেন্টগণ অগ্রিম সহ ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে অর্ডার পাঠান। পরে পাবেন না।
HMV
দি গ্রামোফোন কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ
২ চৌরঙ্গী এপ্রোচ, কলিকাতা ৭২

আশ্চর্য ঘটনা কেন? কতদিন নানা শিল্পীর ওপর আপনার লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। ভেবেছি যদি আপনার সংগে আলাপ হোতো? অনেক গানের জলসায় আপনাকে দেখেছি একেবারে পাশ দিয়ে চলে গেছেন। কিন্তু কেই বা চেনাচ্ছে আর কেই বা আলাপ করিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ যখন খবর পেলাম আপনিই আমার খোঁজ করছেন—এত আনন্দ হয়েছিলো কি বলব।

দিল্লীতে কি কি গান গেয়েছিলে? হেমন্তদার সুরে মুকুল দত্ত ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা গান 'বঁধুয়া কেন ভুলে গেলে' ওগো বৃষ্টি আমার চোখের পাতা ছুঁয়োনা।

হৈমন্তীর বাবা শ্রীহরিহর শুক্লা উচ্চাংগ সংগীতের চর্চা করতেন। তাঁরই কাছে ওর সংগীতশিক্ষার প্রথম পাঠ। হৈমন্তীর কণ্ঠের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো গান সুরু করার সংগে সংগেই। নানা আসরেই তার গাইবার আমন্ত্রণ আসতো। চিন্ময়বাবুর মত একাধারে এমন শিল্পী ও শিক্ষক দুর্লভ। ওঁর শিক্ষায় হৈমন্তীর সংগীত সম্বন্ধে ধ্যানধারণা গড়ে ওঠার সংগে সংগে শিক্ষার বনেদও পাকা হোলো। সুর তাল লয়ের সংগে আলাদা পরিচয় ঘটবার সুযোগ এলো। এ অধ্যায় বড় রোমাঞ্চকর। চার বছর ধরে ওঁর কাছে শিখেছে।

তারপর ন্যাশন্যাল স্কলারশিপ পেয়ে টি এল রাণার কাছে ধ্রুপদ ধামার ও খেয়ালের তালিম চলল। এখানেও এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হোলো। রাণাসাহেব বললেন ন্যাশনাল স্কলারশিপের জন্য দরখাস্ত করতে। আমি কিছুতেই রাজী নই। দিল্লীতে ভারতবর্ষের নানান দেশ থেকে কত বড় বড় গাইয়ে আসবেন। সেখানে আমার মত সাধারণ গাইয়ের পরীক্ষা দিতে যাওয়া টাই ধৃষ্টতা। রাণাজী বললেন না হয় বৃত্তিই পাবে না। একটা অভিজ্ঞতা ত হবে? সেটাও অনেক কাজে আসবে।

বাবাও যেন একটু দ্বিধাগ্রস্ত। শুধু শুধু অতগুলো টাকা খরচ করে যাবি?

কিন্তু হৈমন্তী গেলো দেখলো এবং জয় করলো। মাত্র ১২ মিনিটেই ওর কণ্ঠে ললিতের বিস্তার শুনে নানান প্রদেশের পরীক্ষকরা শুধু মুগ্ধই হননি ওকে আলাদা করে ডেকে আলাপ পরিচয় করলেন আর উৎসাহ দিলেন। তুমি অনেক বড় হতে পারবে যদি শিক্ষা ও সাধনায় ছেদ না পড়ে। রক্তের মধ্যে গান না থাকলে এমন করে গাওয়া যায় না।

সাধারণতঃ দু বছর এই স্কলারশিপ দেওয়া হয়ে থাকে কিন্তু হৈমন্তী পেয়েছে পরের পর তিন বছর এবং প্রতিবারের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েই। ছোট্ট বেলা থেকে সুরু করে আজ অবধি হৈমন্তী সকল সংগীত প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয়-রহিত।

অথচ আমি কখনও কিছু আশা করিনি জানেন সুধাদি? স্কলারশিপ পাব এটাও কখনও ভাবিনি তেমনই ভাবিনি আমার ক্ষেত্রে দিন রেকর্ড হবে। হেমন্তদার একটা কথায় আমার মন খুব সায় দেয় 'কখনও কোনো কিছুর আশা করিস না—যখন যা পাবি উপরি-পাওনা বলে ধরে নিবি। তাহলে দেখবি জীবনে কখনও হতাশা আসবে না।

এত সহজে এমন গভীর কথা বলতে পারার মূলে আছে হৈমন্তীর অনুভূতিপ্রবণ মন ও উচ্চশিক্ষার পটভূমিকা। ১৯৬৮তে বি-এ পাশ করে ও বাংলা নিয়ে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হোলো। তারপর গানের নেশায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নেবার আকাংখা কোথায় ভেসে গেলো। গানই হয়ে উঠলো জীবনের ধ্রুবতারা। কিন্তু শিক্ষার ছাপটা বুদ্ধি ও মনকে মার্জিত করে সকল-রকম ধ্যান-ধারণার পথ খুলে দিয়েছে। সেই-দিনই বলল জানেন সুধাদি অনেকে বলেন তুই যখন অনেক বড় হবি অনেক নাম হবে টাকা হবে তখনতো আমাদের ভুলে যাবি। আমি ভাবি এমন নাম নাইবা হোলো যে নাম নিজের লোকদের ভুলিয়ে দ্যায়? ওর কথা বলার ছেলেমানুষী ঢংটি ভারী মিষ্টি।

প্রশ্ন করলাম তোমার শিক্ষা সুরু ক্ল্যাসিক্যাল গান দিয়েই। বহুদিন ধরে ভালো গুরুর কাছেই শিখেছ। তবু আধুনিক গানকেই জীবনের প্রধান গানরূপে বেছে নিলে কেন?

জীবনের প্রধান গান তো নয়? কেরিয়ারের প্রধান গান। কারণ প্রথম শ্রেণীর ক্ল্যাসিক্যাল আর্টিষ্ট হতে হলে সময় অর্থ শিক্ষা—সবেরই প্রাচুর্য দরকার। সেটার অভাবেই প্রফেশন হিসেবে আধুনিক গানকে বেছে নিতে হোলো। আমার নিভৃত সাধনার ধন উচ্চাংগ সংগীত। তবু মডার্ণ গানকে আমি সামান্য বলে মনে করিনা। সাধারণ মানুষের গানের রুচিপ্রকৃতি ত এই গানেই তৈরী হয়। যে কোনো দেশেই সাধারণ মানুষের মধ্যে গানের প্রবাহ জিইয়ে রেখেছে এই গানই।

মডার্ণ গানের শিক্ষা কার কাছে? শৈলেনদাই (মুখার্জি) এই লাইনে আমায় প্রথম নিয়ে এসেছেন। ওঁর স্নেহের কাছে আমি চিরঋণী। উনিই হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীর সংগে যোগাযোগ করিয়ে রেকর্ড করালেন (এ রেকর্ডটির কথা প্রথমেই বলেছি)। রেকর্ডটি শ্রোতাদের কাছে সাড়া পাবে কিনা সে সম্বন্ধে শৈলেনদারও সন্দেহ ছিলো। কিন্তু আশাতীতভাবে উতরে গেলো। সেলও হোলো দারুণ। পরের বছর শৈলেনদার ট্রেনিংএ একটি নজরুল গীতির রেকর্ডও ভালো সেল হয়েছে। হিন্দুস্থান কোম্পানীতেই হেমন্তদার সুরে আমার আর একটি রেকর্ডের দুটি গান হোলো 'তুমি যদি খবর দিতে' ও 'তুমি যে কত কথা বলতে আমায়'।

এরপর গ্রামোফোন কোম্পানীতে করলাম বসন্তবন্দনার রেকর্ড 'আমাকে যতই ভালো-বাসোনা' ও 'সবচেয়ে আপন কবে তোমার পেলাম'।

এবারের পূজায় অনুপম ঘটকের দেওয়া সুরের গানের একটি এস পি [illegible]

১৮০ গ্রামের
ডিটারজেন্ট শক্তিতে
ভরপুর বার
এখন মাত্র টা. ১.১৪ স্থানীয় কর অতিরিক্ত

সুপার ৭৭৭

ডিটারজেণ্ট কাপড় ধোয়ার বার
ভারতে সবচেয়ে বেশী কাটতি

**এখন আরও
বেশী পয়সা বাঁচান,
বেশী সাদা
করুন**

সুপার ৭৭৭ এর মত উৎকৃষ্ট ও
কম দামে অন্য কোন সাবান বা ডিটারজেণ্ট পাবেন না।

Shilpi dm 6A/76 ban

হচ্ছে। তাতেও আছে আমার দুখানি গান 'চন্দ্রাবলীর চৈতী হাওয়া' ও 'পাখী বলে কারে দেব এ গান'।

সিনেমাতে প্রথম যোগাযোগ করিয়েছেন অভিজিৎদা। দুষ্টু-মিষ্টি ছবিতে লম্বা-দাড়ি-চৌকিদার আজ পিকনিক ও বালক লক্ষ্মণচন্দ্রে গেয়েছি। শ্যামল মিত্রের সুরে আমি সে ও সখা-তে গেয়েছি এমন স্বপন কখনও দেখিনি আমি। কথা গৌরীপ্রসন্ন। শ্যামলদার সঙ্গে একটি ডুয়েটও গেয়েছি এমনি করেই দুজনে তরী বেয়ে চলি। অজয় দাসের সুরে গেয়েছি 'অচেনা অতিথি'র হিন্দী 'আনজানে মেহমান'এ। রাগ-অনুরাগ ছবিতে হেমন্তদার সংগে ডুয়েটও গেয়েছি।

এ ছাড়াও মুক্তি পায়নি এমন ছবিতেও গেয়েছি যেমন অগ্রদূত পরিচালিত দিন আমাদের'। মানবেন্দ্র মুখার্জির সুরে আগুনের ফুলকিতে টাকা দিয়ে যায় না কেনা কালো চোখের তারা ছবিতেও মান্নাদার সুরে। তপনবাবুর হারমোনিয়াম ছবিতে তরুণদার সংগে ডুয়েট গেয়েছি। মোহন বাগানের মেয়ে-তে তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে। হাতে রইলো তিন ছবিতে হেমন্তদার সুরে ওগো স্বপন তুমি চলে যেওনা। বিশ্বজিতদার ছবি জীবননাটক (হিন্দী ও বাংলা ভার্সন) হেমন্তদার সংগে ডুয়েট গেয়েছি খোকনমণির চোখে নেই ঘুম। একটি অসমীয়া ছবিতেও গান গেয়েছি। সলিল চৌধুরীর সুরে 'মিষ্টার' ছবিতে মান্নাদার সংগে সোনালী সোনালী পোষালী ধান। জয় ছবিতে আনন্দ মুখোপাধ্যায়ের সুরে অনল চ্যাটার্জির সুরে সোনার কাঠি-রূপোর কাঠি। পরেশ চ্যাটার্জির সুরে সমর্পণ। আরগুলো মনে করতে পারছি না।

রেডিওতে হৈমন্তী খুব ছোটোবেলা থেকেই গায়। মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই শিশু-মহল গল্পদাদুর আসরে ওর অনুষ্ঠান সুরু হয়। প্রথমে গাইতো ভজন। তারপর একে একে খেয়াল ঠুংরী আধুনিক নজরুলগীতি গজল। ওর নিজের সবচেয়ে প্রিয় হোলো খেয়াল আধুনিক ও রাগপ্রধান।

দিল্লীতে বিজনবালা ঘোষদস্তিদার ওকে অনেকবার নিয়ে গেছেন ও'র সংগে ডুয়েট গাইবার জন্য। নয়নাদেবী ওর গান শুনে ওকে টি ভি প্রোগ্রাম দিয়েছেন। এলাহাবাদ প্রয়াগ সংগীত সমিতির সংগীত-প্রবীণ উপাধিও পেয়েছি।

আধুনিক গানের ক্ষেত্রে ওর হিরো হেরোইন হলেন হেমন্তদা ও লতা মংগেশকার।

অনেক ফাংশনে দেখেছি কি কুৎসিৎ অংগভংগি করে গায়ক-গায়িকারা গাইছেন। এতে যে গানের অমর্যাদা হয় সে খেয়াল তাঁদের নেই। শ্রোতাদের কিন্তু দেখেছি ভাল গানেই সাড়া দিতে।

এই স্বল্প কয়েক বছরের গানের জগতের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলার কিছু নেই?

নিশ্চয়ই আছে। এখানে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য শৈলেনদা হেমন্তদার মত মানুষ আছেন আবার দলাদলি এবং অহেতুক দাম্ভিকতারও অভাব নেই।

একবার ভারী মজা হয়েছিলো। আমার কাছে শৈলেনদার গল্প শুনে হেমন্তদা বললেন শৈলেনদা এত ভালো? কই জানিনা ত? চল যাই একদিন তাঁর কাছে। হঠাৎ একদিন আমায় নিয়ে গেলেন। শৈলেনদা আনন্দে বিস্ময়ে দিশেহারা। বারবার বললেন এ কি? আগে একবার বললিনা? খুব আনন্দে কেটেছিলো সেদিন। উচ্চাংগ সংগীতের ক্ষেত্রে হৈমন্তী পান্ডিত্য প্রদর্শন ও তানকর্তব্যের তাম্বিহাম্বিব চেয়ে খুব নরম ও মিষ্টি পরিবেশনার পক্ষপাতী। ওর প্রিয় শিল্পী হলেন পালসেকার বড়ে গোলাম আলি আমীর খাঁ।

শিল্পীদের ব্যবহার একটা মস্তবড় জিনিস। এদিক থেকে মোহরদি ও সন্ধ্যাদি (মুখার্জি) আমার আদর্শ। শুনেছি এ বিষয়ে সুনন্দা পট্টনায়কের তুলনা নেই। জানিনা কবে তাঁর সংস্পর্শে আসবার সুযোগ ঘটবে।

বাণীচক্রে হৈমন্তী গান শেখায়। বাণীচক্রেরই একটি ফাংশনে ওর গান শুনে রেডিও থেকে অরুণ দত্ত ওকে গজল গাইবার অনুরোধ জানান। হৈমন্তী সবিনয়ে বলে বাণীচক্রে আসার জন্যই পাবলিকের সংগে যোগাযোগের সুযোগ হচ্ছে। আর বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রুচির অভিজ্ঞতাটাও মস্ত লাভ। বাণীচক্রের দুই কর্ণধার বাবদা ও রেণুদি—দুজনেই আমায় কনার অধিক স্নেহ করেন। আমার প্রতিষ্ঠার মূলে ওঁদের অবদানের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। এটা একটা মস্ত সৌভাগ্য নয়?

নিশ্চয়ই। কর্মক্ষেত্রে ধাক্কা মেরে পিছিয়ে দেবার লোক অজস্র। ঠেলে এগিয়ে দেবার মত মানুষ মুষ্টিমেয়।

দেখুন সবাই বলেন হেমন্তদা আমায় ব্যাক করেন বলেই সব জায়গায় আমি চান্স পাই। রেডিওতে এ-ক্লাশ পে-স্কেল ওরই জন্য। এ নিয়ে নাকি সমালোচনাও হচ্ছে। সন্ধ্যাদি আপনিও কি তাই মনে করেন?

অগ্রজশিল্পী হিসেবে হেমন্তদা যদি তরুণ প্রতিভাকে বিকাশের প্রশস্ত অবকাশ দিয়ে—উত্তরকালের শিল্পী তৈরী করেন তাহলে তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন বলেই ভাবব?

এখনকার সরকার সম্বন্ধে তোমার ধারণা ও বক্তব্য?

আমি যাঁদের সুরে গেয়েছি তাঁদের মধ্যে সলিলদা শিল্পীকে নিজের মত করে গাইবার স্বাধীনতা দেন এটা একটা মস্ত সুবিধে। হেমন্তদার সুর খুব সহজ সরল।

আগে প্যান্ডেলে গাইতে গেলেই শ্রোতারা হিন্দী গান শুনতে চাইতেন। এখন কিন্তু ভালো বাংলা গানেরই বেশী চাহিদা।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলব হিন্দী গানকে আমি ছোটো নজরে দেখিনা। কারণ এ গান উচ্চারণ রাগের বেসিস সব মিলিয়ে ভালো করে গাওয়া শক্ত। হিন্দী ফিল্মের সংগীতস্রষ্টারা উচ্চাংগ সংগীতে শিক্ষিত এবং পাশ্চাত্যসংগীত সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। আর রাগ-ভিত্তিক গানই এমন হাল্কা ও শ্রুতিমধুর করে রচনা করেন যে সকল শ্রেণীর মানুষই তার রসগ্রহণ করতে পারে।

তবে ফিল্মের গান বিশেষ করে বাংলা গান বড্ড একঘেয়ে হয়ে পড়ছে। এ গান মানে আধুনিক গানের একটা কিছু পরিবর্তন হওয়া দরকার। পরিবর্তনটা কি তা জানিনা। তবে দরকার।

আর সংগীত আসরের শিল্পীদের মধ্যে একটা পারস্পরিক সৌহার্দ্য ছিল। এক আসরে গাইতে গিয়ে ধনঞ্জয়দা হেমন্তদাকে বলছেন 'তুই আগে গা' হেমন্তদা বলছেন 'না তুই আগে'। একে অন্যের গান শুনতেন। এখন? কে আগে গেয়ে বাড়ী চলে যাবেন তাই নিয়ে বচসা কলহ, মনোমালিন্য। প্রাণ খুলে কারো সংগে কথা বলতেও ভয় করে। কোন্ কথা কে কি অর্থে নেবে কে জানে। তবে আমায় সকলেই খুব ভালবাসেন এইটেই যা ভরসা।

অনেককেই দেখি একটু নাম ও অর্থের জন্য কি দাম্ভিকতা প্রকাশ করেন। আমি বুঝি না কেন এটা হয়? আগে আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটলে কেউ চিনতো না। এখন অনেকেই চিনতে পারেন। দেখে আনন্দ হয়। কিন্তু অহংকার কেন হবে?

আমার সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা? একটিই। শুধু গান গাইব আর গাইব। ছোটবেলায় কাগজের মাইক্রোফোন তৈরী করে তার সামনে বসে গাইতাম লতার গান। কল্পনা করতাম হাজার হাজার শ্রোতা আমার সামনে বসে গান শুনছেন। সে স্বপ্ন আজ ত অনেকটাই বাস্তব হয়ে উঠেছে। এই বাস্তব পূর্ণতর হোক—আমার প্রার্থনা এই একটিই। আমি আর কিছু চাই না। শাড়ী না, গয়না না, গাড়ী না। শুধু গান গাইব আর বিদগ্ধ, বুদ্ধিমান শ্রোতারা আগ্রহ করে শুনবেন।

সন্তোষ সেন

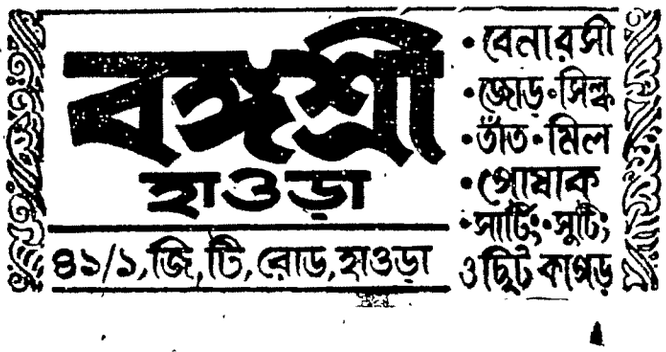

দ্বন্দ্ব

হীরক রায়

মাথা থেকে ঢোলের ওপর টস করে এক ফোঁটা জল পড়ল।

মাথা মোছার ফুরসতটুকু পর্যন্ত আসেনি। তার আগেই সূর্য উঠি উঠি করছে। আগের দিন ভেবে রেখেছিল অন্ধকার থাকতে থাকতেই স্নান সেরে নেবে। তারপর দুদন্ড একমনে ঠাকুরের নাম করবে। বলবে হে-ঠাকুর একটা বাবু এনে দাও। মস্তবড় কোন বারোয়ারীর এক বাবু। এই ষষ্ঠীর সকালে মানত করছি। ফি-বেস্পতিবার তোমাদের সকলকে একসঙ্গে বাড়ীতে পুজো দেব—পটের সামনে—হল না। অন্ধকার কেটে গেছে। রাস্তায় লোক চলতে শুরু করেছে কয়েকজন। যে বাবুরা এখনও ঢাকি নেয়নি তারা হয়ত এখুনি এসে পড়বে। সবচেয়ে তেজী ঢাক ওদের পছন্দ। অনেক আওয়াজের মধ্যে সেরা আওয়াজকে ওরা পছন্দ করে। নারাণ বাজাবার আগে নীচু হয়ে প্রণাম করতে গেল বাদ্যিটাকে। আর তখনই ঢোলের ওপর মাথা থেকে টস করে এক ফোঁটা জল পড়ল।

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল জল পড়লে বাদ্যির যৌবন টসকায়। আওয়াজ থিতিয়ে যায়। আর পড়েছেও ঠিক মধ্যিখানে। গভীর মমতায় জলটুকু কাপড়ের খোঁট দিয়ে মুছে নিল নারাণ একবার দুবার তিনবার।

পাশ থেকে মধু বলল কিরে কি হল? বোল তোল।

নারাণ ঘুরে তাকাল। মুখে দুশ্চিন্তা। হাতে লাঠি। বিড়বিড় করে [illegible] গালে

পড়লে বাদ্যির অসুখ হয়, শুকিয়ে গেলে চাপ্পা হয়। চাপ্পা করাচ্ছি এখন।

ঢাকের শব্দে মধু কিছু শুনতে পেল না। শুধু দেখতে পেল নারাণের ঠোঁট উঠছে নামছে বোধহয় কিছু বলছে। হেসে ঢোলের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করল— বাজা বসে থাকিস না।

নারাণ তখন চোখ বন্ধ করে দুর্গার মুখ দেখছে। চোখ বন্ধ করলে খুব সামনে দেখতে পায়। মনির ঠিক পাশেই। তিন-চোখে বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে কিন্তু ঠোঁটের কোনে বরাভয়ের হাসি। সেই হাসির দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে বলল—মা জননী। দয়া কর। দয়া কর। আজ ষষ্ঠি। —আরও কিছু বলার ছিল। বলা হলনা। গলায় আটকে গেল। তারপর একসময় চোখ খুলে দু পায়ের ফাঁকে ঢাকটাকে নিয়ে তৈরী হল।

বুক টান টান করে একবার চারপাশ দেখে নিল নারাণ। তারই মতো আরও জনা চল্লিশেক এখন ঢাক বাজাচ্ছেই—বাবুরা আসবে কিনা কে জানে! যদি না আসে কাল পণ্ডুদাকে এতকরে বললাম, আমাকে নিয়ে চল। যা দেবে ভাই নেব। রাস্তার ওপর বাজারের পাশে দাঁড়িয়ে আর বাজাতে পারছিনা। মন্ডপে বাজার। তা পণ্ডুদা রেয়াৎই করল না!

ঢাকের ওপর ঘা পড়ল। বোল বাজল। কানে গেছে সবাই আপনিই বোল বাজাচ্ছে ধাঁ কিট কিট ধা কিট কিট ধা। পাশাপাশি বাজাতে হলে একই বোলে বাজাতে হয়। নইলে বেসুরো ঠেকে। চোখ বুজে নারাণ

ঢাকে ঘা দিল। ধুনুচি হাতে কেউ না নাচলে কিংবা প্রদীপ হাতে কেউ না আরতি করলে এই বাজনা জমে না। পায়ের ছন্দের তালে বোল তুলতে হয়। একটু দুলে দুলে বোল মিলিয়ে শব্দ তুলল নারাণ।

গায়ের গেঞ্জিটা ভিজে গেছে এটা বুঝতে বুঝতেই নারাণ টের পেল তার ছাতি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। গেঞ্জিটা খুলে তাতেই গা মুছলো সে। সামনের কলে কুলকুল করে জল পড়ছে। শহরের কলে জল এমনই উপচে পড়ে বোধহয়। বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা নেই। নল দিয়ে তোরে জল আসছে। নারাণ আঁজলা পেতে সেখানে বসল।

ট্যাঁকে হাত দিল। সাংঘ্যে আর দু টাকা আছে। আধ পেটা করে খেলেও একদিন কাটবে না। ষষ্ঠীর বেলা গড়িয়ে দুপুর নারাণ ঢাকের দিকে তাকাল। ওর চোখ মুখ খুব কঠিন দেখাল। যেন কোন প্রতিজ্ঞা নিয়ে ফেলেছে হঠাৎ।

মধু কখন নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি নারাণ। কাঁধে হাত পড়তে মুখ তাকাল। মধু বলল, কিরে আর বাজাবিনা এখন?

নারাণ বলল, নারে মধু, এখন যাব।

মধু বলল খাবার পর?

নারাণ বলল না। যতক্ষণ না দেখব যে কোন বাবু এসে কাউকে নিয়ে গেছে ততক্ষণ আর বাজাবোনা। এ সময়ে শুনবার লোক নেই। সবাই তো ছুটছে। কেউ না ডাকুক কিন্তু কেউ কেউ তো দাঁড়িয়ে শুনতেও পারতো।

মধু কানের ভাঁজ থেকে বিড়ি বের করল। বিড়ি ধরিয়ে বলল এত মন খারাপ করিস কেন? ক্ষেতেও কি সব বছর ফসল হয়? হয়নাতো আশামত। বল ঠিক কিনা। মা ভোকে এখনও ডাকেনি—দেরী করেছে—তোর আশাগত হচ্ছে না। কিন্তু দেখিস ঠিক ডাকবে।

নারাণ ঘাড় নাড়ল—না। মা যদি ডাকে তবে বাজাবো। প্রাণপণ দিয়ে বাজাবো। এই হুজার শহরে আর এমনি এমনি বাজাবোনা।

নারাণ খাবারের দোকানের দিকে পা বাড়ালো।

একটু পরে এ ফুটপাথ ছেড়ে ওই ফুটপাথে চলে যেতে হবে। রোদ এখনও ঘুরছে। ঢাকে চড়া রোদ লাগানো চলবে না। দুটো কচুরী তরকারি দিয়ে খেতে খেতে নারাণ দেখল অনেকে ওপাশে চলেও গেছে। এপাশ থেকে ওপাশে যাওয়াও বড় সহজ নয়। গাড়ীর যেন শেষ নেই। আসছেতো আসছেই। পার হওয়া কি সোজা কথা। কাল পার হতে দেরী হয়েছিল। একটা ট্যাকসীর ড্রাইভার গাড়ী থেকেই ধাঁই করে একটা চাঁটি কসিয়ে বলল গাইয়া ভূত। মরবিযে। তাড়াতাড়ি পার হয়ে যা।—লোকটা তো মিষ্টি করেও বলতে পারতো। কই গাঁয়ে কোন অচেনা লোককে তো এমন কথা কেউ কখনও বলে না। নারাণ ক্রমশ এই সহরটার ওপর তিতি-বিরক্ত হয়ে উঠছিল।

একটু পরে সবার মত সেও ওপাশে চলে এল। সবাই কাঠি তুলে নিল। নারাণ ফুটপাতে বসে রইল দেয়ালে পিঠ দিয়ে। ঢাকের পাশে মধু আছে সেই দেখবে চিন্তা নেই। বসে বসে অত আওয়াজেও ঘুমে নারাণের চোখ বুজে এল।

ঘুমের মধ্যে সে দেখতে পেল একটা সুন্দর পোষাক পরা বাবু এসেছে। বাবুরা বাজনা শুনছে কিনা বোঝা গেল না। নারাণের দিকে একদৃষ্টি তাকিয়ে নাক সিটকাল। নারাণ বাজনা বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করল—কি হল বাবু বাজনা পছন্দ হচ্ছেনা।

বাবুটা নাক কুঁচকেই বলল, তোর যা পোষাক তাতে চলবে না।

নারাণ অনুনয় করে বলল কিন্তু আমার বাজনা—বাজনা পছন্দ হচ্ছে না বাবু। আমার বয়স উনিশ ছাতি ছত্রিশ একবেলা খেলে তিনবেলা বাজাতে পারি। পোষাক খারাপ অভাবের জন্য। আপনাদের দয়ায় টাকা পেলেই নতুন ধুতি কিনে নেবো। আমার বাজনাটা শুনুন বাবু।

নারাণ আবার কাঠি তুলে নিল। চোখ বুজে কয়েকটা বোল তুলে বলল—বলুন বাজনা কেমন। চোখ খুলে দেখল বাবু নেই। বাবুটা আর আসবে না।

দূর থেকে কয়েকটা লোক আসছে দেখতে পেল নারাণ প্রায় তখনই। কাছে আসতে লোকেরা বাবু হয়ে গেল। ছোকরা-গুলো। পাঞ্জাবী পায়জামা পরা। বাজনা শুনে-ছোলা বলল কিরে কত নিবি?

নারাণ ঢাক সামনে নিয়ে হাতে কাঠি তুলে নিল বোল শোনাবার জন্য। একটা বাবু হাত দিয়ে বলল বাজাতে হবেনা। কাঠি দিয়ে পেটালে আওয়াজ হয় জানি। কত নিবি বল।

নারাণ বলল পেটালেই আওয়াজ হয়না বাবু। বোল তুলতে হয়। বোল হল ঠিক কথার মত।

প্রথম বাবুটা বলল এ শালাতো বড় পাকা মাইরি। পাশের জন্য বলল ফোটা ওকে।

নারাণ হাত জড়িয়ে ধরল সবচেয়ে লম্বা বাবুটার। আজ ষষ্ঠি। আমাকে নিয়ে যান বাবু।

বাবুরা থমকে দাঁড়াল। বলল কত নিবি?

নারাণ কত দেবেন?

—তা চারদিনে পঁয়ত্রিশ টাকা।

নারাণ বলল—না বাবু অন্তত আশি টাকা করুন।

তা হলে চল্লিশ। তার বেশী পারবো না।—বাবুগুলোর সঙ্গে আর কথা বলা হোল না। তার আগে হঠাৎ মিলিয়ে গেল রাস্তায়। একটা ছোট ছেলে জল ছেটাচ্ছিল। সেই জল গায়ে যেতেই ঘুম ভেঙ্গে গেছে। নারাণ সোজা মধুর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল কাঠি দে বাজাবো।

মধু কাঠি এগিয়ে দিল। ঢাকটাকে দু-পায়ে ধরে নারাণ বোল তুলল। অল্প শুনেই নারাণের গায়ে ঠেলা দিল মধু। বলল কি যে তুই ষষ্ঠির বিকেলে বিসর্জনের বোল বাজাচ্ছিস কেন?

নারাণ ঘুরে তাকাল। মধুর চোখে চোখ রেখে বলল বিসর্জনের বাজনাইতো বাজাবো। আমাদের চেয়ে আর কেউ ভাল বাজাতে পারবে? আমাদের সকলেরই তো বিসর্জন হয়ে গেছে। মন্ডপে কেউ তো পা দিলাম না।

নারাণ কথা বাড়ালোনা। অনেকের আবতিব বাজনার মধ্যে বেসুরো বিসর্জনের বাজনা বাজাতে লাগল।

অনেক রাত্রে গাড়ীর শব্দ কমে এল। ফুটপাথে লোকজন ঘুমিয়ে আছে। এত বড় সহরেও সব লোকের জায়গা হয় না। কতজনের যে বিছানা ফুটপাথ কে জানে। নারাণ এপাশ ওপাশ তাকালো। সবাই ঘুমোচ্ছে মনে হল। একটা বিকসা ঠুনঠান শব্দ করতে করতে চলে গেল। একটি মেয়ে বসে। নারাণ এরি মধ্যে বুঝে ফেলেছে এই সহরে খারাপ মেয়ে অনেক পাওয়া যায়। সন্ধ্যের পরেও ঠোঁটে মুখে রং মেখে অনেকে চাঁদরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়েছিল। এখন যে গেল সে বেরকম পোষাক পরে আছে আর যেমন ঢলছে তাতে বুঝতে কষ্ট হল না নারাণের এও সেই দলের।

নারাণ আকাশের দিকে তাকায়। এই সহরে আকাশের মাপ খুব ছোট। একফালি দেখা যায়। দুটি বাড়ীর মাঝখানে ছোট্ট একফালি আকাশ। গ্রামে জানলায় তাকিয়ে যতদূর চোখ যায় আকাশ দেখা যায়। নারকেল, অশ্বত্থ আমপাতার ফাঁকেও আকাশ। এই নির্জন রাতে বড় অপরূপ করে গ্রামের কথা মনে পড়ল নারাণের। সেই মেঠো পথ, টালির বাড়ী, টলটলে পুকুর, সবুজ গাছ, বিরাট আকাশ। মনটা হু হু করে উঠল। ইচ্ছে হল এখুনি একবার ছুটে গিয়ে সবাইকে ঘুম থেকে তুলে বলবে, সবাই জাগো, দেখো, ফিরে এসেছি। আমি নারাণ, আবার তোমাদের মধ্যে চলে এসেছি।

কথাটা মনে হতেই ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে গেল নারাণ। মা বলেছিল, বাজনা বাজিয়ে যে টাকা পাবি যদি পারিস তবে আমার জন্যে তা দিয়ে একটা লালপাড় কাপড় আনিস। পদ্মা বলেছিল, হ্যাঁ গো আমার জন্য একটা নকল সোনার হার এনে দেবে তো?—সবাইকেই হ্যাঁ বলে এসেছে নারাণ। সবাই আশায় বসে আছে। এদিকে পরের দিন খাবার টাকাও পকেটে নেই, মুজরোও নেই। কি যে হবে। নারাণ একদৃষ্টে তারার দিকে তাকিয়েছিল।

ওর বুকে হঠাৎ একটা হাত উঠে এল। মধুর ফিসফিস করে, বলল, চিন্তা করে কি করবি। চিন্তা করার কিছু নেই। ভাগ্যে যা আছে তা হবেই। মিছিমিছি রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে। তাতে কি লাভ।

নারাণ ঘুরে মধুর দিকে তাকালো। তারপর বলল, কি হবে বলতো? এতজনকে এতকিছু বলে এসেছি এখন খালি হাতে ফিরি কেমন করে?

মধু একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল। আমারও তো একই হাল। মধু শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

নারাণ বিড়বিড় করে বলল, কাল থেকে আর ঢাক ধরছি না। সহরে ঘুরে বেড়াবো। যে কাজ পাই এই কদিন করবো। বাসন মাজতে হলেও মাজবো। কিছু টাকা আর করতে হবে। যেমন করেই হোক। এ সহরে ঢাক বাজিয়ে কিছু হবে না।

মধু ওর কথার কোন উত্তর দিল না। বলল, কালকের কথা কালকে। এখন ঘুমোত!

ওরা আর কোন কথা বলল না। চোখ বুজে শুয়ে রইল। কখন যে ঘুমে চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল ওরা জানতে পারেনি।

সকালে আপনা থেকেই ঘুম ভেঙ্গে গেল খুব ভোরে। মধু উঠে মুখে চোখে জল দিয়ে এল। অন্য সকলেও উঠে গেছে। নারাণ তাকিয়ে দেখল। হাই তুলল। কিন্তু উঠলো না।

মধু একটু পরে ঘুরে এল। বলল, পাগলামি করিস না। আজ একবার দেখা। আজকে সকালটা অন্তত মাথা ঠাণ্ডা রাখ। ভগবান করলে একটা খবর জুটে যেতে পারে।

নারাণ তাকিয়ে তাকিয়ে মধুর কথা শুনল। কোন উত্তর দিল না।

মধু বলল, কিরে, যা বললাম শুনলি?

নারাণ বলল, বলেছিতো আর বাজনা ধরবো না। ভগবান যদি দেয় তবে আমাকে একটা কাজ জুটিয়ে দেবে। তাই করবো। একটু পরে আমি কাজ খুঁজতে বের হব।

মধু বলল, সে কিরে? এই সহরের

তুইতো কিছুই চিনিস না। কোথায় যাবি কাজ খুঁজতে!

নারাণ বলল, কোথায় যাবো জানি না। তবে সারা সহর খুঁজবো। এতবড় সহরে একটা লোকের কাজ হবে না!—নারাণ উঠল। হাই তুলল। তারপর কলের দিকে এগিয়ে গেল।

মধু ঢোলটাকে টেনে নিল। গভীর মমতায় ঢোলের গায়ে হাত বুলাল। তারপর ঢোলের চামড়ায় মুখ রেখে ফিসফিস করে বলল, বাজা মেয়ের মত নিস্ফলা তো তুই না! কত তেজে বাজিস। তবু একটা বাচ্চাকে ফুসলাতে পারছিস না! আজ আমি শেষ-বারের মত তোকে তোয়াজ করবো। আজও যদি খদ্দের না মেলে তবে আমিও নারাণের মত কাজ খুঁজতে যাবো। তার আগে ছুরি দিয়ে তোর পেট ফেঁড়ে দেব যাতে আর কোনদিনও বোল না ওঠে।

আশে পাশে সবাই তো আজ তৈরী। তাদের মধ্যে বেশীরভাগই কিছু খায়নি তখনও। সূর্য্যি ওঠার সময়টুকু একটু বোল বাজিয়ে তারপর খাবে।। বোল উঠল। প্রথমে একজন তারপর অনেকে। ঢোলের ওক চোখ রেখে কাঠি হাতে তুলে নিল মধু। বোল বাজল। একই বোল, নানা ঢোলে। তখন সহরটার মাথার ওপরের অন্ধকার একটু একটু করে ফর্সা হচ্ছে।

সারাদিন পর নারাণ ফিরে এল হাসি-মুখে। মধুর তখন মুখ গোমড়া। আজ কারও খদ্দের জোটেনি। আজ নিশ্চিত-ভাবে বোঝা গেছে যে এ পুজোয় আর খদ্দের জুটবে না। সবাই চিন্তিত। নারাণ মধুকে কোমরের গোঁজ থেকে গঞ্জা বের করে খেতে দিল। বলল, খা! খদ্দের জোটেনি তো? জানতাম। তবে এ সহরটা বড় মজার রে। মন খারাপ করিস না। ভাল খবর এনেছি।

মধু হাত বাড়িয়ে গঞ্জা নিতে নিতে বলল, কি খবরবে?

নারাণ হাসল। বলল, আচ্ছা মধু বলতো, আমরা চারদিন ঢাকঢোল বাজিয়ে কত টাকা পেতাম?

মধু বলল, সে কথা বলে এখন আর কি লাভ?

নারাণ বলল, বাজিয়ে যত পেতাম না বাজিয়ে বোধহয় তার চেয়েও বেশী পাবো। খবর নিয়ে এসেছি, কাল শেয়ালদার কাছে সকালে কাঙ্গাল ভোজন আর বস্ত্র বিতরণ। আমরা তো কাঙ্গালই। ওখানে খাবো হাত পেতে কাপড় নেবো। এ রকম আর চারটে ভোজনে যেতে পারলে কতগুলো নতুন কাপড় হবে বলতো!

মধু বলল, যাঃ, রোজই এরকম হবে নাকি?

নারাণ বলল, দেখ না, কালও বের হব। এর চেয়েও বেশী ভাল খবর হয়ত কাল পাবো। আজ বড় ভাল ঘুম হবেরে।

মধু শুনেছিল, এ সহরে অনেক মণ্ডপে কাপড় বিলোয়। কিন্তু কোথায় তা জানতো না। নারাণের কথা শুনে ভাবল, মন্দ-ভাল! আর কিছু না হোক একটা নতুন কাপড় তো হবে।

নারাণ ডাকল, মধুরে। কাক ডাকছে ওঠ।

মধু চোখ খুলল। নারাণ আবার বলল, আজ কেউ জাগার আগে আমাদের জাগা উচিত ছিল। সকলের আগে লাইনে দাঁড়ালে সকলের আগেই খাবার পাবো, কাপড় পাবো। কাক ডাকা শুরু হয়ে গেছে। এই ডাকে আরও অনেকের ঘুম ভাঙবে। আর দেরী করিস না। ওঠ।

মধু হুড়মুড় করে উঠে পড়ল। এ সুযোগ ছাড়া যায় না। কিছু না করে একটা কাপড়। উঠে দাঁড়িয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল, চল।

কলকাতা তখনও জাগেনি। ল্যাম্প-পোষ্টে আলো জ্বলছে। অস্পষ্ট আলো। কলতলায় দু চারজন চান করছে। চারি-দিকে কেমন শোক শোক চেহারা, দুজনে তারি মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে এগুতে থাকল। মধু বলল, নারাণ, আমার কি মনে হচ্ছে জানিস।

নারাণ বলল, কি?

মধু ফ্যাক ফ্যাক করে হাসল।

নারাণ বলল, কিরে, কথার জবাব দিচ্ছিস না, ফ্যাকফ্যাক করে হাসছিস। ব্যাপারটা কি?

মধু বলল, আমার কি মনে হচ্ছে জানিস, সারা রাত জেগে মরা পুড়িয়ে ফিরছি। এর আগে দুবার যখন ফিরেছি তখনও এই রকম সকাল ছিল।

মধু তীরের মত ঘুরে তাকাল। দুহাত কপালে তুলে দুর্গা দুর্গা বলে কয়েকবার নমস্কার করল। তারপর বলল, যাচ্ছি একটা কাজে আর এই সাত সকালেই তুই শ্মশান-মশানের নাম করছিস!—একটু থেমে বলল, আমাদের ভাগ্য আর কি করে ভাল হবে বল। আমরাই তো ভাগ্যের মাথায় আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিই। দিনটা ভাল যেত। তুই বোধ হয় খারাপ করে দিলি।

মধু খুব অপ্রতিভ বোধ করল। বলল, না, না, তা হবে কেন! দেখিস সব ঠিক হয়ে যাবে, আমার কেমন যেন হঠাৎ কথাটা মনে এসে গেল। বলে ফেললাম। —মধু মুখে বলল বটে তবু মনটা খচখচ করতে লাগল। —আহা, কেন যে বলে ফেললাম। হে মা দুর্গা কোন খারাপ কিছু মনে করে বলিনি, হঠাৎ ফসকে বেরিয়ে গেছে। মাপ করে দিও মা জননী। জয় মা দুর্গা।

ওরা দুজনে যখন শেয়ালদার মণ্ডপে এসে পৌঁছল তখনও খুব বেশী লোক এসে পৌঁছয়নি। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই অনেকে এসে গেল। নারাণ মধুকে বলল, তুই সামনের দিকে বসে আমার জন্য একটা জায়গা রাখ। আমি খোঁজ নিয়ে আসি কখন কাপড় দেবে।

মধু বসে বসে দেখল, যারা এসেছে তারা সবাই দুঃখী মানুষ। সবারই মুখে কষ্টের ছাপ। বেশীরভাগই খালিগা। দু-চার জন গেঞ্জিও পরে আছে। মেয়েদের বেশী ভাগেরই শুধু শাড়িপরা। কেউ কেউ বাটিও এনেছে সঙ্গে। হয়তো ওতে খাবার খাবে। হয়তো ভেবেছে খাবার পরে কিছু নিয়ে যাবে। সামনে প্রতিমা। ঝলমলে পোশাক। অসুরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বর্শা গেঁথে দিয়েছে। জোরালো আলো চারপাশে।

একটু পর নারাণ ঘুরে এল। বলল, ওরে মধু। কাপড় দেবে বেলা ন'টার পরে। এখনও অনেক সময় বাকি। এক কাজ কর। তুই লাইন রাখ। আমি একবার ঘুরে আসি। দেখি আর কোথাও পাই নাকি? আরো দু-চারটে কাপড় পেলে ভালই হবে।

মধুর একা থাকতে ইচ্ছা করছিল না। বলল, তুই একা একা ঘুরবি নাকি আমিও সঙ্গে আসবো।

নারাণ হাসল, বলল, তাহলে লাইন রাখবে কে? নারে মধু, সামনেরটা আগে হাত পেতে নিতে হয়। হেলাফেলা করিস না। মনে রাখিস, গুন্তি কাপড় এরা দেয়। সময় মত নিতে না পারলে জুটবে না। তুই এখানেই থাক। আমি একপাক দেখে আসি।

মধু বলল তাড়াতাড়ি আসিস। যদি আগে দিতে শুরু করে?

নারাণ যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছিল। থমকে দাঁড়াল মধুর কথা শুনে। বলল, ঠিক বলেছিস। তাড়াতাড়িই আসবো। ভাল বলে-ছিস।—নারাণ আর দাঁড়াল না। এগিয়ে গেল।

মেড়ের মাথায় দাঁড়াতেই চোখে পড়ল। চিনতে কষ্ট হল না। শেয়ালদা স্টেশন তখন জমজমাট। পিলপিল করে লোক আসছে। নারাণ সোজা স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেল।

ভিড়ের মধ্যে গা ভাসিয়ে নারাণ স্টেশনের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। ঘুরে ঘুরে দেখল স্টেশনে সবই পাওয়া যায়। প্লাস্টিকের খেলনা, চা, সিগারেট, ওষুধ, বই, খাবার। বিক্রিও মন্দ হয় না। অনেকেই কিনছে ও দেখতে পেল। হঠাৎ একটা ফাঁকা কামরায় চোখ পড়তে নারাণ চমকে উঠল। একজন মাঝবয়েসী লোক কাঁধে হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে নামছে। ব্যাপার কি? স্টেশনে হারমোনিয়াম নিয়ে কি করছে! নারাণ ভাবল।

লোকটি ইতিমধ্যে কাছে এসে গিয়েছে। নারাণ তাকে জিজ্ঞাসা করল, কি কত। গান করেন বুঝি!

লোকটি থমকে দাঁড়াল। বলল, হ্যাঁ। কেন?

নারাণ বলল, না। আমিও বাজাই। তাই জানতে ইচ্ছা করল কোথায় আপনি গান করেন।

লোকটি হো হো করে হেসে উঠল, বলল, এখান থেকে কৃষ্ণনগর আবার কৃষ্ণনগর থেকে এখান পর্য্যন্ত প্রত্যেকটা বগীতে গান গেয়ে রোজগার করি। আমার সম্বল বলতে তো এই গলা আর হারমোনিয়াম।

লোকটি ভিড়ের মধ্যে চুপ করে মিলিয়ে গেল। বোধ হয় ওপাশের প্ল্যাটফর্মে যে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে ছিল সেটায় উঠবে। নারাণের মনে পড়ল, মেদিনীপুর থেকে আসার সময় ট্রেনে দুটো ছেলে কাঠি বাজিয়ে গান করে-ছিল। ছেলে দুটোও পয়সা পেয়েছে। একটা লোক রামপ্রসাদী গেয়েছিল খালিগলায়, সেও মন্দ পয়সা পায় নি। এসব কথা মনে পড়তে নারাণ ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে উঠল। ও যেন একটা নতুন পথের হদিশ পেল। ওর মনে হল, এতে যখন আসা হয় তখন ঢোল বাজালেও পয়সা হবে। এই ট্রেনের

বগীই এখন শেষ ভরসা। কাল জয়মা দুর্গা বলে উঠে পড়বো। মধু আর আমি দুজনেই বাজাবো। একবেলা বাজিয়ে দেখি না আগে কি হয়। যদি ভগবান করে আয় ভাল হয় তবে এই পুজোর কদিন উদয়াস্ত বাজাবো।

নারাণ একটা বেঞ্চিতে বসল। সামনের ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে ওর মনে হল, এতদিন মিছিমিছি বাবু খুঁজে মরেছি। ট্রেনটা অসাধারণ একটা বাবু। বোবা, পয়সা নেয় না পয়সা দেয়। কত লোক এর পেটের মধ্যে বসে কত টাকা আয় করছে। কি মনে করে নারাণ উঠে গিয়ে ট্রেনের একটা বগীর গায়ে মাথা রেখে দাঁড়াল। বিড়বিড় করে বলল, এতদিনে তোমাকে চিনতে পেরেছি। কাল সকালে মধুকে নিয়ে আসবো। দেখো বাবু। কিছু যেন হয়। সবাইকেই তো তুমি পাইয়ে দিচ্ছ দেখছি। আমাকেও কিছু পাইয়ে দিও। —নারাণ মাথা ঠেকিয়ে আর অল্প একটু সময় দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কোন দিকে না তাকিয়ে হনহন করে হেঁটে গেটের দিকে এগুল। চেকারবাবু পানের পিক ফেলতে তখন একটু সরে গেছে। সেই ফাঁকে নারাণ একদম বাইরে।

নারাণ ফিরে আসতে মধু যেন হাঁপ ছাড়ল। বলল, যাক এসে গেছিস। আমি ভাবলাম আবার দেরী না করে ফেলিস।

নারাণ চারদিক তাকিয়ে দেখল। মণ্ডপে বেশ ভিড় হয়েছে। পুষ্পাঞ্জলি দিতে যারা এসেছে তারা সামনের দিকে ভিড় করে আছে। কি সুন্দর সুন্দর শাড়ি পরে মেয়েরা এসেছে আর কি সুন্দর রং গায়ের। তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। ওদের সামনে একটি ছেলে বুকে ব্যাজ এঁটে গুণতে শুরু করল কতজন এসেছে। নারাণ বুঝল কাপড় দেবার সময় হয়েছে। বলল, মধুরে তৈরী থাক। এবার সময় হয়েছে।

মধু বলতে যাচ্ছিল কিসের? সেই সময় হঠাৎ প্রচণ্ড চেঁচামেচি শুরু হল। ওরা মুখ ঘুরিয়ে দেখল দুই বান্ডিল কাপড় নিয়ে দুটো লোক এগিয়ে আসছে। নারাণ দেখল, সব চোখগুলো চকচক করছে। সবাই আগে পেতে চাইছে। বুক টানটান করে মধুর হাত ধরে ও দাঁড়িয়ে রইল। পিছন থেকে চাপ বাড়ছে। ওদের সামনেই কাপড়ের গাঁট খোলা হল। তারপর একজন এগিয়ে এসে বলল, সবাই শান্ত হয়ে থাক। কিছুক্ষণের মধ্যেই বস্ত্র বিতরণ শুরু হবে।

ধাক্কাধাক্কি খুব বাড়ছিল। অবস্থা ক্রমশ ঘোরালো হয়ে উঠছিল। ভিড়ের চাপ প্যাণ্ডেলের গায়ে গিয়ে পড়ছিল। প্যাণ্ডেল সামলানোর জন্য ছেলেগুলো বলল, ধস্তাধস্তি কোর না। ধস্তাধস্তি করলে কাপড় দেওয়া বন্ধ করে দেব। যাদের এখন কাপড় দেওয়া হবে তারা সঙ্গে সঙ্গে বাইরে চলে যাবে। আর আসতে পারবে না। যদি কেউ আবার ঘুরে আস তবে কাপড় তো দেওয়া হবেই না, আগের কাপড়ও আটকে রাখা হবে।

নারাণ কোন দিকে তাকাচ্ছিল না। কোন কথা ওর কানে যাচ্ছিল না। সামনে লালপেড়ে কাপড় এক বান্ডিল। মা আসার সময় চেয়েছিল। আজ সেটা পাওয়া যাবে। এখন হাতে এলেই হয়। নারাণ একবার দুর্গার দিকে একবার কাপড়গুলোর দিকে তাকাচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ কানে এল ঢাকের শব্দ। ওর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।

যেদিক থেকে শব্দটা আসছিল তার উল্টোদিকে মুখটা ঘুরিয়ে নিল নারাণ।

কাপড় দেওয়া শুরু হল। আট নম্বর কাপড় পেল নারাণ। লালপাড়। মধুরও তাই। নারাণ চোখ বন্ধ করে মা দুর্গাকে মনে মনে প্রণাম করল। তারপর মধুর সঙ্গে মণ্ডপের বাইরে বেরিয়ে এল।

বাইরে তখন রোদের তাপ। রং পাল্টেছে কিন্তু রোদের ঝাঁঝ তখনও কমেনি। মধু বলল, আর কোন খবর পেলি?

নারাণ বলল, হ্যাঁ পেয়েছি বটে একটা। কাল থেকে আবার ঢাক বাজাবো। আবার কাঠি হাতে নেব। একটা দারুন বাবু পেয়েছি।

মধুর চোখ চকচক করে উঠল প্রত্যাশায়। বলল, পেয়েছিস। কোথায় রে!

নারাণ বলল, এখন বলব না। কাল সকালে নিয়ে যাব। ভুলিস না, এখনও কাঙ্গাল ভোজন বাকি। আবার লাইন দিতে হবে। রাত্রেও কোথাও প্রসাদ খেয়ে কাটাবো। কাল থেকে আর এসব দরকার হবে না। প্রাণভরে বাজাবো।

কথা শেষ করে নারাণ উল্টেপাল্টে কাপড়টা দেখছিল। ভালই। বিনে পয়সায় দিয়েছে বলে যা ইচ্ছে তাই দেয় নি।

মধু বলল, কখন খাবার দেবেরে।

নারাণ বলল, তা ধর বেলা একটা। তার আগে অবশ্য ফল প্রসাদ পাবো। তবে এ-মণ্ডপে নয়। চল ওপাশের মণ্ডপে যাই। ফল প্রসাদটা ওদের ওখানেই খাব। একজনের কাঁধে চেপে এতকিছু করলে জোরজুলুম হয়ে যাবে। বল তাই না?

মধু ঘাড় নাড়লো। ঠিক, ঠিক কথা।

রাত্রিবেলা শোবার আগে নারাণ কাঠিটাকে মাথার কাছে রাখল। মধু তখনও খুব যত্ন করে গামছা দিয়ে ঢাক দুটোকে মুছছে। একবার আঙ্গুল দিয়ে শব্দ তুলে কান পেতে শুনল। বলল, এখনও বলবি না কোন মণ্ডপে বাজাতে যাবো।

নারাণ শুতে শুতে বলল, বলেছি তো এখন কিছু বলব না। কাল ভোরবেলা নিয়ে যাব।

মধু আর কিছু বলল না। পাশাপাশি শুয়ে পড়ল।

ঘুম আর আসে না। একেকবার তন্দ্রা মত আসে আবার কেটে যায়। নারাণ পাশ ফিরে খেয়াল করল মধুরও একই দশা। ঘুম হচ্ছে না। এপাশ ওপাশ করছে কেবল। কখন যে ভোর হবে। রাত কত তাও বোঝা যাচ্ছে না। আকাশের চেহারা রাত বারোটায় যেমন ছিল এখন তেমনি। আবছা আবছা। এতদিন পরে যখন কোন আশা নেই তখন নতুন করে আশার কাজ শুরু করার উত্তেজনায় নারাণ ভেতরে ভেতরে ছটফট করছিল।

এক সময় নারাণ উঠে বসল। কিছুক্ষণ পর মধু বলল, কিরে কতক্ষণ বসে থাকবি? এখনও রাত পোহায়নি। শুয়ে থাক।

নারাণ খুব আস্তে আস্তে বলল, ও, তুইও তবে জেগে।

মধু বলল, ঘুমোলাম কখন!

নারাণ বলল, কতক্ষণ জেগে থাকবি এখনও রাত পোহায়নি। ঘুমিয়ে থাক, মধু আহত বোধ করল, বলল, তুই আমাকে ভোলাচ্ছিস।

নারাণ বলল, নারে। তুই যে জেগে তা আমি অনেক আগেই বুঝেছি। এমন একটা রাতে আমাদের চোখে কি ঘুম আসে রে?

কথা বলতে বলতে ওরা পাখির ডাক শুনতে পেল। নারাণ বসেইছিল। মধু এবার উঠে বসল। সোজা কলতলায় চলে গেল।

নারাণ চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল। বিড়বিড় করে বলল, আজকের দিনটা সদয় থেকো মা। তোমার নাম করে আবার ঢাক তুলে নিচ্ছি। দয়া কর মা।

মধু ইতিমধ্যে ফিরে এসেছে। নারাণ বলল, মধু মা দুর্গার নাম করে ঢাক তুলে নে। চল, এবার যেতে হবে।

মধু বলল, তুই মুখ ধুবি না।

নারাণ বিরক্তিতে ফেটে পড়ল। বকিস বলছি না, তুই আগে মায়ের নাম নে, আমি মুখ ধোয়াটোয়া পরে হবে। মায়ের নাম নিয়ে চল দুর্গা দুর্গা করে রওনা হই।

ওরা দুজনে ঢাক কাঁধে তুলে নিল। কাঁধে গামছা। নতুন কাপড় দুটা আর কাঠি হাতে। চার রাস্তার মোড় থেকে ডানহাতি রাস্তায় ওরা সোজা এগিয়ে গেল। দুপাশে সেলুনার দোকান। বড় বড় সব সাইনবোর্ড। কোথাও নতুন বৌয়ের ছবি আঁকা। গরনায় গা ভরে আছে। রাস্তা একদম ফাঁকা। মধ্যিখান দিয়েও হাঁটা যায়।

বেশী সময় হাঁটতে হল না। স্টেশনের মুখ দেখা যাচ্ছিল অনেক আগেই। নারাণ বলল, বুঝতে পারছিস কোথায় যাচ্ছি?

মধু কিছুই বুঝলো না। বলল কোথায়।

নারাণ বলল, শেয়ালদা ইস্টিশানে। গাড়ীতে গাড়ীতে বাজাব। কাল দেখেছি হারমোনিয়াম বাজিয়ে একটা লোক রোজগার করছে। আজ আমরা দু-দুটো লোক। পুজোর দিনে ঢাক বাজাবো, পয়সা চাইবো, দেখ না কি হয়?

মধুর এতক্ষণের উৎসাহ দপ করে নিভে গেল। বলল, কোন মণ্ডপে তবে যাচ্ছি না। ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

নারাণ বলল, দাঁড়ালি কেন! আমি বলছি তুই দেখ না একটা দিন। তারপর আমাকে বলিস। জানি না কি হবে তবে দেখা যাক।

আসলে মধুকে থমকে যেতে দেখে নারাণের বিশ্বাসের ভিতটাও কেমন যেন নড়ে উঠেছিল। শেষকালে যদি কিছু না হয়। যদি লোক হাসে। যদি জোর করে কাপড় থেকে নামিয়ে দেয়।

ওরা আর কোন কথা বলল না, অনেকটা যন্ত্রের মত পাশাপাশি চলতে লাগল।

শেয়ালদায় তখন খুব বেশী ভিড় নে একটা ফাঁকা ট্রেণ কোথাও রওনা হবে নারাণ ধরমর করে সেদিকে ছুটল।

পছন পেছন মধু। শাঁখের মত শব্দ তুলে ঘণ বওনা হল।

মধু বলল, কোথায় যাচ্ছিরে!

নারাণ বলল, ফিরতি পথে ভিড় হবে। খন একেবারে শেষে চলে যাবো। যেখানে ক থাক না, সেখান থেকে ফেরার পথে মিবায় কামরায় বাজাবো।

চার পাঁচটা স্টেশন পার হতেই জানলা য়ে ধানক্ষেত দেখা গেল, কাঁচা বাড়ী, কাঁচা স্তা, পুকুর, সজনে গাছ, লাউ গাছ। তখন মিবায় ভিড় হতে শুরু করেছে। জানলার কে তাকিয়ে ওরা দুজনেই অন্যমনস্ক য়ে গেল। এক চেহারা সব গ্রামের। বড় াম্ভীর মনে হয়। শহরটা কেমন যেন পর-দেশ। যতক্ষণ দেখা যায়, যতটা দেখা যায়—ওরা দেখছিল।

নারাণ হঠাৎ মধুকে ঠেলা দিল। বলল ন্দ ভিড় হয়নি, পরের স্টেশনে কামরা পাল্টাবো। বাজাতে শুরু করবো। দেরী করবি— আমি বললেই শুরু করবি। চল মধু, ার সামনে দাঁড়াই।

স্টেশন আসতে ওরা নেমে পড়ল। বি দরজায় ঢুকে নারাণ ঠিক দু-দরজার মধ্যিখানে ঢাক নিয়ে দাঁড়াল। পাশে মধু। নারাণ চিৎকার করে বলল, সবাই কাজ চায় পায় না। আমরাও চেয়েছিলাম, কোন মণ্ডপ থেকে ডাক আসেনি। এখন আপনারা যারা মণ্ডপ থেকে দূরে তাদের শোনাবো মণ্ডপের বাজনা। প্রথমে আরতির। —কথাগুলো নারাণ মনে মনে অনেকবার আওড়ে তৈরী করে রেখেছিল। একনিঃশ্বাসে বলে মধুকে বলল, বাজা।

মধু হকচকিয়ে গিয়েছিল। নারাণ হঠাৎ বক্তৃতা দিতে শুরু করল কেন বুঝতে পারছিল না। নারাণকে কাঠি তুলে নিতে দেখে সেও কাঠি তুলে নিল হাতে। ঢাকে বোল উঠল।

ছোকরা মত একজন পাশের জনকে বলল, এরপর মাইরি একদিন দেখা যাবে ট্রেনে বাইজির নাচও হবে। শালা ঢাক নিয়ে এসেছে মাইরি।

মধুর কানে কথাগুলো যেন গরম সিসে ঢেলে দিল। এরকম কথা শুনলে বাজানো যায়! নারাণ তাল বাজতে শুরু করেছে। তাই থামার উপায় নেই। ও বাজাতে লাগল।

মাঝ বয়েসী এক ভদ্রলোক সিগরেট খেতে খেতে বললেন, একটু নেচে নেচে বাজাও। তবে পয়সা দেব।

নারাণ হাঁক দিল, মধু তুই ওপাশে আমি এপাশে। একটু নেচে নেচে বাজা। বাবুরা খুশী হলে পয়সা দেবে।

বোল উঠল। অত ছোট জায়গায় নাচা যায় না, হাঁটু মুড়ে বসে, নাচের ভঙ্গি করে, ছোরার ভঙ্গি করে বোল তুললো নারাণ। আড়চোখে ওর দিকে নজর রেখে মধুও তাই করল। নারাণ দেখল লোকগুলো হাসছে। ও হাসল। ঢাকটা চমৎকার। বোল ওঠে খুব তাড়া। কানে সেই শব্দ যেতে বেশ জোশ পাচ্ছিল নারাণ। যার যা কাজ। কত হাল্কা লাগে ঠিক ঠিক বোলে ঠিক ঠিক আওয়াজ উঠল। কিছুক্ষণ বাজাতেই কপালে ঘাম ফুটে উঠল। মধুর সঙ্গে বোলে বোল মিশিয়ে বাজানো বন্ধ করল নারাণ। বেশী বাজালে চলবে না। পরের স্টেশন এলে নামতে হবে। তার আগে পয়সা চেয়ে নিতে হবে। এপাশে নারাণ হাত পাতলো। ওপাশে মধু।

প্রথম পয়সাটা হাতে পড়তে নারাণের সমস্ত শরীর কেমন যেন করে উঠল। ও হাত তুলে নমস্কার করে পয়সা নিল, সামনের ছেলে কোন পয়সা দিল না, হাত তুলে মাথায় ঠেকাল। অনেকে দিল পাঁচ পয়সা, দশ পয়সা, সিকি। মন্দ উঠলো না। নারাণ মধুকে তাড়া দিল, মধু, নেমে আয় স্টেশন এসে গেছে।

স্টেশনে নামার মুখে নারাণ মধুকে বলল, কি রে কেমন হল। মধুর চোখ চক-চক করছে তখন। বলল, মন্দ নারে, তিন মিনিট বাজিয়ে কমবেশী দু-টাকা পেয়ে গেছি।

নারাণ হাসতে হাসতে বলল, আমার বোধহয় গোটা চারেক টাকা হয়েছে। টাঁকে গুঁজে রাখ।

পরের স্টেশনে পরের কামরায় নারাণ একই বক্তৃতা দিয়ে বাজাতে শুরু করল। এখানেও পয়সা মন্দ উঠলো না। নানা জনে নানা মন্তব্য করল, আবার অনেকে পয়সাও দিল। একটানা দুঘন্টা এ-কামরা সে-কামরা বাজিয়ে ট্রেণ যখন থেমে পড়ল তখন ওদের দুই জন খালি পেটে একটানা অনেকক্ষণ বাজিয়েছে। ট্যাক ভারি হয়েছে। খিদেও চেপেছে। পাশের এক ভদ্রলোককে নারাণ জিজ্ঞেস করল, এটি কি স্টেশন বাবু?

লোকটি বলল, কৃষ্ণনগর।

এখান থেকেই ট্রেণ ফিরে যাবে শেয়ালদা। নারাণ জিগ্যেস করল।

হ্যাঁ। লোকটি জানাল।

নারাণ মধুকে নিয়ে স্টেশনের এক কোণে চলে গেল। জায়গাটা নির্জন। সামনে লেভেল ক্রসিং। একটা অশ্বত্থ গাছ আছে। তারই ছায়ায় বসে বলল, মধু গোনতো প্রথম ক্ষেপে কত হল।

মধু গামছায় পয়সা পেতে গুনতে থাকল। নারাণও সিকির গায়ে সিকি, দশ পয়সার গায়ে দশ পয়সা। আধুলির গায়ে

আধলি, পাঁচ পয়সার গায়ে পাঁচ পয়সা। গুনতে সময় লাগল। মধু বলল আমার হয়েছে তেতাল্লিশ টাকা। নারাণ বলল আমার সাতান্নো টাকা। নোটও দিয়েছে কয়েকটা বাবু।

দুটো শালিক সামনে নেমে এল। বোধ হয় ভেবেছিল গামছায় কিছু খাবার আছে। একটু এ পাশ ও পাশ করে উড়ে চলে গেল। নারাণ বলল, দু-টাকা বাইরে রেখে বাকিটা বেঁধে ফেল। একটু থেমে বলল, কিরে কেমন বুঝছিস।

মধু দাঁত বের করে হাসল। বলল, তুই এত কলও জানিস।

নারাণ পাঁচটা টাকা হাতে নিয়ে মধুকে বলল তোর দু-টাকা দে। চল পেটে ভরে কিছু খাই।

সামনে খাবারের স্টল। মণ্ডা, লুচি আছে। নারাণ গিয়ে বলল পাঁচটা করে লুচি আর পাঁচটা করে মণ্ডা দাও। ভাল আর কি আছে?

দোকানী বলল, সবভাজা আছে। এখানকার বিখ্যাত সরভাজা।

নারাণ বলল, দাও, ওটাও দাও।

কত? পঞ্চাশ না একশো গ্রাম, দোকানী জানতে চাইল।

নারাণ বলল, একশোই দাও, ভাল যখন বলছো।

মধু ফিসফিস করে বলল, হাঁরে দরদাম করছিস না। জলখাবারে এত খরচা করছিস?

নারাণ বলল, সব সময় হিসেব করিস নাতো? এখন খা দেখি।

একটা ভিখিরির ছেলে এসে হাত পাতলো। নারাণ ওর দিকে একটা মণ্ডা ছুঁড়ে দিল। মধু চোখ খুলে তাকাল। ওর দৃষ্টিতে বিস্ময়।

নারাণ বলল, কি দেখছিস! গতকাল ওর মত অমরাও হাত পেতে কাঙ্গাল ভোজনে খেয়েছি। আজ পারছি তাই ওকে দিলাম। নে খেয়েনে। তারপর চা খাবো।

চা খেয়ে দাম মিটাতে মিটাতে ট্রেন ছাড়ার সময় হল। কৃষ্ণনগর স্টেশনটা বড। সহরটা দেখা হল না। নিশ্চয়ই বড শহর। —পরে কোন এক সময়ে আবার দেখে যাব শহরটা, বুঝলি মধু বড় খাসা মিষ্টির এখানে। যেতে যেতে মধুকে বলল নারাণ।

ফেরার পথে বেশ ভিড। ঠাসাঠাসি নয়। তবে সব সিট ভরে গেছে। কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে। নারাণ বলল মধুরে, কাজ তাড়াতাড়ি সারতে হবে, ভিড় ঠাসাঠাসি হলে আর বাজানো যাবে না। চল একেবারে শেষ কামরা থেকে সুরু করি, একেবারে প্রথম কামরায় এসে থামবো।

শেষ কামরায় উঠতে না উঠতেই ট্রেণ ছেড়ে দিল। নারাণ আবার একটা ছোট বক্তৃতা দিয়ে ফেলল। এবার ভাষাটা অন্য। বলল, মা বাবারা, পুজোর সময় ঢাকের বাদ্যি কামরায় কামরায় বাজাচ্ছি, সারা বছর বাজাই না। দায়ে পড়ে এসেছি। বাজনা ভাল লাগলে দয়া করে যার যা ইচ্ছে দেবেন।

কথা বলতে বলতে নারাণ দেখল সামনের সিটে একটি কমবয়সী বউ ওর দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছে। নারাণ আর কোন দিকে তাকালো না। বউটির চোখে চোখ রেখে বোল তুলল, তারপর পাশের বাবুটির দিকে তাকিয়ে হাসল। মধু পেছনে বাজাচ্ছে, নারাণ একমনে খানিকক্ষণ বাজিয়ে হাত পাতল। প্রথমেই বউটির সামনে। হাতে টুপ করে দুটো টাকা পড়লো। নারাণ হাত তুলে নমস্কার করল। আরও অনেকেই দিল। কামরা থেকে নামার আগেই নারাণের হাত ভরে গেল পয়সায়, মধুরও তাই। আঁজলা করে ধরে কোঁচড়ে বেঁধে রেখে নামল। পরের স্টেশনে পরের কামরায় উঠতে হবে।

শিয়ালদহের যে মন্ডপটায় আগের দিন কাঙ্গাল ভোজনে দুপুরবেলা খেয়ে ছিল তার সামনে একটা হোটেলে এসে বসল নারাণ। সঙ্গে মধু।

বেয়ারা এসে বলল কি খাবেন।

নারাণ বলল ভাল মাংস দাও, মাছ দাও ডাল ভাত।

মধু বলল এখানে বোধহয় অনেক খরচ। একবার দামটা জেনে নিলি না।

নারাণ রাগে ঝলসে উঠল। বলল, আবার হিসেব হিসেব করছিস। একটা পয়সাও পেতিনা, ফুটপাতে শুয়ে থাকতি। এখন কোঁচড় ভরতি পয়সা তবু এখনও কিন্তু কিন্তু করছিস।

মধু আর কোন কথা বলল না। নারাণ বলল, এ বেলা কত হয়েছে বলতো।

মধু বলল গুণিনিতো। কি করে বলবো।

নারাণ বলল আন্দাজ বল না। সকালের চেয়ে বেশীত।

মধু ঘাড় নাড়ল। —কত হয় তাহলে? নারাণ জানতে চাইল। সকালে পেয়েছিস তেতাল্লিস এবেলা যদি পঞ্চাশ হয় তবে পাঁচদিন বাজানোর চেয়ে বেশী হচ্ছে না। কালও বাজাবো কত হবে বলতো তাহলে।

মধুর উত্তর দেওয়া আর হোল না। এত বড় বড় প্লেটে সব খাবার আসতে দেখে ও চুপ করে গেল। বেয়ারা সব খাবার নামিয়ে চলে গেলে নারাণ মুচকি হেসে বলল, নেরে কাঙ্গালী এবেলা ভদ্রলোকদের মত খা।

মধু পাশে শুতে শুতে বলল, বুঝলি নারাণ, পয়সা পাচ্ছি বটে তবে আবার হুলও ফুটছে। কতজন কত কথা বলছে। একটা লোক কি বলল জানিস,

নারাণ বলল দেখ মধু এখন আমাদের ভাল লাগা না লাগার সময় না। আমরা এখন অনাথ কার্তিকের মত। যেখানে জায়গা পাবো সেখানে ওঠা ছাড়া আমাদের কোন গতি নেই। এসব কথা এখন বলিস না। ঘুমো।

মধু একটা হাত দিয়ে চোখ ঢেকে শুল। নারাণ পাশ ফিরে। একটু পরে মধুর দিকে ঘুরে নারাণ বলল, মধুরে!

মধু বলল কি।

নারাণ বলল, কাল একটা বেশন ব্যাগ কিনে নিতে হবে। এই কাপড় পয়সা রাখা তা নইলে বড় ঝামেলা হচ্ছে।

মধু বলল হুঁ। তারপর দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ল।

নবমীর রাত্রে খাবার পর মধু বলল নারাণ চল, আজ শেয়ালদার হোটেলে থাকবো। কাল রাতটুকু পোহালেই তো এই শহর ছেড়ে চলে যাবো। চল না।

নারাণ বলল এই কথা। চল।

শেয়ালদার একটা সস্তা হোটেলে ম্যানেজারের ঘরে ঢাকঢোল রেখে ওরা ঘরে শুতে গেল। ঘরে ঢুকে মধু বলল, এবার ভাগ করে নিতে হয়। মোট যা হবে তার দুভাগ তোর একভাগ আমার।

নারাণের চোখ কুঁচকে ছোট হয়ে গেল। বলল, কেন। তুই খেটেছিস আর করছিস। আমি তারজন্য পয়সা নেবো কেন?

মধু বলল তুই তো খোঁজ দিলি। নিবি না।

নারাণ কথার কোন উত্তর দিল না। বলল, দুদিনে আমি পেয়েছি মোট একশো সত্তর টাকা। তুই কত পেয়েছিস।

মধু বলল, একশো একচল্লিশ।

—আর দুটো কাপড় পেয়েছি। খরচা এই দুদিনে ধর তিরিশ চল্লিশ টাকা। তাহলেও অনেক থাকবে। নারাণ একটু চুপ করে থেকে বলল, এবার থেকে যখনই কলকাতায় আসবো শেয়ালদা ইস্টিশনকে আগে চুমু খেয়ে আসবো। এবার কি হত বলতো আমাদের এখানে ট্রেণের খবর না পেলে।

মধু খাটে শুতে শুতে বলল, কি নরম তোষক রে!

নারাণ হাসল, বলল ফুটপাতের চেয়েও নরম।

মধুও হাসল শব্দ করে।

দশমীর দিন সকাল থেকেই মন কেমন করছিল ফেরার জন্য। তবু ওরা বের হল। ট্রেণে ট্রেণে ঘুরে বেলা একটা নাগাদ যখন ফিরে এল তখন ট্যাকটা বেশ ভারী। নারাণ বলল কিরে কেমন হল।

মধু বলল কেনা কেটা কিছু করে ফেলবো। ও বেলা শেয়ালদার ফুটপাথ থেকে বং চংয়ে জামা জুতো সব কিনে নিয়ে যাবো।

নারাণ বলল বিকেলে কেন? চল এখনই খেয়ে দেয়ে কিনে আনি। বেলা করে কি লাভ?

খাওয়া দাওয়া করে ওরা কিনতে বের হল। মধু নিজের মেয়ের বউয়ের জন্য রাবারের জুতো কিনল। নারাণ হাসল বলল মধুরে তোর বউ জুতো পায়ে হাঁটতে গেলে হোঁচট খাবে না তো।

মধু বলল, দাঁড়া দাঁড়া গুলিয়ে দিস্নে দায়া যা আছে কিনতে হবে।

নারাণ বলল আমাকে একটা হার নিতে হবে। সোনার মত দেখতে। চল একটু খুঁজে দেখি।

মধু বলল তুই এসব শাড়ি জামা

কনবিনা?

মধু বলল ওসব ছাড়াই পদ্মা মা খায়না। ওসব পবলে আর রক্ষে নেই। যা চেয়েছে হারই দেব।

ওবা ভিড় ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে চলল। পায়ে পায়ে ভিড়। হাঁটতে গেলে ওর সঙ্গে গুতো লাগে। অল্প একটু গুতেই একটা লোক একটা বাকস নিয়ে সে আছে দেখল, বাকস ভর্তি পাথবের মার নকল সোনাব হাব। নাবাণ অনেকক্ষণ ধে দুটো হাব বেছে নিল, দরাদরি বল না। টাকা গুনে দিল। তারপর াটেলেব দিকে ফিরে আসতে আসতে ক বলল বাস। সব কাজ শেষ। কাল কাল হলেই সোজা বাড়ী। শহুবের খেল তম।

তখনও কোন পাখি ডাকেনি, নারাণ ম থেকে উঠল। কলঘর গিয়ে মুখে থে জল দিয়ে এল। কতদিন পর ঘরে ফিরবে। মার কাপড় নেওয়া , পদ্মার হাব। ফেবার পথে বাজার কে টাটকা সব্জী মাছ কিনে নেবে। স। তারপর ঘুমোবো একটানা অনেক-ণ। পাশে পদ্মা না থাকলে ঘুমটা ঠিক মে না। অভ্যেস হয়ে গেছে।

মধু তখনও ঘুমুচ্ছে। নাবাণ ডাকল ই মধু ওঠ ট্রেণ এসে গেছে।

মধু ধড়মড় কবে উঠে বসল। বাণ বলল এখনও আসেনি। একটু পর াসবে। তুই এখনও হোটেলের ঘরে াচ্ছিস। যা তৈবী হয়ে নে।

হাত মুখ ধুয়ে ওরা পয়সা-কড়ি গুণে হবী হয়ে বসল। দুজনেই দুটো ব্যাগন াগ কিনেছে। তাতেই কাপড় পয়সা গামছা।

নারাণ বলল রইল কত?

মধু বলল তা আশি টাকাব মত।

এত খবচ কবেও এত টাকা নিয়ে ছিস্। এবার থেকে পুজায় আব মণ্ডপে জাবো না। প্রতিবাব এই রকম কামবায় মরায় বাজাবো।

মধু বলল নাবে। এ সহ্য হয়না, ণ্ডপে বাজানো আলাদা ব্যাপাব মায়ের খব দিকে তাকিয়ে বাজানো। তেমনটা ার কোথাও হয় না। এবার তো নেহাৎ ষে পড়ে কবাছি।

নাবাণ বলল যা যাঃ। পয়সাব জন্য হরে এসেছিলাম। পয়সা পেয়ে গেছি। যসাব রাস্তাও চিনে ফেলেছি। আব ষ পাস্টাচ্ছি না।

মধু বলল বিশ্বাস কর নাবাণ এ ক্ষণ ন ভাল কবে ঘুমুতে পারিনি। এ এক ন্ত্রণা। পয়সা পাচ্ছি, কিন্তু আনন্দ চ্ছে না।

পাখিব ডাক শোনা গেল। এই শহরেও ুব ভোরে পাখি ডাকে। কাক শালিক দুই কতকি। ওবা তৈরী হল। আগের দিন রাতেই বিল মিটিয়ে দিয়েছিল। ম্যানে-জারের ঘর থেকে ঢাক-ঢোল নিয়ে বাইবে এসে দাঁড়াল।

ট্রাম বাস্তা তখন ফাঁকা। গত দিনের আবর্জনা বাস্তার একপাশে জমে আছে। ফুটপাতে অনেকের ঘুম তখনও ভাঙেনি। কয়েকজন ঘুমন্ত মানুষকে ডিঙিয়ে ওবা রাস্তায় এসে পৌঁছল। এবার শেবালদাব দিকে পিঠ দেখিয়ে সোজা চলে যেতে হবে মাইল দুয়েক পথ। তাহলেই হাওড়া বীজ। ওপাবে হাওড়া ষ্টেশন। বাস। বাড়ী ফেবাব আর দেবী নেই।

স্টেশনে পৌঁছে ওরা আগে টিকিট কেটে নিল। প্ল্যাটফর্মে তখন সবে ট্রেণটা এসে দাঁড়িয়েছে। একদম সামনের বগীটায় উঠে পা ছড়িয়ে বসল ওবা। নাবাণ বলল, এবার নিশ্চিন্ত। ট্রেণ ছাড়লেই প্রতি মিনিটে দেশের দিকে এগিয়ে যাবো।

চায়ের কেটলি নিয়ে একটা ছেলে যাচ্ছিল। মধু তাকে ডাকল। দুজনে দুভাঁড় চা খেল। অত সকালে কম লোকই ট্রেণে ওঠে। বিশেষ করে ছুটির দিনে। ট্রেণ ছাড়াব সময় হল। কামরায় তবু অন্য কোন লোক উঠলো না। নারাণ বলল গোটা বগীটা আমাদেব যে বে মধু।

মধু কিছু বলল না, হাসল।

সাঁতাগাছি পার হতেই সেই ছবিটা আবাব জানালাব গায়ে ভুস করে ভেসে উঠল। পুকুব কাঁচাবাড়ী সজনে লাউ কুমড়ো গাছ, বাঁশের বেড়া নারাণ একদৃষ্টে দেখছিল, ওব মনে পড়ছিল এমনি একটি পুকুরে পদ্মা বাসন মাজে এমনি একটা সজনাব ডাল থেকে সজনা পাড়ে আবার দিয়ে। মধু অন্যমনস্ক, একটা খাবাপ কাজ করে ফেললে যেমন দেখায় ক্রমশ ওব মুখ তেমনি হয়ে উঠছিল। নাবাণ বলল কিরে তোর মুখ এমন কেন।

মধু বলল কি করতে এসেছিলাম, আব কি করে ফিবে গেলাম বলত?

নাবাণ বুঝতে না পেরে বলল তার মানে?

মধু বলল মন্ডপেব বদলে ট্রেণেব কামবায় বাজিয়ে এখন ফিরে চললাম।

বাইবে ধানক্ষেতে তখন বাতাস দিয়েছে, যেখানে গাছ সেখানে বাতাসেব ঢেউ। নাবাণ সেদিকে চোখ রেখে বলল, আমি এসে-ছিলাম পয়সা কবতে। পয়সা করে এখন ফিরে চলেছি।

ওবা বেউ আব কোন কথা বলল না। নাবাণ বাইবেব দিকে তাকিয়ে রইল। মধু চোখ বুজে বসে রইল পাশে।

স্টেশনে পৌঁছে নাবাণ গেল দক্ষিণ দিকে বাজাব কবে ফিববে। মধু পশ্চিমদিকে।

পদ্মা দূব থেকে দেখতে পেয়েছিল সে আসছে, তাড়াতাড়ি মাকে ডাকল মা দেখে যান কত কি নিয়ে এসেছে।

সব্জীব ভারে তখন নারাণ একদিকে ঝুঁকে পড়েছে। এক কাঁধে ঢাক একগাল হাসতে হাসতে কাছে এসে বলল তোমবা যে যা চেয়েছো সব এনেছি।

নাবাণের মা বলল সব কথা পরে হবে। কত পবিশ্রম করে এয়েচিস। আগে দুদণ্ড ঘর বোস। আমি সরবত কবে আনছি।

নাবাণ লক্ষ্মী ছেলের মত সুরসুর করে ঘরে ঢুকে পড়ল। ওর পেছনে পেছনে পদ্মা।

বাইবে থেকে মার গলা পাওয়া গেল। এই নাবাণ সরবত এনেছি। —আসলে দাওয়া থেকে হাঁক পাড়তে পাড়তে মা আসছিলেন। সময় মত পদ্মা সরে গেল। নাবাণ শব্জী সবিয়ে একদম তলা থেকে মার শাড়ি বেব করে বলল দেখ পছন্দ হয়েছে।

নাবাণের মা আহ্লাদে আটখানা। পদ্মার দিকে হাবটা এগিয়ে দিতে দিতে বলল এটা তোমাব।

নারাণের মা কাপড়টা দুহাতে মাথায় তুলে বললেন সবই ঠাকুরের দয়া। এবার তো বাবুবা খুব ভাল দিল। আবার ওদের কাছে কাজ পাবিত।

নাবাণ বলল বাবুবা তো আমায় ছাড়ছিল না, বলছিল কালীপুজো পর্যন্ত চলে এলাম।.....

বাড়ীব দিকে যত এগিয়ে আসছিল মধুব মুখ তত গম্ভীর হচ্ছিল। অন্যান্যবার এত জিনিষ সে আনে না, এত টাকাও সব বাব সঙ্গে থাকে না। কিন্তু এবারের মত এমন কোনবাব হয়নি। টাকা কম হোক বেশী হোক মন্ডপেই সে বাজিয়েছে। এবাব ঢাক পয়সা দিয়েছে কিন্তু মন্ডপে পৌঁছতে দেয় নি।

মধুব বৌ বাচ্চাকে কোলে নিয়ে ছুটে এল। মধু ঢাকটা কাঁধ থেকে নামিয়ে ব্যাগটা বৌয়ের দিকে এগিয়ে দিল তাবপব হাত বাড়িয়ে বাচ্চাটাকে টেনে নিল কোলে।

বৌ কাপড় জামা জুতো বের কবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল বলল কবেছো কি? একটা গোটা বাজারকে যে কিনে এনেছো গো?

পোষাক জুতো জামা গুছোতে গুছোতে মধুব বৌ বলল, হে ভগবান প্রতি বছব যেন এই বাবুর কাছেই ও বাজাতে পায়।

মধু একটা কাটা পাঁঠার মত আর্তনাদ করে উঠল। বাচ্চাটাকে কোল থেকে নামিয়ে দাওয়াই বসিয় দুহাতে বৌয়ের কাঁধ ধরে বলল না নাবে না। এমন কথা মুখেও আনিসনা। এমন বাবুর কাছে জীবনে যেন আব বাজাতে না হয়।

মধুর বৌ কেন মধু এরকম আর্ত-নাদ করে উঠলো তা বুঝতে না পেরে হকচকিয়ে গেল। মুখ তুলে তাকিয় দেখল মধু ঠোঁটে ঠোঁট চেপে দাঁড়িয়ে আছে, নাকের পাটা উঠছে নামছে ওব চোখ বেয়ে টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে। মধু মুখে কিছু বলছে না সমানে ঘাড় নেড়ে যাচ্ছে।

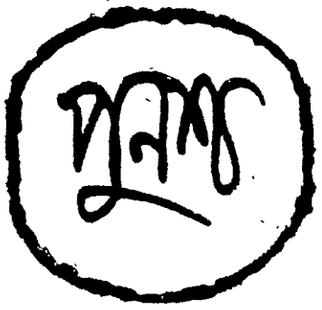

প্রাচীন গ্রন্থ 'সংস্কৃত কোকিলদূত কাব্য' প্রণেতা হরিমোহন প্রমাণিকের নাম আজ কদাচিৎ কোন বিদ্বজ্জনের স্মরণে উদয় হয় কিনা সন্দেহ। কিন্তু তাঁর অন্যতম গ্রন্থ ১৩০২ সালে প্রকাশিত 'ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময় নিরূপণ' বহুকাল অপ্রকাশিত হয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকলেও, আজ কোন বিশিষ্ট প্রকাশন সংস্থা কর্তৃক পুনঃপ্রকাশের যথেষ্ট সার্থকতা আছে। এই গ্রন্থের অংশ বিশেষ আজ যদিচ্ বিভিন্ন কয়েকটি অভিধানের মধ্যে সংশ্লিষ্ট হয়েছে এবং কয়েকজন জীবনী-অভিধানকারও কেবলমাত্র সামান্য ভাষান্তর করে এই গ্রন্থের যে বহুলাংশ গ্রহণ করেছেন, তা যথাযথ স্বীকৃত হলে পরিতাপের বিষয় ছিল না, কিন্তু কেউই এই সাধারণ সৌজন্যটুকু পর্যন্ত ব্যক্ত করেন নি। অথচ জীবনীকার হিসাবে বিগত দিনের পথিকৃৎ হরিমোহন যেমন এক নূতন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছিলেন, তেমনি 'কমলা কুচপা বিলাস' নামক সংস্কৃত নাটক, ইংরেজীতে 'এ্যান এ্যাড্রেস টু ইয়ং বেঙ্গল' প্রভৃতি প্রবন্ধাদি রচনা করে যথেষ্ট খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন তিনি।

আলোচ্য 'ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময় নিরূপণ' গ্রন্থের প্রথম পর্বে তিনি কামন্দক, ভর্তৃহরি, ক্ষপণক, বিষ্ণুশর্মা, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, ভারবি প্রভৃতি ৩০ জন কবির বর্ণনা দেন। দ্বিতীয় পর্বে আমরা পাই বাণভট্ট, শ্রীহর্ষ, অমরু, ভবভূতি, দামোদর, সোমদেব, রাজশেখর, দণ্ডী হলায়ুধ হনুমান মল্লিনাথ শার্ঙ্গধর ও বিল্বমঙ্গল প্রমুখ ৭০ জনের নাম। তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বে আছেন, বিষ্ণুপুরি, কৃষ্ণদাস, কবিরাজ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ঘনশ্যাম দাস, শ্রীজীব গোস্বামী, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, ভাবতচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম, বিশ্বনাথ কবিরাজ, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি ৩৯ জন, এবং শেষ আধুনিক পর্বে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভারানাথ তর্কবাচস্পতি, কবিকেশরী, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ প্রভৃতি নামধেয় ২২ জন কবির কথা।

এঁদের জীবন-কথাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত হলেও, প্রয়োজনীয় তথ্যাদিভূবিষ্ঠ। এই গ্রন্থের প্রথম পর্বের বিষ্ণুশর্মা এবং দ্বিতীয় পর্বের 'শ্রীজয়দেব' বিষয়ক রচনা দুটি এস্থলে আমরা উদ্ধৃত করে দিলাম। এই দুটি রচনার গুরুত্বই গ্রন্থখানি সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করবে।

।। বিষ্ণুশর্মা ।।

ইঁহাকে পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের প্রণেতা বলিয়া অনেকেই স্বীকার করেন। কিন্তু এ বিষয়ের কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। ফলতঃ এই উভয় গ্রন্থ যে এক ব্যক্তি কর্তৃক রচিত হইয়াছে, ইহা কখনই বোধ হয় না। বিশেষতঃ হিতোপদেশের রচনাকর্তা লিখিয়াছেন যে, আমি পঞ্চতন্ত্রের ও অন্যান্য গ্রন্থের সার সঙ্কলন করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলাম। ইহাতে হিতোপদেশ রচনাকর্তা ও পঞ্চতন্ত্রের রচনাকর্তা উভয়ে এক ব্যক্তি বলিয়া কদাচই বিশ্বাস হইতে পারে না। পঞ্চতন্ত্রে ও হিতোপদেশে বিষ্ণুশর্মা বক্তা, রাজপুত্রগণ শ্রোতা; বোধ হয় তন্দর্শনেই বিষ্ণুশর্মা উভয় গ্রন্থের রচনাকর্তা বলিয়া তাঁহাদের ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকিবে। নল্লুলাল হিতোপদেশকে নারায়ণ পণ্ডিত প্রণীত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

পঞ্চতন্ত্রকর্তা একজন অতি প্রাচীন গ্রন্থকার। তাঁহার রচিত পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থ অন্যান্য দেশেও বহুকালাবধি প্রচলিত আছে। আবুল-ফজল্ নামক একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্তা পারসিক ভাষাতে এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া তাহার ভূমিকাতে লিখিয়াছেন যে, বিদ্পাই নামক এক ব্রাহ্মণ এক রাজাকে এই গ্রন্থ উপদেশ করিয়াছিলেন। ইহাতে অনুমান হয় যে, বিদ্পাই শব্দ ব্রাহ্মণের কোন উপাধির বিকৃতি হইতে পারে এবং ইহা বাজপেয়ী হওয়াও অসম্ভব নহে।

আবুলমান নামক পারসিক গ্রন্থকর্তার অনুবাদিত কলীলঃ দমনার ভূমিকা অনুসারে আবুল-ফজল্ ও হুসেন ওয়াফেজ লিখিয়াছেন যে, পারসিক রাজা নওসেরওয়াঁ যিনি ৪৫২ শকে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তিনি একজন বিদ্বান্ চিকিৎসককে কলীলঃ দমনঃ নামক গ্রন্থ আনিবার জন্য ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। সেই চিকিৎসক তথা হইতে উক্ত গ্রন্থ সঙ্গে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। প্রথমতঃ তাহা রাজাজ্ঞানুসারে প্রাচীন পারসিক ভাষা পহ্লবীতে অনুবাদিত হইল; পরে তাহা হইতে আবুল-জফর মনসুর আরব-সম্রাটের অনুমতিক্রমে আরবী ভাষাতে বিবৃত করিল। তাহা হইতে আবুলহোসেন নসরুদ্দীন আহম্মদ রাজকুমারের আদেশক্রমে পারসিক ভাষাতে উদ্ধৃত করিলেন ও বুদ্‌ফী নামক কবি দ্বারা তাহার শ্লোক প্রস্তুত হইল। তদনন্তর আবুল মজফ্ বহ্রাম সাহের আদেশানুসারে আবুল মালের দ্বারা পুনর্বার আরবী ভাষাতে তাহার গদ্য প্রস্তুত হইল। তৎকালাবধি এই আবুল মালের ভাষিত গ্রন্থ কলীলঃ দমনঃ নামে খ্যাত আছে। তৎপরে কিছুদিন ওয়াফেজ এবং আবুল ফজল্ পারসিক ভাষাতে ইহার বিবরণ করিয়াছেন। পরে এই গ্রন্থের প্রতিরূপ মলনাহোসেন কর্তৃক পারসিতে আনেয়ার সুহেল নামক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

হিতোপদেশের মধ্যে শূদ্রক রাজার ও তৎকৃত মৃচ্ছকটিকের নায়ক বিশেষ চারুদত্তের নাম উল্লেখ আছে এবং এক স্থলে 'সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াং' ইত্যাদি ভারবির রচিত শ্লোকটিও লেখা আছে; ইহা দ্বারা উক্ত গ্রন্থকর্তার বর্তমান সময়ের অনুধাবন করিবেন।

।। শ্রীজয়দেব ।।

ইনি মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইহার সবিশেষ প্রমাণ পূর্বেই 'উমাপতিধরের' প্রসঙ্গে লেখা হইয়াছে। 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের প্রথমে যে ইংরাজী মুখবন্ধ আছে, তাহাতে ইঁহাকে খৃষ্টীয় ৮০০ শতাব্দীতে বর্তমান বলিয়া অনুমান করিয়াছেন; কিন্তু ইহা প্রমাণসিদ্ধ নহে।

কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেবের বাস ছিল। অজয় নদীর উত্তর তীরে কেন্দুলি নামে যে গ্রাম আছে, জয়দেব তাহাকেই কেন্দুবিল্ব নামে নির্দেশ করিয়াছেন। ঐ কেন্দুলি গ্রামে অদ্যাপি জয়দেবের স্মরণার্থ প্রতি বৎসর পৌষ মাসে বৈষ্ণবদিগের মেলা হইয়া থাকে।

জয়দেবের রচিত গীতগোবিন্দ গ্রন্থের মাধুর্যরসে মুগ্ধ হইয়া অনেকেই তাঁহাকে অসামান্য ব্যক্তি বলিয়া মান্য করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় লোকেরা জয়দেবের প্রতি যেরূপ বিশ্বাস করেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় 'ভক্তবিজয়' নামে এক গ্রন্থ আছে; তাহাতে জয়দেবকে ব্যাসদেবের অবতার বলিয়া লিখিয়াছে।.....

পক্ষধর মিশ্রোপ নামক অপর একজন জয়দেব ছিলেন। ইঁহার অপর নাম পীযূষবর্ষ। চন্দ্রালোক ও প্রসন্নরাঘবের কর্তা জয়দেবের পিতার নাম মহাদেব ও মাতা সুমিত্রা; ইনি কৌণ্ডিল্য গোত্রজ। ইঁহার সহিত রঘুনাথ শিরোমণির বিচার হইয়াছিল।...ঐ শিরোমণি এবং রঘুনন্দন স্মার্ত ও শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপের বাসুদেব সার্বভৌমের ছাত্র।

ইঁহার রচিত গ্রন্থ—'রতিমঞ্জরী' ও 'চন্দ্রালোক'। 'প্রসন্ন রাঘব' নাটক এই জয়দেবের কৃত কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। ঐ গ্রন্থের শেষে লেখা আছে, 'মহামহোপাধ্যায় তার্কিক জয়দেব মিশ্র বিরচিত', জয়দেব গোস্বামী লেখা নেই।

'প্রসন্ন রাঘব' নাটকের প্রস্তাবনাতে জয়দেব যে সকল কবির নামোল্লেখ করিয়াছেন, এক্ষণে লেখা যাইতেছে। ইহা দ্বারা কোন্ কোন্ কবি তাঁহার পূর্ববর্তী ছিলেন, তাহা প্রকাশ হইবে—

যার শিরে শোভে চোর চিকুর চিকুর।
মরুর যাহার কর্ণে মণিকর্ণপুর।।
ভাস যার ভাস, হর্ষ হর্ষের প্রকাশ।
কবীন্দ্র শ্রীকালিদাস যাহার বিলাস।।
পঞ্চবাণ বাণ যার হৃদয় মাঝারে।
কবিতা কামিনী হেন না ভুলায় কারে।।*

ক্ষপণক

* সংস্কৃত হইতে বঙ্গানুবাদ

ইন্দ্র দুগার

অবনীন্দ্রনাথ অনুসৃত নব্যবঙ্গীয় চিত্র-শৈলীকে আশ্রয় করে অবনীন্দ্র অনুরাগী-দের মধ্যে অনেকেই কালের গণ্ডীকে অতি-ক্রম করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মনে হয় এক-মাত্র নন্দলাল ও ভেঙ্কটাপ্পা এই নবীন চিত্ররীতি থেকে দূরে সরে গিয়ে স্বকীয় মহিমায় স্বপ্রতিষ্ঠ। ভেঙ্কটাপ্পার কতিপয় চিত্রে পাশ্চাত্য রীতির স্পর্শ থাকলেও নন্দ-লালের শিল্প কৌশলে তা প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। অর্থাৎ তিনি তথাকথিত নব্য বঙ্গীয় চিত্ররীতি এবং পাশ্চাত্য শৈলী থেকে সরে গিয়ে নতুন দিগন্তের সন্ধানে যাত্রা করেছেন। আর নন্দলালের শিল্প আব-হাওয়ায় যে কজন শিল্পীর তুলি রং ও রেখার আলোড়নে সোচ্চার হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলেন ইন্দ্র দুগার।

নন্দলালের সঙ্গে দুগারের পরিচয় বাবার দৌলতে। বাবা হীরাচাঁদ দুগার ছিলেন সেকালের একজন খ্যাতিমান শিল্পী। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য। ১৯১৯ সালে শান্তিনিকেতনে কলাভবনের জন্মলগ্নের প্রথম বর্ষে যে চারজন ছাত্র প্রথম শিল্প-দীক্ষায় দীক্ষিত হয়েছিলেন। হীরা-চাঁদ দুগার তাঁদেরই একজন। অপর তিন-জন হলেন অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণ কিঙ্কর ঘোষ ও ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবশর্মা। শুনেছি অনতিকাল পরে অসিত হালদার ও সুরেন্দ্রনাথ করও যোগদান করেছিলেন। তবে নন্দলালের কাছেই হয়েছিল এঁদের শিক্ষার হাতেখড়ি।

ইন্দ্র দুগার বাড়ীতে বাবার মাধ্যমে শিল্প সান্নিধ্যে এলেও শিল্পের ব্যাকরণ সম্মত মূল বিষয়গুলোর সঙ্গে পরিচয়ের অবকাশ পেয়েছিলেন নন্দলালের সাহচর্যে। পিতার সুবাদে ১৯৩১ সালে নন্দবাবুর সঙ্গে শিল্পীর সাক্ষাৎ পরিচয়। জন্ম জিয়াগঞ্জে ১৯১৮ সালে। স্কুলে পড়তেন। তবে ছবি আঁকার নেশাতেই মশগুল হয়ে থাকতেন। স্কুলের ছুটি হলে ছবি পাক করে নিয়ে গিয়ে হাজির হতেন কলাভবনে।

নন্দবাবু ছবি দেখে ভুল শুধরে দিতেন। বুঝিয়ে গল্পের ছলে বলতেন নানা আখ্যান উপাখ্যান। এইভাবেই শৈশবে শিল্পীর মনে শিল্পের বনিয়াদ গড়ে উঠেছিল।

একবার স্কুলে হেড মাস্টার মশাই কার কি এমবিশনা লিখতে বললেন। ইন্দ্র দুগার লিখলেন—আমি শিল্পী হতে চাই। হেড মাস্টার মশাই লেখা দেখে বললেন—হতে চাই কেন? 'হব' লেখ। সেদিনই মনে এক দৃঢ় আর প্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শিশু শিল্পীর।

১৯৩৭ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর শিল্পীর বাসনায় বাদ সাধলেন বাবা। নিজে শিল্পী হয়ও ছেলেকে ইনজিনীয়ারিং পড়াতে চাইলেন একান্তই তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে। সেই অভিপ্রায়ে দুগার কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই এস সি পাস করলেন কোনো রকমে। অঙ্কে পণ্ডিত দুগার বুঝলেন বিজ্ঞান তাঁর ধাতে সইবে না। তাই বিদ্যাসাগর কলেজে রাতে বি-কম কোর্সে ভর্তি হলেন। আর দিনের বেলা অতিবাহিত করতে লাগলেন চিত্র-চর্চায়।

এমন সময় এক অভাবনীয় স্বীকৃতি শিল্পীর চলার পথে এনে দিল অনেকখানি প্রেরণা। ১৯৩৯ সালে রামগড় কংগ্রেস অধি-বেশনের মণ্ডপ সজ্জা ও অলংকরণের জন্যে সারা ভারত থেকে চারজন শিল্পীর ডাক পড়ল। ইন্দ্র দুগার বাদে বাকী তিনজন তখন শিল্পী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। এখানে সাজসজ্জা ছাড়াও ইন্দ্র দুগার সমবেত ভাবে আঁকলেন 'হিস্ট্রি অফ বিহার' পর্যায়ের চিত্রা-বলী। পরবর্তীকালে ১৯৪৯ সালে জয়পুর ও ১৯৫৬ সালে অমৃতসর কংগ্রেস অধি-বেশনেও ঐ কাজে শিল্পীর ডাক এসেছিল।

১৯৪৬ সালে ইন্দ্র দুগারের শিল্পী-মানসে এক নতুন শিল্পবোধের ছায়া পড়ে। সেটা যুদ্ধের পূর্বের অবস্থা। আকাশে বাতাসে যুদ্ধের দামামা বাজছে। দুর্ভিক্ষ মহামারীতে দেশ ভরে গেছে। চারদিকে হাহাকার। শিল্পীদের তুলিতে সমকালীন ঘটনার অভিঘাত দিনের আলোর মত স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল। গোপাল ঘোষ যখন সৈন্য জয়নুল আবেদিন প্রমুখের তুলির টানে সজীব হয়ে উঠতে লাগল সম-কালীন সংঘাত। ইন্দ্র দুগারও বাদ গেলেন না। বেশ কিছু হাহাকারের ছবি আঁকলেন। নিয়ে গেলেন শান্তিনিকেতনে নন্দবাবুকে দেখাবেন বলে। ছবি দেখে নন্দবাবু বললেন —ইন্টারেস্টিং কি জানো? এ ছবি এঁকেছো ভালই করেছো। এর মূল্য যতদিন এই অবস্থা থাকবে। অবস্থার পরিবর্তন হলে সাময়িকভাব গর্ভে হারিয়ে যাবে ঐ সব ছবি। যে ছবি কালের গণ্ডীকে অতিক্রম করে বেঁচে থাকতে পারে সেই ছবিই হয় ইটারনাল। গুরুর কথা শুনে ইন্দ্র দুগারের মনে হল—যা এঁকেছি সব মিথ্যে। ছবি আঁকতে ভাল লাগে আঁকি। কিন্তু ছবিতে কালোত্তীর্ণ করার কথা ত কোনদিন ভাবিনি।' বিদ্যুৎ চমকের মত কথাগুলো মনের গভীরে ঘুর পাক খেতে লাগল।

এ ঘটনার কয়েক মাস পরে নন্দলাল দুর্ভিক্ষের ছবি আঁকলেন ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীতে আশ্রয় করে। ছবির তলার দিকে দিলেন—অন্নপূর্ণা।—যার ঘরে সে কাঁদে অন্নের তরে। এই রসোত্তীর্ণ কালজয়ী ছবিটি দুগারের নতুন করে ভাবতে শেখাল।

খুঁজতে লাগলেন নতুন পথের সন্ধান। এক অস্থিরতার অবসাদ ক্লান্ত হয়ে ফিরে গেলেন রাজগীরে। সেখানে হীরাচাঁদ দুগার অঙ্কিত রাজগীর পর্বতমালার চিত্রাবলী দেখে উজ্জীবিত হলেন। ওখানে বসেই একের পর এক বারটি নিসর্গ চিত্র আঁকলেন। আকৃতি যোজনায় রেখায় বর্ণে এল নতুন আস্বাদ। নতুন গন্ধ। প্রকৃতির প্রতি শিল্পীর আশৈশব আকর্ষণের ফলে মরীচিকা দূরন্তর প্রান্তর দিগন্ত বিস্মৃত পর্বতমালা গঙ্গা ফলপাতা চিত্রকল্পের প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে উঠল।

একালের চিত্রশিল্পী

ইন্দ্র দুগারের আঁকা মহাবলীপুরম

১৯৪৬ থেকে তিনি জীবন ভিত্তিক গঠনরীতি থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে আঁকলেন প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনের দিকে। কলকাতায় এসেও মনোনিবেশ করলেন নিসর্গ চিত্র রচনায়। বিষন্ন বর্ণে রঞ্জিত ছবিতে এল কিছুটা স্বকীয় নতুন পরিবেশ। এই সময়ে প্যারিসে ইউনেসকোর উদ্যোগে আয়োজিত ইন্টারন্যাশন্যাল মডার্ণ আর্ট একজিবিসনে চল্লিশটি ভারতীয় ছবির মধ্যে শিল্পীর একটি নিসর্গ চিত্র স্থান পেয়েছিল সাগ্রহে।

শিল্পীর সাবলীলতা জল রংয়ের কাজে। কৈশোর থেকে এ পর্যন্ত যা কিছু ভাঙ্গা চোরা পরীক্ষা নিরীক্ষা সবই জলরংয়ের মাধ্যমে। এক সময় তৈলচিত্র অঙ্কনের প্রত্যাশায় উদয়পুর গিয়ে তৈলরংয়ের ছবি এঁকে নিয়ে গেলেন আচার্য নন্দলালের কাছে। একঘর লোকের সামনে ছবি দেখে গুরু মুখে ইষৎ হাসির রেখা টেনে বললেন—ইন্দ্র আজকাল ঘি ছেড়ে বনস্পতি ধরেছে। আমিষ ছেড়ে নিরামিস্ খাচ্ছে।' এর পর থেকে আর কোনদিন তৈলচিত্র করেননি। গুরুর নির্দেশমত জলরংয়েই কাজ করেছেন।

আর একবার প্যাস্টেলে কাজ করার ইচ্ছে হল। গুম্ফকুটের ছবি এঁকে দেখালেন শিল্পী বন্ধু গোপাল ঘোষকে। তার হাতে পরে প্যাস্টেলের ছোঁয়ায় গুম্ফকুটের চিত্র রঙের দৃশ্যে রূপান্তরিত হল। প্যাস্টেলের কাজেও এখানেই ইতি।

কিছুকাল পর পাশ্চাত্য শিল্পের সূত্র সন্ধানে বিদেশ যাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। ছাত্রের মানের কথা জানতে পেরে নন্দলাল বললেন—অজন্তা ইলোরা কিংবা শ্রবন বেল গোলার বাহুটি ফুটের মূর্তি দেখেছ? নিজের দেশে এত ধনবত্ব থাকতে বিদেশে কেন? ইন্দ্র দুগার বিদেশ যাওয়ার পরিবর্তে স্বদেশ ভ্রমণে বেরোলেন। প্রায় দু বছর ভারত ঘুরে ঘুরে আঁকলেন প্রাকৃতিক অজস্র দৃশ্য। আঁকলেন উদয়পুর জয়পুর ওড়িষ্যা ও রাজস্থানী চরিত্রের কয়েক শত রঙীন মিনিয়েচার। এরপর পশ্চিম জার্মাণীর বিভিন্ন স্থানে শিল্পীর চিত্রকলার প্রদর্শনী চলেছে। কিন্তু বিদেশে যাওয়া হয়নি।

শিল্পী একের পর এক দেখছিলেন পল্লী প্রকৃতির নিসর্গ চিত্র। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে শিল্পীর সজীব তুলির টানে। জিয়াগঞ্জ বেনারস রাজগীর পুরী দার্জিলিং রাজস্থান দুমকা শান্তিনিকেতন এবং দক্ষিণ ভারতের ওপর অঙ্কিত অজস্র ল্যান্ডস্কেপ ইন্দ্র দুগারের প্রকৃতি প্রেম ও সৌন্দর্য চেতনার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এ সব ছবি দেখে শিল্পীর শিল্পবহিসত্তার প্রাণবস্তুকে সহজেই বুঝে নেওয়া যায়। এ অর্থে ইন্দ্র দুগারকে নিসর্গের চিত্ররূপ বলে অনায়াসে আখ্যায়িত করা চলে। কৃষ্ণাশায় মোড়া সকাল আঁকতে তিনি সিদ্ধহস্ত। জিয়াগঞ্জের গঙ্গা বহুবার বহুভাবে ধরা দিয়েছে তাঁর ছবিতে। পর্বতময় অরণ্যানীর রূপঐশ্বর্য তাঁর চিত্রকল্পের অন্যতম অবলম্বন বিষয়। তাঁর চিত্রে বিস্মৃত প্রান্তর স্রোতস্বিনী সমুদ্রের চর মন্দির নানান রূপে নানান রঙে রঞ্জিত হয়ে এক মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি করে। তাঁর অধিকাংশ চিত্রকর্মই ওয়াশ টেকনিকে।

ইন্দ্র দুগারের তুলিতে এ-সব নিসর্গ চিত্র দেখে মনে হয় তিনি মাটির বড় কাছাকাছি। তবে তাঁর ছবির পরিবেশ ভীষণ নির্জন। নিঃসঙ্গ। পাখী, প্রজাপতি ইত্যাদি কিছু জীব ছাড়া ছবির আওতায় অন্য কোন প্রাণীর অস্তিত্ব প্রায় নেই। অত্যন্ত হালকা এবং নরম রঙের ব্যবহারে ধূসর স্বপ্নময় এবং ছায়াময় পরিবেশে আচ্ছন্ন চিত্রে শরীর যেন মস্তব স্বপ্নের আলো-আঁধারিতে হারিয়ে যেতে হয়। নন্দলাল বসুর কথা দিয়ে বলি—'ইন্দ্র দুগারের ছবি প্রকৃতির হুবহু নকল নয়। আবার একেবারে মনগড়াও নয়। তার মধ্যে আছে শিল্পীর অন্তরের আনন্দ, ভাব, রস ও ছন্দ যা শিল্পের প্রাণ।'

শিল্পীর রূপকল্পের আর একটি প্রিয় বিষয় ফুল। লিলি, গোলাপ, পলাশ, পদ্ম প্রভৃতি ফুলের সৌরভ চিত্রে শতধারায় উৎসারিত। কেবল ফ্লাওয়ার স্টাডি করে কাটিয়েছেন বছরের পর বছর। মুগা বা সিল্কের ওপর কাজ করার ফলে এক অদ্ভুত টেকসচার বিরাজ করে ছবিতে।

শিল্পের উৎস সন্ধানে শিল্পী নন্দলালের কাছে যে রাজপথের নিশানা পেয়েছিলেন, এখনও সেই পথেই চলছেন। নন্দলালের কথা তুলতে শিল্পী সবিনয়ে বললেন—এমন আদর্শ শিক্ষক দেখিনি। ছাত্রদের সব রকম ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখেরও সংবাদ রাখতেন। সাধ্যমত সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। কোন দিন কারুর ড্রইং-এ হাত দিতেন না। অন্যত্র এঁকে দেখাতেন। দাঁড়ান, আপনাকে কয়েকটা পুরোন ড্রইং খাতা দেখাই। তাহলে বুঝতে পারবেন বলে চলে গেলেন পাশের ঘরে।

কিছু সময় পরে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে একটা ড্রইং-খাতা এনে পাতা ওলটাতে লাগলেন। দেখুন এই পাতাটা—বলে এগিয়ে দিলেন খাতাটা আমার হাতে। দেখি পাতার একপ্রান্তে রাজস্থানী নারীর প্রতিকৃতি। অপর প্রান্তে নন্দবাবুর আঁকা সংশোধিত ড্রইং। ড্রইং-এর তলায় নন্দবাবুর স্বহস্তে লেখা নির্দেশ—'ছবির প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে শিল্পী প্রবেশ করবে। ছবির বস্তু ও শিল্পী এক। তার মধ্যে নড়াচড়া, ভাবা, তোমারই নড়াচড়া, ভাবা।' অপর এক পাতায় গুরু নন্দলাল এক ত্রিভুজাকৃতি ড্রইং-এর মাধ্যমে বুঝিয়েছেন কেমন করে নেচার, ট্রাডিসান, অরিজিন্যালিটি—এই তিনের সমন্বয়ে একটি ছবি হয় মাস্টারপীস।

এক প্রশ্নের উত্তরে শিল্পী জানালেন—'আমার ছবি সম্পর্কে কে কি ভাবেন জানি না। তবে আমি কাজ করে যাচ্ছি এখনও অন্তরের সাড়া পাই বলে। একটা বিশেষ বিশ্বাস নিয়ে এগোচ্ছি। এ-বিশ্বাস ব্যক্তিগত অনুভবের ফলশ্রুতি। আমি কাজে বিশ্বাসী। বেশী কথা বলে বিতর্কে যেতে চাই না। আমার কাজই আমার শেষ উত্তর। তার চেয়ে বরং বসুন আপনাকে আমার সদ্য আঁকা কয়েকটা ছবি দেখাই।

পাশের ঘর থেকে একগোছা ছবি এনে শিল্পী দেখালেন একের পর এক। আগের তুলনায় তাঁর সম্প্রতিক চিত্রকলার ভঙ্গী ভিন্ন। সীমিত অস্পষ্ট বৈথিক বন্ধনে, স্বল্প শীতল রঙের ছোঁয়ায় ছবি যেন এক বর্ণহীন আকারহীন মাধ্যমে চলে যেতে চায়। যেন এক নিরুদ্দেশে যাত্রার মত। এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করতে শিল্পী বললেন—এ-পথের শেষ নেই। চলেছি। কোথায় চলেছি, কতদূর যাব জানি না।

প্রশান্ত দা

উপন্যাস

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আদ্য শেষ রজনী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমায় শ'তিনেক টাকা দিতে পারো বাবা?

কি করবি?

খাতা, কলম, পেন্সিলের ব্যবসা করব। স্কুলের গেটে একটা জায়গা দেখেছি।

তার চেয়ে তুই নিজে আবার পড় না সন্তু।

আমি যে বং হয়ে আমি বাবা।

বং? বং কী জিনিস সন্তু?

আমাকে বাবা তিন বছর পরীক্ষায় বসতে দেবে না।

সে-তিন বছর এখনো কাটেনি সন্তু?

কেটেছে বাবা। কিন্তু আমায় তো কোন স্কুল নেবে না আর।

প্রাইভেটে দিয়ে দে সন্তু। আমি তোর জন্য টিচার রাখবো।

আমার যে কিছু মনে নেই বাবা। আমি এখন ক্লাশ থ্রির জিনিসও বুঝি না। আমার ব্রেন ফেটে গেছে বাবা।

ব্রেন?

ব্রেন হল গিয়ে ভাগ্য। আমার ভাগ্যের পাইপটাই ফুটো! তুমি আর কি করবে বাবা।

এসব ভাষা শিখলি কোত্থেকে? আমরা তো জানি না সন্তু।

বাবা তোমরা যে কত জিনিস জানো না তাই ভাবি। যাপ্পিয়ে। আমার তিন-চারশো টাকা দেবে বাবা?

খাতা কাগজের ব্যবসাটা করতাম তাহলে।

অত টাকা কোথায় পাবো সন্তু। দেখছিস তো কোথায় থাকি আমি।

দুশো টাকা দাও তাহলে।

আমার যা ছিল তাই তোকে দিলাম সন্তু। তোর মায়ের কাছে চাইলে পারিস। চেয়েছিস কখনো! দেবে না বাবা। খুব কাই আছে। ওঃ! তুমি তো আবার কাই বোঝো না। কঞ্জুস জানো?

নে ঘুমিয়ে পড়। রাত হোল।

অভ্যেস মত শশাঙ্ক ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘটাং করে আওয়াজ হতে লাফিয়ে উঠল শশাঙ্ক। কে? কে?

অন্ধকারে হা হা করে হেসে উঠলো সন্তু। বাবাটা তো খুব ভীতু আছে! চেঁচাচ্ছো কেন?

আমি। আমি সন্তু। বাথরুমটা কোনদিকে?

ওঃ! আমি ভেবেছি—খুব গুতো খেয়েছিস!

এখন আর বকিয়ো না। ভাল লাগছে না মাইরি! পেচ্ছাব করবো। বাথরুম কোন্‌দিকে?

বাথরুম নেইতো। দাঁড়া দেশলাই জ্বালি।

দুচ্ছাই! তাড়াতাড়ি করো না।

দেশলাই জেবলে ছেলেকে শশাঙ্ক নোংরা গলিপথটা দেখিয়ে দিল। তুই কর। আমি আরেকটা কাঠি জ্বালি।

সন্তুর মেজাজ খিঁচড়ে গিয়েছিল। অন্ধকার। নোংরা। দুর্গন্ধ। মশা। এই হল গিয়ে তার বাবার আস্তানা। এই ঘন্টা দু'য়েকে বাবাকে নিয়ে তার ভাল ভাল ভাবনাগুলো একদম ব্যাংচ্যাপটা হয়ে গেল।

শশাঙ্ক প্রথম ধাক্কা খেয়েছে—সন্তুর মুখের ওই সাংকেতিক ভাষায়। তারপর একটু আগে সন্তু বলেছে—বাবাটা। আরো তিনটে কাঠি জ্বালাতে হোল শশাঙ্ককে। এই মাঝরাতে এমন দমবন্ধ গলিতে কোত্থেকে যে ভুতুড়ে বাতাস এসে ঢোকে। একদম বেআক্কেলে বাতাস।

বেলা আটটা নাগাদ ঘুম ভাঙলো শশাঙ্কর। সন্তু নেই। কখন উঠে গেছে। চা খেতে গিয়ে বুঝলো, যাবার সময় সন্তু তার পাঞ্জাবির বুক পকেট হাতড়ে সাতটা টাকা আর খুচরো যা ছিল নিয়ে গেছে। একদম মুছে নিয়ে গেছে। ভিখারি চাইলে দেবে এমন একটা ডবল পয়সাও রেখে যায়নি।

এই প্রথম একটা সকাল বেলায় রজনীর জন্যে শশাঙ্কর ভীষণ কষ্ট হল। কী করে যাচ্ছে মেয়েটা। তার ছেলে এই। রজনী নিজে হাউসে যায়। হিসেব করে। স্টেজে দাঁড়ায়। পোস্টারে তার বড় ছবি। পাবলিসিটিতে বড় বড় টাইপে তার নাম। অথচ ছেলে? তার একমাত্র ছেলে? তাদের দু'জনের ছেলে! এই বাহান্ন বছর বয়সে অনেকদিন পরে শশাঙ্কর চোখে জল এসে গেল। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। বাইরে কলকাতা একটু পরেই প্রচণ্ড রোদে তেতে উঠবে। আশ্চর্য! কলকাতা পৃথিবীর কতখানি জায়গা জুড়ে শুয়ে আছে। বিরাট লাস পড়ে আছে।

শশাঙ্ক দোর আটকে অন্ধকার ঘরে আলো জ্বাললো। তারপর উবু হয়ে বসে খাটের নিচের স্টিলের ট্রাঙ্কটা টেনে বের করল। ডবল তালা খুলে ফেলে ডালা তুলতেই ন্যাপথালিনের গন্ধ ভক করে তার নাকে এসে গুতো দিল। সঙ্গে গ্যামাক-সিনের গা গুলোনো গন্ধ। তবু চোখ ফেরাতে পারলো না শশাঙ্ক। হাতি আঁকা একগাদা বান্ডিল পরপর সাজানো। একদিকটা শাদা। সেখানে তিন সিংহির গুলছাপ। আলোয় ধবলে স্পষ্ট দেখা যায়। এখন ট্রাঙ্কের গলায় গলায় বান্ডিলের থাক। শশাঙ্ক ডালা আটকে তালা দিল। তারপর ট্রাঙ্কটাকে খাটের নিচের অন্ধকারে পাঠিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ভরত হলে এত সকালে থাকবার মধ্যে দারোয়ান, ক্যান্টিন বয় আর চণ্ডীবাবু। চণ্ডীবাবু ঘুম থেকে ওঠে সবার শেষে। তাই শশাঙ্ক যখন হাউসের ভেতর ক্যান্টিনের উঠোনে গিয়ে হাজির হল—তখন চণ্ডীবাবু অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

বইরে কলশোয়ের সেই বাসে করে নিয়ে যেতে হয়। সেটগুলো খুলে বাসের ছাদে বসিয়ে দড়ি দিয়ে আচ্ছা করে বেঁধে তবে যাত্রা। হাইওয়ে দিয়ে চললো 'পঞ্চমুখ' সারারাত ধরে। ভোর ভোর থামে গিয়ে দুর্গাপুর,, বনগাঁ, শিলিগুড়ি। দু'এক সময় দুপুর হয়ে যায়। যেমন অন্ডালে হয়েছিল।

সেটের জোড় আলগা হয়ে যাওয়ায় দু'জন কাঠের মিস্ত্রি ভোর থেকে কাজে লেগেছে। হাতুড়ির খটাখট। র‍্যাদার শব্দ গ্যারেজে দুখানা গাড়ি ঘুমুচ্ছে। সবুজ লনে ভোর বেলাতেই দুটো পাখি। দারোয়ান জিভ

শরৎ অমনিবাস বাঁধাইকৃত বহু তথ্যসমৃদ্ধ সুশ্রী উপন্যাস
শরৎচন্দ্র—মণি বাগচি—১৮৲
রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম • কাজী আবদুল ইসলাম • ২০৲
দেশবন্ধু • মণি বাগচি • ২০৲
মহানায়ক মুজিবুর—অমলেন্দু দে—১৫৲ মহাজীবন—অমলেন্দু দে—২০৲
মোহন লাইব্রেরী : ৩৫ এ, সূর্যসেন স্ট্রীট • কলিকাতা-৯ ফোন: ৩৫-০৬৩৩

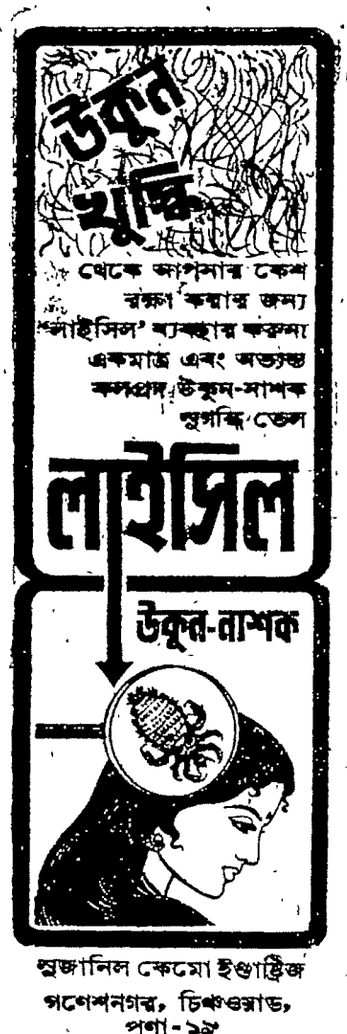

সুজানিল কেমো ইণ্ডাষ্ট্রিজ
গণেশনগর, চিঞ্চওয়াড,
পুণা-১৯
EXPRESSO/686 B

ঘসতে ঘসতে এসে শশাঙ্কর সামনে দাঁড়াল। শশাঙ্ক তখন উবু হয়ে কসি মিস্ত্রিদের সঙ্গে ভাব করছিল।

দারোয়ানের কথায় শশাঙ্ক বলল, এই একটু কথা বলছি।

বেশি সময় নিবেন না। হিরো হিরোইন আসবার আগে চলে যাবেন বাবু। দেখলে হামার চাকরিটা খতম।

তোমার বাড়ি কোথায় বাবা?

দ্বারভাঙ্গা।

নাম কি?

লালন ঝা।

মাইনে কত পাও?

সে ভালো দেয়। খারাপ বলতে পারবো না। কেন? আপনার দারোয়ানির লোক লাগবে?

এখন না। পরে লাগতে পারে তো। হিরোইন কখন আসে বাবা?

ঠিক নাই। এমনিতে এগারোটা বাজতেই গাড়ি গিয়ে নিয়ে আসবে। আবার কখনো সকাল সকাল চলে আসেন।

হিরো?

অমিয়বাবু? তিনি তো ঠিক এগারোটায় আসবেন। কেন? হাপনার চিনা আছে?

নারে বাবা। আমি চিনবো কোত্থেকে। এখন তো দেশসুদ্ধ লোক চেনে ওদের। আমায় এক কাপ চা খাওয়াও তো বাবা।

ক্যান্টিন তো খোলেনি এখনো। পয়সা দিন। নিয়ে আসছি।

শশাঙ্ক বেশি করেই পয়সা দিল। যাতে মিস্ত্রি দুজন আর লালনের জন্যেও চা আসে। এবার মিস্ত্রিরা বেশ মন খুলে কথা বলতে লাগলো।

কবিয়াল চলবার সময় সেট কসটিউম দেখতো রজনী নিজে। ও বড় হয়েছে সেটের ভেতরে। লাইট রজনীর নখদর্পণে। সাউন্ড রজনীকে ফাঁকি দিতে পারবে না। কোথায় মাইক বসালে আওয়াজ বাড়ি খেয়ে ফিরে আসবে না—তার প্রায় নির্ভুল অন্দাজ রজনীর আছে। এসব শশাঙ্কর নিজের চোখে দেখা। বিশেষ করে কবিয়াল স্টেজ হওয়ার সময় থেকেই।

কথা বলে যা আন্দাজ পেল তাহল এরকম মোটামুটি একটা সেট বানাতে অন্তত দুমাস ধরে চারজন মিস্ত্রিকে একটানা কাজ করতে হবে। হাতের কাছে সব জোগাড় থাকা চাই। নইলে আরো দেরি হবে। মনে মনে একটা এস্টিমেট নিচ্ছিল শশাঙ্ক।

আপনি থিয়েটারের দল খুলছেন বাবু?

নারে পাগল! এমনি জানতে ইচ্ছে হল তাই—

লাগান না একটা থিয়েটার। একটি মেয়েছেলে চাই—

বেটে মত অন্য মিস্ত্রি বলল, একটিতে হবে না বাবু। দুতিনটি মেয়েছেলে চাই। একজন গাইবে। একজন নাচবে। তবে না জমবে—

তোমরা এ থিয়েটার দেখেছো?

কতবার! এখানে একটি গায়। একটি নাচে। আরেকটা কাঁদে বাবু। খুব সুন্দর কাঁদে বাবু।

কারটা ভালো লাগে তোমাদের?

সে বলতে গেলে রজনী দিদিমনিরটাই সবচেয়ে ভালো। উনি তো জমিয়ে রাখেন। শুনিছি ভদ্দরঘরের বউ। পয়লা সিনে একটু যা জামাকাপড় খুলতে হয়—নইলে নাটক তো মন খারাপ করে রাখে।

তোমরা দেখেছো?

হাসালেন বাবু! আমরা কতবার দেখলাম। আমাদের তো টিকিট লাগে না। শেষালদার সব বিকসাওয়ালার দেখা হয়ে গেল বাবু। ওরা দেখতে দেখতে সিটে পা তুলে রজনী দিদির জন্যে ঠিক কাঁদবে। আপনি দেখেননি এখনো?

শশাঙ্ক থতমত খেয়ে গেল।

তার সামনে তখন একদম দেবদূত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চণ্ডীবাবু। সারারাত বেশ ভালো ঘুম হয়েছে।

আপনি কী মনে করে শশাঙ্কবাবু? আসুন আসুন। ভেতরে এসে বসবেন। আমি চণ্ডী।

শশাঙ্ক মনে মনে বলল, এই হল গিয়ে সেই চণ্ডী। অমিয়র বিখ্যাত বাহন। শুনেছে, এরই কাছে ক্যাশের চাবি থাকে। চণ্ডীই ভাউচার সই করিয়ে টাকা দেয়। গ্রুপ থিয়েটারে কাগজে কলমে তো মাইনে নেওয়া যায় না। অ্যালাউন্স বলে নিতে হয়। তারপর ভেতরে ভেতরে যার যা পাওনা তা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। সেজন্যে আলাদা দুনম্বর খাতা থাকে। সেই দুনম্বর খাতার হিসেব তাহলে এই চণ্ডী দেখে। শশাঙ্ক মুখে বলল, এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম—তাই ঘুরে গেলাম।

আপনি আছেন জানলে ভেতরেই যেতাম।

আমি তো এখানেই থাকি। আসুন। আপনি এসে ফিরে গেছেন জানলে আমার ওপর খুব একচোট নেবে।

(ক্রমশঃ)

ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাঙ্কের কাজকর্ম সম্বন্ধে আপনার কোন কিছু বলার আছে কী?

আপনার যদি কোন অভিযোগ বা প্রস্তাব থাকে তাহলে সেটি ডাকঘরের সংশ্লিষ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জানান।

পনর দিনের মধ্যে কোন সন্তোষজনক উত্তর না পেলে পোস্ট মাষ্টার জেনারালকে লিখে জানান।

যেন কোড মানে ঠিক ঠাক

ডাক ও তার বিভাগ
ডি এ ভি পি ৭৬।১৩৯
বাংলা

স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ॥ ৫

সনৎ শেঠ

গোলরক্ষণে সংশয়াতীত দক্ষতা অর্জন করতে হলে সবার আগে মস্তিষ্ককে সক্রিয় রাখতে হয়। প্রতিবর্তী ক্রিয়ার তীক্ষ্ণ তাগিদ ছাড়া কেউই গোলরক্ষার পাকা হাতের ছাপ রাখতে পারে না। সব খেলার মতো ফুটবলেও শরীর ও মস্তিষ্কের সমন্বয় ঘটানো চাই। নইলে কেউ জাতে উঠতে পারে না। তবে একজন গোলরক্ষকের পক্ষে বোধহয় এই সমন্বয় ছাড়া টিঁকেই থাকার উপায় থাকে না। একজন ফরোয়ার্ড বা হাফব্যাক তার নির্দিষ্ট কাজে ফাঁকি দিলে অথবা অনবধানতা বশতঃ তার কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে গেলে হয়তো দলের তেমন বিপর্যয় নাও ঘটতে পারে। কিন্তু গোলরক্ষকের ভূমিকা যদি সেই দোষে দোষী হয়, তাহলে পরিনাম যে কী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে তা সহজেই অনুমেয়।

গোলরক্ষকের তাই ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই। খেলার গতিবিধির ওপর থেকে অন্য নজর সরানো বা অন্য কোনো চিন্তায় জড়িয়ে পড়ার জোটি নেই। দলের অন্য কারুর ফুরসৎ যদিও বা মেলে, কিঞ্চিৎ শিথিল হওয়ার অবকাশ গোলরক্ষকের কপালে তাও জোটে না সর্বক্ষণই তাকে খেলতে হয়। বল যখন দূরে ওপ্রান্তে বা মাঠের মাঝখানে তখনও সে মনে মনে খেলায় জড়িয়ে থাকে। মুহূর্তকাল পরে কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে সেই ভাবনায় সে সর্বদাই বিভোর। পরিস্থিতির নাড়ির খবর পেতে তাকে আগেভাগেই চিন্তা করে নিতে হয়। তার কাছে মস্তিষ্কের তাগিদই সবচেয়ে বড়।

তবে শারীরিক সংগতিতে টান পড়লেই বা চলবে কেন? হঠাৎ ঝাঁপিয়ে একপাশ থেকে আর একপাশে গড়িয়ে পড়ে বলটি রাগিয়ে ধরতে হবে। একলাফে অনেকের মাথা ডিঙিয়ে চিলের মতো ছোঁ মেরে বলটিকে লুফে নিতে হবে। অথবা ঘুঁষির একঘায়ে বারের ওপরে ঠেলে দিতে হবে। শরীর সমর্থ না হলে এসব কাজ চোখের পলকে করে তোলা সম্ভব নয়। কাজেই শরীরের সেই সংগতি থাকা চাই। তবু বলি, সবার ওপরে থাকতে হবে জীবন্ত মস্তিষ্কের প্রেরণা। মুহূর্তকাল পরে ঠিক কোন কাজটি করলে পরের কড়ি যোগাড়ে সফল হওয়া যাবে তার ঠিকানা যথাসময়ে জানিয়ে দেয় সজীব মস্তিষ্কই মগজই শরীরকে চালায়। সনতের ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তাই মস্তিষ্ক ও শরীর, কোনো কিছুরেই দৈন্যে তাঁকে ভুগতে হয়নি। বরং বলতে পারি যে উভয় সম্পদের পুঁজি তাঁর বেশিই ছিল। তাই তিনি কালজয়ী ক্রীড়াবিদের অভিধায় অভিনন্দিত হতে পেরেছেন।

গত সার্ধ শতাব্দীতে কলকাতার মাঠে ডজনখানেক কি তারও বেশি জাত গোলরক্ষককে দেখার সুযোগ আমার ঘটেছে। যথা ডেভিস মনি তালুকদার পল্ম ব্যানার্জি কে দত্ত সুবোধ ব্যানার্জি ওসমান আর্মস্ট্রং পিগট, ইসমাইল, ভরদ্বাজ, সঞ্জীব এবং আরও কেউ কেউ। এঁদের প্রত্যেকেই নানা গুনে গুণী। কেউবা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে আরও ভাস্বর। যেমন উঁচু উড়ন্ত বলে দীর্ঘকায় আর্মস্ট্রংকে হার মানানো ছিল কঠিন। ডেভিস ও মনি তালুকদার ছিলেন অসমসাহসী। দলের পতন রোধের চেষ্টায় শারীরিক চোটের ঝুঁকি নিয়ে ম্যানসফিল্ড বুটের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তে মনি তালুকদারের বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা জাগতো। এমনভাবে ঝুঁকি নেওয়ার পরিনামে তাঁকে যে কতোবার আহত হতে হয়েছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। গোল ছেড়ে এগিয়ে এসে ফিরতি কিকে বলটিকে অনন্য পাঠাতে ইসমাইল ছুটতেন সবার আগে। কে দত্ত ও ওসমান ছিলেন সর্ববিষয়ে সুবিন্যাস্ত। কে দত্ত মাথায় ঘাটো হয়েও পরিস্থিতি সামাল দিতে বুদ্ধি, বিচক্ষণতার বড় মূলধন বারেবারে যোগাড়ে আনতে পারতেন।

ওঁদের পাশে দাঁড়ালে সনৎ শেঠকে নিশ্চয়ই বেনামান বলে মনে হবে না। সংযত, পরিশীলিত অথচ পরিস্থিতির খোঁচায় তাৎক্ষণিক তৎপরতা ও মস্তিষ্কের তাগিদে যথাসময়ে সক্রিয় এই সনৎ শেঠ হলেন ওই সব পূর্বসূরীদের যোগ্য উত্তরসাধক। গোলরক্ষকের ভূমিকাকে তিনি নতুন এক মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিলেন নিজের সপ্রতিভ আচরণে এবং জীবন্ত চিন্তার কল্যাণে। তবু কেন জানিনা মনে হয় যে, যে নাম ও সম্মান সনতের পাওয়া উচিত ছিল তা বোধহয় তিনি পান নি। ফুটবলে যারা গোল করে নামডাকের সিংহভাগে তারাই হয় অধিকারী। যারা গোল খায় তারা যে গোলের রাস্তা আগলে দাঁড়াতে মাঝে মাঝে কতোবড় দায়িত্ব পালন করে, তা অনেকেই মনে রাখতে চায় না। হয়তো সনৎ শেঠ সম্পর্কে অনেকের জনমানসে মূলে এই মনস্তত্বই কাজ করেছে।

কিন্তু বিস্মরণের সনতের যে প্রতিচ্ছবি আঁকা থাক না কেন, সনৎ কিন্তু তাতেই খুসী। আত্মতৃপ্ত। বেতার অনুষ্ঠান স্মৃতি দিয়ে ঘেরায় অংশ নিতে এসে সনৎ বারেবারে সেই কথাই জানালেন। সোচ্চারে বললেন, যা পেয়েছি তাই তো অনেক। ফুটবলের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা সীমা পরিসীমা নেই।

থাকুন না কেন, আমি কিন্তু সেদিন দস্তানা জোড়া হাতে গলাইনি। গ্লাভস এঁটে খেলতে তখনকার দিনে আমার বড্ড অসুবিধে হোত!'

ইস্টার্ন রেল থেকে জর্জ টেলিগ্রাফ, এরিয়ান্স ঘুরে সনৎ শেষ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল ওমোহনবাগানে চলে যান। এবং ধাপে ধাপে এগিয়ে ভারতীয় দলের প্রতিনিধি হিসেবে ম্যানিলা ও রাশিয়া এবং মোহনবাগানের পক্ষে পূর্ব আফ্রিকাও ঘুরে আসেন।

সনৎ এশীয় ক্রীড়ায় (১৯৫৪ সালে ম্যানিলা) ও চতুর্দলীয় ফুটবলে (ঢাকা ও কলকাতা) খেলেছেন। তবে প্রতিবারেই তাঁকে অন্যদের সঙ্গে রসুতুরমতো লড়াই করে তবেই ভারতীয় দলে জায়গা পেতে হোত। তার আমলে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল তীক্ষ্ণ, ক্ষুরধার। নির্বিঘ্নে দলে ঠাঁই পাওয়ার উপায় ছিল না।

প্রতিনিধিমূলক খেলায় অংশ গ্রহণের সুযোগ কতকটা বিনা বাধাতে পেয়েছিলেন একেবারে গোড়ার পর্বে, যেদিন জাতীয় ফুটবল বা সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করায় তিনি প্রথম ডাক পান। সনৎ তখন অপেক্ষাকৃত অপ্রধান দলের গোল-রক্ষক। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের ছাপ পড়েনি। তখনই তিনি বাংলার পক্ষে সন্তোষ ট্রফিতে খেলেন। পরে আরও সাত-আট বছর তিনি বাংলা দলের গোল-রক্ষণের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। **অজয় বসু**

মাঠের নায়ক

'খেলার মত খেলতে হলে, প্রথমেই শরীরটাকে তৈরী করতে হবে। শরীরে তাগৎ না থাকলে মাঠে নেমে কি করুণ অবস্থা হয়—বিদেশের মাঠে তা বারবার নিজের চোখে দেখেছি। দেখে দুঃখ হয়েছে, কখনও কখনও চোখ ফেটে জল এসেছে...কিন্তু ঐ মুহূর্তে আমাদের কিছুই করার ছিল না, ছিল না সামর্থ্যও'।

প্রদীপ চৌধুরী

কথা হচ্ছিল মোহনবাগানের অন্যতম স্টপার ব্যাক সুদেহী প্রদীপ চৌধুরীর সঙ্গে চারুগলী মহল্লায় ওঁর কর্মস্থল ইসকোর অফিসে বসে। প্রদীপ ধীর স্থির মিতবাক। যা বলেন তা হিসেব করে মেপে মেপে। মাঠে যেমন প্রতিটি মুহূর্ত হিসেব করে খেলেন হিসেব করে খেলেন কথাবার্তায়ও ঠিক তারই ছাপ। প্রদীপ থাকতেন বোম্বাইয়ে ভাল চাকরীও করতেন টাটায়। সর্বভারতীয় কীর্তিও ঐ বোম্বাইয়ের দৌলতে। হঠাৎ বোম্বাইয়ের পাট তুলে দিয়ে চলে এলেন কলকাতায় জমজমাট ফুটবলের টানে। প্রদীপ ভাল টাকলার মাথাটি একেবারে ঠাণ্ডা প্রতিপক্ষের আক্রমণের গোড়া উপড়ে ফেলতে একেবারে হেডিং এবং সাইড ব্যাসিংএর ওস্তাদ। সর্বোপরি রয়েছে পরিশ্রম করার অসাধারণ ক্ষমতা।

প্রদীপের নিজের অভিমত হোল এই সব বিদেশী দলগুলির বিরুদ্ধে খেলতে হলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন। একটু টাফ একটু রোবাস্ট হতেই হবে। ফুলের ঘায়ে মুর্ছা গেলে চলবে না। তার বাহুল্য সেজন্য শারীরিক দিক থেকে প্রস্তুতির প্রয়োজন। নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে অনেক কুণ্ঠা প্রদীপের। সবে তো কলকাতায় এলুম এখনও তো আহা মরি কোছের কিছু করতে পারিনি। আর একটু থিতু হয়েনি। কথায় নিজেকে বিনয়ের সুর।

১৯৫০ সালে প্রদীপের জন্ম বীরভূমের সিউড়িতে। পিতৃ-পিতামহের ভিটে বর্ধমানে। বাবা ব্রজগোপাল চৌধুরী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। মা পুষ্প চৌধুরী। চার ভাই এক বোন নিয়ে প্রদীপদের জমজমাট স্বচ্ছল সংসার। স্কুল কলেজের লেখাপড়া খড়গপুরে। সবচেয়ে মজার কথা স্কুল কলেজের ছাত্র জীবনে প্রদীপ কিন্তু প্রতিনিধিমূলক কোন আসরেই খেলার সুযোগ পাননি। যা খেলেছেন তা সবই

প্রদীপ চৌধুরী

ঘরোয়া অনুষ্ঠানে। বড় ফুটবলের সঙ্গে প্রথম পরিচয় বোম্বাইয়ে ১৯৭০ সালে হারউড লীগে নিউ ইণ্ডিয়া এ্যাসুওরেন্স চাকরীর সূত্রে। ৭০ সালের খেলার পর ৭১ সালে ডাক পেলেন মফঃস্বল থেকে। বড় দলে খেললেন এবং নিজের গুণেই প্রায় আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের শিরোনামে স্থান মিললো। ৭২ সালে গোয়াতে অনুষ্ঠিত সন্তোষ ট্রফির আসরে প্রতিনিধিত্ব করলেন মহারাষ্ট্রের। তার আগের বছরই অবশ্য রাশিয়া সফরকারী ভারতীয় দলে স্থান পেয়ে গিয়েছিলেন। ৭২-এর সন্তোষ ট্রফির পর নির্বাচকরা প্রদীপকে প্রাক ওলিম্পিকেও (রেঙ্গুন) দলভুক্ত করেছিলেন কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য রেঙ্গুন আর যাওয়া হয়নি। ১৯৭৩—৭৪ মারদেকা (কোয়ালালামপুর) খেলার পর তেহরাণ এশীয় ক্রীড়ায় প্রদীপ ছিলেন ভারতের অন্যতম স্টপার। পরের বছর ইন্দোনেশিয়ায় গিয়ে খেললেন আর হালিম ট্রফি। প্রদীপের হিসেবে এখন পর্যন্ত চল্লিশটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ তার খেলা হয়ে গেছে পাঁচবারের বিদেশ সফরের কল্যাণে। প্রেসিডেন্ট কাপ (সিওল) যোগদানকামী ভারতীয় দলের বাঙ্গালোর ট্রায়াল শিবির থেকে ডাক এসেছে।

বোম্বের এবং কলকাতার মাঠে অনেক তফাৎ কলকাতার মাঠ নরম বৃষ্টি হলে স্বাভাবিক খেলায় অনেক বাধা—এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করতেই প্রদীপ সবিনয়ে বললেন—নাচতে না জানলে উঠোনের দোষ দেওয়ার একটা রেওয়াজ আছে বটে কিন্তু আমি ও জন্য বিশেষ মাথা ঘামাই না কেননা আমি এখন রীতিমত সিরিয়াস। বোম্বের পাট চুকিয়ে অনেক রিস্ক মাথায় নিয়ে কলকাতায় এসেছি। তাই খেলতে হবে আমাকে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই। সব দিক শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারবো কিনা জানি না। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা।

কলকাতার ফুটবল অনুরাগীরা আমাকে অনেক স্নেহ প্রীতি ও ভালবাসা উপহার দিয়েছেন। ছোট ছোট ভাইয়ের কাছ তো বটেই বয়সে অনেক বড়ো এমন অনেক অনুরাগীর কাছেও দাদা বনে গেছি। হ্যাঁ—দাদা। কেন জানেন?—বলেই মাথার সম্ভাব্য টাকটির ওপর সহাস্যে হাত বুলোলেন।

বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলাধূলা

দর্শক

মন্ট্রিল অলিম্পিক গেমস

কানাডার মন্ট্রিল শহরে নবনির্মিত অলিম্পিক স্টেডিয়ামে গত ১৭ই জুলাই ইংল্যান্ডের নারী এলিজাবেথ তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে আনুষ্ঠানিকভাবে একবিংশতিতম অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধন করেন। চিরাচরিত প্রথায় অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধন ঘোষণা অলিম্পিক ইতাকা উত্তোলন, স্টেডিয়ামের অগ্নিআধারে অনির্বাণ অগ্নিকুন্ড প্রজ্জলন, শপথ গ্রহণ, তুর্য ও তোপধ্বনি প্রতিযোগিদের কুচ-কাওয়াজ, শান্তির দূত হিসাবে হাজার হাজার পারাবত উড্ডয়ন প্রভৃতি অনুষ্ঠান যথাযথ প্রতিফলিত হয়।

মন্ট্রিল অলিম্পিক গেমসে তাইওয়ান এবং নিউজিল্যান্ডের যোগদান নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছিল তার মীমাংসা না হওয়াতে তাইওয়ান এবং আফ্রিকার ষোলটি দেশ মন্ট্রিল অলিম্পিক গেমস থেকে তাদের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এক কথায় তারা এই মন্ট্রিল অলিম্পিক গেমস বর্জন করেছে। তাইওয়ানের যোগদান সম্পর্কে কানাডা সরকারের কড়া নির্দেশ ছিল তাইওয়ান কোনক্রমেই প্রজাতন্ত্রী চীনের নাম, তাদের জাতীয় সংগীত ও পতাকা ব্যবহার করতে পারবে না। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি লর্ড কিলানিন কানাডা সরকারের এই নির্দেশের তীব্র প্রতিবাদ করেন। এমনকি তাইওয়ান প্রশ্নে একসময় মন্ট্রিল অলিম্পিক গেমস বাতিলের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। শেষপর্যন্ত কানাডা সরকারের নির্দেশ ছিল তাইওয়ান কেবল প্রজাতন্ত্রী চীনের নাম ব্যবহার করতে পারবে না। প্রজাতন্ত্রী চীনের জাতীয় পতাকা এবং সংগীত ব্যবহার সম্পর্কে কানাডা সরকার তাঁদের আগের নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু এই আপস প্রস্তাব তাইওয়ান সম্মানজনক মনে করেনি। তাই তারা মন্ট্রিল অলিম্পিক গেমস বর্জন করে। অপরদিকে নিউজিল্যান্ডের একটি রাগবী দল খেলাধূলার আসরে বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করায় আফ্রিকার ষোলটি দেশ মন্ট্রিল অলিম্পিক গেমস থেকে নিউজিল্যান্ডকে বাদ দেওয়ার যে দাবী জানিয়েছিল তা অগ্রাহ্য হওয়াতে আফ্রিকার ষোলটি দেশ মন্ট্রিল অলিম্পিক গেমস বর্জন করে। প্রজাতন্ত্রী কঙ্গোর বিদেশ মন্ত্রক থেকে ঘোষণা করা হয়েছে নিউজিল্যান্ড দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতিতে মদৎ যোগাচ্ছে। অলিম্পিক গেমস বর্জন সম্পর্কে কেনিয়ার বৈদেশিক মন্ত্রী বলেছেন, আদর্শ এবং নীতি সোনার পদকের চেয়ে বেশী মূল্যবান। অলিম্পিক গেমসের সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে এমন রাজনৈতিক সংকট আর কখনও দেখা যায়নি।

মন্ট্রিল অলিম্পিক স্টেডিয়ামের অগ্নি-আধারে গ্রীসের অলিম্পিয়া থেকে প্রেরিত অগ্নিশিখা দিয়ে অগ্নিকুন্ড রচনা করা হচ্ছে। এই অগ্নিকুন্ড আগামী ১লা আগষ্ট পর্যন্ত অনির্বাণ থাকবে।

সুদূর গ্রীস থেকে মন্ট্রিল শহরের অলিম্পিক গেমস আসরে পবিত্র পুতাগ্নি বয়ে আনা ব্যাপারে যথেষ্ট অভিনবত্ব ছিল। অতীতে অলিম্পিক গেমসের বিভিন্ন আসরে অ্যাথলীটদের দিয়ে এবং দ্রুত যানবাহনে গ্রীস থেকে এই অলিম্পিক পুতাগ্নি বয়ে আনা হয়েছিল। এবার মন্ট্রিল অলিম্পিক গেমসের আসরে পুতাগ্নি বয়ে আনতে অ্যাথলীটদল ছাড়াও আধুনিককালের মহাকাশ বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্য নেওয়া হয়। গত ১৩ই জুলাই প্রাচীন অলিম্পিয়ার অলিভকুঞ্জে এক ভাবগম্ভীর ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অলিম্পিক মশাল প্রজ্জলন করা হয়। গ্রীসের সুপ্রাচীন হেরাত মন্দির সংলগ্ন বেদীর ওপর গ্রীক অভিনেত্রী মারিয়া মুস্কোলিউ এবারে অলিম্পিক মশাল প্রজ্জলন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। তিনি আতস কাচে সূর্যরশ্মি ফেলে যে অগ্নি উৎপাদন করেন তা দিয়ে অলিম্পিক মশালটি প্রজ্জলন করা হয়। তারপর ৫৪০ জন গ্রীক অ্যাথলীট হাত বদল করে অলিম্পিক মশালটি এথেন্সের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে বহন করে নিয়ে যান। সেখান থেকে পুতাগ্নি টেলিফোন সংকেতে রূপান্তরিত করে উপগ্রহের মাধ্যমে কানাডার রাজধানী অটোয়ার পার্লামেন্ট হিলে অবস্থিত একটি বিশেষ অগ্নিআধারে পেরিত হয়। পরে এই সংকেত অগ্নিতে রূপান্তরিত করা হলে একটি বালিকা সেই আগুনে মশাল জ্বালিয়ে কানাডার প্রধানমন্ত্রী পিয়ের ট্রুডোর হাতে তুলে দেয়। এরপর একদল অ্যাথলীট হাত বদল করে সেই জ্বলন্ত মশালটি মন্ট্রিলের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে বহন করে আনেন। এই মশালের পবিত্র আগুনেই মন্ট্রিল অলিম্পিক স্টেডিয়ামের অগ্নি আধারটি প্রজ্জলিত করা হয়। মন্ট্রিলের ২১তম অলিম্পিক গেমসের আসরে দীর্ঘ ১৬ দিন (জুলাই ১৭ থেকে আগষ্ট ১ পর্যন্ত) এই বিশেষ অগ্নি আধারটি অনির্বাণ থাকবে।

*

নায়িকা প্রসঙ্গে বোধ হয় আর বেশী দূরে অগ্রসর হওয়া যাবে না; কারণ দুর্বলতম জায়গায় নাকি ইতিমধ্যেই 'শক ওয়েভ' সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেক মানুষেরই একটা বিশেষ অতীত আছে। আর তাতে যদি কোন গ্লানির ছোপ থাকে—তাহলে পরবর্তীকালে তা মানুষ অস্বীকার করতেই চেষ্টা করে। পারে কি পারে না—সেটা বড় কথা নয়! মোট কথা, বায়োস্কোপের লাইনে আমার কিছু হিতৈষী আছেন, যাঁরা আমাকে ওই নায়িকা প্রসঙ্গে 'আর বেশী কিছু' লিখতে মানা করেছেন।

দেখুন, অনেক দিন হল আমি কাগজে লিখছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত কারো চরিত্র-হনন করব বলে কছু লিখিনি। যা লিখি—হিউমার করেই লিখি। প্রত্যেক মানুষেরই একটা সহজাত 'সেন্স অফ হিউমার' আছে বলে আমার বিশ্বাস। তাই আমার মতে 'চরিত্র চিত্রণ' আর 'চরিত্র হনন' এক কথা নয়। কাউকে দুঃখ দেব বলে কখনো কিছু লিখিনি, আর লিখবও না।

যাক প্রসঙ্গ পরিবর্তন করা যাক অগত্যা। এবং সেই সঙ্গে কাট-টু-কাট এসে পড়া যাক সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে। অনেকেই জানেন না যে সত্য বাড়ুজ্যে এক-জন বেশ রসিক মানুষ। আমি নিজেও জানতাম না। তারপর কোন একটি ছবিকে ও'র সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে টের পেলাম—ভদ্রলোক রীতিমত রসের ভাণ্ডারী।

ও'কে নিয়ে একটা গ্রামে কোন একটি ছবির আউটডোর শুটিং চলছে। সকাল থেকেই সত্য বাড়ুজ্যে খুব চঞ্চল হয়ে পায়-চারী করছেন। আমি গেছি সে-ছবির আউট-ডোর শুটিং কাভার করতে। সত্যবাবু আমায় দেখে কণ্ঠ করে হাসলেন। আমি তো অবাক। হঠাৎ মতি পরিবর্তন? প্রশ্ন করলাম—কী ব্যাপার সত্যবাবু, আপনাকে বেশ বিচলিত দেখাচ্ছে?

সত্যবাবু মাত্র 'হুম' করে নীরব হয়ে গেলেন। আর সাড়াশব্দ নেই। কিছুক্ষণ পায়চারী চলল। তারপর হঠাৎ ব্রেক কষার মত দাঁড়িয়ে পড়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন—

জানেন মশাই, শটের মধ্যে আমায় একটা গরু তাড়া করবে—এখনও পর্যন্ত সেই গরু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—

—এ্যাঁ?

—হ্যাঁ—যা বলছি শুনুন। আবার কি... এ ছবিতে এরা আমাকে একটা তোতলার পার্ট দিয়েছে। তাতে আরও ফ্যাসাদে পড়েছি। এ'চোড়ে পক্ক ডিরেকটর, তখন অত করে বুঝিয়ে বললাম—গামলা গামলা ডায়লগ দিও না আমাকে দিও না—তা শুনল না—তার ফলে তুখলে সারাক্ষণ ডায়লাগ বল বলে আমি এখন প্রায় তোৎলা হতে বসেছি। ছবিটাই তো সব নয়; আমার থিয়েটার আছে। রেডিও স্টাছে। ফাংশন আছে। ফ্যামিলি আছে। আপিস-কাছারি আছে। সর্বত্র আমার এগ্‌নস্টে কমপ্লেন,—আমি নাকি ইচ্ছে করে লোককে ভ্যাংগাচ্ছি—ডিসগাস্টিং...

একটাঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা-বার্তা হচ্ছিল, হঠাৎ অনুপম (এ ছবির সহকারী পরিচালক—শটে ওকে সবাই 'পম্' বলে ডাকে, সত্যবাবুর তোতলামোতে নামটা পম্‌পম্ হয়ে দাঁড়িয়েছে শুনলাম) এক রকম দৌড়ে এসে বললে—সত্যদা আর্টিস্ট পাওয়া গেছে একটা—

—চলবে তো?

মনে হয়।

পালাবার পথ নেই ।। অপর্ণা ও জনৈক শিল্পী

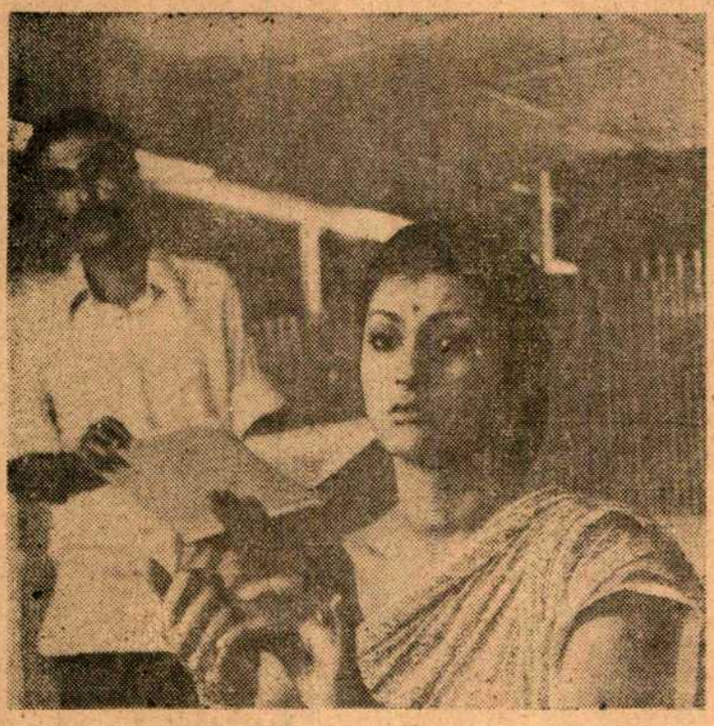

—আ। তাহলে চল একবার চেষ্টা করে দেখা যাক। ক্যামেরা-সাউণ্ড সব রেডি তো? না আবারো সেই গণ্ডগোল?

অনুপম বলল—না দাদা এবার বিলকুল টাইট রেডি। স্পটে গিয়ে দাঁড়াবেন, ব্যস সঙ্গে সঙ্গে টেকিং—

সত্যবাবুর সঙ্গে আমিও লোকেশানে গেলাম।

গাঁয়ের রাস্তা। তখন গরমের দিন। ধুলোয়-বালিতে চোখে অন্ধকার দেখার ব্যবস্থা। আশপাশের পাঁচখানা গাঁ ভেঙে লোকে শুটিং দেখতে এসেছে। উত্তমকুমার নেই জেনেও তারা হতাশ হয়নি, বরং বাড়তি কৌতূহল নিয়ে ভীড় করে স্পটে দাঁড়িয়ে আছে। স্কুলের ছেলেমেয়েদের ভীড় খুউব। বুঝলাম আজ স্কুলের দফা গয়া। ছাত্ররা ক্লাসে নেই এই অজুহাতে মাস্টাররাও হয়ত শুটিং দেখতে বেরিয়ে পড়েছেন। অসলে গ্রামের নিস্তরঙ্গ প্রাত্যহিক জীবনে এমন ঘটনা কদাচিৎ ঘটে—ফলে কে আর কার নিষেধ শুনছে!

স্পটে দাঁড়িয়ে সত্য বাড়ুজ্যে হাঁকলেন-পম, তোমার সেই আর্টিস্ট কই?

অনুপম অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা একদল গরু দেখিয়ে দিয়ে বলল—ওই তো দাঁড়িয়ে রয়েছে দাদা—

সত্য বাড়ুজ্যে দারুণ গম্ভীর মুখে গরুদের ইন্সপেক্শান করার নিয়ে বিস্ময় কণ্ঠে মন্তব্য করলেন -এর গোরুগুলি কাজের নয় বলে মনে হচ্ছে—

পম সরব প্রতিবাদ করে বলল—না দাদা আমরা টেস্ট করে সব স্পটে ঢুকিয়েছি। সবকটাই একদম ঠাণ্ডা। বলিয়ে দিল বো বো করে আপনাকে হয়ত তাড়া করেই পগার পার করে দেবে—

—বটে?

—হ্যাঁ দাদা। পম ফার্মলী জবাব দিল।

—বে-বেশ...কথায় বল-জ কী, ফলেন প-পরিচয়তে...

ক্যামেরাম্যান ধ্রুবজ্যোতি বসু ফিল্ম ইন্সটিটিউটের পাশ করা ছেলে, সে এতক্ষণ লেন্সে চোখ রেখে সব শুনছিল, এবার গলা বাড়িয়ে বলল—সত্যদা, আমি চিদানন্দবাবুর একটা ছবিতে এই রকম সিন একবার টেক করেছিলাম—

বাধা দিয়ে সত্যবাবু—কে চিদানন্দবাবু?

—অপর্ণা সেনের বাবা—আপনি দেখছি বিলেত ফেরৎটা দেখেন নি...ওতে ছিল ষাড়ে তারা করছে। উঃ, শটটা টেক করতে আমাদের কালঘাম ছুটে গিয়েছিল। তারপর ছিল গাধার সিন...

আ-আর এতে গরুর সিন। বেড়ে ক্যামেরাম্যান ভাই তুমি। তাহলে এট্টা গল্প বলি শোন; আমি একবার ক্যালকাটা মুভি-টোন স্টুডিওতে শুটিং করছি (সত্যবাবু কিছুতেই সেই ছবির নামটা স্মরণ করতে পারলেন না)। কাজ করতে করতে রাত হয়ে গেছে। তখন আমার চোখে ইয়ে হয়েছে মনে হচ্ছে ইরিটিবিলিটিস না কি যেন, ওই যে জয়বাংলা না কি নাম তার। তাই সারাক্ষণ চোখে গগলস এঁটে রেখেছি। এখন হয়েছে কি, আমি সেট থেকে বেরিয়ে মেকআপ-রুমের দিকে আসছিলাম। গলিটা এমনিতেই বেশ অন্ধকার, তায় চোখে গগলস্। পথের ওপর একটা নেড়ি কুত্তা শুয়ে ছিল খেয়াল করিনি, মাড়িয়ে বসলাম। আর যায় কোথা কতকটা ঘেউ করে দিলে আমার ডানদিকের হাঁটুতে এক কামড় বসিয়ে। তারপরই ল্যাজ গুটিয়ে পোঁ করে কেটে পালাল। আমি বাপরে বলে লাফিয়ে দৌড়ে মেকআপরুমে গিয়ে দেখি—সত্যনাশ, হাঁটু বে গেছে, রক্ত ঝরছে; দাঁত বসার দাগ ফুটে বেরিয়েছে।

দেখে মেকআপম্যানের চক্ষুস্থি কাণ্ড!

—কুকুর কামড়ে পালিয়েছে উ

—সেকি! সব্বোনাশ করেছে মাড়িয়েছিলেন নাকি?

—আরে ধুৎ, কি মাড়িয়েছি আমি দেখেছি! দেখে আবার কো মাড়ায়? তুমি তো আচ্ছা লোক?

মেকআপম্যান তৎক্ষণাৎ থুড়ি —বটেই তো বটেই তো। তা কুকুরে লোকের জলাতঙ্ক রোগ হয় জা দাদা—

—কখন?

মেকআপম্যান ভ্যাবাচাকা খে কী কখন?

—রোগটা? তক্ষুনি হয়?

—আরে না না, ঘাবড়াচ্ছেন কে ক্রেমে ক্রেমে হয়। মানে বিলাস্ত কী ধরুন এই আজ কামড়ালো, কাল মধ্যে আবার আপনিই কামড়াবেন—

—কাকে?

—লোককে। মানে জলাতঙ্ক ভীষণ ভাদোড় রোগ কিনা। তা চিকিৎসে করতে হবে। ডাক্তারের যান আপনি—

শুটিং মাথায় উঠল। ট্যাক্সি তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের কাছে। সব শু বলল—রাস্তার বেওয়ারিশ কুত্ত ভয়...আপনি সোজা ট্রপিক্যাল চলে যান—ওরা চোদ্দটা ইঞ্জেকশন আপনাকে।

বাপরে বাপ! পরদিন ভোর হ বাড়ুজ্যে হন্তদন্ত হয়ে ট্রপিক্যাল হাজির। রাতে দুর্ভাবনায় ভাল ক হয়নি। আর্টিস্ট দেখে ট্রপিক্যালের খুশী—যাক এট্টা নামজাদা লোক ডেছে। নার্সরা পর্যন্ত একবার উ দেখে গেল। ডাক্তার এলেন। সত্য দেখে চিনতে পারলেন।—কি হ আপনার?

—আর বলবেন না ডাক্তারবাবু, বিশদ হয়েছে এট্টা কুকুরে কামড়ে করে। এই যে এখানে—বলে উনি দেখালেন।

—এ হে-হে-হে-হে, এযে দাঁত দেখছি! তা পোষা?

—না না, স্টুডিওর—

—ও—ডাক্তারবাবু অবাক—সে স্টুডিওতে কুকুর পোষে নাকি?

বিরক্ত বীতশ্রদ্ধ সত্য বাড়ুজ্যে স্টুডিও কোন দুঃখে কুকুর পুষবে বাবু—নেড়ি কুত্তা নেড়ি কুত্তা, এ ঘুরে বেড়ায়...

শুনে ডাক্তারবাবু ভ্রু কুঁচকে তাহলেই তো গণ্ডগোল, রাস্তার বিশ্বাস নেই। ইয়ে পাগলা নয় তো

—তাও তো ছাই বুঝতে ডিনেন্ট আপনি একটা কাজ কর টাকে ওয়াচে রাখুন যদি দেখেন

মোহন সায়গল ও কিছু কথা

পরিপাটি সাজ আর চোখে চশমা নিয়ে চুলবিহীন মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে পরিচালক মোহন সায়গল সেদিন সাংবাদিক-দের সংগে একান্তে কথা বলছিলেন। স্থান পার্ক হোটেলের ভি-আই-পি রুম।

সম্প্রতি সেন্সরশিপের কড়া নীতির ফলে বম্বে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাই নিয়েই আলোচনা শুরু হয়েছিল। সেকস ও ভায়োলেন্ট দৃশ্যের প্রতি খড়্গহস্ত নেমে আসায় বম্বের অধিকাংশ ছবির কাজ এখন বন্ধ।

অবশ্য সে কারণে মোহনজীর ছবি করা কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না। ও'র ছবিতে কোনদিনই সেকস বা ভায়োলেন্স-এর আধিক্য থাকে না। যেটুকু থাকে সেটি অবশ্য প্রয়োজন। যেমন আছে মোহনজীর আগামী ছবি 'এক হি রাস্তায়'। এই প্রসংগে একটি মজদার ঘটনা শোনা গেল তাঁর কাছে।

সেন্সর বোর্ডের সামনে ছবিটি হাজির হতে তাঁরা নাকি বলেছিলেন—'মারামারির দৃশ্য অত দেখানো চলবে না কেটে আর্ধেক করুন।' উনি বললেন 'আমার ছবিতে দেড়শ ফুটের আ্যাকশন দৃশ্য আছে তাকে যদি পঁচাত্তর ফুটে আনতে হয় তাহলে তো কন্টিনিউটিই থাকবে না" কিন্তু রাজী করান যায়নি কর্তৃপক্ষকে। আর্ধেক না হলেও অনেকটাই বাদ দিতে হয়েছে। কি আর করা!'

আসলে মোহনজীর 'ভালো ছবির পরিচালক হিসাবে বম্বেতে বেশ সুনাম আছে। সাধারণতঃ তিনি সামাজিক - পারিবারিক ছবি করে থাকেন। প্রথম ছবি 'আউলাদ'এ তাঁর সেই ক্ষমতার প্রমাণ ছিল। অধিকার; নয়াদিল্লী ইত্যাদি ছবির মাধ্যমে তিনি বম্বের চিত্রজগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছিলেন সেই মধ্য-পঞ্চাশ দশকেই।

বছর দশেক আগে 'দেবর' ছবিতে মোহনজী তাঁর সুনামকে আরও ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তখন নবাগতা শর্মিলা ঠাকুর ঐ ছবি থেকেই নতুন ইমেজে হাজির হলেন। পরবর্তী ক' বছরে অবশ্য তিনি আর সেই সুনামবজায় রাখতে পরেননি। শাঁওন ভাদো; রাজাজানি ইত্যাদি কিছু অকিঞ্চিৎকর ছবি তিনি কেন করলেন জিজ্ঞেস করায় জবাব পেলাম—'টু কিপ পেস উইথ দ্য টাইম।'

তবে আর নয়। সময় থেকে মুখ ফিরিয়ে আবার আত্মস্থ হয়েছেন তিনি। ও'র আগামী দুখানি ছবি—সন্তান ও এক হি রাস্তায় মোহনজীকে দর্শকরা পুরোন রূপেই দেখবেন।

একদা আই-পি-টি-এর সক্রিয় সভ্য অভিনেতা মোহন সায়গল এখন ব্যস্ত পরবর্তী ছবির পেপার ওয়ার্ক নিয়ে। শুনলাম —'বিগ বাজেটের ছবি করছি এটা। একাধিক স্টার থাকছেন।'

বললাম—'এই প্ল্যানও কি টু কিপ পেস উইথ দ্য টাইম-এর কথা- ভেবে? হেসে উঠলেন তিনি। বললেন—'আগামী মাসে আবার আসছি, বাকিটা না হয় তখনি আলোচনা করা যাবে!'

নিঃ, ধঃ

করছে না, উল্টোপাল্টা করছে—তাহলে আমরা ইঞ্জেকশন শুরু করে দেব—

এমন সময় 'বাবাগো' বলে একটা বিকট চীৎকার শোনা গেল! সত্য বাড়ুজ্যে চমকে উঠে তাকালেন দেখলেন একটা কুকুর কেসের চিকিৎসে হচ্ছে। প্রায় একহাত লম্বা সিরিঞ্জে ওষুধ ভরে রুগীর পেটে ঢোকানো হচ্ছে। দেখে সত্য বাড়ুজ্যে যেন আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার দাখিল। এই কুকুর চিকিৎসে? সর্বনাশ।

ডাক্তারবাবু মৃদু হেসে বললেন—ঘাবড়াবেন না। এখন আপনার কাজ হচ্ছে কুকুরটাকে পর্যবেক্ষন রাখা...

কাট-টু-কাট সত্য বাড়ুজ্যে ভয়ঙ্কর অবদমিত মনে ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে সেদিনই হাজির। ফাঁকা স্টুডিও। ওঁকে দেখে দারোয়ান এগিয়ে এসে বলল—ক্যা খবর বাবু?

আর বাবু, নিকুচি করেছে ববুরে—মনে মনে বলে সরব হলেন—আচ্ছা দারোয়ান, ওই কুকুরটা কোথায় বলতে পার?

দারোয়ান অবাক।—কোন কুকুর বাবু?

—কাল রাতে যেটা আমায় কামড়ে কেটে দুড়োছল—

হুহো, আপাহিকো কাটা? রাম কহ, আরে কাল কত পুছ করলাম তো কেউ বলতে পারল না যো কাকে কুত্তা কেটেছে—সমঝে লিন বাবু, খালি শুনলাম—কুত্তা কেটেছে—সিনেমা লাইনের লোক আধেক বোলে আর আধেক পেটে পেটে রাখে—নামটা বলল না—পিকআপ হল সব তড়বড় বাড়ী চলে গেল। হুঁ। তা আপনাকে কেটেছে? ইলাজ কোরিয়ে লিন বাবু, লাইনের কুত্তা বড়া-সা-খতরনাক—

সত্য বাড়ুজ্যে তার লেকচার থামিয়ে দিয়ে বললেন—সেই কুকুরটা কোথায়?

—তালাশ কোরতে হোবে।

—ভাই তালাশ করে নিয়ে এস একবার, ওটাকে ওয়াচ করতে হবে কিছুদিন, তারপর চিকিৎসে—

দারোয়ান তখন হাঁকডাক করে স্টুডিওর ক্যান্টিনের কাছে ডজনখানেক ঘিয়ে ভাজা লেড়ি কুত্তা জোগাড় করে হৃষ্ট কণ্ঠে বলল—এখোন চিনে লিন আপনারটা—

—আরে ধুৎ, আমার চোখে দেখছ জয়-বাংলা, অন্ধকারে কেটেছে, আমি চিনব কি করে?

তখন এই এক মুস্কিল হল। ঘিয়েভাজা গুলো তখন পন-পন করে লেজ নেড়ে যাচ্ছে, খাবার লোভে ছুটে এসেছে, এখন মাল নেই দেখে তাদের কেটে যাবার ধান্দা, এখনই গেরস্থর আস্তাকুঁড়ে 'মাল' জমবার সময় এখন কি অন্য দিকে তাদের মনোযোগ থাকে। অগত্যা কয়েক পাউণ্ড পাউরুটী কিনে দিতে হল ওদের। তারপর কনফারেন্সে বসা হল। এখন কি উপায়ে বোঝা যাবে কে কামড়েছে? কার সেই দুর্মতি হল!

স্টুডিওতে যেদিন শুটিং থাকে না, কর্মীরা সেদিন সাধারণতঃ দেরীতেই রিপোর্ট করে। এদিন শুটিং ছিল না। কর্মীরা রয়ে-সয়ে আসছিল। এমন সময় এল মারু—স্টুডিওর সেটিং ডিপার্টমেন্টের কর্মী। ফ্লোরে শটের সময় খাট বিছানাপত্র আলমারী, দেয়ালের ছবি যথাস্থানে গুছিয়ে দেওয়া বা ট্রলি শটের সময় পাইপ লাইন ট্রলি ক্যামেরাম্যানের নির্দেশিত জায়গার ঠিক ঠিক বসিয়ে দেওয়াই যার কাজ—সে এসে দাঁড়াল।

সে বল—সেটা (কুকুর) তো এই দলে নেই—

দারোয়ান বলল—উসকো বোলাও—

মারু বলল—তার নাম বোঁদে। দাঁড়াও ডাকছি—বলে আ-তু আ-তু করে বিকট চীৎকার করে উঠল। (চলবে)

রঞ্জন মজুমদার

কয়েকজন

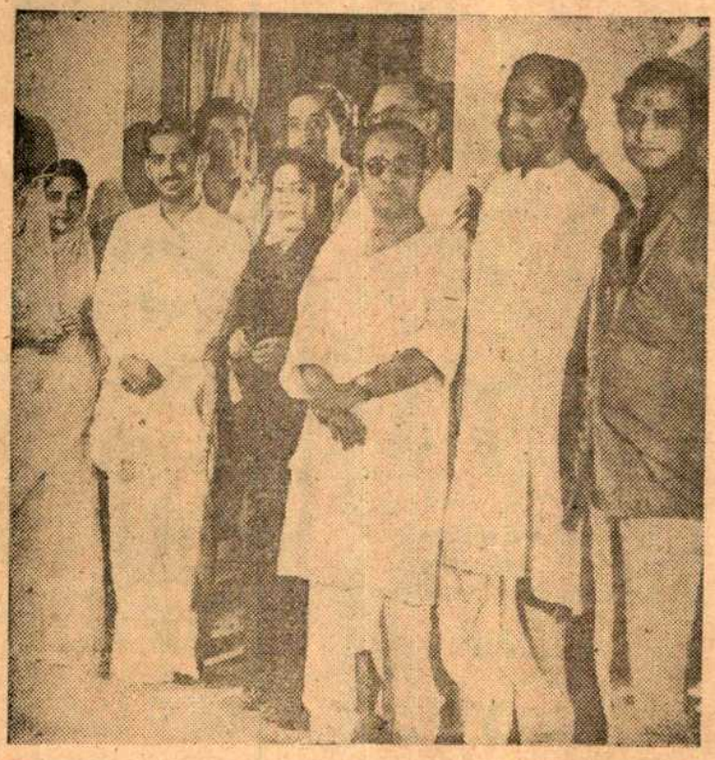

চিত্রপরিচয় : প্রায় কুড়ি বছর আগে **নবাবিধান** ছবির মহরতে শিল্পী কলাকুশলীদের সঙ্গে সত্যনারায়ণ খাঁ। ছবিতে আছেন পদ্মাদেবী সত্যনারায়ণ খাঁ কানন দেবী কালীপদ সেন রাধামোহন ভট্টাচার্য ও হরিদাস ভট্টাচার্য।

সত্যনারায়ণ খাঁ

ব্যবসায়ে বাঙালীর সুনাম তেমন নেই, বিশেষ করে ফিল্ম ব্যবসায়ে আজ বাঙালী বেশ কোণঠাসা। এক সময় যেখানে নিউ থিয়েটার্স, এম-পি প্রোডাকসন্স, অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন ইত্যাদি নামীদামী সংস্থাগুলো দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করেছে আজ সেখানে একে একে প্রায় সব দীপ নিভু নিভু। ফিল্ম ব্যবসার স্পেকুলেশন আর যথার্থ ব্যবসায়ীসুলভ স্পিরিটের অভাবেই এমনটা ঘটেছে বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না।

চারদিকের ভয়াবহ ঝড়ঝাপ্টার মধ্যে এখন অব্দি যে দীপশিখাটি দীপ্যমান সেটি হচ্ছে নারায়ণ পিকচার্স এবং চণ্ডীমাতা ফিল্মস। ১৯৫০ সালে ডিলাক্স ফিল্মসের 'বাঁকা লেখা' ছবিতে কিছু টাকা দাদন দিয়ে সত্য নারায়ণ খাঁ শুরু করেছিলেন ফিল্ম ব্যবসা। সেই শুরু এখনও শেষ হয়নি, চলছে। ফিল্ম লাইনের বাঁকাচোরা পথে মাঝে মাঝে হোঁচট খেয়ে তিনি থেমে পড়েন নি বরং 'একলা চলরে' আপ্তবাক্যটিকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন।

হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে খাঁ-বংশের নাম জানে না এমন মানুষ মিলবে না, আশ-পাশের দু-দশ গাঁয়ে আমতা-মাজুরত প্রত্যেকেই জানেন খাঁ মানেই জগৎবল্লভপুরের এককালের জমিদার। আগে ছিল বড়বাজারে তেলের ব্যবসা। ভালোই চলত। অকস্মাৎ বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ায় স্কুলের পড়ুয়া ক্লাশ নাইনের ছাত্র সত্যনারায়ণকে তিনি এনে বসিয়ে দিলেন বড়বাজারের গদিতে। বললেন —দেখো কি করতে পারো! আমার তো আর বেশী দিন বাকি নেই। তুমি বড়ো, তোমাকেই সব বুঝে-সুঝে নিতে হবে।'

বুদ্ধির জোরে আর অধ্যবসায়ের গুণে সেই ব্যবস্থা সত্যনারায়ণবাবুর হাতে ফুলে ফেঁপে উঠল এক সময়। এই বড়বাজারেই একদিন পরিচয় হয়েছিল প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মশায়ের সঙ্গে। তিনি নাকি তখন ছবির বিজনেসে ব্রোকারি করেন। ওঁরই পরামর্শে সত্যনারায়ণবাবু এলেন ফিল্ম লাইনে। দীপচাঁদ কাংকারিয়ার 'বাঁকা লেখা'য় কিছু ফিনান্স করলেন। ছবিটা মন্দ চলেনি, তিনি তাঁর টাকা ফেরৎ পেয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে ছবির প্রোডাকসনে নামার জন্য তোড়জোড় শুরু করলেন ওঁরা। সত্যনারায়ণ-বাবু একা নন, সঙ্গে আছেন প্রাণকৃষ্ণ দত্ত দুর্গা বসুমল্লিক আর সুনীল বসুমল্লিক। তৈরী হলো নারায়ণ পিকচার্স। টাকা-পয়সার সব দায়িত্ব নিলেন সত্যনারায়ণবাবু নিজে, ওঁরা হলেন পঁচিশ পার্সেন্ট ওয়ার্কিং পার্টনার।

এর আগে অবশ্য কোয়ালিটি ফিল্মস নামে একটি পরিবেশক সংস্থা খুলেছিলেন সবাই মিলে। কিন্তু তার আয়ু ছিল মাত্র বছর দুই।

নারায়ণ পিকচার্স জন্মক্ষণ থেকেই হোল সুনামের অধিকারী। প্রযোজনা-পরিবেশনা দুটি কাজেই তাঁরা এগিয়ে এলেন। প্রথম ছবি—'স্বামী'—পরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, সুপার হিট ছবি। পরবর্তী ছবি 'কিষাণ'—মাঝারি ধরনের ছবি। এর পর শরৎচন্দ্রের গল্প নিয়ে যে ছবিগুলো হয়েছে তার প্রায় সবগুলিই পরিবেশন করেছেন নারায়ণ পিকচার্স। এবং সবগুলোই সুপার সুপার হিট।

শ্রীমতী পিকচার্সের (কানন দেবীর) সব ছবিরই তিনি ছিলেন পরিবেশক। কানন দেবীর সঙ্গে আলিখিত চুক্তিই ছিল শরৎ-চন্দ্রের গল্প নিয়ে ছবি হলে নারায়ণ পিকচার্সই ছবির পরিবেশনার দায়িত্ব পাবে। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য কানন দেবী খুব শিগ্গিরই যে ছবির কাজ শুরু করতে যাচ্ছেন—সেটির পরিবেশনাও নিচ্ছেন নারায়ণবাবু। ছবির নাম—'বিপ্রদাস'।)

একে একে শরৎচন্দ্রের গল্প ছাড়াও যে ছবিগুলি নারায়ণ পিকচার্সকে ফোরফ্রন্টে এনে দিল সেগুলি হচ্ছে রানী রাসমনী, শিল্পী, মামলার ফল, সিঁদুর, আজ সন্ধ্যায়, ডাক্তারবাবু, ভোলা মাস্টার, হেডমাস্টার, আঁধারে আলো, সাহেব বিবি গোলাম ইত্যাদি ছবি, সব নাম লিখতে গেলে বাড়তি পাতার দরকার।

নারায়ণ পিকচার্সের ব্যবসায়িক সুনাম তখন মধ্যগগনে। ফিল্ম জগতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তখন সবাই। ঠিক সময় এমনি বজ্রপাতের মতই/সাত মাসের ব্যবধানে দুই ওয়ার্কিং পার্টনার ছেড়ে দিলেন ব্যবসা। প্রাণকৃষ্ণবাবু গিয়ে খুললেন শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স আর সুনীল বসুমল্লিক তৈরী করলেন কালিকা ফিল্মস।

সেই সময়টার কথা বলতে গিয়ে নারায়ণবাবু একটু ইমোশন্যাল হয়ে পড়েন। অতর্কিত এই আঘাতে অবশ্য তিনি বিন্দুমাত্র ভেঙ্গে পড়েন নি, শিরদাঁড়া সোজা রেখে এগিয়ে গেছেন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে। মানসিক ধৈর্য তাঁর অসাধারণ। ঐ সময়েই তিনি কংগ্রেসের সদস্য হিসাবে

বিধানসভায় এসেছিলেন সদস্য হয়ে। পাঁচ-পাঁচটা বছর কাটিয়ে সাতষট্টি সালে আর ফিরে আসেন নি বিধানসভায়। রাজনীতির দরবারীতে ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছিল তাই।

ইতিমধ্যে ১৯৬২তেই চণ্ডীমাতা ফিল্মস খুলেছেন। নতুন সংস্থা। ব্যবসা বাড়ছিল, নিজে সবদিক দেখাশুনো করতে পারছিলেন না। নারায়ণ পিকচার্সের সর্বস্বত্ব নিয়ে সত্যনারায়ণবাবু বসলেন। চণ্ডীমাতার দায়িত্ব দিলেন দুই ছেলে দিলীপ খাঁ এবং প্রদীপ খাঁ-এর ওপর। ছোটভাই অজামিল ভূষণ খাঁও একজন ডিরেকটর। আর সেক্রেটারী আছেন প্রণব বসু। বস্তুতঃ প্রোডাকসন ডিস্ট্রিবিউশনের ফিল্ড ওয়ার্ক করেন প্রণব বাবুই। আর বিহাইণ্ড দি স্ক্রীন রেন হচ্ছে এই সত্যনারায়ণ খাঁর। যিনি এই দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠানটিকে গড়ে তুলেছেন।

নারায়ণ পিকচার্সের মত চণ্ডীমাতা ফিল্মসও বাংলা ছবির জগতের গর্ব। ফি-বছর অন্ততঃ চারখানি ছবি এই প্রতিষ্ঠান থেকে পায় দর্শকরা। ভালো ছবি পরিবেশনার সুনাম আছে বলেই চণ্ডীমাতা এখনও সবচেয়ে বড় সংস্থা। আরও গর্বের বিষয় যে এটি সম্পূর্ণ বাঙালীর সংস্থা।

—হিন্দী ছবির ডিস্ট্রিবিউসান নেন না কেন? ওখানে তো আরও বেশী টাকা আয় হতে পারে?

শ্রীশ্রীমা (১৯৫৮ খৃঃ)
ছায়া দেবী ঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বিনয়ের সঙ্গে সত্যনারায়ণবাবু বললেন —বলতে পারেন ওটা আমার প্রিন্সিপল্। হিন্দী ছবি কখনও নিইনি, নেবোও না। বরং হিন্দী আর্টিস্টদের এনে এখানে বাংলায় ছবি করার চেষ্টা করবো।' উদাহরণ দিয়ে বললেন—'পাড়ি করেছি। দিলীপকুমার ধর্মেন্দ্র অভিনয় করেছিল। সুমিত্রা দেবীকে যখন বম্বেতে রমরমা, তখন তাঁকে আনিয়ে এখানে আঁধারে আলো, সাহেব বিবি গোলাম করিয়েছি। জয়া ভাদুড়ীকে এনে 'ধন্নিমেয়ে' করেছি এই তো ক'বছর আগে।'

চণ্ডীমাতা বা নারায়ণ পিকচার্সের ব্যানারে ছবি করেন নি, এমন শিল্পী-কুশলী টালিগঞ্জে নেই। বললেন—'একমাত্র ব্যতিক্রম 'সত্যজিৎ রায় আর তপন সিংহ।' ইচ্ছে থাকলেও ওঁদের সঙ্গে তেমন যোগাযোগ ঘটেনি।

এই দীর্ঘ সময়ে নবীন প্রবীণ বহু শিল্পী মনীষীর সংস্পর্শে তিনি এসেছেন। সবচেয়ে বেশী করে কার কথা মনে পড়ে জিজ্ঞেস করতে বললেন—'কানন দেবী আর ছবি বিশ্বাস।' ভাবুন তো ঐ ভদ্রমহিলা কোথা থেকে আজ কোথায় উঠে এসেছেন। গলা-অভিনয় আর আন্তরিক চেষ্টা না থাকলে এটা সম্ভব নয়।'

স্মৃতি রচনা করতে গিয়ে একটা ঘটনার কথা তিনি বললেন। 'মেজদিদি' রিলিজের আগে শো হয়েছে স্টুডিওয়। সত্যনারায়ণ ছবি দেখে খুব খুশী। কিন্তু কানন দেবীর তেমন ভাল লাগেনি। ছবির ব্যবসায়িক সাফল্য সম্পর্কে তিনি চিন্তায় পড়েছেন। নারায়ণবাবু বললেন—'চিন্তার কিছু নেই

স্বামী (১৯৪৯খৃঃ) সুমিত্রা দেবী

ফ্লোর থেকে বলছি

শটের রিহার্সালের সময় আমি ঠিক বুঝতে পারিনি যে চোখের সামনে যে মেয়েটি চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, সে কথা বলতে পারে না—কানেও শুনতে পায় না। কাহিনীকার-পরিচালক সুখেন দাস আমায় বললেন—এই মেয়ের নাম নয়ন। এর নামেই আমি ছবির নাম করছি। আর এই নয়নের ভূমিকায় অভিনয় করছেন সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়।

ফ্লোরে তখন ছবির একটা সটের তোড়জোড় চলছিল। তারই ফাঁকে ফাঁকে সুখেন দাস আমাকে ছবির গল্প সংক্ষেপে বলছিলেন। সুখেন দাস ইতিপূর্বে কয়েকটি চলচ্চিত্রের কাহিনী লিখেছেন। এই ব্যাপারে তাঁর নিশ্চয়ই মুন্সীয়ানা আছে। কারণ প্রতিটি ছবিই ভাল চলেছে। দর্শকেরা খুশী হয়েছেন। দর্শকদের ভাল লাগাবার জন্যেই যখন এত তোড়জোড় তখন আমি বলব সুখেন দাস ঠিকই করেছেন। আমরা যখন সকলেই বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য উদগ্রীব—তখন আমরা নিশ্চয়ই চাইব দর্শকদের খুশী করার মত ছবির সুখন বেশী করে তৈরী হয়। তাতে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রী বাঁচবে—ইণ্ডাস্ট্রীর ওপর যারা নির্ভরশীল, তারা বাঁচবে।

মুসাফিরের পাশে একজন নামজাদা আর্টিষ্ট বসেছিলেন। তিনি বললেন, সুখেন ঠিকই বলেছে। সর্বাগ্রে ইণ্ডাস্ট্রীকে বাঁচাতে হবে, তারপর ছবির শিল্পগত উৎকর্ষ নিয়ে বিচার-বিবেচনা। এই যে ধরুন না, ছিয়াত্তর সালের গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত যে কটি বাংলা ছবি রিলিজ হয়েছে—তার একটাও কী হিট করেছে? শুধু ফ্লপের পর ফ্লপ চলেছে। এই ভাবে আর কিছুদিন কাটলে ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রীর সর্বনাশ ঘটবে। প্রযোজকরা আর সাহস করে ছবি তুলতে চাইবে না। আর বাংলা ছবি না ওঠার মানেই হচ্ছে হিন্দী ছবির পৌষ মাস। অর্ডিন্যান্স জারি করেও বাংলা সিনেমাকে বাঁচানো যাবে না...

মুসাফির বড় বিব্রত বোধ করছিল। বাংলা চলচ্চিত্রের এই সমস্যার কথা তার অজানা নয় কিন্তু ফ্লোর কভার করতে এসে হঠাৎ এই আলোচনায় জড়িয়ে পড়াটাও তার পক্ষে সুখকর নয়।

প্রতিশ্রুতি :: গান রেকর্ডিং অনুষ্ঠানে সঙ্গীতে পরিচালক হেমন্ত মুখার্জি, আরতি ভট্টাচার্য, পরিচালক পিনাকী মুখার্জি এবং গীতিকার পুলক ব্যানার্জি।

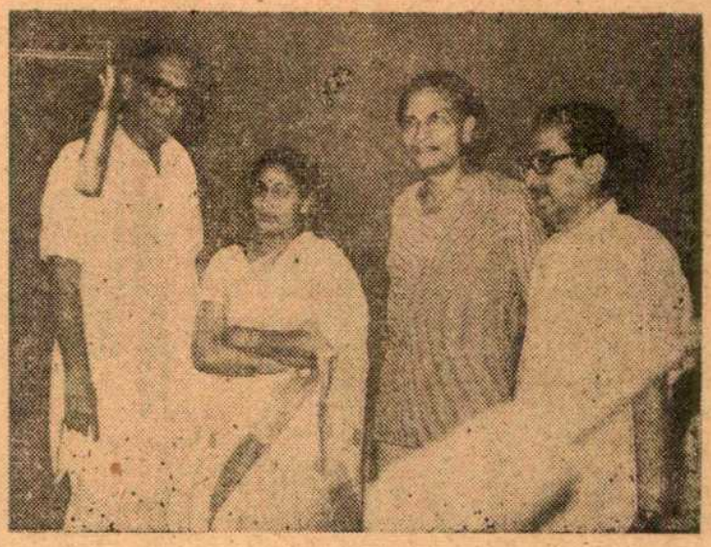

হাতে রইল তিন :: সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় ও রঞ্জিত মল্লিক। —অমৃত ফল্গু

বশ করে তার সাহায্যে নয়নের বিরুদ্ধে দুশ্চরিত্রের অপবাদ আনল। আর ঘটনাচক্রে সৌরেশ তা বিশ্বাস করে বসল। সেই সঙ্গে তারা নয়নের বিরুদ্ধে ঠাকুরের নিরেট সোনার মুকুট চুরির অভিযোগও প্রমাণ করে ছাড়ল। বোবা কালা নয়ন চোখের জলের মাধ্যমে তার প্রতিবাদ করল—কিন্তু সৌরেশকে সে বোঝাতে পারল না। চক্রান্তের এমনই মহিমা যে সে বিশ্বাস করল—নয়ন কুলটা—নয়ন চোর।

সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ীর আশ্রয় ঘুচে গেল নয়নের। নয়ন উন্মাদিনীর মত নদীর জলে ডুবে মরবে বলে ছুটে গেল। কিন্তু মরা হল না। সবাসাচী তার মাকে অনুসরণ করে তাকে আত্মহত্যা করা থেকে বাঁচাল।

সজল চোখে বলল—মাগো, তুমি এমনি-ভাবে চলে গেলে আমি বাঁচব কি করে? কে আমায় দেখবে? কে আমায় ভালবাসবে?

নয়নের মরা হল না। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে সে কাঁদল। তারপর স্থির করল—এই ছেলেকে মানুষ করে গড়ে তুলে সে এই মহা অন্যায়ের সত্যিকারের প্রতিবাদ করবে। নয়ন এরপর আশ্রয় পেল এক সম-ব্যথী মেয়ের কাছে। বস্তিতে জুটল ঠাঁই। আর তার জীবিকা হল—বাবুদের বাড়ী ঝি-বৃত্তি। সেই সামান্য উপার্জনেই সে ছেলেকে স্কুল—স্কুল থেকে কলেজে পড়িয়ে মানুষ করে গড়ে তুলল। সবাসাচী ইউ-নিভার্সিটির পড়া শেষ করে শেষ পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরী পেল।

ওদিকে কিছুদিনের মধ্যে দেনার দায়ে সৌরেশের কারখানা বিক্রী হয়ে গেল। ছেলের খোঁজ করে না পেয়ে সৌরেশ তখন সংসার সম্পর্কে রীতিমত বীতশ্রদ্ধ। সে কারখানা বাঁচাবারও কোন চেষ্টা করল না। তারপর একদিন সে তীর্থের পথে বেরিয়ে পড়ল। শান্তির সন্ধানে। বহু তীর্থ ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একদিন সৌরেশের সঙ্গে তার বন্ধ্যা পিসিমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। পিসিমা তাকে আবার সংসারে ফিরে যেতে উপদেশ দিল। নয়নের ওপর যে অবিচার হয়েছে তাও সব খুলে বলল।

তাতে যেন চৈতন্য ফিরল সৌরেশের। সে এত তলিয়ে চিন্তা করেনি কখনও। সৌরেশ তখন নয়নের খোঁজে কলকাতায় ফিরল। নয়নের কাছে ক্ষমা না পেলে তার যে মুক্তি নেই।

বাড়ী ফিরে দুই ভাই এবং তাদের বৌদের দৈনদশা দেখে সৌরেশ হতবাক। একজন পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী। আর অন্য-জনের পেছনে পুলিশের গ্রেপ্তারী পরো-য়ানা ঘুরছে। ছোটভাই তখন নানা ধরনের অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত। দাদাকে দেখে সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল—দাদা তুমি আমায় বাঁচাও। আমার জেল হলে নিরপরাধ ছেলে-মেয়েগুলি না খেয়ে শুকিয়ে মরবে। পেটের জ্বালায় আমি চোর বদমায়েশ হয়েছি।

স্নেহপ্রবণ দাদা বলল—বেশ তাতে যদি তোর সংসার বাঁচে তাহলে আমিই তোর অপরাধের বোঝা কাঁধে তুলে নিচ্ছি। ডাক্ পুলিশ—

সৌরেশের স্বেচ্ছা স্বীকারোক্তিতে পুলিশ তাকেই গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্য চালান করে দিল।

যাবার আগে বলে গেল—তোরা তোদের বৌদিকে খুঁজে বের করে বলিস সে যেন আমায় ক্ষমা করে। আর তোরাও তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিস—

এবং তারপরই পিতা-পুত্র মুখোমুখি একদিকে আইনের নিরপেক্ষতা—অন্যদিকে পিতা-পুত্রের সম্পর্কের প্রশ্ন...

ফ্লোরে শট দিচ্ছে নয়ন এবং সবাসাচী। নয়নের চুলে পাক ধরেছে। চোখের দৃষ্টির উজ্জ্বলতা কমেছে। নয়ন যখন শুনল স্বয়ং স্বামী তার ছেলের বিচারের কাঠগড়ায়—তখন সে প্রতিহিংসা চরিতার্থের হাসিতে ফেটে পড়তে পারত—কিন্তু আমি দেখলাম যার কণ্ঠস্বর নেই যার শ্রবণী নেই—হয় অঝোরে কান্নায় সতীনের ছেলের বুকে ভেঙ্গে পড়ছে যেন টুকরো টুকরো হয়ে। ছেলের চোখেও জল। অদৃষ্ট আজ তাদের এ-কোথায় টেনে এনে ফেলল।

সুখেন দাসের এ-গল্প, এ-ছবি হয়ত মামুলী, একটা টিয়ার জার্কার ছবি—তবুও মানবিক সম্পর্কের নিক্তিতে যদি এর প্রকৃত ওজন কখনও হয়, দেখা যাবে সে মূল্য-বোধের ভিত্তিতে পৃথিবীর সব সৎ প্রয়াস, মহৎ শিল্পসৃষ্টি—তা থেকে এই নাটকীয় কাহিনী খুব একটা দূরের জিনিস নয়। মুসাফির সেই রকমই ভাবছে—এখন সময়ের সঙ্গে দাঁড়িয়েও।

মুশাফির

বর্ণবিবর্ণ : মমতা চট্টোপাধ্যায়

দু'খানি ছবি

'আমার ছবি কেউ দেখল বা না দেখল তাতে কিছু আসে যায় না। ছবি করতে আমার ভালো লাগে বলেই আমি ছবি করি...' এমনতরো উক্তি যাঁর তাঁর ছবিকে সহসা ফেলে দেবার সাহস বোধহয় কারোরই নেই। নেই অভাবিত কিছু দেবার আশা নিয়ে গিয়েছিলাম অ্যাকাডেমী হলে। ফিল্ম সেন্ট্রাল আয়োজিত চলচ্চিত্র উৎসবে সেদিনের ছবি ছিল মণি কাউলের 'আষাঢ় কা একদিন'।

মহাকবি কালিদাসের জীবনে প্রেম ছিল প্রেমের বেদনা ছিল। কমলা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর বাল্যপ্রণয়ের কথা হয়তো অনেকেরই জানা নেই। পরিচালক শ্রীকাউল কবির সেই প্রায় অজানা অধ্যায়টির প্রতি আলোকপাত করেছেন। কালিদাসের মান-সিকতা সুন্দরভাবে পরিস্ফুট। প্রথম জীবনে কমলার সঙ্গে তাঁর প্রেম.....পরবর্তী সময়ে উজ্জয়িনীর রাজদুহিতার সঙ্গে কবির বিবাহপর্ব.....এবং অন্তিমে বিলাস বাহুল্য পরিত্যাগ করে কমলার কাছে তাঁর প্রত্যা-বর্তন এই তিনটি অধ্যায়কেই এক ধরনের স্নিগ্ধ কাব্যিক মেজাজ চিত্রায়িত করেছেন পরিচালক। রবি ঠাকুরের কিছু দীর্ঘ কবিতার মত আপাত ক্লান্তির মধ্যেও এক [illegible] সুষমা ছড়িয়ে আছে ছবিখানির [illegible] কে কে মহাজনের ক্যামেরা শিল্পী হাতের নরম তুলির মত ঘুরে বেড়িয়েছে পাহাড়ে উপত্যকায় অরণ্যানিতে। আর অধিকাংশ সময় আলো-আঁধারির মাঝে কিছু কিছু চমকে দেওয়া কম্পোজিশনে কমলা-মাতুল আলাবিলোমের মুখে কাঠের ঘরে মশাল আর আলোর মাঝে।

সংলাপ এই ছবির আরেক সম্পদ। কাহিনীকালের কথা স্মরণ রেখে সংলাপে সংস্কৃত ঘেঁষা হিন্দীর ব্যবহার প্রশংসনীয়। এবং সেই সঙ্গে অভিনয়ে এক ধরনের ধীর-

চরিত্র-প্রস্তুতির সময় মদ্যপান থেকেও তিনি বিরত থাকতেন। রথযাত্রা উপলক্ষে পুরী ও কটকে গিয়ে মিনার্ভা থিয়েটার কয়েক রজনী অভিনয় করে আসা একদল পুরী যায় আর একদল কলকাতায় থাকে। আবার কাউকে কাউকে শনি-রবিবার অভিনয় করে পুরী বা কটকে যেতে হতো। আবার শনিবার কলকাতায় ফিরে অভিনয় করতে হতো। পুরীর অভিনয়ের লোকসান কটকের অভিনয় দিয়ে পূরণ করা হয়।

২৯ জুলাই ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রাণা-প্রতাপের নামভূমিকায় দানীবাবু এবং অপরেশচন্দ্র অভিনয় করেন শক্তি সিংহ চরিত্রে। রাণাপ্রতাপের রিহার্সেল পরিচালনা বিষয়ে নটগুরু গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালকে আহ্বান জানালে দ্বিজেন্দ্রলাল উত্তর দিয়েছিলেন, সেকি কথা? যেখানে আপনি আর অর্ধেন্দুশেখর উপস্থিত সেখানে আমি রিহার্সেল দেব কি? আপনি রিহার্সেল দিন। আমি শুনি।

অপরেশচন্দ্র তার রঙ্গালয়ে ত্রিশ বছর পূর্তিকে লিখেছেন, রিহার্সেল আরম্ভ হইল। তখনকার সে রিহার্সেল—সে এক অপূর্ব দৃশ্য। সম্মুখের চেয়ারে গিরিশচন্দ্র—পুরুষ সিংহ; পার্শ্বে দ্বিজেন্দ্রলাল, শান্ত-সৌম্য-সুন্দর, তাহার সাথে তাহারই দুই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু; এক পার্শ্বে একটা পাঠাগার মত, উঁচু প্ল্যাণ্ড, তাহাতে ভর দিয়া অর্ধেন্দুশেখর দাঁড়াইয়া' মনমোহনবাবু, মহেন্দ্রবাবু এবং তাঁহার দুই একজন ব্যবহারজীবীবন্ধু সকলে বসিয়া; জমজমাট আসর—দক্ষিণে বসে আমরা অভিনেতারা সুবোধ ছাত্রের মত বসিয়া কিছুদূরে সম্মুখের ফরাসে অভিনেত্রী দল। সূচীপতনেরও শব্দ হয়, স্থান এমনি নিস্তব্ধ। গিরিশচন্দ্র রিহার্সালে বসিলে রিহার্সেলের আসর এমনি জমিয়া উঠিত। গিরিশচন্দ্র যে রিহার্সেলে আসরে, সেখানে তদানীন্তন কত মহা মহারথী, কত সাহিত্যিক, কত নাট্যকার এবং কত সমালোচককে কতদিন এমনি বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। হায়! বাংলা থিয়েটার, সে গৌরবের আসর আর কখনও দেখিবে কিনা কে জানে।

প্রথম দিন দুঘণ্টা রিহার্সেল হয়। প্রথম দিনের রিহার্সেল শুনেই দ্বিজেন্দ্রলাল বলেন, চমৎকার হবে।

দ্বিতীয় দিনেও দ্বিজেন্দ্রলাল উপস্থিত। তৃতীয় অঙ্কের একটা দৃশ্যে সেলিম শক্তি সিংহকে লাথি মারত। এই লাথি মারা নিয়ে গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালকে জিজ্ঞাসা করেন, রায় মশায়, এই লাথি মারার জের মেটালেন কোথায়? দ্বিজেন্দ্রলাল উত্তর দিয়েছিলেন, লাথির শোধ নিয়েছি আমি পঞ্চম অঙ্কে। শক্তিসিংহ সেলিমকে পদাঘাত করবে।

গিরিশচন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন, আপনার সাহস আছে। দুই লাথির চোটেই আমার কলম কিন্তু বন্ধ হয়ে যেত।

অভিনয়ের সময় দ্বিতীয় রজনী থেকে একটা লাথি-মারা বন্ধ করতে হয়েছিল। শেষের লাথি মারার দৃশ্যটির যে বিবরণ অপরেশচন্দ্র লিখে গেছেন—তা থেকেই বলছি। সেলিম বিবাহ করতে যাচ্ছে। বিরাট প্রশেসন। কিন্তু সমস্যা দেখা গেল গিরিশচন্দ্রের সামনে। সেলিম ঘোড়া-হাতী-উট না হয় তাজঙ্গমে চড়ে বিয়েতে যাবে। কিন্তু তাহলে শক্তিসিংহ তাকে কি করে লাথি মারবে? শেষ পর্যন্ত হেঁটেই সেলিম বিয়েতে যাত্রা করলো এবং শক্তিসিংহ ছুটে এসে লাথি মারলো। শক্তিসিংহ রূপে অপরেশচন্দ্র খেয়মিত্র রূপী সেলিমের লাথিতে বরবেশে মঞ্চে গড়াগড়ি খেতে লাগলো। দর্শকেরা সঙ্গে সঙ্গে হো-হো করে ফেটে পড়লেন হাসিতে। গিরিশচন্দ্র দ্বিতীয় রজনী থেকে দ্বিতীয় লাথি মারা বন্ধ করে দেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তখন গিরিশচন্দ্রকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, আমি অতটা বুঝতে পারিনি। এই নাটকেরই আর একটা দৃশ্যে আছে আকবর-কন্যা মেহের উন্নিসা রাণা-প্রতাপের কুটীরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ইরার সঙ্গে সাখিত্ব বশতঃ ইরার বিছনায় উঠে বসবে—যেন এক পরিবারভুক্ত। রিহার্সেল দিতে দিতে গিরিশচন্দ্র বলেন, দৃশ্যটি চমকপ্রদ। দর্শকরা হাততালিও দিতে পারে—হিন্দু মুসলমানের এমন চোখ-জুড়ানো দৃশ্য দেখে। কিন্তু আমি প্রতাপসিংহ হলে তালগাছে দড়ি থেকে ঝুলে মরতাম। রাণাপ্রতাপ কী করে এই দৃশ্য মেনে নেবেন?

কালীশ মুখোপাধ্যায়

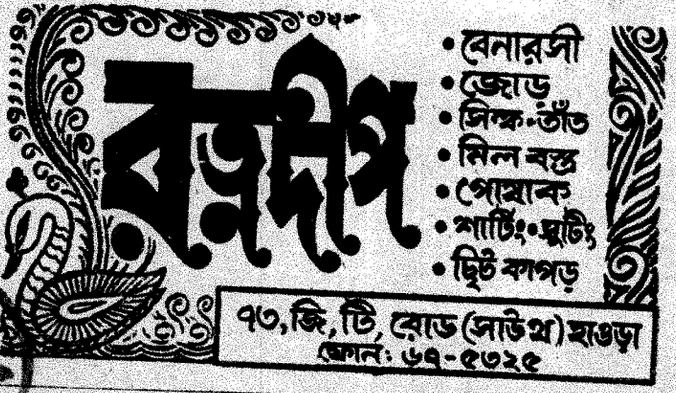

বিবিধ সংবাদ

সংগীতে কৃতিত্ব : শ্যামলী ঘোষ গীতিকা আয়োজিত নিখিলবঙ্গ গীতিকা সংগীত প্রতিযোগিতায় খেয়াল ও রবীন্দ্র সংগীতে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন।

ত্রিশতম বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে ১৯ জুন অবন মহলে সঙ্গীত ট্রেনিং কোরের সভ্যবৃন্দ উপহার দেন একটি আনন্দসন্ধ্যা। এই সানন্দ সন্ধ্যায় সংঘের শিশুসদস্যরা 'হিমকুমারী ও সাতবামন' নামক নৃত্যনাট্য এবং অন্যান্য সদস্য ও সদস্যরা 'দোহাই হাসবেন না' নামক নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। প্রথম অনুষ্ঠান প্রখ্যাত ইংরাজী রূপকথা অবলম্বনে সমীর ঘোষ রচিত 'হিমকুমারী ও সাতবামন' নৃত্যনাট্য সবচেয়ে বেশী উপভোগ্য হয়েছিল। হিমকুমারীর ভূমিকায় মৌসুমী মিত্র, উজ্জীবিত নৃত্যে সমবেত দর্শকদের মন কাড়েন উর্মিম রায় (সুপ্তি-মতী), মৌসুমী মুখার্জি (রাজকুমার) এবং মৌসুমী দাশগুপ্ত (আয়না) নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করে নেয়। এছাড়া সুঅভিনয় করে মহাশ্বেতা ঘোষ অনিতা দাস, স্বাতী ভট্টাচার্য, মামণি দাস, বনশ্রী চক্রবর্তী, পিয়ালি সেনগুপ্ত, তাপসী ঘোষ, সৌমি দাস, ধ্রুবা ব্যানার্জি, মৌ মুখার্জি, শর্মিষ্ঠা ঘোষ ও মৌসুমী মুখার্জি। নৃত্য পরিচালনা করেন মীরা দাশগুপ্তা। মিষ্টি সুর ও সংগীত পরিচালনায় সলিল মিত্র নিজের দক্ষতা প্রমাণ করেন।

সংগীতাংশে সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখান চন্দ্রা মুখার্জি (হিমকুমারী)। অন্যান্য চরিত্রের সার্থক শিল্পী হলেন রুণু বসু, সুজাতা চারি, সঞ্জয় দত্ত, বিপ্লব মল্লিক ও কালীদাশ মহলানবিশ। দ্বিতীয় তথা শেষ অনুষ্ঠান রতন ঘোষ রচিত 'দোহাই হাসবেন না' নাটকটিও বেশ উপভোগ্য হয়। এই নাটকে যারা সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখান তাঁরা হলেন সমীর ঘোষ (কমলেশ), অজয় কয়রাল (ব্যান্ডো) সমর হালদার (কালী-নাথ) সেমেন ব্যানার্জি (নিতাহরি), দীপ্তি চ্যাটার্জি (রামসেবক), ভোলানাথ ঘোষ (টাকরাম) কেকা চৌধুরী (মালা) মুনমুন ভট্টাচার্য (পিসীমা) এবং শ্যামালাল ব্যানার্জি (ভোলা)।

অন্যান্য যাঁরা নাট্যানুষ্ঠানকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন অজয় বসু, অভিজিৎ ঘোষাল ও প্রসূন ঘোষ। নাটকটি পরিচালনা ও আবহসংগীতে কৃতিত্ব দেখান অজয় কয়রাল ও সলিল মিত্র।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৯ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের নতুন বই

চিত্র বিচিত্র

একাল-সেকালের বিচিত্র কথা ও রসমধুর কাহিনী-সমারোহ দাম ঃ সাত টাকা

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১৩৮১ সালের মৌচাক পত্রিকা কর্তৃক
সুধীরচন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ রচিত
ছোট বড় সকলের মনের মত
বাংলা সাহিত্যের দু'খানি আশ্চর্য বই

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য ঃ—চার টাকা

(সপ্তম সংস্করণ চলছে)

ছোটদের উপযোগী সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী লেখা হয় নি। বিশেষ করে নানাবিষয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ছোটদের মনের মত বিচিত্র রোমাঞ্চকর লেখা খুব সহজ নয়। বিচিত্র কাহিনী'তে লেখক সত্য ঘটনাগুলিকে নিজের সরস মুন্সিয়ানা দিয়ে এমন জীবন্ত আর আকর্ষণীয় করে তুলেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রচনাই অনবদ্য রস ও রোমাঞ্চে টইটম্বুর। মোট পনেরোটি কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রসের ফল্গুধারায় সিক্ত বর্ণনায় মনোমুগ্ধকর।

আরও বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য ঃ—চার টাকা

(চতুর্থ সংস্করণ চলছে)

আরও বিচিত্র কাহিনী বইটি কিশোর ও বয়স্কদের জন্য সমভাবে রচিত। লেখক শুধু ছোটদের জন্যই রস পরিবেশন করেননি, বড়রাও এই অমৃত আস্বাদন করে পুলকিত হবেন। অনবদ্য রস রচনাশৈলী এবং প্রতিটি কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ চুম্বকের মত পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে। এই বইটিতে দশটি বিভিন্ন রসের কাহিনী রয়েছে এবং লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি এমন সুন্দরভাবে রসযুক্ত করে উপস্থিত করেছেন যে পাঠককে বিমুগ্ধ করবে।

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ঃ ফোন ৩৪-১৭৮২

Grams : AMRITA Calcutta-700003 AMRITA Phone 55-5231 (14 lines)

ELPARADE

24 JUL 1976

এলপার স্যুটিং-এর প্যারেডঃ

চেক, স্ট্রাইপ, ক্রেপ—টেকস্চ্যারাইজড্...এলপার স্যুটিং-এর বিস্ময়কর সম্পূর্ণ নতুন সম্ভার ! এছাড়া, শার্টিং • শাড়ী • জামার কাপড়।

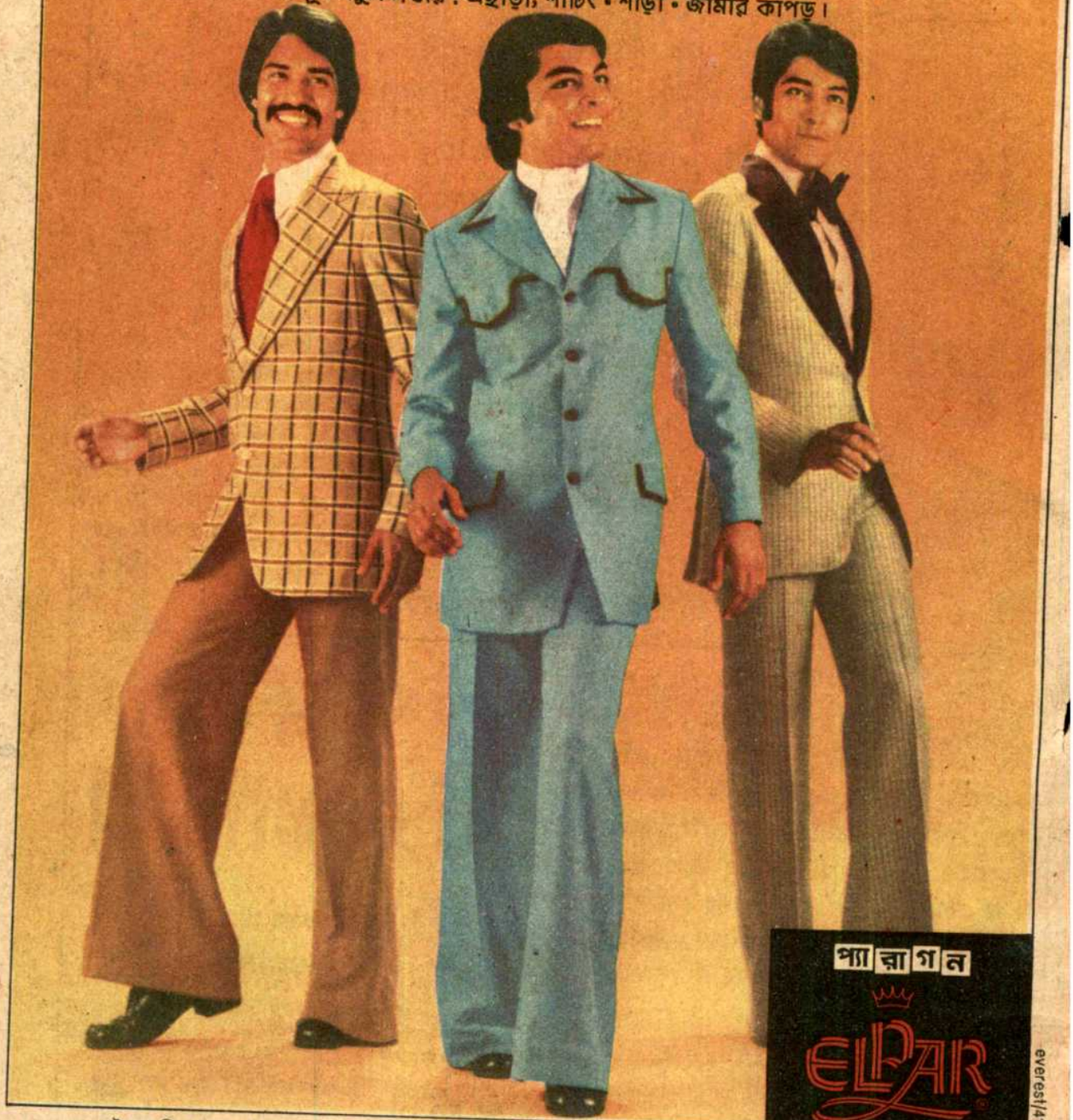

এই সব কিছুর সঙ্গেই এলপার আপনাকে দিচ্ছে পয়সা ফেরত দেবার অদ্বিতীয় গ্যারাণ্টী।

সব প্রধান দোকান গুলিতেই পাওয়া যায়। প্যারাগন টেকস্টাইল্ মিল্স্, বম্বে ৪০০ ০১৩

প্যারাগন

ELPAR

এলপার স্যুটিং
বিশ্বাসের প্রতীক

everest/412/PTM-bn

ফটো-অফসেট : এন, কে, গোসেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ /

৬ আগস্ট ১৯৭৬ ॥

মূল্য ৭৫ পয়সা
অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা

বারোলীন যার সহায়
গ্রীষ্মে তার ভয় কি?

ঘর্মাক্ত রাত্রি ত্যাগ আপনাকে সারাদিনের এই অরুচিকর স্মৃতিই ঘুমাতে ফিরাতে হবে। শরীরের উত্তাপ সংশোধন সব তাপে গলিয়ে যাবে। দেখা দেবে ফোড়া, ফুসকুড়ি ও শরীরে অন্যান্য অস্বাচ্ছন্দ্য। অনেক সময় এই সব অসুখ দূষিত হ'য়ে ওঠে বাইরের ধুলো-(ধোঁয়া বা রোদ-জলে।

বারোলীন সুরভিত অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম আপনার ঘামের সময়ে ক'রে কাটা-(ছেঁড়া-ফাটা অংশগুলোকে নিরাপদ রাখে।

প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর
নেস্‌কাফে® স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়
NESCAFE
instant coffee
finest
coffee
নেস্‌কাফে
শতকরা ১০০ ভাগ
খাঁটি কফি থেকে তৈরী
একমাত্র ইনস্ট্যান্ট কফি
বিশ্বের সর্বাধিক বিক্রীত কফি

বাংলা ভ্রমণ-সাহিত্যের অনন্য রূপকার

শঙ্কু মহারাজ-এর

মন-দ্বারকায় ১২.

জরাসন্ধের আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা থেকে দ্বারকায় চলে গিয়েছিলেন, আর শ্রীকৃষ্ণের মহাজীবনকে ভ্রমণ-কাহিনীর মাঝে ধরে রাখবার প্রেরণায় অস্থির হয়ে লেখক মথুরা থেকে দ্বারকা ও বেট-দ্বারকায় ছুটে গিয়েছেন। তারপরে সেই তীর্থ পরিক্রমার কাহিনী ও মহাভারতের কৃষ্ণকথা নিয়ে দীর্ঘ দু'বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে রচনা করলেন এই অনবদ্য গ্রন্থ। বহু আলোকচিত্র শোভিত অপূর্ব ভ্রমণ-কাহিনী।

নিখিলচন্দ্র সরকারের সাম্প্রতিকতম উপন্যাস

সজনে নির্জনে ১২.

সমস্যাজর্জরিত বাঙালীর সামাজিক জীবনের বর্তমান ভঙ্গুর চিত্র। নানা আঘাত-সংঘাত, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে বাঙালীর পারিবারিক চিত্র আজ বিষাদ-মলিন। তারই প্রেক্ষাপটে আপনার-আমার —প্রতিটি বাঙালী-মনের অসহনীয় বেদনা-বিধুর কাহিনী।

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সর্বাধুনিক উপন্যাস

একাল চিরকাল ১০.

চিরঞ্জীব-এর অনবদ্য গ্রন্থ

বিশ্বকাপ ফুটবল ২৫.

অমলেন্দু ঘোষের নবতম গ্রন্থ

বিপ্লব ও বিপ্লবী ৮.

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অপূর্ব উপন্যাস

চাঁদের কাছাকাছি ৭.

চলচ্চিত্রের রূপালী পর্দায় শীঘ্রই দেখতে পাবেন

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নতুন ভ্রমণ-কাহিনী

গোমুখীর পথ ১৬.

দৃষ্টিহীনের উপন্যাস

মঞ্চ ১০.

ব্রজমাধব ভট্টাচার্যের উপন্যাস

স্বর্ণভ্রমর ১৪.

অমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সুবর্নাশরি ২০.

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

থৈ থৈ হাহাকার ১৮.

নারায়ণ সান্যালের উপন্যাস

বিহঙ্গ বাসনা ১০.

শক্তিপদ রাজগুরুর

অভয়ারণ্য ১৫.

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাস

স্বাতী ও দীপু ১২.

আবদুল জব্বারের

পল্লীর পদাবলী ১৬.

কলহণের উপন্যাস

খবরে প্রকাশ ১০.

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

নীলাঙ্গুরীয় ১২.

নটরাজন-এর

থানার মাটি নোনা ১৬.

রবীন্দ্র লাইব্রেরী

১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

কলি-১২

ফোন ঃ ৩৪-৮৩৫৬

পোকামাকড় যে কি তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে...ভাবতে পারবেন না!

ফিনিট

ছড়ান বাড়ীতে নিয়মিতভাবে, বাড়ী পোকামাকড় মুক্ত করুন, নিরাপদ অথচ নিশ্চিতভাবে!

বিজ্ঞানসম্মত ফরমুলায় তৈরী ফিনিট বহু উদ্দেশ্যসাধক কীটনাশক—মাছি, মশা, আরশোলা, ছারপোকার মত সব পোকামাকড় মারবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী।
অতএব, নাশ করুন সারা বাড়ীর কীট, ছড়িয়ে দিয়ে ঘাতক ফিনিট। মশা, মাছি, আরশোলা, ছারপোকা!

ফিনিট ছড়ান, ওদের খতম করুন!

নিরাপদ অথচ নিশ্চিতভাবে!

HP

হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড

ফিনিট 'পোকামাকড়-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা'

ফিনিট কিভাবে ব্যবহার করতে হয়

উড়ন্ত পোকামাকড়—
মাছি, মশা, পতঙ্গ, চাঁশ আর তীরফলের মতে। বন্ধ ঘরে ফিনিট স্প্রে করুন যতক্ষণ না ঘর কুয়াশাচ্ছন্ন দেখায়। ১৫ মিনিট পরে ঘর খুলে দিন।

হুকেহাঁটা পোকামাকড়—আরশোলা, পিঁপড়ে, মাকড়সা, ডানাহীন মাছি, কেন-বিছে, এঁটুলি, "সিলভার ফিশ"-এর ওপর।
যেখানে সম্ভব সোজাসুজি স্প্রে করুন। বেসিন মর্দমা থেকে নিয়ে সম্ভব মত সমস্ত লুকোবার জায়গায় স্প্রে করুন। সপ্তাহে একবার কি দুবার স্প্রে করবেন।
মনে রাখবেন, ফিনিট টিনের গায়ে আরও তথ্য দেওয়া আছে। সেগুলি নিশ্চয় করে পড়ে নেবেন।
মনে রাখবেন, পোকামাকড় শুধু বিরক্তিকর নয়, নানান রোগও ছড়ায়।
ফিনিট ছড়ান, ওদের খতম করুন।

CMHPF-3-244-Ben

১৬ বর্ষ

অমৃত

১৩ সংখ্যা

"ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 6th August, 1976 শুক্রবার, ২১ শ্রাবণ, ১৩৮৩

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়		
৭	বাক্সা	(গল্প)	শ্রীবরেন গঙ্গোপাধ্যায়
১০	ভুয়া	(গল্প)	ঐ
১৫	কথায় কথায়		শ্রীতারাপদ রায়
১৬	বিজ্ঞাপন বিচিত্রা		শ্রীআনন্দ রায়
১৮	গোষ্পদে বিম্বিত যথা	(কবিতা)	শ্রীবক্কেশ্বর হাজরা
১৮	বেহুলার শব	(কবিতা)	শ্রীসুকমল নাথ
১৮	প্রকৃতি	(কবিতা)	শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত
১৯	গোধূলিয়া	(উপন্যাস)	শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
২২	মনের অসুখ		শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
২৫	মোহিনী আট্টম	(উপন্যাস)	শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি
২৮	একালের গান		শ্রীসন্ধ্যা সেন

সদ্য প্রকাশিত—

স্বপ্নদেখা এক নিষিদ্ধ মহিলা রাজ্যে একটি মাত্র পুরুষের আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে সেখানকার জনজীবনের আলোড়নের পটভূমিকায় রচিত নটরাজন-এর সর্বাধুনিক কৌতূহলোদ্দীপক বিচিত্র উপন্যাস

প্রমীলা মহল ১০

লেখকের আর একখানি অসামান্য গ্রন্থ

ওরা সেই পুলিশ ১৫

চিরঞ্জীবের মেয়েদের খেলার জগতের একমাত্র গ্রন্থ

খেলার মাঠে মেয়েরা ৭

সন্তোষ ঘোষের ভ্রমণরসসিক্ত অসামান্য উপন্যাস

গুড্‌বাই ক্যালিফোর্ণিয়া ২০

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের নবতম গোয়েন্দা কাহিনী

সোনার পিতল মূর্তি ৭

আবদুল জব্বারের সাড়া জাগানো নতুন স্বাদের উপন্যাস

রাতপাখির ডাক ১২

পূর্ণ প্রকাশন : ৮এ, টেমার লেন, কলি-৯ ফোন : ৩৪-৯৫৯২

পূজো সংখ্যা

প্রসাদ

একাই একশো

প্রতি ৭টি উপন্যাস লিখছেন

বিমল মিত্র

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

নিমাই ভট্টাচার্য

প্রফুল্ল রায়

এবং

চিত্তরঞ্জন মাইতি

এবং

চাণক্য সেন

রহস্য উপন্যাসে

কিরীটি রায়কে আনছেন

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

একটি সম্পূর্ণ নভেলেট

লিখছেন

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আরো লেখার খবর

আগামী সংখ্যায়

যোগাযোগের ঠিকানা

৪২ ইন্ডিয়ান মীরর স্ট্রীট

কলকাতা-১৩

১৮০ গ্রামের
ডিটারজেন্ট শক্তিতে
ভরপুর বার
এখন মাত্র টা. ১.১৪ স্থানীয় কর অতিরিক্ত

সুপার ৭৭৭

ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার বার
ভারতে সবচেয়ে বেশী কাটতি

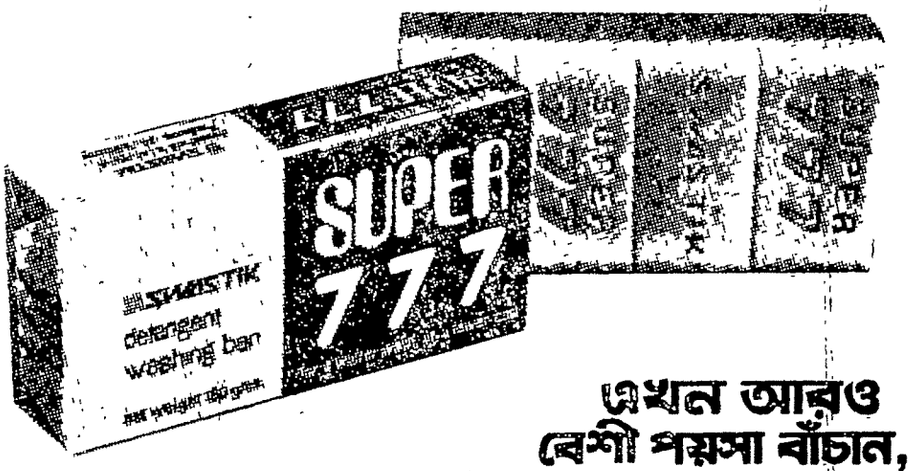

এখন আরও
বেশী পয়সা বাঁচান,
বেশী সাদা
করুন

সুপার ৭৭৭ এর মত উৎকৃষ্ট ও
কম দামে অন্য কোন সাবান বা ডিটারজেন্ট পাবেন না।

Shilpi dm 6A/76 ben

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৩২	একালের চিত্রশিল্পী		শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৩৫	অদ্য শেষ রজনী	(উপন্যাস)	শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
৪১	পালকি থেকে পাতাল রেল		শ্রীতারাশিস মুখোপাধ্যায়
৪৩	জন্তব	(গল্প)	শ্রীচন্ডী মণ্ডল
৪৮	পঞ্চশ্চ		ক্ষপণক
৪৯	বিজ্ঞানের কথা		অয়স্কান্ত
৫১	অঙ্গনা		শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৫২	মাঠ থেকে বলছি		শ্রীঅজয় বসু
৫৫	মাঠের নায়ক		শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৬	খেলাধুলো		দর্শক
৫৯	সিনেমাটিক টক		শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৬১	ক য়রজন		নিরীক্ষিং
৬৩	নাটমঞ্চ		নাট্যসমালোচক

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ লাস্ট জাজমেণ্ট
শিল্পী মিকেল্যাঞ্জেলো।

সারদা-রামকৃষ্ণ

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

যুগান্তর—সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে।
অষ্টম মুদ্রণ চলিতেছে

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যার অপূর্ব জীবনচরিত
সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।
ষষ্ঠবার মুদ্রিত হইয়াছে—৮৲

দুর্গামা

শ্রীসারদামাতার মানসকন্যার জীবনকথা
শ্রীসরযূবালা দেবী রচিত।
বেতার জগৎ:—অপরূপ তাঁর জীবনাদর্শ অসাধারণ তাঁর তপশ্চর্যা।

সাধনা

বসুমতী:—এমন মনোরম স্তোত্রগীতি-পুস্তক বাঙ্গলায় আর দেখি নাই।।
পরিবর্ধিত ষষ্ঠ মুদ্রণ—৬৲

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম
২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪

বিখ্যাত ডাটা গুঁড়ো মশলার প্রস্তুতকারক কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ এখন আপনাদের দিচ্ছেন একটি নতুন অতি সুদৃশ্য টিনের কৌটায় সবরকম গুঁড়ো মশলার অপূর্ব সংমিশ্রণ

এক কৌটা ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাক কিনলে আর কোনরকম মশলা এমন কি পেঁয়াজ, আদা, রসুন প্রভৃতি আলাদা কার ব্যবস্থা নিতে হয় না। ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাকের মাছ মাংস, ডিম ও সবরকম মুখরোচক তরিতরকারি অল্প সময়ে চটপট রান্না করা যায়। আপনার সবরকম রান্নায় আজই ডাটা (রেডিমিক্সড কারি পাউডার (কিচেন কুইন প্যাক) ব্যবহার করুন।

ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার কিচেন কুইন প্যাক

প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ
২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭, পোষ্ট বক্স নং ৬৭৭৪.
ফোন: ৩৩-১৩৩৭, ৩৪-১৭০৮

PAM—KCD-74

সম্পাদকীয়

মঙ্গলে মঙ্গল হোক

কবি অমিয় চক্রবর্তীর সেই মজার লাইনগুলো মনে আছে কি—'আছি এখন মার্সে। এখানে কই, রেফ্রিজেরাটারের দই?' বেশ মজা লেগেছিল তখন, কবিকল্পনার বিস্ময় সৃষ্টির ক্ষমতা দেখে। অবশ্য তার আগেই শেষের কবিতার অমিট রে মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যের কথা শুনিয়ে কম তাক লাগায় নি।

ভাইকিং-১ থেকে একটি রবোট-ক্যাপসুল মঙ্গলের মাটিতে অবতরণ করানোর পর এখন কিন্তু দুটি ব্যাপারের কোনোটিই আর অসম্ভব কিছু মনে হবে না।

প্রথমত ভাইকিং-১ থেকে যে সব রঙিন ছবি পৃথিবীতে পাঠিয়েছে তাতে জানা গেছে—মঙ্গলগ্রহের মাটি রীতিমত লাল আর আকাশের রঙও গোলাপী। কাজেই—মঙ্গলে অবশ্য গাছপালা নেই, থাকলে তার রঙ লাল হওয়া বিচিত্র ব্যাপার হত না। আর দ্বিতীয়ত, মঙ্গলের আবহাওয়া রীতিমত উল্টোপাল্টা। দুপুরে প্রচণ্ড গরম হলেও রাত্রিতে অসম্ভব ঠাণ্ডা, এবং সকাল বেলাতেও তাপমাত্রা থাকে সেখানে শূন্য ডিগ্রি থেকেও ১২২ ডিগ্রি কম ফারেনহাইট। অতএব, মঙ্গলে ফ্রিজ না থাকলেও ঠাণ্ডা দই পাওয়ার কোনো অসুবিধা ঘটত না।

মঙ্গলগ্রহ রয়েছে পৃথিবী থেকে আশী কোটি কিলোমিটার দূরে। মহাশূন্যে এত দূর পথ পাড়ি দিয়ে ভাইকিং-১ যে মঙ্গলের মাটিতে সফলভাবে তার ক্যাপসুলটিকে অবতরণ করাতে পেরেছে, অমেরিকার এ কৃতিত্ব শুধু একটি দেশ বা জাতির নয়, সমস্ত মানবজাতিরই। তাই গোটা পৃথিবীর কোটি কোটি নরনারীর মতো আমরাও আজ এক নতুন যুগের দ্বারপ্রান্তে এসে আবেগ-উৎফুল্ল।

কোটি কোটি ডলার খরচ করে মঙ্গলে এই অবতরণ অবশ্যই নিছক বাহাদুরী দেখানোর জন্যে করা হয় নি। মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা সেইটাই খুঁজে দেখা হচ্ছে বিশেষভাবে। এখন পর্যন্ত যা খবর পাওয়া গেছে তাতে আশা করার মতো কারণ দেখা যাচ্ছে যথেষ্ট। মঙ্গলে নাইট্রোজেন আছে, আর্গন আছে, এবং জল না থাকলেও বরফ আছে। কাজেই মঙ্গলের ধুলো মাটিতে বা তার নিচে কোনো-না-কোনো ধরনের মাইক্রোব, অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র জীবাণু, বেঁচে থাকার মতো উপাদান রয়েছে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। যদি সে রকম কোনো প্রাণের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, সে হবে এক পরম আশ্চর্য আবিষ্কার—জানা যাবে, মহাবিশ্বে আমরা এই পৃথিবীর প্রাণীরা নিঃসঙ্গ নই।

রুশ মহাকাশযান মঙ্গলগ্রহে অবতরণের চেষ্টা করেছে অনেক আগেই। ১৯৭১ সালেই তারা মার্স-২ এবং মার্স-৩ ছাড়ে মঙ্গলের দিকে। মার্স-২ মঙ্গলের বুকে একটি ক্যাপসুল নামায়, তাতে টি ভি সেট ছিল। প্রায় ২০ সেকেণ্ড কাজ করার পর সেটা অকেজো হয়ে যায়। এক হিসেবে সেইটেই প্রথম মঙ্গলবিজয়। কিন্তু এবারের মার্কিন ক্যাপসুলটি কাজ করে যাচ্ছে দীর্ঘ সময় ধরে। তাছাড়া ওতে এমন একটি উন্নত স্তরের গবেষণাগার আছে যেখানে মঙ্গল থেকে সংগৃহীত মাটিকে ১১ দিন ধরে পরীক্ষা করে তাতে কোনো জীবাণু পাওয়া যায় কিনা তাও জানাবে পৃথিবীতে। সেদিক থেকে এবারের সাফল্য তুলনাহীন।

মঙ্গলগ্রহ ছাড়াও বিজ্ঞানীরা যে সব তথ্য জানিয়েছেন আমাদের তা রীতিমত অবাক করে দেবার মতো। হিসাবে জানা যায়, আমাদের এই ছায়াপথ—সূর্য যেখানে একটি বেশ ছোটখাট নক্ষত্র ছাড়া আর কিছুই নয়, সেখানে অন্য যা নক্ষত্র আছে তার সংখ্যা ১০ লক্ষ কোটি। আর মহাবিশ্বে আমাদের এই ছায়াপথের মতো আরও যা ছায়াপথ আছে তার সংখ্যাও প্রায় ১০ লক্ষ কোটি। কাজেই গোটা মহাব্রহ্মাণ্ডে অযুত-নিযুত কোটি এই সব নক্ষত্র সূর্যের মতো সৌরজগৎ আছে তাতে গ্রহের সংখ্যা কতো হতে পারে, ভাবাই যায় না। যদি এমন হয় যে সেই অনন্ত কোটি গ্রহের মধ্যে মাত্র একটিতেও পৃথিবীর অনুরূপ আবহাওয়া ও ভূতাত্ত্বিক অবস্থা থাকে, তাহলে কত লক্ষ লক্ষ পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা। তারপর যদি ভাবা যায় সেই সব প্রাণীজগতের কোনো কোনোটিতে ক্রমোবিবর্তনের বিকাশ কয়েক হাজার বছর আগেই ঘটে গেছে, তবে এটা আর নেহাৎ অনুমানের স্তরে থাকে না যে, মানুষের চেয়েও উন্নত বুদ্ধির প্রাণী মহাবিশ্বে হাজার হাজার পৃথিবীতেই হয়তো আছে।

যদি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় সে হবে এক আশ্চর্য যুগ। মানুষের এই পৃথিবীতে নিজেদের মধ্যে হানাহানি তখন কতো তুচ্ছ হয়ে যাবে।

মঙ্গল আমাদের মঙ্গল করুক।

একই লেখক

দুই গল্প ঃ দুই সময়

রাজা

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

রেলগাড়ির শব্দ পেলেই বুকটা বড় চনমন করে ওঠে। ছুটি গিয়ে লাইনে কান পাততে ইচ্ছে করে ওর। কেমন যেন গুরগুর করে শব্দ ভেসে এসে বুকের ভেতর জমা হয়। কেমন যেন থিরথির করে রসালো হয়ে যায় দেহটা। সুখে না দুঃখে ঠিক বুঝতে পারে না রাজা, কেমন যেন এক অপার রহস্য। মনে হতে থাকে, একটা আধ-কপালে মানুষ জন্ম নিচ্ছে। সারা গা থেকে তার চর্বি ধুইয়ে দেওয়ারও মানুষ নেই। নীলবর্ণ গর্ভধারিণী মা তার অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে এক পাশে। কয়লার ধোঁয়া আকাশে ছড়িয়ে গিয়ে রাতের মুখ খচিত হচ্ছে। লাইন ধরে একপাল নিশি-জাগা শেয়াল পার হয়ে যাচ্ছিল বোধ হয়, তীক্ষ্ণ স্বরে হুইসল বাজিয়ে জানিয়ে দেয় ইঞ্জিন, সে আসছে গো, সে আসছে।

হ্যাঁ, এই ভাবেই একদিন একটা ইস্টিশনে এসে প্রথমবারের মতো চোখ মেলেছিল রাজা। রেলবাবুরা ওকে নিয়ে জমা দিয়েছিল হাসপাতালে। রেলবাবুদের কৃপা, মাছি পিঁপড়ে ধরবার আগেই ওর গায়ে জল পড়ল, অষুধ পড়ল, তুলতুলে বিছানা পেল ও। বোতলের দুধ চুষে চুষে ও বেঁচে রইল।

সেই রাজা এখন কুড়ি বছরের পুরুষ। কুড়িটা বছর যেন হাওয়াই রাজির মতো পার হয়ে গেল। আই বাপ, ভাবতে গেলে গা ঝলমল করে, কুড়িটা বছর কি চাট্টিখানি কথা। সেই যে মায়ের পেট থেকে গাড়ির কামরায় পড়ে ওর বুকের ধুকধুকি শুরু হল, দিব্যি আজও তা চলেছে। বুকের ওপর হাত বিছিয়ে ও শব্দ পায়, হ্যাঁ চলেছে, ঠিক চলেছে। কানাড়া ইঞ্জিন চলেছে। ও নিজেই যেন রেলগাড়ি হয়ে যায় মাঝে মাঝে। বয়লারে ঠিক মতো যদি কয়লা পড়ে, আর দেখতে হবে না। ঠিক চলে যাবে। বাকিটা জীবন ঠিক কাটিয়ে দেবে ও।

অথচ ওরকম একটা নামের জন্যই মাঝে মাঝে বিপাকে পড়ে যায় ও, রাজ্য নেই পাট নেই, বাপ মায়েরই পাত্তা নেই, রাজা। কে যে ব্যঙ্গ করে ওরকম একটা নাম রেখেছিল ওর কে জানে। বাপ মায়ের দেওয়া নাম হলে কিছু থাকত না কিন্তু এ নামটা ওর কে রেখেছিল; রেলবাবুরা, না হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা, না অর্ফানেজের দিদিভাইরা। যেই রেখে থাক, ব্যঙ্গ করেই রাখুক আর ভালবেসেই রাখুক, ও রাজা। রাজাবাহাদুর।

বাপের জন্য কোনকালেই ওর দুঃখ নেই। না থাকলেও মায়ের একটা আবছা ছবি মাঝে মাঝে ওকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে। ছেঁড়া কানি ফানি পরা একটা মা। টিংটিংয়ে একটা পেত্নী, ধুলোর ধুলোয় ফ্যাকাশে কেমন চোখ মুখ। তা, সেই মানুষটা যদি মরে গিয়েও থাকে, নির্ঘাৎ স্বর্গ থেকে ওর দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে আছে। আর যদি এখনো বেঁচে থাকে ওর মা জননী, নির্ঘাৎ কানি পাগলির মতো গাড়িতে গাড়িতেই ঘোরে। গাড়ির এক কোণে বসে ঘা চুলকোতে চুলকোতে শেয়ালদা যায়, আবার ফিরে আসে। কে জানে ঐ কানি পাগলিই ওর মা কি না। রেলবাবুরা ওকে গাড়ি থেকে খোঁচাতে খোঁচাতে নামিয়ে দেয়, পাগলা কুকুর ওকে তাড়া করে করে গগ্গার ধার অবধি এনে ফেলে। কিন্তু ব্যাপারটা ঐখানেই চুকে যায় না, দেখা যায় কানি পাগলি আবার এক সময় ঠিক উঠে এসেছে গাড়ির কামরায়। কে জানে নিজের ছেলেকেই ও রেলের কামরায় একদিন পেয়ে যাবে আশায় অমন করে বসে থাকে কি না।

অথচ কানি পাগলির জন্য বিন্দুমাত্র ওর ভাবনা নেই। কানি পাগলি ঘোরে বজবজ লাইনে আর ও জন্মেছিল ডানকুনি লোকালে। অর্ফানেজের বড়দির মুখেই শোনা ডানকুনি লোকালের লাস্ট ট্রেনে জন্মেছিল রাজা। ঘটঘুটে রাত, তায় কামরায় কোন আলো ছিল না, জানালা কপাট ভাঙা, হুহু করে কেবল বাইরের বাতাস, বাইরের বাতাস আর পিচকিরি দিয়ে ছিটিয়ে দেওয়া মাঝে মাঝে কিছু আলো। তোর মা তখন মেঝেয় পড়ে ছটফট করছে ব্যথায়। সহায় নেই, সম্বল নেই, তোর মা আর তুই। গার্ড সাহেব ফ্ল্যাগ নাড়ছে, চালাও হে চালাও। লাইন ক্লিয়ার আছে চালিয়ে যাও। ফায়ারম্যান গনগনে আগুনের দরজা খুলে কয়লা ঠুসে দিচ্ছে বেলচা দিয়ে। ড্রাইভার চেন টেনে হুইসল বাজাচ্ছে, ঝাঁ ঝাঁ—ঘুমের বিছানায় নড়েচড়ে ওঠে মানুষ, আশেপাশের গ্রামগুলো কেমন বিরক্ত হয়ে জাগে, আবার ঘুমিয়ে পড়ে। ব্যাস, ঐটুকুই ঘটনা ঘটেছিল তোর জন্মকালে। তুইও শেষ পর্যন্ত ড্যাং ড্যাং করে এই পৃথিবীতে চলে এলি।

—হ্যাঁ বড়দি, আমার মায়ের কি হল তারপর? আমার মা

—মায়ের কথা বুঝি খুব মনে পড়ে তোর? রাজাকে আদর করে কাছে টেনে নিয়েছিল বড়দি। মায়ের যদি বিবেকই থাকবে তাহলে কি তোকে কাছছাড়া করে!

মানে, আমার মা বেঁচে নেই বলছ! ঘন চোখের আবেগ নিয়ে তাকিয়ে থাকে রাজা।

—তাই বা বলি কি করে। আমরা তো আর চোখে দেখি নি। রেলবাবুরাও নাকি

তোর মাকে দেখে নি। নইলে কি আর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে তুই এখানে আসিস।

রাজা আর কথা বলে নি। ডানকুনি লাইনে কানি পাগলির মতো ওর মা এখনো ঘুরে বেড়ায় কি না কে জানে। দেখতে বড় ইচ্ছে হয়।

বছর দশেক বয়েস হলে একদিন ও আশ্রম থেকে বেরিয়ে পড়ে, পালায়। যেন সেদিন থেকেই রাজা ভাগদখলের দায়িত্ব নেয় সারা পৃথিবীর। সে সব অনেক কথা, অনেক ইতিহাস। আজ শুরু হয়েছিল যেখান থেকে সেখানেই আবার ফিরে আসা যাক।

রাজা আ আ আ—

হঠাৎ কেমন ও চমকে ওঠে। বেল লাইনের ধারে সন্ধ্যে থেকেই ঘুর ঘুর করছিল ও। লাইনে কান পেতে মাঝে মাঝে আবোল তাবোল কত কি সব যেন ভাবছিল রাজা। চোখ ধাঁধানো আলোর ফোকাস এসে চোখে লাগল। লাগতেই ও বুঝতে পারল, একশ হাতেরও তফাৎ নয় একটা গাড়ি এসে পড়েছে। আর, কিছুক্ষণ ঐভাবে লাইনের ওপর পড়ে থাকলে গাড়ির চাকা ওকে পিষে ফেলত। কয়েক হাত ছিটকে লাফিয়ে ও সরে এল। তারপর গাড়িটার দিকে রহস্যময় চোখে ও তাকিয়ে থাকল।

—কি রে, কি হল তোর? নিমু এসে ততক্ষণে ওর পাশে দাঁড়িয়েছে।

গাড়িটা সামনে দিয়ে চলে না যাওয়া

পর্যন্ত কথা বলতে পারল না রাজা। অনেকক্ষণ পর বলল, কিছু না। হাসল। আসলে নিমুদা রেলগাড়ি দেখলেই না বুকের ভেতর কেমন যেন একটা ব্যাপার হয়।

—কি হয়?

রাজা আসল কথাটা চেপে গেল। বলল, এই খুব দেশ-বিদেশ ঘুরে দেখতে ইচ্ছে হয়।

—যাহশালা, আমি ভাবলাম, কি না কি বলবি। আমি ভাবলাম গাড়ির চাকা ফাকা খুলে হজম করার কথা বলতে চাইছিস।

রাজা একটু দমে গেল। কদিন ধরেই নিমুদা ওর পেছু লেগেছে। কদিন ধরেই অন্য সব প্রসঙ্গ ওকে ফিসফিস করে বোঝাতে চাইছে। নিমুদারা না পারে হেন কাজ নেই। ইচ্ছে করলে নিমুদারা গোটা রেলগাড়িটাই হজম করে ফেলতে পারে।

নিমু আবার চিবিয়ে চিবিয়ে প্রশ্ন করল, কি রে কথা বলছিস না যে?

রাজা হাসল, কি বলব!

—বটে, তা হলে আমিই তোকে কটা কথা শুধোই, সাফ সাফ জবাব দে দেখি।

বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে রাজার কি কথা কে জানে।

—লাইনের ওপর অমনভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ছিলি কেন? পালাতে চাইছিলি?

—কেন কেন, পালাব কেন!

—তা হলে কি ভেবেছিলি বল।

রাজা বুঝতে পারে না কি বলবে। সত্যি কথা বললে কি নিমুদা বিশ্বাস করবে। নিমুদা তো আর রেলগাড়িতে জন্মায় নি। ওর বাবা আছে, মা আছে। ও বুঝতেই পারবে না রেলগাড়ির শব্দ শুনলে কেন অমনভাবে রাজার বুকের ভেতর গুবগুব করে কেঁপে ওঠে।

—তা হলে দেখ, ঠিকই ধরেছিলাম, তুই পালাতে চেয়েছিলি!

—না নিমুদা। বিশ্বাস করো, এমনি এমনি এদিকে চলে এসেছিলাম।

থাবড়া মেরে নিমু ওর পিঠের ওপর হাত রাখল। পালিয়ে আর কতদূর যাবি রে রাজা, আমরা ঠিক তোকে খুঁজে বার করব।

রাজা কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। আমার নিমুদা ওসব খারাপ কাজ ভাল লাগে না।

—খারাপ কাজ! হা হা করে হেসে উঠল নিমু। বেল্ল গাড়ির মাল হাপিস করাটা বুঝি খারাপ কাজ, কোনটা ভাল কাজ তাহলে?

—আমি গরীব মানুষ। একজনের পেট, কোনক্রমে আমার চলে যাচ্ছে।

—বটে। নিমু একটুক্ষণ দাঁতে দাঁত ঘষল, শুনলাম সাধুর দোকানে আজকাল বিড়ি বাঁধছিস?

রাজা নরম গলায় বলল বাঁধছি।

—কত পাস?

—এখনো কিছু দেয় নি, এই দিন কয় হল কাজে লেগেছি।

শারদীয় অমৃত ১৩৮৩

সম্পাদক : শ্রীভুষারকান্তি ঘোষ

অমৃতের শারদীয় সংখ্যা বেরোবে এবার মহালয়ার অনেক আগে। সংখ্যাটি এমনভাবে তৈরি করা হচ্ছে যাতে সহজেই পাঠকদের খুশি করতে পারে।

উপন্যাস থাকছে পাঁচখানি এবং লেখকরা বেশির ভাগ 'বেস্ট সেলার'। প্রতিভাবান নতুন লেখকদেরও অবশ্য স্থান দেওয়া হয়েছে সেই সঙ্গে। যেমন—গল্পের বেলাতেও ঠিক এইরকমই। প্রবীন লেখকদের সঙ্গে এবার গল্প লিখছেন এমন কজন লেখক, তাঁরা এর মধ্যেই রীতিমত নাম করেছেন—অথচ অমৃতের শারদীয় সংখ্যায় তাঁদের গল্প বেরোচ্ছে এইবারই প্রথম

৫টি উপন্যাস

এবারে লিখছেন
প্রেমেন্দ্র মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়,
নিমাই ভট্টাচার্য, চাণক্য সেন, আনন্দ বাগচী।

২০টি ছোট গল্প

লিখছেন
অন্নদাশঙ্কর রায়, বনফুল, মনোজ বসু,
প্রমথনাথ বিশী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র,
সুমথনাথ ঘোষ, প্রফুল্ল রায়, বুদ্ধদেব গুহ,
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, অদ্রীশ বর্ধন, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়,
শ্রীলেখা বসু, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন রায়,
দেবল দেববর্মা, সুধাংশু ঘোষ এবং
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক রচনা লিখছেন

অমিতাভ চৌধুরী

নির্বাচিত কবিতা ॥ প্রবন্ধ ॥
সুঅলংকৃত ॥ দাম আট টাকা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-তিন

—মাসে কত রোজগার হবে সেটা বুঝিস না!

রাজা মিনমিন করে বলল, যা হবে, তাতে চলে যাবে আমার।

—তুই তোর ভবিষ্যতের কথা ভাবিস না? তুই একদিন বিয়ে করবি, তোর ছেলে মেয়ে হবে। ভাল ভাবে বেঁচে থাকতে হলে কত পয়সা তোর দরকার হবে। এখন থেকে যদি তুই রোজগার না করিস।

—ওভাবে চুরি ডাকাতি আমার পোষাবে না।

নিমু যেন ঠাস করে একটা থাপড় খেল গালে। কিন্তু রাগটা হজম করে বলল, বিড়ি তো বাঁধছিস, পকেটে স্যাম্পল আছে? ছাড় দেখি।

রাজা বলল, বাল তোমাকে সোনামুখি বিড়ি খাওয়াবো নিমুদা, আজ নেই।

—কাল খাওয়াবি। নিমুর চোখ জোড়া সাপের মতো জ্বলছিল। ধর কাল যদি তুই বেঁচে না থাকিস!

রাজার গা শিরশির করে উঠল, মানে!

—মানে, মানুষের মরা বাঁচার কি বিশ্বাস আছে। যে দিনটা যায় সে দিনটাই আমরা বেঁচে থাকি। পরের দিনটা আবার বাঁচব কিনা দিনটা না কাটলে তো আর বলতে পারি না।

—তুমি যেন কি রকম সব কথা বলছ নিমুদা। আমার ভাল লাগছে না।

—কেন খুব সহজ করেই তো বলছি। আচ্ছা ধর, আরো সহজ করে বলছি, তোর তো এতখানি বয়স হল,তুই তো ভালমন্দ সব কিছু এখন বুঝতে শিখেছিস, তাই না।

রাজা ফ্যাকাশে চোখে তাকিয়ে থাকল।

—তুই তো এখন, এটা বুঝেছিস, আমরা বাজে কথা বলি না। তোকে আগেও বলেছি এখনো বলছি, আমাদের হয়ে যদি কাজে হাত না লাগাস তুই, তোর ঐ তরমুজের মতো পেটটা আমরা ফাঁসিয়ে দেব।

—রেল ইয়ার্ড থেকে আমি মাল সরাতে পারব না। আমি বিড়ি বেঁধেই খাবো।

নিমু হাসল, কদিন খাবি? তারপর দাঁত ঘষে ঘষে বলল, ঠিক আছে রেলে যদি কাজ করতে না চাস তুই, অন্য জায়গায় কাজ কর। চারপাশে আমাদের অনেক কাজ।

রাজা চুপ করে থাকল।

—তুই তো আগে কেদারবাবুর বাড়িতে কাজ করতিস?

রাজা অল্প করে মাথা নাড়ল, হ্যাঁ করতাম।. কেদারবাবুর ছেলেকে ইস্কুলে নিয়ে যেতাম, ইস্কুল থেকে নিয়ে আসতাম।

—ঐ বাড়ির নাড়ীনক্ষত্র তোর জানা।

—কিছু কিছু জানি।

—কজন থাকে ও বাড়িতে?

আঙুলের কড় গুনে গুনে রাজা বলল, কেদারবাবু, বৌদি, কেদারবাবুর মা, আর এক ছেলে দুই মেয়ে।

—মালকড়ি ওরা কোথায় রাখে?

রাজা সঙ্গে সঙ্গে ছটফট করে উঠে বলল, আমি ও বাড়িতে অনেকদিন নুন খেয়েছি, নিমকহারামি করতে পারব না।

নিমু রাজার পিঠে আবার একটা থাবা কষাল, ঘরেরও খাবি না, বনেরও খাবি না, তা কখনো হয়! সাফ সাফ বলে যাচ্ছি, যে কোন একটা তোকে করতেই হবে।

রাজা পাথরের স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে থেকে শুনল।

—আর যদি বিট্রে করিস, তা হলে, এই দেখ, দেখেছিস?

কোমরের খাঁজ থেকে ঝকঝকে একটা ছোরা বার করল নিমু।

রাজার তলপেটে শিরশির করে কাঁপতে শুরু করল।

—একদিন মাত্র তোকে সময় দিলাম ভেবে দেখতে। একদিন মানে কতক্ষণ সময় জানিস তো! চব্বিশ ঘণ্টা।

ড্যাগারটা রাজার বুকের কাছে তুলে এনেছিল নিমু। আবার তা গুটিয়ে নিয়ে একঝলক হাসল, তারপর অন্ধকারের মধ্যেই ঝাঁ করে কোথায় মিলিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ কেটে গেল রাজার ঘোরটুকু কাটতে। চারপাশে ঝিঁঝি ডাকছে এতক্ষণ পর যেন বুঝতে পারল ও। রেল লাইনের পাশে অল্পস্বল্প ঝোপ। ঝোপের ভিতর দপদপ করে জোনাকি জ্বলছে। বহুদূরে দেখা যাচ্ছে ডিসট্যান্ট সিগন্যালের লাল টকটকে আলো। স্টেশন এখান থেকে এমন কিছু

আগের গল্প

জুয়া

দূর থেকে শব্দ পেয়ে ওরা বুঝল, লঞ্চ আসছে। লঞ্চ অথবা মোটর বসানো ছোটখাট বোট। যে বোটে জল-পুলিশ অথবা জল-জুয়াচোর অথবা জেলে যে কেউই থাকতে পারে। জুয়াচোর অথবা জেলের জন্য ভাবছে না ওরা, জল-পুলিশের বোট হলেই ঘাটে তরি ডুববে। তাহলেই শেষ আশাটুকু এবার চোখের মণি থেকে টুপ করে খসে পড়বে, ব্যস, সব অন্ধকার।

ওরা বুঝল, সামনে এখন নতুন করে আবার এক রহস্য ঘনাচ্ছে। তাই নতুন করে আবার ওদের বুকের ভিতরে মৃত্যুভয় বড় হয়ে ফেঁপে ফুলে অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি করতে লাগল। এমন অসহ্য চাপ যে, কুয়াশা-শীতল রাত্রির মধ্যেও ওরা দরদর করে ঘামতে লাগল।

এরই মধ্যে কচি শেখ বিজবিজ করে কি যেন বলবার চেষ্টা করছিল তখন থেকে, নবচন্দ্রের কানে এল না। একটানা লঞ্চের শব্দ কানের পর্দায় পুরু করে একটা স্তর জমিয়ে রেখেছে ওর। দৃষ্টিশক্তির উপর আরো বেশি করে ও নির্ভর করতে লাগল। ফলে, তীক্ষ্ণভাবে ও মোটর বোটের হেডলাইট, হেড লাইটের ফোকাস মারার ধরন লক্ষ্য করতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই ও অনুমান করতে পারছিল না, কার বোট, কে হতে পারে? জল-পুলিশ না জেলে? আর যাই হোক, সার্ভিস নয়। সার্ভিস লঞ্চ এ অসময়ে চলবার কথা নয়। কে তবে?

অনবরত ফোকাস ঘুরছে চারপাশে, কুয়াশার মধ্যে, আকাশের গায় আর দুপাশের বনোজঙ্গলে। ফোকাসের আলো শঙ্খ জমান একটা বল্লীকাঠের মত বাঁইবাঁই করে ওদের নৌকার উপর দিয়েও পেরিয়ে গেল। আর একটু হলেই ছুঁয়ে ফেলেছিল আর কি! ওরা দুজনেই হুমড়ি খেয়ে গলুইয়ের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গিয়েছিল তখন। তারপর অনেকক্ষণ আলোর ফলকটা তীরের দিকে ঘুরতে থাকায় বোটটাও অনেকখানি এগিয়ে এল। আরো এগিয়ে আসার পর যখন ওরা বুঝতে পারল ওটা জল-পুলিশের বোট নয়, তখন যেন আবার ওরা ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল।

কচি শেখ বিজবিজ করে বলল, নয় রে নব, পুলিশ নয়। মাছের লঞ্চ।

নবচন্দ্র ক্ষীণ কণ্ঠে সায় দিল, হুঁ ক্যানিং যাচ্ছে।

মাছের লঞ্চ পাশ কাটিয়ে চলে গেলে সামনে আবার অন্ধকার নামল। অন্ধকার আর কুয়াশা। অন্ধকারে তাকিয়ে থেকে লঞ্চের শব্দ আর জলের শব্দ, এ ছাড়া আর কিছুই নেই। খানিকক্ষণ আগে যেমন ছিল লাঠি-সোটা, লণ্ঠন, সোরগোল, চতুর্দিক থেকে গাঁকগাঁক করে ছুটে আসছিল; না, সে-সব এখন কিছু নেই। এখন এক অন্ধকার। অন্ধকার আর কুয়াশা। এমন অন্ধকারই এ যাত্রা ওদের বাচিয়ে দিল। ওদের দুজনকে। কচি শেখ আর নবচন্দ্রকে। কিন্তু হতভাগ্য আর একজন এখন ছইয়ের ভিতর আলো দেখাবার জন্য কাতরাচ্ছে, তার কথা এরা যেন ভুলে গিয়েছিল এতক্ষণ। ব্যাপারটা সেই পুরনো ছড়াটাকে সত্যি বলে প্রমাণ করে দিচ্ছে, চাচা, আপনা প্রাণ বাচা। ছড়াটা কচি শেখের মনে পড়ল।

আমরা তাহলে বেঁচে গেলাম রে নব! দু' পারে এখন সোঁদরবন।

নবচন্দ্রকে এখন একটা চার পা-অলা জীবের মত কিম্ভূত দেখাচ্ছে। কোমরের দিকটা শুশুকের মত ভুসভুস করে ফুলে ফুলে উঠছে। কচি শেখের মনে হল, জল থেকে লাফিয়ে উঠে বড় জাতের একটা কাকড়া যেন গলুইটাকে চেপে ধরে বাঁচবার চেষ্টা করছে। এখন এগিয়ে গিয়ে ওর পাছায় একটা লাথি মারলে ঘাবুৎ করে জলেই ও উলটে পড়বে। পড়লে ব্যাপারটা মন্দ হয় না। সঙ্গে সঙ্গে ও নবচন্দ্রের ফুলে ওঠা পাছার দিকে বৈঠা দিয়ে একটা খোঁচা মারল।

একটা দূরে নয়। স্টেশনের দিকে প্রায়ই ঘুরতে ঘুরতে চলে যায় রাজা।

আজও কি যেন হল ওর. স্টেশনটাই হাতছানি দিয়ে ওকে ডাকল। প্রথমে ধীরে ধীরে, চারপাশে চোখ বুলিয়ে নজর করতে করতে না নিমুদোর আর নাম গন্ধ নেই তারপর বেশ জোরে জোরেই ছুটতে শুরু করল রাজা।

পায়ের নিচে দুটি কঠিন লাইনের ছোঁয়া পাচ্ছে ও। এই লাইনের ওপর দিয়েই গাড়ি চলে। গুব গুব করে শব্দ হয়। কানি পাগলি কি এখনো সারা গায়ে ঘা জড়িয়ে বেঁচে আছে। কে জানে. কে বলে দেবে ঐ কানি পাগলিই সত্যি সত্যি ওর মা কি না।

বেশ জোরে জোরেই ছুটতে শুরু করল রাজা। লাইনের পাশে বড় বড় কয়েকটা গাছ। ঘন জমাট বাঁধা ছায়া তার। ছায়া গুলো এড়িয়ে এড়িয়ে চলল রাজা। আর ততক্ষণে লাল ডগডগে আলো পাল্টে গিয়ে সবুজ হয়ে উঠল। তবে কি আবার গাড়ি আসছে। কোন গাড়ি এটা।

রাজা পাগলের মতো ছুটে চলল স্টেশনের দিকে। কোন গাড়ি. কোথায় যাবে এই গাড়ি। নাহ্, আশেপাশে কেউ নেই, কেউ লক্ষ্য করছে না ওকে।

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছে গেল রাজা। রেলিং ধরে হাঁপাতে শুরু করল ও। হাঁপাতে হাঁপাতে এক সময় আবার সারা শরীরটা ওর জুড়িয়ে এল।

দুজন চারজন লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে দেখতে পেল রাজা। একটু বোধ হয় অন্যমনস্কই হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ আবার চমকে উঠল, কে।

—ও আপনি! দেখুন, বাজে পরেন্টস-ম্যান ওর পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। এক-গাল হাসল রাজা, কি গো পয়েন্টবাবু, ভালো?

—এত রাতে এখানে কি করছিস? প্রশ্ন করল লোকটা।

অপরাধীর মতো চোখ তুলে রাজা একটু হাসল, চলে এলাম বেড়াতে বেড়াতে।

—বেড়াতে বেড়াতে! লোকটা কেমন সন্দেহের চোখে তাকাল, তারপর সাধু সাধু গলা করে বলল, বাড়ি যা রাজা। ধান্দা ভাল না, বাড়ি যা।

বলতে বলতে লোকটা চলে গেল।

আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝমঝম করে চলে এল একটা ট্রেণ। এল যেন বুকের রক্তে এলোমেলো ঢেউ তুলে দিয়ে। বাপস, একটা যেন দৈত্য। একটা যেন ঝড়।

কি যে এখন করা উচিত বুঝতে পার-ছিল না রাজা। গাড়ি থেকে লোক নামছে, মাল নামছে। গাড়ির কামরায় লোক উঠছে দেখতে পেল ও। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল রাজা। ভুলে গেল আজকাল ও বিড়ি খেতে খায়। ভুলে গেল কিছুক্ষণ আগেই নিমুদার খপ্পরে পড়েছিল ও। ভুলে গেল কেদারবাবুর কোন লকারে গয়না থাকে।

গাড়িটার কাছাকাছি এগিয়ে এল রাজা। গাড়ির গায়ে হাত বোলাল. আহ্, এমনি একটা গাড়িতেই জন্ম নিয়েছিল ও। সেটাও ছিল এমনি একটা রাত। সেটাও ছিল এমনি এক ঘন দুর্যোগের দিন।

ও কি চলতে শুরু করল নাকি গাড়িটা। এক মুহূর্তে কেমন যেন পাল্টে গেল রাজা। তড়াক ও লাফিয়ে উঠে একটা কামরায়। ইস কি অন্ধকাররে বাবা। বগির ভেতর কে কে আছে দেখা যাচ্ছে না। জানালা ভাঙ্গা, আলো নেই, কি হাল হয়েছে গাড়িটার।

রাজা মেঝের ওপরই বসে পড়ল। গুব-গুব করে শব্দ। কেমন এক অপার রহস্য যেন জড়িয়ে আছে শব্দটার ভেতর। রসস্থ হয়ে ওঠে ওর রক্ত মাংস মজ্জা। হ্যাঁ রে, এমনি এক চলন্ত গাড়িতেই জন্ম হয়েছিল ওর। আর ওর জন্মের সময় ঠিক এমনি-ভাবেই বুঝি হুইসেল বেজে উঠেছিল গাড়িটার। হুইসেলের শব্দে সারা শরীর কাঁপতে শুরু করে রাজার।

আরো কিছুক্ষণ ও ঘোরের মধ্যে কাটাল। হঠাৎ আবার সেই চিৎকার. রাজা আ আ আ—

অবিকল সেই নিমুদার মতো গলা। নিমুদাই কি! না ভুল। আরো শক্ত হয়ে পা গুটিয়ে বসে পড়ল রাজা। হে ভগবান, নিমুদার সঙ্গে যেন জীবনেও আর দেখা না হয় গো।

সুখে হোক দুঃখে হোক গতির মধ্যেই বসে থাকতে ভাল লাগে ওর।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

নবচন্দ্র ঘুরে তাকাল। পলকেই আবার আতঙ্কে চোখ ফিরিয়ে নিল পিছনে। মনে হল পিছনে এখনো সেই ভোমরার মত লঞ্চের শব্দ গুনগুন করে ছুটে আসছে। লঞ্চের শব্দ, আর জলের শব্দ। কান পেতে তারই মধ্যে কোন মানুষজনার হৈ-হুল্লোড়, লাঠি-সোটার শব্দ কিংবা ঐ ধরনের অন্য কিছু শুনবার চেষ্টা করল ও। সামনের দিকে আকাশ। আকাশ আর নক্ষত্র। ধকধক করে নক্ষত্র জ্বলছে। কুয়াশার মধ্যে ঢাউস হয়ে ফুলে ফুলে অনেক নিচ অবদি নেমে আসছে। যেন লগি দিয়েও নাগাল পাওয়া যায় নক্ষত্রের। সব মিলিয়ে নবচন্দ্র যেন ভৌতিক কোন দৃশ্য দেখছে। ঘোলাটে চোখে কচি শেখের দিকে তাকাল। তারপর আঁকে চেঁচিয়ে উঠল, এই বাস্তোৎ, বুকের কাছে তাকিয়ে দেখ, চকচক করছে।

কচি শেখ বুকের দিকে তাকাল। হাতের চেটো বুলিয়ে বুঝতে পারল, চটচট করছে এক চাপ রক্ত। ভেলি গুড়ের মত আঠা আঠা। লোনের গোডায় শক্ত হয়ে কামড়ে বসেছে। অথচ রক্তের সেই লাল রংটুকু উবে গিয়ে কালো, ভীষণ কালো দেখাচ্ছে জায়গাটা। ওর মনে পড়ল, ভরতকে ডিঙ্গিতে টেনে তুলবার সময় একবার ওকে বুকে চেপে ধরেছিল। তারই চিহ্ন রয়ে গেছে বুকে।

কচি শেখ অর্থহীনভাবে নবচন্দ্রের দিকে তাকাল. তাকিয়ে হাসতে লাগল।

নবচন্দ্র শিউরে উঠল হাসি দেখে। এমন দুঃসময়েও কেউ হাসতে পারে! আশ্চর্য! কচি শেখ কি ভুলে গেল, ওরা জীবন নিয়ে এখন ছিনিমিনি খেলছে। যে কোন মুহূর্তেই এখন যে কোন ঘটনা ঘটতে পারে। তা ছাড়া ভরত ডিঙাল সর্ডকির ঘায়ে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে কাতরাচ্ছে এখনো ছইয়ের ভিতর। সর্ডকির ফলাটা ভরতের বুকে না লেগে কচি শেখের গায়েও তো লাগতে পারত। কপাল ভাল, মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভরত তবু মাছের মত লাফাতে লাফাতে ডিঙিতে এসে উঠতে পেরেছিল। লোকটা যদি বেঁচে যায়. কলজের জোরে বাঁচবে। নবচন্দ্র খানিকটা বিরক্ত হয়ে শুধাল. হাসছিস যে? মুছবি না রক্তটা?

মুছব। স্বাভাবিকভাবেই উত্তর করল কচি শেখ। তুই বেটা এমন ধেবড়ে গিয়েছিস —বলতে বলতে জলের ঝাপটা দিয়ে বুক ভেজাতে লাগল কচি শেখ।

নবচন্দ্র বলল, এবার তাহলে আলো জ্বালি? আর কোথাও রক্ত আছে কিনা দেখে নে এবেলা।

ডিঙিটাকে জলে না চুবলে রক্ত যাবে না রে। ভিতরে যা, গোটাটাই রক্তে ভেসে গেছে, দেখে আয়। বলল কচি শেখ।

নবচন্দ্রের বুকের ভিতর মুচড়ে উঠল। ভরতটা বুঝি এতক্ষণে শেষই হয়ে গেল। সাড়া পাচ্ছিস কিছু?

দুজনে এবার দু' গলুই থেকে ছইয়ের দিকে দৃষ্টি পাতল। ডিঙির দুলুনিতে ছইটাও দুলছে। খুব স্তিমিতভাবে, বুকের স্পন্দনের মত একটু একটু উঠছে আর নেমে আসছে। আর গলুইয়ের সঙ্গে বৈঠার ঘষা খেয়ে অদ্ভুত একটা আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। যেন ভরত ডিঙাল ছইয়ের ভিতর গড়াতে গড়াতে যন্ত্রণা প্রকাশ করছে ও রকম ভাষায়। আজ পাঁচ বছর হল ওরা তিনজন আর এই ডিঙি নৌকো এক হয়ে মিশে আছে। এই পাঁচ বছরে কত কি যে ঘটে গেল! কতবার ওরা বাঁচল। কতবার ওরা মরেও মরল না। অথচ আজ ভরত ডিঙাল, কতক্ষণইবা, আর কতটুকুইবা পরমায়ু ওর! এইবার একজনকে ওরা বিদায় দেবে। ভরত ডিঙাল ওদের স্মৃতি থেকে ধীরে ধীরে মুছে যেতে থাকবে। আরো কতজনাই তো মন থেকে একে একে মুছে গেছে ওদের।

তুই একবার ভিতরে যা নব। কচি শেখ বলল। বাইরে আমি পাহারা দেই, তুই দেখে আয় একবার।

নবচন্দ্র চারপাশে আর একবার তাকাল, কুয়াশা আর অন্ধকার। ডিঙির নিচে

গাঙের জল ঘষঘষ করে গা ঘষছে। দুই তীরের কিছুই ওর চোখে পড়ল না। অন্ধকার ছাড়া কিছুই না। ডিঙিটা বোধহয় মাঝ-গাঙ দিয়ে চলছে এখন। ভরতের নাম ধরে ও ডাকল, ভরত, এই ভরত।

উত্তর এল না। পরস্পর আর একবার ওরা মুখ চাওয়া-চাইরি করে অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ তারপর হামা দিয়ে ছইয়ের ভিতর ঢুকে পড়ল নবচন্দ্র। অন্ধকার আরো জটিল এখানে। জমানো একটা পাথরের মত ভারি মনে হচ্ছে ভিতরটা। এখানেই পড়ে আছে ভরত।

নরম গলায় আবার ডাকল নবচন্দ্র, ভরত রে, এই ভরত!

এবারও কোন সাড়া পেল না ও। তা হলে কি শেষ হয়ে গেছে ভরত! আতঙ্কে ছইয়ের গায়ে লণ্ঠনটাকে খুঁজবার চেষ্টা করল। কিন্তু নড়তে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ভরতেরই গায়ে। গা, না পা এটা? লোমশ, গুলি-পাকানো মাংস পেশি শীতল মনে হল ওর! পায়ের নখ কি ধারাল, বাপ্‌স! হাঁটুতে ওর পায়ের নখ আঁচড় কাটছিল। হাঁটু সরিয়ে খানিকটা ঝুঁকে এল নবচন্দ্র। ভরত শ্বাস টানছে কিনা বুঝবার জন্য খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল।

কি রে নব, বলে কি ভরত? ছইয়ের বাইরে থেকে কচি শেখ নবচন্দ্রকে শুধোল।

নবচন্দ্র উত্তর করল না।

ভরতের হাঁটুর কাছটায় চটচট করছে। এ্যাঁ, এতদূর অবদি রক্ত গড়িয়েছে তাহলে। ঝনাৎ করে আর এক পলকের জন্য সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলীতে ঝাঁকানি খেল নবচন্দ্র। নিজেকে সামলাবার জন্য কাপড়ের খুঁটে দ্রুত হাত ঢুকিয়ে দেশলাই বার করবার চেষ্টা করল। ধুততোর দেশলাইটা গেল কোথায়? এই কচি, ম্যাচিস আছে? অন্ধকারে ছাই কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

রোশ, নিয়ে আসছি। ডিঙিটা একটু দুলে উঠল। নবচন্দ্র বুঝল, কচি শেখ ছইয়ের দিকে এগিয়ে আসছে। স্থির হয়ে রইল ও।

তুই বেটা ভয়েই মরে গেলি! এত যদি ভয় তবে এ লাইনে কেন বাবা! বলতে বলতে কচি শেখ উটের মত ছইয়ের ভিতর গলা ঢুকিয়ে দেশলাই জ্বালল।

এক চিলতে আলোয় চলকে উঠে নবচন্দ্র দেখল, ভরত কুৎসিত একটা ভঙ্গি করে বেকায়দা ভাবে পড়ে আছে। এক হাঁটু ভাঁজ করা, দোমড়ান। আর এক পা ছড়িয়ে টান টান হয়ে আছে, কালির ফটোর দিকে। বুকের উপর রক্তের ভুজভুজি; ভেলি গুড়ের মত রক্ত ছড়ান পাটাতনে।

কি রে, কি হল? কাঠিটা নিভে যাচ্ছে দেখে খিঁচিয়ে উঠল কচি শেখ। হাঁ করে বসে থাকবি নাকি বেকুফ?

নবচন্দ্রের নড়তে কেমন ভয় করছিল তখন। জখমটা বড় মারাত্মক। বাঁচবে তো ও। নাকি এই শেষ।

কচি শেখ আবার কাঠি জ্বালল। দেখল, এক হাতে রক্ত খামচে পড়ে আছে ভরত। আর এক হাত শিয়রের দিকে, গহনার বাকসটার দিকে টেনে রেখেছে। বাকসটার জ্যাবড়াভাবে কয়েক গুচ্ছ গোলাপ আঁকা, গোলাপগুলি যেন ধরতে চাইছে ভরত।

এই! কচি শেখ শুধোল, চোখ দুটো দেখেছিস?

নবচন্দ্র দেখল, ভরতের চোখ দুটো খোসা-ছাড়ান লিচুর মত সজল, ফ্যাকাশে। কাঁদছে নাকি ও!

এই প্রথম ওর চোখে জল দেখলাম। বলল কচি শেখ।

আমিও। বলল নবচন্দ্র। আমিও কোনদিন ওর চোখে জল দেখব ভাবিনি!

আর একটা জ্বলন্ত কাঠি নিঃশেষ হওয়ার পর কচি শেখ আবার একটা কাঠি জ্বালল। আঙুলের ডগায় ছেঁকা খেয়ে ও এবার চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, উহ্‌ আঙুল পুড়িয়ে দিল আমার! এবার তুই লণ্ঠনটা জেবলে নে নবচন্দ্র।

নবচন্দ্র খানিকটা সম্বিৎ ফিরে দেখল, ভরতের বাঁ পাশে বেড়ার গায় লণ্ঠনটা ঝুলছে। হামা দিয়ে ও ভরতকে ডিঙোল, তারপর অস্পৃশ্য জিনিসের মত দু আঙুলে আলতোভাবে লণ্ঠনটাকে তুলে নিল।

কাঠি নিভে যেতে আবার অন্ধকার। কচি শেখ বলল, বাইরে আয় জেবলে নিয়ে যা।

বাইরে এল ওরা। চিমনি কল খুলতে খুলতে নবচন্দ্র বলল, ভরতের গাটা কেমন শীতল মনে হল রে কচি। বোধ হয়—

কচি শেখ খুব জোরে শ্বাস টানতে টানতে বলল, শালার এই লাইনটাই বড় খচরা। এবচে যদি পুলিশে ধরত অনেক ভাল হত। ছোটখাট কিছু ঘাঁতানি খেয়ে হাজতে ঢুকে থাকাও অনেক ভাল। জানে তো আর খতম হত না কেউ। সবই ওর কপাল।

নবচন্দ্র দেশলাই জেবলে লণ্ঠনের পলতেয় আগুন ছোঁয়াল। তারপর চিমনিটাকে উপুড় করে বসিয়ে কচি শেখের দিকে চোখ ফেরাল। ওর চোখ দুটো গুলিখোরের মত লাল টকটক করছে। কপালের নিচে চুল গড়াচ্ছে, থুতনির কাছে খোঁচা খোঁচা দাড়ি জমে আছে, অনেকদিন কামায়নি ও। যেন অনেকদিন ধরে একটানা নেশা করেছে ও। নবচন্দ্রের কেমন ঘেন্না হচ্ছিল ওর দিকে তাকাতে।

সামান্য একটু নেশা ওরা তিনজনেই করেছিল। নেশা না করলে এসব কাজে হাত বসে না। নেশা না করলে এমনভাবে হাজারটা লোকের মাঝখান থেকে পালিয়েও আসা সহজ হয় না। কিন্তু একটি লোকও, বটুখালির বাজারে ওদের দুজনকে দেখে বুঝতে পারে নি, কি ওদের অভিসন্ধি, কি অঘটন আজ রাতে ওরা ঘটাতে চলেছে।

সমস্ত ঘটনাকে আশ্চর্য রকম নাটকীয় বলে মনে হতে লাগল নবচন্দ্রের। নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যের মতই উত্থান-পতনময় ঘটনা গুলো সারাক্ষণ ঘটে গেছে।

সন্ধ্যায় বটুখালির ঘাটে নৌকো বেঁধে, বাজারে। বাজার থেকে সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ির বাইরের বারান্দায় রাত্রিবাসের জন্য আশ্রয় গ্রহণ, তারপর গভীর রাতে ঘরে ঢুকল দুজনে, ভরত আর কচি। দরজায় নবচন্দ্র শক্তিশালী আলোয় টর্চ ঘুরাল এপাশে ওপাশে। সিন্দুকের পাওয়া গেল। সিন্দুক খোলা অবধি কাকপক্ষীও টের পেল না। বাড়ির কর্তা মশারী কাঁপিয়ে একবার কেশে উঠলেন। বুঝতে পারল না ওরা লোকটা ঘুমের চোখেই কাশল কিনা! তিনজনেই ছায়ামূর্তির মত খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। নিশ্বাসের শব্দও চেপে রইল।

নাহ্‌, ঘুমিয়েই আছে লোকটা। সিন্দুক থেকে গয়নার বাকসটা টেনে বার করল ভরত। ভারি মনে হচ্ছে কি! বাকসটা বুকে চেপে নাচতে ইচ্ছে হল ওর।

আর ঠিক এই সময়ই অতর্কিতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। মশারীর ভিতরে সেই লোকটা পুরোপুরি জেগে উঠেছে। একলাফে লোকটার বুকের উপর চড়ে বসে ড্যাগার তুলে ধরল কচি শেখ। তারপর, তড়িতেই আবার তিনজনে লাফিয়ে ঘরের বাইরে এসে ছুটতে শুরু করল।

ঘাটের কাছাকাছি এসে বহুমের খোঁচায় চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ল ভরত। বুক থেকে তবু ও বাকসটাকে আলাদা করল না। মাছের মত লাফাতে লাফাতে নৌকোয় এসে আছড়ে পড়ল।

তারপর—

হ্যাঁ তারপর এক দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেছে। ভাবতে ভাবতে নবচন্দ্র কচি শেখের দিকে তাকাল। লণ্ঠনের আলোয় কুয়াশাকে স্পষ্ট এখন ধরা যাচ্ছে। জেঁপেশ করে চেপে বসেছে কুয়াশা। পাটাতনের উপর টুপ টুপ করে জল গড়াচ্ছে। নদীতে জলের টান এখন ভাটার দিকে। ফলে তেমন কোন ঢেউ নেই আজ। ঢেউ থাকলে আরো বিপাকে পড়ত ওরা।

কি রে, কি দেখছিস? চোখ নাচিয়ে প্রশ্ন করল কচি শেখ।

তোকেই দেখছি। নবচন্দ্র ম্লান চোখে তাকাল।

আমাকে? হুঃ, তুই এমন ভয় পেয়েছিস নব। তোদের মত লোক নিয়ে বড় কাজে হাত দেওয়া ঠিক নয়।

ভ্রূ কুচকে তাকাল নবচন্দ্র। বলল, ভরতটার জন্য বড্ড খারাপ লাগছে, নইলে আর কি। বাকসটাও তো পাওয়া গেছে! বাকসটার কথা এই প্রথমবার উচ্চারণ করল নবচন্দ্র।

বেশ মালদার বাকস কিন্তু! কচি শেখের লোভার্ত চোখ চকচক করে উঠল। কয়েক মাস পায়ের উপর পা তুলে জিরিয়ে নেওয়া যাবে, কি বলিস?

হুঁ। ছোট্ট করে উত্তর করল নবচন্দ্র। হ্যারিকেনে শিস উঠতে পেরাল হওয়ায় পলতে-কমটাকে খানিক ঘুরিয়ে শিখাটাকে খাটো করে নিল ও।

তাছাড়া একটা কথা বলব? কচি শেখ নবচন্দ্রের দিকে তাকাল।

কি কথা?

হয়তো শুনতে তোর খুব খারাপ লাগবে, তবু সত্যি বলেই বলতে পারি।

কি কথা? বল্‌ না।

ধর, ভরত আর বাঁচল না। কচি শেখ গলা নিচু করে বলবার চেষ্টা করল।

এতবড় জখমের পর কেউ বড় একটা বাঁচে না। কিন্তু কি বলতে চায় ও। নবচন্দ্র বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

যদি শেষ পর্যন্ত না-ই বাঁচে ও তাহলে এবার গয়নার বাক্সটা ভেঙেচুরে আমরা দুজনেই ভাগ করে নেব। ব্যাপারটা কিন্তু কম নয়রে নব। বরাবর তো আমরা তিনজনে পেতাম, এবার নেব দুজনে।

আর যদি ও বেঁচে ওঠে?

সে তা হলে অন্য কথা। অবশ্য ও না মরলেই ভাল; আমাদের তিনজনের কেউই যেন না মরে...শুকনো ঠোঁটে খুব শীতল-ভাবে হাসল কচি শেখ। তারপর একটু সজাগ হয়ে বসে গলা তুলে বলল, বাহু ওস্তাদ, লণ্ঠন জেবলে বসে বাইরেই থাকবি নাকি। ভিতরে যা; কিছু করা যায় কিনা দেখে আয়।

যেন এইমাত্র আবার দায়িত্বজ্ঞান ফিরে পেল নবচন্দ্র। হন্তদন্ত হয়ে লণ্ঠন নিয়ে ছইয়ের ভিতর ঢুকে পড়ল।

ডিঙিখানা নিতান্তই ছোট বলে ছইয়ের ভিতর পরিসরটা নেহাতই কম। তারই গায় একপাশে সিঁদুরমাখা মা-কালীর একটা ফটো ঝুলছে। আর ওপাশে একখানা ক্যানেস্তারা টিনের বাক্স। তার গায় গুটি কয়েক মেয়ের ছবি আঠা দিয়ে সাঁটান। ছবিগুলোর গায়ে আঙ্গুল-ঘষা বিশ্রী সব দাগ পড়েছে। একটু তফাতেই একটা মাছ ধরা জাল, মাছ কোপাবার কাঁটা। প্রয়োজন হলে ঐ কাঁটাতেই মানুষ কোপানো যায়। একবার তাক করে ছুঁড়ে মারলে সড়সড় করে ঢুকে যাবে, বের করার টান পড়লে নাড়িভুঁড়িতে উল্টো কাঁটায় জড়িয়ে থাকবে।

লণ্ঠনটাকে কাঁটার গায় ঝুলিয়ে দিল নবচন্দ্র। হেই ভরত, ভরত রে—ভরতের হাঁটুতে একটু ধাক্কা দিল ও।

সাড়া শব্দ পাচ্ছে না দেখে বুকের দিকে ঝুঁকে পড়ল। ইস, কি রক্ত রে বাবা! পায়ের নিচে চিটাচট করছে। ভরতের এলানো হাতটাকে একটুখানি তুলে ধরল ও। আরে শ্বাস, এখনো বন্ধ বেরুচ্ছে যে কচি। প্রায় চেঁচিয়েই উঠেছিল নবচন্দ্র।

হাতটাকে ও তুলে রাখল। ক্ষত জায়গাটায় এক তাল মাংসপিণ্ড জবার পাঁপড়ির মত বেরিয়ে এসেছে। বল্লমটা বড় বেরাড়া জায়গায় ঢুকে গেছে ওর। আর একটু নিচে লাগলে ফুসফুসটা বেঁচে যেত। হয়ত বা বাঁচতেও পারত ভরত। বেচারা। সবই কপালের লেখা।

হাতটাকে নামিয়ে কাটা জায়গাটায় একটুখানি চাপ দিয়ে রক্ত বন্ধ করবার চেষ্টা করল নবচন্দ্র। ভরতের মাথার দিক খানিকটা বাঁকাভাবে ঘুরে গয়নার বাক্সের দিকে এলিয়ে পড়ে আছে। কপালের পাশে কাটা দাগটা চিকচিক করছে আর একটা ঘায়ের মত। এই দাগটা কবে হয়েছিল নবচন্দ্র মনে করতে পারল। আজ যদি ভরত বেঁচে ওঠে ওর এই পেটের কাছের দাগটাও চিরকাল চিহ্ন হয়ে থাকবে।

রক্তের ফেনায় হাতের মুঠো ভরে উঠল দেখে নবচন্দ্র ক্ষত জায়গা থেকে হাত সরাল। অসহায়ভাবে ও দেখল, মাঝে মাঝে মুখ খুলে বড় বড় শ্বাস টানছে ভরত। একটু জল দেব মুখে! ভাবতে ভাবতে আবার ও কচি শেখকে ডাকল, এই কচি ভিতরে আয়। ব্যাপারটা কিন্তু ভাল নয় এখন।

কচি শেখ বলল, বাইরে একজনের থাকা দরকার। তুই আয়, আমি যাচ্ছি।

প্রস্তাবটা খারাপ নয়। এইভাবে ভরতের কাছে বসে বসে মৃত্যু দেখার চেয়ে বাইরে গিয়ে কুয়াশার নিচে বসা ভাল। সঙ্গে সঙ্গে ও উঠে পড়ল। বাইরে এল। আহ্, বেশ ঠান্ডা এখানে। বাইরে বসে দম ভরে শ্বাস টানা যাবে কিছুক্ষণ।

এই নে। বৈঠাটা নবচন্দ্রের হাতে দিয়ে কচি শেখ উবু হয়ে ছইয়ে ঢুকল। ঢুকে এক নিঃশ্বাসে ও ভরতের আপাদমস্তক একবার দেখে নিল। তারপর আর্তভাবে চেঁচিয়ে উঠল, এ যে হয়ে এসেছে রে নব?

নবচন্দ্র উত্তর করল, হুঁ। ভোর অবধিও টিকবে না আর। পারলে একটু জল খাওয়া কচি। এ সময় নাকি খুব তেষ্টা পায়।

কচি শেখ উত্তর করল, দাঁড়া খাওয়াচ্ছি।

যেন এইখানেই সব কথা ফুরিয়ে গেল ওদের। কচি শেখ এবার ভরতের গলায় জল ঢেলে দেবে ফোঁটা ফোঁটা করে। মৃত্যু-কালে জল দিলে পুণ্য হয়। এক অর্থে কচি শেখ পুণ্য করবে এবার। কবুকে নবচন্দ্র বাতাসের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বাতাসের ঝাপটায় শীতল হবার জন্য স্থির হয়ে বসে রইল।

তারপর অনেকক্ষণ পর হঠাৎ লক্ষ্য করল ডিঙিখানা খানিক বেচালভাবে দুলছে। বুঝতে পারল, কচি শেখ এপাশ ওপাশ দুলতে শুরু করেছে ছইয়ের ভিতর। আরো কিছুক্ষণ পর ও বাক্স ঘষার শব্দ পেল। পাটাতনে ঝাপট মারার শব্দ, কান সজাগ রেখেই নদীর কুয়াশার দিকে তাকিয়ে রইল নবচন্দ্র।

আরো খানিকক্ষণ শুনোতার মধ্যে কেটে যাওয়ার পর ও বুঝতে পারল, কচি শেখ ছইয়ের ভিতর থেকে বাইরে আসছে। এক হাতে গড়ে বগড়ে একটা টিনের পাত্র নিয়ে আসছে। পাত্রটি দেখেই ও চিনতে পারল। আবার এখন মদ খাবি কচি?

আলবাত খাব। না খেলে আমরা তিনজনেই মরে যাব।

অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইল নবচন্দ্র। মদ খেলে একদিক থেকে সত্যি সত্যি বাঁচা যায় বলে মনে হল ওর। খেয়েই ডুবে থাকা যাক। কপালে যা আছে ঘটবেই।

কচি শেখ ঝাঁকি দিয়ে টিনটাকে মুখের কাছে ধরল। বুঝলি নব, রাতটা হয়ত কোনরকমে টিকে যাবে ভরত, কিন্তু তার বেশি নয়। বলতে বলতে ওর গলা কেঁপে এল। শত হলেও মরা বাঁচা হাতে নিয়েই তো এতকাল ঘুরছে ওরা। আজ স্রেফ এতটুকু ভুলের জন্য।

ডিঙির নিচ থেকে জলের শব্দ গলে গলে কানে আসছে। বাতাসে কুয়াশার গন্ধ। বালির মত গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে কুয়াশা ঘুরছে। ছইয়ের ভিতর থেকে কয়েক টুকরো আলো নদীর উপর ফোঁটা পরিয়ে রেখেছিল। ফোঁটাগুলি জলের ঢেউয়ে একটু একটু করে কাঁপছে, ভেঙে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। আবার গুঁড়ো-

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

কিরীটী অমনিবাস

অষ্টম খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। দাম ২০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বাজীকর ১৬, অশনি সংকেত ১০,

সাঁঝের মল্লিকা ৫, হীরামানিক জ্বলে ৫,

সুমথনাথ ঘোষের

ওখানে পদ্মা এখানে গঙ্গা ৫,

বিমল মিত্রের গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

বিষয় বিষ নয় ৭, পাও নাই পরিচয় ৫,

তিন ছয় নয় ৮, তিনে একে চার ২০,

আশাপূর্ণা দেবীর

কখনো দিন কখনো রাত ৩০,

ভৃগুজাতক-এর

হাত দেখতে শিখুন ৭, ভাগ্যলিপি ৯,

অমর সাহিত্য প্রকাশন, ৭ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

গুলো একসঙ্গে মিশে গোলাকার ফোঁটা হয়ে উঠছে।

ফোঁটাগুলির দিকে তাকিয়ে রইল নবচন্দ্র। অনেক কথাই ওর মনে পড়ছিল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা হারিয়ে যাওয়া, বহু পুরনো স্মৃতিরা গুঁড়ো সারা মন ভরিয়ে দিচ্ছিল ওর।

টিনের গায়ে শব্দ করে চেতনা ফেরাল কচি শেখ। কাছে ডাকল, আয়, গলা ভিজিয়ে নে।

নবচন্দ্র এগিয়ে এল। মিষ্টি মোলাম গন্ধটা ওর নাকে লাগল।

যাই বলিস মালটা কিন্তু খারাপ দেয়নি ওরা।

মগ থেকে খানিকটা গিলে নিয়ে ম্লান একটু হাসল নবচন্দ্র।

খানিকটা চাট পেলে ভাল হত। ভীষণ খিদে পেয়েছে, না রে?

নবচন্দ্র বলল, হুঁ। বলে মগটা আবার ও কচি শেখের দিকে ফিরিয়ে দিল।

একটাই মগ। ফলে দুজনে একই মগে সইয়ে সইয়ে গিলতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর কচি শেখ বলল, তুই কি ভাবছিস আমি বলব?

কি ভাবছি? পাল্টা প্রশ্ন করে কৌতুকে তাকাল নবচন্দ্র।

তুই ভাবছিস ভোর অবধিও টিকবে না ভরত। আমার কিন্তু মনে হয়, অত তাড়াতাড়ি ও মরবে না।

কুয়াশার জন্য ভোর হতে কত বাকি ধরা যাচ্ছিল না, তবু যতই সময় থাক ভরত আর কয়েক পলক মাত্র বেঁচে আছে। অসম্ভব, তার বেশি আয়ু নেই ওর। কাটা জায়গাটা তুই ভাল করে দেখেছিস কচি? দলাদলেক মাংস ঝুলে আছে। তাছাড়া যা রক্ত।

রক্ত তো বেরুবেই। স্বাভাবিক গলায় বলল কচি শেখ। জখমটা তো আর কম নয়। তা হলেও বলছি সূর্য ওঠার আগে মরছে না ও। ততক্ষণে আমরা জঙ্গলের ধারে পৌঁছে যাব।

যখনই মরুক, ওকে কিন্তু কবর দেব আমরা। কবরের উপর ছোট ছোট ফুলগাছ পুঁতে দেব। আবার যদি সময় পাই, বেঁচে থাকি গাছগুলো এসে দেখে যাব।

তোর বকটা বড় নরম রে নব। অদ্ভুতভাবে হাসল কচি শেখ। এসব লাইনে না এসে উচিত ছিল তোর মায়ের দুধ খাওয়া।

খানিকটা অস্বস্তি বোধ করল নবচন্দ্র। তা হলে বলছিস মরে গেলে ওকে ভাসিয়ে দিবি?

তা দেব কেন? কবরই দেব। ব্যস সব তখন ফুরিয়ে যাবে।

আবার মগ ভর্তি করা। টিনটা প্রায় খালি হয়ে এসেছিল।

ভর্তি মগ থেকে চোঁ চোঁ করে খানিকটা খেয়ে চোখ দুটোকে কুচকে ছোট করে, আবার ও খুলে ধরল।

তা যাই বলিস না কেন, এক ব্যাপারে কিন্তু ভালই হয়েছে আমাদের। ভরতটা [illegible] গণনায় তো ভাগ বসাতে পারবে না। এবার আমরা পুরো গণনাই দুভাগ করে নিতে পারব।

নবচন্দ্রের মনে হল ও যেন সত্যি সত্যি বাকসে থেকে আধাআধি বখরায় গণনা তুলে নিচ্ছে। যতই নিষ্ঠুর হোক ব্যাপারটা, ওরা কিন্তু লাভবানই হচ্ছে শেষ পর্যন্ত।

কি রে নবচন্দ্র, তুই কিছু বলছিস না?

কি আর বলব। নবচন্দ্র মগটাকে কচি শেখের দিকে এগিয়ে ধরল। থরথর করে হাত কাঁপছিল ওর।

আচ্ছা ধর, যদি আমরা আর একটা ব্যাপার করি। তাকাল কচি শেখ।

চোখের সামনে কুয়াশায় গুঁড়োগুলো আলোর ফুলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে নবচন্দ্রের। আকাশের তারাগুলোই নেমে এল কী? বুঝতে পারছিল না ও।

ধর, আজকে আমরা গণনাগুলো দুভাগ করে না দিয়ে যদি একভাগ করে নেই।

মানে?

মানে আর কি? মানে খুব সহজ। ধর, তুই তো বলছিস ভোর হওয়া অবধি টিকে থাকবে না ভরত। তাই যদি সত্যি হয় আমি তোকে পুরো বাকসটাই দিয়ে দেব। আর না হলে আমিই নেব গণনাগুলো।

ভরতকে নিয়ে জুয়া খেলবি। আর্তভাবে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল নবচন্দ্র।

কেন দোষ কি তাতে। ওর যদি বেঁচে ওঠার আশা থাকত তা হলে না হয়—

নবচন্দ্র অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইল। বাজি ধরা উচিত কি অনুচিত কিছুই ও বুঝতে পারছিল না।

মরে যাওয়ার পর তাদের পাপ আর ভরত তফাৎ থাকে কিছু? কচি শেখ এগিয়ে এসে নবচন্দ্রের হাত ধরে ঝাঁকি দিল। নে নে, কপাল ঠুকে এবার লেগে পড়। সূর্য ওঠার আগে মরলে তুই পাবি সব গণনা, পরে মরলে আমি পাব।

নতুন করে সূর্যের মুখ আর দেখবে না ভরত নবচন্দ্র স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছিল। তবু তবু ওর এ ধরণের বাজি ধরতে বুক কাঁপছিল। আবার বলল, শেষ পর্যন্ত ভরতকে নিয়ে বাজি ধরব।

যাহ্ শালা তোর আবার সব কিছুতেই ঝুকপুক করা। ওরে কি আর বাঁচাতে পারবি, তা হলে না হয়—

আবার শূন্য চোখে তাকাল নবচন্দ্র।

তা যখন পারবি না তাহলে যা বলছি তাই কর। কপালে থাকলে লেগে যাবে তোর।

নবচন্দ্র বলল, বেশ ডুবেছি যখন সব দিক দিয়েই ডুবব। বাজি।

ভিজিও নিচে জলের শব্দ। জলের উপর আলোর ফোটাগুলি কাঁপছে। সামনে অন্ধকার পেছনেও অন্ধকার। অন্ধকার আর কুয়াশা। নবচন্দ্র উঠে গিয়ে জানা গলাইয়ে বসল। হাতে বৈঠা তুলে নিল। কচি শেখ খালি টিনটাকে লাথি কষিয়ে জলে ফেলে দিল। মগটা কেবল গড়াতে লাগল পাটাতনের উপর।

ছইয়ের ভিতর ভরত। ক্ষত জায়গায় জল ফোলার মত রক্ত মাংস দলা পাকিয়ে [illegible] রক্ত গড়াচ্ছে। মনুষ্য মরে যাওয়ার পরও কি রক্ত গড়ায়। ভেতরের রক্তটা কি জমে যায় না কখনো।

নবচন্দ্র মাথাটাকে ঝাঁকিয়ে সাফ করার চেষ্টা করল। ভীষণ ধোঁয়াটে লাগছে এখন। হে মা কালী! রাতটা যেন রবারের মত লম্বা, অনেকখানি লম্বা হয়ে যায়! ভরত বেঁচে না যায় অন্তত রাতটা যেন না ফুরায়।

গুম হয়ে ছইয়ের ওপাশের গলুইয়ে ও কচি শেখকে দেখতে থাকে।

কচি শেখ দুলতে দুলতে বৈঠা চালাচ্ছে জলে। হঠাৎ ওর মনে হল, কি প্রয়োজন ছিল এই বাজি ধরার! ডরপুক নবটাকে একটা ফোঁৎকা মেরে জলে ফেলে দিলেই তো চুকে যেত সব।

কি রে নবচন্দ্র, কি ভাবছিস?

কিছু না।

কিছু না কি রে? বাকসটা না জানি তোর কপালেই রয়ে গেছে! কুৎসিতভাবে হেসে ওঠে কচি শেখ।

অমনভাবে হাসল কেন ও! সন্দেহ হল নবচন্দ্রের। তবে কি ওর অন্য মতলব মাথায় এসেছে। চোখটা কেমন ধকধক করে জ্বলছে ওর। তবে কি শালা বাকসটাকে গায়ের করে কলা দেখাতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে ওর চাবিটার কথা মনে পড়ল। চাবিটা কোথায়? কচি শেখ কি সরিয়ে রাখল। তাই বা সম্ভব কি করে? বাকসটা তো কেউ আমরা খুলে দেখিনি এখনো। ছুঁয়েও দেখিনি। থাকলে তো চাবিটা ভরতের কাছেই থাকা উচিত।

ফলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় শুধাল, চাবিটা কোথায়? এই কচি, চাবিটা পেয়েছিস?

বাকসটা যখন হাতের কাছে চাবি না হলেও চলবে আমাদের। উত্তর করল কচি শেখ।

না তবু বলছি চাবিটার কি হল? দেখেছিস?

কি আবার হবে। ভরত হয়ত গিলে রেখেছে।

অসম্ভব নয়, অনেক সময়ই এসব জিনিস গিলে ফেলতে হয়। তবু নাবালকের মত নবচন্দ্র শুধাল, তা হলে ওটা পাবি কি করে?

কি করে আবার, পেট চিরে বার করে নেব।

নিবি! বিস্ময়ে প্রশ্ন করল নবচন্দ্র, পারবি তো?

কেন পারব না। মরা মানুষের পেট চিরতেও ভয় নাকি! নে নে, বাই মার বাই মার, এখনো রাত ভোর হতে বহুত সময়।

ভয়ে ভয়ে বৈঠাটাকে জলে নামাল নবচন্দ্র। জলের শব্দ ছাড়া আর কিছুই ওর কানে আসছে না এখন। আলোর ফুল ছাড়া কিছুই ও দেখছে না আর।

কিন্তু হঠাৎই ওর মনে হল ভরতটাও কি বাজি ধরেছে ওদের সঙ্গে, ওর পাওনাটা ও আগেভাগেই কি বসিয়ে রাখার জন্য চাবিটাকে পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে রেখেছে। যেন বলতে চাইছে ভরত, পাওনা গণ্ডা এক কানাকড়িও ছাড়ব না আমি। আমার বখরাটা মিটিয়ে দিয়ে তবে নিষ্কৃতি দিস।

নবচন্দ্র দেখল, ওর হাত পা আবার অবশ হয়ে আসছে।

কথায় কথায়

পোষা কুকুর ...

একটা কুকুর আজ কিছুদিন হলো আমাকে পুষছে।

এই পংক্তিটি পড়ে নিশ্চয়ই কেউ কেউ অবাক হচ্ছেন কেউ কেউ ভাবছেন, 'মুদ্রণ-প্রমাদ কিংবা লেখার ভুল। কিংবা লেখকেরই হয়তো বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, তাই এই রকম উল্টোপাল্টা লেখা হচ্ছে, সামনের সংখ্যা থেকে এই পৃষ্ঠাটা আর পড়বো না।'

কিন্তু এরকম ভাবার কোনো মানে হয় না। এই ফাঁকিবাজ লেখক তার সামান্য জীবনে হাজার হাজার শব্দ না ভেবে চিন্তে, পরিনাম চিন্তা না করে উল্টোপাল্টা লিখেছে, কিন্তু উপরের ঐ প্রথম পংক্তির সাতটি শব্দ সে সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে বিনা প্ররোচনায় সম্পূর্ণ বুঝেসুঝে লিখেছে, লিখেছে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা থেকে।

একটা কুকুর আজ কিছুদিন হলো আমাকে পুষছে। কিছুদিন মানে আজ বিশে জুলাই তারিখ, আজকে পাঁচ মাস পাঁচদিন হলো, পনেরই ফেব্রুয়ারি থেকে আমার এই অধঃপতির আরম্ভ। তারিখটা ভুল হওয়ার উপায় নেই ক্যালেন্ডারে আমার ছেলে লিখে রেখেছে ঐ তারিখের পাশে 'আজ কুকুর ছানা এলো।' এই রকম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্ভব বাংলায় ভালো বোঝানো যায় না লেখা উচিত ছিলো।

'অদ্য সারমেয় শাবকের আগমন।'

আমার এই পোষমানার কাহিনী এক শীতের সকালে শুরু। অবশ্য তার আগে একটু ব্যাপার আছে। আমাদের পাড়ায় আশেপাশে খুব চুরি হচ্ছিলো। 'কথায় কথায়' যারা নিয়মিত পাঠ করেন (আছেন কি ভূসংসারে তেমন কেউ সুবোধক?) তারা জানেন আমাদের বাড়িতেও দু-একটা ছোট চুরি হয়ে যায়। অনেকেই পরামর্শ দিলেন 'বাড়িতে একটা কুকুর পোষো।' আমার বাড়ির বাইরের দরজায় সর্বদাই চার-পাঁচটি কুকুর শুয়ে থাকে, এক সঙ্গে তিন ধাপ সিঁড়িতে পাঁচজনের বেশি জায়গা হয় না বাকি সাত-আটজন দুঃখিত মুখে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায় অথবা কাছেই ফুটপাথে কোথাও চোখ বুজে পড়ে থাকে। এরা ঠিক আমার পোষা কুকুর নয় এদের আমি কখিং কখনো ভাত-ডাল বা বাসি রুটি ছুঁড়ে দিই। সুযোগ এরা এদিক-ওদিক থেকে দৌড়োদৌড়ি করে খাবার জোগাড় করে আমার সিঁড়িতে শুধু বিশ্রাম নেয় ও ঘুমায়। কিন্তু এই সামান্য ব্যবস্থার জন্যেই তাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। আমি যখন বিকেলে বাড়ি ফিরি এরা দূর থেকে দেখে মোড়ে ছুটে যায়, তারপর আট-দশজনে মিলে আমাকে গার্ড অফ অনার দিতে দিতে বাড়িতে নিয়ে আসে।

কিন্তু এরা তো বাড়ির বাইরের দিকে থাকে। বাড়ির ভিতরে এদের প্রবেশ নিষেধ, এরা রাস্তার নোংরা কুকুর। আর চোর আসে বাড়ির ভিতরে, পিছনের দেয়াল টপকে। সুতরাং অন্দর-মহলের জন্য একটি স্বতন্ত্র কুকুর চাই আর সেটা রাস্তার নেড়ি কুকুর হলে চলবে না।

ফলে এক শীতের সকালে হাতী-বাগানের কুকুরের বাজার, নিউমার্কেটের কুকুরের বাজার সব জায়গা ঘুরে ফিরে অবশেষে ময়দানে কেল্লার দরজায় সামনের মাঠে এক সন্দেহজনক চেহারার লোকের কাছ থেকে একটি কুকুর ছানা কিনলাম। কুকুরছানাটির চেহারা কিন্তু সন্দেহজনক নয়, সে তার ভাইবোন, বাবা-মা সকলের সঙ্গে গলায় দড়ি দিয়ে ছাগলের মত খুঁটির সঙ্গে বাঁধা ছিলো। চমৎকার লোমে ঢাকা কুকুরছানা, ঝোলা কান, চোখ দুটো নীলচে, বিক্রেতা অভয় দিলো, 'নিয়ে যান বাবু, খাঁটি শিকারি কুকুর।' কেমন সংশয় ছিলো এমন তুলতুলে চেহারা কি করে শিকারি কুকুর হবে, কিন্তু ততক্ষণে বাচ্চাটা আমার কোলে উঠে বসেছে এবং আমার মায়া হলো। সেই মায়াই আমার কাল হয়েছে এবং আমার সংশয়ও এখন কেটে গিয়েছে।

পাঁচ মাসের মধ্যে সেই কুকুরছানার সমস্ত লোম ঝরে গেলো, চোখের নীলচে ভাব কেটে গেছে। এখন একটা দশাসই চেহারার কুকুর আমাদের তিন ঘরের ছোট বাড়ি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আলনা থেকে কাপড় নামিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলছে। জুতো-চটি বলতে কিছু নেই, শুধু আমাদেরই নয় বহিরাগতদের, অতিথিদের জিনিসপত্রও নিরাপদ নয়, ইতিমধ্যে একজন অসতর্ক কবির একটি পোর্টফোলিও ব্যাগের এক-তৃতীয়াংশ সঙ্গে তিরিশ চল্লিশটা কবিতা, এক দূরসম্পর্কের পিসেমশায়ের চশমার খাপ এবং প্রাণের বন্ধুর সদ্য কেনা নতুন চটির বাঁ পাটির অগ্রভাগ এই কুকুরটি (যার নাম দিয়েছি আমরা ইংরেজিতে চিলি বাংলায় লঙ্কা) গলাধঃকরণ করেছে। সকলের চোখের সামনে, পাশে বসে সে এই কাজগুলি নিঃশব্দে করেছে, যখন চোখে পড়েছে তখন আর্তনাদ করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। আজ কয়েকদিন হলো তার খেলার প্রধান উপকরণ হয়েছে আমার অতি প্রয়োজনীয় একটি ইংরেজি এবং একটি বাংলা অভিধান।

বাধ্য হয়ে কর্পোরেশন থেকে পুরনো মালের নিলামের সময় একটা মই কিনে এনেছি, অফিসে যাওয়ার জুতোজোড়া বিকেলে বাড়ি ফিরে মই বেয়ে উঠে ভেন্টি-লেটরের মধ্যে রেখে দিই, না হলে পরদিন খালি পায়ে অফিস যেতে হবে। জামাকাপড় সব আলমারিতে তালা দিয়ে রাখি, শুধু টেলিফোনটা আলমারিতে রাখা সম্ভব নয়, গতকাল বিকেলে একবার অনেকদিন পরে যন্ত্রটা ক্রিং ক্রিং করে উঠেছিলো আমরা ছুটে এসে ধরবার আগেই টেলিফোনের এই অস্বাভাবিক আচরণ এক থাবার আঘাতে চিলি ক্ষান্ত করে দিলো। যাক বাঁচা গেলো, আমরা সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

কিন্তু স্বস্তি কোথায় পাই। একদা, মানে মাত্র পাঁচ মাস আগে, সকাল সাড়ে-সাতটা, আটটা পর্যন্ত ঘুমোতাম। এখন সকাল চারটের মধ্যে চিলি তোষক ধরে হিঁচড়ে নামিয়ে আনে তারপর শুরু হয় বাঁচার লড়াই। দরজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে অর্থাৎ এবার দরজা খুলে বাইরে নিয়ে চলো। বড় বাইরে না ছোট বাইরে কে জানে, তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিই এবং সঙ্গে সঙ্গে দে ছুট। চিলি ছুটে দেয় তার পিছনে আমি ছুটি। আমার সেই স্ফীত মধ্যদেশ, নয়নমনোহর স্বাস্থ্যশ্রী আর নেই, ছুটে ছুটে হাড্ডিগিলে পাখির পালনের মত চেহারা হয়েছে। লেক, সাদার্ন এভিনিউ কোনো কোনো দিন এমনকি চাকুরিয়া, যাদবপুর হয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরি। ফিরে এসে আটটার সময় দুধের সঙ্গে একটা ঘুমের বড়ি খাইয়ে দিই চিলিকে। এই সুযোগে স্নান খাওয়া করে অফিস চলে যাই। স্ত্রী-পুত্র-ভ্রাতা দেওতলার মেজ্জানিনে আশ্রয় নিয়েছে, যথাসম্ভব সেখানেই থাকে। বাকি নিচের দুটো ঘরে আলনা উলটিয়ে, চেয়ার ছিঁড়ে ঘুম ভাঙার পর থেকে চিলি তাণ্ডব করে বেড়ায়। আমি ফিরে আসা মাত্র আমাকে ধাক্কা দিয়ে মেজেতে ফেলে দিয়ে আমার বুকের উপর উঠে বসে ঘাড়টা কামড়িয়ে ধরে।

যারা দেখেন, সবাই বলেন, 'এ রকম সাংঘাতিক কুকুর পোষেন কেন?' আমি বলি, 'সর্বনাশ! কি বলছেন, আমি ওকে পুষিনি, ও আমাকে পুষছে।'

তারাপদ রায়

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

বিয়ের উপলক্ষে এক পার্টি। সেই পার্টিতে উপস্থিত অতিথি অভ্যাগতের সংখ্যাও অনেক। বর কনে তো আছেই। গান-বাজনার সঙ্গে আনন্দ সহকারে খাওয়া-দাওয়া চলছে। কিন্তু হঠাৎ একি বিপত্তি। এরকম এক আনন্দানুষ্ঠানে বর নাকি মাছ খাবেন না! কেন? বর নাকি মাছ খেতে ভালবাসেন না। কেন বাসেন না? নিশ্চয়ই সেরকম ভালো-ভাবে রান্না হয় না। সেই অনুষ্ঠানেই ভালো দক্ষ হাতে রান্না করে এক সুগৃহিনী বরকে পরিবেশন করলেন মাছ। উপস্থিত অতিথি অভ্যাগতদের সামনে 'বর' নামক যে পুরুষটি মাছ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, পরে দেখা গেল, তিনিই পাঁচ টুকরো মাছ খেয়ে ফেললেন। বরের এই রুচি পরিবর্তনে উপস্থিত সকলেই আনন্দিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু আসল রহস্যটা কোথায়? অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে সুগৃহিণী এবং রাঁধুনি সেই মহিলা জানালেন—'বরের এই রুচি পরিবর্তনের জন্য যে কৃতিত্ব আমার প্রাপ্য, তার চেয়েও বেশী প্রাপ্য সেই ভালো মশলাটির, অর্থাৎ 'কুকুমী'ই এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে।'

সিনেমা হলের পর্দায় প্রায় চার মিনিট দৈর্ঘ্যের এই 'ছবি' দেখে দর্শকরা অর্থাৎ বাইরের জীবনের ক্রেতারা হাসিতে আনন্দে কেউ বা বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন সেই শেষ মুহূর্তে দেখানো মশলাটি নামের দিকে, নির্মাতার দিকে। এ জিনিস তাঁদের মনে গেঁথে গেল, যাকে বলে—'পিন পয়েন্ট ডিসক্লোস।' বাস্তব জীবনের ঘটনা তুলে ধরে তার মধ্য দিয়ে গল্পচ্ছলে খুব সূক্ষ্মভাবে নিজেদের বিজ্ঞাপন করে গেলেন কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাইভেট লিমিটেড। শেষ মুহূর্তের আগে পর্যন্ত ছবির কাহিনীতে বুঁদ হয়ে থাকেন দর্শক, বুঝতেও পারেন না যে একটা বিজ্ঞাপন অর্থাৎ সেই সূক্ষ্ম পরিবেশন।

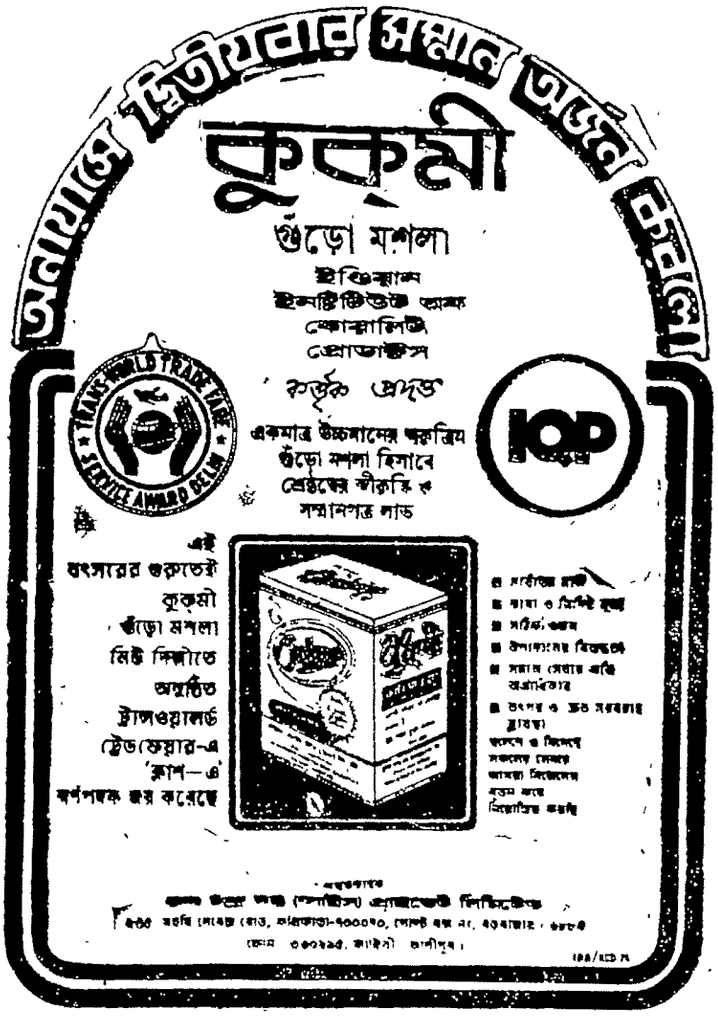

যুধিষ্ঠির দত্ত

বিজ্ঞাপন ও বিচিত্রা

প্রচার ধারার মধ্যে যতগুলো মিডিয়াম আছে, তার মধ্যে চলচ্চিত্র এবং যাত্রা (বিশেষত আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে) যে সবচেয়ে প্রভাবশালী মাধ্যম, সে কথা আমি আগেও লিখেছি। রেডিও অবশ্যই আছে। এবং চলচ্চিত্র মাধ্যমটাকে ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন-টাকে যদি বিষয়গত ও আঙ্গিকগত দিক থেকে খুব সুনিপুণভাবে পরিবেশন করা যায় তবে তা আরো ফলপ্রসূ হয়। প্রচারের অন্যান্য পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে ইদানীং চলচ্চিত্র মাধ্যমটির উপরেও খুব বেশী জোর দিচ্ছেন কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাইভেট লিমিটেড।

প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্ণধার শ্রীঅতনু দত্ত বললেন—এই ধরনের বিজ্ঞাপন আমাদের পক্ষে খুবই কার্যকরী। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে এই প্রচার আমাদের ব্যাপকভাবে করার ইচ্ছে আছে। এখন আসামের অধিকাংশ হলে দেখানো হচ্ছে। এর সঙ্গে প্রচারের অন্যান্য শাখা তো আছেই।

—তা হঠাৎ আসামকে দিয়েই এই ধরনের প্রচার ধারার সূত্রপাত হলো কেন?

সুদর্শন স্মার্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তরুণ কর্ণধার বললেন—পশ্চিমবঙ্গ, বিহারে প্রায় প্রতিটি গৃহেই আমাদের প্রতিষ্ঠানের মশলা অর্থাৎ কুকুমী বিশেষভাবে পরিচিত। ইদানীং আমরা আসাম এবং উড়িষ্যাতে বিশেষ করে আমাদের দ্রব্যের 'সেলস প্রোমোশন'-এর ব্যাপারে একটা 'একসটেনসিভ ড্রাইভ' নিয়েছি। সেইজন্যেই আসামকে দিয়ে সূত্র-পাত।

—ফলাফল কিছু জানতে পেরেছেন?

—নিশ্চয়ই। ঐসব অঞ্চলে আমাদের বিক্রিও অনেক বেড়েছে। আপনাকে পরিসংখ্যান দিলেই বুঝতে পারবেন। বাংলা বছর হিসাবে ১৩৮২ সালে আসামে যখন ২ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা আমাদের বিক্রি হয়েছিল, তখন ১৩৮৩ সালে এই ক মাসেই আমাদের বিক্রি হয়েছে ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। বছর শেষ হতে এখনও তো অনেক দেরী।

—আপনি কি মনে করেন যে বিক্রির এই উন্নতির সবটাই আপনার বিজ্ঞাপন কার্যের জন্য? নাকি সাংগঠনিক অন্যান্য দক্ষতাও এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে?

—মূলতঃ বিজ্ঞাপনের জন্যই আমার বিক্রির এত উন্নতি ঘটেছে বলে আমি মনে করি।

অহেতুক ভনিতা, প্রতিষ্ঠানের ইমেজ বা 'গুড-উইল' বৃদ্ধির জন্য মিথ্যা ভাষণ বা আচরণ হাম-বড়া জাহিরের অন্যায়কর ছলচাতুরি আজ ব্যবসা এবং প্রচার জগতেও ঢুকেছে। তার থেকে নিজেকে দূরে রেখে সসম্মানে বাঁচিয়ে রেখেছেন শ্রীঅতনু দত্ত। যথার্থ সৎ ব্যবসায়ীর ধর্মানুসারেই তিনি সোজাসুজি সত্যি কথা কবুল করতেও পেছপা নন। বললেন—১৩৫৩ সালে আমার বাবা অর্থাৎ শ্রীযুধিষ্ঠির দত্ত আট-হাতা খাটো কাপড় পরে একক চেষ্টায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই সংস্থা। দুটো যাঁতা কল দিয়ে নিজের হাতে মশলা গুঁড়ো করে সূচনা করেছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের। আজ সংঘের শুভেচ্ছায় বিস্তৃতি লাভ করেছে এই কোম্পানী। তবুও সব জায়গায় যেতে পারিনি আমরা। এটা আমাদের ব্যর্থতা। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি সকলের কাছে পৌঁছবার। উড়িষ্যার কথাই ধরুন না! ১৯৭১—৭২ সাল পর্যন্তও উড়িষ্যাতে প্রায় কোনো লোকই আমাদের কোম্পানীর নাম জানতো না। ১৯৭৩ সালে আমি নিজে গেলাম। শহর এবং গ্রামগুলোতে ঘুরে ঘুরে দেখলাম, জানলাম। উড়িয়া ভাষায় মুখে বলার ভঙ্গিতে ব্যাপক বিজ্ঞাপন দিলাম স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় বড় বড় পত্রিকায়, সঙ্গে সঙ্গে হোর্ডিং। ফল কি পেলাম জানেন? এখন প্রতি সপ্তাহে উড়িষ্যা থেকে ব্যবসায়ীরা নিজেরা এসে আমাদের এখান থেকে মাল নিয়ে যায়। শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনের জন্যই এটা সম্ভবপর হয়েছে।

শ্রীযুধিষ্ঠির দত্ত এখনও এই প্রতিষ্ঠানের মূল কর্ণধার। যথেষ্ট বয়স হ'লেও এখনও দেখাশুনা করেন ব্যবসার। অতনুবাবুর বাছে বাবার বিজ্ঞাপনের উপযোগিতা সম্পর্কে মতামতটা জানতে চাইলাম। প্রসঙ্গত বলে রাখি আমার এই প্রশ্নের কারণ ছিল যুধিষ্ঠিরবাবু যখন ব্যবসার সূত্রপাত করেন তখন সমগ্র ভারতবর্ষেই বিজ্ঞাপন নামক বস্তুটির অগ্রগতি ও কার্যকারিতার কথা প্রায় অনালোচিতই ছিল। তাছাড়া তখন এত প্রতিযোগিতাও ছিল না। অথচ এখন কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাইভেট লিমিটেড প্রতি বছরে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করেন বিজ্ঞাপন খাতে।

আমার প্রশ্নের উত্তরে অতনু দত্ত বললেন—বাবাই তো সব করেছেন এই প্রতিষ্ঠানের। বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা বাবা যদি উপলব্ধি না করতেন তবে আমাকে বিজ্ঞাপনে এতগুলো টাকা খরচ করার অনুমতি দিতেন কি?

—গ্রামাঞ্চলে আপনার বিজ্ঞাপনের প্রচার পদ্ধতি এবং ফলাফল সম্বন্ধে কিছু বলুন।

—গ্রামের স্থানীয় পত্র-পত্রিকাগুলোতে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি। এক-একটা জেলার উল্লেখযোগ্য মেলা বা অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের স্টল খুলি। এসবের মাধ্যমে ফলাফলও ভালোই পেয়েছি। গ্রামের মানুষ আমার 'কুকমী' নামের সঙ্গে খুব ভালোভাবেই পরিচিত। তাঁরা এতই পরিচিত আপনি শুনলে অবাক হবেন গ্রামের মুদি দোকানে এসে তাঁরা যখন বলে—৫০ গ্রাম কুকমী দেখি দোকানী সেই পরিমান হলুদ তাঁদের হাতে তুলে দিতে ভোলে না। কুকমী মানেই তাঁরা বুঝে নেন—গুঁড়ো হলুদ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ভারতবর্ষের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানই একমাত্র প্রতিষ্ঠান—যারা গুঁড়ো মশলার সর্বোৎকৃষ্টতার জন্যে এই প্রথম ১৯৭৫—৭৬ সালে 'ট্রান্স-ওয়ার্ল্ড ট্রেড—ফেয়ার' পুরস্কারে স্বর্ণপদক দ্বারা সম্মানিত হন। এছাড়াও ১৯৭৬ সালে এল ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কোয়ালিটি প্রোডাক্ট-এর সার্টিফিকেট অফ মেরিট দ্বারা পুরস্কৃত হন। একটা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সর্বভারতীয় এই সম্মান সত্যিই কৃতিত্বের।

একটা বাঙ্গালী ব্যবসা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হোক সুনাম অর্জন করুক, এটাই আমার কাম্য।

আনন্দ রায়

১৯৭৫-৭৬ সালের ট্রান্স ও ওয়ার্ল্ড ট্রেড ফেয়ার অ্যাওয়ার্ড হিসাবে বোম্বের মেয়র শ্রীনন্দলাল মেহতার কাছ থেকে স্বর্ণপদক গ্রহণ করছেন শ্রীঅতনু দত্ত।

গোষ্পদে বিম্বিত যথা ॥

রমেশ্বর হাজরা

বিশাল ঘড়ির দিকে চলে যায় আমাদের কণ্ঠস্বরগুলো
আমরা দোলক ধরে নাড়া দিই হঠাৎ হঠাৎ
আমাদের ঘরে থাক সন্তান এবং দুধ ভাত
আমরা চেয়েছি বেশি এর চেয়ে কবে।
যাইনি কখনো খুব রক্তাক্ত আহবে।

বিশাল ঘড়ির দিকে চলে যায় আমাদের কণ্ঠস্বরগুলো
আমরা দোলকে দিই নাড়া—
আমাদের প্রতীক্ষা পাহারা,
পায়রা উড়িয়ে দিই রোজ
শান্তির পতাকা উড়ে যায়
অল্পেই সন্ধান চাই তার
যে গেছে ভূমায়।

বেহুলার শব ॥

সুকমল নাথ

ছোট্ট সেই ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম
একরাশি মাছির ভ্যানভ্যানানী কুলি-কামিনের
গুঞ্জন...মিলে মিশে একাকার—
মাল গুদামের চালার নীচে বেওয়ারিশ
বেহুলার শব ঘিরে সুগোত্রীয় মেয়েলি
সুরের কান্না..মুহূর্তে যাত্রীর স্তব্ধতা।
সমবেদনার্তব্যা দয়াশীলতার সুযোগ হারালো না
সিকি-আধুলি পাঁচ-দু' পয়সা
বেহুলার শীর্ণ বুকে আছড়ে পড়লো
একটা নুলো ভিখেরীর লোলুপ দৃষ্টি
কতদূরে পৌঁছলো কেউ দেখে নি—
কিন্তু বেহুলা কি সত্যিই মৃত?
মরার ভান করেনিতো?

প্রাকৃত ॥

সুশীলকুমার গুপ্ত

সত্যিই উন্মাদ, তা না হ'লে
মাটিতে কি কেউ
ফোটাবেই সূর্য ব'লে নেয় এক ধনুর্ভঙ্গ পণ;
ঘাসের গভীরে
সমুদ্রের সাড়া খোঁজে, গোলাপের টবে
গোধূলির বিহ্বল আকাশ;
কান পেতে শুনে নিতে চায়
মানুষের হৃৎপিণ্ডে কবুণার শুভশঙ্খধ্বনি;
আগুনের শিখা বুনে বুনে
দগ্ধ হাতে সৃষ্টি করে নিদারুণ সভ্যতার শীতে
হৃদয়ের উষ্ণবস্ত্র;
যুগের পাথর ভেঙে আনে
সবুজ সুষমা,
ছায়া চিরে চিরে দেখে কোথায় গোপন
আলোর বিশুদ্ধ অর্থ;
একটি নক্ষত্র দিয়ে ঘটায় রাত্রির
অতর্কিত বিস্ফোরণ।

সত্যিই উন্মাদ, তবু দেখি
যখন সমস্ত পথ-ঘর-বাড়ি-মানুষ-বাহন
অন্ধকারে কবলিত নিরর্থক, বিষণ্ণ, বাতিল;
সে নিজস্ব জ্যোৎস্নায় জেগে থাকে, লেখে
যে কাব্য তাই তো শেষে হয়
জীবনের ছাড়পত্র—যাতে যাওয়া যায়
অন্য এক ভোরের স্বদেশে।

গোধূলিয়া

উপন্যাস নিমাই ভট্টাচার্য

।। ছাব্বিশ ।।

কিছুক্ষণ পিসী কথা বলতে পারলেন না। তারপর আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, কাঁদিস না বাবা, কাঁদিস না। সারা জীবনই ত কেঁদেছিস; এখন আর কাঁদিস না।

একটু পরে আমার কান্না থামল। আমার হুঁস ফিরে এলো। লজ্জায়, দ্বিধায় সঙ্কোচে আমি একটা শব্দ উচ্চারণ করতে পারলাম না। পিসীকে ঐভাবে জড়িয়েই বসে রইলাম।

তুই দেবীকে বিয়ে করতে চাস?

জানি না।

দেবী বিয়ে করতে রাজী আছে?

জিজ্ঞাসা করি নি।

পিসী ডাকলেলেন, দেবী শুনে যা।

দেবী এলো না, কোন জবাবও দিল না।

পিসী আবার একটু জোরে ডাকলেন, দেবী শুনে যা মা।

তবু দেবী এলো না।

আমি বুঝলাম, দেবী আসতে পারছে না। অথবা আশেপাশে নেই।

দু'পাঁচ মিনিট পরে পিসী আমাকে বললেন, তুই একটু শুয়ে থাক। আমি আসছি।

আমি নিঃশব্দে ওপাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম।

আমি শুয়ে শুয়েই শুনলাম, পিসী ডাকছেন, দেবী দরজা খোল। ....লক্ষ্মীটি দরজা খোল। আমার কাছে লজ্জা কি? শোন, কথা আছে।

কিছুক্ষণ পরে দরজা খোলার আওয়াজ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে পিসী বললেন, আমি কি তোর দুঃখ বুঝি না রে আমার কাছে এত লজ্জা পাচ্ছিস। চল, ও ঘরে যাই।

ও ঘরে গিয়ে কি হবে?

ও ঘরে ছেলেটা একলা একলা রয়েছে, চল ও ঘরে গিয়ই কথা বলি।

পিসী ওকে হাত ধরে আমার ঘরে এনে বসালেন। ওর মাথায় মুখে হাত দিয়ে আদর করে বললেন, আমি তোর আপন পিসী না ব'লে কি আমি তোকে ভালবাসি না? যেমন প্রদীপকে ভালবাসি, তেমন তোকেও ভালবাসি।

দেবী মুখ নীচু করে বসে রইল। কোন কথা বললো না।

এবার পিসী ওকে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোরা বিয়ে করবি?

দেবী শুধু বললো, না।

কেন, তুই প্রদীপকে ভালবাসিস না?

না।

পিসী হেসে বললেন, ভাল না বাসলে এই এতদিন ধরে পাগলের মত দিনরাত্তির ওর সেবা করলি কেন?

অসুস্থ হয়ে এলো কেন?

পিসী আবার হেসে বললেন, অসুস্থ হবে এলো বলেই তুই অমন করে সেবা করবি? হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলি না কেন?

দেবী কোন কথা বলে না।

এবার পিসী ওকে আদর করতে করতে বললেন, আমি তোর সেবা-যত্ন দেখেই বুঝেছিলাম, তুই প্রদীপকে কত গভীরভাবে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসিস। কিন্তু হতভাগী, তুই আমাকে আগে বলিস নি কেন? আমি তাহলে আলপনার মাকে কথা দিতাম না।

দেবী কাঁদতে কাঁদতে বললো, না না পিসী আমি কাউকে ভালবাসি না, ভালবাসতে পারি না। আমি বিধবা।

আমি পাশ ফিরে শুয়ে থাকলেও আমার দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল।

পিসী একটু গলা চড়িয়েই বললেন একদিনের জন্যও কি স্বামীর ঘর করেছিস যে নিজেকে বিধবা বলছিস? তুই শাঁখা-সিঁদুর পরিস না বলে কি তোর সব সাধ-আহ্লাদ মরে গেছে? আমি তোদের বিয়ে দেব।

মিনিট খানেক পরে দেবী আমাকে ডাকল, ওঠ ওষুধ খাও।

বললাম, রেখে দাও পরে খাব।

চারটেয় খাবার কথা; সওয়া চারটে বেজে গেছে। নাও ওঠো নাও।

বলছি ত পরে খাব।

পিসী বললেন, প্রদীপ ওষুধ খেয়ে নে বাবা। শেষে আবার জ্বর-টর হ'লে...

ভয় নেই; আমার আর কিছু হবে না।

দেবী আবার বললো, নাও ওষুধটা খেয়ে শোও।

রেখে দাও। আমি নিজেই পরে খেয়ে নেব।

বেশী দেরী করো না। ছ'টার সময় আবার তোমা ওষুধ খেতে হবে।

পিসী বললেন, কেন রাগ করছিস বাবা?

বললাম, কার উপর রাগ করব?

এই ত দেবীর উপর রাগ করে ওষুধ খাচ্ছিস না।

ও যতটুকু দয়া দেখিয়েছে, আমি তাতেই কৃতজ্ঞ। রাগ করব কোন অধিকারে?

দেবী একটু হেঁসে জিজ্ঞাসা করল, আজ রাত্রেই কলকাতা ফিরে যাবে না?

আজ রাত্রে যাব না ঠিকই, তবে বোধহয় কালই পাটনা চলে যাব।

পিসী একটু রেগেই বললেন, তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? তুই এই শরীর নিয়ে কোথায় যাবি?

আমি বললাম, পিসী, বিনা অধিকারে অনেক কৃপা উপভোগ করেছি। আর না, তোমাদের কাশী থেকে আমার ছুটি নেবার সময় এসে গেছে।

পিসী তাড়াতাড়ি আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন, তুই এই শরীর নিয়ে চলে গেলে আমরা কি দুঃখ পাব, তা ভেবে দেখেছিস? না না বাপু, তুই কোথাও যেতে পাবি না।

আমি একটু ম্লান হাসি হেসে বললাম, তোমাদের দু'জনের মত আমিও এই পৃথিবীতে শুধু দুঃখ পেতেই জন্মেছি। বোঝার উপর শাকের আঁটির মত আমার চলে যাবার দুঃখ আমরা তিনজনে বেশ ভাগ করে নিতে পারব।

দেবী পিসীকে বললো পিসী, তুমি রাণু মাসীর বাড়ী যাবে না?

পিসী বললেন, হ্যাঁ এবার যাব। সুষমা এসেছে?

দেবী বললো, না, বামুনদিদি আসেন নি। বোধহয় ওর জ্বর বেড়েছে।

পিসী বললেন, তাই হবে। তা না হলে এতক্ষণে এসে যেতো। তাহলে তুই বরং একটু চায়ের জল স্টোভ বসিয়ে দে।

দেবী বললো, ওষুধটা খেয়ে নিলেই চায়ের জল চাপাব।

আমি কোন কথা না বলে বিছানা থেকে নেমে ওষুধ খেয়ে নিলাম। বুঝলাম, দেবী আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল কিন্তু আমি কিছু বললাম না।

দেবী চা করতে গেলে পিসী আমাকে বললেন, লক্ষ্মীটি বাবা আমার, তুই দেবীর উপর রাগ করে চলে যাস না ও সে আঘাত সহ্য করতে পারবে না।

আমি চুপ করে থাকি। কোন কথা বলি না।

পিসী চুপ করে থাকেন না। বলেন, ও যে তোর কি সেবা করেছে, তা আমি বলে বোঝাতে পারব না। এক নাগাড়ে মেয়েটা পনের দিন ঘুমোয় নি। সত্যি কথা বলতে কি, দেবী না থাকলে আমি তোকে বাঁচাতে পারতাম না।

শুনে আমার দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লেও মুখে কিছু বললাম না।

পিসী আমার চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন, মেয়েটা ক'দিন আগেই এত বড় একটা শোক পেল। তারপর যদি তুই রাগ করে চলে যাস, তাহলে ও যে কি করবে, কিছুই বলা যায় না।

দেবী আমাদের চা নিয়ে এলো। চা খেতে খেতে পিসী ওকে বললেন, আজ ত আমার বাড়ীর সবাই বাণুর বাড়ী যাবে। তুই সাবধানে থাকিস।

দেবী একটু হেসে বলল, কত কাল আর তোমরা আমাকে পাহারা দেবে? এবার আমাকে একলা একলা সবকিছু সামলাতে দাও।

ওসব কথা রাখ ত। আর শোন, আমার আসতে দেরী হলে তোরা খেয়ে নিস।

ভয় নেই, উপবাস করব না।

পিসী যাবার সময় বার বার করে আমাকে বলে গেলেন, ঠিক মত ওষুধপত্র—খাওয়া দাওয়া করিস।

। করব।

আর এসে যদি দেখি কান্নাকাটি হচ্ছে, তাহলে কিন্তু আমি দুজনকে ধরেই মার লাগাব।

আমি হাসি।

দেবী বললো, আমি নিশ্চয়ই বেশী করে খায় খাব।

কেন?

আমি কি জানি না, তুমি আমার চাইতে ওকে অনেক বেশী ভালবাস।

তোকে আমি একটুও ভালবাসি না।

দেবী পিসীকে জড়িয়ে ধরে বললো, না, না, তুমি আমাকে খুব ভালবাস।

আচ্ছা ছাড। আমি যাই।

পিসী সহস্র কোটি দেবতার নাম স্মরণ করতে করতে চলে গেলেন।

পিসী বোধ হয় তখনও সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামেন নি। দেবী হঠাৎ আমার দুটো পা জড়িয়ে ধরে বললো, সোনা, তুমি আমার উপর রাগ করে চলে যাবে না।

আমি ওর হাত দুটো ধরে টানতে টানতে বললাম, একি করছ? পা ধরো না।

আগে বল তুমি যাবে না।

কাল-পরশু না গেলেও আমাকে ত যেতেই হবে।

না, আমাকে ছেড়ে তুমি কোথাও যাবে না। কোন দিন যাবে না। কিছুতেই যাবে না।

কথাগুলো বলতে বলতে দেবী ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। আমি তাড়াতাড়ি ওকে একটু টেনে নিয়ে বললাম, তুমি অমন করে চোখের জল ফেলবে না।

কিন্তু সোনা, তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না।

কিন্তু—

না, না, কোন কিন্তু আমি শুনব না। তুমি চলে গেলে আমি বাঁচব না, কিছুতেই বাঁচব না।

আমি কোন অধিকারে, কি পরিচয় নিয়ে এখানে থাকব, তুমি বল।

লোকে যা ইচ্ছে বলুক কিন্তু আমি একলা একলা বাঁচব কি করে?

তুমি আমাকে বিয়ে করবে না?

আমাকে বিয়ে করলে আত্মীয়-বন্ধুরা তোমাকে যা তা বলবে, হাসি-ঠাট্টা করবে। আমি তা কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।

শুধু কি তাই? নাকি সংস্কার তোমাকে...

আমি সংস্কারমুক্ত না কিন্তু জেনে রেখো, আমার কাছে সংস্কারের চাইতে তুমি অনেক বড়।

আমি চুপ করে বসে বসে ভাবি।

দেবী আমার মুখের সামনে মুখ এনে বলে, সোনা, কি এত ভাবছ?

কি ভাবছি তা আমিও জানি না।

একটা কথা বলব?

বল।

আমি কোন দিন বিবাহিত জীবনের সুখ পাব না।

কে বললো?

ভানুদা বলেছেন।

আমি অবাক হয়ে বলি, ভানুদা?

হ্যাঁ, ভানুদা।

ভানুদা কি করে জানলেন?

ভানুদা খুব ভাল জ্যোতিষ ছিলেন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। আমার জীবনে ওর প্রতিটি কথা বর্ণে বর্ণে মিলে গেছে।

যেমন?

দেবী একটু হেসে বললো, শুনতে চাও?

চাই বৈকি।

তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে, তাও উনি আমাকে বলেছিলেন।

সত্যি?

দুজন শ্রেষ্ঠ লেখকের দুখানা শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

গী. দে. মোপাসাঁর

বুল দে সুইফ

অতুলনীয় এই বইটি বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য রত্ন

মূল্য ছয় টাকা

এমিল ব্রাউনের

ভ্যাম্‌পায়ার

বিশ্বের রহস্য-সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই অসাধারণ উপন্যাসটি বাংলা রহস্য-সাহিত্যেও আলোড়ন এনেছে। প্রথম সংস্করণ শেষ হতে চলেছে। দাম আট টাকা।

দুখানা বইয়েরই ভাষান্তর করেছেন শ্রীইন্দুভূষণ দাস

সব দোকানে পাবেন

তোমাকে ছুঁয়ে বলছি।

কি বলেছিলেন?

বলতে গিয়ে খুশীতে ওর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললো, ভানুদা বলেছিলেন এই সময় থেকে এই সময়ের মধ্যে একটি ছেলের সঙ্গে আমার দেখা হবে এবং আমি তাকে ভালবাসব। তাকে পাবার জন্য আমি পাগল হয়ে উঠব কিন্তু ছেলেটি নেহাতই ভাল হবে বলে আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়েও সে কোন ক্ষতি করবে না।

শুনে আমিও হাসি। জিজ্ঞাসা করি, সত্যি এসব বলেছিলেন?

উনি বলেছিলেন বলেই ত আমি তোমাকে ভানুদার কাছে নিয়ে যাবার জন্য অত আগ্রহ দেখিয়েছিলাম।

আর কি বলেছিলেন?

তোমাকে দেখে উনি কি বলেছিলেন জান?

কি?

দেবী না হেসে পারে না। বলে, ভানুদা বলেছিলেন, জননী, এই তোমার ভাগ্যবিধাতা এই তোমার শেষ পাবানির কীড়।

তুমি বোধহয় একটু ভুল করছ। ভানুদা নিশ্চয়ই বলেছিলেন, তুমিই আমার ভাগ্যবিধাতা হবে।

আমি তোমার ভাগ্যবিধাতা বলেই ত একটু আগে আমার হাতে ওষুধ পর্যন্ত খেলে না।

আমি ত তোমাকে কিছু বলিনি। আমি আমার বউয়ের উপর অভিমান করেছি।

কেন, তোমার বউ কি করেছিল?

হাজার হোক সুন্দরী। তার উপর জানে ওর ফিগারটাও দারুন! ওকে দেখলেই আমার বুকের মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে। তাই

অনেক কষ্টে হাসি চেপে বললো, আগে ভেবেছিলাম, তুমি বেশ ভাল ছেলে কিন্তু এখন দেখছি তোমার মত অসভ্য লোক আর দ্বিতীয় নেই।

অসভ্য বলেই ত সারা রাত আমার কাছে কাটিয়েও তুমি অক্ষত থেকে গেছ।

দেবী দু'হাত দিয়ে বললো, সত্যি বলছি সোনা, সেদিন রাত্রির পর থেকেই তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা হাজার গুণ বেড়ে গেল!

চোখ দুটো বড় বড় করে একটু বিস্ময়ের সঙ্গে আমি বললাম, হাজার গুণ শ্রদ্ধা বেড়ে গেল?

বাড়বে না? তুমি পুরুষমানুষ। তুমি বুঝবে না কিন্তু আমি ত জানি, পুরুষরা শুধু মেয়েদের দেহটাই চায়।

তাই নাকি?

একশবার। চাল-কলা দিয়ে পূজা-আচার নৈবেদ্য সাজাবার মত মেয়েদের এই দেহের নৈবেদ্যই সব পুরুষের একমাত্র কামনা।

শুনে আমি একটু হাসি।

দেবী আপন মনে বলে যায়, শুনলে হয়ত তুমি হাসবে কিন্তু তবু বলছি। সেদিন রাত্রে তোমাকে একটু কাছে পাবার জন্য ছটফট করছিলাম কিন্তু ভয়ে আসতে পারছিলাম না।

কিসের ভয়?

ভয় হচ্ছিল এই ভেবে যে যদি তুমি নিজেকে সংযত রাখতে না পার, যদি তুমি কিছু দাবী কর তাহলে কি আমি...

দেবী কথাটা শেষ না করেই লজ্জায় আমার পিঠের উপর মুখখানা লুকিয়ে রাখল।

কথাটা শেষ করবে না?

না।

কেন?

তোমার প্রশংসা করতে আমার একটুও ভাল লাগে না।

আমি ত আমার প্রশংসা শুনতে চাই না।

তবে কি শুনতে চাও?

সে রাত্রে আমি যদি কিছু দাবী করতাম, তাহলে কি তুমি ফিরিয়ে দিতে?

সেদিন হয়ত ফিরিয়ে দিতাম কিন্তু এখন আর ফিরিয়ে দিতে পারব না।

কি বলছ তুমি?

ঠিকই বলছি সোনা। তোমাকে না দেবার আমার কিছুই নেই। আমার সব কিছুই আমার সোনার। (ক্রমশঃ)

বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ
প্রাথমিক উদ্যান-বিদ্যা ১০·০০
শাক-সব্জি চাষের কথা ৭·০০

নারায়ণ সান্যাল
অজন্তা অপরূপা ১৫·০০

SHAKUNTALA DEVI
Astrology for the Millions 8.00

সুখময় মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্র-সাহিত্যে নবরাগ ১৫·০০

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময় ১০·০০

পরিতোষ দাশ
চৈতন্যোত্তর প্রথম চারটি সহজিয়া পুঁথি ১৫·০০

শুকদেব সিংহ
শ্রীরূপ ও পদাবলী-সাহিত্য ২০·০০

নিরঞ্জন চক্রবর্তী
বিদ্যাপতি-সমীক্ষা ১৫·০০

নীহারকান্ত সামন্ত
জল-সরবরাহ প্রযুক্তি-বিদ্যা
(Water Supply Engineering) ১০·৮০

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
উজ্জ্বল নীলমণি ২০·০০

অশোক কুণ্ডু
বঙ্কিম অভিধান ২০·০০

রমেশচন্দ্র মজুমদার
বঙ্গীয় কুল-শাস্ত্র ১০·০০

ঋষি দাশ
রাজা রামমোহন ১২·০০

রাহুল সাংস্কৃত্যায়ণ
মানব-সমাজ ১০·০০

গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী
সমষ্টি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ১০·০০

অলক চক্রবর্তী
যে গল্প শুনিনি ৪·০০

N. Basak
History of Vernacular Education in Bengal 40.00

ভারতী বুক ষ্টল
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯ ফোন : ৩৪-৫১৭৮

মনের অসুখ

(বারো)

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি
নৈনং দহতি পাবকঃ

—মন, অশুচি হলে সারা দেহটই অশুচি হয়ে যায় কিন্তু দেহ অশুচি হলেই মন অশুচি হবে—এমন কোনো কথা নেই। আর আত্মা? আত্মাতো দেহমনের অতীত —পরমাত্মায় লীন হবার জন্যে উদগ্রীব; আত্মার বিনাশ নেই। পাপ-পুণ্য, ধর্মাধর্ম, ভালমন্দ শুধু এই দেহ ঘিরে—তাই না? আপনিতো অনেক কিছু জানেন? বলুন না। অশুচি দেহ নিয়ে ঠাকুরকে ডাকা যায় না, ঠাকুরের পুজো দেওয়া যায় না। ঠাকুরকে না ডেকে, ঠাকুরকে না খেতে দিয়ে, আমারতো খাবার উপায় নেই। অশুচি দেহের খাঁচা থেকে আত্মাকে মুক্তি দেওয়া পাপ নয়। তাই নয় কি?—এই বলে আয়ত চোখ তুলে দেবলা আমার মুখের দিকে তাকাল।

তিরিশ বছরের মেয়ে দেবলা প্রায় চারদিন কিছু না খেয়ে আছে। তার দিদি ভগ্নীপতী অনেক সাধ্যসাধনা করে তাকে জল ছাড়া আর কিছু খাওয়াতে পারেননি। কয়েকদিন ধরেই দেবলার ভাবান্তর লক্ষ্য করছিল ওরা। কিন্তু সেটা এমন কিছু বড় দরের নয়। দেবলার স্বামী বিজয়েশ কয়েক সপ্তাহ হল দিল্লীতে। অনেকদিন বেকার থাকার পর নতুন চাকরী পেয়ে বিজয়েশ দিল্লী গেছে। অনেক দিন পরে অবস্থার বদল হতে চলেছে। নতুন উৎসাহ, নতুন আনন্দ নিয়ে দেবলা কাজকর্ম করবে,—সকলে এই আশা করছিল। কিন্তু দেখা গেল, দূরসম্পর্কের দেবরের আমদানী-রপ্তানী সংস্থায় মোটা মাইনেতে স্বামীর নিয়োগের পর থেকেই দেবলার ভাবান্তর ঘটছে। প্রায় সব সময়েই কি যেন ভাবছে, দুতিনবার না ডাকলে সাড়া দেয় না, কাজ-কর্মে মন বসে না। গত কয়েকদিন হল তার নিত্যকর্ম গৃহদেবতার সেবা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে, নিজেও অন্ন বর্জন করেছে। তার খুড়তুতো দিদি ইরা ও তার স্বামী নিখিল বিদেশে থাকে, ছুটিতে কোলকাতায় এসে একটা হোটেলে উঠেছে। প্রায় বছর পনেরোর পর বোনের সঙ্গে দেখা হতেই তার মনে হয়েছে দেবলা যেন অন্য জগতের মানুষ। গীতা ভাগবত পড়া এবং গৃহ-দেবতার পুজো আরাধনা ছাড়া আর সব কিছুতেই তার অনীহা। দুই বোনের মধ্যে এক বছর কোনো যোগাযোগ ছিল না। ইরা বিদেশে থাকতে শুনেছে বিপত্নীক জ্যাঠামশায় দেবলাকে অল্পবয়সে বিয়ে দিয়ে সন্ন্যাস নিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছেন। এর বেশি আর কোনো খবর ইরা জানত না। কোলকাতায় এসে চেনাজানা সবার সঙ্গে দেখা করার কর্তব্য সারতে গিয়ে অনেক খুঁজে নাবকেলডাঙ্গার এক বস্তীর পাশে জীর্ণ এক চুনবালীখসা বাড়ীর একটা ঘরে দেবলাকে আবিষ্কার করে। মাত্র কয়েকদিন আগে বিজয়েশ নতুন চাকরী নিয়ে দিল্লী গেছে। সে ফিরে এলেই ওরা নিউ আলিপুরের একটা আধুনিক ফ্ল্যাটে উঠে যাবে। বিজয়েশের দূরসম্পর্কের ভাই রঞ্জন সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে। বর্তমানে বস্তির এক বৃদ্ধা দেবলার বাইরের কাজকর্ম করে দিচ্ছে। প্রত্যেক দিন রঞ্জন এসে খোঁজখবর নিয়ে যাচ্ছে।

গতকাল দেখা করতে গিয়ে ইরা জানতে পারে যে, চারদিন ধরে দেবলা উনুন ধরায়নি, দাঁতে কিছু কাটেনি। ওর কথাবার্তায়, আচার ব্যবহারে, অস্বাভাবিকতার গন্ধ পেয়ে ওরা ওখানেই রাত কাটায়। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও ওকে কিছু খাওয়াতে পারেনি। তারপর প্রায় জোরজবরদস্তি করে আমার কাছে নিয়ে এসেছে। ইরা সমাজবিদ্যা নিয়ে চর্চা করে, ওর দুচারটে লেখা আমার পড়া ছিল, পত্র-যোগে পরিচয়ও ঘটেছিল। ১৯৬২ সালের অকটোবর মাসের মাঝামাঝি ইরা তার বোনকে নিয়ে আমার কাছে এসেছিল।

দেবলার প্রশ্নের জবাবে বললাম ঃ আত্মহত্যা গর্হিত পাপ। তুমি নাকি অনেক ধর্মশাস্ত্র পড়েছ; কোথাও কি আত্মহত্যার অনুমোদন আছে?

—আত্মহত্যা করতে যাব কেন? উপোষ করে পাপ দূর করছি। আজকাল ডাক্তারবাও বলেন, উপোষ করলে অনেক অসুখ সেরে যায়। আপনি নিশ্চয়ই সে কথা জানেন।

—ডাক্তারের নির্দেশে উপোষ করলে তোমাকে আমরা বাধা দিতাম না। কিন্তু তুমিতো নিজের খেয়ালে উপোষ করছ; আর এইতো একটু আগেই বললে অশুচি দেহের খাঁচা থেকে আত্মাকে মুক্তি দেবার জন্য তুমি না খেয়ে থাকার পণ করেছ। নিজের দেহকে অশুচি ভাবছ কেন?

—শুধু দেহ নয়, মনটাও অশুচি হয়ে গেছে। তাইতো আত্মশুদ্ধি করছি। যিনি ডাক্তারের ডাক্তার, আমার সেই ঠাকুর আমাকে উপোষ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

এই বলে চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে গীতা আওড়াতে লাগল—ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং/ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণো/ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

ইংরিজীতে ইরাকে জানালাম যে আমার কিছু করবার নেই। এখনই হাস-পাতাল বা নার্সিংহোমে পাঠাবার ব্যবস্থা করা দরকার। ইরা আমাকে ওর ছোটবেলার কথা প্রসঙ্গে জানিয়েছিল যে দেবলা ইংরিজী জানে না। ওর বাবা ওকে ইস্কুলে পাঠাননি, ইংরিজী শেখাননি; শুধু বাড়ীতে রেখে নিজে বাংলা ও সংস্কৃত শিখিয়েছেন। তাঁর এই অদ্ভুত আচরণের বিশেষ কারণ ছিল। ইরার কাছে যা জেনে-ছিলাম তা পরে বলছি।

হঠাৎ শ্লোক আওড়ানো বন্ধ করে দেবলা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। চোখে মুখে উৎকণ্ঠা ফুটিয়ে বলে উঠল ঃ আমাকে এখুনি যেতে হবে, এতক্ষণে বোধ হয় দীনুদা এসে গেছে, গোপাল আমার চারদিন অভুক্ত। দীনুদা নিশ্চয়ই একটা বন্দোবস্ত করে ফেলেছে।

কথাগুলোর মানে ঠিকমত বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ইরার দিকে তাকাতে ও বুঝিয়ে দিল। দীনুদা পাশের বস্তিতে থাকে, যে মেয়েটি দেবলার বাজারহাট করে, তার স্বামী, আর 'গোপাল' ওর গৃহদেবতা। ইরা দেবলার কাছে গিয়ে ও পিঠে হাত বুলিয়ে ওকে শান্ত করতে চেষ্টা করল।

—সে ব্যবস্থা আগেতো করে এসেছি। দীনুদা পুরুতমশাইকে নিয়ে আসবেন, তিনি তোমার গোপালের সেবার ভার নিতে রাজী হয়েছেন। এতক্ষণে হয়তো তোমার গোপালকে নিয়ে তিনি নিজের মন্দিরে চলে গেছেন।

আরো বেশী অস্থির হয়ে উঠল দেবলা। সে তখুনি ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইল। শুধু গোপালকে নিলেই তো হবে না; তার কাপড়-চোপড়, গয়না-পত্তর ওকে বের করে দিতে হবে। শীত আসছে। গরম কাপড় গায়ে না দিলে গোপালের কী কষ্ট হয়—তা পুরুতমশাই জানবেন কি করে? তাছাড়া, কখন গোপাল কি খাবে, কি চাইবে, সবতো পুরুতমশাইকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। গোপাল তো অন্যের কাছে মুখ ফুটে কিছু চাইবে না।

—সে ব্যবস্থাও করে এসেছি। আমরা ফিরে না গেলে পুরুতমশাই গোপালকে নিয়ে যাবেন না। তোমার কোনো চিন্তা নেই। স্থির হয়ে বসে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বল। উনি তোমার অনেক কথার জবাব দিতে পারবেন—যা আমরা পারিনি। তারপর তোমার জামাইবাবু গাড়ী নিয়ে এলেই আমরা এখান থেকে চলে যাব।

আমার নির্দেশমত নিখিল তখন পাশের ঘরে গিয়ে টেলিফোনে একটা নার্সিংহোমের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছিল। দিদির কথায় বোধহয় দেবলা একটু আশ্বস্ত হল। শান্ত হয়ে বসে

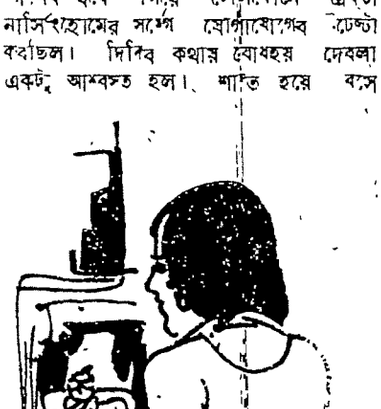

আমার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল : খুব বড় দরের পাপ না করলে আত্মার সদ্গতি হয় না। তাই না? আমার স্বামী দিল্লী থেকে তাই লিখেছেন। অনেক কিছু লিখেছেন। দিল্লীটা টেবাইয়ের জঙ্গল। বাঘ ভাল্লুকরা সব লড়াই করছে। সবাই পাপচক্রের এজেন্ট। আমরা রেসের ঘোড়া, রঞ্জনরা জকি। আরো লিখেছেন, তাকে আমাকে এগিয়ে চলতে হবে, আরো জোরে ছুটতে হবে, ঐ রঞ্জনদের সওয়ার করে বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে হবে। এ যুগের অন্য সকলের মত আমাদেরও আরো চাইতে হবে, আরো পেতে হবে। থেমে থাকলে চলবে না। সব কথা আমার মনে পড়ছে না। ওঁর বন্ধু কৃষ্ণমূর্তি লাইসেন্স পারমিটের ব্যবসা করেন। তিনি নাকি সুন্দর সুন্দর অনেক কথা বলেছেন। সেসব কথা আমি বুঝি না, আমার গোপালও বোঝে না। রঞ্জনের কথা তবু বোঝা যায়, কৃষ্ণমূর্তি একেবারে দুর্বোধ্য। শুনবেন?

এ-সব ক্ষেত্রে সব চিকিৎসকের যা করতে হয়, আমাকেও তাই করতে হল। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। হাত-ব্যাগ থেকে একটা দলাপাকানো চিঠি বের করে দেবলা পড়ে চলল।

—আমলাধানী, রাজধানী—ইত্যাদি অনেক কিছু নাম আছে দিল্লীর। আমার মনে হচ্ছে দিল্লী কাশী মক্কা জেরুসালেমের মত এক মহান তীর্থক্ষেত্র।..... তীর্থক্ষেত্রে পাপ খণ্ডাতে মানুষ সব থেকে প্রিয় জিনিসটি উৎসর্গ করে, এখানেও তাই চলেছে। অনেক পাপ করার পর আমলা-ঠিকাদাররা নিজেদের স্ত্রীকন্যা উৎসর্গ করেছেন। আমাকেও করতে হবে, তারপর আমার পাপের জন্য আমার সব থেকে প্রিয় জিনিসটি উৎসর্গ করতে হবে। কৃষ্ণমূর্তি বলল, হ্যাঁ পাপ। কিন্তু এ পাপতো আমরা করছি না। আমরাতো এজেন্ট, রবার স্টাম্প। আর বলল, সব থেকে দামী জিনিস বলি না দিলে মোক্ষলাভ হয় না।

চিঠির অংশবিশেষ মাত্র উদ্ধৃত করলাম। দীর্ঘ চিঠি পড়ার পর হঠাৎ ওর চোখদুটো সজল হয়ে উঠল। চোখ বন্ধ করে নিজের মনে বলতে লাগল : আমার দেহে বাইরের ময়লা লেগেছে, আমার দেহ অপবিত্র। কিন্তু অন্তরের শুচিতা তো নষ্ট হয়নি। তবে কেন, তোমাকে ছুঁতে পারছি না, গোপাল? তোমাকে খাওয়াতে পারছি না, নাওয়াতে পারছি না, তোমার আরতি করতে পারছি না। না, আমার মনেও বোধহয় পাপ ঢুকেছে। একপর আবার উঠে বাইরে যাবার জন্য ব্যস্ত হল। আবার ইরা বুঝিয়েশুঝিয়ে চেয়ারে বসাল।

নিখিল ঘরে ঢুকে ইংরিজিতে জানাল যে আজ সন্ধ্যায় একটা বেড় খালি হবে, কাল ওরা ভরতি করে নেবে বলেছে।

চোখ মেলে ইরার দিকে তাকিয়ে বলল, আমাকে তোমরা হাসপাতালে পাঠাচ্ছ। ভেবেছ, তারা আমাকে খাওয়াতে পারবে। আমার গোপালের খাওয়া হয়েছে না জানলে কেউই আমাকে খাওয়াতে পারবে না।

—হাসপাতালে যেতে হবে কেন? যত সব আজগুবি কল্পনা।

—দুচারটে ইংরিজি কথা আমি বুঝি ইরাদি। তোমরা আমাকে হাসপাতাল কি নার্সিং হোমে পাঠাবে। আমি তোমাদের কথা শুনে বুঝতে পেরেছি।

আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হল : তুমি যদি খাওয়াদাওয়া কর—অন্তত শরবত, কমলালেবু কিছুটা মুখে দাও তবে আর কোথাও পাঠাতে হবে না।

—গোপালের পেটে কিছু না পড়লে আমার খাওয়ার উপায় নেই। গোপালের ভোগ দেওয়া হবে, আরতি হবে, ঠাকুর জানবেন যে আমার মনে ময়লা লাগেনি তবে আমার গলা দিয়ে কিছু নামবে। তার আগে জোর করে আমাকে কিছু খাওয়ালে কোন ফল হবে না, সব খাবার বমি হয়ে যাবে। আমাকে তোমরা খাওয়াতেও পারবে না, হাসপাতালেও পাঠাতে পারবে না। বুঝলে ইরাদি।

—বেশ, তাই হবে। এখন বাড়ী চল। গাড়ী এসে গেছে। কেউ জোর জবরদস্তি করবে না। ইরার কাঁধে দেহের ভার রেখে ধীরে ধীরে দেবলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রাত্রিরটা ওর ওপর বিশেষ নজর রাখা দরকার—এই কথাটা ইরাকে বারবার বুঝিয়ে দিলাম।

শেষের কথা বলার আগে রোগিনীর পারিবারিক ইতিহাস কিছু জানাচ্ছি। এ-ইতিহাসের কিছুটা ইরার জানা ছিল, আর বিজয়েশের কথা ইরা বিজয়েশের পিতৃবন্ধু ডাক্তার পালের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিল।

দেবলার পিতা এক কলেজে সংস্কৃত পড়াতেন। ছোট ভাই ইরার বাবা ছিলেন সরকারী আমলা। দেবলার দিদি দেবযানীর বিয়ে নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে মতান্তর ঘটে, সেই থেকে তাঁরা পৃথক পৃথকভাবে বাস করতে থাকেন। ইরার বয়স তখন সতেরো, কলেজে পড়ছে, আর দেবলা বছর আস্টেকের মেয়ে। দেবযানী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী এক আহমেদকে বিয়ে করতে চায়। বাবা মত দিলেন না। বাবার অমতে বিয়ে করে দুজনে বিদেশে চলে যায়। দেবযানী ও দেবলা দুই বোনই ছিল অপরূপ সুন্দরী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দেবলার মায়ের মৃত্যু হয়। দেবলাকে বাবা তাকে ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসে, বাড়ীতে শিক্ষা দিতে লাগলেন। সংস্কৃত, কাব্য, দর্শন ধর্মশাস্ত্র ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে তার আগ্রহ না জন্মায়, এদিকে তিনি কড়া নজর রাখলেন। নিজের ইংরিজি বই সব একঘরে আলমারী বন্দী করে ঘরটায় তালাচাবি দিলেন। কয়েক বছর পরে খবর পাওয়া গেল দেবযানী আহমেদকে ত্যাগ করে একটি ফরাসী ছেলেকে বিয়ে করেছে। মাসখানেকের মধ্যে দেবলাকে বিজয়েশের হাতে তুলে দিয়ে বিষয়সম্পত্তি কোনো এক মঠের নামে

নারায়ণ দত্তর

জন কোম্পানীর বাঙালী কর্মচারী

আদি কলকাতার বাঙালী কর্মচারীদের সম্পর্কে বাংলা ভাষায় প্রথম গ্রন্থ। ২০·০০

শ্রীমতী ভক্তি বিশ্বাসের

অপরিচিত প্রতিবেশী ভুটান

প্রতিবেশী ভুটান সম্পর্কে বাংলা ভাষায় প্রথম ভ্রমণ-কাহিনী ১৫·০০

নেপাল হিমালয়ে ।। ১২·০০

প্রসূন বসুর

অন্যদিক

নারী জীবনের বিচিত্র সব কাহিনী।

দ্বিতীয় মুদ্রণ ।। ৭·০০

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের

ভূতের বেগার ।। ৮·০০ ক্ষমা নেই ।। ৬·০০

ঘরে ঘরে সংগ্রহ করে রাখার মত দুটি বই।

• নবপত্র প্রকাশন • ৫৯ পটুয়াটোলা লেন • কলি-৯

উইল করে প্রায় একবস্ত্রে তীর্থ ভ্রমণে বেরুলেন। সেই থেকে তাঁর আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। এর পরের খবর ইরা জেনেছে ডাঃ পালের কাছে। বিজয়েশের বাবা-মা তার বিয়ের বছর তিনেকের মধ্যেই মারা যান। আদর্শবাদী বিজয়েশ পিতৃ-সম্পত্তি ও শ্বশুরের দেওয়া টাকায় নদীয়া জেলায় কিছু জমি কিনে ক্ষেতমজুরদের অংশীদার করে, নতুন পদ্ধতিতে চাষবাস ও হাঁসমুরগী পালন আরম্ভ করে। তিন বছরের মধ্যে নিঃস্ব হয়ে কলকাতায় ফিরে এসে স্কুল মাষ্টারী করতে থাকে। সেখানে তার আদর্শের সঙ্গে প্রবীণ শিক্ষকের আদর্শের সংঘাত বাধে, ফলে চাকরী ছাড়তে হয়। এরপর স্ত্রীর গয়নাগাঁটি বেচে নিজে একটা আদর্শ শিশু-বিদ্যালয় খোলে। শিশুদের অভিভাবকরা কিছুতেই তার আদর্শ পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য বুঝে উঠতে না পারায় ছাত্রাভাবে স্কুল উঠে যায়।

কয়েক বছর চরম দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে কোনোমতে বেঁচে থাকে। এমনি সময় কালীঘাটে দূর সম্পর্কের এক ভাই রঞ্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটে। প্রথম দর্শনেই রঞ্জন বৌদি দেবলার একান্ত ভক্ত ও বিজয়েশের অকৃত্রিম সুহৃদ হয়ে ওঠে। দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্যে দেবলার রূপলাবণ্য বিশেষ ম্লান হয়নি। নিঃসন্তান দেবলার যৌবনশ্রী রঞ্জনকে আকৃষ্ট করেছে— দেবলা বুঝতে পারে। রঞ্জনের ফার্মে চাকরী নেবার কথা উঠলে সে স্বামীর উৎসাহে সাড়া দিতে পারেনি। আদর্শবাদী বিজয়েশ কয়েকদিন নিজের বিবেকের সঙ্গে লড়াই করে পরে রঞ্জনের কাছে আত্মসমর্পণ করল। দারিদ্র্য, দৈন্য, বিশেষ করে দেবলার দুঃখ-কষ্ট তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। বিজয়েশ বুঝতে পেরেছিল আমদানী-রপ্তানী ফার্মের সাইনবোর্ডের আড়ালে রঞ্জন নানা ধরনের কালো টাকার কারবার চালায়। সেই কারবারের দেবতার পূজার নৈবেদ্যে সুন্দরী নারী অতি-প্রয়োজনীয় উপাচার। রঞ্জন দেবলার দেহ তার ফার্মের নিয়োগ করতে পারে এভয় স্বামী স্ত্রী দুজনের মনেই জেগেছিল। কিন্তু দুজনেই দুজনের মনের কথা মনে চেপে রেখেছিল, একে অপরকে জানায় নি। বিজয়েশকে দিল্লি পাঠিয়ে রঞ্জন একরকম খোলাখুলিই তার মতলব প্রকাশ করল।

এই অংশ ইরা দেবলার অসংলগ্ন কথা বার্তা থেকে বুঝতে পেরে আমাকে জানায়। এ-ছাড়া ডাক্তার পাল বলেন যে সন্তান না হবার কারণ অনুসন্ধানের ফলে বোঝা যায় যে বিজয়েশই এর জন্য দায়ী, দেবলার দিক থেকে কোনো ত্রুটি নেই। এ খবর খুব সম্ভব দেবলা জানত না। তার অন্তরের বাৎসল্য রসের অভিব্যক্তি ঘটেছিল বাল-গোপালের মূর্তিটিকে কেন্দ্র করে।

রঞ্জনের আবেদন-নিবেদনে অস্থির অতিষ্ঠ উদ্‌ভ্রান্ত দেবলা দিল্লীতে স্বামীর কাছে খোলাখুলি কিছু জানতে সাহস পেল না। রঞ্জন শক্তিশালী রঞ্জন মরিয়া বিজয়েশ কোনোভাবে তাকে অপদস্থ করার চেষ্টা করলে রঞ্জন বিজয়েশকে পোকার মত টিপে মারতে ইতস্তত করবে না। মদের ঘোরে রঞ্জনের বেপরোয়া কথাবার্তা থেকে ও বুঝতে পারে বিদেশী কোনো এক বিশেষ গুপ্তচর চক্রের সঙ্গে ওর যোগাযোগ আছে। একদিন রঞ্জনের দৃঢ় আলিঙ্গন পাশ থেকে কোনমতে মুক্ত হবার জন্যে সে প্রতি-শ্রুতি দিতে বাধ্য হয় যে, তার গোপালকে অন্য কোথাও রাখার বন্দোবস্ত করে সে রঞ্জনের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করবে। গোপালের সামনে—ছিঃ! গোপাল যে ওর সন্তান। সেইদিন থেকে ওর খাওয়া বন্ধ হয়েছে আর মনোবিকারের লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

এ-সব কথা পরে জানা যায় ইরার হোটেলের ঠিকানায় লেখা দেবলার একখানা চিঠি থেকে।

শেষ অংশ ইহার মুখে শুনুন।

—আপনার এখান থেকে যাবার পর দীনুদার পুরুতমশায়ের হাতে গোপালকে সমর্পণ করল, সঙ্গে গোপালের জন্যে ওর নিজের হাতে তৈরী জামা কাপড় মালা গয়না।

পুরুতমশাইকে বারবার বুঝিয়ে দিল কোন পার্বনে কি ভোগ দিতে হবে কোন তিথিতে কোন ফুলের মালা দিতে হবে, কোন ভজনটি শুনতে গোপাল সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। তারপর ওকে অনেকটা শান্ত মনে হল। আমার নামে একটা চিঠি পাঠিয়েছে জানাল। আপনার দেওয়া ঘুমের ওষুধটা খেতে আপত্তি জানাল না। কিছু-ক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। দুচারবার ডাকতেও সাড়া দিল না। গায়ে নাড়া দিয়ে মনে হল গভীরভাবে ঘুমুচ্ছে। আমরা আলো নিভিয়ে, দরোজায় তালা লাগিয়ে দীনুদাকে দরোজায় পাহারা রেখে, কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে যা কিছু হোক দুটো পেটে দেবার চেষ্টায় বেরিয়ে পড়লাম। রাত বেশি হয়েছিল, ও দিকটায় দোকানপাটও কম। খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে আমাদের ফিরে আসতে বোধহয় ঘণ্টাখানেক লেগেছিল। ফিরে এসে দীনুদাকে বাড়ী পাঠিয়ে সন্তর্পণে দরোজা খুলে দেখি দেবলা তখনও ঘুমুচ্ছে। নিশ্চিন্ত মনে আমরা মেঝেতে একটা মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বোধহয় একটা ইঁদুরের কামড়ে অভ্রাটা চট করে ভেঙ্গে গেল। আলোর সুইচ টিপলাম। দেবলার দিকে নজর পড়তে মনে হল ওর মুখ দিয়ে যেন লালা পড়ছে। ওকে নাড়া দিতেই সব বুঝতে পারলাম।

—বিষ কোথায় পেল।

—বাড়ীতেই ছিল। ফলিডল। হাতের মুঠোতে একটুকরো কাগজ পেলাম। তাতে লেখা ছিল:—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ।
নঃ চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি
মারুতঃ।।

আমার মনে হয় ডাক্তারবাবু বিজয়েশের চিঠিটা না পেলে হয়তো ও এইভাবে মরত না। চার্মিং বোগ ঐ রঞ্জনকে ও ঠিক ঠেকিয়ে রাখতে পারত। চিঠিটাতে স্বামীর পরোক্ষ সম্মতির ইংগিত আছে মনে করে-ছিল দেবলা।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ঘড়ি
ও
গ্যারান্টিসহ ঘড়ি মেরামত
রায় কাজিন এণ্ড কোং
জুয়েলার্স এন্ড ওয়াচ মেকার্স
৪, বি, বি, ডি বাগ, কলি-১
ওমেগা ও টিসট্ ঘড়ির
অফিসিয়াল এজেন্টস্

ষাট দশকের শ্রেষ্ঠ কবিতা

সংকলনভুক্ত কবি : অঞ্জন কর অনন্ত দাশ অরুণ বসু অরুণাভ দাশগুপ্ত অশোক দত্তচৌধুরী আশিস সান্যাল কবির্বুল ইসলাম কালীকৃষ্ণ গুহ গণেশ বসু গৌতম গুহ গৌরাঙ্গ ভৌমিক চিন্ময় গুহঠাকুরতা তুষার রায় দেবারতি মিত্র দেবাশিষ বন্দ্যোপাধ্যায় পবিত্র মুখোপাধ্যায় পরেশ মণ্ডল পার্থ রাহা পুষ্কর দাশগুপ্ত প্রভাত চৌধুরী বিজয়া মুখোপাধ্যায় বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত ভাস্কর চক্রবর্তী মুকুল গুহ মৃণাল দত্ত মৃণাল বসুচৌধুরী যোগব্রত চক্রবর্তী রনজিৎ দেব রত্নেশ্বর হাজরা রথীন্দ্র মজুমদার রবীন সুর রাণা চট্টোপাধ্যায় শম্ভু রক্ষিত শান্তনু দাস শামশের আনোয়ার সত্য গুহ সামসুল হক সুব্রত চক্রবর্তী হরিজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়।

পবিত্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। প্লাস্টিক জ্যাকেটে মোড়া। দাম সাত টাকা

পুস্তক প্রকাশনী, ৮২।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

উপন্যাস

মোহিনী আট্টম

চিত্তরঞ্জন মাইতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রেমা অনামনস্কভাবে বলল, তাই তোমার রক্তে নাচ। তোমার অণু-পরমাণুগুলো নাচের ছন্দে বাঁধা।

দেবন বলল, তা আমি জানি না প্রেমা, তবে স্টেজে যখন নাচতে নামি তখন মনে হয় কেউ যেন আমার ওপর ভর করেছে।

একটু থেমে দেবন বলল, এইযে আট্‌পেটিখানা আমি মাথায় বয়ে নিয়ে চলেছি, এতে কি আছে জান?

প্রেমার গলায় ঔৎসুক্য, কি?

দেবন সেই জ্যোৎস্নার আলোয় পথের ধারে রেখে দেওয়া আট্‌পেটিখানা খুলে ফেলল। প্রেমা দেখল, বাকসখানার ওপরে দেবনের কয়েকটা জামাকাপড়। দেবন কাপড়-জামাগুলো সরিয়ে নিয়ে তলা থেকে বের করতে লাগল একটি একটি করে কথাকলির পোশাক। একদিকে অতি সাবধানে রাখা একটি খোপের ভেতর থেকে বের করল কিরীটম্‌। প্রেমার হাতে দিয়ে বলল, দেখ তো কেমন?

প্রেমা জ্যোৎস্নার আলোয় দেখল, মুকুট-খানা অনেক কালের পুরোন, কিন্তু গঠনের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মত।

প্রেমা বলল, এ ধরনের কিরীটম্‌ তুমি জোগাড় করলে কোথা থেকে?

দেবন তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে একে একে বের করতে লাগল, কানের তোড়া, বাহুর পারান্তিকা মণি, বুকের কোস্তারম্‌। কোমরবন্ধনী— পাড়িআরঞ্জানম্‌ হাতের বালা আর মণিবন্ধের হস্তকটকম্‌। নিম্ন-দেহের বাস পাট্টওয়ালোর ওপর গাঢ় হলুদ রঙের মুন্ডিপ্। সাদা উত্তরীয়ের শেষপ্রান্তে অনেক বড় কক্কেফুলে আকারের সোনালী জরির কাজ।

প্রেমা দেখল সবকটি জিনিসই পুরোন। নতুন পোষাকের ঔজ্জ্বল্য নেই, কিন্তু পোষাকটির কোন কোন অংশে বেশ অভি-নবত্ব আছে।

প্রেমা একটি একটি করে পোষাক যত্নে হাতে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করছিল। মাঝে মাঝে মন্তব্য করছিল বিস্ময়ের ভাষায়।

সব দেখানো শেষ হলে অতি যত্নে দেবন সেগুলিকে আবার গুছিয়ে রাখল তার আট্‌পেটিতে। বাকসের মুখ বন্ধ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এ পোষাক আমার ঠাকুরদার বাবা পরতেন প্রেমা। একশো পাঁচ বছর আগেকার এই পোষাকের উত্তরাধিকার আমি লাভ করেছি। এটি পরে স্টেজে দাঁড়ালেই আমি অন্যমানুষ হয়ে যাই। এক অদৃশ্য শক্তি আমার ভেতর তখন কাজ করতে থাকে।

প্রেমা বলল আশ্চর্য।

দেবন বলল, তুমি জান আমি কলা-কেন্দ্রমে নাচ শিখছি স্কলারশিপ নিয়ে; আমাদের সংসারের অবস্থা কোন কালেই ভাল ছিল না আজও নয়। তবু জান প্রেমা, আমি যদি আমার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে অনেক অর্থ পেতাম তাহলেও এত খুশী হতাম না, যত হয়েছি এই পোষাক আর আট্‌পেটিশানার মালিকানা পেয়ে।

প্রেমা গভীর গলায় বলল সত্যি, তোমার এ ঐশ্বর্য ঈর্ষা করার মত।

দেবন বলল, আমি যদি ভুল না শুনে থাকি তাহলে বলব প্রেমা মেনন অনেক বড় বাড়ীর মেয়ে। টাকা খরচ করে তাকে নামী গুরুর কাছে নাচ শেখানো হয়েছে। অনেক দামী আর নামী সমঝদারের চোখে এখনই সে পড়ছে। তার নাচের তারিফ বিশিষ্ট লোকেদের মুখে মুখে।

প্রেমা অধীর গলায় বলল, 'এ কথা কেন দেবন? বড়লোকের ঘরে জন্মে আমি কি খুব বড় একটা অপরাধ করেছি?

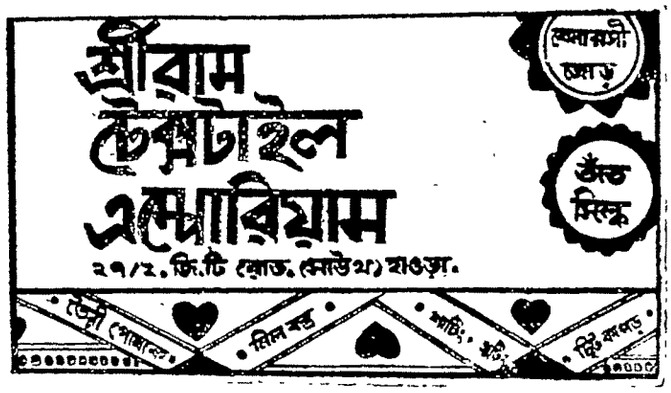

দেবন বলল, আমি ঠিক সেকথা বলতে চাইনি প্রেমা। হয়তো আমি আমার মনের কথাগুলো বলতে গিয়ে তোমাকে আঘাত করে বসতে পারি কিন্তু বিশ্বাস কর তোমার মনে কোনরকম আঘাত দেবার উদ্দেশ্য আমার আদপেই ছিল না। আমি আমার নিজের জীবনের কথাগুলোই তোমাকে বলতে চাইছিলাম।

প্রেমা বলল থাক সেসব কথা, এখন তুমি যা বলতে চাইছিলে বল।

দেবন অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবল। এক-সময় বলল অনেক আগে আমাদের নাচিয়ে সম্প্রদায়ের মানুষদের বড় একটা সম্মান ছিল না। কিন্তু যারা নাচ শিখেছে এত কষ্ট করে তারা সবাইকে তো তা দেখাতে চায়। মানুষের মুখের একটুখানি বাহবা পেলেই তারা কৃতার্থ হয়ে যায়।

প্রেমা বলল, আমার বাবা কিন্তু এসব ব্যাপারে খুবই প্রোগ্রেসিভ ছিলেন। আমাদের কনভেন্টে পড়াশোনার ব্যবস্থা যেমন করেছিলেন তেমনি নাচ শেখানোর ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন দারুণ। তিনি বলতেন, গাছের শাখায় শাখায় যেমন পাতা জাগে আর ফুল ফোটে ঠিক তেমনি দেহের শাখায় শাখায় নাচের মুদ্রাগুলো আশ্চর্য সব অনুভূতির ফুল ফোটায়। তিনি নাচ শুধু ভালবাসতেন না, নাচিয়েদের দারুণ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

দেবন বলল, এখন দর্শক অনেক শিক্ষিত হয়েছে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গীও বদলেছে। কিন্তু আমার দাদুর মুখে গল্প শুনেছি, তাঁরা ছোটবেলা নাচের জন্যে কত অপমান সহ্য করেছেন।

প্রেমা বলল, কি রকম?

দেবন বলল, পাঠশালায় বানান ভুল করলেই পণ্ডিতমশায় বলতেন পড়তে এসেছিস কেন? কস্মিনকালেও তো কিছু শিখতে পারবি না। তোর বাপ নাচিয়ে, ধেই ধেই করে নেচে বেড়াগে যা।

প্রেমা বলল, যাদের কোন কালচার নেই তারাই এ ধরনের কথা বলে।

শোনই না দেবন বলে চলল আমার ঠাকুর্দা তাঁর বাবার সঙ্গে আটপৌটি মাথায় বয়ে নিয়ে কোন উৎসব বাড়ীতে গিয়ে হাজির হতেন। শুধু নাচ দেখাবেন, এই ইচ্ছে। জমিদারের মর্জি হলে অনুমতি পাওয়া যেত। আশ্রয় মিলত কেটেডমের একেবারে বাইরে গাছের তলায়। তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না প্রেমা, জমিদারবাড়ীর হাতি আর ঘোড়াগুলোকে দালানের ওপর খেতে দেওয়া হত, অথচ দাদুদের খাবার জন্যে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তারওপর কলাপাতা পাততে হত। তারই ওপর চুড়ো করে ভাত ঢেলে দিত জমিদারবাড়ীর চাকরগুলো। সামান্য একপাত্র রকাবী পেলেই যথেষ্ট। প্রেমা বলল এ ধরনের অবস্থা তাবাই যায় না।

দেবন বলল, এত অপমান সয়েও কিন্তু শিল্পীরা বসে থাকত। শুধু যে বিদ্যা তারা এত সাধনায় শিখেছে তাকে সকলের সামনে তুলে ধরবে বলে। জান প্রেমা, আমি শুনেছি পাঁচ বছরে পড়লেন দাদু আর সেই থেকে শুরু হয়ে গেল তাঁর শিক্ষা। দশ বছরের পর দিনে কমপক্ষে দশ ঘন্টা প্র্যাকটিশ করতে হত। সামনে জ্বলন্ত নারকেল তেলের ভিলাক্কু। তার সামনে সাধনার আসন পেতে মুখ আর চোখের কাজ করতে হত। মাংস-পেশীর সেসব কাজ দেখলে আজকের শিল্পীরা থ বনে যাবে। আমার দাদু বলতেন, একই মুখের একদিকে কান্না আর একদিকে হাসি ফোটানোর খেলা দেখাতে যদি না পারলি তাহলে শিখলি কি?

প্রেমা বলল, সত্যি এইসব সাধকই আমাদের প্রেরণা।

হঠাৎ দেবন বলল, দেখ প্রেমা কথা শুরু হলে কথা আর শেষ হবে না। দয়া করে আমাকে যেতে দাও। রাত দশটার ভেতরে একটা বাজারে পৌঁছতে না পারলে রাতের খাবারটাও জুটবে না।

প্রেমা বলল, অন্ততঃ ঐটুকু পথ তোমাকে পৌঁছে দিতে দাও।

আটপৌটিটা মাথায় তুলে নিয়ে দেবন বলল কিছু মনে কোরো না প্রেমা, অভ্যেস আমি খারাপ করব না। একদিন সুখের কথা মনে করে দুঃখ পেতে হবে। ওতে আমি নেই। যেমন চলছি, এমনি আমাকে নিজের মত করে চলতে দাও।

প্রেমা মনে মনে বলল, কি নিষ্ঠুর আর কি অহংকারী তুমি দেবন। মুখে বলল, আচ্ছা এসো পনেরটা দিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে। আবার দেখা হবে কলাকেন্দ্রমে। তখন তোমার এই পথচলার অভিজ্ঞতার কথা শুনব।

প্রেমা গাড়ীতে স্টার্ট দিল। দেবন তেমনি আটপৌটি মাথায় পথের ধার ঘেঁষে চলতে লাগল, কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। একটু আগে যে প্রেমা নামে এক সতীর্থের সঙ্গে তার আলাপ চলেছিল তার কোন চিহ্ন নেই দেবনের আচরণে। প্রেমা গাড়ী চালিয়ে পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় উৎসুক চোখে একবার তাকাল কিন্তু পথের ওপর পড়ে থাকা দেবনের দৃষ্টিকে সে কোনরকমেই নিজের দিকে টানতে পারল না।

কলাকেন্দ্রমে পাঁচটি বছরের নানা উৎসব অনুষ্ঠানে দেবনের মুখোমুখি হয়েছে প্রেমা কতবার। অনুষ্ঠান পরিকল্পনা করেছে ওরা একই সঙ্গে। দেবনের প্রাধান্যকে ও মেনে নিতে দ্বিধা করেনি। দেবন যখন নিরাসক্ত চোখে ওর দিকে চেয়ে আসন্ন উৎসব পরিকল্পনার কথা বলে গেছে, তখন প্রেমা শুধু দেখেছে দেবনকে। তার কানে হয়ত দেবনের একটিও কথা বাজেনি। সেতার সামনে দেখেছে সেই শক্তিমান কর্ণকে, যার সমস্ত শক্তি অদৃশ্য ভাগ্যদেবতা নির্মম কৌশলে হরণ করে নিয়ে চলেছে।

শিক্ষকেরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন, দেবন কলাকেন্দ্রমের অন্বিতীয় শক্তিমান শিল্পী। কিন্তু যখনই কোন উৎসবের আয়োজন হয়েছে, বিশিষ্ট দর্শকেরা এসে-ছেন কলাকেন্দ্রমে তখনই তাঁরা দেবনকে করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করলেও পুর-স্কার কিংবা উপহারের বস্তুগুলি একে একে তুলে দিয়েছেন প্রেমার হাতে।

প্রেমা মাথায় ঠেকিয়ে তুলে নিয়েছে সে দান কিন্তু তার মন সেগুলিকে গ্রহণ করতে পারেনি। সে জানে সে মোহিনী, আর সেই মোহিনীমায়ায় সে সবার চোখে মোহের অঞ্জন মাখিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া সকলেই জানে সে অন্যতম বিজনেস ম্যাগনেট করণাকরের মেয়ে। বাড়তি একটা সুযোগ স্বাভাবিক-ভাবেই সে তার অজ্ঞাতে সবার কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে। এসবে প্রেমার নিজের কোন ইচ্ছার প্রশ্নই ওঠে না। সমস্ত অনু-কূল পরিস্থিতি ঘুরেছে তাকে কেন্দ্র করে।

অন্যদিকে অধিরথ সূতপুত্র দেবন। কর্ণের কবচকুণ্ডল সে স্মিত হাসিতে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। শক্তি তার থেকে ঝরে পড়া তুষার নদীধারার মত চিরপ্রবহমান। কিন্তু ভাগ্যের আশ্চর্য খেলায় বারে বারে তার গতি শুষ্ক মরুতে লুপ্ত হয়ে গেছে।

প্রেমা ছবি দেখে,—তার কর্ণের বধচক্র গ্রাস করেছে যোদ্ধিনী। মহা শক্তিধর সেই

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা

সম্পাদক
বমেন্দ্রনাথ মল্লিক

চতুর্দশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যার সূচীপত্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (পত্রাবলী), হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ), ভরত মুনি (নাট্যশাস্ত্র), কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত (অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত), দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য (অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ), রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত (বাংলা কথাশিল্পে শৈলজানন্দ ও অচিন্ত্যকুমার), পুলকেশ দে সরকার (বাংলা ভাষার গড়নে রবীন্দ্রনাথ), অমলেন্দু চক্রবর্তী (বাকপ্রতিমার স্বরূপ ও সংজ্ঞা সন্ধান), সত্যজিৎ চৌধুরী (শিল্প-সংজ্ঞার সম্ভাব্যতা ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। চিত্রসূচী। জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্র-নাথের বিচিত্রা ভবন ও মহর্ষিভবন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য তিন টাকা।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় । দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭
পরিবেশক। জিজ্ঞাসা ১এ কলেজ রো ও ১৩৩এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা

প্রার্থিত চক্রকে শেষ শক্তিতে তুলে ধরবার চেষ্টা করছে, আর ভাগ্যের দেবতা নিষ্ঠুর শরাঘাতে অসহায় সংগ্রামীকে বিদ্ধ করতে উদ্যত।

ছবি দেখতে দেখতে হাহাকার করে কেঁদে উঠেছে প্রেমা। কিন্তু সেই অনুচ্চারিত হৃদয়ের শব্দ কারো কানে গিয়ে পৌঁছয়নি। এমনকি প্রেমা যখন অশান্ত ক্ষতার হৃদয়ের ভার বয়ে নিয়ে তার কাঁধের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে হয়ত কোন সন্ধ্যায় কলাকেন্দ্রমের কাছাকাছি কোন সমুদ্রবেলায়, দেবন স্মিত হাসিতে তাকে অভ্যর্থনা করেছে। তার পুরস্কার প্রাপ্তিতে জানিয়েছে আন্তরের গভীর অভিনন্দন।

কিন্তু প্রেমা তার সামনেই বালির জমিনে তার প্রাপ্ত পুরস্কার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছে এ আমার নয় দেবন, এ আমার নয়। এ পুরস্কার তোমার। কিন্তু এ উচ্ছিষ্ট বস্তুটি আমি তোমার হাতে তুলে দিতে পারব না, আর এও জানি এ পুরস্কার তুমি স্পর্শ করবে না।

প্রেমার হাত ধরে দেবন বলেছে বড় বেশী সেন্টিমেন্টাল তুমি প্রেমা। আমার নাচ তোমার ভাল লাগতে পারে, মাষ্টার মশায়দের ভাল লাগতে পারে তা বলে সবার লাগবে এ কথা কি করে বলা যায় বল। তাঁরাও তো গুণী। তাঁদের বিচারের দাম দিতে হবে বৈকি।

উদ্যত অভিমানটুকু বুকের মধ্যে চেপে রেখে ভাঙা গলায় বলে উঠেছে প্রেমা, থামো তোমাকে আর বিচারকদের সাফাই গাইতে হবে না।

দেবন হেসে উঠে বালির ওপর ফেলে দেওয়া প্রেমার পুরস্কারটা কুড়িয়ে নিয়ে এসে বলেছে, এই অবোলা জড় পদার্থটির অপরাধ কি প্রেমা। ওকে অমন করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কি লাভ হচ্ছে তোমার। একদিন এই উপহারকে তুচ্ছ বলে ছুঁড়ে ফেলে দেবার জন্যে হয়ত তোমাকে দুঃখ পেতে হবে।

প্রেমা দেবনের হাত থেকে সে পুরস্কার দিকে। জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে বলে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে ছুটে গেছে সমুদ্রের উঠেছে, এ আমারও নয়, তোমারও নয় একে মহাসমুদ্র গ্রাস করুক।

দেবন অশান্ত প্রেমার দুটো হাত আবার নেজের হাতের ভেতর ধরে নিয়ে বলেছে ঐ সমুদ্রের সঙ্গে তোমার কোন তফাৎ নেই প্রেমা। ও অনন্তকাল ধরে নাচের লীলায় মেতে আছে, তুমিও তাই। তোমার দেহেই শুধু নয়, মনেও চঞ্চল নাচের একটা লীলা চলেছে সারাক্ষণ।

প্রেমা দেবনের হাত থেকে নিজের হাত খানা ছাড়িয়ে নিয়ে বালির জমিনে পায়ের চিহ্ন আঁকতে আঁকতে ব্রস্ত পায়ে চলে গেছে কলাকেন্দ্রমের দিকে।

দেবন চেয়ে চেয়ে দেখেছে খেপাটী প্রেমাকে। তার ভাল লেগেছে প্রেমার সবকিছু। চঞ্চল পায়ে ঢেউয়ের মত এগিয়ে এসে তাচ্ছিল্যে আছড়ে পড়া আবার ফিরে যাওয়া। সবকিছুর ভেতর একটা সুন্দর অশান্ত ছন্দ আছে যে কোন শিল্পীর মনকে তা নাড়া দিয়ে যাবেই। দেবন অভিভূত হয়, সে ভাবে প্রেমার অন্তর ঐ দিগন্ত ছুঁয়ে থাকা সমুদ্রের মতই প্রসারিত।

দেবনের চিঠিখানা হাতে নিয়ে প্রেমা ভাবছিল ফেলে আসা কলাকেন্দ্রমের দিনগুলোর কথা।

হঠাৎ তার মনে হল, দেবন কি যেন কোন নারী সম্বন্ধে নিস্পৃহ। প্রেমা যেমন করে তার অবসর মুহূর্তগুলো ভরে তোলে দেবনের ভাবনায়, দেবনও কি তেমনি করে ভাবে না তার কথা। হয়ত ভাবে হয়ত ভাবে না। শিল্পী কি তার চারদিকের চলমান চঞ্চল জীবন সম্বন্ধে একেবারে নিরাসক্ত থাকতে পারে। সে দ্রষ্টার ভূমিকা নিয়ে জীবনকে দেখে দেখে যায়, আর দ্রষ্টার ভূমিকা নিয়ে তাকে রূপ দিয়ে চলে। দেবনকে তার মনে হয় বিরল উপাদানে গড়া বিশ্বকর্মার সৃষ্টির একটি বিস্ময়কর ব্যতিক্রম।

প্রেমা ভাবল দেবন কখনো কাছে আসে না সে দূরে থেকেই আকর্ষণ করে। চন্দ্রের মত সে দূর আকাশে থেকে সমুদ্রকে টানতে থাকে। তাই সমুদ্র উচ্ছ্বাসে উত্তাল হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই নিষ্ঠুর আকর্ষণকারীকে না পেয়ে আক্ষেপে ভেঙে পড়ে বেলাভূমিতে।

ঘরের ভেতর জলতরঙ্গের শব্দ তুলে বেলটা বেজে উঠতেই প্রেমার ধ্যান ভাঙল। সে মাথা থেকে চিরুনীটা টেনে নিয়ে চুলগুলো ঠিক করে নিল।

প্রেমা দরজা খুলতেই ঝড়ো হাওয়ার মত একটা উচ্ছ্বাস ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। মিঃ পিল্লাই দুখানা হাতই প্রেমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, হ্যালুলো কনগ্র্যাচুলেশন্স, প্রেমা তুমি অসাধ্য সাধন করেছ। জার্নালিস্ট এ্যাসোসিয়েশনের পুরস্কারটা সবার চোখের সামনে থেকে ছিনিয়ে নিয়েছ। ওঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি কম হয়েছিল, একবার দেবনের দিকে পাল্লা ঝোঁকে তো আরবার প্রেমা মেননের দিকে। সুধা আয়েঙ্গারের ভারতনাট্যম পারফরমেন্সের প্রশংসায়ও কেউ কেউ পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শেষ অব্দি কেরালার বিউটি কুইন, ট্যালেন্টেড আর্টিস্ট প্রেমা মেননের মাথাতেই জয়ের মুকুটটা উঠল।

প্রেমা শান্ত গাম্ভীর্যে বলল, বসুন, আসছি।

আড়ালে বেসিনের কাছে গিয়ে চোখে-মুখে জলের ঝাপ্টা দিতে লাগল। চোখ থেকে স্নোগত গড়িয়ে আসছে জলের ধারা। বেসিনের হাতভরা জলেও ঐ ফোঁটা ফোঁটা চোখের জলকে ধুয়ে মুছে ফেলা যাচ্ছে না। এ জল উত্তাপে শুকোয় না, জলেও ধুয়ে যায় না। আশ্চর্য এর প্রবাহ।

আলতো করে তোয়ালেতে মুখখানা মুছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল প্রেমা। জরী হলে মানুষ সাথী হয় কিন্তু এমন সুখও আছে যা পরাজয়ের ভেতর দিয়ে আসে। সেই সাথীই প্রেমা পেতে চেয়েছিল। দেবনের কাছে হার হলে সে মনে মনে তার সমস্ত কৃতজ্ঞতা উজাড় করে দিত বিচারকদের উদ্দেশ্যে। শাস্ত্রে বলে, পুত্র আর শিষ্যের কাছ থেকে পরাজয় গৌরবের। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা জানেন না ভালবাসার জনের কাছে হেরে গেলেও কি অসীম তৃপ্তি আর গর্বে মনটা ভরে ওঠে।

(ক্রমশঃ)

প্রকাশিত হয়েছে

শিশু সাহিত্য সংসদ সংস্করণে নতুন রঙীন ছবিতে নতুন পরিসাজে

শিশু সাহিত্যের দুই দিক্‌পাল

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের

হাসিখুসি ২-৫০

হাসিরাশি ৪-০০

ছোটদের রামায়ণ ২-৫০

ছোটদের মহাভারত ৪-০০

এবং

সুকুমার রায়ের

আবোল তাবোল ৩-০০

খাগড়াই ২-৫০

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ

৩২এ আচার্য প্রফুল্ল রোড ॥ কলিকাতা-৯

সন্তোষ সেনগুপ্ত

আজকের সন্তোষ সেনগুপ্ত সঙ্গীতে এবং বিশেষ করে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের জগতে যাকে বলে ভি আই পি ব্যক্তি যে কোনো সংস্থারই বিশেষ কোনো নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হলেই সম্মানিত অতিথি ও উপদেষ্টামণ্ডলীতে ডাক পড়বেই সন্তোষ সেনগুপ্তের। এমন কোনো নৃত্যনাট্যের আসর নেই যেখানে ঝকঝকে গরদের অথবা দুগ্ধশুভ্র আদ্দির পাঞ্জাবী এবং লাল নকসাপাড় ধুতি পরা হাসি হাসি মুখ সন্তোষ সেনগুপ্ত বসে নেই এবং তাঁর চারপাশে ভক্তরা ভিড় করে নেই।

তেত্রিশ বছর আগের ইতিহাস কিন্তু এর বিপরীতে সাক্ষ্য দেয় না। অবশ্য জাগরণক্ষণীর প্রসন্ন বরদানে কর্মজীবনের সুরুতেই যোগ ঝলমল দিন এবং বিঘ্নবিহীন নিশ্চিন্ত পথে দীপ্ত জয়টিকা ললাটে নিয়ে যাদের সৃষ্টিমুখর নিমেষগুলি নৃত্য-নূপুর বাজিয়ে ছুটে চলে যায় সার্বজনীন সন্তোষদা সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন সৌভাগ্যবান শিল্পী স্রষ্টা এবং পথদ্রষ্টার অন্যতম। পথদ্রষ্টা কেন বললাম? সে আলোচনায় পরে আসছি। এই প্রসঙ্গে শুধু একটি কথাই জানিয়ে রাখি মঞ্চে এবং গ্রামোফোন কোম্পানীর নৃত্যনাট্য আধুনিক গান রবীন্দ্রসংগীত নজরুল অতুলপ্রসাদ রজনীকান্ত এবং অন্যান্য সংগীতের ক্ষেত্রে আজ যাঁরা উজ্জ্বল তারকা তাঁদের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষ সেনগুপ্তের আবির্ভাব এবং [illegible] তাঁর ভূমিকা কিছু কম নয়। তাঁর অবদান সমগ্র শিল্পী গোষ্ঠীর মধ্যে পুরুষকণ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠও আছে ফিফটি ফিফটি শেয়ারে। গ্রামোফোন কোম্পানীতে এ সি সেন সন্তোষ সেনগুপ্ত টি পি রায়চৌধুরী পি কে দে ও পি কে বানার্জির সেই বসাল কম্বিনেশনের যুগে শিল্পী ও গানের সেই আনন্দধারার প্রবাহ এত তাড়াতাড়ি ভোলার নয়। এদিক দিয়ে শুনেছি পি কে সেনও উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের অংশীদার। এবং আমাদের অনেক ধন্যবাদ পাওনা তাঁর।

কিন্তু সে কথা বলব যথাস্থানে। তার আগে ফিরি পূর্ব প্রসঙ্গে। শিশিরসিক্ত বায়ে বিকশিত তরুছায়ে স্নিগ্ধ সুরভির গন্ধে বাতাস মন্থর করেই আমাদের

যে গানে মন দুলে ওঠে সে গান চাইবার, খোঁজবার, ভাববার ধৈর্য আজ কারো নেই। সে সময়ও নেই। কারণ শিল্পীরা এখন 'ডিভোটেড' নন। 'কমার্শিয়ালাইজ্‌ড্‌'

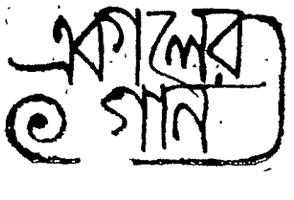

সন্তোষদার শিল্পীজীবন বয়ে চলেছে সেই ১৯৩৬ (আনুমানিক) থেকে সুরু করে আজ অবধি।

১৯৩৬-তেই বোধহয় হবে। সংগীত-রসিক সমাজ যেন সম্মোহিত হয়ে গেলো একখানি রেকর্ডের দুটি গান শুনে আজও পড়েগো মনে দুটি কাজলা আঁখি ও আঁখি শাওন ঝড়ে মম বিজন বনে কে গো আসিলে একা হেন নীরব ক্ষণে। লালিত্য ও মাদকতায় মর্মছোঁওয়া কণ্ঠ। কিন্তু পৌরুষদীপ্তির উজ্জ্বলতাও কিছু কম নয়। প্রেমসংগীতের অবর্ণনীয় কোমলতায় ভেজা সে গান সবিনয়ে ঘোষণা করেছিলো শুধু সংগীত জগতে প্রতিভাবান সুগায়কের আবির্ভাব নয় যথার্থ শিল্পী চিত্তের নিঃশব্দ কিন্তু নিশ্চিত গতিলয়। সেইদিনটি থেকে সুরু করে আজও তিনি অকৃপণদানে আমাদের প্রাপ্তির অঞ্জলি ভরে দিয়েছেন। কোনো বিশেষ ধরণের অথবা বিশেষ সুর-কারের গানে ইনি নিজেকে সীমিত রাখেননি যে গানে তিনি সুন্দরের ছোঁওয়া পেয়েছেন সেই গানের অতল আহ্বানে তাঁর গ্রহিষ্ণু মন সাড়া দিয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ নজরুল ডি এল রায় রজনীকান্ত অতুল-প্রসাদ সুরসায়র শৈলেশ দক্ষগুপ্ত নজরুল কমল দাশগুপ্ত অনুপম ঘটক—যখন যাঁর গানই গেয়েছেন সে গানে সুরকারের চিন্তার বিশিষ্ট রূপের প্রতি আনুগত্য রেখেও নিজস্ব কল্পনার রঙে রঙিন করে তুলতে পেরেছেন বলেই—বাংলা গানে সন্তোষ সেনগুপ্ত একটি অনন্য চরিত্র হয়ে উঠেছেন। এখনকার তরুণ শিল্পীদের মধ্যে অমর সেনের কণ্ঠে সন্তোষ সেনগুপ্তের মাধুর্য ও ভংগিটি মেলে। মুক্ত মনের শিল্পী সন্তোষ সেন-গুপ্তের গানেও মেলে মুক্ত বাতাসের দাক্ষিণ্য।

যুগে যুগে তাঁর গানের গতি বাঁক নিয়েছে ভিন্ন দিকে ও চিন্তায়। কিন্তু তাঁর সুরের পুষ্পবন কখনও পুষ্পবিহীন নয়।

ছোটোবেলা থেকে গান গেয়েছেন শুধু গাওয়ার আনন্দে। তখনকার দিনে হীরেন বসু একজন নামকরা গীতিকার ছিলেন। সেই যুগের যেসব আধুনিক গানের কথা তিনি স্মরণ করলেন তার মধ্যে একটি জনপ্রিয় গান হোলো 'শেফালী তোমার আঁচল খানি' গেয়েছিলেন মিস শেফালী তাঁরই লেখা। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ গানকে তখনও উচ্চাংগের শিল্পরূপে গ্রহণ করেননি। মেয়েদের ক্ষেত্রে তবু নিখিল লিখনম-পঠনমের মধ্যে একটু-আধটু সংগীত-চর্চা যদি বা বিবাহের কাম্য বলে অনুমোদিত হোতো ছেলেদের ক্ষেত্রে কিন্তু গান গাওয়াটা ছিলো বসাতলে যাবার সামিল।

এ হেন যুগেও সন্তোষ সেনগুপ্তের গানের তরী নির্ভরে পাল তুলে অনুকূল জোয়ারের স্রোতে ভেসে চলেছে। এবং সংগীতশিক্ষা বলতে যা বোঝায় তাও সুরু

হয়েছে শিল্পীজীবন সুরু হবার পরে। সুকণ্ঠের অধিকারী তরুণ সন্তোষ সেন-গুপ্ত সেনোলা রেকর্ড কোম্পানীর দুই কর্ণধার সুরেন সেন ও বিভূতি সেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁদেরই আমন্ত্রণে সন্তোষবাবুর প্রথম রেকর্ড আজও পড়েগো মনে ও আজি শাওন ঝড়ে (কথা ও সুর নরেশ্বর ভট্টাচার্য ও শৈলেশ দত্তগুপ্ত)—রসিকচিত্ত জয় করে নিলো। সেনোলা কোম্পানী থেকেই ওস্তাদ মপ্পু সাহেবকে ওঁরা নিয়ে এলেন সন্তোষবাবুকে তালিম দেবার জন্য। তাঁর কাছে ঠুংরি টপ্পার সুবিস্তীর্ণ শিক্ষা চললো গলা তৈরী করবার জন্য। রেকর্ড করাও চলল পুরোদমে। এক একখানা রেকর্ড বার হবার সংগে সংগে গান পাগলারা যেন লুফে নিতো। তখনকার দিনে টাকা বয়ালটি ইত্যাদির চল ছিলো না। কিন্তু রেকর্ড কোম্পানীতে শিল্পীর সেই রাজ সমাদর এখনকার শিল্পীরা কল্পনাতেও আনতে পারবেন না। আমার যাওয়া-আসার পথে ওঁরা রেড-কার্পেট বিছিয়ে দিয়েছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। আমার জন্য সুসজ্জিত ঘর স্নানাগার বিশ্রামকক্ষ এবং রাজসিক আহারাদির ব্যবস্থা ত ছিলোই। এসব ছাড়াও আমার হেফাজতে একটা গাড়ী থাকতো কোম্পানীর কাজ ছাড়াও ব্যক্তিগত প্রয়োজনেও এ গাড়ী আমার ব্যবহার করবার এক্তিয়ার ছিলো—সেই পরিচিত পরিচ্ছন্ন হাসির আলো মাখিয়ে বললেন—সন্তোষ সেনগুপ্ত একালের গানের ইন্টারভ্যাল সময়।

এত সুখ সম্মান পেয়েও গ্রামোফোন কোম্পানীতে চলে এলেন কেন?

১৯৩৯ অবধি খোস মেজাজে বাহাল তবিয়তেই সেনোলায় ছিলাম। তারপর সুরেন সেন চলে গেলেন কানপুর। বন্ধু না থাকায় বিভূতিবাবুও ম্লিয়মান। তারপর সব কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেলো। আর সে মেজাজ পেলাম না।

১৯৩৪ থেকে গ্রামোফোন কোম্পানীতে ছিলেন হেম সোম। এখানে আসার পর তখনকার দিনের (শুধু তখনকার দিনেরই বা বলি কেন চিরদিনেরই) বড় বড় গীতিকার ও সুরকারদের সংস্পর্শে এসেছিলাম। এইখানেই দেখেছি কাজী সাহেবকে। সকাল থেকে সুরু করে রাত ১০টা এগারোটা অবধি তাঁর সান্নিধ্য পাবার সুযোগ ঘটেছিলো। তখনই দেখেছিলাম এক সংগে কতরকম গান লিখছেন আর সুর দিচ্ছেন ওরই মধ্যে আড্ডা হাসি গল্প সবই চলছে। কি প্রচণ্ড তাঁর শক্তি।

সেই সময় গ্রামোফোন কোম্পানীর ট্রেনার ছিলেন কমল দাশগুপ্ত। তখন দোর্দণ্ড তাঁর প্রতাপ। প্রত্যেকটি কাজ ঘড়ি ধরা। তাঁর সংগে দেখা করতে হবে কাজ করতে হবে চলতে হবে কথা বলতে হবে ঘড়ি একেবারে ধরে। এমন পাংচুয়াল মানুষ সংগীত জগতে ছিলো না। একবার বাজেন সরকার তাঁর সংগে নির্ধারিত সময়ের পাঁচ মিনিট বাদে দেখা করতে গিয়েছিলেন বলে—তিনি তাঁকে ঘরে ঢুকতেই দেননি।

ফিল্ম ওয়ার্ল্ডেও নিয়মানুবর্তিতা এবং সময়ানুবর্তিতা তাঁরই অবদান। কমার্শিয়াল সুরকার হিসাবে তাঁর কাছে কেউ দাঁড়াতেই পারেন না। কি ফিল্ম কি ননফিল্ম যে কোনো গানে তাঁর ছিলো যেন লাজ্বস্কেল মেসিনারী প্রোডাকশন।

সুরসাগর হিমাংশু দত্ত ছিলেন আত্ম-মগ্ন ভাবুক প্রকৃতিক মানুষ। একটা গানের সুর কবে তিনি পাগলের মত পথে পথে খুঁজতেন—আর খুঁজতেন সেই মানুষকে যাকে সুরটি তুলিয়ে দিয়ে তিনি ভারমুক্ত হতে পারেন। একবার বেলা সাড়ে ১১টায় আমার সংগে হিমাংশুবাবুর সংগে ট্রামে দেখা হোলো। আমার সংগে দেখা হতেই একেবারে যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন এসো এসো তোমাকে আমার ভীষণ দরকার। কি ব্যাপার? আমিও শশব্যস্ত। কাল সারারাত ঘুমোইনি। একটা নতুন গানে সুর দিয়েছি। সকাল হতেই এই একই ট্রামে তিনবার ধরে বালিগঞ্জ থেকে ডালহৌসী যাচ্ছি আর আসছি। আমায় গানটি তোলালেন বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে রাসবিহারী মোড় থেকে ধর্মতলার মোড় অবধি হেঁটে তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে একটা সিগ্রেট ধরালেন। গানটি হোলো রাতের দেউলে জাগে বিরহী ভাবা।

এইরকমই ছিলেন তখনকার শিল্পী ও সংগীত স্রষ্টারা। তাঁরা অর্থ, উপার্জনের কথা ভাবতেন না। জীবনে প্রতিষ্ঠা বা সিকিউরিটির কথা ভাবতেন না। সরস্বতীর বরপুত্র কার হাত দিয়ে যাবেন শুধু এইটিই ছিলো তাঁদের ধ্যান-জ্ঞান জপমন্ত্র। হিমাংশুবাবু সবসময়ই যেন একটা গভীর-ভাবে ডুবে থাকতেন। কখনও মনে পড়ে না তিনি তাঁর কোনো গান রেকর্ড করতে বলেছেন। শুধু চাইতেন সুকণ্ঠ কোনো শিল্পীকে তাঁর গানখানি তুলিয়ে দিতে। দিলীপ রায় নাটোরের মহারাজা তথা অনেক গুণী সমাবেশ অহরহই ঘটতো তাঁর ঘরে। হিমাংশু দত্তর সুর ছিলো প্রধানত ক্লাসিক্যাল ভিত্তিক। আর প্রতিটি সুর মনন গহন থেকে বেরিয়ে আসতো যেন তাঁর আবেগের উত্তাপ নিয়ে।

অনুপম ঘটক এই যুগেরই। ওঁর সুর-রচনা খুব বুদ্ধিদীপ্ত। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি গানে সুর দিতেন বলে তাঁর সুরের মধ্যে একটা সচেতন প্রয়াস লক্ষ্যে আসতো। একটা মার্জিত রুচির ছাপও পাওয়া যেতো তাঁর গানে। তুলসীদাস কথাচিত্রে অনুপম ঘটকের অনেক সুন্দর সুন্দর গান ছিলো। তাঁর সংস্পর্শে এসেই হীরেন বসু নাম করেছেন। হেমন্তর প্রথম যুগের বিখ্যাত গান লিখিনু যে লিপিখানি ও শুকনো শাখা ঝরে যায়' অনুপমদার সুর হীরেন বসুর কথা। এ পাড় ভাঙাও তাঁরই সুর। আমি গেয়েছি।

সুধীরলাল এঁদের অনেক পরের শিল্পী ও সুরকার। ওঁকে আমি চিনেছিলাম ক্ল্যাসিক্যাল গানের এক তরুণ প্রতিভারূপে। তখন ওর বয়স ষোলো-সতেরো বছরের বেশী নয়। ঐ বয়সেই কণ্ঠ সুর তাল লয়ের মান দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর আমিই ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম মালদার জমিদার বাড়ী গান গাইতে। অসাধারণ গেয়েছিলো। এই ক্ল্যাসিক্যাল আর্টিস্টই যখন সুরকারে কনভার্টেড হোলো সুরের বিরাট পরিচ্ছন্ন শিল্পবোধ অনুভূতিশীল মন—সবকিছু মিলে তার রচিত সুরে এমন একটা মাধুর্য সৃষ্টি হোলো যাতে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। উৎপলা সেন নিখিল সেন ওর সুরে অনেক গান গেয়েছে। ওরাই ওর নামকরা ছাত্র-ছাত্রী পরে শ্যামলও ওর কাছে শিখেছে।

সন্তোষদা আজ অবধি কতগুলি গান রেকর্ড করেছেন এবং তার বিখ্যাত গান কি কি স্মরণ করতে পারেন না গানের সংখ্যাধিক্য এবং প্রতি কটি গানের অসাধারণ সার্থকতার কারণে। এইটুকুই শুধু মনে করতে পারেন যে তাঁর জীবনে যারে কভু দাওনি মালা রেকর্ডটির রেকর্ড সেল হয়েছিলো (৬৫ হাজার কপি) এবং আজ অবধি বাংলা গানের উচ্চতম বিক্রীর ক্ষেত্রে চতুর্থ স্থান অধিকার করে আছে। প্রথম স্থান যাঁর

গোকুলচন্দ্র (রেণুকা সেনগুপ্ত) দ্বিতীয়—ও কেন গেলো চলে (পঙ্কজ মল্লিক) তৃতীয়—হুঁয়োনা ছুঁয়োনা বঁধু (কৃষ্ণচন্দ্র দে)। তখন অবশ্য অবিভক্ত বাংলা ছিলো।

আপনি সজ্ঞানে এবং প্রত্যক্ষভাবে গত ৪০ বছর ধরে বাংলা গানের সংগে যুক্ত। নিজের সম্বন্ধে সবকথা মনে না থাকলেও আপনার চারপাশের সংগীত পরিমণ্ডল সম্বন্ধে একটা ছবি ত আপনার চোখের সামনে ভাসছে আপনি শিল্পীরূপে ছাড়াও গ্রামোফোন কোম্পানীর সংগে বহুদিন ধরে যুক্ত আছেন—ট্রেনার এবং রেকর্ডের পরিকল্পনাকার হিসেবেও। বাংলা গানের গত চার দশকের একটা সুসংবদ্ধ রূপ ও গতির খবর আপনার কাছে পাবার আশাতেও এসেছি কিন্তু। —এইবার আমার তাগাদা সুরু হোলো।

গত চল্লিশ বছরের আধুনিক বাংলা গান সম্বন্ধে আমি হয়ত কিছু বলতে পারি। কিন্তু চল্লিশ বছর ধরেই ত কোনো গান আধুনিক থাকতে পারে না। এই সিরিজের এ নাম কেন দিলে? একে বলা উচিত সমসাময়িক কালের গান।

একালের গান ও সমসাময়িক কালের গান—দুটি নামেরই অর্থ কিন্তু একই। আজ যে গানকে সমসাময়িক বলা যায় ২০ বছর বাদে নিশ্চয়ই সে নামে তাকে অভিহিত করা যাবে না। কারণ এ গান বিভিন্ন দশকে বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। আসল কথাটা হোলো শিপলাস সং বা জনমানসের আনন্দ বেপনার গান—যা ক্ল্যাসিক্যাল কনভেনশনের বাইরেও এমন একটা কনভেনশন সৃষ্টি করেছে যেটা ক্লাসিক্যাল বিরোধী নয়। কিন্তু সুর ও প্রকাশভংগির একটা স্বতন্ত্র রূপ আছে এবং কথায় একটা বিশেষ ভূমিকা এ গানে আছে। এই ত? এ সিরিজের নাম যে অন্য কিছু হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আমরাও অবহিত আছি। বই আকারে হয়ত হবেও তাই। কিন্তু জেনেশুনেও এ নাম আমরা দিয়েছি এবং প্রবীণ ও সৃষ্টিশীল সুরকার গীতকার অথবা শিল্পী দিয়ে সুরু না করে নবীন যুগের মানুষের জনপ্রিয় শিল্পী দিয়ে সুরু করেছি এইজন্য যে আমরা চাই বর্তমান যুগের মানুষ তাঁদের সংগীতের ঐতিহ্যকে জানুন এবং এই জানাটা হোক সৌন্দর্যপিপাসী মনের তাগিদে। তাঁদের চেনামহলের সম্মুখপট আলোকিত হলে—পশ্চাৎপট সম্পর্কে আগ্রহ আপনিই জাগবে। তাঁদের প্রিয় শিল্পীর মুখে—সংগীতের ক্ষেত্রে তাঁদের আদর্শ হিরোর কথা শুনলে সেইসব সাধক শিল্পীর সম্বন্ধে এঁরাও আগ্রহী হবেন। যথার্থ আগ্রহ না জাগলে মানুষ অন্যের সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল হতে পারে না। এবং জোর করে উপদেশ দেবার মত সেইসব জ্ঞানী-গুণীদের কথা শোনাতে গেলে তাঁদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান জানানো হয় না। সেইজন্য আমরা তরুণ শিল্পীদের দিচ্ছি। আর তারই মাঝে মাঝে জানবি সেই সব সাধক শিল্পীদের—যাঁরা তাঁদের ধ্যানকল্পনা দিয়ে এই গানের ধারা সৃষ্টি করেছেন। হিমালয়ের দিকে মানুষ কি সব সময় তাকিয়ে থাকবার শক্তি ধরে?

উত্তম পরিকল্পনা। কি যেন বলছিলাম? গত ৪০ বছরের বাংলা গানের কাহিনী—ধন্যবাদ। ১৯৩০ সাল থেকে দেখা গেলো সেই সময় প্রচলিত সংগীতধারা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের ও রসের আর একটি বাংলা গানের ধারা সমান্তরালভাবে বয়ে চলেছে এই গান প্রধানত তুমি এইমাত্র যে কথা বললে কাব্যধর্মী এবং এর সুর মার্গ সংগীতাশ্রয়ী।

এই সব গান গাইবার জন্য পরিশীলিত কণ্ঠের প্রয়োজন ছিলো। প্রথম যুগে এই আধুনিক গানের রচয়িতা ছিলেন অজয় ভট্টাচার্য শৈলেন রায় সুবোধ পুরকায়স্থ অনিল ভট্টাচার্য এবং শিল্পী ছিলেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় হর্ষদেব রায় জ্ঞান গোস্বামী ও শচীন দেববর্মন। এই সময় থেকেই বাংলা গানের জগতে একটি নতুন সংস্কার সূত্রপাত হোলো যার নাম সুরকার। এই প্রসংগেই বলি কুমিল্লার যে তিনটি মানুষ তখন সংগীত জগতে প্রতিপত্তি জনপ্রিয়তা ও সম্মানের শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত তাঁরা হলেন সুরে সাগর হিমাংশু দত্ত অজয় ভট্টাচার্য ও শচীন দেববর্মন।

আর তৎকালীন অন্যান্য যে সব সুরকার পুরোভাগে ছিলেন তাঁরা হলেন অনুপম ঘটক অনিল ভট্টাচার্য (গীতিকার সুবোধ দুই-ই) উমাপদ ভট্টাচার্য কমল দাশগুপ্ত শৈলেন দত্তগুপ্ত সুধীরলাল চক্রবর্তী এবং আরো অনেকে। একটা কথা অনেকেরই হয়ত নজরে আসেনি শচীন দেববর্মন প্রথমের দিকের অনেক রেকর্ডের গান যেমন বাঁশি দখিনা পবন প্রেমের সমাধি তাঁরে আরও অনেক গান হিমাংশু দত্তরই সুরে গেয়েছেন।

কাকে ছেড়ে কার কথা বলি? সেই সময়ই কাজী নজরুল ইসলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের বাংলা গান লিখতে সুরু করেন যার সুর গজল ঢং-এর এবং অনেক উর্দু কথার সমাবেশে এইসব কাব্যগীতির একটা রঙিন মাদির রূপ যেন উচ্ছল হয়ে উঠলো।

একথা বললে বোধহয় একটুও অত্যুক্তি হবে না যে ১৯৩০ থেকে ১৯৫০ সাল হোলো বাংলা গানের স্বর্ণযুগ। এতগুলি দিকপাল গায়ক গীতিকার ও সুরকারের সমন্বয় বাংলা গানে আর কখনও ঘটেনি। ভবিষ্যতে ঘটবে কিনা তারও কোনো আভাস অন্তত এখন অবধি পাচ্ছি না। ১৯৪০ থেকে ১৯৫০ সাল অবধি বাংলা গানে শ্রেষ্ঠ যে কয়েকজন শিল্পীর নাম এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি তাঁরা হলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে শচীন দেববর্মন পঙ্কজ মল্লিক ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় হর্ষদেব কানন দেবী সাবগল মুখিকা রায় রবীন মজুমদার জগন্ময় মিত্র হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য বেচু দত্ত অখিলবন্ধু সুধীরলাল চক্রবর্তী শৈল দেবী গীতশ্রী গীতা দাস উমা বসু সুপ্রভা সরকার উৎপলা সেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায় মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্যামল মিত্র।

এদিকে নজরুল ইসলাম একটি স্বতন্ত্র পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছেন। তাঁর গানের সর্বপ্রধান শিল্পী ছিলেন ইন্দুবালা। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ইন্দুবালার গান বা তৎকালীন রেকর্ড যে না শুনেছে কাজী সাহেবের গানের প্রকৃত রূপ ও গায়কীর পরিচয় সে পায়নি। আঙুরবালা অবশ্য কয়েকটি নজরুলের গান করেছিলেন। কিন্তু নজরুলের সুরের বৈশিষ্ট্য তাতে খুব প্রবল নয়। বর্তমান যুগে নজরুল ইসলামের গানের বহুল প্রচার অবশ্য হচ্ছে। কিন্তু তার মধ্যে নজরুলকে খুঁজে পাওয়া যায় না। সেই সময়ই পঙ্কজ মল্লিকের মেঘনিবিড় কণ্ঠের রবীন্দ্রসংগীত জনসাধারণের চিত্তে বৈপ্লবিক আলোড়ন জাগালো। সর্বধারার সংগীতের শ্রেষ্ঠ সমন্বয় ঘটেছিলো ঐ সময়েই কোনো বিষয়েই কারো কোনো গোঁড়ামো ছিলো না। কি শ্রোতার কি গায়কের।

তখনকার আধুনিক বাংলা গান প্রধানতঃ বাগাশ্রয়ী ছিলো। কাজেই আধুনিক সংগীতের গায়কদের বাগসংগীতে রীতিমত শিক্ষা ও দক্ষতার অধিকারী হতে হোতো। সেই সময়েই তাঁদের কণ্ঠ অত্যন্ত পরিশীলিত ও মার্জিত ছিলো। তখনকার দিনের একখানা আধুনিক গান অন্ততঃ দশ বছর বিক্রী হোতো। বর্তমান কালের আধুনিক গানের আয়ু দাঁড়িয়েছে ছ' মাস থেকে বড় জোর এক বছরের মধ্যে।

একমাত্র বাংলা গানের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ফিল্মের গান এ গানকে কিছুমাত্র বিপর্যস্ত করতে পারেনি। ভারতের অন্যান্য সব ভাষার আধুনিক গানকেই ফিল্মের গানের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে—

একটা প্রশ্ন কবছি আপনার কথায় বাধা দেবার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে। এখন নজরুলের গানেও একটা নতুন ঢেউ এসেছে। এ গানের শিল্পীদের মধ্যেও ব্যাপকভাবে পরীক্ষানিরীক্ষার একটা উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। এর মূলে কিন্তু গ্রামোফোন কোম্পানীর অনেকখানি অবদান আছে। আমার যতদূর মনে পড়ছে ১৯৬৫ সালে আপনার উৎসাহেই সব শিল্পীদের নিয়ে একখানি এল-পি ডিস্ক প্রকাশিত হয়েছিলো। এই উপলক্ষ্যে নলিনী সরকার স্ট্রীটে এক সাংবাদিক সম্মেলনও হয়। কাজী অনিরুদ্ধ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সংগে আমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন সন্তোষ দে।'

'রাইট। ১৯৬৫ সালে গ্রামোফোন কোম্পানীতে ট্রেনার হিসেবে যোগদান করতে গিয়ে দেখি নজরুলের কোনো রেকর্ড হচ্ছে না। ফিরোজা বেগম আমায় বললেন 'নজরুলের রেকর্ড করেন না কেন?'—কথাটা মনে লাগলো। তখন ফিরোজা বেগমকে নিয়েই একখানা রেকর্ড করালাম। তার একটি গান ছিলো 'গানগুলি মোর আহত পাখীর সম।' নজরুলের গানের প্রতি আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকলেও আমার এ গানের

ডিস্ক করার মুখ্য উদ্দেশ্য কমল দাশগুপ্তকে আবার নূতন করে এখনকার জেনারেশনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। ওঁর তখন দুঃখলগ্ন। কিন্তু মধ্যগগনে ওঁর সেই প্রখর দীপ্তির দিনগুলোর কথা আমার পক্ষে ত ভোলা সম্ভব নয়? প্রত্যেকটি আর্টিস্টকে অনুরোধ করলাম ওঁর সুরে রেকর্ড করতে। কিন্তু কেউ রাজী হোলো না।

তখন মনে হোলো সকল স্টার আর্টিস্ট-দের সমন্বয়ে নজরুল গানের একখানা রেকর্ড করলে কেমন হয়? আর কাজীদার অনেক ভালো ভালো গানের সুর কমল দাসগুপ্তর দেওয়া এবং স্বয়ং কাজীদার দেওয়া সুরের গান সম্বন্ধেও ওঁর অভিজ্ঞতা প্রচুর। কারণ এসব গান যখন ইন্দুবালা রেকর্ড করেন কমলদার তখন গ্রামোফোন কোম্পানী এবং সংগীত জগতেও বিরাট পোজিশন।

সেই পরিকল্পনা কার্যকরী হোলো 'বেস্ট লাভড্ সংগস অফ নজরুল রেকর্ড' করে। কমলদার ট্রেনিং-এ বারখানি গান ধনঞ্জয়; সতীনাথ; মানব; প্রতিমা; সন্ধ্যা সবাই গেয়েছিলো। অ্যান্ড ইট ওয়াজ এ গ্রান্ড সাকসেস। পরেরবার প্রকাশিত হোলো, 'সে ইট উইথ রোজেস'—নামকরণ করেছিলেন পি কে ব্যানার্জি। এ বিষয়ে আমি অকুণ্ঠ সহায়তা ও উৎসাহ পেয়েছিলাম এ সি সেন; টি পি বাষচৌধুরী ও পি কে ব্যানার্জির কাছে। এইভাবে প্রতিবছর নজরুলগীতির নিয়মিত রেকর্ড রিলিজ হওয়ায় এইসব গানের শিল্পীরাও রেডিওতে এবং ফাংশনে নজরুলের গান গাইতে শুরু করলেন। এবং এই কারণেই এ গানের একটা চাহিদা গড়ে উঠলো। তারপর ১৯৭১ সালে যখন যুদ্ধ বাধলো তখন সরকারের তরফ থেকেও নজরুলের গান প্রচারে আনুকূল্য পাওয়ায় এ গানের পথ খুলে গেলো। বাণিজ্যিক সাফল্যও লক্ষ্য করবার মত। আর কি প্রশ্ন আছে বলুন।'

'এখনকার সুরকারদের সম্বন্ধে কিছু বলবেন না?'

প্রথমেই যাঁদের কথা বলেছি তাঁদের পরের যুগে রবীন চট্টোপাধ্যায় ফিল্মে এবং নন-ফিল্ম গানেও খুব ব্যাপকভাবে কাজ করেছেন। ওঁর জ্ঞান অভিজ্ঞতা এবং রস-বোধও প্রচুর। নির্মল ভট্টাচার্যও অনেক সুন্দর সুন্দর গানের সুর দিয়েছেন।

সলিল চৌধুরী বাংলা গানের ক্ষেত্রে একটা নতুন চিন্তা নতুন গতি আনবার চেষ্টা করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন। তিনি সত্যি-কারের প্রতিভা। তবু বলব এ গানে যতটা স্পার্ক আছে ঠিক ততখানি গভীরতা নেই। তাই দীর্ঘস্থায়ী কোনো রেশ রাখতে পারলো না।

সতীনাথ মুখার্জি একজন সৃষ্টিশীল শিল্পী। রাগসংগীতের ওপর অসাধারণ দখল থাকায় ওর সুরের মধ্যে একটা বৈচিত্র্যও ছিলো। ওর সুরকে আধুনিক গানের 'ডিসটিংটিভ স্টাইল' বলা যাবে। ঐ গানটার কথাই ধরুন না 'এ জীবনে আর কিছু ভালো [illegible]

আর একটা কথা। আমার মনে হয় প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপনারা যদি ঠিকভাবে একসপ্লয়েট করতেন তাহলে অনেক চিরায়ত মূল্যের গান ওঁর কণ্ঠ থেকে আদায় হোতো। রাজেন সরকার এ বিষয়ে আমাদের ওঁকে দিয়ে দৃষ্টি খুলে দিয়েছেন 'দুলী' চিত্রে। 'নিঙাড়িয়া নীল শাড়ী' 'হিবেনী তীর্থ পথে' ঠুংরী টপ্পা খেয়ালের অনেক সূক্ষ্ম কাজ ওঁর গলায় আছে। আলি আকবর খাঁ সাহেবও ওঁকে দিয়ে আমীর খাঁর সঙ্গে গাইয়েছেন 'ক্ষুধিত পাষাণ'। মনে আছে?'

'তোমার সঙ্গে আমি একমত। যা আমাদের করা উচিত তার সবটাই কি পারি? তা যদি পারতাম পৃথিবী ত স্বর্গ হয়ে উঠতো।'

'এখনকার যুগের আধুনিক বাংলা গান আগের মত রসোত্তীর্ণ নয় কেন?'

'আগেকার যে মানসিকতা এখন নেই। আগে একটা ভালো গান পেলে শিল্পীরা পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়তো। সেসব গানের মধুরতা মনকে যেন চুম্বকের মত আকর্ষণ করে আজও। মনে কর রবীন্দ্রসংগীতের মত গানও তখন প্রবেশের পথ পায়নি। অথচ সংগীতপ্রাণ রসিকচিত্তের অভাব তখন একেবারেই ছিলো না। তবু রবীন্দ্র-সংগীত অপেক্ষা করছিলো পঙ্কজ মল্লিকের মত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবের।

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে আমি যখন 'কইর কথা শুকতারাগো' রেকর্ড করলাম (১৯৩৭ সাল) প্রথম দফার অর্ডার ছিলো ৫ হাজার কপি। এখনকার দিনে এটা ভাবা যায়?'

'কেন যায় না? এখনকার মানুষও ত কম গান-পাগল নয়? রবীন্দ্রসদন কলামন্দির একটা সন্ধ্যাও খালি থাকে না।'

'সংগীতরসিক সমাজ চিরকাল আছেন থাকবেনও। তবে যে গানে মন দুলে উঠে আজ সে গান চাইবার খোঁজবার ভাববার ধৈর্য কারো নেই। সময়ও নেই। তখনকার শিল্পীচিত্ত ডিভোটেড এখন কমার্শিয়া-লাইজড মনের এই দৈনের ছায়া গানেও পড়েছে। সেইজন্যই এখনকার গানে সে লাইফ নেই।'

'খুব সুন্দর বলেছেন। আপনার কথা শুনে ধনঞ্জয়বাবুর (ভট্টাচার্য) একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। এইরকম এক দিনের আলোচনায় উনিও বলেছিলেন বাড়ীতে পুজোর ঘরে দেবতার সামনে বসে নিবিষ্ট মনে পুজো করবার সে তন্ময়ভাব বারোয়ারী তলায় হাজারটা মানুষের দৃষ্টি ঢাক ঢোল মাইক্রোফোনের সমনে বসে আসতে পারে না।

'ধনঞ্জয় সাধকশিল্পী। তাই সাধকদের মতই কথা বলেছে।

বর্তমান যুগে আধুনিক বাংলা গানের জগতে একটা গভীর নৈরাশ্যের ছায়া নেমেছে। বাংলা গানে এমন কোনো যুগ বিপ্লবী প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না—যিনি বলতে পারেন আমার জীবনের লভিয়া জীবন জাগোরে দেশের গান।

কারণ? অনেকের মতে দেশে এখন রবীন্দ্রসংগীতের জোয়ার বইছে। আধুনিক গান শুনতে এখন আর কেউ আগ্রহী নন।

সংগীত শিক্ষার্থীমাত্রই রবীন্দ্রসংগীত শেখেন—কারণ এ গান মোটামুটিভাবে আয়ত্ত করা দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। বৈশিষ্ট্যের অধিকারীদের কথা বাদ দিয়ে অধিকাংশের কথাই বলছি এখানে। কারণ প্রতিভা যে কোনো ক্ষেত্রেই আপন শক্তিতেই গৌরব অর্জন করে।

অধিকাংশ শিক্ষার্থীই এখন রবীন্দ্র-সংগীত শিখতে চান কারণ এঁরা মনে করেন গলায় কিছুটা সুর থাকলেই অল্প কিছুদিন শিখেই পরিবেশনযোগ্য রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া যায়। ঠিক এই কারণেই হাওয়াই গীটারের প্রচলন আজ এত বেশী। কারণ কিছুটা সুরে টংটাং করতে পারলেই শিক্ষার্থীরা আত্ম-প্রসাদ লাভ করে। সুর স্বর অথরা রাগ-রাগিনীর চর্চা মার্গসংগীতের ক্ষেত্রের বাইরে প্রায় উঠেই গেছে। কারণ এতে যে আত্মনিয়োগ নিষ্ঠা ও সময়ের প্রয়োজন তা এখন প্রায় দুর্লভ। আধুনিক গানেও শিক্ষা সাপেক্ষ এবং ভাল করে গাইতে হলে উচ্চাঙ্গ সংগীতের ভিত্তি দরকার।

তাই বলে এ কথাও বলব না যে আধু-নিক গানের মৃত্যু ঘটেছে। হয়ত হঠাৎই একদিন আবির্ভাব ঘটবে কোনো কালজয়ী শিল্পী গীতকার অথবা সুরকারের যাঁর দারুণ দীপ্তিতে বাংলা গানের জন্মান্তর ঘটবে। এটা হতেই হবে এবং আমরা সেই সেই বর্ষণ প্রাচ্যের প্রতীক্ষায় বসে জুপ-মালার এক একটি বিদ্রাক্ষ ঘনিষ্ঠ সংগীতের এই নিঃস্ব কিন্তু প্রহরগুলো গুনছি।

সন্ধ্যা সেন

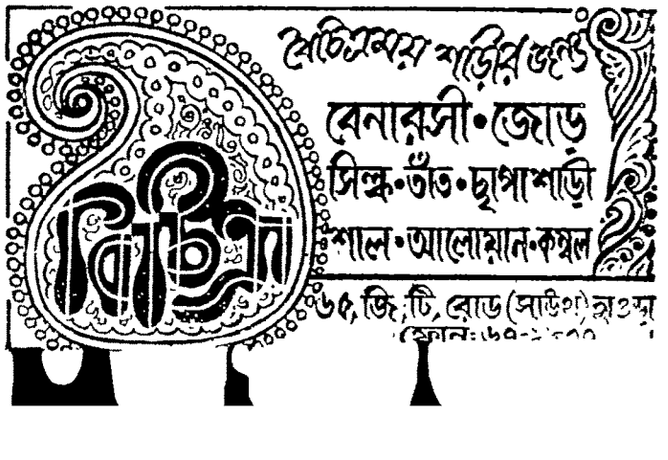

গণেশ হালুই

সে এক অন্য জগৎ। অলস মায়ার আলিম্পনে স্পন্দিত জগৎ। সে জগৎ মাধমময় মমতায় সাড়া জাগায় সজীব তৃণের বুকে। জলছবি আঁকে ধরার ধুলোয় কত না গভীর অন্বেষে। শব্দ লহরী ওঠে তরঙ্গের আঘাতে। সে সংগীতময় ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে হতে যেন মিশে যায় তরঙ্গিত বৃত্তের বলয়ে। প্রজাপতির পাখার মত হাওয়ায় মাটির বুকে একটি সবুজ পাতা কাঁপে শিরশির। বর্ষণসিক্ত সূর্যমুখীর গা বেয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে মুক্ত বিন্দুর মত। এই প্রাণচঞ্চল প্রাকৃতির সন্ধান পাই শিল্পী গণেশ হালুইয়ের চিত্রে। আত্মস্থ অনুভূতি চেতনার রংয়ে রঙ্গীন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ছবিতে। এই অনুভূতিই ছবির মূলে রহস্য। প্রাণবন্ত। এরই মধ্যে খুঁজে পাই শিল্পীর যথার্থ প্রাণের সাড়া। উষ্ণ উত্তাপ। শুধু বাইরের ফর্ম ও রূপের চমৎকারিত্বে গণেশের চিত্রকলা ছবির গায়ে সোনায় মোড়া ফ্রেমের মত অধিক গুরুত্ব-পূর্ণ হয়ে ওঠেনি কখনও।

বিষয় নির্বাচনে স্বাতন্ত্র্য সুপরিলক্ষিত। চিত্রে কেবল নিসর্গের ব্যাপ্ত পরিমণ্ডল চিত্রায়িত হয়নি। বরং অতি নগণ্য, অতি তুচ্ছকে নিজের সম্পূর্ণ সত্তা দিয়ে অনুভূতির স্পর্শে রঞ্জিত করেছেন। কোন কোন বিশেষ মুহূর্তে প্রকৃতি লীলার ফর্ম ও রঙের সংগৃহীত একটি একক রূপের অস্তিত্ব চিত্রে আভাসিত। এই দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপময়তার চেতনে অবচেতনে সাউন্ড, মিউজিক ও মুভমেণ্ট মিলেমিশে যেন এক ছন্দময় সুর রূপকে মূর্ত করে তোলে। কিংবা বলা যায় প্রাণচঞ্চল প্রকৃতির গতি সঞ্চারিত করে।

অতি সামান্য ঘটনা অসামান্য হয়ে ওঠে গণেশের চিত্রকল্পে। অপাংক্তেয় কোন জলজ উদ্ভিদ, লতাগুল্ম কিংবা কোন অতিশয় দীন, নামগোত্রহীন একটি ফুল কম্পিত দীপশিখার মত দাঁড়িয়ে থাকে মাটির বুকে। যেন বলে—ধন্য আমি, ধন্য আমি, মাটির পরে। মনে হয় এখানেই গণেশের স্বকীয়তা। স্বাতন্ত্র্য। তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি অতি সূক্ষ্ম। এবং সেই সূক্ষ্ম অনুভূতি অনেক ক্ষেত্রে বিকশিত হয়ে ওঠে সুচারুরূপে, শুধু গতি স্পর্শ ও শব্দকে সম্বল করে। সেখানে এক আধটি শাপলা বা শালুক ফুল, দু একটি বৃক্ষ, কয়েকটি তৃণই যথেষ্ট। গণেশের দৃষ্টি এ অর্থে 'মাইক্রোস্কোপিক'। তার কারবার সাধারণের দৃষ্টিবহির্ভূত সৃষ্টি লীলার কতিপয় নেহাৎই তুচ্ছ বিষয়কে নিয়ে। যা নিত্যই আমরা চোখে দেখি কিন্তু মনে ধরি না।

তাছাড়া গণেশের সামগ্রিক চিত্রচরিত্র ফুলের মত সুন্দর, শুচিশুভ্র শুভ্র। মর্তের মৃত্তিকার রোগ শোক জরা আর জীর্ণতার কোন আবেশ নেই। নেই কোন ধরার ধুলোর করুণ ব্যথাদীর্ণ জীবনের কাতর ক্রন্দনধ্বনি। কিংবা মৃত্যুর অমোঘ দৃঢ়তা, যা আমাদের জীবনের কনটিনিউটিকে ভেঙ্গে দেয়। এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করতে হালুই উত্তর দিলেন—গাছকে গাছ কাল যেমন বার বার চিনে নিতে হয় না। শিশু বয়স থেকেই এমনি কত অতীতের উপলব্ধি নিয়ে এক একটি মানুষের সত্তা। প্রকাশ্যের আড়াল এ এক অদৃশ্য জগৎ। তাই তোমার জগৎ নিয়ে তুমি—আর আমার জগৎ নিয়ে আমি। আমাদের চারপাশে মৃত্যুর বিভীষিকাও যেমন বিচরণ করে তেমনি জীবনের প্রাণশক্তিও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকে। এই সামঞ্জস্যতাই সব সৃষ্টির পূর্ণাবস্থা। ব্যতিক্রমে আঘাত, মৃত্যু, ধ্বংস। সকলেই এই অদৃশ্য জগৎটিকে একান্ত করে পেতে চায়। যে ছবি আঁকে, সে তাঁর ছবিতে, যে লেখে সে তাঁর লেখাতে। সকলেই তাঁর সেই আপন আপন জগৎটির সাথে নিজের প্রতিটি রচনায় এই অকৃত্রিম সামঞ্জস্যের যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে চলেছে। কেউ পারে। কেউ পারে না। যে পারল তাঁর সৃষ্টি যেমন আমার ভাল লাগে, তেমন তোমারও ভাল লাগে।

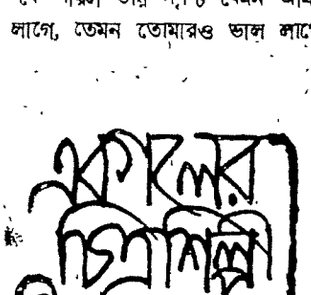

আমাদের মনের জানালা সহসা উন্মুক্ত হয়। খুঁজে পাই সেই জগতকে। প্রশস্তিতে মন ভরে উঠে। আর সেই যোগসূত্রেই খুঁজে পাই ছবির পরিপূর্ণতা।

চিত্রে দুঃখ, হতাশা ও আঘাতের আভাস না থাকলেও ব্যক্তিগত জীবনে গণেশ হালুই এ সবের মুখোমুখি হয়েছেন। এক সময়ে দারিদ্র্য ও বঞ্চনার নিষ্ঠুর কষাঘাতে জীবন কেটেছে রীতিমত লড়াই করে। জন্মেছিলেন ১৯৩৬ এর ১ জুলাই ময়মনসিং জেলার জামালপুর সাবডিভিসনে। বাড়ী ব্রহ্মপুত্রের এক নির্জন তীরে। বীরেন দে নামে এক শিল্পী আসতেন নদীর চরে ছবি আঁকতে। তিনি এলে দাদা বলতেন—আসন নিয়ে যা। বসতে দে'। আসন পেতে বসতে দিয়ে তাঁর পাশে বসে গণেশ তন্ময় হয়ে ছবি আঁকা দেখতেন। ডেভিড কক্স পেপারের ওপর ফুটে উঠত নদীর ঢেউ, বালির চর আরও কত কি! এ সব দেখেশুনে ছবি আঁকতে লোভ হত। স্কুলে গিয়ে আঁকতেন। পাড়ায় হাতেলেখা ম্যাগাজিনে অলংকরণ, লেটারিং ও ইলাস্ট্রেসনের কাজ করতেন। বাড়ির ভাড়াটে স্বর্ণকারকে দিয়ে বানালেন বোর্ড ও পেতলের পিন। জুতোর বাক্সের পেছনের পিজবোর্ড হল ড্রইং পেপার। এক বন্ধুকে দিয়ে কলকাতা থেকে আনালেন রঙ। বাড়ির পাশে ব্রহ্মপুত্রের নির্জন শান্ত নদীতীর বয়ে আঁকলেন নদী, নৌকা ও মাঝি মাল্লার কত না ছবি।

বাবাকে হারিয়েছিলেন বাল্যেই। দেশ বিভাগের পর পিতৃহীন বালক ভাসল অকূল পাথারে। বাস্তুহারা হয়ে ১৯৫০ সালে সপরিবারে এলেন এদেশের মাটিতে। পুনর্বাসন দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় ঠাঁই হল বিহারের রাজমহল ক্যাম্পে। সেখানে পুনর্বাসন দপ্তরের এক অফিসার ছবি

দেখে মুগ্ধ হয়ে হালুইকে সরকারী স্টাইপেণ্ডের ব্যবস্থা করে দিলেন। কয়েক মাস পর স্থানান্তরিত হলেন মোকামায়। দিন কাটে অর্ধাহারে, অনাহারে। কিন্তু ছবি আঁকার বিশ্রাম নেই। নিষ্ঠুর অভাব অনটনের ভেতরেও দু'চোখে ভাসে ছবির স্বপ্ন।

এমন করে আত্মসমর্পণ নয়। কিছু একটা করতে হবে। 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'। ভাব নিয়ে পালিয়ে এলেন কলকাতায়। আশ্রয় হল হাওড়া স্টেশনের বাংলা নম্বর প্ল্যাটফর্ম। সময়টা হবে সম্ভবত ১৯৫১ সালের জুলাই মাস। হাওড়া স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে জিজ্ঞেস করতে করতে পৌঁছুলেন চৌরঙ্গী রোডে গভর্নমেণ্ট আর্ট কলেজে। সৌভাগ্যবশত তখন ভর্তির সময়। ফর্ম ফিলাপ করে ঠিকানার কলমে লিখলেন—হাওড়া স্টেশন। প্ল্যাটফর্ম নম্বর ১২। ফর্ম জমা নেওয়ার মুহূর্তে অফিসের ভদ্রলোক হালুইয়ের মুখের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। হাত থেকে কাগজের প্যাকেট খুলে দেখলেন ওয়াটার কালারের কাজ। কোন কথা না বলে ছবি দেখে ফর্মে লিখে দিলেন—কমার্সিয়াল আর্ট। নৈহাটির মামার কাছ থেকে টাকা জোগাড় করে ভর্তিও হলেন। কয়েকদিন পরে অবশ্য বড়বাজারের চিনি পট্টীতে বাবার এক পুরনো খদ্দেরের গুদামে আশ্রয় মিললো। কিন্তু ত্রিশ টাকা সরকারী সাহায্যে কি কলকাতার মত জায়গায় খাওয়া ও রঙ তুলি কেনার খরচা চলে? তাই কমার্শিয়াল কাজ করতে হত। ছবিও এক আধটা করে বিক্রী হয়ে যেত সেই ছাত্রাবস্থাতেই বেশ মোটা অঙ্কে।

ছাত্র হিসেবে হালুই ছিলেন কৃতী। তাঁর কাজ কলেজের ভেতরে ও বাইরে সমাদর পেয়েছিল স্বল্পকালের মধ্যেই। কলেজ ও বাইরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রদর্শনীতে নানান পুরস্কার ও স্বীকৃতিও পেয়েছেন। ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত উপর্যুপরি তিনবার একাডেমি পুরস্কার লাভও তার মধ্যে মনে রাখার মত।

ওয়াটার কালারে হালুই দক্ষ শিল্পী। জীবনের প্রথম ভাগে তাঁর জলরংয়ের কাজ রসিক সমাজে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই সময়ে অঙ্কিত স্টেশন, নির্জন প্রান্তর, ওয়েস্ট টু পাটনা, জনাকীর্ণ শহর এবং নেপাল ও কুলুভ্যালী সিরিজের চিত্রাবলী রসিকের স্মৃতিতে অনেককাল সজীব থাকবে। পরবর্তীকালে 'ট্রান্সপারেন্ট' ওয়াটার কালারের কাজ আরও বেশী সাড়া জাগিয়েছিল। বরং বলা যায় শিল্পী হিসেবে গণেশ হালুইকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই অধ্যায়ের তিনটি চিত্র-মুহূর্তের গঙ্গার পাড়, পাহাড় ও বেলওয়ে ইয়ার্ডের কথা এখনও মনে আছে।

১৯৫৭ সালে আর্ট কলেজের পর্ব শেষ করার পর চাকরীও জুটে গেল সৌভাগ্যবশতঃ। আজন্তা গুহাচিত্র কপি করার কাজ। সেখানে গিয়ে কর্মসূত্রে প্রাচীন ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্যের একটি মূল্যবান অধ্যায়কে আত্মস্থ করার অবকাশ পেয়েছিলেন। কাজের

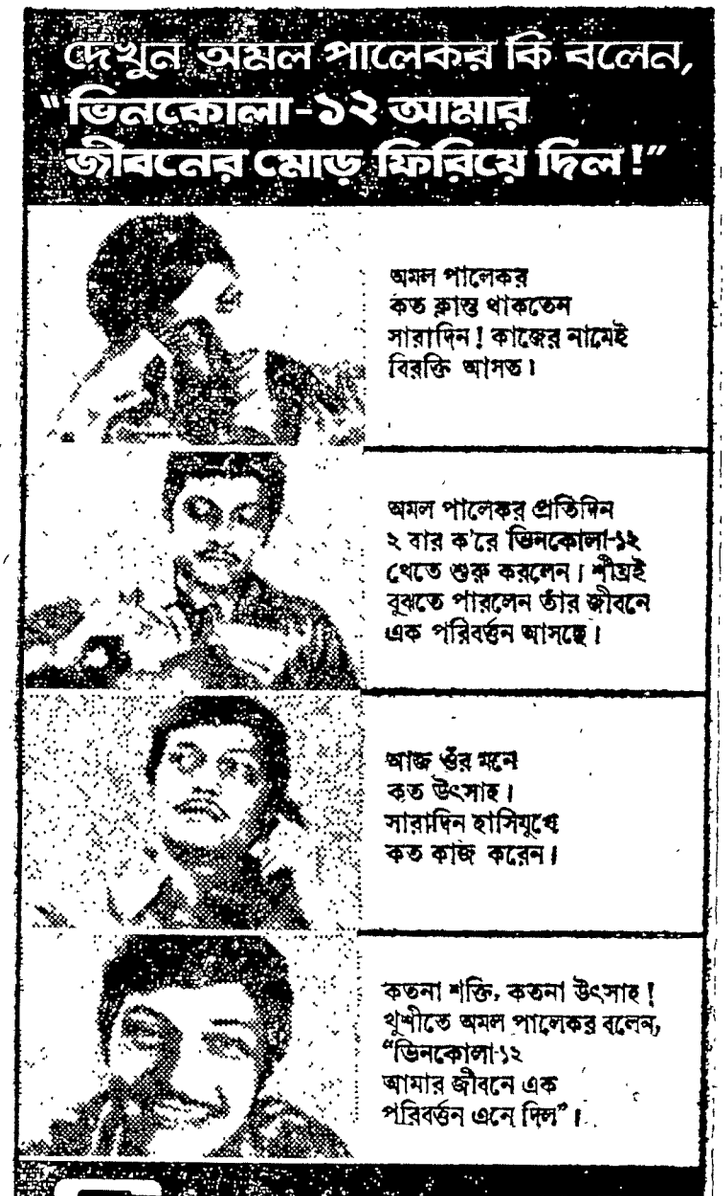

ফাঁকে আশেপাশের গ্রামে বেরিয়ে পড়তেন ড্রইং করার অভিপ্রায়ে। কিন্তু কপি করার কাজ বেশী দিন ধাতে সইল না। ফিরে আসার আগে অজন্তা গুহা চিত্রের ওপর একটি গবেষণামূলক কাজ করে এসেছেন। যা গুহাচিত্র সম্পর্কে আমাদের হয়ত নতুন কোন তথ্যের সন্ধান দিতে পারে। যাই হোক, ১৯৬৩ সালে কলকাতায় ফিরে এসে অকটোবর মাসে সরকারী আর্ট কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হলেন।

বাইরে থাকার ফলে চলতি শিল্প ধারার সঙ্গে তাঁর যোগ প্রায় ছিল না বললেই চলে। কলকাতায় এসে খেই হারিয়ে ফেললেন। হালুইয়ের শিল্পীমন তখন নিত্যনতুন অনুসন্ধানে ব্যস্ত। দাঁড়িয়ে যাওয়াতেই তাঁর আতঙ্ক। থেমে থাকাতেই তাঁর ভয়। শিল্পীর নিজের কথায় বলি—অজন্তা থেকে ফিরে এসে অজন্তা ঢং-এর ফিগারেটিভ লাইন ড্রইং-এর কাজ করতাম। সাড়াও যথেষ্ট পেয়েছি। কিন্তু খুব বেশী দিন খুসী হতে পারিনি। নিজের অনুভূতি ও উপলব্ধি সচল ও গতিময় করার আশায় ল্যান্ডস্কেপ করেছি। এখনও ল্যান্ডস্কেপ করছি। ভাল লাগছে। ভাল লাগার কারণ হল এতে মুভমেন্ট ও মিউজিক দুই-ই আছে। এই পর্যায়ের চিত্রকলা গ্রামবাংলার প্রকৃতিকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ক্যাকটাস, নুন, দি ফ্রেণ্ড এন্ড দি ট্রীস, অতীতের স্মৃতি, সাউন্ডলেস মিউজিক, সিম্ম গাছ, ঝড়ো হাওয়ায় আন্দোলিত কদলী বৃক্ষ প্রভৃতি উল্লেখ্য। এসব চিত্রকর্মে ছোট ছোট সঙ্কেত মূলক রেখার ব্যবহারে ক্যালিগ্রাফিক জাতীয় রচনা রীতির প্রবণতা দেখা যায়। এবং ঐ ছোট ছোট স্ট্রোকের মাধ্যমে চিত্রকে সচল ও গতিশীল করে তোলার প্রচেষ্টাও সুপরিকল্পিত।

চিত্রকরদের বড় সমস্যা ছবিতে কোথায় থামতে হবে এবং কোথায় এর শেষ। এ প্রসঙ্গে হালুই-এর অভিমত—প্রত্যেক শিল্পী তাঁর সৃষ্টির ভেতর দিয়ে আপন আপন নিভৃত জগতের সঙ্গে একাত্ম হতে চায়। এই একাত্মভাবেই তাঁর পরম চরিতার্থতা। পরম আস্বাদন। যে মুহূর্তে ছবি তাঁকে ওই জগৎটিকে এনে হাজির করতে সমর্থ হল—চাকিতে মন সাড়া দিল, বলে উঠল—থাম, থাম, তুমি পেয়েছো। যে সত্যি কারের সার্থক তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতিতে এ সাড়া ধরা দেয়। সে যথার্থই সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করে। কিন্তু এই সাড়াকে প্রায়ই আমরা আমাদের ছবিতে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে গিয়ে অনুভব করি না। ফলে শিশুমনের সরল স্বাভাবিকতা বুদ্ধির গোলকধাঁধায় পড়ে যথার্থ স্থানে পৌঁছনোর পূর্বেই কিংবা অতিক্রম করার পরেই ছবির সমাপ্তি ঘোষণা করে। ভাবে পেয়েছি। একে আমরা এক কথায় জোর করে নিজেকে ছবির মাধ্যমে সেই জগতের সাথে সংযোগ স্থাপনের দুরূহ চেষ্টা বলতে পারি। আর প্রকৃত অনুশীলনের স্বল্পতা, সূক্ষ্ম অনুভূতির অভাব এবং আশা ও মোহের আচ্ছন্নতাই সকল সৃষ্টির প্রকৃত পরিপূর্ণতার অন্তরায়।

শিল্পী থামতে জিজ্ঞেস করি শিল্পীর প্রকৃত আত্মোপলব্ধি কি? উত্তরে বললেন—যা সহজ তাই সুন্দরম যা সুন্দর তাই সত্য। জীবন, মৃত্যু, সৃষ্টি বা লয় সবই একক সত্যে অন্তর্নিহিত একটি পরম আনন্দলোক। নিত্য পরিবর্তনশীল নিয়মের অন্তর্গত এই সত্যটিকে উপলব্ধি করতে হলে আত্মার সাথে পরমাত্মার যোগ ও চেতনার সাথে চৈতন্যের সংযোগ স্থাপনই হল সব সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য। শুধুমাত্র বাইরের আবরণ, যুক্তির বেড়াজাল কোন সমাধান করতে পারে না। ছোটবেলায় যা ছিল সহজ তাই আজ অতোধিক জটিল হয়েছে। অনায়াসেই যা ধরা দিত বুদ্ধির বিচারে তাকে সরিয়ে রেখেছি অনেক দূরে। সত্য ধরা দিতে চায়। আমাদের চেতনাও তাতে বিলীন হতে চায়। এই দুয়ের মিলনই শিল্পীর ছবিতে, কবির কবিতায়, গায়কের গানে সত্য রূপটি তুলে ধরতে চায়। যা কিছু দৃশ্যমান তার আবরণের অন্তরালে সেই নিভৃত সত্যটিকে খুঁজে পাওয়াই হল প্রকৃত শিল্পীর আত্মোপলব্ধি।

জলরং হালুইয়ের প্রিয় মাধ্যম হলেও তিনি তেলরং, টেম্পেরা ও ওপেক মিডিয়ামেও কাজ করে থাকেন। মিউরাল ধর্মী কাজের মধ্যে ফাইং ফিগার উইথ-এ মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট এবং বোম্বাই ইণ্ডিয়ান ট্রেড রসোত্তীর্ণ। প্রতিকৃতির মধ্যে মাই সিসটার আশুতোষ সেনগুপ্ত, কয়েকটি কিশোরীর মুখ সার্থক, সুন্দর। তবে তাঁর ইদানীং কালের কাজগুলোর মধ্যে ডাক, ভয় ভয় করতাম, তিন পুরুষ, মধ্যবাত্রি, খেয়াপার প্রভৃতি যেন অপিকতর সিমপ্লিফিকেসনের দিকে যাচ্ছে। সঙ্কেতময় দ্রুতচারী টুকরো টুকরো রেখা ধ্বনির ব্যঞ্জনা ও গতিময়তায় আকীর্ণ। আর শান্ত শব্দময় শীতলতা ছড়িয়ে থাকে ছবির দেহজুড়ে। সেই স্নিগ্ধ প্রশান্তি ও প্রসন্নতায় তাঁর চিত্রকে কোন কোন সময় মায়াবী নদীপারের দেশ বলে বোধ হয়।

গণেশ হালুই ভালবাসেন তিন ঠাকুরের ছবি। বললেন—অবন ঠাকুরের ছবিতে রসের ব্যাখ্যা করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে রং ভালো লাগে। গগন ঠাকুরের চিত্র মর্তলোকের বাইরে এক অতীন্দ্রিয় জগতকে ভাবতে শেখায়। নন্দলালের চিত্রে প্রকৃতি ও মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা মনে গভীর দাগ টানে। রামকিঙ্করের ভাস্কর্যে প্রকৃতির সঙ্গে যে একটা স্বতঃস্ফূর্ত যোগ খুঁজে পাই তার যেন কোন মাপকাঠি নেই। বিদেশী চিত্রকরদের মধ্যে পল ক্লের ডাইনামিক অ্যাপ্রোচ, স্কোনবেনস্কীর কনসট্রাকটিভ কাজ এবং গ্যাবো সিমবলিক অ্যাপ্রোচ। বত্তিচেলীর হিউম্যান এবং নেচারের ওপর কাজগুলো মনে ঢেউ তোলে।

গণেশ হালুইকে জিজ্ঞেস করি, আপনার চিত্রে শৈশব স্মৃতির ছাপপাত হয়েছে কতটা? কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে জবাব দিলেন—ছোটবেলার অনেক ঘটনাকে আমরা এই বিচার বুদ্ধিতে উপেক্ষা করে নিজেকেই অনেক সময় উপহাস করে থাকি। অথচ শৈশবে আমরা প্রকৃতির প্রভাব কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারি না। শৈশবের বিচিত্র খেলাধূলার মধ্যে উন্মুক্ত প্রাণের উৎসাহ ও সারল্য থাকে। শিশুর কৌতূহলী দৃষ্টিতে যে জগৎ একদিন তাকে সম্মোহিত করেছিল, পরবর্তী জীবনে কৃত্রিম পরিবেশেও প্রচ্ছন্নভাবে শৈশব স্মৃতি তার চিন্তা-ভাবনাকে প্রভাবিত করে।

প্রশান্ত

উপন্যাস

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আদ্য শেষ রজনী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আমি তো আসিনি।

আসিনি মানে! এইতো এসেছেন। এক কাপ চা খেয়ে যান।

এইতো খেলাম চা।

আর এক কাপ খাবেন। চা খেলে তো বেশি কিছু নয়।

শশাঙ্ককে একদম সাজঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালো চন্ডী। এলাহিকাণ্ড। সব দেখে শশাঙ্কর তো চক্ষুস্থির।

আতো সব কবে হল?

আপনি থেয়েটারের লোক। আপনি বদর দেবেন শশাঙ্কবাবু। দোতলা তেতলার ঘর গেঁথে তোলা হবেছে পঞ্চমুখের। গ্রীনরুমে এখন সবার জন্যে আলাদা আয়না, আলাদা পাখা। ঠান্ডা কিছু খাবেন?

দিন। বলেও শশাঙ্কর নিজেকে বড় দীনহীন লাগতে লাগলো। তখন চন্ডী ডাউস ফ্রিজের ডালা খুলে তার জন্যে ঠান্ডা লেমন-বার্লি বের করছে।

এ বাথরুমটা কার?

যাবেন?

না। একদম নতুন।

অমিয়বাবুর জন্যে তৈরি হয়েছে। ওপাশেও একটা তৈরি হয়েছে। রজনী দিদিমণি আর অন্য মেয়েদের জন্যে।

ঠান্ডা লেমন বার্লি খেতে খেতে শশাঙ্কর চোখ চারদিক দেখছিল। আগাগোড়া একটা গোছানো হাতের চিহ্ন। জায়গামত সিন বাই সিন কসস্টিউমের হ্যাঙ্গার ঝুলছে। ইলেকট্রিক ইস্ত্রির জায়গা। বিরাট দুটো পাখা দাঁড়িয়ে। সামান্য বাতাসে অমিয়র মেকআপ নেওয়ার হাইটেবারের পাশের ভারি পর্দাটা দুলে উঠলো। শশাঙ্ক দেখলো ভেতর দিকে একজোড়া বাঙ্কার ইজিচেয়ার। একখানা ডবল বেডের পালঙ্ক। তাতে গাঢ় লাল রংয়ের সুজনি পেতানো জানলা থেকে আলো পেয়ে ঝক ঝক করছে।

গ্লাসধরা শশাঙ্কর হাতখানা ঠান্ডা হয়ে গেল। আমি উঠি চন্ডীবাবু।

বসুন না। আপনি আর আমি তো থিয়েটারের পুরনো লোক।

আমি আর কোথায় থিয়েটারের চন্ডীবাবু! আপনারাই—

আমি আর যাবার জায়গা পাইনি কোথাও। থিয়েটারে থেকে গেলাম এ জীবনটা—

কদিন হল আপনার?

বত্রিশ বছর। এখন যে দলেই থাকবো—আমার জন্যে একটা বিট রোল তৈরি হবে। আমি আজকাল সুজাতায় সেকেন্ডের ভেতর হাউ হাউ করে কেঁদে উঠি। জিনিসটা অডিয়ান্স খুব খায়। এই ফতুয়া গায়েই স্টেজে ঢুকে পড়ি। এ ফতুয়া পরেই রাতে শুয়ে থাকি। সাজঘরই আমার বাসরঘর বলতে পারেন।

দিব্যি কাটিয়ে দিলেন বলুন।

আর কাটবে বলে মনে হচ্ছে না। অমিয়র মাথায় ভূত চেপেছে। এ নাটক তুলে দেবে।

রজনী কি বলছে?

আপনার স্ত্রীর জন্যেই তো এ-নাটক টিকে আছে। আমরা বাকি সবাই টিম ওয়ার্কের সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছি শুধু। দশ রজনীও একদিন বেঁকে বসতে পারে। যতই বকসঅফিস হোক—একঘেয়ে তো।

চন্ডীর মুখে 'আপনার স্ত্রী' কথাটা শুনে অনেকদিন পরে বড় ভালো লাগলো শশাঙ্কর। তার শ্বশুর, শাশুড়ি, স্ত্রী—সবাই তো থিয়েটারের। সে নিজেও এতকাল থিয়েটারের অন্নে পালিত। তার ছেলে-মেয়েরও ওই একই অন্নে বড় হয়ে উঠেছে। থিয়েটার তার শ্বশুরবাড়ি। থিয়েটারের সে ঘরজামাই।

মন্দ লাগছিল না সকালবেলাটা। শশাঙ্ক ভাল করেই জানে—রজনীর সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ির খবর এই চন্ডী লোকটার অজানা নয়।

আমাদের সময়টা ভালো যাচ্ছে না শশাঙ্কবাবু।

শশাঙ্ক তো এসবই শুনতে চায়। কিন্তু কোন আগ্রহ না দেখিয়ে কান খাড়া করে বসে থাকলো। মুখে দার্শনিকের টাচ দিয়ে বললো, সময় তো সবসময় একরকম যায় না।

সুজাতার স্টোরি বইটার বিনয়বাবু ছোট আদালতে মামলা দিয়েছে। ভরত হলের শ্রীরাম ট্রাস্ট উচ্ছেদের মামলা চালাচ্ছে। ইলেকট্রিক সাপ্লাই লাইন কাটবো কাটবো করছে। ইনকাম ট্যাক্সের লোকের ঘোরা-ঘুরি তো আছেই—

অমিয়বাবু কদ্দিক সামলাবেন একা।

চন্ডী বললো, এই শরীরে বোজ সকাল-বেলা কাগজপত্তর হাতে গিরীশ ঘোষের টত উকিল বাড়ি করছে।

অমিয়বাবুর শরীর খারাপ? কাথায়? জানি না তো।

খোঁজ নিলে তো জানবেন। রজনী দিদিরও তো শরীর ভালো না গলা বসে যাচ্ছে। ডাক্তার ছ মাস রেস্ট নিতে বলেছে।

এখানে শশাঙ্ক আর কিছু বলতে পারল না। তার নিজের স্ত্রীর খবরই সে কিছু রাখে না। মনো বা সরী কেউ তো কিছু বলে নি তাকে। হ্যাঁ, না—কোনটাই এখন সে বলতে পারছে না। ওদের দুঃসংবাদগুলো শশাঙ্কর কানে মধু হয়ে ঝরে পড়ছিল। মনে মনে বলছিল, এই তো চাই। গ্রুপ থিয়েটার যখন বড় ব্যবসা হয়ে যায়—তখনই তো এসবের শুরু হয়।

চন্ডী বললো, এর মাঝে নন্দনা দিদি আবার যাত্রায় কেটে পড়ল। ফলে আপনার স্ত্রীকে আর বেস্ট জুটলো না কপালে।

শশাঙ্ক উসখুস করছিল। এখন তার ওঠা দরকার। কারণ, আজ যদি সুজাতা নাটকে হিরোইন সকাল সকাল হাউসে এসে দেখে তারই খেদানো স্বামী গ্রীন-রুমে বসে তারই ফ্রিজের রোমান বার্লি খাচ্ছে, তাহলে ব্যাপারটা কোথায় গড়াতে পারে?

শশাঙ্ক চেয়ার থেকে একদম লাফিয়ে বেরিয়ে এল। আরেক দিন আসবো চন্ডী-বাবু।

এদিক এলে আমাদের খোঁজ নিয়ে যাবেন অবশ্য। আমি আপনি—আমরা সব থিয়েটারের লোক। আমরা আত্মীয় সবাই। কি বলুন।

বেরিয়ে এসে চন্ডীর কথাগুলো আদৌ বেসুরো আলাপ বলে মনে হল না শশাঙ্কর। আজ যদি তৃপ্তি বেঁচে থাকতো! লোকটা কিন্তু অন্যের মুখে সুখী হোত। দুঃখে দুঃখ পেত। পঞ্চমুখের উল্কা দাঁড়ানোর খবর শুনে কিন্তু সুখীই হোত তৃপ্তি।

কিন্তু রজনীর জন্যে কী যে হয়ে গেল লোকটার। কোন লুকোছাপা ছিল না। শশাঙ্ককে পরিষ্কার বললো, তোর বউকে আমি ঠিক বিশ্বে করতাম।

তোমার তো সংসার রয়েছে তৃপ্তিদা।

গুলি মারো সংসার। সংসার তো রঞ্জনীরও আছে—

ঠিকই তো। কী করে বিয়েয় বসবে তোমার সঙ্গে?

গুলি মেরে চলে আসুক।

তাহলে তো আমাকেই গুলি খেতে হয় প্রথম। আমি রঞ্জনীর হাজব্যাণ্ড।

কি বললি শশাঙ্ক? আরেকবার উচ্চারণ করতো।

হাজব্যাণ্ড। কেন?

তুই হাজব্যাণ্ড রঞ্জনীর? বাই অ্যাকসিডেণ্ট। যা সত্যি তাই বলবো।

কেন? আমায় মানায় না তৃপ্তিদা?

আবার দাদা-ফাদা কি? শুধু তৃপ্তি। তুই আমার বউকে বিয়ে কর। সেখানেও ছেলেপেলেসুদ্ধু সংসার পাবি। রঞ্জনীকে ছেড়ে দে।

তুমি খুব পরিষ্কার লোক, এজন্যে বেশ ভালো লাগে তোমায়। কিন্তু রঞ্জনীকে আমি ছাড়াব কে? সে তো আমায় নাও ছাড়তে পারে।

তোমার জন্যে ডালা সাজিয়ে বসে আছে! বাজারের রোজগারে খাস—তোর লজ্জা করে না?

আমি তো কোন কাজ জানি না। তোমার মত ইজি সলিউশন কজন পারে এ-বাজারে! শশাঙ্ক তার নিজের মুখের এই পুরনো কথাটাই বিড় বিড় করে বলতে, বলতে ট্রাম লাইন পার হোল।

।। উনিশ ।।

থার্ড সিনে অমিয় সাত মিনিটের একটা রেস্ট পায়। তখন। বড় পাখাটার নিচে বসে এক কাপ গরম কফি আর ট্যাবলেট খেল দুটো। ডাক্তারের কথামত চলতে হচ্ছে এখন তাকে। ঠিক সেই সময় যতীনবাবু এসে হাজির।

ড্রয়ার থেকে কাগজ মোড়া প্যাকেটটা তার হাতে তুলে দিল অমিয়।

কত আছে?

পাঁচশো। এখন এই নিয়ে যান। আর পারছিনে। পরে দেখা যাবে।

বড় আশা করে এসেছিলাম তোমার কাছে অমিয়। তুমি আমার পুরনোকালের থিয়েটারের লোক। মেয়ের বিয়ে বলেই হাজার টাকা চেয়েছিলাম। কোন উপায় থাকলে চাইতাম না। আজকাল তো কাজ পাই না কোথাও।

চণ্ডী এসে অমিয়কে উদ্ধার করল। প্রায় দাঁত খিঁচিয়েই বলল—পেয়েছেন কি আপনারা? সিনের ভেতরে এসে সাহায্য চাইবেন? নাটক বকস অফিস বলে পাখির মেলা বসেছে গাছে! এখনকার মত ওই নিয়ে যান। যান এখন।

অমিয় চোখ নামিয়ে বসে থাকল। না থেকে উপায় ছিল না। কপালের ঘাম তুলো দিয়ে শুষে নিচ্ছিল চণ্ডী। পায়ে মেক-আপ লেপটে যায় ঘষাঘষিতে।

আমাদের অবস্থা বড় ভালো চণ্ডীদা। সবাইকে দিয়ে থুয়ে আমার কপালে জোটে বদনাম আর পণ্ডশ্রম। তবু কাউকে খুশি করতে পারি না।

যাও কেন খুশি করতে। কী দরকার?

আমি থিয়েটার গুটিয়ে যাত্রায় চলে যাব। মাস গেলে পাঁচ হাজার টাকা মাইনে। বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা বয়ালটি। কারও সাত পাঁচে থাকতে হবে না। খাবো-দাবো ঘুমোবো আর স্টেজে উঠে চেঁচাবো।

তাই ভালো। কারও জন্যে কিছু করে খুশি করতে পারবে না।

সেটা সত্যি। বলেই অমিয় থ্রি বাই ফাইভ মেক-আপ লাগাতে লাগলো। মনে পড়ল—বন্যাত্রাণ ভাণ্ডার, দুস্থ শিল্পীদের জন্যে তহবিল খরায় রিলিফের জন্যে সে থোকে থোকে পঞ্চজনের হয়ে নানাবকমের ফাণ্ড কত টাকা দিয়েছে। দিয়ে কাউকে খুশি করা যায়নি। বরং উল্টো ফল ফলেছে। অ্যাকাডেমিতে কাউন্টার খুলে অভিনয় করতে গিয়ে দেখা গেল তিন ঘন্টায় সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। পরিনাম: অন্য দলগুলো আর তার সঙ্গে কথা বলে না। বড় কাগজগুলো বিজ্ঞাপন নেয়। কিন্তু রিভিউ করে না। নির্বাক। নীরব। বাঙ্গালীর চরিত্রই আশ্চর্য। চোখের ওপর এমন সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে—তা তে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। বিদেশে কোন নাটক মঞ্চ সফল হলে—তা একটা খবর। আলোচনার বিষয়। এখানে চিতায় মড়া তোলাই রেওয়াজ। এখানে আন্ডারডগকে নিয়ে মাতামাতি করাই প্রথা। আন্ডারডগের ভেতর প্রতিভা সিনিয়াস্ই আছে কিনা তা কেউ খতিয়ে দেখবে না।

বিনা সম্ভোগপচারে
অর্শের
জ্বালা-যন্ত্রনা
থেকে
দ্রুত আরাম
পেতে হলে
হ্যামেসা
মলম
ব্যবহার করুন!

অমিয়র কান খাড়া ছিল মিউজিকের দিকে। জায়গায় মত ডানদিকের এক নম্বর উইংস দিয়ে এন্ট্রান্স নিল। হাউজফুল। আজও একশ্টা চেয়ার দিতে হয়েছে। স্টেজে ঢুকেই আশ্চর্য হল। একদম ফ্রন্ট রোয়ে ডানদিকে দু নম্বর সিটে শশাঙ্ক দত্ত বসে আছে।

নির্বিকার চোখে সব দেখে নিয়েই অভিনয় করতে হয়। অমিয় তাই করলো। রঞ্জনী সম্ভবত দেখতে পায়নি। পেলে উনিশ-বিশ কিছু হত না। এতদিনের অভিনেত্রী। তবু মনের ওপর চাপ পড়তো নিশ্চয়।

শোয়ের পর অমিয় বলল—শশাঙ্ক আজ দেখতে এসেছিল।

জানি।

তুমি দেখতে পেয়েছিলে?

হুঁ। আরও দেখতে আসবে। ঘন ঘন আসবে। এবারে খুলে বলল রঞ্জনী। ও আবার দল করতে চায়। আমাকেও চায়। কোথেকে ফাইনানসিয়ার জুটিয়েছে বলছে।

তুমি চলে যাবে নাকি?

পাগল হয়েছো! দল গড়া তোলার লোক ও নয়। বরং ভাঙতে পারে। আমার কথা বলে কোন মাড়োয়ারি হয়ত লাগিয়েছে। ওর তো গুণের কোন ঘাট নেই। আমাকে বলতে এসেছিল।

তা শশাঙ্কবাবু তো আমাদের পঞ্চমুখে জয়েন করতে বলেন।

সেইটেই বাকি আছে। ও যে দলে ঢুকবে—সে দলই ভেঙ্গে যাবে।

মানুষটা পাল্টাতেও তো পারে।

পল্টালে সবার আগে টের পেতাম আমি। আমি যে ওকে চিনি এতদিন। হয়তো ইচ্ছে হয়েছে দল করার। হয়তো ফাইনানসিয়ার পেয়েছে। দল হোল। তারপর যেই দেখবে দলের ভেতর আমি বড় হয়ে উঠছি—নিজের ছায়াটা ওর ছোট লাগছে—অমনি ও নিজেই দলের ভেতরে আর কাউকে সঙ্গে নিয়ে সুড়ঙ্গ কাটতে শুরু করে দেবে। এ যে আমি জানি অমিয়। এখন তৃপ্তি নেই। তাই আমাকে অপমানের জায়গাও আর ও পাচ্ছে না—বড্ড অসুবিধেয় পড়ছে। নইলে শশাঙ্ক বসে বসে নাটক দেখার মানুষ?

ফাইনানসিয়াররা জানে শশাঙ্ক তোমার স্বামী?

তা জানবে না কেন? কোর্ট বাছারিতে এখন ফাইনানসিয়ার ঘোরে। কে যার নিবিরে আর। সরকার যেভাবে বালোটাকার টুঁটি চেপে ধরেছে তাতে ওদের এছাড়া উপায় কি? টাকা তো কোথাও লাগাতে হবেই। সিনেমা থিয়েটার মেয়েমানুষ জায়গা জমি—

চুপ কর রঞ্জনী। পৃথিবীটাকে আমার ডাস্টবিন লাগে। ভেতরে খুললেই শুধুই নষ্ট।

অমিয় অন্যদিনের তুলনায় সকাল সকাল বাড়ি ফিরে দেখলো লীনা খুব মন দিয়ে

জানলার পর্দা সেলাই করছে। বড়ছেলে একমন দিয়ে অ্যালজেব্রা কষছে। কথাবার্তা বললে শুধু জবাব দেয় লীলা। নিজের উৎসাহ কিছু করে না। বলে না।

অমিয় খানিক জানলায় বসে থাকলো। অন্য নাটক শুরু করার আগে নেপথ্যবিলাসিনী এই মহিলার উৎসাহই দেখা যেত সবচেয়ে বেশি। এখন?

ছেঁড়া পর্দা সেলাইয়ের দরকার কি লীলা? নতুন করে নিলেই তো ভালো হোত।

সেলাই মেশিনের হ্যান্ডেল ঘোরাচ্ছিল লীলা। চোখ সূচের ওখানটায়। নতমুখী। ইলেকট্রিকের ভোল্টেজ পালটাচ্ছে বলে আলো কিছু কম। আমার মনে একটি প্রাচীন প্রশ্ন জেগে উঠলো। নারী ও পুরুষ করে থেকে একসঙ্গে আছে। সভ্যতার গোড়াপত্তনে মুনের ভাবগুলো মানুষ স্পষ্ট করে প্রকাশ করতো। এখন তা হয় শুধু নাটকে। সলিলকিতে। নয়তো সবাই আমরা মনের ভাব চেপে রাখতে সদা সতর্ক।

পথসা তো আসছে লীলা। আপনা-আপনি হেঁটে হেঁটে চলে আসে।

ও পথসা তোমার নাটকের। এ সংসার তো আগে কোনদিন থিয়েটারের আলো চালেনি।

অমিয় ভেবে দেখলো কথাটা তো মিথ্যে নয়। বরং সংসারের পথসা থিয়েটারে চলে গেছে। আগে নাটক নামার মুখে বাড়িতেও সাজো সাজো রব পড়ে যেত। স্কুল থেকে ফিরে লীলা খোঁজ-খবর নিত। নাটক উপলক্ষে এমন কি দু-একটা নতুন রান্নাও রেঁধেছে।

লীলার কপালে মাথায় কালো চুলের ঢাল মানানসই বসানো। এতদিনের টানাটানির সংসার চালিয়েও মুখখানা লীলা বেড়োটে হতে দেয়নি। বরং এখন সে মুখে তেজের চিহ্ন। তার সঙ্গে বিষণ্ণ ভাবটা মিশে গিয়ে একটা নতুন রহস্য পেয়েছে সে মুখ।

অমিয় এখুনি বলতে পারে: জানো লীলা রজনীকে জড়িয়ে তুমি শুধু শুধুই আমার সম্পর্কে নানারকম ভেবে যাচ্ছো। আসলে কিছুই হয়নি। হয়েছে যা—তা হল—আমার আর রজনীর কাছে বেড়েছে। রজনী একনিষ্ঠ দরদী মানুষ। সে তার জীবন থেকে শঙ্খকে ঝেড়ে ফেলেছে। কিন্তু আমাকেও তার জীবনে সে নিতে পারবে না। কারণ আমাকে ভালবাসে। সেই সূত্রে তোমাদেরও।

আমি তোমার লীলা। তুমি আমায় নিতে ভুল যাচ্ছো। তোমার নিজের জন্য। নয়তো আমি তো বদলাইনি। যা ছিলাম তাই আছি। সন্দেহ তোমার বাড়ি বড়ো দাঁড়িয়েছে। আমি তো তোমাকে চাই।

এসব কোন কথাই অমিয় বলতে পারলো না। রাত দশটায় ঘুমের প্রচণ্ড আক্রমণে সে কাবু হয়ে গেল। লীলা যখন তাকে তুললো ছেলেমেয়েদের ঘর অন্ধকার।

ওরা খেয়েছে?

অনেকক্ষণ। খাবে এসো।

এরকম ডাক পেলে অমিয়র ভালোই লাগলো। চোখ মুখে জল দিয়ে এসে বসলো।

তুমি খাবে না লীলা?

খিদে নেই। তুমি খেয়ে নাও।

একা একা আমি খেতে পারিনে।

আমি বসছি।

কলের পুতুলের কায়দায় লীলা কাছাকাছি বসলো। মুখে কোন হাসি নেই।

অমিয় খানিকটা ভাত মেখে দু-তিন গ্রাস খেয়েই উঠে পড়লো। লীলার মুখে কোন ছায়া পড়ল না। তার দিক থেকে ভালো করে খেয়ে ওঠার কোন অনুরোধও পেল না অমিয়। লীলা দিব্যি থালা তুলে নিয়ে জায়গা মুছে ফেললো। পান সেজে অমিয়কে দিয়েই মশারি টানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

আরও রাতে অমিয় লীলাকে কাছে আনতে গিয়ে দেখলো—দিব্যি কবাতকলের কাঠের গোলাইয়ের মতই লীলা তার দিকে গড়িয়ে এল। এভাবই কাঠ লরি থেকে নামে। আবার লরিতে ওঠে।

তোমার কি আজকাল আমাকে ভালো লাগে না?

ভালোমন্দ বুঝি না। ছেলেমেয়ে রান্না-বান্না স্কুল নিয়ে আছি।

আমি তোমার হিসেবের বাইরে পড়ে গেছি।

অনেক রাতে অমিয় লীলাকে সবচেয়ে সহজ রাস্তা দিয়ে পাওয়ার চেষ্টা করলো। যে-পথে মানুষ মাত্রেই ধরা দিতে থাকে। ঘুমের ভেতর লীলা অসাড় হয়ে পড়েছিল। অমিয় খুব যত্ন করে চুমু খেয়ে দেখলো, না সেই বউই তো আছে। তখনো হারানো জিনিসে দখল বজায় রাখার তাগিদে মানুষ যা করে—অমিয় তাই করলো। সঙ্গে সঙ্গে লীলা অমিয়কে নামিয়ে দিল ভালো লাগছে না—

অমিয় চুপ করে থাকলো। আমার এ অধিকারটাও হারিয়ে বসে আছি। মনে মনে নিজেকে এই প্রশ্নটা করে অমিয় অন্ধকারে মশারির ছাদের দিকে চোখ খুলে তাকিয়ে থাকলো।

একসময় দেখলো লীলা উঠে যাচ্ছে। খানিক শুয়ে থেকে বুঝলো তার বিবাহিত স্ত্রী এখন বিছানায় ফিরবে না। অমিয় উঠে এসে ঝুল বারান্দায় লীলাকে পেল। রাস্তার আলো পড়ে একদম পাথরের মূর্তি। চোখে জল।

শুধু শুধু কাঁদছো লীলা।

আজকাল কাঁদতে আমার ভাল লাগে।

আর কি ভালো লাগে লীলা?

প্রকাশিত হ'ল

পকেট বই

চম্বলের আতঙ্ক

চিরঞ্জীব সেন । ৩·০০

চম্বল উপত্যকার দুর্ধর্ষ দস্যু মানসিং-এর সহচর অচল সিং-এর রোমহর্ষক কাহিনী। ১৬০ পৃষ্ঠার ডবল ডিমাই সাইজ বোর্ড-বাঁধাই বই যার দাম হবে বর্তমানে দশ টাকা। কোনও লাইন বাদ না দিয়ে স্মল পাইকা ডবল ডিমাই ২৪ পেজি ফর্মা এন্টিক কাগজে ছেপে মাত্র তিন টাকায় দিচ্ছি। জুস সেলাই আর্ট বোর্ডে তিনরঙা লাইন হাফ-টোনে অচল সিং-এর ফটো দিয়ে কভার। গ্লস করা।

এই বইখানি যিনি আমাদের কাউন্টার থেকে পুরো দামে কিনবেন তাঁকে ইতিপূর্বে প্রকাশিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস চাঁপাডাঙ্গার বৌ ২·৫০-র পকেট বইখানি মাত্র এক টাকায় দেওয়া হবে।

কমলকাটা পাবলিকেশনস । ১৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলি-১২

কাগজে অ্যাকসিডেন্টের খবর। দার্জিলিংয়ের ধস নেমেছে বলে খবর বেরোলে আমি অনেকক্ষণ ধরে পড়ি। পড়তে ভালো লাগে আজকাল।

আর কি ভালো লাগে?

ট্রেন দুর্ঘটনা। কাছাড়ের বন্যা। চাসনালার খনিতে প্লাবন। তুরস্কে ভূমিকম্প—

কী হচ্ছে লীলা?

চেঁচিও না। আগেজানতাম, সংসার চালু রাখতে আমার চাকরি। নাটক করতে তোমার উদ্‌বাস্তু পরিশ্রম। এখন তো সব মিথ্যে হয়ে গেছে। আর মানে হয় না!

কেন?

তুমি যে টাকা দাও সংসারে—তা তো আমার চাকরি—তোমার নাটকের আইডিয়াল—সবই কি মিথ্যে হয়ে যাবনি? ভেবে দেখো। টাকাই সব সমান করে দেয়। রেফ্রিজারেশনের আরেক নাম বোধহয় টাকা। বেটা তুমি পেয়েছো। যা আমাদের স্বচ্ছল করেছে। যা সব নষ্ট করে দিল। বলতে বলতে গলা বুজে গেল লীলার। জানো—আজকাল প্রত্যেকটা এক টাকার নোটে আমি বাসি কুচো চিংড়ির গন্ধ পাই।

পাবেই তো! প্রত্যেক গণতন্ত্রের নিচ খুঁড়লেই অন্তত একটা কঙ্কাল পাওয়া যায়।

তুমি তো জ্ঞানপাপী।

না হলে উপায় কি বল লীলা? আমরা যে, দর্শক স্নেহধন্য! মঞ্চসফল সুজাতা নাটকের পাটাতনের নিচ আজ এক বছরের ওপর আমি কঙ্কাল হয়ে শুয়ে আছি।

শুয়ে শুয়ে তো তুমি নোট গুনতে থাকো। হাউসফুলের নোট! একস্ট্রা চেয়ার-পিছু সাড়ে দশ টাকা! সাকসেসের আশ্চর্য গন্ধ তোমার নাকে লাগে না?

লাগে লীলা। কিন্তু কোন পথ তো নেই। অ্যাভোগুলো লোকের অন্ন।

কেন? তোমার আরাম? অবেল গেস্টিংয়ের জন্য তোমার সিটিং! আর এক বছর সুজাতা চললে বাংলা থিয়েটারে ওয়ার সবাই চাইকি নটশেখর বলে ডাকবে।

আমার ঠাট্টা করছো তুমি। কাঁদলে তোমার সুন্দর লাগে বেশি। আজ রাতে নিশ্চয় তোমায় পাবো।

কেন? আমি কি কেউ খাদ্য? না, তোমার কোন সম্বর?

ভীষণ কঠিন কথা বলছো। কাছে এসো। না। তুমি শুয়ে পড়োগে।

ঝুলে বারান্দাটা ছোটো। তার ভেতরেই অমিয় এগিয়ে গিয়ে লীলাকে ধরলো। কোথায় একটা ঘন্টা পড়লো। রাত একটা বোধহয়। অমিয় বহুদিন পরে লীলাকে চুমু খেলো। ভরতের স্টেজে সুজাতাকে চুমু খাওয়ার অভিনয় এ নয়। অমিয়কে তাই ফোকাস বা মিউজিকের টাইমিং ঠিক করে চুমু খেতে হচ্ছিল না।

চমকে পিছিয়ে আসতে হল অমিয়কে। এ তুমি কি করলে লীলা?

বলেছিলাম তো শুয়ে পড়োগে—

তাই বলে কামড়ে দেবে লীলা?

আমার কিছু ভালো লাগে না—আগেই তো বলেছি।

অমিয় নিজের ঠোঁটে হাত দিয়ে বুঝলো, রক্ত বেরোয়নি। কিন্তু বেরোতে পারতো। সেইভাবেই কামড়ে ধরেছিল লীলা। এই কি চুমু ফিরিয়ে দেবার রীতি? এখন লীলাকে কুকুর ভাবতে পারলে সবচেয়ে ভালো ছিল। কিন্তু তার বদলে লীলার জন্য অমিয়র ভেতরটা হু-হু করে উঠলো।

তাহলে কি ভালো লাগে তোমার লীলা।

অন্ধকারে একটা বিষাক্ত গুমোর মতই লীলার শরীরটা ঝুলে আছে। ও পরিষ্কার বলল, দুর্ঘটনা ভূমিকম্প ধস—যাতে কি না আরাম হয়। তুমি এসব দিতে পারবে?

এ কোন লীলা? একদম চেনা যায় না।

তোমার শংকর এসেছিল। বলে গেছে দাদাকে বোলো, আমি নাটক পাল্টাবার ঝুঁকি নব না। সুজাতা এখনো হাজার নাইট চলবে।

শ্রীরাম ট্রাস্টের সম্পাদক হরিসাধন বসু পরিবারওয়ারি তিন পুরুষে ট্রাস্টের সঙ্গে আছেন। ভরত হল ছাড়াও কলকাতার তিনখানা বাজারে তার আর সবজির বাজারের ধরতাই পায় ট্রাস্ট। এ বাদও ট্রাস্ট শহর কলকাতার ভেতর তিনটে বড় পেট্রল পাম্পকে জমি লিজ দিয়েছে। ভদ্রলোক নিজে একসময় সি আই টি-র ভ্যালুয়ার ছিলেন। তিনি নিজে মামলা বোঝেন। জানেন কি করে উচ্ছেদ করতে হয়। রাজা-রাজার থেকে সিমলেপাড়া—সব মহল্লার গুণ্ডাদের একসময় চিনতেন। কাউকে কাউকে পুষতেনও। এখন সেসব গুণ্ডারাও ঘরসংসার করে বুড়ো হয়ে গেছে।

সময় সন্ধ্যা। নিবেদিতা স্কুলের কাছাকাছি নিজের পৈতৃক বাড়িতে বসে সম্পাদক মশায় ভরত হলের বকেয়া টেলিফোন বিল, ইলেকট্রিক বিল ট্যাক্সের বাসিদ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। কোন পথ দিয়ে অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় আনন্দ কোংকে ভরত থেকে উচ্ছেদ করা যায়—তারই পথ খুঁজে দেখছিলেন।

সম্পাদক কাগজপত্রে নিজের নাম সই করেন শ্রীহরিসাধন বসু। পাকানো গোঁফের একটা সোনালী তার। গায়ে সুতোলি আটকানো ফতুয়া। পেছনের দেওয়ালে সুন্দর কাঠের ছাতা ঝুলছে। অসিজিনাল সাইদের মামলা তদ্বিরে এই মেহাবাব লোককে হাই-কোর্ট পাড়ায় ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়।

একখানা চেকের হিসেব দেখে আঙুলে কামড়ালেন বসুমশায়। তিনদিনের জন্যে তিনি শিবিডি গিয়েছিলেন। সেই সময় হলভাড়া ট্যাক্স টেলিফোন বিল ইলেকট্রিক বিল—একসঙ্গে তিন মাসের খরচ পঞ্চমুখ এক চেকে শোধ করে। হলধর কেরানী না বুঝে চেক রিসিভ করে জমা দিয়েছিল। এখন মামলার শ্রীরাম ট্রাস্টের সবচেয়ে বড় কাঁটা এই চেকখানা। হলভাড়া নেওয়ার কথা এখন অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কে ভেবেছিল—ভরত হল একদিন থিয়েটারের এতবড় সেন্টার হয়ে উঠবে। আগে তো ফাঁকা হলে রামায়ণ গানের সময় পাখরা উড়তো সিলিং থেকে।

এখন বড় বড় ভাড়ার অফার আসছে। আর দরিস্থধনের ছটফটানি বাড়ছে। ট্রাস্টিদের ভেতর গোয়াবাগানের জ্যোতিষ গুপ্ত ছাড়া বাকি কারও হিসেব মিলিয়ে দেখার সময় নেই। সুতরাং জ্যোতিষকে ঠান্ডা রাখতে পারলে শ্রীহরিসাধন বসু ট্রাস্ট মারফৎ সুখেই থাকতে পারেন।

ছোকরা চাকরটি এসে বলল, কাল সকালের সেই বাবুটি এয়েছেন।

মুখে একটা বিরক্তি ফুটিয়েও হরিসাধনবাবু বললেন, আবার? বসতে বলেছিস? পাখা খুলে দিয়েছিস তো?

চাকরের জবাবের অপেক্ষায় তিনি ছিলেন না। বড় চিরুনিতে পরিপাটি করে নিজের মাথাটি সিঁথি থেকে দুধার সিঙ্কিলমিছিল করে নিলেন। তারপর নিচে নেমে এলেন।

শরৎ অমনিবাস বার্ষিকীতে বহু তথ্যসমৃদ্ধ সম্পূর্ণ গ্রন্থ—
শরৎচন্দ্র—মণি বাগচি—১৫৲
রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম • কাজী নজরুল ইসলাম • ২০৲
দেশবন্ধু • মণি বাগচি • ২০৲
মহানায়ক মুজিবুর—অরুণকুমার সরকার—১৫৲ মহাজীবন—অরুণকুমার সরকার—২০৲
মোহন লাইব্রেরী : ৩৫ এ, সূর্যসেন স্ট্রীট • কলিকাতা-৯

বলুন শশাঙ্কবাবু! সে জেল কি আর এখনকার ছেলেমেয়েদের ভেতর আছে। কি খাবেন বলুন?

আপনি সাহস দিলে কিসে আটকায়!

আমি তো আছিই। কিন্তু ভেতর থেকেও লোক ভাগিয়ে না আনলে ওরা সিধে হবে না। শুনেছি—একজন বরস্থা মাগী আছে দলে। তাকেই ভাংচি দিয়ে নিয়ে আসুন না। কি নাম থাকে যেন বিজ্ঞাপনে—

রজনী বলে তো দেখলাম তাকে। ওপথে হবে না বসুমশায়। বাইরে থেকে ধাক্কা। ভেতরে বসে শাবল দিয়ে গর্ত খুঁড়তে হবে। কিন্তু তার আগে তো আপনাকে কন্ট্রাক্টে সই করতে হবে।

সে তো নিশ্চয়। ব্যাকডেটের চুক্তি হবে। আপনি নতুন দল করবেন—নতুন কন্ট্রাক্টে ভাড়া দেবে বেশি। আমার তো বাজি না হওয়ার কিছু নেই। যা-কিছু করার সে তো আপনিই করবেন। শুনলাম অমিয়বাবু প্রীনরুমটি ভেঙে বড় করে বানিয়েছেন। সেটি এখন মডার্ন পতিতালয়। ইনচার্জ সেই মাগী। চাবির গোছা তার আঁচলে। প্রাইভেট মাইফেল বসে। বুঝুন আমার মনের অবস্থা।

তাতো বটেই। টাকা নাহয় জোগালাম। কিন্তু লোকজন তো হরিসাধনবাবু আপনাকেই দিতে হবে।

সাহস করে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। কোথাও আটকাবে না।

সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ দেখা গেল—নিবেদিতা স্কুলের সামনে দিয়ে শশাঙ্ক চলেছে। গভীর বিশ্বাসে ভরা দুখানা চোখ চশমার নিচে চুপচাপ। আজকাল শশাঙ্ক দত্ত সবসময় ফিটফাট থাকে। পায়ের পাম্পসুতে রাস্তার আলো পড়ে ঠিকরে যাচ্ছে। ট্যাকসি নিয়ে সিধে কলেজ স্ট্রীটে এল। নিজের ঘরের ঢুকতে তালা খুলতে হল। দরজা ভেতর থেকে আটকে শশাঙ্ক ট্রাঙ্কটা খুললো। ভীষণ শক্তিশালী কিছু যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে। শশাঙ্ক বোজকার মত হাত বোলালো। বুঝলো ঝাড়পোছের দরকার নেই কোন। গ্যামাক্সিনের গুঁড়ো সর্বত্র ছড়ানো।

মাথার চুলটি আঁচড়ে নিয়ে শশাঙ্ক ট্রাঙ্কের তালা টানাটানি করে দেখলো। ঠিক আছে। বিং লক দাঁতে দাঁতে আটকে বসেছে। আলো নিভিয়ে দরজায় তালা দিল শশাঙ্ক। হাতঘড়িতে পৌনে আটটা। নিজেই বলে উঠলো শশাঙ্ক মনে মনে, পনের মিনিটে মেট্রোয় পৌঁছতে পারবো তো। ফোন পেয়ে ছোকরা নিশ্চয় অবাক হয়েছে! আজ তো শো নেই—নিশ্চয় আসবে।

অন্য নাটকের রিহার্সালে অমিয় হাঁ করলে শংকর বুঝে নেয়। তখন শংকর এক একটা রোল করে দেখায়। অন্যরা তুলে নেয়। অমিয়কে খানিক মোটা দাগের পরিশ্রম থেকে মুক্তি দিত শংকর। সেটা আজ হচ্ছিল না।

সম্রাট জানেন—মৃত্যু, সুন্দর ক্ষয়ের পদধ্বনি জীবন শুনতে পায়। তাই কোন কিছুই সম্পূর্ণ নয় পৃথিবীর। এটাই তাঁর মন খারাপের কারণ। সম্রাট একজন বিষণ্ণ দার্শনিক। এবং ভয়ংকর নিষ্ঠুর। তাঁর কাছ থেকে বিষপানে মৃত্যুবরণের আদেশ শুধু তারাই পায়—যারা তাঁর খুবই প্রিয়।

অমিয় বুঝিয়ে বলল মঞ্চের অবস্থা। পেছনের ব্যাকড্রপ স্রেফ বুপোলি রংয়ের। উইংসের বদলে থাম। গাঢ় লাল রংয়ের। সম্রাটের প্রাসাদের অলিন্দ মনে হবে। অমিয়র নিজের পোশাক ঃ হাঁটু অব্দি সন্ত্রাপ-জড়ানো জুতো। কোমরবন্ধনীর ওপরটা বুক আটকানো ফতুয়া। নিচে গাউনের ধারা কাপড় হাঁটুতে এসে থামবে। মাথার চুল নেমে এসে ভ্রু ঢেকে ফেলেছে প্রায়। দুখানা চোখ অবুঝ আর আকুল ভাবনায় ঢলো ঢলো। নিষ্ঠুর লোকের যেমন হয় আর কি।

সুজাতায় অমিয়র সেকেন্ড হিসেবে মাসকাবারে নিয়মিত বেতন পেয়ে আসছেন কমলবাবু। তাকে সম্রাটে দেওয়া হয়েছে কবির বোল। সারা নাটকে এই ক্যারেক-টারটি সম্রাটের সবচেয়ে কাছাকাছি। সম্রাট তারই পিতাকে বিষপানে মৃত্যুবরণের আদেশ দিয়েছেন।

কবিকে তোয়াজ করছে শ্রেষ্ঠী। মহামন্ত্রী। তাদের মতলব, এমন সম্রাটকে রেখে কি হবে। তাই তারা কবিকে বলছে, আপনি তো সম্রাটের প্রিয় পাত্র। কাছাকাছি থাকেন সব সময়। সেই সুযোগে পিতৃ-হন্ত্রীকে নিকাশ করুন।

কবির দ্বিধা। সাম্রাজ্ঞীর অশান্তি। সম্রাটের আদেশে মহামন্ত্রীর একপায়ে নৃত্য। ষড়যন্ত্রী শ্রেষ্ঠী ধরা পড়ে গিয়ে সতর্ক।

রিহার্সেলের সময়েই ফাঁকা হল টেন্স হয়ে উঠলো। তার ভেতর রজনী বলল, এ নাটক তোমায় বাঙালীর মনে পাকাপাকি জায়গা দেবে অমিয়।

অমিয় অন্য কথায় গেল। তোমার গলা উঠছে না রজনী। একজন সম্রাজ্ঞী তার কথায় সব জায়গায় জোর দেবেন।

জানি। কিন্তু আমার গলা বিট্রে করছে। আজ কদিনই ভীষন ব্যথা।

ডঃ সেনকে ফোন করেছিলে।

সে সময় পেলাম কোথায়! লোক পাঠিয়েও তো শংকরের খবর পাওয়া গেল না। বাড়ি নেই।

গ্রস ইনডিসিপ্লিন।

শংকর যদি বলে—তুমিই দায়ী সেজন্যে। সব রিহার্সেলের বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়ে যদি ডিক্টেটরি করো—

চন্ডী রজনীকে থামালো। তা কেন? অমিয় তো আমায় বলেছে। আমরা তো নতুন নাটকের কথা বলে আসছিলাম। নাম দেবো গ্রুপ থিয়েটার—আর কোন ঝুঁকি নেব না—তা কি করে হয়?

ঝুঁকি যদি কেউ নিতে না চায়?

তাহলে দল তুলে দাও দিদি।

দল তো ভেঙেও যেতে পারে। এটাই হয়তো তার শুরু।

সন্ধ্যেবেলা অলুক্ষুণে কথা বোলো না। অভাবের দিনে ভাঙা লা না। আর এখন!

অমিয় এবার মুখ খুললো। মিউজিক হ্যাণ্ডের সবাই চুপচাপ বসে। বাইরের রাস্তার আলো জ্বলে উঠেছে। সুজাতা নাটকে বিনয় তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে, স্টেজের একদম উঁচুতে উঠে অন্ধকারের ভেতর রজনীর বাঁ গালে ফোকাস দেয়। তার ফলে লাস্ট রো থেকেও একসপ্রেসন দেখা যায় পরিষ্কার। সেই বিনয় উঠে গিয়ে স্টেজের ফুটলাইটগুলো জ্বেলে দিল। তাতে মঞ্চের রহস্যময় ভাবটা পরিষ্কার হোল খানিক।

আরো হালকা করে দিতে অমিয় বলল, অর্থই অনর্থ চন্ডীদা!

ওসব ভুলে যাই এসো ভাই। তার চেয়ে বরং আমাদের নতুন পুরনো সব কটা নাটক দিয়ে একটা উৎসব লাগিয়ে দাও।

মন্দ বলোনি চন্ডীদা। ফেরিওয়ালার মাতৃ-সন্দেশ; অর্থ মালতী বসন্ত কথা; সুজাতা; সম্রাট। পঞ্চমুখের নাট্যোৎসব। প্রতিষ্ঠা সপ্তাহর সাতদিনের একটানা অভিনয়।

সাতদিনের সিজিন টিকিট করা যাবে।

রজনী বললো, তাহলে আমাদের সাকসেসের বিরুদ্ধে হুইসপার ক্যামপেনও কদিনের জন্যে থামা।

অমিয় দেখলো, চন্ডীদা গ্রীনরুম থেকে পায়রা তাড়াতে ছুটছে। সেই ফাঁকে রজনী ক বলল, একজন মহিলা তো আমাদের সাকসেসে আশটে গন্ধ পান।

বুঝেছি।

কে বলতো?

আর কে! লীলা তো। জানি অমিয়—তার চোখে আমি খুব আমিষ।

মেক্আপ সামনে শংকরকে পেয়ে গেল শশাঙ্ক। কি মনে করে শশাঙ্কবাবু? এদিকে?

আমিও তো তাই বলছি। আপনি এখন এখানে? শো নেই শংকরবাবু?

নাঃ! একজনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে এখানে। আটটা বেজে গেল। ভদ্রলোক তো এলেন না দেখছি। মাঝখান থেকে রিহার্সেলে যাওয়া হল না। জীবন অন্যায় হয়ে গেল।

অন্যায় কিসের? সবাই খাটবে আর একজন ছাঁড় ঘোরাবে। এর নাম গ্রুপ থিয়েটার? আপনি কিসে কম যান শংকরবাবু বলুন তো?

থাক। হয়েছে শশাঙ্কবাবু। রজনীদিদির ওপর রেগে গিয়ে দাদার নামে যা তা বলবেন না। এক অপেরা পার্টির নামকরা অধিকারী ফোন করে আসতে বলে আর এলেন না। কীরকম লোক বলুন তো।

আপনাকে বাজিয়ে দেখছেন হয়তো। আর আসবেন না আজ। দাঁড়িয়ে কি কথা হয়। চলুন পার্কে বসি। অমিয়বাবুর কোন নিন্দে আমি করিনি। কিন্তু একটা কথা বলুন তো। ওরা দুজন একসঙ্গে অসুস্থ হলে—আপনি আর কল্যাণী তো জীবন আর সুজাতার রোল করেছেন। তাতে হাউসফুলে ভাটা পড়ছে?

না। কিন্তু তাইতো থিয়েটারের নিয়ম। সবাই সব রোল মুখস্থ রাখে। একজন বসে পড়লে আরেকজন করে।

তাই যদি হয়—তাহলে সবার সমান অ্যালাউন্স হয় না কেন? সেকথাটা বুঝিয়ে বলুন আমাকে।

সন্ধ্যার বাতাস ভালোই লাগছিল। পর পর দুটো এল পাঁচ নম্বর প্রেস ক্লাবের সামনে দিয়ে ফুলস্পীডে মসৃণ ডিঙোচ্ছে। মাঠে বসে শংকর বলল দাদা তো সবার চেয়ে বেশি খাটে। বেশি নেবে না?

কিন্তু রজনী?

তারও তো বড় রোল শশাঙ্কবাবু। দিদির জন্যে তো সুজাতা নাটক দাঁড়িয়ে আছে। সে বেশি নেবে না? ?

কত বেশি শংকরবাবু? দুশো? পাঁচশো? হাজার?

অত বেশি কি কেউ পায়! আমাদের প্রেস পাবলিসিটির খরচ আপনি জানেন না।

তা জানি না। কিন্তু আমি আরেকটা জিনিস জানি আমার ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে। ওদের মা মাস গেলে কড়কড়ে পঞ্চাশখানা একশো টাকার নোট বাড়ি নিয়ে যায়। ব্যাঙ্কে ফিকসড ডিপোজিটে ফেলে দেয় অনেকটাই। তারপর গাড়ির খরচ? তেল? ড্রাইভার? পোশাক? বেড়ানো? খাওয়াদাওয়া? এসব কোত্থেকে আসছে?

শংকর কি বলতে গিয়ে গুম হয়ে গেল।

শশাঙ্ক বলল, দেখুন শংকরবাবু। আমি নিজে দল করেছি ওর সঙ্গে। ভীষণ খরচে মেয়েছেলে। হাত আলগা। ওই হিরোইন একাই পঞ্চমুখকে শুষে ছিবড়ে করে দেবে। দেখবেন। আমার সঙ্গে কোনদিনই কোন শত্রুতা নেই রজনীর। ওর ভালো চাই আমি। আজও আমরা স্বামীস্ত্রী। ওর ছেলেমেয়েরা তো আমারও ছেলেমেয়ে। ওর আয় বন্ধ হলে আমরা দাঁড়াবো কোথায়? সুজাতা চলুক। পাঁচ হাজার নাইট চলুক। যাতে চলে সেকথাই বলছিলাম। থিয়েটারের স্বার্থে; গ্রুপের স্বার্থে। আমিও তো থিয়েটারের লোক ছিলাম একদিন। থিয়েটারের পাশ টেনে কথা বলবোই আমি। সে আমার ধর্মপত্নীই হোক আর যে-ই হোক।

শংকর কারো দিকে তাকালো না। বিজ্ঞাপনের নিওন আলো দুজনের মুখেই আন্দাজে ফোকাস ফেলছিল—আবার অন্ধকার করে দিচ্ছিল। শংকর নিজে থেকেই বলল, পাঁচ হাজার নাইট নয়—শীগগিরই সুজাতা বন্ধ হবে।

কেন? কি ব্যাপার শংকরবাবু? দিব্যি পাবলিক রেসপনস পাচ্ছেন আপনারা।

ঠিক বন্ধ নয়। নতুন নাটক নামবে। নামানো হবে।

ছিঃ! ছিঃ! এই দর্শক ছেড়ে দিয়ে—নিশ্চয় রজনীর বুদ্ধি। পঞ্চমুখকে ওই শেষ করবে বলে দিলাম।

না। দাদার জেদ। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের। স্থায়ী সভাপতি, পঞ্চমুখ।

অমিয়বাবুকে থামান। এখুনি থামান। এক সেনচুরিতে একবারই এরকম নাটক লেগে যায়। দুবার নয় কিন্তু। স্রেফ পাগলামি মশায়। এখুনি থামান।

থামবো কি! রিহার্সেল শুরু হয়ে গেছে। কমিটিমেম্বর অর্ডার চলে গেছে। কাঠের মিস্ত্রিরা সেট বানাতে শুরু করবে কদিনের ভেতর।

অন্যমনস্ক শংকরের হাত জাপটে ধরলো শশাঙ্ক। একটা কাজ করে দিন আমার। চিরকৃতজ্ঞ থাকবো শংকরবাবু। সুজাতার স্ক্রিপ্টখানা অমিয়বাবুকে বলে আমার এনে দিন। ওঁর তো আর কাজে আসবে না।

স্ক্রিপ্টের কি দরকার? পরো নাটকখানাই আমার মুখস্থ। কিন্তু লোক পাবেন কোথায়? ফাইনান্স?

সে ভাবনা আমার শংকর। আপনি এলে আমি সব পারবো। এমন চালু নাটক কেউ ছাড়ে? (ক্রমশঃ)

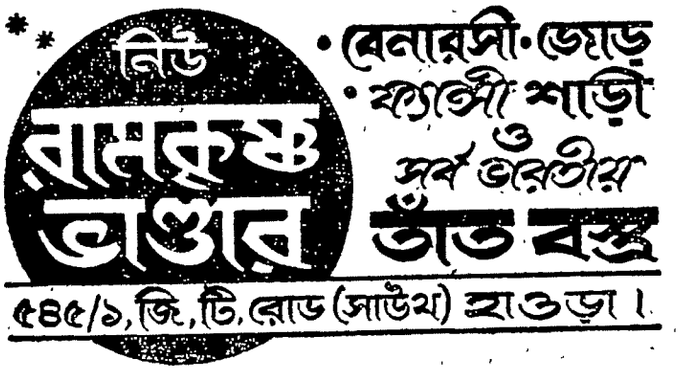

সেকালের কলকাতায় পালকি এবং

পালকি থেকে পাতাল রেল

হাওড়া স্টেশনের নতুন 'সাবওয়ে' দিয়ে বাইরে এসে ডবল ডেকার, ট্রাম, ট্যাক্সি, মিনিবাস ইত্যাদির জমাটি মিছিল দেখে ভাবতে অবাক লাগে—প্রায় দেড়শো বছর আগেও পালকি ছিল কলকাতা শহরে ভ্রমণের প্রধান অবলম্বন। সেকালের পালকি আর পালকি বেহারাদের নিয়ে নানান মজার কাহিনী ছড়িয়ে আছে সাহেবদের লেখা ভ্রমণ কাহিনী, আত্মজীবনী ও সংবাদপত্রে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল থেকে শুরু করে বৃটিশ সাম্রাজ্য পত্তনের প্রথম যুগেও ইউরোপ থেকে কোন পর্যটক অথবা সরকারী কর্মচারী কলকাতার মাটিতে পা দিয়ে মানুষের কাঁধে বওয়া পালকি চড়বার অভিজ্ঞতা লাভ করতেন ভয়ে ভয়ে। দূর থেকে পালকি দেখে আবার অনেকেই ওটাকে ভেবে নিতেন 'কফিনের বাকস' বলে। ঠাণ্ডা দেশ থেকে এসে ছোটখাট পালকির ভেতরে বসে গলদঘর্ম হওয়াই নয়—বেহারাদের বিচিত্র সুরে হাঁকডাকে ত্রস্ত হয়ে উঠতেন দোল খেতে খেতে। অবশ্য প্রথম অভিজ্ঞতা যতই বিব্রতিকর হোক না কেন, বিদেশী সাহেবরা ঠিকই বুঝেছিলেন যে এদেশে থাকতে হলে পালকি বেহারাদের বরদাস্ত করতেই হবে।

অপরাপর যানের মত পালকির ক্রম-বিবর্তনেরও একটা ইতিহাস আছে। সব থেকে পুরানো একটি পালকির ছবি চোখে পড়ে ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে লেখা লিনসোটেন সাহেবের গ্রন্থে। ওটা অবশ্য বাঁশে ঝোলানো চৌপাইয়ের মত দেখতে। মনে হয়, হ্যাডলী সাহেব এই চৌপাই-মার্কা পালকিকেই বলেছেন 'বেড প্যালাঙ্কিন'। আবার, দূরপাল্লার ভ্রমণে খুব জোরে চলে বলে উইলিয়মসন বোধ হয় একটু মজা করেই এই পালকির নামকরণ করেছেন 'ফ্লাইং প্যালাঙ্কিন'। অবশ্য 'বেড প্যালাঙ্কিন' ছাড়াও 'বোচা' বা 'চেয়ার পালকি'রও বেশ কদর ছিল সেকালের কলকাতায়। আঠারো শতকের শুরুতে লোকশিল্পীর হাতের ছোঁয়া লাগে পালকির অঙ্গে। ঐ সময়ে পালকির পায়াতে পরানো হয় পিতলের তবক এবং বেহারাদের কাঁধ রাখবার দাঁট কাঠের হাতলের সম্মুখভাগ কুঁদে রূপ দেওয়া হয় কুমীর কিংবা বাঘের মুখ। এছাড়া, রোদ-বৃষ্টি থেকে যাত্রীর মাথা বাঁচানোর প্রয়োজনে পালকির উপরিভাগ ঘেরা হয় মোম লাগানো কাপড়ের আচ্ছাদনে। কালক্রমে পালকির ওপরে একটা স্থায়ী কাঠের আচ্ছাদন গড়ে ওঠে। যতদূর জানা যায়, মাত্র একজন যাত্রীকে বওয়া হত 'বোচা' পালকিতে। কিন্তু 'তাঞ্জাম' পালকিতে দুজন যাত্রীও চড়তেন বেশ আরামে। তখনকার সম্ভ্রান্ত লোকেদের ব্যক্তিগত সৌখীন 'বোচা' ও 'তাঞ্জাম' পালকির অঙ্গে অলঙ্করণের বাহুল্য দেখে, বিদেশীরাও প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন ওঁদের সঙ্গে। ঐ সময়ে পালকির অলঙ্করণে প্রচুর রূপা ব্যবহৃত হত মালিকের ঐশ্বর্য ও আভিজাত্য প্রকাশের বিজ্ঞাপনে। এই ঘটনা ১৭১৬ খৃষ্টাব্দের। ইতিমধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কার্যাধ্যক্ষ জব চার্নক কলকাতার সমাধিক্ষেত্রে ঠাঁই নিয়েছেন ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে। জনবসতিও বেছেড়ে কলকাতায় সুযোগ-সন্ধানীদের আগমনে।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৩ জুন তারিখে পলাশীর যুদ্ধের পরে সারা বাংলাদেশ জুড়ে একটা রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার ঢেউ আছড়ে পড়ে। তথাপি লর্ড ক্লাইভ কোম্পানিকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য নানাভাবে সংগ্রাম করে চলেন। 'কলবাতা কালচারের' প্রবর্তক শোভাবাজারের মুনশী নবকৃষ্ণ তখন ক্লাইভের নেকনজরে পড়ে 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধি পেয়ে ঝালরদার

তারাশিস
মুখোপাধ্যায়

পালকি চড়বার অধিকার পেয়েছেন। মজার কথা—ইংরেজের অনুমতি ছাড়া সৌখীন ঝালরদার পালকিতে চড়া তখন দণ্ডনীয় অপরাধ। ক্লাইভের পরে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে হেস্টিংস এদেশের শাসনকর্তা হয়ে আসেন। ওঁর আমলেই কলকাতা বাংলার রাজধানী হওয়ার গৌরব লাভ করে। এছাড়া, নবকৃষ্ণের মত আরও কয়েকজনের ভাগ্যে 'ঠাঠাং-বাজা' হওয়ার সৌভাগ্য হয়। তথাপি সামন্ততন্ত্রীয় কালচারের সঙ্গে ইংরেজী কালচারের সংমিশ্রণে এক বিচিত্র 'কলবাতা কালচারের' সৃষ্টা হিসেবে নবকৃষ্ণের ভূমিকাই বিশেষভাবে উল্লেখ করা চলে। বাঙ্গালীদের মধ্যে ১৭৭৫ খৃঃ তিনিই পালকি ছেড়ে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়েন। বাস্তবে হেস্টিংসের আমলে ঘোড়ার গাড়ীর চল হলেও, প্রধানত পাল্কির ওপরে নির্ভর করে তিনি রাজ্য পরিচালনা করেন। গ্রামবাংলায় ভ্রমণকালে হেস্টিংস তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী মারিয়মকে উৎসর্গ করে অনেক কবিতাও লিখেছিলেন বেহারাদের হাঁকডাক উপেক্ষা করে। ১৭৮৪ খৃঃ সরকারী কাজে কাশী যাওয়ার পথে তিনি উইলকিনসের লেখা মহাভারতের ইংরেজী তর্জমাও পড়েছিলেন পালকিতে বসে। ১৭৮০ খৃঃ লেখা হ্যাডলী সাহেবের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি—উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাই নন, এদেশী 'রাইটার' বাবুদের মধ্যেও পালকি বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তবে 'নেটিভ' বাবুদের মধ্যে 'ঠিকা' পালকির ব্যবহার ছিল একচেটিয়াভাবে—যদিও 'কেরাঞ্চী গাড়ী' মিলত কলকাতার পথে। যতদূর জানা যায়, পালকি বাহকের কাজ তখন ওড়িয়া ও বাঙ্গালী বেহারাদের অধিকারে। প্রসঙ্গত, কলকাতার 'বাবু'দের সম্পর্কে সুন্দর বর্ণনা পাই ম্যাকে সাহেবের লেখায়। 'বাবু'দের পায়ে পেটেন্ট চামড়ার জুতো, মাথায় সিল্কের ছাতা আর সাহেবী ভাবাদর্শে বাদ হয়ে ওরা ইংরেজী-বাংলার মেশানো বেঙ্গলিশ বলতেন বিদেশী প্রভুদের কৃপা লাভের অভিলাষে। তথাপি ১৭৮০

খৃঃ কোন এক সময়ে এ-দেশী রাজকর্মচারী-দের পালকি চড়ায় আপত্তি এল লণ্ডনের ডিরেকটরবর্গের কাছ থেকে—নিছক মিত-ব্যয়ের জিগির তুলে। অবশ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এদেশী কর্মকর্তারা ভাবলেন যে এই আদেশ যদি ঠিক ঠিক মানতে হয়, তবে কোম্পানির কাজ চলবে কিভাবে? ফলে তাঁরা কর্মচারী-দের পালকি ব্যবহারের ঘটনাটি মেনে নিলেন অনিচ্ছাকৃতভাবে। কোম্পানির অধস্তন কর্মচারীরাও পালকি চড়বার আদেশ পুন-র্বিবেচনার দাবীতে আবেদন জানালেন লণ্ডনে।

১৭৮৬-৯৩ খৃঃ লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে কলকাতার সামগ্রিক উন্নতির ফলে পালকি বেহারা কিংবা জলের ভারীর কাজ পাওয়ার আশায় সুদূর উড়িষ্যা এবং কুচবিহার থেকে লোকেরা কলকাতায় ভীড় করে। তখনও দূরপাল্লার ভ্রমণে পরি-বর্তিত আকারে 'বেড প্যালাঙ্কিনের' ব্যবহার চলছে একইভাবে। তবে কেবলমাত্র অবস্থা-পন্ন জমিদার এবং সাহেবরাই পালকি রাখ-তেন নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্যে। এইসঙ্গে কয়েকজন পালকি বেহারাও কাজ পেত তাদের বাড়ীতে। মজার কথা, কল-কাতার বিশিষ্ট জমিদার বাবুদের অনুকরণে সাহেবরাও তখন নিয়মিত সান্ধ্যভ্রমণে বের-তেন পালকি বা ঘোড়ার গাড়ীতে। শুধু তাই নয়, জমিদার বাবুদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে এদেশী পূজা-পার্বণ, আমোদ-প্রমোদ এবং হৈ-হুল্লোড়ের সঙ্গেও তারা পরিচিত হয়েছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে। সাত সমুদ্র পেরিয়ে বাংলাদেশে এসে তথাকথিত বাঙালীকরণের পথে সাহেবরা যে কতদূর এগিয়েছিলেন, তার পরিচয় মেলে ওদেরই লেখায়। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের গ্রামসমাজে প্রচলিত নানা কুসংস্কার এবং জাতিভেদ প্রথা ছোঁয়াচে রোগের মত হাজির হয়েছে কল-কাতার বুকে। ১৭৮৯ খৃঃ একটি ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারি—কলকাতার বিশিষ্ট ধনী নিমাইচরণ মল্লিকের পালকি বেহারা জনৈক পশ্চিমা ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করায় সেই ব্রাহ্মণ নিজেকে এতদূর অপমানিত মনে করেন যে, তিনি মল্লিক বাবুদের বাড়ীর সামনে বন্দুকের গুলীতে আত্মহত্যা করেন। এই নজিরবিহীন প্রতিশোধ চরিতার্থের ঘটনা কলকাতার ইতিহাসে সত্যই বিরল। যাই হোক, উনিশ শতকের শুরুতেও কল-কাতার জীবনযাত্রায় পালকি ছিল অপরিহার্য। তবে এই সময়ে 'বেড প্যালাঙ্কিনের' কদর কমতে থাকে 'মহঙ্গা' পালকির আবির্ভাবে। ১৮১০ খৃঃ উইলিয়মসনের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি—তখন ইউরোপীয়ান-দের মধ্যে 'মহঙ্গা' ব্যবহারের চল বেড়েছে। এই পালকির হাল্কা দেহে কাঠের থেকে বাঁশ ও বেতের ব্যবহার হত বেশী করে। এটি লম্বায় প্রায় ছ'ফুট ও চওড়ায় আড়াই ফুট। যাত্রীর বসবার জন্য 'মহঙ্গায়' থাকত গদি দেওয়া আসন, দু পাশে দরজা ও মাথায় ভেনেসিয়ান কাঁচের আচ্ছাদন। পালকির দুটি দরজার পাশে খসখস ঝোলানোর ব্যবস্থাও থাকা। তাই প্রখর গ্রীষ্মে খসখসে জল দেওয়ার প্রয়োজনে, দুজন ভিস্তিওয়ালা ছুটত বেহারাদের সঙ্গে। অনেকের মতে, সৌখীন 'মহঙ্গার' থেকে নবাবী আমলের 'পালকির ইজ্জত নাকি আরও বেশী। এখানে সে প্রসঙ্গ থাক। তবে ১৮২৪-২৫ খৃঃ বিশপ হেবারের লেখাতেও তখনকার সাহেবদের মধ্যে 'তিনশত টাকা মূল্যের পালকি ব্যবহারের উল্লেখ আছে। এই পরি-প্রেক্ষিতে পালকি-নির্ভর কলকাতায় সাহেবরা যে বেশ একটা জমিদারী মেজাজে দিন কাটাতেন, তা সহজেই অনুমান করা চলে। কিন্তু এত সুখভোগ সাহেবদের কপালে থাকলে তো!

বাস্তবে ১৮২৭ খৃঃ কোন এক সময়ে গোরা সাহেবরাই কালো কালো পালকি বেহারাদের চটিয়ে দিলেন ওদের ওপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ করে। হুকুম হল—এবার থেকে প্রত্যেক 'ঠিকা' পালকি বাহকের হাতে থাকবে লাইসেন্সের নম্বর দেওয়া তাবিজ। এছাড়া, মাথাপিছু কুড়ি পয়সা দেওয়া হবে পাঁচজন বেহারাকে মোটামুটি চৌদ্দ ঘণ্টা পরিশ্রমের বিনিময়ে। অবশ্য পালকির মালিক অতিরিক্ত চার আনা পাবেন পালকি-ভাড়া হিসেবে। কিন্তু এই আইনের বেড়াজালে ধরা দেওয়ার আগেই কলকাতার কয়েকশত পালকি বেহারা সমবেতভাবে প্রতিবাদ জানা-লেন পালকি ধর্মঘট করে। প্রসঙ্গত, যদিও তখন সাহেবদের মধ্যে 'ঠিকা' পালকি ব্যবহার হত না বললেই চলে, তথাপি 'ঠিকা' পালকি বাহকদের ধর্মঘটে জমিদার ও সাহেবদের নিজস্ব পালকি বাহকেরাও ধর্মঘটী ভাইদের সমর্থন জানালেন কাজ বন্ধ করে। কলকাতার অচল অবস্থা দেখে পালকি বেহারাদের কাজে ফিরিয়ে আনবার তাগিদে জোর লেখা-লেখি চলল বিভিন্ন কাগজে। কিন্তু বেহারা-দের কাঁধে পালকি ওঠবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। এই সুযোগে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা পালকি বেহারার কাজ পাওয়ার আশায় ভীড় জমালো কল-কাতায়। অবস্থা বুঝে, অফিস পাগল ব্রাউনলো সাহেব তার পালকির নীচে চার্বাট চাকা লাগিয়ে ঘোড়া জুড়ে দিলেন 'পালকি গাড়ী' টানবার কাজে। এই বিচিত্র 'ব্রাউন বেবি' বা 'পালকি গাড়ী' দেখে কলকাতার সকলেই তাকে বাহবা জানালেন হাসিমুখে। ইতিমধ্যে ভিনদেশী বেহারাদের কাঁধে পালকি উঠেছে আর ঘোড়ায় টানা 'পালকি গাড়ী'ও নেমেছে রাজপথে। ফলে, পূর্বপুরুষের জীবিকায় নিযুক্ত বাঙালী ও ওড়িশা বেহারারা ধর্মঘট তুলে নিতে বাধ্য হলেন পেটের দায়ে। এখন ওদের 'হুন-হুন-না' ডাকে আর যেন সেই প্রাণ নেই—নবাগত পালকি বেহারাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতাও বেড়েছে জীবিকার প্রয়োজনে। তথাপি পালকির প্রয়োজন ছিল কলকাতার কাছে। ১৮৪০ খৃঃ চার্লস গ্রান্টের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি, তখন কলকাতায় পালকি বেহারাদের সংখ্যাই প্রায় এগারো হাজার।

প্রসঙ্গত, চুয়াত্তর বছর আগে পালকি ব্যবহারের অনুমতি চেয়ে কোম্পানির কর্ম-চারীরা যে আবেদন পাঠিয়েছিলেন লণ্ডনে ১৭৮০ খৃঃ তার জবাব এল ১৮৫৪-তে। এবারেও লণ্ডনের কর্তৃপক্ষ পালকি ও 'ঘোড়া চেয়ারের' খরচা বন্ধ করবার হুকুম পাঠালেন এদেশী 'রাইটার' বাবুদের। আবার শুরু হল নানান জল্পনা-কল্পনা। অবশেষে কোম্পানির কাজকর্ম ঠিকমত চালানোর দাবিতে লণ্ডনের ওপরওয়ালাদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো হল তাঁদের আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্যে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষেরও যে এতে সমর্থন ছিল না তা নয়। ফলে 'রাইটার' বাবুদের হুকুম তামিল করে চরম প্রতিযোগিতার মাঝেও পালকি বেহারারা বেঁচে ছিল কোনরকমে। বছর চারেক বাদে ১৮৫৮ খৃঃ কড়া হুকুম এল লণ্ডন থেকে। ওরা জানালেন—যদি কোন 'রাইটার' পালকি ঘোড়া এমনকি হাল্কা ছোট দুজনে চড়বার মত গাড়ী রাখেন, তবে তাঁকে অবশ্যই চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই হুকুমের নড়চড় হতেও দেরী হল না। দেখতে দেখতে ১৮৭৯ খৃঃ ২ অক্টোবর মেসার্স পারিস অ্যান্ড সাউদার কোম্পানি দুটি ঘোড়া জুড়ে ট্রাম চালালেন কলকাতার কয়েকটি রাজপথে। মজার কথা ঘোড়ায় টানা ট্রামেরও দিন ফুরিয়ে এল ১৯০২ খৃঃ বিজলী ট্রামের প্রবর্তনে। ইতিমধ্যে দশ মাইল স্পীডে কলকাতায় মোটর ছুটেছে ১৮৯৮ খৃঃ। এরপরে ট্যাকসির আবির্ভাব ঘটেছে ১৯০৯ খৃঃ ও পাবলিক বাস ১৯১২ খৃঃতে। 'সুন্দরী ট্রামের' তো দেখা মিলল মাত্র গত বছর ১৯৭৫ খৃঃএ। সুন্দরীর হর্ন শুনে সচকিত বেবীসিক পথ-চারীর মুখেও সেদিন হাসির ঝিলিক খেলেছে নিজের অজান্তে। অনেক আলো-চিত 'পাতাল রেলের' কল্পনাও আজ বাস্তব রূপায়ণের পথে এগিয়ে চলেছে পরিকল্পিতভাবে।

রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলায়' আজ থেকে প্রায় এক শতাব্দী আগের কলকাতার যে বর্ণনা পাই—বলতে গেলে তার অবসান ঘটেছে বিংশ শতাব্দীর জন্মলগ্নে। পালকি বেহারাদের হাকডাকই নয়, পাঁজরা-সর্বস্ব ঘোড়ার পিঠে চাবুক পড়বার দিনও ফুরিয়ে এসেছে গতিশীল উন্নত যানবাহনের আবিষ্কারে ও এদেশে তার আবির্ভাবে। অবশ্য শহর থেকে দূরে আজও পালকি চলে গ্রামের মেঠো পথ ধরে—ক্লান্ত ঘুঘু ডাকা দুপুরের নির্জনতা ভেঙে। কিন্তু এটা ঠিকই যে, স্বাধীনতার পরে সারা পশ্চিমবঙ্গে যে কর্মযজ্ঞের জোয়ার লেগেছে, তারই ফলশ্রুতি হিসেবে পালকি ও রিকসার মত মানুষে-টানা যানের বিলুপ্তি ঘটবে এই শতকের শেষে। এই আকাঙ্ক্ষিত পরি-বর্তন কেবলমাত্র আরো জোরে চলবার প্রয়োজনে নয়—মানুষের মর্যাদা, আত্মসম্মান ও পশুর মত পরিশ্রমের গ্লানি থেকে মুক্তির দাবীতেই।

জ্বর

চণ্ডীমণ্ডল

ভোরের স্নানের মধ্যে এক সুখ আছে, শরীরটাকে স্নিগ্ধ করে না শুধু, মনটাকেও অন্য এক আনন্দে ভরিয়ে দেয়—জীবনে এই প্রথম আনন্দের স্বাদ পেয়েছে জয়ন্তী।

স্নান সেরে শুধু শাড়ির আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে ঘরে ফিরে এসে আঁচলটা শুধু নয়, শাড়িটাই খুলে ফেলেছে শরীর থেকে। জয়ন্তীর নিজের এই ঘর—নিজের টাকায় কেনা সিঙ্গল খাট, আলনা, বই-এর আলমারি—ড্রেসিং-টেবিলের ওপরে আলোটা জ্বেলে নিয়েছে। উজ্জ্বল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

এমন করে নিজেকে দেখার সময় পায় না জয়ন্তী। শীতের ক-মাস বিছানা ছেড়ে উঠতেই সাতটা বেজে যায়। তারপর চা খায়। বাবার কাছ থেকে খবরের কাগজটা আসে কর্মখালির বিজ্ঞাপনের পাতাটা বোজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে। চাকরী তাকে করতেই হবে, তাহলে কেন ইস্কুলে পড়ে থাকবে, যে চাকরীতে তার কোন ভবিষ্যত নেই' যত দিন যাচ্ছে, অফিসে চাকরীর সুযোগ হাল্কাড়া হয়ে যাচ্ছে—বয়েস বেড়ে যাচ্ছে—। পরীক্ষার খাতা দেখা না থাকলে সকালটা মাকে একটু সাহায্য করে। সাড়ে নটায় দাদা অফিসে বেরিয়ে যায়, তখন জয়ন্তী বাথরুমে ঢোকে। স্নান সেরে আর নিজের দিকে তাকাবার সময় পায় না, তাড়াহুড়ো করে দু-গাল খেয়ে তারপর কোন মতে চুলে একটা বিনুনি করে একটা যা-ই হোক শাড়ি আটপৌরে করে পরতে পরতে সাড়ে দশটা বেজে যায়—জয়ন্তী ইতিহাসের দিদিমণি হয়ে যায়।

এই পাঁচ বছরে গায়ের রংটা পোড়াটে হয়ে যাওয়ার কথা। শরীরের সমস্ত বাঁধন আলগা হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু সে-সব কিছুই হতে দেয়নি জয়ন্তী, বয়স যাতে বাইসটাকে না পাঁয়ত্রিশ, নিজের শরীরটাকে একটা বয়েসে বেঁধে রাখতে পেরেছে। গোখের কোলে, গলার চামড়ায় খুঁটিয়ে দেখলে অনেক ভাঁজ চোখে পড়বে, কিন্তু একটু পরিশ্রম করলেই সে সব ঢেকে ফেলতে পারে জয়ন্তী। কোমরের কোথাও একটু বাড়তি মেদ কিংবা চর্বি জমতে দেয়নি—রোজ এক মাইলের ওপর হেঁটে ইস্কুলে যায়, হেঁটে বাড়ী ফেরে। সময় পেলেই সন্ধেবেলা দু-একটা সহজ ব্যায়াম করে, এবং ডায়েট কন্ট্রোল তো করেই। —কিন্তু আর বেশী দিন শরীরটাকে এমনি পোষ মানিয়ে রাখা যাবে না, জয়ন্তী টের পেয়ে গেছে। এই সব খুঁটিনাটি নানামানি, এত সংযম আজকাল যেন ঠিক সহ্য হয় না। ভেতরে একটা ক্ষোভ জমছে, জয়ন্তী যেন বুঝতে পারে, একটা নিস্ফল ক্ষোভ তার নিজের মনটাকে বিষিয়ে দিচ্ছে। দিনে দিনে সে নিজেই নিজের কাছে দুঃসহ হয়ে পড়ছে। নিদারুণ একটা জ্বালার সব সময় সে ভেতরে ভেতরে জ্বলে।

আগুন রংয়ে নাকি তাকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায়! আগুন রংয়ের সিল্কের শাড়ি, ম্যাচ করা লাল রবিবার ব্লাউজ। লাল রংয়ের টিপ কপালে। ঠোঁট দুটো তার এমনিতেই রক্তাভ, তবু রাঙিয়ে নিয়েছে। শুধু চুলটা ভিজে বলে খোপা করা যায়নি। না হলে একেবারে নিখুঁত সেজেছে জয়ন্তী। লতিব দেয়া মণিবন্ধে বাঁধতে বাঁধতে দেখে সাড়ে ছটা বাজেনি; এখনো হাতে সময় আছে, প্রীতিকে একবার দেখে যাবে নাকি। প্রীতি এমনিতে তারই মতো সাতটার আগে ঘুম থেকে ওঠে না, এই সময় এত সকালে ওর ঘুম না ভাঙানোই ভাল। আজও যদি জ্বর থাকবে, অল্পই থাকবে। অনেকটা সেন্ট স্প্রে করেছে জয়ন্তী, জামা কাপড়ে, সারা গায়ে—ঘরটা গন্ধে ভরে গেছে। এমনি সেন্টের গন্ধ কোথায় যেন পেয়েছিল, মনে পড়েছে, পিসতুতো বোন দীপার বাসরঘরে। দীপার বাসর ঘরের গোটা ছবিটা মনে পড়ে যায়। লাল রংয়ের ভ্যানিটি ব্যাগটার মুখ খুলে একবার দেখে নেয় চিঠিগুলো ঠিক আছে কিনা। তারপর আলো নিভিয়ে ঘর থেকে বেরোয়।

বারান্দায় একটা হাতলভাঙা চেয়ারে মা বসে, গায়ে এণ্ডির চাদর জড়ানো।

আমি গেলাম মা—।

গায়ে কিছু দিলি না কেন?

জয়ন্তী একমুহূর্ত থামে। —আমার ফিরতে রাত হবে মা—।

বেশী রাত যেন করিস না—।

ছোট এই অঞ্চলটুকু এখনও কেমন লুকিয়ে আছে, কলকাতা একে দেখতে পায়নি পাড়াগাঁয়ের সবুজ স্নিগ্ধতা ভরানো কেমন এর সারা গায়ে। আম তোকবেলা কুয়াশা ছড়িয়ে, তার নরম রেশ লেগে আছে গাছের ডালপালায়। শীত নেই, একটা মৃদু শীতল আমেজ। ছোট ছোট কয়েনি বাড়ী-ঘর, ঘন গাছগাছালি, লাল সুরকির পথ। পথের ধারে বাগান, বাগানে কেউ ভাঁড়িয়া।

কোথাও আমগাছে মুকুল এসেছে। মিষ্টি একটা গন্ধ সারা পথ জয়ন্তীর সঙ্গে আসছে। নিজেকে কোনদিন এত ভাল লাগেনি জয়ন্তীর!

এই সকালে অফিসযাত্রী কেউ নেই ট্রাম স্টপে। সবে শাড়ি পরতে শুরু করেছে, ফর্সা রোগা দুটি কিশোরী কাঁধে বই-এর ব্যাগ, নির্জন ট্রাম-স্টপ মুখর করে তুলেছে। এই একটা বয়েস সারাক্ষণ কথা বললেও ক্লান্তি আসে না। অথচ কদিন থাকে এই বয়েস। এই তো মনে হয় এই সেদিন, প্রীতি আর সে এমনি সকালে বই-এর ব্যাগ কাঁধে ইস্কুলে যেত, যাওয়া আসার পথ এমনি গল্পে, কথায়, উজ্জ্বল হাসিতে ভরিয়ে রাখত। দুপুরে ইস্কুল থেকে ফিরে স্নান-খাওয়া সেরে কোন দিন দুপুরে সে যেত প্রীতিদের বাড়ী, কোনদিন প্রীতি আসত তাদের বাড়ী— গল্পে গল্পে দুপুর বিকেল হয়ে যেত। বিকেল সন্ধ্যেয় পৌঁছে যেত, গল্প ফুরোতো না। তারপর দুজনের কলেজ-জীবন শুরু হল। সেই সকালে কলেজে— একসঙ্গে দুজনের কলেজে যাওয়া, একসঙ্গে বাড়ী ফেরা। দুপুরে আবার দুজনের দেখা-হওয়া। এমনি করে ফার্স্ট ইয়ার, সেকেণ্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার—থার্ড ইয়ারের শেষের দিকে ঘটনাটা ঘটল। প্রীতির দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যেগুলো জয়ন্তীর কাছ থেকে কেড়ে নিল একজন।

প্রীতির কোন এক মাসতুতো বোনের বিয়েতে প্রীতির প্রথম দেখা মিহিরের সঙ্গে। মিহির তখন এম-এ ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। প্রীতি যেদিন প্রথম দুপুরে বেরোল মিহিরের সঙ্গে, প্রীতি বলেছিল তাদের নাকি প্রায় কোন কথাই হয়নি—দুজনের কেউই ভাল করে কথা বলতে পারেনি, ম্যাটিনী শোয় সিনেমা দেখেছিল, তারপর একটা রেস্টুরেন্টে খেয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যেয় দুজনের ছাড়া-ছাড়ির আগেই পরের রবিবারের জন্যে দুজনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছিল। কী একটা ইংরাজী সিনেমা দেখার প্রোগ্রাম ছিল—প্রীতিরা তিনখানা টিকিট কেটেছিল। তারপর ওদের দুজনের প্রায়ই—প্রায় রোজই দেখা হত। মিহির নাকি মাঝে মাঝেই প্রীতিকে বলত, তোমার বন্ধু আর আসেন না কেন—উনি কি আসতে চান না! সত্যি কিনা জয়ন্তী জানে না, প্রীতি নাকি একদিন বলেছিল—আমরা দুজনে বন্ধু বলে ভেবেছো কি দুজনেই তোমার সঙ্গে প্রেম করব!—

আরো অনেক, অনেক কথা, প্রীতি নাকি সব কথাই বলত যা যা কথা হোত মিহিরের সঙ্গে। —প্রীতিটা শেষ পর্যন্ত অনার্স পেল না। মিহির কিন্তু ভাল সেকেণ্ড ক্লাস পেয়েছিল। বেজাল্ট বেরোবার ছ মাসের মধ্যেই একটা চাকরীও পেয়ে গিয়েছিল।—বড় একটা ব্যাঙ্কের প্রবিশনাল অফিসার। দু বছর পরেই সাব-অ্যাকাউন্টেন্ট। এখন অ্যাকাউন্টেন্ট। তিবিশের আগেই পাকাপোক্ত ক্যারিয়ার তৈরী করে নিয়েছে মিহির। প্রীতিকে কোনদিন চাকরী করতে হবে না। মিহিরদের বাড়ীর অবস্থা খুব ভাল। প্রীতি টাকা খরচ করতে ভালবাসে, প্রত্যেক মাসে শাড়ি কেনে। ট্রামে-বাসে চড়ে না, কথায় কথায় ট্যাকসি করে। মিহিরের স্বভাবের সঙ্গে ভাল মানিয়ে গেছে। এমনিতেই দুজনকে খুব মানায়। মিহির সাধারণ ছেলেদের চেয়ে মাথায় লম্বা, গায়ের রং যদিও প্রীতির তুলনায় চাপা, কিন্তু নাক চোখ অসম্ভব সাফ। ভাল জামা-কাপড়ে রীতিমত অভিজাত দেখায় মিহিরকে। একটু বেশী কথা বলে কিন্তু দরকার হলেই সিরীয়াস হতে জানে। মাঝে মাঝে দুজনের ঝগড়া হয়, জয়ন্তী বুঝতে পারে কখন দুজনের ঝগড়া চলছে। এমন এক একবার হয়েছে যে একমাস দুজনের মুখ দেখাদেখি বন্ধ। জয়ন্তী হয়ত সেই সময়টা ইস্কুলের খাতা দেখায় ব্যস্ত ছিল, ওদের খবরাখবর নিতে পারেনি, তারপর একদিন প্রীতির সঙ্গে দেখা হতে ওর মুখের দিকে তাকিয়েই সব বুঝতে পারে। সেদিনই মিহিরের অফিসে ফোন করে জয়ন্তী। পরের দিন বিকেলে গঙ্গার ধারে বা ভিক্টোরিয়ার মাঠে দুজনের মাঝখানে বসে দুজনের ঝগড়া মিটিয়ে দেয়, তারপর কোন জরুরী কাজের অজুহাতে ওদের দুজনকে বসিয়ে রেখে নিজে সন্ধ্যের আগে উঠে আসে।

প্রীতি কতবার বলেছে, জয়ন্তী, বিয়ের পরেও কি আমাদের এমন ঝগড়া হবে?

জয়ন্তী হাসকা হেসে বলেছে, হলেও তখন কি আমাকে বলবি—না আমাকে ডাকবি তখন ঝগড়া মেটাতে!

তোকে ডাকলেও কি তুই তখন আসবি —তোরও তো ঘরসংসার হবে।

প্রীতিটা তো খুব সরল, আর জয়ন্তীকে সত্যি ভালোবাসে তাই এমন অসংকোচে এই কথাটা বলে। জানে কিংবা জানেও না যে জয়ন্তীর নিজের ইচ্ছায় কোনদিন আর জয়ন্তীর ঘরসংসার হবে না। বাবার সংসারের অনেকখানি দায়িত্ব ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তাকে নিতে হয়েছে। বাবা সাধারণ চাকরী করতেন, দু বছর হল রিটায়ার করেছেন। জয়ন্তীর পরে দুটো ভাই, একজন পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে, একজন কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে। হিস্ট্রীতে ভালই অনার্স ছিল জয়ন্তীর, কিন্তু এম-এটা আর পড়া হল না। মিহির অনেকবার বলেছে, আপনি এত ভাল ছাত্রী ছিলেন—স্কুলে কেন চাকরী করছেন—আজকাল মেয়েরা আই-এ-এস হচ্ছে!

জয়ন্তী বলেছে, বেশ তো, আপনার ব্যাঙ্কে এবার যখন লোক নেবে আমাকে বলবেন।

প্রীতি বলেছে, আচ্ছা, তোমার ব্যাঙ্কে আমার একটা চাকরী হয় না?

মিহির বলে, হবে—ব্যাঙ্কের মেঝে ধোয়া মোছার একটা চাকরী হতে পারে।

প্রীতির মুখখানা লাল হয়ে উঠেছিল।

জয়ন্তী বলেছিল, কেন মশাই, ব্যাঙ্কের কেন—ব্যাঙ্কের অফিসারের ঘর মোছার একটা চাকরী তো আপনার হাতেই আছে। প্রীতি, এইবেলা অ্যাপলাই করে দে—!

প্রীতির মুখে হাসি ফুটেছিল। বলেছিল, মাইনে কত আগে শুনি, তারপর ভাবব—

জয়ন্তী মিহিরের চোখের দিকে চেয়ে বলেছিল, শুনিয়ে দিন তো কত মাইনে!

মিহির বেশ গম্ভীর হয়ে বলেছিল, মাইনে —অ্যারাউণ্ড ফোর্টিন হানড্রেড—চোদ্দস।

জয়ন্তী প্রীতির দিকে ফিরে বলেছিল, চোদ্দশ খুব কম নয় বল, রাজী হয়ে যা প্রীতি। আজকাল চাকরীর খুব আকাল— এমন চাকরী যদি হাতছাড়া হয়ে যায় কেঁদে কিন্তু কূল পাবি না।

বিয়ে করতে একটু দেরীই করল ওরা। প্রথম আলাপের পর পাঁচ বছর পার হয়ে যাওয়ার পরেও কেউ কারো বাড়ীতে জানায়নি। তবে শেষের দিকে দুজনেরই বাড়ীর লোকজন একটা কিছু আন্দাজ করে ছিল। ওদের ভাবনাটা ছিল এই রকম—এই-ভাবে যেমন চলছে চলুক, একটা সময় আসবে যখন প্রীতির বাড়ী থেকে বিয়ের কথা উঠবে, পাত্র দেখার উদ্যোগ শুরু হবে, তখন একদিন প্রীতি বাড়ীতে তাদের ব্যাপারটা বলবে। তা-ই করেছে! দুজনের বাড়ী থেকেই ও দের ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে। পাত্রপক্ষ কন্যাপক্ষ পরস্পরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেছে, কথাবার্তা বলেছে, পাকা দেখা, আশীর্বাদ ইত্যাদি অনুষ্ঠান বিধিমতই সমস্ত হয়েছে। ওরা যে পাঁচ বছরেরও ওপর প্রেম করেছে, ওদের বাবা মা, আত্মীয়স্বজন তার কোন গুরুত্বই দেয়নি। দু-মাস আগে বিয়ের দিন ঠিক হয়ে যাওয়ার পর থেকেই দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ। অবশ্য টেলি-ফোনে কথা হয়। বন্ধুদের নিমন্ত্রণের আলাদা কার্ড করেছে দুজনেই। এমন অনেক বন্ধু আছে যারা মিহিরেরও বন্ধু, প্রীতিরও বন্ধু। কথা ছিল একদিন সকালে দুজনে বেরিয়ে সেই সব বন্ধুদের বাড়ী যাবে—প্রীতি

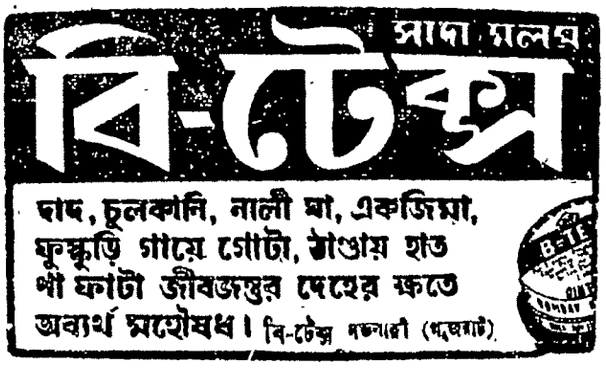

করবে বিয়ের নিমন্ত্রণ, মিহির করবে বৌভাতের নিমন্ত্রণ।

যেমন হয়, বেনারসী কেনা হয়ে যায় এক মাস আগে, গয়না তো কয়েক বছর আগেই গড়ানো হয়ে থাকে, শুধু কিছু কিছু পুরোনো ডিজাইন বদলে নতুন ডিজাইন করে নেয়া—সে-সবও অনেক আগেই হয়ে যায়। তাছাড়া আরো কত জিনিস কেনা-কাটার থাকে, একে একে সবই হয়, শুধু নিমন্ত্রণ করাটাই বাকী থেকে যায়। যখন একেবারে হাতে আর দিন থাকে না তখন খেয়াল হয়, তাড়াতাড়ি একটা দিন ঠিক করে, সকালে দুজনে বেরিয়ে বিকেলের মধ্যেই সব নিমন্ত্রণ শেষ করে ফেলবে। পরের দিন সকাল থেকে প্রীতির জ্বর। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে জ্বর, কিন্তু বাইরে বেরোন বারণ। তাই তার তরফের নিমন্ত্রণের ভার নিতে হয়েছে জয়ন্তীকে। প্রীতির এবং মিহিরের বন্ধুদের অনেকেই জয়ন্তীরও বন্ধু।

এসপ্ল্যানেড এসে গেছে। ট্রামে তেমন ভীড় ছিল না, জয়ন্তীর শাড়ি, সাজসজ্জা, একটুও এলোমেলো হয়নি। এসপ্ল্যানেডের রাস্তায় এখনো কুয়াশার রেশ লেগে আছে। এমন সকালবেলার এসপ্ল্যানেড অনেকদিন দেখেনি, বিকেল আর সন্ধ্যার এসপ্ল্যানেড দেখতে অভ্যস্ত জয়ন্তী, এক ধরনের রোমাঞ্চ অনুভব করছে আজ। প্রীতির কথা মনে পড়ল। এখনো হয়ত ঘুম ভাঙেনি প্রীতির। হয়ত ঘুম ভেঙ্গে গেছে ভোরেই, জেগে শুয়ে আছে। জয়ন্তী স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে প্রীতির দুটো চোখ চেয়ে আছে তার দিকে।

রাস্তা পার হওয়ার আগেই একটা ট্যাকসি সামনে এসে দাঁড়ায়, জয়ন্তী চমকে গিয়েছিল, পরক্ষণেই দেখতে পায় মিহিরকে। জয়ন্তীকে দেখে ছেলেমানুষের মত খুসী হয়ে উঠেছে মিহির। তাড়াতাড়ি ট্যাকসির দরজা খুলে দিয়ে ডাকে—আসুন! জয়ন্তী খুব সহজ ভঙ্গিতে ট্যাকসিতে ওঠে। মিহির একটু সরে বসে তারপর ড্রাইভারকে নির্দেশ দেয়। তারপর জয়ন্তীর মুখের দিকে ফেরে। জয়ন্তীও মুখ ফেরায়, একটা সলজ্জ হাসি তার ঠোঁটে ফুটে ওঠে, ক্রমে হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে যায়। মিহির কোন কথা বলে না, জয়ন্তীর দিকে চেয়েই থাকে। এক অভিনব লজ্জায় জয়ন্তী আরক্ত হয়, অদ্ভুত হেসে চোখদুটো ফিরিয়ে নেয়।

মিহির বলল, চা খেলে হত?

জয়ন্তী বলল, আপনি চা খাননি সকালে?

মিহির বলল, হ্যাঁ খেয়েছি- আপনি খেয়েছেন?

হ্যাঁ। জয়ন্তী মিহিরের দিকে মুখ ফেরায়।

মিহির বলে, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে খুব ভোরে উঠেছেন—।

জয়ন্তী হাসে।—এরকম বোঝা যায় নাকি?

আগে কোনদিন বুঝিনি, আজ প্রথম মনে হল আপনাকে দেখে।

আচ্ছা! জয়ন্তীর আবার সেই লজ্জা এবং হাসি।

মিহির বলে, আপনাকে অনেকদিন এত উজ্জ্বল দেখিনি—।

জয়ন্তীর ভাল লাগে মিহিরের এই প্রশস্তি। বুকের ওপরে রাখা শাড়ির আঁচলটা অকারণে সরিয়ে আবার রাখে। সিল্কের শাড়ির আঁচল গাড়ির মধ্যে এলোমেলো হাওয়ায় উড়তে থাকে, কয়েকবার মিহিরের মুখের ওপর উড়ে পড়ে। আঁচল নিয়ে বিব্রত হয় জয়ন্তী। দু-একবার মিহিরের বুকে ছুঁয়ে যায় তার হাত। তার দুর্বল মুহূর্তগুলো মিহির কেমন উপভোগ করে। জয়ন্তী বলে—কথা বলুন।

মিহির বলে—দেখছি।

জয়ন্তীর বলতে ইচ্ছা করে—আপনি ভীষণ অসভ্য। দুটো চোখ দিয়ে তাই বলে জয়ন্তী।

মিহির বলে, আপনাকে সত্যি আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

জয়ন্তী বলে, আমি জানি আমি দেখতে সুন্দর নই!

কে বলেছে! মিহির বলে- আপনি অনেকের চেয়ে সুন্দর।

প্রীতির চেয়ে?

হয়তো।

তাই?

মিহির যেন উত্তর দিতে ভুলে যায়, হঠাৎ সে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। যেন কিছু খুব গভীরভাবে ভাবতে থাকে।

জয়ন্তীর মনে হয় মিহিরের সঙ্গে এইভাবে কথা বলা ঠিক হয়নি।

মিহিরের সঙ্গে এইভাবে একা জয়ন্তী আগে কোনদিন বেরোয়নি। প্রত্যেকবার প্রীতি থেকেছে। প্রীতি থাকলে মিহির জয়ন্তীর সঙ্গে খুব সহজভাবে মেশে। আজ মিহিরের কী হয়েছে একটা সংকোচ শুরু থেকেই লুকোতে চাইছে, জানে না কি জয়ন্তী শুরুতেই সেটা টের পেয়ে গেছে। আরো কিছু জানতে চায়, একে একে জেনে নেবে জয়ন্তী। মিহির যে কথার মাঝখানে কেন হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল অনেকক্ষণ আর কোন কথা বলছে না এ নিয়ে জয়ন্তী এলোমেলো অনেক কিছু ভাবল। একসময় এই নীরবতা অসহ্য মনে হতে লাগল। তারও অনেক পরে জয়ন্তী কথা খুঁজে পেল। বলল —ও কেমন আছে জিজ্ঞাসা করলেন না?

মিহির এতক্ষণ যে জগতে ছিল সেখান থেকেই বলে—কে, কার কথা বলছেন?

বলছি আপনার ভাবী স্ত্রী, প্রীতির কথা। —ও কেমন আছে একবারও তো জিজ্ঞাসা করলেন না।

ও—আচ্ছা। কেমন আছে ও?

কাল সন্ধ্যেয় জ্বরটা ছিল—আজ সকালে হয়তো থাকবে না।

মিহিরের যেন উৎসাহ নেই, বলে—ঠাণ্ডা লেগে থাকবে—তার বেশী কিছু নয়।

হঠাৎ কী করে এমন ঠাণ্ডা লাগল—এর মধ্যে কোনদিন বেরিয়েছিলেন নাকি সন্ধ্যের পর?

নাঃ! আপনি তো জানতেই পারতেন তাহলে।

তাই তো ভাবছি ঠাণ্ডাটা লাগল কী করে—।

মিহির বলল, সিজন চেঞ্জের সময়।

তা ঠিক! আপনিও সাবধানে থাকবেন।

জয়ন্তী কী বলতে চাইছে যেন ঠিক বুঝতে পেরেছে মিহির, কিন্তু তার হাসি বলছে সে অন্য কথা ভাবছে।

জয়ন্তী বলল—ভাবছেন তো ওর জ্বরটা যদি খারাপ কিছুর দিকে যায়।

না। নিশ্চয়ই সন্ধ্যের পর চানটান করেছিল। আপনার বন্ধু তো আসলে ভীষণ জেদী, নিজে যেটা ভালো মনে করবে তাই করবে—অন্যের সুবিধে অসুবিধের কথা কোনদিন ভাবে না!

জয়ন্তী বলে—ও এখানে নেই তাই ওর নামে যা খুসী বলে নিচ্ছেন।

মিহির বলে—না—আপনি বলুন ও অসম্ভব জেদী কিনা—।

আপনি ওকে খুব ভয় করেন না?

মিহির একথার কী উত্তর দেবে রীতিমত অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে।

জয়ন্তী প্রসঙ্গ বদলাতে ব্যস্ত হয় বলে—আপনি কেমন আছেন বলুন

কেন—আমার তো কিছু হয়নি।

কিছুই মনে হচ্ছে না?

ও। মিহির হাসে। হাসিটা আবার তেমন স্বচ্ছন্দ হয় না। মিহির কিছুতেই সেই সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারছে না।

জয়ন্তী জেনে গেছে মিহির খুব বেশী মেয়ের সঙ্গে মেশেনি। খুব স্মার্ট দেখতে হলে কী হয়, প্রীতি ছাড়া আর কোন মেয়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কোনদিন এসেছে মনে হয় না। ওর চোখ দুটোর দিকে একটু তাকালেই

সহজ ছন্দের হৃদয়স্পর্শী
কবিতার সংকলন

কাব্য সুষমা

ইন্দু দাঁ

দাম—দশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : "কবিনিবাস" — "মমতা"
৫৯, পাবমাব রোড ভদ্রকালী
উত্তরপাড়া, হুগলী

কিন্তু বোঝা যায় জয়ন্তী অন্তত বুঝতে পারে অন্য মেয়ের সম্পর্কে ওর দুর্বলতা আছে। শুধু দ্বিধাটুকু কাটিয়ে উঠতে পারে না। এমনও হতে পারে যে জয়ন্তী ওকে ভুল বুঝছে—কতদিন আর এই তো মাত্র একটা দিন আজ সকাল থেকে এতক্ষণ সে একা—একক সান্নিধ্যে এত কাছ থেকে মিহিরকে দেখছে! এমন এক পুরুষকে দেখছে যার চোখে মুখে ভীরু কিশোরের লজ্জা আবেগ আর কৌতূহল জয়ন্তী নামে একটি মেয়েকে দেখবার অদম্য ইচ্ছা—ইচ্ছাটা ভাঙছে, গড়ছে—ভাঙছে—। আগে প্রত্যেকবার অনেক কাজে থেকেও মিহিরের সান্নিধ্য ছিল দুরের আজ সেই দূরত্ব দূর হয়েছে ইচ্ছা করলেই আজ যে কোন কথা বলা যায় মিহিরকে। একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ বার বার জয়ন্তীর ভেতরটা কাঁপিয়ে দিচ্ছে; যা বলা যায় না এমন কোন কথা বলতে ভীষণ ইচ্ছা করছে জয়ন্তী। মনে হচ্ছে সে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে। কী ভাবতে কী ভাবছে—কী বলতে কী বলছে। এমন মনে হচ্ছে যা সে হয়ত বলেনি—সেই কথা যেন বলেছে! অস্থিরতা না আবেগ তাকে ক্রমশ অসহায় করে তুলছে। একবার মনে হল সে তার সীমা পেরিয়ে যাক!—পুরুষ বন্ধু তো এই একজনই আর যারা আছে তারা তার পরিচিত মাত্র—বন্ধু একা মিহির। এবং আজ মাঝখানে প্রীতি নেই!—অর কোনদিন মিহিরকে এত নির্জনে এমন একা পাওয়ার কোন আশা নেই! এখন কী করতে পারে জয়ন্তী! কী করতে পারে।

জয়ন্তী ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন দগ্ধ হয়—অক্ষমতায় আর্তনাদ করে। ক্ষোভে মরিয়া হয়ে উঠতে চায়।

মিহির বলে আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে জয়ন্তী—।

নাঃ! জয়ন্তীর ঠোঁটে হাসি। দুটো ঠোঁটের ওপর হাসি স্থির হয়ে থাকে—মিহির মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে। ঠোঁটের ওপর হাসি ক্রমে কত ভাঙে গড়ে কত বিভিন্ন হয়—মিহির আর ইচ্ছা করলেই চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে না। তখন জয়ন্তী বলে— মিহির আমি কেমন দেখতে ভালো করে কোনদিন বলেননি—আজও না: আমাকে দেখতে ইচ্ছা করে না?

মিহির কি এ কথার কোন উত্তর দিয়েছিল!—দিয়েছিল কিনা একটু পরে আর মনে করতে পারে না জয়ন্তী। তার একবার মনে হয় উত্তর দেয়নি। আবার মনে হয় দিয়েছিল। যদি দিয়ে থাকে—কী বলেছিল?—মনে করতে পারে না। তাহলে কোন উত্তর দেয়নি! তবে কী করেছিল মিহির উদাসীন-ভাবে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল—মিহির তাই কি পেরেছিল? জয়ন্তীর মন বলে আচ্ছা সে কি সত্যিই বলেছিল সেই কথা—। কী কথা—? কী বলতে চেয়েছিল। জয়ন্তী কিছুতেই সেই মুহূর্তে ফিরে যেতে পারে না। নিজেকে তার খুব অসহায় মনে হয়। এই বিভ্রান্তি থেকে সে মুক্তি চায়। একবার মনে হয় বলে মিহির আমার শরীর খুব খারাপ লাগছে! —মিহির।

মিহির মুখ ফেরায়।

আচ্ছা মিহির আপনাকে কোন কথা আমি বলেছিলাম—।

কবে?

কোনদিন?

না—।

বলিনি না—।

না—।

আপনি আমাকে কোনদিন বলেছেন কোন কথা।

আজ বলব। অনেকদিন থেকে কথাটা আপনাকে বলব ভাবছি।

সব জায়গায় নিমন্ত্রণ সেরে দুপুরের একটু পরে তারা এসপ্ল্যানেডে ফিরে এল।

মিহির বলল—কী খাবেন বলুন আপনাকে খাওয়াবো—।

একটা চীনা রেস্টুরেন্টের কোণের দিকের টেবিলে মুখোমুখি বসল।

বলুন কী খাবেন—।

আপনি বলুন।

মিহির কিছুক্ষণ মেনুকার্ড পড়ল। তারপর চেনা খাবারের অর্ডার দিল। চিকেন চাউ মিং চিলি চিকেন। শেষে আইসক্রীম।

প্রায় এক ঘন্টা সময় নিয়ে তারা খেল কিন্তু প্রায় কোন কথাই হল না। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে যখন আবার রাস্তায় নামল তখন প্রায় সিনেমার ম্যাটিনী শোর সময় হয়ে গেছে।

যেন আজ এই খাওয়ার পর তাদের সিনেমা দেখার কথা অনেকদিন আগেই স্থির ছিল।

নিউ এম্পায়ারে, লাইট হাউসে টিকিট পাওয়া গেল না—গ্লোবে পাওয়া গেল টিকিট। সবচেয়ে দামী সিটের দুটো টিকিট কাটল মিহির। টিকিট কাটার পর দেখল কী ছবি হচ্ছে।

মিহির বলল—হাসির ছবি আমার তেমন ভালো লাগে না।

জয়ন্তী বলল—আমার কাছে সব ইংরাজী ছবি একইরকম মনে হয়।

মিহির বলল, বসে তো গল্প করা যাবে।

জয়ন্তি হাসল।

নিশ্চিন্তে বসে গল্প করার মতো সিট দুটো পেয়েছে তারা। তাদের পিছনে কোন সিট নেই দেয়াল—তাদের বাঁদিকে কোন সিট নেই দেয়াল—ডানদিকে সিট আছে কিন্তু যারা কাছে লোকজন কেউ বসে নেই। দূরে দূরে দুজন দুজন বসে। ছবিটা ভাল চলছে না। যারা দুপুরে নির্জনতা খোঁজে তারা ঠিক খবর রাখে এমন রঙ্গীন কোথাও ঘরে দু ঘন্টা কাটিয়ে যায়।

জয়ন্তীর মনে পড়ে যায় প্রীতি নেই! প্রীতি নেই এখানে সে একা সে মিহিরের পাশে বসে। তারে এইভাবে সে নিজেকে কল্পনা করেছে কতদিন—কত দিন! ভাবতে ভাবতে ভাবতে ভাবতে নিজেকে যেন ভুলে যায়। দেয়ালে আঙুল রাখে ঠান্ডা মসৃণ দেয়ালে নরম আঙুলে খেলা করে। ধীরে ধীরে আলো নিভে আসে। জয়ন্তী আবার ধীরে ধীরে নিজের মধ্যে ফিরে আসে।

ছবি শুরু হয়। রঙিন ছবি। বিশাল আলো খেলে সারা ঘরে।

অনেকক্ষণ মিহির কথা বলেনি। জয়ন্তী অনেকবার ফিরে ফিরে দেখছে মিহিরকে। একটু আগে যে মিহির ছিল সেই মিহির যেন নেই। এই মিহিরের যেন কোন কিছুতেই কোন উৎসাহ নেই।

কথা বলছেন না কী হয়েছে?

কিছু না।

তবে।

ভাবছি—।

কী—। প্রীতির কথা নিশ্চয়ই।

প্রীতি—না!

তবে কার কথা ভাবছেন?

আপনার কথা।

বাজে কথা।

কেন আপনার কথা ভাবতে পারি না?

কী ভাবছেন বলুন তাহলে।

ভাবছি বলব কিনা।

বলুন—।

আচ্ছা আপনার সঙ্গে আমার আগে আলাপ হতে পারত।

বুঝতে পারলাম না। আলো একটু পরিষ্কার করে বলুন—।

জয়ন্তীর গালের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে মিহির বলে—আপনার বন্ধুর আগে আপনার সঙ্গে আমার যদি দেখা হত!

একথা কেন বলছেন—।

আপনি রাগ করলেন?

না—।

মনে হল তাই না, বলে পারলাম না। আপনি হয়ত রাগ করলেন।

রাগ করিনি—।

এই সময় জয়ন্তীর মনে হল মিহিরের একটা হাত তার হাত ছুঁয়ে গেল। মিহির কি ইচ্ছা করেই তাকে ছুঁলো। এমনভাবে ছুঁয়েছে বোঝা যায় যত সময় যাচ্ছে ততই স্পষ্ট হচ্ছে যে মিহির যা করছে ইচ্ছা করেই করেছে! তারপর থেকে ও আর কথা বলছে না। ও কি অপেক্ষা করছে জয়ন্তীর তরফ থেকে কোনরকম সাড়া আসে কিনা।

জয়ন্তী যদি সাড়া দেয় সেটা কি অন্যায় হবে। এই রকম অন্যায় কি অপরাধ! জয়ন্তীর কৌতূহল হয়। কৌতূহল তার সারা শরীরে সংক্রামিত হয়। মিহিরকে যদি

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, ছাত্র ও গৃহস্থ সকলের পক্ষে উপযোগী অনবদ্য সৃষ্টি

চিকিৎসক সাক্ষীও গৃহস্নেহর বন্ধু

ডাঃ কালীচরণ দে (এম-এ)

পুস্তকপ্রকাশনী, ৮২।১, মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৯

...ন ...শ...ম যে তাকে ছুঁয়েছে তা সে জানে। তারপর কী হয় জানতে ইচ্ছা হয়। বাসনায় পুড়তে থাকে জয়ন্তী। তবু অনেকক্ষণ কিছুই করতে পারে না। তারপর একসময় পারল।

সত্যি কি পেরেছিল মিহিরকে ছুঁয়ে-ছিল, একটু পরে জয়ন্তী আর মনে করতে পারে না। শুধু মনে হয় জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে শরীর। গভীর ঘোরের মধ্যে থেকে অনুভব করছে তার একটা হাত কারো কোলের ওপর—একটা কঠিন মুঠির পেষণে দলে পিষে যাচ্ছে তার নরম আঙুল যেন তার গোটা শরীরটাও। যত সময় যাচ্ছে মিহির তত নিবিড় হতে চাইছে। মিহিরের একটা হাত উঠে আসে জয়ন্তীর কোলে। জয়ন্তী আবেগে কাঁপে। আবেগ। ক্রমে উত্তাল হবে, সে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাবে। নিজেকে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাবে। নিজেকে সম্পূর্ণ হারাবার আগে জয়ন্তী প্রীতির কথা ভাবে। তারপর ধীরে ধীরে মিহির যাতে কোনরকম আঘাত না পায় সযত্নে যেন খেলার ছলে কোল থেকে মিহিরের হাত নামিয়ে দেয়। তারপর যেন কিছুই ঘটেনি যদি কিছু ঘটে থেকেও জয়ন্তী কিছু মনে করেনি স্বচ্ছন্দে বলে—কী কথা বলবেন না?

সামনে সিনেমার পর্দায় একের পর এক হাসির ঘটনা ঘটছিল দর্শকদের মধ্যে থেকে থেকে হাসির রোল উঠছিল। হাসি থামলে মিহির বলল—আপনাকে একটা কথা বলব বলেছিলাম—।

কেন বলুন না—।

মিহির কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বলল—আচ্ছা আমার কথা ও বলে আপনাকে—।

বলে তো—অনেক বলেছে কেন?

আমার যে কথা ও জানে না—কোনদিন জানবে না সেই কথা আপনাকে বলতে ইচ্ছা করে; কিন্তু যদি আপনার শুনতে ভাল না লাগে!

ভাল লাগবে—।

না যদি ভুল বোঝেন সেই ভয়।

ভুল বুঝব না—।

কী জানি!—আচ্ছা আপনার কি মনে হয় আমরা খুব সুখী হব।

সেটা কী করে বলব—। তবে প্রীতি নিশ্চয়ই খুব সুখী হবে।

আপনি আমার কথা ভাবেন না।

জয়ন্তী একথায় কী উত্তর দেবে, মিহিরের মুখের দিকে মুখ ফেরায়।

মিহিরের মুখে আলো-ছায়া খেলে। জয়ন্তীর মনে হয় সম্পূর্ণ অচেনা এক পুরুষের মুখ। কোন অজানা পুরুষ কথা বলে।—ওর সঙ্গে অনেকদিন তো মিশছি ওকে আমার জানা শেষ হয়ে গেছে!

ও আপনাকে ভালোবাসে—।

ও শুধু নিজেকে ভালোবাসে!

ও কিন্তু ভালো—।

ও ভীষণ জেদী!

ও চিরদিন একটু ওই রকম—।

ও শুধু জেদী নয় খুব স্বার্থপরও! নিজের সুখ ছাড়া আর কিছু জানে না। সুখের যদি এতটুকু হানি হয়—যা পেতে চায় তা পেতে যদি এক মুহূর্ত দেরী হয়—ও নির্মম হয়ে ওঠে। নির্মম আর নির্লজ্জ! ও এখন এত নীচ আচরণ করে এমন সমস্ত কুৎসিৎ ভাষায় কথা বলে—আমি বলতে পারব না—কোনদিন বলতে পারব না! —আমি কোনদিন একটুও শান্তি পাব না!

খুব হতাশ দুঃখীর মত দেখায় মিহিরকে।

জয়ন্তী সান্ত্বনার মত করে বলে কী হয়েছে বলুন তো আপনাদের—আবার ঝগড়া করেছেন। কেন এমন করেন।

মিহির ভেঙ্গে পড়া মানুষের কণ্ঠে বলে—আমাদের চিরকাল ঝগড়া হবে! ও ঝগড়া করবে!

না-না তা হতে পারে না—প্রীতি নিশ্চয়ই তা করবে না।

জয়ন্তী আমি প্রীতিকে জানি। ভাবনা চিন্তা ভাল লাগা মন্দ লাগা—সমস্ত কিছুতে ওর আমার মধ্যে বিরাট পার্থক্য। ওর সুন্দর শরীর—শরীরটাই ওর সব তার বাইরে ওর আর কোন পরিচয় নেই! শাড়ি গয়নায় শরীরটা আরো দর্শনীয় করে তুলতেই ও ব্যস্ত। ওর কাছে আমার আর কিছুই পাওয়ার নেই! ও কোনদিন জানবে না আমি ওকে ভালোবাসতে পারব না। ভালো খাওয়া পরা, টাকা পয়সা—স্থূলরুচির একটা মেয়ে আর যা যা চায় সব ও পাবে শুধু আমাকে পাবে না কোনদিন। চিরদিন আমি ওর কাছে থেকেও অ-নে-কে দূরে থাকব যা ও কখনো জানতেও পারবে না!

সারা সিনেমা হল জুড়ে জোড় হাত-তালির সঙ্গে উচ্চ হাসির রোল উঠল। ছবি শেষ হয়ে গেল!

বাইরে অনেকক্ষণ সন্ধ্যে হয়েছে—পথের ওপর কুয়াশার জাল পাতা। মিহির জয়ন্তীর পাশাপাশি খুব কাছাকাছি হাঁটে।

চা খাবেন তো।

ইচ্ছে করছে না—।

তাহলে—।

বাড়ী যাই—।

বাড়ী যাবেন বেশ চলুন আপনাকে পৌঁছে দিই।

আমি ট্রামে করে চলে যাব আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।

আপনাকে পৌঁছে দিতে আমার কোন কষ্ট হবে না।

জানি—। তবু আপনাকে আর যেতে হবে না।

আপনার সঙ্গে আরো একটু থাকি আপনি চান না!

আমি তাই বলেছি! ছি! ছি!—চলুন।

না থাক।

না চলুন।

না! আপনাকে ট্রামে তুলে দিই—। আপনার অনেক দেরী করিয়ে দিলুম।

এভাবে কথা বলছেন কেন?

জানি না। আপনার হয়ত ইচ্ছা ছিল না? আপনার হয়ত ভালো লাগেনি!—আমার সম্বন্ধে কী ভাবলেন যদি জানতে পারতাম!

ট্রাম এসে গেছে। কোন উত্তর দেয়া হয়ে ওঠে না জয়ন্তীর। একটু শুধু হাসল।

যাচ্ছি—।

মিহির কোন কথা বলে না।

অনেকটা দূরে গিয়েও জয়ন্তী দেখতে পায় দূরে কুয়াশায় মিহির নিঃঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে।

সকালবেলার মতোই খালি ট্রাম। ঘোলাটে আলোর ভেতরে কয়েকজন বসে আছে যে যার মধ্যে ডুবে। জয়ন্তীও ডুবে যায় নিজের মধ্যে।

যেন একটা দীর্ঘ দুঃস্বপ্ন পার হয়ে এল। ট্রাম থেকে নেমেই জয়ন্তীর মনে হল সেই ভালো, প্রীতিকে সব কথা বলবে, কোন কিছুই গোপন করবে না। তাতে যদি বিয়েটা ভেঙ্গে যায়, ভালোই হবে প্রীতির! জীবনভোর বঞ্চনা নিয়ে কে বাঁচতে চায়! সব শোনার পর প্রীতি নিশ্চয়ই বিয়ে ভেঙ্গে দেবে!

কুয়াশায় অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে। ধারে কাছে মানুষের সাড়া শব্দ নেই শুধু পোকা-মাকড়ের অস্তিত্বটাই প্রখর হয়ে উঠেছে! তীক্ষ্ণ হয়ে কানে বিঁধছে যত ইতর প্রাণীর উল্লাস। মাথাটা ধরেছে ভীষণ। কপালের দুপাশে শিরাগুলো দপ দপ করছে উত্তেজনায়—দংশনে দংশনে অস্থির করে তুলছে। গলাটা শুখিয়ে আসছে। দেহে মনে অসহ্য একটা কষ্ট।

একটা উদ্বেগ তীব্রতর হচ্ছে। প্রীতিদের বাড়ী আর বেশী দূরে নেই—। প্রীতিকে সব কথা বলবে ভেবেছিল কিন্তু কিভাবে বলবে এখনো কিছুই গুছিয়ে ভাবতে পারছে না। মিহির কী বলেছিল—কথা-গুলো আর কিছুতেই মনে করতে পারছে না। মনে পড়ছে—সঙ্গতিহীন টুকরো টুকরো ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কিছু কথা যেন সব প্রলাপ। যা জয়ন্তীকে আরো বিষম বিভ্রান্তির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। সে ক্রমশ আরো ঘন কাঁটা বনের মধ্যে চলে যাচ্ছে—।

হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয় জয়ন্তী। মাত্র তো একটা দিন সকাল থেকে সন্ধ্যে সে মিহিরের সঙ্গে কাটিয়েছে; প্রীত পাঁচ বছরেরও বেশী মিশছে মিহিরের সঙ্গে। কী জানতে বাকী আছে আর প্রীতির! নতুন কথা তাকে কী শোনাবে!

একটা নতুন কথা শোনাতে পারে—। মিহির বলেছিল প্রীতির আগে জয়ন্তীর সঙ্গে তার দেখা হতে পারত।—কিন্তু কি লাভ শুনিয়ে কথাটা! সত্যিই তো আর মিহিরের সঙ্গে প্রীতির আগে তার দেখা হয়নি!

এবং নিশ্চয়ই প্রীতির জ্বরটা সাধারণ সর্দি জ্বর ছাড়া অন্য কিছু নয়।

স্বনামধন্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছাড়া আর একজন সাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন। যেমন ছিলেন দুই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু দ্বিতীয় আশুতোষের নাম সাধারণ্যে বিশেষ পরিচিত না হলেও নানা ধরনের বহু বিচিত্র বই লিখেছিলেন তিনি। শুধু বাংলায় নয় ইংরেজীতেও অনেক প্রয়োজনীয় বই যেমন অফিসের কাজকর্ম শেখার জন্য 'ক্লার্কস গাইড' চিঠিপত্র ও দরখাস্ত প্রভৃতি লেখার জন্য 'কমপ্লিট করসপনডেন্স' ইংরেজী প্রবাদ-প্রবচনের অভিধান 'প্রভৃতি 'এ ডিকসনারি অফ প্রভার্বস' প্রভৃতি রচনা করেন আশুতোষ।

তাঁর অন্যান্য বাংলা রচনার মধ্যে 'পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য' ও 'বিশ্ব-বৈচিত্র্য' যেমন বৃত্তান্ত বহুল তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। বিশ্ব-বৈচিত্র্য ১৩১৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি সচিত্র এবং তার মধ্যে জল স্থল ও আকাশ নামক তিনটি পরিচ্ছেদের মধ্যে এমন সব বিচিত্র অত্যাশ্চর্য বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায় যা পাঠ করে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অভিভূত হবেন। উক্ত গ্রন্থের প্রথম জল পরিচ্ছেদ থেকে 'মৎস্য-নারী' নামধেয় রচনাটি উদ্ধৃত করে এস্থলে আমরা অমৃতের পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দিলাম।

।।মৎস্য-নারী।।

সর্বদেশে সকল সময়ে জনসাধারণ মধ্যে এই কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে অপরিমেয় সমুদ্র-গর্ভে অর্ধ-মনুষ্য ও অর্ধ মৎস্যের ন্যায় আকৃত বিশিষ্ট জীব বাস করিয়া থাকে। কিন্তু অধুনাতন বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে বিশ্ববাজ্যে ওরূপ প্রাণীর অস্তিত্ব কখনই সম্ভবপর নহে; উহা কেবল কাল্পনিক কথা মাত্র। একথা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল সেই অপরিসীম-শক্তিসম্পন্ন বিশ্বাধিপতি মনে করিলে সকল প্রকার বস্তুই সৃষ্টি করিতে পারেন; এবং ইহা যে কাল্পনিক কথা মাত্র নহে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তন্মধ্যে কয়েকটি সন্নিবেশিত হইল।

মেগাসথিনিস লিখিয়া গিয়াছেন যে টাপ্রোবানা বা লঙ্কাদ্বীপের নিকটবর্তী সমুদ্রে স্ত্রীলোকের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট জীব বাস করিয়া থাকে। ইলিয়ান নামক একজন বিখ্যাত লেখক লিখিয়াছেন যে দৈত্যাকৃতি মৎস্য সমুদ্র মধ্যে বাস করিয়া

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম.বি, ডি.জি.ও.
ডাঃ এস এন পাণ্ডে এম.বি.বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য-৮৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও বহুচিত্রে চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী ৩৫ নং স্কুলেন স্ট্রীট কলিকাতা ৯
অগ্রিম ৮৲ টাকা পাঠাইলে ডাকমাশুল ফ্রী

পুনশ্চ

থাকে। ভারতবর্ষের পূর্ববর্তন পর্তুগীজ ঔপনিবেশিকগণ কহিতেন যে পূর্ব সমুদ্রে যথার্থ সাগর-নর দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনেক নাবিক বহুদিন সমুদ্রবাসের পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া শপথ করিয়া কহিত যে আমরা অর্দ্ধমনুষ্য ও অর্দ্ধমৎস্যাকৃতি জীব সচক্ষে সন্দর্শন করিয়াছি।'

ভেলেটিন নামক এক উচ্চ ঔপনিবেশিক ধর্ম্মাধিক্ষ স্বীয় প্রাণী বৃত্তান্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে টকোয়ানের গীর্জ্জার নিকট ১৬৬১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল প্রাতঃকালে সমুদ্র মধ্যে এক সমুদ্র-নর দৃষ্ট হইয়াছিল এবং ঐ দিবস অপরাহ্ন সময়ে এক সাগর-নারীও নয়নগোচর হইয়াছিল। আর ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে বুরো দ্বীপের সমীপে এক সাগর-নারী কেবল যে জনগণের নয়ন পথবর্ত্তিনী হইয়াছিল তাহা নহে সে মনুষ্যগণ কর্তৃক ধৃতও হইয়াছিল। এই ধৃত সাগর-নারী দৈর্ঘ্যে প্রায় পাঁচ ফুট ছিল। সে স্থলোপরি নীত হইয়া অবধি কোন খাদ্য ভোজন করে নাই ইহাতে সে চারিদিন সাত ঘণ্টাকাল জীবিত ছিল।

উক্ত ভেলেটিন আরও কহিয়াছেন যে এমবয়না দ্বীপেও অনেক সাগর-নর ও সাগর-নারী ধৃত হইয়াছিল। গীর্জ্জাসমাহরণ প্রাদেশিক তত্ত্বাধায়ক একটি ধৃত করিয়া তত্রত্য শাসনকর্ত্তা ভ্যান্দাবস্টেলকে উপঢৌকন-স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই ধৃত অদ্ভুত প্রাণীর এক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। এই প্রকার জীবের সমাচার ইউরোপে প্রচারিত হইলে ফলস্তীয় ইংরাজ রাজমন্ত্রী ১৭১৬ খৃষ্টাব্দের ১৮শে ডিসেম্বর ভেলেটিনকে এক পত্র লেখেন। এই পত্রের মর্ম্ম এই যে আমষ্টার্ডাম নগরে বসিয়া বিখ্যাত সম্রাট মহান পিটার উক্ত রাজমন্ত্রীর বাটীতে অতিথিস্বরূপ অবস্থিতি করিতেছেন। ভেলেটিন যদি অনুগ্রহ করিয়া একটি সাগর-নারী স্বদেশে আনয়ন করেন তাহা হইলে সম্রাট পিটার বড়ই প্রীত হইবেন।

ভেলেটিন আরও লিখিয়া গিয়াছেন যে ফলন্দ দেশ সমুদ্রের অপেক্ষা অনেক নিম্ন। তজ্জন্য সমুদ্রের জলপ্লাবন নিবারণার্থ ফলন্দ দেশের পার্শ্ব সকল সুদৃঢ় মৃত্তিকা প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে তথায় একটি প্রবল ঝটিকা হয়। সমুদ্রের প্রচণ্ড ঊর্মিমালাঘাতে ঐ প্রাচীর শ্রেণীর কিয়দংশ ভগ্ন হওয়াতে নিকটবর্তী জনপদসমূহ সমুদ্র জলে প্লাবিত হইয়াছিল। এক দিবস কতকগুলি স্ত্রীলোক নৌকারোহণে সেই প্লাবিত স্থান উত্তীর্ণ হইবার সময় সহসা জলোপরি মনুষ্য মস্তকের ন্যায় একটি পদার্থ দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা নিকটে যাইয়া দেখিলেন যে একটি সুন্দরী নারী গভীর জলে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উহার মস্তক হইতে নাভি পর্যন্ত সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই স্ত্রীলোকের ন্যায়। কিন্তু নাভির অধোদেশ হইতে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মৎস্যাকৃতি। ইহার মস্তকে বিপুল কেশরাশি এবং মুখমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল যুবতী রমণীর ন্যায়।

নৌকাস্থিতা রমণীগণ সেই আশ্চর্য নারী-ললনা দর্শন করতঃ বিস্ময়াবিষ্টা হইয়া তাহাকে বলপূর্বক ধৃত করিয়া হাবলাম নগরে আনয়ন করিলেন। ক্রমে ক্রমে ঐ আশ্চর্য জীবের কথা নগরের শাসনকর্ত্তার কর্ণগোচর হইল। তিনি উহার বাসের জন্য যথোপযুক্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট ও সেবার জন্য একটি পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ঐ নর-নারী মনুষ্যের নিকট থাকিয়া মনুষ্যের অনেক আচার-ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছিল। মনুষ্যের ন্যায় দুগ্ধ ও রুটি আহার করিত; স্ত্রীলোকের ন্যায় পরিচ্ছদ ব্যবহার করিত। মনুষ্যের জীবনধারণোপযোগী অনেক কাজকর্ম্মও শিক্ষা করিয়াছিল। এমন কি সে সূতা প্রস্তুত করিতে পারিত। অধিকতর আশ্চর্যের বিষয় এই যে তাহার অন্তঃকরণে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সংস্কার জন্মিয়াছিল। খৃষ্টানদিগের সহবাসে থাকিয়া খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। কিন্তু এই নর-নারী মনুষ্য ভাষায় কথা কহিতে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং তাহার মনের ভাব মনুষ্যলোকে প্রকাশিত হয় নাই। হাবলাম নগরে ঐ আশ্চর্য নারী ১৩ বৎসর কাল জীবিত ছিল। তাহার মৃত্যু হইলে হাবলামবাসীগণ খৃষ্টধর্ম্মানুসারে তাহার সমাধি করিয়াছিল।

১৬১০ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন রিচার্ড হাইটবোরন সাহেব সেন্ট জন হাববার নামক সমুদ্র শাখায় একটি মৎস্য-নারী দেখিতে পাইয়াছিলেন। দূর হইতে তিনি ঐ নারীর মস্তকে স্ত্রীজাতির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ কেশরাশি দেখিয়াছিলেন। তিনি তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিতে পারেন নাই। কারণ ঐ নর-নারি নিকটে আসিলে কাপ্তেন সাহেব ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন। তৎপরে মৎস্য-নারী নিকটবর্তী আর একখানি নৌকার নিকট গমন করিয়া এক হস্তের উহার এক পার্শ্ব ধারণ করিয়াছিল। তদ্দর্শনে তরণীস্থিত নাবিকগণ ভীত হইয়া দণ্ড দ্বারা আঘাত করাতে সে তথা হইতে পলায়ন করে। তৎপরে ঐ নারীরূপা ঐরূপে তাহার নৌকার নিকটবর্তী হইয়াছিল। এই ঘটনায় তথাকার সমস্ত নাবিকেরা ভীত হইয়া তীরে পলায়ন করিয়াছিল। সুতরাং এই নর-ললনার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

(আগামীবার সমাপ্য)

ক্ষপনক

বিজ্ঞানের কথা

অজানা পৃথিবী ও তার জীবজগৎ

পৃথিবীর মানুষ চাঁদে পা দিয়েছে, শুক্র-গ্রহে ও মঙ্গলগ্রহে মহাকাশযান নামিয়েছে, মঙ্গল ছাড়িয়ে গ্রহাণুপুঞ্জ ছাড়িয়ে বৃহস্পতি ছাড়িয়ে প্লুটোর দিকে এবং প্লুটো ছাড়িয়ে নক্ষত্রলোকের দিকে রোমযান যাত্রা করিয়েছে, পৃথিবীর আকাশে 'স্থির' কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করে সারা দুনিয়ায় একযোগে বেতার ও টেলিভিশন প্রচারের ব্যবস্থা করেছে, মহাশূন্যের স্টেশন থেকে অতিদূর নক্ষত্রপুঞ্জের নিখুঁত আলোকচিত্র তুলছে কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে সাইক্লোনের ছবি নিচ্ছে, এমনি আরো কত কি, কত কি। মনে হতে পারে, এত নানাদিকে যার অনুসন্ধানী অভিযান তার এই অতিকাছের পৃথিবীর কোনোকিছুই বোধহয় অজানা নয়।

তাই যদি হত! আসলে বিশ শতকের শেষ পাদে এই নিউক্লিয়র যুগে পৌঁছেও আমরা বলতে পারি না আমাদের নাগালের মধ্যে রয়েছে এই যে ভূগোলক তার নাড়ি-নক্ষত্র না হোক চামড়ার ওপরকার কিছুটা চেহারাও আমাদের জানা। ১২৭৫৭ কিলোমিটার ব্যাসের এই ভূগোলকের মাত্র কুড়ি কিলোমিটার গভীরেও আজ পর্যন্ত আমরা যেতে পারিনি সেখানে কি আছে অনুমান করেছি মাত্র—চোখে দেখিনি। আর উপরি তলের তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে রয়েছে যে সমুদ্রের এলাকা তাও আমাদের কাছে এখনো পর্যন্ত বহুলাংশেই অজানা। আর উপরিতলের যে এক-চতুর্থাংশে ডাঙাজমির এলাকা যেখানে আমরা খুশিমতো রূপাসে ভর দিয়েই চলাফেরা করতে পারি, তাও কি আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানতে পেরেছি? স্বীকার করা ভালো, এখনো পর্যন্ত নয়।

এই শেষ উক্তির পক্ষে অনেক দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা চলে—পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, প্রত্নবিজ্ঞান, জীবাশ্ম-বিজ্ঞান, বস্তুতপক্ষে সকল বিজ্ঞানের দিক থেকে, এবং বলা বাহুল্য, ইতিহাস ও ভূগোলের দিক থেকে তো বটেই। জানার যেন আর শেষ নেই। এমনকি ভবিষ্যতেও কোনো দিন এমন কোথাও আমরা পৌঁছতে পারব কিনা সন্দেহ যেখানে বলতে পারি, আমরা সবকিছু জেনে ফেলেছি। যারা বলে বা বলেছে তারা কেউ-ই মুখরক্ষা করতে পারেনি। যেমন, ১৮৭৫ সালে (অর্থাৎ আজ থেকে একশো বছরেরও আগে) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেটেন্ট আপিসের অধিকর্তা এই বলে পদত্যাগ করেছিলেন যে মানুষের আর কিছু আবিষ্কার করার নেই, অতএব, ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনি দৃষ্টান্ত আরো আছে।

এই অধিকর্তার মতো অবস্থা কিন্তু আমাদের সকলেরই। কতকগুলো বিষয় আমরা জেনে গিয়েছি একথা তো ঠিক। কিন্তু সেই জানা বিষয়ের ক্ষেত্রেও অনেক সময়ে ঠকে গিয়ে স্বীকার করতে হয় আরো জানা বাকি আছে।

যেমন, পৃথিবীর জীবজগতের কথা ধরা যাক। এ-বিষয়ে আমরা মোটামুটি একটা ছক কেটে নিয়েছি, মোটামুটি জেনে বসে আছি এই ছকের কোন অংশে জীবজগতের চেহারা কেমন বা কেমন-নয়। তারপরেই আচমকা এমন দু-একটি জীবের নিদর্শন বেরিয়ে পড়ে যা এই ছকের সঙ্গে কিছুতেই মেলানো যায় না, বিভ্রান্ত হয়ে ভাবতে হয়—কেন এমন হল?

এমনি কয়েকটি ছক-লণ্ডভণ্ডকারী জীবের কথা বলার জন্যই আজকের আলোচনায় এত কথার অবতারণা।

প্রথমে জীবজগতের ছকটি তুলে ধরতে চাই।

পৃথিবীতে জীব এসেছে (পৃথিবীর বয়স প্রায় ৫০০ কোটি বছর) আজ থেকে ৫০ কোটি বছর আগে। এই পঞ্চাশ কোটি বছরকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে:

(১) নবজীবীয়। স্তন্যপায়ীদের যুগ সাত কোটি বছর আগে শুরু হয়ে এখনো চলছে।

(২) মধ্যজীবীয়। সরীসৃপদের যুগ, উনিশ কোটি বছর আগে শুরু হয়ে সাত কোটি বছর আগে শেষ।

(৩) পুরাজীবীয়। আদিম প্রাণীদের যুগ, পঞ্চাশ কোটি বছর আগে শুরু হয়ে উনিশ কোটি বছর আগে শেষ।

প্রত্যেকটি যুগকে আবার কতকগুলো কালে ও পর্বে ভাগ করা হয়েছে। আমাদের এই আলোচনার পক্ষে অত বিস্তৃত তথ্যের প্রয়োজন নেই।

মোটামুটি ধরে নেওয়া হয়, এক যুগের জীব অন্য যুগে অস্তিত্বহীন। যেমন, মধ্য-জীবীয় যুগের ডাইনোসর নবজীবীয় যুগে বিচরণ করে বেড়াবে এমন কল্পনা অবাস্তব, অতএব অসম্ভব। কিন্তু তাই যদি ঘটে?

'যদি ঘটে' নয়, ঘটেছে। জীবটির নাম 'সীলাকান্থ'। আজ থেকে ৩২ কোটি বছর আগে যে-জীবটির আবির্ভাব এবং আজ থেকে ৬ কোটি বছর আগে যার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ লোপ পাবার কথা সেই সীলাকান্থ ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে জীবন্ত অবস্থায় ধরা পড়ল দক্ষিণ-আফ্রিকার সমুদ্র-উপকূলে জেলেদের মাছ-ধরা জালে। শুধু এই একটি নয়, পরবর্তী কালে আরো চারটি।

পৃথিবীর জীবজগতের যে ছকটি তৈরি ছিল তার সঙ্গে সীলাকান্থকে কিছুতেই মেলানো যায় না। কেন? সীলাকান্থের শরীরের গড়নই এমন যে তাকে স্থান করে দিতে হয় মেরুদণ্ডী জীব যখন জল থেকে ডাঙায় উঠে আসছিল সেই সময়ে। তার কারণ, সীলাকান্থের শরীরে ছিল এমন চারটি পাখনা যা সাধারণ মাছের পাখনার মতো নয় (সাধারণ মাছের পাখনাতে থাকে পর্দা দিয়ে আটকানো সারি সারি কাঁটা আর এই কাঁটাগুলো সরাসরি মাছের শরীরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে),

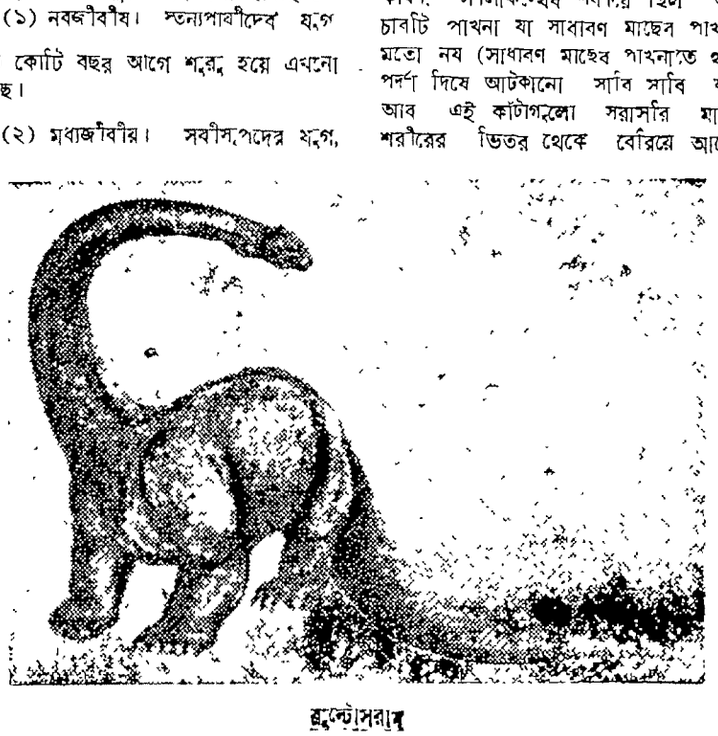

ব্রন্টোসরাস

সীলাকন্থের পাখনা ডিবিওলা, বিশেষ ধরনের। সীলাকন্থের শরীর থেকে প্রথমে বেরিয়ে এসেছে এক ঢিবি মাংস, তারপরে সেই মাংস থেকে কাঁটা। আর মাংসের মধ্যে আছে মানুষের হাতের হাড়ের মতো হাড় (হিউমাবাস, রেডিয়াস, আলনা) ও মানুষের কবজির হাড়ের মতো হাড়। তাছাড়া, সীলাকন্থের শরীরে যেমন আছে ফুলকো, তেমনি ডাঙায় নিশ্বাস নেবার মতো আয়োজনসম্বলিত নাকের ফুটো। অর্থাৎ, এই জীবটি জল থেকে ডাঙায় উঠে এসে চারটি 'পা' দিয়ে চলাফেরা করতে পারত এবং গলা পর্যন্ত প্রসারিত নাকের ফুটো দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চালাতে পারত।

এই জীবটির এত কোটি কোটি বছর টিঁকে থাকাটাই আশ্চর্য ব্যাপার।

মধ্যজীবীয় যুগের একটি সরীসৃপ, নাম ব্রন্টোসরাস। ওজনে ৫০ টন, লম্বায় ৩০ মিটার। আজ থেকে সাত কোটি বছর আগে পৃথিবীর জীবজগৎ থেকে এই জীবটির অস্তিত্ব লোপ পাবার কথা। কিন্তু এমন কি হতে পারে আফ্রিকার কোনো জঙ্গলে এখনো জীবন্ত ব্রন্টোসরাস বিচরণ করছে? জীবজগতের ছক যদি শেষকথা হয় তাহলে বলতে হয়—না। কিন্তু ঘটনার সাক্ষ্য অন্যরকম।

১৯২৭ সাল। মধ্য আফ্রিকার জঙ্গলে বিরাট এক শিকার-অভিযানের আয়োজন চলছে। শিকারী-দলের নেতা লেফটেনেন্ট কর্নেল এইচ এফ ফেন। তিনি চান বেলজিয়ান কঙ্গোর দুর্ভেদ্য গভীর জঙ্গলে ঢুকে একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ গরিলার ছবি তুলবেন এবং লন্ডনের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের জন্য পূর্ণবয়স্ক পুরুষ গরিলাটিকে পাকড়াও করে আনবেন।

কথাটা বড়ো সহজে বলা হয়ে গেল। পূর্ণবয়স্ক এক গরিলা, ছ' ফুট লম্বা, দশাসই চেহারা, বিপুল বলশালী, মেঘ-গর্জনের মতো হুংকার, হিংস্র চাউনি, প্রচণ্ড আক্রোশে দু' হাতে ঘুষি পাকিয়ে নিজের বুক বাজানো—খাড়া হয়ে দাঁড়ানো এই যমদূতের সামনে অতিবড়ো সাহসীও ভয়ে মূর্ছা যায়। এ-কারণে একটি পূর্ণ-বয়স্ক গরিলা পাকড়াও করতে পারাটা অসাধারণ এক অ্যাডভেঞ্চার। তবে কর্নেল ফেন আরো একটি রোমাঞ্চের সন্ধান করতে চান। স্থানীয় লোকেরা বলে, কঙ্গোর জঙ্গলে এমন সব প্রাণী নাকি আছে যাদের কেউ কখনো দেখেনি। কর্নেল ফেন এই প্রাণীদের দেখতে চান।

একজন নির্ভরযোগ্য শিকারীর মুখে কর্নেল ফেন শুনেছেন লেক এডওয়ার্ডে নাকি একটি দানবসদৃশ্য রহস্যময় পশু বাস করে। তার নাম দেওয়া হয়েছে 'ইবিজিমা', যার মানে 'এমন কিছু যাকে নিয়ে কথা বলা চলে না'।

কেমন দেখতে এই ইবিজিমা? অতি-প্রকাণ্ড হিপোপটেমাসের মতো, মাথার গম্বারের মতো শিঙ। এক পাগল শিকারী নাকি এই জীবটিকে ধরবে বলে জঙ্গলের গভীরে ঢুকেছিল। সে দেখেছে, জলাভূমির নলখাগড়ার বন ভেঙেচুরে জীবটি চলেছে, হুবহু এক ব্রন্টোসরাস, সবচেয়ে বড়ো হাতির চেয়েও দশগুণ বড়ো। কেপটাউনে কেউ তার কথা বিশ্বাস করেনি। কিন্তু আমেরিকার এক বৈজ্ঞানিক সংস্থার টনক নড়ে এবং ব্রন্টোসরাসকে ধরার জন্য সংস্থার পক্ষ থেকে এক অভিযানের আয়োজন করা হয়। নানা দুর্বিপাকে পড়ে অভিযানটি সফল হতে পারেনি।

সম্ভবত এই একই জীবকে আরেক দল শিকারী দেখেছে নীল উপত্যকার বিশাখ জলাভূমিতে। সেখানে তার নাম 'লাউ'।

কিংবা হয়তো 'লাউ' এক ভিন্ন জীব। বিশাল অজগরের মতো তার চেহারা, সারা গায়ে ঘন লোম, গাঢ় বাদামী ও হলদে ডোবা কাটা গা, মাথায় প্রকাণ্ড শিঙ। লম্বায় প্রায় ১০০ মিটার, শরীরের বেড় মহিষের মতো, এই জীবটি বিকট হুংকার ছাড়ে আর শুঁড় বাড়িয়ে শিকার ধরে।

এমনি জীব দেখা গিয়েছে অন্য হ্রদের এলাকাতেও, অভিজ্ঞ শিকারী মাত্রই তা শুনেছেন। চেহারায় হিপোপটেমাসের আদল, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড়ো, মাথায় প্রকাণ্ড শিঙ, ইত্যাদি ইত্যাদি। এও ব্রন্টোসরাস, কিংবা অন্য কিছু।

কেনিয়া ও টাঙ্গানিকার জঙ্গলে যে-সব শিকারী ঘুরে বেড়িয়েছিল তাঁরা সকলেই স্থানীয় আদিবাসীদের মুখে শুনে এসেছেন অতি-ভয়ংকর এক জীবের বিবরণ। জীবটিকে বলা হয় চিমিসেং বা নদির জঙ্গলের ভালুক। স্থানীয় আদি-বাসীরা সিংহের সঙ্গে খালি হাতে লড়াই করতে ভয় পায় না, কিন্তু চিমিসেতের নাম শুনলে আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। অন্ধকার ঘুটঘুটে রাত্তিরে এই জীবটি মানুষের বসতিতে শিকার করতে আসে ও বিশেষ করে শিশুদের ধরে ধরে খায়। চেহারায় অর্ধেক মানুষ ও অর্ধেক বানরের মতো মুখওলা পাখি। হুংকার অতি বিকট এবং রাতের অন্ধকারে মুখখানা জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো দপদপ করে।

চিমিসেতের হুংকার সম্পর্কে একজন বিখ্যাত শিকারী লিখছেন, তিনি একেবারে সামনে থেকে গোটাছয়েক সিংহকে গর্জন করতে শুনেছেন, শুনেছেন উন্মত্ত হস্তিনীকে ডাক ছাড়তে, ফাঁদে-পড়া নেকড়েকে হিংস্র চিৎকার তুলতে—কিন্তু চিমিসেতের হুংকারের কাছে কোনোটাই কিছু নয়। আর চিমিসেৎ যখন শিকার ধরে নিয়ে চলে যাচ্ছে তখন সেই শিকারীর মনে হয়েছিল গোটা এলাকা ভূমিকম্পে কাঁপছে।

পূর্ব আফ্রিকার উপকূলে একই সময়ে আরো একটি জীবের কথা শোনা গিয়েছিল, নাম নন্দা, চেহারায় গাধার মতো আকারে বেড়ালের মতো। এই জীবটিও মাঝে মাঝে লোকালয়ে এসে মানুষ শিকার করত, চোখের দেখাও অনেকে দেখেছে, কিন্তু কখনো ধরা যায়নি।

এমনি আরো কত। শুধু আফ্রিকায় নয়, পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও। মালয়ে আছে মানুষ-ভালুক- বনমানুষ, তিব্বতে তুষারমানব, সাইবেরিয়ার টাইগাতে সম্ভবত জীবন্ত ম্যামথসদৃশ জীবও।

কোটি কোটি বছর আগে যে জীবজগৎ বিলুপ্ত হয়েছে, সেই টেরোডাকটিল সেই ডাইনোসর, সেই ব্রন্টোসরাস, যারা বিপুল বিক্রমে শিকার করত ও লড়াই করত, বংশরক্ষা করত ও জীবনধারণের পালা শেষ হয়ে গেলে মারা যেত, তারা কি এখনো পৃথিবীর কোনো কোনো অগম্য অরণ্যে সশরীরে বেঁচে আছে?

জোর গলায় অস্বীকার করা চলে না। কতটুকু আমরা জানি? আমাদের সমকালেই জিরাফ নামে একটি জীব যে একই পৃথিবীতে চলেফিরে বেড়ায় এই অবিসম্বাদিত ঘটনাও কিছুকাল আগে আমরা জানতাম না, শুনেও বিশ্বাস করতে চাইনি, হাতেনাতে প্রমাণ উপস্থিত করতে হয়েছে। আর জিরাফের সমগোত্রীয় জীব ওকাপি? তার গায়ের চামড়া ও শরীরের কংকাল হাতে না পেঁছনো পর্যন্ত জীব-বিজ্ঞানীরা ওকাপিকে রূপকথার জীব মনে করতেন। আর ঘোড়ার মতো শরীর, মাথায় শিঙ, যে-জীবটিকে রূপকথার কাহিনীতে বলা হয় ইউনিকর্ন, তাও কি একেবারেই তাই? সম্ভবত নয়। এমনও হতে পারে আমাদের মহাভারতের পক্ষিরাজ ঘোড়ারও কোনো একটা অনুকৃতি হিমালয়ের কোনো এক অজানা সানুদেশে এখনো বিচরণশীল।

বিজ্ঞানকে এখনো বিস্তর এই পৃথিবীর অনেক কিছুরই সন্ধান নিতে হবে। জানতে হবে। জানতে হবে আরো, জানার শেষ নেই।

অয়স্কান্ত

ভর্তি চলিতেছে

শাস্ত্রীয় সংগীতে, রবীন্দ্র সংগীতে, তবলা, সেতার, গীটার বেহালা ও নৃত্য শিক্ষা কেন্দ্র ও পরীক্ষা কেন্দ্র, পরিচালনা ও শিক্ষাদানে প্রধানতঃ

ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ এবং

শ্রীঅখিলবন্ধু ঘোষ

শিক্ষা বিভাগ ঃ ৮ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত

বিশিষ্ট বেতার শিল্পী দ্বারা পরিচালিত

মেট্রোপলিটান কলেজ

২৪১।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৯

অঙ্গনা

এখনও পণের ছায়া

সংবাদে প্রকাশ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মেয়েরা এবার জোট বেঁধে নেমেছেন পণ-প্রথাকে নির্মূল করতে। তাঁরা ছুটির দিনগুলিকে আলস্যে না কাটিয়ে দলে দলে বিভিন্ন বাড়ী বাড়ী গিয়ে অভিভাবকদের পণপ্রথার কুফল সম্বন্ধে বুঝিয়ে এ সংস্কারকে ঝেড়ে ফেলতে অনুরোধ জানাচ্ছেন। কোন কোন রাজ্যে এ প্রচার চলছে ব্যাপক অভিযান। তাঁরা সরকারকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন এবং পণের বেআইনি কাজের অপরাধী যাতে শাস্তি পায় সেজন্যও তাঁরা উদ্‌গ্রীব। আইনভঙ্গ করে পণ নিয়ে আদালতের কাঠগড়ায় কাউকে দাঁড়াতে হয়েছে কিনা সঠিক বলা যায় না কারণ এ দৃষ্টান্ত এখনও বিরল। স্বীকৃতিতঃ পণ নেওয়াটা ঘুষ নেওয়ার সমতুল্য। উৎকোচ গ্রহণকারী ও প্রদানকারীরা যেমন উৎকোচের কথা গোপন রাখতে পরস্পরের মধ্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তেমনি উভয়েই নিজেদের ছেলেমেয়ের বিবাহিত জীবনের সুখের কথা চিন্তা করলেও এই পণ দিয়ে ও নিয়ে সমান অপরাধী। ফলে আইনের কড়া শাসন এদের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। যাঁরা আরো বেশী বাস্তব-বুদ্ধিসম্পন্ন তাঁরা নগদ টাকা হাতে না নিয়ে জলে বলে কৌশলে তার চেয়ে অনেক বেশী উসুল করে নিচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে এক ধনীর শিক্ষিত পরিবারের কথা মনে পড়ছে। ছেলের বিয়ে ঠিক করতে গিয়ে ছেলের বাবা মেয়ের বাবাকে সরাসরি জানালেন—আপনার অবস্থা আর ক্ষমতা সকলেই জানে। আপনার কাছ আর টাকা-পয়সা চেয়ে বেআইনি কাজ করতে চাই না। আপনি নিশ্চয়ই না চাইলেও সেই ফাঁকটুকু ভরাট করে দেবেন।

মেয়ের বাবা বুঝলেন নগদের সঙ্গে সঙ্গে টুকিটাকি দিতেও ছেলের বাবার ভুল হবে না সে যতবড় অবস্থাপন্নই হোন না কেন। মনে মনে ভাবলেন চামার অর্ধপিশাচ। অথচ সেই পরিবারে নিজের মেয়ের বিয়ে দিলেন। সিনি কন্যাকে বিয়ে দিতে গিয়ে তার শ্বশুরবাড়ীর প্রতি শ্রদ্ধা হারান অথবা কোন ক্ষেত্রে যদি পণের বিরোধী মন নিয়ে সেই পরিবারে ঘর করতে যান এবং কখন ক্রোধবশে অন্তরের কথাটি প্রকাশ করেন তবে তার পরিণাম কি ভয়ংকর হতে পারে আমরা সকলেই উপলব্ধি করি। পুরি

পুরোপুরি পণপ্রথা বন্ধ হয়নি এবং আইন করে পণ নেওয়া পুরোপুরি বন্ধ করা যাবে না এ ব্যাপারে আমরা সকলে সুনিশ্চিত। আইন পাস হওয়ার পরেও পণ নিয়ে বিয়ে হওয়ার বহু ঘটনা লোকচক্ষুর অন্তরালে ঘটে যাচ্ছে।

এই প্রথার বেসব ফাঁক রয়েছে সেগুলি ভরাট করতে শুধু মেয়েদেরই এগিয়ে আসা যথেষ্ট নয়। কর্তব্য রয়েছে শিক্ষিত প্রগতিশীল অবিবাহিত যুবকদের। তাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে বিয়ের নামে অপরের অর্থ আত্মসাৎ করে মাথা উঁচু করে না দাঁড়ানো। অযথা মিথ্যে অর্থ, সংগ, মর্যাদা ও আভিজাত্যের অহংকার ও দোহাই থেকে মুক্ত হতে হবে। তাদের মনে রাখতে হবে পৃথিবী অনেক দূর এগিয়ে এসেছে এখন আর সেই পুরনো জরাজীর্ণ বস্তাপচা কুসংস্কারের ঝুলি আউড়ে গর্ব করার মতো কিছু নেই। এই গর্ব এখন অতি দর্পহত লঙ্কার মত হাস্যোদ্দীপক ছাড়া অন্য কিছু নয়। আজ যেখানে লোক জাতিভেদের অন্ধ সংস্কার কাটিয়ে উঠছে সেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ পরস্পর পরস্পরকে জানতে ও ভালবাসতে শিখছে তখন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ছেলেমেয়েরা শুধু বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হচ্ছেন না তাঁরা বিবাহের সম্পর্ক স্থাপন করছেন বিদেশের জনগণের সঙ্গে সেখানে আমাদের ভারতীয় আদরের দুলালদের কি আর পণ নেওয়ার জেদ বেশী দিন টিকবে? শিক্ষা আর প্রগতির নামে অশিক্ষাকে জিইয়ে রাখা কি সম্ভব?

এবার মেয়েদের বাসিকের কথাটা একটু ভেবে দেখা যাক। মেয়ে মাত্রই এই প্রথার প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠবেন এটাই স্বাভাবিক। অথচ এদের মধ্যে যাঁরা সক্রিয় প্রতিবাদ করতে পারবেন তাদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। উচ্চ শিক্ষিতা চাকুরীরতা মেয়েরা পরমুখাপেক্ষী নন এবং নিজেদের ওপর আস্থাও তাঁদের বেশী, পণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে জিদ করে তাঁরা কিছুদিন বা আজীবন কুমারী থাকতে পারেন। অবশ্য বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে চাকুরীরতা মেয়েদের চাহিদা বিশ্বের বাজারে অত্যন্ত বেশী। পাত্রপক্ষ এবং পাত্র নিজে অনেক সময় একালীন অর্থের চেয়ে প্রতি মাসে মোটা অংক বেশী আগ্রহী সে-কারণে ছেলে-পক্ষ বিনাপণে বিয়ের প্রস্তাবে রাজী হয়ে যান।

চাকুরীরতা শিক্ষিতার পর কর্মরতা মেয়েদের সামাজিক চাহিদা মন্দ নয়। এর সঙ্গে দু-একটা লেখাপড়ার ডিগ্রি থাকলে তো কথাই নেই। এরপর জোর ঘর করে এরা আদের সমাজে চাহিদা দিতে পারেন। পণ ছাড়াই বাবা মায়ের ভাবনা দূর করেন। কাজেই দেখা যায় শিক্ষিতা সুন্দরী কিংবা শিক্ষিতা ও চাকুরীরতা মেয়েরা পণের বেড়াজাল, পৈশাচ বেড়াই পেরিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু সমাজে এ ধরনের মেয়েদের আশানুরূপ সংখ্যা কম।

তবে এটাই স্বচ্ছ হয়ে আমাদের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে যে পণের শিকার বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণ চেহারা অশিক্ষিত অর্ধ-শিক্ষিত এবং উপার্জনে অক্ষম মেয়েরা। এদের মধ্যে অনেকের ধারণা যে অভিভাবকেরা অর্থের বিনিময়ে পণের আশ্রয় নিয়ে তাদের বিয়ের পথ প্রশস্ত করতে পারবেন। রূপ আর শিক্ষার ঘাটতি নগদ কিছু টাকার বিনিময়ে পূরণ হয়ে যাবে পণপ্রথার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করলে তাদের ভবিষ্যৎ কি হবে? তাদের অভিভাবকদেরই বা করণীয় কি থাকবে?

আসলে মেয়েদের রূপের ঘাটতি সবক্ষেত্রে বিয়ের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। অর্থের বিনিময়ে কুরূপা হচ্ছেন সুরূপা। এই অর্থ উপযুক্ত পরিমাণে যাদের ব্যয় করার সামর্থ্য নেই তাদের অন্যটা কানা নিয়ে হা-হুতাশ ভিন্ন গত্যন্তর নেই। গভীরভাবে ব্যাপারটা ভাবলে দেখা যায় কি নিষ্ঠুর এই সমাজ। অশিক্ষিতা রূপহীনা অসচ্ছল মেয়েরা কত অসহায় ভাগ্যের হাতে নিপীড়িতা। তাই অর্থকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে না পারলে লক্ষ লক্ষ দুর্বল ও অসহায়রা সমাজে সম্মানের সঙ্গে বাস করতে পারবেন না। একমাত্র পণপ্রথার বিলুপ্তিই এই সমস্যা আনতে পারে। কিন্তু পণপ্রথাকে ভর করে যে মেয়েরা শ্বশুরালয়ে লজ্জায় সসম্মানে উপস্থিত হচ্ছেন তাঁরা কেন এর প্রতিবাদ করবেন? তবে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য তাঁরা এগিয়ে আসবেন?

এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হলে সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে প্রগতিশীল অশিক্ষিতা ও সাধারণ চেহারার মেয়েদের যাঁরা আজও নানা কারণে পিছিয়ে আছেন। এই সংগ্রামে আমাদের সরকারের দায়িত্বও জানকারণ। আইন প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে এঁদের শিক্ষাদীক্ষা কর্মসংস্থানের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হলে এঁরা সকলেই হবেন আত্মসচেতন ও স্বাবলম্বী সুস্থ-সুন্দরদের উচ্চশিক্ষার যোগ্যতা বা মেধা যাদের নেই বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ থাকলে তাদের স্বাধীনসত্তা পরিস্ফুট একদিন না একদিন হবেই। এঁদের সঙ্গে পণপ্রথার বিরুদ্ধে শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়েরা একযোগে হলে সোচ্চার। অশিক্ষিতারাও তখন সচেতন। তখন আর তাদের হাতে বাজার পড়ে থাকা বেনামেচা করে মালমামলের প্রয়োজন হবে না। পণপ্রথাও লোপ করা সহজ হবে।

তাই যাঁরা প্রগতির ধ্বজা নিয়ে পণ-প্রথার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন তাদের আরো বেশী তৎপর হয়ে সর্বশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার পতাকাকে সমুন্নত করে ওড়াতে হবে এবং সেই পতাকাতলে সমবেত হবে সমগ্র দেশবাসীকে—তাঁরা মেয়েদের সম্মানকে উপেক্ষা করতে পারবেন না এবং অর্থলোভ ত্যাগ করে তাদের পূর্ণ সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন।

অঞ্জলি চৌধুরী

মাঠ থেকে বলছি

স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ॥ ৬ ॥ চুণী গোস্বামী

সোনা নয়, রুপো নয়, মামুলি কোনো পাথরও নয়। একেবারে সাচ্চা জিনিষ। খনি ছেঁচা মণি—চুণী। মণির খনিতে যেমন, ফুটবল মাঠেও তেমনি। সর্বঘটেই ঝকমক করছে —কথাগুলি বেতার তরঙ্গে ভেসে আসতেই বোঝা গেল যে এবার স্মৃতি দিয়ে ঘেরা—এই অনুষ্ঠানে কথকতার দায়িত্ব নিতে চুণী গোস্বামী এগিয়ে এলেন বলে।

কিন্তু শ্রোতাদের সঙ্গে চুণী গোস্বামীর পরিচয় ঘটাবার ভার ছিল যাঁর ওপর তাঁর উপক্রমনিকা তখনও শেষ হয় নি। তিনি বলেই চলেছেন ঃ—

জাতকের নাম কে রেখেছিলেন জানি না, কিন্তু নামকরণ যে সার্থক হয়েছে তাতে আর সন্দেহ কী। সাক্ষী উত্তর ইতিহাস। যৌবনে চুণী গোস্বামী ছিলেন খোলা মাঠের জীবন্ত বিগ্রহ। বুদ্ধিদীপ্ত আচরণে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পায়ের কাজে, অধিগত প্রকরণ বিদ্যার প্রয়োগনৈপুণ্যে ফুটবলের জাত শিল্পী। যে দেখেছে, সেই মজেছে। দেশের মাঠে ভক্তের দল ঢাকঢোল পিটিয়ে বাদ্যি বাজনা বাজিয়ে নিত্যই তাঁকে ঘিরে জয়ধ্বনি তুলতেন।

কিন্তু একবার হলো কী দারুণ ঝামেলা। এদেশে নয়, বিদেশে। চুণী তো বটেই, সেই সঙ্গে তাঁর নেতৃত্বাধীন পুরো ভারতীয় দলটিই হয়ে গেল স্থানীয় দর্শকদের দু চোখের বিষ। চুণীর পক্ষে সে এক অভাবনীয় পরিস্থিতি। ব্যাপারটা এবার চুণীর মুখেই শোনা যাক। চুণী জানাতে শুরু করলেন ঃ—

সেবার ১৯৬২ সালে জাকার্তায় এশীয় ক্রীড়ার ফুটবল ফাইন্যাল। রাজনীতিক চিন্তা ভাবনার ঢেউ সে বছর এশীয় ক্রীড়াভূমিতে আছড়ে পড়েছে। উচ্চরোল বিতর্ক আর উত্তাপের আঁচে সারা ইন্দোনেশিয়া যেন টগবগিয়ে ফুটছে। সভা-সমিতিতে ইন্দোনেশীয় প্রতিনিধি যে বক্তব্য রেখেছিলেন, ভারতীয় অভিনিধি দলের নেতা অধ্যাপক গুরু দত্ত সোধী তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারেন না। অধ্যাপক সোধী ছিলেন এশীয় ক্রীড়া অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর কাছে রাজনীতিক চিন্তার বিশেষ মূল্য ছিল না। এশীয় ক্রীড়ার মঙ্গল চিন্তাই ছিল মুখ্য। তিনি বরং দৃঢ়কণ্ঠে ইন্দোনেশীয় অভিমতের বিরোধিতা করেন।

ন্যায়সঙ্গত এবং যথার্থ হলেও অধ্যাপক সোধীর এই ভূমিকাকে ইন্দোনেশীয় জনসাধারণ সেদিন ভাল চোখে দেখতে পারেন নি। অধ্যাপক সোধীর হোটেলের সামনে বিক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে। আর সোধীর বিরোধিতা করতে গিয়ে ইন্দোনেশীয় জনসাধারণও ভারতীয় ফুটবল দলের শত্রু বনে যান। মাঠে তাঁরা সব একজোট হয়ে ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে এমনই ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ করতে থাকেন যে শুনে আমাদের রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ার উপক্রম। তবে ওঁদের প্রত্যক্ষ বিরোধিতার খোঁচায় আমাদের এই লাভ হয়েছিল যে, ওঁরা যতই আমাদের দুষতে চেয়েছেন ততই আমরা যোগ্য জবাব দেবার জন্যে দলের সমস্ত শক্তিকে সংহত করতে চেয়েছি। এবং পেরেছিও। শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে ফুটবলের সোনাটি ছিনিয়ে আমরা ইন্দোনেশীয় দর্শকদের চুপ করিয়ে দিই। সবাই সেদিন জান লড়িয়ে খেলেছিলাম। এমন অন্তরিক চেষ্টা কখনও বিফল হয়! তবে ওই ফাইনাল খেলার দিনে স্নায়ুর চাপের যে ধকল আমাদের সইতে হয়েছিল, তা ভোলবার নয়।

চুণী গোস্বামীর নেতৃত্বে ভারত এশীয় ক্রীড়ায় (ভিন্নমতে জাকার্তা ক্রীড়ায়) সেই শেষবারের মত স্বর্ণপদক পেয়েছিল। তা ছাড়া তাঁর পরিচালনাধীন ভারতীয় দল ১৯৬৩তে এশীয় ফুটবলে এবং একবার মারডেকা প্রতিযোগিতাতে রৌপ্যপদকও পেয়েছে। এক খেলোয়াড়ের অধিনায়কত্ব কালে একটি সোনা ও দু দুটি রুপোর মেডেল পাওয়ার রেকর্ড চুণী ছাড়া আর কোনো ভারতীয় ফুটবলারের অধিকারে নেই।

জাকার্তায় অভাবনীয় উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত ওই ফাইনাল খেলাটিকেই কি চুণী তাঁর খেলোয়াড় জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ বলে মনে করেন? বোধ না। চুণীর কথায়।

ফাইনালে খেলা তাই গুরুত্বপূর্ণ। অভাবনীয় উত্তেজনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাই খেলাটি স্মরণীয়ও। তবে আমি কিন্তু জাকার্তায় সেমিফাইনালে ভিয়েৎনামের সঙ্গে খেলাটির ওপর আরও জোর দিয়েছিলাম। সেমিফাইনালে না জিততে পারলে মেডেল পাওয়ার আশা অনেকটা হারিয়ে যায়। আর সেমিফাইনালে জিতলেই সোনা বা রুপো যে কোন একটি পদক পাওয়ার সম্ভাবনা নিশ্চিত হয়ে ওঠে। তাই আমার বিচারে সব প্রতিযোগিতার ফাইনালের চেয়ে সেমিফাইনাল খেলাটাই হল গুরুত্বপূর্ণ। আগেভাগে ভেবে-চিন্তে নিয়েই আমি ও আমরা ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে খেলতে নামি। কথায় বলে মনের সাধন কিংবা শরীর পতন—এই মন্ত্রেই আমরা সেদিন দীক্ষিত হয়েছিলাম। পরিণামে সুফলও পেয়েছি।

জাতীয় ফুটবলের আসর (১৯৬৪ খৃঃ) মাদ্রাজের কর্পোরেশন স্টেডিয়ামে চুণী গোস্বামীর পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি।

সুফল তো বটেই। দলগত ও ব্যক্তিগত ভূমিকার নিরিখে অবশ্যই সুফল। যেহেতু আমরা জানি যে ভিয়েৎনামের সঙ্গে সেমি-ফাইনালে ভারতীয় দলাধিনায়ক চুণী গোস্বামী একাই দু দুটি গোল করেছিলেন।

খেলোয়াড় জীবনে গোল তিনি অনেক করেছেন। সিনিয়ার ফুটবলে আত্মপ্রকাশ ঘটান তিনি গোল করেই (১৯৫৪ সালে ইস্টার্ণ রেলের বিপক্ষে), আবার ওই আসর থেকে বিদায় নেন ১৯৬৮-তে স্পোর্টিং ইউ-নিয়নের বিপক্ষে গোল করে। চুণী যখন খেলোয়াড় জীবনের মধ্যাহ্নে তখন মোহন-বাগান অনন্য প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে দুবার তিন গোলের ব্যবধানে হারিয়েছিল এবং সে দুবারই চুণী দলের পক্ষে প্রথম গোলটি করেছিলেন। ১৯৬৭তে ক্রিকেট উদ্যান ইডেনে যেদিন লীগ ফুটবলের প্রথম ম্যাচটি খেলা হয় সেদিনও চুণীর একমাত্র গোলেই মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলকে হারাতে পেরেছিল।

কিন্তু শুধু গোল করাতেই একজন ফরোয়ার্ডের সর্বাঙ্গীন কুশলতার পরিচয় ধরা থাকে না। জাত ফরোয়ার্ড সেই যে কার্যকর আক্রমণ গড়তে পারে। সাথিসঙ্গী-দের খেলাতে ও গোল করাতে পারে। আর পারে আস্থা বুঝে নিজেও গোল করতে। পরিভাষায় যাকে বলে স্কোরার ও স্কিমার, এই দুটি গুণের সমন্বয়েই একজন ফরো-য়ার্ডের কৌলীন্য যাচাই হয়ে যায়। চুণীর মধ্যে এই দুটি গুণের কোনটিরই ঘাটতি ছিল না। তাই তিনি পূর্ণাঙ্গ বা টোটাল ফরোয়ার্ডের স্বীকৃতি পেয়েছেন। চুণী নিজেও বললেন যে, যে খেলায় তিনি অন্যদের ভালভাবে খেলাতে পেরেছেন, তা নিজে গোল করুন বা না করুন থাকুন সেই খেলার স্মৃতিই তাঁর মনের গভীরে দাগ কেটে রেখেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি ১৯৬২তে জাকার্তা ক্রীড়ার সেমিফাইনালে ভিয়েৎনামের সঙ্গে এবং ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে হাঙ্গেরীর সঙ্গে ভারতের খেলার উল্লেখ করে বলেন যে প্রথমটিতে তো আমি গোল করেছিলাম। দ্বিতীয়টিতে গোল করি না। তবু দুর্ধর্ষ হাঙ্গেরীর মোকাবিলায় একজন ফরোয়ার্ড হিসাবে আমার যা করণীয় ছিল তার অনেকটাই সুসম্পন্ন করতে পেরেছি। তাই নিজে গোল করেছি বলে ভিয়েৎনামের সঙ্গে খেলার কথা যদি আজও মনে থাকে। তাহলে গোল না করে সহযোগীদের খেলাতে এবং দলের আক্রমণ গড়তে পেরেছিলাম বলে হাঙ্গেরীর সঙ্গে খেলাটির কথাও আমার মনে গেঁথে রয়েছে।

তবে চুণীর নিজের সব কথা হয়ত তাঁর নিজের মনে নেই। সে স্মৃতি অতীতের কুয়াশাই আবছা হয়ে আসছে। কথকতার সময় ছিল সংক্ষিপ্ত। নির্দিষ্ট। অনেক কথা জানাবার অবকাশই ছিল না। সেই অবকাশ আমার আছে বলে এই সুযোগে চুণীর খেলোয়াড় জীবন সম্পর্কে দু-একটি কথা জানিয়ে রাখি।

সিনিয়ার ফুটবলে চুণীর অভিষেক ১৯৫৩তে। পরের বছরেই রাজ্য দলে খেলার ডাক পান। সেই সঙ্গে সব ভারতীয় দল বাছাইয়ের আগে নির্বাচনী খেলায় আমন্ত্রণও পেয়েছিলেন। কিন্তু সামনেই ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা। পরীক্ষা ছেড়ে ট্রায়ালে যোগ দিতে চান নি। ১৯৫৬তে তিনি প্রথম জাতীয় দলে খেলার সুযোগ পান। উত্তরপর্বে (১৯৬২—৬৫) জাতীয় দলকে নেতৃত্বও দেন। তার আগেই রাজ্য দলের নেতৃত্ব ভার তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। চুণীর নেতৃত্বে বাংলা দল কোন-দিন জাতীয় ফুটবল বা সন্তোষ ট্রফি জয় করতে পারে নি। যদিও দলের একজন হিসেবে অন্যূন চারবার বাংলাকে সন্তোষ ট্রফি পেতে তিনি সাহায্য করেছিলেন।

চুণীর নেতৃত্বে বাংলা কোনদিন সন্তোষ ট্রফি পায় নি। নজির হিসেবে এই তথ্যকে যদি আজ অদ্ভুত বলে ঠেকে তাহলে বলে রাখি যে খেলোয়াড় চুণীকে ঘিরে এমন নজির সৃষ্টি হয়ে আছে যেগুলিকে নিঃসন্দেহে অসাধারণ বলে ধরে নেওয়া যায়। যথা তাঁর পক্ষে জাতীয় ফুটবল ও ক্রিকেটের আসরে বাংলার নেতৃত্ব করা। দু ধরনের খেলায় রাজ্য দলের অধিনায়কত্ব করার গৌরব আজ পর্যন্ত তিনি ছাড়া আর কেউই অর্জন করতে পারেন নি। আর একবার তিনি অনন্যসাধারণ সম্মানে সম্মানিত হন মাদ্রাজে। সেবার মাদ্রাজে (১৯৬৪) সন্তোষ ট্রফির আসর বসলে মাদ্রাজী সংগঠকেরা। অনুষ্ঠান কেন্দ্র কর্পোরেশন স্টেডিয়ামে তাঁর পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি স্থাপন করেন। চুণী নিজে সেবার মাদ্রাজে খেলতে যান নি অথচ প্রতিকৃতি স্থাপন করে সংগঠকেরা তাঁর ক্রীড়াকৃতির প্রতি আন্তরিক সম্মান দেখিয়ে-ছিলেন। আর কোন জীবিত ভারতীয় ফুট-বলারের ভাগ্যে এমন অসাধারণ সম্মান-তিলক কখনো আঁকা হয়েছে কিনা সন্দেহ। মাদ্রাজের ওই ঘটনা সম্পর্কে চুণী নিজেও বেশ স্পর্শকাতর। বললেন, এর আগে ১৯৫৫তে জাতীয় ফুটবলের আসরে আমি সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি পেয়েছিলাম। ব্যাগ ভর্তি সোনার মেডেলও সংখ্যায় পঁচিশটি জুটেছিল। কিন্তু আমার অনু-পস্থিতিতে মাদ্রাজে আমায় যে সম্মান অভিষিক্ত করা হয়েছিল তার তুলনা কই। সত্যিই, মাদ্রাজী ক্রীড়া সংগঠকেরা আমার কৃতজ্ঞতা পাশে আজীবন জড়িয়ে রেখেছেন। তাঁদের দেনা শোধ করার সাধ্য আমার নেই।

চুণী ফুটবল মাঠে এলেন কেমন করে? সে এক মজার কাহিনী।

চল্লিশের দশক তখন যায় যায়। সাম্প্র-দায়িক দাঙ্গার উৎপাতে পাড়ার ছেলেদের তখন বহুতর ঘাবার রাস্তা নেই। আটকে থাকতে হবে পাড়ার চৌহদ্দিতেই। চুণীর অবস্থাও তাই। শুধু বিকেলে খেলায় ফুরসৎ। দেশপ্রিয় পার্কের এক ধারে পায়ের জুতো-চটি দিয়ে গোল পোস্ট সাজিয়ে আরও পাঁচজনের সঙ্গে ফুটবল খেলা। মহানন্দে খেলে। বৃষ্টির দিনে কাদায় লুটো-পুটি খায়। ফুটবলের নামে ছেলেরা করে ছেলেমানুষী। আর কাছেই দাঁড়িয়ে এক প্রবীণ ভদ্রলোক তাই দেখেন নির্নিমেষচিত্তে।

ভদ্রলোকটির ইয়াদাশাসই চেহারা। কথা বলেন না। শুধু ছেলেদের দেখেন আর মাঝে মাঝে মুচকি হাসেন। তবে ছেলেদের মত তাঁরও প্রতিদিন বিকেলে দেশপ্রিয় পার্কে আসা চাই।

একদিন হলো কি, গোল হয়েছে কি হয় নি তা নিয়ে ছেলের দলে তুমুল তর্ক বাধলো। এক দল বলে, বল বরিপুত গোলের মধ্য দিয়ে গেছে। অন্য দল বলে, না বল ছুটে গেছে এক পাশে জড়ো করা জুতোগুলির ওপর দিয়ে। হ্যাঁ, না, করে ছেলের দল অনেকক্ষণ কাটিয়ে দেওয়ার পর কিছুতেই যখন মীমাংসা হয় না, তখন ওই প্রবীণ ভদ্রলোক এগিয়ে এসে ওদের ঝগড়া মিটিয়ে দিয়ে বললেন, বলটি সত্যিই গোলের মধ্যে ঢোকে নি। বয়স্কের রায় ছেলেরা মেনে নিল। আর সেই সূত্রেই চুণীর সঙ্গে ভদ্র লোকের আলাপ জমে গেল। ওই ভদ্র-লোকই শুধালেন, খোকা তুমি আমার ক্লাবে খেলবে? চুণী ঘাড় নাড়তেই সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল।

ভদ্রলোকের নাম? বলাইদাস চ্যাটার্জি—বাংলাদেশের ক্রীড়া সমাজে যে নাম অবি-স্মরণীয়। বয়সকালে ছিলেন বিখ্যাত চৌকশ খেলোয়াড়। উত্তর যৌবনে প্রসিদ্ধ প্রশিক্ষক ও মোহনবাগান ক্লাবের অন্যতম মাথা। চুণী বলাইবাবুর আবিষ্কার। বলাই-বাবুই চুণীকে হাত ধরে নিয়ে যান মোহন-বাগান ক্লাবে। মোহনবাগানের জুনিয়ার দলের পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করেই চুণীর খেলোয়াড় জীবন শুরু হয়।

চুণী প্রথম ডিভিশনে প্রথম খেলেন ১৯৫৪ সালে। প্রথম সুযোগ পাওয়ার ঘটনাটিও অভাবনীয়। বদরু ব্যানার্জি খুব গুহঠাকুরতা ও সত্যর তখন মোহনবাগানের নামকরা ইনসাইড ফরোয়ার্ড। ইস্টার্ণ রেলের সঙ্গে খেলার দিনে ওই তিনজনেই নাকি মাঠে আসতে পারবেন না বলে জানিয়েছিলেন। সত্যর ও বদরুর নতুন চাকরি। অফিস দলে খেলতে হবে। আর বদরুর এক আত্মীয় মারা যাওয়ায় তাঁকে ছুটে হয়েছে শ্মশানে। অতএব জুনিয়ার

দলের খেলোয়াড় চুণীর আর পড়ল সিনিয়ার দলের পক্ষে খেলার।

দুপুরে বাড়িতে বসে গাঁপতে ভাজা ছিবোচ্ছি। এমন সময় কুমারবাবুর (উমাপতি কুমার) বাতা নিয়ে লোক এলো। চুণী বল ছিলেন—ভয়ে ভয়ে ছুটলাম তাঁবুর দিকে। গিয়েছি গায়ে জার্সি গলিয়ে নিই। পাশে ওই বস্তুটিকে আর কেউ গছিয়ে নেয়। জার্সি পরবার সময় গেঞ্জিটা খুলতে সাহস পাই নি। তখন আমার হাড্ডিসার চেহারা। কেউ দেখে ফেললে দল থেকে বাদ পড়ে যেতে পারি এ ভয়ও ছিল। যাই হোক, জার্সি গায় অপেক্ষা করছি এমন সময় বদরু ঢুকলো হুড়মুড় করে। শ্মশান থেকে সোজা চলে এসেছে। বদরুকে দেখে আমি আবার নার্ভাস। এই বুঝি বাদ দিয়ে দেয়। বদরু খেলে রাইট ইন হিসেবে। আমিও তাই। অতএব ভাবনা কিছুটা ছিল বৈকি। এমন সময় কুমারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন তুমি লেফট ইনে খেলতে পারবে? শুনে মনে পড়ে গেল বলাইবাবুর উপদেশ, চান্স ছাড়বে না যে কোন জায়গায় খেলার জন্যে তৈরী থাকবে। আমার সেই তো প্রথম চান্স। তাই কুমারবাবুর কথায় রাজী হয়ে মাঠে নেমে পড়লাম এবং বলের বিরুদ্ধে প্রথম গোলটিও করে ফেলি। সেই খেলায় আমরা জিতেছিলাম তিন গোলে। বিশ্রামের সময় বদরু আমাকে তার জায়গা ছেড়ে দিয়ে নিজে সরে এসেছিল লেফট ইনসাইডের জায়গায়। ফলে রাইট উইং ভেঙ্কাটেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে খেলার অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছিলাম সেই প্রথম দিনেই।

সেই শুরু। তারপর আর চুণীর পেছনে ফিরে তাকাবার দরকার পড়ে নি। কলোস্তে থাকতে চুণী অবশ্য রাইট ও লেফট দু জায়গাতেই খেলেছেন। উত্তর পর্বেও অনেক বার তাই করেছেন। ছাত্র জীবনে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের পূর্বাঞ্চলে আলিগড়ের বিরুদ্ধে (১৯৫৩) চুণী একটি ম্যাচে জোড়া হ্যাট-ট্রিক করেছিলেন। সেবার ওই আসরে গোলের রেকর্ড ছিল তাঁরই।

ছাত্রাবস্থাতেই ক্রিকেটের দিকে ঝোঁক বাড়ে। ফুটবল ছাড়ার পর সেই ঝোঁক পরবর্তী পরিণত হয়। ক্রিকেটে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় চুণী সেঞ্চুরী করেছেন। সফরকারী ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে ইন্দোরে দু ইনিংসে আটটি উইকেট পেয়েছেন ইন সুইং বল করে। তা ছাড়া ইন্দোরে সোবার্সের ক্যাচ যেভাবে ধরেছিলেন তার স্মৃতি প্রত্যক্ষদর্শীর মনে আজও জ্বলজ্বল করছে। ছুটতে পারতেন ভাল। তাই মিড অন থেকে স্কোয়ার লেগে ছুটে গিয়ে বলটিকে বাগিয়ে ধরার তাঁর অসুবিধে হয় নি। বনজি ট্রফিতে বহুর দুই বাংলার নেতৃত্ব করেন এবং নিজে অধিনায়ক থাকার সময়েই বনজিতে প্রথম সেঞ্চুরী করেন বিহারের বিরুদ্ধে। তাঁর নেতৃত্বে বাংলা একবার বনজি ট্রফির ফাইনালেও খেলেছে।

তবে বনজিতে সেঞ্চুরী করার চেয়ে সেঞ্চুরী করতে না পারার একটি ঘটনাকেই চুণী মনের মধ্যে পুষে রেখেছেন। সেবার (১৯৬৯) বোম্বাইয়ের সঙ্গে খেলা বোম্বাই শহরে। বোম্বাই রীতিমত শক্তিশালী—দেশাই, ইঞ্জিনীয়ার ইসমাইল সোলকার এবং আরও অনেকে বোম্বাইয়ের পক্ষে খেলছেন। খেলা আরম্ভের মুখে চুণী আবিষ্কার করেন যে তাঁর পকেট থেকে একশ টাকার একটি নোট হারিয়ে গেছে। মন্দ ভাগ্যের লক্ষণ। মনমরা হয়ে টাকা খোয়া যাওয়ার কথা দলের ম্যানেজার কমল ভট্টাচার্যকে জানাতে তিনি বলেন তাতে কি হয়েছে। তুমি সেঞ্চুরী করো। আমি তোমায় দুশো টাকা দেব। কিন্তু সেঞ্চুরী আর করা হল না। এক ইনিংসে ৯৬ ও আর এক ইনিংসে ৮৪ করে চুণী সেঞ্চুরীর দোর গোড়াতেই আটকা পড়ে যান। ঘটনাটি জানাবার কালে চুণী বলেন, কী আফশোস বলুন তো! বলতে গেলে সেদিন আমার হাত থেকে তিনশ টাকাই ফসকে যায়!

মজা করে বসিয়ে বসিয়ে বলছিলেন চুণী আর একটি কাহিনীর কথা :—

সেবার জাকার্তায় ষ্টেট ব্যাঙ্কেরেটে। ইন্দোনেশীয় প্রেসিডেন্ট সোয়েকর্ণ ভোজসভায় হাজির। নিজে এসে আমাদের পাশে বসে পড়ে বললেন আমি শুধু তোমাদের ভাল খাওয়া-দাওয়ারই ব্যবস্থা করি নি। সময়টা যাতে ভালভাবে কাটে তার জন্যে ফিলিপিনো সুন্দরীদেরও এখানে আনিয়েছি। যার যাকে পছন্দ তার সঙ্গে নাচতে পারো।

প্রেসিডেন্টের কথায় বেশ মজা পেলাম। নাচতে জানি না। তবু মজার সন্ধানেই এক সুন্দরীর হাতে হাত রেখে মহানন্দে নাচা জুড়ে দিলাম। আমাদের দলের আর কেউ অবশ্য সাহস করে এগোয় নি। বেশ কিছুক্ষণ নাচানাচির পর হঠাৎ ভোজসভা কক্ষে এক হাসির হিল্লোড় শুনে তাকিয়ে দেখি, সব বাবী সবাইই নাচ থামিয়ে ওঁর ওঁর করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। মানে, আমার সঙ্গীনীটি পর্যন্ত। আর শুধু আমিই মহা উৎসাহে নেচে চলেছি। ওঁদের মাইনি আর ঠোঁটের কোণে গুড়ো হাসির ঝিলিক দেখে বুঝতে আর বাকি রইল না যে এতক্ষণ যথাই অঙ্গভঙ্গী করেছি আর লোক হাসিয়েছি। আমার নাচ নাচই হয় নি। তবে মজা কিন্তু মন্দ জমে নি।

চুণী বললেন, সেদিন জাকার্তার ওই আসরে মুহূর্তের জন্যে লজ্জা পেলেও ভয় পাই নি। সত্যিকারের ভয় পেয়েছিলাম কলকাতার এক ফিল্ম স্টুডিওতে ছায়া ছবির এক দৃশ্যে অভিনয় করতে গিয়ে। পরিচালক যেই না ক্যামেরার এক জায়গায় গণ্ডী কেটে বললেন এর বাইরে যাবেন না। গেলে ক্যামেরার চোখের বাইরে চলে যাবেন, অমনি বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করতে লাগল। তারপর যতক্ষণ ফ্লোরে ছিলাম ততক্ষণই নিজের কানে নিজের হৃদ-যন্ত্রের ধকধকানি শুনতে হয়েছে। আলোর রোশনাই, পাঁচজনের শোনদৃষ্টি নিজের মনের অসংখ্য জিজ্ঞাসা—সব মিলিয়ে আমার অবস্থা কাহিল। যেন ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি। হাজার হাজার মানুষের খোলা দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে তাদের উচ্চারিত টিকাটিপ্পনি হজম করে বকু ফুলিয়ে খেলেছি। নার্ভাস হই নি। কিন্তু ফিল্ম করতে গিয়ে এক মুহূর্তের অভিজ্ঞতাতেই ঘেমো নেমেছি। বুঝেছি, ব্যাপারটা যার সাজে তারই। ও আমার কম্মো নয়।

জাকার্তার ব্যাঙ্কোরেটে ভোজ কেমন হল চুণী তা বলেন নি। তবে আর একটি ভোজপর্বের কথা তিনি শুনিয়েছেন :—

১৯৬৭ সালে ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে আমাদের খেলার দিনে লীগের পরিস্থিতি ছিল এই রকম : আমরা জিতলে মহামেডান স্পোর্টিং লীগ পাবে। আর হেরে গেলে চ্যাম্পিয়ান হবে ইষ্টবেঙ্গল। মাঠে নামছি অমনি গ্যালারী থেকে কে যেন ফোড়ন কাটলো, আজ আর কী চুণীবাবু মন দিয়ে খেলবেন? শুনেই তেতে গিয়ে খেলার মধ্যে মেতে উঠলাম। হাড্ডাহাড্ডি খেলা। শেষ পর্যন্ত এক গোলে আমরা জিতে ইষ্টবেঙ্গলকে টপকে মহামেডান লীগও পেয়ে গেল।

সেদিন কেমন খেলেছিলাম? তা জানি না। তবে রাত্রে বাড়ি ফিরে দেখি মহামেডান দলের অনুরাগীরা ডাঁই ডাঁই খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন। বিরিয়ানি, কাবাব, মুরগি—নাম-করা হোটেলের রান্না মোগলাই সব খানা। পরিমাণেও অপর্যাপ্ত। বাড়ির লোকজন মিলেও শেষ করতে পারবো না জেনে সেই রাত্রে পাড়াপড়শি, বন্ধুবান্ধবদের ডেকে এনে আমাদের বাড়িতে রীতিমত একটি ভোজ-সভা বসিয়ে দিয়েছিলাম। আর পরের দিনে গোন্দাদি করার সময় আমার তখন কেবলই মনে পড়ছিল যে একেই বলে কারো পোষ মাস, কারো সর্বনাশ।

অজয় বসু

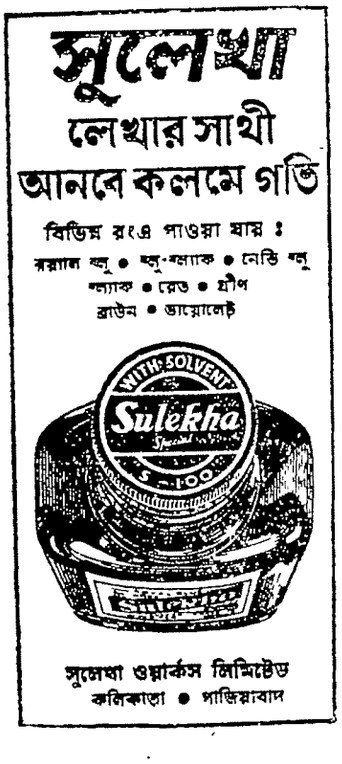

মাঠের নায়ক

বলাই চক্রবর্তী

বলাই চক্রবর্তী ইস্টবেঙ্গলের লেফট্ হাফ্ টপার। কাজল ঢালির শূন্যস্থান পূর্ণ করেছেন এবার। কাজল যখন ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে গেলেন তখন অনেকেরই সংশয় ছিল অতবড়ো ফাঁক সামাল দেবেন কে? খোঁজ চললো, খোঁজ মিললোওই বলাইকে পাওয়া গেল। বলাই এলেন, সই করলেন ইস্টবেঙ্গলে। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে বলাই ফুটবলেই নিবেদিত প্রাণ। ধ্যান, জ্ঞান ঐ ফুটবলই। শক্ত সমর্থ চেহারা বুক ভরা সাহস, অসাধারণ পরিশ্রমী আত্মপ্রত্যয়ে নিটোল। টাকলিং হেডিং এবং ফিডিং নজর কাড়ার মত। জায়গা রাখা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা, জ্ঞান গরিমা সুধীর অশোক আর শ্যামলের পাশে খেলে খেলে দিন দিন বাড়ছে। বলাইয়ের বৈশিষ্ট্য—তার টাফ্ ফুটবলে। ক্রীড়াগত নৈপুণ্যের সঙ্গে ঐ ভঙ্গিটিও সমান্তরালভাবেই প্রবহমান।

'তুমি টাফ্ ফুটবল খেলো কেন?' সেদিন আর্টিলারী রেজিমেন্টের সঙ্গে খেলা সাঙ্গ হওয়ার পর সাজঘরে বসে ঐ প্রশ্নটি রাখতেই বলাই জবাব দিলেন হেসেঃ 'আমরা বরিশালের কাঠ বাঙ্গাল কথাবার্তায় টাফ্, চালচলনে টাফ্, মাঠেও তাই। ফুটবল খেলতে নেমে আমি রজনীগন্ধার স্টিক হাতে নিয়ে কবিতা পড়ার পক্ষপাতী নই। আসল ব্যাপারটা কি জানেন গোড়ায় গোড়ায় সখের ফুটবল খেললেও এখন এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছেছি যখন সিরিয়াস ফুটবল খেলা ছাড়া অন্য কোন গতি নেই। গড়ের মাঠে অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে আমাকে খেটে খেলতে হবে কার্যকর ফুটবল খেলতে হবে। তা যদি না পারি তো—বলাই চক্রবর্তী আউট আউট ফর এভার। এবং ঐ আউটের অর্থ হচ্ছে—নিজের এবং আমার সংসারের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সুতরাং নিজের এবং সংসারের কথা ভেবে আমাকে লড়ে যেতে হবে। অন্যভাবে বলতে পারি—এ লড়াই চলছে চলবে। পরিশ্রম করবো প্র্যাকটিস করবো, পুরুষালি ফুটবল খেলবো। সখি সখি ফুটবল নয়, মেয়ে মেয়ে ফুটবল নয়। মেয়েদের ফুটবল আমি একদম বরদাস্ত করতে পারি না।'

আজকাল দেশে-বিদেশে শ্রীমতীরা ফুটবল খেলছেন বটে কিন্তু ঐ জিনিষটা আমি একদম পছন্দ করি না। কেন জানেন? ফুটবল হচ্ছে গায়ে গতরের খেলা, ভীষণ পরিশ্রমের খেলা, যে পরিশ্রম, যে মেহনত আমরা ছেলেরাই করতে পারি না। বাবু ফুটবলের দিন গত। আজকের ফুটবল কঠোর পরিশ্রমের ফুটবল। দেহে প্রচুর শক্তি চাই, চাই নিবিড় অনুশীলন। ঐ সত্যকে সামনে রেখেই অনুশীলন করছি, খেলছি। কি খেলছি তা জানি না, তবে এটুকু জানি যে, অনুশীলনে ফাঁকি দিচ্ছি না আমি।

বলাইয়ের (ঝুনু) জন্ম দক্ষিণ কলকাতার প্রতাপাদিত্য প্লেসে ১৯৫৫ সালের ১০ মে। এখন অবশ্য বলাইরা চলে গেছেন টালিগঞ্জ অঞ্চলে চণ্ডী ঘোষ রোডে (কুদঘাট)। বাবা রাখালচন্দ্র চক্রবর্তীর আদি নিবাস বাংলাদেশের বরিশাল জেলার স্বরূপকাঠি গ্রামে। বাবা রাখালবাবু এবং মা শ্রীমতী রেণুবালা দেশ বিভাগের পরই ওপার বাংলার পাট চুকিয়ে এপার বাংলায় চলে আসেন। পাঁচ ছেলে এবং চার মেয়ে নিয়ে ভরা সংসার তাঁদের। রাখালবাবু চাকরী করতেন রেলে। অবসর নেওয়ার পর সংসার নামক বিরাট জাহাজটা চালাবার অনেকটা ভার পড়েছে বলাইয়ের মাথায়। স্কুল ফাইনালে পাশ করেছেন বলাই ১৯৭৪ সালে কুমার আশুতোষ স্কুল থেকে (পাইকপাড়া)। বি এন আর-এ চাকরী নিয়েছিলেন ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বরে। এখন আছেন ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া (মিডলটন ষ্ট্রীট পার্শোনাল ডিপার্টমেন্ট)। ফুটবলের প্রথম পাঠ পেয়েছেন পূর্ব পুটিয়ারীর ফ্রেন্ডস ইলেভন ক্লাবে মধুসূদন দত্তের (টুংকুদা) কাছে। টালিগঞ্জ থেকে গড়ের মাঠে এলেন ১৯৬৯ সালে তৃতীয় ডিভিসনে মিলন সমিতির জার্সি গায়ে চাপিয়ে। ৭০

সালেও ওখানে রইলেন। ৭১ সালে কালীঘাট ৭২-এ চাকরীর সূত্রে বি এন আর দলে। চার চার বছর রেলে খেলার পর ১৯৭৬ সালে ডাঃ নৃপেন দাস টেনে আনলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে।

বলাই বাংলা রাজ্য স্কুল দলে খেলেছেন ১৯৬৯ ১৯৭০ ১৯৭১ সালে যথাক্রমে পুণা আগরতলা ও গান্ধীনগরে। আন্তঃ রেলওয়ে ফুটবল খেলেছেন ১৯৭২ ৭৩ ৭৪ এবং ৭৫-এ। ৭৪ সালে ধানবাদে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় রেল ফুটবলের আসরে তিনি পেয়েছিলেন সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি। জাতীয় ফুটবলে বলাইয়ের প্রথম আবির্ভাব ১৯৭৪ সালে জলন্ধরে। ১৯৭৫ সালে কোজিকোড়ে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বলাই নির্বাচিত হয়েছিলেন সেরা রেল ফুটবলার। আন্তর্জাতিক ফুটবলেও বলাই কুয়েতে এশীয় যুব ফুটবলে। খেলেছেন ঐ বছরই বলাই বললেন—ভাল খেলতে না পারলে মন খারাপ হয়ে যায়। আবার ভাল খেললে মনটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে দেহে বল পাই যেমন পেয়েছিলাম ১৯৭২ সালে মহামেডানের বিরুদ্ধে খেলে (০—০) কুয়েতে ইরাণের বিরুদ্ধে খেলে ইরাণির সঙ্গে আমাদের খেলায় ফলাফল হয়েছিল ১—১ গোলে। সে কি খেলা! কি তার স্পীড! কি তার লাইফ কি স্টাণ্ডার্ড! চোখের সামনে যেন এখনো ভাসছে। আমরা এগারোটি ভারতের ছেলে সেদিন জান দিয়ে লড়েছিলাম। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ভাগবো কিন্তু মচকাবো না।

বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

ইডেন উদ্যানে মোহনবাগান-ইস্টবেংগলের খেলার একটি দৃশ্য। ইস্টবেংগলের গোল লক্ষ্য করে উলগানাথন বলে সট করেছেন, এই খেলায় মোহনবাগান ১—০ গোলে জয়ী হয়।

খেলাধূলা

দর্শক

মন্ট্রিল অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধন হয়েছে গত ১৭ই জুলাই এবং খেলা শুরু হয়েছে ১৮ই জুলাই থেকে। এবারের অলিম্পিক ক্রীড়া সূচীতে আছে একশ রকমের খেলা। ১লা আগষ্ট মন্ট্রিলের ২১তম অলিম্পিক গেমসের সমাপ্তি দিবসে আছে মাত্র একটা খেলা—এই খেলা শেষ হওয়ার পরই মন্ট্রিলের ২১তম অলিম্পিক গেমসের সমাপ্তি উৎসব চিরাচরিত প্রথায় উদ্যাপিত হবে।

গত আট দিনের খেলাতে (জুলাই ১৮ থেকে ২৫) পদক জয়লাভের তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছে রাশিয়া দ্বিতীয় স্থান পূর্ব জার্মানী এবং তৃতীয় স্থান আমেরিকা। রাশিয়ার মোট পদক ৬১ (স্বর্ণ ২১ রৌপ্য ২৩ ও ব্রোঞ্জ ১৭) পূর্ব জার্মানীর মোট পদক ৪০ (স্বর্ণ ১৯ রৌপ্য ১১ ও ব্রোঞ্জ ১০) এবং আমেরিকার মোট পদক ৩৮ (স্বর্ণ ১৪ রৌপ্য ১৪ ও ব্রোঞ্জ ১০)। এখনও অনেক খেলার ফাইনাল বাকি সুতরাং চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকাটি কিরূপ নেবে তা আগে থেকে বলা যায় না। অনেক অঘটন ঘটতে পারে। তবে রাশিয়া আমেরিকা এবং পূর্ব জার্মানী—এই তিন দেশই যে চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় প্রথম তিনটি স্থান দখল করবে তা এক রকম জোর করেই বলা যায়।

ইতিমধ্যে মন্ট্রিল অলিম্পিক গেমসের আসরে রানীর সম্মান লাভ করেছে রুমানিয়ার চতুর্দশী জিমনাস্ট নাদিয়া কোমানেসি। একাধিক স্বর্ণপদক জয় এবং অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টির সূত্রে নাদিয়া একাই জিমনাস্টিকস আসর আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। তার জন্যেই জিমনাস্টিকসের জনপ্রিয়তা শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তার নয়নাভিরাম খেলা দেখতে জিমনাস্টিকস হল কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যেত। সকলেই তার খেলার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সকলেরই কাছে নাদিয়া অতি প্রিয় পাত্রী। নাদিয়া জিমনাস্টিকস জগতের এক বিস্ময়কর আখ্যা লাভ করেছে। অলিম্পিক জিমনাস্টিকসের ইতিহাসে নাদিয়াই সর্বপ্রথম ইভেন্টে পুরো পয়েন্ট সংগ্রহের নজির সৃষ্টি করে। তাও একবার নয় মোট সাত বার। এবার মেয়েদের অলিম্পিক জিমনাস্টিকসের আসরে এই সুন্দরী মেয়ে নয়টি ইভেন্টে পুরো পয়েন্ট সংগ্রহ করে অভূতপূর্ব নজির গড়েছে—রুমানিয়ার নাদিয়া কোমানেসি সাত বার এবং রাশিয়ার নেলী কিম দু'বার।

সাঁতারে পূর্ব জার্মানীর সতের বছরের সকল ছাত্রী কোরনেলিয়া এনডার এ পর্যন্ত চারটি স্বর্ণপদক জয় এবং বিশ্বরেকর্ড করার সূত্রে বিরাট ব্যক্তিগত সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। এনডার ১০০ ও ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল এবং ১০০ মিটার বাটার ফ্লাই সাঁতারে বিশ্ব রেকর্ড করে স্বর্ণপদক জয়ী হন। মাত্র আধ ঘন্টার ব্যবধানে এনডার ১০০ মিটার বাটারফ্লাই এবং ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে বিশ্বরেকর্ড করে স্বর্ণপদক জয় রীতিমত বিস্ময়কর নজির। ৪×১০০ মিটার মেডলি সাঁতারে পূর্ব জার্মানী বিশ্বরেকর্ড করে স্বর্ণপদক জয়ী হয়। এই স্বর্ণপদক জয়ী পূর্ব জার্মানী দলে কোরনেলিয়া এনডার অংশ গ্রহণ করেছিল।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত ২৪ জুলাই শনিবার মোহনবাগান ১-০ গোলে ইস্টবেংগলকে পরাজিত করে দুটি মূল্যবান পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। বর্তমানে মোহনবাগানের ১৭টি খেলায় ৩২ পয়েন্ট এবং ইস্টবেংগলের ১৬টি খেলায় ২৯ পয়েন্ট দাঁড়ালো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ-বছরের লীগে ইস্টবেংগলের এটাই প্রথম পরাজয়। অপরদিকে মোহনবাগান এখনও অপরাজিত আছে। কলকাতার বড় ফুটবল খেলার আসরে ইস্টবেংগলের বিপক্ষে মোহনবাগান শেষ জিতেছিল ১৯৬৯ সালে, আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে। সুতরাং ইস্টবেংগলের বিপক্ষে মোহনবাগানের এ জয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সাঁতার

পুরুষ বিভাগের সাঁতারে আমেরিকা এবং মেয়েদের সাঁতারে পূর্ব জার্মানী বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিয়ে চলেছে। ২৪শে জুলাই পর্যন্ত পুরুষ বিভাগের সাঁতারে নয়টি বিষয়ের এবং মেয়েদের বিভাগের সাঁতারে আটটি বিষয়ের ফাইনাল হয়ে গেছে। পুরুষ বিভাগের এই নয়টি বিষয়ের ফাইনালে আমেরিকার সাঁতারুরা স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে। তাছাড়া আমেরিকা সাতটি রৌপ্য এবং চারটি ব্রোঞ্জ পদক

পেয়েছে। এই নয়টি বিষয়ের মোট ২৭টি পদকের মধ্যে আমেরিকা একাই পেয়েছে ২০টি পদক। বাকি ৭টি পদক ভাগাভাগি করে পেয়েছে এই পাঁচটি দেশ—রাশিয়া রৌপ্য ১ ও ব্রোঞ্জ ২ কানাডা রৌপ্য ১ এবং একটি করে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে বৃটেন অস্ট্রেলিয়া এবং পশ্চিম জার্মানী। এ পর্যন্ত পুরুষ বিভাগের যে আটটি ইভেন্ট বিশ্বরেকর্ড হয়েছে তা আমেরিকার সাঁতারুরাই করেছে। আমেরিকার ১৭ বছরের হাইস্কুল ছাত্র ব্রায়ান গুড্ডেল ৪০০ মিটার এবং ১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে নতুন বিশ্ব রেকর্ড সময়ে স্বর্ণপদক জয়ী হয়ে বিরাট ব্যক্তিগত সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে।

মেয়েদের সাঁতারে এ পর্যন্ত (জুলাই ২৪) যে আটটি বিষয়ের ফাইনাল হয়েছে তাতে স্বর্ণপদক পেয়েছে পূর্ব জার্মানী সাতটি এবং রাশিয়া একটি। এই আটটি ইভেন্টের মোট ২৪টি পদকের মধ্যে পূর্ব জার্মানী একাই পেয়েছে মোট ১২টি পদক—স্বর্ণ ৭, রৌপ্য ৪ এবং ব্রোঞ্জ ১। বাকি বারোটি পদক এই চারটি দেশ ভাগাভাগি করে পেয়েছে—রাশিয়া ৩ (স্বর্ণ ১ রৌপ্য ১ ও ব্রোঞ্জ ১) আমেরিকা রৌপ্য ৩ ব্রোঞ্জ ১ কানাডা ব্রোঞ্জ ৩ এবং হল্যান্ড ব্রোঞ্জ ২। এ পর্যন্ত মেয়েদের সাঁতারে ৬টি ইভেন্টে বিশ্বরেকর্ড হয়েছে—পূর্ব জার্মানী করেছে পাঁচটি এবং রাশিয়া একটি। পূর্ব জার্মানী ২০০ মিটার বাটারফ্লাই এবং রাশিয়া ২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক সাঁতারের সমস্ত পদক জয়ের সূত্রে নিরঙ্কুশ প্রাধান্যের নজির সৃষ্টি করেছে। পুরুষ বিভাগে এই রকম নিরঙ্কুশ প্রাধান্যের নজির সৃষ্টি করেছে এ পর্যন্ত একমাত্র আমেরিকা, চারটি ইভেন্টে—১০০ ও ২০০ মিটার বাটার-ফ্লাই ১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক এবং ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে।

হকি প্রতিযোগিতা

মন্ট্রিলের অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতা বর্তমানে সেমি-ফাইনাল পর্যায়ে এসে গেছে। একদিকের সেমি-ফাইনালে 'এ' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হল্যান্ডের সঙ্গে খেলবে 'বি' গ্রুপের রানার্স-আপ স্পেন অথবা নিউজিল্যান্ড। অপর দিকের সেমি-ফাইনাল 'বি' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান পাকিস্তানের সঙ্গে খেলবে 'এ' গ্রুপের রানার্স-আপ ভারত অথবা অস্ট্রেলিয়া।

মন্ট্রিলের অলিম্পিক হকি আসরে প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের খেলায় ১২টি দেশ খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল। এই ১২টি দেশকে দুটি গ্রুপে সমান ভাগ করে লীগ খেলার তালিকা তৈরী হয়েছিল। কেনিয়ার খেলা পড়েছিল 'বি' গ্রুপে। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের অলিম্পিক গেমসে যোগদানের প্রতিবাদে অন্যান্য আফ্রিকান দেশের সঙ্গে কেনিয়া মন্ট্রিল অলিম্পিক গেমস থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে অলিম্পিক হকির 'বি' গ্রুপে পাঁচটা দেশ নিয়ে খেলা হয়। 'এ' গ্রুপে লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল হল্যান্ড। তারা অপরাজিত অবস্থায় পাঁচটা খেলায় ১০ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছিল। 'এ' গ্রুপের লীগের খেলায় যুগ্মভাবে রানার্স-আপ হয়েছিল ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া। লীগের নিম্নস্থানাধিকারী আর্জেন্টিনা অপ্রত্যাশিতভাবে ৩-২ গোলে লীগের ২য় স্থানাধিকারী অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করায় ভারতের কপাল খুলে যায়। তখন ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার পয়েন্ট সমান ৬ দাঁড়ায়। আর্জেন্টিনা তাদের শেষ খেলায় শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে যে জয়ী হবে তা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। এই খেলার আগে আর্জেন্টিনা তাদের চারটে খেলায় একটা পয়েন্টও সংগ্রহ করতে পারেনি। অপরদিকে অস্ট্রেলিয়া তাদের চারটে খেলায় ৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছিল।

সাতবারের অলিম্পিক হকি চ্যাম্পিয়ান এবং বর্তমানের বিশ্ব হকি চ্যাম্পিয়ান ভারত শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ভারত ১-৩ গোলে হল্যান্ড এবং ১-৬ গোলে অস্ট্রেলিয়ার কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। অলিম্পিক হকির ইতিহাসে ভারত অতীতে কখনও এত গোলের ব্যবধানে হারেনি। অলিম্পিক হকি আসরে হল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারতের পরাজয় এই প্রথম।

হকির প্লে-অফ

সমান পয়েন্ট থাকায় দ্বিতীয় স্থান নির্ধারণের জন্য যে প্লে-অফ খেলা হয় তার ফলাফলঃ

এ গ্রুপঃ অস্ট্রেলিয়া ৬ঃ ভারত ৫
(১—১ গোলে খেলা ড্র যায়। ট্রাই-ব্রেকারে ফল দাঁড়ায়ঃ অস্ট্রেলিয়া ৫ ও ভারত ৪ গোল)

বি গ্রুপঃ নিউজিল্যান্ড ১ঃ স্পেন ০

সেমি ফাইনালে হল্যান্ডের সঙ্গে খেলবে নিউজিল্যান্ড এবং পাকিস্থানের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া।

'বি' গ্রুপের লীগ খেলায় পাকিস্তান চারটি খেলায় ৭ পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। ইউরোপের হকি চ্যাম্পিয়ান স্পেনের সঙ্গে তারা ২-২ গোলে খেলা ড্র করে একটা পয়েন্ট নষ্ট করে। ১৯৭২ সালের অলিম্পিক হকি চ্যাম্পিয়ান পশ্চিম জার্মানী এই 'বি' গ্রুপে খেলে শেষ পর্যন্ত সেমিফাইনালে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। 'বি' গ্রুপের লীগ খেলায় রানার্স-আপ হয়েছিল স্পেন এবং নিউজিল্যান্ড, উভয়েরই পয়েন্ট ছিল ৪ করে।

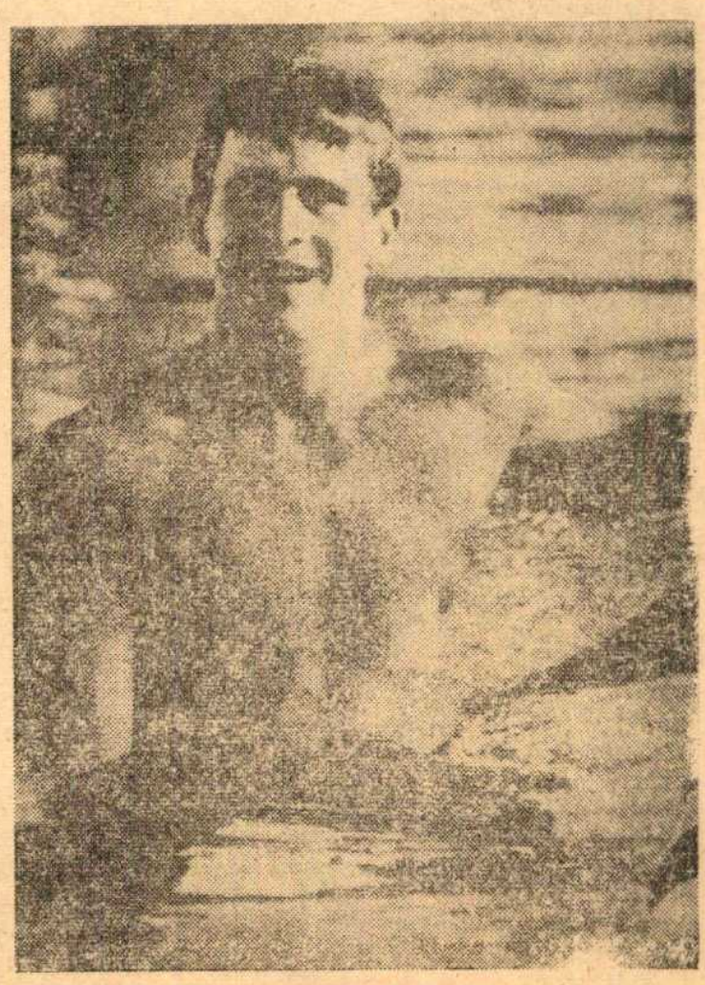

মন্ট্রিল অলিম্পিকে পুরুষদের ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতারের স্বর্ণপদক বিজয়ী ব্রুস ফার্ণিস (আমেরিকা) ১ মিনিট ৫০-২৯ সেকেণ্ড দূরত্ব শেষ করে বিশ্ব-রেকর্ড করেন।

অর্জুন

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : ইন্দর সেন

উদ্বাস্তু কলোনীর নিপীড়িত নিগৃহীত দরিদ্র জনগণকে যখন ব্যবসায়ী কেওয়াল সিং দিবার সাহায্যে তাদের ঘর ভেঙ্গে আগুন লাগিয়ে উৎখাত করতে উদ্যত তখন রুখে দাঁড়ায় অর্জুন। অর্জুন কি সঙ্ঘবদ্ধতার প্রতীক? যাই-হোক তারই নেতৃত্বে কিভাবে কলোনীর লোকেরা তাদের অধিকার ফিরে পায় ছবিতে তাই বর্ণিত।

পরিচালক ইন্দর সেন ছবির গতিকে কোথাও শ্লথ করেন নি। তাই ছবিটি বেশ উত্তেজনাপূর্ণ, ট্রিটমেন্টেও কিছু নতুনত্ব আছে। তবে ছবির আগে ও শেষে অর্জুন কিছু না বললেই ছিল ভাল। ছবিতে চরিত্র অনেক। মূল চরিত্রগুলি বাদে বাকীগুলির গভীরে না প্রবেশ করে ছুঁয়ে যেতে গিয়েও পরিচালক বেশ কিছু ক্ষেত্র তা এড়াতে পারেন নি। বরং কিছু অপ্রাসঙ্গিক চরিত্র (অর্জুনের বান্ধবী) এবং গান বাদ দিয়ে ঘটনা-গুলিকে আরও সুগ্রথিত করার প্রয়োজন ছিল।

প্রাণবন্ত অভিনয় করেন স্বরূপ দত্ত সমিত ভঞ্জ ও বিশেষভাবে সন্ধ্যা রায়। অনেকদিন পর আবার স্বরূপ - সমিত সংঘর্ষ। সুঅভিনয় করেন শোভা সেন প্রেমাংশু ও চিন্ময়। স্মরণীয় অভিনয় করেন গোবিন্দ চক্রবর্তী ও বিজন ভট্টাচার্য। কলাকৌশলও কাজ ভাল হওয়া সত্ত্বেও কিছু দৃশ্য ঝাপসা থেকে যায়। সঙ্গীত পরিচালক আনন্দশঙ্করের এ্যাফেকট মিউজিক অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ স্মরণযোগ্য।

চিন্ময়
স্বরূপ

রাজশ্রী বসু

অসময়

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : ইন্দর সেন

যখন সময় ছিল যৌবন ছিল তখন মোহিনীর জীবনে কেউ কেউ এসেও-ছিল। যার একজন শচীপতি যে কোন এক সংস্কারবশে নিজেকে অযোগ্য মনে করে কাপুরুষের মতই সরে দাঁড়ায়। অপরজন স্বামী রাজেশ্বর যার অত্যাচার তাকে পালিয়ে আসতে বাধ্য করে। সব-শেষে আসে অবিন নিতান্তই অসময়ে এবং ঝড়ের বেগে। এই ঝড়ে মোহিনী নিজেকে সামলাতে পারে না। তার মনের বন্ধ দরজায় ঘটে বিস্ফোরণ। চুরমার হয়ে যায় তার পৃথিবী আর সে ভেসে যায় এক দুর্বার স্রোতের টানে।

ছবির যা ভাল তা হল এর অপূর্ব কাহিনী (বিমল কর) সুন্দর সংলাপ সঙ্গীত আলোকচিত্র ও লোকেশান। আর সে যে কারণে ছবিটি আশানুরূপ হয়ে ওঠে নি তা হল—চিত্রনাট্য সম্পাপনা ও বিশেষত অভিনয়। একমাত্র অনিল চট্টো-পাধ্যায় ছাড়া মুখ্য চরিত্রগুলিতে কেউই তেমন ভাল অভিনয় করেন নি। অথচ অভিনয়ের যথেষ্ট সুযোগ ছিল এবং একটু ভাল করলে ছবিটিও অনেক জমে উঠত। কাহিনী বিশ্লেষণের দিকেও বেশ নজর দেবার প্রয়োজন ছিল। সমগ্র উপন্যাসটিতে বিশেষত শেষের দিকে যে বিশেষ রস বা অনুভূতির স্বাদ মেলে সিনেমায় তা কোথায়? মোহিনীর অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সংঘাতটিকে কি আরও ভাল ফোটানো যেত না? অপর্ণা সেনের মোহিনী আরও ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও সংযত হতে পারত। আর অবিন (স্বরূপ দত্ত)? অনিল চট্টোপাধ্যায়ের জ্যাঠামশাই একটি নিখুঁত চরিত্রচিত্রণ। এছাড়া মহুয়া (আয়না) ও পার্থ (তপু) বেশ ভাল অভিনয় করেন। ছবিতে এদের প্রসঙ্গই সবচেয়ে ভাল লাগে। অন্যান্য ভূমিকায় দীপংকর দে, দেবীকা দাস, কল্যাণ চট্টো-পাধ্যায় ও চিন্ময় রায়ও সুঅভিনয় করেন। আনন্দশঙ্করের আবহসঙ্গীত উন্নতমানের। গানগুলিও (নজরুল) সুগীত তবে সুপ্রযুক্ত নয়।

চিত্রদূত

লেজে খেলানো

সিস্টার/সুপ্রিয়া দেবী পরিচালনা : পীযূষ বসু। —অমৃত ফটো

কালকাটা মুভিটোন স্টুডিওর স্টেটিং ডিপার্টমেন্টের কর্মী মারুর হাঁকডাকে যে সারমেয়টি ল্যাজ খাড়া করে হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এসে ব্রেক কষে দাঁড়াল তাকে দেখে সত্য বাঁড়ুজ্যে বেশ পুলকিত হলেন। এমন ঘাঁয়ে ভাজা কুকুর কদাচিৎ দেখা যায়। পিয়ার লেস কুত্তা গায়ে লোম প্রায় নেই বললেই চলে, খোঁকড়ে চেহারা।

মারু একগাল হেসে বলল—বাবু এরই নাম বোঁদে। ব্যাটা বোঁদে খেতে দারুণ ভালবাসে তাই ওর নাম রেখেছি বোঁদে। এটাই আপনাকে কামড়েছে।

কুকুরটিকে ভালভাবে পর্যবেক্ষন করলেন সত্য বাঁড়ুজ্যে। ডাক্তার বলে দিয়েছিলেন দেখবেন মশাই মাথায় ঘা হয়েছে কিনা মুখ দিয়ে লাল পড়ছে কিনা! যদি দেখেন পড়ছে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবেন ইঞ্জেকশন শুরু করে দিতে হবে...। কিন্তু ভাল করে দেখে সত্য বাঁড়ুজ্যে নিশ্চিত হলেন—মাথায় ঘা নেই। আর লাল? কই পড়ছে না তো।

—আচ্ছা মারু, তোমার এই বোঁদে নাল ফেলে মুখ দিয়ে?

—নাল?

হাঁ নাল।

মারু একটু ভেবে নিয়ে বলল—হা ফেলে।

সত্য বাঁড়ুজ্যে হকচকিয়ে গিয়ে বললেন—ফেলে?

—ফেলে বৈকি বাবু—মারু একগাল হেসে জবাব দিল—গরম জিলিপি দেখলেই নাল ফেলে। ভাল-মন্দ খাবার দেখলে বলে আমাদেরই পড়ে আর ও তো সামান্য বোঁদে কুকুর। কী যে বলেন বাবু, হাঃ হাঃ হাঃ—

—থাম থাম—সত্য বাঁড়ুজ্যে রেগে গিয়ে ধমক দিলেন। এই জন্যে লোকজন সাধে কিছু হয় না। এখানে সিরিয়াস ব্যাপার হচ্ছে তা নিয়েই যেন মস্করা করছে।

তারপর সত্য বাঁড়ুজ্যে ভাবতে বসলেন তাঁর এখন কী করা উচিত! ডাক্তার বলছেন একমাস আক্রমণকারীকে কড়া নজরে রাখতে হবে লক্ষ্য করতে হবে এই সময়ের মধ্যে আক্রমণকারীর ব্যবহারের বড় রকম কোন তফাৎ হচ্ছে কিনা দেখতে হবে সে নিশিদিন বদমেজাজ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিনা বা কাউকে অতর্কিতে আক্রমণ করছে কিনা বা নিজের ল্যাজ নিজে কামড়াচ্ছে কিনা! সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অবজার্ভ করতে হবে। এবং ইতর বিশেষ হলেই চিকিৎসার আশ্রয় নিতে হবে। এটাকে তো বাড়ী নিয়ে যাওয়া যায় না। কোথাও আটকে রাখাও সম্ভব নয়। কে এর দেখ—ভাল করবে? কার আর ঘেয়ে কাজ নেই যে এইরকম বিচ্ছিরি এট্টা বিদেশী কুকুরের সংগত করে!

মারু জানাল—বাবু বোঁদে বেওয়ারিশ। যত্রতত্র প্যাদানি খাচ্ছে। এখন কি করে বলি হুজুর-ও রোজ তাপ্পানায় ফিরবে! নিশ্চয় সঙ্গ শক্ত। তারপর ব্যাটা একে নবাবের বেটিয়া। বিয়ে বাড়ীর গন্ধ পেলে ও শ্যামবাজার উলাবেড়ে পর্যন্ত ঢলে যেতে পারে। তখন?

—তাহলে ব্যাটাকে বেঁধে রাখ। আমি না হয় সব খরচ-খচা দেব।

মারু সন্ত্রাসে বলল—অসম্ভব। এমন চেঁচাবে যে শুটিং বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের মালিক রাজী হবেন না।

—তাহলে?

—আমিও তো তাই ভাবছি। দেন আপাততঃ কিছু পয়সা, ওর জন্যে, জিলিপি

যা বোঁদে নিয়ে আসি! না হলে ব্যাটা এক্ষুনি পগার পার হয়ে যাবে।

এলো জিলিপি। বোঁদে আনন্দের চোটে প্রথমে খানিকটা নেচে নিল তারপর তারবং করে সেগুলো সাঁটল। মায় শালপাতাটা চিবিয়ে কিমা করে ছাড়ল। আর ততক্ষণ অন্যান্য নেড়িগুলিকে হেই হেই করে মারু তাড়াল। বোঁদে জিলিপি সাঁটছে দেখে ওঃ তাদের সেকি হিংসে। এমন কান্ড তারা জন্মে দেখেনি; যাকে কামড়েছে সেই এখন আদর করে জিলিপি খাওয়াচ্ছে? হুঁ গড়!

সত্য বাঁড়ুজ্যে মহা ঝঞ্ঝাটে পড়লেন। অফিস কাছারী থিয়েটার আর সিনেমা সামলে তিনি দৈনিক যে এপাড়ায় বোঁদের খবর করতে আসবেন এমন উপায় কোথায়! অগত্যা মারুকে বললেন—ভাই যাহোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে তোমাকে। বোঁদেকে সামলে-সুমলে রাখতেই হবে। খরচাপাতির জন্যে ভেব না। যা লাগে আমিই যোগান দেব—কি আর করা যাবে। তুমি এখন দায়িত্ব নিলেই হয়। মারু বলল—এ ব্যাটা বেজাক্কেলে কুকুর অনেকদিন থেকেই দেখছি তো যদি চম্পট দেয় তো কেস খারাপ তাই ভাবছিলাম একটা রাস্তা আছে—

—আছে নাকি রাস্তা? বল বল ভাই—

মারু বিড়ি ধরিয়ে গম্ভীর মুখে বলল—ওকে সংসারী করা।

শুনে সত্য বাঁড়ুজ্যের চোয়াল ঝুলে যাবার দাখিল—কী বললে?

—আজ্ঞে হাঁ বাবু বোঁদেটা একা একা থাকে এখন ধরুন যদি ওকে এটা ইয়ে দিয়ে দেয়া যায় তো মক্কেল পুরো টিট স্টুডিও ছেড়ে একপা নড়বে না।

—তা তোমার ইয়েটা কী?

মারু সলজ্জ ভঙ্গীতে বলল—মানে বে দিয়ে দেয়া আর কি!

সত্য বাঁড়ুজ্যে হাসবেন না কাঁদবেন—কিছুক্ষণ স্থির করতেই পারলেন না। রঞ্জন জানে—সত্যদার সেন্স অফ হিউমারের তুলনা হয় না এক-একটা গুবুতর সিচুয়েশনে সত্যদার একটা মার সরস ডায়লগ যেন মিরাকল এফেকট দেয় তাই তো সত্য বাঁড়ুজ্যে তরুণকুমার জুটিতে মামা-ভাগ্নে সেকচু এত পপুলার। সেদিন মারুর কথায় সত্য বাঁড়ুজ্যে শেষ পর্যন্ত হাসবেন বলেই মনস্থির করলেন। হাঃ হাঃ হাঃ হাসিতে জায়গাটা উচ্চকিত হয়ে উঠল। —বাঃ বেশ বলেছ মারু বিয়ে দিয়েই ব্যাটাকে আটকাতে হবে—বেশ বলেছ। তাহলে তুমি সেই ব্যবস্থাই কর বেশ সুন্দরী পাত্রী দেখে ওকে বিয়ে দিয়ে দাও জমিয়ে সেই আরেঞ্জমেন্টই তুমি কর। খরচ-খর্চা আমিই যুগিয়ে দেব। নাও ধরো— বলে তখুনি দশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিলেন।

তারপর প্রতিদিনই এসেছেন স্টুডিওতে। মারুর সেবায় যত্নে বোঁদে ক্রমেই হোৎকা হয়ে উঠছে। এত দ্রুত ভাগড়া হবার কারণ আবিষ্কার করা গেল মারু ওকে মাঝে মধ্যে চোলাইও খাওয়াচ্ছে। তবে মাঝে মাঝে ও নিপাত্তা হয়ে যায়। তখুনি যত মুস্কিল। মারু তখন খোঁজ নেয় কাছে কোথায় বিয়ে হচ্ছে। বিয়ে বাড়ীর গন্ধ পেলে বোঁদে স্থির থাকতে পারে না। একদিন ব্যাটা চব্বিশ ঘন্টা পলাতক ছিল। সত্য বাঁড়ুজ্যের সেকি ধড়ফড়ানি—এইরেঃ দাম্পত্য কলহ কেটে গেল নাকি? বৌটা কোথায়? তাকে দেখা গেল নিশ্চিন্তভাবে লাজ নাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। কলহের কোন চিহ্ন নেই তার গায়ে-গতরে। তবে কি বোঁদে সন্ন্যাসী হল? না ডেলিপেসেঞ্জারি ধকুড়ুক প্যাসেঞ্জারি সহ্য করতে না পেরে সেই অভিমানে দেশত্যাগী হল? না গত চার-পাঁচ ঘন্টার মধ্যে এই এলাকার পাড়ার কোন কুকুর প্রহৃত হয়নি। কর্পোরেশনের ডগ স্কোয়াডও বছর খানেক এদিক-পানে মাড়ায়নি। তাহলে গেল কোথায়?

পরদিন আবার যথারীতি বোঁদেকে তার আস্তানায় পাওয়া গেল। মারু ধরে এই ঠেংগাল বজ্জাত কুকুর না বলে কোথায় গিয়েছিলি? বোঁদে কুঁই কুঁই করে প্রহার হজম করে গেল। বাস একমাস ভালয় ভালয় পার সত্য বাঁড়ুজ্যেকে ডাক্তার রায় দিলেন যান মশাই এযাত্রা বেঁচে গেলেন এবার কুকুর সামলে পা ফেলবেন কিন্তু...

—সে আর বলতে—বলে সত্য বাঁড়ুজ্যেও লম্বা।

এখন এখানে চলছে গরু তাড়া খাবার মহড়া।

ছবির গল্পেও আছে—ইন্দু মিত্তিরের প্রতিবেশী মাধব ঘোষের মধ্যে কারও কোন বাক্যালাপ নেই। কয়েকদিন আগে একটা দুর্ঘটনা হয়েছিল দুজনের মধ্যে। এখন তার জের চলছে। মাধব একদিন বিকেলে দেখে ইন্দু মিত্তির তার পেয়ারের চাকর ভুতোকে নিয়ে হাট থেকে ফিরছে। অমনি মাধবের মাথায় দুষ্টবুদ্ধি চাগাড় দিয়ে উঠল। নিজের চাকর কেনোকে ডেকে বলল—গোয়াল থেকে ঝামেলাকে নিয়ে আয় তো। ঝামলা একটি গরুর নাম। ভয়ংকর টেঁটিয়া। মানুষ ছাড়া যাকে পায়—অমনি চার্সিয়ে দেয় ঠাঁই ঠাঁই করে। আর এই বেয়াড়া স্বভাবের জন্যে ঝামেলাকে গোয়ালের বাইরে রাখা হয় না। ওর জল-জাবনা যা দেবার সব থাকে গোয়ালেই দেওয়া হয়।

কেনো মানিবের নির্দেশমত তৎক্ষণাৎ ঝামেলাকে বার বাড়ীতে নিয়ে এল। ওদিকে তখন ইন্দু মিত্তির ভুতোর সংগে খোশ গল্প করতে করতে বাড়ীর পথে চলছে। মাধব কবল কি—ঝামেলার লাজ বেদম মুচড়ে দিয়ে ভোঁ করে লেলিয়ে দিল ওদের পেছনে। মোচড় খেয়ে ঝামলা লাজ খাড়া করে ছুটল।

(চলবে)

রঞ্জন মজুমদার

৩০শে জুলাই থেকে—
আমি "স্যার নবকৃষ্ণ"!

সুচিত্রা সেনগুপ্তা ঘোষ অন্যান্য চরিত্রে ঃ বাসবী - সুলতা - অনুপ - হরিধন তর্ণুণ - পার্থ - শৈলেন - অরনাথ - শিউলী - জহর - দেবীকা - সোমা অজয় - দিলীপ - শ্রাবণী - ছায়া দেবী ও উৎপল দত্ত।

রূপবাণী ঃ অরুণা ঃ ভারতী ও অন্যান্য চিত্রগৃহে।

॥ সংহিতা চিত্রম পরিবেশনা ॥

কয়েকজন

প্রাণকৃষ্ণ বাবুর বয়স তখন বছর কুড়ি হবে। দেশ-গাঁ মলয়পুরে লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে চাকরীর সন্ধানে এসেছেন কলকাতায়। কিন্তু চাকরী কে দেবে? যদিও সেই উনিশশো চল্লিশ সালে চাকরীর বাজারে এমন মন্দা ছিল না। কিন্তু জানাশুনো লোকজন কোথায়? যাঁকে ধরে একটা মাঝারি গোছের রোজগারের বন্দোবস্ত হয়।

ভাগ্যদেবী বোধহয় তাঁর প্রতি তেমন অপ্রসন্ন ছিলেন না। অল্প কদিন পরে একরকম বিনা পরিচিতিতেই ভারাইটি ফিল্ম-এর অফিসে পিওনের চাকরী পেয়ে গেলেন। কোনদিনই আত্মসম্মান বোধে তাঁর আঘাত লাগেনি সেজন্য। শ্রমের মর্যাদাই ছিল তাঁর কাছে বড়। এখনও তিনি বিশ্বাস করেন কাজ কখনও মানুষকে ছোট করে না, ছোট করে আত্মম্ভরিতা।

ওখানে বছর পাঁচেক কাজ করার পর এলেন সুরেন্দ্ররঞ্জন সরকারের ইস্টার্ন টকীজে। এবার আর পিওনের চাকরী নিয়ে নয়, রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে। ইস্টার্ন টকীজের ব্যবসা তখন চলছিল বেশ ভালই।

প্রতি সপ্তাহে ছবি নিয়ে এখানে ওখানে যান, কখনও হাওড়া কখনও শ্রীরামপুর কখনওবা আরও দূরে। ধীরে ধীরে ফিল্ম ব্যবসার অন্ধিসন্ধিগুলো তাঁর আয়ত্ত হতে লাগল। ভারাইটি ফিল্মসের পিওন প্রাণকৃষ্ণ দত্ত আটচল্লিশ সাল হলেন ইস্টার্ণ টকীজের ম্যানেজার। মালিক সুরেনবাবু ওর কাজে খুব খুশী। বছর তিনেক রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে তাঁর ব্যবসাকে তিনি অনেকটা এগিয়ে দিয়েছেন।

সুতরাং যোগ্যব্যক্তিকে যোগ্য আসন দিয়েই তিনি বসালেন।

কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানেন ওপর তলার লোকদের মধ্যে সবসময়ই নানা ধরনের কমপ্লেক্স কাজ করে। এই কমপ্লেক্স-রোগ থেকে কেউই মুক্ত নন। ফলে পার্সোনালিটির সংঘাত অনিবার্য। এক্ষেত্রেও তাই হোল। বছর দেড়-দুই বাদে সংঘাতের ফলে প্রাণকৃষ্ণ বাবু ছেড়ে দিলেন ইস্টার্ন টকীজ।

ইতিমধ্যে সত্যনারায়ণ খাঁর (নারায়ণ পিকচার্স) সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। দীপচাঁদ কাংকারিয়ার বাঁকা লেখা ছবির জন্য সত্যনারায়ণবাবুকে পারসুয়া করিয়ে টাকা পাইয়ে দিয়েছেন এই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মশাই-ই। আর দলে দুর্গা বসু মল্লিকতো অনেকদিন ধরেই ছিলেন।

তিনজনে মিলে শুরু করলেন নারায়ণ পিকচার্স। অল্পকরী সব ব্যাপারের দায়-দায়িত্ব রইল নারায়ণবাবুর ওপর এঁরা দুজন হলেন ওয়ার্কিং পার্টনার অফিসের কাজ-কর্ম কিং এসব ব্যাপার প্রাণকৃষ্ণবাবুই ছিলেন সর্বেসর্বা।

স্বামী কিষাণ নিষ্কৃতি মেজদিদি রাণী রাসমণি ইত্যাদি ছবি করে নারায়ণ পিকচার্স তখন অল্প সময়ের মধ্যেই চলে এসেছিল সবার আগে। সত্যনারায়ণবাবুর টাকা এবং প্রাণকৃষ্ণবাবুর বুদ্ধি মিলেই নারায়ণ পিকচার্সের এই রেকর্ড সাফল্য।

কিন্তু ঐ যে আগেই বলেছি—কমপ্লেক্স আর পার্সোনালিটির কনফ্লিক্ট সব নষ্টের মূল। উপরন্তু পার্টনারশিপ ব্যবসায় এ দুটো বস্তুতো একবারে অঙ্গের ভূষণ। সুতরাং নারায়ণ পিকচার্সের অমন হিংসা-উদ্রেককারী সাফল্য তিনজনকে দিলো আলাদা করে। পাশের বাড়ীর পর ওঁরা চলে গেলেন আলাদা বাড়ীতে।

কারণটা কি? জিজ্ঞেস করায় প্রাণকৃষ্ণবাবু বললেন—ওসব অতীতের ঘটনা বলে আর শত্রুতা বাড়িয়ে কি লাভ? হয়তো আমিই দায়ী হয়তো বা তাঁরা। তবে যা হবার ছিল তাই হয়েছে এটুকু বলতে পারি। (নারায়ণবাবুও এই কথাই বলেছিলেন) ছাপ্পান্ন সাল নাগাদ তিনি বেরিয়ে এলেন নারায়ণ পিকচার্স থেকে। এতদিনের ব্যবসায় যা কিছু জমিয়েছিলেন তার সব কটি পয়সা দিয়ে শুরু করলেন নিজের কোম্পানী। শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স সাতাশি ধর্মতলা স্ট্রীটে বাইশ বছর আগের সেই অফিস এখনও চলছে। এখনও প্রাণকৃষ্ণবাবু নিয়মিত অফিসের তদারকি করে যাচ্ছেন। নতুন ছবি কিনছেন পুরনো ছবি বিক্রী করছেন।

শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রথম থেকেই ছবি প্রযোজনা এবং পরিবেশনা দুটো দায়িত্বই নিয়েছেন। অগ্নি সংস্কার এই ব্যাপারে প্রথম ছবি পরিচালক অগ্রদূত। সুপার হিট হয়েছিল ছবিখানা। কিন্তু পরিবেশক হিসাবে যে ছবিখানিতে তিনি প্রথম হাত দিয়েছিলেন সেটি তেমন চলেনি। বীরেন দাসের নতুন পাঠশালা ছবির নামটি কজনের আর মনে আছে?

দ্বিতীয় ছবি অগ্নিশিখার (রাজেন তরফদার) ভাগ্যও তেমন সুপ্রসন্ন ছিল না। পরের প্রোডাকসন বাদশা অবশ্য সেই লোকসান পূরণ করে দিয়েছে। শ্রীবিষ্ণু পিকচার্সের সবচেয়ে হিট ছবি এটাই।

প্রাণকৃষ্ণবাবু বললেন—বাদশাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে! ভাল পিরিয়ডে ওটি না থাকলে বোধ হয় বাঁচতেই পারতুম না। এখনও ভালো বিজনেস আনছে বাদশা।

এই ছবির সাফল্য তাঁকে দিয়ে করাল তাপসী ১৯৬৬ সালে। ছবিটা তেমন হোল না মানে বিজনসে আর কি? সুতরাং আর কোন রিস্ক না নিয়ে নীরবে নিভৃতে প্রোডাকসনের কাজ থেকে সরে গেলেন প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মশাই ওরফে শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স।

পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়ে প্রযোজনা থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন। শ্রীবিষ্ণু

বিমল করের আকাদেমী
পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাসের চিত্ররূপ

আমাদের সমাজে মেয়েরা
ব্যবহার্য সামগ্রী।
পুরুষরা তাদের ব্যবহার
করে। স্বতন্ত্র মূল্য
দেয় না।

অসময়

শ্রেঃ—অপর্ণা - দীপংকর - মঞ্জু - অনিল - স্বরূপ
সগৌরবে চলছে

রাধা - পূর্ণ - প্রাচী

এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে

শুভারম্ভ ৩০শে জুলাই

অমর
কথাশিল্পী
শরৎচন্দ্রের
জন্ম শতবার্ষিকীর
মহান
চিত্রপ্রয়াস
চিত্রলিপি ফিল্মসের
দত্তা
সুচিত্রা সেন
সৌমিত্র চ্যাটার্জী
উৎপল দত্ত
সমিত ভঞ্জ
নৃপেন মুখার্জী
সুমিত্রা মুখার্জী
প্রযোজনা
বিমল দে

পরিচালনা অজয় কর • সঙ্গীত হেমন্ত মুখার্জী

শ্রী - ইন্দিরা ও অন্যত্র

বাদশা (১৯৬৪)/কালী বানার্জি ও মাঃ শঙ্কর

পিকচার্স এখন শুধু পরিবেশক। প্রযোজনায় আবার ফিরবেন কি? প্রশ্ন শুনে তিনি বললেন—আর তেমন ইচ্ছে নেই। পরিবেশনার কাজেও প্রাণকৃষ্ণবাবুর ভাগ্য এখন তাঁকে তেমন প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখছে না। আঁধার পেরিয়ে জিন্দগী জিন্দগী এবং পদী পিসির বক্সঅফিস পর পর ফেল করায় তিনি এখন খুব সেকি।

অথচ আশ্চর্যের ব্যাপারটা দেখুন যে এল কাপুরের ব্যাপারে তপন সিংহর প্রতিটি ছবিই হিট। কিন্তু শ্রীবিষ্ণু পিকচার্সের ক্ষেত্রে হিন্দী বাংলা দুটি ছবিই ডাম ফ্লপ। এমনকি অরুন্ধতী দেবীর রঙিন শিশু চিত্রটি পর্যন্ত। ভাগ্য একেই বলে!

—বললাম এরকম ডিজাস্টার হোল কেন ভেবেছেন কখনো? হাসতে হাসতে তিনি বললেন—ভেবে আর কি করবো? যা হবার তাতো হয়েইছে! ছবি করার আগে সব দিক দেখে শুনেইতো শুরু করেছিলাম। তবুও হোল এমন অঘটন। আমার স্পেকুলেশন ঠিক হয়নি এটুকু বলতে পারি।

ছবির ডিস্ট্রিবিউশন নেবার আগে প্রযোজক পরিচালকের সঙ্গে যেমন যেমন আলোচনা কথাবার্তা হবার কথা তাতো হয়েইছিল। কাঁচাপাকা চুলে হাত বুলিয়ে সিগারেট ধরাতে ধরাতে কপালটা দেখিয়ে বললেন—আমি ফিল্ম স্টারে বিশ্বাস করি না এই স্টারটাকে বিশ্বাস করি।

সুতরাং ভাগ্য খারাপ—কপাল মন্দ বলেই এই অঘটনকে মেনে নিতে হয়েছে তাঁকে।

মাঝখানে কয়েকখানা হিন্দী ছবি নিয়েও কাজ করেছিলেন। কিন্তু ভালো লাগেনি তেমন। পয়সা অবশ্য পেয়েছেন। সুতরাং আর ফেরেননি। তাছাড়া এখন হিন্দী ছবি পেতে গেলে কমসে কম আট-দশ লাখ টাকা দরকার। ঐ টাকা দিয়ে দুখানা বাংলা ছবি করা যেতে পারে।

নিজের ছবিগুলো ছাড়াও পুরনো কিছু ছবি সম্প্রতি কিনেছেন তিনি। এখনতো পুরনো ছবির বাজার ভালোই! সেই আশায়: আর অর্ডিন্যান্স হলেতো ছবির দরকার হবেই তখন এই ছবিগুলো মন্দ বিজনেস করবে না।

অর্ডিন্যান্সের কথা আসতে তিনি বললেন—ও সম্পর্কে এখন কিছু বলতে পারছি না। কারণ অর্ডিন্যান্সের ধারা উপধারা কি হবে না হবে কিছুই জানি না কি বলতে কি বলব।

পরিস্কার কোনো অভিমত না দিলেও প্রাণকৃষ্ণবাবু এটুকু বললেন যে সেন্সর ওইজ রিলিজে কিছু সুবিধেতো হবে। ছবি করে অনিশ্চিতভাবে বসে থাকার ব্যাপারটা বসে যাবে।

নতুন রিলিজ হাউসগুলোকে কিভাবে ফিল্ড আপ করা যাবে বা উচিত জানতে চাইলে প্রথমে সেখানে রিলিজ করাতে হবে। হলগুলোর হিন্দী ইমেজ পাল্টানো দরকার সবার আগে।

উদাহরণও দিলেন তিনি। গ্রেস হিন্দী ছবির হাউস সবাই জানে। হঠাৎ সেখানে ছোট বাজেটের বাংলা ছবি রিলিজ করালে কেউই দেখবে না। সুতরাং প্রথম প্রথম ঐসব হলে উত্তম-সুচিত্রা প্রমুখ বিগস্টারদের বড় ছবি রিলিজ করিয়ে হলটাকে বাংলা ছবির হাউস-এ পরিণত না করে দমদাম কাজ করার ফল ভালো হবে না। তাতে ছবিরও ক্ষতি হলেরও ক্ষতি।

এবং আরেকটা ভাববার মত কথা বললেন তিনি। প্রদর্শক পরিবেশক সম্পর্কে প্রাণকৃষ্ণবাবুর মত আগেকার মত পার্সেন্টেজ বেসিসে ছবি রিলিজ হোক। রিলিজের প্রথম তিন-চার সপ্তাহ সিকসটি ফরটি শেয়ার পরে ফরটি সিকসটি শেয়ার। আগে যেমনটি হতো। এতে কারোই ক্ষতি লাভের দুর্ভাবনা কম।

নিরীক্ষক

সেই চোখ/ উত্তম ও মহুয়া

নাটমঞ্চ

উইল শেকসপীয়র

বাংলার বাইরের কোন নাট্যদল কলকাতায় এসে নাটক মঞ্চস্থ করলে যেমন সেই নাটক দেখার ব্যাপারে আগ্রহের সঞ্চার হয় তেমনি কেমন একটা আনন্দও হয়। আর সেই নাটক পরিবেশন যদি চমক সৃষ্টি করে এবং রীতিমত মর্যাদাসম্পন্ন হয় তাহলে গর্বটা যেন বাঙালী হিসেবে আমাদেরই বেশী হয়।

সেই আনন্দ আর গৌরবের অবকাশ ঘটল আবার সম্প্রতি আকাডমী মঞ্চে জামসেদপুরের 'বর্তিক' নাট্যগোষ্ঠীর 'উইল শেকসপীয়র' দেখে।

নাটক দেখতে বসে অবাক লাগছিল এই ভেবে যে বঙ্গসংস্কৃতির স্নায়ুকেন্দ্র কলকাতা থেকে দূরে বাংলার বাইরে (জামসেদপুর যদিও কলকাতা থেকে খুব বেশী দূরে নয় বরং বলা যায় বাংলাদেশের সীমানার গা ঘেঁষেই তার অবস্থান তবুও সেটা বাংলার বাইরে অবশ্যই) সীরিয়স নাটক করার এই প্রয়াস তাঁরা কোথা থেকে পেলেন। যেন বাংলার বাইরে নয় এই কলকাতারই কোন গ্রুপ থিয়েটার নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে নিজেদের দায়িত্ব পালন করছেন। এ বড় কম কৃতিত্ব এবং গৌরবের কথা নয়।

এর জন্য 'বর্তিক' নাট্যগোষ্ঠী ও নাট্য পরিচালক প্রদীপ চক্রবর্তীকে ধন্যবাদ।

কি নাটকের বিষয়বস্তু কি অভিনয় ও সামগ্রিকভাবে টিম ওয়ার্ক—সব দিক থেকেই কলকাতার সচেতন দর্শকদের তাঁরা অবাক করেছেন। (নাটকটি অবশ্য কোলকাতার একটি দল পূর্বে অভিনয় করেছেন।) ব্যক্তিগতভাবে এই নাট্যসমালোচকের মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের কাহিনী উপস্থাপনা কাব্যমন্ডিত ঋজু সংলাপ ও বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আছে। এই নাটকে সেটা আরো বেড়ে গেল। বহু জায়গায় সংলাপ শুনতে শুনতে যেন মনে হচ্ছিল মঞ্চে কোন চরিত্র মারফৎ ভাব ভাষা ও ছন্দে সমৃদ্ধ কোন কাব্যপাঠ শুনছি।

সত্যি কথা বলতে কি এমন নাটক মঞ্চে উপস্থাপিত করে তাকে সার্থক করে তোলা সত্যিই দুরূহ। কিন্তু সেই দুরূহ বাধাকে ডিঙ্গিয়ে 'বর্তিক'-এর শিল্পীরা উইল শেকসপীয়ারকে আশ্চর্যভাবে সার্থক করে তুলেছেন।

এ নাটকের বিষয়বস্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্য-জাদুকর উইলিয়ম শেকসপীয়রের জীবনকে অবলম্বনে। যেখানে তাঁর প্রথম যৌবন থেকে নাট্যকার হিসেবে মধ্যগগন স্পর্শ করার সময় পর্যন্ত ধরে রাখা হয়েছে। নাটকের শুরু প্রিয়তমা স্ত্রীকে ছেড়ে লন্ডনে আসা; শেষ ইংলন্ডেশ্বরীর হাত থেকে মাথা পেতে নেওয়া গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্বর স্বীকৃতির মুকুট।

উইল শেকসপীয়রের ভূমিকায় অভিনয় করে যিনি দর্শকদের অবাক করে দিয়েছেন তিনি প্রদীপ চক্রবর্তী। চরিত্রটির মানসিকতা যন্ত্রণা অস্থিরতা উদ্দামতা স্ফুরনোন্মুখ প্রতিভার জন্য যে মানসিক চঞ্চলতা উইলিয়মকে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারে রূপান্তরিত করেছিল তার প্রকাশ প্রদীপবাবুর অভিনয়ে যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। মঞ্চে এমন চরিত্রচিত্রণ সত্যিই দুর্লভ মঞ্চে যেমন তিনি সজীব তেমনি স্বচ্ছন্দ। এটা একমাত্র একজন বড় অভিনেতার পক্ষেই সম্ভব।

এর পরেই নাম করতে হয় রানী এলিজাবেথরূপী স্বপ্না সেনরায়ের। ধীর স্থির সংযত তৎকালীন ইংলন্ডেশ্বরীর চরিত্রটি তিনি মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিশেষ করে সংযতভাবে সংলাপ উচ্চারণ সত্যি আকর্ষণীয়।

তেমনি শেকসপীয়রের সরল বিশ্বাসী স্বামীর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ স্ত্রী এ্যানের

সমালোচনায় বিতর্কের ঝড়...

মহাভারতের অর্জুনের মতো ছবির নায়ক অর্জুনকেও স্বজনদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে। সেই অর্জুনের মতো এই অর্জুনও লক্ষ্যভেদ করেছে —[যুগান্তর]

A hut in refugee colony; the 'Bangaal" dialect of Bijon Bhattacharya and Geeta Dey; one might begin to except something similar at least in sprit to "Meghe Dhaka Tara"

— THE STATESMAN —

There are isolated moments, where the director seemed intent upon injecting some "soul' into his charactors as is evedent played by Sandhya Majumdar.

— Amrita Bazar Patrika

চিত্রনাট্যকার পরিচালক ইন্দর সেন মূল লড়াইয়ে সবাইকে এনে দিয়েছেন।

—[সত্যযুগ]

ছবির অর্জুন মহাভারতের সব্যসাচীর মতন। অনন্য ডেমিক, অসাধারণ সংগ্রামী। এই জাতীয় চরিত্র আমাদের দেশের ছবিতে, সাধারণতঃ বাস্তবের ধারে-কাছে ঘেঁষে না। কিন্তু 'অর্জুন' ছবির নায়ক, যার নামেই ছবির নামকরণ, তার পরিবেশ এবং পটভূমির একজন বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। [দেশ এবং আনন্দবাজার]

অর্জুন লক্ষ্যভেদ করতে পারল না।...

সন্ধ্যা · সমিত এবং স্বরূপ

অর্জুন

পরিচালনা ইন্দর সেন

উত্তরা ঃ পূরবী ঃ উজ্জলা ও অন্যত্র

ভূমিকায় মালা ঘোষের অভিনয় দর্শকদের হৃদয়স্পর্শ করেছে।

মারীর চরিত্রটি (যে ছিল শেকসপীয়রের আবিষ্কারক এবং প্রেরণা অন্যদিকে চতুর এবং রাণীর হতে ক্রীড়নক(?) শিখা গুহও সুন্দর। মঞ্চে তিনি অনেকটাই স্বচ্ছন্দ এবং প্রাণবন্ত। তিনি চরিত্রটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। যেমন করেছেন এ্যানের মা-র ভূমিকায় রেবা লাহা।

নীলু চক্রবর্তীর মার্লো (শেকসপীয়রের প্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যকার এবং প্রিয় বন্ধু। মারীর জন্য উত্তেনার মুহূর্তে শেকসপীয়র যাকে খুন করেছিল) এবং অমর লাহার হেনস্লো সার্থক চরিত্রসৃষ্টি। তবে বোধহয় আর একটু স্বচ্ছন্দ হবার অবকাশ ছিল।

অন্যান্য ভূমিকায় ব্রহ্ম চক্রবর্তী বিন্টু লাহা শোভন মুখার্জি ও রতন চক্রবর্তী চরিত্রানুযায়ী।

এ নাটকের আর এক আকর্ষণ এর আবহসঙ্গীত। নাটকের মুড গড়ে তুলতে এর ভূমিকা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। তবে 'চল লন্ডন' গানটির সুর কিন্তু

টেলিভিশন মানেই
"টেলিকিং"
অর্থাৎ
টি. ভির রাজা।
আজই আসুন, দেখুন, শুনুন ও
কিনে খুসী হোন।
এ-ছাড়া আমাদের রয়েছে রকমারি রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার, রেকর্ড, ট্রান্সিস্টার রেডিও, টেপ্ রেকর্ডার, ষ্টীরওগ্রাম ইত্যাদি ইত্যাদি।
মেরামতের সুবন্দোবস্ত তো আছেই।
রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোরস্
৬৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিঃ-১৩
ফোন : ২৪-৪৭৯৩

জাপানে যাদুকর হাকাশা

তেমনভাবে দর্শকদের আকর্ষণ করেনি। তবু মনীষ মুখার্জির সুর ও টুকু চক্রবর্তীর শব্দ যোজনার তারিফ করতেই হয়।

তড়িৎ ঘোষের মঞ্চ পরিকল্পনা শচীন বানার্জির লাইটের কাজ এবং সমীর বসুর মঞ্চ পরিচালনা নাটকের সহায়ক হয়েছে।

বর্তিকের মত বাংলার বাইরের নাট্যদল কলকাতায় এসে এমনি করে এখানকার দর্শকদের মন ভরিয়ে মন জয় করে যাক সবশেষে এমন একটা বাসনা রইল।

দরদী শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে শরৎচন্দ্রের বর্মার প্রবাস জীবনকে ভিত্তি করে সম্প্রতি আর যে নাটকটি মঞ্চস্থ হো।। তার নাম 'দরদী শরৎচন্দ্র'।

এই নাটকের মূল লক্ষ্য ছিল দরদী মরমী শরৎচন্দ্রের বার্মা জীবনের একটি দিক তুলে ধরা। (রচনা সন্তোষ সেন)।

অভিনয়ে শিল্পীরা কিছুক্ষণের জন্য যেন সেই অতীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। শিল্পীদের এই নিষ্ঠা প্রশংসা করার মত।

অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় দামোদর সাহার। শরৎচন্দ্রের ভূমিকায় তাঁর সুন্দর অভিনয় দর্শকদের বহুদিন মনে থাকবে।

এছাড়া অমিতা পোদ্দার অভিজিৎ বসু ও দুলাল সাহার অভিনয়ও সুন্দর।

কল্যাণব্রত চন্দ চিত্তকুমার দাস শ্যামাদাস সাহা অরবিন্দ সাহা সুধীর কর্মকার ও সাক্ষীগোপাল অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

নাটকটি পরিচালনা করেছেন সুনীল সুর।

যাদুকর হাকাশা

সম্প্রতি জাপানের ফুজি কোম্পানির টি ভি স্টুডিওতে দু' ঘন্টাব্যাপী এক যাদু উৎসব হয়ে গেল। জাপানের শ্রেষ্ঠ মহিলা ম্যাজিসিয়ান মিটাডোরা প্রকান্ড এক সিংহকে দিয়ে দেখান পৃথিবীর বিখ্যাত 'লেডি টু লায়ন' খেলাটি। এই উৎসবে ভারতীয় যাদুকর হাকাশা অতিথি যাদু শিল্পী হিসাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। যাদুকর হাকাশা পুরো ভারতীয় পরিবেশে তিন টুকরো মহিলা এবং সেই সঙ্গে আরও কয়েকটি ভারতীয় ইন্দ্রজাল দেখিয়ে তিনি ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য যে যাদুকর হাকাশা গত তিন বৎসর যাবৎ জাপানের প্রায় একশ পঁচাত্তরটি বড় বড় শহরে ভারতীয় ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করে সম্প্রতি কলকাতায় ফিরে এসেছেন।

সেই ইলেকট্রিসিটি বোর্ড বিক্রিয়েশন ক্লাবের মহিলা সভ্যদের অভিনীত সাজাহান নাটকের দৃশ্য

বরদীপ
• বেনারসী
• জোড়
• সিল্ক-তাঁত
• মিল বস্ত্র
• গেঞ্জাক
• শার্টিং • সুটিং
• ড্রিট কাপড়
৭৩, জি, টি, রোড (সাউথ) হাওড়া
ফোন: ৬৭-৫৩২৫

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীঅমিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১২ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১৯।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের নতুন বই

চিত্র বিচিত্র

একাল-সেকালের বিচিত্র কথা ও রসমধুর কাহিনী-সমারোহ দাম ঃ সাত টাকা

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১৩৮১ সালের মৌচাক পত্রিকা কর্তৃক
সুধীরচন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ রচিত
ছোট বড় সকলের মনের মত
বাংলা সাহিত্যের দু'খানি আশ্চর্য বই

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য ঃ—চার টাকা

(সপ্তম সংস্করণ চলছে)

ছোটদের উপযোগী সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী লেখা হয় নি। বিশেষ করে নানাবিষয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ছোটদের মনের মত বিচিত্র রোমাঞ্চকর লেখা খুব সহজ নয়। 'বিচিত্র কাহিনী'তে লেখক সত্য ঘটনাগুলিকে নিজের সরস মুন্সিয়ানা দিয়ে এমন জীবন্ত আর আকর্ষণীয় করে তুলেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রচনাই অনবদ্য রস ও রোমাঞ্চে টইটম্বুর। মোট পনেরোটি কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রসের ফল্গুধারায় সিক্ত. বর্ণনায় মনোমুগ্ধকর।

'আরও বিচিত্র কাহিনী' বইটি কিশোর ও বয়স্কদের জন্য সমভাবে রচিত। লেখক শুধু ছোটদের জন্যই রস পরিবেশন করেননি, বড়রাও এই অমৃত আস্বাদন করে পুলকিত হবেন। অনবদ্য রস রচনাশৈলী এবং প্রতিটি কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ চুম্বকের মত পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে। এই বইটিতে দশটি বিভিন্ন রসের কাহিনী রয়েছে এবং লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি এমন সুন্দরভাবে রসযুক্ত করে উপস্থিত করেছেন যে পাঠককে বিমুগ্ধ করবে।

আরও বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য ঃ—চার টাকা

(চতুর্থ সংস্করণ চলছে)

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ঃ ফোন ৩৪-১৭৮২

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 6th August, 1976
Phone 55-5231 (14 lines)

aa/KC0107

অনায়াসে দ্বিতীয়বার সম্মান অর্জন করলো

2 SEP 1976

কুকমী

গুঁড়ো মশলা

ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ্
কোয়ালিটী প্রোডাক্টস
কর্তৃক প্রদত্ত
একমাত্র উচ্চমানের অকৃত্রিম
গুঁড়ো মশলা হিসাবে
শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি ও
সম্মানপত্র লাভ।

এই বৎসরের শুরুতেই
কুকমী গুঁড়ো মশলা
নিউ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত
ট্রান্সওয়ার্ল্ড ট্রেডফেয়ার-এ
ক্লাশ—এ
স্বর্ণপদক জয় করেছে।

IQP

- সর্বোত্তম মান
- ন্যায্য ও নির্দিষ্ট মূল্য
- সঠিক ওজন
- উপাদানের বিশুদ্ধতা
- সমাজ সেবার প্রতি অগ্রাধিকার
- তৎপর ও দ্রুত সরবরাহ ব্যবস্থা

TRANS-WORLD TRADE FAIR
SERVICE AWARD DELHI

স্বদেশে ও বিদেশে
সকলের সেবায়
আমরা নিজেদের
নূতন করে
নিয়োজিত করছি

প্রস্তুতকারক :
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাইভেট লিমিটেড
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০০৭০, পোষ্ট বক্স নং, বড়বাজার : ৬৮৮৫ ফোন : ৩৩০৯৯৫
ফ্যাক্টরী : কাশীপুর

অফিসি-কলকাতা : এন, কে, ডোসেস এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ /

১৩ আগস্ট ১৯৭৬ ॥

মূল্য ৭৫ পয়সা
অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা

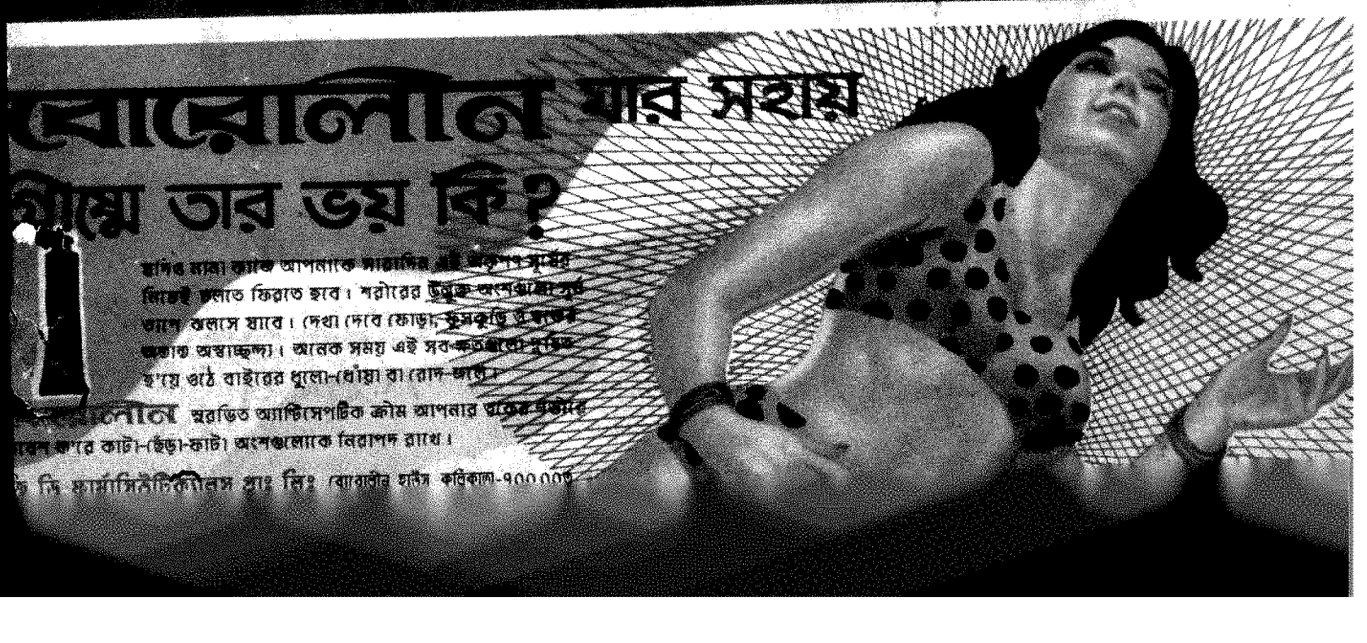

বাচ্চাদের বড়সড় করে গড়ে তুলুন ইনক্রিমিন* দিয়ে

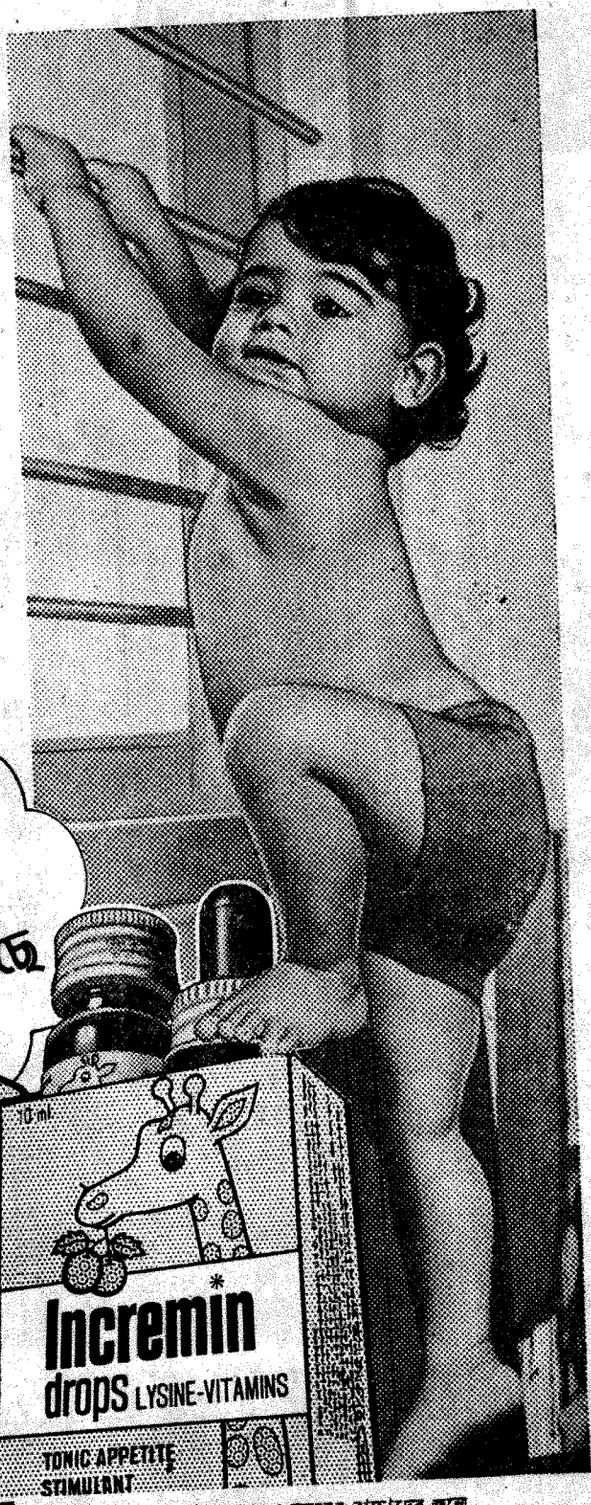

প্রথম দুবছর বাচ্চার বাড়বৃদ্ধি ঠিকমত হওয়া একান্ত দরকার। এই সময়ে তাকে ইনক্রিমিন ড্রপস নিশ্চয়ই দেবেন। তারপর দেখবেন ওর খাওয়ার আগ্রহ! খাওয়া নিয়ে জ্বালাতন তো দূরের কথা, খিদে বেড়ে গিয়ে যেমন খুশি হয়ে খাবে তেমনি চটপট বেড়ে উঠবে। ইনক্রিমিন উপকারী ভিটামিনে ভরপুর তো বটেই, তার চেয়ে বড়কথা— এতে যে বিশেষ অ্যামিনো অ্যাসিড, লাইসিন আছে—তা আপনার বাচ্চাকে আহারের পুরো পুষ্টি গ্রহণ করতে সাহায্য করে।

ইনক্রিমিন* টনিক

ড্রপস্—২ মাস থেকে ২ বছরের বাচ্চাদের জন্যে
সিরাপ—১৪ বছর পর্য্যন্ত বয়সের বাচ্চাদের জন্যে

বাড়তি আহারকে বাড়তি বৃদ্ধিতে পরিণত করে

ডাক্তারদের কাছে নির্ভরযোগ্য নাম—Lederle সায়নামিড ইণ্ডিয়া লিমিটেডের একটি বিভাগ

আমেরিকার সায়নামিড কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক।

Sista's-INC-3641-R/76 Ben

ভিটামিনের অভাবের ফলে ক্লান্তি দূর করার জন্য

ডাক্তাররা খেতে বলেন সেই সমস্ত ভিটামিন আর খনিজ পদার্থ যা আপনি পাবেন রোশ ভিটামিনেট্‌স ফোর্টে-তে

আজকাল আমাদের জীবন আগের মত নয়, পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে। যা পাওয়া যায় তাও তেমন পুষ্টিকর আর তাজা নয়। সকালের জলখাবার আর দুপুরের আহার তাড়াতাড়ি সারতে হয়। পুষ্টির দিক থেকে সেসবও যথেষ্ট নয়। পুষ্টির এই অভাব আর তার ওপর অফিসে ঘরে আর কারখানায় কাজের চাপ—আপনি সহজেই ক্লান্তি আর অবসাদ বোধ করেন।

ভিটামিনের এই অভাব পূরণের জন্য সবচেয়ে ভাল উপায় হল রোশ ভিটামিনেট্‌স ফোর্টে যাতে রয়েছে সুষম আহারের জন্য আবশ্যক ১১টি ভিটামিন আর ৫টি খনিজ পদার্থ।

মাত্র একটি রোশ ভিটামিনেট্‌স ফোর্টে প্রত্যহ সকালে খান। ক্লান্তি দূর করার এই হল সেরা উপায়।

রোশ

ভিটামিনেট্‌স ফোর্টে

ট্রেড মার্ক

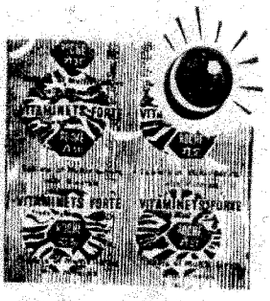

'বড়ির আকারে টনিক'

প্রত্যেক দিন সকালে মাত্র একটি রোশ ভিটামিনেট্‌স ফোর্টে দিনে ২০ পয়সারও* কম খরচে।

*স্থানীয় কর আলাদা

RP 8578

'সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি' বহু ব্যবহারে কথাটা 'কথার কথায়' পরিণত হয়েছে। তাই সত্য ব্যবহারটা প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন

কিন্তু—

তারাশঙ্করের

কীর্তিহাটের কড়চা

তাঁর সর্বশেষ কীর্তি তো বটেই, সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিও।
ইংরেজিতে যাকে বলে 'লাস্ট্ বাট নট দা লীসট'!

তারাশংকর কীর্তিমান লেখক। 'কবি' 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' 'আরোগ্য নিকেতন' 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' 'গন্নাবেগম' 'রাধা' 'যোগভ্রষ্ট' 'পঞ্চপুত্তলী', 'ধাত্রীদেবতা', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম' প্রভৃতি বাংলাসাহিত্য তাঁর অসংখ্য কীর্তিতে সমৃদ্ধ, বরণীয়। কিন্তু—

কীর্তিহাটের কড়চা—ন ভূতো, ন ভবিষ্যতি।

এই একটিমাত্র রচনাতেই লেখক স্মরণীয়, পূজ্য, অমর হয়ে থাকতে পারতেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হবে ॥ দাম ৩০৲

॥ বিশেষ ঘোষণা ॥

আগামী ১৬ই আগস্ট সোমবার আমাদের ২নং কাউণ্টারের (৮৬।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলেজ-স্ট্রীট—মহাত্মা গান্ধী রোড জংশন) প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে, ঐ দিন প্রতি সাধারণ ক্রেতাকে আমাদের যাবতীয় বইতে ১৫% কমিশন দেওয়া হইবে। পুস্তক বিক্রেতাদেরও ঐ দিনের জন্য বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে। এই বিশেষ কমিশন কেবলমাত্র উক্ত নির্দিষ্ট কাউণ্টারেই দেওয়া হইবে। অন্য কোন ক্ষেত্রে নয়।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
ভূমাপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ ১০৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
রজনী শেষের শেষ তারা ৭৲

ধনঞ্জয় বৈরাগীর
রেসকোর্স ৯৲

নারায়ণ সান্যালের
অবাকপৃথিবী ৯৲

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২ / ৩৪-৩৪৯২
৮৬।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯/৩৪-৮৭৯১

পূজো সংখ্যা
প্রসাদ
একাই একশো

বড় গল্প লিখছেন
বিমল কর
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

৭টি গল্প লিখছেন
শংকর
বনফুল
ডা: সিন্হা
হরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
প্রতিভা দেবী
মহাশ্বেতা দেবী
সন্তোষকুমার ঘোষ

রম্যরচনা লিখছেন
বহুরূপী
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আরো লেখার খবর
আগামী সংখ্যায়

যোগাযোগের ঠিকানা
৪২ ইন্ডিয়ান মীরর স্ট্রীট
কলিকাতা-১৩

স্বাধীন ভারতের প্রথম রাজেয়াপ্ত বাংলা উপন্যাস—"মেখলা পরা মেয়ে" খ্যাত শ্রীমৃণালজিৎ-এর আর এক বিতর্কিত সৃষ্টি, বহুনাদীর অশ্রুবাষ্পসিক্ত অভিনব উপন্যাস। এতে লেখক যে প্রশ্ন তুলে ধরেছেন তা হল সমাজ কেন বিষাদিত হচ্ছে—দায়ী কে—মানুষ, বিচার ব্যবস্থা, পলিটিক্স না কি পুলিশ প্রশাসন? আজের পরিবর্তনশীল পটভূমি সমাজের লোভ-লালসা-জ্বালা-যন্ত্রণা নৃশংসতার এক দৃঢ়প্রত্যয়ী রচনা ও নতুন টেকনিকের—।

১৯৪৭-এ প্রবর্তিত এবারের

সুরূপা

শারদীয়া রূপাঞ্জলি

সংকলনে এক বিশেষ আকর্ষণ।

শ্রীমৃণালজিৎ-এর "মেখলা পরা মেয়ে" সম্পর্কে ১ম সম্পাদকীয়, নিবন্ধ "বাজেয়াপ্ত বই"-এ দৈনিক বসুমতী লেখেন"—নায়িকার চরিত্র লেখক অতি মহৎরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। যে-কোন দেশের যে-কোন জাতি নিজের মধ্যে এরূপ তরুণী থাকিলে নিজেকে ধন্য মনে করিবে। আইনের দিক দিয়া বইটির বাজেয়াপ্তকরণ পদ্ধতিতেও আপত্তির কারণ রহিয়াছে। কোন বইয়ের একটি চরিত্রের জন্য উহা বাজেয়াপ্ত করিতে হইলে সেরূপচরিত্রের 'ওথেলো' বইটি অহরহ চরিত্রের জন্য বহু পূর্বেই বাজেয়াপ্ত করা উচিত ছিল। "যুগবাণী" সম্পাদক, একাদশ বৃহস্পতিরূপে খ্যাত (১১ বিষয়ের এম-এ) অধ্যক্ষ দেবজ্যোতি বর্মণ লেখেন "যে সব ঘটনাই সমাজকে আলোড়িত করিয়া তোলে তার পশ্চাৎপট নিয়া বাংলা উপন্যাস রচিত হয় না—এই অভিযোগ "মেখলা পরা মেয়ে" দূর করিতে পারে। 'যুগান্তর" সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বইটির ভূমিকায় লেখেন 'এই বইয়ের ভূমিকা অনাবশ্যক।' "মধুমিতা" সম্পাদক, শ্রীকুমারেশ ঘোষ লেখেন,—শ্রীমৃণালজিৎ অসীমে "বাংলা খেদাও" আন্দোলনের পটভূমিকায় "মেখলা পরা মেয়ে" উপন্যাস লিখে বাংলা সাহিত্যে অতি প্রয়োজনীয় সৎ সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। এবার তিনি 'খাদ্যমন্ত্রী" উপন্যাসে দিলেন অসম সাহসের পরিচয়। ... তাতে এইটুকু বোঝা গেল 'বাংলার সাহিত্যিক মেরুদণ্ড' এখনও ভেঙ্গে পড়েনি। এজন্য শ্রীমৃণালজিৎ-এর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। দেশ লেখেন—"মহৎ প্রয়াস।"

শারদীয়া রূপাঞ্জলি — অভিনব 'সুরূপা' উপন্যাস ও গল্প—কবিতা ফিল্ম ফিচার সম্বলিত সচিত্র

"শারদীয়া রূপাঞ্জলি" (মূল্য ৫-০০, সডাক ৭-০০) আপনি সম্পূর্ণ বিনা-মূল্যেও পেতে পারেন—যদি প্রতিষ্ঠার মাস—অগস্ট-এর মধ্যে বার্ষিক চাঁদা ১৫-০০ পাঠিয়ে গ্রাহকভুক্ত হন। এতে ডিসেম্বর অঙ্কসহ রূপি বুক করুন। টাকা জমা দেবার স্থান—'রূপাঞ্জলি', ৩।২এ, চন্দ্র চ্যাটার্জি স্ট্রীট, (৪৭-৫২৪০) কলিঃ-২৫; ডাকের অভাব—রূপাঞ্জলি, ৩৭, গড়ফা রোড PIN-743506)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

যুগঋষি শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীঅরবিন্দের সাতটি বিভাবের—জ্ঞানী, মুনি, যোগী, প্রেমী, গুরু, কবি ও ঋষি—সম্বন্ধে মনীষী লেখকের শ্রদ্ধাতর্পণ। একে তাই বলা চলে সপ্তকাণ্ড শ্রীঅরবিন্দায়ন। দাম দশ টাকা ॥

তীর্থংকর

শ্রীঅরবিন্দ, রোলাঁ, গান্ধি, রাসেল ও রবীন্দ্রনাথ—পাঁচ মহাপুরুষের চিত্রণ তাঁদেরই কথালাপ ও পত্রের মাধ্যমে। দাম আঠার টাকা ॥

ডক্টর অধরচন্দ্র দাস

SRI AUROBINDO AND SOME MODERN PROBLEMS

॥ দাম দশ টাকা ॥

[জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত]

জেনারেল বুকস্, এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা ৭০০ ০০৭

১৬ বর্ষ

অমৃত

১৪ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday 13th August, 1976 শুক্রবার, ২৮ শ্রাবণ, ১৩৮৩

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৮	সম্পাদকীয়	
৯	করুণা	(গল্প) শ্রীসমীর রক্ষিত
১৪	বাপটা ছেলেটা	(গল্প) ঐ
১৯	কথায় কথায়	...শ্রীতারাপদ রায়
২০	বিজ্ঞাপন বিচিত্রা	...শ্রীআনন্দ রায়
২২	হাতে হাত বেঁধে	(কবিতা)...শ্রীসুনেহাঙ্কুর ভট্টাচার্য
২২	এ কি খেলা, এ কি ভালোবাসা	(কবিতা).. শ্রীপ্রদেশরঞ্জন দত্ত
২২	যা কিছু ঘটছে ঘটতে দাও	(কবিতা). শ্রীঅবন্ধতী সেনগুপ্ত
২৩	গোধূলিয়া	(উপন্যাস).. শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য ৩

প্রকাশিত হয়েছে ॥

নেতাজী রহস্য সন্ধানে

নারায়ণ সান্যাল

থাইল্যাণ্ড, জাপান এবং তাইহকু বিমানবন্দর পরিদর্শন এবং অজস্র ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত এক অসাধারণ গ্রন্থ। অজস্র ফটোগ্রাফ ॥ ১৫·০০

"তোমরা আমাকে যে বিরোধী কথাই বল না কেন, আমি এখনও আমার অন্তরের অন্তস্থলে বিশ্বাস করি যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বেঁচে আছেন।" —মহাত্মা গান্ধী

I have got unassailable proof that Netaji Subhas Chandra is alive"

Dr Radhabinode Pal.

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে ॥

আমি নেতাজীকে দেখেছি

প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দী

শঙ্খ প্রকাশন। ৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৯

দশ টাকার ডিস্কাউণ্ট কুপন কিনে ২৫% কমিশনে কিনুন

লীলা মজুমদার রচনাবলী

প্রথম খণ্ড ২৫৲

এই যা দেখা ৫৲

সব সেরা গল্প ৪৲

হেমেন্দ্র কুমার রায় রচনাবলী

প্রথম ২৫৲ দ্বিতীয় ২৫৲

তৃতীয় খণ্ড ছাপা হচ্ছে

অমাবস্যার রাত ৫৲

উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র রচনাবলী
১ম খণ্ড ৩০৲ ২য় খণ্ড ৩০৲

সুকুমার রায় সমগ্র রচনাবলী
১ম খণ্ড ২৫৲ ২য় খণ্ড ৩৫৲

হ্যান্স অ্যান্ডারসন রচনাবলী
১ম খণ্ড ২৫৲ ২য় খণ্ড ২০৲

লুইস ক্যারল রচনাবলী
১ম খণ্ড ২৫৲

গ্রিমভাইদের রচনাবলী
১ম খণ্ড ২৫৲

এডওয়ার্ড লিয়ার রচনাবলী
এক খণ্ডে ১২৲

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কার্যালয়: ৭২।১, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলিকাতা—৭০০০০৬
বিক্রয় কেন্দ্র : এ/১৩২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—৭০০০০৭
ফোন : ৩৪-২৩৮৬

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম.বি, ডি.জি.ও
ডাঃ এস এন পাণ্ডে এম.বি, বি এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য-৮৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও রুচিতে চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী ৩৫এ, কলেজ ষ্ট্রীট
এছাড়া চ. টাকা পাইকারী ডাকমাশুল ফ্রী

প্রকাশিত হল পকেট বই

চম্বলের আতঙ্ক

চিরঞ্জীব সেন ৩·০০

চম্বল উপত্যকার দুর্ধর্ষ দস্যু মানসিংহের সহচর অচল সিং-এর রোমহর্ষক কাহিনী। এন্টিক কাগজে ঝরঝরে ছাপা আর্টবোর্ডে তিনরঙা ভার্ণিশ করা কভার।

চাঁপাডাঙ্গার বৌ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ২·৫০

চলচ্চিত্রে রূপায়িত লেখকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই দুইখানি বই সাধারণ ক্রেতা আমাদের কাউণ্টার থেকে মাত্র ৪·০০ টাকায় পাবেন। সীমিত স্টক।

ক্যালকাটা পাবলিকেশানস, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিঃ ১২

মুগ্ধের বই

পরিমল গোস্বামী

পত্রস্মৃতি
[২২·০০]

যখন সম্পাদক ছিলাম
[১৬·০০]

আমি যাঁদের দেখেছি
[১২·০০]

পুরুষের ভাগ্য
[১২·০০]

বনপথের পাঁচালী
[৬·০০]

দুই রহস্য দুই সহরের
[৬·০০]

স্কুলের মেয়েরা
[৩·০০]

মুখী

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০১২

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ কর্তৃক গ্রন্থিত

শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত LORDGOURANGA

(১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড)

প্রতি সেট—মূল্য ২৪·০০ (vol. 2)
Per Vol. Rs. 6.00

কালাচাঁদ গীতা

প্রতি কপি—মূল্য ১·৫০ LIFE OF SISIR

নরোত্তম চরিত KUMAR GHOSH

প্রতি কপি—২·০০ Per Copy Rs. 6.50

প্রাপ্তিস্থান :

পত্রিকা হাউস (হিসাব বিভাগ)

১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
২৫	মনের অসুখ		... শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
২৮	নতুন বই		...
২৯	সাহিত্যের নেপথ্যে		... শাণ্ডিল্য চতুর্বেদী
৩১	মোহিনী আট্টম	(উপন্যাস)	... শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি
৩৪	একালের চিত্রশিল্পী : অতুল বসু		... শ্রীসন্ধ্যা সেন
৩৯	অদ্য শেষ রজনী	(উপন্যাস)	... শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
৪১	বিজ্ঞানের কথা		... অয়স্কান্ত
৪৪	পুনশ্চ		.. রূপদক
৪৫	ফিরে এলাম	(গল্প)	... শ্রীমতী বালসুব্রহ্মনিয়ম
৪৯	মাঠ থেকে বলছি		... শ্রীঅজয় বসু
৫১	মাঠের নায়ক		শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৩	খেলাধুলা		... দর্শক
৫৫	সিনেমাটিকটক		... শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৫৮	কয়েকজন		... নিরীক্ষিৎ
৬১	নাটমঞ্চ		... নাট্য সমালোচক
৬৩	স্টুডিও সংবাদ		... মুসাফির

প্রচ্ছদ পরিচয় : প্রাচীন রোম নগরীর স্থাপত্যের কিছু ভগ্নাবশেষ। এই ঋজু সুঠাম স্তম্ভগুলি রোম সাম্রাজ্যের সুউচ্চ মহিমা ও পরিচ্ছন্ন রুচি-বোধেরই প্রতীক। জায়গাটি এখন রোমের ২১নং অঞ্চল।

অফিস এবং ইনজিনীয়ারিং-এর
নিখুঁত সরঞ্জাম
এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

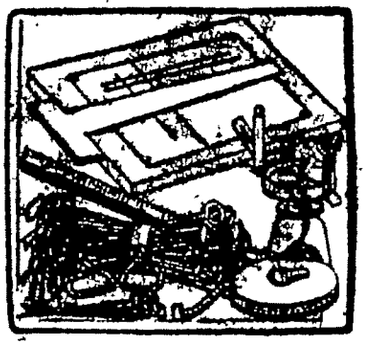

সার্ভে, ড্রইং, নানা রকম কাজ।
খাতা, লেজার, ক্যাশবই, কালি ও
উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য
অন্যতম প্রতিষ্ঠান

কুইক ষ্টেশনারী ষ্টোর্স
৬৩ই, রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিঃ-১
ফোন : ২২-৮৫৮৮, ৬৭-৪৬৬৪
গ্রাম : অষারপিন, পোষ্ট বক্স—৩৮ হাওড়া
পরিবেশক : কামলিন প্রডাক্টস
(ষ্টেশনারী বিভাগ)

বিখ্যাত ডাটা
গুঁড়ো মশলার
প্রস্তুতকারক
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত
(কুকমী) প্রাঃ লিঃ
এখন আপনাদের দিচ্ছেন
একটি নতুন অতি
সুদৃশ্য টিনের কৌটায়
সবরকম গুঁড়ো মশলার
অপূর্ব সংমিশ্রণ

এক কৌটা ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাক কিনলে আর কোনরকম মশলা এমন কি পেঁয়াজ, আদা, রসুন প্রভৃতি আলাদা করে যোগাড় করতে হবে না। ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাকের ঝাল, ঝাঁঝ, ডিম ও সবরকম মুখরোচক তরিতরকারি অল্প সময়ে চটপট রান্না করা যায়। আপনার সবরকম রান্নায় আজই ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার (কিচেন কুইন প্যাক) ব্যবহার করুন।

ডাটা রেডিমিক্সড কারি
পাউডার
কিচেন কুইন প্যাক

প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ
২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭, পোষ্ট বক্স নং ৬৭৭৪.
ফোন : ৩৩-১৩৩৭, ৩৪-২৭০৮

PAM—KCD-74

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞানের দায়িত্ব

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গত সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশান অব সায়েন্সের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ও শতবার্ষকী ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এই উপলক্ষে তিনি এমন কয়েকটি কথা বলেন, যাতে বিজ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন চিন্তার সূচনা ঘটবে।

শ্রীমতী গান্ধী বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক গবেষণাকে খুবই মূল্যবান গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের ফলিত জ্ঞান যাতে শহর ও গ্রামাঞ্চলের অগণিত সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করতে পারে, সেদিকেও তিনি সচেতন করে দিয়েছেন। তিনি একথাও অবশ্য বলেছেন, ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রয়োগবিদরা ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁদেরই কৃতিত্বে পোখরা ও আর্যভট্টের সাফল্য অর্জন করেছি আমরা। ইস্পাত সেচ কৃষি এবং বিদ্যুতের ক্ষেত্রেও তাঁদের কাজ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আরো এগিয়ে যেতে হবে। কারণ সামনেই আমাদের কঠিন চ্যালেঞ্জ—গোটা দেশকে সুউন্নত দেশগুলির সমকক্ষ করে নিজেদের স্বয়ম্ভর অর্থনীতি ও জাতীয় অস্তিত্বকে দুর্ভেদ্য করে তুলতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুরা চুপ করে বসে নেই, তার নাম নয়া উপনিবেশবাদ।

প্রধানমন্ত্রীর দ্ব্যর্থহীন ব্যাখ্যার পর নতুন কিছুই আর বলার থাকে না। আমাদের দায়িত্ব যে কতো গুরুতর ও বিপুল, মুহূর্তেই তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমাদের অশেষ সৌভাগ্য যে একশ বছর আগেই আমাদের বরণীয় পূর্বপুরুষগণ অনুমান করতে পেরেছিলেন, ভবিষ্যতের এই প্রয়োজনের কথা। তাই অন্ধকার সেই পরাধীন যুগেই শিক্ষা বিস্তার ও সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যাতে বিজ্ঞান-চেতনা ও বিজ্ঞান-গবেষণারও ভিত্তি তৈরি হয় তার জন্যে তাঁরা সচেষ্ট হয়েছিলেন। এবং ১৮৭৬ সালের ২৯ জুলাই স্থাপিত হয়েছিল পূর্বোল্লিখিত ঐ প্রতিষ্ঠান।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে এজন্যে। ১৮৬৮ সালের আগষ্ট মাসে ক্যালকাটা মেডিকেল জার্ণালে তিনিই প্রথম এই রকম একটি বিজ্ঞান-গবেষণা বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের দরকার যে কত জরুরী সেকথা জানিয়েছিলেন একটি প্রবন্ধে। ডাঃ সরকার ছিলেন একজন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ও বিখ্যাত চিকিৎসক। দেশের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির নজরে এল সে প্রবন্ধ এবং তাঁরা সচেতন হলেন সে ব্যাপারে। এঁদের মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগরও ছিলেন। ১৮৭০ সালের ৩রা জানুয়ারী হিন্দু প্যাট্রিয়টে অ্যাসোসিয়েশনের প্রসপেকটাস প্রকাশিত হয়। অনেক ধনী ও বিদ্বান মানুষ সাহায্যের জন্যে চাঁদা দেন। ১৮৭৫ সালে ৮০ হাজার টাকা ওঠে। ১৮৭৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে সেকালের বাংলা সরকার অ্যাসোসিয়িশনকে ২১০ বউবাজারের বাড়িটি বিনা ভাড়ায় ব্যবহার করতে দেন এবং ঐ বছরই ২৯শে জুলাই অ্যাসোসিয়েশন কাজ শুরু করে।

প্রথম দিকে এর শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ সরকার নিজে, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ফাদার লাফোঁ, ডাঃ নীলরতন সরকার এবং আরো অনেকে। পরে ১৯০৭ সালে এখানে গবেষণা শুরু করেন চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন। এবং এখানে যা গবেষণা করেছিলেন সেজন্যেই ১৯৩০ সালে নোবেল পুরস্কার পান তিনি।

অ্যাসোসিয়েশনকে যাদবপুরের নিজস্ব ভবনে নিয়ে আসেন ভারতের আরেকজন বিশ্বশ্রুত বিজ্ঞানী অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা। ১৯৫১ সাল থেকে কাজ শুরু হয় এখানে। পরে এখানে আরেক বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু আসেন সভাপতি হয়ে। তাছাড়া আরো অনেকের সঙ্গে কে এস কৃষ্ণানও গবেষণা করেছেন এখানেই।।

এ রকম একটি উত্তরাধিকার পেয়ে তাকে আজকের প্রয়োজন মত কাজে লাগাতে পারবেন এমন বিজ্ঞানীও এখানে এখন কম নেই। নিশ্চয়ই তাঁরা সে দায়িত্ব গৌরবের সঙ্গেই পালন করবেন।

একই লেখক

দুই গল্প : দুই সময়

করুণা

সমীর রক্ষিত

বিদ্যুৎ দিন পঁচিশেক আগে একটা চিঠি দিয়েছিল; তারপর গতকাল অবধি জবাবের অপেক্ষা করে করে যখন বুঝতে পারল জবাব আর আসবে না তখন নিজেই চলে এল সটান বাঁচিতে। করুণা জবাব দেবেন কী দেবেন না ভাবতে ভাবতেই সে চিঠির কথা ভুলেই গেছেন। ফলে ভীষণ অবাক হলেন।

সকালের থুন ধরা কুয়াশা তখনো পুরো-পুরি কাটে নি অদূরে গায়ে গা লাগানো উটের পিঠের মত পাহাড়গুলো তখনো অস্পষ্ট, কুয়াশা মাখানো রোদে পিঠ দিয়ে বিছানার নীল চাদর গায়ে জড়িয়ে বাবাদাস কুরুশে বুনছিলেন করুণা, হঠাৎ বুকনী এক-পাট-ভাঙা গেটের দরজার ওপাশ থেকে তাকে চমকে দিল—এ বুড়ি মাঈ, দেখো কে এসেছে!

বুকনী আস্তে কথা বলতে পারে না। হেমন্ত যেদিন মারা গেলেন সেদিনও ঘরের ভেতর থেকে এমনি চীৎকার করে উঠেছিল বুকনী। সেও এক সকাল। করুণা ছিলেন রান্না ঘরে ছুটে এলেন এসে দেখেন হেমন্তর শরীরে সাড় নেই। সকালের চা খেয়ে একটু ঘুমনো তার চিরকালের অভ্যাস। সে ঘুম ভাঙত তার আধ ঘন্টা বাদেই, কিন্তু সেদিনর ঘুম আর ভাঙে নি।

তারপর থেকেই বুকনীর চেঁচানি শুনলেই বুক কাঁপে করুণার। সোজা হয়ে দাঁড়াতে গেলে যা হাঁটুতে টান লাগে; তবু ঝাঁকি দিয়ে উঠে দাঁড়ান করুণা—আহ্ কী যে চেল্লাস বুকনী! কে এল।

কতদিন কেউ আসে না তাঁর কাছে—করুণা কী করে বিশ্বাস করবেন বিদ্যুৎ এল। ছোট্ট একটা এ্যাটাচি বাঁ-হাতে, একেবারে সামনে এসে সোজা হয়ে দাঁড়ায় বিদ্যুৎ রহস্যময় মুখে হাসে।

আতস কাচের মত মোটা লেন্সের ভেতর দিয়ে তাকে ঝাপসা ধোঁয়াটে দেখায় ডান হাতটা আলতো বাড়িয়ে বিদ্যুতের হাত ধরেন করুণা বিদ্যুৎ হেসে বলে—চিনতে পারলে না মা!

করুণা যদি অন্ধও হতেন তবু চিনতে এতটুকু অসুবিধা হত না। আসলে এখন করুণার দু' চোখের ভেতরে কোথায় যেন কিছু জলবিন্দু ভীষণ টলছে, বুকের ভেতরে দ্রুততর নিঃশ্বাস দারুণ মোচড় খাচ্ছে, সম আটকা গলায় বলেন—বুবু, তুই এলি!

—কেন চিঠি পাও নি? বলতে বলতে বিদ্যুৎ উবু হয় তার ডান হাতটা চলে যায় করুণার পায়ের দিকে আর ঠিক তক্ষুণি করুণা বিদ্যুতের মাথাটা বুকের মধ্যে দু' হাতে জড়িয়ে ধরেন। এ হয়তো করুণার মাতৃসুলভ বাড়াবাড়ি ভাবোচ্ছ্বাস; দীর্ঘ আট মাস বাদে নিজের ছেলেকে এমনি আকস্মিক নাটকীভাবে চোখের একেবারে সামনে দেখতে পেলে কোন্ মা আছে পৃথিবীতে যে তার ভাবাবেগ লুকোতে পারে! যদিও করুণা তেমন ভাবপ্রবণ নন। অসঙ্গতিতে ভরা জীবনের বহু মলিন অভিজ্ঞতা তাঁর অনুভূতিগুলোকে অনেক ভোঁতা শিথিল করে দিয়ে গেছে।

কান্ড দেখে আধবুড়ি বুকনী হাসে উঠোনে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে। করুণা কী বলবেন দিশা পান না। বুকনীকে ধমক দিয়ে, বলেন—তোর খালি হি হি, যা গুলবটেনের মার কাছ থেকে একটু দুধ নিয়ে আয় জলদি চা করতে হবে। তুই কী একবার বাজার যেতে পারবি? কী কী আনবি বলতো?

বিদ্যুৎ মোড়ায় বসে জুতো খোলে, বলে—ট্রেনে সারারাত ঘুমুতে পারি নি মা!

—একদম ঘুমুসনি? আহারে! যাকগে খেয়েদেয়ে লম্বা ঘুম দিবি শরীর একদম ঝরঝরে হয়ে যাবে। দাঁড়া আমি এক্ষুণি চা করে আনি—

বলে আর এক মুহূর্ত দাঁড়ান না: ছোট্ট উঠোনের পশ্চিমে ছোট্ট রান্নাঘর। শিশিরে ভেজা পাথুরে উঠোন পার হন করুণা দপদপিয়ে। একটা মুরগী ছানা-পোনা নিয়ে কোঁকর কোঁ করে দৌড়ে পালায়। যৌবনে এমনি দাপিয়ে চলতেন

করুণা। এখন বাঁ হাঁটুতে বাবোমেসে ব্যথা মালাই চাকিটা নেই। সেই কবে পা জখম হয়েছিল। সিনেমা দেখার ঝোঁক ছিল তার দুরন্ত, বড় ভাসুরকে লুকিয়ে একদিন দুপুরে বড়জাকে নিয়ে ম্যাটিনিতে গেছেন, ফিরছেন সাঁঝ সন্ধ্যায় খিড়কি দোর দিয়ে শ্যাওলা ধরা কলতলায় এসে চিৎপটাং। তখন বুবু পাঁচ মাসের পেটে। কী দুর্ভোগ কী যন্ত্রণা তারো চেয়ে বেশী ভয়। হাঁটু ব্যথা যাক কিন্তু পেটে ধরা প্রাণটার যেন কোন অমঙ্গল না লাগে। সেই বুবু দশ মাসের আগেই কোলে এল, কত ঝকমারি। ফরসেপ করতে হল। সেটা শীতকাল। আঁতুড় ঘরের কাঠ কয়লার পোড়া গন্ধ যেন নতুন করে নাকে লাগে। কাঠ পুড়ছে মাটির উনুনে কেটলিতে জল বলক দেয়।

একটা টিনের গ্লাসে দুধ নিয়ে আসে রুকনী। বলে—তোমার বড় বেটা?

করুণা বলেন—হ্যাঁরে পাগলী!

—তোক নিতে এসেছে না?

করুণা চোখ তুলে রুকনীর উল্কি আঁকা মুখ দেখেন, হাসেন, বলেন—আমাকে ছেড়ে কী বেশী দিন থাকতে পারে!

রুকনীর নিষ্প্রভ চোখের তারা থমথম করে। ওর ছেলে কাজ করে হাওড়ার চটকলে রুকনীর বড় সাধ ছেলের কাছে যায় গঙ্গায় একবার স্নান করে সে কালীঘাটের কালী বাড়িতেও যাবে; ছেলে আর আসে না বৌকে নিয়ে গেছে এক বছর। কত অপূর্ণ সাধ বুকে নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকে!

দু' দমক শীতের বিশুষ্ক হাওয়া বয়ে যায়, সন সন শব্দ ওঠে, মরা পাতা ওড়ে এলোমেলো। কেটলি নামাতে গিয়ে হাতে ছ্যাঁকা লাগে করুণার। আনমনে করুণা ভাবেন কে জানতো বুবু এমনি হুট করে চলে আসবে একদিন।

তক্তপোষে বসে চায়ে চুমুক দেয় বিদ্যুৎ নিঃশব্দে। দু' চোখের বিরক্ত দৃষ্টিতে চার দেয়াল ঘেরা ঘরের শূন্যতা ঠুকরে যায়, কিছু একটা বলবে বলবে ভাবে সে কিন্তু কোথা থেকে কী দিয়ে সুরু করবে ভেবে পায় না।

করুণার পক্ষেও কী হুট্ করে কিছু বলা সম্ভব? অনেক কথা মনের মধ্যে এক সঙ্গে ভীড় করলে কোন বিশেষ কথা বলা যায়? শুধু নির্বাক দাঁড়িয়ে করুণা বিদ্যুতের মুখ ভঙ্গিতে কোথাও আত্মগ্লানি ফুটে উঠছে কিনা খুঁজে দেখেন। আট মাস আগে বিদ্যুতের বাড়ি থেকে চলে এসেছেন করুণা, এসেছেন রাগ করেই। রাগ না করে তার কী উপায় ছিল? নিজেকে করুণার বিদ্যুতের সংসারে অবাঞ্ছিত অতিথির মত মনে হচ্ছিল দীর্ঘদিন। বয়েস হলে মানুষ এমনি মূল্যহীন আবর্জনার মত পরিত্যক্তা হয়ে ওঠে। জেনে শুনেও মন বোঝে না। কেউ তাকে তাড়িয়ে দেয় নি তিনিই চলে এসেছেন। চলে এসেছেন কিন্তু মনে মনে অপেক্ষা করেছেন প্রতিদিন, উন্মুখ হয়ে থেকেছেন একটি অনুতপ্ত কণ্ঠস্বরের জন্য—যেদিন বিদ্যুৎ এসে হঠাৎই ডাকবে—মা। তারপর দীর্ঘদিন চলে গেছে সেই দুরাশার ওপরে ধুলো জমে জমে এখন সব ঢেকে গেছে।

হেমন্তের মৃতুর পরেও বিদ্যুৎ আসে নি। অথচ বিদ্যুৎ তাদের প্রথম সন্তান মুখাগ্নিতে তারই অধিকার। কিন্তু করুণা তার আসার জন্য অপেক্ষা করেন নি। নিজে হাতে মুখাগ্নি করেছেন। সব শেষ হলে চিঠি দিয়েছেন লিখেছেন—যদি প্রয়োজন মনে কর তবে শ্রাদ্ধ করিও আমি যাহা করিবার এখনেই করিব।

কিন্তু করুণা পারলৌকিক কাজ কিছুই করেন নি! ইহলোকে যার জন্য কিছুই করা হল না তার পারলৌকিক কাজের কোন গরজ তার ছিল না। শুধু বিদেশ বিভুই বলেই নয় করুণার স্বভাবই এমনি নিজের বিবেক ছাড়া পৃথিবীতে আর কাউকে তোয়াক্কা করেন না।

বিদ্যুৎ তখন আসে নি, মনীষা তখন নার্সিং হোমে। দিন চারেক বাদে বিদ্যুৎ জানিয়েছিল—সে শ্রাদ্ধ করবে, তার একটি ছেলে হয়েছে, মনীষাকে সিজার করতে হয়েছিল পুত্রসহ প্রসূতি সুস্থ আছে।

এসব কথাই করুণার মনে পড়া উচিত কিন্তু এর বিন্দুবিসর্গও তার মনে এল না। করুণা শুধু দেখছিলেন যে-তক্তপোষে বিদ্যুৎ বসে আছে সেই তক্তপোষেই হেমন্ত শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। তার চোখে স্পষ্ট ফুটে উঠছিল হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া হেমন্তর অসাড় শরীর, মৃত নিস্পন্দ মুখ।

নৈঃশব্দময় সে ছবিটা ভেঙে দিয়ে বিদ্যুৎ বলে—বোসো মা। বিদ্যুতের এটা কথার কথা অনুরোধ নয় কিছু বলবার ভূমিকামাত্র।

করুণা খুব সহজেই বর্তমানে ফিরে আসেন অতীত আর বর্তমানের মধ্যে একটা সহজ সুগম সেতু তার মনের মধ্যে তৈরী হয়ে গেছে। করুণা বলেন—তোরা সব কেমন আছিস বুবু? বৌমা বাচ্চা?

—অই আছি কোন রকম। বিদ্যুৎ হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙে। নিবিড় চোখে মাকে দেখে বলে—তোমাকে কিন্তু খুব কাহিল দেখাচ্ছে মা, মুখটা ছোট্ট হয়ে গেছে, চুল সব—

—আমার কথা ছাড় বুবু বুদিন বাবে চিতায় উঠব শরীর দিয়ে কী হবে আর? এখন তোরা সবাই সুখে থাক মনে মনে শুধু এই। কথা শেষ হয় না করুণার এ জন্য নয় যে আর কথা খুঁজে পান না কিন্তু যে কথাগুলো তিনি বলতে চান সেগুলো ঠিক তার প্রাণের থেকে আসে না।

—চিরকাল কী কেউ বেঁচে থাকে তবু যদ্দিন বেঁচে আছ শরীরটার ওপর একটু নজর তো রাখতেই হবে। সাবধানে থাকতে হবে। বিদ্যুতের এসব কথায় খুবই খুশী হয়ে ওঠবার কথা করুণা কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত আপ্লুত বোধ করেন না। তাঁর মনে কেমন সন্দেহ জাগে এগুলো ঠিক বিদ্যুতের মনের কথা কী?

এ সময় বহু ব্যবহৃত একটা কথা করুণার মনে নয় একেবারে জিভের ডগায় এসে পড়ে—'সে ভাগ্য কী আমি করে এসেছি?' কিন্তু বলতে পারেন না করুণা জিভ তার ভারী বোধ হয়। কথাটাও বড় পুরনো হয়ে গেছে।

—আর নজর রেখে কাজ নেই বাবা, অনেক তো হল; এবার যেন তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারি। হয়তো বুকের ভেতরে পুষে রাখা কিছু দুঃখ কিছু অভিমান করুণার অজান্তেই বা অনিচ্ছায় বেরিয়ে পড়ে তার উদাসীন বাচন ভঙ্গিতে। বিদ্যুৎ আড়চোখে নজর করে দেখে—কী বলা এখন সঙ্গত সে কথাটা সে রীতিমত ভাবতে থাকে।

আর ঠিক এ-সময়ে রুকনী বারান্দা থেকে উঁকি মেরে বলে—বাজার যেতে হবে নাই? করুণা কিছু বলার আগেই বিদ্যুৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলে—আমি কিন্তু বাজারে যাব মা। —তুই বাজারে যাবি! তুই কী চিনিস বুবু। করুণার চোখে উদ্বেগ বিস্ময়। বিদ্যুৎ বলে—এই তো আসার সময় দেখে এলাম মোড়ের মাথায় বাজার বসেছে ব্যাগ দাও মা।

করুণার চোখে মুখে প্রচ্ছন্ন খুশীর সুস্পষ্ট আভা রুকনীকে বলেন—দেখেছিস পাগল ছেলের কান্ড। দেয়ালের পেরেক থেকে ব্যাগ তুলে নিয়ে বিদ্যুতের হাতে দেন; দ্বিধা ছিল তবু বলেন—টাকা দেব বে বুবু।

—দূর কী যে বল মা! বিদ্যুৎ এমন মমতা ভরা অভিমানী ভঙ্গিতে ক্ষেপে ওঠে রুকনী হেসে ফেলে। বিদ্যুতের ব্যস্ততা দেখে করুণার মনে পড়ে কলকাতায় বাসা করে যখন তাদের নিয়ে আসে বিদ্যুৎ—এমনি প্রাণবন্ত ছিল সে তখন। তখন সে ছিল বালকের মত উচ্ছ্বাসে ভরা। মায়ের কাছে তার সব কিছু বলার অভ্যাস ছিল তখনো দূরের মানুষের মত হয়ে যায় নি সে আর করুণারা হয়ে যান নি গায়ে-পড়ে-বেড়াতে-আসা অবাঞ্ছিত অতিথি। মানুষ কী ভীষণ পাল্টায়!

গেট অবধি ছুটে যাওয়া বিদ্যুৎ কী ভেবে ফিরে আসে দু' পা, উঠোনের মাঝখানে রোদে দাঁড়িয়ে বলে—তোমাকে নিতে এসেছি কিন্তু মা যাতে কলকাতার গাড়ি। দুপুরেই রওনা গাছিয়ে বেরুব কিন্তু।

রুকনী আর দাঁড়ায় না বিদ্যুৎ, গেট পেরিয়ে যায় দ্রুত পায়ে। সেদিক থেকে চোখ ফেরাতেই রুকণীর করুণ চোখে তাঁর চোখ পড়ে। কী এক আপ্লুত উত্তেজনায় সমস্ত বুকটা টাপ্ টুপ্ করে যায় করুণার এই মুহূর্তে বিদ্যুতের সব অতীত অবহেলা ভুলে যান করুণা, মনে মনে ক্ষমা করে দেন তাকে।

রুকণীকে আস্তে বলেন—তোর ছেলেটাও এসে পড়বে রে রুকণী, দেখিস ঠিক আসবে। রুকণী কিছু বলে না শুধু তার উল্কি আঁকা চিবুকের সূক্ষ্ম কয়েকটা পেশী কেঁপে ওঠে থিরথিরিয়ে।

আঃ বাবু, দস্যিপনা করে না বাবা! করুণা তাঁর দুরন্তপনার দুরন্ত ছেলেকে ধমকে ওঠেন, কৃত্রিম গম্ভীর গলায়। বুবু

দূরে থেকে ছুটে এসে করুণার পিঠে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়েছে, দুহাতে গলা জড়িয়ে ধরে কাঁধে ওঠবার চেষ্টা করছে। করুণা সামনে ঝুঁকে হুয়ে ঝুঁকে পড়েন; হাতের সুচলো কুরুশকাটা সামলে বলেন—আহ্ বুবু, কুরুশ আমার পেটে ঢুকে যাবে, মরে যাব কিন্তু আমি।

ঘরের মধ্যে মেঘের মত গাঢ় ছায়া। বুবু থমকে দাঁড়ায়। নিতু মেঝের উপর হুয়ে শুয়ে মুড়ি খুটে খাচ্ছিল, করুণা বলেন—ভাইয়ের সঙ্গে খেলো বুবু।

বুবু দুহাতে নিতুকে কোলে তুলতে চেষ্টা পায়, তচ্ছণ্ডে নিতু চীৎকার করে ওঠে। আহ্—বলে করুণা নিতুকে কোলে তুলে চুমু খান।

অভিমানে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বুবু বলে—আমাকে হাম দাও মা

করুণা হেসে ওঠেন—ওরে হিংসুটে ছেলে। বলেই দুহাতে টেনে নিয়ে ছেলের গালে চুমু খান টুকুস করে।

কেউ দেখলে অবাক হয়ে যাবে বৈকি। শূন্যে চুমু খান করুণা।

এটা করুণার খেলা নয়। পুতুলখেলার বয়েস তাঁর চলে গেছে কতকাল আগে। এখন তাঁর সব খেলা ফেলে রেখে চলে যাবার বয়েস। শরীরের ভেতরে আজকাল মাঝে মাঝে—সেই প্রস্থানের আগাম শব্দ শুনতে পান করুণা। ধীর পায়ে জীর্ণ এই শরীরের খোলস ছেড়ে চলে যাচ্ছেন গাঢ় অন্ধকারের দিকে। মস্ত খেলাঘরের মত এই পৃথিবীতে পড়ে থাকছে তাঁর পঞ্চান্ন বছরের পুরনো অসাড় দেহ পরিত্যক্ত পুতুলের মতই।

দীর্ঘ নির্বাসনে করুণার সারাদিন সারারাত মন্থর পায়ে টলে টলে চলে যায়। ছায়াময় এই নির্জন চৌখুপী ঘরে সারা দুপুর একলা কুরুশ বুনে যান যখন তখন দূর অতীত দ্রুত ছুটে এসে তাঁর মন্থর দিনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুরনো দিন পুরনো মানুষের সঙ্গে কথা হয়, পুরনো ঘটনার পুনরাভিনয় হতে থাকে সকলের অগোচরে। কখনো বুবুর হেমন্ত তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে রহস্যময় গলায় বলেন—দ্যাখ তো, এই শাড়িটা তোমার পছন্দ হয় কিনা? মেঝের উপর হুয়ে শুয়ে নীরবে মুড়ি খুটে খেয়ে যায় নিতু, বহু দূরে থেকে ছুটে এসে বুবু ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর পিঠের ওপর। ভীষণ চমকে উঠে করুণা বলেন—আয় বুবু!

তন্দ্রাঘোরে আড়ামোড়া ভাঙ্গে। বং : ঘুম ভেঙেছে তার একটু আগে। ঘরে দুপুরের মড়ার মত নিঃসাড়ে ঘুমিয়েছে সে। ঘুম ভাঙতেই তার চোখে পড়ে করুণার এই একক অভিনয়, ছায়াচ্ছন্ন ভাবটাকে নাটকের মঞ্চের মতই রহস্যময় লাগে।

কৌতুকের গলায় সে বলে—কার সঙ্গে কথা বলছ মা?

আবছায়ার ভেতরে চমকে ওঠেন করুণা, হাতের কুরুশ কাঠি মুহূর্তে মাত্র স্থির হয়েই ফের চলতে সুরু করে, লাজুক মুখে বলেন—নাই, কার সঙ্গে আবার কথা বলবো! পাশ ফিরে তক্তপোষের কিনারে আসে বিদ্যুৎ বলে—অই যে কী বললে বুবু দুষ্টুমি—করুণা হেসে ওঠেন মৃদু শব্দে, বলেন—ছেলেবেলায় তুই ভীষণ জ্বালাতন করতিস বুবু, তোর মনে পড়ে?

বিদ্যুতের এই মুহূর্তে কিছুই মনে পড়ে না, তবু সে বলে—খুব দুষ্টু ছিলাম ছেলেবেলায়। ওহ্ কী যে দলাই মলাই করতিস! ঈষৎ উৎসাহে কুরুশ কাটা দ্রুত চলে, করুণা বলেন—একদিন খুব গা চটকাচ্ছিস, আমি বললাম—বুবু, আমি মরে গেলে কী করবি বলতো? তখন তোর আট—তুই ভীষণ রেগে গিয়ে আমাকে আঁচড়ে খিমচে দিলি অনেকক্ষণ আর তখন হঠাৎ তোর দিকে চেয়ে দেখি তোর চোখে জল। বলে বেশ উঁচু শব্দে হাসেন করুণা।

বিদ্যুৎ দেয়ালের গায়ে একটা নিথর জান্তব ধেড়ে টিকটিকি দেখে নীরবে। ছেলেবেলার কথায় কালো ধোঁয়ার মত কিছু নিঃশব্দ বিষণ্ণতা তার গায়ের ওপর দিয়ে সির সির করে বয়ে যায়। শীতের হাওয়ার চেয়েও শীতল।

বহুদিন বাদে কথা বলার সুযোগ পেয়ে করুণাকে প্রগল্‌ভ ভাবে পেয়ে বসে। আপন-মনে বলেন—তোদের দুভায়ে খুব ভাব ছিল রে বুবু, তোর জ্যাঠা ঠাট্টা করে কী বলত মনে আছে—ইকড়ি মিকড়ি?

মনে আছে—মনে পড়ে। বাইরে নির্জন পৃথিবীতে কোথায় একটা ঘুঘু আবিরাম ডেকে যায়, সাংকেতিক ভাষায় যেন বহুদূরে কী গোপন খবর চলে যায়। বিদ্যুৎ সতর্ক হয়ে ওঠে হঠাৎ তক্ষুণি হয়তো নিতাইয়ের কথা উঠে পড়বে। সে ত্রস্ত ভঙ্গিতে বলে—তুমি এসব কী বুনছ বলো তো মা সেই থেকে? করুণা খুব হেসে আছেন নিজের মধ্যে গভীর আত্মমগ্নতার ভেতর থেকে বলেন—আমাকে যে আজকাল কী ভুলে পেয়েছে বুবু, বতবার ভাবছি নিতাইয়ের কথা শুধোব—কেমন আছে রে নিতু? বিদ্যুৎ টিকটিকি দেখে ফের। খপ করে দেয়াল থেকে কী কারণে পড়েই সেটা দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায় অন্ধকারে। বিদ্যুৎ নীরবে অন্ধকার দেখে।

কতদিন পরে আবার নিতুকে দেখবেন করুণা, বুকের ভেতরে যেন দ্রুত রেলগাড়ি ছুটে যায় দীর্ঘ হুইসল বাজিয়ে। সেই রোগা পটকা জেদী ছেলেটা মুচকে মুচকে হাসা স্বভাব বদ, গোঁফ নাকের তলায়,

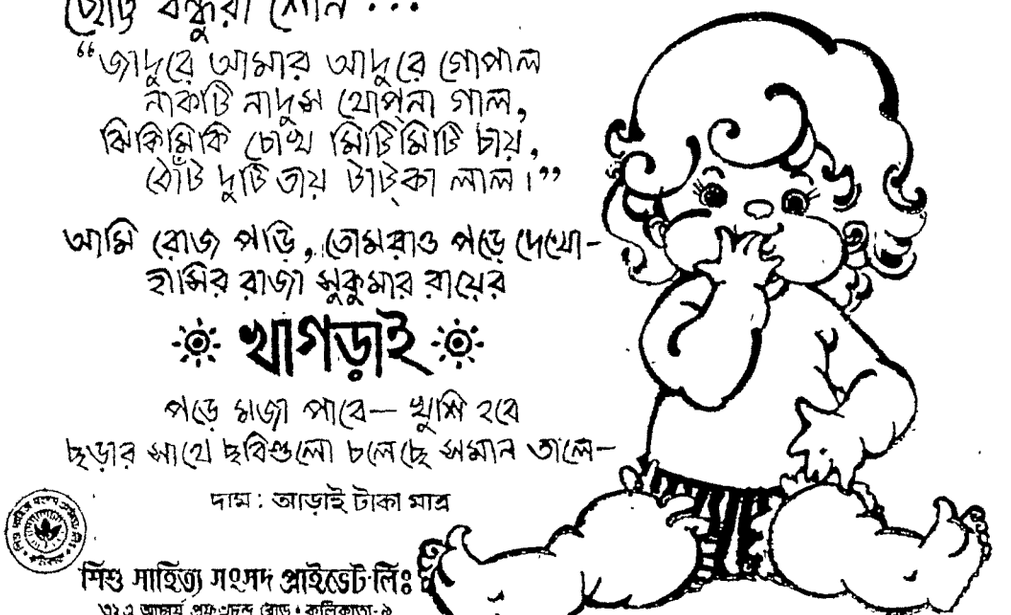

ছেলেবেলা থেকে বাঁশি বাজিয়ে বাজিয়ে কলেজেটাকে দুবলা করে ফেলেছে। লেখাপড়া করল না। কী এক অর্কেস্ট্রা পার্টি খুলেছিল। তাতে কী পেট চলে? শেষমেষ হল কিনা প্রাইভেট বাসের কন্ডাকটার। খ্যাপা না হলে নিজেকে নিয়ে এমনিভাবে কেউ ছেলেখেলা করে? পাগল বলেই কোন কিছু গ্রাহ্য করে না বলেই ওর দিকেই বুক থেকে গড়িয়ে গেছে করুণার বাৎসল্যের সিংহভাগটা।

মাত্র আধা ঘন্টার জন্য দেখেছিলেন করুণা নিতাইয়ের বৌকে। ফিরে গিয়ে দেখবেন বহুক্ষণ ধরে, কাছে কাছে রাখবেন কিছুদিন। নিতাই যাই বলুক বিদ্যুৎ বাই বলুক? কী আর বলবে ওরা? ওরা করুণার কষ্ট করে জন্ম দেওয়া সন্তান নয়?

ঝোঁকের মাথায় রাগের মাথার মানুষ কী না করে, রাগ হচ্ছে চণ্ডাল। কান্ড-জ্ঞান থাকে না রাগী মনুষের। রাগ তো আগুন হঠাৎ জ্বলে ওঠে। জ্বলে কেমন ওঠে আবার তেমনি তো নেভেও। বিদ্যুতের রাগ কী আর এতদিনে নেভেনি! কবে নিভে গেছে। না নিভলে—কেউ ছুটে আসে এমন করে আট মাস পরে? বিদ্যুৎ তো করুণারই ছেলে। করুণার কী কম রাগ। কিন্তু যখন রাগ মিইয়ে যেতে থাকে কী অসহ্য অনুতাপে বুক ভাঙে তখন, করুণা ছাড়া এ কথা কে জানে।

হঠাৎ অদৃশ্য টিকটিকের টকটক শব্দে করুণার খেয়াল হয় বিদ্যুৎ কোন জবাব দেয়নি। কিম্বা ভাবেন দিয়েছে তিনিই শুনতে পাননি। উৎকণ্ঠাভরা মুখে করুণা বলেন—নিতু কেমন আছে বললি নাতো বুবু?

—ওর কথা আবার বলবার কী আছে। চাপা বিরক্তিতে শ্বাসধ্বাসে শোনায় বিদ্যুতের কণ্ঠস্বর। অবাক হয়ে করুণা বলেন—তুই কী ওর কোন খোঁজ রাখিস না?

—ওর কথা আর বলো না মা একেবারে গোল্লায় গেছে। বলতে বলতে হয়তো ভেতরের উত্তেজনায় বিদ্যুৎ উঠে বসে, শক্ত মাথে বলে—মণীষা এখন নার্সিংহোমে, এদিকে বাবার মৃত্যু সংবাদ পেলাম, কতবার খবর পাঠিয়েছি, একদিন এসে দেখাটা পর্যন্ত করল না!

মলিন মুখে করুণা বলেন—ওকে তাইরকমই বুবু নিতুটা ছেলেবেলা থেকে ভীষণ অভিমানী।

—অভিমানী! ও কী এখনো ছেলেমানুষ নাকি? আসলে তোমরাই আস্কারা দিয়ে দিয়ে ওকে মাথায় তুলেছ।

—বুবু! বলে করুণা একটু থমকান, তার বুক থেকে টেনে দিয়ে কিছু রক্ত মুখে এসে পড়ে, করুণা বলেন—বুবু শোন, তুইও ওর সঙ্গে দাদার মতো ব্যবহার করিস নি ওরকমভাবে সদ্য বিয়ে করা বৌসমেত কেউ লাথিয়ে তাড়িয়ে দেয়? বাড়ির কুকুর বেড়ালও কেউ ওভাবে তাড়ায় না রে।

—তোমরা তো সব ব্যাপারেই খালি আমারই দোষ দ্যাখ মা। বিদ্যুৎ ঈষৎ ক্ষুব্ধ গলার স্বরটাকে কোনরকম চাপা দেবার চেষ্টা করে।

—তুই তো বড় ভাই বুবু, তোকে অনেক কিছু—

করুণার কথা শেষ হবার আগেই ভেতরের উত্তপ্ত আবেগ বিদ্যুতের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়—বড় বড় বড়, বড় বলেই আমাকে সবার হাতে পায় ধরে থাকতে হবে? তোমরা কেউ আমার কথা একটুও ভাবো না। বলতে বলতে দাঁড়িয়ে মেঝেয় পায়চারী করে বিদ্যুৎ, বিষণ্ণ গলায় বলে—তুমিও তো বড়, তুমি তো মা। তুমি কী ঠিক করেছ ওরকমভাবে চলে এসে, বলতো মা?

তীক্ষ্ণ শাণিত অভিযোগ, উজ্জ্বল চোখে বসে পড়ে বিদ্যুৎ।

বিস্ময় নয় ক্রোধ নয় অনুতাপ নয়—যেন সবকিছু মিলেমিশে করুণার দু' চোখের দৃষ্টিকে অর্থহীন নির্বোধ করে তোলে।

প্রায়ান্ধকার অতীত হামাগুড়ি দিয়ে চলে যায়। সেদিনের কথা আজ যে খুব স্পষ্ট মনে পড়ে তা নয়—যেদিন একলা একলা হুট করে কলকাতা ছেড়ে চলে এলেন সোজা এখানে। আগেও কতবার এসেছেন দাদার বাড়িতে কিন্তু সে-আসার সঙ্গে এরকম আসার কত ফারাক। যেদিন নিতাই কাউকে না বলে না কয়ে আচমকা রেজেস্ট্রেশন করে বৌকে নিয়ে বাড়ি ঢুকল সেদিন রাতেই করুণা চলে আসেন। তার দু'ঘন্টা আগেই বিদ্যুৎ আর মণীষা ফিরেছে অফিস থেকে। ফেরার পরে একটি ঘন্টার মধ্যে ঘটল সেই দুর্ঘটনা, মানুষের কী ভীষণ রূপ সেদিন চাঁড়িয়ে দেখতে হল। মানুষ বড় বিচিত্র জীব, বিচিত্র তার স্বভাব। সেদিন বিদ্যুৎ নিতাই মিলে যে কুরুক্ষেত্র রচনা করল তার সবটুকু দীনতা সবটুকু যন্ত্রণা অনুভব করবার মানসিক শক্তিও ছিল না করুণার।

নতুন বৌকে নিয়ে নিতাই বেরিয়ে গেল সিনেমার বাড়ি ছেড়ে। দেখে শুধু মনে হল মানুষের সংসারে মানুষের শেকড় বড় বেশী নড়বড়ে, কে কখন উপড়ে পড়বে তার কোন ঠিক নেই। বিদ্যুৎ নিতাইকে বাড়ি থেকে বের করে দিল বলেই যে করুণা চলে এলেন এমন নয়। কিম্বা নিতাইকে অন্ততঃ দু-চারদিন বিদ্যুৎ থাকতে দিক তাঁর এমন একটা অনুরোধও বিদ্যুৎ অগ্রাহ্য করল বলেও নয় তাতে করুণার আত্মঅভিমান যা লেগেছিল হয়তো তারো চেয়ে আরো বেশী আঘাত তিনি প্রতিদিন পাচ্ছিলেন সকলের আলোচারে। করুণা বহুদিন থেকে বুঝতে পারছিলেন মানুষ কেউ কারো নয়। ধরাবাঁধা সম্পর্কের ছক দিয়ে মানুষ আপনপর বিচার করে থাকে সংস্কারের মত। কিন্তু সেটা ভুল। মানুষ জন্মের পর থেকে এমন লক্ষ কোটি ভুল করে আসছে। করুণা টের পাচ্ছিলেন তাঁকে একদিন আসতেই হবে, চারিপাশের ছাওয়ায় এক অনিবার্য বিচ্ছেদের গন্ধ টের পাচ্ছিলেন করুণা। এক ছাতের তলায় থেকেও মানুষে মানুষে দুস্তর ব্যবধান তৈরী হয়ে যায়। বিদ্যুৎ আর মণীষা দুজনেই চাকরি করে কিন্তু শুধুই সংসার চালাবার জন্যই তাদের চাকরী নয়। তাদের কিছু সুখের আকাঙ্ক্ষা আছে, স্বোপার্জিত সব মানুষের থাকে হয়তো ছিল। সুখের জন্যই তো মানুষের এত ছোটাছুটি এত হানাহানি, এত পরিশ্রম! অথচ সে সুখ যে কী সেটা স্পষ্ট জানা ছিল না করুণার। শুধু আভাসে ইঙ্গিতে কিছুটা বুঝতে পারছিলেন—সে সুখ হয়তো ছোট্টখাটো ছিমছাম নির্ভার একটি সংসার; হয়তো সামান্য কিছু গোছগাছ, হয়তো তার জন্য চাই কিছু ঢাকনা দেওয়া সোফাটোফা হয়তো কয়লার বদলে উজ্জ্বল একটা গ্যাসউনান যাতে খুব স্বল্পায়াসে দ্রুত রান্নাবান্না চুকে যায় হয়তো বা ছোট্ট একটা চৌকোণা ফ্রিজ যাতে ধরে রাখা যায় সাতদিনের বাজার কিম্বা হয়তো নিটোল একটু অবসর কোন নির্জন রাতে যখন ঘুমুতে যাবার আগে ছোট্ট একটা রেকর্ড প্লেয়ারে বাজতে থাকবে ডানামেলা পাখির মত রবিশঙ্কর কিম্বা অলীক স্বপ্নের মত—আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে।' সুখের সেই প্রভু আসছে, আসবে, আসছে, আসছে, কাঁকরে ভরা আসার শেষ নেই। ধুলোময়লা কাঁকরে ভরা পৃথিবী তার পাদস্পর্শে কখনো কোনদিনই আলোকিত হয়ে ওঠে না। শুধু মানুষ মানুষের কাছ থেকে ক্রমে দূরে সরে যেতে থাকে, কাছের মানুষ অপাংক্তেয় পরিত্যাজ্য হয়ে ওঠে, দিন দিন, হয়ে ওঠে সুখের পথের কাঁটা।

কাঁটা হয়ে কে কবে বাঁচতে ভালবাসে? করুণার দাদা রাঁচির বাড়ি পুরোটা ভাড়া দিয়েছেন, থাকেন কর্মস্থলে। করুণা খুঁজে পেতে সে বাড়ির একটা স্টোররুম পরিষ্কার করে নিলেন। হেমন্তকে নিয়ে এলেন সানাটোরিয়াম থেকে। টিবি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে ওখানে ছিলেন। কিন্তু তাঁর মন ছিল না ওখানে প্রতি চিঠিতে লিখতেন—শরীর সেরেছে কিন্তু তাতে কী? এখন একদিন তো চলে যেতেই হবে। একা একা এখানে আর একদিনও ভাল লাগে না, বরং চলে যাবার আগে অন্তত দুচারদিন তোমাদের সঙ্গে থাকতে চাই, তোমাদের মুখ দেখতে দেখতে চলে যেতে চাই। সবার কাছে আলাদা আলাদা কিন্তু একই ভাষার চিঠি লিখতেন। করুণা জানতেন সবার সঙ্গে একসঙ্গে কোনদিনই আর হেমন্তর থাকা হবে না। তাই অন্ততঃ তিনি এলেন। হেমন্তর ঠিক যাবার মুহূর্তে তবু করুণা সামনে থাকতে পারলেন না।

পৃথিবীতে এখন শীতকাল, দিনের আয়ু বড়ো কম। দিন সরছে। শুকনো হাওয়ায় শুকনো মরা পাতা উড়ছে আকাশ-ময় পঙ্গপালের মত। দুটি ঋজু শালগাছের ফাঁকের ভেতর দিয়ে দেখা যায়, দূরে নির্জন প্রান্তর পড়ে আছে নিঃশব্দে, তার প্রান্ত-সীমায় পোঁয়াটে কালভৈরব পাহাড়; তারও ওপার গাঢ় অন্ধকারে ভরা এক অচেনা জগৎ, পৃথিবী ছেড়ে যে জগতে মানুষ চলে যায় সেই কাল্পনিক জগতের মত।

এক পলক দেখেন করুণা এই পরিচিত দৃশ্য জানলার দাঁড়িয়ে কেন করুণা বুঝে যান। মন যেমন করে চলে [illegible]

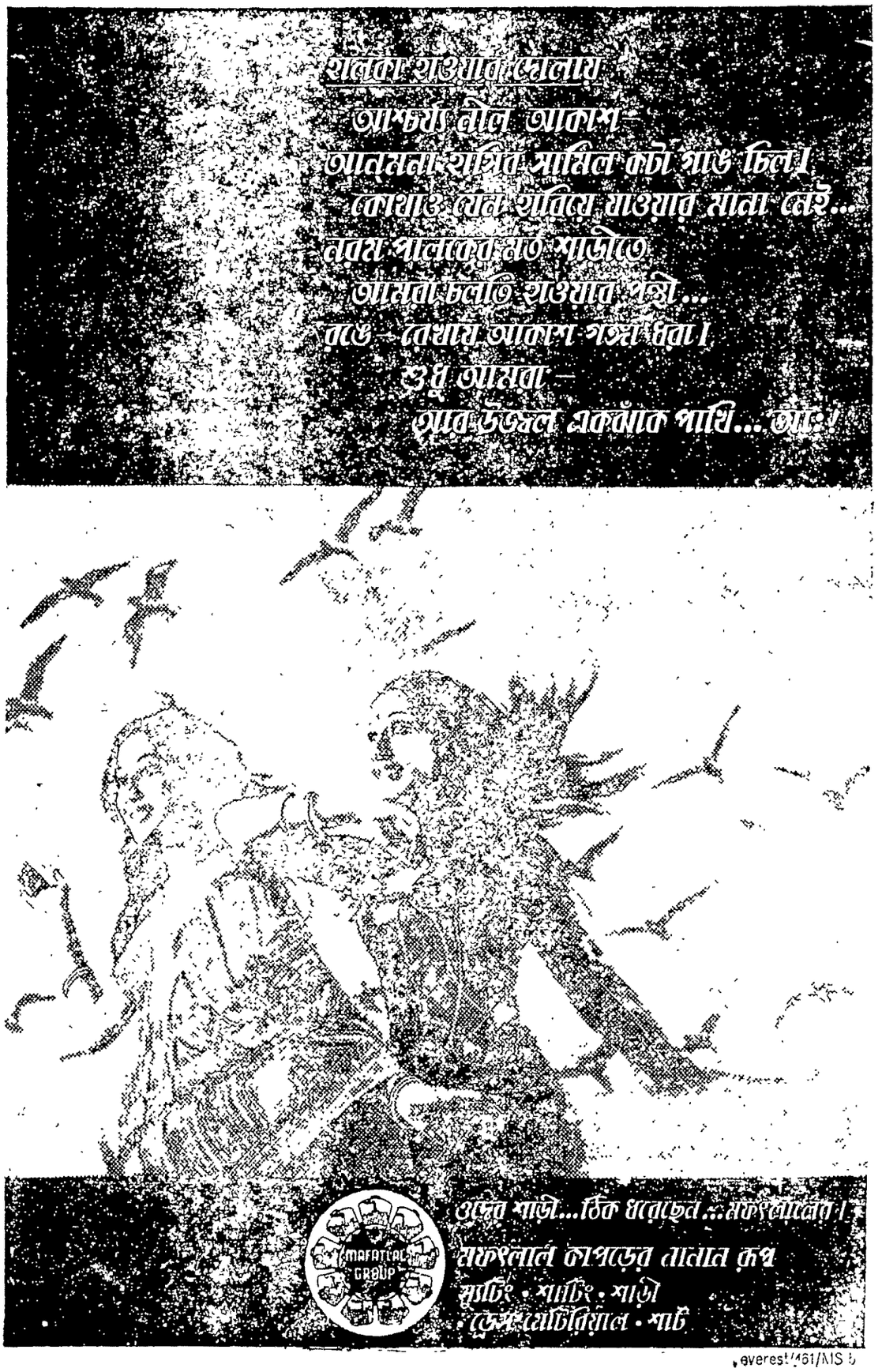

everest/461/AIS 5

বারান্দায় ভোলাজঙ্গে মুখ ধুয়ে এসে বিদ্যুৎ ঘড়ি দেখে। একবার মাকে দেখে আরেকবার ধনিয়ে ওঠা অন্ধকার। বাইরে এখন আর ঘুঘু ডাকছে না, শোনা যাচ্ছে ঘরেফেরা কিছু পাখির বিশৃঙ্খল কলরব।

—যাক্ গে যা হবার হয়ে গেছে। আপনমনে বিচারকের রায় ঘোষণার মত বলে বিদ্যুৎ ও নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে কী হবে। সে বুঝেছে করুণা তার অভিযোগের জবাব দেবেন না।

অন্ধকারের পথে বিদ্যুতের ধোঁয়াটে শরীরটা দেখেন করুণা। কিছু বলেন না। বুকের মধ্যে কিছুক্ষণ আগে যে দ্রুতগামী রেলগাড়ী ছুটে গেছে, তখন আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। দীর্ঘ হুইসলের করুণ প্রতিধ্বনি বুকের গভীরে পাড়ে থাকে।

—সময় কিন্তু হয়ে এল। বলে ফের ঘড়ি দেখে বিদ্যুৎ, নিরুত্তর করুণাকে দেখতে দেখতে বলে—তখন থেকে তুমি কী সব বুনছ বলতো মা?

বলার মত একটা প্রসঙ্গ পেয়ে করুণা বালিকার মত উৎসাহিত হয়ে ওঠেন, বলেন—হেভি এঞ্জিনীয়ারিংএ অফিসারের বৌদের আয়না সোফাসেটি টেবল আর বিছানা ঢাকনা করে দিই বুবু, ওরা সুতো কিনে দেয়—আমি মজুরী পাই। বলতে বলতে কাছে এগিয়ে আসেন করুণা—মানুষের হাতে এখন খুব টাকা রে বুবু, জানিস পছন্দ সই ফ্যান্সি জিনিস পেলে কেউ পয়সা দিতে মাথা ঘামায় না। মাসে কত উপার্জন করি বলতো বুবু?

করুণার উচ্ছ্বাস যত বাড়ে বিদ্যুৎ তত মিইয়ে যায়, আস্তে বলে—কত?

—মাসে একশ দেড়শ! বলে ঠোঁট ছড়িয়ে হাসেন করুণা।

আবহায়ার মধ্যে গোপনে হাসে বিদ্যুৎ বলে—এই করে তোমার সময় বেশ কেটে যায়, তাই না?

মৃদু প্রতিবাদ করেন করুণা, বলেন—শুধু কী সময় কাটানো রে বুবু, হাতে যখন কড়কড়ে নোটগুলো পাই কী যে আনন্দ হয়, নিজের উপার্জনে পেট চালানো যে কী সুখের বুবু, সারাজীবনে তা জানতে পারিনি।

হাসিমুখে করুণা তাকিয়ে দেখেন বিদ্যুতের মুখে অন্ধকার জড়িয়ে যাচ্ছে। করুণার মনের ভেতরেও টান লাগে, নিজেকে একটু শুধরে নিয়ে বলেন—তুই অবশ্য মাসে পঞ্চাশ টাকা করে পাঠাস বুবু, জানি তোর খুব কষ্ট হয়। তা এখন থেকে আর না দিলেও, চলবে। বিদ্যুৎ অবাক হয়ে বলে—আর টাকা পাঠাবার কথা উঠছে কেন মা, তুমি তো যাচ্ছ, তৈরি হয়ে নাও।

করুণার কী যে ভুল হয়ে যায়, বিব্রত হয়ে বলেন—তাই তো! আমার যে কী ভুল। আমি তো যাচ্ছি বুবু, তাই না?

—নিশ্চয়ই যাচ্ছ। বিদ্যুৎ নিজের এ্যাটাচি গোছায়, বলে—তোমার নাতিকে নিয়ে তোমার বৌমা একেবারে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, অভিজ্ঞতা নেই তো। এখন থেকে তোমার নাতিকে সামলাতেই মা তোমার সারাদিন কেটে যাবে। ভীষণ দুরন্ত হয়েছে। বলে পিতৃসুলভ গর্বে ফুলে-ওঠা হাসি হাসে বিদ্যুৎ।

—হ্যাঁরে, সারাদিন কেটে যাবে। সেই রকম দিন, করুণার উপে-যাওয়া যৌবনের সেই দিনগুলো ফের ফিরে আসবে। ছেলেকে স্নান করাতে, খাওয়াতে কাজল দিতে, ঘুম পাড়াতে পাড়াতে যেদিনগুলো চলে গেছে তার। কোলের মধ্যে থাকবে একটুকরো প্রাণ হাসিতে চীৎকারে যে সারাক্ষণ তাকে সচকিত করে রাখবে। তেমনি আবার আসনপিঁড়ি হয়ে বসবেন যেমন করে বুবু নিতুকে কোলে নিয়ে বসতেন তেমনি করে। আস্তে করুণা বলেন—খুব লোভ হচ্ছে রে বুবু।

—তোমার বৌমা আমাকে ঠেলে পাঠাল জানো! বিদ্যুৎ শার্ট পরে নেয়।

বিদ্যুতের তৃপ্ত মুখের প্রতিটি রেখা খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্টা করেন করুণা, বলেন—আহারে খুব কষ্ট হচ্ছে বৌমায়। একটা লোক রেখে দিতে পারিসনি বুবু?

বিদ্যুতের হাসিতে ম্লান আভা লাগে, বলে—তোমার কী মাথা খারাপ মা? ছুটি তো শেষ, ফের অফিস করতে হবে। ছেলেকে দেখবে, বাড়িঘর আগলে রাখবে তেমন বিশ্বাসী লোক পাওয়া কী চাট্টিখানি কথা!

—তাইতো! শীতের হাওয়ার ঝাপ্টা লেগে সামান্য কেঁপে ওঠে করুণার শরীর। বুকের ভেতরে মুচড়ে ওঠে—মনে মনে কত কথা বলে ফেলেন করুণা—আমি খুব বিশ্বাসী লোক বুবু, আমি সারাদিন তোর

আগের গল্প ॥ রচনা ১৯৬৯ খৃঃ

বাপটা ছেলেটা

ওভারব্রিজের ঠিক ওপরে চাপা পায়ের দুদিকের ব্রিজ দু-হাতের আঙুলে আলতো করে ধরে প্রায় নিমীলিত চোখে মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে দু ঠোঁটে একটা ফচকে হাসি লটকিয়ে সমস্ত শরীর দুলিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচছিল নিমু—বেগুনটোলির যোগমায়া নিউটান ভাণ্ডারের ভেতরে: পাকা তবলচির ভঙ্গিতে টেবিলে তাল ঠুকছিল খোকা। বাস্তুহার উল্টোদিকে কাছেই তাদের শক্তি সংঘের পুজো প্যান্ডেলে তখন নতুন রেকর্ডটা চলছে—মাইকের গান ভেসে আসছে—জলিতা গো-ও-ও, ওকে আজ চলে যেতে বল না।' মুখ থেকে হুস করে একগাদা সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে শ্যামল চেঁচিয়ে উঠল—টপা, শালা জোর গেয়েছে। গোবিন্দ একটা ডবল হাফ চা নিয়ে বসেছিল, আস্তে আস্তে যেন চিবিয়ে চিবিয়ে চা খাচ্ছিল এতক্ষণ ধরে—ওর মুখে সব সময় বিরক্তি দেয়ালে হেলান দিতে দিতে চোখ মুখ কুঁচকে বসে বলল—থাম রে, সবার সামনে আর ভাই মরা নিতম্ব দোলাসনি।' সঙ্গে সঙ্গে শ্যামল একহাতে পাশে-বসা খোকার কোমরটা জড়িয়ে ধরতে ধরতে গোবিন্দর দিকে চেয়ে বলে উঠল,—বাংলায় বলো ইয়ার ওসব নিতম্ব ফিতম্ব বুঝি না, পাছা কও—'টপ টপা'—ভানু হাসতে হাসতে উঠে গিয়ে ওর আধ-খাওয়া সিগারেটটা নিমুর দুঠোঁটে গুঁজে দিল, লাচ যে শালা, সলিড হচ্ছে ফিনসে লাচ।' 'ও ঘাট জল আনিতে যাব না—যাব না—আ—ওঘাটে'—তালে তালে নিমুর কোমরটা দ্রুত ওঠানামা করতে থাকে। বেশ জমে উঠেছিল, খোকা মুখে দু আঙুলে ঢুকিয়ে সিটি মারবার উপক্রম করছিল, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই দোকানের বাইরে সাঁ করে এসে ইন্দ্রদার সাইকেলটা ঘ্যাঁচ করে থেমে গেল। চাকা দুটো মাটিতে ঘষতে গিয়ে ধুলো উড়ল খানিক।

সাইকেলটা বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে ইন্দ্র দু লাফে ভেতরে ঢুকল—হাতের ফোল্ডিং ব্যাগটা টেবিলের ওপর ছুড়ে দিল সরকারবেলার বাপের সঙ্গে একচোট হয়ে গেল মাইরি—' বলেই ডানহাতের পাঞ্জায় নিজের বাঁ কাঁধে জোর একটা চাপড় কষাল সে, সাধারণত খুব উত্তেজিত হলেই এরকম করে থাকে ইন্দ্র। কেউ কিছু বলল না, নাচ থেমে গেছে মুহূর্তেই; ইন্দ্র ওদের থেকে একটু সিনিয়র; সবাই ওকে সমীহ করে—একমাত্র গোবিন্দ বাদে। গোবিন্দ ওর সমবয়সী—দু-তিন বছর আগে হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করে বসে আছে গোবিন্দ, ইন্দ্র পাশ করতে পারেনি; ওর সঙ্গেই ইন্দ্রর প্রাণের কথা হয়। গোবিন্দ তেমনি চোখ বুজেই বলল 'এ তার এমন কী নতুন কথা। 'না রে, আজকালকার বাপেরা যা হচ্ছে না সব একেবারে সাধু-সন্ত তার শালা দুনিয়ার বাপেরাকী লোক সব যেন চোর-চোট্টা চিটিংবাজ—বলে ইন্দ্র একটা কাঠের চেয়ার হাতে তুলে সকাস করে বোধ করি পড়ল। দোকানের মালিক জীবন স্যান্যাল কাউন্টারের পাশের বসছিল, সেহচর্বিভর্তি ফোলা ফাঁপা চিনির সন্দেশের মত চেহারা মুহূর্তে উধাও হল সে—তোমার কী হইল ইন্দ্রদা? ইন্দ্র দাঁতে দাঁত চাপল তারপর জোরে চেঁচিয়ে উঠল—একটা কড়া চা জলদি জীবনদা।'

নিমু খোকা শ্যামল আমরা তখন ওপো-চাপ বসে কেউ সিগারেট টানছিল, কেউ কাগজ দেখছিল। তাদের ওপরে একবার চোখ বোলাল ইন্দ্র। এদের সামনে ইন্দ্র এস্টাব্লিশমেন্ট নিয়ে থাকে, কারণ শক্তসংঘের সেই

ছেলেকে দেখব, তোর বাড়িঘর জিনিসপত্তর ঠিক ঠিক আগলে রাখব।

নিজের মনের কথা শুনেই চোখ কর-কর করে ওঠে করুণার, মুখটা সামান্য এগিয়ে নিয়ে বলেন—আচ্ছা বুবু, এ-সময়টা অন্ততঃ নিতুর বৌটাকে তো তোদের কাছে এনে কদিন রাখতে পারতিস?

টান মেরে প্যাণ্ট ওপরে তুলে ভেতরে জামা গলিয়ে দেয় বিদ্যুৎ, রুষ্ট মুখে বলে—আমার কী মাথা খারাপ হয়েছে মা, খাল কেটে কুমির আনব? একবার ঘাড়ে চাপলে আর কী...

সহসা ঘাড় ঘুরিয়ে অস্ফুট শব্দে করুণা কী যেন আপনমনে বলে ওঠেন বোঝা যায় না। হয়তো বলেন—'আমাকে তবে নিচ্ছিস কোন্ সাহসে?'

বিদ্যুতের চোখ ঘুরে যায় করুণার মুখে, সে স্তব্ধ হয়ে দেখে। সহসা যেন তার বুকের মধ্যে হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যায় এমন অসাড় লাগে তার শরীর। করুণার মুখের রেখাগুলো কী ভীষণ ভেঙেচুরে বেঁকে যাচ্ছে। মনে হয় যেন সহসা তার শরীরে কেউ ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। রক্তাক্ত আহত মানুষের মুখ কী এমনি হয়? বিদ্যুৎ মূক হয়ে থাকে।

করুণা ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়াল, বিদ্যুৎ উৎকর্ণ হয়ে ওঠে, যেন এক্ষুনি কোন কথা করুণা বলবেন। চলে আসার দিন করুণার এরকম মুখ দেখেছিল বিদ্যুৎ। তবু বিদ্যুৎ আস্তে বলে—কই তৈরি হয়ে নাও মা।

করুণা সুতো আর কুরুশকাঠি সামান্য তুলে দেখান খুব শান্ত গভীর গলায় বলেন—আমাকে এসব শেষ করতে হবে, আমার অনেক কাজ। তুই চলে যা বিদ্যুৎ—

এই প্রথম বুবু নয়, বিদ্যুৎ বলে তাকে ডাকলেন করুণা। অবাক হয়ে বিদ্যুৎ বলে—তুমি কী যাবে না বলছ?

—নারে বুবু, আমি অনেক ভেবে দেখলাম, আমার যাবার উপায় নেই, বৌমাকে বুঝিয়ে বলিস। করুণা আর একটিও কথা বলেন না।

বিদ্যুৎ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। তারপর ক্ষুব্ধ অভিমান-ভরা গলায় বলে—বেশ যেও না। আমি চলে যাচ্ছি তাহলে। বলে বটে কিন্তু সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না, সত্যি করুণা যাবেন না। সে মনে মনে অপেক্ষা করে। আর জুতো পরে মোড়ায় বসে, যেমন করে সকালে সে জুতো খুলেছিল সেই ভঙ্গিতে। তারপর এ্যাটাচি হাতে তুলে নিয়ে সামনে দাঁড়ায়। করুণা হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরেন না। কিছুই বলেন না।

বিদ্যুৎ সহসা উবু হতে যায়, করুণা তার মাথাটা ঠিক তক্ষুনি বুকে জড়িয়ে ধরেন যান্ত্রিকভাবে। কোনরকম আবেগে উচ্ছ্বাসে তার শরীর কেঁপে ওঠে না, কে জানে চোখের গভীরে এখন তার কিছু জলবিন্দু টলছে কিনা। আস্তে বিদ্যুতের কড়ে আংগুলটা মুখে পুরে মৃদু কামড়ে দেন, সন্তানের যাত্রার সময়ে মায়ের এটা মঙ্গল কামনা।

শেষবারের মত বিদ্যুৎ ভরাট গলায় বলে—তাহলে সত্যি তুমি যাবে না, মা?

করুণা নিরুত্তরে মূক হয়ে শুধু দাঁড়িয়ে থাকেন। তক্তপোষের তলায় যেমন ছিল তেমনি, পড়ে থাকল তার দুপুরে গুছানো ছোট সুটকেসটি।

আর কিছুই না বলে বিদ্যুৎ দরজা পার হয়—বারান্দা, তারপর হিমেভেজা পাথুরে উঠোন, তারপর শ্লথ পায়ে বাইরের দরজা পেরিয়ে ঝাপসা হতে থাকে। যতক্ষণ দেখা সম্ভব দেখেন করুণা, তারপর একেবারে ঝাপসা হয়ে যায়—বিদ্যুতের শরীর, চারিদিকের পরিচিত দৃশ্য, দুটি সবুজ শালগাছ দূরের বিস্তীর্ণ প্রান্তর আরো দূরের কালভৈরব পাহাড়, তারও ওপারে গাঢ়তর অন্ধকার জগৎ।

আর তখনি চোখে পড়ে একপাট ভাঙা গেটের কাছে এক ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়ালো।

করুণার টের পেতে অসুবিধা হয় না রুকনী।

ঘরে গাঢ় নির্জনতায় চলে আসেন করুণা, তক্তপোষ থেকে কয়েক কাঠি সুতো তুলে নেন, মেঝেয় বসে অনুমানে ফের বুনে যান, মন যতটা দ্রুত চলে, ঠিক তেমনি দ্রুত।

সময় বয়ে যায়। হঠাৎ অন্ধকার নির্জনতায় চমকে ওঠেন করুণা। পিঠের ওপর কে যেন বহু দূর থেকে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চোখ না ফিরিয়েই সজল চোখে করুণা বলেন—আঃ বাবু, দুষ্টু করে না বাবা।

সমীর রক্ষিত

সেক্রেটারী। ট্রেনারও বটে। প্রায় ছ'ফুটের কাছাকাছি লম্বা ইন্দ্র—আটাত্রিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি, 'শো'য়ের সময় নিমু ওর ঘাড়ের ফোলানো মাসেলে বাড়ি মেরে লোহার বড় বাঁকায়—মাসলম্যান নামেই খ্যাতি ইন্দ্রর। আগে চেল্টুদা থাকতে বিবেকানন্দ ব্যায়াম-গারে ছিল সে, তখন দুবার মিঃ হারকিউলিস' প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছিল কলকাতায় গিয়ে; বছর দুই আগে পাড়ার কাউন্সিলার দীনেশ রায় এ পাড়াতেই আখড়া করে দিয়েছে—শক্তি সংঘ। এজন্য টাকা পয়সা আর তার বাড়ির পাশেই জমিও দিয়েছে।

'আমাদের সময়ে বুঝলেন, ইয়ংম্যানদের এক হাতে থাকত গীতা আরেক হাতে পিস্তল, রেগুলার স্বাস্থ্যচর্চা করত; আর এখন? আজকের ইয়ং জেনারেশন বুঝলেন, হিন্দী সিনেমা দেখে দেখে সব উচ্ছন্নে যাচ্ছে!'—বলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে হাসে দীনেশ রায়। উকিল তুরপ্রসাদ আর মাছের আড়তদার পরাণ বেলদার মাথা নাড়ে—'যাই বলেন, এখন সব গোল্লায় যাচ্ছে।' 'আরে মশাই বললে বিশ্বাস করবেন না, ভাবলে সত্যি আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়. বাংলা-দেশের আজ—দীনেশ রায়ের কথা শেষ হতে পারে না, বিভূতি সর্দার আপাত-উদাস

সচকিত হয়ে উঠল, নিমু বলল, 'হরপ্রসাদ উকিল ইন্দ্রদা, পাঁচ টাকা ধরিয়ে দিয়েছিল আমরা নিইনি'—ইন্দ্রর চক্ষু স্থির, পাঁচ টাকা? ভিক্ষে নাকি? ওকে তো তিরিশ টাকা ধরা হয়েছে। ধরলে কী হবে, ও আবার দীনেশদার হেভী প্যায়ারের লোক—খোকা বলল, 'চাঁদা চাইতে গেলে খালি জ্ঞান দেয়।' ইন্দ্রর মুখটা কঠিন হল, 'আর রুকিণী গাঙ্গুলী, মেডিক্যাল অফিসার, দাগার বাড়ীর চাঁদা?' 'সব ব্যাটা কাঁদুনি গাইছে ইন্দ্রদা—এই ত সেদিন বন্যা হয়ে গেল। কেউ দু-তিন টাকার বেশী দিতে চায় না।' 'বন্যা? সে ত কোন জন্মে হয়ে গেছে'—ইন্দ্র হঠাৎ রেগে উঠল, 'পুজোটা কী ইন্দ্র ভৌমিকের একার? শোন ওসব বন্যা ফন্যা ফালতু বাৎ বুঝলি—' টেবিলে ঘুষি মারে ইন্দ্র, 'যাকে যা ধরা হয়েছে জাস্ট তাই দিতে হবে, ব্যস। যা এক্ষুনি।' ওরা পরস্পরকে বলল, 'চ চ', 'তাহলে আমরা যাই ইন্দ্রদা'—ওরা প্রায় দোকানের বাবাদা অবধি চলে গিয়েছিল, ইন্দ্র চড়া গলায় ডাকল, 'শোন, ভাল ছেলের মত গিয়ে হাত কচলে বললে হবে না।' ইন্দ্র তর্জনী উঁচিয়ে বলল, 'ওসব প্যায়ার ফেয়ার বুঝি না, হবি উকিলকে বলবি—ইন্দ্রদা বলে দিয়েছে, তিরিশ টাকার এক পয়সা কম নেয়া হবে না। যাঃ।' ওরা ঘাড় কাৎ করে 'আচ্ছা' বলে চলে গেল। ইন্দ্র নিজের মনে গজগজ

করল, 'এই ম্যাড়ার পালকে দিয়ে কিসসু হবে না।'

'দীনেশ ব্যাটা জায়গা মত ঠিক প্রেম বিতরণ করে যাচ্ছে, বুঝলি!' ইন্দ্র যেন গোবিন্দকে শোনায়। গোবিন্দ টেবিলের ওপরে দু-হাত রেখে তার মধ্যে মাথা নামিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। হরপ্রসাদ উকিলের ওপর ইন্দ্রর রাগের কারণ সে জানে, দীনেশ রায়ের ইনকাম ট্যাকসের উকিল সে। ইন্দ্রকে অনেকদিন ধরে রেশনের দোকান পাইয়ে দেবে বলেছিল দীনেশ রায়, শেষ পর্যন্ত পেল হরপ্রসাদের ব্যাটা বিমল। এখন আবার টিউবওয়েলের কনট্রাকটরীর কথা বলছে। সাঁই করে ফোলিও ব্যাগের চেন বন্ধ করে ইন্দ্র—কিছু একটা না করলে আর চলছে নারে গবা।' তবু গোবিন্দ নির্বিকার, সাড়া-শব্দ নেই। ইন্দ্র জানে গবাটা ওই রকমই, কাল সারারাত জেগে প্যান্ডেল খাটিয়ে মেজাজ বিগড়ে আছে, এখন কথা বলবে না। কিন্তু বাবার সঙ্গে ঝামেলার কথা ইন্দ্রর ভেতর টগবগ করছে—'বাপটা মাইরি জোর পলিটিকস করছে, বুঝলি?' হুশহাশ করে চা গিলতে লাগল ইন্দ্র—সব ব্যাটার নাড়ী ধরে ফেলেছি, বেকার বলে না, সব শালা মনে মনে ইয়ে করে, কিন্তু সোজাসুজি বলবার মুরোদ নেই কোন ব্যাটার'—গোবিন্দ তেমনি নিরুত্তর। 'আমিও আজ মোক্ষম ঝেড়ে দিয়েছি।' ইন্দ্র সক্রোধে কাপটা ঠাস করে প্লেটের ওপর রাখে।

ইন্দ্রর সঙ্গে তার বাবার ঝগড়া এই প্রথম না, মাঝে মাঝেই হয়। ইন্দ্র বাড়ির বড় ছেলে, তার ওপর বেকার। বাবা সেটলমেন্ট অফিসের কেরাণী, রিটায়ার করবার সময় প্রায় হয়ে এল। বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েই রাতারাতি মাথার টাক বেড়ে গিয়েছে, আরো তো দুটি বাকি, সংসারের বোঝাটা ঘাড়ে চেপে প্রায় কুঁজো করে দিয়েছে তাকে, কাজেই প্রায়ই তার গলার আওয়াজটা কর্কশ হয়ে যায়—'আমার আর কী, দুদিন বাদেই তো চোখ বুজব, তখন দেখা যাবে কার কত দৌড়?'

ওই এক স্বভাব, সোজাসুজি কখনো ঝগড়া করবে না তার বাপ। পাড়ায় তার গোঁয়ার বখাটে তেরিয়া মস্তান বলে নামডাক আছে—ইন্দ্রর সন্দেহ, এই জন্যই তাকে বিশেষ ঘাটায় না। আর উল্টে এমন ভাল করে যেন বাবা হিসাবে একেবারে আদর্শ। দুই কন্যা তিন পুত্র আর স্ত্রীর জন্য ভেবে ভেবে যেন অস্থির। কাউকে কোন কড়া কথাটি পর্যন্ত বলতে পারে না। উপরন্তু, ইন্দ্রর জন্য যেন অগাধ ভালবাসা। অবশ্য আড়ালে নিজের মনে দুবেকবার ভেবে দেখেছে ইন্দ্র, তার জন্য সব ব্যাপারেই বাবার সত্যি একটু বাড়াবাড়ি ভাব আছে। বন্যার বাড়ির একদিকের দেয়াল পড়ে গিয়েছিল, ইন্দ্রর ঘরটাই সবার আগে সারাই হল। বিছানাপত্র ভেসে গিয়েছিল সব, ইন্দ্ররটাই সবার আগে তৈরী হল। আসলে এতে ইন্দ্রর মেজাজটা আরো বিগড়ে যায়। পলিটিকস, কিনা বুঝতে পারে না, স্রেফ শো-ও হতে পারে। কিসসু বিশ্বাস নেই, এখানেও হয়তো সে 'অ্যাসেট'।

কিন্তু এমনিতে বাপকে খুব দাম্ভিক বলে মনে হয়। লম্বা চওড়া দশাসই চেহারা—মাথায় টাক পড়লেও খুব বুড়ো দেখায় না। ভোরে উঠে মর্নিং ওয়াক করতে বেরোয়, ফেবে একেবারে বাজার করে। ইন্দ্র তখনও ঘুমোয়—আটটা সাড়ে আটটার আগে ওঠে না সে। বাবা মুচকি মুচকি হাসে—যেন এসব ব্যাপার তার অনেক দেখা আছে। অনেক দূর অবধি দেখতে পায় যে-মানুষ তার মত নির্বিকার।—আমরা মাঠা কাপড়ের জামা পরে—আট মাইল রোজ পায়ে হেঁটে ইস্কুল করেছি'—বাবার স্বগতোক্তি। বালিশের তলা থেকে ভাঁজ করা টেরিকটের একমাত্র প্যান্টটা বার করতে করতে ইন্দ্র মনে মনে আওড়ায়—'বেশ করেছ লেংটি পরে থেকেছ, তোমরা তখনকার দিনে হিরো ছিলে।' 'তোমাদের দিনকাল আর নেই।'—মা উত্তর দেয়—'আজকালকার ছেলেমেয়েরা একটু ফিটফাট থাকতে ভালবাসে'—মা শেষ করতে পারে না, বাবার গলা, 'থাকুক না, খুব ভাল কথা। তা নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে যত খুশি ফুর্তি করুক।'—সেই মুহূর্তে কানের পাশের রক্ত ঝাঁ করে নড়ে উঠল ইন্দ্রর, তাকেই লক্ষ্য করে তীর ছোঁড়া হয়েছে, কাঁধের পেশী শক্ত হয়ে ওঠে। 'চেষ্টার তো আর ত্রুটি করছে না কেউ'—মায়ের গলা শুনেও ঠিক কিছু আঁচ করা যায় না, মায়ের কোন লাইন—'চাকরী বাকরীর যা বাজার পড়েছে।' 'আসলে কী জানো?' মাকে বাবা রীতিমত জ্ঞান দেয়—আমরা যে কোন সিচুয়েশন ফেস করতে শিখেছি, কোনটাকে ভয় পাইনি। জীবনে আপনা আপনি কিছু হয় না, বুঝলে?'

'যে কোন সিচুয়েশন ফেস করতে শিখেছি'—মুখ বিকৃত করে বাবার কথাগুলো নকল করে ইন্দ্রর শরীরের রক্ত গরম হয়ে যায়। সব তা জানা আছে—দিদির বিয়ের সময় কী হয়েছিল? 'আমি এখন কী করি?'—তখন তো দুহাতে নিজের চুল ওপড়ানো হচ্ছিল। পাত্রপক্ষও তেমনি আটশর একটি পয়সা কম নিল না। শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রকেই ফেস করতে হয়েছিল, বাবাকে নিয়ে সে গেল তখন দীনেশ রায়ের কাছে—'ধার চাই।' 'ধার? আমার কাছে?'—সে ব্যাটাও যেন সামনে ডাকাত দেখে আঁৎকে উঠেছিল। এদিকে পাড়ার অ্যাসেট—ইন্দ্র, গড়ালবাড়ির পৈতৃক জমির ফসল পাহারা দিতে হবে—ইন্দ্র,

দাঁতের ডাক্তাররা বলেন

নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করলে আর মাড়ি মালিশ করলে মাড়ির গোলযোগ ও দাঁতের ক্ষয় রোধ করা যায়

নিয়মিত ফরহ্যান্স টুথপেস্ট ব্যবহার করেন এমন অনেকে অযাচিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে লিখেছেন ঃ

"...আমার স্ত্রী দাঁতের গোলযোগে ভুগছিলেন... টুথপেস্ট বদলে ফরহ্যান্স ব্যবহার করতে শুরু করলেন ..এমন সুফল পেলেন, যে এখন অন্য কারো মাড়ির সেক্টর্শের কথা শুনেই উনি তাঁকে ফরহ্যান্স ব্যবহার করতে জোর করেন। আমার ভাই থিমি ইংল্যাণ্ডে, তিনিও ভারতে তৈরী ফরহ্যান্সের ওই টিউব পাঠানোর জন্যে পীড়াপীড়ি করে লিখেছেন।"

(স্বাঃ) ই. জি. এম. ডি'সুজা
বম্বে

"বাবামশ্রির এক ডেন্টিস্ট...দাঁত আর মাড়ির জন্যে আমাকে ফরহ্যান্স টুথপেস্ট ব্যবহার করতে বললেন। আমি আজন্ম ওঁর উপদেশ পালন করলাম, আর অল্প সময়ের মধ্যেই আমার নিঃশ্বাস আর মাড়ি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো। সেই থেকে আমি ফরহ্যান্স ছাড়া আর কিছু জানি না। আমার সারা পরিবার (আমরা ৯ জন!) ফরহ্যান্স ব্যবহার করি, আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই অভ্যাস আর বিশ্বাস আমাদের পরিবারে পুরুষানুক্রমে চলবে।"

(স্বাঃ) পি. জে. লাজার
চিরালা, অন্ধ্র প্রদেশ

(এই প্রশংসাপত্রের প্রতিলিপি (অরিজিনাল) কোটি ঘাষাসহ এক কোম্পানী লিঃ-এর যেকোনো অফিসে দেখতে পাবেন।)

দাঁতের সঠিক যত্ন নিতে জানুন, আজই আর সকালে আপনার ফরহ্যান্স ব্রাশ আর টুথপেস্ট মালিশ করবার জন্যে ফরহ্যান্স ব্যবহার করুন।

ফরহ্যান্স
দাঁতের ডাক্তারের তৈরী টুথপেস্ট

বিনামূল্যে! দাঁত আর মাড়ির যত্ন সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ বইটি পড়ুন। অনুগ্রহ করে ডাক খরচ বাবদ ২৩ পয়সার ডাকটিকিট সমেত এই ঠিকানায় লিখুন : ফরহ্যান্স ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন, পোস্ট বক্স ১১৯৪৩, বম্বে ৪০০ ৬২০। যে ভাষায় চাই জানাবেন।

PIN CODE FOR FAST MAIL

ফরহ্যান্স, ডিপার্টমেন্ট নং T-45

ইলেকশনের ক্যাম্পেন, তাও ইন্দ্র। শেষমেস 'নেহাৎ ইন্দ্র এসেছে!'—যেন না দিয়ে পার-ছিল না, দু হাজার চাওয়া হয়েছিল, দীনেশ রায় এক হাজার দিল, তাও—'একটা হ্যাণ্ড-নোট লিখে দিন'—মুখে একটা অমায়িক হাসি—'অবশ্য এটা জাস্ট একটা ফরমালিটি আর কি!' তক্ষুনি বুকের মধ্যে একটা মোচড় লেগেছিল ইন্দ্রর—সে সামনে দাঁড়িয়ে সামান্য এক হাজার টাকা দিতে বিশ্বাস পাচ্ছে না দীনেশ রায়!

রাগটা পড়েছিল বাপের ওপর—সারাটা জীবন ধরে করলেটা কী? খালি খালি ভিক্ষুকের মত—।' ভিক্ষুকের মতই চলনচালন, লেংটি-পরা স্বভাব যাবে কোথায়? আজকে লাগলও ওই নিয়ে। বাড়ির আর সবাইকার পুজোর জামা-কাপড় হয়েছে—মায়ের শাড়ি, বোনেদের শাড়ি ব্লাউজ, ছোট ভাইয়ের জামা-প্যান্ট, এমন কী তার জন্যও একটা টেরিকটের প্যান্টের কাপড় এনে দিয়েছে বাবা, ইন্দ্র মহালয়ার দিনই 'বেম্বকোতে বানাতেও দিয়ে এসেছে। কিন্তু বাবা নিজে কিছু নেবে না, একটা ধুতি না একটা জামা না। এদিকে কলার ফাটা একটা জামা পরে ঘুরে বেড়াবে। মা-ও ছাড়বে না; আজ সাতসকালে ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই শুনল তুমুল লেগে গেছে। মায়ের গলা—তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি—পুজোপার্বণের দিনে তোমার গায়ে সাতপুরনো এক জামা আর আমরা সব নতুন শাড়ি, পারি কি করে? খুব পারবে। সব কী 'একসঙ্গে হয়?' 'সবার হল, তোমার বেলাতেই?' —মায়ের গলা বন্ধ হয়ে আসে যেন। বাবার সেই নির্বিকার কণ্ঠস্বর বা এরপরে আরো খরচ আছে না, পুজোর মাসের সওদা?

ঠিক এজন্যই গা জ্বলে যায় ইন্দ্রর—ভিখারীর মত অভ্যাস। আসলে তাকেই দেখানো হচ্ছে—দেখ, আমি কর্তব্য করে যাচ্ছি আর তুমি চব্বিশ বছরের ছেলে!' কিন্তু মুখ খুলে বলার হিম্মৎ নেই। অনেক আগে—সে যখন স্কুলে পড়ত তখন মাঝে মাঝে ঝাজ দেখাত—ওসব ডাম্বেল ঘুরিয়ে জীবন কাটবে না, যখন বুঝবে তখন আর সময় থাকবে না—হ্যাঁ। এখন আর বলে না—বোধহয় ঘোড়া এখন শুয়ে পড়েছে।

হঠাৎ ইন্দ্র চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'এসব আমি কিছু বুঝি না ভেবেছ তোমার একটা জামা কাপড়ে এমন কী এসে যাবে?' বারান্দায় ঘুরে দাঁড়িয়েছিল বাবা, কী এলে যাবে সেটা বোঝার বুদ্ধি তোমার নেই। ইন্দ্র অবাক হয়ে লক্ষ্য করল বাবার গলা আজ চড়া। ইন্দ্রর গলা ততোদিক চড়ে গেল, সে ত নেই-ই তোমার মত পলিটিক্স করি না আমি। যত সব ন্যাকামো।'

'ন্যাকামো?' পলিটিক্স?' চোখ-মুখ লাল করে বাপও তেরিয়া হয়ে ওঠে একবড় একটা সংসার কী করে চলছে—একদিনও খোঁজ নিয়েছ?' সেই মুহূর্তে ইন্দ্র হঠাৎ নিজের উলঙ্গ গলা শুনল 'এত বড় সংসার বানাতে কে বলেছিল?' আর তখন তার বাপও কেমন যেন থতমত খেয়ে গেছে। কিন্তু পরক্ষণেই মুখ বিকৃত করে কেটে পড়েছিল বাবা, অপদার্থ। খোঁজ রাখো কিছু? দীনেশ রায় তার বাকী তিনশ' টাকার জন্য কবে থেকে আমার কপালে চাড়া বসিয়েছে, 'পুজোর মধ্যেই দিতে হবে।' তারপর গলা নেমেও এসেছিল—আমি রাস্তায় বেরতে পারি না—কাউকে মুখ দেখাতে পারি না।' দীনেশ রায়ের কথা উঠতেই হঠাৎ থমকে গিয়েছিল ইন্দ্র—বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠেছিল। 'আমি পুজো অ্যাডভান্স থেকে মেরেকেটে বড় জোর একশ' টাকা দিতে পারি।' —বাপ বলেই যাচ্ছিল কিন্তু আর বলতে দেয়নি ইন্দ্র, চেঁচিয়েছিল, 'আমাকে বলনি কেন?' তোমাকে? তোমাকে বলে হবেটা কী শুনি?' —হঠাৎ যেন এরপর প্রবল ঘৃণায় বাবার বাক্‌রুদ্ধ হয়ে যায়।

'এই শালা—গবা!' —চীৎকার করে ডাকে ইন্দ্র। গোবিন্দ তখনও ঝিমুচ্ছিল। ইন্দ্র বলেই চলেছে—'তারপর শোন রে, আমিও তো বাপ্‌কা ব্যাটা, ছাড়ব কেন! —টুকস্‌ করে পলিটিক্স চালিয়ে দিলাম —বললাম ওসব বুঝি না, আমার প্যান্ট ডেলিভারী নিতে হবে—উনিশ টাকা লাগবে!' —বলেই হো হো করে অহেতুক হেসে উঠল ইন্দ্র, তারপর হাসি কমিয়ে এগিয়ে এসে বলে, 'একবার ভাবলাম বলে ফেলি—আমার জামাও লাগবে।' গোবিন্দ আড়মোড়া ভেঙ্গে হাই তোলার শব্দে 'বেশ করেছ!' —কথাটা মিশিয়ে দিল। ইন্দ্র হঠাৎ গুম্‌ হয়ে বলল, 'সব শালার টাকা জমানো ছোটাচ্ছি।'

সব গর্জনেই যে একরকম। দাদারও ওই এক কেস, সবাইকে দেবে, অথচ নিজে কিছু নেবে না'—দুহাতে চোখ কচলাল গোবিন্দ—'সত্যি বলছি তোকে ইন্দ্র, এই বৃদ্ধ বয়সে বিশ্বাস কর, নতুন জামাপ্যান্ট পরতে লজ্জাই করে।' —পা বাড়াল গোবিন্দ—'চল্‌'। ইন্দ্র গম্ভীর গলায় বলল, 'কোথায় যাবি?' —তারপর মিয়নো নিস্তেজ গলায় নিজেই উত্তর দিল—'চল্‌ শালা, কোথাও কেটে পড়ি।' গোবিন্দ হাসল—'কোথায় যাবি?' 'যেখানে খুশি, নেপাল ভুটান—কিংবা লাটাগুড়ি ফরেস্টে'—'যাহ্‌, লোকে কাওয়ার্ড বলবে।' 'আর এখানে ভোঁস ভোঁস ঘুমুলে লোকে হিরো বলবে তোমাকে?' এ-কথায় বুক ঠুকল গোবিন্দ—'দেখবে গুরু, একদিন এমন কিছু করব না, লোকে পায়ের ধুলো নেবে।' ইন্দ্র মুখ বিকৃত করল, 'লোকে তোমার ইষে করবে।' গোবিন্দ প্যান্টে দু' পকেটে হাত ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, 'সত্যি, মাঝে মাঝে মনে হয় না, অ্যাটম্‌ বোমার মত ফেটে পড়ি।' গোবিন্দর কথাগুলো চোখ ছোট করে যেন মনোযোগ দিয়ে শুনল ইন্দ্র, তারপর তার ভারী পাঞ্জাবি গোবিন্দের কাঁধে হঠাৎ খুব জোর একটা চাপড় মেরে চাপা গলায় বলল, 'চ শালা, আজ একটা কেচ্ছা করব।' গোবিন্দ যন্ত্রণায় ভুরু কুঁচকে আচমকা ইন্দ্রর মুখের দিকে ফিরে তাকাল।

এগারটা বাজতে না বাজতেই বাইরে তপ্ত বোদ্দুর জলহীন বুদ্ধির মত ঝরছে তখন, শরৎ শেষের নির্মেঘ আকাশ। পায়ের তলে ন্যাশনাল হাইওয়ে সোজা উত্তরে শিলিগুড়ির দিকে চলে গেছে, ওরা সাইকেল হাঁটিয়ে সামনে এগুল। ওদের প্যাণ্ডেলে মাইক বাজছে—'তখন দেবী আবির্ভূতা হলেন, মহিষাসুর দ্বারা লাঞ্ছিত দেবগণ সকল দেবতার তেজোরাশি হইতে উৎপন্না সেই দেবীকে দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলেন—।' বড় রাস্তা থেকে ওরা ডানদিকে বাঁক নিল, একটু দূরে প্যাণ্ডেলের সামনে দীনেশ রায়ের অ্যামবাসাডার গাড়িটা জুলজ্বল

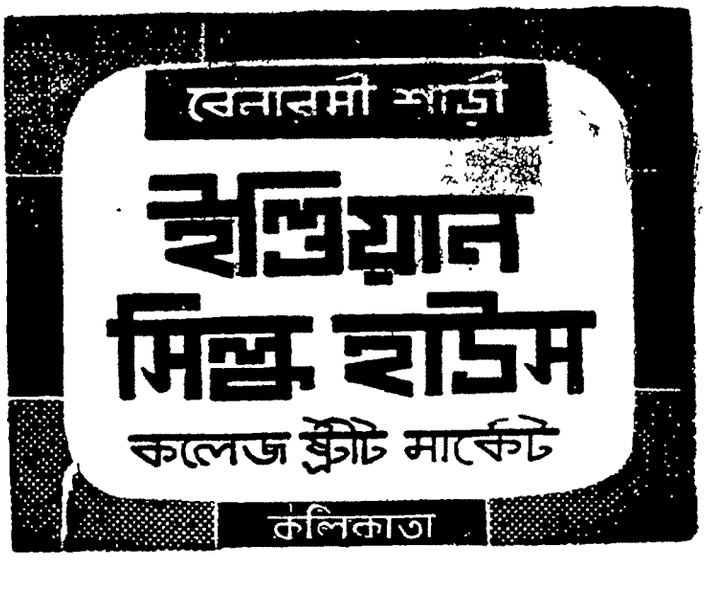

থেকে রোদ্দুর ঝলসে ছুটে আসছে। দীনেশ রায় হাত নেড়ে ফটিককে কী বোঝাচ্ছে। তার পরনে টেরিলিনের ঢোলা হাতা হাঁটু ঝুল পাঞ্জাবী, ফিন্‌ফিনে ধুতি। ইন্দ্র আপন মনে—'টাকার কথা ব্যাটা আমাকে কোনদিন কিচ্ছু বলে না!' —এই জাতীয় কিছু একটা চাপা গলায় উচ্চারণ করল। গোবিন্দ উৎকর্ণ হয়ে উঠে তাকে আড়চোখে দেখল একবার।

'এই যে ইন্দ্র এসে গেছ—প্রতিমা আনার কী করলে?' —দীনেশ রায়ের দুটি সোনায় বাঁধান দাঁত ঝকঝক করে উঠল। 'পূজা বন্ধ করে দিন দীনেশদা।' —ইন্দ্রর গলাটা যেন কীরকম কীরকম শোনাল। একটু যেন হোঁচট খেল দীনেশ রায়—"কেন, কেন ইন্দ্র! সারা বছরের অনুষ্ঠান, পাড়ার ইজ্জৎ'—'ইজ্জৎ না ছাই, কেউ দুতিন টাকার বেশী চাঁদা দিচ্ছে না' —ইন্দ্রর কথা কেড়ে নিয়ে দীনেশ রায় ব্যস্ত হয়ে বলল—'এ কী, অন্যায় কথা বল তো'—অন্যায়ের কী আছে, এই সেদিন বন্যা হয়ে গেল।' ইন্দ্রর ঝাঁঝালো গলা শুনে গোবিন্দ ফিরে তাকাল। আর দীনেশ রায় তাড়াতাড়ি হাসি টেনে বলে উঠল, 'কেন, বন্যার পরে রিলিফ তো দিয়েছি।' মুহূর্তে ইন্দ্রর মুখটা কঠিন হয়ে উঠল, যেন নিজের গাটগচ্চা দিয়ে রিলিফ দিয়েছে, তার একবার চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে হল, 'চাল আর কম্বলের অর্ধেকটা তো নিজে ঝেড়ে দিয়েছে।' কিন্তু সেই মুহূর্তে টিউবওয়েলের কন্ট্রাক্টরীর কথাটা মনে হল তার। আর ইন্দ্র চেপে চেপে বলল, 'ওসব বুঝি না, পূজা যদি করতে চান, তাহলে একশ' টাকা না—' একটু থামল ইন্দ্র, তারপর বলল, 'আপনাকে পাঁচশ টাকা চাঁদা দিতে হবে দীনেশদা।' তার গলাটা কাঠ কাঠ তেবিয়া শোনাল। দীনেশ রায় ব্যস্ত হয়ে উঠল, হঠাৎ কী বলছ ইন্দ্র, বললে বিশ্বাস করবে না, শুধু কাপড়চোপড় কিনতেই আমার হাজার দেড়েক টাকা বেরিয়ে গেছে। ওই যে তসর, পিওর সিল্ক, না কী কী সব বেরিয়েছে তোমাদের, আমার মেয়েরা তো —হঠাৎ তাকে থামিয়ে দিয়ে ইন্দ্র উত্তপ্ত একরোখা গলায় বলে উঠল, 'আপনাকে ওই পাঁচশই দিতে হবে।' দীনেশ রায় হতভম্বের মত গলা খাঁকারী দিল, বললে বিশ্বাস করবে না ইন্দ্র আমার যা অবস্থা। চা-বাগানে এই সেদিন এতবড় একটা স্ট্রাইক হয়ে গেল কত ডিভিডেন্ড পাব জানি না, তার ওপর গড়ালবাড়ির জমি থেকে ফসল তুলতে পারব কিনা তারই বা—' এবারও আমাদের পাঠাবেন তো?' প্রায় বলে ফেলেছিল ইন্দ্র। গোবিন্দ তার জামায় টান মারল হঠাৎ। আর ঠিক তখনই নিমু খোকা শ্যামলরা এসে পড়েছে—'হরি উকিল পাঁচ টাকার বেশী দেবে না ইন্দ্রদা।' হঠাৎ ইন্দ্র গর্জন করে উঠল, 'বলেছিলি ইন্দ্রদা বলে দিয়েছে?' ওরা থতমত খেয়ে গেল, 'বলেছিলাম। তা বলল, দীনেশবাবুকে আমি বলেছি'—ইন্দ্রর চোখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে, তার ঠোঁট কাঁপছে, সে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল গোবিন্দ হঠাৎ পেছন থেকে [illegible] চেপে ধরল—'ইন্দ্র, তোকে ডাকছে। সেই মুহূর্তে মুখ ফেরাল ইন্দ্র, দেখল হাই-ওয়ের ওপরে একটা সাইকেল রিকসা দাঁড়িয়ে আছে। গোবিন্দ বলল—'তোর বাবা।' তখন কোথায় যেন গুড়গুড় করে ঢাক বাজছিল।

সাইকেল হাঁটিয়ে ইন্দ্র এগিয়ে গেল, পেছনে সন্তর্পণে গোবিন্দ। বিকাশ সত্যি তার বাবা বসে, পায়ের কাছে রিকসা ভর্তি ব্যাগবস্তা, খাঁকি ঠোঙ্গা, ওপরে কিছু নারকেল উপচে পড়ছে। ইন্দ্রর বাবা ভরাট গলায় ডাকল—'শোনো।' এমনি সময়ে তুই বলে, রেগে থাকলে তুমি। ভুরু কুঁচকে ইন্দ্র এগিয়ে গেল, তার বাবা পকেট থেকে টাকা বের করে এগিয়ে ধরল—'এই নাও উনিশ টাকা—এবেলাই প্যান্টটা ডেলিভারী নিয়ে নিও', রিকসার হুডের ছায়ায় বাবার মুখটা ঘামে চকচক করছে, কলার ফাটা জামাটা শরীরের সঙ্গে লেপ্টে গেছে কোথাও কোথাও। ইন্দ্র চোখের দিকে তাকাতে পারল না, টাকাটা হাতে নিয়ে কিছু একটা বলতে ভাবল, কিন্তু ততক্ষণে তার বাবা রিকসা-ওলাকে 'চলো' বলতেই, চেনের কর্ কর্ আওয়াজ তুলে রিকসা এগিয়ে চলে গেল। ইন্দ্র হাবার মত দাঁড়িয়ে রইল।

আর ঠিক সে মুহূর্তেই,—কে বলে তার স্মৃতিশক্তি খারাপ, সেই সাতপুরনো আধখ্যাচড়া দৃশ্যটা তার মনের মধ্যে ভেসে চলে গেল। এরকম মাঝেমধ্যেই হয় তার, বাবার সঙ্গে খটাখটি হলে। সেই কবে ছোট-বেলায়, তখন সবে শীতকাল শেষ হয়ে যাচ্ছে—সম্ভবতঃ দোলের সময়, সে সমবয়সীদের সঙ্গে দাগাব বাড়ির পেছনে বিশ্বাসদের বরলা নদীর লাগোয়া বিলে জল সেঁচে মাছ ধরছিল, হাঁটু পাঁকে কাদা মাখামাখি। বিকেল হয়ে এসেছে। হঠাৎ পেছন থেকে বাবার ডাক শুনেছিল সে, ফিরে তাকিয়ে দেখেছিল উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে তার বাবা, হাতে কী একটা। অনেকদিন ধরে একটা 'ধুতি' 'ধুতি' করছিল সে। দৌড়ে এক ছুটে বাবার কাছে যেতেই অবাক হয়ে গিয়েছিল সে—বাবার হাতে নতুন একটা কোরা ধুতি অদ্ভুত গন্ধ। তখনই তার হাতে পায়ের কাদা ধুইয়ে কোমরে শক্ত গিট বেঁধে ধুতিটা বাবা পরিয়ে দিয়েছিল তাকে, আর হেসে শুধু বলেছিল, কি, কেমন!' ব্যস্—এইটুকু অদ্ভুত গন্ধমধু পুরনো আধখ্যাচড়া বিবর্ণ দৃশ্যটা মাঝে মাঝেই তার মনের ভেতরের ফুটোফাটা দেয়ালগুলো ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়ে ভুস্ করে ভেসে ওঠে। আর তখনই তার মেজাজ মুচড়ে দুমড়ে একধারে বিগড়ে যায়।

'এই যে, কী শালা ন্যাকার মত দাঁড়িয়ে আছিস। গোবিন্দ ইন্দ্রর পিঠে খোঁচা মারল, ইন্দ্র যেন অথৈ জল থেকে হঠাৎ ভেসে উঠল—'বুঝলি গবা'—তার গলা ফ্যাসফ্যাসে—রুক্ষ, সব শালা না, আমাদের পেছনে লেগেছে। বাপটা কীরকম রেলা দিল দেখলি?' তারপর কী ভেবে একটু ইতস্তত করে ইন্দ্র সাইকেলের সিটের সামনে বড় দেখিয়ে গোবিন্দকে বলল, 'ওঠ'। জিজ্ঞাসু চোখ গোবিন্দর 'কোথায় [illegible]?' [illegible] [illegible]—জোরে

ধমক দিল ইন্দ্র তারপর এক পা প্যাডেলে রেখে একটা কর্কশরুক্ষ কঠিন চীৎকারে ইন্দ্র ডাকল—'নিমু।' গোবিন্দর হঠাৎ ভয় লাগল। প্যাডেলের দিক থেকে নিমু জোর কদমে এগুল। ইন্দ্র তেমনি চেঁচিয়েই বলল, 'নিমু' দুপুরে ডিউজবলগুলো রোদ্দুরে দিবি তো'। নিমু জানে ডিউজবল মানে হাতবোমা। ওগুলো তাদের বাড়ির পেছনটাতেই তারা তৈরী করে। সে সম্মতি-সূচক মাথা ঝাঁকাল। ইন্দ্র সাইকেলে উঠে পড়ল। তার মুখটা লাল হয়ে উঠেছে, শরীর শক্ত, এরপর ইন্দ্রর বাজখাই গলা শোনা গেল—'আজ রাত্রে, সব শালাকে দেখে নেব।' দু'হাতে হ্যাণ্ডেল চেপে ধরলে গোবিন্দ। পেছন থেকে তখন শ্যামল কিংবা ভানু কিংবা ফটিক ইন্দ্রকে ডাকল—তোমাকে ডাকছে ইন্দ্রদা—।'

কিন্তু ততক্ষণে ইন্দ্রর সাইকেল যোগমায়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডার ছাড়িয়ে বেগুনটারির মোড়ে এসে পড়েছে। সাঁ করে বাঁদিকে মোড় নিয়ে সাইকেল বাজারের দিকের রাস্তায় ছুটল। ইন্দ্রর মেজাজ বিগড়ে গেছে, গোবিন্দ উত্তেজনায় উসখুস করছিল, তার দুপাশে ইন্দ্রর দুহাত সাঁড়াশীর মত হ্যাণ্ডেল চেপে আছে। জোর পায়ে প্যাডেল ঘোরাচ্ছে সে। ইন্দ্রর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুততর হচ্ছে। গোবিন্দ ভয়ে ভয়ে বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস রে ইন্দ্র?' ইন্দ্র কোন উত্তর দিল না, দুপাশে হাওয়া কেটে কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে গর্তে পড়তে পড়তেই সাইকেল লাফিয়ে উঠছে। গোবিন্দ ছটফট করছে, সে এবার মৃদু শব্দ করে হেসে বলল, 'মাল টানবি? শালা যা জমবে না?' উৎকর্ণ গোবিন্দর কণ্ঠস্বরে রীতিমত পুলক। ইন্দ্র যেন শুনতেই পায়নি, যেন অনেকদূরে থেকে সে উদাস গলায় বলল,—ব্যায়াম করে করে না, শালা বুকটাকে শক্ত করে ফেলেছি। গোবিন্দ এরকম উত্তর আশা করেনি। সে কিছু বুঝতে পারল না—'বেমকোতে তোর প্যান্ট ডেলিভারী নিতে যাবি?' এবারও ইন্দ্র নিরুত্তর; গোবিন্দ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। ইন্দ্রর তপ্ত নিশ্বাস গোবিন্দর কানের পিঠে এসে লাগছে তার দু'হাতের পেশী ফুলছে। সাইকেল সোনাউল্লার বাঁড়ি ছাড়িয়ে অন্নপূর্ণা হোটেল পেরিয়ে বাজারের মুখটাতে ফার্মেসী ব্রডওয়ের বাঁদিকে চাপা অন্ধকার গলিটাতে মোড় নিতেই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল গোবিন্দ, 'এই শালা, এদিকে কোথায় যাচ্ছিস?' জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে, ইন্দ্রর গলা ঘ্যাস্‌ঘ্যাসে—'বাজারের ভেতরে।' গোবিন্দর গলা কাঁপে, কেন?' 'জামা কিনব।' ইন্দ্রর কাটা কাটা উত্তর। 'জামা?'—বিস্মিত গোবিন্দ মুখ ঘোরাতে চেষ্টা করে। ইন্দ্রর গলা কঠিন—'হ্যাঁ'—তারপর দম টেনে নেয় ইন্দ্র আর যেন গলা সাফ করার জন্য গলা-খাঁকারী দেয় তারপর খুব আস্তে যেন গোপনে বলে সে, 'বাপটার জন্য একটা জামা কিনব রে।' গোবিন্দ অবাক।

এইটুকু পথ এবড়োখেবড়ো—খোয়া আর পাথর ছড়ানো, সাইকেলই লাফাতে লাফাতে দুই সমানে এগুতে থাকল।

কথায় কথায়

ছাগল

বড় বড় লেখকেরা যাঁরা জনপ্রিয়তার তুঙ্গে তাঁরা তাঁদের পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে কত রকম চিঠি পান। প্রতিদিন তাঁদের সিন্দুক প্রমাণ ডাক-বাকস ভরে যায় নীল গোলাপি সাদা ভারি-ভারি খামে তাঁদের অনুরাগী-অনুরাগিণীরা কত কথা লেখে, কত অনুরোধ, বই-ফটো-চকোলেট-ফুল কত কি উপহার আসে।

সব শুনি সব জানতে পারি। কিন্তু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া আমার কিছু করার নেই। আমার কোনো পাঠক নেই আমার পাঠিকারা এখনও জন্মায় নি। তাদের মা-বাবারা এখন নার্সারিতে পড়ে। আর দুই একজন যদি কোথাও কখনো থেকেও থাকে তারা থাকে ডাকঘর বর্জিত দেশে সে সব জায়গায় খাম পোস্টকার্ড কিছু পাওয়া যায় না। কোনোদিন কেউ লেখে না তারাপদ-বাবু আপনার লেখা পড়ে কি হলো জানেন কাল রাতে...'

এই শোচনীয় দুরবস্থার মধ্যে হঠাৎ সেদিন একটা চিঠি পেলাম আমার জীবনের প্রথম ও একমাত্র পাঠকপ্রেরিত চিঠি। চিঠিটি অবশ্য একটু রহস্যময় এবং পত্র লেখক সত্যি আমার অনুরাগী কিনা বোঝা কঠিন। চিঠিটির বয়ান এই রকম—

সবিনয় নিবেদন

আপনি কুকুর বিড়াল চোর-জোচ্চোর অনেক কিছু লইয়া অনেক কিছু রচনা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অবশ্যই আমাদের কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু একটা কথা মনে আসিতেছে যদি অভয় প্রদান করেন তো বলি। আপনি কখনো ছাগল লইয়া কিছু লেখেন না। গরু লইয়া ভেড়া লইয়া পর্যন্ত কতবিধ উল্টা-পাল্টা রচনা করিয়া ফেলিয়াছেন কিন্তু ছাগলদের প্রতি আপনার এই বিরাগ কেন? হতভাগ্য ছাগল সমাজের করুণ ব্যা-ব্যা ধ্বনি আপনার কর্ণকুহরে কি কিছুতেই প্রবেশ করিবে না?

ইতি—

বিনীত জগদম্বাপ্রসাদ দাস

পুঃ নাকি আত্মজীবনী রচনায় আপনার স্বভাবগত অনীহাই আপনাকে ছাগল বিষয়ে আলোচনা হইতে বিরত রাখিয়াছে?

সম্ভবত ঐ জগদম্বাপ্রসাদ দাস নামটি ছদ্মনাম। এমনও হতে পারে কোনো সম্পাদকীয় দপ্তর থেকেই এই চিঠিটি আমাকে পাঠানো হয়েছে আমি কি জাতের সেটা সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্যে এবং ঐ শেষ লাইন পুনশ্চ অবশ্যই মানহানিজনক।

কিন্তু আমি অনুপায়। চিঠিতে জগদম্বা প্রসাদের কোনো ঠিকানা নেই। হাতের লেখা হয়তো একটু চেনা-চেনা কিন্তু তার উপরে কাল্পনিক আস্থা করে কোনো ক্ষমতাশালী লোকের সঙ্গে কলহে নামা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

বরং যে গুরুদায়িত্ব ঐ জগদম্বাপ্রসাদ নামীয় অথবা ছদ্মনামীয় মহাত্মা আমার এই সামান্য স্কন্ধে অর্পণ করেছেন আমি সেটাই যথাসাধ্য পালন করার চেষ্টা করি।

কিন্তু সত্যিই আমার ছাগল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা নেই। সেই কবে দাঁড়াতে শেখার বয়েসে পিতামহী আমাকে কিছুদিন শক্ত সমর্থ করে তৈরি করার জন্যে নিয়ম করে ছাগলের দুধ খাইয়েছিলেন এছাড়া ছাগল সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অতি সামান্য। তাছাড়া সেই ছাগদুগ্ধ পানের মধুর স্মৃতিও আমার এ বয়েসে আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। সবচেয়ে বড়কথা ঐ মধুর স্মৃতিও আমার এ বয়েসে আর বিশেষ করে যতবারই পুনশ্চের পংক্তিটি পড়ছি আমার সামান্য বুদ্ধিতে মনে হচ্ছে রচনাটা ঠিক সোজাসুজি ছাগল বিষয়ে হলে জগদম্বাপ্রসাদের পছন্দসই হবে না এতে আমার মতো ছাগল সদৃশ মনুষ্যদের সম্পর্কে কটাক্ষ থাকা চাই।

সবাই জানেন কোনো বিদ্যায়ই এমন কি কটাক্ষপাত বিদ্যায় পর্যন্ত আমার কোনো পারদর্শিতা নেই। বাধ্য হয়ে অভিধানের শরণাপন্ন হলাম। প্রথমেই একটা প্রামান্য অভিধানে পেলাম ছাগল মানে ছাগ। চমৎকার ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কার বোঝা গেলো অবশ্য এর পরে কমা দিয়ে লেখা আছে অজ পাঠা। পাঠ করে আরো চমৎকৃত হলাম ছাগল মানে পাঁঠা এটা সবসময়েই জানতাম কিন্তু অভিধানে পাবো এটা আশা করিনি। তার চেয়েও বহুকথা বহু অভিধানেই একথা স্পষ্ট করে বলা আছে যে ছাগল পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রী-লিঙ্গ হবে ছাগলী। এর পরে আমি একটু শান্ত হয়ে ভাবতে বসলাম ভেবে দেখলাম আমরা যখন বলি ছাগলের দুধ খাচ্ছি তখন প্রকৃতই ভুল বলি। এবং রামছাগল বলতে যে দুগ্ধদায়িনী ঘন্টা-লম্বিত বিরাট দাড়িওয়ালা জীবটির ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে অভিধানিক অর্থে সেটা একেবারেই উচিত নয় কারণ রামছাগল হলো এক জাতের বড় ধরণের পাঁঠা।

এর পরে আরেকটু নিচে চোখ নামাতেই চোখ পড়ে ছাগলাদ্য শব্দটির উপর এবং সঙ্গে সঙ্গে চমকিয়ে উঠি। বহুকাল পরে এই শব্দটির সঙ্গে অনেকের মতই আমি পরিচিত। জিনিসটি কি স্পষ্ট জানি না কিন্তু আয়ুর্বেদীয় ওষুধের বিজ্ঞাপন এবং কবিরাজি দোকানের সাইন বোর্ডে ছাগলাদ্য-ঘৃত শব্দটি সহস্রবার দেখেছি। আজ জানলাম এর সঙ্গে আমাদের চেনা ছাগলের সম্পর্ক অতি ক্ষীণ পাঁঠারও খুব সম্পর্ক নেই ছাগলাদ্য ঘৃত মানে হলো খাসির চর্বি দিয়ে তৈরি একরকম ওষুধ এবং এটা কোনো মতেই ছাগলের দুধের ঘি নয়।

এই পর্যন্ত লেখার পরে হঠাৎ একটা পুরনো গ্রাম্য কথা আমার মনে পড়লো ছাগলের বাচ্চা হয় তিনটে তার দুটো দুধ খায় আর একটা লাফিয়ে বড় হয়। তিনটে কেন চারটে-পাঁচটা বাচ্চাও ছাগলের কিন্তু ছাগলের মায়ের দুধ মাত্র দুটো। প্রকৃতিতে এরকমটি আর কোথাও নেই। গরুর একটা বাচ্চা হয় দুধ চারটে কুকুর বিড়ালের বাচ্চা ছয়-সাতটা পর্যন্ত হতে পারে কিন্তু তাদের মায়ের দুধের সংখ্যা আট। বাঘ সিংহ মানুষ মানুষ সব স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে যে নিয়ম চলছে সে নিয়ম ছাগলের বেলায় নেই আশ্চর্য।

আরো আশ্চর্য কোনো অভিধানেই ছাগলে কি না খায় পাগলে কি না খায় এই প্রবাদ বাক্যটি খুঁজে পেলাম না এমনকি প্রবাদের অভিধানেও না।

তারাপদ রায়

প্রশিক্ষণ
আধুনিক চাষের দিশারী

ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

শ্যামল ব্যানার্জি

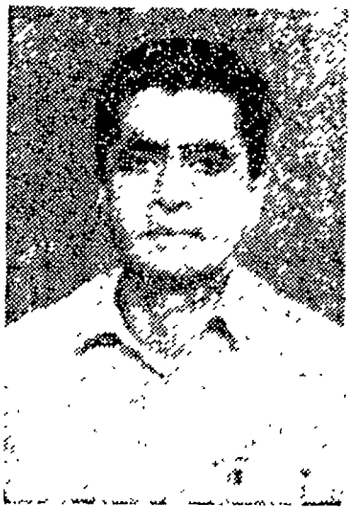

যদি কোন রবিবার বা অন্যান্য ছুটির দিনে ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার পূর্বাঞ্চলের জোনাল ম্যানেজার শ্রীশ্যামল ব্যানার্জিকে শহর থেকে ৭০।৮০ মাইল দূরের কোন গ্রামের গাছের তলায় বসে সাধারণ চাষীদের সঙ্গে চাষাড়ুষো ভাষায় কথা বলতে দেখেন, তবে অবাক হবার কিছু নেই। প্রতিষ্ঠানের তরফে কর্তব্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের মিশে যাওয়া, মিলে যাওয়ার ব্যাপারটা তাঁর অন্যতম প্রধান হবি।

সাধারণ পোশাক-পরা শ্যামলবাবুকে গ্রামের চাষীরা তাঁদের মুখ্য মুখ্য ভাষায় কষ্টের কথা, সমস্যার কথা বলছেন। এরকম ঘটনা চোখে পড়লেই ভাববেন, সার প্রয়োগের ব্যাপারে তাঁর প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক প্রচার-পদ্ধতি চালানো সত্ত্বেও গ্রামের চাষী আজও পর্যন্ত ক্ষেতে সার ব্যবহার করে কিনা, সার চেনে কিনা, সার প্রয়োগের ফল ফল কি হলো ইত্যাদি ব্যাপারগুলো সম্পর্কে সরেজমিনে নিজে খোঁজ নিতে এসেছেন।

দেশের কৃষি উন্নতিতে ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার দায়িত্ব অনেক। তাই তাকে আরো ছড়িয়ে পড়তে হবে। ছড়িয়ে পড়তে হবে ভারতের গ্রামাঞ্চলে, প্রতিটি গ্রামে। শহরে তার কাজ নয়। সুতরাং নানা প্রতিষ্ঠান সেরে শেষে এমন এক প্রতিষ্ঠানের মুখোমুখি হলাম আমি, যার প্রচার অভিযানের সবটাই গ্রাম-কেন্দ্রিক। গ্রামে গ্রামে গিয়ে চাষীদের সার ব্যবহারের প্রচার অভিযানে শরিক করার দায়িত্ব যাঁদের।

এতে আমার ভালোই হলো। এই প্রতিষ্ঠানকে ঘিরেই রুরাল-পুরবলিসিটি সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে অনেক কিছু জানা যাবে। সেই আশা নিয়েই প্রতিষ্ঠানের জোনাল ম্যানেজারের মুখোমুখি আমি।

শ্রীব্যানার্জি মুখ খুললেন—সত্যি কথা বলতে গেলে, এখনও পর্যন্ত শতকরা মাত্র ২০ থেকে ২৫ ভাগ চাষী সার ব্যবহার করে। অথচ মাত্র আগামী তিন বছরের মধ্যেই আমাকে শতকরা ৭৫ ভাগ চাষীর কাছে পৌঁছতে হবে। এটা এক বিরাট দায়িত্ব। কারণটা আপনাকে একটু উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই, তাহলে আপনার সুবিধে হবে। যেমন ধরুন—নিউট্রেট আমার প্রতিষ্ঠানের তৈরি একটি অন্যতম সার। বর্তমানে প্রতি বছর এই সারের উৎপাদন দেড় লক্ষ টন। আমি কিন্তু এখনে শুধুমাত্র পূর্বাঞ্চলের কথাই বলছি। কারণ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা, বিহারই আমার এলাকা। আগামী তিন বছরে কারখানাগুলো এই সারের উৎপাদন আরো বেশী দেবে, এটা আমি জানি। তখন সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়াবে—৬ লক্ষ টনে। সুতরাং দ্রুত উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও তো বিক্রির ব্যাপারে খুব দ্রুত হাতে এগোতে হবে। অতএব বিক্রির ব্যাপারে ব্যাপক প্রচারও চালাতে হবে।

—তা আপনার এই প্রচারাভিযানের মাধ্যমে চাষীদের মধ্যে বিশ্বাস জন্মাতে পারবেন বলে মনে করেন?

—চাষীরা কতটা নেবে, কি না নেবে, বলতে পারি না। কারণ, এদের মনস্তত্ত্বের মধ্যে অনেক মজার ব্যাপার আছে। এটা তো

ঠিক যে আমরা এখনও 'প্রকৃতির দাস'। তাই পরীক্ষার দ্বারা দেখেছি, একবার যদি খরা বা বন্যায় ফসল নষ্ট হয়, চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে এই সব চাষী-মানুষ প্রচণ্ড ভেঙ্গে পড়ে। এরা সেট্-ব্যাক করে। আর সার ব্যবহার করতে চায় না।

—গ্রামাঞ্চলে প্রচারাভিযানের কোন কোন্ মাধ্যমগুলো বেছেছেন? কিভাবে কাজ চালাচ্ছেন?

আমার প্রশ্নের উত্তরে শ্যামলবাবু বললেন—মাধ্যম তো অনেকই নিয়েছি, তবে আমার বিষয়টা যেহেতু প্র্যাকটিক্যাল এবং দেশের কৃষি অগ্রগতি যাদের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ সেই লেখাপড়া না-জানা চাষীদের নিয়েই আমার কাজ-কারবার, তখন বেশ গভীর প্রচার কৌশলেই আমাদের যেতে হয়েছে। এবং সেই গভীর প্রসঙ্গ দিয়েই শুরু করা যাক। প্রথমেই আমরা বেছে নিয়েছি—টেকনিক্যাল পাবলিসিটি। অর্থাৎ আমরা অনেক গ্রামেই 'ডেমনস্ট্রেশন প্লট' করেছি। এ রকম প্লটের সংখ্যা কয়েক হাজার। সেখানে আমাদের নিজস্ব দক্ষ ডেমনস্ট্রেটর আছেন। আমাদের নিজস্ব সেই সব জমিতে সার প্রয়োগের মাধ্যমে চাষ করে আমরা চাষীদের দেখাই এবং বলি—দ্যাখো, ঠিকভাবে সার প্রয়োগে এইভাবে চাষ করতে কত ভাল ফল পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, ইনটেনসিভ 'গ্রুপ-ডিসকাশন' পদ্ধতিতে প্রয়োগ করেছি। যেমন ধরুন, আগে থেকে স্থির করা হল যে অমুক দিনে আমরা ঐ ব্লকে একটা সভার আয়োজন করে স্থানীয় চাষীদের সঙ্গে মিলিত হবো। পরিকল্পনা অনুযায়ী সেখানকার বি ডি ও এবং অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা সেরে স্থানীয় কোন স্কুলে বা সামিয়ানা খাটিয়ে তৈরি করে সভা ডাকা হলো। পাঁচ টাকা মজুরির বিনিময়ে গ্রামে গ্রামে সাইকেল রিকসায় করে হর্ন দিয়ে ভেঁপু দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হলো—ওরে আজ অমুক জায়গায় মেলা আছেরে, মেলা আছে। সঙ্গে সঙ্গে হ্যান্ডবিল ছড়ানো হলো। অনুষ্ঠানে সবাই জড়ো হলেন, চাষীরা, তাদের বউ এমন কি বাচ্চাগুলো পর্যন্ত। আমরা কিছুই বলবো না সেখানে। শুধু শুনবো। তাই চাষীদেরই অনুরোধ করা হোল বলে যেতে। একের পর এক চাষী বলে যেতে লাগলেন তাঁদের সমস্যার কথা, অসুবিধার কথা। আমরা নোট করলাম। সবশেষে আলোচনার ভঙ্গিতে (উপদেশের ভঙ্গিতে নয়) সমস্যা সমাধানের কথা বললাম। বললাম—সার প্রয়োগের কথা।

এ ছাড়াও মেলা হয়। সেই মেলাগুলোতে আমরা স্টল খুলি, ছবির মাধ্যমে চাষীদের বোঝাই। আমাদের নিজস্ব ফিল্ম আছে। সেই সব মেলা প্রদর্শনীগুলোতে আমরা চাষাবাদ সম্পর্কে ফিল্ম দেখাই। গ্রামে হাটের কাছে বা স্টেশনের কাছের (অর্থাৎ যেখানে জনসমাগম হয়) জায়গাতে দেওয়ালে ওয়াল-পেইন্টিং করি, হোর্ডিং দিই।

—এই ধরনের বিজ্ঞাপনে বয়ান কি ধরনের হয়?

—একটু ধর্মীয় বেস রাখি। এছাড়া স্থানীয় পত্রপত্রিকাগুলোতে ব্যাপক হারে বিজ্ঞাপন দিই। এই শহর থেকে প্রকাশিত বড় বড় বাংলা বা ইংরেজী পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বিশেষ দিই না। তাতে কস্ট-বেনিফিট কিছুই হয় না আমাদের। গ্রামের পত্রিকাতে দিই

—সব মিলিয়ে বছরে বাজেট কত?

—২৫ লক্ষ টাকারও বেশী।

—জনসংযোগের কাজও নিশ্চয়ই করতে হয়?

—অবশ্যই। গ্রামাঞ্চলের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেই হবে। সরকারী অফিসাররা তো আছেনই, গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত প্রধানের বা চৌকিদার বা মুখিয়া পরিষদের নেতা শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখলে আমরা কখনো কোন গ্রামে এফেকটিভলি পৌঁছতেই পারবো না।

আনন্দ রায়

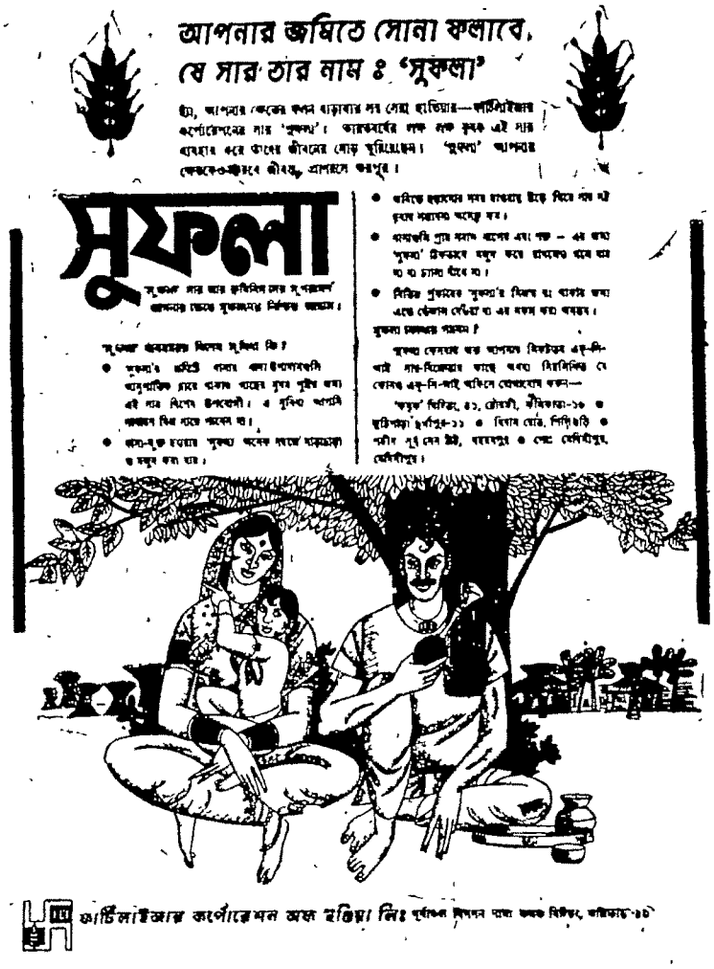

বিজ্ঞাপন বিচিত্রা

হাতে হাত রেখে ॥ স্নেহাকর ভট্টাচার্য

হাতে হাত রেখে তোমার দু চোখ পুজোর আকাশ হলে
বাম বাহুতে কেঁপে উঠেছিল শেফালির নত শাখা,
মেঘ আমাদের দিয়েছিল তার রত্নসিংহাসন—
সকলই স্বপ্ন, ভালো মনে নেই, মাধুর্য বুকে আছে।
ঋতু বদলায়। শুধু আজও অন্তরে
খুব ভোরবেলা স্মৃতি ও শেফালি ঝরে।

নতুন শিশির ঘাসের মতোন মাথা পেতে নিয়ে আমি
ভেবেছি পূর্ণ হবে এইবার জীবনের যত ক্ষয়,
নিরাময় হবে সকল অসুখ নশ্বরতার ব্যথা—
কিবা লাভ জেনে প্রেম যদি আসে কপালে দুঃখ থাকে!
ঋতু বদলায়। শুধু আজও অন্তরে
খুব ভোরবেলা স্মৃতি ও শেফালি ঝরে।

তুমি এনেছিলে আকাশ। আমিও উজ্জ্বল থোকা থোকা
তারার আঙুর নিংড়ে গোপনে স্বর্গের সোমরস
তৈরি করেছি। উৎসব কবে ভেঙে গেছে তবু জ্বলে
বুকে ও গলায় নক্ষত্রের নীল আগুনের দাহ!
ঋতু বদলায়। শুধু আজও অন্তরে
খুব ভোরবেলা স্মৃতি ও শেফালি ঝরে।

এক জীবনের ভালোবাসাবাসি শেষ হয়ে এলো তবে।
কেউ আর কাছে আসবে না, ভালোবাসবে না, বুক কাঁপে—
একটি হৃদয় আমাকে সময় দিল না, পাপী ও প্রেত
হতে দিল। তুলে রেখে দিল তার আকাশের বেনারসী।
ঋতু বদলায়। শুধু আজও অন্তরে
শিশিরের বিষ, স্মৃতি ও শেফালি ঝরে।

একি খেলা, একি ভালোবাসা ॥

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

দেখা না হলেও ঠিক একই কথা প্রচ্ছন্ন ভাষায়
একই পাণ্ডুলিপি বার বার একই কথা
যে রঙ যে ছলে তুলে ধরো
একই মুখ প্রচ্ছন্ন ভাষায় আঁকা হয়ে যায়

দেখা না হলেও ঠিক একই তীর নিক্ষেপ করেছ
তুমি যে কোন কৌতুকে

দেখা না হলেও ক্ষত এখনো মুখর
সূর্যের গুড়োষ মেঘ শেষ মেঘ যখন রক্তাক্ত হয়
সেই মুখ শৈশবের দেবালয় ভেঙে
ছুটে আসে ছুঁয়ে যায়
একি খেলা একি ভালোবাসা!

যা কিছু ঘটছে ঘটতে দাও ॥

অরুন্ধতী সেনগুপ্ত

যা কিছু ঘটছে ঘটতে দাও
উত্তরে যাবার সময় হলে
খুব সহজেই কেটে যাবে সময়
পেরিয়ে যাবে যোজন ব্যাপী রাস্তা
এক মুহূর্তে
ইচ্ছা অনিচ্ছার সূত্র গুলো
ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে
উত্তরে দক্ষিনে।
লক্ষ চোখ দেখবে এক বিন্দুতে
এক সারিতে দাঁড়িয়ে যাবে
বৃক্ষের মত, শান্তি পথের দু ধারে।
নিঃশ্বাসে ক্লান্তি সবে গিয়ে
বইতে শুরু করবে উত্তপ্ত বায়ু
প্রচন্ড ক্ষিপ্রতা
খরস্রোতা নদীর মত
তীরে বেগে ছুটে যাবে লক্ষ জীবন।

গোধূলিয়া

উপন্যাস নিমাই ভট্টাচার্য

।।সাতাশ।।

অনেকক্ষণ ও আমার পিঠের উপর মুখখানা রেখে চুপ করে বসে রইল। আমিও কোন কথা বলতে পারলাম না। মুখে কিছু না বললেও মনে মনে অনেক কিছু বললাম। বললাম—দেবী আমি শাস্ত্র পড়িনি ধর্মের নির্দেশ আমি জানি না কিন্তু মনে মনে বেশ উপলব্ধি করতে পারি স্ত্রীত্ব বলতে যদি কিছু বোঝায় তা তোমারই মত মেয়েকে বলা যায়। তোমার মত আমিও অনেক কথা তোমাকে বলিনি। বলতে পারিনি। লজ্জায় দ্বিধায় চুপ করে থেকেছি। আজ তোমাকে বলতে ইচ্ছে করছে, বউ সেদিন রাত্রে বা তার পরে অনেকবারই তোমার ভালবাসার জোয়ারে ভেসে যেতে যেতে তোমার ঐশ্বর্যময় লালিত্যপূর্ণ অপরূপ দেহ আমাকে পাগল করে তুলেছে কিন্তু পারিনি। আর এগুতে পারিনি। পিছিয়ে এসেছি। মনে হয়েছে যে আমাকে এত ভালবাসে এত বিশ্বাস করে এত আপন মনে করে যে তার সমস্ত ঐশ্বর্যের চাবিকাঠিটি হাসতে হাসতে আমার হাতে তুলে দিয়েছে তার কাছ থেকে কিছুই আমি কেড়ে নিতে পারি না। পারব না। অপরূপা অনন্যাকে কোন কালিমার স্পর্শে আমি লাঞ্ছিত করব না।

বউ।

বল সোনা।

পিসীকে ঐসব কথা না বললেই ভাল করতাম।

হঠাৎ একথা মনে হলো কেন?

এসব কথা বলার ত কোন দরকার ছিল না। তুমি আর আমি যেমন ছিলাম তেমনই থাকব।

বলে ভালই করেছ।

কেন?

পিসী তোমার বিয়ে দেবার জন্য হঠাৎ এত বেশী মেতে উঠেছিলেন যে..

পিসী কি ওদের কথা দিয়ে দিয়েছেন?

পিসী বলেছেন যে ও যদি বিয়ে করে তাহলে এখানেই বিয়ে করবে।

হঠাৎ এরকম কথা দিলেন কেন?

আলপনাকে দেখে ওর খুব ভাল লেগেছে। তাছাড়া পিসী দেখলেন ওদের বাড়ীতে যখন কোন ছেলে নেই তখন তুমি ও বাড়ীতে ছেলের মর্যাদা পাবে।

আলপনাকে তোমার কেমন লাগল?

আলপনাকে আমার বেশ ভালই লেগেছে কিন্তু ওর মাকে আমার বিশেষ ভাল লাগে নি।

কেন বলো ত?

ভদ্রমহিলা বোধহয় একটু অহংকারী। একটু নয় যথেষ্ট।

তাছাড়া উনি বোধহয় তোমাকে খুব জামাই করে রাখতে পারলেই...

তুমি ঠিক ধরেছ।

আচ্ছা আলপনা কি তোমাকে ভালবাসে?

তা বলতে পারব না; তবে ও যে আমাকে যথেষ্ট পছন্দ করে বা হয়ত একটু ভক্তি শ্রদ্ধাও করে তা বুঝতে পেরেছি।

তোমাকে কি ওরা বিয়ের কথা কিছু বলেছিলেন?

কাকাবাবু বলেছিলেন।

তুমি কি জবাব দিয়েছিলে?

বলেছিলাম অত অহংকারী মহিলার মেয়েকে বিয়ে করব না।

সে কথা বোধহয় আলপনা জানে তাই না?

হ্যাঁ জানে।

তাই ও বললো—তুমি ওর মাকে বিশেষ পছন্দ কর না।

আলপনা মেয়েটি বেশ ভাল কিন্তু আমার ত কিছু করার নেই। তুমি যদি আমার জীবনে না আসতে তাহলে হয়ত ওকে বিয়ে করতাম।

তার মানে তোমারও ওকে ভাল লাগে।

নিশ্চয়ই ভাল লাগে কিন্তু ভাল লাগা মানেই ত বিয়ে করা নয়।

দেবী দু'হাত দিয়ে আমার মুখখানা খুব জোরে চেপে ধরে বলে—আমি জানি আমার সোনাকে আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

সত্যি জানো?

দেবী হঠাৎ যেন কোথায় তলিয়ে গেল। আমার কাঁধের উপর মাথা রেখে বললো—আমি জানি সোনা আমি মরে গেলেও তুমি কাউকে বিয়ে করে সংসারী হতে পারবে না। অথচ..

ও আর বলে না। চুপ করে যায়।

অথচ কি?

অথচ আমি বোধহয় খুব বেশী দিন তোমার দেখাশুনা করতে পারব না।

আমি ওকে একটু বকুনি না দিয়ে পারলাম না। বললাম—কেন আজেবাজে কথা বলছ?

আজেবাজে নয় সোনা, ঠিক কথাই বলছি।

তুমি কবে মরবে তাও কি ভানুদা বলে গেছেন?

ঠিক কবে মরব তা না বললেও বলেছেন আমি খুব বেশীদিন বাঁচব না।

জন্ম মৃত্যুর কথা কেউ বলতে পারেন না।

আমিও আগে তাই ভাবতাম কিন্তু এখন সব কথা মিলে যাচ্ছে বলেই মনে হয়...

সব কথা মানে ত আমার সঙ্গে দেখা হবার কথা?

আরো অনেক কিছু।

অনেক কিছু মানে?

যা কিছু ঘটেছে ঘটছে সবকিছুই মিলে যাচ্ছে।

যেমন?

যেমন দিদির মৃত্যু তোমার-আমার ব্যাপার।

তোমার-আমার ব্যাপারে কি বলেছেন?

এইত যা হচ্ছে তাই বলেছেন।

বিয়ে হবে কিনা কিছু বলেছেন?

বিয়ে করতে ভানুদা বারণ করেছেন।

কেন?

ফল নাকি ভাল হবে না।

একটু চুপ করে থাকার পর বললাম—বউ আজ থেকে আর তোমাদের এ ঘরে শোবার দরকার নেই।

কেন?

আমি ত এখন অনেকটা ভাল হয়ে গেছি। তাছাড়া তোমাদের মেঝেয় শুতে হবে না।

তাতে কি হয়েছে?

দরকার যখন নেই তখন শুধু শুধু মেঝেয় শোবে কেন?

রাত্রে তোমার যদি কিছু দরকার হয়?

সে রকম দরকার হলে তোমাকে ডাকব। তাছাড়া আমার জন্য আর কত রাত ঘুমোবে না?

সোনা ঘুমুবার চাইতে তোমার পাশে বসে রাত কাটান অনেক অনেক আনন্দের।

এর পর যদি তুমি অসুস্থ হয়ে পড়?

তুমি আমার পাশে বসে বসে রাত কাটাবে না?

ভয় নেই তোমার জন্য আমাকে কিছুই করতে হবে না। সারা জীবন তুমিই আমার জন্য করবে।

সোনা তোমার জন্য কিছুই করতে পারলাম না। ইচ্ছে করে কত কি করি কিন্তু ভগবান ত সে সুযোগ আমাকে দেবেন না।

কেন ইচ্ছে তোমার অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে?

দেবী খুব জোরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললো আমার আসল ইচ্ছেটাই জীবনে কোনদিন পূর্ণ হবে না।

কেন?

সে ইচ্ছে পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়।

কি সেই ইচ্ছে?

শুনতে চাও সোনা?

চাই বৈকি।

শুধু ঘরে না এই দোতলায় কোন তৃতীয় ব্যক্তি না থাকলেও দেবী আমার কানে কানে ফিস ফিস করে বললো—আমাদের যদি একটা ছেলে হতো...

বউ।

ও লজ্জায় সঙ্গে সঙ্গে আমার কোলের মধ্যে মুখ লুকোল।

আমি হাসতে হাসতে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম—বিয়ে করতে ও না কিন্তু ছেলের স্বপ্ন দেখো?

তুমি আমাকে বুঝবে না সোনা।

তোমাকে বকলাম নাকি?

আর কিভাবে বকুনি দেবে? ?

তুমি আমার বড় আদরের বউ।

যখন মনের মত স্বামী পেয়েছি তখন আদর পাব না কেন?

মনের মত স্বামী পেয়েছ?

নিশ্চয়ই পেয়েছি। আমার সোনার মত রাজী আর কেউ পায় নি।

দেবীর মাথায় মুখে হাত দিতে দিতে জানলার জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি রাত্রির অন্ধকার নেমে আসার দেরী থাকলেও সূর্য অস্ত গেছে। চারদিকে গোধূলির মিষ্টি আলো বাঙ্গালীটোলার গলি-গলির মধ্যেও উষার পৃথিবীর দাক্ষিণ্যের জোয়ার এনে দিয়েছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর দেবী উঠে বসে আমার কপালের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে বললো তোমাকে যদি এইভাবে প্রাণের কাছে পাই তাহলে আমার আর কিছু চাই না।

আমি কিছু বলি না।

ও হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়েই লাফিয়ে উঠল। দাঁত দিয়ে জিভ কেটে বললো—তোমাকে কিছু খেতেও দিলাম না ওষুধও দেই নি।

ও আমাকে ওষুধ দিয়েই রান্নাঘরে গেল। একটু পরে এক গেলাস গরম দুধ আর বিস্কুট এনে বললো— তাড়াতাড়ি খেয়ে নিও। আমি গা ধুতে যাচ্ছি।

যাও।

একটু পরে দুধ আর বিস্কুট খেয়ে ঘরের মধ্যে বসে থাকতে ভাল লাগল না। ঐ ছোট ছাদ আর বারান্দায় পায়চারী করতে করতে দেবীর ঘরের দিকে নজর পড়তেই ওর ঘরে গেলাম। দু-এক মিনিট ঐ অন্ধকার ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কে? একটু ভয় পেয়েই দেবী জিজ্ঞাসা করল।

আমি।

তুমি?

হ্যাঁ।

এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কি করছ?

কিছু না। এমনি দাঁড়িয়ে আছি আর ভাবছি...

ভাবছি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি এ ঘরে আসব বা এ ঘরের মালিককে আমি এমন করে পাব।

ও আমার সামনে এসে দুহাত দিয়ে গলা জড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল সত্যি পেয়েছ?

নিশ্চয়ই। এখন যেখানেই আমি যাই না কেন এক মুহূর্তের জন্যও অনুভব করব না আমি একা আমি নিঃসঙ্গ।

তুমি কোথাও যাবে নাকি?

তুমিই বল কাজকর্ম না করে চুপচাপ বসে থাকা কি ভাল?

তা কেন বলব?

তাহলে তুমি আমাকে পাটনা যাবার অনুমতি দাও। আমি শনিবারে শনিবারে না পারলেও মাসে দুবার নিশ্চয়ই আসব।

তুমি সত্যি পাটনার চাকরিটা করতে চাও?

হাজার হোক জীবনের প্রথম চাকরি পেয়েছি।

যদি এখানেই কোন চাকরি পাও তাহলে চলে আসবে?

নিশ্চয়ই আসব।

তাহলে যাও। আমার কোন আপত্তি নেই।

আজকে ওদের একটা টেলিগ্রাম করা যায়?

কাল সকালে করে দেব।

কিন্তু ওরা ত জানে না...

তুমি আসার পরদিনই আমি ওদের একটা অর্ডিনারী টেলিগ্রাম করে জানিয়েছি যে...

বাচ্চাদের মত ওর গাল টিপে আদর করে বললাম এই না হলে আমার বউ। আলো জ্বালো তোমাকে দেখব।

না না এখন আলো.....

কেন কি হলো?

আমি শুধু সায়া-ব্লাউজ পরে আছি।

তাহলে ত আলো জ্বালতেই হবে। এ দৃশ্য না দেখে আমি ঘর থেকে বেরুচ্ছি না।

না না তোমার পায়ে পড়ি আলো জ্বালবে না।

মাত্র এক মিনিটের জন্য...

ও আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললো—লক্ষ্মী সোনা আমার তুমি আমার কথা শুনবে না।

এভাবে বললে না শুনে পারি?

আমি আর কোন কথা না বলে হাসতে হাসতে নিজের অন্ধকার ঘরে গিয়ে ইজি চেয়ারে বসলাম। পনের-বিশ মিনিট পরে দেবী আলো জ্বালতেই আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে অপলক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কি হলো? ওভাবে তাকিয়ে দেখছ কি।

বউ তুমি এভাবে আর আমার সামনে এসো না।

এভাবে মানে?

তুমি এভাবে আমার সামনে এলে আমি আর সত্যি নিজেকে সামলাতে পারব না।

বাজে বকো না।

সত্যি বলছি ঠিক একটা কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে।

দেবী ধীর পদক্ষেপে হেলে-দুলে আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললো অসভ্যতা করবে না। চুপ করে বসে থাক।

কেন?

জবাব দেবার আগেই ও হাঁটু মুড়ে আমার সামনে বসে আমাকে প্রণাম করল।

হঠাৎ প্রণাম করলে কেন?

কৈফিয়ত চাইবার আগে আশীর্বাদ করবে না?

ওর মাথায় হাত রেখে বললাম—আজ যেন তোমার সমস্ত বিশ্বাস আর শ্রদ্ধার উপযুক্ত হতে পারি।

এটা আশীর্বাদ করা হলো?

মনে মনে ত সব সময়ই তোমার মঙ্গল কামনা করি।

করো?

হঠাৎ পিসীর গলার আওয়াজ শুনতেই ও তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বললো—ও বাড়ীর কাজকর্ম মিটে গেল পিসী?

পরে আবার যেতে হবে।

তাহলে এখন আবার এলে কেন?

ভাবলাম প্রদীপকে একবার দেখে যাই আর মনে মনে ভাবছিলাম আবার ঝগড়া বাধিয়ে...

আমি ত তোমার প্রদীপের মত আদুরে ননীগোপাল নই যে...

পিসী আমার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ওকে বললেন—বাজে বকিস না। এবার আমার চিবুক ধরে জিজ্ঞাসা করলেন কেমন আছিস বাবা?

হেসে বললাম—ভাল।

দুধ খেয়েছিস?

না ত।

পিসী বেশ রেগেই দেবীকে জিজ্ঞাসা করলেন অসুস্থ ছেলেটাকে একটু দুধ পর্যন্ত দিতে পারিস নি?

দেবী হেসে বললো—যে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে আমি দুধ দিতে পারব না।

পিসী একবার আমাদের দুজনকে দেখে হাসতে হাসতে বললেন—আমি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভাব হয়ে গেল?

আমরা দুজনে প্রায় এক সঙ্গে বললাম—না না পিসী ভাব হয়নি।

পিসী হাসতে হাসতে বললেন—ওরে বাপু আমার বয়স হলেও এসব ভাব-ভালবাসার ব্যাপার বেশ বুঝতে পারি।

আমরা দুজনে হেসে উঠতেই পিসী আমাদের দুজনকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললেন—আমার কাছে লুকোচ্ছিস কেন? আমি কি তোদের পর?

আরো এক সপ্তাহ পরে আমি নতুনভাবে কর্মজীবন শুরু করার জন্য পাটনা রওনা হলাম। পিসী আর দেবী হাসি মুখেই আমাকে বিদায় দিল।

(ক্রমশঃ)

মনের সুখ

(তের)

"But hail, thou goddess sage
and holy,
Hail, divinest Melancholy"
— Milton.

মিসেস্ হাজারী বিষণ্ণতা রোগে ভুগছেন। বছর তিনেক ধরে তিনি কোনো কাজকর্মে মন বসাতে পারছেন না। গৃহস্থালীর কাজ ভাল লাগে না, বই পড়তে ভাল লাগে না, রেডিও শুনতে ইচ্ছে করে না, গল্প করতে বা শুনতে আগ্রহ নেই; অনেক রাত অবধি জেগে থাকেন, সকালে বিছানা থেকে উঠতে চান না, সবরকম খাদ্যে অরুচি, সব ব্যাপারে অনীহা। এখন তাঁর বয়স ৪৮। ডাক্তাররা বলেছেন, এসব রজঃ-রোধের মেনোপোজ আনুষঙ্গিক উপসর্গ; এ-নিয়ে ভাবনা-চিন্তার কিছু নেই, কিছুদিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে। ট্রাংকুলাইজার, ভিটামিন, আয়রণটনিক অনেক খেয়েছেন। ওষুধ খেতেও আর ভাল লাগে না। ছোট মেয়েটির বিয়ের পর থেকে বেশি বাড়াবাড়ি হয়েছে। অবশ্য কিছু কিছু উপসর্গ দেখা দিয়েছিল আরো বছর সাতেক আগে সেই সময় তাঁরা আলাদা ঝড়ী করে কোলকাতার বাসা ছেড়ে গড়িয়াতে উঠে যান। বড় মেয়ের বিয়ের বছরখানেকের মধ্যে অসুখটা বেশ কিছুটা বাড়ে। কোলকাতার বাসায় হাজারীরা তিন ভাই একত্র থাকতেন। বড় ভাই সওদাগরী অফিসে চাকরী করেন, ছোট ভাই শিক্ষকতা করেন, আর মেজ ভাই শ্যামলবাবু একজন কনট্রাক্টর ঠিকাদার। লেখাপড়া তিন ভাই-এর মধ্যে সব থেকে কম শিখলেও রোজগারের দিক থেকে শ্যামলবাবু সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। প্রধানত তাঁর রোজগারেই সংসার চলত। বড় ভাই অফিস আর ক্লাব নিয়ে থাকতেন, ছোট ভাই-এর কাজ ছিল বাজার করা আর সংসারের কখন কি দরকার তার খোঁজ রাখা ও যোগান দেওয়া। শ্যামলবাবুর কাজ ছিল সমস্তই জেগে থাকত।

ছোট ভাই-এর চাহিদামত টাকা দিয়ে যাওয়া। এই রকম করে মিসেস কমলা হাজারীর বিয়ের পর আঠারো-উনিশ বছর পর্যন্ত যৌথ পরিবার বেশ ভালভাবেই চলছিল। কোনো ঝগড়াঝাটি মতবিরোধ দেখা যায়নি। মেজবৌ কমলা অন্দরমহলের কর্ত্রী ছিলেন, তাঁরই নির্দেশে ও ব্যবস্থা-পনায় সংসার চলত। বড়বৌ চিররুগ্না হাঁড়িহেঁসেলের দিকে ঘেঁসতেন না। ছোট ভাই বিয়ে করেনি, বাড়ীর কাজ আর মাষ্টারী টিউশানী নিয়েই তার দিন কেটে যায়। মায়ের অনুরোধ উপরোধে হেসে বলত যে তার পুষ্যি বাড়ানোর মত ক্ষমতা নেই। বড় ভাইয়ের চারটি ছেলে ও মেজর তিনটি মেয়ে নিয়ে প্রায় ১০।১২ জনের সংসারের সব ঝক্কি সামলাতেন মেজ বউ। সকাল থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত তাঁর নিঃশ্বাস ফেলার সময় থাকত না। কিন্তু তার জন্যে তাঁকে কোনোদিন অনুযোগ করতে কেউ শোনেনি? কাজের চাপের মধ্যেও নিজের শরীরের যত্ন নিতে তাঁর ভুল হত না। নিয়মিত প্রসাধন করতেন। দেহশ্রী বজায় রাখতে ছোটবেলার শেখা যোগব্যায়াম রোজই অভ্যাস করতেন। স্বাস্থ্যশ্রীতে তাঁর দেহ ঝলমল করত, তৃপ্তির হাসি তার মুখে সব

আজকে ওকে দেখে আপনি বুঝতেই পারবেন না যে সাত বছর আগে ও কেমন ছিল! ওর সে সময়কার ফটো দেখলে আপনার বিশ্বাস হবে না যে সেটা ওরই ফটো। আমার সময় খুবই কম; বাড়ীতে রাত এগারোটার আগে ফিরতে পারি না, ভোরবেলায় ওর বিছানা থেকে ওঠার আগেই বেরিয়ে যেতে হয়। ওর দিকে ভাল করে তাকাবার সুযোগ আমার কম হয়। কিন্তু যখনই তাকাই, তখনই চমকে উঠি। আমারই মনে হয় যেন অন্য কোনো মেয়েকে আমি কমলা মনে করছি।

এই বলে শ্যামল হাজারী তাঁর প্রাথমিক বক্তব্য শেষ করলেন।

—নিজের বাড়ীতে উঠে আসার পর থেকেই ওঁর পরিবর্তন শুরু হয়েছে—তাই না? এই ব্যাপারে ওঁর কি অমত ছিল।

—না, একেবারেই না। আমিই বরং নানা অজুহাতে দিন পেছিয়ে দিচ্ছিলাম। ওইতো একরকম নিজেই সব ব্যবস্থা করে চলে এসেছিল। মায়ের মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে পুরনো বাসা ছাড়বার আমার ইচ্ছে ছিল না। তিন মাস যেতে না যেতেই ওর এই চলে আসাটা কেউই ভাল চোখে দেখেনি আত্মীয়স্বজন মহলে এ নিয়ে আমাকে কথা শুনতে হয়েছে। না—আমার দাদা বৌদি কিছু বলেননি, কোনো কিছুতে প্রতিবাদ জানাবার মত মানুষ তাঁরা নন। তবে ছোট ভাই আর বাচ্চাগুলো নানারকম বাধার সৃষ্টি করেছিল; ছোট ভাইতো রাগ করে আগের কয়েকদিন বাড়ীতে খাওয়া বন্ধ করেছিল। কমলার সংকল্প থেকে তাকে কেউ টলাতে পারেনি।

—মায়ের মৃত্যুর পর কি জায়ে জায়ে বনিবনাও হচ্ছিল না?

—মন তো হত না। তাহলে নিশ্চয়ই আমার কানে আসত। বৌদিতো সংসারে কোনো কিছুতেই থাকতেন না, দাদা ত

থিয়েটারের দল নিয়ে ব্যস্ত অন্য কোনো কিছুতে নজর দেবার সময় নেই ছোট ভাই তো যাকে বলে সেই—দেবব লক্ষ্মণ। সংসারের সব ব্যাপারে ওর মতামতই চিরকাল বহাল থেকেছে। বনিবনাও না হবার কোনো কারণ ঘটেছিল বলে মনে হয় না।

—তবে উনি অত উতলা হয়ে উঠলেন কেন?

—সে একমাত্র উনিই বলতে পারেন। ওঁর মনের খবর আমার জানা নেই। মজুর-মিস্ত্রী আর কনট্রাকট-দেনেওয়ালা বড়তর্কা-দের মনের খবর রাখতে আর মন জুগিয়ে চলতেই আমি হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি ওঁর মন কেন জগতের আর কোনো কিছুর খবরই রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলতে পারি যে ও-বাড়ীর কারুর সঙ্গে ওঁর ঝগড়াঝাঁটি হয়নি, ঝগড়াঝাঁটি ও করতেই জানে না। কি বললেন? না তাঁদের আর্থিক কোনো অসুবিধে ঘটেনি। বাড়ী আমার নামে ভাড়া নেওয়া, বাড়ীভাড়া ইলেকট্রিক বিল আগের মত আমিই দিয়ে যাচ্ছি দাদার বড় ছেলেটাকে কাজ শিখিয়ে চার আনার অংশীদার করে নিয়েছি রান্নাবান্নার কাজের ভার অনেকদিন ধরেই একটি আশ্রিতা মহিলার ওপর ছিল এখনও আছে। দাদার ছেলেরা সব বড় হয়ে গেছে তাদের দেখা-শোনার দায়-দায়িত্ব নেই। মায়ের অসুখের সময় তাঁর সেবা করতে আমার বিধবা এক মাসী এসেছিলেন। তিনিই কমলার পোস্টে বহাল হয়েছেন। বৌদির অসুখের জোষার-ভাঁটা খেলে না। যখন বড়দরের কোনো কাজ-কর্মের জন্য বাড়তি টাকা-পয়সার দরকার হয় কমলাই আমাকে তাগিদ দিয়ে আদায় করে ও বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে। না অন্য কোনো দিক দিয়ে এখন তার কারুর কোনো অভিযোগ নেই। ছোট ভাই-এর সঙ্গেও কোনো গোলমাল নেই। হ্যাঁ সে মাঝে মাঝেই আমার গাড়িয়ার বাড়ীতে আসে। সবাই ঠিক আছে বদলেছে শুধু কমলা। ছোট ভাইয়েরই তাগিদে আমি আপনার কাছে এসেছি। তার মতে এটা অন্য কোনো রোগ। বজ্রঃরোধের উপসর্গ হলে এতদিন ধরে চলবে কেন? আপনার কি মনে হয়? সারবে তো? ওকে এইবার আপনি জিজ্ঞাসা করুন কেন ও সব সময় মুখ ভার করে থাকে? বল, ডাক্তারবাবুর কাছে সব খুলে বল। আমি থাকব না যাব? আমি বরং বাইরেই বসছি। তোমার যা বলবার তুমি একান্তেই বল।—স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে শেষের কথাগুলো বলে শ্যামলবাবু বেরিয়ে গেলেন।

মুখ তুললেন মিসেস হাজারী। বড় বড় চোখ দুটোতে বিষাদের ছায়া মাথার চুল রুক্ষ এলোমেলো ফ্যানের হাওয়ায় সামনের দু-একগাছা চুল উড়ে এসে মাঝে মাঝে কপালে পড়ছে। কালো রঙের শাড়ীর অগোছাল আঁচলটা সামনে নিয়ে আমার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামালেন। চোখের পাতাগুলো বেশ বড় চোখ নামাতে মনে হল যেন চোখ বন্ধ করে কিছু ভাবছেন। ভাল করে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে মনে হল বুঝি এই রকম কোনো মূর্তি দেখেই মিলটন লিখেছিলেন কাম পেনসিভ্ নান ডিভাউট এ্যান্ড পিওর। সত্যিই ধ্যান-মগ্না সন্ন্যাসিনীর মত দেখতে। এক শুচি-স্নিগ্ধ পবিত্র মূর্তি। মনে হল না এই মহিলার জীবনে কোনো সমস্যা আছে আর যদিও থাকে তবে সে সমস্যার সমাধান আমাদের মত চিকিৎসকের সাধ্যের বাইরে। কি কথা দিয়ে আলাপ শুরু করব কিছুতেই ভেবে পেলাম না। কিছুক্ষণ পরে মিসেস হাজারীই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন। ধীরে ধীরে গম্ভীর গলায় বললেন:

—আমি তো অনেক চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতেই মনে আনন্দ আনতে পারছি না। কিছুতেই কোনো কাজে মন বসাতে পারছি না। বিছানা ছেড়ে উঠতে গেলে মনে হয় পা দুটো এত ভারী যে আমি দাঁড়াতেই পারব না হাত তুলতে গেলে মনে হয় যে হাত দুটো যেন আমার নয়। আমার দেহটা যেন শিসে দিয়ে তৈরী। কথা বলতে কষ্ট হয় বুকের ভেতরটা ফাঁকা অথচ মাথাটা ভারী। কী আমার দুঃখ কী আমি চাই—আমি নিজেই জানি না। মনে হয় আমার ওপর যে দায়িত্বভার ছিল যে তা আমি পালন করতে পারিনি। আমি বোধহয় কোনো অন্যায় করেছি, ঘোরতর অন্যায়। তাই শাস্তি পাচ্ছি। আমাকে এমন কোনো ওষুধ দিন যাতে আমি কথা বলতে পারি। আমার দেহের রক্ত সব জমে গেছে তাই বোধহয় দেহে কোনো সাড় নেই আমার স্নায়ুগুলো সব শুকিয়ে গেছে—তাই নড়া-চড়া করতে গেলে কষ্ট হয়। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে আর কিছু বলতে পারছি না। শুধু এইটুকু জেনে রাখুন আমার এ অবস্থার জন্যে আমিই দায়ী আর কেউ নয়। আমি বোধহয় আর ভাল হব না, বোধহয় ভাল হতে চাইও না।

সত্যিই ওঁর কষ্ট হচ্ছিল। আমি ওঁকে শবাসনে রিল্যাক্স করার পদ্ধতি শিখিয়ে কিছু ওষুধপত্র দিয়ে সেদিনকার মত বিদায় দিলাম।

পরের দিনই মিসেস হাজারী আবার এলেন। শ্যামলবাবু ছোট ভাইকে বসিয়ে রেখে নিজের কক্ষে চলে গেলেন। এবার তাঁকে দেখে মনে হল একটু যেন উন্নতি হয়েছে বোধহয় ওষুধের ফল। কিন্তু ওঁর কথা শুনে আমার ভুল ভাঙ্গল চমকে উঠলাম।

—আপনার ওষুধে কোনো কাজ হল না। দিনে তিনটে করে খেয়ে কাজ হবে না ভেবে কাল একসঙ্গে সব কটা বড়ি খেয়ে নিয়েছিলাম। ঘুমাতে হলই না সারারাত জেগে রইলাম; গায়ে জ্বালা মাথায় যন্ত্রণা। সারা-রাত ছটফট করলাম। অবশ্যি খাওয়ার পরেই বমি হয়ে গিছল হয়তো বড়িগুলো বমির সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে থাকবে। ওঁদের বাড়ীর ডাক্তারতো তাই বললেন।

শ্যামলবাবুর ছোটভাই-এর দিকে তাকিয়ে বললাম—কী করে উনি ওষুধ পেলেন? আপনার দাদাকে বিশেষ করে বলে গিছলাম, ওষুধ যেন ওঁর নাগালের মধ্যে না থাকে। তিনি যেন নিয়মিত নিজের হাতে ওঁকে ওষুধ খাওয়ান—আমার প্রেসক্রিপশনেও একথা স্পষ্টভাবে লেখা ছিল।

তিনি কিছু বলার আগেই মিসেস হাজারী বলে উঠলেন: উনি যে ড্রয়ারে ওষুধ রেখেছিলেন তার একটা চাবি আমার কাছে ছিল। ওঁর কোনো দোষ নেই। তবে একটা উপকার হয়েছে আপনার ওষুধে। আমার বুকের ভারটা কমে গেছে সারা দেহে অস্থির অস্থির কেমন একটা ভাব দেখা দিয়েছে। কথা বলতে ইচ্ছে করছে। অনেক কথা বলবার ইচ্ছে। আপনার শোনবার সময় হবে কি? অমল তুমি একটু বাইরে যাবে?

অমল বাইরে যেতেই মিসেস হাজারীর ভাবান্তর ঘটল। তাঁর উৎসাহ নিভে গেল। সোফায় দেহ এলিয়ে চোখ তুলে সিলিং দেখতে লাগলেন।

—কি বলবেন বলুন। আমি প্রস্তুত, সময়ও আমার যথেষ্ট আছে। হ্যাঁ বলুন।

প্রথমটায় কোনো সাড়া দিলেন না কমলা হাজারী। আমার কথা তাঁর কানে ঢুকেছে বলে মনে হল না। নিজের চিন্তায় ভার হয়ে রইলেন। আবার তাঁকে সম্বোধন করে আগের কথাগুলো উচ্চারণ করলাম। কোনো উত্তর পেলাম না। তারপর তিনি ঐভাবেই আপন মনে বলে চলতে লাগলেন: আমি মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি। জেগে জেগে স্বপ্ন

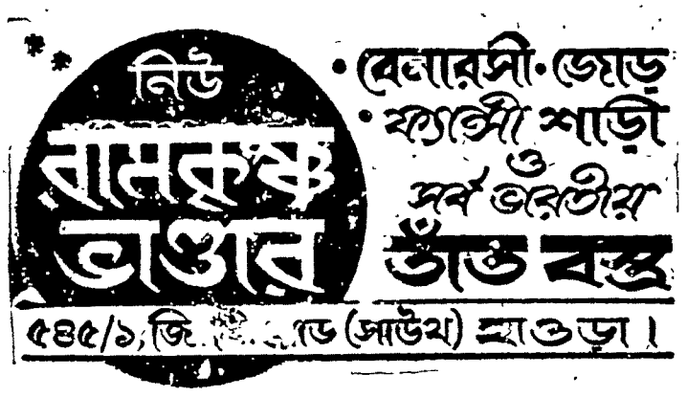

দেখি। এখনও দেখছি। ঐতো মঠের একটা ঘরে আমি মরে পড়ে আছি। শ্মশানেশ্বরী কালীমায়ের আদেশে মঠের সন্ন্যাসিনীরা আমার মৃতদেহটা একটা সৎকার সমিতির গাড়ীতে তুলেছে। গাড়ী চলেছে। ওরা আমার শবদাহ করবে না জানি। কিন্তু গঙ্গায় ভাসিয়ে দিচ্ছে না কেন? আমাকে কোথায় নিয়ে এসেছে! মাথার ওপর অনেকগুলো শকুনি ঘুরপাক খাচ্ছে। ওটাতো ভাগাড়। কেয়াঝোপের মধ্যে কেউটে লুকিয়ে আছে। কেয়া ফুটেছে তাই সাপ এসেছে। শকুনিরা প্রথমে চোখ দুটো তুলে নেবে তারপর বুকের নরম মাংস। না! বুকতো শুকিয়ে গেছে। শকুনিরা খালি চলাফেরা ঘুরছে। সন্ন্যাসিনীরা কালো আলখাল্লায় মাথা মুখ ঢেকে ফিরে যাচ্ছে। কেয়াফুলটা আমাকে কে এনে দিল? কেউটে নয় গোখরো। ফণা বিস্তার করে শকুনিদের আক্রমণ থেকে আমাকে বাঁচাবে। সরাসরি শ্মশানেশ্বরীর সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমি স্বীকার করছি আমার অপরাধ। শাশুড়ী ঠাকরুণকে আমি মেরে ফেলেছি.....

এই অবধি বলে হঠাৎ ওঁর যেন সম্বিৎ ফিরে এল। ধড়মড় করে উঠে এসে আমার সামনের চেয়ারে বসে পড়লেন। লক্ষ্য করলাম—আজ ওঁর চুলে মুখে অবিন্যস্ত ও যত্নহীন প্রসাধনের চিহ্ন। —ভাবছেন আমি মরতে ভয় পাই? মোটেই না। তবে আমি সুন্দরভাবে মরতে চাই, হাসতে হাসতে মরতে চাই মরে পুড়ে ছাই হতে চাই। সেই ছাই গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে চাই। নিজের চিতাভস্ম নিজে ভাসিয়ে দেবার আনন্দ মা কালী আমাকে দেবেন না। আমি যে অনেক পাপ করেছি। —একটু চড়া সুরে কথাগুলো বললেন।

—কি আবার পাপ করলেন? আমি যতদূর জেনেছি আপনি নিষ্পাপ। না কোনো পাপ করেননি আপনি।

আবার ভাবান্তর। কণ্ঠস্বরে আর উত্তেজনা নেই। শ্রান্ত ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন:

—আপনি বলছেন আমি পাপ করিনি! আমার শাশুড়ী আমার জন্যে মরেননি! উনি যে আমাকে বলেছিলেন উনি যতদিন বেঁচে আছেন আমরা যেন আলাদা বাড়ী না করি! মেজছেলে ওঁর কথা নাও শুনতে পারে তাই ভেবে আমাকে বলেছিলেন। আমি আমার স্বামীকে সেকথা জানাইনি। জানলে স্বামী কিছুতেই বাড়ী করতেন না আর উমিরও অমন করে কপাল পুড়ত না।

—উমি কে? কি হয়েছে তার?

—উমি? আমার বড় মেয়ে ঊর্মিলা। নতুন বাড়ীতে গিয়েই ওর বিয়ে দিই। খুব ভাল ছেলে খুব ভাল; ইঞ্জিনীয়ার, বিলেতে কাজ করে। ভাল ঐ ছেলের সঙ্গে উমির বনিবনাও হল না। সেতো আমার পাপেই। শাশুড়ীর অভিশাপে উমির কপাল পুড়েছে। দু বছরের মধ্যেই স্বামীর সঙ্গে উমির ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। বিলেতেই ডাক্তারী করছে উমি। কী কষ্টে যে দিন কাটাচ্ছে—আমি ছাড়া কেউ বোঝে না। ওর কথা গোপন করে সুমির আমার ছোট মেয়ে সুমিতার বিয়ে দিয়েছি। ওরা একদিন সব জেনে যাবে। সেদিন সুমিকে ঠিক বাড়ী থেকে ওরা তাড়িয়ে দেবে। আমারই দোষ। আমি ওদের জ্যাঠা, কাকুর সঙ্গে থাকতে দিইনি। তাহলে ওরা এমন হত না এত কষ্ট পেত না। কিন্তু ঐ বাসা না ছেড়েও আমার উপায় ছিল না। শাশুড়ী ঠাকুরুণ মরার পর রোজ রাত্রে এসে আমাকে ভয় দেখাতেন। কেন আমি মেজছেলেকে বাড়ী করতে বাধা দিলাম না?

শ্মশানকালীর বেশ ধরে এসে আমাকে ভয় দেখাতেন। আমারতো ইচ্ছে ছিল বাড়ীটা হচ্ছে হোক। বাগান আছে খোলামেলা জায়গা আছে ছুটি-ছাটাতে সবাই মিলে গিয়ে থাকব। বাসা ছাড়বার আমার কোনো ইচ্ছে ছিল না। ভয়ে আমাকে পালাতে হল। কোনো লোককে একথা বলিনি সকলে জানে, আমি আরাম চাই বলে আলাদা বাড়ীতে উঠে গেছি। মোটেই না। বরং এখানে এসে কাজ করতে না পেরে ঝক্কি-ঝামেলা সামাল দেবার দায়িত্ব না পেয়ে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি।

—ওখানে গিয়ে আর বুঝি ভয়ের স্বপ্ন দেখেননি।

—প্রথমদিকে দেখিনি। উমির কপাল পোড়ার পর থেকে আবার দেখছি। রোজ দেখছি। কখনো দেখি উমি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে কখনো দেখি সুমি রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করছে, কখনো দেখি মেজছেলে কমলাকে তার শাশুড়ী বিষ খাইয়েছে। একদিন দিনের বেলায় স্বপ্ন দেখলাম ঘুষ দেবার অপরাধে আমার স্বামীর ফাঁসির হুকুম হয়েছে।.. আমাকে আপনি ভাল করতে পারবেন না। কেউই পারবে না। অসুখ সহ্য হয় পাপ। অসুখ ভাল করা যায় পাপ কিনা জানা যায় না। তবু মরতে ভয় করে। মরলে যমরাজ আমাকে ফুটন্ত তেলে ছেড়ে দেবে, করাত দিয়ে আমাকে চিরবে। তাই মরতে ভয় করে। আমাকে বরং কোনো মঠে পাঠিয়ে দিন। সেখানে আমি আতুরের সেবা করব, কুষ্ঠরোগীর পরিচর্যা করব নিজের খাবার থেকে অর্ধেক খাবার রাস্তার ভিখিরীকে খাওয়াব। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করে আমি মরতে চাই না। আমি মরবার জন্যে আপনার বড়িগুলো খাইনি তাড়াতাড়ি ভাল হবার জন্য খেয়েছিলাম। আমি একলা থাকতে ভয় পাই। স্বামী দিন-রাত বাইরে বাইরে থাকেন। চাকর--ঝিয়ের ওপর আমার ভরসা নেই ওরাতো বুঝতে পারে আমি পাপ করে অনুতাপ করছি। ওরা আমাকে কৃপার চোখে দেখে। আমার একটা উপায় করে দেবেন তো ডাক্তারবাবু? আপনি ছাড়া আমার পাপের কথা কেউ জানে না। কিন্তু আপনার কাছে এত কথা বললাম—তবু তো বুকের ভার নামল না। আবার শরীর ভারী হয়ে আসছে হাত-পা অবশ হয়েছে গলার ভেতর কে যেন শিসে ঢেলে দিচ্ছে—বলতে বলতে সহসা থেমে গিয়ে আবার সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখতে লাগলেন মিসেস হাজরা।

পরে শ্যামলবাবুর কাছে জানলাম বড় মেয়ের ব্যাপার। স্বামী বিলেতে একটি ভিনদেশী মেয়ের সঙ্গে বেশ কিছুদিন একসঙ্গে বাস করেছিল। মেয়ে ওখানে গিয়েই বুঝতে পারে বিদেশিনীর সঙ্গে বিয়ে না হলেও তার প্রতিই স্বামীর বেশি আকর্ষণ। তাই বাপ-মাকে জানিয়েই ও আলাদা হয়ে যায়। সে সময় ওর মায়েরও এতে সম্মতি ছিল।

যৌথ পরিবারের ছত্রছায়ায় থাকলে হয়তো কমলার বিষণ্ণতা রোগ দেখা দিত না। যৌথদায়িত্ববোধ চলে গেলে ব্যক্তিগত পাপ-বোধ সহজেই জেগে উঠতে পারে। কমলার এখন প্রথম প্রয়োজন বাড়ীর সকলের সঙ্গে একত্রে থাকা একথা শ্যামলবাবুকে জানিয়ে দিলাম। তিনি দাদা ও ছোট ভাইকে রাজী করালেন। সকলে একসঙ্গে গড়িয়ায় থাকার ব্যবস্থা হল। কমলার তথাকথিত মনো-পোজাল সিনড্রোম রজঃবোধের উপসর্গ ক্রমশ দূর হয়ে যাবে—এই আশ্বাস দিলাম তার স্বামীকে। আর কমলাকে বললাম—তিনি বাড়ীর লোকের সেবার মধ্য দিয়েই শুচি স্নিগ্ধ পবিত্র হয়ে উঠতে পারবেন।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ছন্দঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী' ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট কলকাতা—৭১। কুড়ি টাকা।

বাংলা কবিতায় ছন্দের বহু বিচিত্র ধারার প্রস্রবণ রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের আগে মধুসূদন বাংলা ছন্দের মুক্তি এনেছিলেন পয়ারের শৃংখল সরিয়ে অমিত্রাক্ষরে। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ যদি না এভাবে বাংলা ছন্দের বন্ধ মুখ খুলে দিতেন তা হলে বাংলা কবিতায় সেই শ্মশান দৃশ্য যে কি ভয়াবহ হত তা যে কোন ভাবুক রসিক অনুধাবন করবেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর একের পর এক প্রকাশিত গ্রন্থে কাব্যের বিষয় নিয়ে যেমন ভেবেছেন তেমনি তাঁর ছন্দ ভাবনাও তাঁকে বার বার পীড়িত করেছে। শব্দ শব্দ-ধ্বনি যতি ছেদ পর্ব অঙ্গ মিল মাত্রা এসবই ছন্দের প্রধান অংগ। কবির মনে যেভাব এসেছে স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যের আকারে তাই নিজস্ব নতুন ছন্দ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। রবীন্দ্রনাথ গভীর যা সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টির পর তার রূপ নিয়েও কম চিন্তা করেননি। সেই সব ছন্দ সম্পর্কিত চিন্তা ভাবনাগুলি—ছোট হোক বড় হোক—সব কিছুকে সংকলিত করে প্রকাশ করেছেন বিখ্যাত ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন।

বর্তমান ছন্দ গ্রন্থটি তৃতীয় সংস্করণ। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ সম্পর্কিত সমস্ত রচনা এতে সংকলিত হওয়ার যেমন গ্রন্থটির সর্বাঙ্গীন গবেষণা মূল্য বেড়েছে তেমনি সংকলকের দীর্ঘ ভূমিকা অংশ এর আর একটা মূল্যবান চাবিকাঠি হয়ে উঠেছে। অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য জানিয়েছেন শ্রদ্ধেয় প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ গ্রন্থ ও ছন্দ ভাবনা বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান লাভ তা অত্যন্ত দরকারী। গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও বাংলা ছন্দের দশটি নীতিসূত্র শীর্ষক অংশ এড়িয়ে ছন্দরসিক পাঠক সোজাসুজি গ্রন্থের মধ্যে যেতে চাইবেন না বলেই মনে হয়।

মোট তিনটি পর্বে বিভক্ত এই গ্রন্থটি। এতে আছে রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দ সম্পর্কিত সমস্ত আলোচনাও। পাঠ পরিচয় এই গ্রন্থের মধ্যে সংযোজিত। ফলে বোঝা যায় গ্রন্থটি সাধারণভাবে সম্পাদিত নয় সম্পাদনায় গভীর শ্রম এবং দীর্ঘদিনের নিরলস অনুসন্ধিৎসার পরিচয় সুস্পষ্ট। প্রবোধবাবুর যে ছন্দ সম্পর্কে মৌলিক চিন্তার পরিচয় অন্য প্রসঙ্গে পাওয়া গেছে সে সব কিছু এই গ্রন্থেও অত্যন্ত নিষ্ঠা ও যত্নের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ছন্দভাবনা সম্পর্কে এমন নিখুঁত ও ব্যাপক কাজ বাংলা ছন্দ সাহিত্যে আজও দুর্লভ। শ্রদ্ধেয় প্রবোধচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথের ছন্দ গ্রন্থটির সম্পাদনায় সেই কঠিন কাজটি সম্পন্ন করে শুধু রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর আন্তরিকতম শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনই করেননি সেই সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠকদের সামনেও নতুন দরজা খুলে দিয়েছেন। এখানেই এ গ্রন্থের বিশেষ মূল্য।

বীরেন্দ্র দত্ত

নতুন বই

অগস্ত্য যাত্রাঃ (কিশোর উপন্যাস)। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ ৫৭-সি কলেজ স্ট্রীট কলকাতা-১২। আট টাকা।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় কিশোরদের জন্য উপন্যাস রচনাতেও যে সমান দক্ষ আলোচ্য 'অগস্ত্য যাত্রা' উপন্যাসটি তা প্রমাণ করল। বিশিষ্ট গোয়েন্দা মিঃ ব্রোক অর্থাৎ নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরী তার সহকর্মী ক্যাপ্টেন স্মিথ অর্থাৎ অচিন্ত্যকুমার ঘোষের সহায়তায় যে সব কান্ড করল তাকে যথেষ্ট কৌতূহল কৌতুক মিশিয়ে শ্যামলবাবু বিস্ময়করভাবে সর্বশ্রেণীর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। আসফাকুল ইসলাম তার সাকরেদ পবিত্র হুই, হাষদার আলি—এই তিনজন আর আগের স্মিথ এবং ব্রোক—মোট পাঁচজন জেলা স্কুলের ছাত্র। এদের নানান কান্ড-কারখানা লেখক এমনভাবে এঁকেছেন—যা পড়তে পড়তে সব পাঠকেরই স্কুলজীবন কিশোরকাল তাঁদের সেই সময়ের পরিবেশ মজার সব স্মৃতি মনে পড়ে যাবে। আর তার জন্যেই কোন পাঠকই এই বইটি শেষ না করা পর্যন্ত দ্বিতীয় কোন পাঠকের কাছে হাতছাড়া করবেন না। এখানেই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ও 'অগস্ত্য যাত্রা' উপন্যাসের কৃতিত্ব।

উপন্যাসটির শেষটি অবশ্য ঈষৎ আকস্মিক।

বিষ বহ্নি বাসনা (উপন্যাস)। ধীরেন হোম। এম সি সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট কলকাতা-১২। আট টাকা।

ধীরেন হোম লিখিত 'বিষ বহ্নি বাসনা' সাহিত্য রসিক পাঠকদের তৃপ্ত করবে। প্রবীর প্রবীরের প্রেমিকা শিপ্রা প্রবীরের দুই বন্ধু কালু সুরেশ সুরেশের প্রেমিকা প্রভা শাহ্—এদের ভিড়ে লেখক কৌশলে কাহিনী ও ঘটনা সাজিয়েছেন। প্রবীর জারজ সন্তান—সে জানে প্রবীরের মা সাবিত্রীর সঙ্গে বাবা দেবপ্রসাদ প্রৌঢ় স্বামী শরৎ পুরকায়স্থ শশাঙ্ক রামতনু ইত্যাদি চরিত্রের স্ব স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্যের হৃদয় ও হৃদয়হীনতার সম্পর্ক লোপ করে লেখক মূল কাহিনীকে যথেষ্ট জটিল করেছেন যার জট ছাড়ানো দেখতে পাঠকদেরও যথেষ্ট মনোযোগ দিতে হয়। প্রবীরের বন্ধু কানুর সঙ্গে নিরুর বিবাহ প্রসংগও রসোত্তীর্ণ।

সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী (১৩৮৩)। সম্পাদক—অশোক কুন্ডু। পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা-৯। পঁচিশ টাকা।

তেরশ তিরাশি সালের সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী সম্প্রতি আমাদের হাতে এলো। সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার কুন্ডুর নিষ্ঠা বাস্তবিকই প্রশংসা করার মত।

এবারের গ্রন্থটি স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার মত এই কারণে যে এতে শ্রীকুন্ডু তেরশ তিরাশির সাহিত্য সংবাদ শিরোনামায় শরৎ জন্মশতবর্ষ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ ও বাইরের সমস্ত অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত খবর দিয়েছেন। আঠারো শতক থেকে শুরু করে বাঙ্গালী সাহিত্য সাধকদের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা ছাড়াও এতে আছে সাহিত্য মেলা পুরস্কার প্রাপ্তি, প্রসঙ্গ, কবি সম্মেলন, স্মরণ-সভা, সাহিত্য ও সাহিত্যিক প্রসঙ্গ। তেরশ তিরাশি সালে যে সব সাহিত্যিক ও মনীষীর দেহাবসান ঘটেছে তাঁদের পরিচয়ও এতে আছে। পরলোকগত সাহিত্যিক স্মরণে রচনাগুলি এর মূল্যবান অংশ। সেই সঙ্গে গত এক বছরের প্রকাশিত গ্রন্থ তালিকাও করার মতো। কিন্তু গ্রন্থটিতে ছাপার ভুল মাঝে মাঝে পীড়া দেয়। গ্রন্থ তালিকায় উপন্যাসকে ছোটগল্প ইতিহাসকে অনুবাদ বলে চিহ্নিত করায় পাঠকদের বিভ্রান্তি ঘটতে পারে।

সত্যবন্ধ উচ্চারণ (কাব্য সংকলন)। স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায়। পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা-৯। চার টাকা।

স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায় একজন তরুণ কবি। ইতিমধ্যে এঁর কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। খ্যাত-অখ্যাত বেশ কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় সত্যবন্ধ উচ্চারণ নামের সদ্য প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ তাঁর সামগ্রিক ক্ষমতা বোঝার সহায়ক হল। আলোচ্য কবি আশাবাদী। নগরজীবনের সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণার হতাশা বেদনার মধ্যেও আশা করেন নদীর বুকের ঘাস বেঁচে। একবার ফিরবেই—সেই শুভ সময়ের গতি। এই বিশ্বাস কবির অন্যান্য কবিতাতেও স্পষ্ট।

একাঙ্ক নাটক

বোম্মানা বিশ্বনাথমের

সার্কাসের বাঘ। অন্বেষণ

২-০০

দৃশ্যের দর্পণে। ট্যাক্সমন্ত্রী

(২য় সং) ২-০০

প্রতিটি একাঙ্ক স্ত্রী বর্জিত, ১টি সেটে

অভিনয়যোগ্য মঞ্চসফল পুরস্কারপ্রাপ্ত নাটক

নবগ্রন্থ কুটির

৫৪/৫-এ, কলেজ স্ট্রীট, কলি-১২

আমাদের বই প্রকাশ করা মানে পূর্বসূরীদের ঋণ শোধ। তাই আমরা কখনো ফিকশন ছাপি না। যে বই দুরন্ত গতিতে বাজারে চলবে মনে হয়, তার পেছনে ব্যয় না করে আমরা হাজার হাজার টাকা খরচা করি তার পেছনে যার বিক্রি নেই। তবু সামাজিক দায়িত্ববোধে আমরা গর্বিত।

সুরজিৎ চন্দ্র দাস

সাহিত্যের নেপথ্যে

এই বইপাড়ায় কতো বই বেরোয়। তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থপঞ্জী বাংলা সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন লাভ করে। লেখকের দীর্ঘকালের পরিশ্রম জনসমর্থিত হয়। কিন্তু আলোর আড়ালে অন্ধকারে কোনো মুখের অন্তরাল কি আমাদের মনের দর্পণে সে-মুহূর্তে প্রতিবিম্বিত হয়?

না।

ওই একটি শব্দ বুকে নিয়েই প্রকাশকেরা বেঁচে থাকেন এবং এই বিরাট 'না' পাওয়ার আনন্দেই পর্দার প্রতিদিন আড়ালে কাজ করে যান। হয়তো প্রাচুর্য আসে, হয়তো তাদের জীবনযাপনের বন্ধুর পথ সাবলীল হয়। কিন্তু বুকের গভীর গভীরতর কোটরে কি কোনো দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে না? অস্বীকার করলে কি হবে। আমি যতো এঁদের দেখছি, লেখকদের সম্পর্কে এঁদের শ্রদ্ধা, পরিশ্রম এবং কোনো কোনো ক্ষেত্র লাভের আশা না রেখে শুধু মাত্র বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার অঙ্গীকারে তাঁদের পদযাত্রা খানিকটা মিশনের মতো। সত্যিই?

দূর, এখানেও সেই কেউ কেউ-এর প্রশ্ন এসে যায়। এরকম কেউ কেউ-এর একজন হোলো জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশক সংস্থা। যাঁদের বই প্রকাশনার ক্ষেত্রে অবদানের কথা চিন্তা করতে গেলে একটু অবাক হয়ে যেতে হয়।

কতোদিন কত হাজার বার যে এই রাস্তা দিয়ে গেছি, কতোবার যে সাদাসাদা কালোয় আঁকা সাইনবোর্ডটা দেখেছি, তখন কি একবারও মনে হয়েছে যে, এঁদের জন্যে কখনো কলম ধরতে হবে। কিন্তু না ধরলে আমার এই দীর্ঘ পরিশ্রমে গড়া প্রকাশনী সিরিজ প্রায় খানিকটা অপূর্ণ থেকে যেতো।

কেন? সেই গল্পটা বলি।

গল্পটা অনেকদিন আগে থেকে শুরু। সেই ঢাকা থেকে। যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রমেশচন্দ্র মজুমদার, মোহিতলাল মজুমদারের মতো কৃতী মানুষগুলো ছাত্রদের সামনে এসে দাঁড়াতেন। সুরেশচন্দ্র দাস ছিলেন ওঁদেরই একজন ছাত্র। তা ছাত্রতো অনেকেই থাকেন, স্নেহধন্য হন ক'জন? এই কয়েকজন স্নেহধন্য ছাত্রদের একজন ছিলেন সুরেশবাবু। শুধু স্নেহভাজন বললে ভুল হবে, রমেশবাবু অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র ছিলেন সুরেশ দাস। যাই হোক, ঢাকা য়ুনিভার্সিটি থেকে এম-এ পাশ করার পর সালিমুল্লা কলেজে অধ্যাপনার কাজ পেলেন। বেঙ্গল্ট বেরুনোর পর বললে একটু ভুল হবে, কারণ সুরেশবাবু এত ভালো ছাত্র ছিলেন যে, বেঙ্গল্ট বেরুবার আগে থেকেই পড়াতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু মন টিকলো না, বছর খানেক পড়িয়ে কলকাতায় চলে এলেন।

কোনো কলেজে?

না।

তখন বাঙালী ছেলেদের আলাদা ব্যাপার ছিল। যাই হোক, সে-কথা পরে বলছি। কলকাতায় এসে সুরেশবাবু 'বসুমতী'র সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দিলেন। হ্যাঁ, যা বলছিলুম—তখন তো আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বাঙালী তরুণদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন যে, বাঙালীকে ব্যবসায় নামতে হবে। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। সুতরাং চাকরী কে করে। চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে নিজের ব্যবসা করবেন এই ভেবে—করা হল 'অবিনাশ প্রেস'। মির্জাপুরে ছোট একটা ট্রেডল মেশিন, দু'-একজন কম্পোজিটার নিয়ে ব্যবসা শুরু হোলো।

—আচ্ছা, অবিনাশ প্রেস কেন? ওঁর বাবার নামে কি প্রেস নামকরণ হয়েছিলো?

ঃ না, বাবা নয়, অবিনাশবাবু হলেন সুরেশবাবুর খুড়তুতো ভাই। প্রথমাবস্থায় টাকা-পয়সা দিয়ে প্রচুর সাহায্য করেছেন, ফলে সুরেশবাবু এ-কৃতজ্ঞতার কথা ভুলতে পারেননি। প্রেস চললো—কিছুদিনের মধ্যেই সুরেশবাবু গড়লেন—মডার্ন পাবলিশিটি সিন্ডিকেট'।

পাঠক, বিশ্বাস করুন, মডার্নের লেখকলিস্ট দেখে আমার প্রায় মাথা ঘুরে যাবার জোগাড়। এ এক অবিশ্বাস্য ঘটনা! আপনাকে যদি বলি—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের মতো লেখককে প্রায় আবিষ্কার করেছিলেন সুরেশবাবু। যদি বলি, স্বর্গাদপী গরিয়সী, বরযাত্রী, নীলাঙ্গুরীয় —এইসব কালজয়ী বইগুলো প্রথম লাভের কথা চিন্তা না করে ছেপেছিলেন মডার্ন।

জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

বিশ্বাস হবে? বিশ্বাস হবে—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার রমেশচন্দ্র মজুমদার, অসিত হালদার এই লিস্টে আছেন?

. কি করে মনে থাকবে বলুন। আমরা বড্ডো ভুলে যাই। আগের কথা আর কেই বা মনে রাখে!

যাই হোক, প্রেস বাড়লো। বাড়তে বাড়তে, বাড়তে বাড়তে—এমন এক জায়গায় এলো যখন আর মির্জাপুরে ধরছে না। তখন উঠে আসতে হোলো—ধর্মতলায় ১১৯ নম্বরে। তখন তো আর লেনিন সরণী ছিল না। প্রেসের সঙ্গে ঐ এক নামে বই প্রকাশনা চলতে লাগলো।

রমেশচন্দ্র মজুমদারের এবং যদুনাথ সরকারের বাংলাদেশের ইতিহাস তখন ইংরেজীতে বেরুতো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা বিভাগ থেকে। শুধু ছাপানো নয় এপারের সেলিং এজেন্ট হলেন—জেনারেল প্রিন্টার্স। বিক্রি হচ্ছিলো বটে, তবে পাঠকদের কাছ থেকে বারবার তাগাদা বা অনুরোধ আসছিলো। এ বইয়ের বাংলা ভাষার অনুবাদের জন্যে। বারবার এ-অনুরোধ আসতে থাকায় ডঃ মজুমদার 'জেনারেল'-কে ভার দিলেন বাংলা মুদ্রণ প্রকাশ করার। সেই শুরু হোলো ঃ প্রাচীন যুগ থেকে। তারপর পর পর আর তিন খণ্ড। ১৯৪৭এ বেরুলো ৪ খণ্ড।

ইতিমধ্যে প্রেস হয়েছে জমজমাট। ট্রেডল মেশিন দিয়ে যা শুরু হয়েছিল, সেখানে এসছে ৪টে লাইনো মেশিন। ছটা লেটার প্রেস। এছাড়া অন্যান্য ব্যাপার তো আছেই। যে প্রেসে কাজ করতেন দু'-চারজন, সে-প্রেস এখন ভারতের একমাত্র প্রেস যেখানে সব ভাষার বই বেরুতে পারে। বের করুন না কোলকাতা থেকে তিব্বতী, তামিল, গুরুমুখী, কানাড়ি। স্ক্রিপট দিন, ছাপবেন জেনারেল প্রিন্টার্স। কমসে কম ২৪টা ভাষার বই বের করবার ক্যাপাসিটি আছে জেনারেলের।

৯০ বছর বয়সে সুরেশবাবু অবসর নিলেন। তার অনেক আগে থেকেই প্রেসের আর প্রকাশনার হাল ধরেছেন সুরেশবাবুর সুযোগ্য পুত্র সুরঞ্জিৎচন্দ্র দাস। ইংরেজীতে এম-এ দেওয়ার কথা ৫৯-এ। খানিকটা শ্রমিক গোলমাল এবং প্রেসের অব্যবস্থায় পরীক্ষার মুখ থেকে উঠে আসতে হোলো সুরঞ্জিৎবাবুকে। আর সেই যে উঠে আসা, আর ফিরে যেতে পারেননি পরীক্ষার হলে, আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছেন।

—আচ্ছা সুরঞ্জিৎবাবু, আপনি আসার পর প্রকাশনীকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার কথা ভাবলেন?

—এসে দেখলাম ডঃ মজুমদারের বয়স প্রায় আশী হয়ে গেছে, এখনো দু'খণ্ড বাকি। অনুরোধ-উপরোধ তাগিদ-তাগাদা দিয়ে শেষ দু'খণ্ড বাঙালীর ইতিহাস বের করলাম। আমার মনে হয়েছিল, কোনো ব্যবসা বা বিক্রি নয়, বাঙালী জাতির গর্বের জন্যে অন্ততঃ এই বই প্রকাশ করার দরকার। তাছাড়া শুধু এ বই নয়। আমরা বের করেছি বাংলা নাটকের ইতিহাস, ডঃ অজিতকুমার ঘোষের। গর্ব করে বলছি না, বাংলা নাটকের আদি থেকে বর্তমান পর্যন্ত এরকম ধারাবাহিক আর বিস্তৃত আলোচনা এর আগে আর প্রকাশিত হয়নি। বাংলার অবজ্ঞাত নাট্য সমালোচনার ক্ষেত্রে এ এক অক্ষয় কীর্তি বললে খুব বেশি বলা হবে না। এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথা বলতে ইচ্ছে হয়—যা আমাদের কাছে গর্বের বলে মনে হয়েছে। তা হোলো—ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাকের কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র। রাজনীতিবিদ চাণক্যের নাম সর্বজনবিদিত। তার অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি আর সমাজনীতি সম্বন্ধে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আমরা বিদেশের মনীষীদের, লেখকদের সবার ওপরে জায়গা দিই। কিন্তু 'কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র' প্রমাণ করেছে যে, রাজাশাসন আর অর্থনীতি প্রাচীন ভারতে আধুনিক কালের বহু ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছিল। দুটো খণ্ডে এটা শেষ হয়েছে।

এ-বইয়ের তো কোনো কমার্শিয়াল ভ্যালু নেই। ১০ হাজার টাকা খরচা করে মাত্র ১১০০ বই বের করেছিলাম। সেই বই বিক্রি করতে আমাদের প্রায় ১১ বছর সময় লেগেছিল। বলুন, কোন্ প্রকাশক জেনে-শুনে এভাবে টাকাটাকে আটকে রাখে। কিন্তু একটা কথা আমরা বিশ্বাস করি, অন্ততঃ বারবার কথাই আমি বিশ্বাস করি—যে-কোনো বই খুব তাড়াতাড়ি বিক্রি হয়ে টাকা নিয়ে আসবে, এ-রকম বইয়ে আমরা হাত দেবো না। সমাজ বা দেশের ক্ষেত্রে এমন এমন তথ্যসমৃদ্ধ বই প্রকাশ করার দরকার, যার পেছনে সবচেয়ে আগে উঠবে না কোনো অর্থকরী বা ব্যবসার বা লাভের কথা। যার জন্যে আমরা সমস্ত ফিকশনের বই আর বের করবো না ঠিক করেছি। শুধু এ-বই কেন—আমরা পর পর এমন কয়েকটা বইয়ে নাম করে যাবো, দেখবেন তার পেছনে কোনো ব্যবসার ব্যাপার নেই—যেমন ধরুন—মোহিতলাল মজুমদারের আধুনিক বাংলা সাহিত্য, মধ্যযুগের কবি ও কাব্য (শংকরীপ্রসাদ বসু), আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিপ্রহর (সুখময় মুখোপাধ্যায়), বৈষ্ণব সাহিত্য প্রবেশিকা (হিরণ্ময় চৌধুরী), ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ আলোচনাগ্রন্থ যার মধ্যে আছেন—ব্যালো, বোদলেয়ার, ভেরলেন মালার্মে প্রমুখ—এক দিগন্ত দিনান্তের (ডঃ লোকনাথ ভট্টাচার্য) এছাড়া ডঃ নরেন ভট্টাচার্যের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, ডঃ অমলেন্দু বসুর সাহিত্যলোক ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাকের রামচরিত প্রাচীন রাজ্যশাসন পদ্ধতি, এইসব।

বলুন, এর মধ্যে একখানা বইও কি আমরা বিক্রির কথা ভেবে তৈরি করেছিলুম? আসলে আমাদের প্রকাশনীর উদ্দেশ্য বা প্রতিজ্ঞা-ই হোলো আমরা প্রামাণ্য বা তথ্যসমৃদ্ধ, গবেষণামূলক বই-বের করবো। এর পেছনে আমাদের কি রকম পরিশ্রম বা সময় যায় তার একটা উদাহরণ দিই। ধরুন ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের রবীন্দ্র চর্যার কথা। এ-বই বের করতে গিয়ে আমরা ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীকে দিয়ে লণ্ডন য়ুনিভার্সিটির বহু নথিপত্র ঘেঁটে আনিয়েছি সব ফটোস্টাট কপি। ওঁরা ছবি তুলে পাঠিয়েছেন, আমরা ব্লক করে নিয়েছি। তা না হলে "মেদিনা-ভিলা'র ছবি কি করে পেতাম। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন— villas শুনলে তোমাদের হঠাৎ মনে হবে বাগানবাড়ি। আমি লণ্ডনে থেকে যখন প্রথম শুনলুম যে আমরা ভিলায় বাস করতে যাচ্ছি, তখন কত কী কল্পনা করেছিলুম তার ঠিক নেই।

এর পর আছে—রবীন্দ্রনাথের ভর্তির নিদর্শন পত্রের ফটোস্টাট। নং ৫৫২। ১৫৩-তে জমা আট টাকা। এছাড়া হাজার তথ্য। এ বইয়ের ভূমিকায় প্রবোধচন্দ্র সেন লিখছেন—এ-গ্রন্থে 'অনেক স্থলে এমন অপ্রত্যাশিত আলোকপাত করা হয়েছে, যাতে রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে চেনা যায়।'

শুধু এখানেই শেষ নয়। আমরা যে বই বের করতে যাচ্ছি, সেই 'বিষাদ সিন্ধু'র লেখক মোশারফ হোসেনের 'আমার জীবন' এই বইটি বের করার পরিকল্পনা থেকে আজ পর্যন্ত এর পেছনে যে পরিশ্রম হয়েছে তার তুলনা হয় না। ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে মাইক্রো-ফিল্মে গোটা বইটা তুলে নিয়ে আসা হয়েছে। এতে জানা যাবে, ১৩০ বছর আগেকার বাংলাদেশের সমাজ-অর্থনৈতিক মুসলিম জীবনযাপন, যা আমাদের দেশের প্রকাশনীর ইতিহাসে একটা অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে। আমরা জানি, দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে যে বইটি আমরা প্রকাশ করতে যাচ্ছি, তারও কোনো কমার্শিয়াল ভ্যালু নেই কিন্তু যা আছে সেটাই আমাদের পরম সম্পদ। এছাড়া ডঃ অমলেন্দু বসুর বাংলা কবিতার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটা তথ্যবহুল বই প্রকাশ করছি যার নাম—ভারতের ধর্ম লিখেছেন—নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে একেবারে আধুনিক কাল পর্যন্ত ধর্মের বিবর্তন, ধর্মীয় আচার-আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে আলোকিত হয়েছে নারী-পুরুষ ধর্মীয় জীবন। এ-ধরনের বইও এত সমৃদ্ধভাবে এর আগে বেরিয়েছে বলে মনে হয় না।

ঘরটা পুরনো। ঘর না বলে একে সাবেকী মাপের বিশাল দালান-বাড়ি বলা যায়। পুরনো বাড়িতে ঝকঝকে মার্জিত বিনয়ী ৩৮ বছরের আধুনিক তরুণ পরিচালক সুরঞ্জিৎবাবুর ব্যক্তিত্ব এখন জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্সের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে। ইতিমধ্যেই মুদ্রণশিল্পে সর্বভারতীয় পুরস্কার নিয়ে এসেছেন। বাবা খড়দার গঙ্গার ধারে বাড়িতে থাকেন পড়াশোনা নিয়ে একান্ত নির্জনতায়। মেজো ভাই সুপ্রিয় এখন ও বি এম এ্যাডভারটাইজিং এজেন্সীর একসিকিউটিভ। ছোট ভাই সুবোধ, স্টেট ব্যাঙ্কের অফিসার। সপ্তাহান্তে সুরঞ্জিৎবাবু চলে যান বাবার কাছে। এখনো পরামর্শ, পরিকল্পনার কথা আলোচনা করেন। গরচা বোড থেকে প্রতিদিন কাঁটায় কাঁটায় ৯টায় আসেন অফিসে এবং পরের দিনের কাজের হিসেব নিয়ে ফেরেন।

শান্ডিল্য চতুর্বেদী

উপন্যাস

মোহিনী আড়ম

চিত্তরঞ্জন মাইতি

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রেমা এসে দাঁড়াল ঘরের মাঝখানে। মুখে একটুখানি হাসির রেখা টেনে বলল, পুরস্কারটা কিন্তু আমার প্রাপ্য নয়।

মিঃ পিল্লাই শক্ খেয়ে যেন সোফায় উঠে বসলেন। বললেন, এ কথা কেন প্রেমা। সবচেয়ে বেশী ভোট পেয়ে তুমি জয়ী হয়েছ। এ ব্যাপারে কারো কিছু বলার নেই।

প্রেমার ঠোঁটের সূক্ষ্ম হাসিটা রহস্যময় হয়ে উঠল। সে বলল, পুরস্কার পাবার ব্যাপারে সত্যি করে বলুন তো আপনার হাত ছিল কতখানি?

লোকটি যেন হকচকিয়ে গেল। কি বললে প্রেমা খুশি হবে, আর কি বললেই বা প্রেমার একটুখানি করুণা সে পেতে পারবে তাই ভাবতে গিয়ে অনেকখানি সময় চলে গেল পিল্লাই-এর।

আমতা আমতা করে বললেন জন্মভূমি পত্রিকাই তোমার প্রথম নায়ের পার্বালিসিটি দিয়েছিল। তাই তোমাকে আমরা আমাদের আপনজন বলেই ভাবি। এক্ষেত্রে নিজের মানুষের জন্যে যতটুকু করা দরকার তাই করা হয়েছে। আর দেখ, তুমি যদি পশু হতে তাহলে নিশ্চয় বিধাতাপুরুষ ছাড়া কেউ তোমাকে গিরি লঙ্ঘনের কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে আসত না।

প্রেমা ছোট্ট করে বলল, বুঝলাম, এখন বলুন কি আমার হার্ড না সফট?

পিল্লাই চেঁচিয়ে উঠলেন, এতবড় একটা খবর কয় আমার পুরস্কার তুমি শীতল অভ্যর্থনায় চিত্ত চাও প্রেমা।

প্রেমা বেল বাজাল। বেয়ারা এসে দাঁড়াতেই প্রেমা মিঃ পিল্লাইকে বলল, আপনার জন্যে বাম, জিন, হুইস্কির কোনটা আনাব বলুন?

তুমি?

প্রেমা বলল, আমার বিয়ার।

মিঃ পিল্লাই বললেন, আজ আর আলাদা করে দূরে সরিয়ে দিও না প্রেমা। একই পানীয়ে আমাদের কণ্ঠ নীল হোক।

বেয়ারা অর্ডার নিয়ে চলে গেল।

ড্রিংকের ভেতরে কথা হচ্ছিল। মিঃ পিল্লাই বললেন জন্মভূমি পত্রিকায় তোমার বাবার যে শেয়ার ছিল তা আমি বেচে দেবার ব্যাপারে সাহায্য করেছিলাম, তাই না?

সে জন্যে আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ মিঃ পিল্লাই।

কৃতজ্ঞতার কথা নয় প্রেমা। আমি বলতে চাইছি সেই থেকে তোমাদের সঙ্গে আমার পরিচয়।

প্রেমা বলল, জন্মভূমি আমাকে অনেক দিয়েছে। টাকা যেমন পেয়েছি, পাবলিসিটিও পেয়েছি তেমনি। পুরো পাতা জুড়ে এমন করে আমার নায়ের ছবিগুলো আর কোন পত্রিকাই ছাপে নি।

মিঃ পিল্লাইএর গলায় আবেগ, সে সামান্য একজন রিপোর্টার সবকিছুর আড়ালে থেকে নীরবে কাজ করে গেল তাকে কি কোন দিন একটুখানি কৃপার চোখে দেখতে ইচ্ছে হয় না তোমার?

একথা বলে আমাকে ছোট্ট করে দিচ্ছেন মিঃ পিল্লাই। আপনি আমাদের পরিবারের শ্রদ্ধেয় বন্ধু।

আবেগে মিঃ পিল্লাই প্রেমার একখানা হাত চেপে ধরলেন। বললেন, শ্রদ্ধের কথাটা উইথড্র করতে হবে। আমার সঙ্গে কি তোমার শ্রদ্ধার সম্পর্ক প্রেমা। আমি কি তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুগোষ্ঠীর একজন হতে পারি না?

খিলখিল করে হেসে উঠল প্রেমা। বলল, অন্তরঙ্গ বন্ধু আমার মতে একজনই হতে পারে, বাকী সব বন্ধু।

মিঃ পিল্লাই বললেন, একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুর পদ আমি পাব, এমন দুরাশা আমার নেই, তবে আশাতে ঋণীর পড়ার অধিকার ধুঁকি সব পতঙ্গেরই আছে।

আবার হাসল প্রেমা। বলল, আপনি বেশ নাটক করে কথা বলতে পারেন। যারা নাটক দেখতে ভালবাসে তারা আপনাকে দারুন রকম পছন্দ করে ফেলবে।

চুপ করে গেলেন পিল্লাই। মানসম্ভ্রম আহত হয়েছে ভেবে প্রেমা তাকে খুশি করার জন্যে তার গ্লাসে বেশ খানিকটা বিয়ার ঢেলে দিল।

পিল্লাই বললেন, বিশ্বাস কর প্রেমা, জীবনে কারো কোন ক্ষতি করেছি বলে আমার মনে পড়ে না। আমার সামর্থ্য মত সাহায্যের চেষ্টা করেছি মানুষের। কিন্তু আঘাত ছাড়া কোন দিন কোন পুরস্কার পাইনি।

প্রেমার মনটা হঠাৎ তার লিঙ্গগত রহস্যময় মানুষটার ওপর নরম হয়ে উঠল। সে বলল, আমার কথায় যদি কোন রকম আঘাত আপনি পেয়ে থাকেন তাহলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি মিঃ পিল্লাই।

আবার পিল্লাই গ্লাসটা নামিয়ে রেখে হাত ধরলেন প্রেমার। বললেন, তোমাকে ভালবাসতে খুব ইচ্ছে করে প্রেমা, কিন্তু ভালবাসা কারু হৃদয় থেকে জোর করে তো আদায় করে নেওয়া যায় না।

প্রেমা বলল, বিশ্বাস করুন আপনাকে

এই মুহূর্তে আমার খুব ভাল লাগছে। কেন জানেন, ইনিয়ে বিনিয়ে ঢেকেঢুকে আপনি কথা বলতে জানেন না। মনের কথা খুব সোজা করে বলতে পারেন।

মিঃ পিল্লাই বললেন, প্রেমা, আমি এও জানি আমার এমন কোন যোগ্যতা নেই যে আমি প্রেমা মেননের মত তরুণীর সান্নিধ্য পেতে পারি। তবু ভয়ানক একটা দুরাশার হাত থেকে তো নিষ্কৃতি পাই না। তাই নিশ্চিত পাব না জেনেও তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারছি কই।

প্রেমা বলল, আপনার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে?

মিঃ পিল্লাই কিছু সময় চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর গেলাসের সবটুকু পানীয় গলায় ঢেলে দিয়ে গ্লাসটা দূরে সরিয়ে রেখে বললেন, বড় দুর্বল জায়গায় ঘা দিয়ে ফেললে প্রেমা। আমি আমার জীবনের ঐ অংশটার ওপর একটা কালো পর্দা ফেলে রেখেছিলাম।

প্রেমা সঙ্গে সঙ্গে বলল ক্ষমা করবেন, কৌতূহলটা আমার খুব সামান্যই ছিল, তাতে আপনার আহত কোন একটা জায়গায় ঘা লাগবে ভাবতে পারি নি। আপনার পারিবারিক প্রসঙ্গ ছেড়ে এখন আমরা অন্য প্রসঙ্গে আসতে পারি।

না, তা পার না,—গলায় ভারী একটা আওয়াজ তুললেন মিঃ পিল্লাই। বললেন, প্রশ্নের হাওয়ায় যখন কালো পর্দাটা একবার উড়েছে তখন সবটুকু দেখে নাও প্রেমা।

প্রেমা বলল, বিশ্বাস করুন, আমি বিশেষ কোনকিছু না ভেবেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, এখন আমার খুব খারাপ লাগছে। মানে আমি বেশ অস্বস্তি বোধ করছি।

থাক তাহলে, তবে আমি কথাটা বলতে পারলে কিছুটা হালকা হতে পারতাম।

প্রেমা বলল, আপনি যদি আমার কাছে বলে শান্তি পান তাহলে শুনতে আমার একটুও আপত্তি নেই।

পিল্লাই বললেন, কথাটা কিছু বিচিত্র নয়। ঘটনা চরিত্র, সবই সাধারণ।

একটু থেমে হাসলেন পিল্লাই। বললেন রোজ আমার চারদিকের চরিত্র আর ঘটনাগুলোকে নিয়ে খবর তৈরী করেছি, কিন্তু বুঝতে পারি নি একদিন আমি নিজেই খবর হতে চলেছি।

প্রেমা টেবিলের ওপর কনুই ঠুকে গালে হাত দিয়ে চেয়ে রইল মিঃ পিল্লাইএর মুখের দিকে।

পিল্লাই বললেন আমার স্ত্রী সুন্দরী বলে কোন দিনই আমি তাকে বরে বন্দী করে রাখার ফিকির খুঁজিনি। আমি সব মানুষের মনের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলাম। আমাকে অফিসের কাজ নিয়ে এখান ওখান বোজ ঘুরে বেড়াতে হত তাই স্ত্রীর মুখোমুখি বসে ঘন্টার পর ঘন্টা চেয়ে থাকার সময় হত না আমার।

প্রেমা কথার মাঝেই বলে উঠল, আপনার স্ত্রী এনিয়ে অনুযোগ করতেন না?

বিয়ের প্রথম দু-তিনটে বছর জোর অনুযোগ আর কান্নাকাটি করত। আমি তাকে স্যার এগারটি হবে না বলে কথা দিতাম, কিন্তু আমার সেসব কথার কানাকড়ি দাম ছিল না। কথা দেওয়াটা ছিল যেন কথা ভাঙ্গার জন্যেই।

প্রেমা বলল, কেন এমনটা করতেন?

মিঃ পিল্লাই বললেন, কাজটা আমার এমনিতেই অফিস ঘরের বাইরে, তার ওপর উন্নতি করা নিদারুণ একটা আগ্রহে অফিস দূর দুর্গমের যেখানে পাঠাতে চাইত, সেখানেই বিনা প্রতিবাদে চলে যেতাম। চাকরীতে উন্নতি হবে, ভাল করে সংসার গড়ে তুলব এই ভাবনায় প্রথম জীবনে খুব খেটে গেছি।

আবার একটু থেমে বললেন, মিস মেনন একটু বিরক্ত করব?

—বলুন বলুন।

হুইস্কি একটা আনালে হয় না?

ও সিয়োর—বলেই প্রেমা উঠে দাঁড়িয়ে বেল বাজাল।

বেয়ারা এল, অর্ডার নিয়ে সার্ভ করে গেল। পিল্লাইএর অনুরোধে মেননকেও ভাগ বসাতে হল।

পিল্লাই বলতে লাগলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে একটা পরিবর্তন দেখলাম আমার স্ত্রীর ভেতর। সে আর কান্নাকাটি তো করছেই না, বরং আমার কাজকর্মের খোঁজখবর নিচ্ছে। উন্নতির জন্যে আমি কোন রাস্তায় দৌড় ঝাঁপ করছি সে সম্বন্ধে শলাপরামর্শ করছে।

ওর মন শান্ত হয়েছে, ও কঠিন সংসারটাকে বুঝতে শিখছে দেখে আমি অনেকখানি আশ্বস্ত হলাম। আরও বাড়তি উৎসাহ পেয়ে কাজকর্মে জোর মন দিলাম। বল প্রেমা, স্ত্রী সহযোগিতা করলে কোন স্বামী না কাজে প্রেরণা পায়।

প্রেমা হাতের তেলোতে রাখা মুখখানা একবার সমর্থনের ভঙ্গীতে নাচাল।

পিল্লাই বললেন, বিয়ের পঞ্চম বার্ষিকীর দিনটিতে আমি অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরব মনে করেছিলাম কিন্তু কাজের চাপে পারলাম না। ফিরতে ফিরতে হয়ে গেল মিড-নাইট। একগুচ্ছ গোলাপ আগে-ভাগে আনিয়ে রেখেছিলাম, তাই নিয়ে ঘরে গেলাম। বাইরে থেকে কয়েকবার কলিং বেল টিপেও সাড়া পাওয়া গেল না। আমার কোয়ার্টারে পার্ট টাইম কাজের একটা মেয়ে আসত। সে চলে গেলে সারা সময় আমার স্ত্রী একাই থাকত। ভাবলাম, অনেক রাত, বেচারা ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু ভুল ভাঙ্গল হঠাৎ দরজার গায়ে হাত ঠেকতে। দরজার পাল্লা দুটো বন্ধ ছিল না, কেউ নিঃশব্দে ভেজিয়ে রেখে বেরিয়ে গেছে।

বুঝতেই পারছ প্রেমা তখন আমার মানসিক অবস্থা কি রকম। কোন খুনী নিঃশব্দে এসে হয়ত ভয়ঙ্কর কিছু অঘটন ঘটিয়ে গেছে। আমার সারা শরীর কাঁপছিল। হাতের ফুল পড়ে গেল মেঝেতে। আমি দৌড়ে ঢুকে গেলাম আমার শোবার ঘরে।

আলো জ্বলছিল। বেড সুইচ। চারদিকে ছায়া-ছায়া একটা ভাব, শুধু বিছানার ওপর এক টুকরো হলুদ আলো একটা পেতলের থালার মত পড়ে আছে। তার তলায় এক চিলতে কাগজ। তার ওপর আমার স্ত্রীর হাতের বিডটা চাপা দেওয়া আছে। আমি প্রথম বিবাহ বার্ষিকীতে ঐ ঘুড়িটা আমার স্ত্রীকে উপহার দিয়েছিলাম।

তাড়াতাড়ি কাগজের টুকরোটা হাতে তুলে নিয়ে দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলাম। না, কোন খুনী আমার স্ত্রীকে হত্যা করে ফেলে রেখে যায় নি, আমার স্ত্রীই এক বিস্ময়কর খুনীর ভূমিকায় অভিনয় করে গেছে।

প্রেমা সোজা হয়ে উঠে বসে বলল, কি রকম?

পিল্লাই করুণ হেসে বললেন, আমার স্ত্রী লিখেছে : এই দিনটিতে তোমার বাড়ীতে ঢুকেছিলাম, আবার ঠিক এই বিশেষ দিনটিতেই তোমার বাড়ী ছেড়ে যাচ্ছি। যার সঙ্গে যাচ্ছি তাকে তুমি চিনবে না। পুরো একটি বছর ম্যাটিনী শোতে মানুষটা তার কাজকর্ম ফেলে আমাকে সঙ্গ দিয়েছে। তার নিষ্ঠার কাছে আমাকে হার মানতে হল। তোমার দেওয়া ঘড়িটার কোন দাম ছিল না, কারণ ওটা তোমাকে একটি দিনও ঠিক সময়ে ঘরে টেনে আনতে পারে নি। তাই ঐ অপয়া বস্তুটাকে আর সঙ্গে নিলাম না।

থামলেন মিঃ পিল্লাই। মদের ঝোঁকে হা-হা করে বর ফাটিয়ে একবার হেসে উঠেই থেমে গেলেন। গভীর নিস্তব্ধতায় ঘরটা থম-থম করতে লাগল।

প্রেমা বলল, কিছু মনে করবেন না মিঃ পিল্লাই, দোষটা পুরোপুরি আপনার স্ত্রীর নয়।

পিল্লাই বললেন, সদ্য সদ্য আঘাতটা বুকে বড় বেজেছিল, কিন্তু পরে বুঝেছিলাম এ আঘাত আমার স্ত্রী ইচ্ছে করে দেয় নি। আমার ঠিক ঠিক প্রাপ্যটুকুই সে আমাকে দিয়ে গেছে।

প্রেমা কৌতূহলী হল, তার খোঁজ আপনি আর করেন নি?

পিল্লাই হেসে বললেন, কত সন্ধান করে করে আমি জন্মভূমির পাতার খবর পরিবেশন করি, কিন্তু নিজেকে নিয়ে আর খবর তৈরী করতে ইচ্ছে হল না। তবে গোপনে সন্ধান নিয়েছিলাম। লোকটার অবস্থা আদপেই সচ্ছল নয়। চিঠি দিয়ে আমার পলাতকা স্ত্রীকে জানিয়েছিলাম, সে নিশ্চিন্তে ঘর করতে পারে, আমি তাকে কোন দিক থেকেই জ্বালাব না। আর এও লিখেছিলাম, দরকার হলে সে যেন আমার কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিতে দ্বিধা না করে।

প্রেমা বলল, আমি নিশ্চিত বলতে পারি আপনার স্ত্রী আপনার কাছ থেকে আর কোন দিন সাহায্য চান নি।

মিঃ পিল্লাই বললেন, একেবারে নির্ভুল অনুমান। দেখছি মেয়েরাই মেয়েদের মনের কথা জানতে পারে।

প্রেমা বলল, সেটাই তো স্বাভাবিক।

পিল্লাই বললেন, জান প্রেমা, মেয়েটিকে কষ্ট দিয়েছিলাম বলে আজও ভুলতে পারি নি।

প্রেমা হঠাৎ বলল, এখনও কি তার খোঁজ রাখেন?

মিঃ পিল্লাই কিছুক্ষণের জন্যে অন্যমনা হয়ে গেলেন। এক সময় বললেন, মেয়েটি স্বামীকে বড় বেশী কাছে পেতে চাইত, তাই ভদ্রলোক মারা যাবার আগে তাঁর স্ত্রীকে

চার-চারটে বছর ধরে উদয়াস্ত সঙ্গ দিয়েছিলেন।

প্রেমার গলায় ঔৎসুক্য, কি রকম?

পিল্লাই বললে—ভদ্রলোক চার বছরে প্যারালিসিসে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। আর স্ত্রী সেবা করেছে রাত্রিদিন।

প্রেমা বলল—ওঁদের কোন ইস্যু নেই।

পিল্লাই বললেন, একটি মেয়ে। কারো জন্যেই কিছু রেখে যেতে পারেন নি ভদ্রলোক। রাখার মত রেস্ত ছিল না তাঁর। শেষের দিকে স্ত্রীই সংসার চালিয়েছে বাদাম ছাড়ানোর সামান্য কাজ করে। কখনো বা দড়ি পাকিয়ে মার্কেটে বিক্রি করে এসেছে।

প্রেমা বলল—উনি কিন্তু মহিলা হিসেবে ভাল বলেই মনে হচ্ছে।

পিল্লাই যেন প্রেমাকে চমকে দিয়ে বলে উঠলেন, দস্তুর মত ভাল।

প্রেমা পাল্টা প্রশ্ন করে বসল, আপনি কি করে জানলেন?

স্বামী মারা যাবার বছর খানেক পরে একদিন ওর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। ওর অবস্থা দেখে দুঃখ জানিয়ে বলেছিলাম, সব ভুলে তুমি মেয়েকে নিয়ে এসো আমার সঙ্গে। ও ঘরে আজও নতুন কেউ আসেনি।

ও কথাটা শুনে অবাক হয়ে বলেছিল, সে কি কথা, এতখানি অবস্থা ফেরালে আর এতদিনে বউ একটা জোটাতে পারলেন না।

আমি হেসে বলেছিলাম, বোধ হয় ভাগ্যে নেই। সকলের তো সবকিছু সয় না।

ও অমনি বলে উঠেছিল, তাহলে আবার আমাকে ডাক দেওয়া কেন, তার চেয়ে আমাকে আমার মত করে থাকতে দাও।

আমি ওর মেয়েটাকে মাসে মাসে কিছু দিতে চেয়েছিলাম, ও তাও নেয় নি। বলেছিল, শরীরে এখনও শক্তি আছে, কাজটাজ করে চালিয়ে নিতে পারব। আর আমার মেয়েকে লেখাপড়া শেখাব না, তাহলে তোমাদের মত বর পেতে চাইবে। তার পরিণতিটা তো তোমার জানা। তার চেয়ে মেয়ে মাথা থেকে দিন-মজুরের কাজ শিখুক—বিয়ে করুক একটা খেটে-খাওয়া মানুষকে,—সুখী হবে।

আমি আর কোন কথা বলতে পারি নি প্রেমা। সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিলাম। আসার সময় মা মেয়ের অগোচরে আমার স্ত্রীকে দেওয়া ঘড়িটা ওদের বাড়ীতে রেখে এসেছিলাম। প্রতিদিন ভাবতাম ঘড়িটা ফিরিয়ে দেবার জন্যে ও হয়ত একবার আসবে, কিন্তু ও আর আসে নি।

অনেকক্ষণ দুজনে বসে রইল চুপচাপ। হুইস্কির বোতলটা এক সময় নিঃশেষে ঢেলে নিয়ে কয়েক চুমুকে শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ পিল্লাই। প্রেমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, আজ তোমার ঘরে আমার প্রবেশ ও প্রস্থানের নাটকটুকুকে বেমালুম ভুলে গেলে খুশি হব প্রেমা।

প্রেমা উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ মিঃ পিল্লাইএর দুটো হাত ধরে বলল আপনি আমার বন্ধু মিঃ পিল্লাই। সে বন্ধুত্বের সময়ের সীমা অথবা বয়সের বেড়া নেই। শুধু প্রয়োজনের দিনে নয় অপ্রয়োজনে অসময়েও আমার দরজা খোলা থাকবে আপনার জন্যে।

(ক্রমশঃ)

শারদীয় অমৃত ১৩৮৩

সম্পাদক : শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

অমৃতের শারদীয় সংখ্যা বেরোবে এবার মহালয়ার অনেক আগে। সংখ্যাটি এমনভাবে তৈরি করা হচ্ছে যাতে সহজেই পাঠকদের খুশি করতে পারে।

উপন্যাস থাকছে পাঁচখানি এবং লেখকরা বেশির ভাগই 'বেস্ট সেলার'। প্রতিভাবান নতুন লেখকদেরও অবশ্য স্থান দেওয়া হয়েছে সেই সঙ্গে। গল্পের বেলাতেও ঠিক এইরকমই। প্রবীণ লেখকদের সঙ্গে এবার গল্প লিখছেন এমন কজন লেখক, যাঁরা এর মধ্যেই রীতিমত নাম করেছেন—অথচ অমৃতের শারদীয় সংখ্যায় তাঁদের গল্প বেরোচ্ছে এইবারই প্রথম

৫টি উপন্যাস

এবারে লিখছেন

প্রেমেন্দ্র মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, নিমাই ভট্টাচার্য, চাণক্য সেন, আনন্দ বাগচী।

২১টি ছোট গল্প

লিখছেন

অন্নদাশঙ্কর রায়, বনফুল, মনোজ বসু, প্রমথনাথ বিশী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, শওকত ওসমান, সুমথনাথ ঘোষ, প্রফুল্ল রায়, বুদ্ধদেব গুহ, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, অদ্রীশ বর্ধন, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীলেখা বসু, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন রায়, তারাপদ রায়, দেবল দেববর্মা, সুধাংশু ঘোষ এবং শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক রচনা

অমিতাভ চৌধুরী

•

নির্বাচিত কবিতা ॥ প্রবন্ধ ॥

সুঅলংকৃত ॥ দাম আট টাকা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-তিন

আজি হতে শতবর্ষ পরে/১৩৮৩ বঙ্গাব্দ ২৫ বৈশাখে অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের চিত্রের সঙ্গে শিল্পী অতুল বসু

শিল্পী অতুল বসু

রাজকোষ হতে চুরি?-র মতই বিস্মিত করা প্রশ্নের চমকে মনটা চমকে উঠেছিলো যখন শুনলাম রাজভবন থেকে অতুলবাবুর আঁকা সেই সুবিখ্যাত রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিটি অদৃশ্য। যে ছবি ১৯৪৭ সালে পঞ্চম সমাদরে রাজাজী রাজা (গোপালাচারী) তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে ছিলেন রাজভবন চিত্রালয়ে সংরক্ষণের জন্য।

পরে কাগজে দেখলাম বর্তমান মিঃ রাজ্যপাল মিঃ ডয়াস সে ছবিকে উদ্ধার করে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন - ব্রাশ ও তুলির স্পর্শে সংস্কার করার জন্য। একদিন ফোনে তাঁরই কাছে খবর পেলাম সংস্কারের কাজ শেষ। ছবিটি দু একদিনের মধ্যেই রাজভবনে চলে যাবে। বললাম 'তার আগেই আমি গিয়ে দেখে আসব।

যথাসময়ে গেলাম। পাংচুয়ালিটিতে অতুলবাবু একেবারে পাকা ইউরোপীয়ান। হেসে. গল্পে আমি যখন ওঁর বেন্ডেল রোডের বাড়ীর গেটে পৌঁছলাম ঠিক সেইসময় উনিও শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে বারান্দায় বসলেন। আমার যাওয়া এবং ওঁর প্রতীক্ষার মধ্যে ছন্দের মিল দেখে উভয়েই খুশীতে ভরে উঠলাম। কালের নির্মম স্পর্শ ওঁর চেহারায় কিছু ছাপ হয়ত রেখেছে। মনটা কিন্তু রঙে-রসে-কৌতুকে আজও সবুজ।

চট্ করে ছবিটি দেখাতে চাইলেন না। চোখ দুটিতে দুষ্টু হাসি ঝিলিক মারছে। আগে সাসপেন্স ভাল করে জমাট বাঁধুক তারপর বিবেচনা করা যাবে—ভাবখানা ছিলো এই।

ওঁর দিক থেকে ছবি-দেখাবার কোনো গরজ নেই। যেন খোশগল্প করতেই গেছি।

জানো সন্ধ্যা, হঠাৎ যখন শুনলাম ছবিটি তার নির্দিষ্ট জায়গা থেকে অন্তর্হিত হয়েছে সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো মোনালিসার ছবিও ত তিন চার বার চুরি হয়েছিলো? আমার তাহলে আর আফশোস করার কি আছে? এমনও ত হতে পারে যে রাজাজীর মত কোনো রসিকের নজরে পড়েছে তাই স্ব-স্থানে অবিচলিত থাকা ও-ছবির পক্ষে সম্ভব হয়নি?"

"কিন্তু ছবিটা যে এখনও দেখলাম না। আগে দেখে নিই না? তারপর শুনব?"

আমার মিনতিতে কর্ণপাত না করেই অতুলবাবু বলে চললেন তারপর মিঃ ডায়াসের অনেক তদ্বিরে যখন সত্যি করেই ছবিটি পাওয়া গেলো এবং আমার কাছে এসে পৌঁছলো ছবিটি দেখে আমার চক্ষু স্থির। তখন আমার অবস্থাটা কেমন জান? নজরুলের একটা কবিতায় আছে না? "আমার নয়ন আমারই সম্মুখে করে অপমান বরিষণ।" অবিকল সেই ব্যাপার। যাই হোক কিছুক্ষণ বাদে আত্মস্থ হয়ে বুঝতে পারলাম কোনো বৈসাদৃশ্যধর্মী চিত্রকর এই সাদৃশ্যধর্মী চিত্রকরের ছবিটি আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিয়েছে।

তারপর বং, তুলি নিয়ে বসলাম। মেরামতের কাজে। নিজের লেখা বা ছবির ওপর লেখক বা চিত্রকারের দুর্বলতার খবর ও তোমার অজানা নেই? মা যেমন খেলাধুলো সাংঘাতিক শিশুর ধুলোমাখা দেহটাকে স্নেহভরে মার্জনা করেন ঠিক সেই আবেশ ও স্নেহের ব, তুলি আর ব্রাশ নিয়ে বসলাম: কাজ শেষ হতে এত কম সময় লেগেছে শুনলে অবাক হবে।'

'কিন্তু ছবিটা—'

চল চল এবার দেখাই।

ঢুকলাম তাঁর ষ্টুডিওতে। উনি রহস্যভরে হেসে আস্তে আস্তে ছবির পেছনের ব্রেকসিন কভার ও সিংদুটি সরিয়ে দিয়ে আমার দিকে তাকালেন।

আঃ ছবির দিকে তাকাতেই মনে হোলো যেন ব্যাকগ্রাউণ্ডে দোতারার ঝংকার বেজে উঠলো। মৃদু সুর, কিন্তু অশ্রান্ত তার গুঞ্জন এক অবর্ণনীয় মধুরতায় যেন মনটা ভরিয়ে দিলো।

শিল্পী তাঁর ধ্যানবৈভবে কোথায় যে পৌঁছে গেছেন সে খবর কি তিনি নিজেই জানেন?

এ ছবিতে নেই নানা রং-এর অক্রেস্ট্রেশন। গঠন পরিপাট্যের অভিনিবেশী সতর্কতা নেই—আবার উজ্জ্বল বর্ণের উদ্দামতাও নেই, বাঁধাবরাদ্দ ছায়াস্তরই বা কই? আছে শুধু আলো-আঁধারীতে নিশ্চল এক কান্না। আর সেই ছায়ামর মায়াতেই ধরা পড়ে শুধু দুটি চোখ দুটি ভাবের ব্যঞ্জনা নিয়ে যেন চেয়ে আছে। একটি চোখ অর্ধেক খোলা, যেন ধ্যানমগ্ন ঋষির দৃষ্টি আর অপরটিতে কোন রহস্য কৌতুকের মায়া। দুটি মিলিয়ে যেন নিকষকালো মেঘের কিনারে সোনালী রেখায় ইসারা আঁকা একটি ছবি, যে ছবি স্তব্ধ ভাষায় বলে 'তোমায় আমায় দেখা হোলো সেই মোহানার ধারে।'

শিল্পীকে সে কথা বলতেই বললেন প্রায় ধরেছ। ঐ চোখ দুটোই আমায় সকল লজ্জা অপমানের তিক্ততা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

'অপমান লজ্জা! কেন?'

সন্ধ্যা, তুমি ত গানবাজনার জগতের মানুষ। বলতে পারো এমন কোনো রাগ-রাগিনীর নাম যা মানুষকে নিয়ে যায়

ঘরে ঘরে প্রতি ঘরে খাবার বিস্কুট

ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট

যেমন হাল্কা তেমনি সহজপাচ্য

দিন শুরু করুন বেশ মচমচে আর তাজা ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট বিস্কুট দিয়ে। স্বাদেভরা এই বিস্কুট যেমন হাল্কা, তেমনি হজম করাও সহজ। দাদু থেকে নাতি—বাড়ীর সবার জন্যে। সকালে, কাজের অবসরে চায়ের সঙ্গে—যে কোনো সময়েই ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট খেতে ভাল।

ব্রিটানিয়া
দেয় ভাল বিস্কুট—
৫০ বছরের অভিজ্ঞতায়

ব্রিটানিয়া বিস্কুট সবচেয়ে সেরা

লিমটাস-BBCAR.3-140 BG

অন্তর্বিহীন পথে আবার ফিরিয়ে আনে ঠিক বক্ষস্পন্দনের মাঝখানে?

অনেক বাগই আছে আড়ানা, দরবারী কানাড়ার নামই ঠিক এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। একটা নিয়ে যায় অনেক দূরে অন্যটা ফিরিয়ে আনে হৃদয়পুরে। কিন্তু এতদিনে কি এমন মূল্যবান সম্পদ ফিরে পেলেন বাগ-বাগিনীর সুরে সুর মিলিয়ে যাকে দেখতে ইচ্ছে করছে?

'তোমার কথায় উত্তর দিতে হলে চল্লিশ বছর আগে ফিরে যেতে হয়। তখনকার আর সব তরুণ শিল্পীদের মত আমিও আড়াল থেকে লুকিয়ে থেকে রবীন্দ্রনাথের ছবি স্কেচ করেছিলাম। তখনকার ডি পি আই হর্নেল সাহেব ছবিখানি কিনে নিয়েছিলেন।

প্রমথ চৌধুরী মহাশয় আমায় অত্যন্ত স্নেহ করতেন। সেই সূত্রে সত্যেন ঠাকুরের একখানা ছবি একে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে খুসী করে সেই তালেই গুরুদেবের ছবি আঁকার অনুমতি ও সুযোগ প্রার্থনা করলাম। রবীন্দ্রনাথকে উনি চিঠিও লিখলেন। কিন্তু উত্তর এলো শিল্পীর সচল তুলির সামনে নিশ্চল হয়ে বসে থাকার সাধ্য আমার নেই।' ব্যস্ হয়ে গেলো দিব্যস্বপ্নের ইতি।

তারপর কত ঘটনাপ্রবাহ। বাংলার বাঘ এলেন, বিলেত যাবার সুযোগ পেলাম। তারপর ১৯২৪ সালে রয়েল একাডেমীর অধ্যায় এবং তারও পরে ১৯৩০ সালে বাকিংহাম প্যালেস ও উইন্ডসর ক্যাসেল থেকে রাজারাণীর ছবি এঁকে এনে বড় লাট সাহেবের (আরউইন) বাড়ী অলঙ্কৃত করলাম।

এলো পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক সুধীন দত্ত ও শনিবারের চিঠি গোষ্ঠির সাহিত্যের দরবারে ঢোকার সুযোগ। সুধীন দত্তর বাড়ীর ওপরে থাকতেন আই সি এস চারু দত্ত। আমায় তিনি খুবই স্নেহের চোখে দেখতেন। যতীন্দ্রনাথ বসু (তখন আমার ভাবী শ্বশুর মহাশয়) ও চারুবাবু প্রায়ই আমার ষ্টুডিওতে আসতেন। আমিও ঘন ঘন যেতাম।

তারপর দত্ত মশাই গেলেন শান্তিনিকেতনে। হঠাৎই একদিন ওর চিঠি পেলাম রং, তুলি, ক্যানভ্যাস নিয়ে ধাঁ করে চলে এসো। গুরুদেব রাজী হয়েছেন, তোমার যতদিন খুসী সিটিং দিতে।

১৯৩৬ সালের ভাদ্র মাসে রওনা হলাম। শান্তিনিকেতনে। ভাদ্রমাসটা ঠিক অয়েল-পেন্টিং-এর সময় নয়। কিন্তু মনে লেগেছে খুশীর হাওয়া। সব সরঞ্জাম নিয়ে হাজির হলাম। সত্যিই পেলাম বাণী চন্দর বাড়ী। প্রথম সিটিংএ কবি এলেন কৌতুকভরা দুষ্টু হাসি নিয়ে।

দুষ্টু হাসি কেন?

আরে শোনোই না আগে। আবার সেই সাসপেন্স। অগত্যা চুপ করে শুনতে হোলো। মনটা যদিও কৌতূহলে ভরে উঠছিলো।

ঘন্টাখানেকের মধ্যে চারদিকে সাড়া পড়ে গেলো। রথীবাবু তাঁর ক্যামেরা নিয়ে এসে তুললেন বাবামশায়ের সেই সিটিং দেওয়া ভঙ্গির ছবি। সে ছবি ১৯৩৬ সালের বিশ্বভারতী পত্রিকায় ছাপাও হয়েছিলো।

তারপর রঙে রঙে ভরাট করবার পালা। গোপনে কিছু দেখলাম। কিছু পেলামও। হৃদয়ে লেগেছে পুলক রোমাঞ্চের কাঁপন। সঙ্গে সঙ্গে আবার শংকাও জেগেছে যা পেলাম তার সামান্যতমও কি ফিরিয়ে দিতে পারব? কোনো কিছু ভাববার অবকাশও তখন ছিলো না। চিত্রফলকে শুধু ব্যর্থ সাধনার পথরেখা রয়ে গেলো।

কাজ প্রায় সমাপ্তির মুখে। এমন সময়ই হঠাৎ একদিন জিজ্ঞেস করছেন রঙে রঙে তোমরা যে মেলাও তার নাম কিগো?

বললাম টিউবে যে রং ছাপা হয়ে থাকে তার সব সনাক্তীকরণ ঘুচে যায় পাশাপাশি থাকার ছোঁয়াচে। এর সঠিক কোনো নাম ত দেওয়া চলে না।

শুনে বললেন আমাকে সবাই বারবার এই প্রশ্নটি করে বলে তোমায় আমি এই প্রশ্নই করলাম। আমিত নিজের খেয়াল-খুশীমত রংগুলি বার সংগে যেমন মানায় তেমনি করেই বসিয়ে যাই। প্রতিটি ছবি রং রেখায় আলাদাভাবেই স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে। নাম-করণ আর কি করে হয়? তবে ক্যাটালগ্ করবার সময় ওরা যা তা কিছু একটা লেখে বটে।' বলেই একেবারে ঘন্টাখানেকের মত নিশ্চুপ হয়ে পড়েন। এরই মধ্যে কতবার যে মুখখানি আরক্ত হয়ে গেলো, আবার প্রশান্তিতে ভরে উঠলো তার ইয়ত্তা নেই। মাঝে মাঝে বাঁ হাতের মুঠিটি একবার করে খুলছে। আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ডান হাতটি কিন্তু স্থির।

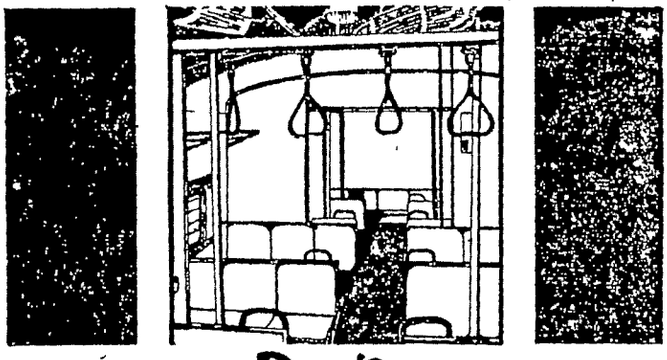

শহরতলী ট্রেন-এ
ধূমপান নিষিদ্ধ

জ্বলন্ত সিগারেট বা বিড়ি থেকে অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে; তা ছাড়া, যাত্রীসাধারণের কামরায় ধূমপানে অন্যদের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সেইজন্য শহরতলী ট্রেন-এ ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
যাত্রিসাধারণের কাছে একান্ত অনুরোধ, বাস, ট্রাম ও সিনেমা হল-এর মতো শহরতলী ট্রেন-এও তাঁরা যেন ধূমপান না করেন।

পূর্ব রেলওয়ে

এক এক সময় মনে হোতো শান্তিনিকেতনেও যেন সাইরেন বেজে ব্ল্যাক আউট হয়ে গেছে।

সৃষ্টি, স্রষ্টা ও দ্রষ্টা সব যেন একাকার হয়ে যেতো মনে হোতো নিঃসীম অন্ধকার যেন স্থির হয়ে আছে আমার ওঁর ও ক্যানভাসের মাঝখানে।

এমনই অবসরকালে হঠাৎ একদিন আমার সামনে হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে, বললেন দ্যাখোতো কি লেখা আছে? আমি স্তম্ভিত, নিরুত্তর।

উনি আশ্বাস দিয়ে বললেন আমি জানি, তুমি কিছু জানো। বুঝলাম এটা অনিল চন্দের প্র্যাকটিক্যাল জোক।

দেখলাম হাত। জীবনের চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর অবধি আপনার প্রস্তুতিপর্ব। আয়ুরেখার মাঝখানে কিছু বিচিত্র প্রভাব-চিহ্ন। কিন্তু কবির জীবনের এসব কথা ত সবারই জানা।

ইনি কিন্তু স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন কত কিছুই ঘটে গেলো স্ত্রী বিয়োগের পর। তারপর কয়েক মুহূর্ত অন্যমনস্ক নীরবতার পর বললেন আর কিছু দেখতে পাও?

দেখলাম হেডলাইন ও মঙ্গলের ক্ষেত্র দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বিচলিত। দ্বিধাহীনভাবে বলে ফেললাম আপনি কেন ছোটো ব্যাপারে নজর দেন? নিম্নতম লোকের সঙ্গে তর্ক ও কথা কাটাকাটিতে নেমে যান? আপনার এই হীনদশা আমার ভালো লাগছে না।

বললেন বুঝেছি। নামের জন্য টাসকো দিতে হবে অনেক। তারপর? জীবনের মেয়াদ? বলেই যেন সাছাড়বন্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। পালাবার আর পথ রইলো না। তাল ঠুকে বলে ফেললাম বৃহস্পতি জীবনে ছ বার ঘুরেছে ৭২ বছর পর্যন্ত। সাতবার আর পেরোতে পারবেনা। তবে আশী বছর দেখে যাবেন।

ওঁর বয়স তখন পঁচাত্তর বছর। বললেন বেস্পতির হাত থেকে সহজ ছাড়া পাব না।

তারপর কোনো রকমে টলতে টলতে বাড়ী পৌঁছেই অনিল চন্দের সঙ্গে যাকে বলে হাতাহাতি সুরু হয়ে গেলো। রাণী ত হেসে কুটোপাটি।

অনিল গম্ভীর হয়ে বললেন এই বয়সে এতক্ষণ ধরে ওঁকে আটকে থাকতে হয়। আমার কাজ হচ্ছে কোনো ফন্দী-ফিকির করে কিছুক্ষণের জন্য ওঁকে ভুলিয়ে রাখা। ওর দৌলতেই ত বেঁচে আছি। আপনি আমার সহায় হোন।

অনিল ও রাণীর বাড়ীর আড্ডাতেই বলেছিলাম কিশোরগঞ্জের একটি হেঁয়ালী।

কুহু কুহু কবে গেলো।
কোকিলের নন্দন।

দৈবের নির্বন্ধে পেচকের বন্ধন।

খাঁচায় ত মরিনা, খোচায় মরি রাজ্জামশাই যদি আজ্ঞা করেন তবে কিছু ক্যাচবম্যাচ করি। এই হেঁয়ালীর সংবাদ অনিল গুরুদেবের কাছে নিবেদন করতে ভোলেন নি। পরদিন সিটিং-এর সময় কবি আমার কাছে ঐ হেঁয়ালী শুনতে চাইলে আমি আপত্তি জানালাম। উনি বললেন আপত্তি কিসের? দুনিয়াশুদ্ধ ত ধুনিমুখর হয়ে আছে বাজার আজ্ঞায় আর পেয়াদার খোঁচায়।

কিন্তু আমার মাথায় তখন ছবি ঘুরছে। ওসব দিকে মন দেবার মত মন ছিলা না।

এইরকম অনেক উপরি পাওনা ভাগ্যে জুটে গিয়েছিলো ঐ ছবি আঁকবার সময়।

আর একদিন। ওঁর সিটিং দেবার সময়ই নামলো ভাদ্রমাসের প্রবল বৃষ্টি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর বৃষ্টি থামলো। সামনে খানিকটা খোলা বারান্দা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে উনি ইষৎ ন্যুব্জ হয়ে হাটছিলেন। তখন ঐ ভাবেই হাটতেন। আমি দৌড়ে ধরতে গেলাম। উনি একটু থেমে পিছন ফিরে তাকিয়ে বললেন ওহে আমাকে ধরতে হবে না। আমি অনেক পিছল পথ ভ্রমণ করেছি। কখনও পড়িনি।

আমি ভয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর আমায় কাছে ডেকে যেন গোপন কথা বলবার মতই কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন এবার পড়েছিলাম। ধাক্কা দিয়েছিলো। কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই লজ্জায় আমার মুখ কেন রক্তজবার মত লাল হয়ে উঠলো। কিশোরীর মত সলজ্জ হাসিতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

যাই হোক ছবি আঁকার পর্ব একদিন শেষ হলো। বললাম আমার দ্বারা এর বেশী আর কিছু হবে না।

ছবিটা একবার দেখে নিয়ে উনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কিরকম লাগছে অতুল?

বললাম, ভালো লাগছে না। আমি যে আশা করে এসেছিলাম 'আমি ভারিব পাষাণ-কারার প্রতিজ্ঞা ফোটাব আপনার চোখে। কিন্তু এ কি? আপনি এত একা? চারিদিকের এমন সমারোহের মধ্যেও আপনি এমন নিঃসঙ্গ?

উনি স্নেহভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার তাকালেন। দেখলাম ওঁর দুটি চোখ ছলছল করছে। অস্ফুটস্বরে বললেন, তুমি আমায় পেলে কি করে অতুল? বলেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

ফিরে আসবার সময় বললেন। তুমি এখনই শান্তিনিকেতন ছেড়ে যেতে পাবে না। নন্দর একখানি ছবি এঁকে দিতে হবে।

ক্যানভাস বোর্ড সব নিয়ে বসলাম

পাহারাওয়ালা/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা অতুলবাবুর প্রতিকৃতি। ১৩৪৩ সালে অঙ্কিত চিত্রটি শিল্পীকে উপহার দেন রবীন্দ্রনাথ

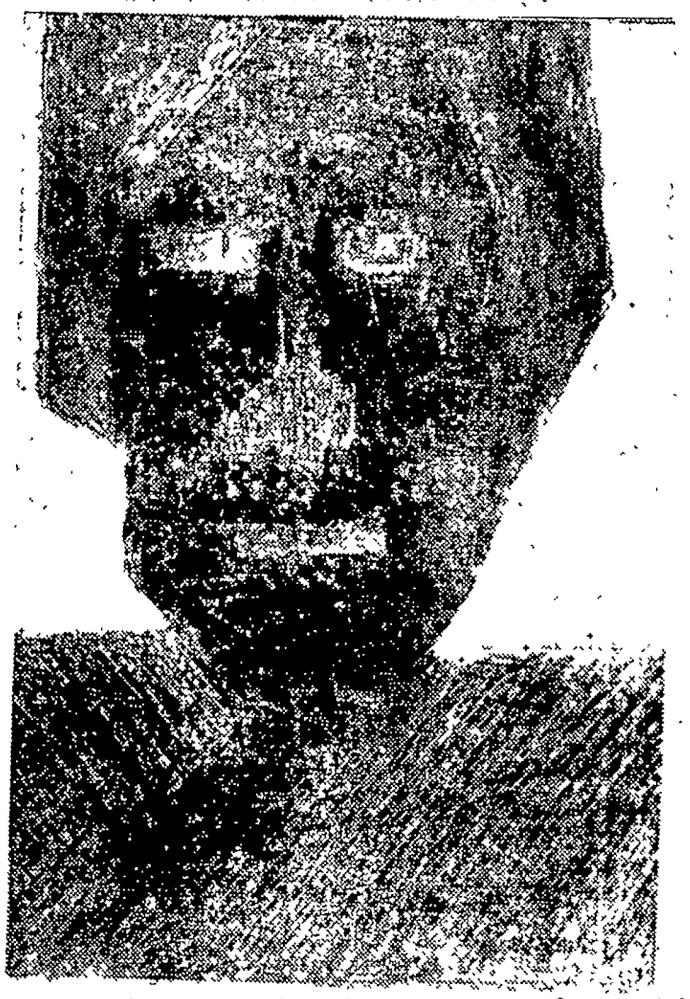

রবীন্দ্রনাথ। অতুল বসুর আঁকা। (বিশ্বভারতীতে প্রকাশিত)

একদিন নন্দলাল বসুর সামনে। নন্দবাবু বললেন অতুল আইভরি ব্ল্যাকের টিউবটা নিয়ে খানিকটা ঘসে দাও। তাহলেই আমার ছবি হয়ে যাবে।

জবাবে আইভরি ব্ল্যাকের টিউবটা ওঁর পায়ের কাছে রেখে বললাম এই নিন। আপনাকেই এটি দিলাম। আইভরি ব্ল্যাক ছাড়াই আপনাকে আমি আপনার চেয়েও কালো করে দেব।

তারপর ডিপ আলট্রা মেরিন ব্লু ও আম্বার দিয়েই ছবিটা এক ঘন্টার মধ্যেই শেষ করে ফেললাম। একটা দোষ কিন্তু হয়ে গিয়েছিলো। ইয়েলো অকার, লাইট রেড ও আইভরী ব্ল্যাক যথাযথভাবে না দেওয়াতে ছবিখানা সত্যিই সিংক করে গেছে।

আমি সামনে বেঁধে দেখবার চেষ্টা করছি ওর ভুলত্রুটিগুলি। এমন সময় কোথা থেকে বাণী চন্দ ঝড়ের মত এসে ছোঁ মেরে ছবিখানি নিয়ে পালালেন।

রবীন্দ্রনাথ এ খবর শুনে হেসে বললেন বুঝেছি। ও তোমার খরচটা আদায় করে নিলো। (বাণী ও অনিলের বাড়ী আমার আতিথ্য গ্রহণের প্রতি ওঁর সকৌতুক কটাক্ষ এটা।

১৯৩৬ সালের কথা। আমি তখন একাডেমী অফ ফাইন আর্টসের জয়েন্ট সেক্রেটারী। জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন জোহন ভ্যান ম্যানেন।

সেই সময়ই নন্দবাবুর মাধ্যমে কবির কাছে প্রস্তাব করলাম জগন্নাথ ক্ষেত্র আমাদের একাডেমী ত বিশ্বভারতীরই সহমর্মী। তবু ওরিয়েন্টাল আর্টের বিরুদ্ধবাদী বলে আমাদের দুর্নাম। এ অপবাদ ঘোচাতে চাই। দিননা আপনার কিছু ছবি?

ফল সুদূরপ্রসারী হোলো। রবীন্দ্রনাথের আঁকা সত্তরোখানি ছবি নন্দবাবুর নটীর পূজা ছবি এবং ওঁর চীনা সংগ্রহশালা থেকে বড় একটি বাঁশঝাড়ের ছবি ১৯৩৬-৩৭ এর এগজিবিশনে দেখানো হোলো। বস আর যাই কোথা?

আর্ট পলিটিকসের ভীমরুলের চাকে ঘা পড়লো। একাডেমী অফ ফাইন আর্টসের প্রথম সভাপতি স্যার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরকে আর্ট-ক্রিটিকরা বোঝালেন অতুলবাবুকে বিশ্বাস নেই এবং কাগজে অতুলবাবুর চরিত্র হননকরা হোলো চার কলামে। এবং তারই ফলে দুই সম্পাদককে কাজে ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে পড়তে হোলো আর্ট পলিটিকসের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য।

আর একটি মজার ঘটনা আমার জীবনে সুখস্মৃতি হয়ে আছে। কবির মতে আমি নাকি ছবি আঁকবার সময় পাহারাওয়ালার মত ওঁর ভাব অনুভবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখতাম—যেন আমার তুলি থেকে কিছু ফসকে না যায়। তাই ঐ পাহারাওলা নামেই আমার একটি প্রতিকৃতি এঁকে অনিল চন্দর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। ব্যস আর কি? ছবি দেখা হোলো—ঐ ছবিকে ঘিরে স্মৃতি চারণের পথে ঘেরাও হোলো। এখন তুমি খুসী ত?

কিন্তু আসল কথাই ত শোনা হোলো না? সেই কি করে পেলেন? আমিও ছাড়তে রাজী নই।

তুমি ত সাংঘাতিক মেয়ে দেখছি। আমি যদি পাহারাওলা তুমি হচ্ছ জেরাদার ল-ইয়ার। না বলে যখন রেহাই নেই বলেই ফেলি। চারু দত্তর সংগে আমার খুবই অন্তরংগতা ছিলো সে কথা আগেই বলেছি। উনি লক্ষ্য করেছিলেন আমার যখন তখন যতীন্দ্রনাথ বসুর বাড়ী যাওয়া। অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে বুঝে নিলেন সবই। অনুমানও করলেন যে এই অধমই অক্ষয় চৌধুরীর নাতজামাই। রবীন্দ্রনাথ অক্ষয় চৌধুরী মহাশয়ের স্ত্রী শরৎকুমারী দেবীর প্রায় সমবয়সী ছিলেন এবং তাঁর সংগে খুব বন্ধুত্ব ছিলো বলেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লাহোরিণী (লাহোরেই ওঁর বাল্য কিশোর কেটেছিল) বলে ডাকতেন। চারুবাবু এই কথাটি যথাসময়ে রবীন্দ্রনাথের কানে পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে লাহোরিণীর নাতজামাইকে দেখার আগ্রহে কিছু কান্ড ঘটে গেলো. কিন্তু আপনি প্রথমেই যে বলেছিলেন এই ছবির ঐ দুটি চোখই আমায় লজ্জা অপমানের তিক্ততা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে? এই লজ্জা অপমানের কারণটা কি?—আমি আবার ওঁকে তাগাদা দিই।

তোমার হাত থেকে দেখছি নিস্তারই ছাড়া নেই। শোনো স্কেচের পরই একটি চোখের কৌতুকমাখা হাসিতেই তাঁর মনের ভাবটি যেন ধরা পড়ে 'দেখি শ্রীমানের কান্ডটা।'

যে গুরুদেব সচল তুলির সামনে নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন—তিনি তাঁর লাহোরিণীর নাতজামাইকে দেখবার অভিপ্রায়ে বা কৌতুকে এতখানি বিরক্তিকর ব্যাপারের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করতে রাজী হলেন। এটা আমার, —মানে শিল্পী অতুল বসুর কাছে কি খুব গৌরবের? —নিজের যোগ্যতায় যা অর্জন করতে পারি নি, তাকে এত সহজে পেলাম কেন? না। আমি লাহোরিণীর ভাবী নাতজামাই বলে (সে রহস্য পরে জেনেছি)—যেন তাঁর একটা কৌতুকের খেলার খেলনা হিসেবেই আমার দাম। —লজ্জাটা এ কারণেই। কিন্তু—সে পর্যায়ের উত্তরণ ঘটলো তাঁর দ্বিতীয় চাহনির গভীর ব্যঞ্জনায়। কারণ এখানে এই আশ্বাসই মূর্ত যে "তোমায় আমায় দেখা হোল সেই মোহানার ধারে"—লজ্জা ও আশংকার সেতু বেয়ে শেষ অবধি এলেন তাঁর দ্বারে। এইখানেই আমি সার্থক।

সন্ধ্যা সেন

উপন্যাস

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আদ্য শেষ রজনী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এক তাঁতি ঘুরে ঘুরে শাড়ি দিয়ে যায় গৃহীনরমো। মনো আর সবির জন্যে দুখানা টাংগাইল ডুরে কিনেছিল রজনী। সন্তুর জন্যে শার্টের কাপড়। বেশি রাতে ফিরে আর দেখানো হয় নি। সকালে ম্যাসেজের লোক এসে বসে বসে চলে গেল। তারপর ঘুম ভাঙলো রজনীর। মেয়ে দুটোকে ডেকে শাড়ি দেখাচ্ছিল রজনী। এমন সময় সন্তু ঘরে ঢুকলো। মা! আমায় কিছু টাকা দাও।

খাবার টেবিলে একটা দশ টাকার নোট চাপা দেওয়া আছে। নিবে যা।

সনৎ নোটখানা নিয়ে এসে বলল, নোট এ টাকায় হবে না মা। আমায় হাজার দুয়েক টাকা দাও।

শাড়ি দেখানো থামিয়ে রজনী সন্তুর দিকে চাইলো। আগে ওকে রজনী আর শশাঙ্ক দুজনেই খোকন বলে ডাকতো। ভালো নাম সনৎ থেকে এখন সন্তু হয়েছে। আগায় কামিয়ে গালে বেশ দাড়ি করে ফেলেছে। চোখ দুটো লাল। সারাদিন কোথায় কোথায় ঘোরে। কি করবি এত টাকা দিয়ে?

ব্যবসা করবো। খাতা কলমের এজেন্সি।

ব্যবসার তুই কি জানিস সন্তু। টাকা-গুলো তো নষ্ট করবি।

তুমি দিয়েই দ্যাখো না। ব্যবসা করে তিন মাসের ভেতর ফেরৎ দেব তোমায়।

মনে মনে একটা হিসেব করে ফেলল রজনী। দু হাজার টাকা জলে দিতে সন্তুর দু দিনও লাগবে না। অনভিজ্ঞ। কার কথায় মেতেছে কে জানে।

বর্ণলিপি খাতা আর তুলিকা কলমের এজেন্সি নেব মা।

রজনী ভাবছিল, আমার তো যেমন-তেমন বিয়ে হয়ে আজ এই অবস্থা। মনো আর সবিকে তো সেভাবে বিয়ে দেওয়া যায় না। মাস মাস ব্যাঙ্কে টাকা ফেলে দিয়ে আসতে রজনী। ফিকসড করেছে কিছু। সংসার খরচ আছে। সফল নাটকের নায়ক-ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে তাকেও সব সময় ফিটফাট থাকতে হচ্ছে। তার পক্ষে এখন আর যেমন-তেমন করে বাইরে বেরোনো সম্ভব নয়। হাতে সব সময় কিছু টাকা রাখতে হয়।

অত টাকা কোথায় পাবো বল। তুই বরং তোর বাবার কাছে গিয়ে চা। ব্যবসা করবি? ভালো কথা তো। নিজের বাপকে গিয়ে বল না। তার সঙ্গে তো তোর যোগাযোগও আছে।

কথাটা আন্দাজে বলে চুপচাপ তাকিয়ে থাকলো ছেলের মুখের দিকে। রজনী জানে, শশাঙ্ক তার অনুপস্থিতিতে এখানে ছেলে-মেয়েদের জন্যে ইদানীং মিষ্টিফিষ্টি নিয়ে আসে। মোটা মানি ব্যাগ বের করে বুক পকেট থেকে। একটু আগে মনো বলছিল।

বাবার কাছে চাইলে পাবো না মা।

চেয়েছিস কোনদিন?

চাইলে অনেক রকম কথা বলে। দেয় মোটে একখানা দশ টাকার নোট।

তেমন করে চাসনি বল! হাজার হোক তোর নিজের বাবা। তুই তার বড় ছেলে! একমাত্র ছেলে! তোকে না দিয়ে থাকতে পারবে ভেবেছিস। তার ডেরা তো চিনিস। ঘুরে আয় না একবার। আন্দাজেই ঢিল ছুড়লো রজনী। তার কেমন সন্দেহ হয় আজকাল—শশাঙ্ক সন্তুর সঙ্গে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। শশাঙ্কর কথা বলতে গিয়ে রজনীর গলায় শ্লেষ চলে আসে। কিছুতেই ঠেকাতে পারে না রজনী।

বাবো বলছো?

যা না।

যদি না দেয় বাবা।

যদির কথা নদীতে।

এইভাবে বলে তখনকার মত রজনী সন্তুকে থামালো। পরশু স্টেজে ঢোকার মুখে ডান পায়ে হোঁচোট খেয়েছিল রজনী। গোড়ালিতে দারুণ ব্যথা। কন্ট্রাস্ট বাথ নিলে ব্যথাটা কমে। মনোরমাকে বলল, একটু গরম জল করে দিবি মা। পায়ে শেক দিতাম। ঠাণ্ডা গরম দু বকম জল দুটো গামলায় করে এনে দিবি?

মনো আর সবি ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল। তারা এভাবে পায় না মাকে অনেক দিন।

সন্তু যেমন এসেছিল—তেমনি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

শ্রীরাম ট্রাস্টের সম্পাদক হরিসাধন বসু ফতুয়ার বন্ধনী ভাল করে বেঁধে নিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। এটা তাঁর একতলার বৈঠকখানা। বেলা দশটা হবে। উল্টোদিকের চেয়ারে শশাঙ্ক দত্ত বসে। সবে তার চা শেষ হল। হরিসাধন বুঝলো, এবারে শশাঙ্ক কথাটা পাড়বে। সেজন্যে তিনি তৈরি হয়েই আছেন।

আপনার কথা মত ওদের দলের বড় একখানা পিলারকে সরাতে পেরেছি।

এই তো চাই। আপনি তো কারিৎকর্মা লোক। বলুন কত দূর এগোলো?

ওদের শংকরবাবুকে টানতে পেরেছি। যদ্দিন না ভরত হল আমাদের হাতে আসছে—ততদিন শংকরবাবুকে আমার এক জায়গায় ভিড়িয়ে দিচ্ছি।

আপনার আরও জায়গা আছে বুঝি?

এই সামান্য একটুখানি। বৈশাখ মাসে এক অপেরা পার্টিকে কিছু টাকা কর্জ দিয়েছিলাম। সুদে আসলে সেদিকে এখন আমার পাল্লাটা কিছু ভারি।

বেশ। বেশ। শুনে আনন্দ হচ্ছে। আপনি তো বিষয়কর্ম ভালো বোঝেন

সহজ ছন্দের হৃদয়স্পর্শী
কবিতার সংকলন

কাব্য সুষমা

ইন্দু দাঁ

দাম—দশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : "কবিনিবাস"—"মমতা"
৫৯, পাবমাব রোড ভদ্রকালী
উত্তরপাড়া, হুগলী

দেখছি। তাহলে তো আমাদের চিন্তা কি! আগে আপনার সঙ্গে দেখা হলে তো আমি পঞ্চমুখের এগেনস্টে মামলাতেই যেতুম না। আমরা দুজন এক সঙ্গে এগোতাম।

দুঃখ রাখবেন না বসুমশায়। অতীতের দিকে ফিরে তাকাবার সময় সেই আমাদের! আপনি আর আমি তো এখন এক সঙ্গেই এগোচ্ছি। এক সঙ্গেই আমরা উঠবো বসবো। শংকর অ্যাকটিং ভালোই করে। দু নম্বর সুজাতায় ওকে এখনকার মত লাগিয়ে দেব। মেইন রোলে চান্স পেয়ে খানিকটা গ্রেটফুলও হয়ে থাকবে আমার কাছে। ছোকরার নামে বড় করে প্রেস পাবলিসিটি হবে। ফলে আমাদের ওপরেই অনেকটা নির্ভর করতে হবে ওকে। আর ওদিকে ভরত হলের এক নম্বর সুজাতা নাটক এই ধাক্কায় খানিকটা নবমও হবে।

শশাঙ্কবাবু। আরেক কাপ চা দিক আপনাকে।

না। থাক এই তো খেলাম।

না। দিক। সব শুনে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। আপনার বুদ্ধি আছে বলতে

হবে। যত দুঃখ ভাবছেন আপনি সমস্যাটা নিয়ে। আশ্চর্য লাগছে আমার।

সবটা বলা হয় নি এখনো আমার। পাবলিসিটির জোরে নীলকমল যাত্রা পার্টির দু নম্বর সুজাতা হয়ে দাঁড়াবে এক নম্বর। মেইন রোলে চান্স পেয়ে—মোটা মাস মাইনে পেয়ে শংকরও মন-প্রাণ দিয়ে অভিনয় করবে। ভালো গানের গলা ছোকরার। তখন এক নম্বর সুজাতার অবস্থা হবে—দু নম্বর নয়—ধাক্কা খেতে খেতে তিন কি চার নম্বর! আর আপনারও ধাক্কা মারবার সুযোগ ওরা নিজেরাই করে দিচ্ছে।

কি রকম?

আমার খবর হল, পঞ্চমুখের অমিয়-বাবুরা নতুন নাটক নামাচ্ছে। মহলা চলছে।

তাতে আমি কি করতে পারি?

অনেক কিছু পারেন। এখন চুপ করে থাকবেন। নতুন নাটকের পয়লা শোয়ের দিন হাইকোর্ট থেকে শো-কজ করে ইঞ্জাংশন আনবেন। খরচ-খরচার পর মাথায় হাত দিয়ে বসবে। না পারবে বন্ধ করতে। না পারবে চালু রাখতে। বেরোবার রাস্তা পাবে না অমিয়বাবুরা। আপনার সঙ্গে তো শুধু সুজাতা নাটকের চুক্তি?

হ্যাঁ।

তাহলে নতুন নাটকের পেপার পাবলি-সিটি করার পর শোয়ের দিন যদি ইঞ্জাংশন আনতে পারেন—তবে তো কেল্লা ফতে! এক ঢিলে দুই পাখি মরবে! টাকার সোর্স সুজাতা বন্ধ রাখায় আমাদের নীলকমল যাত্রা সমাজের সুজাতা তখন এক নম্বর। সে একাই অডিয়ান্স টেনে নেবে সব। আর চুক্তিভঙ্গের দায়ে আপনিও পঞ্চমুখকে ভরত হল থেকে উড়িয়ে দিতে পারবেন।

দাঁড়ান। দাঁড়ান শশাঙ্কবাবু। এই নীল-কমল আবার কে? আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

নীলকমল যাত্রা সমাজ। পুরনো পুরনো ভালো লোকজন নিয়ে নতুন দল। সামান্য কিছু টাকা ঢেলেছিলাম। সেটাই সুদে আসলে এখন আমাকে ও দলে কিছু অধি-কার দিয়েছে। সেই জোরেই তো শংকর-বাবুকে আজ বিকেলে ওখানে নিয়ে যাচ্ছি।

তার মানে আপনি এখন নীলকমলের আসল অধিকারী!

তা বলতে পারেন। গতবারে ভরতে সুজাতার সাকসেস দেখলাম। নীলকমলেও ওরা তখন ঘুরছিল টাকার জন্যে। আমিই বুদ্ধিটা দিলাম ওদের। বললাম এপাশ-ওপাশ করে দু নম্বর সুজাতা লাগিয়ে দাও। বেশ লেগে গেছে। দিব্যি চলছে।

আপনাকে তারিফ না করে পারছি না শশাঙ্কবাবু। কিন্তু একটা কথা। ভরত হল নিয়ে কিন্তু আপনাকে ভাড়া বাড়াতে হবে।

আলবৎ বাড়াবো। আমার এখন আর নীলকমল যাত্রা সমাজের সঙ্গে বাইরে ঘুরে হিসেবপত্র রাখতে ভালো লাগে না। সিনেমার মত পাকা হলে এক জায়গায় বসে থিয়েটার হবে। দিনে একবার গিয়ে হিসেব বুঝে নেব। ব্যাস। এই চাই আমি বসুমশায়! এর কমও না। এর বেশিও না

তা ও দল থেকে মাগীটাকে ভাগিয়ে আনুন না। পঞ্চমুখের এক নম্বর মাগী।

শশাঙ্ক মুখে কিছু বলল না। মনে মনে বলল, মাগীর গুমোর ভাঙতেই তো এত কাঠখড় পোড়াচ্ছি। অ্যাকটিংয়ের গুমোর! পয়সার গুমোর! শালীকে আমার পায়ের তলে না আনি তো—

আচ্ছা? একটা কথা আমায় বলতে পারেন শশাঙ্কবাবু। কী থাকলে এখনকার নাটক চলে? গল্প? অ্যাকটিং? সেকস? খুনখারাবি? আমার তো সব গুলিয়ে যায় মশাই। মনে হচ্ছে, আপনি এ লাইনের পাকা লোক। তাই আপনার কাছেই জানতে চাইছি।

সবই চাই হরিসাধনবাবু। সবার আগে চাই একটি মেয়েছেলে।

ছিঃ! ছিঃ! ওভাবে কথা বলবেন না। নাটক সরস্বতীর জিনিস।

আপনি খোলাখুলি বলছিলেন—তাই বললাম। আমরা বন্ধুজন। আমাদের মধ্যে রেখেঢেকে কথা বলে লাভ নেই। ওই সঙ্গে চাই খানিক নাচ। তিন চামচ রসিকতা। চাই তামাশা নয়তো ভাঁড়ামি বলতে পারেন। সেকস তো রাখতেই হবে। আপনি আমা-দের পার্টনার হয়ে যান না। ভরত হল আপনার ইনভেস্টমেন্ট। প্রফিট ফর্টি. সিকসটি।

সিকসটি কার?

নীলকমলের।

আপনি তো তার অধিকারী।

খোলাখুলি নয়।

ওই একই। বকলমে তো? না শশাঙ্ক-বাবু। এই বয়সে আর ওসব হবে না। ঝক্কি আমার একদম সয় না। নিয়মিত হল ভাড়া পেলেই আমরা খুসী। ছ মাসের আগাম দেবেন। অর্ধেক শাদা। পাতায় উঠবে। বাকিটা বাড়িতে আমার হাতে দিতে পারেন।

শশাঙ্ক দত্ত এখন শ্রীরাম ট্রাস্টের হরি-সাধন বসুর গোঁফের সোনালী তারগুলো শুধু দেখতে পেল। গোঁফের কালো ভাগ-টুকু ঘরের মেঘলা আলোর সঙ্গে মিশে গেছে।

একতলায় জুতো, লুঙ্গি আর মাছ ধরার ছিপের দোকান। ট্যাকসির ভাড়া মিটিয়ে দোতলা বাড়িটার সামনে শংকরকে নিয়ে শশাঙ্ক নামলো। আজই ভাই চুক্তিতে সই করো। মাস মাসেই দেড় হাজার টাকা। বছর ঘুরলে বোনাস পুরো হাজার টাকা। মনে কর এ দল তোমার। তুমি গড়ে-পিটে নাও। পঞ্চমুখের মত এখনে কেউ তোমায় একসপ্লয়েট করবে না।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠছিল দুজনে। মোটোর ওখান থেকে ট্যাকসিতে উঠে অবধি এই চিৎপুর পর্যন্ত কথা একা শশাঙ্কই বলে আসছে। শংকর এতক্ষণ হ্যাঁ, না কিছুই বলে নি। শুনে যাচ্ছে।

(ক্রমশ)

বিজ্ঞানের কথা

*সয়ুজ-২১ ও তার নভশ্চর
* ডকিং
* মঙ্গলগ্রহে ভাইকিং

পৃথিবীর কাছাকাছি আকাশে গবেষণা ও অনুসন্ধান চালানোর জন্য গত ৬ জুলাই তারিখে ভারতীয় সময় বিকেল ৫টা ৩৯ মিনিটের সময়ে সোভিয়েত মহাকাশযান সয়ুজ-২১ উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। মহাকাশযানে দুজন যাত্রী—অধিনায়ক কর্নেল বোরিস ভলিনভ এবং ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার লেফটানেন্ট কর্নেল ভিতালি জোলোবভ।

ইতিপূর্বে ২২ জুন তারিখে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকার্য চালাবার জন্য সালিয়ুৎ-৫ নামে একটি স্টেশন পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপিত হয়েছিল। সয়ুজ-২১ কক্ষপরিক্রমারত এই স্টেশনের সঙ্গে ৭ জুলাই তারিখে জোটবদ্ধ হয়েছে এবং অতঃপর দুই নভশ্চর সালিয়ুৎ-৫ স্টেশন থেকে নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ শুরু করেছেন।

সয়ুজ-২১ মহাকাশযানের নভশ্চর

বোরিস ভলিনভের বয়স ৪২, সোভিয়েত ইউনিয়নের এই পাইলট নভশ্চর 'সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর' সম্মানে ভূষিত। গত ষোল বছর ধরে তিনি নভশ্চরদের দলে আছেন।

মহাকাশে ভলিনভের প্রথম যাত্রা ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে। সে-যাত্রায় তাঁর সঙ্গী ছিলেন ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার আলেকসই ইয়েলিসিয়েভ ও ইঞ্জিনিয়ার-গবেষক ইয়েভগেনি খ্রুনভ। সয়ুজ-৫ মহাকাশযানকে তিনি কক্ষে স্থাপন করেছিলেন এবং সেই মহাকাশযানের সঙ্গে ভলাদিমির শাতালভ চালিত সয়ুজ-চারের মিলন ঘটিয়েছিলেন। এই দুটি মহাকাশযানের মিলনের ফলেই সে-সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল বিশ্বের প্রথম পরীক্ষামূলক কক্ষ-পরিক্রমাকারী গবেষণাগার। এই সফল পরীক্ষাকার্যের মাধ্যমেই গড়ে উঠেছিল মহাশূন্যে সালিয়ুৎ-ধরনের কক্ষ-পরিক্রমাকারী গবেষণাগার স্থাপনের কারিগরী ভিত্তি। সয়ুজ-২১ মহাকাশযানের উৎক্ষেপণ এই একই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য।

মহাকাশে প্রথম যাত্রা করার পরে যে সাত বছর পার হয়েছে সেই সময়ে বোরিস ভলিনভ ছিলেন একদল নভশ্চরের অধিনায়ক। বিশেষ করে তিনি তরুণ নভশ্চর ভলাদিমির দজানিবেকভ ও য়ুরি রোমানেঙ্কোকে সোভিয়েত-আমেরিকান সয়ুজ-অ্যাপোলো যৌথ প্রকল্পের জন্য তৈরি করেছিলেন।

তাঁর স্ত্রী তামারা ধাতুবিদ্যার ইঞ্জিনিয়ার, আঠারো বছরের ছেলে ট্রান্সপোর্ট ইনস্টিটিউটের ছাত্র, এগারো বছরের মেয়ে স্কুলের ছাত্রী।

ভিতালি জোলোবভের বয়স ৩৯, ইউক্রাইনে জন্ম। ১৯৫৯ সালে আজারবাইজান পেট্রো-রসায়ন ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক, পরবর্তীকালে সোভিয়েত সৈন্যদলের অফিসার ও টেস্ট-ইঞ্জিনিয়ার। ১৯৬৩ নভশ্চরদের দলে যোগদান। নভশ্চরদের শহরে তের বছরের কাজের মধ্যে দিয়ে ভোস্তক ও সালিয়ুৎ ধরনের মহাকাশযান সম্পর্কে নিখুঁত জ্ঞানলাভ করেছেন। নিজের কাজে ছেদ না ঘটিয়ে ১৯৭৪ সালে স্নাতক হয়েছেন লেনিন সামরিক-রাজনৈতিক আকাদেমি থেকে। তিনি বিবাহিত, স্ত্রী লিলিয়া ইঞ্জিনিয়ার, চোদ্দ বছরের মেয়ে স্কুলের ছাত্রী।

ডকিং

কক্ষপথে দুই মহাকাশযানের জোটবদ্ধ হওয়াকে ইংরেজিতে বলে ডকিং। যেমন, এক্ষেত্রে বলতে হবে সালিয়ুৎ-পাঁচের সঙ্গে সয়ুজ-একুশের ডকিং সম্পন্ন হল। কক্ষপথে সবচেয়ে বিখ্যাত ডকিং সম্পন্ন হয়েছিল গত বছর ১৫ জুলাই তারিখে—সোভিয়েত সয়ুজের সঙ্গে আমেরিকান অ্যাপোলোর।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছেন, মহাকাশে গবেষণা চালাবার জন্য ও নভশ্চারণার জন্য আগামী বছরগুলিতে আরো বহুবার তাঁরা কক্ষপথে দুই মহাকাশযানকে জোটবদ্ধ করবেন। আমেরিকান বিজ্ঞানীরা যে ফেরি-রকেট নিয়ে গবেষণা করছেন তার জন্যেও বারে বারে ডকিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

এই উপলক্ষে ডকিং সম্পর্কে কিছু আলোচনা তোলা যেতে পারে।

কক্ষপথে দুই মহাকাশযানের ডকিং খুব সহজে সম্পন্ন হয় না। যেমন, পুরো একদিন সময় লেগেছে সালিয়ুৎ-পাঁচের সঙ্গে সয়ুজ-একুশের ডকিং সম্পন্ন হতে। কেন এত সময়

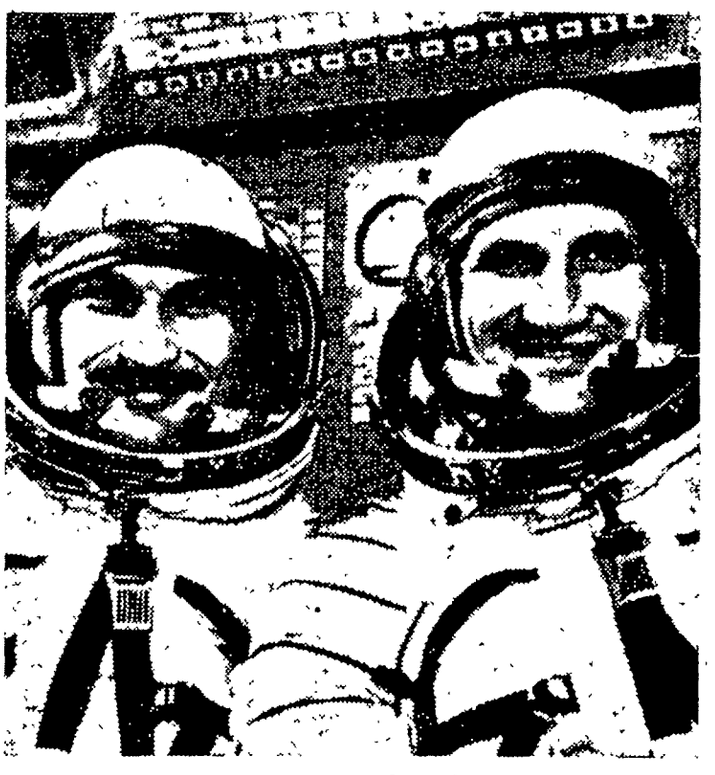

সয়ুজ-২১ মহাকাশযানের দুই নভশ্চর—বোরিস ভলিনভ (ডানদিকে) ভিতালি জোলোবভ

লাগল? এই প্রশ্নের জবাব একজন সোভিয়েত বিশেষজ্ঞের মুখে শোনা যাক।

ডকিং-এর প্রক্রিয়াটি খুবই শ্রমসাধ্য ব্যাপার। দুই মহাকাশযানকে পরস্পরের কাছাকাছি আনা ও একই কক্ষে স্থাপন করার জন্য অনেক কিছু করতে হয়।

একটি ব্যোমযানকে যখন কক্ষে স্থাপন করা হয় তখন সেই কক্ষটি হয় উপবৃত্তাকার। অতএব প্রথমেই দরকার হয়ে পড়ে কক্ষ-পথের নির্ভুল মাপজোক নেওয়ার। তার-পরে রকেট-ইঞ্জিন চালু করে সেই কক্ষ-পথকে বৃত্তাকার করে তুলতে হয়। সালিয়ুৎ ও সয়ুজের এই বিশেষ ক্ষেত্রে কাজটি অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল এ-কারণে যে দুই মহাকাশযানেরই গোড়ার কক্ষপথ ছিল ডকিং-এর পক্ষে অতি উত্তম। দুই নভশ্চরও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বোরিস ভলিনভের কৃতিত্বের দরুণ অন্তত একবার ইঞ্জিন চালু করতে হয়নি।

ডকিং সম্পন্ন হয় কিভাবে?

ডকিং-এর জন্য অপেক্ষমান স্টেশন যে কক্ষপথে থাকে তার চেয়েও নিচের একটি কক্ষপথে মহাকাশযানকে ওঠানো হয়। অর্থাৎ মহাকাশযান থাকে স্টেশনের 'পিছনে'।

ডকিং সম্পন্ন করার ব্যাপারে মহাকাশ-যানকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হয়। রকেটের ইঞ্জিন চালু করে ত্বরান্বিত করতে হয় গতি-বেগ। তার ফলে একদিকে যেমন মহাকাশ-যান স্টেশনের আরো কাছাকাছি আসে অন্য-দিকে একই সঙ্গে উচ্চতর কক্ষপথে স্থাপিত হয়। জোটবদ্ধ হওয়ার ক্রিয়াকাণ্ডে আছে দুটি পর্ব—প্রাথমিক ও প্রান্তিক। প্রথম পর্বে নিয়ন্ত্রণের কাজকর্ম চালানো হয় ভূপৃষ্ঠ থেকে, কেননা নভশ্চরদের কাছে স্টেশন তখনো অদৃশ্য। ভূপৃষ্ঠ থেকেই সঠিকভাবে হিসেব করতে হয় ঠিক কোন সময়ে মহাকাশযানের ইঞ্জিন চালু করতে হবে এবং কতক্ষণ ধরে তা চালু থাকবে। মহাকাশযানের নভশ্চরদের তখন বিশেষ কিছু করার নেই।

প্রান্তিক পর্ব শুরু হয় যখন মহাকাশযান ও স্টেশনের মধ্যে দূরত্ব থাকে ২৫ কিলো-মিটারের মতো। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে ওঠে দুই মহাকাশযানের আপেক্ষিক গতিবেগ এবং দূরত্বের মধ্যেকার দূরত্ব। তারপরে দূরত্ব যখন হয়ে দাঁড়ায় কয়েকশো মিটার মাত্র তখন স্বয়ংক্রিয় উপায় কাজ করতে শুরু করে। স্টেশন থেকে নির্গত হয় রেডিও ঝলকের মতো সংকেত এবং তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে মহাকাশযান স্টেশনের কাছাকাছি আসে। এই অবস্থায় নভশ্চরেরও কিছু করার থাকে, স্বয়ংক্রিয়তার উপায় নিয়ন্ত্রণ করে সে। তারপরে দূরত্ব যখন হয়ে দাঁড়ায় ১০০ মিটার মতো এবং স্টেশনকে সরাসরি দেখতে পাওয়া যায় এক-মাত্র তখনই নভশ্চরের অনেক কিছু করার থাকে এবং দক্ষতার পরিচয় দেওয়ার সুযোগ থাকে। নভশ্চর না থাকলেও ডকিং অসাধ্য নয়। যেমন, মনুষ্যবিহীন সয়ুজ-২০ (উৎক্ষেপণ ১৭ নভেম্বর ১৯৭৫) সালিয়ুৎ-৪ স্টেশনের সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় উপায়ে জোটবদ্ধ হয়েছিল।

মঙ্গলগ্রহে ভাইকিং

গত বছর আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে অল্প কিছুদিন পরে-পরে আমেরিকা থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল মঙ্গলগ্রহে অনুসন্ধান চালাবার জন্য ভাইকিং-১ ও ভাইকিং-২। ৩০০ দিনের অধিক সময়ে ৩২ কোটিরও অধিক কিলোমিটার দূরত্ব পার হয়ে ভাইকিং-১ মঙ্গলগ্রহের উপগ্রহ হয়ে উঠেছে। ভাইকিং-এ আছে কক্ষপথে পরিক্রমার একটি অংশ এবং একটি অবতরণ-যান। ৪ঠা জুলাই তারিখে অবতরণ-যানটির মঙ্গলের মাটিতে নামার কথা ছিল, কিন্তু কক্ষ-পরিক্রমাকারী ভাইকিং-এর পাঠানো আলোকচিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় অবতরণ-স্থানটি অবতরণ-যানের অবতরণের পক্ষে বড়ো বেশি বন্ধুর। পরে অন্য একটি স্থান নির্বাচিত হয়েছে (আলোকচিত্রের বিশ্লেষণ থেকে) এবং ২০ জুলাই সেই স্থানে অবতরণ করেছে।

ভাইকিং-১ মহাকাশযানের ল্যান্ডার বা অবতরণ-যানটি মঙ্গলের মাটিতে যেখানে নেমেছে সেটি সতর্কতার সঙ্গে নির্বাচিত। ১৯৭৩ সালে সোভিয়েত মার্স-৬ অবতরণ-যানও মঙ্গলের মাটিতে নেমেছিল, কিন্তু তারপরে সেটিতে আর সাড়া থাকেনি। ভাইকিং-১ অবতরণ-যানের অবতরণ সুসম্পন্ন হয়েছে, অতএব আশা করা চলে এই যান অনুরূপ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়বে না।

এই যানে আছে পাঁচ কোটি ডলার ব্যয়ে নির্মিত এবং এক ঘনফুট আয়তনের মধ্যে ঠাসা একটি ক্ষুদ্রাকার ল্যাবরেটরি। তার সাহায্যে সম্পন্ন হবে তিনটি পৃথক জৈব পরীক্ষাকার্য। উদ্দেশ্য, মঙ্গলের মাটিতে জীবনের লক্ষণ অনুসন্ধান করা। জুলাই মাসের শেষ নাগাদ এ-বিষয়ে প্রাথমিক কিছু ঘোষণা আশা করা যেতে পারে, তবে সম্ভবত আগস্ট মাসের মাঝামাঝির আগে নির্দিষ্ট কিছু জানা যাবে না। উল্লেখযোগ্য বিষয়, এবারের পরীক্ষাকার্য সম্পর্কে অস্বাভাবিক গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছে। বোধ-হয় এই কারণে যে মঙ্গলগ্রহে প্রাণ আবি-ষ্কৃত হওয়ার সংবাদের বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব ছাড়াও আছে বিরাট দার্শনিক তাৎপর্য। কোপারনিকাসের বিপ্লব বা ডারউইনের বিপ্লব বুদ্ধিজগতে যে বিপুল আলোড়ন তুলেছিল তা এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা চলে।

প্রায় একশো বছর আগে ইতালীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী গিওভানি শিয়াপারেলি মঙ্গলগ্রহ পর্যবেক্ষণ করে 'কানালি' (ইতালীয় ভাষায় অর্থ প্রণালী, কিন্তু ভুল অনুবাদ করে বলা হয়েছে ক্যানাল বা খাল) দেখেছিলেন, তারপর থেকে এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর বাইরে জীবনের লক্ষণ সন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা ও বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনীর লেখকরা তাকিয়েছেন এই লাল

মন মধুকরের নিবেদন

ক্ল্যাসিক ভ্রমণ-সাহিত্য, 'শংকর-নর্মদা'-খ্যাত

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের

॥ বাণী বারকরী ॥

॥ বারকরী যাত্রা এক যুগাশ্রয়ী ব্রতসংবদ্ধ পরিক্রমা। এক মহান জাতির আত্ম-বিকাশের ইতিবৃত্ত এই যাত্রার মধ্যে উদ্ঘাটিত। পথপ্রদর্শক জ্ঞানেশ্বর নামদেব একনাথ তুকারাম প্রমুখ সন্তকবি ও যুগন্ধর লোকনায়ক। অভঙ্গ বাণীর ছন্দে সুরে ঐক্যের অনুপ্রাণনা, জাতীয়তার উৎসব-সূচনা ॥

॥ নিষ্ঠাকঠোর সুদীর্ঘ পদযাত্রার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সন্ত কবিদের জীবনলীলা ও গীতিগুচ্ছ সমৃদ্ধ এই পরমরমণীয় সাহিত্যকৃতি প্রতিটি বিদ্যানিকেতন ও গ্রন্থাগারের অপরিহার্য সঞ্চয় ॥

কুড়ি টাকা

পরিবেশক :

অভ্যুদয় : ৬ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

নব ভারতী : ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

গ্রহটির দিকেই। তার কারণও আছে। এখনো পর্যন্ত যতোদূর জানা গিয়েছে, মঙ্গল হচ্ছে যথেষ্ট শীতল একটি গ্রহ, সেখানকার তাপমাত্রা কদাচ হিমাঙ্কের ওপরে ওঠে। ফলে মঙ্গলের অধিকাংশ জল রয়েছে বরফের অবস্থায়, আবার এই বরফেরও অধিকাংশ মেরু-টুপিতে। এই মেরু-টুপির সবটাই বরফ নয়, তার সঙ্গে আছে কঠিন-অবস্থাপ্রাপ্ত কার্বন ডাই-অকসাইড। এই প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও এমন মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে মঙ্গলগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। এই পৃথিবীতেও অনুরূপ প্রতিকূল অবস্থায় প্রাণের অস্তিত্ব থাকার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। ১৯৭১ ও ১৯৭২ সালে মেরিনার —৯ থেকে যেসব আলোকচিত্র পাওয়া গিয়েছে তা বিশ্লেষণ করে মনে হতে পারে মঙ্গল রয়েছে দীর্ঘ এক আবহাওয়া-চক্রের হিমযুগে। ছবিগুলোতে এমন বহু নদী ও নালার চিহ্ন পাওয়া যায় যাতে কোটি কোটি বছর আগের আরো উষ্ণ আবহাওয়ায় জলের প্রবাহ ছিল মনে হয়। তার মানে কি এই যে আজকের পৃথিবীতে যেমন প্রাণের সাড়া তেমনি একসময়ে ছিল মঙ্গলেও?

এ-থেকে ধরে নিতে হয়, মঙ্গলগ্রহে জীবনের লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে দুই ধরনের। প্রথমত, এমন কোনো জীবের অস্তিত্ব পাওয়া যেতে পারে যারা অতিশয় শীত ও জলাভাবের অবস্থায় অভ্যস্ত। দ্বিতীয়ত, এমন কোনো জীবের যারা লুপ্ত বা সুপ্ত। ভাইকিং-এর পরীক্ষাকার্যে অনুসন্ধান চলবে অস্তিত্বশীল জীবের। অতীতের লুপ্ত জীব সম্পর্কে নজর না-থাকারই কথা যদি-না সেই জীব এমন কোনো বৃহৎ চিহ্ন রেখে যায় যা টেলিভিশনের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে।

জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা

ভাইকিং-এর ল্যাবরেটরিতে তিনটি জৈব পরীক্ষাকার্য চলার কথা। প্রথম পরীক্ষাকার্যে নির্ণীত হবে মঙ্গলের জীবাণু কর্তৃক কার্বন ডাই-অকসাইড গ্রহণ ও তার বিপাকক্রিয়ার ব্যাপারটি দ্বিতীয় পরীক্ষাকার্যে পুষ্টির বিপাকক্রিয়াগত ভাঙনের। তৃতীয় পরীক্ষাকার্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ জমিতে জীবের দ্বারা সৃষ্ট গ্যাসীয় পরিবর্তনের।

মাটিতে নামার অল্প পরেই অবতরণযান তার টেলিস্কোপিক বাহু বিস্তার করে প্রায় ১৩০ ঘন সেন্টিমিটার পরিমাণ মাটি তুলে নেবে। এ থেকে মাত্র ৭ ঘন সেন্টিমিটার পরিমাণ মাটি জৈব পরীক্ষাকার্যের জন্য পৃথক করার ব্যবস্থা।। প্রথম পরীক্ষাকার্যটি অনেকটা এই রকম ঃ খানিকটা মাটি বিশেষ এক প্রকোষ্ঠে গরম করা, তারপরে কৃত্রিম সূর্যের (জেনন আর্ক ল্যাম্প) উত্তাপের মধ্যে রেখে তাকে পাঁচদিন ধরে তেজস্ক্রিয় কার্বন ডাই-অকসাইড ও কার্বন মনোকসাইডের সামনে উন্মুক্ত রাখা, তারপরে ৭০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করা, এইসব প্রক্রিয়ার পরে নিঃসৃত গ্যাস যদি তেজস্ক্রিয় হয় সেটাই হবে মঙ্গলের মাটিতে জীবের অস্তিত্বের প্রমাণ। দ্বিতীয় পরীক্ষাকার্যে নির্ণীত হবে কার্বন ডাই-অকসাইড, নাইট্রোজেন, মিথেন, হাইড্রোজেন বা অকসিজেনের সঙ্গে উষ্ণ মাটির লক্ষণীয় ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া। তা থেকে প্রমাণিত হবে সুপ্ত জীবের অস্তিত্ব। তৃতীয় পরীক্ষাকার্যের দ্রষ্টব্য বিষয় কতকগুলো সরল জৈব রাসায়নিকের মিশ্রণ মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে এগারোদিনব্যাপী উল্কাভাভের পরে বিপাকঘটিত লক্ষণযুক্ত হয় কিনা। যদি হয় তাহলে সেটাই জীবন্ত প্রাণীর অস্তিত্বের প্রমাণ।

এই একই পরীক্ষাকার্য পুনরায় চলার কথা দ্বিতীয় মহাকাশযান ভাইকিং-২ অবতরণের পরে। দ্বিতীয়টি অবতরণ করছে ৪ সেপ্টেম্বর তারিখে। তার অবতরণের স্থান আরও উত্তরে যেখানে প্রায় তরল অবস্থায় জলও থাকা অসম্ভব নয়।

মঙ্গলে যদি জীবের অস্তিত্ব থেকে থাকে তাহলে তার চেহারা কেমন? বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনীর লেখকরা অনুমান করেছেন, মঙ্গলগ্রহের জীব খুবই ক্ষুদে আকারের। এই অনুমান অনেকটা এই ধারণা থেকে যে মঙ্গলগ্রহের জীব পৃথিবীর জীবের চেয়ে অনুন্নত। কিন্তু বিজ্ঞানের দিক থেকে দেখলে ব্যাপারটা উলটো হবারই সম্ভাবনা। মঙ্গলগ্রহের শীতল আবহাওয়া বৃহদাকার জীবের পক্ষেই অধিকতর উপযোগী। তবে জীবের চেহারা যে সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কেননা মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলে ওজোন স্তর নেই, ফলে অতিবেগুনী রশ্মি অবাধে মঙ্গলের মাটি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। পৃথিবীর জীব এই রশ্মির মধ্যে কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারে না। এ অবস্থায় মঙ্গলগ্রহে যদি জীব থেকে থাকে তাদের চেহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে বাধ্য। এমনও হতে পারে মঙ্গলের জীবের শরীর গড়ে ওঠার ভিত্তি কার্বন নয়, অন্য কিছু।

শুধু জৈব পরীক্ষাকার্যই নয়, ভাইকিং-এর অবতরণযানে অন্যান্য পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন করার ব্যবস্থা আছে। যেমন, ইলেকট্রনিক ক্যামেরার সাহায্যে চারদিকের স্থানিক দৃশ্য গ্রহণ, প্রতি ঘণ্টায় বাতাসের গতিবেগ ও দিক নির্ধারণ, তাপমাত্রা নির্ণয় ইত্যাদি। অন্যদিকে, অবতরণযান নেমে আসার পরে ভাইকিং-এর যে অংশটি কমপক্ষে মঙ্গলকে পরিক্রমা করে চলেছে, যাকে বলা হচ্ছে অরবিটার, তার সাহায্যে পৃথিবীতে তথ্য প্রেরণের ব্যবস্থা করা ছাড়াও নানা পরীক্ষাকার্য চালানো হবে। প্রতি কুড়িদিন অন্তর অরবিটারের সাহায্যে সমগ্র মঙ্গলগ্রহের রঙীন আলোকচিত্র নেওয়া হবে। অনুসন্ধান চালানো হবে কোথাও কোনো আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব আছে কিনা। পরিমাপ নেওয়া হবে মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে ধুলোর পরিমাণের, মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণগত ক্ষেত্রের, মঙ্গলের আবর্তনগত অক্ষের। এমনি আরো অনেক কিছুর।

মঙ্গলের দুটি ছোট চাঁদ আছে—দাইমো ও কোবো। পরিকল্পনা আছে, এ-বছরের ডিসেম্বরে ও আগামী বছরের জানুয়ারি ও মার্চে এই দুটি চাঁদ থেকে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটারের মধ্যে অরবিটারের অবস্থান ঘটানো যাবে এবং সৌরমণ্ডলের এই দুটি আশ্চর্য বস্তু সম্পর্কে অনেক কিছু খবর সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।

পরিকল্পনা আরো আছে। ৭ সেপ্টেম্বর নাগাদ ভাইকিং-১ অবতরণযানের কাজ শেষ হয়ে যাবার কথা, তারপরে কক্ষ-পরিক্রমাকারী যানকে এমনভাবে স্থাপন করা হবে যেন মঙ্গলগ্রহের পুরো একটি বছর (অর্থাৎ ১৯৭৮ সালের জুন পর্যন্ত) মঙ্গলের কক্ষ পর্যবেক্ষণাধীন থাকে।

ভাইকিং সম্পর্কে সবচেয়ে বড়ো কথা এটি নানাভাবে ব্যবহৃত হবার উপযোগী। আশা করা হচ্ছে, ভাইকিং প্রতিদিনই নতুন নতুন আবিষ্কার করে চলবে এবং আরো নতুনভাবে ব্যবহৃত হতে পারবে। ভাইকিং থেকে পাওয়া তথ্য থেকে আরো ভালো জানা যাবে মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের বিবর্তন সম্পর্কে, পৃথিবীর বাইরে অন্য গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব সম্পর্কে।

২০-৭-৭৬

অয়স্কান্ত

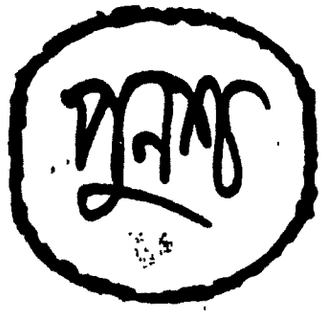

।। মৎস্য-নারী ।।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গ্রীস দেশীয় প্রাচীন কবি হোমার তাঁহার 'ওডিসি' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন যে, সিসিলির নিকটবর্তী কোন একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে তিনটি সিন্ধু-কামিনী বাস করত। কোন তরণী দেখিলে তাহারা এরূপ সুমিষ্ট স্বরে গান করিত যে তরণী স্থিত নাবিকগণ তরণীর গতি স্থগিত রাখিত। তাহারা সেই গান শুনিয়া বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া স্ব স্ব কার্য্য বিস্মৃত হইত। এমন কি অবশেষে তাহারা ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া তথায় প্রাণত্যাগ করিত। একদা ইউলিসিসের ঐ সঙ্কটাপন্ন স্থান পার হইবার বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল। তিনি যেরূপ আশ্চর্য্য বুদ্ধি কৌশলে ঐ স্থান পার হইয়াছিলেন তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে। তিনি ঐ সঙ্কটাপন্ন স্থান পার হইবার সময় নাবিকদিগের কর্ণকুহর এরূপ দৃঢ়ভাবে বন্ধ করিয়াছিলেন যে, যেন তাহারা ঐ গান শুনিতে না পায়, অনন্তর নিজ শরীর জাহাজের সর্ব্বোচ্চ মাস্তুলে দৃঢ়ভাবে বন্ধ করিয়া রাখেন। ঐ স্থানে তরণী আগত হইলে ইউলিসিস, সেই নারীগণাদিগের সুমধুর গীতে এরূপ বিমোহিত হইয়াছিলেন যে, (তরণী স্থগিত রাখিলে কিরূপ বিপদ উপস্থিত হয়, জানা সত্ত্বেও) তরণী রাখিতে নাবিকদিগকে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু নাবিকদিগের কর্ণকুহর বিশেষরূপে আবদ্ধ থাকায়, তাহারা ঐ সুমধুর গীত বা তাহার আদেশ কিছুই শুনিতে পায় নাই। সুতরাং তাহারা নিরাপদে ঐ বিষম সঙ্কটাপন্ন স্থান উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ইউলিসিসের শ্রবণাবরব আবদ্ধ ছিল না; এ-হেতু তিনি গীতও শুনিলেন এবং প্রাণেও বাঁচিলেন।

১১৮৭ খৃস্টাব্দে ইংলণ্ডের সসেকস্ প্রদেশের সমুদ্রে একটি মীন-নর ধৃত হইয়াছিল। উহা ধৃত হইয়া ছয়মাসকাল জীবিত ছিল। উহা স্থলে পুরুষের ন্যায় অনেক বিষয় আচরণ করিত, কেবল কথা কহিতে পারিত না।

১৮১১ খৃস্টাব্দের কোন একখানি বিখ্যাত সংবাদপত্র হইতে আমরা দুইটি সমুদ্র-মানব শিশুর বিষয় উদ্ধৃত করিলাম। ঐ বৎসর প্রবল ঝটিকার পরাদিবস ইংলণ্ডের নিকটবর্তী আইলস অব ম্যান নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে তিনজন নাবিক জল-বিহঙ্গম শিকার মানসে সমুদ্রের উপকূলে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সহসা বিড়ালশিশুর ক্রন্দনধ্বনির ন্যায় এক প্রকার শব্দ তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। বহু অনুসন্ধানের পর তাঁহারা জলের সন্নিহিত পর্ব্বত গহ্বরে দুইটি অদ্ভুত জীব দেখিতে পাইলেন। উহাদিগের শরীর অর্দ্ধ-মনুষ্যাকৃতি ও অর্দ্ধমৎস্যাকৃতি। উহাদের মধ্যে একটি বিড়াল শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিতেছে এবং অপরটি প্রাণত্যাগ করিয়া ধরাপৃষ্ঠে পতিত রহিয়াছে। মৃতটির শরীরে ক্ষতবিক্ষতের চিহ্ন সকল দৃষ্টিগোচর হইল। বোধহয় গত রাত্রির ঝটিকায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বণিকের স্বীয় বাসভূমি ডগলাস নগরে ঐ জীবিত প্রাণীটিকে আনয়ন করিয়াছিলেন। উহার শরীরের দৈর্ঘ্য, মস্তক হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত নানাধিক ৪ ফুট, স্কন্ধদেশের বিস্তার ৫ ইঞ্চি, ত্বক তরল পাটলবর্ণের এবং পুচ্ছভাগের শল্ক সকল কিঞ্চিৎ রক্তাভ। চুলগুলি স্পর্শ করিলে আঠার ন্যায় অনুভূত হয়; চুলগুলি দেখিতে ঠিক সমুদ্র-নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতোপরিস্থ শৈবালের মত। মুখ গহ্বর নিতান্ত অপ্রশস্ত ও দন্তহীন। শাবকটিকে জলে রাখা হইয়াছিল। সে তাহাতে পরমানন্দে সাঁতার দিত এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে চিংড়ী মৎস্য আহার করিত। পেনকলমের ভিতর করিয়া দুগ্ধ ও জল মুখের নিকট ধরিলে আনন্দ সহকারে পান করিত। যে সময় সংবাদপত্রে এই বিবরণটি লিখিত হয়, তখন ঐ জীবটি জীবিত ছিল। কোন্ সময় মরিয়া যায়, তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

সন ১৩০৪ সালে এই কলিকাতা মহানগরীতে একবার একটি মৃত মৎস্য-নর আসিয়াছিল। সেটি দৈর্ঘ্যে ৫ হাত ছিল। মজীবেরা এক পয়সা দর্শনী লইয়া অনেককে দেখাইয়াছিল। আমরা স্বচক্ষে ইহা দেখিয়াছি। সুতরাং 'মৎস্য-নর' বা 'মৎস্য-নারী' সম্বন্ধে আর কোনরূপ অবিশ্বাসের কারণ নাই।

এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়া স্বতঃই আমাদিগের মনে পুরাণ লিখিত মৎস্যাবতারের কথা উদিত হয়। কিন্তু পুরাণ প্রমাণে ভগবান অবিকল মীন শরীর ধারণ করিয়াছিলেন। কেবল তাঁহার ললাটদেশে বিশাল বিষাণ ছিল। অতএব আমাদিগের বর্ণিত অর্দ্ধনর ও অর্দ্ধমৎস্য, তাঁহার বংশ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। কিন্তু উপরোক্ত প্রমাণে বেশ বুঝা যায়, যে মৎস্য নরনারীর অস্তিত্ব কোনরূপ কল্পনাপ্রসূত নহে।

অতঃপর এস্থলে আমরা পুনরপি স্বর্গীয় সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'পৌরাণিক অভিধান' থেকে প্রসঙ্গত 'মৎস্যাবতার' সম্বন্ধীয় বিষয় উদ্ধৃত করে এই 'মৎস্য-নারী' অংশটি সম্পূর্ণ করছি। এতদ্ব্যতীত আমাদের পুরাণকারদের এতদ্‌বিষয়ক বক্তব্য অনুধাবন করা সহজ হবে।

।। মৎস্যাবতার ।।

বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে প্রথম অবতার। বিষ্ণু প্রথমে মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হন। পুরাকালে বিবস্বানের পুত্র মনু অতি প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তিনি তপস্যাদির দ্বারা পিতৃ-পিতামহদের অতিক্রম করেন। একদিন তিনি ঘোর তপস্যায় রত আছেন, এমন সময় এক ক্ষুদ্র মৎস্য এসে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। কারণ, সে প্রবল এক মৎস্য কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে ভীত হয়েছে। সে বলে যে, তাকে রক্ষা করলে সেও প্রতিদানস্বরূপ প্রত্যুপকার করবে। বৈবস্বত মনু এই ক্ষুদ্র মৎস্যকে আশ্রয় দিলেন। এই মৎস্য দিন দিন এমনভাবে বৃদ্ধি পেতে লাগল যে, যে স্থানে সে ছিল, তা অত্যন্ত ক্ষুদ্র হওয়ায় তাকে মনু একটা পুষ্করিণীতে রেখে দিলেন। এখানেও সে এত বৃহৎ হয়ে পড়ল যে, দুই যোজন দীর্ঘ ও এক যোজন বিস্তৃত এই পুষ্করিণীতেও এর জায়গা হল না। তখন মৎস্যের অনুরোধে মনু একে গঙ্গায় রেখে দিলেন, কিন্তু গঙ্গাতেও তার শরীর স্থানের সঙ্কুলান হল না। তখন তাকে সমুদ্রে রাখার ব্যবস্থা হল। সমুদ্রে এসে সে মনুকে বলল যে, এখন প্রলয়কাল উপস্থিত হয়েছে, সমস্ত পৃথিবী প্রলয় সলিলে নিমগ্ন হবে। এখন আপনি বজ্র সংযুক্ত একটি নৌকা নির্মাণ করুন। সেই নৌকায় আপনি সপ্তর্ষিদের সহিত উঠুন। আপনার সহিত সর্বপ্রকার বীজও রাখুন। আপনি ঐ নৌকায় বাস করে আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। আমি শৃঙ্গযুক্ত হয়ে আপনার কাছে উপস্থিত হব। এবং আমিই আপনাকে এই মহাপ্রলয় থেকে উদ্ধার করব।

এই কথা অনুসারে মনু এক বৃহৎ নৌকায় অবস্থান করতে লাগলেন। পরে এই মৎস্য শৃঙ্গযুক্ত হয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হল। তখন এই নৌকা সমুদ্রের প্রলয়োচ্ছ্বাসে ভীষণভাবে আন্দোলিত হতে লাগলো। এই সময়ে ঐ মৎস্য তার মাথার সিংয়ের সহিত নৌকাকে আবদ্ধ করে নৌকাস্থিত সকলকে রক্ষা করবার জন্য লবণ জলের মধ্যে আকর্ষণ করে নিয়ে যেতে লাগল। তখন মহাপ্রলয়ে সমস্ত দিক জলমগ্ন হয়ে গিয়েছিল। কেবল মৎস্য, মনু ও সপ্তর্ষি ভাসমান অবস্থায় বহু বৎসরকাল অবস্থান করলেন। শেষে এই মৎস্য হিমালয়ের শ্রেষ্ঠ শৃঙ্গকে আকর্ষণ করে নিয়ে এসে ঋষিদের এই শৃঙ্গের সহিত নৌকা বন্ধন করতে বলল। ঋষিরাও নৌকাকে হিমালয়ের শৃঙ্গের সঙ্গে আবদ্ধ করলেন। এরপর মৎস্য ঋষিদের জানালেন যে, তিনিই স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা। তিনি মৎস্যরূপ ধারণ করে এঁদের মহাভয় হতে রক্ষা করেছেন। এখন মনু সুর, অসুর, মানুষ—সর্বপ্রকার প্রজা সৃষ্টি করবেন। জড় এবং চেতন প্রাণীও তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হবে। মৎস্য এই বলে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পরে বৈবস্বত মনু প্রজাসৃষ্টির মানসে কঠোর তপস্যা করে সমস্ত প্রাণী জগৎ সৃষ্টি করলেন। এই জন্যই ভগবান বিষ্ণু মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন (মহাভারত)।

ক্ষপণক

ফিরে এলাম

মীরা বালসুব্রমনিয়ম

পুরনো ধাঁচের লাল বাড়ীটার সামনে এসে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন নরেনবাবু। অফিস পাড়ায় আশে-পাশের বহুতল হাল ফ্যাসানের বাড়ীগুলোর মধ্যে পুরনো বঙচটা এই বাড়ীটাকে এতদিন বড্ড বেমানান মনে হোত ওঁর। কিন্তু আজ মনে হোল এই লাল বাড়ীটার চেয়ে সুন্দর আর কিছু পৃথিবীতে নেই।

হাতের লাঠিটার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে রুমাল বার করলেন নরেনবাবু। অজ্ঞাতে কখন চোখের কোণা ভিজে উঠেছে চশমার কাঁচ হয়েছে ঝাপসা। অথচ বুকের ভেতরটা আনন্দে কেমন তোলপাড় করে উঠছে। কিছু দিন আগেও কী ভাবতে পেরেছিলেন এই বাড়ীটা আবার দেখতে পাবেন, এই বাড়ীটার সামনে আবার এসে দাঁড়াতে পারবেন? এই যে গেটের সামনে ফোঁটা তিলক কাটা দারোয়ান 'জয়হিন্দ' বলে মিলিটারী ভঙ্গীতে সেলাম ঠুকছে অফিসারদের—আর বাইরের পার্টি দেখলেই একটা বিশেষ ভঙ্গীতে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে—ওকে আবার দেখতে পাবেন? গেট দিয়ে ঢুকে ক পা এগুলেই পুরনো আমলের নড়বড়ে খাঁচার মত লিফট,—আর তার সামনে সাপের মত আঁকা-বাঁকা লাইন—ওই যে ডেসপ্যাচের গিরীশবাবু—আজও ময়লা রুমালে জড়ান টিফিন বাকসটা হাতে, ওই যে ক্যাশের পরিতোষ—ছোকরা চুলগুলো এখনো তেমনি লম্বা রেখেছে। অনেকগুলো মুখই তো চেনা—অনেক দিনের চেনা। আবার কয়েকটি অচেনা মুখও আছে। এই চেনা-অচেনা মেশানো জগতটাকে যে কী ভীষণ ভালো লাগছে ওঁর। ভয় হয়, এতোটা ভালো লাগা সহ্য হবে তো।

ক্ষণিকের জন্য দু বছর আগেকার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। অফিস ফেরৎ বাড়ী ফিরছিলেন। হাতে দুটো ফাইল। আর রঙীন অ্যালুমিনিয়ামের টিফিন বাকস। বাসের ভিড়ে টাল সামলাতে পারছিলেন না—অন্য হাতে ওপরের বডটা ধরতে যাবেন, এমন সময় যেন শিরদাঁড়াতে কেউ হাজারটা ছুঁচ বিঁধিয়ে দিল। যন্ত্রণায় মুখটা নীল হয়ে উঠেছিল ওঁর। পাশের লোকটিকে অতিকষ্টে বলেছিলেন—'আমি—আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না—হঠাৎ কেমন একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। একটু একটু যদি—'

অত ভিড়েও একজন উঠে বসতে দিয়েছিল ওকে। কিন্তু সেই হাজার ছুঁচের যন্ত্রণা আর যায় নি। সেদিন না, তারপর দিন না, তারও পরদিন না। অতএব হাসপাতালে যেতে হোল।

অপারেশন থিয়েটারে যাবার আগের মুহূর্তে ভেবেছিলেন হয়তো এই শেষ। সামনে দাঁড়ানো স্ত্রী নীরবালা আর ছেলে বক্তের মুখটা চোখের জলে ঝাপসা লাগছিল। হাত বাড়িয়ে ওদের ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছিলেন উনি। মনে মনে বিদায় নিয়েছিলেন ওদের কাছ থেকে। জেনারেল ওয়ার্ডের বড় ঘরটা থেকে যখন বার হয়েছিল ষ্ট্রেচারটা—করিডরে এক থালি বোদ আর রেলিং-এর ওপর বিচিত্র-মিচির করা কয়েকটা চড়ুই পাখি দেখে মনটা টনটন করে উঠেছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল চেঁচিয়ে বলেন—'আমি আরো অনেক দিন—অনেক দিন বেঁচে থাকতে চাই—' কিন্তু কেমন একটা ঘুমের ভাব ওঁকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। অপারেশন থিয়েটারে চৈতন্যের অবলুপ্তির মুহূর্তে আবার অস্থির হয়ে উঠছিলেন তিনি—তাঁর অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে বলে উঠেছিল, 'না-না আমি মরতে চাই না—মরতে চাই না—' কিন্তু গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরোয় নি তাঁর।

কিন্তু বেঁচে উঠলেন নরেনবাবু আবার চোখ খুলে পৃথিবীর আলো দেখলেন,—ষ্ট্রেচারটা করিডর দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় কানে কতকগুলো আওয়াজ এলো—যেন অনেক দূর থেকে পরিচিত পৃথিবীর সুর ভেসে আসছে। বিছানায় এনে শুইয়ে দেওয়ার পর কতক্ষণ সব কিছু অন্ধকার মনে হয়েছিল—তারপর একটু একটু করে সামনে দাঁড়ানো নীরবালা আর রক্তের ঝাপসা মুখগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

বেঁচে উঠলেন নরেনবাবু—তবু সন্দেহ ছিল আর কোনদিন উঠে দাঁড়াতে পারবেন কিনা। ডাক্তারদের আশ্বাসবাণীগুলো যেমন যেন শূন্যগর্ভ মনে হোত ওঁর। অনেক

অনেক দিন শুয়ে থাকতে হোল ওঁকে। ডাক্তারদের মুখ ক্রমশ গম্ভীর হয়ে উঠছিল। মাঝে মাঝে নরেনবাবুর মনে হচ্ছিল নীরবালা রজতের মুখেও অসহিষ্ণুতার ছায়া দেখা যাচ্ছে। অফিস ফেরৎ রোজ রোজ আসতে রজতের বড্ড কষ্ট হয়—ও না হয় ছুটির দিনে আসবে। এখন তো তুমি ভালোই আছ। আর আমিও তো আসছি রোজই—' বলেছিলেন নীরবালা। নরেনবাবু মুখটা দেয়ালের দিকে ঘুরিয়ে শুয়েছিলেন—উত্তর দেন নি। কিন্তু তাঁর মনে হয়েছিল, 'কেন, কেন বাঁচলাম?'

কিন্তু তারপরই কি করে কি জানি, ভাগ্যের চাকা ঘুরে গিয়েছিল। একটু একটু করে সেরে উঠলেন উনি। হাসপাতাল থেকে বাড়ী এলেন—বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন—লাঠিতে ভর দিয়ে দু-এক পা করে হাঁটলেনও। তারও কিছু দিন পর ডাক্তার একদিন হাসি মুখে বললেন—'এবার কাজে জয়েন করুন। তবে কিছু দিন একটু হাল্কা কাজ করবেন। আর একটানা বেশীক্ষণ বসে থাকবেন না। বাইরে বেরুবার সময় দু-চার দিন লাঠিটা নিয়েই বেরুবেন।' প্রথম কটা দিন শরীরটা একটু টলমল করতে পারে।'

ট্রামে রজত সঙ্গে এসেছিল, নরেনবাবুকে নামিয়ে দিয়ে নিজের অফিসে চলে গেছে। ট্রাম থেকে নেমে হাজার দিন-হাঁটা পথ হেঁটে এসেছেন নরেনবাবু—আর মনে হয়েছে—কই, এ পথটা যে এত সুন্দর—বাঁদিকে রাজভবনের গাছগুলোতে যে এত ফুল ফোটে কোনদিন তো নজরে পড়ে নি।

চশমার কাঁচ পরিষ্কার করে রুমাল পকেটে রেখে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠলেন নরেনবাবু। একটা অদ্ভুত আনন্দে আর মমতায় বুকটা ভরে উঠেছে তাঁর। লিফটের লাইনে দাঁড়ালেন উনি। আশে-পাশে অনেকগুলো অচেনা মুখ।

কিন্তু লিফটে ঢুকে দেখলেন ক্যাশের পরিতোষ সেখানে। ওঁকে দেখেই স্বভাব-সিদ্ধ ভঙ্গীতে চেঁচিয়ে উঠলো পরিতোষ,—'আরে, নরেনদা যে। আজ জয়েন করছেন বুঝি? ভালো আছেন তো?'

'হ্যাঁ ভাই, আজই জয়েন করবো—' গলাটা একটু কেঁপে গেল নরেনবাবুর,—'শেষ পর্যন্ত ভালো হয়ে উঠলাম।'

C. F. Advtg/76

'খুব খুশী হয়েছি দাদা। আপনি না থাকাতে অফিসটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগতো।'

আরেকটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস পড়লো নরেনবাবুর। হাসপাতালের বেডে শুয়ে অনেকবার মনে হয়েছে—কই অফিস থেকে তো আজকাল আর কেউ আসে না? এতদিন এক সঙ্গে কাজ করেছেন, তার সম্বন্ধে কি কারুর বিন্দুমাত্রও উদ্বেগ নেই? নিদেন পক্ষে কৌতূহল? এত বছর কাজ করলেন চেয়ারটা ছাড়তেই কি মন থেকে তাঁকে মুছে ফেলেছে সবাই? কিন্তু না, তাহলে ওরা ভাবত ওঁর কথা—ওঁর অভাবটা অনুভব করতো। নয়তো পরিতোষ এ কথা বলবে কেন?

লিফট থেকে বেরিয়ে পরিতোষকে জিজ্ঞেস করেন—'তুমি কি এখনো ক্যাশেই আছ?'

'আর কোথায় যাবো দাদা!' ক্যাশবুক লিখতে লিখতে জবাব দেয় পরিতোষ।

'কবিতা লিখছ না আজকাল?'

'দাদার দেখি সবই মনে থাকে—হাসলো পরিতোষ। 'লিখেছি বই কি। ওটা তো মন ভালো রাখবার জন্যেলা। চলুন সেকশনে চলুন। চা খাবো সবাই মিলে—অনেক দিন পর।'

একটু ইতস্তত করে নরেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন—'মিঃ সেনগুপ্ত কি এখনো আছেন?'

সেনগুপ্ত ওদের অফিসার। অল্প বয়েসী ছেলেটি—সেন্ট্রাল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করে ঢুকেছে। রজতেরই বয়েসী হবে। মুখে বুদ্ধির ছাপ, চোখ দুটো কোমল, চোখ দুটোকেই ইস্পাতের মত কঠিন বলে মনে হোত নরেনবাবুর। ভয় করত ওঁকে সবাই—নরেনবাবুও করতেন তবু মাঝে মাঝে তরুণ ছেলেটির প্রতি কেমন একটা মমতা হোত। রজত যদি পড়াশোনায় আরেকটু ভালো হোত, এই পরীক্ষাটা দিত, হয়তো এই চেয়ারে বসতে পারতো। হয়তো একথা মনে করেই ফাইলে নোট দিতেন নরেনবাবু—পুরনো সার্কুলার, রুলস, সব কাগজে এঁটে ফ্ল্যাগ করে দিতেন। নরেনবাবু যখন হাসপাতালে ছিলেন, অপারেশনের ঠিক পরদিন,—একদিন দেখতে এসেছিলেন সেনগুপ্ত—হাতে একটা লাল গোলাপের তোড়া। নরেনবাবুর সহকর্মী ঘটক দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিলেন উঃ, কি চালু! মুসৌরীর ট্রেণিং কলেজের ফ্যাসান দেখাতে এসেছে।' নীরবালা ফুলগুলো হাতে নিয়ে খুঁত খুঁত স্বরে বলেছিলেন—আচ্ছা লোক তোমার এই অফিসার,—ফুলের পেছনে টাকাটা খরচ না করে গোটা কয়েক আপেল কিনে দিতে পারতো।' কিন্তু নরেনবাবু ঐ গোলাপের তোড়াটা গালের কাছে চেপে ধরে একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে নীরবালাকে বলেছিলেন—'খাওয়া ছাড়া কিছুই বুঝলে না তুমি।'

সেনগুপ্ত এখনো আছেন শুনে নরেনবাবু বললেন—'ওঁর সঙ্গে দেখাটা সেরেই আসি।' কথাটা পরিতোষের খুব মনঃপূত হল না। ভুরু কুঁচকে বলল—'যান তাহলে জ্ঞান দিয়ে দেবেখন খানিকটা।'

সেনগুপ্তর ঘরের সামনে এসে একটু দাঁড়ালেন নরেনবাবু। নতুন একটা বেয়ারা বসে। পুরনো শ্রীহরি নেই। হয়তো বদলী হয়ে গেছে। নতুন বেয়ারাটা নরেনবাবুকে চেনে না। বললো—'স্লিপ দিন, সাহেব ব্যস্ত আছেন।'

সারা সকালে এই এতক্ষণে একটু বেসামাল মনে হোল নরেনবাবুর। এই ঘরে এতদিন অবলীলাক্রমে ঢুকে গেছেন তিনি, স্লিপ পেওয়ার কথাই ওঠে নি।' মে আই কাম ইন—' বলারও নয়। সেনগুপ্ত সাহেবী ভাবাপন্ন হলেও এসব দিকে খুঁত খুঁতে ছিলেন না। বেয়ারাটার দিকে ফিরে নরেনবাবু বললেন—'আমার স্লিপ লাগবে না—' বলে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

ঘরে সেনগুপ্ত কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলেন। পায়ের শব্দে ভ্রু কুঁচকে তাকালেন। বিরক্তির সুরে বললেন—'আপনি—'

এক মুহূর্তের জন্য নরেনবাবুর মনে হল সেনগুপ্ত ওঁকে চিনতে পারছেন না। আশ্চর্য, শুধু দুটো বছরের অদর্শনে তাঁর চেহারাটুকুও মন থেকে মুছে ফেলেছেন সেনগুপ্ত? যাঁকে নরেনবাবু এতদিন ধরে পুরনো রুলস রেগুলেসন আর সার্কুলার বুঝিয়ে এসেছেন? নরেনবাবুর সাহায্য না পেলে যাকে হয়ত পদে পদে অধস্তনদের কাছে অপদস্থ হতে হত? হঠাৎ বুকের কাছে যেন একটা জোর ধাক্কা খেলেন নরেনবাবু।

কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। কারণ তৎক্ষণে সেনগুপ্ত আকর্ণ বিস্তৃত হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেলেছেন। 'ও, নরেনবাবু! আসুন আসুন। আই ডিড নট একসপেকট ইউ অ্যাট অল। এখন ভাল আছেন তো?'

সামনে বসা লোকটির দিকে ফিরে সেনগুপ্ত আবার বললেন, 'আমাদের হেড-ক্লার্ক। অসুস্থ ছিলেন। দু বছর পর জয়েন করলেন, —আচ্ছা আপনি কি তাহলে—'

'আজ আমি আসি। ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ান।

নরেনবাবু একটা চেয়ার টেনে বসেন। সেনগুপ্ত একটা সিগারেট ধরিয়ে দু আঙুলে আলতো করে ধরে রাখেন ওটা। ওঁর প্রিয় ভঙ্গী। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসে বলেন—'বলুন

কেমন আছেন। ডাক্তার কি বলেছেন? অনেক দিন তো শুইয়ে রেখেছিল, তাই না?'

'আপনাদের — আপনাদের যে আবার দেখতে পাব ভাবি নি—' আবেগে গলাটা কেঁপে ওঠে নরেনবাবুর। চোখের কোণটা কি আবার ভিজে উঠল।

কোমল দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন সেনগুপ্ত। আর সেই কোমল চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে নরেনবাবুর মনে অদ্ভুত একটা মমতা জাগে। ইচ্ছে হয় বুক দিয়ে এই তরুণটিকে সব ঝড়-ঝাপটা থেকে আড়াল করে রাখেন।

'আপনারা,—ভাল ছিলেন তো?'

'এই চলে যাচ্ছে কোনক্রমে। অফিসে গিয়েছেন?'

'যাবো এবার।'

ভ্রূ কুঁচকে একটা কি চিন্তা করলেন সেনগুপ্ত। তারপর বললেন— 'আপনার জায়গায় আরেকজন হেডক্লার্ক জয়েন করেছেন বছর দেড়েক হল। অতএব, টেক ইট ইজি। বেশী খাটাখাটুনী করতে যাবেন না এখন। শরীরটা আগে।'

নমস্কার করে বেরিয়ে এলেন নরেনবাবু। লম্বা করিডোর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবলেন সেনগুপ্ত ঠিক কথাই বলেছেন। বেশী খাটবেন না এখন।

ওঁকে দেখে অফিস ঘরে সবাই হৈ হৈ করে উঠল। পরিতোষ সমাদর করে চেয়ার টেনে বসাল। কিছুক্ষণ তো কেটে গেল কুশল প্রশ্ন করেই। নতুনদের ডেকে পরিচয় করিয়ে দিল পরিতোষ। বেয়ারাকে ডেকে বলল—কই হে —ক্যান্টিন থেকে চা আনতে বললাম যে—'

চা খেতে খেতেও গল্পগুজব চলল কিছুক্ষণ ধরে। তারপর একজন দুজন করে নিজের টেবিলে ফিরে যেতে লাগল সবাই।

তখনই নরেনবাবুর হঠাৎ নজরে পড়ল জানলার কাছের সেই শূন্য টেবিলটা—সেই সবুজ রেক্সিন দেওয়া টেবিল আর হাতল দেওয়া চেয়ারটায় গিয়ে বসলেন গৌরহরিবাবু। নতুন হেডক্লার্ক। একটু আগেও নরেনবাবুর মনে হচ্ছিল গত দু বছরের দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটে গেছে—ফিরে গেছেন উনি আগের জীবনে। কিন্তু গৌরহরিবাবুকে ঐ চেয়ারে গিয়ে বসতে দেখে ওঁর মনে হল—না —আগের জীবনে তিনি পুরোপুরি ফিরে যেতে পারেন নি। কোথায় একটা ফাঁক রয়ে গেছে।

চেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে গৌরহরিবাবুর টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন উনি। টেবিলে রাখা ফাইলগুলোর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে রইলেন। অবশেষে গৌরহরিবাবুকে বললেন — 'কাজের চাপ এখনও তেমনি আছে দেখছি।'

'কাজ অনেক বেড়ে গেছে। কথা বলারই সময় হয় না।' গৌরহরিবাবু তাড়াতাড়ি একটা ফাইল খুলে বসলেন। নরেনবাবুর মনে হল ওঁর কথা বলতে আসাটা পছন্দ করলেন না গৌরহরিবাবুও চেয়ার আনাবার কোন উদ্যোগ করলেন না। দু-এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ফিরে এলেন নরেনবাবু।

সুপারভাইজার চক্রবর্তী ডাকলেন ওঁকে। 'আসুন নরেনবাবু, আমার টেবিলে এসে বসুন। ওহে কালিন্দী, ও পাশের সেকশন থেকে একটা চেয়ার নিয়ে এস তো। পত্রে ফেরত দিয়ে দেব।'

তারপর নরেনবাবুর দিকে ফিরে বললেন—'ডিপার্টমেন্টের যা অবস্থা হয়েছে বলার কথা নয়। একটা বাড়তি চেয়ারও দেবে না। কেউ এলে যে একটু বসতে বলবো তার জো নেই।'

কালিন্দী চেয়ার এনে দিয়ে গেল— "ওদের বড়বাবু বলে দিয়েছেন বিকেলের মধ্যে ফেরত দিতে।"

"দেবো, দেবো।" আশ্বাস দিলেন চক্রবর্তী। "নারনবাবু তো আর পাঁচটা পর্যন্ত বসে থাকছেন না।"

পাঁচটা পর্যন্ত থাকার প্ল্যান নরেনবাবুরও ছিল না। অল্প স্বল্প কাজ করে বাড়ী চলে যাবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু চক্রবর্তীর কথার ধরন ওঁর ভালো লাগলো না। বললেন—"তা কেন? অফিস ডিসিপ্লিন মেনে চলাই ভালো। পাঁচটা পর্যন্তই থাকবো। কিন্তু কাজ আমাকে দিন কিছু—"

পরিতোষ বলে উঠলো—"বেশ আপনি দাদা। আমাদের যদি কেউ বলে কাজ কোরো না তো বেঁচে যাই। আর আপনি কী না সেধে কাজ চাইছেন।"

"অসুখ থেকে উঠে এসেছেন—এখনই কাজ চাইছেন কেন?" চক্রবর্তী প্রশ্ন করেন। "বিশ্রাম নিন কিছুদিন।"

"দু বছর বিশ্রাম করেছি। আর ভালো লাগছে না। গৌরহরিবাবুর কাজ বেশী বলছিলেন—"

গৌরহরিবাবুর মাথাটা যেন ফাইলের ওপর আরো ঝুঁকে পড়লো। সেদিকে তাকিয়ে চক্রবর্তী বললেন—"না, মানে, তাহলে সেনগুপ্তকে জিজ্ঞেস করতে হবে। আপনি বসুন না। আমাদের কারুর কাজ বেশী হয়ে গেলে হাত লাগাবেন। নিন, ততক্ষণ এই খবরের কাগজটা পড়ুন।"

কিন্তু ঘন্টাখানেক ধরে খবরের কাগজটা আগাগোড়া পড়ে ফেললেও নরেনবাবুর হাতে কোন কাজ পৌঁছল না। আড়চোখে দেখলেন উনি—কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে সবাই অল্পবিস্তর কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু ওঁর দিকে কাজের ছিটেফোঁটাও ছুঁড়ে দিচ্ছে না কেউ।

টিফিন টাইমে পরিতোষ ধরে ক্যান্টিনে নিয়ে গেল। "দাদা, আজ আপনি আমার গেস্ট—কী খাবেন? চপ না রসোগোল্লা?" ওদের হাসি ঠাট্টায় নরেনবাবুর মনটা আবার ভালো হয়ে এলো।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস

ডক্টর নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের একটি বিজ্ঞানসম্মত, ও ধারাবাহিক ইতিহাস—যা এর আগে বাংলা ভাষায় লেখা হয় নি। দাম বারো টাকা ॥

বাংলা দেশের ইতিহাস

চতুর্থ খণ্ড ঃ মুক্তি সংগ্রাম

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার

১৯০৮ হইতে ১৯৪৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা দেশের ইতিহাস বস্তুতঃ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। ইতিপূর্বে অজ্ঞাত বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য ও ঘটনার সমাবেশে রচিত এই গ্রন্থ আচার্য রমেশচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। দাম চল্লিশ টাকা ॥

MILITANT NATIONALISM IN INDIA

ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিপ্লববাদীদের ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কে বিস্তৃত ইতিহাস। দাম দশ টাকা ॥

[জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত]

জেনারেল বুকস্ এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা ৭০০ ০০৭

কিন্তু টিফিন থেকে ফিরে দেখলেন ও'র জন্যে আনা চেয়ারটা অন্তর্হিত। চক্রবর্তী একটু অপ্রতিভ স্বরে বললেন—"ও সেকশনের বড়বাবু ফেরত চাইলেন চেয়ারটা। আপনি না হয় বাড়ী চলে যান আজ আমি হেড অফিসে লিখে দিচ্ছি, আপনার জন্য চেয়ার টেবিল পাঠিয়ে দিতে। দিন দশেকের মধ্যে পেয়ে যাবেন।"

নরেনবাবুর রাগ হোলো। এই দশদিন কী উনি দাঁড়িয়ে থাকবেন? কিন্তু রাগটা প্রকাশ পেলো অন্যভাবে। বললেন—"বাড়ী যাবো বই কী। কিন্তু তার আগে আমার কাজের একটা ফয়সালা করে দিন।"

চক্রবর্তী ও'র কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন—"আপনি মিছি মিছি উত্তেজিত হচ্ছেন নরেনবাবু। কাজ পেয়ে যাবেন বৈ কী। আজ না হয় কাল। এ অফিসে না হয় অন্য অফিসে। তবে চাইছেন যখন আমি সেনগুপ্তর সঙ্গে ব্যাপারটা আলোচনা করে আসি। বসুন আপনি।"

চক্রবর্তীর চেয়ারে বসে রইলেন নরেনবাবু। মাথায় একটা শিরা দপদপ করছে। মনে পড়লো ডাক্তার বারন করে দিয়েছিলেন উত্তেজিত হতে। শরীরটা এখনো দুর্বল। এত বড়ো একটা অসুখ থেকে উঠেছেন। চেষ্টা করলেন সকালের আনন্দের ভাবটা ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু পারলেন না। কোথায় যেন সুর কেটে গিয়েছে। "কাজের জন্য অত ব্যস্ত হয়েছি কেন আমি?" নিজের মনকে প্রশ্ন করলেন উনি।" সুপার ভাইজার ঠিকই বলেছেন। কাজ পেয়ে যাবোই। আজ না হয় কাল। বসিয়ে বসিয়ে আর কদ্দিন মাইনে দেবে আমায়।' কিন্তু যুক্তি শুনতে চাইলো না ও'র মনটা। মনে হোলো সবাই যেন ওকে দূরে সরিয়ে রেখে দিয়েছে। এই অফিসের জগত থেকে ছেঁটে ফেলে দিয়েছে ওকে।

চক্রবর্তী বললেন—"চলুন, সেনগুপ্ত ডাকছেন আপনাকে—"

অনেক আশা নিয়ে উঠলেন নরেনবাবু। সেনগুপ্ত নিশ্চয়ই একটা বিহিত করবেন। নরেনবাবুকে যথেষ্ট ভালোবাসেন উনি।

সেনগুপ্তর ঘরে ঢোকার আগে এক মুহূর্ত থমকালেন চক্রবর্তী। কেশে একটু গলাটা পরিষ্কার করলেন। তারপর বললেন—"আপনাকে বলে দেওয়াই ভালো। সেনগুপ্ত গৌরহরিবাবুর পোস্টটা আপনাকে দেবেন না হয়তো।"

নরেনবাবুর মাথার শিরাটা আবার দপ করে উঠলো। তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন—"দেড় বছর কাজ করাতেই ওটা গৌরহরিবাবুর পোস্ট হয়ে গেল? আমি ওই পোস্টে কতদিন কাজ করেছি জানেন?"

"জানি—"। আবার হাসলেন চক্রবর্তী। "আমি এ অফিসে আসার আগে থেকে। কিন্তু ফ্যাক্ট ইজ ফ্যাক্ট। সেনগুপ্ত গৌরহরিবাবুকে খুব পছন্দ করেন। ভদ্রলোক খুব চটপটে কাজ করতে পারেন। আর খাটেনও যথেষ্ট। ডবল কাজ দিলেও মুখে রা কাড়েন না। অতএব—"

চক্রবর্তীকে কথা শেষ করতে না দিয়েই দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়েন নরেনবাবু। সেনগুপ্ত ওদের বসতে বলেন। তারপর নরেনবাবুর দিকে ফিরে বলেন—"আপনি কাজ করার জন্য অত ব্যস্ত হয়েছেন কেন নরেনবাবু? আপনাকে তো বললাম—"টেক ইট ইজি—"

"কোন কিছু না করে শুধু শুধু বসে থাকতে ভালো লাগবে না স্যার—"

"মুস্কিল কী জানেন,—আপনাকে দেওয়ার মত ইমিডিয়েটলি কোন কাজ পাচ্ছি না। তবে হেড অফিসে লিখে দিচ্ছি আমি,—ওদের কাছে যদি হাল্কা কাজের কোন পোস্ট থাকে।"

"আমি কী আমার আগের পোস্টে ফিরে যেতে পারি না?" মরীয়া হয়ে জিজ্ঞেস করে ফেলেন নরেনবাবু।

ভ্রূকুঁচকে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন সেনগুপ্ত। যেন গভীরভাবে চিন্তা করছেন ব্যাপারটা। কিন্তু ও'র এই মুখের ভঙ্গী নরেনবাবু অনেকবার দেখেছেন। উনি জানেন সেনগুপ্তর এটা একটা লোক-দেখানো ভাগ মাত্র। কতবার বাইরের পার্টির কাছে এরকম চিন্তার ভাগ করেছেন সেনগুপ্ত—যখন আগেভাগেই নরেনবাবুর সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন—তখনও।

"মুস্কিল কী জানেন—ওই পোস্টটার কাজ অনেক বেড়ে গেছে। আপনার এই শরীরে"—

"ঠিক পারবো স্যার, একবার দিয়ে দেখুন—"

সেনগুপ্ত দৃঢ়তার সঙ্গে মাথা নাড়েন। "না, এত কাজ আপনার ওপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। তাছাড়া গৌরহরিবাবু এত এফিসিয়েন্টলি কাজ করে যাচ্ছেন— ওকেই বা সরাবো কেমন করে। শুনুন, কদিন রিল্যাকস করুন একটু। আমি দেখছি হেড অফিসে বা অন্য কোন ব্রাঞ্চে কোন লাইট চার্জ আছে কী না। আপনার বসার ব্যবস্থা অবশ্য কালই আমি করে দিচ্ছি।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন নরেনবাবু। কী করে বোঝাবেন ওদের—উনি বিশ্রাম করতে চান না। কী করে বোঝাবেন উনি মৃত্যুর মুখ হতে ফিরে এসেছেন বলেই আগেকার জীবনকে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে হচ্ছে ওঁর। বিশ্রামের নিরালম্ব শূন্যতা সহ্য করতে পারবেন না উনি। বোঝাতে পারবেন না নরেনবাবু,—কারণ দু'বছরের অনুপস্থিতিতে অফিস নামক যন্ত্রটির কেন্দ্রবিন্দু হতে ছিটকে একেবারে বাইরে চলে এসেছেন নরেনবাবু। আজ উনি সেখানে একজন বাড়তি কর্মচারী মাত্র যাকে দেবার মতো কাজ খুঁজে পাওয়া যচ্ছে না,—যার বসার চেয়ারটাও বেদখল হয়ে গেছে।

"আপনি যা বলছেন তাই হবে স্যার—" নমস্কার করে উঠে পড়েন নরেনবাবু। লাঠিতে ভর দিয়ে লিফটের দিকে এগিয়ে যান। মনে হয়—কেন এলাম। সকালের মতো চোখটা ভিজে ওঠে। কিন্তু অন্য কারণে।

পথে নেমে দেখেন রোদটা বেশ চড়া। ছাতাটা আনতে হবে কাল থেকে ভাবেন উনি। লাঠি ছাতা দুটো নিয়ে চলা মুস্কিল। কিন্তু অভ্যাস করতে হবে। এখন থেকে অনেক কিছুই নতুন করে অভ্যাস করতে হবে। বাঁ হাতে ভিজে চোখের কোনাটা মুছে ফেলেন নরেনবাবু।

স্মৃতি দিয়ে ঘেরা (৭)

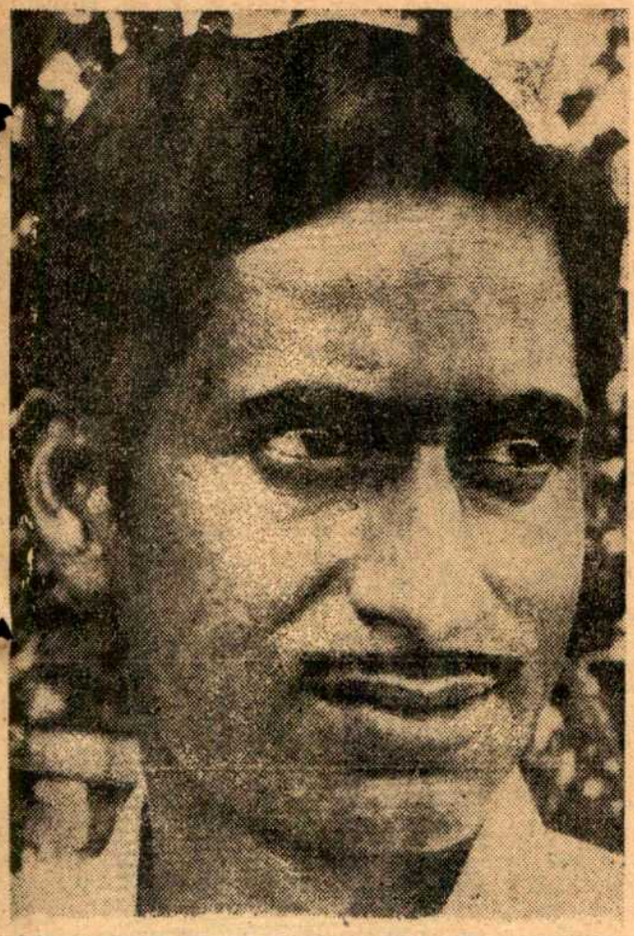

প্রশান্ত সিংহ

প্রশান্ত সিংহকে মনে আছে বোধহয়। থাকাই স্বাভাবিক। যেহেতু প্রশান্ত অনেক-কাল আগেকার খেলোয়াড় নন। এই সেদিনেও মানে, সত্তরের দশকের গোড়ার পর্বেও ফুটবল খেলোয়াড়ের সাজ-পোশাকে তাঁকে আমরা মাঠে ময়দানে দেখেছি।

পদবি সিংহ। কিন্তু মাঠের আচরণে প্রশান্তকে কখনও সিংহের মত মাতামাতি করতে দেখি নি। আকৃতিও এতখানি নয়। চালচলন সংযত, প্রয়োজন অনুযায়ী কখনও সংক্ষিপ্ত। আবার কখনও সারা মাঠে প্রসারিত। দম ছিল অফুরন্ত। ওপর ওপর দেখতে যেমনই হোক না কেন, শরীরে ছিল কষ। এই সংগতিতে মস্তিষ্ক মিশিয়ে প্রশান্ত নিজেকে তাঁর কালের অন্যতম সেরা ডারতীয় হাফব্যাকের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। সে যুগে রামবাহাদুর ও প্রশান্ত, এই জুটি মিলে ইস্টবেঙ্গল দলের মেরুদণ্ডকে এমনভাবে গড়ে তুলে-ছিলেন যে তাতে ঠোক্কর কষাতে গিয়ে নামী নামী প্রতিদ্বন্দ্বীদেরও হিমসিম খেতে হয়েছে। সাধে কি আর তাঁর আমলে, তাঁরই নেতৃত্বে ইস্টবেঙ্গল দিল্লি থেকে ডুরান্ড কাপ বোম্বাইয়ের রোভার্স কাপ নিয়ে ঘরে ফিরতে পেরেছিল। সেবার আই এফ এ শীল্ড হয়ত ইস্টবেঙ্গলের আলমারিতে শোভা পেত। কিন্তু বাদ সাধলো বৃষ্টি। প্রবল আক্রোশে ক্রিকেট উদ্যান ইডেনকে ভাসিয়ে দিতে সেবারের শীল্ড ফাইনাল খেলা আর সম্পূর্ণ করে তোলা যায় নি।

চরিত্রগুণেও তিনি নামের সঙ্গে সুসমঞ্জস। সিংহের চেয়ে সিনহা তাই তিনি মানানসই। লোক সমাজে পরিচিত সিনহা-রূপেই। মিতবাক বিনয় এবং সাটের কলার তুলে নিজেকে জাহির করায় রীতিমত অনিচ্ছুক। খেলে আনন্দ পেয়েছেন। জয়-লাভে উচ্ছ্বসিত হন নি। নিজের কর্মকাণ্ডে তিনি তৃপ্ত। চোখে-মুখে তাই সদাই প্রশান্তির ছাপ।

প্রশান্ত ফুটবল খেলা আরম্ভ করে-ছিলেন ইনসাইড ফরোয়ার্ড হিসেবে। শেষ পর্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হন হাফব্যাক লাইনে। ফরোয়ার্ড রূপেও নামডাক হয়েছিল। কিন্তু দেশজোড়া খ্যাতির অধিকারী হন সামনে থেকে এক ধাপ পিছিয়ে দাঁড়াবার পরই। জায়গা বদলের এই নজির দৃশ্যত যেমনই হোক না, মাঠে এক ধাপ পিছিয়ে দাঁড়ানোর ফলে প্রশান্ত ফুটবলে যে অনেক ধাপ এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন তাতে কোন সন্দেহই নেই।

প্রশান্তকে ফুটবলার হিসেবে গড়ে-পিঠে মানুষ করেছেন তেজেশ সোম, ওরফে বাঘা-বাবু। বাঘাবাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ ফুটবল প্রশিক্ষক। শিষ্য ভাগ্যও তাঁর ভাল। তাঁর সংস্পর্শে এসে, তাঁর নির্দেশনা মান্য করে কতজন যে ফুটবলার কুলে কৌলীন্য গর্বে ধন্য হতে পেরেছেন তার ঠিক ঠিকানা কী!

নামে বাঘা। মেজাজেও তাই। গুরু-গিরি ফলাতে গিয়ে কোন শয্যাকেই মেহনতে ফাঁকি দেওয়ার ফুরসৎ দিতেন না। মুখে মুখে বলতেন মেহনত কর ফল পাবে। ফাঁকি দিলে নিজেই পড়বে ফাঁকিতে। শিষ্যদের দস্তুরমত খাটাতেন। মেহনত করার রীতিই ছিল বাঘাবাবুর বিচারে কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেওয়ার পদ্ধতি। খাটুনির ধকল যে সইতে পারত সেই টিকে যেতো বাঘাবাবুর শিক্ষণ শিবিরে। না পারলে রাস্তা দেখতে হোত।

বাঘাবাবুর কাছে খেলা শিখতে এসে খাটুনির ভয়ে কতজন যে পিটটান দিয়েছে। প্রশান্ত নিজেও একদিন ওই পথ অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। তখন বয়সে একে-বারেই কাঁচা। বেলগাছিয়া রেলওয়ে কোয়ার্টার্সে থাকতে থাকতে গিলমোর ইনষ্টি-টিউট মাঠে ফুটবলের হাতেখড়ি হয়। খেলতেন তখন পাড়ার ক্লাবেই। একদিন রেলওয়ে সপ্তাহে ইস্টার্ণ রেলের সঙ্গে পাড়ার ক্লাবের পক্ষে খেলার সময়ে প্রশান্ত স্বরাজ ঘোষ, নিখিল নন্দী প্রমুখ সেকালের

শুধাতে আমরা বললাম যে সিংহল থেকে এসেছি। সিংহলী আর ভারতীয়দের চেহারায় অনেকটা সাদৃশ্য আছে বলেই সে মাত্রায় রেহাই পেয়ে গেলাম। নইলে কপালে যে কী ঘটতো তা কে জানে!'

জাকার্তার ফুটবল ফাইনালে স্টপার জানেল সিংকে সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসেবে খেলানো হয়েছিল কেন? প্রশ্ন শুনে প্রশান্ত বললেন, থাইল্যান্ডের সঙ্গে খেলার দিনে জানেলের কপাল কেটে যেতে তাঁকে পিছিয়ে পড়া সেন্টার ফরোয়ার্ডের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সে দায়িত্ব জানেল ভালভাবে পালন করেছিলেন। আর তার বদলে অরুণ বোস স্টপারের জায়গায়। এমনই খেলে যা অরুণকে সরাবার কোনো প্রশ্নই দেখা দেয় নি। এই অবস্থায় জানেলকে আবার সেন্টার ফরোয়ার্ডে দাঁড় করাবার পরিকল্পনা নেই। তা ফাইনালে পিছিয়-পড়া সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসেবে জানেল খেলেছিলও দারুণ!'

জানেল আর অরুণ দুজনের কথা উঠতেই প্রশান্তর আর একদিনের কথা মনে পড়ল। বললেন মারডেকায় মালয়েশিয়ার সঙ্গে খেলায় কর্ণার কিকে হেড করতে ওঠার সময় অরুণের সঙ্গে ও পক্ষের গোলরক্ষক স্কিনারের ধাক্কা লাগে। ধাক্কা খেয়ে স্কিনার তো চটেই লাল। ঘুঁষি বাগিয়ে অরুণের দিকে তেড়ে আসে। ওই স্কিনার একে পুলিশের লোক তার ওপর নামী বকসার। তার ঘুঁষি এড়াতে অরুণ পালাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু পালাবে কোথায়? অরুণ যতো সরে যায় স্কিনার ততোই তার দিকে তেড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত দুজনের মধ্যে দৌড়দৌড়ি শুরু হয়ে গেল। খেলা তখন বন্ধ। মাঠের একধার থেকে ওধারে অরুণ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। আর তাকে তাড়া করছে স্কিনার। প্রায় পুরো মাঠটি চক্কর দেওয়ার পর অরুণ আমাদের দলে ফিরে আসাতে আমরা তাকে ঘিরে দাঁড়ালাম। আর জানেল সামনের দিকে এগিয়ে এলো। এক মুখ দাড়ি মাথায় কটি শক্ত সমর্থ চেহারা জানেলের। তাঁকে সামনে দেখে স্কিনার আর এগোবার চেষ্টা করলো না বলেই সে সাত্রায় অরুণ রেহাই পেয়ে গেল।

ওই ম্যাচেরই আর একটি ঘটনা। মালয়েশিয়ার হাফ ব্যাক কিস সুইয়ের সঙ্গে খেলতে খেলতে প্রশান্তর ঠোকাঠুকি লাগে। আর কিস সুই চিবিয়ে গালাগাল দিচ্ছে। লাগে বেশ কিছুক্ষণ। তারপর খেলা বন্ধ হলে কিস সুইয়ের সঙ্গে প্রশান্তর মোলাকাৎ। এবার কিস সুই প্রশান্তর কাছে এসে তার অভিপ্রায় জানালেন এখানে রেহাই পেয়ে গেলে, কিন্তু তোমরা তো সিঙ্গাপুরে যাচ্ছো। সেখানে তোমার পিঠে ছুরির ফলা বসিয়ে ছাড়বো।

শুনে তো প্রশান্ত অবাক। বলে কী। মাঠের ঝগড়া ঘরে টেনে আনবে নাকি। বিদেশ বিভূঁই। কিঞ্চিৎ নার্ভাস হয়ে পড়লো। স্থানীয় ম্যানেজারকে ঘটনা জানাতে তিনি সাবধানে থাকতে বলেন। কেননা কিস সুই নাকি সিঙ্গাপুরের এক দাগী গুন্ডা।

গুন্ডা! শুনে তো প্রশান্তর ধাত ছেড়ে যাওয়ার উপক্রম। পরের কদিন ভয়ে ভয়ে কাটলো। সিঙ্গাপুরে গিয়ে বড় একটা ঘরের বাইরেই হোত না। হলেও দল বেঁধে। খেলার দিন মাঝ মাঠে আবার কিস সুইয়ের সঙ্গে দেখা। কিন্তু কী আশ্চর্য! কিস সুই সেদিন একেবারে অন্য মেজাজই ধরে বসলেন। গালাগাল মন্দ করা তো দূরের কথা। প্রশান্তর সঙ্গে হেসে হেসে কথাও বলে গেলেন। ব্যাপারটা অদ্ভুত যেন। তবে তাতেই প্রশান্তর ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল! প্রশান্ত বলছিলেন, খেলতে নেমে কোনোদিন কাউকে ভয় পাই নি। কিন্তু সেদিন সিঙ্গাপুরের মাঠে কিস সুইকে প্রথমে দেখে উদ্যত ছুরির লকলকে ফলার ছবি অনেকক্ষণ আমার মনকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছিল।

আর ভয় হয়েছিল ওই, কোয়ালালামপুরেই যেদিন স্থানীয় পুলিশ আমাদের ফাটকে পোরার জন্যে টানাটানি করছিল প্রশান্ত হেসে হেসে বলছিলেন—বাঙালী দিলীপ বর্ধন থাকেন ইপো শহরে। কোয়ালালামপুরে এসে নিজের গাড়িতে করে আমাদের কজনকে ঘোরাচ্ছেন। ন্যাশনাল পার্কের কাছাকাছি আসতে বললেন, চলুন গাড়ি থেকে নেমে পার্কের ভেতরে যাই। পার্কে গাড়ি চালানোর নিয়ম নেই। চুনী বাহাদুরী দেখিয়ে বলে আরে আমরা খেলতে এসেছি। গাড়ি নিয়ে ভেতরে গেলে কেউ কিছু বলবে না। ভাবলাম চুনী হয়তো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু গাড়ি নিয়ে পার্কের ভেতরে কিছুটা যাবার পরই বুঝলাম যে কী ভুলই করেছি চুনীর কথায় সায় দিয়ে। চোখের পলকে এক ঝাঁক পুলিশ আমাদের ঘিরে ফেলে ওদের ভাষায় বললো ফাটকে যেতে হবে। আমরা যতো বোঝাই যে আমরা কারা, ওরা তাতে কান পাতে না। বুঝবে কী করেই বা! দু পক্ষই যে পরস্পরের ভাষা বোঝে না। অনেকক্ষণ ধরে টানা-হ্যাঁচড়া চললো। আমাদের তো মুখ শুকিয়ে যাওয়ার পালা। শেষ পর্যন্ত কে যেন বুদ্ধি করে পকেট থেকে এশীয় ক্রীড়ার অভিজ্ঞানটি বার করে ওদের দেখাতেই ওরা কিঞ্চিৎ নরম হয়ে বলে, এবারের মতো ভাগো। আর কখনো গাড়ি নিয়ে পার্কে ঢুকো না।

ছাড়া পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে দিলীপ বর্ধন বলেন চুনী দুনিয়ার সবটাই ফুটবল মাঠ নয়। বুঝলেন? চুনীও পিছিয়ে পড়ার পাত্র নয়। সঙ্গে সঙ্গে শুনিয়ে দিলে সে কি! দেখলেন না খেলাই শেষ পর্যন্ত আমাদের বাঁচিয়ে দিলে? আর দেবেও সর্বত্র!

প্রশান্তর নেতৃত্বে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের মুখ থেকে সবচেয়ে বড় গ্রাসটি কেড়ে নিয়েছিল কবে? নিঃসন্দেহে ১৯৬৬ সালে। সেবার লীগ পেলে মোহনবাগান পর পর পাঁচ বছর লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়ে মহম্মডানের রেকর্ড ছুঁতে পারবে। এই পরিস্থিতিতে মোহনবাগান - ইস্ট বেঙ্গলের খেলা।

খেলার আগেই শহরময় নানা গুজব ছড়িয়েছিল—ইস্টবেঙ্গল আলগা দেবে। খেলোয়াড়দের টাকা খাওয়ানো ইত্যাদি ইত্যাদি মনগড়া কথা সব। সে বছর ইস্ট-বেঙ্গলের দলনায়ক চন্দন ব্যানার্জি। তিনি না খেলায় দল পরিচালনার ভার পড়ে সহ-অধিনায়ক প্রশান্তরই ওপর। তাঁর নেতৃত্বে ইস্টবেঙ্গল জান লড়িয়ে খেলে মোহন-বাগানকে হারিয়ে নিজেরাই চ্যাম্পিয়ন হয়।

কিন্তু লীগ জয় করাতে ইস্টবেঙ্গলের যতো না আনন্দ তার চতুর্গুণ আনন্দ হলো মহামেডান দলের সমর্থকদের। তারা আগে-ভাগেই ব্যবস্থা করে রেখেছিল। খেলা ভাঙতেই তাদের তাসা পার্টি মাঠ জুড়ে ঘুরতে থাকে। আর মহামেডানের এক সমর্থক গায়ে ভস্ম মাখায় জটা নিয়ে মহা-দেবের সাজ সারা মাঠ চক্কর দিতে থাকে। মহাদেবের গলায় ঝোলানো ছিল ইয়াবড় এক মশাল সাপ! হাতে ত্রিশূল। কী ভয়ংকর চেহারা। কে জানে সেদিন কে-ওই সমর্থকটিকে মহাদেব ভর করেছিলেন। তবে তাকে ঘিরে নাটক যে জমছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ফুটবলে দল সমর্থক-দের মাথার পোকাটি কখন যে কীভাবে নড়তে শুরু করে তা বোধহয় স্বয়ং দেবাদিদেবেরও অজানা! তাই নয়?

অজয় বসু

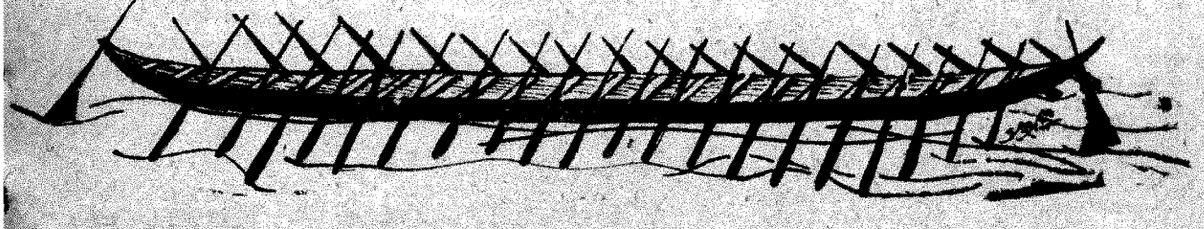

খেলাধূলা

দর্শক

অলিম্পিক হকি

অলিম্পিক হকির ফাইনালে নিউজিল্যান্ড ১-০ গোলে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে। অলিম্পিক হকির ফাইনালে নিউজিল্যান্ডর পক্ষে এই প্রথম খেলা। এমনকি নিউজিল্যান্ড এর আগে কখনও সেমি-ফাইনালেও উঠতে পারেনি। অপরদিকে অস্ট্রেলিয়া এর আগে ১৯৬৮ সালের ফাইনালে রৌপ্যপদক এবং একবার ব্রোঞ্জপদক পেয়েছিল।

প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের এ গ্রুপ থেকে হল্যান্ড এবং বি গ্রুপ থেকে পাকিস্থান লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে সেমি-ফাইনালে উঠেছিল। লীগের খেলায় হল্যান্ড এবং পাকিস্থান অপরাজিত ছিল—হল্যান্ডের পাঁচটা খেলায় ১০ পয়েন্ট এবং পাকিস্থানের ৪টে খেলায় ৭ পয়েন্ট। এ গ্রুপে অস্ট্রেলিয়া ও ভারত এবং বি গ্রুপে নিউজিল্যান্ড ও স্পেনের পয়েন্ট সমান হওয়াতে দ্বিতীয় স্থান নির্ধারণের জন্য যে প্লে-অফ ম্যাচ খেলা হয় তাতে অস্ট্রেলিয়া ৬-৫ গোলে ভারতকে এবং নিউজিল্যান্ড ১-০ গোলে স্পেনকে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার প্লে-অফ ম্যাচ প্রথমে ১-১ গোলে ড্র ছিল। শেষপর্যন্ত টাইব্রেকারে অস্ট্রেলিয়া ৫-৪ গোলে ভারতকে পরাজিত করে। একদিকের সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়া ২-১ গোলে পাকিস্থানকে ও অপরদিকের সেমি-ফাইনালে নিউজিল্যান্ড ২-১ গোলে হল্যান্ডকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল। কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি সেমি-ফাইনালে পাকিস্থান এবং হল্যান্ড হেরে যাবে।

এবারের অলিম্পিক হকির ফাইনালের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী—নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া ছিল প্রাথমিক লীগের রানার্স-আপ দল। এর আগে এইভাবে লীগের দুই রানার্স-আপ দলকে একই বছরের অলিম্পিক হকির ফাইনালে কখনও খেলতে দেখা যায়নি। আরও উল্লেখ্য গত ৪৯ বছরের মধ্যে (১৯২৮—৭৬) এইবারই অলিম্পিক হকির ফাইনালে এশিয়ার কোন দেশকে খেলতে দেখা গেল না। গত ৪৯ বছরে (১৯২৮—৭৬) ১২টি অলিম্পিক গেমস্‌ সব আসর বসেছে। ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত একটানা ৯টি অলিম্পিক হকির আসরে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে এশিয়ারই দেশ—ভারত জয়ী হয়েছে ৬টি স্বর্ণপদক এবং পাকিস্থান ২টি। ১৯৭২ সালের অলিম্পিক হকির ফাইনালে পাকিস্থানকে

জন নেবার (আমেরিকা) : মিল্টন অলিম্পিকে পুরুষ বিভাগের সাঁতারে চারটি স্বর্ণপদক জয়ী হন।

হারিয়ে পশ্চিম জার্মানী স্বর্ণপদক জয়ী হয়। ফলে অলিম্পিক হকির আসরে এশিয়ার একটানা স্বর্ণপদক জয়ের যুগ শেষ হয়। তবে পদক জয়ের ধারা এখনও অব্যাহত আছে। পাকিস্থান ১৯৭২ সালে রৌপ্য পদক এবং ১৯৭৬ সালে ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে এশিয়ার মুখ রেখেছে। আন্তর্জাতিক হকি খেলার আসরে দুই শক্তিশালী দেশ—ভারত এবং পাকিস্থানের বর্তমান বিপর্যয়ের কারণ কি? প্রধান কারণ হকিতে ভারত এবং পাকিস্থানের একটানা প্রাধান্য খর্ব করার জন্য অন্য দেশগুলি আগের তুলনায় অনেক বেশী সক্রিয় হয়েছে। দৈহিক পটুতার দিক থেকে ভারত এবং পাকিস্থানের হকি খেলোয়াড়রা অনেক দেশের হকি খেলোয়াড়দের তুলনায় দুর্বল। খেলার পদ্ধতিরও রকমফের হচ্ছে। আগের তুলনায় এবারের অলিম্পিক হকি আসরে খেলার ফলাফল অনেক বেশী অঘটন ঘটেছে।

অলিম্পিক হকির সাতবারের স্বর্ণপদক বিজয়ী ও বর্তমানের (১৯৭৫ সালের) বিশ্ব হকি কাপ চ্যাম্পিয়ান ভারত, দুবারের অলিম্পিক হকি চ্যাম্পিয়ান এবং বর্তমানের বিশ্ব-হকির রানার্স-আপ পাকিস্থান, ভূতপূর্ব বিশ্ব হকি কাপ চ্যাম্পিয়ান হল্যান্ড এবং ১৯৭২ সালের অলিম্পিক হকির স্বর্ণপদক বিজয়ী পশ্চিম জার্মানী—এই চারটি শক্তিশালী দেশের একটিও এবারের অলিম্পিক হকির ফাইনালে উঠতে না-পারার আন্তর্জাতিক হকির আসরে সৃষ্টি বিস্ময়ের উদ্রেক হয়েছে।

সেমিফাইনাল

নিউজিল্যান্ড ২ : হল্যান্ড ১
অস্ট্রেলিয়া ২ : পাকিস্থান ১
নিউজিল্যান্ড ১ : অস্ট্রেলিয়া ০

লীগ খেলার চূড়ান্ত তালিকা

গ্রুপ এ

	জয়	হার	ড্র	স্বঃ	বিঃ	পঃ
হল্যান্ড	৫	০	০	১১	৩	১০
অস্ট্রেলিয়া	৩	২	০	১৪	৬	৬
ভারত	৩	২	০	১২	১	৬
মালয়েশিয়া	২	৩	০	৩	৭	৪
কানাডা	১	৪	০	৪	১১	২
আর্জেন্টিনা	১	৪	০	৪	১২	২

গ্রুপ বি

	জয়	হার	ড্র	পয়েঃ	বিঃ	পঃ
পাকিস্তান	৩	০	১	১৬	৬	৭
স্পেন	২	১	২	৯	৭	৬
নিউজিল্যান্ড	১	১	২	৬	৮	৪
পঃ জার্মানী	১	২	১	১০	১০	৩
বেলজিয়াম	১	৩	০	৫	১৫	২

তৃতীয় স্থান নির্ধারণের খেলায় পাকিস্থান ৩-২ গোলে হল্যান্ডকে পরাজিত করে ব্রোঞ্জ পদক জয়ী হয়।

অলিম্পিক সাঁতার

মন্ট্রিলের অলিম্পিক সাঁতারে পুরুষ বিভাগে আমেরিকা এবং মেয়েদের বিভাগে পূর্ব জার্মানী বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। অলিম্পিক সাঁতারে এক সময়ের শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং হল্যান্ড প্রভৃতি এবার তলিয়ে গেছে।

পুরুষ বিভাগের মোট ১৩টি স্বর্ণপদকের মধ্যে আমেরিকা একাই পেয়েছে ১২টি স্বর্ণপদক। বাকি একটি স্বর্ণপদক পেয়েছে ইংল্যান্ড। পুরুষ বিভাগের মোট ৩৯টি পদকের মধ্যে আমেরিকা পেয়েছে ২৮টি পদক (স্বর্ণ ১২ রৌপ্য ১১ এবং ব্রোঞ্জ ৫)। বাকি ১১টি পদক পেয়েছে এই ৬টি দেশ : রাশিয়া ৪ (রৌপ্য ১ ও ব্রোঞ্জ ৩) বৃটেন ২ (স্বর্ণ ১ ও ব্রোঞ্জ ১) পঃ জার্মানী ২ (ব্রোঞ্জ) পূঃ জার্মানী ১ (ব্রোঞ্জ) কানাডা ১ (রৌপ্য) এবং অস্ট্রেলিয়া ১ (ব্রোঞ্জ)। গত ১৯৭২ সালের মিউনিখ অলিম্পিকেও আমেরিকা পুরুষ বিভাগের সাঁতারে শীর্ষস্থান পেয়েছিল। ১৯৭২ সালের সাঁতারে তাদের মোট পদক সংখ্যা ছিল ২৬ (স্বর্ণ ৯, রৌপ্য ৯ ও ব্রোঞ্জ ৮)।

মহিলা বিভাগের মোট ১৩টি স্বর্ণপদকের মধ্যে পূর্ব জার্মানী পেয়েছে ১১টি স্বর্ণপদক এবং একটি করে স্বর্ণপদক পেয়েছে রাশিয়া এবং আমেরিকা। মেয়েদের সাঁতারের মোট ৩৯টি পদকের মধ্যে পূর্ব জার্মানী একাই পেয়েছে ১৮টি পদক। বাকি ২১টি পদক ভাগাভাগী করে নিয়েছে এই চারটি দেশ: আমেরিকা ৭ (স্বর্ণ ১, রৌপ্য ৩ ও ব্রোঞ্জ ২), কানাডা ৭ (রৌপ্য ১ ও ব্রোঞ্জ ৬) রাশিয়া ৫ (স্বর্ণ ১ রৌপ্য ২ ও ব্রোঞ্জ ২) এবং হল্যান্ড ২ (ব্রোঞ্জ)। গত ১৯৭২ সালের অলিম্পিক সাঁতারে পূর্ব জার্মানী মেয়েদের বিভাগে পেয়েছিল মাত্র ৫টি পদক—রৌপ্য ৪ এবং ব্রোঞ্জ ১। মাত্র চার বছর সময়ে মেয়েদের সাঁতারে তারা কি বিরাট ঐতিহ্য করেছে! কিন্তু ভারা এবার পুরুষ বিভাগে একটা ব্রোঞ্জ পদক সংগ্রহ করেছে। গত ১৯৭২ সালে পূর্ব জার্মানী পুরুষ বিভাগে ৪টি পদক (স্বর্ণ ২, রৌপ্য ১ ও ব্রোঞ্জ ১) পেয়ে পদক জয়ের তালিকায় দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল।

অলিম্পিক গেমসের কোন একটি ইভেন্টে একটি দেশের পক্ষে তিনটি পদক (স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ) জয় নিঃসন্দেহে সেই দেশের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়। সদ্য সমাপ্ত মন্ট্রিল অলিম্পিক গেমসের সাঁতারে এরকমের নিরঙ্কুশ প্রাধান্যের পরিচয় দিয়েছে পুরুষ বিভাগের চারটি ইভেন্টে আমেরিকা এবং মেয়েদের বিভাগের একটি করে ইভেন্টে পূর্ব জার্মানী ও রাশিয়া। আমেরিকা পুরুষ বিভাগের ১০০ ও ২০০ মিটার বাটারফ্লাই ২০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক এবং ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল ইভেন্টের সমস্ত পদকই (স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ) জয়ী হয়। অপরদিকে মহিলা বিভাগের ২০০ মিটার বাটারফ্লাই সাঁতারে পূর্ব জার্মানী এবং ২০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক সাঁতারে রাশিয়া সমস্ত পদক জয় করে।

মন্ট্রিল অলিম্পিক সাঁতারে নতুন বিশ্ব-রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পুরুষ বিভাগের ১২টি ইভেন্টে এবং মেয়েদের বিভাগের ৯টি ইভেন্টে।

পুরুষ বিভাগের তিনটি ইভেন্টে আগের সময়ের বেড়া ভেঙ্গে গেছে। আমেরিকার জন নেবার ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক সাঁতারে ৫৬ সেকেণ্ডের বেড়া ও ২০০ মিটার ব্যাক-স্ট্রোকে ২ মিনিটের বেড়া এবং আমেরিকার ২১ বছরের স্কুল-ছাত্র জিম মনটগোমেরী ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতারে ৫০ সেকেণ্ডের বেড়া প্রথম অতিক্রম করার গৌরব লাভ করেন। আমেরিকার সতের বছরের স্কুল-ছাত্র রায়ান গুডেল ৪০০ ও ১৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতার নতুন বিশ্ব-রেকর্ড সময়ে অতিক্রম করে স্বর্ণপদক জয়ী হন। জন নেবার ১০০ ও ২০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে বিশ্বরেকর্ড প্রতিষ্ঠা করে স্বর্ণপদক জয়ী হন। তিনি এই আসরে মোট চারটে স্বর্ণপদক পান।

মেয়েদের সাঁতারে ব্যক্তিগত ক্রীড়া-চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন পূর্ব জার্মানীর কোরনেলিয়া এনডার পেত্রা থুমার এবং উলরিক রিচার। ১৭ বছরের স্কুল-ছাত্রী এনডার চারটি স্বর্ণ এবং একটি রৌপ্যপদক জয় করেন। তিনি ১০০ ও ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল এবং ১০০ মিটার বাটারফ্লাই সাঁতারে বিশ্বরেকর্ড করে স্বর্ণপদক পান। ১৯৭২ সালের অলিম্পিক সাঁতারে এনডার পেয়েছিলেন তিনটে রৌপ্যপদক। ১৫ বছরের স্কুল-ছাত্রী পেত্রা থুমার ৪০০ ও ৮০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতারে বিশ্বরেকর্ড করে স্বর্ণপদক পান। ১৭ বছরের স্কুল-ছাত্রী উলরিক রিচার নতুন অলিম্পিক রেকর্ড সময়ে ১০০ ও ২০০ মিটার ব্যাক-স্ট্রোকে স্বর্ণপদক জয় করেন।

অলিম্পিক গেমস

কানাডার মন্ট্রিল শহরে গত ১লা আগস্ট এক ভাব-গম্ভীর পরিবেশে আধুনিককালের ২১তম অলিম্পিক গেমসের সমাপ্তি উৎসব উদযাপিত হয়। সেই সঙ্গে বড় বড় অক্ষরে ঘোষিত হয়েছে পরবর্তী ২২তম অলিম্পিক গেমসের আসরের নাম "মস্কো ৮০"। অর্থাৎ ১৯৮০ সালে পরবর্তী ২২তম আসর বসবে মস্কো শহরে। এবারও রাশিয়া চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকার শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। এবার রাশিয়ার মোট পদক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২৫—স্বর্ণ ৪৭, রৌপ্য ৪৩ এবং ব্রোঞ্জ ৩৫। গতবারের থেকে রাশিয়া এবার তিনটে স্বর্ণপদক কম পেয়েছে। তবে গতবারের থেকে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক অনেক বেশী সংগ্রহ করেছে গতবার রাশিয়ার মোট পদক ছিল ৯৯। গতবারের দ্বিতীয় স্থানাধিকারী আমেরিকা এবার তৃতীয় স্থানে নেমে গেছে। আর গতবারের তৃতীয় স্থানাধিকারী পূর্ব জার্মানী এবার দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে। মাত্র সতের কোটি লোকের দেশ এই পূর্ব জার্মানী এবারের অলিম্পিক গেমস আসরে স্রেফ ভেল্কী খেলা দেখিয়ে দর্শক-দের তাক লাগিয়েছে। ১৯৭২ সালের মিউনিখ অলিম্পিক গেমসের পর পূর্ব জার্মানীই একমাত্র দেশ যে আন্তর্জাতিক খেলাধূলার আসরে বিরাট অগ্রগতির পরিচয় দিয়েছে। ১৯৭২ সালের মিউনিখ অলিম্পিক গেমসের আসরে পূর্ব জার্মানী পেয়েছিল মোট ৬৬ পদক—স্বর্ণ ২০, রৌপ্য ২৩ ও ব্রোঞ্জ ২৩। এবারের অলিম্পিক আসরে তারা পেয়েছে মোট ৯০টি পদক—স্বর্ণ ৪০, রৌপ্য ২৫ ও ব্রোঞ্জ ২৫। গতবারের থেকে তারা ২০টা স্বর্ণপদক বেশী পেয়েছে। শুধু তাই নয়, মেয়েদের সাঁতারে আমেরিকার এবং অ্যাথলেটিকসে আমেরিকা ও রাশিয়ার দীর্ঘকালের একচ্ছত্র প্রাধান্য খর্ব করে পূর্ব জার্মানী আজ শীর্ষস্থান দখল করেছে। পুরুষ ও মেয়েদের নৌ-বাইচেও পূর্ব জার্মানী সর্বাধিক স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে। ফুটবলের স্বর্ণপদকটি এবার তাদের হাতে এসেছে। গতবার আমেরিকার মোট পদক ছিল ৯৪—স্বর্ণ ৩৩, রৌপ্য ৩০ ও ব্রোঞ্জ ৩১। এবারও মোট পদক সেই আছে ৯৪টি—স্বর্ণ ৩৪, রৌপ্য ৩৫ এবং ব্রোঞ্জ ২৫। গতবারের চতুর্থ স্থানাধিকারী জাপান এবার পঞ্চম স্থানে নেমে গেছে। গতবার জাপান সংগ্রহ করেছিল মোট ২৯টি পদক—স্বর্ণ ১৩ রৌপ্য ৮ ও ব্রোঞ্জ ৮। এবার জাপানের মোট পদক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৫—স্বর্ণ ৯, রৌপ্য ৬ ও ব্রোঞ্জ ১০। গতবারের পঞ্চম স্থানাধিকারী পশ্চিম জার্মানী এবার চতুর্থ স্থান দখল করেছে। ভারতের ভাগ্যে এবার একটিও পদক জুটেনি। ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত—দশটি অলিম্পিকের প্রতিটিতে ভারত পদক জয়ী হয়েছে। ভারতের পদক জয়ের তালিকায় আছে মোট ১১টি পদক—হকির স্বর্ণ ৭ রৌপ্য ১ ও ব্রোঞ্জ ২ এবং কুস্তিতে কে ডি যাদবের ব্রোঞ্জ ১। অলিম্পিক গেমসের আসরে ৬০ কোটি লোকের দেশ-জনতার কি লোমহীন ব্যর্থতা!

রামের সুমতি ছবির শুটিং-এ, মাধবী চক্রবর্তী ঃ অমৃত ফটো

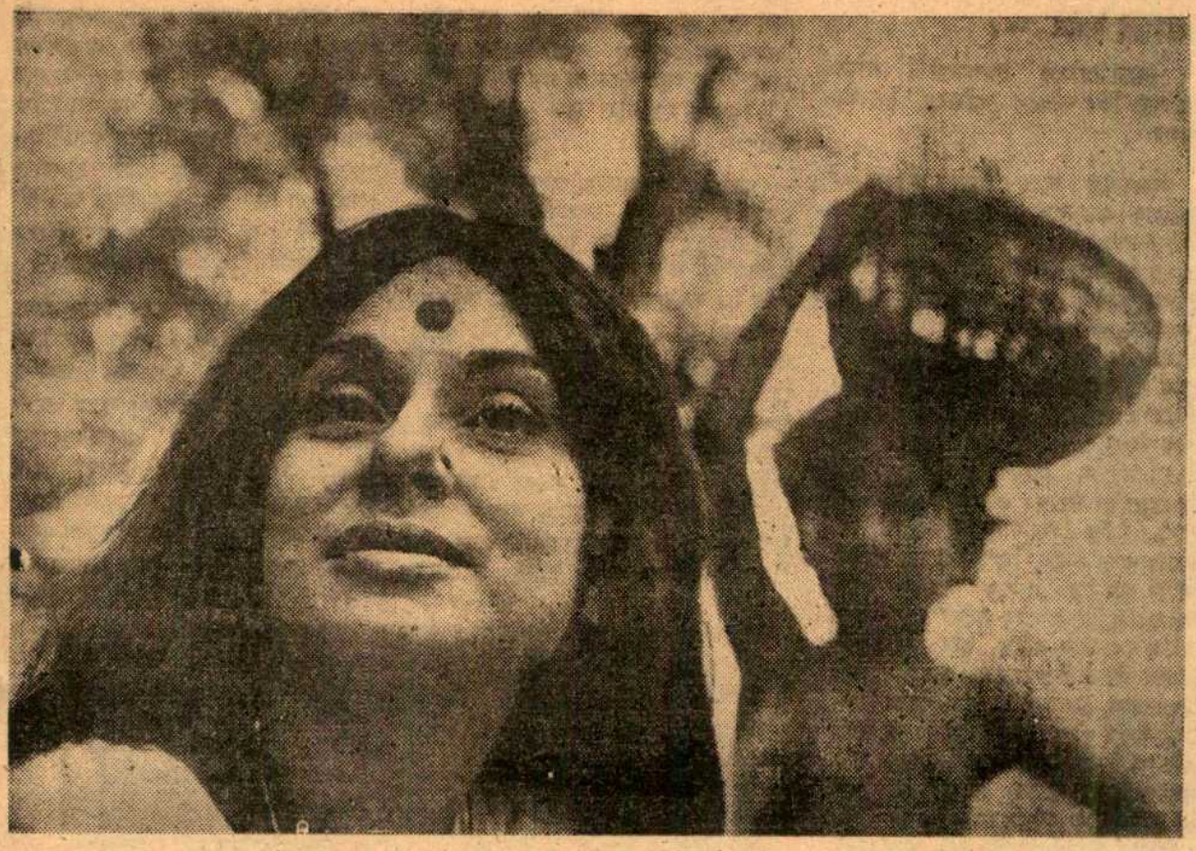

সিরিয়াস টক

আর আমার মত অন্তত হাজারখানেক শুটিং দর্শনার্থীর চোখের সামনে সেই দৃশ্য তোলা হচ্ছিল যে দৃশ্যে দেখা যাবে—শিং বাগিয়ে, লেজঝাড়া করে একটি এঁড়ে গরু সত্য বাঁড়ুজ্যেকে তাড়া করে ছুটে চলেছে। আর সত্যবাবু পড়িমড়ি ছুটে পালাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে তপন দত্ত চাকরের ভূমিকায় অভিনয় করছিল; হাট থেকে ফিরছিল বলে ওর মাথায় ধামা ভর্তি আনাজপত্র ছিল—গরুর তাড়া খেয়ে সে বেচারি মাথার ধামা ফেলে দে-দৌড় দুদ্দাড়।

একদল গরু লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এ-ছবির ক্ষ্যাপাটে ডিরেকটর, সত্যবাবুকে বলছে শুনলাম—এর মধ্যে থেকে মোশাই বাছাই করে নিতে হবে; সব গরু তো ঠিক ছোটে না, ঘাসে ভিটামিনের অভাব পড়েছে যে! তার ওপর বেঙ্গল কাউ। হুত ভাগলপুরী, দেখিয়ে দিত কাকে বলে রেস,—টালীগঞ্জের রেসের ঘোড়াকেও হার মানিয়ে দিত...

সত্য বাঁড়ুজ্যে সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূকুটী করে খাটো গলায় মন্তব্য করলেন—শুনলেন তো ডিরেকটরের বাক্য! উফ্, মশায় পাগল করে ছাড়ছে এই ক'দিনের আউটডোর শুটিং-এ। দুটো নতুন ছেলে-মেয়ে নিয়েছে, তাদের বলে কিনা তোমরা দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়, আমি শট্ নেব। শুনুন আহ্লাদের কথা।

আমি উৎকণ্ঠায়—নিয়েছে নাকি?

—পাগল। তবে ছাড়েনি। রেলপাঁইপ ধরে পোঁ পোঁ করে নামিয়ে নিয়েছে। এখন আমায় বলছে—আপনি গরুর তাড়া খেয়ে হুঁয়ে করুন মানে পানা পুকুরে লাফ্যে পড়ুন—আমি শট নেব—দেখুন দেখুন, এখন গরু বাছছে, কোন্‌টে আমার পেছনে লেলিয়ে দেবে—তা ঠিক করছে—এই যে শুনছ ব্রাদার ভাই এটু শান্ত-শিষ্ট দেখে বেছো—আমায় পাঁচ জায়গায় কামড়ে খেতে হয়। হাঁটু ভাঙ্গলে রোজগারপাতি একেবারে ডকে উঠবে বলে দিলাম—

শেষে সেমি-ফাইন্যালে এলো তিনটি পুরুষ্টু গরু। তাদের ল্যাজ মোচড়াতেই তারা বিরাট লম্ফ-ঝম্প দিল। ডিরেকটর খুশী হয়ে বলল—এবার হবে—সত্য বাঁড়ুজ্যের খিল্ খুলে যাবে এর কোনও একটা লেলিয়ে দিলে—

চাকরের ভূমিকাভিনেতা তপন দত্ত ভয়ে অস্থির। বলেই ফেলল—দাদা, শিং দিয়ে গুঁতিয়ে দিলে কিন্তু আমার অফিসের তেইশটা বেজে যাবে। বায়োস্কোপ করছি বলে এখনও কেউ জানে না, সিক্ লিভে কেটে এসেছি, এবার মনে হচ্ছে হাড়গোড় ভেঙ্গে পার্মানেন্ট লিভে যেতে হবে।

সহকারী পরিচালক পরিমল তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলল—আরে ধুৎ, গরু তাড়া করলে এটু প্রেস্টিজ যায়, কে বলেছে হাড়গোড় ভাঙ্গে? যতসব। আজকাল রিস্ক না নিলে বায়োস্কোপে অ্যাকটিং করা যায় না। মাদ্রাজের চিম্পাঞ্জী ডেবর হাতি নিয়ে ছবি করে সুপারহিট বেরিয়ে গেল রাজেশ খান্না কাস্টিং-এ, আর তোমাদের এই সামান্য গরুতে ভয়? ধিক্ ধিক্! ও ভাল কথা...দাদা সত্য বাঁড়ুজ্যেকে শটে কাছাটা খুলতে ফেলতে পারবেন?

সত্যবাবু স্রেফ আকাশ থেকে পড়লেন—কাছা? এই মরেচে...কেন?

—মানে দৌড়ের ইমপ্যাক্ট-টা জব্বর হত আর কি! পরিমল সবিনয়ে নিবেদন করল।

সত্যবাবুর মুখে বাক্য জোগাল না কিছুক্ষণ—এরা বলে কি! কাছা খুলে দৌড়? বাপরে বাপ, এ আমি কাদের পাল্লায় পড়েছি! উনি গুম হয়ে গেলেন। তারপর ফিস্ ফিস্ ফিস্ করে আমায় বললেন—বেআক্কেলেদের কথাগুলো স্রেফ শুনে যান। গত দশদিন ধরে এই আমি শুনে যাচ্ছি। বুড়'র (তরুণকুমার) আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে। স্ক্রিপ্ট শুনিয়েছিল এক, এখন স্পটে এসে দেখছি বিলকুল উল্টে গেছে। জিগ্যেস করলেই বলে দাদা এট্টু ইম্প্রোভাইজ করছি। ওয়ার্ল্ড সিনেমা এখন শুধু নাকি অন-দ্য-স্পট-ইম্প্রোভাইজেশানের ওপর চলছে, স্ক্রিপ্টটিপ্ট সব গোল্লায় গেছে। আদীতে গ্রিফিথ সাহেব স্ক্রিপ্ট বোগলে শুটিং করতেন নাকি? চার্লি যিনি অতবড় শো-ম্যান—বেদম ছবি করেছেন—ক'খানা স্ক্রিপ্ট লিখেছেন? গদার, থ্রুফো, বেয়ারিম্যান, আন্তানিয়নি, করোসোয়া—কেউ কাগজ কলমে ছবি করেন না, সবাই এট্টা আইডিয়া মাথায় নিয়ে ক্যামেরা কাঁধে করে বেরিয়ে পড়েন, ব্যস্, একেকখানা দারুন বারোস্কোপ হয়ে যায়! কি মশাই, কি বুঝলেন? বক্তব্য ফেরেববাজি। জানতে তো আর কিছু বাকি নেই! যাকগে এসব নিয়ে কিছু লিখবেন না যেন...

এইসব বলা কওয়ার মধ্যে হঠাৎ তরুণকুমার লোকেশানে এলেন। রাতজাগা ফোলা চোখ মুখ। রাত্রে কোথায় যেন থিয়েটার ছিল। সেখান থেকে সোজা এই ছবির লোকেশানে চলে এসেছেন। আবার এখানকার শুটিং শেষ করে যাবেন রিষড়ে না ডোমজুড়ে—সেখানে আজই রাত্রে হোল-নাইট শো আছে। মেজাজ খুব তিরিক্ষি হয়ে আছে। এসেই প্রোডাকশন ম্যানেজার নিতাই সরকারকে বললেন—লাঞ্চে আমার মাগুর মাছের ঝোল দেবে আজ। আর ঘন্টায় আট-চল্লিশটা ডাব দেবে আমার। আর ঠাণ্ডা দৈ-য়ের ব্যবস্থা কর। শরীর বিষম উত্তেজিত হয়ে আছে। আর আমার ড্রাইভারকে বল ও যেন এক্ষুনি চান করে খেয়ে নিয়ে টান্ টান্ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে—ও পর পর চাররাত জেগেছে—এইটুকু পথ আসতেই বত্রিশটা অ্যাকসিডেন্ট কানঘেঁষে বেরিয়ে গেছে। আচ্ছা ভাল্লু বল এবার কি শট্? অ্যাঁ, সত্যদাকে গরু তাড়া করবে? বাস হয়ে গেল, লাঞ্চের আগে ও-শট ও কে হবে না আমি বুঝেগেছি। তাহলে আর পাপ বাড়িয়ে লাভ নেই, আমিএখন ঘুমোতে চললাম—উঃ—

সত্য বাঁড়ুজ্যে বললেন—আরে যাচ্ছ কোথায়, বস বস। কাল তোমাদের কেমন শো হল?

—গোড়ার দিকে বেশ ভাল, লাস্ট থান ইঁট পড়ল। আমি তৎক্ষণাৎ কেটে পড়লাম।

সত্য বাঁড়ুজ্যে গম্ভীরভাবে বললেন—সারা বছর যদি থান ইঁট পড়ে তো আমি হিসেব করে দেখলাম বাড়ী করবার জন্যে কিছু কিছু আর্টিস্টকে গ্যাটের টাকায় আর ইঁট কিনতে হয় না। কত সুবিধে বল ভাই—

এরপর তরুণকুমারের গল্প শুরু হল। মানুষটি দারুণ মেজাজী। জমিয়ে হৈ-হুল্লোড়ের আড্ডা দিতে তরুণকুমার অদ্বিতীয়। 'স্ত্রী' ছবির সেটে শুটিং করতে গিয়ে কি কান্ড ঘটেছিল তা বসিয়ে বললেন আমাদের। তখন টালীগঞ্জে দারুণ উগ্রপন্থী টেনশন চলছে। স্টুডিওতে শুটিং করা দায়। রোজই খুনখারাপী বোমাবাজী হচ্ছে ওই অঞ্চলে। এরই মধ্যে 'স্ত্রী' ছবির শেষ দৃশ্যের শুটিং পড়ল। তরুণকুমার ওই ছবির আর্টিস্ট। কিন্তু বাহাত্তর সালের টালীগঞ্জে যাতায়াত করবার কথা শুনলে আতঙ্কে প্রাণ শুকিয়ে যায় যে! এর কয়েকদিন আগে ও পাড়ার কয়েকজন সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। যখন-তখন খন্ড যুদ্ধ বেধে যাচ্ছে। পাইপ-গান, মলটভ্ ককটেল বোমা। ছোঁড়াছুঁড়ি হচ্ছে। তখন ছবির কর্তৃপক্ষ আর্টিস্টদের নিরাপত্তার জন্যে পুলিশের শরণাপন্ন হলেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষ এক গাড়ী সি-আর-পি পাঠিয়ে ব্যবস্থা নিলেন যথারীতি—যাতে শুটিং-এর সময় কোন হ্যাঙ্গামা-হুজ্জুত না হয়। স্বয়ং উত্তমকুমার আর্টিস্ট। অন্যান্যদের মধ্যে তরুণকুমার ছাড়া ছিলেন সৌমিত্র চ্যাটার্জি আর সুব্রতা চ্যাটার্জি।

মাধব দত্ত ছুটে এসেছেন তরুণকুমারের (ক্যারেকটারের নাম ভুলে গেছি) বাড়ীতে। দেখা যাচ্ছে এখানে সীতাপতি (সৌমিত্র চ্যাটার্জি), তার অন্তিম শয্যায় শুয়ে আছে। মাধব বন্দুক হাতে করে এনেছে। মুমূর্ষু সীতাপতির তখন শ্বাসই উঠেছে। ক্রুদ্ধ, অবমানিত মাধব তার কাছে জানতে চাইছে—ছেলেটি তবে কার? সীতাপতি তুমি বল—ছেলেটি আসলে কার? সত্যি কথা না বলা

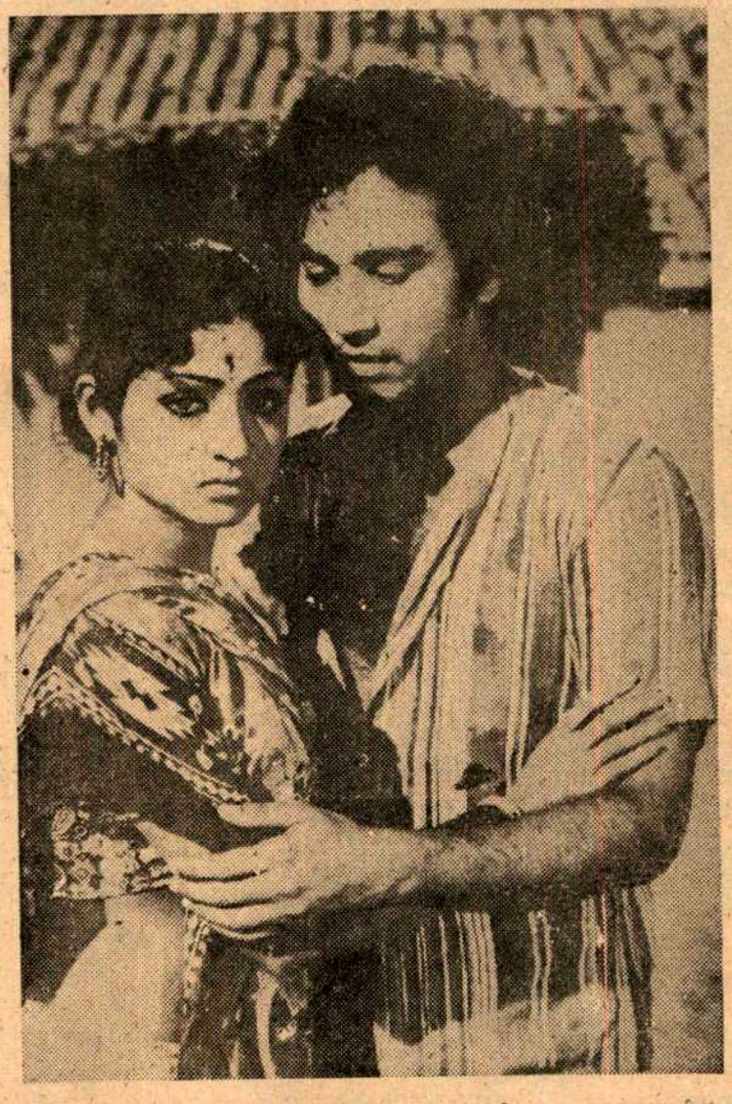

বনবাসর/পরিচালনা সুশীল মুখার্জি মহুয়া রায়চৌধুরী ও সন্তু মুখার্জি।
অমৃত ফটো

প্রেমানারায়ণ
এক যে ছিল দেশ/পরিচালনা তপন সিংহ অমৃত ফটো

পর্যন্ত আজ তোমার আর রেহাই নেই... বল, ও কে?

সীতাপতি তখন বাক্‌শক্তি রহিত অন্তিমঅবস্থা।

কিন্তু জমিদার মাধব দত্তের সেদিকে খেয়াল নেই। সে এই মুহূর্তে জানতে চায়—নিজের সন্তান জ্ঞানে যাকে সে এতদিন লালন করে এসেছে, সেই ছেলেটি কি তবে তার ঔরসজাত পুত্র নয়? এই রহস্যের সমাধান এখন একমাত্র সীতাপতিই করতে পারে। আর একজন যে করতে পারত—সন্তানের গর্ভধারিণী—সে আর ইহলোকে নেই।

উত্তমকুমার তখন ক্রুদ্ধ উত্তেজিত কণ্ঠে, হুবহু হয়ত নয়, মোটামুটি এইরকমই বলে চলেছেন—বল সীতাপতি—বল ও কার ছেলে?...না বললে আমি তোমাকে গুলী করে মেরে ফেলব...বল বল—

বলতে বলতে এক অলঙ্ঘনীয় হটকারী মুহূর্তে মাধব দত্ত তার বন্দুকের ঘোড়া টিপে বসবে। গুলী বেরিয়ে যাবে। এবং সেই গুলীর আঘাতেই সীতাপতির ঘটবে মৃত্যু—উহুঁ, আশঙ্কা হয় তার আগেই হয়ত নশ্বর দেহ ত্যাগ করে তার আত্মা মহাশূন্যে বিলীন হয়েছে।

এখন হয়েছে কি—নকশাল হাঙ্গামা থেকে শিল্পীদের রক্ষা করতে সেদিন এক গাড়ী যে সি-আর-পি স্টুডিওতে এসেছিল, তারা সকাল থেকে স্টুডিওর বিভিন্ন জায়গায় সশস্ত্র পাহারায় মোতায়েন ছিল। আবার তারই মধ্যে একদল খোদ ফ্লোরের মধ্যে বসে পাহারা দিচ্ছিল। কারণ এর কিছুদিন আগে বিভিন্ন স্টুডিওতে শুটিং চলাকালীন কিছু উগ্রপন্থী ফ্লোরে-মেকআপরুমে ঢুকে শিল্পীদের ওপর চড়াও হয়েছিল। তাই সেদিন আগেভাগেই সব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

ফ্লোরের ভেতরে, ফ্লোরে দরজার বাইরে এবং স্টুডিওর গেটে রাইফেলধারী কড়া পাহারা চলছিল তখন। ফ্লোরের দরজায় যে পুলিশটি ডিউটী করছিল, তার তখন একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব। হঠাৎ ভেতর থেকে গুলী চালানোর শব্দ শুনেই তার আত্মারাম খাঁচাছাড়া। সে ভাবল স্টুডিওতে নিশ্চয় নকশাল হামলা আরম্ভ হয়েছে। তাই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে সে উঠে দাঁড়াতেই তার থেকে রাইফেলটি সটান মাটিতে পড়ে গেল। আর তাই দেখে অদূরে প্রহরারত স্টুডিওর দ্বারোয়ানরা টেনে দৌড় মারল। আর দারোয়ানরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে দেখে যারা শুটিং দেখতে এসেছিল, তারাও আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে ছুটোছুটি ফেলে দিল। একটি লোক তো ভ্যাঁক করে কেঁদেই ফেলল। মুহূর্তের মধ্যে সারা স্টুডিও রাষ্ট্র হয়ে গেল যে উগ্রপন্থীরা সদলবলে ফ্লোরে ঢুকে আক্রমণ করেছে এবং গুলী করে খুন করছে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই ছুটে যে যেখানে পারল অমনি লুকিয়ে পড়ল: কাজের দফা গয়া। পুলিশেরা এরপর খুঁজতে বেরোল—দুষ্কৃতিকারীরা কোথায় লুকিয়ে আছে।

অথচ ফ্লোরের মধ্যে কি হাসাহাসি। উত্তমকুমারের বন্দুকে আসল কার্তুজের বদলে ব্ল্যাংক কার্টিজ ভরে দেওয়া হয়েছিল যাতে ঘোড়া টিপলে আগুনের ঝলক নল থেকে বেরিয়ে আসে, ধোঁয়া দেখা যায় এবং গুলীর আওয়াজ রেকর্ড হয়। এটা আগে কেউ বলেনি। ফলে এই বিপত্তি। পরিচালক সলিল দত্ত বিব্রত, বিচলিত। শট্ আর হল না। সবাই হঠাৎ প্যানিক স্টিকেন হয়ে ছোটা-ছুটি করায় শিল্পীদের হাসি আর থামে না। এমন উদ্ভট পরিস্থিতিতে কে আর না হাসে? পরিচালক বুঝলেন যে এখন আর শুটিং করা সম্ভবপর নয়—অগত্যা তিনি লাঞ্চ ব্রেক দিয়ে শুটিং-এর সাময়িক বিরতি ঘোষণা করলেন।

তরুণকুমার বললেন—শুটিং করতে গিয়ে আমরা একেক সময় এমন সব বিদ্‌ঘুটে পরিস্থিতিতে পড়ি যা বলে শেষ করা যায় না। মানুষের তো কৌতূহলের শেষ নেই। ফলে শুটিং অনেক সময় বানচাল হয়েও যায়...আচ্ছা এখন আমি ঘুমোতে যাচ্ছি ভাই—লাঞ্চের পরে শট্ দিতে আসব—তখন আবার দেখা হবে—

তরুণকুমার চলে গেলেন।

পরিমল এসে সত্য বাঁড়ুজ্যেকে বলল—দাদা আমরা রেডি। চলুন শট্ দেবেন।

সত্যবাবু মেকআপম্যান শম্ভুকে ডাকলেন—কৈ হে, এসে আমার মাথায় চুলটা ঠিক করে বসিয়ে দাও, আর গোঁফটা। বড্ড কুট্ কুট্ করছে। দিশী আঠা আর দিও না—

(চলবে)

রঞ্জন মজুমদার

একটি মূল্যবান আলোকচিত্র : ১৯৫৮ খৃঃ সাগর সঙ্গমে চিত্রের জন্য বছরের সেরা ছবির পুরস্কার নিচ্ছেন দীপচাঁদ কাংকরিয়া রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের কাছ থেকে। পাশে উপবিষ্ট জওহরলাল নেহরু।

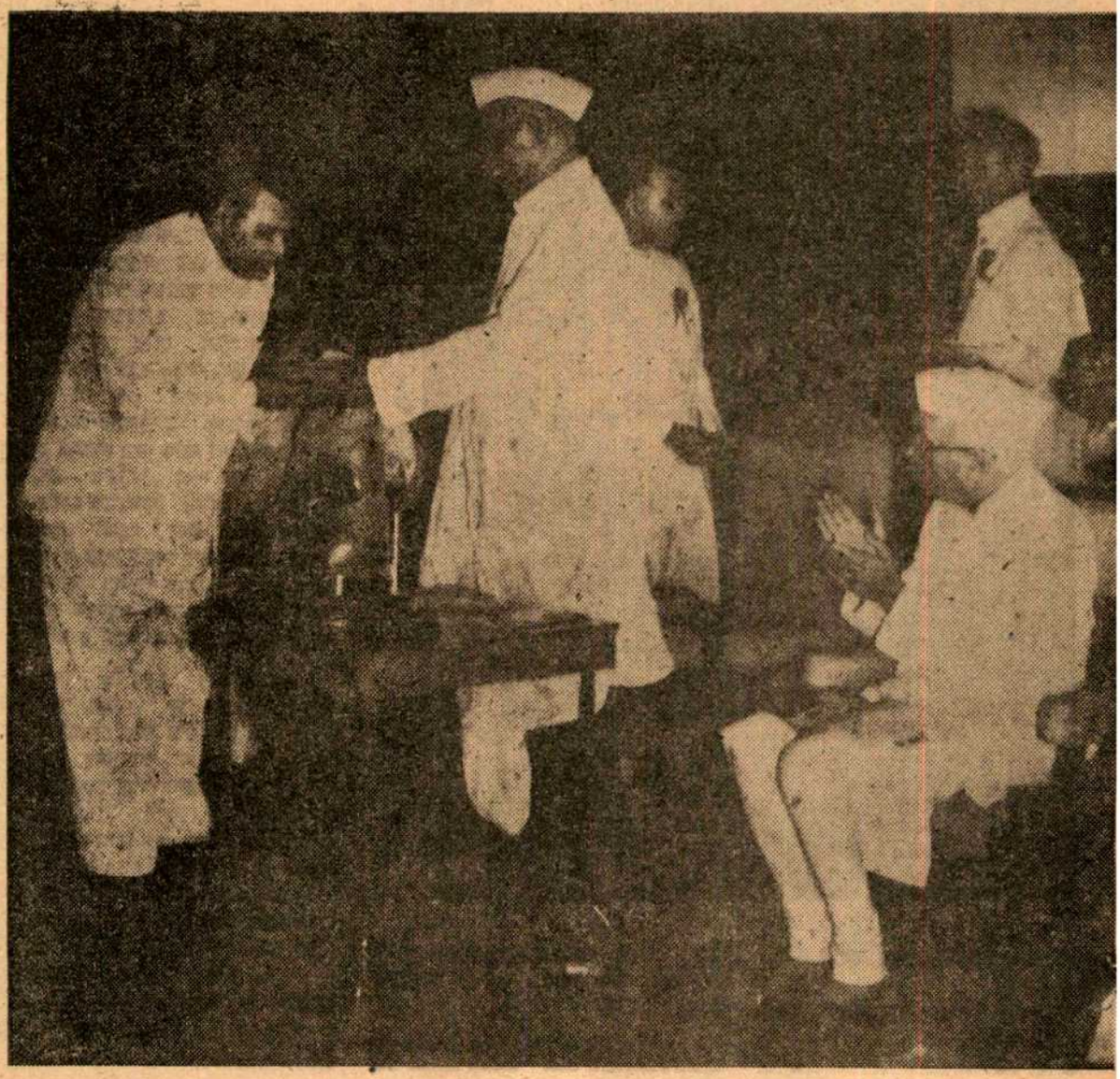

কয়েকজন

দীপচাঁদ কা কারিয়া

পূর্ব পুরুষ রাজস্থানবাসী, কিন্তু গত একশ বছরেরও বেশী কাংকারিয়া ফ্যামিলি রংপুরের ছন্দে জমিদার। পাট আর কাপড়ের ব্যবসায় দেশজোড়া নামডাক ছিল তখন। জমিদারী চলে গেলেও রংপুরে এখনও কাংকারিয়া পরিবারের নাম শুনলে সবাই-ই বোধ হয় সম্ভ্রমে মাথা নোয়াবে।

সেই বাড়ীর ছেলে দীপচাঁদ কাংকরিয়া। যাঁকে বাংলা ছবির জগতে অনেকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। সেই ১৯৩৫-৩৬ সাল থেকে আছেন এই ফিল্ম লাইনে। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে ভালবাসেন একে পিতৃস্নেহে।

যাঁর কাছ থেকে এক সময় বাংলা ছবির জগৎ সাগর সঙ্গমে, ডাক হরকরার মত শিল্প সমৃদ্ধ ছবি পেয়েছিল; যাঁর পরোক্ষ চেষ্টায় সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী ছবিখানি শ্রী-বসুশ্রী-বীণায় মুক্তি পেয়েছিল সেই মধ্য পঞ্চাশ দশকে, যিনি মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক হয়ে জন্ম দিয়েছিলেন এম-পি প্রোডাকসনের, যাঁর ছবি করার জন্য বড়ুয়া সাহেবের মত আর্টিস্টও গায়ে একশ তিন ডিগ্রী জ্বর নিয়ে সারা রাত কাটিয়েছেন ফ্লোরে সেই দীপচাঁদ কাংকারিয়া রংপুর ছেড়ে কলকাতায় এসেছিলেন ১৯২৫ সালে। পিতৃ ব্যবসাতেই মন দিয়েছিলেন।

ফিল্ম করবেন তেমন বাসনা ছিল না কিন্তু পাকেচক্রে যোগাযোগ ঘটে গেছে উমা গাঙ্গুলী (কালী ফিল্মস) আর বি এ সরকারের (নিউ থিয়েটার্স) সঙ্গে। ওঁদেরই সুবুদ্ধিতে তিনি চলে এলেন ফিল্ম লাইনে। সেই ১৯৩৫ সাল থেকে শুরু

আটত্রিশ সালে পি এন গাঙ্গুলীর কা থেকে কিনলেন উত্তরা হলটি। পরের বছ হাতে এলো পূরবী। শুধুমাত্র একসিবিট হিসেবে নয়, ইতিমধ্যে প্রোডিউসা হিসাবেও দীপচাঁদবাবুর নাম এসে গেছে সামনের সারিতে। মুরলীধর চট্টোপাধ্যা সঙ্গে এক হয়ে ডিলাক্স ফিল্মসে ব্যাপারে অভয়ের বিয়ে আটত্রিশ সাল নাগা বাংলার পর্দায় এসে গেছে। এই ছবিতেই শচীনদেব বর্মণ প্রথম এবং শেষবারের ম

অভিনয় করেছেন। এই রকম প্রথম কাজের দাবীদার তিনি বহুবার হয়েছেন। খ্যাত-নামা অভিনেতা ছবি বিশ্বাসকে ফিল্মে আনার মূলেও ছিলেন এই দীপচাঁদবাবু।

ছবি বিশ্বাসের ফ্যামিলির সঙ্গে ওঁদের হৃদ্যতা বহুদিনকার। পাটের ব্যবসায়ে ওঁরা ছিলেন প্রধান রোকার। ছবি বিশ্বাসের সঙ্গে ওঁদের সম্পর্ক পারিবারিক। সেই ছবি বিশ্বাসকেও একদিন তিনি সেট থেকে বের করে দিয়েছিলেন দেরীতে আসার জন্য। এমন কি সেই ছবি থেকেও বাদ গিয়েছিলেন তিনি। পরবর্তী কয়েক বছর দীপচাঁদবাবুর কোন ছবিতেই আর ছবি বিশ্বাসকে দেখা যায় নি। আবার সবার উপরে ছবিতে তিনিই তাঁকে ফিরিয়ে এনেছেন।

আসলে দীপচাঁদবাবু প্রচণ্ড শৃঙ্খলা-পরায়ণ। ভালবাসা স্নেহ প্রীতি উদারতার সবার আগে, সেই সঙ্গে ডিসিপ্লিনটাকেও তিনি মেনে চলেন। বললেন — আমাদের সময়ে কাজকে আমরা সিনসিয়রলি নিতাম, কোন ফাঁকি ছিল না তার মধ্যে। আজ সবার মনেই এই বস্তুটির খুব অভাব।

আজকের আবহাওয়ার সঙ্গে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছেন না তিনি। ১৯৫৪য় সাগর সঙ্গমে ছবি করে প্রোডাকশন বন্ধ করে দিয়েছেন। যে সব শিল্পীদের এক সময় আড়াইশ/তিনশ টাকা মাস মাইনেয় কাজ করিয়েছেন ছবিতে তাঁদের কাছে গিয়ে ডেট-এর ধর্ণা দিতে হবে এটা ভাবতেই পারেন না দীপচাঁদবাবু। তার ওপর আর্টিস্ট টেকনিসিয়ানদের নিত্যনৈমিত্তিক দাবী-দাওয়ার ঝামেলাও কম নেই। কষ্ট বেড়েছে অনেক। সেই সঙ্গে বাজারও গেছে কমে। কাজেই ছবি করায় ইন্টারেস্ট এখন আর তাঁর নেই।

এমন কি পরিবেশনার কাজেও প্রায় হাত গুটিয়ে নিয়েছেন। সেই বছর কয়েক আগে 'কখনো মেঘ' ছবিই ডিলাক্স ফিল্মের শেষ পরিবেশিত ছবি।

—ডিস্ট্রিবিউশন নিচ্ছেন না কেন?

দীপচাঁদবাবুর উত্তরটি বেশ মজাদার, সেই সঙ্গে আবার মর্মও বটে। উনি বললেন—বাংলা ছবির আসল প্রোডিউসার কেউ আছে নাকি? আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—একটা নাম করুন তো দেখি যিনি ছবির সোল প্রোডিউসার! পারবেন না। আসলে এখানে ডিস্ট্রিবিউটরই বেনামে প্রোডিউসার। ছবির খরচের সিংহভাগ তাকেই দিতে হয়।

এই অবস্থায় ছবির ডিস্ট্রিবিউশন নেওয়া মানে প্রোডাকসনেই নামা। কিন্তু প্রোডাকসনে যাবেন না স্থির করেছেন বলেই ডিস্ট্রিবিউসানও নিচ্ছেন না।

—তাহলে এখন করছেন কি? ফিল্ম লাইনের সঙ্গে সম্পর্কটা কোথায় আপনার-

জবাবে তিনি বললেন —, প্রোডিউসার-ডিস্ট্রিবিউটররা টাকার অভাব হলে আসেন—টাকা দিই। এছাড়া লেবরেটরী আছে, ডিস্ট্রিবিউসনের কাজ তো আছেই।

৪৫ আর-পি-এম
স্ট্যাণ্ডার্ড প্লে রেকর্ড

45N 83576
সমরেশ রায়
ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হোয়ে
কেন মেঘের ছায়া

৪৫ আর-পি-এম
এক্সটেন্‌ডেড্ প্লে রেকর্ড

7EPE 3130
(১) মীরা দত্তরায়
(২) নীতিশ দত্তরায়
বোলো না বোলো না ওলো সই (১)
আর কত গান গাইব বল (২)
তুই কালি মেখে জ্যোতি ঢেকে (২)
গোঠের রাখাল বোলে দে রে (১)

7EPE 3132
(১) সুমিত্রা রায়
(২) অধীর বালচী
এলো শ্যামল কিশোর (১)
কত সে জনম কত সে লোক (১)
শাওন রাতে যদি (২)
তরুণ অশান্ত কে বিরহী (২)

7EPE 3134
কাজী সব্যসাচী (আবৃত্তি)
'বিদ্রোহী'
এক রন্তে দু'টি কুসুম
হে রুদ্র আদেশ দাও
কবির মুক্তি

৩৩⅓ আর-পি-এম
সুপার সেভেন
স্টিরিও রেকর্ড

S/7LPE 139
ডাঃ অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়
মোমতাজ
ফাল্গুন-রাতে ফুলের নেশায়
বনবিহঙ্গ ও রে উড়ে
তুমি যখন এসেছিলে
ওগো, নতুন নেশার আমার এ মদ
রেশমী রুমালে কবরী বাঁধি

S/7LPE 141
অনুপ ঘোষাল
স্বপ্নে দেখি একটি নতুন ঘর
মালার ডোরে বেঁধো না গো
মম মধুর মিনতি
আমি যদি আরব হতাম
পলাশ ফুলের গোলাপ ভরি
শূন্য এ বুকে পাখি মোর

S/7LPE 140
মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সন্ধ্যা গোধূলি লগনে
পথিক ওগো
তুমি আমায় ভালবাস
আজ সুদিনের আসলো উষা
ঘুমাও ঘুমাও দেখিতে এসেছি
স্বপনে এসেছিল মৃদুভাষিণী

HMV
দি গ্রামোফোন কোম্পানী
অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড
ই. এম. আই. কোম্পানী সমূহের অন্যতম।
সংগীত, ইলেকট্রনিক্স ও মনরঞ্জনের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অগ্রণী।

GC 8874

তবুও বাংলা ফিল্মের অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব এই দীপচাঁদ কাংকারিয়া। যখনই কেউ বিপদে পড়েন সোজা চলে আসেন সাতাশি ধর্মতলা স্ট্রীটে। বিপদ উদ্ধারে তিনি সর্বদা সবার আগে।

এই নিয়ে ফিল্ম লাইনে কটূক্তিও কম হয় না। দীপচাঁদদের শত্রুও কম নেই। এই প্রসঙ্গে কথা পাড়তেই তিনি হাসতে হাসতে বললেন—লোকের উপকার করলে এ রকমই হয়। এজন্য আমার কোন দুঃখ নেই।

দুঃখ তাঁর একমাত্র বাংলা ফিল্মের দুরাবস্থা নিয়ে। ভাল ছবি আর তেমন হচ্ছে না এখন। অথচ উনি যে বিশটা বছর এই টালিগঞ্জে ছবি করেছেন একখানা ছবিও ফ্লপ করে নি। প্রায় সব ছবিই হিট। দু-একটা নাম বলি—নবরঙ্গম অভয়ের বিয়ে সম্পর্ণ, সাগর সংগমে, লালু-ভুলু, ডাক হরকরা অগ্নি পরীক্ষা উত্তরায়ন লাল পাথর চন্দ্রশেখর বাঁকা লেখা, প্রতীক্ষা ইত্যাদি। সব নাম করতে গেলে জায়গায় কুলোবে না।

যিনি এমন সাকসেসফুল প্রোডিউসার তাঁর এই নীরব বসে থাকা খুবই অস্বাভাবিক। তাই বললাম—আপনার ব্যথার এবং ব্যক্তিগতভাবে আপনার সুনামই বা কম কিসে? আপনারা ছবি তৈরী শুরু করলে আরও পাঁচজন উৎসাহ পেত, ভাল ছবি তৈরী হতো আরও কিছু।

অভিমান মাখা সুরে একই উত্তর দিলেন তিনি। এক সময় যিনি অফিস ঘরে বসে টালিগঞ্জের স্টুডিও তদারকি করেছেন আজ তাঁর পক্ষে স্টুডিওর বিশৃঙ্খলা আব-হাওয়ায় নাকি কাজ করা সম্ভব হবে না।

বললাম—সবাই-ইতো করছেন কাজ এই সব অসুবিধের মধ্যেও।

: আমি পারব না। অন্তত এই মুহূর্তে ছবির কাজে আর ফেরবার কথা ভাবছি না।

সুতরাং দীপচাঁদ কাংকারিয়া আপাতত টাকা ধার দিচ্ছেন বিপন্ন ফিল্ম নির্মাতাদের এবং উত্তরা পুরবী উজ্জলা হলের মালিক হয়েই ফিল্মের সঙ্গে আছেন, থাকবেন।

হলের প্রসঙ্গ আসতেই উঠল আগামী অর্ডিনান্সের কথা। উনিও বললেন—অর্ডিনান্স নিশ্চয়ই উপকার করবে বাংলা ছবির। সেন্সর ওয়াইজ রিলিজের বন্দোবস্ত হলে ছোটখাট প্রোডিউসারদের বসে থাকতে হবে না, ধারের টাকা সুদে তেমন বাড়তে পারবে না। এটা কম সুবিধে নয়।

মেহবুবা/রাজেশ খান্না/হেমা মালিনী

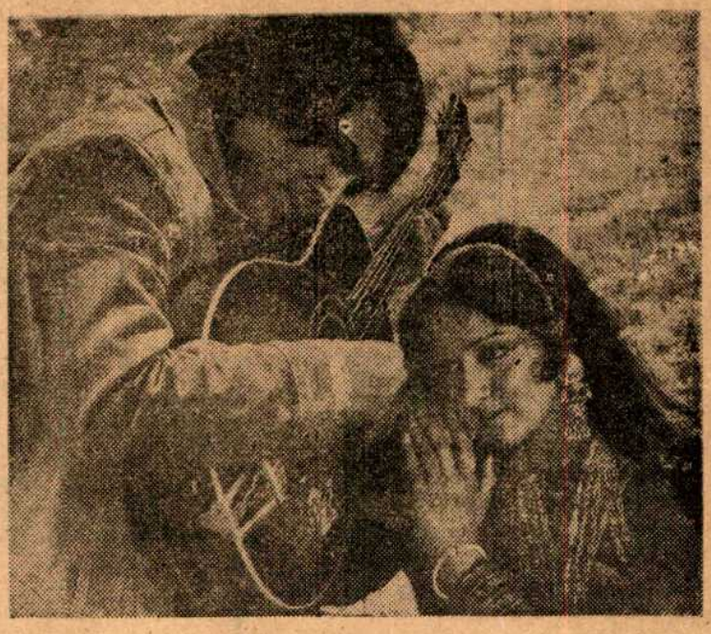

সেই সঙ্গে অসুবিধের কথাও বললেন দীপচাঁদবাবু। বললেন আমার হলে কোন ছবি কবে রিলিজ হচ্ছে জানতে পারব না। আমিও না, প্রোডিউসারও না। ফলে ছবি রিলিজের আগে হলে যে সব পাবলিসিটি হয়ে থাকে (ট্রেলার-স্লাইড ইত্যাদি) সেগুলো হবে না। তাতে ক্ষতি কম হবে না।

কিন্তু সুদে টাকা বেড়ে যাওয়ার চাইতে এই ক্ষতি অবশ্যই অনেক কম। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে লাভই বলা যায়। আর ছাব্বিশ সপ্তাহ বাংলা ছবি চালানো?

এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য—আমার হাউস তো বাংলা ছবিরই হাউস। প্রায় প্রথম থেকেই বাংলা ছবি চালাচ্ছি। অন্য কোন ছবি চালাবার কথা এখনও ভাবছি না। সুতরাং ছাব্বিশ সপ্তাহ ছবি দেখানোয় কোন অসুবিধে হবে না।

তবে দুঃখ করে তিনি বললেন—একের পর এক বাংলা ছবি যেভাবে মার খাচ্ছে তাতে বাংলা ছবি চালিয়ে আর হল বাঁচান যাবে কিনা বুঝতে পারছি না।

প্রতিটি খাতে হিসেব দেখিয়ে তিনি বললেন — মিনিমাম ওয়েজ-শো ট্যাক্স কর্পোরেশন ট্যাক্স ইলেকট্রিক বিল ইত্যাদির রেট যেভাবে দিনকে-দিন বেড়ে যাচ্ছে তাতে আর খরচ কুলিয়ে ওঠা যাচ্ছে না। ইলেকট্রিক বিল তো গত কয়েক বছরে প্রায় চার গুণ বেড়েছে। এগুলোর দিকেও সরকার দয়া করে নজর দিন না।

বাংলা ছবি চালিয়ে নাকি তেমন লাভ হয় না। আর দুঃখ করে বললেন—যে ছবি চলে সুপার হিট হয় তার প্রোডিউসরও আমাদের বাড়তি কিছু দেন কি? কিছুই না, বড়জোর গোল্ডেন জুবিলীর সময় এক-খানা লোহা বা তামার ফলক। ওটা নিয়ে কি হবে আমার?

সেই কারণেই হল পাবার ব্যাপারে এত ঝামেলা এত ঝঞ্ঝাট। রোন্টাল বেসিসে বুকিং হোল্ড ওভার প্রোটেকশনের ফাঁসে সব দিক দিয়ে প্রোডিউসার-ডিস্ট্রিবিউটরকে এমনভাবে বেঁধে নেন যে নড়বার ক্ষমতা থাকে না। ছবি ফেল করলে নার্ভাস ওঠে প্রোডিউসারের, হল মালিকের প্রায় রিস্ক-হীন ব্যবসা। দীপচাঁদবাবু বললেন—আমাদের খরচ-খরচার দিকে একটু নজর দিন সরকার। আয়ের পথ তো আমাদের তেমন বাড়ে নি। এন্টারটেনমেন্ট ট্যাক্স বেড়েছে প্রচুর, কিন্তু টিকিটের দাম কি সেই হারে বেড়েছে? এমনি আরও অভিযোগের পাহাড় জমে আছে তাঁর?

যে দীপচাঁদ কাংকারিয়া এক সময় টালি-গঞ্জ ধর্মতলা স্ট্রীটের ফিল্ম পাড়ায় হা-হা রবে ব্যবসা করে গেছেন আজ তিনি স্তব্ধ নীরব। অন্ততঃপক্ষে প্রত্যক্ষভাবে ফিল্ম তৈরীর কাজে আর তিনি নেই।

—কেন?

সেটা চিন্তার বিষয় নিশ্চয়ই!

নিরীক্ষক

ভর্তি চলিতেছে

শাস্ত্রীয় সুগীতে, রবীন্দ্র সঙ্গীত, তবলা, সেতার, গীটার, বেহালা ও নৃত্য শিক্ষা কেন্দ্র ও পরীক্ষা কেন্দ্র, পরিচালনা ও শিক্ষাদানে প্রধানতঃ

ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ এবং

শ্রীঅখিলবন্ধু ঘোষ

শিশুবিভাগ ঃ ৮ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত

বিশিষ্ট বেতার শিল্পী দ্বারা পরিচালিত

মেট্রোপলিটন কলেজ

২৪১।১, ডাঃ হাঃ রোড, বেহালা, কলিঃ-৩৪

নাটমঞ্চ

উপভোগ্য নাটক 'অতএব'

গত ২৩ জুলাই রঙ্গনা মঞ্চে একটি প্রহসনমূলক সামাজিক নাটক দেখতে দেখতে যেন আজ থেকে কুড়ি পঁচিশ বছর পূর্বের প্রারম্ভ যৌবন বয়সে চলে গিয়েছিলাম, যখন অ্যামেচার নাটকের শিল্পীদের অভিনয় দেখে বিস্ময় জাগতো মনে, অভিনয় দেখে প্রেরণা পেতাম।

সেই বিরল অভিজ্ঞতা এই দীর্ঘকাল পরে পাওয়াও এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা অবশ্যই। নাটক দেখলেও যার স্বাদ মন থেকে মুছে যায় না, এমনই ছিল সে কালের শিল্পীদের অভিনয়-ক্ষমতা। সেই ট্র্যাডিশন কোন কোন শিল্পীর মধ্যে আজও আছে দেখে সেদিন বড় ভালো লেগেছিল।

সেদিনের নাটক ছিল বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত "অতএব"। তাকে সার্থকভাবে মঞ্চে উপস্থাপিত করেছেন শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট-এর অ্যাম্বুলেন্স, নার্সিং ও ক্যাডেট ডিভিশনের সভ্যরা ৩৬তম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে।

বিধায়কবাবুর এই সিরিও কমিক নাটকটি এক সময় দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে। দেখা গেল অভিনয় করতে জানলে নাটক কখনও পুরোনো হয় না।

আর সেদিন যে ঐ নাটকটি কতখানি উত্তীর্ণ হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদের ঘন ঘন হাততালি ও উদ্দাম হাসিতে।

অভিনয়ে প্রথমেই যিনি দর্শকদের মধ্যে বিস্ময়ের সঞ্চার করেছেন এবং অজস্র ধন্যবাদ কুড়িয়েছেন, তিনি বিরাট ধনী দোলগোবিন্দ চৌধুরী চরিত্রের সার্থক রূপকার মুকুলকান্তি ঘোষ। এমন পাকা অভিনয় শুধু অ্যামেচার ক্লাবে নয়, যে কোন পাবলিক স্টেজেও দুর্লভ। দীর্ঘকাল দর্শকদের তাঁর অভিনয় মনে থাকবে।

তার পরেই নাম করতে হয় লেডি ম্যানেজারীরূপী শ্রীমতী গীতশ্রী দেবীর। তিনি এবং মুকুলবাবু যখনি মঞ্চে এসেছেন, তখনি দর্শকরা তাঁদের আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

অসীমরতন গাঙ্গুলীর চেতনও একটি সুন্দর টাইপ চরিত্র সৃষ্টি। তিনিও দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন। প্রেম পাগল যুবকের ভূমিকায় অলক মিত্র বেশ সপ্রতিভ অভিনয় করেছেন।

এছাড়া ছিটগ্রস্থ প্রৌঢ়-রূপী সুশীল মুখার্জী, হোটেল ম্যানেজারের ভূমিকায় হরুণ দত্ত, প্রতাপ রায়চৌধুরী (কালাচাঁদ), গৌতম সরকার (ব্যাচারাম বল), পরিমল রায়চৌধুরী (প্রফুল্ল), সুমিত চৌধুরী (বিভূতি), হিরন্ময় মুন্সী (হরবিলাস), অচিন্ত্য মিত্র (পঞ্চানন), তরুণ কর (অম্বিকা) ও বিশু চাকরের ভূমিকায় কাশীনাথ দাস সুন্দর।

অন্য দুটি নারী চরিত্রে জ্যোৎস্না নিয়োগী ও রীতা চ্যাটার্জীও দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন।

অভিনয় ছাড়া এ নাটকের আর এক আকর্ষণ ছিল সলিল মিত্র পরিচালিত সঙ্গীতাংশ। নাটকের অম্ল, মধুর ও করুণ দৃশ্যগুলি যেন মুখর হয়ে উঠেছিল তাঁর প্রচেষ্টায়।

নাটকটি সুষ্ঠু এবং সার্থকভাবে পরিচালনা করার জন্য শ্রীসুধীর মুস্তাফীকে অজস্র ধন্যবাদ।

নান্দনিক-এর 'নতুন সূর্য'

নিছক এবং নির্দোষ নাটক পরিবেশন আজকাল অ্যামেচার নাট্যদল ছাড়া বড় একটা কেউ করে না। গ্রুপ থিয়েটারগুলি তো নয়ই।

তাই গ্রুপ থিয়েটার দল কোন নাটক মঞ্চস্থ করলে আধুনিক সচেতন নাট্য-দর্শকরা তার মধ্যে নতুন কিছু অন্বেষণ করে। সেটা এমন কিছু নতুনত্বে চিহ্নিত যা শুধু টেকনিক-এর দিক থেকেই সমৃদ্ধ নয়, নতুন কিছু ভাবনার বীজও তার মধ্যে নিহিত থাকে।

তাই বড় ভরসা ছিল, নান্দনিক ও তেমনি কিছু উপহার দেবে দর্শককে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁদের নতুন নাটক 'নতুন সূর্যে' তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বস্তু দিতে পারেনি।

তার দুটো বড় কারণ বোধহয় ক্লান্তিকর সংলাপ ও নাটকের আলগা বাঁধুনি। আর কিঞ্চিৎ অগোছালও মনে হয়েছে নাটকের সংলাপ। এবং মাঝে মাঝে মোটা দাগের। (নাটক পার্থ ভট্টাচার্য, পরিচালনা

শেষ রক্ষা/সন্তু মুখার্জি ও সুমিত্রা মুখার্জি। (অমৃত—ফটো)

সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য)। অথচ শিল্পীদের অভিনয়ে কোন খামতি বা গাফিলতি নেই। তবু নাটককে সার্থকতায় পৌঁছে দিতে না পারা দুঃখজনক বৈকি। অথচ আধুনিক নাটক পরিবেশনের ক্ষেত্রে নান্দনিক-এর কিছুটা খ্যাতি আছে। এ নাটকের প্রয়োগ বা উপস্থাপনা কিছুটা ভিন্ন ধরনের (যে টেকনিকটি প্রয়োগ করে ইতিমধ্যেই দু-একটি দল সুনাম অর্জন করেছে) অর্থাৎ একজন মাধ্যমকে খাড়া করে, তার প্রয়োজন মত নট নটী বা চরিত্রকে মঞ্চে এনে তার প্রয়োজন অথবা ভাবনা কিংবা বক্তব্য অনুযায়ী তাদের দিয়ে অভিনয় করানো।

মাধ্যমটি সুন্দর এবং আকর্ষণীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু গল্পের বাঁধুনি শক্ত না থাকার দরুন এবং বক্তব্য স্পষ্ট না হবার দরুন শিল্পীরা পরিশ্রম করা সত্ত্বেও তা দাঁড়ায়নি।

অথচ মূল চরিত্র (একজন নাট্যকার) প্রচুর পরিশ্রম করেছেন নাটকটিকে দাঁড় করাবার জন্যে।

অভিনয়ে অমর ভট্টাচার্য দেবব্রত ও পার্থ ভট্টাচার্যর সমর সেন বক্তব্যে কিঞ্চিৎ স্থূল হলেও অভিনয় ও অভিব্যক্তিতে নিষ্ঠাবান। প্রবীর মুখার্জীর সুবীর, দীনেন মুখার্জীর উপনায়ক এবং বেবী মুখার্জীর সোমা-র অভিনয় করার সুযোগ না থাকলেও মঞ্চে কিন্তু তারা অনেকটাই সপ্রতিভ ও স্বচ্ছন্দ ছিলেন।

'নান্দনিক-এর কাছে দর্শক আরও বলিষ্ঠ ও পরিণত নাটক চায়।

নাট্য সমালোচক

দত্তা

পরিচালনা : অজয় কর

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত বর্তমানের এই ছবিটি সুপরিচালনার গুণে নিঃসন্দেহে একটি ভাল ছবির পর্যায়ে পড়বে। বহু পঠিত এই কাহিনী সম্বন্ধে নতুন কিছু লেখা নিষ্প্রয়োজন। কারণ পরিচ্ছন্ন এই চিত্রটিতে শরৎ কাহিনীর বিশ্লেষণ সুন্দর। আর সুন্দর মুখ্য চরিত্রের শিল্পীদের অনবদ্য অভিনয়, যা ছবিকে প্রাণবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী করতে বিশেষ সাহায্য করেছে। পরিচালক

দত্তা : সুচিত্রা

ছবির মুডকে সারাক্ষণই ধরে রাখতে পেরেছেন। নাটকীয় সংঘাতগুলিও বেশ জমেছে। সম্পাদনার গুণে ছবি কোথাও চঞ্চল নয়, আবার স্থিরও নয়; একটা সুন্দর মেজাজে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সুচিত্রায়িত। ছবির মোট তিনটি গানের ভিতর দুটি রবীন্দ্রসংগীত, যার মধ্যে নরেনের আগমনের দৃশ্যগুলিতে 'আমার বীণা' গানটির প্রয়োগ সুন্দর। অপর গানটি তুলনামূলকভাবে তত ভাল লাগে না।

এবার আসা যাক অভিনয়ের কথায়। সুচিত্রা সেনের বিজয়া আর একবার শিল্পীর প্রতিভার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শিক্ষিত, সংযত ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ এই ব্রাহ্ম মহিলার কঠিন ও কোমল মুহূর্তগুলিতে শ্রীমতী সেন অনন্যা। একই কথা বলা চলে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে। নরেনের চরিত্রটি তাঁর অভিনয়গুণে বিশেষ প্রাণবন্ত। বিজয়ার কোন এক প্রশ্নের উত্তরে নরেনের মাথা নীচু করে চলে যাবার দৃশ্যটি ভোলবার নয়। মুহূর্তটিও সুন্দর। উৎপল দত্তর রাস-বিহারী আর এক স্মরণীয় চরিত্রসৃষ্টি। আগাগোড়া অসাধারণ অভিনয় করে শেষে তিনিই বাজীমাৎ করেছেন। সুঅভিনয় করেছেন শৈলেন মুখোপাধ্যায়, শমিত ভঞ্জ, সুমিতা মুখোপাধ্যায় ও বিশেষভাবে মাস্টার জুম্মাদার।

চিত্রবিদ

মেহবুবা

প্রযোজনা : এম, আর, প্রডা
প্রাঃ লিঃ

সুরজ শহরের একজন জন
সঙ্গীত শিল্পী। আচমকা একি
অনুষ্ঠান থেকে ফিরবার পথে এ
প্রাসাদের ভগ্নাবশেষে ওঁর দৃষ্টি
করে। ওখানে এক মলিন ও জ
পেন্টিং দেখে সুরজের পূর্বস্মৃ
আসে, মনে পড়ে যায় চন্দনপু
চন্দনপুরে সুরজের নাম ছিল প্রক
সেখানকার রাজসভার গায়ক ছি
রাজনর্তকী রত্নার সঙ্গে সুরজে
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়েছিল। অথচ
সঙ্গে ঠাকুর বংশের পূর্ব ব্যব
যমুনার বিবাহ স্থির হয়েছিল
ছেলেবেলা থেকেই। একদিন যখ
সঙ্গে সুরজের বিবাহের ব্যবস্থা
রাজনর্তকী রত্নাকে নিয়ে পা
আর দুই প্রেমিক প্রেমিকার পি
এলেন যমুনার বাবা ঠাকুর সা
নিয়ে। অবশেষে ঠাকুর সাহেবে
হিংসার শিকার হয়ে দুই
মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন।

রত্নাকে দেখে সুরজ তাঁর
টানলেন, পরে বুঝতে পারলেন
রত্নার মতোই দেখতে এক পাহা
ঝুমরু। ঝুমরুর সঙ্গে ওদের দ
আপার বিবাহ স্থির হয়ে আ
থেকেই। বিভিন্ন ঘটনা ও ক্লাইম্যা
দিয়ে সুরজ (প্রকাশ) আবার তা
রত্না (ঝুমরুকে) ফিরে পেলেন
সেটাই এই রোমান্টিক ছবি
উপজীব্য। গুলশন নন্দার লেখ
ও চিত্রনাট্য এ ছবির গতিকে
শ্লথ করে ফেলেছে। পুনর্জন্ম
'মহল' ও 'মধুমতী' বরং কা
থেকে এ ছবির চেয়ে অনেক

তবুও শক্তি সামন্তের মতো বিচক্ষণ পরিচালক দুর্বল কাহিনীকে, তাঁর অপূর্ব রসবোধ এবং পরিচালনায় সহাসো সবদিক থেকে এ ছবিকে উপভোগ্য করে তুলেছেন। অভিনয়ে—প্রকাশ ও সুরজের দ্বৈত ভূমিকায় রাজেশ খান্না এবং রত্না ও ঝুমরুর দ্বৈত চরিত্রে হেমা মালিনী অপূর্ব অভিনয় করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে—যোগিতাবালী, প্রেম চোপরা, আশা সচদেও, আসরাণী, নাজির হুসেন, মদনপুরী, হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মনমোহন কৃষ্ণ মন্দ নয়। আলোকচিত্র গ্রহণে অলোক দাশগুপ্ত, সম্পাদনায় বিজয় চৌধুরী ও শিল্প-নির্দেশনায় শান্তি দাসের কাজ অপূর্ব। সংগীত পরিচালনায় আর ডি বর্মনের সুরারোপ গতানুগতিক।

চিত্রদূত

স্টুডিও সংবাদ

কলকাতার বিখ্যাত টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওটি নাকি খুব শিগ্গির বন্ধ হয়ে হয়ে যাচ্ছে। আমাদের খবর হচ্ছে—যখন কালী ফিল্মস্ নামে এই স্টুডিওটি মুমূর্ষু অবস্থায় ধুঁকছিল, তখন বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের কয়েকজন খ্যাতনামা কলাকুশলী এই স্টুডিওটি জমির মালিকের কাছ থেকে ইজারা নিয়েছিলেন। সেই চলচ্চিত্র কলাকুশলীদলে তখন ছিলেন (যতদূর জানি) —ক্যামেরাম্যান রামানন্দ সেনগুপ্ত, শব্দ-যন্ত্রী সতোন চট্টোপাধ্যায়, শব্দযন্ত্রী দেবেশ ঘোষ, শব্দযন্ত্রী মৃণাল গুহঠাকুরতা, শব্দযন্ত্রী দুর্গা মিত্র এবং আরও কয়েক-জন। এই মুহূর্তে তাঁদের নাম ঠিক ঠিক স্মরণ হচ্ছে না বলে উল্লেখ করতে পারলাম না। তারপর সেই অচল স্টুডিওটিকে তাঁরা অতিকষ্টে সচল করে তোলেন আন্তরিক পরিশ্রম দিয়ে। গোড়ার দিকে ওঁরা প্রচণ্ড খেটেছেন। নিজেদের কোন পয়সাকড়ি ছিল না—তাই যে যেখানে যেমনভাবে এবং যতটা বেশী পেরেছেন—ধার করে টাকা এনে কাজকর্ম চালু রেখেছেন। পার্টির দোরে দোরে ঘুরেছেন— আসুন আমাদের এখানে এসে ছবির শুটিং করুন—সব রকম সহযোগিতা পাবেন। আমরা এই ক'জন মিলে স্টুডিওটি নিয়েছি আপনাদের ওপর ভরসা করে—আপনারা আমাদের বাঁচান, মৃতপ্রায় স্টুডিওকে বাঁচান, মাসের পর মাস বেতন-না-পাওয়া কর্মীদের বাঁচান। এঁদের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে সত্যজিৎ রায় এলেন এই স্টুডিওতে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত ছবি 'পথের পাঁচালী'র শুটিং করতে। এলেন ঋত্বিক ঘটক 'সুবর্ণরেখা' ছবি করতে। এলেন রাজেন তরফদার 'অন্তরীক্ষ' এবং গঙ্গার অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ করতে। এখনকার সুপরিচিত পরিচালকদের অনেকেই এই টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে তাঁদের কেরিয়ার শুরু করেছেন—যেমন তরুণ মজুমদার, দিলীপ মুখার্জি। মৃণাল সেন তাঁর একাধিক ছবির শুটিং এই স্টুডিওতেই করেছেন। এই স্টুডিওতে তোলা ছবির অনেকগুলিই বিদেশের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ চিত্রের পুরস্কার পেয়েছে। স্টুডিওর অফিসঘরে সেইসব ছবির একটি তালিকা ফটোফ্রেমে ঝোলান আছে। এই স্টুডিওতেই শিক্ষানবিশী করে বেরিয়েছেন এ-কালের তিনজন ক্যামেরা-ম্যান—দীনেন গুপ্ত, কৃষ্ণ চক্রবর্তী এবং সৌমেন্দু রায়। এঁরা স্টুডিও থেকে মাইনে পেতেন, কাজ শিখেছেন স্টুডিওর অন্যতম পরিচালক ক্যামেরাম্যান রামানন্দ সেনগুপ্তর কাছে। তারপর একদল শব্দযন্ত্রী স্টুডিওর মালিকানা হাতে নিয়েছিলেন বলে এই স্টুডিওর সাউন্ড রেকর্ডিং ভারতে শ্রেষ্ঠ বলে সম্মান পেয়েছে এককালে—এখনও পাচ্ছে শব্দযন্ত্রী সতোন চ্যাটার্জির দৌলতে।

পূর্ব ভারতে এক নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর পর 'ভাল স্টুডিওর' সম্মান

"ইন্দর সেন তাঁর 'অসময়' ছবিতে বিমল করের লিরিক্যাল সুরকে খোদাই করতে পেরেছেন" সত্যযুগ।

"সাহিত্যের যে স্বাদ 'অসময়'-এ পাওয়া গেল বাংলা ছবিতে সেটা খুব বেশী মেলে না।" আনন্দবাজার

"'অসময়' ফিল্ম করার সাহসের জন্য বেশী বাহবা পরিচালক ইন্দর সেনের প্রাপ্য।" আনন্দবাজার।

"'মোহিনী'র আত্মসমর্পণ মুহূর্তটি সমাপ্তি হিসেবে অনবদ্য।" যুগান্তর।

After many a consecutive disappointment comes a film which re-affirms your faith in the strength & quality of Bengali Cinema.. ASAMOY therefore contrary to its title is very timely—
Amrita Bazar Patrika

রাধা - পূর্ণ - প্রাচী ও অন্যত্র

শুভারম্ভ ঃ ৬ই আগষ্ট !

আদর্শবাদী সন্তানের মর্মস্পর্শী চিত্রকাব্য

ডি.লুক্স ফিল্মস নিবেদিত

অশোক কুমার·জীতেন্দ্র·রেখা·বিন্দু

মোহন সাইগলের

সন্তান

ইস্টম্যানকলার

সংগীত লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল

প্যারাডাইস ঃ কৃষ্ণা ঃ প্রিয়া ঃ মিনা

ছায়া - রূপালী - খাতুনমহল - ন্যাশনাল ও অন্যত্র

একমাত্র এই টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওই পেয়েছে। এঁদের প্রতিটি বিভাগের কাজ খুবই দক্ষতাপূর্ণ, নিয়মনিষ্ঠ। স্টুডিও কর্তৃপক্ষের রুচিবোধও প্রশংসনীয়। ফুলের বাগিচা, মাঠ, গাছপালা, রাস্তা—এমন সুন্দর এবং সুরক্ষিত যে ভেতরে ঢুকলে বাস্তবিক চোখ জুড়িয়ে যায়। ম্যানেজার আনন্দ ভট্টাচার্যের ব্যবহার খুবই আমায়িক। পার্টি কখনও কোন সমস্যায় পড়লে আনন্দ-বাবু স্টুডিওর তরফে যথাসাধ্য সমাধানের চেষ্টা করে থাকেন। শব্দযন্ত্রী বলরাম বাবুই তাঁর উন্নতমানের রেকর্ডিং-এর জন্যে ইতিমধ্যে ভাল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তবে সবাইকে ছাপিয়ে আছেন সাউন্ড ইঞ্জিনীয়ার সত্যেন চ্যাটার্জি। এঁর হাতের রেকর্ডিং দেশে-বিদেশে সম্মান পেয়েছে।

এখন, যখন সমগ্র বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প সুদিনের মুখ দেখতে একটা বিরাট সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে (অর্ডিন্যান্স আসছে, ছবির মান ক্রমেই উন্নত হচ্ছে, ছবির প্রোডাকশনের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে) তখন হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রপাতের মত আমরা খবর পেলাম যে স্টুডিওর জমির মালিকেরা হাইকোর্টে কেস করে টেকনি-শিয়ান্স স্টুডিও তুলে দিচ্ছেন। ষোল বছরের ইজারা শেষ হয়ে গেছে। ওঁরা আর নতুন ইজারা দিতে (একজন মালিক অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করেন) প্রস্তুত নয়। ওঁরা হাইকোর্টের ডিগ্রী পেয়েছেন—ভেকেট দ্য ল্যান্ড (স্টুডিও)।

RUPA'S
BENGALI & ENGLISH
BOOKS
are available at
Binod Book Stall
GOL PARK : CALCUTTA

বেকারত্বের জ্বালা নাটকের দৃশ্য

অথচ বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের মঙ্গলের জন্যই এই টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওকে বাঁচিয়ে রাখা খুবই দরকার। হ্রাস পেতে পেতে এমনিতে স্টুডিওর সংখ্যা পাঁচটিতে এসে ঠেকেছে। এর মধ্যে নিউ থিয়েটার্স দু' নম্বর স্টুডিও সরকারী অধিগ্রহণে চলছে। টেকনিশিয়ান্স স্টুডিও বন্ধ হলে মাত্র চারটি স্টুডিওতে পূর্ব ভারতের এত ছবির কাজ যে কি উপায়ে চলবে—তা আমরা ভেবে পাচ্ছি না। ছিল মোট চোদ্দটি স্টুডিও। যার অধিকাংশই এখন গো-ডাউন বা গেঞ্জির কলে বা ওই জাতীয় কারখানায় রূপান্তরিত। সে-সব স্টুডিওর মালপত্র সবই বিক্রি হয়ে চলে গেছে বোম্বে এবং মাদ্রাজে। আর এই আপাত পাঁচটি স্টুডিওর মধ্যে আবার কালকাটা মুভিটোন স্টুডিওর দশা খুবই শোচনীয়। ওখানে ফ্লোরের মধ্যে সেট ফেলে শুটিং করা দায়—বিশেষ করে এই বর্ষা-বাদলের সময়। স্টুডিওর ছাদ ফুটো—সারা ফ্লোরে জল পড়ছে—সেট ভিজছে—আর্টিস্ট ভিজছে। খুবই দুঃখের কথা।

এই পরিস্থিতিতে আমরা টেকনি-শিয়ানের মত এমন সুন্দর একটি স্টুডিওর অস্তিত্ব বিলুপ্তির কথা কল্পনাও করতে পারছি না। অর্ডিন্যান্স চালু হলে বছরে যখন কমপক্ষে পঞ্চাশটি বাংলা ছবির প্রোডাকশনের দরকার পড়বে—মাত্র চারটি স্টুডিওর ক্ষমতা থাকবে না—সেই বিপুল চাপ সামলাবার। এখন একমাত্র ভরসা—পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি এই ব্যাপারে একটু উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তাহলে স্টুডিওটি বাঁচে, একদল কলাকুশলী বাঁচে, বাঁচে ভবিষ্যতের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা!

মুসাফির

বিবিধ সংবাদ

দীপ শিখার দ্বিতীয় নিবেদন : ২১ জুলাই বাগবাজারের দীপ শিখা নাট্যগোষ্ঠী "বেকারত্বের জ্বালা" অরুণ রায়ের লেখা নাটকটি বিশ্বরূপা মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করলেন। সনৎ দাসের ব্যবস্থাপনায় ও তরুণ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় বেসব তরুণ শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে সুখলাল পোদ্দার (দীপক) ছোটদের সাউ, সাগর মুখার্জি, কানাই মুখার্জি শিবনাথ মুখার্জি ও দিলীপ ঘোষ প্রভৃতি সু-অভিনয় করেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১২, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১৯।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের নতুন বই

চিত্র বিচিত্র

একাল-সেকালের বিচিত্র কথা ও রসমধুর কাহিনী-সমারোহ দাম ঃ সাত টাকা

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১৩৮১ সালের মৌচাক পত্রিকা কর্তৃক
সুধীরচন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ রচিত
ছোট বড় সকলের মনের মত
বাংলা সাহিত্যের দু'খানি আশ্চর্য বই

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য ঃ—চার টাকা

(সপ্তম সংস্করণ চলছে)

ছোটদের উপযোগী সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী লেখা হয় নি। বিশেষ করে নানাবিষয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ছোটদের মনের মত বিচিত্র রোমাঞ্চকর লেখা খুব সহজ নয়। 'বিচিত্র কাহিনী'তে লেখক সত্য ঘটনাগুলিকে নিজের সরস মুন্সিয়ানা দিয়ে এমন জীবন্ত আর আকর্ষণীয় করে তুলেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রচনাই অনবদ্য রস ও রোমাঞ্চে টইটম্বুর। মোট পনেরোটি কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রসের ফল্গুধারায় সিক্ত, বর্ণনায় মনোমুগ্ধকর।

'আরও বিচিত্র কাহিনী' বইটি কিশোর ও বয়স্কদের জন্য সমভাবে রচিত। লেখক শুধু ছোটদের জন্যই রস পরিবেশন করেননি, বড়রাও এই অমৃত আস্বাদন করে পুলকিত হবেন। অনবদ্য রস রচনাশৈলী এবং প্রতিটি কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ চুম্বকের মত পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে। এই বইটিতে দশটি বিভিন্ন রসের কাহিনী রয়েছে এবং লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি এমন সুন্দরভাবে রসযুক্ত করে উপস্থিত করেছেন যে পাঠককে বিমুগ্ধ করবে।

আরও বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য ঃ—চার টাকা

(চতুর্থ সংস্করণ চলছে)

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড. ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ঃ ফোন ৩৪-১৭৪২

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday ... August
Phone 55-5231 (14 lines)

iaa/KCD107

অনায়াসে দ্বিতীয়বার সম্মান অর্জন করলো

11 Aug 1976

11 AUG 1976

কুকমী

গুঁড়ো মশলা

ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ্ কোয়ালিটী প্রোডাক্টস কর্তৃক প্রদত্ত

একমাত্র উচ্চমানের অকৃত্রিম গুঁড়ো মশলা হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি ও সম্মানপত্র লাভ।

এই বৎসরের শুরুতেই কুকমী গুঁড়ো মশলা নিউ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ট্রান্সওয়ার্ল্ড ট্রেডফেয়ার-এ ক্লাশ—এ স্বর্ণপদক জয় করেছে।

IQP

- সর্বোত্তম মান
- ন্যায্য ও নির্দিষ্ট মূল্য
- সঠিক ওজন
- উপাদানের বিশুদ্ধতা
- সমাজ সেবার প্রতি অগ্রাধিকার
- তৎপর ও দ্রুত সরবরাহ ব্যবস্থা

স্বদেশে ও বিদেশে সকলের সেবায় আমরা নিজেদের নূতন করে নিয়োজিত করছি

TRANS-WORLD TRADE FAIRE
SERVICE AWARD DELHI

প্রস্তুতকারক :
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাইভেট লিমিটেড
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০০৭০, পোষ্ট বক্স নং, বড়বাজার : ৬৮৮৫ ফোন : ৩৩০৯৯৫
ফ্যাক্টরী : কাশীপুর

বিজ্ঞাপন-পরিকল্পনা : এম, কে, গোসেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

অমৃত
সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ /
২০ আগস্ট ১৯৭৬ ॥
মূল্য ৭৫ পয়সা
অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা

রোলীন যার সহায়
তার ভয় কি?

ও নানা কাজে আপনাকে সারাদিন এই রকম সূর্যের
ই চলতে ফিরতে হবে। শরীরের উন্মুক্ত অংশগুলো সূর্য
। ঝলসে যাবে। দেখা দেবে ফোড়া, কুসকুড়ি ও ঘামের
ত অস্বাচ্ছন্দ্য। অনেক সময় এই সব ক্ষতস্থানে দূষিত
ে ওঠে বাইরের ধুলো-(ধোঁয়া) বা রোদ-জলে।

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম আপনার ত্বকের গভীরে
-ফাটা অংশগুলোকে নিরাপদ রাখে।

সুস্বাদু, পুষ্টিকর
ব্রিটানিয়া গ্ল্যাক্সো বিস্কুট

বাড়ন্ত বাচ্চার
সুস্বাদু সাথী

ব্রিটানিয়া

বিস্কুট সবচেয়ে সেরা

ব্রিটানিয়া গ্ল্যাক্সো বিস্কুট এত ভাল লাগে কেন ? কারণ, এর বিশেষ পুষ্টিকর গুণ। বাচ্চারা ভালবাসে খুব আর পুষ্টির গুণে বেড়েও ওঠে। ব্রিটানিয়া গ্ল্যাক্সো বিস্কুট সত্যিই বাড়ন্ত বাচ্চাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

লিনটাস-BBC.GLX.6-149 BG

একসেটে অভিনয়োপযোগী আমাদের প্রকাশিত মঞ্চ-সফল কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। অন্যান্য পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক নাটকের তালিকার জন্য আমাদের নিকট লিখুন।

যশস্বী নাট্যকার মন্মথ রায়ের নতুন নাটক

শরৎ-বিপ্লব (৪ নারী) ৫-০০

দেবনারায়ণ গুপ্তের নতুন নাটক

নাট্যকার (৩ নারী) ৫-০০

রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের নতুন নাটক

কেষ্টধনের কেরামতি (৩ নারী) ৫.

মনোজ মিত্রের নতুন নাটক

পরবাস (১ নারী) ৫-০০

শিবের অসাধ্য (২ নারী) ৫-৫০

নেকড়ে (২ নারী) ৪-০০

অগ্নিমিত্রের নতুন নাটক

পটভূমি দৃশ্যমান (১ নারী) ৫-০০

অপেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন নাটক

ব্লেকজানি (১/২ নারী) ৫-০০

রামরঞ্জন ঘোষের নতুন নাটক

রণ-দুন্দুভি (১ নারী) ৫-৫০

শতাব্দীর পদাবলী (১ নারী) ৪-০০

জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্থক নাটক

ইস্তাহার (১ নারী) ৪-০০

চিতাভস্ম (৩ নারী) ৩-৫০

নিহত নিয়তি (২ নারী) ৩-০০

গঙ্গাপদ বসুর নাটক

নহমাতা (১ নারী) ৩-৫০

একটি স্বপ্নের জন্যে (২ নারী) ৩-৫০

প্রবোধবন্ধু অধিকারীর নাটক

জনক-জননী (৩ নারী) ৩-৫০

বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীর নাটক

আমি ক্রীতদাস (৩ নারী) ৪-০০

কিরণ মৈত্রের নাটক

শেষ কোথায় (২ নারী) ৪-০০

বিজন ভট্টাচার্যের নাটক

দেবী গর্জন (৫/৬ নারী) ৩-০০

বর্তমানের সর্বাধিক জনপ্রিয় নাট্যকার রতনকুমার ঘোষের

এই দশকের মঞ্চে (২ নারী) ৫-০০

সীতাহরণ (২ নারী) ৫-০০

সকালের জন্য (৫ম সং ॥ ১ নারী) ৫-০০

অমৃতস্য পুত্রাঃ (৩য় সং ॥ ৩ নারী) ৫-০০

ভোরের মিছিল (২য় সং ॥ ১ নারী) ৫-০০

দোহাই! হাসবেন না (২ নারী) ৫-০০

সিঁড়ি (২য় সংস্করণ ॥ ১ নারী) ৫-০০

ফেরা (২য় সংস্করণ ॥ ১ নারী) ৩-৫০

ভূমিকম্পের আগে (১ নারী) ৩-০০

ভূমিকম্পের পরে (১ নারী) ৩-০০

অগ্নিদূতের কালজয়ী নাটক

অন্ধকারের নীচে সূর্য (২ নারী) ৫-০০

৩য় সংস্করণ

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সফল নাটক

ক্যাপ্টেন হুররা (১ নারী) ৪-০০

পার্থপ্রতিম চৌধুরীর নাটক

মলাটের রং মুহূর্ত (২ নারী) ৩-০০

খাঁচা (২ নারী) ৩-০০

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্চ সফল নাটক

জনপদবধূ (৫ নারী) ৫-০০

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক

এরিণা (৫/৬ নারী) ৩-০০

আদিম (২ নারী) ৩-০০

V. P. P. -তে নাটক পেতে হলে অগ্রিমসহ অর্ডার পাঠাবেন। অগ্রিম ছাড়া V. P. P পাঠানো হয় না।

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা—৭০০০১২ ॥ ফোন : ৩৪-৮৩৫৬

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য অমৃত কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে অমৃত কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে অমৃত কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৩-০০	টাকা ৪০-০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১৬-৫০	টাকা ২০-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৮-২৫	টাকা ১০-০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন
কলিকাতা—৩

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

কিরীটী অমনিবাস

৮ম ও ৯ম খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে।
প্রতিটির মূল্য ১৫ টাকা বাকী সবল খণ্ড পাওয়া যাচ্ছে

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
নীলে একে চার ২০
আশাপূর্ণা দেবীর
কখনো দিন কখনো রাত ৩০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অশনি সংকেত ১০
উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
কুয়ারী গিরিপথে ১০

বিমল করের
যাদুকর ৫॥
সুমথনাথ ঘোষের
ওখানে পদ্মা এখানে গঙ্গা ৫
ভৃগুজাতকের
ভাগ্যলিপি ৯
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
কামনার ধূপ ১০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
বাজীকর ১৬
নূতন দ্বিতীয় সংস্করণ

বিমল মিত্রের
আমি ১৬
নূতন তৃতীয় সংস্করণ

অমর সাহিত্য প্রকাশন, ৭ টেমার লেন, কলি-৯

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ কর্তৃক গ্রন্থিত

শ্রীশ্রীআময়ানমাই চরিত LORD GOURANGA
(১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড)
প্রতি সেট—মূল্য ২৪-০০
(vol. 2)
Per Vol. Rs. 6.00

কালাচাঁদ গীতা
প্রতি কপি—মূল্য ১-৫০
LIFE OF SISIR KUMAR GHOSH

নরোত্তম চরিত
প্রতি কপি—২-০০
Per Copy Rs. 6.50

প্রাপ্তিস্থান ঃ
পত্রিকা হাউস (হিসাব বিভাগ)
১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩

১৬ বর্ষ

অমৃত

১৫ সংখ্যা

ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ফরেন নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

Friday, 20th August, 1976 শুক্রবার, ৩ ভাদ্র, ১৩৮৩

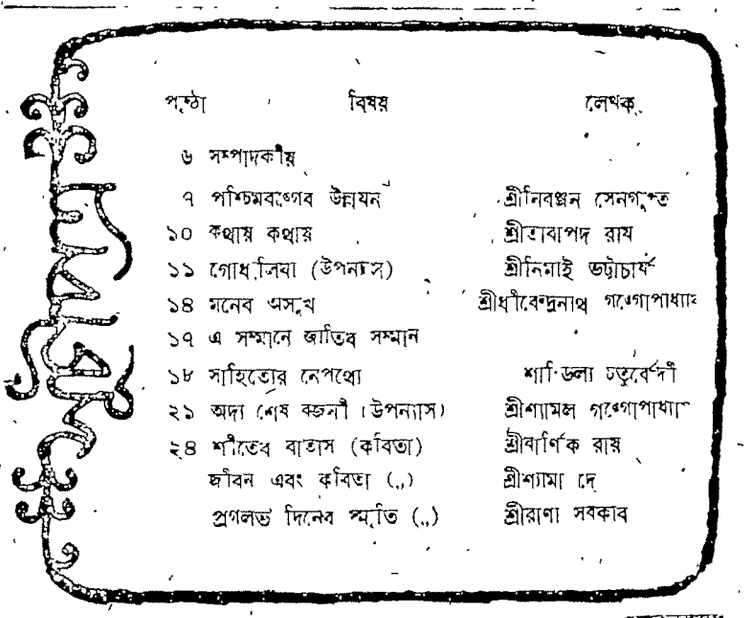

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৬	সম্পাদকীয়	
৭	পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন	শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত
১০	কথায় কথায়	শ্রীতারাপদ রায়
১১	গোধূলিবেলা (উপন্যাস)	শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
১৪	মনের অসুখ	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
১৭	এ সম্মানে জাতির সম্মান	
১৮	সাহিত্যের নেপথ্যে	শ্রীচিত্রলেখা চক্রবর্তী
২১	অন্য শেষ রজনী (উপন্যাস)	শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
২৪	শীতের বাতাস (কবিতা)	শ্রীবার্ষিক রায়
	জীবন এবং কবিতা (,,)	শ্রীশ্যামা দে
	প্রথমলব্ধ দিনের স্মৃতি (,,)	শ্রীরাণা সরকার

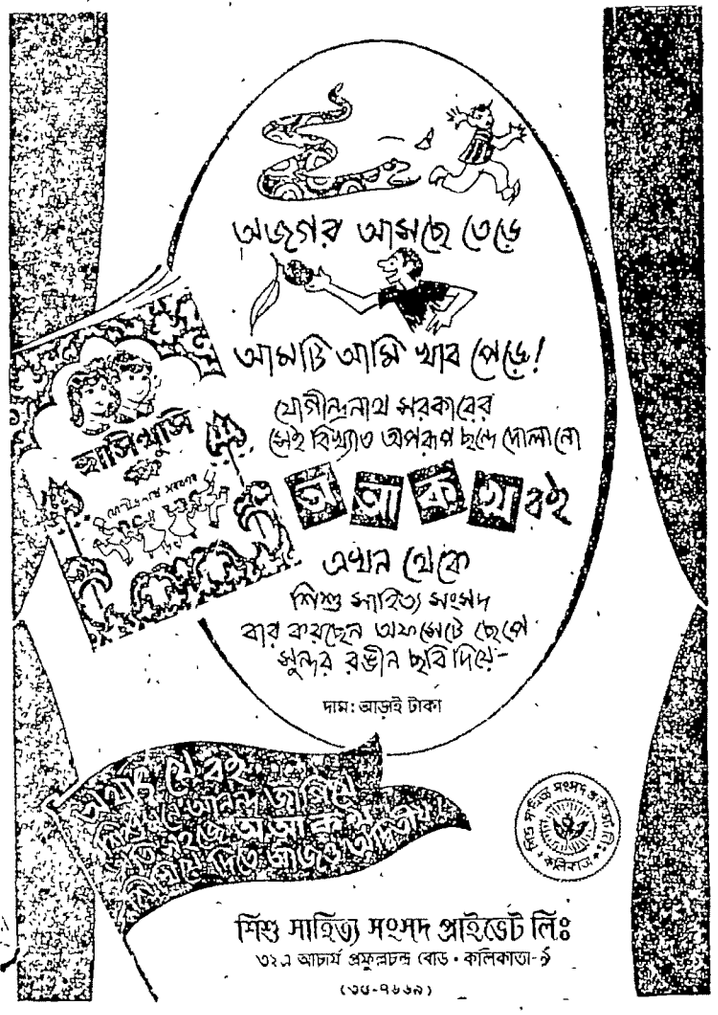

কলেজ পাঠ্যপুস্তক

দর্শন (Philosophy)

অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত প্রণীত

ভারতীয় দর্শন—
১ম খণ্ড—৯ম সংস্করণ ১২-০০
ভারতীয় দর্শন—
২য় খণ্ড—৩য় সংস্করণ ৭-০০
ভারতীয় দর্শন—
৩য় খণ্ড (বেদ ও উপনিষদ) ৭-০০
পাশ্চাত্য দর্শন—১১শ সংস্করণ ১২-০০
নীতিবিজ্ঞান—১০ম সংস্করণ ১২-০০
সমাজদর্শন—৯ম সংস্করণ ১২-০০
মনোবিদ্যা—৭ম সংস্করণ ২২-০০
পাশ্চাত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—
(বেকন-হিউম) ৩য় সংস্করণ ১২-০০
পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস—কান্ট ১৬-০০
ধর্মদর্শন (Religion) ২২-০০
সমাজ মনোবিজ্ঞান— ১০-০০
(Social Psychology)
অধিবিদ্যার কয়েকটি সমস্যা—
৩য় সংস্করণ ৬-০০

শিক্ষা (Education)

অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও রায় প্রণীত

শিক্ষাতত্ত্ব—৩য় সংস্করণ ১৪-০০
ভারতের শিক্ষা সমস্যা—
৩য় সংস্করণ ১৫-০০
শিক্ষা মনোবিজ্ঞান— ——
৪র্থ সংস্করণ ২২-০০
C.U. B.A. Edu Hons Qu (1983-76)
— Prof. A. K. Mitra 8.00

শিক্ষক শিক্ষণ

অধ্যাপক গৌরদাস হালদার প্রণীত

শিক্ষণ প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ—
১৬-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে অর্থনীতি ও
পৌরবিজ্ঞান ১৪-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে ইতিহাস— ১৫-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষার ইতিহাস—১৬-০০
ভারতের শিক্ষা সমস্যা—
(প্রাচীন ও মধ্যযুগ) ৪-০০
অধ্যাপক সেনগুপ্ত রায় ও ঘোষ প্রণীত
শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান—
২য় সংস্করণ ২৫-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষাতত্ত্ব— ১৬-০০

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য

উচ্চ মাধ্যমিক দর্শন—
অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত
উচ্চ মাধ্যমিক মনোবিজ্ঞান—
—অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও গীতা সেন
উচ্চ মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা—অধ্যাপক
প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সেনগুপ্ত
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা—অধ্যাপক সেনগুপ্ত,
ঘোষ ও হালদার

BP

ব্যানার্জী পাবলিশার্স

৫।১এ কলেজ রো, পিন—৭০০০০৯
ফোন : ৩৪-৭২৩৪

লিটল্ ম্যাগাজিন, সংকলন গ্রন্থ মুদ্রণ ও প্রকাশের যাবতীয় কাজ আমরা দায়িত্বের সঙ্গে করে থাকি।

পত্রমিতা

লিটল্ ম্যাগাজিন সংগঠক ও মুদ্রণ ব্যবস্থাপক
৫৭, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা—৭০০০০৯

পূজো সংখ্যার কাজের জন্য
সত্বর যোগাযোগ করুন

অফিস এবং ইনজিনীয়ারিং-এর
নিখুঁত সরঞ্জাম
এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

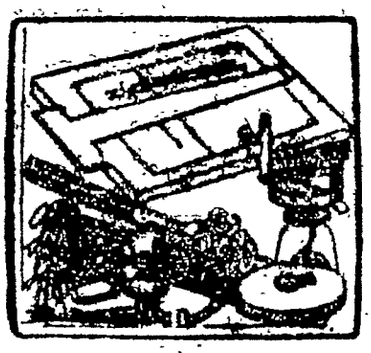

সার্ভে, ড্রইং, নানা রকম কাজ
খাতা, লেজার, ক্যাশবই কালি ও
উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য
অনাতম প্রতিষ্ঠান

কুইক ষ্টেশনারী ষ্টোর্স
৬৩ই রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিঃ-১
ফোন ঃ ২২-৮৫৮৮ ৬৭-৪৬৬৪
গ্রাম ঃ সরোবপিন, পোষ্ট বক্স—৩৮ হাওড়া
পরিবেশক ঃ কার্মলিন প্রডাক্টস
(ষ্টেশনারী বিভাগ)

ভারততত্ত্বের উপর দু'টি বিশিষ্ট গ্রন্থ

SANSKRIT DRAMA

স্টেন কোনো

বিশ্ববিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত রচিত সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস ও আলোচনা। মূল জার্মান হইতে অনুবাদ করিয়াছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শিবেন্দ্রনাথ ঘোষাল। দাম কুড়ি টাকা।

CLASSICAL INDIAN DANCING

মন্দাক্রান্তা বসু

প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক বার্ণের ভূমিকাসম্বলিত এই গ্রন্থখানি ভারতীয় নৃত্য ও উহার ইতিহাসে আগ্রহী পাঠকের পক্ষে অপরিহার্য। দাম পঁচিশ টাকা।

[জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত]

জেনারেল বুকস্ এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা ৭০০ ০০৭

সুকান্ত ভট্টাচার্যের সমগ্র রচনার একত্রিত সংকলন

সুকান্ত-সমগ্র ২০-০০

সুকান্ত ভট্টাচার্যের অন্যান্য বই

ছাড়পত্র	৫-০০	গীতিগুচ্ছ	১-৫০	হরতাল	২-০০
ঘুম নেই	৫-০০	মিঠেকড়া	৩-০০	সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত,	
পূর্বাভাস	৩-০০	অভিযান	৩-০০	আকাল	৩-৫০

মিহির আচার্য সম্পাদিত সুকান্তনামা ৩-০০

অশোক ভট্টাচার্য কবি সুকান্ত ৫-০০ ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য অন্তরঙ্গ সুকান্ত ১২-০০

অরুণাচল বসু ও সবলা বসু কবি কিশোর সুকান্ত ৩-৫০

"সুকান্ত ভট্টাচার্যের পাণ্ডুলিপির নির্বাচিত সংকলন"

কবিতা লিপি ২০-০০

সাবর্ণ্য লাইব্রেরী ॥ ২০৬ বিধান সরণী, কলিঃ-৭০০০০৬ ফোন ৩৪-৫৪৯২

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
২৫	বিজ্ঞাপন বিচিত্রা	শ্রীঅনন্দ রায়
২৭	একালের চিত্রশিল্পী	শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৩০	স্বপ্নের মুখ (গল্প)	শ্রীবীরেন্দ্র দত্ত
৩৭	একালের গান	শ্রীসন্ধ্যা সেন
৪০	বিজ্ঞানের কথা	অয়স্কান্ত
৪৩	মোহিনী আট্টম (উপন্যাস)	শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি
৪৬	পুনশ্চ	ক্ষপণক
৪৭	কাছাকাছি (গল্প)	শ্রীবিজয় পাল
৫০	মাঠ থেকে বলছি	শ্রীঅভয় বসু
৫৩	খেলাধুলো	দর্শক
৫৫	মাঠ থেকে বলছি	শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৬	সিনেমাটিক টক	শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৫৯	কয়েকখানা	নিরীক্ষিৎ
৬১	শতবর্ষের স্মরণীয়	শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়
৬৩	নাটমঞ্চ	নাট্যসমালোচক

প্রচ্ছদ পরিচিতি : মিকেল্যাঞ্জেলো শুধু চিত্রশিল্পে নয় ভাস্কর্যেও সুদক্ষ ছিলেন। তাঁর তৈরি মোজেজ-এর এই মূর্তিটি রয়েছে সেণ্ট পিটার্স গির্জায়।

সুলেখা
লেখার সাথী
আনবে কলমে গতি
বিভিন্ন রংএ পাওয়া যায় :
ব্লু-ব্ল্যাক ● ব্লু ● ব্লু-ব্ল্যাক ● নেভি ব্লু
ব্ল্যাক ● রেড ● গ্রীণ
ব্রাউন ● ভায়োলেট

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা ● গাজিয়াবাদ

বিখ্যাত ডাটা
গুঁড়ো মশলার
প্রস্তুতকারক
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত
(কুকমী) প্রাঃ লিঃ
এখন আপনাদের দিচ্ছেন
একটি নতুন অতি
সুদৃশ্য টিনের কৌটায়
সবরকম গুঁড়ো মশলার
অপূর্ব সংমিশ্রণ

এক কৌটা ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাক কিনলে আর কোনরকম মশলা এমন কি পেঁয়াজ, আদা, রসুন আলাদা করে যোগাড় করতে হয় না। ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাকের মাছ, মাংস, ডিম ও সবরকম মুখরোচক তরিতরকারি অল্প সময়ে চটপট রান্না করা যায়। আপনার সবরকম রান্নায় আজই ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার (কিচেন কুইন প্যাক) ব্যবহার করুন।

ডাটা
রেডিমিক্সড কারি
পাউডার
কিচেন কুইন প্যাক

প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ
২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭, পোষ্ট বক্স নং ৬৭৭৪.
ফোন : ৩৩-৯৩৩৭, ৩৪-১৭০৮

PAM—KCD-74

সম্পাদকীয়

শিক্ষার অচলায়তন

কলকাতা শহরে বাস করেন যাঁরা, সকলেই তাঁরা জানেন, বছরের এই সময়টিতে কেবল-যে রাস্তা-ঘাটই ডোবে তাই নয়, ডোবে এ শহরের ছাত্ররাও।

মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষাতেই ছাত্র সংখ্যা বেশি এবং তাদেরই বিপর্যয় সব থেকে মর্মান্তিক। একে তো পাশের চেয়ে ফেলের সংখ্যা বেশি, তারপর পাশ করেই বা স্বস্তি কোথায়? কলকাতার কলেজগুলিতে ভর্তির যা সমস্যা সেটা গত শতকের কুলীন কন্যার বিবাহ-সমস্যার চেয়েও বেশি দুরূহ। কিন্তু হাজার হাজার ছাত্রদের ভগ্য নিয়ে এই যে হৃদয়-হীনতা, এতে ক্ষতি হচ্ছে কার?

ছাত্ররা তো বটেই, অভি-ভাবকেরাও এর জন্যে ক্ষতিগ্রস্ত হন কম নয়। ছেলে যদি ফেল করে, তাহলে তাকে নতুন করে পড়াতে হয়, কেননা না পড়ে সে কিইবা করবে। আর সে যদি পাশ করে, তবে তো আরো মুশকিল। কারণ পছন্দ মতো একটি কলেজে তাকে ভর্তি করানো প্রায় তাকে একটি চাকরি খুঁজে দেবার মতোই শক্ত ব্যাপার। এবার কলকাতার প্রধান প্রধান কলেজগুলিতে ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে যে সব নীতি ও অচলা-বস্থার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে তাতে সমস্যা আরো জটিলতর হবে। কেননা এই বছর থেকেই নতুন শিক্ষা ব্যবস্থাও চালু হচ্ছে।

আসলে, উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবস্থা প্রচলনের সময় কর্মকর্তারা যা ভেবেছিলেন, সেটা ব্যর্থ হয়ে গেছে। হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে শুধু মেধাবী ছাত্রই যাবে উচ্চ শিক্ষার দিকে, অন্য ছাত্ররা বেশির ভাগই যাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে, এই ছিল শিক্ষা-নীতি রচয়িতাদের ধারণা। কিন্তু বৃত্তিশিক্ষার কোনো আগ্রহই ছাত্র-দের মধ্যে জাগে নি। কারণ তারা জানত, ইঞ্জিনীয়ারিং-এর শেষ পরীক্ষায় পাশ করে কয়েক হাজার ইঞ্জিনীয়ার প্রতি বছরই বেকারত্ব-বরণে বাধ্য হন। এবং যাঁরা ইণ্ডা-স্ট্রিয়াল ট্রেনিং নিয়ে পাশ করেন তাঁরা উপার্জনের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ অসহায়, তা না বলাই ভালো। কাজেই নিতান্ত টেনেটুনেও যারা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করে তারা অনিবার্যভাবেই লাইন দেয় গিয়ে কলেজে ভর্তি হবার জন্যে। তবু যদি গ্র্যাজুয়েট হলে নতুন কিছু কাজের সুযোগ জোটে। কিন্তু হায়রে দুরাশা, সে পথও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে চোখের সামনেই।

ছাত্ররা তাহলে করবে কি?

এই নিরাশা এবং উপায়হীনতা ক্রমেই কি তাদের ঠেলে দেবে না সমাজবিরোধীদের দলে? আর তা দেশের গোটা ভবিষ্যৎকেই করে তুলবে না অন্ধকারাচ্ছন্ন?

তাই প্রশ্ন জাগে বার বার—হাজার হাজার ছাত্রদের ভাগ্য নিয়ে এই যে হৃদয়হীনতা এতে ক্ষতি হচ্ছে কার? অবশ্যই দেশের।

প্রশ্নটা আরো তীব্র হয়ে ওঠে যখন আমরা দেখি, কয়েক হাজার ছাত্রের পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে অসম্পূর্ণভাবে। এবং যখন শুনি, মার্কসিটে এমন সব গণ্ডগোলের কথা, যাতে পরীক্ষকদের সততার বিষয়েও সন্দেহ জাগে, তখন আশা করার মতো কোনো কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না।

মাধ্যমিক শিক্ষাকে এবার থেকে নতুন ধারায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে, এই সব সমস্যা ও দুর্নীতির বিষয়ে সচেতন হওয়া আরো বেশি জরুরী।

ছাত্ররা যদি শতকরা ৬০ জনই ফেল করে, তবে সেই অকৃতকার্যতা কিন্তু শুধু ছাত্রদেরই ক্ষতি করে না, ক্ষতি করে জাতিরও। কাজেই ছাত্রদের মধ্যে অবহেলা ও অনাচার আছে এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষকদের মধ্যে কোনো ত্রুটি আছে কিনা তাও বিচার করা দরকার। বরং তাঁদেরই দায়িত্ব বেশি, কারণ তাঁরা বয়সে বড় এবং শিক্ষাগুরু।

গুরুর গুরুত্ব লঘু করে দিলে লঘুমতিরা গুরুতর ভ্রান্তির দিকে যেতে থাকবে, তাতে আর বিচিত্র কি!

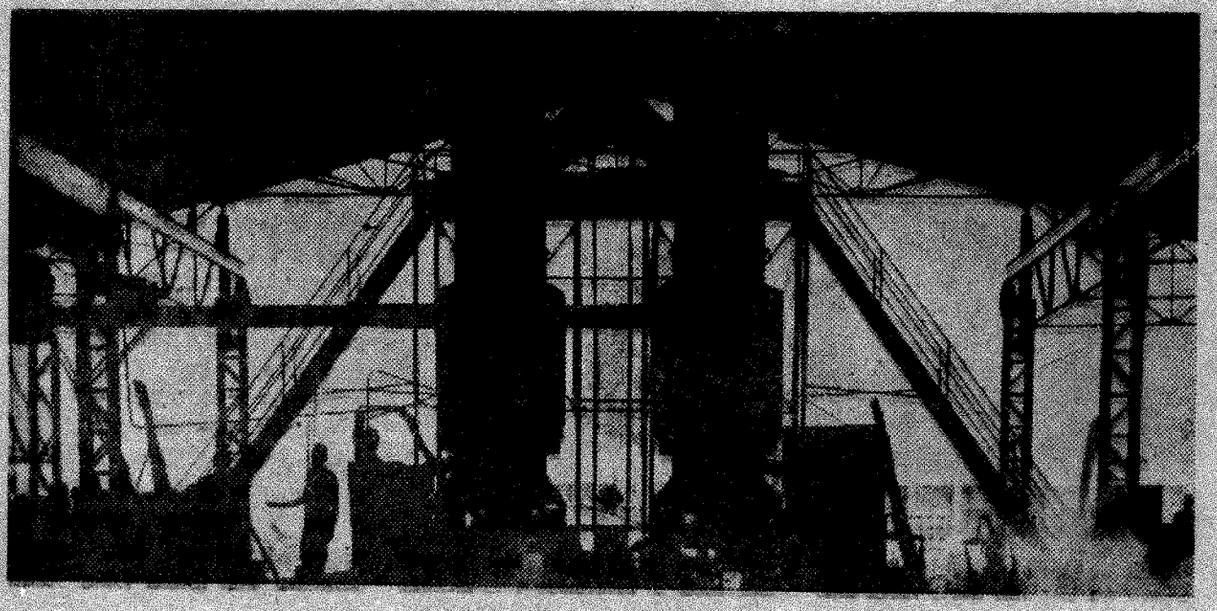

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন

নিরঞ্জন সেনগুপ্ত

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গত ১৯৭৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্যসভায় বলেছিলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে যা ঘটেছে সেটা গণতন্ত্রের ইতিহাসে রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবনের একটি মহত্তম কাহিনী।'

এই রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবনের হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি যে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন হয়েছে তার কাহিনীও কম চমকপ্রদ নয়। এই পুনরুজ্জীবনের একটি বড় লক্ষণ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যেন মরা গাঙে জোয়ার এসেছে। ১৯৭২-৭৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক পরিকল্পনার আকার ছিল ৬৬-৪৯ কোটি টাকা। ১৯৭৬-৭৭ সালের সংশোধিত বাজেটে সেই অঙ্কটা ২৪০-৫২ কোটি টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়ে সাড়ে তিন গুণের বেশি হয়েছে। পরিকল্পনার আয়তনের এত দ্রুত বিস্তার সারা ভারতবর্ষের পক্ষেই একটা রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

বিভিন্ন খাতে উন্নয়নমূলক ব্যয়বরাদ্দগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব যে, ১৯৭১-৭২ সালে ক্ষুদ্র সেচসহ কৃষি-খাতে যেখানে ২০-৫৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছিল সেখানে ১৯৭৬-৭৭ সালের ব্যয়-বরাদ্দ ছিল ৫৭-৮৬ কোটি টাকা। বহুমুখী নদী পরিকল্পনা-সেচ, জলপথ ইত্যাদি খাতে ১৯৭১-৭২ সালের ৩২-৫১ কোটি টাকা ব্যয়ের অঙ্ক ১৯৭৬-৭৭ সালে এসে ৬৬-২৯ কোটি টাকার ব্যয়বরাদ্দে ঠেকেছে। পশুপালন, মৎস্য চাষ, গোশালা ও দুগ্ধ সরবরাহ খাতে ব্যয় বৃদ্ধির অঙ্ক হল ঃ— ১২-৫৪ কোটি টাকা থেকে ৩৫-৪৭ কোটি টাকা। শিক্ষাখাতে ৭৬-৩৬ কোটি টাকা থেকে ১২৯-৭৩ কোটি টাকা, স্বাস্থ্যখাতে ৩৫-৮৬ কোটি টাকা থেকে ৭০-৭৭ কোটি টাকা। বিদ্যুৎশক্তি খাতে ব্যয় ১৫-৯২ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৭২-৫২ কোটি টাকা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যোদ্ধারের আর একটি বড় লক্ষণ হল, এই বাড়তি ব্যয়ের দায় মেটান হয়েছে অভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে সংগ্রহ করে। ১৯৭১-৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিক্রয় কর আদায়ের পরিমাণ ছিল ৭৪-১৮ কোটি টাকা। ১৯৭৬-৭৭ সালের বাজেটে এই খাতে আদায়ের পরিমাণ দেখান হয়েছে ১৭৭-০৪ কোটি টাকা। ১৯৭২-৭৩ সালের আগের চার বছরে বিক্রয় করের মোট আদায় যেখানে ২০ কোটি টাকার বেশি নয় সেখানে গত চার বছরে আদায় বেড়েছে ৮০ কোটি টাকারও বেশি। রাজ্যের বিভিন্ন কর থেকে সংগ্রহের মোট পরিমাণ ১৯৭১-৭২ সালে ছিল ১৪৬-০৪ কোটি টাকা। ১৯৭৬-৭৭ সালের বাজেটে মোট কর আদায়ের পরিমাণ ধার্য হয়েছে ৩০৪-৪০ কোটি টাকা। পাঁচ বছরে কর আদায়ের পরিমাণ বেড়ে দ্বিগুণের বেশি হয়ে গেছে।

অভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে পশ্চিমবঙ্গ এ-ভাবে অর্থসংগ্রহ করতে পেরেছে বলেই উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য বাড়তি অর্থের সংস্থান করতে গিয়ে এই রাজ্যকে নিজের ঋণ দায় আর বাড়াতে হয়নি, বরং আগেকার কয়েক বছর ধরে জমে থাকা ঋণের বোঝা সে নামিয়ে ফেলতে পেরেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে মোট যে ১৩০ কোটি টাকা ঋণ জমেছিল সেটা শোধ দিয়ে গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গ ঋণমুক্ত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই আর্থিক সচ্ছলতা তাঁদের বাজেটের মধ্যেও প্রতিফলিত

মাছ ধরার ব্যবসা বৃদ্ধি বাড়ছে

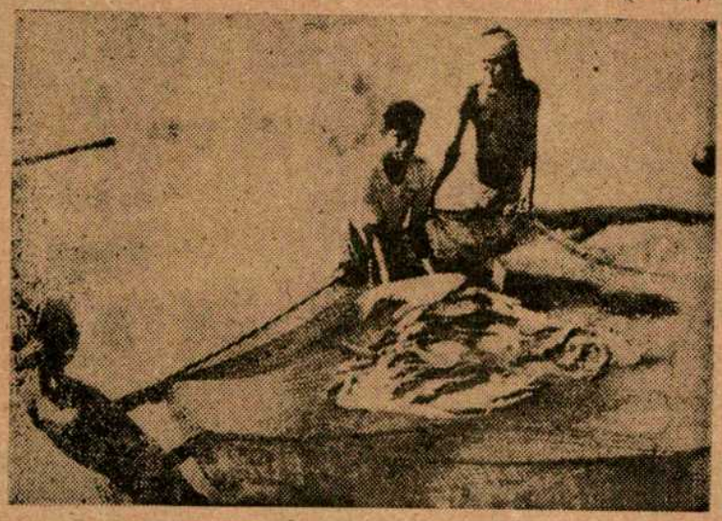

হয়েছে। ১৯৬২-৬৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে ২২ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত দেখান হয়েছিল। তারপর থেকে প্রতিবছরই ঘাটতি চলে আসছিল। ১৩ বছরের মধ্যে প্রথম উদ্বৃত্ত বাজেট হল ১৯৭৫-৭৬ সালে। উদ্বৃত্তের পরিমাণ ৬৯ লক্ষ টাকা। ১৯৭৬-৭৭ সালের বাজেটে উদ্বৃত্তের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াল ২-৯২ কোটি টাকা।

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য অর্থ বিনিয়োগে এই কৃতিত্ব যে বিফলে যায় নি তার প্রমাণ হল, ১৯৭৩-৭৪ সালে যেখানে সারা ভারতে অর্থনৈতিক অগ্রগতির গড় হার ছিল ৩-১ শতাংশ সেখানে পশ্চিমবঙ্গে এই হার হয়েছিল ·৫ শতাংশ।

মাত্র পাঁচ ছয় বছর আগেও পশ্চিমবঙ্গ যে দ্রুত অর্থনৈতিক অবনতির পথে চলেছিল তার সঙ্গে তুলনায় এই রাজ্যের সাম্প্রতিক অগ্রগতি একটা লক্ষণীয় ঘটনা। এই অবনতির লক্ষণগুলি ছিল, শিল্প ও কৃষির রুদ্ধ অগ্রগতি, কলকারখানার উৎপাদন-ক্ষমতা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকা, শিল্প মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি, পশ্চিমবঙ্গ থেকে পুঁজির অপসারণ, ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা, ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষ ইত্যাদি। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল যেন পশ্চিমবঙ্গের সামনে কোন ভবিষ্যৎ নেই। ১৯৭১ সালে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইণ্ডাস্ট্রিজের উদ্যোগে প্রকাশিত একটি বইয়ে এই প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল, 'প্রাকৃতিক ও মনুষ্য-সৃষ্ট কতকগুলি কারণ একত্রে মিলে একটা অত্যন্ত হতাশাজনক ও শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। এই আবহাওয়া সামাজিক উদ্যোগ ও অগ্রগতির পক্ষে অত্যন্ত অনুপযোগী। উচ্ছৃঙ্খলতা, বিশৃঙ্খলা এবং সর্বোপরি, শুধু সংগঠিত অপরাধ বিস্তারের অনুকূল হিংসা এই রাজ্যের জীবনকে আচ্ছন্ন করে তুলেছে। এগুলি বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশের কারণ হতে পারে অথবা তার ফল হতে পারে কিম্বা একই সঙ্গে কারণ ও ফল হতে পারে।'

পশ্চিমবঙ্গের ঐ অবনতি অকস্মাৎ হয় নি। অনেক বৎসরের অনেক বিপর্যয় ও হুটিবিচ্যুতি পুঞ্জীভূত হয়ে এই রাজ্যকে ঐ অবনতির পথে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশবিভাগ পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির উপর যে আঘাত হেনেছিল তার জের আজও মেটেনি। পশ্চিমবঙ্গের নদীনালাগুলি হেজে-মজে যাচ্ছিল। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারি নি। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পব্যবস্থা মূলত তার ঔপনিবেশিক চরিত্র রক্ষা করে চলছিল। কৃষি ও শিল্পের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। কৃষি ও শিল্প, দুইয়েরই প্রয়োজনে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ বাড়ানর জন্য আগে থেকে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি। বৃহত্তর কলকাতার পৌর ব্যবস্থাগুলি দ্রুত ভেঙ্গে পড়ছিল। আমাদের অর্থনৈতিক চাহিদার সঙ্গে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সামঞ্জস্য হচ্ছিল না।

সুখের বিষয়, এই হুমকি কার্যে পরিণত করা হয় নি। তা করা সম্ভব ছিল না। কেননা পশ্চিমবঙ্গের অবস্থিতি এমনই এবং সারা দেশের অর্থনীতিতে তার স্থান এমনই যে পশ্চিমবঙ্গ পড়ে গেলে বাকি ভারতবর্ষও দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না।

দেশের শতকরা ১৫টি কারখানা পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। কলকারখানাগুলি উৎপন্ন পণ্যের মোট মূল্যে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ হচ্ছে ২১ শতাংশ। সারা দেশের কয়লার মোট চাহিদার প্রায় এক তৃতীয়াংশ মেটায় এই রাজ্য। সারা দেশের সাকুল্য ইস্পাত উৎপাদন ক্ষমতার এক তৃতীয়াংশ রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। দেশের অ্যালুমিনিয়াম শিল্পেও পশ্চিমবঙ্গের একটা বড় অংশ রয়েছে। পাটের রপ্তানি বাণিজ্যেও পশ্চিমবঙ্গের একটা বড় স্থান রয়েছে। এই সেদিন পর্যন্ত ভারতের মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের ৪০ শতাংশ অধিকার করে থাকত কলকাতা। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া আসাম বিহার মণিপুর ত্রিপুরা নাগাল্যান্ড মেঘালয় মিজোরাম এবং ওড়িশাও উত্তর প্রদেশের কিছু অংশ ২ লক্ষ ৩০ হাজার বর্গমাইলব্যাপী পশ্চাদভূমি এই কলকাতা বন্দরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সূত্রে আবদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গ শুধু এই রাজ্যের মানুষদেরই জীবিকার ক্ষেত্র নয় অন্যান্য রাজ্যের বহু মানুষও পশ্চিমবঙ্গে রুজিরোজগারের সন্ধানে আসে। ১৯৫৭-৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছিল যে কলকাতায় উপার্জনকারী জনসংখ্যার শতকরা ৫৯ জনই অবাঙ্গালী। পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থভাণ্ডারেরও একটা বড় অংশ পূর্ণ করে। ১৯৬৭-৬৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আহরণ সংগৃহীত হয়েছিল ১৬৮ টাকা। আর ১৯৭১-৭২ সালে, পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন ও কলকাতা বন্দর থেকে রপ্তানি মালের বাবদ বৈদেশিক-মুদ্রা অর্জিত হয়েছিল মোট ৩১২ কোটি টাকা।

পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান এমনই যে এই রাজ্য ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক মানচিত্রে একটি অগ্রসর স্থান গ্রহণ করতে বাধ্য। দুই শ বছর আগে রাণীগঞ্জেই যে প্রথম শিল্পে কয়লার ব্যবহারের সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল ১৮১৪ সালে এই রাণীগঞ্জেই যে ভারতে আধুনিক খনি শিল্পের প্রথম পত্তন হয়েছে, ১৮১৮ সালে কলকাতার কাছে যে ভারতের প্রথম সুতাকল ও ১৮৫৫ সালে প্রথম চটকল স্থাপিত হয়েছিল, এগুলি নিতান্ত অকারণ নয়।

পশ্চিমবঙ্গ আজ তার হারান স্থান পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছে। ১৯৭২ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৭৫ সালের মার্চ পর্যন্ত এই রাজ্যে সংগঠিত শিল্পে প্রায় দুই লক্ষ নতুন পদ সৃষ্টি হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে এত বেশি চাকরির অন্য কোন রাজ্যে

শরৎ জন্মশত বার্ষিকীতে বহু তথ্যসমৃদ্ধ সশ্রদ্ধ অর্ঘ্য—
শরৎচন্দ্র—মণি বাগচি—১৮৲
রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম • কাজী নজরুল ইসলাম • ২০৲
দেশবন্ধু • মণি বাগচি • ২০৲
মহানায়ক মুজিবুর-অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ-১০৲ মহাজীবন-অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ-২০৲
মোহন লাইব্রেরী : ৩৫ এ, সূর্যসেন স্ট্রীট • কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৫-০৬৩৩

সৃষ্টি হয়নি। ১৯৭২-এর এপ্রিল থেকে আরম্ভ করে চার বছরে পশ্চিমবঙ্গে ২১৭৮টি নতুন কোম্পানি রেজিস্টার্ড হয়েছে। এদের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৬৮৭ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। অথচ এর আগেকার ৫ বছর রেজিস্ট্রি হয়েছিল মোট ১২১৫টি কোম্পানি আর তাদের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল মোট মাত্র ১২৮-৫৩ কোটি টাকা। ১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৭৪-৭৫-এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থসংস্থানগুলির অর্থ-মঞ্জুরির পরিমাণ ৪৩-৫৭ কোটি টাকা থেকে বেড়ে দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। ১৯৭২ এর এপ্রিল থেকে ১৯৭৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন ৯২টি প্রকল্পে সাহায্য করেছেন এবং তার মধ্যে ২৪টি প্রকল্প সম্পূর্ণ হয়েছে। জনগণের অঞ্চলগুলিতে শিল্প স্থাপনে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ১৯৭১ সালে যে ১৬ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল পুনর্গঠিত পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশনের সাহায্যে সেই কর্মসূচীকে রূপ দেওয়া হচ্ছে। এই কর্পোরেশনের উদ্যোগে যেসব প্রকল্পের কাজ এগিয়েছে সেগুলির মধ্যে খড়্গপুরের ট্রাক্টার তৈরির কারখানা, দুর্গাপুরে টায়ার ও টিউবের কারখানা ও পুরুলিয়ায় সিমেন্টের কারখানা। শিল্পবিস্তারের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বিষমতা দূর করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার হলদিয়া, দুর্গাপুর, আসানসোল শিলিগুড়ি কল্যাণী সাঁওতালদি ও খড়্গপুরে ৮টি উন্নয়নকেন্দ্র গড়ে তুলছেন। ৭৪টি বন্ধ অথবা পঙ্গু কলকারখানা আবার চালু করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে বেড়ে ১৪৯ কোটি ইউনিটের স্থলে ১২২ কোটি ইউনিট হয়েছে। ১৯৭২ সালে বিদ্যুৎ চলাচল ও সরবরাহের লাইনের মোট দৈর্ঘ (সার্কিট কিলোমিটার) ছিল ১৭৩৪৭। ১৯৭৬ সালে সেটা বেড়ে ৪০৭৯৩ হয়েছে। অর্থাৎ দ্বিগুণের বেশি বেড়ে গেছে। ১৯৭২ সালে যেখানে পশ্চিমবঙ্গের মাত্র ৩৩২৮টি গ্রাম বিদ্যুৎ পেয়েছিল ১৯৭৬ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত সেজায়গায় বিদ্যুৎ-সঞ্চারিত গ্রামের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০ হাজারের বেশি।

কৃষি সেচ ও গ্রামীন অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতেও পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক অগ্রগতি লক্ষনীয়। ১৩ বছরে ধানের উৎপাদন ১৫ লক্ষ টনের বেশি বেড়েছে। গমের উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ এখন

উচ্চফলনশীল ধান কাটা হচ্ছে

পাঞ্জাবের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। গত চার বছরে এই রাজ্যে অধিকফলনশীল জাতের ধানের জমি প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। চার বছরে ৩৯ হাজারের বেশি নলকূপ বসান হয়েছে। বিশ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী অনুযায়ী ৪৮০০০ অগভীর নলকূপ স্থাপনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে গ্রামীন অর্থনীতির সামগ্রিক বিকাশের একটি বৈপ্লবিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের এই অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের একটি লক্ষণ হল উন্নয়নে কৃষির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন অর্থ ও যোজনামন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, পরিকল্পনা যোজনায় শিল্পকে উপেক্ষা না করে গ্রাম ও কৃষিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আমরা যদি গ্রাম ও শহরের মধ্যেকার কৃষি ও শিল্পের মধ্যেকার পারস্পারিক নির্ভরতার কথা বুঝতে না পারি এবং শুধুমাত্র শিল্পকে অগ্রাধিকার দিই তাহলে শহর বা শিল্প কোনটারই উন্নতি করা যাবে না, আর গ্রাম ও কৃষিকে ত অবহেলা করা হবেই।

পশ্চিমবঙ্গে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের বর্তমান পর্যায়ের মধ্যেও আমাদের শিল্পের ভিত্তির মৌলিক দুর্বলতাগুলি তাত্ত্বাত প্রকটভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ছে। চা ও পাট এই দুটি রপ্তানিভিত্তিক শিল্পই প্রচন্ড মার খাচ্ছে। যেসব চটকল ও চা-বাগিচা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সেগুলি নিয়ে আমরা কি করব ভেবে পাচ্ছি না। রেলওয়ে ওয়াগণ তৈরির জন্য যথেষ্ট ফরমায়েস হাতে না থাকায় মার খাচ্ছে আমাদের ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প। তুলোর দামে পড়তা পোষাতে না পেরে সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছে আমাদের সুতাকলগুলি সময় থাকতে যদি আধুনিক পেট্রল-ভিত্তিক অথবা ইলেকট্রনিক শিল্প গড়ে তোলা হত তাহলে আমাদের মামুলি শিল্পগুলির অবনতি সম্পর্কে হয়তো এতটা হাহুতাশ করতে হত না। কিম্বা যদি আমাদের শিল্প মূলত শুধু ভবিষ্যত পণ্যের ব্যবহারকারী না হয়ে চাষেও প্রয়োজনীয় উপকরণের যোগনদার হত তাহলেও হয়তো সংকটের চেহারাটা এমন হত না।

আধুনিক চাষবাসের উপকরণ যোগাবার জন্য শিল্পের একটা বড় ভিত্তির প্রয়োজন হয়। সি এম পি ও-র একটি হিসাব দেখান হয়েছে যে, সেচ জল নিষ্কাষণ গ্রামের গার্হস্থ্য প্রয়োজন মেটান ইত্যাদি বাবদ পশ্চিমবঙ্গে প্রতিটি গ্রামের জন্য গড়ে ৪০ হাজার টাকার ইঞ্জিনীয়ারিং পণ্যের চাহিদা হবে। এই হিসাব থেকে এটা পরিষ্কার যে আমাদের গ্রাম উন্নয়নের কর্মসূচী কার্যত আমাদের শিল্পের উন্নয়নেরও কর্মসূচী হয়ে উঠতে পারে যদি কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক সুস্থ সম্পর্কের দিকে দৃষ্টি রেখে আমাদের শিল্প-ব্যবস্থার কিছুটা পুনর্বিন্যাস করে নেওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের এই পথ। পশ্চিমবঙ্গ সেদিকেই চলেছে।

কলিংবেল

...সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।

পায়ের শব্দ উপরের দিকে উঠে আসছে।

ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং

কলিংবেল বেজে উঠলো।...'

সেই কবে জ্ঞান হওয়া থেকে, বলা উচিত, বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ পেরুনোর পর থেকেই, রহস্য উপন্যাস পড়ে আসছি। সেই থেকে আমার কলিংবেলের সঙ্গে পরিচয়। তখন কলিংবেল চোখেও দেখিনি, আমাদের বহু দূরের মফস্বল শহরে বিদ্যুৎই ছিলো না কলিংবেল থাকবে কি করে?

কলিংবেল নামক বস্তুটির সঙ্গে আমার চাক্ষুষ আলাপ পনেরো বছর বয়েসে কলকাতায় এসে। তার আগে আরো দু'একবার কলকাতায় আসি নি তা নয়, কিন্তু আমরা উঠতাম শ্যামবাজারে, সেখানে কোনো বাড়িতে কলিংবেল তখন দেখেছি বলে মনে পড়ে না। মফঃস্বলের মতই লোকেরা বাড়ির রোয়াকে উঠে ডাকতো, 'শ্যামবাবু, বাড়ি আছেন নাকি?' সাড়া না পেলে আরো চেঁচিয়ে তারপর আরোতর চেঁচিয়ে শ্যামবাবুর অনুসন্ধান চলতো যতক্ষণ পর্যন্ত না উত্তর আসে। আর তাছাড়া দরজা খোলা থাকলে, একটু জানাশোনা থাকলে যে কোনো দিগ্‌গজের বাড়িতে যে কেউ উঠোনে বা ভিতরে ঢুকে পড়তো, এটা কোনো অস্বাভাবিক কিছু ছিলো না, কোনো জানান দেওয়ার আবশ্যক ছিলো না। এমন কি গলা-খাঁকারি দিতেও হতো না।

কিন্তু ইতিমধ্যে মোহন সিরিজ, কিরীটি রায় রহস্য কাহিনীর পৃষ্ঠা অতিক্রম করে ক্রিং ক্রিং করে কলিংবেল এসে গেছে, বাড়িতে বাড়িতে সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু বাংলা রহস্য উপন্যাসেই নয় ফাঁকে বিলিতি রোমাঞ্চমালাতেও ক্রমাগত শুনেছি কলিংবেলের শব্দ, কখনো শব্দের হুহুতেই শব্দের ঠিক ওপাশে মারাত্মক সমস্ত রোমহর্ষক ঘটনা ঘটে গেছে। রোমহর্ষক না হলেও আমার এখনকার প্রিয়তম গায়েন্দা নায়ক ফেলুদার বাড়িতে একবার খনা বিদ্যুতেই লোডসেডিং-এর সময় কলিংবেল বেজেছিলো।

অবশ্য বিদ্যুৎহীন কলিংবেল যে নেই তা নয়, অনেক অফিসের টেবিলেই সেটা রাজে, সেটা বাজিয়ে বড় সাহেবেরা চাপরাশিদের ডাকেন। একেক সময় মনে হয় যখন কলিংবেল ছিলো না তখন সাহেবেরা কি করে চাপরাশিদের ডাকতেন, নাকি তখন চাপরাশিদের ডাকবার জন্যে চাপরাশি থাকতো।

কথায় কথায়

অফিসের কলিংবেল নয়, বাড়ির কলিংবেলের কথা বলি। বাড়ির দরজায় কলিংবেল দেখলেই আমার মফঃস্বলী মনে কি রকম একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এর একটা সম্ভাব্য কারণ বোধ হয় এই, বছর পনেরো আগে একবার এক প্রচণ্ড বর্ষার দিনে সন্ধ্যাবেলা এক বাড়ির ভিজে দরজায় কলিংবেল টিপতে গিয়ে এমন সাংঘাতিক ইলেকট্রিক শক খেয়েছিলাম ভাবতে গেলে এখনো পায়ের তালু থেকে মাথার ব্রহ্মতালু পর্যন্ত ঝিন্‌ঝিন্‌ করে ওঠে। এর পর থেকে কোনো বাড়ির দরজায় কলিংবেল দেখলেই আমি ভয় পাই। অনেক খোঁজাখুঁজি করে যে বাড়িতে বিশেষ প্রয়োজনে সাত রাজ্য পার হয়ে চার বার ট্রামবাস বদলিয়ে তারপর এসে পৌঁছেছি, সেখানে ঢুকতে কেমন একটা ভয় হয়, সাহস হয় না বেল টিপতে, ইচ্ছে হয় ফিরে যাই।

কিন্তু উপায় নেই। এখন এমন একটি বাড়ি খুঁজে পাওয়া কঠিন যার সদর দরজা বন্ধ থাকে না এবং যে দরজায় একটি কলিংবেল লাগানো থাকে না। সদর দরজা হাট করে খুলে বাইরের ঘরে বসে যারা হৈ হৈ করে গল্প করতো, তক্তপোষে বসে তাস খেলতো সেই লোকেরা কোথায় গেলো?

সে যা হোক, একটা কলিংবেল তবু ভালো, অনেক বাড়ির দরজায় একাধিক কলিংবেল লাগানো থাকে। তখন এক সমস্যা, হেড না টেল্, কোন্‌টা আসল, উপরেরটা না নীচেরটা কোন্‌টা বাজবে?

দুটোই বাজিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হয় কোন্‌টা বাজে? বাজে মানে ক্রিয়াপদ, বিশেষণ নয়, কোনটা থেকে শব্দ বেরোয়।

কিন্তু এই ব্যবস্থাপত্রও কি ছিদ্রহীন? অনেক বাড়িতেই কলিংবেলের ঘন্টা যন্ত্রটি থাকে বাহিরাগতের শ্রুতি সীমার বাইরে, তখন বারবার বাজিয়ে অধীরভাবে কান পেতে থাকতে হয়, বেল বাজলো কিনা, সিঁড়িতে কিংবা বারান্দায় কারো পায়ের শব্দ পাওয়া যায় কিনা।

অনেক সময় আবার খুব গোলমালও হয়। একই সদর দরজায় দুটো বেল দুই পাশাপাশি ফ্ল্যাটের, কে বুঝবে? দুটি বেল উপরে নিচে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চার মিনিটে আটবার বাজানোর পর এক সঙ্গে দুই প্রান্তে দুটি দরজা খুলে গিয়ে চীৎকার চেঁচামেচি আরম্ভ হয়ে গেলো, তখন বুঝিয়ে বলা কঠিন কেন এই অসৎ কর্ম করতে বাধ্য হয়েছি।

অনেক কলিংবেলের নিচে ছোট ছোট অক্ষরে কি সব নির্দেশ লেখা থাকে। রোদে-বৃষ্টিতে একেবারে অস্পষ্ট হয়ে গেছে, যখন অস্পষ্ট ছিলো না তখনো ঘাড় উঁচু করে দৃষ্টিসীমার ঊর্ধে ঐ ছোট ছোট বর্ণমালা থেকে কোনো অর্থ উদ্ধার করা খুব সহজ ছিলো বলে মনে হয় না। অবশ্য এর আবার উল্টোদিক আছে, সেখানে কলিংবেলের নিচেই একটা ঘন্টার ছবি আঁকা থাকে যাতে কারো অসুবিধা না হয় বুঝতে যে এই ঘন্টাটি বাজাতে হবে।

তবে কোনো কোনো বাড়িতে এ'ও দেখেছি যে, তীর কিংবা হাতচিহ্ন দিয়ে দূরে নির্দেশ দেওয়া আছে, পাশে ইংরেজি ও বাংলাতে লেখা, বেল ইন সাইড প্যাসেজ, ঘন্টা পাশের প্যাসেজে। বলা বাহুল্য এরকম ক্ষেত্রে দরজায় ধাক্কা দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, পাশের অন্ধকার প্যাসেজে বেলের অনুসন্ধান করতে না যাওয়াই ভালো। অন্ততঃ একবার গিয়ে আমার এক আত্মীয় পা পিছলে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, ভাগ্য ভালো দেড় ঘন্টার মাথায় আরেকজন সেই বেল বাজাতে এসেছিলেন এবং তিনিই আমার সেই আত্মীয়কে অজ্ঞান অবস্থায় দেখতে পেয়ে অতি সাবধানে উদ্ধার করে হাসপাতালে পৌঁছে দেন।

সব দেখে শুনে তবুও আমাদের শিক্ষা হয় না। আমরা নিজেরাই বাড়িতে একটা কলিংবেল লাগিয়েছিলাম। ভালোই চলছিলো, কিন্তু মাসখানেকের মাথায় একদিন রাত দেড়টা নাগাদ সেটা একা একাই অকারণে বেজে ওঠে এবং সারারাত ধরে বাজতে থাকে, শেষে সাড়ে চারটা নাগাদ এক বিরক্ত প্রতিবেশী ঘুম থেকে উঠে এসে বন্ধি করে মেন সুইচ বন্ধ করে দেন, আমরা রক্ষা পাই।

তারাপদ রায়

গোধূলিয়া

উপন্যাস নিমাই ভট্টাচার্য

—২৮—

পাটনার জীবন বেশ ভালভাবেই শুরু হল। রাজেন্দ্রনগরে বিরাট দোতলা বাড়ীতে আমাদের অফিস। একতলার পিছন দিকের তিনখানি ঘরে আমার রাজত্ব। দুখানিতে গুদাম, তৃতীয়টি আমার অফিস-কাম-কোয়ার্টার। কোন অসুবিধে নেই। ঘরের সঙ্গেই বাথরুম। ঘরের মধ্যে পর্দা দিয়ে পার্টিশন করে পিছন দিকে আমার সামান্য জিনিষপত্র ও খাটিয়া। এই একতলার সামনের তিনখানি ঘরের একটিতে রিজিওন্যাল ম্যানেজার মিঃ মুখার্জীর চেম্বার। দ্বিতীয়টি অফিস। তৃতীয়টি সেলস রিপ্রেজেনটেটিভদের।

দোতলায় মিঃ মুখার্জির কোয়ার্টার ও গেস্টরুম। কলকাতা থেকে কোম্পানীর কেউ এলে ঐ গেস্টরুমে থাকেন। তবে কলকাতা থেকে বিশেষ কেউ আসেন না। দরকার হলে মিঃ মুখার্জীই কলকাতা যান। আমি আসার পর উনি বলেছিলেন, প্রদীপবাবু, আপনি একলা একলা নীচে না থেকে গেস্টরুমেই থাকুন। কলকাতা থেকে যখন কেউ আসবেন, তখন দু'এক দিনের জন্য না হয় নীচের ঘরে থাকবেন। আমি রাজী হইনি। বলেছিলাম, স্যার, নীচের ঘরে থাকতে আমার কোন অসুবিধে হবে না।

মিঃ মুখার্জী অত্যন্ত আমায়িক ভদ্রলোক। এম এ পাশ করে কোচবিহার জেলার একটা ছোট্ট কলেজে বছর দুই চাকরি করার পর আমাদের কোম্পানীতে চলে আসেন। আমাদের কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেকটর মিঃ কমল রায় বহু দিন নানা কলেজে কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ছিলেন। তারপর সায়েন্স কলেজের পুরোনো দুই বন্ধুকে নিয়ে এই কোম্পানী তৈরী করেন। মিঃ রায়ের ধারণা, সাধারণ শিক্ষিত সমাজ শিল্প-বাণিজ্যে এগিয়ে না আসার দেশের সত্যকার উন্নতি হচ্ছে না। মিঃ মুখার্জী একদিন কথায় কথায় আমাকে বলেছিলেন এম-এ পাশ করেছেন বলেই এ কোম্পানীতে আপনার চাকরি হয়েছে ও উন্নতি হবে।

যাই হোক আমি বেশ আছি। আমাদের অফিসের বেয়ারা নিতাহরি আগে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারের বাড়ীতে রান্না করত। এখানে নিতাহরিই আমার খানসামা। আমি ওকে মাসে মাসে একশ টাকা দিই। মিসেস মুখার্জি ভাল-মন্দ রান্না করলেই আমাকে পাঠিয়ে দেন। দু-একদিন পরপরই উপর থেকে কিছু আসে। আমি বলি, বৌদি, ফ্রান্সে ওয়াইন টেস্টার আছে কিন্তু আপনি কি আমাকে ফুড টেস্টার এ্যাপয়েন্ট করলেন?

মিসেস মুখার্জী হাসতে হাসতে বলেন, না প্রদীপবাবু, আমি ইনভেস্টমেন্ট করে যাচ্ছি। এরপর আপনার স্ত্রী এলে আমাকে হয়ত রান্নাঘরেই ঢুকতে হবে না।

আমি হেসে বলি, বৌদি, আমার পত্নীর স্থানে শনির দৃষ্টি। সুতরাং আগামী পঁচিশ-তিরিশ বছরের মধ্যে সে সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।

মিসেস মুখার্জী নিরাশ হবার পাত্রী নন। বলেন, দেখুন প্রদীপবাবু, আমিও আপনার মত আশুতোষ-দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এর সিঁড়ি ভেঙেছি পুরো দুটো বছর। তাছাড়া প্রেসিডেন্সীতে পড়ার সময় থেকেই আপনাদের মিঃ মুখার্জীর সঙ্গে কফি-হাউসে আড্ডা দিয়েছি, ওয়াই-এম-সি-এ রেস্টুরেন্টের কেবিনে বসে প্রাণের কথা বলেছি।...

ওর কথা শুনতে শুনতে আমি হাসি।

উনি এবার আমার দিকে তাকিয়ে চাপা হাসি হাসতে হাসতে বললেন, আপনার রোগ আমি ধরতে পারি নি, তা আপনি ভাববেন না।

আমি খুব জোরে হেসে উঠি।

হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবেন না। শেষকালে লুকিয়ে লুকিয়ে আপনার পিছন পিছন কাশীধাম ধাওয়া করে হাতেনাতে ধরিয়ে দেব।

সারা বিহার ও নেপাল আমাদের এই অফিসের অধীনে। নেপালে দুজন ও বিহারে আটজন সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ ছড়িয়ে আছেন। প্রত্যেক সেলস রিপ্রেজেনটেটিভকে প্রতিমাসে পাটনা আসতে হয়। মিঃ মুখার্জীও মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে ঘুরতে যান। এই রিজিওন্যাল অফিসের ডিপোর দায়িত্ব আমার। কলকাতার সেন্ট্রাল ডিপো থেকে মাল আনিয়ে এখান থেকে নানা অঞ্চলে পাঠানই আমার কাজ। এ-কাজে খুব একটা বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন নেই; তবে খাতাপত্রে ঠিক মত লেখালেখি না করলে বা মালপত্র ঠিকমত আনিয়ে নানা জায়গায় না পাঠাতে পারলে মুস্কিলে পড়তে পারি। প্রথম দু-এক মাস খুবই অসুবিধে হয়েছিল। সত্তর-পঁচাত্তরটা ওষুধ আর কেমিক্যালস-এর নাম আর বানান মুখস্ত করতেই পুরো একটা মাস লেগেছিল। এখন সব কাজটাই জলবৎ তরলং মনে হয়। কাজ করে বিশেষ আনন্দ পাই না কিন্তু অফিসের পরিবেশ আর মিঃ মুখার্জীর জন্য বেশী মাইনে পেলেও এই কোম্পানী ছাড়তে পারব না।

দিনগুলো বেশ কাটছে। প্রত্যেক মাসে দু'দিনের জন্য কাশী যাই। প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে পুরো টাকাটাই পিসীর হাতে দিয়ে বলেছিলাম, হরসুন্দরী ধর্মশালায় গিয়ে দেখলাম মা নেই। পালিয়েছে। তাই তোমার হাতেই মাইনেটা দিচ্ছি।

পিসী কাঁদতে কাঁদতে আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছিলেন। কোন কথা বলতে পারেন নি। পরে দেবীকে বলেছিলেন, দেবী, সোনা বউয়ের ছেলেটাও সত্যি সোনার টুকরো হয়েছে। আজ আমার নিজের ছেলে থাকলেও সে আমাকে এ সম্মান দিত কিনা সন্দেহ।

পিসী পুরো টাকাটাই দেবীর হাতে দিয়ে বলেছিলেন, ওকে দিয়ে দিস। আর তুই ওকে নিয়ে গিয়ে সঙ্কট মোচনে পুজো দিয়ে আসিস। ওর জীবনে যেন কোন সঙ্কট না আসে।

তারপর থেকে আমি কাশী এলেই দেবী আমাকে নিয়ে সঙ্কট মোচনে যাবে। আমি জানতাম না পিসীর মত ওরও সঙ্কট মোচনে এত বিশ্বাস। পরে ও আমাকে বলেছিল, জান সোনা, তোমার অসুখ যখন খুব বাড়াবাড়ি তখন আমি সঙ্কট মোচনে এসে মহাবীরজীকে বলেছিলাম, আমার সোনার যদি কিছু হয় তাহলে আমি আর কোন দিন তোমার মুখ দেখব না।

ওর কথা শুনে আমি হাসি।

দেবী আমাকে চিমটি কেটে বলে, সোনা, তুমি আমার কথা শুনে হাসবে না।

আমি কি ঠাট্টা করে হাসছি? আনন্দে, খুশীতে হাসছি।

কথা ঘুরাবার চেষ্টা করবে না।

সত্যি বলছি, তুমি আমাকে কত ভালবাসো।

তোমাকে ছাড়া আর কাকে ভালবাসব?

তা ঠিক। পৃথিবীতে ত আমি ছাড়া আর কোন যুবক নেই।

ওই জন্যই তোমাকে কোন কথা বলতে চাই না।

আচ্ছা, আচ্ছা, আর এ ধরনের কথা বলব না।

সংকট মোচন থেকে ফেরার পথে রিকসায় বললাম, বউ, একটা কথা বলবে?

কী?

আজ সংকট মোচনে গিয়ে কী প্রার্থনা করলে?

দেবী হেসে বললো, তোমাকে বলব কেন?

আমি যে তোমার সোনা! আমাকেও বলবে না?

ও একটু উদাস করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, বললাম সংকট মোচন, আমি যে সোনাকে ছেড়ে আর থাকতে পারছি না। আমি কি কোনো দিনই আমার সোনাকে

দেবী কথাটা শেষ করতে পারল না। আমি আলতো করে ওর একটা হাত চেপে ধরে বললাম, বউ, তোমার এ ভালবাসা কখনও ব্যর্থ হতে পারে না।

জানি, না সোনা। বেশী আশা করতে ভয় হয়।

কাশীতে গেলে দুটো দিন যে কোথা দিয়ে কেমন করে কেটে যায়, তা বুঝতেই পারি না। পৌঁছবার পর পরই পিসীর কাছে ঘন্টাখানেক খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে জবাব দিহি করতে হবে।

তুই এ রকম শুকিয়ে যাচ্ছিস কেন? নিত্য ঠিক করে খেতে দেয় না?

আমি দু' হাত দিয়ে পিসীর মুখখানা ধরে বলি, তোমার চোখে আমার শরীর কোন দিনই ভাল হবে না।

পিসী আমার কথা কানেই তোলে না। বলে, এই ক'মাস আগে এত বড় অসুখ থেকে উঠলি। একটু ত ভাল-মন্দ খাওয়া-দাওয়া করবি বাবা।

আর বলো না পিসী। আজকাল আবার মাইনে থেকে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও আরো কত কি কেটে নেবার পর যা হাতে পাই, তাতে আর...

আর বলতে হয় না। পিসী সঙ্গে সঙ্গে আমার কান ধরে বলে, ভালভাবে খাওয়া-দাওয়া না করে আমার জন্য অত দামী চাদর কিনে আনলি কেন?

দেবী বলেছিল।

দেবী দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে চা খেতে খেতে সব শুনছিল। এবার ও ঘরের মধ্যে এসে বললো, না পিসী আমি কিছু বলিনি। তাছাড়া তোমার প্রদীপ যেন আমার সব কথা শোনে!

তোরা দুটোই অতন্ত বদ হয়েছিস।

যখনই হোক একবার দু-এক ঘন্টার জন্য পিসীর বাড়ীতে গিয়ে সারদা-সুধা-মণি পিসীদের কাছে যেতেই হয়। প্রতিবারই আমি সামান্য কিছু ফল-মিষ্টি নিয়ে যাই। বঞ্চনা আর উপেক্ষা সহ্য করতে করতে এই পৃথিবীর কারুর কাছেই ওদের কোন প্রত্যাশা নেই। তাই আমি সামান্য ফল-মিষ্টি দিলেই ওরা যেন হাতে স্বর্গ পান।

বাকি সময়টুকুর মালিক দেবী।

সোনা চলো ত একটু গোধূলিরার মোড় ঘুরে আসি।

কেন?

দরকার আছে।

এখুনি যেতে হবে?

হ্যাঁ।

আমি ওর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি। তারপর গোধূলিরার মোড়ে গিয়েই বাটার দোকানে ঢুকে। পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসি। সেলসম্যান আসতেই ও উঠে গিয়ে শো-কেসের কোন একটা জুতা দেখায়। তারপর সেলসম্যান বাক্স থেকে আমার জুতা বের করতেই আমি চমকে উঠি তুমি আমার জুতা কিনতে এসেছ? আমার ত জুতা আছে।

পায় দিয়ে দেখে নাও, ঠিক হচ্ছে কিনা।

ঠাকুরের দিব্যজীবনের অপ্রকাশিত অলৌকিক কাহিনী
বিপুলভাবে সমাদৃত। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিতপ্রায়

শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতিকথা

ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও পার্শ্বচর রামলাল চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ, তদীয়পুত্র শ্রীহরিহর কাঞ্জি। ৬-৫০

"বিশ্বরূপা প্রকাশনী" ঃ বিশ্বরূপা থিয়েটার ঃ কলিকাতা-৬।

প্র কা শি ত হ লো

৩২ টাকার বই ১২ টাকায়

এ কালের প্রিয়তম লেখক

শংকর-এর

প্রথম ট্রিলজি উপন্যাস

স্বর্গ মর্ত পাতাল

জন-অরণ্য সীমাবদ্ধ আশা আকাঙ্ক্ষা

বিশ্ববিজয়ী এই তিনখানি উপন্যাস সমাজের সর্বস্তরে বিপুল কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। গত বিশ বছরে আর কোনো লেখা নিয়ে এমন প্রশংসা ও আলোচনার ঝড় ওঠেনি—যার জের রাজপথ থেকে রাজভবন পর্যন্ত গড়িয়েছে।

৬৮০ পাতার

* মূল সংস্করণের প্রতিটি লাইন তো আছেই, বাড়তি রয়েছে ঃ
  - শংকরের জবানবন্দী
  - এই ট্রিলজির চাঞ্চল্যকর নেপথ্য কাহিনী
  - মূল পাণ্ডুলিপির দুষ্প্রাপ্য ছবি
* পেপার ব্যাকের চেয়ে সস্তা দামে রাজসংস্করণ
* আগাম গ্রাহক হয়ে যে সুযোগ পাওয়া যায় তার থেকেও সুবিধে
* পরবর্তী মুদ্রণের দাম দ্বিগুণ অথবা তিনগুণ হতে পারে—কিংবা আদৌ প্রকাশিত না হতে পারে

দাম ১২ ঃ রেজিস্ট্রি ডাকে ১৪ ঃ বিদেশে জাহাজ ডাকে ২০

অবিশ্বাস্য দামে এই অবিস্মরণীয় বইটি বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় নেমেছি আমরা। আপনার আশীর্বাদ কামনা করি।

দে'জ পাবলিশিং C/o দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০৭৩, ফোন ৩৪ ৫০৩৫

দোকানের মধ্যে ঝগড়া করা যায় না। বাইরে বেরিয়ে আসার পর বললাম, প্রত্যেক মাসেই আমাকে কিছু দেবার দরকার আছে কি?

তোমাকে কি আর দিলাম! যে সিল্কের বুশ সার্ট পরে আছি, সেটা কে দিল?

দেবী আমার দিকে করুণভাবে তাকিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো, সোনা, তোমাকে আরো কত কি দিতে চাই কিন্তু কিছুতেই পারি না।

আবার কি দিতে চাও?

দেবী আবার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে, অনেক অনেক কিছু।

অনেক কিছু মানে?

সবকিছু। সর্বস্ব।

আমি আর প্রশ্ন করি না। মুখ নীচু করে হাঁটি।

এক মিনিট পরেই দেবী বলে, সোনা, না দেবার যন্ত্রণা যে কি, তা তোমাকে বুঝাতে পারব না।

সেদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর কিছুক্ষণ আমি, পিসী আর দেবী গল্প করলাম। তারপর পিসী শুতে গেলেন। আমরা দুজনে বসে বসে কথাবার্তা বলছিলাম। নানা কথার পর দেবী বললো, সোনা, তুমি আলপনাকে বিয়ে কর। ও সত্যিই তোমাকে ভালবাসে।

তুমি সতীন নিয়ে ঘর করতে পারবে?

সতীনদেরও একটা মর্যাদা থাকে কিন্তু আমার সে মর্যাদাও পাবার অধিকার নেই।

সতীনের আবার মর্যাদা? তাও আবার বড় বউয়ের?

যাকগে, এ আলোচনা বাদ দাও। তুমি এবার আলপনাকে বিয়ে কর।

এতদিনে বোধহয় আলপনার বিয়ে হয়ে ছেলেও হয়ে গেছে।

দেবী আমাকে একটা চড় মেরে বললো, অসভ্যতা করো না। এর মধ্যেই ওর বিয়ে হয়ে ছেলে হবে, তাই না?

আমি হাসি। তারপর বলি, ছেলে না হলেও বিয়ে ত নিশ্চয়ই হয়ে গেছে।

তোমাকে কে বললো?

কেউ বলেনি। আমার মনে হয়।

ওরা ত পিসীর কথার উপর ভরসা করেই এখনো বসে আছেন।

তোমাকে কে বললো?

কদিন আগেও পিসীর কাছে আলপনার মার চিঠি এসেছে। তাছাড়া তোমার বাবার বন্ধু—কাকাবাবু আর কাকিমা এর মধ্যে কাশী বেড়াতে এসে..

তারাও এসেছিলেন?

দেবী হেসে বললো, সোনার জন্য আসবে না?

পিসী আলপনার মার চিঠির জবাব দিয়েছে?

না। তবে আমি আলপনার চিঠির জবাবের মধ্যেই লিখেছি পিসী পরে তোমার মাকে...

আলপনাও তোমাকে চিঠি লেখে?

মাসে একটা চিঠি আসেই।

তুমিও জবাব দাও?

দেব না কেন?

এবার লিখে দাও আমি পাটনাতেই একটা মেয়েকে বিয়ে করে সুখে সংসার করছি।

ওসব বাজে কথা বাদ দাও। তুমি আলপনাকে বিয়ে কর। আর কত কাল এভাবে একলা একলা...

আমি দু' হাত দিয়ে ওর মুখখানা ধরে বললাম, বউ, আমি জানি আমাদের বিয়ে হবে না। ফুলশয্যার রাতে তোমাকে না পেলেও অনেক দুঃখের রাতে তোমাকে কাছে পেয়েছি। লক্ষ্মী সোনা আমার তুমি আমাকে বিয়ের কথা বলো না।

(আগামী সংখ্যায় শেষ হবে)

গ্রাহক নেওয়া হচ্ছে

দুর্লভ সেই মহাভারত আবার ছাপা হচ্ছে.

মহামহোপাধ্যায়-মহাকবি-ভারতাচার্য

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য-এর

মহাভারতম্

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-এর

বাংলা হরফে মূল শ্লোক

দর্শনাচার্য শ্রীমন্নীলকণ্ঠের

টীকা

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য-এর

টীকা, পাঠান্তর প্রতি পর্বের ভূমিকা, ভারতযুদ্ধের কালনির্ণয়, বৃহৎ সূচীপত্র এবং

গদ্যে বঙ্গানুবাদ

আনুমানিক ৪০ খণ্ডে প্রকাশিত হবে।

প্রতি খণ্ডের আনুমানিক মূল্য ৩০·০০ টাকা। ৪০ খণ্ডের মোট মূল ১২০০·০০

কিন্তু যাঁরা ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৭৬-এর মধ্যে অগ্রিম ২৫·০০ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হবেন তাঁরা প্রতি খণ্ড ২২·০০ টাকায় পাবেন অর্থাৎ ৯০৫·০০ টাকায় ৪০ খণ্ডের ফুল সেট পাবেন। কলকাতার বাইরে গ্রাহকদের বই পাঠাবার রেজিস্ট্রি ডাক খরচ আলাদা।

যাঁরা এককালীন ৭০১·০০ টাকা দিয়ে গ্রাহক হবেন তাঁরা সমগ্র মহাভারতটিই খণ্ডে খণ্ডে পাবেন। আমরা মাত্র আর ১০০ জন এককালীন গ্রাহক নেবো।

নির্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হচ্ছে

সম্পূর্ণ মূলানুগ সংস্করণ

ব্যাঙ্ক ড্রাফট বা চেক পাঠিয়ে গ্রাহক হতে পারেন।

পাঠাবার ঠিকানা :

বিশ্ববাণী প্রকাশনী

৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলকাতা—৯

..."There's nought in this life sweet,
If man were wise to see't.
But only Melancholy.
O Sweetest melancholy!"..Fletcher.

মনের অসুখ

কিছুতেই সত্যকে অফিসে পাঠানো যাচ্ছে না। সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারে না ধাক্কা দিয়ে তুলে দিলেও আবার কিছুক্ষণ শূন্যে বসে কাটায় তার পর দুপুরের পর থেকে একটু ভাল বোধ করে। এই সময় খাওয়া-দাওয়া করে খবরের কাগজের পাতা ওলটায় বাড়ীর লোকদের দু'একটা কথার জবাব দেয় ওষুধপত্তর খেতে চায়। সন্ধ্যার দিকে মনমেজাজ প্রায় ঠিক হয়ে আসে। কিন্তু আবার রাত্রিবে বিছানায় শুয়ে অস্বস্তি কিছুতেই কম আসে না প্রায় রাত দুটো নাগাদ তন্দ্রা আসে. তন্দ্রার ঘোর কাটতে না কাটতেই সকাল হয়ে যায়। গত চার পাঁচ বছর ধরে বছরে একবার করে এই অবস্থা দেখা যাচ্ছে। ওষুধপত্রে বিশেষ কাজ হয়নি প্রতিবারই বৈদ্যুতিক শক (ই সি টি) দিতে হয়েছে। প্রতি বছরই এই অবস্থার জন্য তার প্রায় মাসখানেক করে অফিস কামাই হয়েছে। অন্যবারে চিকিৎসার পর বছরখানেকের মত ভাল থাকত এবার মাস ছয়েকের মধ্যেই উপসর্গ দেখা দিয়েছে। ডাক্তাররা বলেছেন ও বিষাদ রোগ (ডিপ্রেসনে) ভুগছে। এই বিষাদ রোগ কেন হয়? এ-কি সারবার অসুখ নয়?

সত্য সেনের বৃদ্ধ পিতা মণিবাবু ছেলের অসুখের বিবরণ শেষ করে জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকালেন। মণিবাবুকে আমি আগে থেকেই চিনতাম। দেশ ভাগের পরই পশ্চিমবঙ্গে আসেন। নামকরা একটা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন; এখানে এসে কোলকাতার উপকণ্ঠে এক উদ্বাস্তু কলোনীতে একটি স্কুল গড়ে তোলেন। সত্য তখন বছর পাঁচেকের ছেলে। দুটি কিশোরী মেয়ে সত্য আর স্ত্রী—এই নিয়ে সংসার। মণিবাবুর অনেক কৃতী ছাত্র এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিল। তাদের অর্থ সাহায্য কয়েক বছরের মধ্যেই মেয়ে দুটিকে পাত্রস্থ করে মণিবাবু স্কুল আর সত্যকে নিয়ে মেতে ওঠেন। তাঁর চেষ্টায় স্কুলটি অনুমোদন লাভ করে এবং ঐ তল্লাটের একটি উচ্চমানের স্কুল হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এই স্কুল থেকে সত্য কৃতিত্বের সঙ্গে বেরোয় স্কুল ফাইনাল পাশ করে সেবারই উপদলীয় কলহের ফলে মণিবাবুকে স্কুলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করতে হল। শুধু তাই নয় স্কুল-সংক্রান্ত মামলামোকর্দমায় জড়িয়ে পড়ে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। মামলামোকর্দমা থেকে কোনোমতে সম্মান বজায় রেখে বেরিয়ে আসার পর তিনি মনের অসুখে ভোগেন। সেই সূত্রে আমার সঙ্গে পরিচয়। ভদ্রলোকের নানাবিষয়ে ঔৎসুক্য ও আগ্রহ আছে সে সময় জেনেছিলাম। তাঁর অসুখের চিকিৎসা প্রসঙ্গে আধুনিক সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের অনেক সমস্যা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন হয়েছিল। ছেলের ব্যাপার নিয়ে কেন এতদিন তিনি আমার পরামর্শ নিতে আসেননি। জানতে চাইলাম। উত্তরে শুনলাম যে ছেলের শ্বশুরবাড়ী থেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তিনি বাতের অসুখে পঙ্গু আর্থিক সঙ্গতি কিছু নেই। ছেলেরও বোধ হয় ইচ্ছে ছিল না বাপের চেনাজানা চিকিৎসককে দিয়ে চিকিৎসা করায়। বাপের ওপর তার বিশেষ আস্থা নেই। কিন্তু এখন সে শ্বশুরবাড়ীর লোকদেরও আর বিশ্বাস করতে পারছে না। চিকিৎসক বন্ধুরা সেই আগ্রহ দেখিয়েছে তাই মণিবাবুকে অশক্ত দেহ নিয়েও আমার কাছে আসতে হয়েছে।

—ব্যাপারটা আরও বিশদভাবে জানা দরকার ছেলেকে পরীক্ষা করা দরকার তার সঙ্গে কথাবার্তারও প্রয়োজন আছে। রোগ কেন হয়েছে সারবে কি না—এ সব প্রশ্নের উত্তর তার পর হয়তো দিতে পারব। আরো সব জানার পরও অনেক সময় আমরা রোগের সঠিক কারণ ধরতে পারি না সারবে কিনা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না। আমাদের শাস্ত্র মানে মস্তিষ্কবিজ্ঞান এখনও অপরিণত।

মণিবাবুর মুখে সত্য সম্পর্কে অনেক কিছু শুনলাম। তার সংক্ষিপ্ত সার পাঠকদের কাছে পরিবেশন করছি।

সত্য স্কুল ফাইনালে ভাল রেজাল্ট করে বৃত্তি পেয়ে কলেজে ভর্তি হবার সময়ই মণিবাবু মামলামোকর্দমায় জড়িয়ে পড়লেন। নিজের ঝঞ্ঝাট সামলাতে তিনি এ-সময় খুবই ব্যস্ত থাকার দরুণ ছেলের পড়াশুনোর ব্যাপারে কোনো নজর দিতে পারেননি। দারুণ অভাব অনটনের চাপে পড়ে সত্যকে সকাল সন্ধ্যায় ছেলে পড়ানোর কাজ নিতে হয় এতে তার নিজের পড়াশুনোর ক্ষতি হতে থাকে। যে রকম রেজাল্ট আশা করেছিল না হওয়াতে খুব মুসড়ে পড়ে। ওর ইচ্ছে ছিল ইঞ্জিনিয়ার হবে। প্রথম বিভাগে পাশ করলেও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হবার কোনো চেষ্টা করল না। এঞ্জিনিয়ারিং পড়ার খরচ চালাবার ক্ষমতা ওদের নেই ও বুঝতে পেরেছিল। এই সময় ও নাকি সারাদিন ঘরে বসে থাকত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা করত না। বিজ্ঞানে ওর আসক্তি ছিল কিন্তু বিজ্ঞানের লাইন ছেড়ে কমার্স ক্লাস ভর্তি হল। বাপের সঙ্গে এ-নিয়ে বেশ কিছু বচসা ও মনোমালিন্য ঘটে। তবে সে সময় মণিবাবু নিজের মানপ্রতিপত্তি রাখার সংগ্রামে এত ব্যস্ত যে ছেলের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় পেলেন না। অনেক কষ্টে মামলার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সত্য তখন কমার্স গ্রাজুয়েট হয়েছে ফলও বেশ ভাল করেছে। ওদের আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয় তাই বাধ্য হয়ে সত্যকে চাকরী নিতে হল এবং বাপের চিকিৎসার খরচ চালানোর জন্যে মায়ের অনুরোধে বেশ মোটা টাকা পণ নিয়ে বিয়ে করতে হল। এই বিয়েতে ওর একেবারেই মত ছিল না। বিয়ের পর শ্বশুর মশাই ওকে চাকরী ছেড়ে এক বড় অডিটারের ফার্মে শিক্ষানবীশ হতে বললেন। টাকা পয়সার সব দায়িত্ব তিনি নিতে চাইলেন। মণিবাবুর তখন মতামত দেবার মত অবস্থা নয় তিনি ছেলেকে তার ইচ্ছামত চলার নির্দেশ দিলেন। সত্য শ্বশুরের প্রস্তাবে সাড়া ছিল না। স্ত্রীর সঙ্গে ও শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে এর পর ওর সম্পর্ক বেশ তিক্ত হয়ে উঠল। ওর স্ত্রী তার ইচ্ছেমত চলাফেরা করত যখন খুশী বাপের

বাড়ী চলে যেত, যখন খুশী আসত। শ্বশুর-শাশুড়ীকে শুনিয়ে শুনিয়েই স্বামীকে তার দুর্বুদ্ধি ও অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তিরস্কার করত। এ-সব কথার জবাব দিত না সত্য। জেদী ও একগুঁয়ে হলেও সত্য খুবই ঠাণ্ডা মেজাজের ছেলে। মণিবাবুর সঙ্গে সেই কমার্স পড়বার ব্যাপার নিয়ে একবার সা-কিছু বাদানুবাদ করেছিল। এই রকমভাবে বছর পাঁচেক চলল। মণিবাবু সুস্থ হয়েছেন সত্যও চাকরী ও টিউশনী করে আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটিয়েছে। আগের মত অভাব অশান্তি আর নিত্য সঙ্গী নয়। এমনি সময় একরাতে স্ত্রীর সঙ্গে প্রচণ্ড বচসা করতে শোনা গেল সত্যকে। মা-বাবার ঘুম ভেঙে গেল। এত উত্তেজিত কণ্ঠে সত্যকে কোনোদিন ওঁরা কথা বলতে শোনেননি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দরজা খুলে সত্য বেরিয়ে এল। কলঘরে গিয়ে মাথায় জল ঢালতে লাগল। ঘরের মধ্যে ওর স্ত্রীর অস্ফুট কান্নার শব্দ শুনলেন মণি-বাবু। তার পর দিনই সত্য অসুস্থ হয়ে পড়ল।

বিষাদ-রোগের এই সূত্রপাতের বিবরণ শোনার পরদিন সন্ধ্যায় সত্যকে আর তার স্ত্রীকে নিয়ে মণিবাবু আমার কাছে আসেন।

সত্যশরণের স্ত্রীর সঙ্গে সামান্য কথা-বার্তা বলেই বুঝলাম মেয়েটি অসহিষ্ণু প্রকৃতির ও অহংকারী। সেই রাতের ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে বলল: ও সেদিন আমার গায়ে হাত তুলেছিল। ওর বুদ্ধি-শুদ্ধি কম কিন্তু ও-যে এরকম অসভ্যের মত ব্যবহার করতে পারে—তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। পরের দিন ও যদি অসুস্থ হয়ে না পড়ত তবে আমি ওদের বাড়ীতে কিছুতেই থাকতাম না। শ্বশুরমশাইকে আমি দোষ দিই না। তিনি ইচ্ছে করে নিজের সর্বনাশ করেননি। ও-কিন্তু ইচ্ছে করেই নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। বাবা ওকে কতরকম-ভাবে সাহায্য করতে চেয়েছেন ও সাহায্য নেবে না। ওর ধারণা আমার বাবার সাহায্যে কৌশলে গড়ল আমার কাছে ও ছোট হয়ে যাবে। কি বোকার মত কথা বলুন তো? সেই রাতে কি হয়েছিল? হাঁ মনে আছে। আমি সেদিন খবর পাই যে অফিসের একটা ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষায় ও ফেল করেছে। এই পরীক্ষার কথা আমাকে জানায়নি ও মা বাপকেও বলেনি অফিস সুপার আমার দাদার বন্ধু তাঁর কাছ থেকে আমরা খবরটা পাই। না বড়া কথা কিছু বলিনি। শুধু বলেছিলাম যে নিজের বিদ্যাবুদ্ধিতে ওপরে ওঠবার ক্ষমতা যার নেই তার আবার এত অহংকার কিসের? এতেই ও একেবারে ক্ষেপে গেল। রেগে উন্মূর্তি ধরল। এর আগে ওকে এত রাগতে কখনো দেখিনি। আমার বাবা ওর উপকার করতেই চেয়েছিলেন; তাঁর সম্পর্কে যা-তা বলতে ওর একটুও আটকাল না। আমার বাবা নাকি 'ব্ল্যাক' করে পয়সা করেন, হিসেবের-কাবচুপি আছে নাকি তাঁর ব্যবসায়। আমি ছেড়ে কথা কইবার পাত্র নই। তাঁর না'মতো এ-পর্যন্ত কোনো জালজুয়াচুরির মামলা হয়নি—হ্যাঁ এই কথা আমি বলে-ছিলাম। এ-তো সত্যি কথা। একশোবার বলব। এই শুনে পাগলের মত আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলতে ও বোধ হয় শেয়াল ফিরে পেল। দরোজা খুলে বাইরে চলে গেল। তার পর সারারাত বোধ হয় ঘুমোয়নি। সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি ওর চেহারা একেবারে অন্য-রকম হয়ে গেছে। ও-আমার দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে; বিড় বিড় করে বলছে—আমারই দোষ আমিই অন্যায় করেছি আমার অহংকারের জন্যেই তুমি কষ্ট পাচ্ছ। প্রথমটায় ভাবলাম বুঝি নিজের ভুল বুঝতে পেরে এতদিন পরে সত্যিই ওর অনুশোচনা হয়েছে। কিন্তু চোখমুখের অবস্থা দেখে আমার ভয় হল; আমি তাড়া-তাড়ি গিয়ে ওর মাকে ডেকে আনলাম।

সত্যশরণের স্ত্রী আরো জানাল যে অসুখের সময় যে স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ীর অনুগত থাকে, তারা যা বলে সব শোনে ভবিষ্যতে তাদের ব্যবস্থা মত চলবে বলে কথা দ্যায়। কিন্তু সেই ভাল হয়ে অফিসে যেতে থাকে তখনই আবার অন্য মূর্তি ধারণ করে। সেই আগেকার স্বভাব ফিরে আসে। সেই পুরণো সংকল্প ওর হারভাবে প্রকাশ পায়। পরে তো নিজের চেষ্টায় বড় হবে। অন্যের সাহায্য নেবে না।

এবার সত্যশরণের কথা।

বিষাদকিষ্ট রোগীদের বেশির ভাগের চোখে মুখে যে-বিষণ্ণতার ছাপ থাকে সত্য-শরণের মধ্যে তার অভাব দেখে একটু আশ্চর্য হলাম। ভাবলাম হয়তো বিষাদ পর্ব শেষ হয়ে আসছে। কথাবার্তার মধ্যেও অতি-পরিচিত বিষণ্ণতার সুরের অভাব আছে—মনে হল। ছেলেটি সোজাসুজি বলল: আমার অফিস যেতে ভাল লাগে না কাজ করতে ভাল লাগে না। এক জায়গায় অনেক-ক্ষণ বসে থাকতে ইচ্ছে করে না। কাশ লেজার পোস্টিং—খুব একঘেয়ে লাগে। বলবেন কাজ করাতো দরকার। না হলে বাঁচব কি করে? ঠিক। সেই জন্য বারবার ডাক্তারের কাছে যাই। কর্তব্য হিসেবে যাই নিজের ইচ্ছেয় যাই না। রোজ শুয়ে পড়ে মাথাটা যন্ত্রবিদের জিম্মায় ছেড়ে দিই। মগজের বিদ্যুৎ চলাচল ব্যবস্থার ঘাটতি কিম্বা বিশৃংখলা ঘটেছে। কোষগুলো অসাড় হয়ে পড়েছে। তাঁরা বাইরে থেকে এনার্জি চালান দেন, ধাক্কা দিয়ে কোষগুলোকে চালু করে আমাকে অফিসে পাঠান। দৈনন্দিন রুটিন-বাঁধা পথে যাই। আবার সেই ক্যাশ-

গলাব্যথা-
কাশি থেকে
নিমেষে আরাম...
ভোকাসিল
চারকোনা,
সবুজ
কাশির বড়ি
VOCACIL COUGH DROPS
VOCACIL
VOCACIL
VOCACIL

লেজার-পোর্টিং-রিপোর্ট। আবার সেই মাস কাবারে মাইনে নিয়ে বাড়ী ফেরা। বছরে বছরে এমনি ধারা মেরে মগজটাকে চালু রাখতেই হবে। নইলে জন্মদাতা পিতা ও গর্ভধারিণী মাতা উপোষী থাকবেন। এঁদের প্রতি আমার কর্তব্য, আমার দায়িত্ব আমি অস্বীকার করতে পারি না!

এই ধরণের কথা 'ডিপ্রেশনের' রোগীদের মনে থাকলেও তাঁদের প্রকাশ করতে কম শোনা যায়। তাছাড়া ছেলেটির কথার মধ্যে যেন শ্লেষের ছোঁয়া ছিল। কথা বলার ভঙ্গী ও 'ডিপ্রেশনের' রোগীর মত নয়। ভাষা সাধারণত 'হাঁ-না'—এই ধরণের এক অক্ষরের শব্দ দিয়েই কথা সারতে চায়।

—তুমি তো তোমার কাজ নিজে পছন্দ করে বেছে নিয়েছ। তোমার বাবা জানতেন তুমি বিজ্ঞান পছন্দ কর তিনি তো তোমাকে সেই লাইনেই যেতে বলেছিলেন।

—আমরা অনেক সময় যেটা চাইনে সেইটেই পছন্দ করি, স্লোইনে যেতে অনিচ্ছুক সেই লাইনেই চলি। আমাদের ইচ্ছে-অনিচ্ছে পছন্দ-অপছন্দের দাম কতটুকু? মনে হয়—অনেক পথই খোলা কিন্তু চলতে গেলে দেখা যায় একটি মাত্র পথ আছে। অন্য পথে কাটা। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছে বলে কিছু নেই।

—অন্য লাইনে গেলে তোমার হয়তো কাজ ভাল লাগত, কাজে মন বসত, এই রকম ধারণা দিয়ে, ঠেলেঠুলে তোমাকে চলতে পথে ত হত না।

—এখন সে কথা ভেবে কোনো লাভ আছে কি? আপনার যদি চালু রাখবার নতুন কোনো জাদু জানা থাকে দয়া করে আমাকে সেটা জানিয়ে দিন। আমি আমার বিষণ্ণতা দূর করতে চাই না, কোনো রকম চালু থাকতে চাই।

—বিষণ্ণতা দূর করতে চাও না? জীবনের কোনো কিছুই তোমার ভাল লাগে না?

—না! খুব নিরেট বুদ্ধির লোক ছাড়া আর কারুরই এই জীবনটাকে ভাল লাগে না। নিজের ইচ্ছেয় এ জীবন আমি পাইনি, জীবনের অর্থ বা উদ্দেশ্য কিছুই আমার জানা নেই, জীবনে ভাল লাগার মত কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। শুধু আমার নয়, সবার জীবনই একরকম একই ছাঁদে একই ছকে বাঁধা। আমি জীবন যুদ্ধে হেরে গিয়ে এসব কথা বলছি না। যুদ্ধে আমি কোনোদিন নামিনি করবও না। বাবা জখম হয়েছে তারাও খুব সুখী হয়েছে বলে মনে হয় না। বাঁচাটা তাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে তাই বেঁচে আছে। তারা হয়তো হাসে, তারা হয়তো গান গায়, তারা হয়তো নিজেদের প্রশস্তি শুনতে চায়, কিন্তু তাদেরও জীবনটাকে ভাল লাগে বলে আমার মনে হয় না। আমি বাহবা চাই না, প্রশংসা চাই না, আনন্দ চাই না শুধু কর্তব্য করতে চাই। আমাকে চালু করার কোনো মন্ত্র জানা থাকে তো বলুন। আমি বিদ্যুৎ-বল্লের ধাক্কা খেতে খেতে অনেক বছর চললাম আর এ-ভাবে চলতে চাই না। দেখি আমার অন্যভাবে চালু থাকার ইচ্ছে সফল হয় কিনা।... মানুষের মনে যদি কোনোদিন সুবুদ্ধির উদয় হয় সেদিন সে এই অর্থহীন চলার রেস নিজেরাই সমবেত চেষ্টায় থামিয়ে দেবে। সেই সংকল্প যে-দিন মানুষ গ্রহণ করবে, সেদিন সে বুঝতে পারবে জীবনের সব থেকে বরণীয় ও কাম্য দেবতা হচ্ছেন বিষণ্ণতার দেবতা। তিনি সুন্দর, তিনি মধুর।

—তোমার এ-সব কথা মরবিড জীবন-বিদ্বেষী, এ্যান্টি-লাইফ; তুমি সুস্থ হলে, আর এ-সব চিন্তা তোমার মনে আসবে না।

—তাই তো আপনারা যে সুস্থতার কথা বলেন সে সুস্থতা আমি চাই না। আমি শুধু চালু থাকতে চাই কর্তব্য করতে চাই।

পরের দিন মণিবাবু সাগ্রহ প্রশ্নের জবাবে বললাম: আপনার পুত্রের প্রায় নাটকীয় সংলাপ শুনে বুঝলাম আপনারা ওষুধপত্র ওর হেফাজতে রেখেছেন। কোনো অতি-উৎসুক ওষুধ খেয়ে আমাকে অনেক বড় বড় কথা শুনিয়েছে। ওষুধ ওর যার কাছে রাখবেন, সময়মত যেন ওকে দেওয়া হয়। আর বুঝলাম আপনার ছেলে আধুনিক নাটক নভেল পড়েছে অনেক, বোধহয় কিছু দর্শনের মনস্তত্ত্বের কেতাবও পড়বার চেষ্টা করেছে। কিন্তু হয় হজম করতে পারেনি, কিম্বা ওর আজন্ম সংস্কারের বর্ম ভেদ করে কেতাবের বুলিগুলো ওর মর্মস্পর্শ করতে পারেনি। আপনার অসুখের সঙ্গে ওর অসুখের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। 'ডিপ্রেসনই' বলুন, তবে মাত্রা আপনার চেয়ে অনেক বেশি। কারণ প্রায় একই। আপনি সরল গ্রামীন ধ্যানধারণা নিয়ে, আদর্শ-অনুপ্রাণিত হয়ে নাগরিক প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরাজিত হয়ে, আঘাত পেয়ে ভেঙে পড়েছিলেন। আপনার পুত্র আপনার সংগ্রাম ও পরাজয়ের সাক্ষী। আবার আপনার পরাজয় তার জীবনকে প্রভাবিত করেছে। আপনার মত লড়াই করে ক্ষতবিক্ষত না হয়ে, আগে থেকে পরাজয় স্বীকার করে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছে। কিন্তু পারেনি। আপনি গীতা পড়েন, পুনর্জন্মের সুকৃতির ফলাফল মানেন, প্রাক্তন, দৈব, ঈশ্বর ইত্যাদিতে বিশ্বাস আপনার অহংকে অনেকখানি স্তিমিত করে রেখেছে। সত্যশরণের বেলায় সেটা ঘটেনি। সে শৈশব থেকে নাগরিক। নাগরিক-দর্শন, নাগরিক মূল্যবোধ, নাগরিক জীবনের সবকিছু আপনার চেয়ে তার জীবনকে প্রভাবিত করেছে অনেক বেশি। সে দৈবশক্তি, ঈশ্বরের করুণা, গতজন্মের কর্মফল বা ভাগ্যের দোহাই পেড়ে নিজের অসাফল্যের ব্যথাকে দূর করতে পারেনি। এই যুগের নাগরিক 'অহং' বোধ তার মধ্যে তীব্র। কিন্তু এই সভ্যতার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে সে অক্ষম। কাজেই তার দায়িত্ব, কর্তব্য, সাফল্যে অসাফল্য—সবকিছুকে নিজস্ব বলে মনে করেছে, নিজেকে হীন, অক্ষম, অপদার্থ মনে হচ্ছে, আর তারই ফলে বাস্তবজীবনের সব কিছু এড়িয়ে মাঝে মাঝে পালাতে চাইছে। তখনই তার মধ্যে 'ডিপ্রেশনের' উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। যদি সে অনেকের স্বার্থের নিজের স্বার্থ এক করে দেখতে অভ্যস্ত হত, অথবা সমষ্টি ও ব্যষ্টির সম্পর্ক ঠিক মত অনুধাবন করতে পারত, তাহলে বোধহয় এই 'পিরিয়ডিক ডিপ্রেশনে' ভুগত না। এ-অসুখ আজকের নাগরিক জীবনের এক প্রধান অভিশাপ। এখানে প্রত্যেকে আমরা একা, একান্ত একা।

—সারবে না? ও কি কোনো দিন আর আনন্দ খুঁজে পাবে না, সুস্থ হবে না?

—পুরো আশা এখুনি আপনাকে দিতে না পারলেও, একেবারে হতাশ হবার কোনো কারণ দেখছি না। তবে ওর স্থানীয় চিকিৎসা দরকার। ওকে কিছুটা অন্যত্র বদলাতে না পারলে, সত্যশরণের জীবনের প্রতি আকর্ষণ ফিরিয়ে আনা কঠিন হবে।

শ্রীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

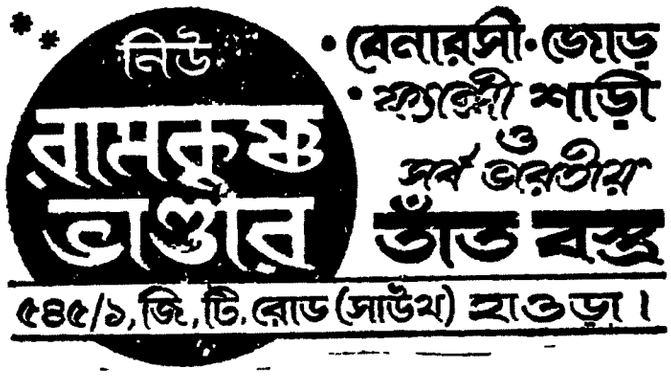

এ সম্মানে জাতির সম্মান

ম্যাগসেসে পুরস্কার পাবার পর বহুরূপীর অফিসে

শম্ভু মিত্র

শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্রকে ম্যাগসেসে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, এতে বাঙালি তো বটেই সারা ভারতের সমস্ত সংস্কৃতি-অনুরাগী মানুষই আনন্দিত হবেন।

অবশ্য শ্রীযুক্ত মিত্র তাঁর স্বদেশে বহু আগেই পুরস্কৃত হয়েছেন অনেকবার। তিনি সঙ্গীত নাটক আকাদমীর ফেলো, ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছেন ১৯৭০ সালেই। আর প্রায় চার দশক ধরে সারা বাংলার অগণিত দর্শক-শ্রোতার প্রীতি ও শ্রদ্ধা পেয়েছেন তিনি প্রতিটি নাট্য প্রযোজনাতেই।

কথায় আছে, প্রতিভা যাকে স্পর্শ করে তাকেই সার্থক করে তোলে। শম্ভু মিত্রের বেলাতেও সেই একই ইতিহাস। 'নবান্ন' নাটকের এই যুগ্ম-পরিচালক তাঁর প্রথম আবির্ভাবেই নতুন নাট্য ভাবনার পরিচয় দিয়ে নবপ্রেরণার প্রাণস্পন্দন জাগিয়েছিলেন সেদিনকার সেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অবসন্ন জাতির মনে। সে এক নতুন অভিজ্ঞতা। রূঢ় বাস্তবকে যে এত শিল্পিত সুষমায় উত্তীর্ণ করা যায়, 'নবান্নের আগে তা ভাবাই যায় নি।

এর পরে ১৯৪৮ সালে শম্ভু মিত্র যখন বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠী গড়ে তার ভিতর দিয়ে কাজ শুরু করলেন, তখন তো প্রতিটি পরিচালনাই আমাদের বিস্মিত করেছে বারবার। 'দুঃখীর ইমান' 'ছেঁড়াতার' দিয়ে যার শুরু, 'রক্তকরবী' 'পুতুল খেলা' রাজা ওয়াদিপাউস' পর্যন্ত পথপরিক্রমা করে সেই প্রতিভা যেন একাই একটি যুগের কর্তব্য উদযাপন করলেন। বলা বাহুল্য, এই কর্তব্যের একটি হল—রবীন্দ্রনাথ যে একালের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় নাট্যকার, এ চেতনা জাগানো। আমাদের দেখিয়ে দেওয়া যে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্য এবং এ যুগের গভীর সংকটকে মূর্ত করে তুলেছেন তাঁর নাটকে। শম্ভু মিত্রের প্রযোজনাগুণে, পরিচালনার নতুনত্বে এবং অভিনয়ের অদৃষ্টপূর্ব সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় 'রক্তকরবী' তো বটেই, চার অধ্যায়ও অবিস্মরণীয়। এবং চার অধ্যায়ের বেলায় তাঁর নাট্যভাবনা আরও সুস্পষ্ট এই কারণে যে বইটি নাটক নয়, নভেলেট—তাকে নাটকের চেহারা দিয়েছেন শম্ভু মিত্র নিজে।

তারপর ভারতের গন্ডি ছাড়িয়ে তিনি আমাদের দৃষ্টিকে নিয়ে গেলেন ইউরোপীয় নাট্য চিন্তার দিকে। তিনি ইবসেনকে উপহার দিলেন বাঙালি নাট্যচেতনার জগতে। এল 'পুতুল খেলা,' 'দশচক্র'। প্রত্যেকটি নাটক মূলের অনুরূপ, কিন্তু এদেশের দর্শকদের কখনো মনে হয়নি, এমন নাটক তাঁরা দেখছেন যা তাঁদের কাছে অভিজ্ঞতার বাইরে, কিম্বা তাঁদের কাছে তার কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই।

শম্ভু মিত্রের আরেক আশ্চর্য সৃষ্টি রাজা ওয়াদিপাউস। প্রাচীন গ্রীসের এই নাটক এখন ইউরোপের কোনো দেশেই কবার অভিনীত হয় সন্দেহের বিষয়, কিন্তু শম্ভু মিত্রের অপরিসীম কৃতিত্ব এই যে, বাঙালি দর্শক-শ্রোতা মাসের পর মাস এ নাটক পরম মুগ্ধতার সঙ্গে দেখে যাচ্ছেন। যেন একেবারে নিজের দেশের নাটকই। কী করে সম্ভব হল এই মিরাকেল তা বিশ্লেষণ করতে যাওয়া মানে শম্ভু মিত্রের নাট্য প্রতিভাকেই ব্যাখ্যা করা—এবং সেটা দুঃসাধ্য।

সেজন্যে অবাক বিস্ময়ে মেনে নিতে হয় তাঁকে, এবং ভাবতে হয়— শম্ভু মিত্র প্রায় একক চেষ্টায় দীর্ঘদিনের অসীম কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের ভিতর দিয়ে এতদিন ধরে যা আমাদের সামনে এনে দিলেন আমরা সে সম্পদকে কী করে সফল করব নতুনতর প্রতিভার ক্ষেত্র তৈরি করে?

শ্রীমিত্র এই জন্যেই চেয়েছেন জাতীয় নাট্যমঞ্চ—যেখানে কেবল নাটক নয় সমস্ত শিল্পকলা ও সংস্কৃতি চর্চার জন্যেই দরজা থাকবে উন্মুক্ত। কেননা, এইভাবেই মিটতে পারে আজকের এই গণতান্ত্রিক যুগের সাংস্কৃতিক প্রয়োজন।

যদি আমরা এধরণের একটি নাটমঞ্চ তৈরি করতে পারি, তবে সেটাই হবে শম্ভু মিত্রের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায়।

ঘ

গীতা দত্ত

মৃণাল দত্ত

উনিশ শো একষট্টি সালে যে বই বের করেছিলাম বারো টাকায়, উনিশশো ছিয়াত্তরে এসে তার দাম পড়ে যাচ্ছে প্রায় পঁচিশ টাকা, মানে ডবল। ফলে বইয়ের দাম বাড়াতে হচ্ছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে কমছে পাঠক। এই প্রতিকূল অবস্থায় থেকে সবার মতো আমরা লড়ছি। কিন্তু ক্ষমতাবানদের সঙ্গে লড়াই চলে না এক্ষেত্রে আমরা বলি—মন কষাকষি তো থাকতেই পারে, কিন্তু আমরা সুস্থভাবে পরস্পর কাঁধ মিলিয়ে চলবো না কেন? কেন আশা করবো না সামান্যতম সততা?

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী

আমেরিকা থেকে জরুরী টেলিগ্রাম এলো। এক সপ্তাহের মধ্যে চলে আসুন। তারিখটা বোধ হয় ছিল উনিশশো আটাত্তোর ১৫ জুলাই। মনোরঞ্জন দত্ত চলে গেলেন। ১৬ জুলাই দোকানের ঝাঁপ খুললেন ছোট ভাই মৃণাল দত্ত। তারপর প্রকাশনীর রাস্তা বদল হয়েছে ঠিকানা বদলেছে। বাড়তে বাড়তে এখন অফিস হয়েছে প্রেস হয়েছে। সেই ঝাঁপ একদিনের জন্যে বন্ধ হয়নি।

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একজন লড়াকু তরুণের সংগ্রামের ইতিহাস। একটা চারাগাছের ফুলে পাতায় শাখায় বেড়ে ওঠার গল্প।

দাদা মনোরঞ্জন দত্ত অধ্যাপক মানুষ ছিলেন, পড়াশুনো অর্থনীতি আর বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সকাল দুপুর বিকেল কাটতো। কিন্তু বিকেলের পরে? কি করা যায় কি করা যায়, ভেবে দুই বন্ধু মিলে হ্যারিসন রোড মানে এখনকার মহাত্মা গান্ধী রোডে একটা বইয়ের দোকান-কাম-প্রকাশনী খুললেন, উদ্দেশ্যটা হোলো একটা পার্ট টাইমেও কিছু হোলো আবার আড্ডাটাকেও রক্ষা করা গেল, মানে একটা ছাত হোলো। টুকটাক বেশ চলছিলো। প্রায় ২০।২৫টা বই বেরুলো। আর লেখক-লিস্টও ফেলনা নয়, মানে তখনকার দাপুটে-অলা—ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, অন্নদা দত্ত, ডঃ অতীন্দ্রনাথ বসু তো ছিলেনই সঙ্গে সঙ্গে সেই সময়কার হিট লেখক মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, অন্নপূর্ণা গোস্বামী, দীপেন সান্যালের বইও ছিলো। তার সঙ্গে ছিল কয়েকখানা স্কুলের বই। তখন মনোরঞ্জনবাবুর অর্থনীতির বই বেরুচ্ছে বিদেশী প্রকাশন থেকে। ১৯৫৭ সালে পার্টনারশিপ থেকে মনোরঞ্জনবাবুর হাতে দোকান এলো।

এবং তারপরে এলো—টেলিগ্রাম।

মৃণালবাবু তখন ছাত্র। এ লাইনে আসা মানে প্রায় অন্ধকারে হাতড়ানো। মৃণালবাবু নিজে না লিখলেও শিশু সাহিত্যের ওপর একটা দুর্বলতা ছিল। তখন শিশু সাহিত্যের পত্রিকা বলতে ছিল শুকতারা আর শিশু-সাথী বা মৌচাক। মৃণালবাবু ঠিক করলেন প্রকাশনী চালাবার সঙ্গে সঙ্গে একটা ছোটদের পত্রিকা বের করলে কেমন হয়? পত্রিকা যদি করতেই হয় তবে তেমনিভাবে বের করতে হবে ভেবে প্রথমেই গেলেন সত্যজিৎ রায়ের কাছে। গিয়ে বললেন—আমরা যদি 'সন্দেশ' নামে একটা ছোটদের কাগজ করি আপনার কি আপত্তি আছে? সব শুনেটুনে সত্যজিৎবাবু বললেন— 'সন্দেশ' নামে যদি আপনারা কাগজ বের করেন, তাহলে আপত্তি নেই বটে, কিন্তু আপনারা কি 'সন্দেশে'র লেখকগোষ্ঠী উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায়, রবীন্দ্রনাথ এঁদের পাবেন?

মৃণালবাবু সঙ্গে সঙ্গে চৌখশ উদ্ভব দিলেন—ডাব যখন ঝুনো হয় তখন তাকে ডাব বলে না, তার তো একটা নতুন নাম হয়। শেষ পর্যন্ত 'রোশনাই' নাম দিয়ে প্রথম পুজো বার্ষিক বেরোয় ১৯৫৯-এ। ১১ মাস সম্পাদক ছিলেন তৎকালীন লোকসেবকের সবুজসাথী—রমেন দাস। পরবর্তীকালে সম্পাদনার দায়িত্ব নেন—গীতা দাশ।

সঙ্গে সঙ্গে 'এশিয়া' থেকে পাশাপাশি বেরুতে থাকলো— প্রেমেন্দ্র, নারায়ণ

সাহিত্যের নেপথ্যে

গাংগুলীর বইয়ের সংগে রকমারি বই—যেমন : শিবরাম চক্রবর্তীর 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' থেকে সব সেরা গল্প, লীলা মজুমদারের মণিমালা, নাকুগামা; অজিতকৃষ্ণ বসুর 'ম্যাজিকের গল্প' মনোজিৎ বসুর ইটুপাটুর কাহিনী, ছড়ায় ছড়ায় ছন্দ, বন থেকে শহরে; রাখাল ভট্টাচার্যের খেলাধুলোর গল্প, এম্নি সব কত কি। সংগে সংগে শৈলশেখর মিত্রের সম্পাদনায় বেরুলো 'ছবি ছড়ার দেশে' বাইকালারে ছাপা বোর্ড বাঁধাইয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে আজকের ছড়াকারদের এক অনবদ্য সংকলন।

আস্তে আস্তে গীতা দাশ, দত্ত হয়েছেন। সহকর্মি থেকে সহধর্মিনী হয়ে নিয়মিত-ভাবে দোকান প্রেস অফিস করেন সংগে সংগে গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন—ছোটদের ভৌতিক গল্প; আজগুবি গল্প; রূপকথা ও ভূতুড়ে। এখন হয়তো শরীর সংসারের জন্যে বোজ আসা হয়ে ওঠে না। তবু ঘরে থেকেই নানা কাজ করেন প্রকাশনীর।

প্রকাশনী একবার চললে যে গড়গড়িয়ে চলবে, এর কোনো মানে নেই। একবার বাইন্ডিংখানা পুড়ে গেল, একবার চুরি হয়ে গেল, তারপর ১৯৬৯এর সেই রাজনৈতিক আতঙ্ক তো ছিলই, ফলে ছাপোষা প্রকাশনী খানিকটা চুপ করে থাকলেও থেমে থাকেনি, বই বেরিয়েছে। ১৯৭৩এ এসে এশিয়া পরিকল্পনা নিল উপেন্দ্রকিশোর রচনাবলী প্রকাশ করবে।

—কেন? হঠাৎ রচনাবলী প্রকাশ করতে গেলেন কেন?

: না করে উপায় ছিল না।—তাহলে ব্যাপারটা আপনাকে একটু গুছিয়ে বলি।—দেখুন, বাংলা প্রকাশনী চলছে গুটিকয়েক হোলসেলার আর ডিস্ট্রিবিউটারের সহ-যোগিতায়। কিন্তু ক্রমশঃ দেখা যাচ্ছে তারা একের পর এক নিজেদের প্রকাশন সংস্থা খুলে চলেছেন। নিজেরা নামীদামী বই বের করে চলেছেন, এবং যেহেতু তাঁদের হাতে যন্ত্রের, সুতরাং এটাই স্বাভাবিক তাঁরা নিজেদের বই আগে পুশ করবেন। এক্ষেত্রে ঠিক করলাম, আমরা সরাসরি পাঠকদের সংগে যোগাযোগ করবো। যে কমিশন বুক-সেলারদের দিই, সে সুযোগটা সরাসরি পাঠকরা পেলে ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা লাভবান হবেন, তাই না?

' বললুম—তাতো বটেই, কিন্তু এতে কি আপনারা খুব একটা লাভবান হয়েছেন?

—কেন না? প্রথম পর্যায়ে উপেন্দ্র-কিশোর রচনাবলী আমাদের যথেষ্ট গুড-উইলের সংগে বিজনেস দিয়েছে। তাছাড়া রচনাবলীর একটা সুবিধে আছে যে সবসময় রয়ালটি দিতে হয় না। এবং আসলে যেটা আমাদের লক্ষ্য ছিল পাঠকের সংগে সরাসরি যোগাযোগ করা, সেক্ষেত্রে আমরা আংশিক নয়, পুরোপুরি সফল হয়েছি। এবং আমাদের পরবর্তী কাজে উৎসাহ যুগিয়েছে। আমরা

শারদীয় অমৃত ১৩৮৩

সম্পাদক : শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

অমৃতের শারদীয় সংখ্যা বেরোবে এবার মহালয়ার অনেক আগে। সংখ্যাটি এমনভাবে তৈরি করা হচ্ছে যাতে সহজেই পাঠকদের খুশি করতে পারে।

উপন্যাস থাকছে পাঁচখানি এবং লেখকরা বেশির ভাগই 'বেস্ট সেলার'। প্রতিভাবান নতুন লেখকদেরও অবশ্য স্থান দেওয়া হয়েছে সেই সংগে।

গল্পের বেলাতেও ঠিক এইরকমই। প্রবীণ লেখকদের সংগে এবার গল্প লিখছেন এমন কজন লেখক, যাঁরা এর মধ্যেই রীতিমত নাম করেছেন—অথচ অমৃতের শারদীয় সংখ্যায় তাঁদের গল্প বেরোচ্ছে এইবারই প্রথম

৫টি উপন্যাস

এবারে লিখছেন

প্রেমেন্দ্র মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, নিমাই ভট্টাচার্য, চাণক্য সেন, আনন্দ বাগচী।

২০টি ছোট গল্প

লিখছেন

অন্নদাশংকর রায়, বনফুল, মনোজ বসু, প্রমথনাথ বিশী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, শওকত ওসমান সুমথনাথ ঘোষ, প্রফুল্ল রায়, বুদ্ধদেব গুহ, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, অদ্রীশ বর্ধন, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন রায়, তারাপদ রায়, দেবল দেববর্মা, সুধাংশু ঘোষ এবং শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক রচনা

অমিতাভ চৌধুরী

নির্বাচিত কবিতা ॥ প্রবন্ধ ॥
সুঅলংকৃত ॥ দাম আট টাকা ॥ অতিরিক্ত
ডাক মাশুল ১·৫০

আপনার কপির জন্য এজেন্টকে বলে রাখুন অথবা যোগাযোগ করুন আমাদের সংগে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-তিন

পরপর পরিকল্পনা নিয়েছি—সুকুমার রায় সমগ্র রচনাবলী; হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী থেকে হ্যান্স অ্যান্ডারসন; লুইস ক্যারল; গ্রিম ভাই; এডওয়ার্ড লিয়ার এবং শেষ-পর্যন্ত লীলা মজুমদারের রচনাবলী, যার প্রথম খন্ড ছাপা চলছে। আমরা এভাবেই ক্রমশঃ বিশ্ব শিশু-সাহিত্যের বরেণ্য সাহিত্যিকদের অমনিবাস প্রকাশ করবো। এ প্রসঙ্গে একটা দুঃখের কথা মনে আসছে—গ্রীমভাইদের সমগ্র রচনাবলীর অনুবাদ করেছেন কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। রচনাবলী ছাপা শেষ হোলো শনিবার। বর্ষাকাল একটু বেশী সময় হট-প্রেসারে বই রাখতে হয়। শনিবার দুতিনবার লেখকের দেওয়া লাইনে সুসংবাদটি জানাবার জন্যে ফোন করলাম। লাইন খারাপ, যোগাযোগ করা হোলো না। সোমবার, আমরা দুজনে বাইন্ডারের কাছ থেকে বই নিয়ে দিয়ে আসবো। সোমবার সকালে কাগজ খুলে পেলাম দুঃসংবাদ। গীতাই প্রথমে খবরটা দেখে। আমার বলতে বিশ্বাস হয়নি, কামাক্ষীবাবু নেই। অসম্ভব দুঃখ পেয়েছিলাম আমরা দুজন। আশ্চর্য! সেইদিনই কিন্তু বাজারে বইটা বেরুলো।

আচ্ছা মৃণালবাবু, আপনার বিক্রির ব্যাপারটা কিভাবে অর্গানাইজ করেন?

: আর দশটা প্রকাশক থেকে আমরা আলাদা নই, কারণ আলাদা হবার উপায় নেই। যেমন ধরুন ক্যাটলগিং। এটা প্রায় সবাই করেন। তারপর ধরুন, রিপ্রেজেন-টেটিভকে দিয়ে ক্যাম্পিং। এটাও অনেকেই করেন। তারপর বই বেরুবার আগে পরে বিভিন্ন দৈনিক সাপ্তাহিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন। এটাও উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। মোটা-মুটি-ভাবে পথটা এক। তারপর খানিকটা ভবিতব্য, এ বিষয় প্রকাশক মহলকে নিতেই হয়, এবং সবাই এটা মেনে নেনও।

—আপনাদের নতুন কোনো পরিকল্পনা আছে?

: পরিকল্পনা ছাড়া প্রকাশনী চলে কি করে।

—সবটাই কি শিশু সাহিত্যকে ঘিরে?

: না।

—তবে?

: আমরা এবার ভাবছি বড়দের বইয়ের কথা।

—কেন???

: কারণ ছোটদের বইয়ের বাজার সীমিত। এবং আমরা যারা অভিভাবক তাঁরা অত্যন্ত আশ্চর্যভাবে ছোটদের সম্পর্কে নিস্পৃহ। ধরুন কোন বাড়িতে দু-তিনটে সিনেমা পত্রিকা বা এমন ধরনের কোন হাল্কা বা গম্ভীর সাপ্তাহিক, মাসিক নিয়মিত রাখার সময় একটুও মনে হয় না, বাড়িতে বেশী সংখ্যায় আছে ঐ বাচ্চারা। তাদের জন্যে আমরা নিয়মিতভাবে বই কিনি না, মাঝে মাঝে দায়সারা গোছের একটা পত্রিকার গ্রাহক হওয়া ছাড়া। সুতরং এ বাজার ক্রমশঃই সঙ্কোচিত হয়ে আসছে স্বাভাবিকভাবেই। তাই শিশু সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভাবছি। ফিকশন এবং নন-ফিকশন বইয়ের কথা।

—যেমন...।

: যেমন ধরুন নামী দামী লেখকের উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে ভাবছি—রবীন্দ্র বীক্ষার কথা। দীর্ঘকাল পরে যার আবার নতুন মুদ্রণ বের হচ্ছে। বের করছি—রবীন্দ্র-নাথ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক সাহিত্যিক-দের দুটি ভিন্ন স্বাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রেমের গল্প সম্ভার—'পঞ্চশর' 'পরকীয়া'। এবং এরপর রবীন্দ্র ও উত্তরযুগের একটি অনন্য কবিতা সংগ্রহ—'প্রেম, ভালোবাসা' এছাড়া সেকাল থেকে হাল-আমলের বিভিন্ন স্বাদের হাসির গল্পের সংকলন—'রঙ্গব্যঙ্গ'। তা বলে ভাববেন না, আমরা বাচ্চাদের কাছ থেকে সরে আসছি। 'রোশনাইয়ের' পাশাপাশি আমরা একেবারে কচিদের জন্যে বের করে চলেছি 'ঝুমঝুমি'। এও সম্পাদনা করছেন গীতা দত্ত।

কেন? এবার আমার বিস্ময়।

গীতা দেবীই বললেন—তার কারণ বাচ্চারা তো সবাই এক বয়সী নয়, এদের মধ্যে অনেকেই আছে যাদের নতুন অক্ষর-জ্ঞান হয়েছে। অর্থাৎ যারা অ আ ক খ-র গন্ডী সবে পেরিয়েছে। তাদের জন্যেই আমরা বের করছি 'ঝুমঝুমি'। সব লেখাই যুক্তাক্ষর বর্জিত।

—কি রকম!! ঝুমঝুমি উল্টে দেখ-লুম—৮ বছরের শুকন্যা লিখছে—'ঝুমঝুমি গো ঝুমঝুমি বলছি আমি শোন, তোমায় পেলে আমি যে আর চাই না খেলা কোনো।'...

মৃণালবাবু, একটা কথা আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে—আচ্ছা, এখন যে কালি, টাইপ কাগজের দাম এত বেড়েছে। এতে আপনাদের কস্ট অফ-প্রোডাকশন উঠে যায়?

: উঠে যায়। তবে যেভাবে ওঠে—সেটা না ওঠারই সামিল। ধরুন না, এই 'রবীন্দ্র বীক্ষা'র কথা। ১৯৬১তে যখন এ বইটা বের করেছিলাম, তখন সর্বসাকুল্যে এর দাম পড়েছিলো—১২ টাকা। আজ ১৯৭৬ র শেষে এসে অনেক চেষ্টা করেও এর দাম ২৫ টাকার কমে নামাতে পারছি না। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে প্রায় ১০০ পার্সেন্ট বেড়ে গেছে। ছোট্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি—আগে আমাদের কর্মচারীদের টিফিন অ্যালাউন্স দিতাম ছ-আনা। এখন দিতে হচ্ছে এক টাকা। মোদ্দা কথা হোলো—এখন ফর্মাপ্রতি পড়ে যাচ্ছে ১ টাকা।

—আপনাদের কর্মচারীর সংখ্যা ক'জন হবে?

: বুকশপে ধরুন ৭ জন। আর প্রেসে ১৬ জন, এছাড়া পার্ট টাইমে, প্রোডাকশন, প্রুফ দেখার ব্যাপারে বেশ কিছু লোক জড়িয়ে আছেন।

—সরকার এ ব্যাপারে কোন সাহায্য করছেন না?

: নিশ্চয়ই করছেন, বে এ ব্যাপারে আমাদের বিশেষ কয়েকটি অসুবিধের সম্মু-খীন হতে হচ্ছে।

—কি রকম?

: যেমন ধরুন সরকার যে কাগজ দেন, তা অত্যন্ত সাধারণ কোয়ালিটির অন্ততঃ বাচ্চাদের বই সাধারণতঃ আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যে ছবিটবি দিয়ে রংচংগা করতে হয় এর জন্যে একটু দামী কাগজ ব্যবহার করতে হয়, তাছাড়া ধরুন কোটা অনুযায়ী কাগজ এলো, চাহিদার জন্যে হয়তো কোনো বই মূল লক্ষ্য থেকে হয়তো বেশী ছাপবার প্রয়োজন হোল কিংবা হয়তো কলেবর বৃদ্ধি হোল, এক্ষেত্রে দুরকম কাগজ হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া আরেকটা ব্যাপার হোলো— ধরুন, আমার কাগজ দরকার জানুয়ারীতে সে হিসেবেই হয়তো প্ল্যান প্রোগ্রাম এগুচ্ছে। কাগজ এলো—এপ্রিলে। এরকম অসুবিধের তো সম্মুখীন হতে হয়ই।

তাছাড়া আমরা ছোট প্রকাশক আমরা ক্ষমতাবানদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ে পেরে উঠি না। ইচ্ছে থাকলেও না। কারো নাম বলতে চাই না, তবু একটা কথা বলতে ইচ্ছে হয়—যেসব লেখকদের রচনাবলী ছাপতে কোনো কপিরাইট ল্যাগে না সে সাহিত্য পরিবেশনে যদি ব্যবসায়িক দিকটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদের দিকে চেয়ে যদি না দেখি তাহলে শুধু আমরা পাঠক-কেই বঞ্চিত করবো না অদূর ভবিষ্যতে হয়তো নিজেরাও বঞ্চিত হবো।

২০।২৫টা বই নিয়ে ছাত্র অবস্থায় যে তরুণটি অনিশ্চিত অবস্থায় থেকে ব্যবসায় নেমেছিল আজ সে জোগাচ্ছে ২০।২৫ জন বেকারের রুটি। এখনো সকাল থেকে রাত গড়িয়ে যায় কলেজ স্ট্রীট থেকে হেদুয়ার প্রেসে। বেঁচে থাকার ও বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রাম।

সংগ্রাম চলে বলেই আমাদের অস্তিত্ব আছে এ যেদিন থেমে যাবে, তখনই জীবনের হবে ব্রেকডাউন।

শাণ্ডিলা চক্রবর্তী

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম.বি, ডি.ভি ও
ডাঃ এস এন পাণ্ডে এম.বি.বি এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য-৮৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও বহুচিত্রে
চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী ৩৫ এ, কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩
আগাম ৮৲ টাকা পাঠাইলে ভি-পি-তে পাঠানো হয়

উপন্যাস

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আদ্য শেষ রজনী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পঞ্চমুখের সুজাতার জীবন বোলচাল এখানে আমরা পাচ্ছে নাম রেখেছি—সাধন। একখানা গান দিয়েছি তার মুখে। পাবলিক গান গায় খুব। তুমি আরো দুখানা বসিয়ে নাও না ভাই। তুমিই তো সাধনের বোল করবে। গানও সুন্দর গাও তুমি।

শংকরের ভালো লাগছিল না। সেই থেকে কানের কাছে ভ্যাজ ভ্যাজ করছে। শরীরটা ভারি হয়ে গেছে শংকরের। সিঁড়ি ভেঙে উঠতে গিয়ে হাঁফাচ্ছিল। মনে মনে ভাবতেও হাচ্ছিল, মাস গেলে পঞ্চমুখে পাই আটখানা একশো টাকার নোট। নীলকমলে মাস গেলে পাবো পনরখানা। তাছাড়া বোনাস পনর হাজার বছরে। এতো বিশ্বাসই হয় না তার। শেষে অতি লোভ করতে গিয়ে নীলকমল যদি ফেল পড়ে। তখন? আবার তো পথে দাঁড়াতে হবে তাহলে। দাদার কাছে কোন মুখে ফিরে যাবে?

কি ভাই?

ওপরে উঠে শংকর হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, দাঁড়ান। একটু বসি আগে। ব্রিফিংয়ে নিয়ে কথা বলছি।

ডাব খাবে?

আবার আনাতে হবে। থাক এখন।

না। মজুত থাকে। আমার জন্যে আনানো থাকে। অম্বলটা তো শরীর থেকে যায় নি।

ডাবের জল খেতে খেতে শংকরের মনে পড়লো, সে আর দাদা একদিন এই লোকটাকেই মদের দোকান থেকে তুলে এনেছিল। রঞ্জনী দিদির জন্যে। শশাঙ্কবাবু তখন তৃপ্তির সঙ্গে বসে ছিল। কী পাল্টেই না গেছে লোকটা এখন। চেনাই যায় না। দিদি কি এত সব জানে?

শংকরকে ভাগিয়ে আনার আনন্দে শশাঙ্ক এতক্ষণ যে তাকে নাম ধরে ডাকছে—সে খেয়ালই নেই। শংকর কোন আপত্তি করল না।

পার্টিশন দেওয়া বড় ঘর। ওপাশে মহলা চলছে। পাকা হল নেই বলে নীলকমল সাজপোশাক রেখেছে তিন তিনটে আলমারিতে। ফ্ল্যাড লাইটগুলো ঘরের [illegible] দিতে। পঞ্চমুখের পাবলিসিটির খানিকটা ভাগিয়ে নিয়ে এরা গাঁয়ে গাঁয়ে দু নম্বর সুজাতা করে বেড়ায়। আসলে নীলকমল যাত্রা সমাজের এই গদি শংকরের কাছে শত্রু-খপরী। খানিকটা লাগছিলও তাই।

আবার মনে পড়ছিল, অমিয় আর রজনীর শরীর খাপ খাওয়ায় সে আর নন্দনা সুজাতা করেছে। সে জীবন। নন্দনা সুজাতা। তখনো তো হাউস ফুল গেছে। সাড়ে দশ টাকার পঞ্চাশখানা করে একট্রা চেয়ার দিতে হয়েছে। তবে তার নাম কেন পাবলিসিটিতে একদম ছোট টাইপে? সে কেন বাসের ঝাঁকুনি খেতে খেতে সারা রাত ধরে দলের সঙ্গে লাভপুরে যাবে? সে কি আলাদা প্রাইভেট কারে আরামে যেতে পারত না? তার জন্যে কি আলাদা ঘরা, মুরগির মাংসের স্টু হতে পারত না? এসব কথা কে বলে! তারও তো বিশ্রাম দরকার ছিল।

কাল ভোরেই তোমার জন্যে গাড়ি যাবে বাড়িতে। আগে দর্জির ওখানে গিয়ে জামা কাপড়ের মাপ দেবে। গাড়িটা তোমার কাছেই রেখো ভাই। তেল ভরা থাকবে। ড্রাইভার থাকবে। তোমার দরকার মত ঘোরাঘুরি কোরো।

না। গাড়ি লাগবে না। দরজি পাঠিয়ে দেবেন বাড়িতে। কিন্তু আগেকার সাধনের জামাই তো রয়েছে। তিন সিনে তিনটে পাঞ্জাবি। দু সিনে পাজামা দুটো। আর বেডরুম সিনের জন্যে একটা সিল্কিং সুট। এই তো!

ঠিক বলেছো। কিন্তু আমাদের সাধন বড় প্যাংলা তোমার তুলনায়। তার জামা তোমার গায়ে হবে না।

সে সাধন গেল কোথায়?

বোজ ভাবাচ্ছিল। ভরাডুবি হবার জোগাড়। তাড়িয়ে দিতে হল।

শংকর চুপ করে গেল। মনে মনে ভাবলো, তোমরা তাহলে তাড়িয়ে দাও। আবার নিজেই নিজেকে বোঝালো, ডোবালে না তাড়িয়ে উপায় কি? একটু পরে খুব আশ্চর্য হল, সে নিজেই নিজের মনে শশাঙ্ক দত্তর যুক্তিগুলো খাড়া করে [illegible]

নাও। হাজার এক টাকা নিয়ে ফর্মে সই করো। তারপর কালকের পেপার পাবলিসিটিটা একটু খুঁটিয়ে দেখো। কাঁপ ইমপ্রুভ করার থাকলে তুমিই করে দাও। তোমার নাম যাচ্ছে—ষাট পয়েন্ট টাইপে।

না। না। এখুনি পাবলিসিটি দেবেন না শশাঙ্কদা।

লজ্জা কিসের ভাই? কাগজ দেখেই ওরা জানুক। পঞ্চমুখ বুঝুক, একসক্লুসিভ করলে মোস্ট লয়াল হ্যান্ডও একদিন রুখে দাঁড়ায়। অবিচারের বিচার চাই। ওদের শিক্ষা দিতে হল এ-পথই তোমার পথ শংকর।

শংকরের বক্ষ গর্বে স্ফীত হয়ে উঠছিল। আবার মনে হচ্ছিল, দাদা ওরা সবাই কাল সকালের কাগজ দেখে তাকে কী মনে করবে। সে কি আর কোনদিন ওদের সবার সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে? রঞ্জনী-দিদির সামনে? চন্দ্রদাদার সামনে? সবাই তাকে কত বিশ্বাস করে। যদি নীলকমলের এ নাটক তাকে নিয়ে না জমে?

নন্দনার কথাই ধরো না—

ভালো কথা মনে করিয়ে দিলেন শশাঙ্কদা।

অবাকও হোল শংকর। নিজেই শশাঙ্কদা বলে ডাকতে শুরু করে দিয়েছে। এ জন্যে এমন কিছু সময় লাগলো না।

শশাঙ্ক তখন কথার তোড়ে ভাসছে। দূরে দূরে থাকলেও পঞ্চমুখের তোমাদের ভেতরকার সব খবরই আমি রাখি। অনেক-দিন ধরেই রাখি। নন্দনা কেন চলে গেল? তার ওপর ইনজাস্টিস হয় নি? দিনের পর দিন মেইন, বাজে রোল করেও সে মোটে পেপার পাবলিসিটিতে একটা লাইনও পায় নি। অথচ তখন ভরত হলে একট্রা চেয়ার দিতে হচ্ছে। আমি কি জানিনা শংকর? কি ভেবেছো আমায়?

কিচ্ছু ভাবি নি শশাঙ্কদা। আপনি এইমাত্র একটা উপকার করলেন। নন্দনার কথা মনই ছিল না। ওকে ডাকুন না।

তুমি গিয়ে বললে চলে আসবে।

অন্য দলে জয়েন করেছে। তারা কি [illegible]

চল্লিশ টাকা দিয়ে আমরা ছাড়িয়ে আনব শঙ্করকে। আমরা বড় করে শো-বিজনেসে নামতে চলেছি। এখানে বড় টাকা ঢালতেই হবে। টাকার পরোয়া করলে চলবে না। শিল্পীর সম্মান দিতে হবে। অ্যাটিস্টের প্রয়োজন মেটাতে হবে সবার আগে। তারপর বাকি সব আপনা-আপনিই হবে। মনে রাখবে—একসপ্লয়টেশন বোনাস দিয়ে ঢাপা থাকে না। পাবা হয়ে ফুটে ওঠে।

ওদের গলার আওয়াজে পার্টিশনের ওপাশের লোকজন এ-ঘরে চলে এল। শশাঙ্ক চেঁচিয়ে বলল আজ আমাদের একটা শুভদিন। পঞ্চমুখের শঙ্করবাবু নীলকমলে জয়েন করলেন। ফ্রেশার অথচ একখানা টাইপ করা বায়োডেটা সই করিয়ে শশাঙ্ক শংকরের হাতে একগোছা নোট দিয়ে দিল। বাড়ি গিয়ে গুণে নিও। হাজার এক টাকা আছে। এর ভেতর থেকে একখানা একশো টাকার নোট ম্যানেজারের হাতে দেবে।

শংকর তাকিয়ে পড়লো।

শশাঙ্ক বলল, নতুন দলে যোগ দিলে। এসব সময় মাকে প্রণাম করে কিছু দিতে হয়।

টাকা পয়সা আমি দিদির হাতে দিয়ে থাকি। আর কিছু বলল না শংকর। দিদিকে ওরা বড়দি ডাকে। বিয়ে-থা করেন নি। জ্যাঠামশায়ের বড় মেয়ে। মাস গেলে তার হাতেই টাকা তুলে দেয় শংকর।

বাড়ি ফিরে দিদির হাতে সব টাকা তুলে দিল শংকর।

এই তো সেদিন টাকা দিলি। আবার? বোনাস পেলি নাকি?

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শের
জ্বালা-যন্ত্রনা
থেকে
দ্রুত আরাম
পেতে হলে
হ্যাডেনসা
মলম
ব্যবহার করুন!

নীলকমলে জয়েন করলাম। মাস গেলে এখন প্রায় ডবল পাবো। অজয়, বছর পনর হাজার টাকা বোনাস। এবার একটা জায়গা দেখতে হবে দিদি। আমরা বড় করে বাড়ি করব। তোমার জন্যে বড় একখানা ঘর থাকবে। বেশ মোজাইক ফ্লোর—

বড়দি তাকে থামালো। কি বলছি? কোথায় জয়েন করেছিস?

নীলকমল যাত্রা সম্প্রদায়—

বেনো জল পঞ্চমুখ তোকে ভাসিয়ে দিয়েছে? না ঝগড়া করেছিস?

তাড়াব কেন! ঝগড়াও তো হয় নি।

তবে? বড়দি একদম সোজাসুজি তার চোখে তাকিয়ে রয়েছে।

ডবল মাইনে দেবে। মেইন রোলে স্টেজে নামবো।

নাটকের নাম?

শংকর কুঁকড়ে গেল। সুজাতা।

সেই দু নম্বর সুজাতার দল! এদের না তোরা নিন্দ করতিস। শেষে সেই দলে গেলি? অমিয়বাবু জানেন? তোদের চন্ডীদা জানেন?

বলা হয় নি বড়দি।

না বলে কয়ে নীলকমলে জয়েন করলি? ওরা না পঞ্চমুখের শত্রু? তুই এটা কি করলি শংকর? তোদের এতদিনের গ্রুপ। যার জন্যে এত খেটেছিস!

যা তুমি বোঝো না বড়দি—তা নিয়ে কথা বলতে এসো না। এক কাপ চা দাও তো। চিনি কম। দুধ কম। বড্ড মাথা ধরেছে।

সম্রাট আদেশ দিয়েছেন—সম্রাজ্ঞীকে বিষ পানে মৃত্যুবরণ করতে হবে। এই হল গিয়ে সম্রাটের ভালোবাসার নিদর্শন।

সম্রাটের ভূমিকায় অমিয়। সম্রাজ্ঞী রজনী। সম্রাট এক সময় দেশের জন্যে অনেক কিছু করেছেন। তিনি এতকাল সুশাসক হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। তিনি যোদ্ধা। বীর। জ্ঞানী এবং কবি। উপযুক্ত গুণগ্রাহী। সাম্রাজ্যের গুনীজনকে তিনি রাজ সম্মান দিতে কোন কুণ্ঠা দেখান নি।

সেই সম্রাট হঠাৎ স্বেচ্ছাচারী একনায়ক হয়ে উঠছেন। তাঁর মুখের কথাই আদেশ।

সম্রাজ্ঞীর রোলে রজনী। সে তার জীবনে অন্তত দশখানা হিস্টোরিকালে অভিনয় করেছে। মায়ের বন্ধু ছাড়া বিশ্বাসের সঙ্গে করেছে। করেছে অহীন চৌধুরীর সঙ্গে। বড়বাবু দুর্গাদাস নারায়ণ মিত্তির তো আছেনই। নয়দশ বছর বয়স থেকে স্টেজই তার খেলাধুলোর জায়গা। তবু অমিয়র এই সম্রাট আগেকার সব হিস্টোরিকালকে ম্লান করে দেবে—একথা রজনী বুঝতে পেরেছে।

এখন যা দরকার—তা হল নিয়মিত [illegible] দরকার বড় করে পেপার পাবলিসিটি। হোর্ডিং। প্রেস-প্রিভিউ।

এবার নতুন নাটকে টাকা চিন্তা অত নেই। চিন্তা অন্য জায়গায়। অমিয় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে—আগেকার সেই বাঁধুনি বেন পঞ্চমুখে আর নেই। সুজাতার বিহার্সালে একটু একটু করে এক একটা জিনিস জোগাড় হয়েছে।

আলো, পোশাক, জ্ঞানলা, পালঙ্ক—সবই। এ ও জোগাড় করে এগিয়ে দিয়েছে। ফার্স্ট নাইটে উইংসের বং কাঁচা ছিল। রজনীর শাড়িতে সে বং লেগে গিয়েছিল। পাবলিসিটির পয়সা ছিল নাক। ভরত হল তখন থিয়েটারের জায়গা হিসেবে একদম অপরিচিত ছিল। সবাই বারণ করেছিল। বলেছিল, অমিয়—ওখানে নাটক জমবে না। উঠে যাবে। ওটা থিয়েটার পাড়া নয়।

এবার হাতের কাছে সব-রেডি। সব থেকেও যেন কি নেই!

মহলার পর গাড়ি গিয়ে সবাইকে বাড়ি পৌঁছে দেয় এখন। খিদে পেলে খাবার আছে। চান করবার বাথরুম। শোবার ঘর—সবই আছে। নেই সেই আগেকার দল বেঁধে কিছু করার উৎসাহ। সবাই কেমন ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে কথা বলছে। কারও পার্ট এখনো মুখস্ত হয় নি। সবাই জানে—মহলার পর নাটক স্টেজে হোক ছাই না হোক—মাস গেলে মাইনেটা তো পাবো।

অমিয় জানে গ্রুপ থিয়েটারেরও চর্মরোগ হয়। সেই চর্মরোগের নাম সিকিউরিটি। এ-রোগ বন্ধিন না সারছে—দলের সবার কাজ করবার ক্ষমতার ওপর আরামের মেঘখানা ছায়া মেলে থাকবে। সবার আগে এই আরামের বেলুনটা ফুটো করে দেওয়া দরকার।

কিন্তু কে দেবে?

অন্যায় লীলা এগিয়ে আসে সবার আগে। কি দরকার তোমাদের? টাকা? আমি দেব। আমার যা আছে ফিক্সড কো-অপারেটিভ থেকে তুলে দিচ্ছি। নাও। কি করে শোধ হবে? সে চিন্তা আমার। মাসে মাসে মাইনে থেকে কেটে শোধ হয়ে যাবে। বন্ধিন বা লাগবে? দেখতে দেখতে দু বছরে শোধ করে ফেলবো।

নিজের শরীরটাও ধারে নেই অমিয়র। একবার মনে হল, আমি অসুস্থ বলেই হয়তো এসব ভাবছি। এমনিতে আমার কোন অসুখ নেই। ডাক্তার বলেছেন, মিষ্টার ব্যানার্জি বিল্যাকস করুন। বিল্যাকস—

কোথায় আর পারছি। নাটকের দলের পাণ্ডার কপালে রিল্যাকস করার সুযোগ নেই কোন। বরং দিনকে দিন সে হাই-পারটেনশনের পেসেন্ট হয়ে উঠতে বাধ্য। বড়বাবুর কথা ভাবলে আশ্চর্য লাগে। কতবড় দল করেছেন। ভেঙেছেন। তাঁর পাশে ছিলেন—তাঁর দুই সহোদর—তারাপদ আর [illegible]

পেয়েও তিনি শেষ দিকটা নিজের অভিমান আর মর্যাদায় বন্দী হয়ে ছিলেন।

তোমার গলা ঠিক হয় নি রজনী।

গলার ব্যথাটা যাচ্ছে না।

গারগেল কর। ডকটর সেন কি বলছেন?

একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি। ভালো করে দেখাতে হবে। নিজেই বুঝতে পারছি—আওয়াজ ঠিক বেরোচ্ছে না।

শংকর আজও এলো না রজনী। পরশু সুজাতার ডবল শো।

তাইতো দেখছি।

বলতে বলতে বিষ্ণু দত্ত এসে হাজির। রিহার্সেল কতদূর ভাই? আমার একটা রোল হবে?

অমিয় দেখলো, বিষ্ণু দত্ত বেশ তৈরি এখন। বলল, মহামন্ত্রীর রোল করতে হবে তোমায়। সম্রাটের আদেশে তাকে একসিন নাচতে হবে।

বেশ তো। নাচবো। আমি তো ভালোই নাচি অমিয়। ডায়ালগ দাও।

সম্রাট। আপনার আদেশের অন্যথা হয়—মন্ত্রিসভার কেউ তো ভাবতেও পারেন না। আপনিই আমাদের বেদ। আপনি যা বলেন তাই আমাদের কাছে বাণী।

অমিয় বলা মাত্র বিষ্ণু গড় গড় করে রিপিট করে গেল।

চমৎকার হয়েছে বিষ্ণু। এবার আমি সম্রাটের ডায়ালগ বলছি। ভালো করে শোন। মহামন্ত্রী। আপনি বিচক্ষণ প্রশাসক। আমাদের রাষ্ট্র শাসনের কাঠখোট্টা পদ্ধতিতে ভঙ্গিমা আনা দরকার। সে ভঙ্গিমা একমাত্র নৃত্যই দিতে পারে। আমার আদেশ—আপনিই প্রথমবার নেচে সেই মহাভঙ্গিমার সূত্রপাত করুন।

আর ডায়ালগ বলতে হল না। মহামন্ত্রীর রোলে বিষ্ণু প্রায় একরকম অরিয়েন্টাল সেক্স ডান্স শুরু করে দিল। হাত কাঁপিয়ে। পা কাঁপিয়ে। একটুও না থেমে।

হোটেলের ছেলেটা এঁটো থালা গ্লাস নিয়ে জায়গাটা মুছে এইমাত্র চলে গেছে। এখুনি আবার আসবে। পান আনতে দিয়েছে শশাঙ্ক। ছেলেটা দেরি করছে কেন? শশাঙ্ক ভাবলো একটু গড়িয়ে নেবে। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর ঘণ্টাখানেক শুয়ে নেয় শশাঙ্ক। তারপর হাটতে হাটতে গিয়ে ট্রাম ধরে। চিৎপুরে নীলকমলের অফিসে গিয়ে পৌঁছতে তিনটে হয়ে যায়।

যাত্রা সমাজে জড়িয়ে পড়ার কোন ইচ্ছে তার ছিল না। ধার দিয়ে জড়িয়ে গেল। এই তো ক' মাসের কথা। ওদের দলের দিকে শশাঙ্ক গোড়ায় ঝুঁকেছিল একটি কারণে। ওরা দু-নম্বর সুজাতা নামাচ্ছে দেখে শশাঙ্ক ধার দিতে দ্বিরুক্তি করে নি। নিজেকে ওদের একজন ভাবতেও এখন আর আটকায় না শশাঙ্কর।

সে চায়, দু নম্বরের চাপে এক নম্বর পাত্তাড়ি গোটাতে বাধ্য হোক। তারপর সে দেখবে—রজনী কোথায় দাঁড়ায়? কোথায় যায় তার দাপট? সে রজনীর স্বামীর আসনটি কোন মতেই ছাড়তে রাজি নয়। বরং পুরোপুরি সে আসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই তার একমাত্র লক্ষ্য। এপথে যেসব কাঁটা পড়বে—তার সবগুলো সে তুলে ফেলবে।

শুয়ে শুয়ে মনে পড়ছিল শশাঙ্কর। প্রথমে ধার দিলাম নীলকমলকে। তারপর মেমবার হলাম। এখন সহ-সভাপতি। মাসখানেক হল নীলকমলের প্রায় সব দায়িত্বই শশাঙ্কর। শংকর এসে গেছে। নন্দনা আসবে। পঞ্চমুখ থেকে আর আসবে কল্যাণী। আসবে অমিয়র ডাবল।

সে এখন ভেতর থেকে, বাইরে থেকে, সব দিক থেকে ধাক্কা দেবে। পঞ্চমুখের ভেতরে তার সুড়ঙ্গ কাটা শুরু হয়ে গেছে। নীলকমলের পেপার পাবলিসিটিতে বড় নাম এখন শংকর। সে কপি কাগজে কাগজে চলে গেছে।

ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল শশাঙ্কর। পান এনেছিস? উঠে বসল শশাঙ্ক।

কে?

আমি বাবা। সন্তু। তুমি ঘুমোচ্ছো দেখে পানটা খেয়ে নিলাম।

খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কত দিন আসিস নি সন্তু। বাড়ির সবাই ভালো। বোস।

ঘরের আলোতে বিকেলের ভাব। সন্তু কোন রকম ভূমিকা না করেই বলল, আমাকে তোমার দু হাজার টাকা দিতে হবে বাবা।

কি করবি?

সেই যে বলেছিলাম—

মনে নেই।

খাতার ব্যবসা করবো। তুলিকা কলমের এজেন্সি নেব।

কিন্তু টাকা কোত্থেকে দেবো রে। আমার তো কিছু নেই। দেখছিস তো এই এঁদো গলির ঘরে থাকি। আলো আসে না একদম।

না। তোমার টাকা আছে। তোমার মানিব্যাগে টাকার নোট ফুলে থাকে!

পাগল! এসব কথা কে বলেছে তোকে?

কে আবার? মা বলল। মা তো তোমার কাছেই টাকার, জন্যে পাঠালো।

আর কি বলেছে? আমি টাকার ওপর তোষক বিছিয়ে শুয়ে থাকি! তাই না?

বাবা। আমার রসিকতা করার সময় নেই। টাকা আমার চাই।

তবে তোর মায়ের কাছেই যা। সাকসেস ফুল থিয়েটারের সাকসেসফুল হিরোইন! সোফার ড্রিভিনকার তার জন্যে চব্বিশ ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে। মাসে মাসে দর্জি এসে নতুন ডিজাইনের ব্লাউজ বানিয়ে দিয়ে যায়। সকালে ম্যাসেজ করতে লোক আসে। ছুটিতে তোর মা পুরী নয়তো দীঘা যায়। টাকা তো তার কাছে! আমার কাছে টাকা দেখলি কোথায় সন্তু?

বঃ! তুমি তো মায়ের খবর অনেক রাখো দেখছি!

আরও অনেক খবর রাখি। শুনবি? বল।

তোর মায়ের জন্যে পঞ্চমুখকে মাসে পাঁচ হাজার টাকা খরচা করতে হয়। আমি ভালো জায়গা থেকে শুনেছি। এবার বুঝে নে—কার কাছে টাকা পাবি।

কিন্তু তুমি তো আমার বাবা। আমার জন্যে তোমার কোন দায়িত্ব নেই?

এসব কথা তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করোগে।

আমি কারও কাছে কিছু জানতে চাই না। আমি জানি তুমি আমার বাবা। আমার যা কিছু জানার—তোমার কাছ থেকেই জানবো। আমি অন্য কারও কাছে পাবো না।

সেটা তোমার ইচ্ছে। বলেও শশাঙ্ক ছেলের মুখের দিকে তাকাতে পারলো না।

(ক্রমশ)

শীতের বাতাস ॥

বার্ণিক রায়

মাটির তলায় অন্ধকারে রত্ন খুঁজতে এসে
পথ হারিয়ে গেলাম।

আকাশে অনন্ত রোদ, চিলের ডানায় নীল,
জলের উদাস সুর।

দ্রুত শব্দে আগুনের রোষ গর্জে।

গাঁইতির ঘায়ে বাতাস হঠাৎ রুদ্ধ, কালো জলে কালো মাটি
নেচে উঠলো অসহ্য আনন্দে। বায়ুহীন জলে
উদ্দাম তরঙ্গ উপচে আকাশে ওঠে। দুঃসহ কষ্টের মৃত্যু
বুক ফেটে যায়, ফুসফুস বন্ধ। ওপরে ঘাসের শিষে দুধ।

হে প্রেম, হে নারী, তোমার গর্ভের গভীর আনন্দে
আমরা সকলে ডুবে যাই।
আমাদের অন্তিম প্রার্থনা অন্ধকার মাটি আর
জলের ভেতরে নিঃশব্দ সুরের মতো মিশে যায়।

ভূগর্ভের তরল আগুন বিরাট মাথায়
জল নিয়ে উত্তপ্ত হৃদয় শান্ত করে।
আর ফুসফুস থেকে বেরিয়ে-আসা প্রাণের তরঙ্গে
মাটির নীচের কালো অন্ধকার আনন্দে স্পন্দিত হয়।
রন্ধ্র ভেদ করে তারি বাষ্প বাইরে আকাশে
মেঘ হয়ে জমতে থাকে।
শীতের বাতাসে রক্তিম হাওয়া॥

জীবন এবং কবিতা ॥

শ্যামা দে

দিনের সুষমা নাকি দিনের জ্যোতি
ঢেকে রাখে সমস্ত বিষাক্ত নিশ্বাস,
যদিও তখনও, বাতাসে বাতাসে
হা-হুতাশ, নীরবে সয়ে যেতে হয়—
সবকিছু, খর খর চলতেই থাকে
ব্যস্ততার চাকা, জীবনের হাটে বাজারে
কেবলই পসরা ফেরী করা।

দিনের প্রকাশ রাতের নির্জনতায়
ঢেকে গেলে, বুকের সেই সব ক্ষুদে কীটেরা—
দলবেঁধে হল্লা করে, কামড়ায় আর
কামড়ায় ছারপোকার মত; সারা দেহে মনে—
তখন আর শব্দ নেই কোনো
স্পন্দন নেই, বাতাসও মেলে না শীতল
কেবল ভাগাড়ের গন্ধ আর—
উচ্ছিষ্ট খাবার নিয়ে কুকুরদের
কাড়াকাড়ির চীৎকার।

প্রগলভ দিনের স্মৃতি ॥

রাধা সরকার

তার চিঠি সমস্ত প্রত্যাশা চূর্ণ করে
ছুটে গেছে দুরন্ত ছেলেবেলায়
অবাধ্য বালকবেলায় এক পা দু পা করে
খেলে যেতো বেয়ারা ডাংগুলি
হেমন্তের নিকানো উঠান জুড়ে যা এখন—
জমে থাকা প্রগলভ দিনের স্মৃতি।

কথার গাঁথুনি ভেঙে তার স্বগতোক্তি খুঁজি
যেখানে স্পষ্ট উচ্চারণে
জড়িয়ে আছে ভোরের প্রতিশ্রুতি।

আদি এম প্যাটেল

একটি মর্মান্তিক দুঃসংবাদ

বিজ্ঞাপন জগতের এক আকর্ষণীয় চরিত্র আদি এম প্যাটেল আর ইহজগতে নেই। তিনি ইংলণ্ডে প্রেরিত অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সিস অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেছেন ভারতীয় বিজ্ঞাপনের ইতিহাসে অনন্য অবদানের জন্যে মিঃ প্যাটেল অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর জন্ম অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে। জীবন শুরু করেছিলেন এক বিজ্ঞাপন দপ্তরে নাইট টেলিফোন অপারেটর হিসেবে। এবং পরবর্তীকালে স্বীয় কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়ে বেনেট কোলম্যানস বিজ্ঞাপন কোম্পানীর সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৪৬ সালে এই দপ্তরের পাঁচজন সহকর্মীকে নিয়ে প্যাটেল এভারেস্ট নামে এক বিজ্ঞাপন কোম্পানীর পত্তন করেন। তিনি নিজস্ব দর্শনের আলোয় এমন এক বিজ্ঞাপনের নীতি প্রবর্তন করেছিলেন যা একেবারে আধুনিক ও অভিনব।

প্রবীর ব্যানার্জি
মার্কেটিং ম্যানেজার

বিজ্ঞাপন ও বিচিত্রা

এটা সুরের জগত। গানের জগত। রেকর্ডে গান থাকে। কিংবা সুন্দর সুর অথবা সুন্দর সুরে বাঁধা আবৃত্তি বা ভাষণ। অন্য কিছু নয়। তাই অন্যান্য দ্রব্যের মতো রসনায় বা পরিধান হিসেবে ব্যবহার করে এর বিচার হবে না। এর বিচার হবে আমাদের গভীর অনুভূতিতে এবং শ্রবণ সংবেদনে। গান শোনার ব্যাপার, উপলব্ধির ব্যাপার। সুতরাং দি গ্রামোফোন কোম্পানি অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের পক্ষে এখন পর্যন্ত প্রচারের সবচেয়ে ভালো মাধ্যম—নিশ্চয়ই রেডিও। টেলিভিসনও হতে পারে। কিন্তু নিশ্চয়ই রেডিওর মতো নয়। আমার তাই ধারণা।

আমার ধারণাকে সমর্থন করেই দি গ্রামোফোন কোম্পানি অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের মার্কেটিং ম্যানেজার শ্রীপ্রবীর ব্যানার্জী বললেন—হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন। আমার কোম্পানির 'প্রোডাক্ট'এর সেল্স-অ্যাডভার্টাইজমেন্টের জন্য যতগুলো মিডিয়াম আছে, সেগুলোর প্রত্যেকটার উপর পরীক্ষা চালিয়ে আমি দেখেছি, রেডিওই এখনও পর্যন্ত 'বেস্ট এফেকটিভ মিডিয়াম।' বিশেষতঃ রেকর্ডের বিক্রির ক্ষেত্রে রেডিওর চেয়ে ভালো প্রচার-মাধ্যম নেই। সুতরাং সর্বপ্রথম এই মিডিয়ামটিকেই আমরা বেছে নিই।

এছাড়া পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন তো আছেই। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। বছরের কতগুলো নির্দিষ্ট সময়ে, কতগুলো নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে আমার কোম্পানি কিছু-সংখ্যক বিশেষ বিশেষ রেকর্ড বের করেন। সেইসব রেকর্ডগুলোকে কেন্দ্র করে আমরা একটা 'ক্যামপেইন-প্ল্যান' করি। যেমন ধরুন—আমার প্রতিষ্ঠান শারদীয় দুর্গাপুজো, ২৫শে বৈশাখ, নজরুল-জয়ন্তী, ২২শে শ্রাবণ, বসন্ত-বন্দনা প্রভৃতি উপলক্ষ্যে রেকর্ড বের করেন। এইসব বিশেষ বিশেষ রেকর্ডগুলো আমরা বিভিন্ন পত্রপত্রিকাকে পাঠাই। তাঁদের পত্রিকার মতামতের জন্যে। এইসব রেকর্ড সম্পর্কে তাঁদের মতামত প্রতিটি কাগজেই বেশ 'ভালোভাবে' প্রকাশ করেন। আমাদের নিজেদের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সংগীত সমালোচকদের এই মতামতও আমাদের পক্ষে খুব 'এফেকটিভ' হয়।

—তাহলে আপনার দ্রব্যের বিক্রি সম্পর্কিত প্রচারের ব্যাপারে আপনাকে একটা মাধ্যমের ক্ষেত্রে (অর্থাৎ প্রেস রিলিজের ক্ষেত্রে) অনেকাংশেই নির্ভর করতে হয় সংগীত সমালোচকদের উপরে। তাই তো?

দি গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিঃ

এটা কিন্তু এক 'গুরুত্বপূর্ণ' নির্ভরতা। যেহেতু আপনি বলেছেন, বিভিন্ন পত্রপত্রিকার এইসব মতামতও 'খুব এফেকটিভ'। আচ্ছা ধরুন, একটা বছরে নজরুল-জয়ন্তী উপলক্ষেই প্রকাশিত রেকর্ডগুলো সম্পর্কে পত্রপত্রিকার অভিমত আপনাদের ফেভারে গেল না এবং সেইসব মতামত জনমতকেও (অবশ্যই গান সম্পর্কিত জনমত) জানান দিল। তখন আপনার আর কিছু করার থাকতে পারে?

আমার প্রশ্নটা শুনে একটা সিগারেট ধরালেন প্রবীর ব্যানার্জী। বেশ একটা প্রসম্বিত-টান দিয়ে বললেন—না, এক্ষেত্রে খুব বেশী কিছু করতে পারি না আমি। আমাকে তাঁদের উপর নির্ভর করতেই হয়, যেহেতু সেক্ষেত্রে আমার কোনো 'কন্ট্রোল' নেই।

—সাধারণতঃ একটা প্রতিষ্ঠান তাঁর ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতেই এমন প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে—যার উপর তাঁর কন্ট্রোল আছে। স্বভাবতই সম্পূর্ণ সচেতনভাবেই সেই প্রতিষ্ঠান সেইসব প্রচার মাধ্যমই ব্যবহার করে যার সেলস-প্রোমোশনের ক্ষেত্রে 'পজিটিভ ভ্যালু' থাকবে। সে বিচারেই যদি হিসেব করি, আপনাকে এমন একটা মাধ্যম নিতে হয়েছে যার উপর কোনো কন্ট্রোল নেই আপনার। সেটা আপনার বিপরীতেও যেতে পারে। ফলাফলও। আজকের প্রচার-মাধ্যমে এরকম জিনিস থাকতে পারে?

সোজা হয়ে বসে প্রবীরবাবু বললেন—অবশ্যই। নিরুপায়ভাবেই এই ধরনের বাধা থাকতে পারে আমাদের সামনে।

যথার্থ অর্থে মার্কেটিং লাইনের লোক শ্রীব্যানার্জী। বয়সও খুব বেশী নয়। অথচ মার্কেটিং সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা নিয়ে বসে আছেন তিনি। ঘুরেছেন নানা দেশও।

'মার্কেটিং রিসার্চ'এর সঙ্গে 'বিজ্ঞাপন'-এর সম্পর্ক খুব গভীর। অথচ এ নিয়ে খুব বেশী চর্চা করেন না অনেকে। প্রবীরবাবুকে প্রশ্ন করেছিলাম—বিজ্ঞাপনের সঙ্গে মার্কেটিং রিসার্চের সম্বন্ধটাকে আপনি কিভাবে দেখেন?

শ্রীব্যানার্জী উত্তরে বললেন—কাস্টোমার মোটিভেশন, কস্টোমার ট্রেন্ডকে জানার জন্যই বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন। আমি সর্বপ্রথম বিজ্ঞাপনকে কতগুলো মাপকাঠিতে ভাগ করে নিই। যথা—সেকটর অফ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, ফ্রিকোয়েন্সী অফ অ্যাডস্ প্রভৃতি। অন্যদিকে আমার 'মার্কেটিং রিসার্চ'এর মাধ্যমেই আমি জানি, আমার কোম্পানির উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রেতা সমাজের কোন্ শ্রেণীর মানুষ? পরীক্ষার দ্বারা আমরা দেখেছি সমাজের 'মিডল-হাই থেকে

তিন সঙ্গী

এইচ-এম-ভি'র তিনটি নতুন এল পি স্টিরিও রেকর্ড

বিরাজ বৌ
শরৎ-জন্মশতবার্ষিকীতে এইচ-এম-ভি'র সশ্রদ্ধ নিবেদন—অমর কথাশিল্পীর কাহিনী অবলম্বনে নাটক 'বিরাজ বৌ'। অভিনয়ে : তৃপ্তি মিত্র, বিকাশ রায়, সবিতাব্রত দত্ত, নীলিমা দাস প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ।

'ডাউন মেমোরি লেন' (২য় খণ্ড) : লোকান্তরিত সুরকার কমল দাশগুপ্তের সুরারোপিত ১২টি চিরপ্রিয় গানের নূতন সংকলন। অংশগ্রহণে : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ফিরোজা বেগম, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, তালাত মাহমুদ, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও মান্না দে।

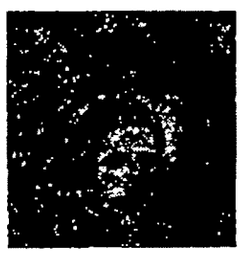

'সঙ্স অফ রজনীকান্ত' (২য় খণ্ড) একটি বহুপ্রতীক্ষিত রেকর্ড। রজনীকান্তের ১৬টি গানের এক মর্মস্পর্শী সংকলন। সঙ্গীতে : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জলি সেন, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল, গীতা মাইতি, নিশীথ সাধু ও নীলা মজুমদার।

সবকটি রেকর্ডই আপনার এইচ-এম-ভি ডীলারের কাছে পাবেন।

হিজ মাস্টার্স ভয়েস HMV

শুরু করে হাই ইনকাম গ্রুপ'ই আমার রেকর্ড কিংবা রেকর্ড—প্লেয়ারের ক্রেতা। এঁদের মধ্য থেকেও আমায় জানতে হয়, এঁদের মধ্যে শতকরা কতজন কোন্ ইনকাম-গ্রুপ-এ পড়ে, এঁদের টেস্ট এবং হ্যাবিট কি, লাইফ-স্টাইল কোন ধরনের ইত্যাদি। আমার ক্রেতাদের জীবনধারার নানা মাপকাঠির বিচারে-এইভাবেই বিজ্ঞাপন বা প্রচারের মাধ্যমটা আমরা স্থির করি।

—পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আপনারা সমজাতীয় দ্রব্যের প্রচার-কৌশল কি ধরনের?

প্রশ্নের উত্তরে প্রবীরবাবু বললেন—অনেক শক্তিশালী। সব দেশের কথা বলতে পারবো না। আমেরিকার কথাই বলছি। আমেরিকার গোটা রেকর্ড মার্কেটটা প্রায় সম্পূর্ণই (শতকরা ৭৫ ভাগ) রেডিও মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল, বাকি ২০ ভাগ টেলিভিশন এবং বাকি অংশ নানা মিউজিক ম্যাগাজিনের উপর। অজস্র মিউজিক ম্যাগাজিন আছে আমেরিকায়। তা যে কথা বলছিলাম, শুনুন। ওখানে দেখেছি, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত রেডিওতে একটা নির্দিষ্ট গানই হয়ত পনেরো কুড়িবার বাজিয়ে যাচ্ছে? একটা নির্দিষ্ট রেকর্ড যেটা দিনে বারবার পনেরো কুড়িবার বাজানো হচ্ছে, তার 'এফেকট'টা কি হয় ভাবুন? তাছাড়াও ওখানে আর্টিস্টদের 'ইমেজ-মেকিং' বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধার পথটাও অনেক ব্যাপক। মানুষের সঙ্গে যোগাযোগটাও কাছাকাছি।

প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, এতো গান গান করেও রেকর্ডের ক্ষেত্রে ভারতের 'ডোমেস্টিক মার্কেট' খুব আশাপ্রদ নয়। একটা বছরে মোটামুটিভাবে সাত কোটি টাকার রেকর্ড বিক্রি হয়। রেকর্ড বিক্রির হিসাবে সংখ্যাটা দাঁড়ায়—বছরে সাত থেকে সাড়ে সাত লক্ষ রেকর্ড।

ত্রিশ লক্ষ টাকা প্রচারখাতে ব্যয় করে (মোটামুটিভাবে) কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন প্রবীর ব্যানার্জী। জনসংযোগও আজকের দিনে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। সেটাও দেখতে হয় এই প্রতিষ্ঠানকে। জনসংযোগের যেসব বিভিন্ন পদ্ধতি দি গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া গ্রহণ করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হলো—সঙ্গীত জগতের ক্ষেত্রে নানা রাজ্য থেকে নতুন নতুন প্রতিভা খুঁজে বের করা। এবং ভারতের সংগীতজীবনকে আরো সমৃদ্ধ করা।

আনন্দ রায়

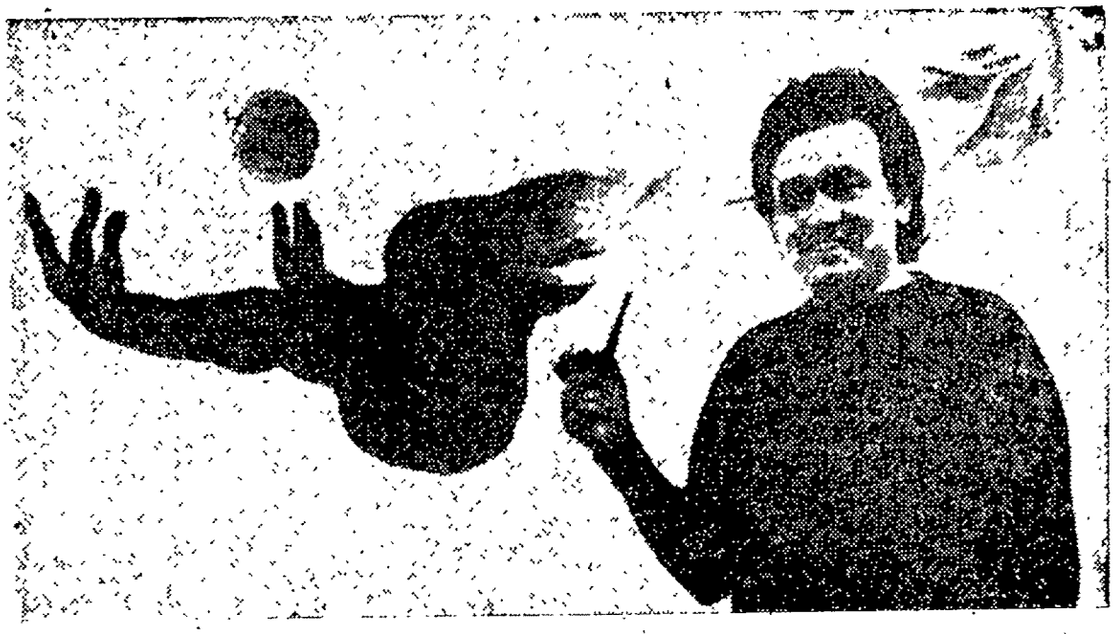

সুনীল দাস

অশ্বের প্রাণচঞ্চল গতিশীলতা প্রাচ্যের বহু শিল্পীর তুলির টানে জীবন্ত হয়েছে কালে কালে। জাপের' ত কেবল ঘোড়া এঁকেই জগৎ বিখ্যাত হয়েছিলেন। পিকাসো মানিভস, লোত্রেক কিংবা আরও অনেক খ্যাতিমান চিত্রকরের চিত্রকল্পেও অশ্বের আবির্ভাব দেখি অহরহ। বহু শিল্পী ত কেবল ঘোড়া এঁকেই সারা জীবন অতিবাহিত করেছেন। যেমন একবার দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর বাড়ীতে এক বর্ষীয়ান চীনা শিল্পীর কাছে শুনেছিলাম তিনি মাকড়সা স্টাডি করে চলেছেন সারা জীবন ধরে। আরও শুনলাম তাঁর এক বন্ধু বাঁশপাতা চিত্রণে জীবন দিয়েছেন। তেমনি এদেশের মাটিতে ইদানীংকালে নিছক ঘোড়ার দেহ সৌষ্ঠব অঙ্কিত করে বিখ্যাত হয়েছেন শিল্পী সুনীল দাস। স্থির ও চঞ্চল ঘোড়ার অজস্র অভিব্যক্তির বলিষ্ঠ চিত্র তিনি চিত্রিত করেছেন। তা এ পর্যন্ত প্রায় কয়েক হাজার হবে।

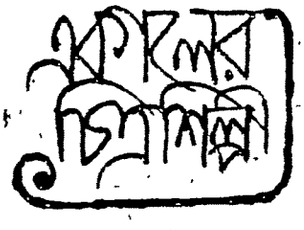

ঘোড়া আঁকার অনুপ্রেরণা এসেছিল ছাত্রাবস্থায় এক ম্যাগাজিনের দৌলতে। এক প্রবন্ধে একটা লাইন ছিল— উট, মঠ, ঘুড়ি এই তিনে যে পারফেকসন আনতে পারে সেই হয় জাত শিল্পী। অর্থাৎ উট, হাতের মুঠো এবং ঘোড়ার ড্রইং যে রপ্ত করতে পারে সে নিশ্চয়ই দক্ষ শিল্পী। মন্ত্র জপার মত এই একটা লাইন ইষ্টনাম হয়ে দাঁড়াল সুনীলের শিল্পী মনে। এক বন্ধুর সঙ্গে গেলেন ঘোড় দৌড়ের মাঠে। ছুটন্ত ঘোড়ার দুরন্ত গতি স্কেচ করতে করতে নেশায় বুঁদ হয়ে গেলেন। দিনের পর দিন কাটালেন রেসকোর্সে, এগিট সিনমার পাশে ঘোড়ার আস্তাবলে নিবিষ্টমনে হর্স স্টাডি করে। এমন কি পরবর্তী কালে প্যারিসে গিয়েও এক সময়ে বেসকোর্সে যেতেন নিয়মিত ঘোড়ার ছবি আঁকতে। ছাত্রজীবনে ঘোড়ার ছবিও বিক্রী হয়েছে বেশ মোটা অঙ্কে। সুনীল হর্স ড্রইং-এর ওপরেই ১৯৫৯ সালে ন্যাশনাল এওয়ার্ড পান মাত্র কুড়ি বছর বয়সে।

সুনীল দাসের শিল্পী জীবনের উষা লগ্নে শিল্পপ্রেরণা এসেছিল দাদার করা সব পেন্টিং থেকে এবং শহরের চলমান দৃশ্য দেখে। বাড়ীর ফেলে দেওয়া টুকরো কাগজের গায়ে রুল টানা কলিং পেন্সিল দিয়ে লাইন ধর্মী ছবি আঁকতে চেষ্টা করতেন। স্কুলের চৌকাঠ পেরোবার আগেই ড্রইং-এ হাত পেকেছিল রীতিমত। আত্মীয়স্বজন ছবি দেখে তারিফ করতেন। স্কুল ফাইনাল পাশ করার পর আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার প্রশ্নে কিন্তু পিতা প্রভাসচন্দ্র দাস এবং পরিবারের অন্যান্যদের কাছ থেকে ঘোর আপত্তি এসেছিল।

কিন্তু বাড়ীর এই মেজ ছেলেটি ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন সব ব্যাপারে স্বতন্ত্র। সকলের আপত্তিকে উপেক্ষা করে সুনীল ভর্তি হলেন কলকাতার সরকারী আর্ট কলেজে ১৯৫৬ সালে। তাঁর এডমিশান টেস্টের কাজ এত ভাল হয়েছিল যে তাঁকে কর্তৃপক্ষ এডভান্স কোর্সে ভর্তি করে নিলেন। অর্থাৎ তিনি ক্লাস সুরু করলেন দ্বিতীয় বর্ষ থেকে।

বছর বছর স্ট্যান্ড করে ফ্রি স্টুডেন্টশিপ পাওয়াসূত্রে সুনীলের অর্থনৈতিক অসংগতির সুরাহা হয়েছিল অনেকখানি। চার আনা পয়সা সম্বল করে কলেজের পথে পা বাড়াতেন প্রত্যহ। পার্ক স্ট্রীট সংলগ্ন গড়ের মাঠে স্কেচ করতেন সকাল দশটা অবধি। তারপর আর্ট কলেজে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাজ আর কাজ। টিফিনেও ক্লাসঘরে বসে ছবি আঁকতেন। কলেজ শেষে এক বন্ধুর সঙ্গে শিয়ালদা স্টেশনে গিয়ে উদ্বাস্তু জীবন সংগ্রামের চিত্রগুলো আঁক-

সুনীল দাসের আঁকা একটি ছবি

তেন বেশ রাত পর্যন্ত। কিংবা আউটরাম ঘাটে গিয়ে কাটিয়ে দিতেন কয়েকটা ঘন্টা গরু ভেড়া ছাগল আর নিসর্গের ছবি এঁকে। পরবর্তীকালে কেমন করে ঘোড়াদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল সে বিষয়ে আগেই বলেছি। এবং সেই সময়ে সুনীলের শিল্প প্রতিভা পথ খুঁজে পেয়েছিল অশ্বের হাজারের অভিব্যক্তির ভেতরে। একদিকে ঘোড়ার ছবি এঁকে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। অন্যদিকে পেয়েছিলেন ভূরিভূরি স্বীকৃতি অর্থ ও পুরস্কার। ১৯৫৯ সালে ন্যাশন্যাল এওয়ার্ড পাওয়ারও ভিত্তি এই চতুষ্পদী প্রাণী আর তার নানান ভঙ্গিমা। সুনীল ১৯৬০ সালে আর্ট কলেজ থেকে পাশ করেন। এই বছর তিনি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের স্বর্ণপদক, হায়দরাবাদ আর্ট সোসাইটির পুরস্কার, বোম্বাই আর্ট সোসাইটির পুরস্কার, দিল্লীর অল ইন্ডিয়া আর্ট এণ্ড ক্র্যাফট সোসাইটির পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজের দুটি করে পুরস্কার ও মহীশূরের দশহারা প্রদর্শনীর পুরস্কার লাভ করেছিলেন। এক বছরে এতগুলো পুরস্কার ইতিপূর্বে আর কেউ পেয়েছিলেন কিনা আমার জানা নেই। সম্ভবতঃ এই প্রথম নজীর।

শুনেছি বেসের মাঠে অনেকে বরাত ফেরাতে যায়। কিন্তু কেউ হয় রাজা, কেউ হয় ফকির। কিন্তু শিল্পী সুনীল দাসের জীবনের মোড় ঘুরেছিল বেসের মাঠে। আর ঘোড়ার আস্তাবলে গিয়ে। তবে রেস খেলে নয়। ঘোড়ার ছবি এঁকে। পুরনো দিনের নজীর টেনে সুনীল বললেন—সেটা ১৯৫৯ সাল। ন্যাশন্যাল এওয়ার্ড পেয়েছি। কলেজে অ্যানুয়াল এগজিবিশন হচ্ছে। কলেজে গিয়ে শুনলাম এক সাহেব আমার খোঁজে এসেছিলেন প্রিন্সিপ্যাল চিন্তামণি করের কাছে। তিনি দিল্লী অ্যাকাডেমি ভবনে আমার ছবি দেখে কলকাতায় এসেছেন আরও কিছু হর্স পেন্টিং দেখতে। বলে গেছেন আগামীকাল আসবেন। পরের দিন কবেকখানা ছবি নিয়ে গেলাম। সাহেব এলেন। খুশী হয়ে চারটে ছবি কিনলেন চারশো টাকায়। সেই প্রথম ছবি বিক্রী। তারপর আরও অনেক মোটা টাকার অনেক ছবি বিকী হয়েছে দেশ বিদেশের বহু জায়গায়। কিন্তু সেদিনের চারশো টাকা আমার কাছে আজও চার লক্ষেরও বেশী মনে হয়। কারণটা বুঝতেই পারছেন। তখন আমি দৈনিক হাতখরচা পেতাম মাত্র চার আনা। সেই থেকেই ঘোড়া নিয়ে মেতে গেলাম। যতই স্টাডি করি ততই মজে যাই। ঘোড়ার বুদ্ধি, নেচার, রিদম সব কিছুর ভেতরই কেমন যেন একটা ঐশ্বরিক ব্যাপার আছে বলে মনে হল। তক তক করছে মসৃন দেহ, রেশমের মত জেব্র সব কিছু ওপর তার ফর্মের মধ্যে যেন একটা ইউনিভার্সাল এ্যাপিল আছে। তাই ত ঘোড়াকে 'নোবল এ্যানিমাল' বলা হয়। তার প্রতিটি অবয়ব ও অভিব্যক্তিতে খুঁজে পাই সৌন্দর্যের আকর।

১৯৬০ সালে ফরাসী সরকারের স্কলারসিপে প্যারিস যাত্রা সুনীল দাসের শিল্পী জীবনে আর এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। সেখানে তিন বছর তিনি একোল ন্যাশিনেল সুপিরিয়র দ্য বোজার্ট এবং ...আঁতালিয়ে-১৭তে শিল্প শিক্ষায় অতিবাহিত করেন।

নিয়ম নির্দিষ্ট, জনপ্রিয় আঙ্গিক ও বক্তব্যে থেমে থাকা সুনীল দাসের চরিত্র বিরুদ্ধ বলে তাঁর চিত্র চর্চায় দেখি বিভিন্ন স্তর। এক এক পর্যায়ে এক এক রসে গন্ধে বর্ণে রঞ্জিত হয়ে ওঠে রূপকল্পের শরীর। ফরাসী দেশে থাকার সময়ে কিছু কালের জন্যে বিমূর্ত চিত্রকলার প্রেমে পড়েছিলেন। আবার স্পেনে বুল ফাইটের নান্দনিকতায় আকৃষ্ট হয়ে শতখানেক ছবি করেছেন ঐকান্তিক নিষ্ঠায়। সে সব ছবির উচ্চ প্রশংসা শোনা গেছে পাবলো পিকাসোরও মুখে। ১৯৬৬ সালে ঐ সিরিজের কিছু ছবি শিল্পী কলকাতাবাসী রসিকদের উপহার দিয়েছিলেন এক প্রদর্শনী মাধ্যমে। বুল ফাইটের বিভিন্ন ভঙ্গিমার ভেতর দিয়ে অন্ধ জান্তব গতিকে তুলে ধরে তার সঙ্গে এক মানবিক বিষয় আরোপ করেছেন বা আমাদের সূক্ষ্মানুভূতি-সূক্ষ্ম বোধকে রীতিমত কর্ষিত করে। আবার ১৯৬২ সালে চীনা হামলার সময় এই শিল্পীকে দেখা গেছে প্যারিসের রাস্তায় চিত্র প্রদর্শনী করে স্বদেশে টাকা

পাঠাতে। তখন আবার চিত্রলেখার বিষয় বদলেছে আশ্চর্যভাবে সেই সুদূর প্যারিসে থেকেও। গত বাংলাদেশ যুদ্ধেও শিল্পীর তুলি কথা বলেছে।

সুনীল সময় সচেতন বলে সমকালীন ঘটনার স্পষ্ট প্রতিফলন ফুটে ওঠে তাঁর সৃষ্টিতে। এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রতীক আশ্রিত অনুষঙ্গের রদবদল হয় পালা বদলের মত। প্রথম জীবনে ঘোড়া এবং বুল ফাইটের প্রতীকে জীবনের অস্থিরতা ও সময়ের গতিশীলতাকে প্রকাশ করেছেন। আবার পরের দিকে বহির্জাগতিক রূপময়তা থেকে অন্তর্জাগতিক অনুভবের উৎস সন্ধানে নিবিষ্ট হয়েছেন। নিজেকে খুঁজে পাওয়ার জন্যে তাঁর অভিসার দৈখি সাগরের গভীরে। সেই অধ্যায়ের চিত্রে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছেন সামুদ্রিক চলমান মাছের চোখে, আন্দোলিত জলজ উদ্ভিদের শাখা প্রশাখায়। বাস্তবকে দূরে রেখে অন্তরকে প্রস্ফুটিত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় নানা আকারের ছক, নক্সা, হরস্কোপ, ত্রিভুজাকৃতি ক্ষেত্র, তীর ত্রিশূল, সাপ স্বস্তিকা প্রভৃতি তান্ত্রিক প্রতীকে। তন্ত্র ফেজের কথা জিজ্ঞেস করতে শিল্পী বললেন—'কখনও কখনও সে অভিমানিনীর মত আমার মনের অগোচরে থাকে। সহজে ধরা দিতে চায় না। কোন কোন সময় জয়ের আশায় তাকে আঘাত হানতেও দ্বিধা করি না। মাঝে মাঝে মনে হয় জীবনটা যেন এক অন্ধকূপের মত যেখানে শুধু ভয় আর ভয়। তখন আমি নিজে বেরিয়ে আসতে চাই নানা আঁচড়ের গা বেয়ে। তাইতো আমার ছবিতে লাল ও কালোয় ফুটে ওঠে কখনও বা ছিন্নমস্তা, কখনও বা নাগকন্যা। তবে আমি কোন কন্যাই বলতে চাই না আমার ছবিকে! আমার ছবি কেবল আমার তন্ত্র বিলাসের উপাদান।

তন্ত্র ও লোকস্মৃতিবাহী পৌরাণিক কাহিনী শিল্পীর ক্যানভাসে প্রথম মূর্ত হয়েছিল প্যারিসে থাকাকালীন। একদিন সুনীলের শিল্প শিক্ষক বললেন—ড্রইং-এ তোমার কব্জীর জোর আছে। কিন্তু তুমি কি কেবল ঘোড়া এঁকে জীবন কাটাবে? তোমার ছবিতে লিটারেচার কই? তোমার দেশের শিল্প-ঐশ্বর্যের আলোকেই ব্যক্তিগত অনুভূতিকে প্রকাশ করতে চেষ্টা কর। এ কথায় শিল্পী উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ভারতীয় দর্শন ও শিল্প ঐতিহ্যের প্রতি আরও অধিক অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সেখানে উজ্জয়িনীর এক দার্শনিকের নিকট সান্নিধ্যে এসে। তাঁর ভারতীয় দর্শনতত্ত্ব ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের নানা আখ্যান শুনে শিল্পীর চৈতন্যে রূপ নিল রামায়ণ, মহাভারত, কাকশাস্ত্র এবং শৈশবে মা দিদিমার মুখে শোনা নানান কথা উপকথা। এই পর্যায়ের ছবিতে লক্ষ্মীর পা, লক্ষ্মীর সরা, পদ্ম, সতী বেহুলার সিন্দুর মাখা শাঁখা আরও কত কি। প্রাচীন বাংলার নক্সী কাঁথার প্রেক্ষাপটেও এসব লোকগাথা অনেক সময় জীবন পেয়েছে।

তবে সুনীল দাসের সাম্প্রতিক ছবি ইন্দ্রিয়ানুগ চৈতন্যে ইন্দ্রিগতময়। বৃত্তাকার কিংবা অর্ধবৃত্তাকার অবয়বের মধ্যে শৃঙ্গার রসের রক্তাভ দৃশ্যগুলো রূপান্তরিত মিস্টিক নীল হলুদের ছোপে। কিংবা মানুষের তীব্র যৌনাবেগ বিকশিত হয়ে ওঠে যৌন যৌগিক প্রতীকের ব্যঞ্জনায়। এগুলো সবই সুবৃহৎ তেল রংয়ের কাজ। শিল্পীর কথায় বলি—খুশী হই যখন কোন শিল্পানুরাগী আমার ছবি কেনেন। আমার সূক্ষ্ম অনুভূতির দ্বারা অন্যের ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে সজাগ করা এবং আনন্দদানের প্রয়াস সৃষ্টি করাও আমার আন্তরিক প্রচেষ্টা।

ওঠার আগে সুনীল দাস আত্মসমালোচনায় মুখর হয়ে বললেন—ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে প্রত্যক্ষ অনুভূতিগুলো রক্ত মাংসের ভেতরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাকে প্রকাশ করতে পারছি না। ছবি বিক্রী হচ্ছে। লোকে বাহবা দিচ্ছে। কিন্তু তৃপ্তি পাচ্ছি না। মনে হয় যা আঁকছি অপরের জন্যে। নিজের জন্যে কি করছি? ছবি বিক্রীর পর মনে হয় পেন্টিং ফর দেম, মানি ফর মী। এতদিন ব্রাস ঘুরিয়েছি। ছবি আঁকিনি। যুগের কথাকে ধরতে পারছি না বলে কোন মেসেজ ছবিতে রাখতে পারছি না। তাই আজকে জেহাদ ঘোষণা করেছি নিজের বিরুদ্ধে। যন্ত্রণা আমার ছবি হোক। রক্ত রং হোক।

শিল্পীর স্টুডিও (১০সি রজনী ভট্টাচার্য লেন, কলি-২৬) থেকে বিদায়ের মুহূর্তে সুনীল দাস অত্যন্ত জোরের সঙ্গে জানালেন—আমি সোসাইটি অব কনটেমপরারী আর্টস-এর সদস্য হিসেবে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। ক্যালকাটা গ্রুপের পর এতবড়, এত ভাল শিল্পগোষ্ঠী হয়েছে বলে আমার জানা নেই। অন্যান্য পুরস্কারের কথা বাদ দিলেও সোসাইটির বারজন সদস্য নাশন্যাল এওয়ার্ড পেয়েছে। এটা রড় কম কথা নয়। আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি শিল্পের সাধনার জন্য। আর এই মুহূর্তে আমার যুদ্ধ নিজেরই বিরুদ্ধে।

প্রশান্ত দাঁ

ঘড়ি
ও
গ্যারান্টিসহ ঘড়ি মেরামত
রায় কাজিন এণ্ড কোং
জুয়েলার্স এণ্ড ওয়াচ মেকার্স
৪, বি, বি, ডি বাগ, কলি-১
ওমেগা ও টিসট্ ঘড়ির
অফিসিয়াল এজেন্টস্

"যদি জোটে রোজ
এমনি বিনি পয়সায় ভোজ!
ডিশের পরে ডিশ
শুধু মটন কারি ফিশ,
সঙ্গে তারি হুইস্কি সোডা দুচার রয়াল ডোজ!
পরের তহবিল
চোকায় উইলসনের* বিল—
থাকি মনের সুখে হাস্যমুখে কে কার রাখে খোঁজ!"
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেল
কলিকাতা
(গঃ বঃ সরকার পরিচালিত সংস্থা)
* বর্তমান গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেল উনিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত ডি উইলসন এণ্ড কোং নামে পরিচিত ছিল।

স্বপ্নের মুখ

বীরেন্দ্র দত্ত

মাধবী আবার ছটফট করে ওঠে। চটা-ওঠা সিমেন্টের মেঝের খোলা পিঠ জ্বালা করে। ক'দিনের মত আজও দুপুরে এমন দুরন্ত গরম। বরং চাপা ভ্যাপসা ভাবটা আজ আগের থেকে অনেক বেশী। অসহায় অস্বস্তিতে উঠে বসে। মেঝে থেকে কালি-ঝুল মাখা ছেঁড়া তালপাতার পাখাটা তুলে নেয়। জোরে নাড়ে বার কয়েক। আবার শুয়ে পড়ে।

ঘুম বা কোন তন্দ্রায় নয়। আগুনের তাপ লাগে লাগে মাধবী এই মুহূর্তে বুঝি মরার মত। ঘামে-ভেজা শরীর নিয়ে উপুড় হয়ে স্থির শুয়ে থাকে ও কিছু সময়।

বাইরের দরজার হঠাৎ কড়া নড়ে ওঠে। মাধবী উৎকর্ণ হয়। ভিতরে একটু বিরক্তও। এমন গরমের দুপুরে কোন অতিথি এলো, মাধবী নিরুপায়। আবার কড়া নড়ে। খুব আস্তে বার কয়েক শব্দ হয়ে থেমে যায়। যেন কেউ ভয়ে-ভয়ে দরজার কড়ায় শব্দ করে যায়।

মাধবী উঠে বসে। এক চিলতে দালান পেরিয়ে ঈষৎ দূরের বন্ধ দরজায় চোখ রাখে। সেই সঙ্গে মেঝেয় পড়ে-থাকা জামাটা হাত বাড়িয়ে বুক-পিঠে, ঠিকমত বসিয়ে নেয়। আঁচল বুক-পিঠ ঢাকে। মাথার ভিজে চুল খোঁপা করে বেঁধে নেয়। সোজা হয়ে দাঁড়ায় মাধবী। হাতে ভাঙা পাখা। এগিয়ে গিয়ে দরজা খোলে।

দরজার বাইরে একটি সতেরো-আঠারো বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে। মাথায় ভর্তি অগোছালো চুল। পরনে বুশশার্ট আর নেংরা এখানে ওখানে তালি মারা ফুল-প্যান্ট। প্যান্টের দু' পায়ের প্রান্ত-বরাবর ছেঁড়া সুতো ঝোলে। ছেলেটি মাধবীর দিকে এক মুহূর্ত দৃষ্টি স্থির রাখে। মাধবী কি ওকে দেখেছে কোথাও? অথচ চেনা-চেনা মুখ মনে হয়!

'কাকে চাই?' কথাটা অস্ফুট, আড়ষ্ট শোনায় মাধবীর স্বরে।

ছেলেটি হাসতে গিয়েও সামলে নেয়। ডান হাত বাড়ায়। 'আপনার চিঠি নির্মলদা দিয়েছেন।'

মাধবী এবার চিনতে পারে। 'তোমার নাম রতন বুঝি? নতুন কাজে লেগেছ?'

'হ্যাঁ।' রতন সবিনয়ে মাথা নাড়ে। আরও কিছু বলতে গিয়ে থামে।

'তোমাকে আমি এই প্রথম দেখলাম, তাই চিনতে পারি নি।'

'আমিও আপনাকে নতুন দেখছি।' রতন হাসে। 'আমি ভাবে ভয়ে কড়া নাড়ছি। নির্মলদা বলে দিয়েছেন, আপনি খুব রাগী। ভেবে চিন্তে কথা বলতে। রতন চতুর হাসে।

মাধবী ভুরু কোঁচকায়। রতনের চোখে চোখ রাখে। মুখে চোখ বেশ সপ্রতিভ। স্বভাবে চটপটে মনে হয়। দু' চোখে বিস্ময় দ্রুত ভেসে যায়। মাধবীর ওর হাতের খামটায় দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়। 'কেন এই চিঠি?' কথাটা ঠোঁটের আড়ালে শব্দহীন থেকে মিলিয়ে যায়। খামটা হাতে নেয়। খুলে পড়ার আগ্রহ দেখায় না। 'কি ব্যাপার বল তো?'

'নির্মলদা একটা পাখা পাঠিয়েছেন আপনাদের ঘরে টাঙিয়ে দেওয়ার জন্যে।' রতন থেমে যেন অপেক্ষা করে।

হঠাৎ ভিতরে চাপা রাগ ঠেলে ওঠে মাধবীর। বুকের শব্দ উত্তেজনায় ভারী হয়ে ওঠে। এমন গরমে মাথার মধ্যে চাপ অনুভব করে। কিন্তু কিছু বলতে পারে না। রতনের অল্প বয়স। ওর দোকানে নতুন কাজে লেগেছে। ওর সামনে স্থির থাকে মাধবী। ধীর সংযত হয়ে ওঠে মুখ চোখের ভাব।

'রতন কি ভাবে। তুমি একটু দাঁড়াও আমি রিকসা থেকে জিনিসগুলো নামাই।' হাত সামনে থেকে সরে যায় ও।

মাধবী লক্ষ্য করে। রতন এক এক করে সব জিনিসপত্তর নিয়ে মাধবীদের দালানে রাখে। শেষে মইটা নিয়ে আসে। রিকসা-

ওলা কোন ভাড়া না নিয়েই চলে যায়। নির্মল বুঝি ভাড়াও আগে মিটিয়ে দিয়েছে। বিড় বিড় করে মাধবী। রিকসওলার অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে থাকে। এক সময়ে দরজা বন্ধ করে। শব্দ করে খিল দেয়।

'কোন ঘরে লাগাবেন?' রতন এবার অনেক সহজ। মাধবীর মুখ চোখ দেখে।

মাধবীর ভিতরে এক-টুকরো হাসি শ্লেষে জড়িয়ে যায়। মুখের রেখায় তা কয়েক মুহূর্তে থেমে থাকে। নির্মল বুঝি ছেলেটিকে বলেই দিয়েছে ওদের দু'তিন-খানা ঘর? মিথ্যে বলে মাধবীর অবস্থা ঢেকেছে বুঝি? রতনের দিকে তাকায়। 'কোন ঘর আবার? একখানাই তো। এসো!' মাধবী ঘরে ঢোকে।

রতন জিনিসপত্তর সব ঘরের মেঝেয় গুছোয়। মইটা একদিকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখে। সিলিং নিখুঁত করে দেখতে থাকে।

'দেখে আর কি হবে?' মাধবী রতনের দিকে তাকিয়ে থাকে। 'দেখছ তো পুরনো লাইন। সব তার ছেঁড়া দেয়াল থেকে ঝুলে পড়েছে। একটু কিছু হলেই লাইন শট। সুইচ বোর্ড বলতে তো এই!' ঠোঁট বাঁকায় মাধবী। ওর গলায় নীরস ঠাট্টার ভাবটা স্পষ্ট করে তোলে। 'এতে আবার পাখা!' সবে কোন চাপা উদ্দেশ্য ধরা পড়ে ওর। কথাগুলো রতন ফিরে গিয়ে নির্মলকে বলুক, এই মুহূর্তে ও যেন তাই চায়। কথার স্বরে তাচ্ছিল্য, উপহাস মিশে থাকে।

তাতে কি হয়েছে এর থেকে কত পুরনো সব ঘরে পাখা ঝুলিয়ে এসেছি!' রতন অভিজ্ঞের গলায় কথাটা বলে থামে। মইটা ঘরের মাঝামাঝি সিলিং-এ ঠেকিয়ে রাখে।' আপনার তো এসপেশাল কেস!'

'তার মানে!' মাধবী কথাটা যেন বিড়বিড় করে। একটু ভয় হয়, চাপা অস্বস্তিও। ছেলেটা কি মাধবীর সঙ্গে নির্মলের সম্পর্কের ব্যাপারটা আন্দাজ করে? নাকি নির্মলই কিছু একটা বুঝিয়েছে? হাতের ঘামে-আঁটা চিঠিটা দুমড়ে মুঠোর মধ্যে লুকোয়। 'স্পেশাল আবার কিসে?' স্বরে বিরক্তি ধরা পড়ে।

রতন এতক্ষণে সিলিং-এর কাছে চলে যায়। ওপর থেকে একবার নীচের দিকে তাকায়। বিড়ি টানা হলদে দাঁতে হাসে। গোঁফের রেখা লম্বা দেখায়। রতনকে ভারিকি মনে হয়। 'আপনি তো এইসব লাইন বাদ দিয়ে একেবারে নতুন লাইন বসানোর কথা বলে এসেছেন দোকানে? শুধু চকচকে পাখাটা আপনার পুরনো ভাড়ার। ব্যাস ওতেই সব ঠিক! নির্মলদা সব বুঝিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না।' ছেলেটি সিলিং-এর পুরনো কাঠে হাত বুলোয়, ফাঁক-ফোকরে আঙুল, হাতের মুঠি ঢুকিয়ে টানে। 'আপনি চুপ করে বসে দেখুন, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।'

মাধবী স্বস্তির শ্বাস ফেলে। নির্মল তাহলে রতনকে এইসব বোঝায়! মাধবী দোকানে গিয়ে নিজেই এত সব অর্ডার দিয়ে এসেছে? কবে? কি ভেবে মাধবী চাপা কৌতুক বোধ করে। নিজের মনেই হেসে ওঠে। চিবুক নরম হয়। ঘরের এক কোণে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। দরদর করে ঘামে মাধবী। রতনের কাজ নিখুঁত করে দেখে যায়।

রতন চলে গেলে মাধবী ঘরের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। ফুল স্পীডে পাখা ঘুরে যায়। সারা ঘর যেন হাওয়ায় দোলে, ভাসে। মাধবী চারপাশের দেয়ালে চোখ বুলোয়। সদ্য সেরে-ওঠা পুরনো খোস-পাঁচড়ার খোসা উঠলে যেমন দেখায়, ঘরের চার দেয়াল সেই রকম। তার গায়ে বসানো নতুন তারের ইলেকট্রিক লাইন, সুইচ বোর্ড, রেগুলেটার! পুরনো ডি সি পাখায় খুব যত্ন করে রং করে পাঠিয়েছে নির্মল! এখন একেবারে নতুন! সমস্ত ব্যাপারটা কেমন বিশ্রী, বেমানান মনে হয় মাধবীর। চোখে লাগে।

কি ভেবে পাখা বন্ধ করে। একেবারে থেমে যাওয়া পর্যন্ত পাখাটা লক্ষ্য করে। সিলিং-এর চারপাশের ঘন হয়ে জমা এখানে-ওখানে আটকে থাকা ঝুলে কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে যায়। মাধবী মেঝেয় বসে। হাতের মুঠোয় সেই চিঠি! এতক্ষণ পরে খামটা ছিঁড়ে কাগজের টুকরো বের করে।...'মাধবী, জানি হঠাৎ এই পাখা দেখে তুমি ভীষণ রেগে যাবে। কিন্তু তোমার জন্য নয়, তোমার বাবা-মা ভাই-বোনদেরও তো কাজে লাগাতে পারে এটা। একখানা ঘর! তার ওপর যা অসহ্য গরম। পাখাটা যেন ফেরত পাঠিও না। বরং ঠিকমত বসিয়ে নাও! বলা যায় না, এতে মাথা ঠাণ্ডাও হতে পারে।' শেষটা পড়েই মাধবী হাসে। চিঠির শেষে নাম লেখে নি নির্মল। মাধবী চিঠিটা আর একবার পড়ে নেয়। কি ভেবে কাগজটা ছিঁড়ে দলা পাকায়। বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

উত্তেজনায় ঘেমে ওঠে মাধবী। রেগুলেটারের কাছে এসে পাখার স্পীড কমায়। পাখা ঘুরিয়ে মেঝেয় চিত হয়ে শোয় ও। মাধবী ভীষণ রাগতে পারে এমন কি রেগে পাখা ফেরত পাঠিয়েও দিতে পারে—নির্মলের এই ধারণা। তার জন্যেই এই টুকরো চিঠি। চিঠির শেষে সেই ঠাট্টা।

মাধবী পাখার ঘুরন্ত ব্লেডগুলোর ছায়া লক্ষ্য করে। অন্যমনস্ক হয়ে যায়। শেষ দেখা হওয়ার দিন। সন্ধ্যের দিকে কথা বলতে বলতে পার্কের বেঞ্চে গিয়ে বসেছিল ওরা। নির্মল ঠাট্টার সুরেই কথা বলছিল। তার পরে কখন যেন কি একটা কথায় মাধবী ভীষণ রেগে ওঠে। নির্মলও গম্ভীর হয়ে যায়।...

'তুমি কি বলতে চাও, বল?' মাধবী নির্মলের থেকে সামান্য দূরত্ব তৈরী করে নেয়।

নির্মল মাধবীর দিকে তাকায় না। নিরাসক্তের মত উদাস বসার ভঙ্গি। 'আমার মতে, আর দেরী করা ঠিক নয়।'

'তা হয় না।' মুখ ঘুরিয়ে বসে। দৃষ্টি পার্কের গাছের মাথায়।

'কেন হয় না,' নির্মলও তাকায় না। একটা সিগারেট ধরায়।

'অনেকবার বলেছি তোমায় নির্মল।'

জাতে আমি এক ধাপ নীচে বলে? ঠোঁটে চাপা সিগারেট কেঁপে ফেঁপে যায়।

ওটা কোন কথাই নয়। তা হলে তো একেবারে গোড়াতেই আমাদের না মেশা উচিত ছিল।

'তুমি না মানলেও, তুমিই তো বলেছ, তোমার বাবা মা তো ভয়ংকর জাতের বিচার করেন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ! নির্মল হাসে।

'সময় এলে ওঁরা অন্য কথাও বলতে পারেন। আগেকার দিনের মানুষ, একটু জাত-টাত নিয়ে ভাবলে আমরা রাগব কেন?' সোজা তাকায় নির্মলের দিকে?

'তা হলে,' নির্মল মাধবীর বড় বড় চোখে দৃষ্টি মেলায়।

মাধবী দৃষ্টি সরায়। সামনে দীঘির জলের ঢেউ-এ দৃষ্টি নাচে। 'বলেছি তো, আমার অনেক দায়িত্ব আছে। বাবা আর এক বছর বাদেই রিটায়ার করবে। ছোট ছোট ভাই-বোন—এদের কথা ভাবতে হবে।'

'তা হলে কোনোদিনই আর তোমার আসা হবে না।' একটা হতাশ ফাঁকা আকাশে এক টুকরো মেঘের মত নির্মলের স্বরে লেগে যায়।

'তুমি কি স্বার্থপরের মত ভালবাসা চাও?' মাধবীর স্বর তীক্ষ্ণ। দু'চোখের সাদা জমি দীপ্ত হয়।

নির্মলের হাতে সিগারেট জ্বলে যায়। স্থির দৃষ্টি রাখে মাধবীর দিকে। ঈষৎ হাসে। 'স্বার্থপর না হলে তুমি কিছুই পাবে না মাধবী।'

'আমার ভালবাসা সকলকে নিয়ে।' মাধবীর স্বরে প্রতিবাদ। 'ওদের সকলকে অসহায় দেখে আমি চলে আসতে পারি না।' মাধবী কিছু সময় কি ভাবে। বিমর্ষ গলায় বলে 'আমি বাবার বড় মেয়ে, ছেলের মত।'

মাধবীর স্বরের বিমর্ষভাব বুঝি নির্মলকেও স্পর্শ করে যায়। নির্মল বিষণ্ণ বোধ করে। নির্বিকার থেকে বার কয়েক সিগারেট টানে। 'তুমি তা হলে দিনরাত টিউশানি করে করে সংসার বইবে, আর আমি তা দেখে যাবো?' নির্মল যেন চাপা অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

'কেন? সময় হলেই বাবা-মাকে সব বলব। তোমার কথা মতো বাবা-মা ভাই—বোনদের লুকিয়ে আমি চলে আসতে পারব না?' মাধবী কিছুর জন্য যেন অপেক্ষা করে। 'আমি সকলকে নিয়েই বাঁচতে চাই।'

ওলা কোন ভাড়া না নিয়েই চলে যায়। নির্মল বুঝি ভাড়াও আগে মিটিয়ে দিয়েছে। বিড় বিড় করে মাধবী। রিকসওলার অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে থাকে। এক সময়ে দরজা বন্ধ করে। শব্দ করে খিল দেয়।

'কোন ঘরে লাগাবেন?' রতন এবার অনেক সহজ। মাধবীর মুখ চোখ দেখে।

মাধবীর ভিতরে এক-টুকরো হাসি লেগে জড়িয়ে যায়। মুখের রেখায় তা কয়েক মুহূর্ত থেমে থাকে। নির্মল বুঝি ছেলেটিকে বলেই দিয়েছে ওদের দু'তিন-খানা ঘর? মিথ্যে বলে মাধবীর অবস্থা ঢেকেছে বুঝি? রতনের দিকে তাকায়। 'কোন ঘর আবার? একখানাই তো! এসো!' মাধবী ঘরে ঢোকে।

রতন জিনিসপত্তর সব ঘরের মেঝের গুছোয়। মইটা একদিকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখে। সিলিং নিখুঁত করে দেখতে থাকে।

'দেখে আর কি হবে?' মাধবী রতনের দিকে তাকিয়ে থাকে। 'দেখছ তো পুরনো লাইন। সব তার ছেঁড়া দেয়াল থেকে ঝুলে পড়েছে। একটু কিছু হলেই লাইন শট। সুইচ বোর্ড বলতে তো এই!' ঠোঁট বাঁকায় মাধবী। ওর গলায় নীরস ঠাট্টার ভাবটা স্পষ্ট করে তোলে। 'এতে আবার পাখা!' স্বরে কোন চাপা উদ্দেশ্য ধরা পড়ে ওর। কথাগুলো রতন ফিরে গিয়ে নির্মলকে বলুক, এই মুহূর্তে ও যেন তাই চায়। কথার স্বরে তাচ্ছিল্য, উপহাস মিশে থাকে।

তাতে কি হয়েছে এর থেকে কত পুরনো সব ঘরে পাখা ঝুলিয়ে এসেছি!' রতন অভিজ্ঞের গলায় কথাটা বলে থামে। মইটা ঘরের মাঝামাঝি সিলিং-এ ঠেকিয়ে রাখে।' আপনার তো এসপেশাল কেস!'

'তার মানে!' মাধবী কথাটা যেন বিড়বিড় করে। একটু ভয় হয়, চাপা অস্বস্তিও। ছেলেটা কি মাধবীর সঙ্গে নির্মলের সম্পর্কের ব্যাপারটা আন্দাজ করে? নাকি নির্মলই কিছু একটা বুঝিয়েছে? হাতের ঘামে-আঁটা চিঠিটা দুমড়ে মুঠোর মধ্যে লুকোয়। 'স্পেশাল আবার কিসে?' স্বরে বিরক্তি ধরা পড়ে।

রতন এতক্ষণে সিলিং-এর কাছে চলে যায়। ওপর থেকে একবার নীচের দিকে তাকায়। বিড়ি টানা হলদে দাঁতে হাসে। গোঁফের রেখা লম্বা দেখায়। রতনকে ভারিকি মনে হয়। 'আপনি তো এইসব লাইন বাদ দিয়ে একেবারে নতুন লাইন বসানোর কথা বলে এসেছেন দোকানে? শুধু চকচকে পাখাটা আপনার পুরনো ভাড়ার। ব্যাস ওতেই সব ঠিক! নির্মলদা সব পৌঁছিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না।' ছেলেটি সিলিং-এর পুরনো কাঠে হাত বুলোয়, ফাঁক-ফোকরে আঙুল, হাতের মুঠি ঢুকিয়ে টানে। 'আপনি চুপ করে বসে দেখুন, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।'

মাধবী স্বস্তির শ্বাস ফেলে। নির্মল তাহলে রতনকে এইসব বোঝায়! মাধবী দোকানে গিয়ে নিজেই এত সব অর্ডার দিয়ে এসেছে? কবে? কি ভেবে মাধবী চাপা কৌতুক বোধ করে। নিজের মনেই হেসে ওঠে। চিবুক নরম হয়। ঘরের এক কোণে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। দরদর করে ঘামে মাধবী। রতনের কাজ নিখুঁত করে দেখে যায়।

রতন চলে গেলে মাধবী ঘরের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। ফুল স্পীডে পাখা ঘুরে যায়। সারা ঘর যেন হাওয়ায় দোলে, ভাসে। মাধবী চারপাশের দেয়ালে চোখ বুলোয়। সদ্য সেরে-ওঠা পুরনো খোস-পাঁচড়ার খোসা উঠলে যেমন দেখায়, ঘরের চার দেয়াল সেই রকম। তার গায়ে বসানো নতুন তারের ইলেকট্রিক লাইন, সুইচ বোর্ড, রেগুলেটার! পুরনো ডি সি পাখায় খুব যত্ন করে রং করে পাঠিয়েছে নির্মল! এখন একেবারে নতুন! সমস্ত ব্যাপারটা কেমন বিশ্রী, বেমানান মনে হয় মাধবীর। চোখে লাগে।

কি ভেবে পাখা বন্ধ করে। একেবারে থেমে যাওয়া পর্যন্ত পাখাটা লক্ষ্য করে। সিলিং-এর চারপাশের ঘন হয়ে জমা এখানে-ওখানে আটকে থাকা ঝুল কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে যায়। মাধবী মেঝেয় বসে। হাতের মুঠোয় সেই চিঠি! এতক্ষণ পরে খামটা ছিঁড়ে কাগজের টুকরো বের করে।...মাধবী, জানি হঠাৎ এই পাখা দেখে তুমি ভীষণ রেগে যাবে। কিন্তু তোমার জন্য নয়, তোমার বাবা-মা ভাই-বোনদেরও তো কাজে লাগাতে পারে এটা। একখানা ঘর! তার ওপর যা অসহ্য গরম। পাখাটা যেন ফেরত পাঠিও না। বরং ঠিকমত বসিয়ে নাও। বলা যায় না, এতে মাথা ঠান্ডাও হতে পারে।' শেষটা পড়েই মাধবী হাসে। চিঠির শেষে নাম লেখে নি নির্মল। মাধবী চিঠিটা আর একবার পড়ে নেয়। কি ভেবে কাগজটা ছিঁড়ে দলা পাকায়। বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

উত্তেজনায় ঘেমে ওঠে মাধবী। রেগুলেটারের কাছে এসে পাখার স্পীড কমায়। পাখা ঘুরিয়ে মেঝেয় চিত হয়ে শোয় ও। মাধবী ভীষণ রাগতে পারে এমন কি রেগে পাখা ফেরত পাঠিয়েও দিতে পারে—নির্মলের এই ধারণা। তার জন্যেই এই টুকরো চিঠি। চিঠির শেষে সেই ঠাট্টা।

মাধবী পাখার ঘুরন্ত বোল্টগুলোর ছায়া লক্ষ্য করে। অন্যমনস্ক হয়ে যায়। শেষ দেখা হওয়ার দিন। সন্ধের দিকে কথা বলতে বলতে পার্কের বেঞ্চে গিয়ে বসেছিল ওরা। নির্মল ঠাট্টার সুরেই কথা বলছিল। তার পরে কখন যেন কি একটা কথায় মাধবী ভীষণ রেগে ওঠে। নির্মলও গম্ভীর হয়ে যায়.....

'তুমি কি বলতে চাও, বল?' মাধবী নির্মলের থেকে সামান্য দূরত্ব তৈরী করে নেয়।

নির্মল মাধবীর দিকে তাকায় না। নিরাসক্তের মত উদাস বসার ভঙ্গি। 'আমার মতে, আর দেরী করা ঠিক নয়।'

'তা হয় না।' মুখ ঘুরিয়ে বলে। দৃষ্টি পার্কের গাছের মাথায়।

'কেন হয় না,' নির্মলও তাকায় না। একটা সিগারেট ধরায়।

'অনেকবার বলেছি তোমায় নির্মল।'

'জাতে আমি এক ধাপ নীচে বলে?' ঠোঁটে চাপা সিগারেট কেঁপে ফেঁপে যায়।

ওটা কোন কথাই নয়। তা হলে তো একেবারে গোড়াতেই আমাদের না মেশা উচিত ছিল।

'তুমি না মানলেও, তুমিই তো বলেছ, তোমার বাবা মা তো ভয়ংকর জাতের বিচার করেন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ! নির্মল হাসে।

'সময় এলে ওঁরা অন্য কথাও বলতে পারেন। আগেকার দিনের মানুষ, একটু জাত-টাত নিয়ে ভাবলে আমরা রাগব কেন?' সোজা তাকায় নির্মলের দিকে?

'তা হলে,' নির্মল মাধবীর বড় বড় চোখে দৃষ্টি মেলায়।

মাধবী দৃষ্টি সরায়। সামনে দীঘির জলের ঢেউ-এ দৃষ্টি নাচে। 'বলেছি তো, আমার অনেক দায়িত্ব আছে। বাবা আর এক বছর বাদেই রিটায়ার করবে। ছোট ছোট ভাই-বোন—এদের কথা ভাবতে হবে।'

'তা হলে কোনোদিনই আর তোমার আসা হবে না।' একটা হতাশ ফাঁকা আকাশে এক টুকরো মেঘের মত নির্মলের স্বরে লেগে যায়।

'তুমি কি স্বার্থপরের মত ভালবাসা চাও?' মাধবীর স্বর তীক্ষ্ণ। দু'চোখের সাদা জমি দীপ্ত হয়।

নির্মলের হাতে সিগারেট জ্বলে যায়। স্থির দৃষ্টি রাখে মাধবীর দিকে। ঈষৎ হাসে। 'স্বার্থপর না হলে তুমি কিছুই পাবে না মাধবী।'

'আমার ভালবাসা সকলকে নিয়ে।' মাধবীর স্বরে প্রতিবাদ। 'ওদের সকলকে অসহায় দেখে আমি চলে আসতে পারি না।' মাধবী কিছু সময় কি ভাবে। বিমর্ষ গলায় বলে 'আমি বাবার বড় মেয়ে, ছেলের মত।'

মাধবীর স্বরের বিমর্ষভাব বুঝি নির্মলকেও স্পর্শ করে যায়। নির্মল বিষণ্ণ বোধ করে। নির্বিকার থেকে বার কয়েক সিগারেট টানে। 'তুমি তা হলে দিনরাত টিউশানি করে করে সংসার বইবে, আর আমি তা দেখে যাবো?' নির্মল যেন চাপা অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

'কেন? সময় হলেই বাবা-মাকে সব বলব। তোমার কথা মতো বাবা-মা ভাই—বোনদের লুকিয়ে আমি চলে আসতে পারব না?' মাধবী কিছুর জন্য যেন অপেক্ষা করে। 'আমি সকলকে নিয়েই বাঁচতে চাই।'

সব পলিয়েস্টার কাপড়েই 'টেরীন' ট্রেডমার্ক লাগতে পারে না

আমরা মনে
করি তার কারণটা
আপনার জেনে রাখা ভাল

'টেরীন'® ট্রেডমার্ক থেকে আপনি এটা যে পলিয়েস্টারের কাপড় শুধু জানতে পারেন তাই নয়। এটা যে পরীক্ষিত, পলিয়েস্টারের কাপড়, 'টেরীন' পলিয়েস্টারের কাপড়ের নির্মাতা কেমিক্যালস্ অ্যাণ্ড ফাইবার্স অফ ইণ্ডিয়া (ক্যাফি) দ্বারা পরীক্ষিত কাপড় সে কথাও জানতে পারেন। একটা পরীক্ষার কথাই ধরুন— ঘষাঘষির পরীক্ষা।

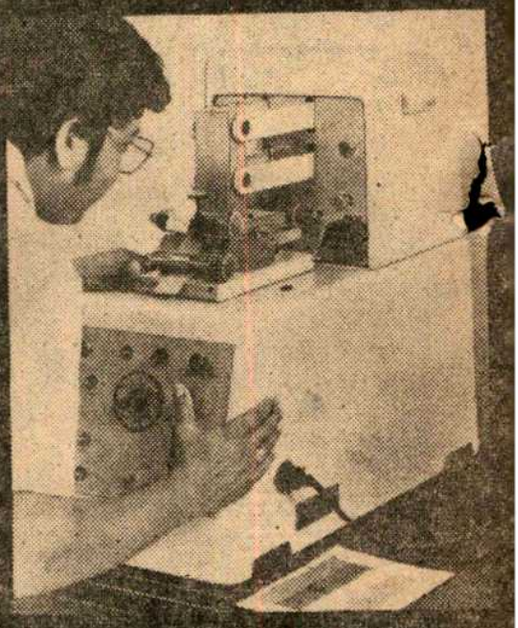

এই পরীক্ষায় বুঝতে পারা যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাচ্চারা স্লাইডে খেলা করলে বসার জায়গায় ট্রাউজারের কাপড় কি ধরনের ঘষাঘষির ধকল সহ্য করতে পারে।

ক্যাফি পরীক্ষাগারে কাপড়ের একটি টুকরো নিয়ে তা আমাদের ঘষাঘষির পরীক্ষার যন্ত্রে পরীক্ষা করা হয়। বিশেষ ধরনের ব্লেড দিয়ে কাপড়ের এক দিক থেকে অন্য দিক পর্যন্ত ঘষা হয়। তাতে যদি কাপড়ের ওপর দাগ-ছোপ পড়ে তাহলে কাপড়ে 'টেরীন' ট্রেডমার্ক লাগান হয় না।

'টেরীন' কাপড় কেনা মানে— আপনার পয়সার সত্যিকারের সদ্ব্যবহার।

তার কারণ, আপনি যাতে পয়সা খরচ ক'রে সেরা জিনিষ পান তার জন্যে কাপড় নানা ভাবে পরীক্ষা করতে আমরা কোন কসুর রাখি না। আমরা শুধু কাপড়ের ঘষাঘষি সহ্য করার শক্তিই পরীক্ষা করি না। কাপড়ে যাতে ভাঁজের দাগ না পড়ে, কাপড় যাতে কুঁচকে না যায়, রঙ যাতে পাকা হয় তারও পরীক্ষা—আরও অনেক পরীক্ষা করি আমরা। এর মধ্যে যে কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে কাপড়ে 'টেরীন' ট্রেডমার্ক পড়ে না।

আমরা বিশেষভাবে পুঙখানুপুঙখ পরীক্ষা করি বলেই আপনি 'টেরীন' ট্রেডমার্ক লাগানো একমাত্র বাছাই বাছাই কাপড় পান। এসমস্ত কাপড় 'টেরীন' ফাইবার দিয়ে তৈরী করে উৎকর্ষ সচেতন কয়েকটি মিল—সেই সমস্ত মিল যারা ডিজাইন ও বুনটের ক্ষেত্রে নতুন রেওয়াজ ও হাল ফ্যাশানের কাপড় আপনার জন্যে তৈরী করে। সেই সঙ্গে মনে রাখবেন, এসব মিলের কাপড় উত্তীর্ণ হয়েছে কঠোর গুণমান পরীক্ষায় আমাদের।

কাপড়ে 'টেরীন' ট্রেডমার্ক দেখে নেবেন— আপনারই স্বার্থে।

TERENE

® 'টেরীন'—কেমিকল্যালস অ্যাণ্ড ফাইবার্স অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

CHAITRA CAFI-457 BEN

বুঝেছি আমার কথা তুমি ভাবছ না!

'কেন? বেশ তো ইলেকট্রিকের দোকান করেছ। স্বাধীন ব্যবসা। সাত সাতটা বছর বেকার থেকে টিউশানি করে এখানে-ওখানে টুকটাক কাজ করে শেষে নিজের মনের মত ব্যবসা করেছ। আমি এটাই তো জীবন পছন্দ করি নির্মল। সাহস দেবার মত চোখে মাধবী নির্মলের মুখের ওপর দৃষ্টি রাখে।

'এই। তার বেশী কিছু না,' নির্মলের চোখে মুখে স্বরে ঠাট্টার ভানে বিস্ময়ে আটকে আছে।

'আমায় সময় দাও নির্মল। বাবা মার দিকে তাকিয়ে স্থির থাকতে পারি না। বাবা কি ভয়ংকর পরিশ্রম করছে। মা ওইটুকু ঘরে থেকে সামলাবার চেষ্টা করছে। ওই একখানা ঘর, এতজন লোক। এমন গরমের দিনে দমবন্ধ হয়ে যায়। তবু ওরই মধ্যে বেঁচে আছি আমরা বছরের পর বছর। আমি বড় হয়েছি। এবার বাবাকে কিছুটা রিলিফ দি। আমি তোমার কাছে এলে বাবা-মাও রিলিফ পাবেন। কিন্তু সমস্ত রকম সম্পর্ক বজায় রেখে আসতে পারলেই সবচেয়ে বড় রিলিফ আমরা দুজন পাবো, ওঁরাও পাবেন। মাধবী একটানা কথা বলে যায়। একটু যেন চাপা উত্তেজনায় হাঁপায়।

নির্মল মাধবীকে স্থির দৃষ্টিতে দেখে। 'আমি তোমায় বুঝতে পারি না মাধবী।' সিগারেট কখন নিভে যায়। বিরক্তিতে আধ-পোড়া সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দেয়। 'সব কিছুতে সময় নেওয়া ভাল, কিন্তু সময়টা যখন দেরী করিয়ে দেয়, তখন কিন্তু অনেক ফাঁক চোখে পড়ে। তাকে আর ভর্তি করা যায় না।' 'সারাজীবন তুমি একটা চারপাশ ছেঁড়া ময়লা কাপড়ের মত সংসারে তালি দিয়ে যাবে, আমি তা ভাবতেই পারি না। আমি ভয় পাই।' হঠাৎ দাঁড়ায় নির্মল। চলি। তুমি কথাটা ভেবো দেখো। কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে নির্মল মাধবীর দিকে পিছন ফিরে দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে যায়। একবারও পিছনের দিকে তাকায় না। অদৃশ্য হয়ে যায় ও।

মাধবী স্থির বসে থাকে। নির্মলের অবিশ্বাস, সংশয়, উপেক্ষা মাধবীকে যেন এক জটিল অপমান-বোধে ঢেকে দেয়। নেমে আসা সন্ধ্যের ছায়ায় মাধবী ক্লান্ত বোধ করে। এখনি আর একটা টিউশানিতে যেতে হবে ভেবে আরও!...

সেদিন নির্মল মাধবীকে বোঝেনি। স্বার্থপরের মত ভালবাসা চেয়েছিল নির্মল। এমন উপেক্ষায় চলে যাওয়ায় তা স্পষ্ট হয়। মাধবী তারপর থেকে দেখা করেনি। নির্মল এই কদিনে ক্রমশ মাধবীর রাগ অভিমানে অনুভব করে। তাই পাখাটা হঠাৎ পাঠায় এমনভাবে। মাধবী অস্থির হয়। অন্যমনস্কতা সরে যায়। পাখার বাতাসে ক্লান্তি আরও স্পষ্ট হয় শরীরে। বাবা মা পরের ভাইবোন, একেবারে ছোট বাপ্পা, মলি সব এই রোববারের ছুটিতে মামার বাড়ি গেছে। সারা বাড়ি নির্জন। মাধবী এক সময় এই নির্জনতা বুকে নিয়ে ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যায়।

সন্ধ্যের একটু পরেই মধ্যমগ্রাম থেকে ফিরে আসেন নন্দগোপাল—মাধবীর বাবা। সঙ্গে মাধবীর মা পারুলতা, ভাইবোনেরা। বুবু ওদের আগেই মামার বাড়ি থেকে বেরিয়ে খেলার মাঠে চলে যায়। এখনো আসেনি।

মাধবীর পরের বোন করবী প্রথম ঘরে পা দিয়েই বিস্ময়ে স্থির হয়ে যায়। সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে থাকে। 'ওমা আমাদের ঘরে পাখা!' মুহূর্তে ঘরের একদিকে দাঁড়িয়ে থাকা মাধবীকে স্থির-বিস্ময়ের চোখে দেখে নেয়।

একেবারে ছোট ভাই বাপ্পা আর ছোট বোন মলি করবীর পাশে দৌড়ে এসে দাঁড়ায়। একসঙ্গে হাততালি দিয়ে ওঠে। নন্দগোপাল, পারুলতা ঘরে ঢোকেন। পারুলতা হাতের প্লাস্টিকের চুপড়িটা মেঝেয় এক কোণে রেখে দেন।

পাখা কোত্থেকে এলোরে মাধু? নন্দ-গোপাল ভুরু কুঁচকে মাধবীকে দেখেন।

পারুলতা উত্তরের অপেক্ষায় মেয়ের দিকে স্থির তাকিয়ে থাকেন। দু'চোখে বিস্ময় সামান্য যুক্তির জন্য অপেক্ষা করে।

মাধবী এতক্ষণ মুখ টিপে হাসছিল। বাবার গম্ভীর মুখের দিকে তাকায়। 'আমি নিয়ে এলাম।'

'তুই! কই আমাকে তো একবারও বলিসনি।' নন্দগোপাল মেয়ের দিক থেকে দৃষ্টি সরান না। 'পাখাটা কিনলি? এত টাকা পেলি কোথায়?'

মাধবীর মুখে চোখে হাসি লেগে থাকে। 'কিনব কেন, ভাড়া করলাম, তোমার যা কষ্ট। চোখে দেখা যায় না। কদিন ধরেই তাই ভাবছিলাম।'

নন্দগোপালের কপালের রেখা অদৃশ্য হয়ে যায়। কি ভাবেন। 'কষ্ট হোক, তবু এতগুলো টাকা নষ্ট করলি। একেই সংসার চলে না মা আমাদের' নন্দগোপালের স্বরে হতাশা আক্ষেপ ভেসে থাকে। ঝকঝকে রেগুলেটার, নতুন তারের লাইন লক্ষ্য করেন।

'তাতে কি? আর একটা টিউশানি নেব। গরমের কটা মাস তো?' মাধবী সহজ হতে চেষ্টা করে। স্বস্তির শ্বাস ফেলার ভঙ্গি করে স্বর টানে।

পারুলতা এতক্ষণ মেয়েকে নিবিষ্ট চোখে দেখছিলেন। 'আর কত উৎকণ্ঠা চাপা ধমকের মত শোনায়।

'ওসব কথা থাক তো।' মাধবী হঠাৎ সব আলোচনার সিদ্ধান্ত টেনে আনে। 'তোমরা এখন কাপড়-চোপড় ছাড় তো। সবকিছু তোমাদের না ভাবলেও চলবে।' শেষ কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে বাবা-মার দিকে স্নেহার্দ্র দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়। অন্তরঙ্গ স্বর কিছুটা চাপা কর্তৃত্বময় শোনায়।

বাপ্পা, মলি এতক্ষণে মেঝেয় শুয়ে পড়ে, খেলার ছলে গড়াগড়ি দেয়। এমন ঘর ভর্তি বাতাসে ওরা চিৎ হয়ে শোয়। পাখার ব্লেড দেখে। ঘরের একদিকে মেঝেয় করবী বসে। ঘাড়ের কাছে ভারী চুলের খোঁপা তুলে বাতাস নেয়। মাধবী ওর পাশে আসে। 'কিরে, খুশী তো?'

করবী হাসে। 'দিদি, তুই খুব ভাল রে? আমার কি যে আনন্দ হচ্ছে।' মাধবীকে দেখে। 'এবার একদিন রত্না, দীপিকাদের আমাদের ঘরে নিয়ে আসব। একে ঘর নোংরা, তাতে সব সময় যা গরম। ওরা কতবার আসবে বলে, আনতে লজ্জা করত!'

মাধবী হাসে। 'নিশ্চয়ই আনবি।' ফিসফিস করে ও। করবীর অভিযোগ অভিমান, অসহায়তার নীচে যে চাপা মুক্তির স্বরটুকু আস্তে আস্তে সরে যায়, মাধবী লক্ষ্য করে। বড় ভাল লাগে ওর। করবীর খুশীতে ভাসা মুখ বার বার নিখুঁতভাবে দেখে, অতি সন্তর্পণে!

দালানের ও কোণে বাথরুম থেকে নন্দগোপালের মুখ-হাত ধোয়ার শব্দ কানে আসে। পারুলতা যেন গজগজ করার মত কিছু বলেন।

মা-বাবা এই নিয়ে রেগে যাবে না তো মাধবী করবীকে গলা নামিয়ে বলে। শংকার সঙ্গে হাল্কা কৌতুক মিশে থাকে চাপা স্বরে।

'তুই থাম তো দিদি।' করবী দালানের দিকে তাকায়। 'বাবার কি কষ্ট, সে কি আর দেখি না? এই গরম, তার উপর মশা! বাবাই তো কতবার একটা পাখার কথা বলেছে না?' একটু থামে। 'মা তো উঠতে-বসতে বাবাকে বলে, তোমার ছেলে থাকলে দেখতে ঠিক একটা পাখা ঘরে ঝুলত। নন্দগোপালকে এদিকে আসতে দেখে করবী থেমে যায়।

বাপ্পা হঠাৎ কখন বাইরে গিয়েছিল। এই মুহূর্তে হাতে তালপাতার ভাঙ্গা পাখাটা নিয়ে ঢোকে। 'দিদি, এবার এটার শেষ।' সঙ্গে সঙ্গে দুমড়ে মুচড়ে পাতা-গুলো ছিঁড়তে বসে যায়।

পারুলতা হাঁ হাঁ করে ওঠেন। 'বাপ্পা, দাও ওটা।' কেড়ে নেন, 'রান্নাঘরে লাগবে না?'

মলি দেয়ালে পাশাপাশি পুরনো ক্যালেন্ডার দুটো দু-হাত দিয়ে চেপে ধরে। 'এই দিদি, ছবি দুটো পড়ে যাবে। কী ভীষণ উড়ছে।' খেলা পেয়ে যায় মলি।

'পড়ুক।' করবী ধমক দেবার মত বলে? 'ওসব কাল পরিস্কার করব। এখন থাক।' ঘরের চারপাশ দেখে। 'ইস, ঘর যা নোংরা! গা ঘিনঘিন করে।'

নন্দগোপাল পাখার ঠিক নীচে মোড়া টেনে বসেন। করবী দেয়ালে ঠেস দিয়ে আরাম করে। বাপ্পা, মলি নানান খেলা পেয়ে যায় পাখার হওয়ার সংগে সংগে।

মাধবী কাউকে বুঝতে না দিয়ে নিখুঁত লক্ষ্য করে যায়। বাবার সারা গায়ে এমন গরমে বিজবিজ করা ঘামাচি। বাপ্পা মলি, করবীর মুখে হাতে মশার কামড়ের বিশ্রী সব দাগ। গরমের ঘাম বসে বসে সকলেই কমবেশী ফর্সা হলেও চামড়ার রং কেমন বিবর্ণ, মলিন। করবীটা দেখতে মন্দ না। তবু গরমের ঘাম জমে জমে ওর ঘাড়ের কাছে, খোঁপার নীচে এক স্তর ময়লা জমে খারাপ দেখায়। এবার আর এসব থাকবে না। সারাদিন খেটে এসে রাতে গরমে বাবা-মা কেউ ঘুমোতে পারে না। দু'চোখের গোড়ায় অসহায় ক্লান্তির কালো ছোপ। এবার সব বাতাসে যেন ধোয়ামোছা হয়ে যাবে। সারাদিনের কাজের মধ্যে, শেষেও সকলে তৃপ্তির সংগে কথা বলতে পারবে। এটুকু ঘরের মধ্যে কাছে কাছে থাকবে—এটাই তো লাভ। মাধবী যেন সে সব কিছু আস্তে আস্তে অনুভব করে। দু'চোখ গভীর গাঢ় প্রীতির অনুভবে বুজোয়।

রাতে শোয়ার আগে বিছানা পাতার সময়ে ওদের ঘরে আজ যেন হুল্লোড় শুরু হয়। ছোট-খাটো একটা উৎসবের রাত তৈরী হয়ে যায়।

নন্দগোপাল গরমের জন্যে দালানে মাদুর পেতে শোন। বুবু সতেরোয় পড়ল। কি গরমে, বর্ষায়, শীতে—কারোর গা ঘেঁসে শুতে চায় না। ও দালানে বাবার পায়ের দিকে এক চিলতে জায়গায় শরীর দুমড়ে শুতে অভ্যস্ত। ঘরের মেঝেয় জায়গা কম। চারদিকের দেয়াল ঘেঁসে বাক্স, সুটকেশ, নোংরা লেপ-তোষকের বিছানা, ছেঁড়া মাদুর, থালা-বাসন, মায়ের প্রতিদিনের পটের পুজোর ঠাকুর, মোড়া, বালতি, চালের টিন, একটা ভাঙ্গা চেয়ার, ছেঁড়া ময়লা কাপড় ঢাকা ভাঙ্গা মিটসেফ বেশ কিছু পুরনো ডিবে, ছেলেমেয়েদের পড়ার বই ঠাসা র‍্যাক আরও অনেক কিছু। এসবের মধ্যে রাতের শোবার আগে কিছু জিনিস এধার-ওধার সরিয়ে শোয় পারুলতা, মাধবী, করবী, বাপ্পা, মলি। আরশুলো, ইঁদুর, টিকটিকি, পোকা-মাকড়—কিছুর ভ্রূক্ষেপ থাকে না ওদের। কতবার যে বিষাক্ত বিছের ভয়ে সিঁটকে থেকেছে ওরা।

আজ মাধবীই প্রথম বলে, 'বাবা, তুমি ঘরে শোও। এবার থেকে প্রতিদিন শোবে।'

নন্দগোপাল হাসেন। 'কি করে হবে? এই ঘরে জায়গা কোথায়?'

'ঠিক হয়ে যাবে।' মাধবী বলে, তুমি দেখ, আমি ঠিক করে দিচ্ছি।'

'তা হয় না মা।' নন্দগোপাল বাধা দেন। 'আমি বরং ঘরের দরজার সামনে দালানে শুই। পাখার বাতাস পাবো।'

কেন তুমি না করছ? পারুলতা রান্নার কাজ সেরে ঘরে আসেন। এতদিন তো কি কষ্টই না করলে। এখন পাখা আছে কেভাবে হাক হয়ে যাবে।

বুবু বলে, 'আমি কিন্তু দেয়ালের ধারে শোব। এবার থেকে আমার জায়গা ফিক্‌স্‌ড থাকবে।'

করবী চেঁচিয়ে ওঠে। 'কেন, এবার তো আর গরম থাকবে না। যেখানে পাবি শুয়ে পড়বি।'

পারুলতা বললেন, 'এই ঘরেই সব হবে। একদিকে পুরুষরা শোও, আমরা মেয়েরা একদিকে শুই।'

সেভাবে জায়গা করতে পারবে না মা এত জিনিসপত্তর।' মাধবী বলে বুবুর গলা চড়ায়। 'সব কাল ঘর থেকে দূর করে ছুঁড়ে ফেলে দেব। মা যা পেরেছে সব ঘরে জড়ো করেছে।'

পারুলতা ছেলেকে দেখেন। 'এসব এতদিন এভাবে ছিল বলেই তো ঠিকঠাক সব কিছু পেয়েছিস রে বুবু! বড় হলি কোত্থেকে?'

'তা হলে ওদেরই পাখার বাতাস খেতে দাও মা। আমরা যা ছিলুম তাই থাকি! বুবুর স্বরে রাগ তৈরী হয়।

নন্দগোপাল এতক্ষণ লক্ষ্য করছিলেন। বেশ তো আজকের মত যা হোক করে শুয়ে নাও। কাল ঘর-দালানের সমস্ত জিনিস পত্তর নতুন করে সাজানো হবে।' মাধবীর দিকে তাকালেন নন্দগোপাল।

মাধবীর ভাল লাগে বাবার কথা। 'ঠিক তাই। কাল সব ঘর গোছানো হবে। তখন যে যেখানে শুতে চাও, বলে দিও।'

একটু রাত করেই সব শোয় আজ। নন্দগোপাল দেয়াল ঘেঁষে শোন। পাশে বাপ্পা মলি মলির পাশে করবী এ পাশের দেয়াল ঘেঁষে মাধবী। ওদের পায়ের দিকে জানালার নীচে বেশ কিছুটা জায়গা পড়ে থাকে। বুবু ওখানে পা ছড়িয়ে শোয়। নন্দগোপালের মাথার কাছে অনেক ঘন হয়ে কোল কুঁজোর মত হয়ে শোন পারুললতা।

নতুন পাখা। ফুল স্পীডের বাতাস প্রথম প্রথম সহ্য হয় না। মাধবী একটু কম করে গা সয়ে ওঠার মত স্পীডে পাখা চালিয়ে রাখে। ঘর অন্ধকার। সারাদিন ওরা মধ্যগ্রাম মামার বাড়ি কাটিয়েছে বলে ক্লান্তিতে নতুন পাখার হাওয়ায় আরামে একটুতেই ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যায়।

মাধবী নিঃসাড় জেগে থাকে। কোন কিছু ভাবতে চায় তবু ভাবনা আসে না। ভাবনাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে সরে যায়।

'আহ ছটফট করছ কেন? এখনো ঘুমোও নি!' নন্দগোপাল অস্বস্তির মধ্যে পাশ ফেরেন।

'তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলে?' পারুললতার চাপা স্বর স্পষ্ট হয়।

নন্দগোপাল হাই তোলেন। 'নাহ ঘুম আসছে না।' একটু থামেন। 'তুমি ঘুমোচ্ছ না কেন? ওখানে তো বলছিলে শরীরটা ভাল নেই!' যেন গজ গজ করেন।

কিছু সময় নীরবতায় সরে যায়।

'মাধুকে তুমি বকতে পারতে। কিছু বললে না!' পারুললতা যেন গভীর চিন্তা থেকে কথাটা বলে ফেলেন।

'কেন?' নন্দগোপালের স্বরে বিস্ময় আটকে থাকে। ঘুমের ভাব এখন নেই।

'এতগুলো টাকা এক সংগে খরচ করলো তার ওপর আবার একটা টিউশানি নেবে বলছে।' থামেন পারুললতা। 'একে তো ওই চেহারা বয়স হচ্ছে গাল তো ভেংগে গেছে। বিয়ে দিতে হবে না?' দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

'তাতে আমি বকলে কি হবে? ও শুনবে?' থামেন নন্দগোপাল। 'তুমিও তো বলতে পারতে?'

পারুললতা নীরব থাকেন কয়েক মুহূর্ত। 'আমি বললে তো বকা-ঝকা করব। ও যা মেয়ে কান্নাকাটি করবে।' বাবা-মা ভাই বোনদের ওপর এত মায়া মেয়েটার! কি যে হবে।' পারুললতার চাপা শ্বাস ফেলার শব্দ পাখার বাতাসে ভেসে যায়।

নন্দগোপাল উত্তর দেন না।

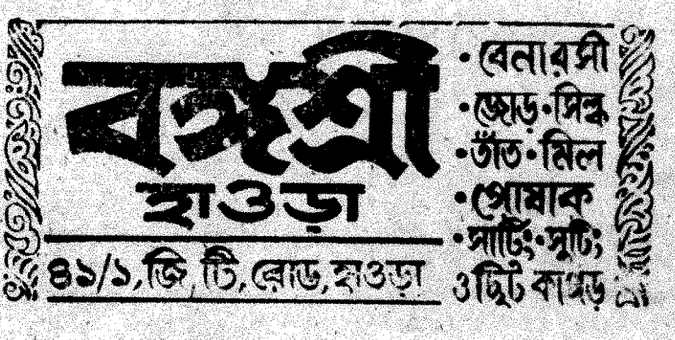

শ্রোতাদের সৌন্দর্যতৃষ্ণার তাগিদেই বাংলা গানকে আবার ফিরে আসতে হবে তার নিজের জায়গায়। আজ গানের ক্ষেত্রে যেটা চলছে সেটা শিল্পীদের প্রকৃতি নয় বিকৃতি।

রবীন চট্টোপাধ্যায়

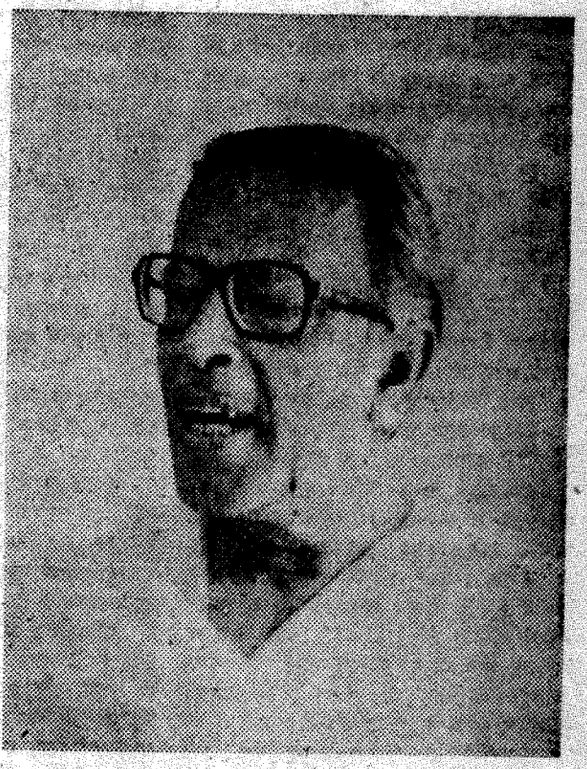

লিখতে বসে বারবার চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। বারবার সামনে ভেসে উঠছে ঢাকুরিয়ার রবীন্দ্রদার বাড়ীর একটি বিকেল। সেদিন সন্ধ্যায় ছিলো আনন্দশংকরের বিবাহের রিসেপশন, ১৯৭৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর। পারিস হলে। তার আগে অশোক বসু (ইলা বসুর স্বামী) পূর্ব-নির্ধারিত এ্যাপয়েন্টমেন্ট অনুযায়ী নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়ী এর আগের ঘটনাও এই প্রসংগে বলা দরকার। তার আগে অন্ততঃ পাঁচ বছর ধরে যতবার যেখানে দেখা হয়েছে ও'র দেওয়া-সুরের গান সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করতে গেলেই হেসে বলতেন 'দেখলেই বুঝি যত প্রশ্ন সব একসঙ্গে টপ্‌-বগ করে ওঠে? এত আগ্রহ যখন একদিন বাড়ীতে গেলেই ত হয়? প্রাণভ'র আলোচনা করা যাবে।—যাব যাব করেও যাওয়া হয়ে ওঠেনি এবং উঠতও না, যদিনা শ্যামবাজার ও ঢাকুরিয়ার দূরত্বের ব্যাবধান ঘুচিয়ে দুজনকে আলোচনায় বসাবার দায়িত্ব নিতেন অশোকবাবু (বসু) এজন্য একটা মস্তবড় ধন্যবাদ তাঁর পাপ্য। রবীনবাবুর জীবনের আলোয় আমার শ্রদ্ধার আলো যোগ করা হোলো না। তবু মরণোত্তর স্মৃতি তর্পণ করার সুযোগ পাওয়া গেলো অশোকবাবুরই দৌলতে। 'কবে আন্দাজ বার হবে?'—রবীনবাবু বারবার জিজ্ঞেস করেছিলেন। শীগ্গির।

সেই 'শীগ্গির' এলো আজ এতোদিনে। দু-বছর বাদে। অতিব্যস্ত সাংবাদিক জীবনের একটি অভিশাপ হোলো এই। নানামুখী ঘটনার গড্ডালিকা-প্রবাহে ভাসতে ভাসতে মনের কত সংকল্প যে কতবার কেন্দ্রচ্যুত হয়ে যায়। আর তারই ফাঁকে হারিয়েছি শ্রদ্ধেয় কালিপদ পাঠক কমল দাশগুপ্ত শচীন দেববর্মণের মত যুগস্রষ্টাদের—যে ক্ষতির কোনো সান্ত্বনা নেই।

এ লেখা শিল্পী পড়বেন না। তাঁর প্রসন্ন-কণ্ঠের আশীর্বাদে নিজেকে সার্থক মনে হবার দুর্লভ সৌভাগ্যও ঘটবে না। কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতার আলোয় তখনকার বাংলাগানের ঐশ্বর্যবন্ধুকে তুলে ধরার কর্তব্য থেকে বঞ্চিত হবনা। এই ভেবেই খুসী থাকতে হবে।

শুভ্রকেশ ও স্মিতহাসি নিয়ে রবীনবাবু এসে বসেছিলেন একেবারে ঘরোয়া মেজাজে শেষ অবধি আসা হয়ে উঠলো তাহলে?—এবার সাজাও পুষ্পগুচ্ছের মত তোমার সুন্দর প্রশ্নগুচ্ছ। শিল্পীদের কাছে তোমার প্রশ্নের খ্যাতি শুনেছি। এ অভাগাকে ঘিরে কতটুকু কিভাবে আবর্তিত হয় দেখা যাক।

আমার গানের প্রেরণা? দশ বছর বয়স থেকে। গান তখন ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাতালিকাভুক্ত হওয়া দূরের কথা নেশাগ্রস্ত হওয়ার মতই অনিষ্টকর বস্তু বলে গণ্য হোতো। মেয়েরা বিবাহের সু-পাত্রী হবার জন্য একটু-আধটু গান শিখতেন।

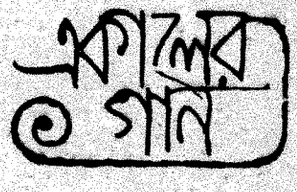

মায়েরা ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়াবার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সংগীতচর্চা করতেন। আর ছেলেরা? অভিভাবকদের লুকিয়ে সিগ্রেট খাবার মত নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে এবং বিবাহ বাসরে শ্যালিকাবৃন্দের মাঝে যেটুকু গাইতেন। মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েদের গানবাজনার চর্চা ছিলো এ অবধিই।

আমার মনে গানের ছবি গড়ে উঠলো কেমন করে? এ প্রশ্নের জবাবে তখনকার সংগীত জগতের পটভূমিকাটুকুই যতখানি পারি তুলে ধরছি। পাড়ায় তখন ধ্রুপদ গানের চল ছিলো। তখনকার সংগীত-গুণিকরা বেশীর ভাগই ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ভালোবাসতেন। নজরুলের গান খুবই জনপ্রিয় ছিলো। অতুলপ্রসাদের গানও যথেষ্ট সমাদৃত হোতো। রবীন্দ্রসংগীত সবে সুরু হয়েছে।

যাঁরা শুনছেন-বুঝতে পারছেন এখানে কিছু একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু তখনও রবীন্দ্রসংগীতের এমন বহুলপ্রচার হয়নি এবং এ গান তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। জনশিক্ষার ব্যাপকতার অভাবে।

মঙ্গলগ্রহের সন্ধানে ভাইকিং

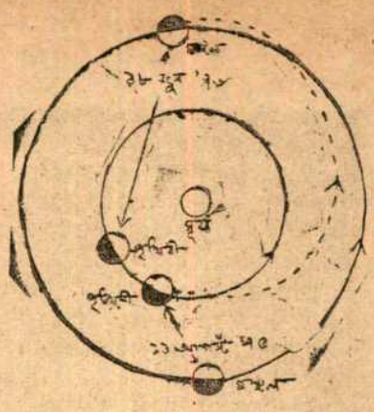

মহাকাশ-গবেষণার ক্ষেত্রে ভাইকিং ইতিহাস সৃষ্টি করেছে সমস্ত দিক থেকে। আমেরিকান বিজ্ঞানীরা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

পরিকল্পনা ছিল আমেরিকার দ্বিশতবার্ষিকীর একটি অবিস্মরণীয় উদ্‌যাপনের ঘটনা হিসেবে ১৯৭৬ সালের ৪ জুলাই তারিখে ভাইকিং-এর ল্যান্ডার বা অবতরণ-যানকে মঙ্গলের মাটিতে নামানো হবে। এই কারণে ১৯৭৫ সালের ১১ই আগস্ট তারিখে প্রথম ভাইকিংকে ও ২১শে আগস্ট তারিখে দ্বিতীয় ভাইকিংকে রওনা করিয়ে দেবার কথা ছিল। এখানে মনে রাখা দরকার পৃথিবী থেকে মঙ্গলে যাত্রা করার সবচেয়ে অনায়াস যাত্রা-পথটির (অর্থাৎ সবচেয়ে কম শক্তি-খরচের পথটির) নাগাল পাওয়া যায় ২৫ মাস পরে পরে। ১৯৭৫ সালের আগস্টে এমনি এক সুযোগ ছিল। আর সেই সুযোগই গ্রহণ করা হয় এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে আমেরিকার দ্বিশতবার্ষিকীর দিনটি (৪ঠা জুলাই) একটা ঐতিহাসিক কীর্তির দ্বারা চিহ্নিত হয়ে থাকবে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কিছু ত্রুটি ধরা পড়ার জন্য যাত্রার দিনটি পিছিয়ে দিতে হয়। মাঝপথেও ঘটে যায় রেডিও-যোগাযোগের কিছু গন্ডগোল। তারপরে মঙ্গলের কক্ষে স্থাপিত হবার পরেও অবতরণের দিন একাধিক বার স্থগিত রাখতে হয় ঠিকমতো মসৃণ একটি স্থান খুঁজে বার করার জন্য। এই খোঁজ করার কাজটি কিভাবে চালানো হচ্ছে? না মঙ্গলের কক্ষে পরিক্রমারত ভাইকিং মঙ্গলের উপরিতলের ফটো তুলে পৃথিবীতে পাঠাচ্ছে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা তাই দেখে স্থান বাছাই করছেন ও হুকুম পাঠাচ্ছেন। আরো মনে রাখা দরকার পৃথিবী ও সূর্য ও মঙ্গল যে বিশেষ অবস্থানে থাকার সময়ে এই ব্যাপারগুলো ঘটছে তাকে বলা হয় পৃথিবী ও মঙ্গলের প্রতিযোগ। অর্থাৎ সূর্য রয়েছে মাঝখানে তার একদিকে পৃথিবী অন্য দিকে মঙ্গল। এমনিতে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ১৪৯ মিলিয়ন কিলোমিটার বা ৯৩০ লক্ষ মাইল সূর্য থেকে মঙ্গলের দূরত্ব ২২৮ মিলিয়ন কিলোমিটার বা ১,৪১৭ লক্ষ মাইল। অর্থাৎ পৃথিবী ও মঙ্গল যদি সূর্যের একই দিকে থাকে (সংযোগ) তাহলে দুটি গ্রহের মধ্যে সর্বনিম্ন দূরত্ব হতে পারে ৭৯ মিলিয়ন কিলোমিটার বা ৪৮৭ লক্ষ মাইল। কিন্তু ঠিক এই সময়ে গ্রহ দুটি যে-যে অবস্থানে রয়েছে তাতে দুয়ের মধ্যে দূরত্ব হয়ে গিয়েছে ৩৮৪ মিলিয়ন কিলোমিটার বা ২৪০০ লক্ষ মাইল (২৪ কোটি মাইল)। এই দূরত্ব পার হতে বেতার-সংকেতের সময় লাগে পুরো আঠারো মিনিট।

এই বিপুল দূরত্বের অবস্থার মধ্যে অবতরণ ঘটানো হয়েছিল অতি নিখুঁতভাবে। দিন গুণে গুণে চাঁদের মাটিতে মানুষের প্রথম পা দেবার (২০শে জুলাই ১৯৬৯) ঠিক সাত বছর পরে ২০শে জুলাই ১৯৭৬)।

অবতরণের ব্যাপারটি কিভাবে ঘটেছিল?

ভাইকিং মহাকাশযানের দুটি অংশ—একটিকে বলা হয় ল্যান্ডার অন্যটিকে অরবিটার। নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে ল্যান্ডার অবতরণ করবে আর অরবিটার কক্ষপথে পরিক্রমারত থাকতে। অবতরণের সময় উপস্থিত হলে অরবিটার থেকে ল্যান্ডার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ও সেকেন্ডে ৩০ সেন্টিমিটার বেগে মৃদু একটি ঠেলা খায়। ল্যান্ডারটি সংরক্ষিত ছিল একটি ঢাকনা মোড়কের মধ্যে পৃথিবীতে উৎক্ষেপণের আগে এই মোড়কটিকে উন্মুক্ত করা হয়েছিল যাতে পৃথিবীর কোনো জীব মঙ্গলে চলে আসতে না পারে। প্রথমে এই মোড়কটি বর্জিত হয়। তারপরে ল্যান্ডারকে ঠিকভাবে বিন্যস্ত করে চালু করা হয় আটটি ছোট রকেট যাতে গতিবেগ কমে। মোট ২৩ মিনিট চালু থাকে এই আটটি রকেট। গতিবেগ কমতেই ল্যান্ডার মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণের টানে নামতে শুরু করে। তিন ঘন্টা ধরে নামে এবং অবশেষে মঙ্গলের বায়ুমন্ডলের ওপরের স্তরে পৌঁছয়। বায়ুমন্ডলের ঘর্ষণে ল্যান্ডারের গতিবেগ আরো কমে। এই ঘর্ষণের দরুণ সৃষ্ট উত্তাপে ল্যান্ডারের যাতে কোনো ক্ষতি না হয় তার ব্যবস্থা ল্যান্ডারে আছে। মঙ্গলের উপরিতল থেকে ল্যান্ডার যখন ৫,৭০০ মিটার উঁচুতে তখন একটি প্যারাসুট খুলে যায়। অবতরণের শেষ পর্যায়ে আবার চালু হয় তিনটি রকেট—ল্যান্ডারের গতিবেগ কমিয়ে আনে ঘন্টায় ৮-৮ কিলোমিটারে। ল্যান্ডারের তিনটি ঠ্যাং মাটি স্পর্শ করা মাত্র আপনা থেকেই ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়।

ল্যান্ডারের হাত মঙ্গলগ্রহের জমি থেকে মাটি তুলছে

শুধু ফুল আর ফুল

প্রকৃতির আশ্চর্য্য সৃষ্টি ফুল
হাতে হাত রেখে আমরা এগিয়ে চলি...
আর মৃদু বাতাসে ফুলেরা শিউরে ওঠে... দুলে ওঠে।
ওর পোষাক... শলকা—স্বচ্ছন্দ।
মৃদু কুজনের মত নরম আমার শাড়ী।
এই ফুলের সমুদ্র—এই অবিস্মরণীয় দিন—
শুধু দুজনের।

ওদের শাড়ী, শার্টিং... ঠিক ধরেছেন... মফৎলালের।
মফৎলাল কাপড়ের নানান রূপ
সুটিং • শার্টিং • শাড়ী
• ব্লেস মেটিরিয়াল • শার্ট

MAFATLAL GROUP

everest/464/MS-ba

অবতরণ নিখুঁত হতে পারে যদি এত সব কাজের প্রত্যেকটি ঠিকভাবে ঠিক সময়ে সম্পন্ন হয়।

আগেই বলেছি আমেরিকান বিজ্ঞানীরা ল্যান্ডারের অবতরণ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করেছেন।

১৯৬৫ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানীদের মেরিনার-৪ মঙ্গলের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময়ে মঙ্গল সম্পর্কে কিছু খবর পাঠিয়েছিল। সেই খবর থেকে বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছিল মঙ্গলের উপরিতলে রয়েছে চন্দ্রের উপরিতলের মতো অজস্র গহ্বর এবং মঙ্গল চন্দ্রের মতোই মৃত। মঙ্গলে জীবনের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে এমন আশা যাঁরা করতেন তাঁরা হতাশ হয়েছিলেন। ১৯৬৯ সালে মেরিনার-৬ ও মেরিনার-৭ পুনরায় মঙ্গল সম্পর্কে খবর পাঠিয়েছিল। তাতেও বিজ্ঞানীদের হতাশ কাটে নি। তারপরে ১৯৭১ সালে তৈরি হয় মঙ্গলের কক্ষ-পরিক্রমাকারী উপগ্রহ মেরিনার-৯। তার মারফৎ মঙ্গলের যে-সব খবর পাওয়া যায় তা ছিল রীতিমতো উৎসাহজনক। নিঃসন্দেহে জানা গিয়েছিল মঙ্গলের মাটি নানাভাবে বিন্যস্ত ও ভূ-গতভাবে সক্রিয়। মঙ্গলের নদী পথে এক সময়ে জলের ধারা প্রবাহিত ছিল। বিজ্ঞানীরা ভাবতে শুরু করেন মঙ্গলে হয়তো প্রাণের অস্তিত্ব আছে। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ-গবেষণায় মঙ্গলগ্রহের সন্ধান কার্য হয়ে ওঠে বিরাট একটি প্রকল্প।

এই বৈজ্ঞানিক সন্ধান কার্যের থাকবে তিনটি মৌলিক দিক।

(১) অরবিটার থেকে মঙ্গলের ফটো তুলে মঙ্গলের ব্যাপক অনুসন্ধান-কার্য চালানো হবে।

(২) মঙ্গলের উপরিতলে ল্যান্ডার অনুসন্ধান করবে জীবনের বা জৈব প্রক্রিয়ার সাক্ষ্য।

(৩) উভয় মহাকাশযান সংগ্রহ করবে গ্রহ-সম্পর্কিত ভৌতিক তথ্য তার বায়ুমন্ডল ও তৎসহ উপরিতলের ভূতত্ত্ব ও আভ্যন্তরিক কাঠামো।

অরবিটার ও ল্যান্ডার থেকে পাওয়া ফটো থেকে জানা যাবে মঙ্গলের ভূ-প্রকৃতি ভূ-স্তর ভাঁজ সন্ধি চ্যুতি শিলার ধরন ক্ষয় পলি ও জমি সম্পর্কিত তথ্য। জানা যাবে মঙ্গলের জমির খনিজ ও রাসায়নিক গড়ন। যদি মঙ্গলের ভূমিকম্প টের পাওয়া যায়—টের পাওয়া যাবে বলেই মনে হয়—তা থেকে জানা যাবে মঙ্গলের কোর বা অধি আছে কিনা; আছে কিনা আবরণ বা মানটল ক্রাস্ট বা ত্বক থাকলে কোন্‌টা কতদূর পর্যন্ত।

ভাইকিং-এর রেডিও ও রেডার ব্যবস্থা থেকে আরো ভালোভাবে জানা যাবে মঙ্গলের আকার ভর মাধ্যাকর্ষণগত ক্ষেত্র উপরিতলের ঘনত্ব বিদ্যুৎ চৌম্বক ধর্ম এবং বায়ুমন্ডলের ঘনত্ব ও আলোড়ন। জানা যাবে মেঘের গড়ন ও চলাচল এবং জলীয় বাষ্পের পরিমাণ।

ভাইকিং থেকে মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে যে-সব তথ্য পাওয়া গিয়েছে তা এই ধারণার সৃষ্টি করেছে যে অতীতে এক সময়ে হয়তো মঙ্গলগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব থাকার উপযোগী অবস্থা ছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য যা পাওয়া গিয়েছে—যা আশা করা যায় নি—তা হচ্ছে মঙ্গলের বায়ুমন্ডলে অল্প পরিমাণ নাইট্রোজেনের অস্তিত্ব। এবং মঙ্গলের মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণ অকসিজেনের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। মঙ্গলে প্রকৃত কোনো ধরনের প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা তা আবিষ্কার করতে ভাইকিং-এর আরো কিছু সময় লাগবে।

ভাইকিং-এর জন্য একটি আবিষ্কারে বিজ্ঞানীরা কিছুটা অবাক হয়েছেন। মঙ্গলগ্রহে যতোটা আশা করা গিয়েছিল আগুন আছে তার চেয়ে অনেক কম। আশা করা গিয়েছিল থাকবে ২৫ শতাংশ আছে মাত্র ৩ শতাংশ। তাতে অবশ্য সুবিধেই হয়েছে। ভাইকিং-এর ল্যান্ডার এখন ব্যবহার করতে পারবে—যাকে বলা হয় গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফ ম্যাস স্পেকট্রোমিটার—এবং গ্রহের উপরিতলের গড়ন বিশ্লেষণ করতে পারবে। বায়ুমন্ডলে প্রচুর আর্গন থাকলে এই বিশ্লেষণ কিছুতেই সম্ভব হত না।

২০শে জুলাই তারিখে মঙ্গলের উপরিতলে ল্যান্ডারের অবতরণের আঠারো মিনিট পরেই (এই আঠারো মিনিট সময় লেগেছিল রেডিও সংকেতের মঙ্গল থেকে পৃথিবী পর্যন্ত দূরত্ব পার হতে) পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা মঙ্গলের প্রথম রঙীন ফটো পেয়ে গিয়েছিলেন। সেই ফটো দেখে বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছে মঙ্গলকে যে লালগ্রহ বলা হয় তা অসঙ্গত নয়। মঙ্গলের বালির রং মরিচার মতো পাথরে আছে সামান্য সবুজ আভা। অনেকটা পৃথিবীর আগ্নেয়গিরির অঞ্চলে ভূ-দৃশ্যের মতো। মঙ্গলের আকাশও লাল (প্রথমে বলা হয়েছিল হালকা নীল কিন্তু সেটা ভুল বলা হয়েছিল) আকাশ মেঘহীন তবে কোথাও কোথাও সামান্য একটু ঝাপসা ভাব।

কোনো এক সময়ে মঙ্গলের বায়ুমন্ডলে হয়তো আরো অনেক বেশি নাইট্রোজেন ছিল। হয়তো সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মিতে নাইট্রোজেনের অণু ভেঙে গিয়েছে ছিটকে সরে গিয়েছে ও মহাশূন্যে উধাও হয়ে গিয়েছে।

মঙ্গলের বর্তমান বায়ুমন্ডল পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের চেয়ে একশো ভাগের এক ভাগ পাতলা। জলীয় বাষ্পের পরিমাণ পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে আছে তার হাজার ভাগের এক ভাগ। হয়তো আরো বেশি থাকতে পারত এমনও হতে পারে জলের অণুগুলো হাইড্রোজেন ও অকসিজেন বিভক্ত হয়ে মঙ্গলের দুর্বল মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

তবে মঙ্গলগ্রহের বয়স যা হিসেব করা হয়েছে—৪৬০ কোটি বছর—তাতে মনে হয় যতোটুকু জল উবে গিয়েছে তা দিয়ে বড়োজোর মঙ্গলের ৯০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত ঢাকা যেত। তবুও প্রত্যেক চিহ্নেই দেখা গিয়েছে নদীপথ ও প্রণালী যা লক্ষ লক্ষ বছর আগে জলধারার দ্বারাই সৃষ্ট মনে হয়। বাকি জল রয়েছে গ্রহের উপরিতলের নিচে জমাট অবস্থায়।

মঙ্গলে যদি জীবন থেকে থাকে তা আছে মাটির নিচে। জীবনের অস্তিত্ব থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সকল অবস্থা মঙ্গলের মাটির নিচে বর্তমান।

মঙ্গলের তাপমাত্রা রাত্রিবেলা নেমে যায় মাইনাস ১২৭ ডিগ্রী ফারেনহাইটে। সূর্য ওঠার পরে উত্তপ্ত হতে হতে তাপমাত্রা উঠে আসে মাইনাস ৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত।

পৃথিবীর সময়ের হিসেবে ২৪ ঘন্টা ৩৭ মিনিটে মঙ্গলের সবটি দিন।

পৃথিবীর ব্যাস ১২,৭৫৭ কিলোমিটার বা ৭,৯২৬ মাইল। মঙ্গলের ব্যাস ৬,৬০০ কিলোমিটার বা ৪,২১৬ মাইল। ঘনত্ব পৃথিবীর যদি এক হয় তাহলে মঙ্গলের ০-৭৪। সূর্যের চারদিকে কক্ষপথে পৃথিবীর একবার ঘুরতে সময় লাগে এক বছর মঙ্গলের লাগে পৃথিবীর সময়ের হিসেবে ১-৮৮১ বছর।

পৃথিবীর যেমন একটি চাঁদ মঙ্গলের দুটি—দাইমো ও ফোবো। দুটিই অতি ক্ষুদ্র।

(২-৮-৭৬)

অয়স্কান্ত

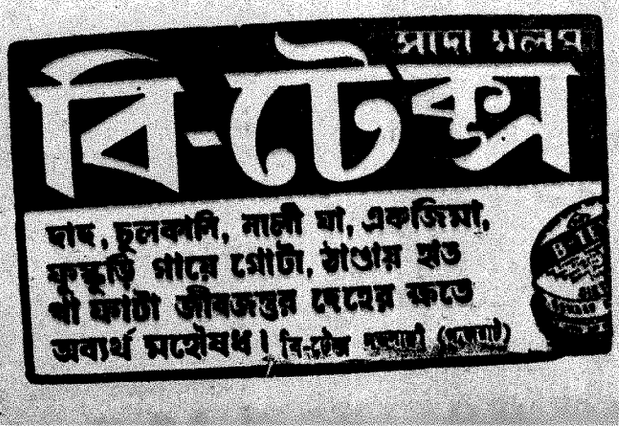

য় নিয়ে চার বছরের মেয়াদে এসেছিল। ও সুধা বলেছে, ছেলের আবার ফর্সা লা! কিন্তু তিনি জানেন, কথাটা ঠিক ।

সুরেশ্বর চোখ বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে লেন কিছুক্ষণ। আশা, পাখি ডাকবে। খির ডাক শোনার পর আর বিছানায় কতে পারেন না। কিন্তু পাখির ডাকের রবর্তে সুধার গলায় বিশ্রী গোঙানির শব্দ তে শুনলেন। বোবায় ধরেছে। সে চলে ওয়ার পর থেকে এমন প্রায়ই ধরে। ছাড়া বুকের ওপর দু-হাত জড়ো করে য়া ওর অভ্যাস। সুধার গায়ে হাল্কা হাত খে ডাকলেন, এই!

সুধা হুড়মুড়িয়ে উঠে বসে, কি কি য়েছে?

সুরেশ্বর বললেন, কিছু না। তুমি ঠিক য়ে শোও।

—ও! সুধার গলায় স্পষ্ট হতাশা। আমি ভাবলাম বিনুরা এসে গেছে।

শুনে হাসলেন না সুরেশ্বর, যদিও হাসিরই কথা। বিনু বৌমা দীপু—দের আসার কথা দুপুর সাড়ে দশটার ট্রেনে। এখনতো ওরা কোলকাতায়। নির্ঘাৎ ঘুমুচ্ছে। শেয়ালদা থেকে ট্রেন ছাড়বে সকাল আটটা সাঁইত্রিশে। তবে কি সুধা তাঁরই মত স্বপ্ন দেখছিল? ওর স্বপ্নে বিনুতো কবেই, সেও ছিল কি না জিজ্ঞেস করতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে খুব সামলে গেলেন। সুধা চিরকাল মনের দিক থেকে ভারি দুর্বল। টা একটা রোগ। বাড়তে বাড়তে এখন তা শেষ বিন্দু ছুঁয়েছে।

সুরেশ্বর টর্চের আলোয় ঘড়ি দেখলেন। ছনটে দশ। এতক্ষণে পাখির ডাক শুনতে পাওয়ার কারণ বোঝা গেল। সুধাকে শারী তুলে বিছানা থেকে নেমে যেতে দেখে লেন, চললে কোথায়?

—আর ঘুম আসবে না।

—না আসুক, তবু শুয়ে থাকো। এত কাল সকাল উঠলে যে আবার অসুস্থ হয়ে ড়বে। সুধা তবু নেমে যাচ্ছে দেখে সুরেশ্বর লেন, কি হল?

—তুমি মিছিমিছি ভাবছ। একদিনের নিয়মে কিছু হবে না।

—কিন্তু পরে বিনু যদি আমায় বকাঝকা রে?

—করবে না। দরজার কাছে থেকে সুধা স, আমি বুঝিয়ে বলব।

—বলার মত সময় পেলে তো বলবে। ন মনে বলেন সুরেশ্বর। সুধা হার্টের গী। অনিয়ম উত্তেজনা চিন্তা সবকিছুই শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর। অন্য সময় লা বেশ বাধা। কিন্তু বিনুরা আসবে শুনলে মন পাল্টে যায়। তখন ও ভীষণ রকমের দী আর একগুঁয়ে হয়ে পড়ে। বিনু যেন ৎসপত্নী স্থানী, এমনকি ওর ঈশ্বরেরও প্রতিদ্বন্দ্বী—অথবা বিনুই ঈশ্বর হয়ে ওঠে। সে বেঁচে থাকলে কি সুধার ভালোবাসা ভাগাভাগি হয়ে যেত না?

সুরেশ্বর খানিক আগে দেখা স্বপ্ন থেকে সরে আসতে চাইলেন। যে চলে যায় তাকে যেতে দেওয়াই ভালো। এমনিতেই মানুষের কতরকম দুঃখ। তার ওপর নতুন দুঃখ চাপানোর কোন মানে হয় না। তাছাড়া যা আছে তাইই বা কম কি?

কুয়োয় বালতি নামানোর শব্দে উঠে বসেন সুরেশ্বর। সুধাকে আজ সামলানো দায় হবে। টর্চটাও নিয়ে যায়নি। পাঁচ-ব্যাটারীর পেল্লায় আলোটা ওর দু-চোখের বিষ। বললে বলে, তা নয়। আমার দরকার হয় না। আসলে এর অস্বাভাবিক আকার এবং ওজন সুধার বইবার পক্ষে অতিরিক্ত। একটা টর্চ না হলেই চলছে না, আরো ভাবলেন, বিনুকে বলতে হবে। উঠোন পেরোনোর সময় অন্যরকম কিছু ভাঙ্গার মত শব্দ শুনলেন—সঙ্গে মৃদু চাপা আর্তনাদ। কুয়োতলা লক্ষ্য করে বোতাম টিপে আলো ছুঁড়লেন। সুধা বসে আছে।

—কি হল?

—এই দ্যাখোনা—সুধা কাঁদছে। ফুল-দানীটা হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে গেলো।

বিনু ফুল ভালোবাসে। ভালোবাসেন সুরেশ্বরও। সুধা দিল্লী থেকে কিনে আনা একজোড়া ফুলদানীর একটা তাঁকে দিয়েছিল, অন্যটা বিনুর। তারটা আগেই ভেঙ্গেছে—আজ বিনুরটা ভাঙ্গলো। সুরেশ্বর পরম মমতার গলায় ডাকলেন, সুধা। হাত ধরে তুলতে চেয়ে বলেন, ঘরে চলো। আমি ভাঙ্গা টুকরোগুলো ফেলে আসছি। রবির মা এলে ভালো করে ঝাঁট দিয়ে দিতে বলব। তার আগে তুমি আর এদিকে এসো না, শেষে পা কেটে কাণ্ড বাঁধাবে একটা।

—কিন্তু—সুধা সহজ হতে পারছে না।

—তুমি ওঠোতো। তারপর খানিকটা নিজের মনেই যেন বলেন, আলমারীতে আর একজোড়া ফুলদানী আছে। এত ভালো নয় অবশ্য। কিন্তু তাতে কি? ওরা কি ফুল-দানীর জাজ হয়ে আসছে?

সুধাকে সিঁড়ি অব্দি পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসেন সুরেশ্বর। সাধ্যমত ভাঙ্গা পোর্সি-লেনের টুকরোগুলো কুড়িয়ে পাশেই আব-র্জনা ফেলার গর্তে ছুঁড়ে দিতে দিতে কয়টা জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে যায়। হাত মুখ ধুয়ে ঘরে এসে, সুধা জবলন্ত লণ্ডন নিয়ে ফুলদানী খুঁজছে, দেখতে পেলেন। আলমারীর ওপরের তাকে হাত পৌঁছোয় না সুধার।

সুধা বলে, নামিয়ে রাখ। হাতে নিতে সাহস পাচ্ছে না। সামান্য উত্তেজনায় শরীর কাঁপে। সুরেশ্বর হাত ধরতেই সুধা চমকে ওঠে। নাড়ী বেশ দ্রুত। হৃদযন্ত্রের প্রতোকটি ধাক্কা জোরে জোরে বাজছে। ফলে মাঝে মাঝে একটা-দুটো বিট অনিয়মিত—অস্বাভাবিক। ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আদেশ করেন, না বলা পর্যন্ত উঠবে না।

সুধা অস্থির হয়ে ওঠে, তা কি করে হয়?

—আমি যখন বলছি তখন নিশ্চয়ই হয়। ক্রুদ্ধ সুরেশ্বরকে সুধা ভয় করে। ওকে শুইয়ে রাখতে হলে এছাড়া আর কোন পথ নেই। আমি ফিরে এসে যেন এভাবেই শুয়ে থাকতে দেখি।

সুধা চুপ করে আছে। লণ্ঠনের ম্লান আলোয় ওর মুখের সবগুলো রেখা আরো ঘন এবং গভীর দেখাল। চোখের গোটা জমি জল মাখানো। সুরেশ্বর সুধাকে জল খাইয়ে গত রাতের জামাকাপড় ছেড়ে বাগানে এলেন। সোয়া তিন কাঠার বাগান। তাও আধাআধি করে একদিকে ফুল, অন্যদিকে সবজী লাগিয়েছেন। টর্চের আলোয় লাউ কুমড়োর শুঁড়গুলোকে নড়তে চড়তে দেখলেন—যেন মানুষের হাতের আঙ্গুল। কিছু একটা ধরতে চাইছে—সুধার মত।

শীত বোধ হওয়ায় মনে পড়ল, কার্তিক প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। দিনকে দিন শীত বাড়তেই থাকবে। তখন সুরেশ্বর বিনুর দেওয়া ছাই ছাই রংয়ের বেশ দামী একটা মাঙ্কী ক্যাপ মাথায় মুখে চাপিয়ে, গরম মোজায় পা ক্যাম্বিসের জুতোয় গলিয়ে সকালে বাগানের কাজ করেন, সন্ধ্যেয় বেড়াতে বেরোন। এ বয়সে ঠাণ্ডার ভয়টাই বেশি। কোথাও কিছু নেই—দম করে লেগে যায়। সুরেশ্বর মৃত্যুকে ভয় পান না। পৃথিবীতে এসেছেন অনেকদিন হল। একজন মানুষের যা কিছু সাধ থাকতে পারে—একটু এধার ওধার করে সবই মিটেছে। ভালো খেয়েছেন, ভালো থেকেছেন। এখন শুধু চলে যাওয়াটাই যা বাকি। ষাট থেকেই তো মানুষের মৃত্যুর অপেক্ষা। তবে তাকে আগ বাড়িয়ে ডেকে আনতে কি নিজে থেকে কোন সুযোগ তৈরী করে দিতে তিনি নারাজ। আর সেজন্যেই তাঁর এত সতর্কতা। বিনু তার মাকে বলে, বাবার সবকিছুতেই ডাক্তারী।

না বললেও সুধা ছেলেকে কি জবাব দেয় সুরেশ্বর জানেন। সুধা ঐ রকম। সারা জীবনে কখনো কারো সামনে স্বামীর হয়ে একটা কথা বলেনি। কারণ, লজ্জা। এমন কি বৌমা যখন বলল, আসলে মায়ের অসুখ কোন অসুখই নয়। বাবাই বাড়াবাড়ি করে মাকে পঙ্গু করে দিচ্ছেন। তখনও সেই লজ্জা সুধার জিভ টেনে ধরেছিল। শুধু বলেছে, আমিও তো তাই বলি, কিন্তু শোনে কে?

সুরেশ্বর শুনেছিলেন শুধু নয়, সাত দিনের মধ্যে বাড়ি সহ এই জমিটুকু কিনে কোলকাতার বাস উঁড়িয়ে চলে এসেছেন। কাউকে কিছু বুঝতে দেননি অথবা ভুল বুঝিয়েছেন। বিনু আর বৌমা জানে, নিজের শরীরের থা ভেবেই সুরেশ্বর চলে এলেন। কোলকাতা কোনকালেই সুরেশ্বরকে সুস্থ থাকতে দেয়না। কাজেই, ওরা বিশেষ আপত্তি করেনি। সুধার জন্য ভাবনা ছিল। সুধা কেঁদেছে। কিন্তু কি ভেবে শেষপর্যন্ত সঙ্গ ছাড়েনি। ওকে আর কটা দিন বাঁচিয়ে রাখতে

চান সুরেশ্বর। কোলকাতায় তা সম্ভব ছিল না।

মাথার ওপর দিয়ে পাখিরা উড়ে যাচ্ছে। একটু পরে সূর্য উঠবে। আকাশ থেকে সরাসরি এক টুকরো রোদ প্রতিদিন তাঁর সোনা তিন কাঠার বাগানে এসে পড়ে। তখন সুরেশ্বর সবাইকে ক্ষমা করতে পারেন—এমনকি বৌমাকেও। আহা, ছেলেমানুষ। মনে হয়, তাঁরই বোঝার ভুল। হয়তো ভালো করতে চেয়ে অপকারই করছেন সুধার। সেই রোগা কালো ছেলেটা সব ভার নিজের হাতে তুলে না নিলে এরকমটা নাও হতে পারত। ভালো মন্দ এই সবকিছুইতো আপেক্ষিক। ভুলটা তাঁরই।

সুরেশ্বর পূর্বাস্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এখনও তাঁর চারপাশে অস্পষ্ট অন্ধকার লেগে আছে। হঠাৎই বসে পড়ে গাছের গোড়ার মাটি উল্টেপাল্টে দিতে শুরু করলেন। এতে মাটি জমাট বাঁধতে পারে না, নরম থাকে—জলগ্রহণ সুবিধে হয়।

কাজ শেষ হল সূর্য দিগন্ত পেরোনোর পর। হাত-পা ধুয়ে নানাজাতের একগুচ্ছ ফুল তুলে ঘরে এলেন। সুধা নেই। জানতেন থাকবে না। বিনুর ঘর ফিরে গোছাচ্ছে। ফুলদানীতে জল ভরে ফুল সাজিয়ে সুধার কাছে এলেন। তখনই মনে পড়ল, বৌমা লাউ ডাঁটা পছন্দ করে। নিজে গিয়ে কেটে আনলেন। রবির মা উনুনে দুধ ফোটাচ্ছে। পায়েস হবে। সুরেশ্বর জিভ কামড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। না, কার্টেনি বলেই তো মনে হয়। কুয়োতলা ভালো করে পরিষ্কার করেছ? রবির মা ওথলানো দুধের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে মাথা নাড়ে—হ্যাঁ।

এক গ্লাস দুধ সুধাকে খাইয়ে নিজে খেয়ে বাজারে পৌঁছোলেন। সুধার দেওয়া ফর্দ মিলিয়ে, তার সঙ্গে অতিরিক্ত দুটো একটা জিনিস কিনে যখন ফিরলেন, সুধা তখন স্নান পুজো সেরে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকেছে। সুরেশ্বর দীপুর জন্য উঠোনের একপাশে আমড়াগাছে ঝোলানো দোলনার দড়ি টেনে ঠিক আছে কিনা দেখলেন। বেশ মজবুত। পিঁড়িটা ভালোই ফিট করেছে। উল্টে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এর সবটুকু কৃতিত্ব রবির। কাল সারা বিকেল শুধু এইই করেছে। আজ আবার রবিই রিকসা করে স্টেশন থেকে ওদের তুলে আনবে।

—সুধা

—কি বলছ?

—রবির মাকে জিজ্ঞেস করত, ছেলেকে ঠিকমত সব বুঝিয়ে বলে এসেছে কিনা?

সুধা বলে, সে তোমাকে ভাবতে হবে না।

কুয়োতলা থেকে রবির মা চেঁচিয়ে ওঠে বলেছিগো বাবা, তুমি ভেবোনি।

ওরা সবাই তাঁকে ভাবতে বারণ করছে—আসল ভাবনা যাকে নিয়ে সেও। সুরেশ্বর হেসে ফেললেন। সাড়ে দশটার ট্রেন চলে যাওয়ার আধ ঘন্টা পরে রবি খালি রিকসা নিয়ে ফিরে এলো। পাছে সুধা শুনে ফেলে এই ভয়ে সুরেশ্বর চুপি চুপি বললেন, দুটো আটচল্লিশের গাড়িটা একবার দেখিস। এখন পালা। সুধা তখনও রান্না করছে। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বেরোল।

—আজও লেট?

—হ্যাঁ। সুরেশ্বর জেনেশুনে মিথ্যে বললেন।

—ক'মিনিট?

—মিনিট নয়—বল ঘন্টা, আড়াইটের আগে আসছে না।

—কি যে হল কালে কালে। একটা জিনিস যদি ঠিক মত হয়। বৌমা আবার একটুও ক্ষিদে সহ্য করতে পারে না। নিজের মনে গজ গজ করতে করতে সুধা আবারও রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে। রবির মা এই একটা অন্তত চুপ করে থেকে সুধার আয়ু বাড়িয়ে দিল দেখে সুরেশ্বর কৃতজ্ঞ বোধ করলেন। বিনু নিশ্চয়ই কোন কাজে আটকে গেছে। আর এইতো কাজের বয়স।

শেষ পর্যন্ত সুধা কিভাবে যেন জেনে গেল। সুরেশ্বর ভয়ে ভয়ে বললেন, বসে থেকে আর কি হবে? যাহোক দুটো খেয়ে নেবে চল।

সুধা শুধু বলল, আমি জানতাম।

কি করে জানল, কখন জানল, কে জানাল সেও সুধাই জানে। সুরেশ্বর কথা বাড়ালেন না। নামে মাত্র খেতে বসা। সুধা কিছুই খেল না। নিজেকে দিকে বুঝলেন, খাওয়া অসম্ভব।

শেষ ট্রেনের শব্দ দাঁতে দাঁত চেপে দুজনেই শুনলেন। অনেক রাত হয়েছে। রবি আবারও এলো। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। হর্ণ বাজিয়ে বাজিয়ে চলে গেল। সুধা উঠে গিয়ে রবির মাকে সব রান্না করা জিনিস দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে ফিরল। তারও অনেক পরে সুধা বলল, ওরা সব ভালো আছে তো?

—সে খবর নিয়ে কালই টেলিগ্রাম আসবে দেখো। সুধার কথা সুধাকেই আবার ফিরিয়ে দিলেন, ভেবো না।

তবে এলো না যে!

—কোন দরকারি কাজে আটকে গেছে হয়ত।

—হবে।

সুধা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না। এরপর আর কিইবা বলার থাকতে পারে। সুরেশ্বর নির্ভার হতে চেয়ে বুঝলেন, চিন্তা ভাবনা যুক্তি বুদ্ধি সব কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। শরীর অবসন্ন। ক্লান্ত।

—দীপু অনেকটা ওর মত, তাই না?

ওর মত মানে? সুধার মুখে প্রশ্নটা এত আচমকা উচ্চারিত হয় যে বুঝে উঠতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল। ঠিকই বলেছে সুধা। বিনু বৌমা দুজনেই ফর্সা। দীপু কালো। রোগা এবং ছোটমতন। কি করে হয়? সুরেশ্বর যুক্তিবাদী মানুষ। জন্মান্তরঘটিত কিছু নয় বলেই বিশ্বাস। এক্ষেত্রে, তাঁর ধারণা, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণই সংগত।

ভাবতে ভাবতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন সুরেশ্বর। এক সময় স্বপ্নের হাত ধরে ওর কাছে পৌঁছেও গেলেন। দীর্ঘশ্বাসের হাওয়ায় ছেলেটা কেঁপে উঠল এবং সুরেশ্বর ঘুম ভেঙ্গে সুধার বুকের ওঠা-পড়া দেখলেন। অস্বাভাবিক। সুধা খানিক দূরত্বে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। তাঁর আর সুধার মাঝখানের জায়গাটা বিনুর জন্য—হয়ত ওর জন্যও সংরক্ষিত। সুধা বিনু সে এবং সুরেশ্বর—এখন পৃথিবী এইটুকুতে এসে ঠেকেছে। এই ফাঁকটুকু পেরিয়ে সুধার কাছে যেতে হলে ওদের সঙ্গে নিয়েই যেতে হবে। সুরেশ্বরের একমাত্র পরিচয়, তিনি দুটি সন্তানের জনক। বিনু আজ এলো না। কাল পরশু কিম্বা অন্য কোনদিন নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু তাকে ফিরিয়ে আনবেন কি করে?

কি মনে হতে সুরেশ্বর উঠে পড়লেন। সুধা জেগে ওঠে, তাই সন্তর্পণে খিল খুলে উঠোনে এসে দাঁড়ালেন। পৃথিবী এখন স্তব্ধ। অস্পষ্টভাবে দোলনাটা চোখে পড়ল। দুলছে। পায়ে পায়ে দোলনার কাছে চলে এলেন। ধীরে ধীরে ঠেলা দিতে দিতে তাঁর মনে হল, স্বপন নিকটবর্তী হচ্ছে। নাকি তিনি নিজেই স্বপনের কাছাকাছি চলে যাচ্ছেন।

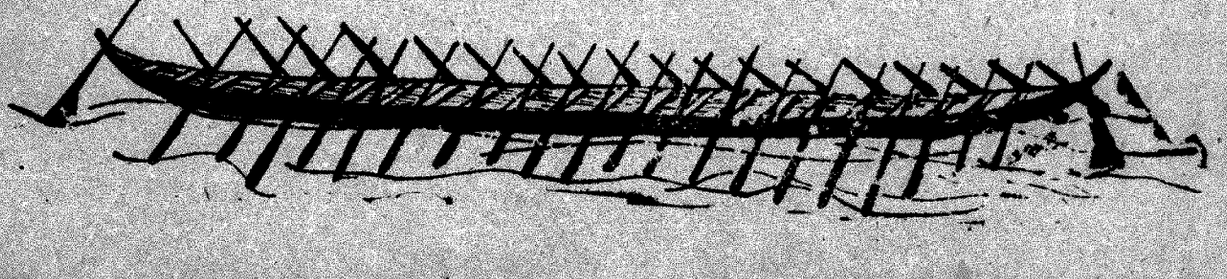

প্রদীপ ব্যানার্জি

প্রদীপ ব্যানার্জি—ছোট্ট একটি নাম। কিন্তু নাম মাহাত্ম্য ব্যাপ্তিতে বিরাট। আমাদের ফুটবলের গোটা সংসারটিই ওই নামগানে সোচ্চার। দেশজুড়ে ঘরে ঘরে অষ্ট-প্রহর সংকীর্তন। কখনো খেলোয়াড়, আবার কখনো প্রশিক্ষক। প্রদীপের জয়জয়কার যেমন যৌবনে, তেমনি উত্তরপর্বেও।

খেলোয়াড় প্রদীপের শিখা নিভে গেছে কবে। তবুও স্মৃতির আয়নায় প্রদীপের আলো আজও ঝলমলিয়ে রয়েছে। সে স্মৃতি সুখকর। ফুটবলের আধুনিকতার ছাপছোপে রাঙানো পরম অর্থবহ প্রতীক। বলতে পারি, সে এক ইতিহাসই বটে।

মধ্যাহ্নে প্রদীপ জ্বলতো আগ্নেয় গিরির মতো। ভেতরে ভেতরে ঝিকিঝিকি আঁচের জ্বলুনী থাকতোই। হঠাৎ বাড়তি প্রাণশক্তির

পাশ থেকে বলছি

স্মৃতি দিয়ে ঘেরা (৮)

উদ্গীরণ। ক্ষমাহীন লাভাস্রোতের মতো ভাসিয়ে দিতে পারতো পথের বাধাকে। ও পক্ষের প্রতিরোধের বাঁধ যেতো ধসে ঘটনার আকস্মিকতায়।

কলকাতার ফুটবল মাঠে প্রদীপের আবির্ভাব যেন ধূমকেতুর মতো। হঠাৎ আত্মপ্রকাশ, দেখা এবং জয় করা, ঠিক যেন ভিনি, ভিডি, ভিসি! সেই আবির্ভাব লগ্নের কথা প্রত্যক্ষদর্শীদের মনে আজও জ্বলজ্বল করছে।

সাল ১৯৫৩। পুরানো মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল মাঠে জাতীয় ফুটবল বা সন্তোষ ট্রফির আসরে বিহার বনাম বাংলার খেলা। বাংলা তখন এক ডাকসাইটে দল। জাতীয় ফুটবলের পুরানো চ্যাম্পিয়ন। আর বিহার? ফুটবলে তার কৌলীন্য গর্ব বলতে গেলে কিছুই নেই। তবু বিহার বাংলার পথ জুড়ে দাঁড়ালো। কোমর কষে রুখে। বিহারের সেই রোখা রোখা ভাবের আগল ভাঙাতে দুর্ধর্ষ বাংলা দলের পাকা তিনটি দিন সময় লাগলো। তিন দিনের মাথায় বিহার হারলো বটে। কিন্তু ওই কদিনের খেলার সুযোগে বিহারের এক আখ্যাত প্রতিনিধির প্রতিচ্ছবির ছায়া কলকাতার মাঠে স্পষ্ট করে আঁকা হয়ে গেল। সেদিনের সেই বাড়ন্ত ছেলেটিই হলো উত্তর পর্বের প্রদীপ ব্যানার্জি।

বাংলা দলে তখন সব নামী নামী খেলোয়াড়। সেই নামের পরিধি পশ্চিম-বাংলার মাঠ ছাপিয়ে সারা ভারতে প্রসারিত। কিন্তু বিহারের ওই এতোটুকু ছেলে বাইট উইংয়ের পজিশনে দাঁড়িয়ে বাংলার সব তাবড় খেলোয়াড়কে কী নাকালই না করে তুললে! পায়ের টানে, শরীরের ঝাঁকুনিতে কতোজনকে যে কাবু করে দিলো তার ঠিকঠিকানা নেই। ছেলেটির বয়স তখন কাঁচা। স্বভাবেও অপরিণত। মনের চেয়ে শরীরের পুঁজি বেশি। সেই পুঁজির টানে বিহারের রাইট উইং বাংলা দলের শক্ত সমর্থ খুঁটিগুলিকে ধুলোয় ধরাশায়ী করে দিচ্ছিল। বয়সের ধর্ম সেদিন শরীরের কী দাপাদাপি। হেরে গিয়ে বিহার কলকাতা ছেড়ে চলে গেল বটে। কিন্তু প্রদীপের খেলার স্মৃতি কলকাতার মনে চিরায়ু চিহ্ন এঁকে দিল। তাই কলকাতায় খেলার জন্যে কলকাতা থেকে ডাক পেতে এতোটুকু দেরি হয় নি।

প্রদীপ কলকাতায় খেলেন প্রথমে এরিয়ান ক্লাবে। তারপর চাকুরি নেওয়ার সূত্রে ইস্টার্ন রেলে। রেলে থাকতে থাকতেই প্রদীপের পূর্ণ শিখা প্রতিভাত হয়। এবং রেলের প্রতিনিধি হিসেবেই তিনি আন্তর্জাতিক আসরে জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং

ভারতকে নেতৃত্ব দেন রোম অলিম্পিক ফুটবলে।

সহজাত দক্ষতা ও মজবুত শরীর ছিল। এই সংগতির ওপর পালিশ চড়ানো সম্ভব হয় বাবা সোমের নির্দেশনায়। বাঘাবাবু তখন ইস্টার্ণ রেলের কোচ। হাতে ধরে শিখিয়ে এবং দস্তুর মতো খাটিয়ে প্রদীপের সহজাত সংগতিকে পরিণত করে তোলেন তিনিই। পরে প্রদীপ রহিম সাহেবেরও সুনজরে ছিলেন।

ও সে কী মেহনত! হাসতে হাসতে প্রদীপ বলছিলেন, খাটুনির বহরের কথা চিন্তা করলে আজও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। খাটতে খাটতে নিঃস্ব হয়ে যেতে হোত। তবুও রেহাই ছিল না। বাঘাদা বলতেন, যতো কষ্ট, ততোই লাভ। ফুটবল মরদের খেলা। তাগদ বাড়ালে তবেই সুবিধা পাবে।

ছেলেদের কিভাবে খাটাতেন আর ফাঁকিবাজ দুচারজন সেই খাটুনিকে কি চোখে দেখতো তার একটি নমুনা দিই।

ভোরে রেলওয়ে ম্যানসন ইনস্টিটিউট মাঠে ট্রেনিং চলছে। বাঘাদা এটা ওটা দেখিয়ে দেওয়ার পর থলি হাতে বাজারের দিকে চলে গেলেন। তবে যাওয়ার আগে সবাইকে নির্দেশ দিলেন ১৫।২০ পাক ছুটতে। আমরা তো নির্দেশমতো দৌড় শুরু করলাম। কিন্তু বাঘাদা যেই না দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন অমনি দুচারজনের দৌড় থেমে গেল। তাদেরি একজন মাঠের ধারে পাঁচিলের ওপর বসে পড়ে পথের দিকে নজর রাখতে লাগলো।

খানিক পরে দেখি, ফাঁকিবাজ ওই দুটির সবাইই আবার মাঠে ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে দৌড়তে শুরু করে দিয়েছে। প্রথম দিন ওদের ব্যাপারটা ধরতে পারি নি। পরে বুঝেছিলাম যে, পাঁচিলে উঠে ও'রা বাঘাদার ফেরার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। আর সেই তাঁকে ফিরতে দেখে অমনি ভাল মানুষের মতো দৌড়তে আরম্ভ করে দেয়। ভাল মানুষ বাঘাদা ফাঁকিবাজদের 'ভাল মানুষী' ধরতে পারতেন না। কিন্তু কোচকে ফাঁকি দেওয়া আর গুরুর নির্দেশ অমান্য করার ফল ওরা অবশ্য হাতেনাতেই পেয়েছে। উত্তরকালে ফাঁকিবাজদের একজনও নামকরা খেলোয়াড় হতে পারে নি। হয়েছে তারাই যারা মুখ বুঁজে বাঘাদার হুকুম মানতে নিষ্ঠা দেখিয়েছে।

প্রদীপের কৈশোর কাটে জলপাইগুড়িতে। জন্ম উত্তরবঙ্গের ওই শহরেই। সেখানে থাকতে অ্যাথলেটিক চর্চা এবং ভলিবল, ক্রিকেট ও ফুটবল খেলার প্রাথমিক সুযোগ মেলে। পরে বাবা জামসেদপুরে বদলী হতে ফুটবল খেলার বাড়তি সুযোগ পাওয়া যায়। ইস্পাত নগর জামসেদপুরে খেলাধুলোর চল্ ছিল অনেক দিন থেকেই। মাত্র পনেরো বছর বয়সেই প্রদীপ বিহারের পক্ষে জাতীয় ফুটবলে খেলার সুযোগ পায়।

স্মৃতি দিয়ে ঘেরা, বেতারে এই পর্যায়ের অনুষ্ঠানে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে প্রদীপ আত্মকথা শোনাচ্ছিলেন। প্রদীপ এমনিতেই কথা বলতে ভালবাসেন। তার ওপর সামনে মাইক পেলে তো আর কথাই নেই। স্বল্প সময়ে গড়গড়িয়ে অনেক কথাই শুনিয়ে দিলেন। কিছু খেলার কথা। কিছু মজার কথা। ঘটনাবহুল জীবন। জীবন কাহিনী তাই বিচিত্র ঘটনায় ঠাসা।

প্রদীপ বলছিলেন,

১৯৫৩ সালে বিহার রাজ্য দল গড়ার আগে নির্বাচনী ম্যাচে খেলতে নেমেই একা দুটি গোল করি। তারপরই হ্যাটট্রিক করার দিকে ঝুঁকি। কতো চেষ্টা করলাম। সাধ্যমতো সব চেষ্টাই। কিন্তু হ্যাটট্রিক আর করা হল না। যাইহোক মোটামুটি মন্দ খেলিনি। দলে ঢুকবো, কোনো সন্দেহ নেই। জামাকাপড় বদলে খুশী মনে বাড়ি ফিরেছি। মনে মনে কিঞ্চিৎ অহং ভাবও হয়তো উঁকি দিয়েছে। এমন সময় দাদার মুখোমুখি হতেই তিনি বিরাশী সিক্কার একটি চড় কষিয়ে দিলেন। আমি তো ভ্যাবাচ্যাকা। দাদা কিন্তু চড়া গলায় আরও ধমকে বললেন, ফুটবল বুঝি একজনের খেলা? নিজের কেরামতি দেখাতে হবে না দলের জন্যে খেলতে হবে? নিজের হ্যাট-ট্রিকের জন্যে উঁচিয়ে ছিলি কেন? কতো কী নষ্ট হয়ে গেল না? চড় খেয়ে অভিমান হয়েছিল। এবার দাদার কথায় সম্বিৎ ফিরলো। সত্যিই তো, সেদিন শেষদিকে তো আমি কেবল নিজের কোলেই ঝোল টানতে চেয়েছি। কাজটা ঠিক হয়নি। পরে দাদার কথা আমি আরও ভাল করে বুঝতে পেরেছি। এবং এখন নিজে যখন প্রশিক্ষণের ভার হাতে নিয়েছি তখন দাদার ওই উপলব্ধি নিজের উপলব্ধির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া ছাড়া আমার অন্য গতিও তো নেই।

স্বদেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীরা রেল দলের প্রদীপ ব্যানার্জিকে তাঁদের পয়লা নম্বর শত্রু বলে মনে করতেন। কারণ, তাঁরা জানতেন সে আস্তো একটি দলকে ভরাডুবির পথে ঠেলে দেওয়ার সামর্থ্য এই একটি মানুষের

ইরিণা জেউইনস্কর (পোল্যাণ্ডঃ ইনি অলিম্পিক অ্যাথলেটিক্সে মেয়েদের ৪০০ মিটার দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড সময়ে (৪৯-২৯ সেকেণ্ড) স্বর্ণ পদক জয় করেন।

খেলাধূলা

দর্শক

অলিম্পিক অ্যাথলেটিকস

মার্ট্রল অলিম্পিক অ্যাথলেটিকসের চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় গতবারের মত এবারও পুরুষ বিভাগে আমেরিকা এবং মেয়েদের বিভাগে পূর্ব জার্মানী সর্বাধিক মোট পদক জয়ের সূত্রে শীর্ষস্থান লাভ করেছে—পুরুষ বিভাগে আমেরিকা পেয়েছে মোট ১৯টি পদক এবং মেয়েদের বিভাগে পূর্ব জার্মানী পেয়েছে মোট ১৮টি পদক। গতবারের থেকে পূর্ব জার্মানী চারটি পদক বেশী পেয়েছে। অপরদিকে আমেরিকার মোট পদক সংখ্যা গতবারের মতই ১৯টি আছে। স্বর্ণ পদক জয়ের তালিকায় পুরুষ বিভাগে আমেরিকা এবং মেয়েদের বিভাগে পূর্ব জার্মানী প্রথম স্থান পেয়েছে—পুরুষ বিভাগে আমেরিকার ৭টি স্বর্ণ পদক, অপরদিকে মেয়েদের বিভাগে পূর্ব জার্মানীর ৯টি স্বর্ণ পদক।

পুরুষ ও মেয়েদের বিভাগের পদক এক সঙ্গে ধরে তালিকা তৈরী হলে সেই তালিকার প্রথম তিনটি স্থান এইরকম হবে ঃ ১ম স্থান পূর্ব জার্মানী—মোট পদক ২৬ (পুরুষ বিভাগে ৮ ও মেয়েদের বিভাগে ১৮), ২য় স্থান আমেরিকা—মোট পদক ২২ (পুরুষ বিভাগে ১৯ ও মেয়েদের বিভাগে ৩) এবং ৩য় স্থান রাশিয়া—মোট পদক ১৯ (পুরুষ বিভাগে ১০ ও মেয়েদের বিভাগে ৯)।

১৯৭২ সালের অলিম্পিক অ্যাথলেটিকসে যাঁরা স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মাত্র এই তিনজন অ্যাথলীট মার্ট্রল অলিম্পিক অ্যাথলেটিকসেও স্বর্ণ পদক পেয়েছেন ঃ পুরুষদের ৫০০০ ও ১০,০০০ মিটার দৌড়ে ল্যাসী ভিরেন, (ফিনল্যাণ্ড) ও ট্রিপল জাম্পে ভিক্টর সানেইয়েভ (রাশিয়া) এবং মেয়েদের জ্যাভেলিনে রুথ ফুকস (পূর্ব জার্মানী)।

ফিনল্যাণ্ডের ল্যাসী ভিরেন ১৯৭২ সালের মত এবারও ৫০০০ মিটার ও ১০,০০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছেন এবং সেই সূত্রে এক অসাধারণ নজির সৃষ্টি করেছেন। তিনি ছাড়া অপর কেউ এইভাবে উপর্যুপরি দুটি অলিম্পিক আসরে ৫০০০ ও ১০,০০০ মিটার দৌড়ে

অলিম্পিক পোলভল্টে স্বর্ণপদক বিজয়ী তাদিয়ুজ স্লুসারস্কি (পোলাণ্ড)।

অলিম্পিক অ্যাথলেটিকসে পুরুষদের ৪০০ মিটার ও ৮০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণ পদক বিজয়ী অ্যালবার্টো জুয়ানটোরিনা (কিউবা)।

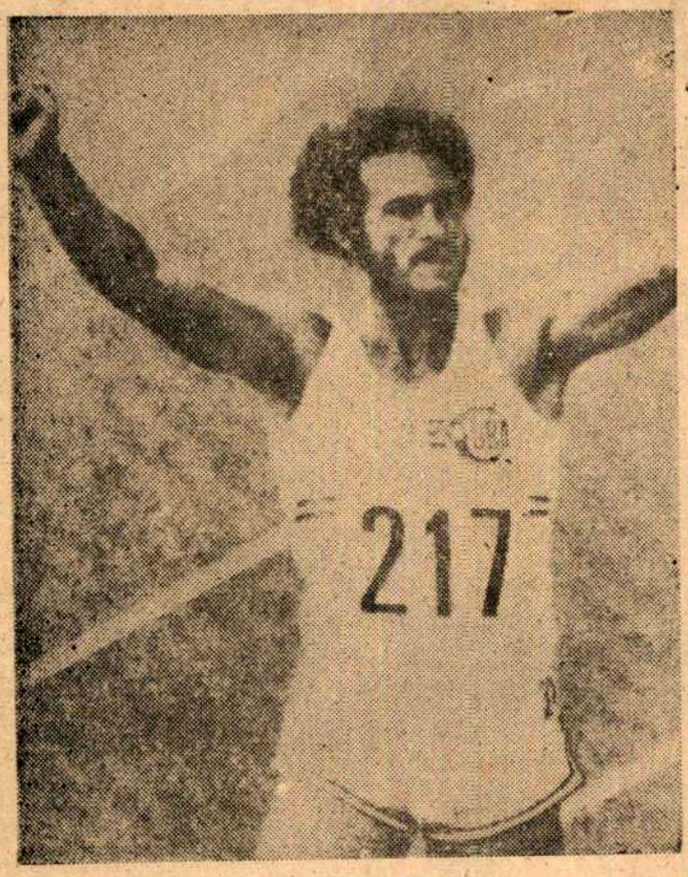

স্বর্ণ পদক জয়ী হননি। এমন কি অলিম্পিকের একই আসরে ৫০০০ মিটার ও ১০,০০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণ পদক জয়ী হয়ে দ্বিতীয়বার অপর কোন এক অলিম্পিক আসরে এই দুই ইভেন্টেই স্বর্ণ পদক জয় অপর কারও পক্ষেই সম্ভব হয়নি।

পুরুষদের জাভেলিন নিক্ষেপে মিকলাস নিমেথ (হাঙ্গেরী) ৯৪-৫৮ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে বিশ্ব রেকর্ড করেন এবং স্বর্ণ পদক জয়ী হন। তিনি নিঃসন্দেহে তাঁর পিতার নাম রেখেছেন। মিকলাস নিমেথের পিতা ইমার নিমেথ ১৯৩৮ সালের অলিম্পিক আসরে হাতুড়ী নিক্ষেপে স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছিলেন।

পুরুষদের ট্রিপল জাম্পে ভিক্তর সানেইয়েভ (রাশিয়া) স্বর্ণ পদক জয়ের সূত্রে ট্রিপল জাম্পে উপর্যুপরি তিনবার (১৯৬৮, ১৯৭২ ও ১৯৭৬) স্বর্ণ পদক জয়ের রেকর্ড করেছেন। তাঁর আগে অপর কেউ উপর্যুপরি তিনবার দূরের কথা মোট তিনবারও ট্রিপল জাম্পের স্বর্ণ পদক জয়ী হননি।

পুরুষদের ৪০০ মিটার ও ৮০০ মিটার দৌড়ে কিউবার অ্যালবার্টো জুয়ানটোরিনা স্বর্ণ পদক জয়ের সূত্রে এক অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করেছেন। একই বছরের অলিম্পিক আসরে একজন অ্যাথলীটের পক্ষে ৪০০ ও ৮০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণ পদক জয়ের নজির এই প্রথম।

মেয়েদের ৮০০ মিটার ও ১,৫০০ মিটার দৌড়ে রাশিয়ার তাতিয়ানা কাজানকিনা স্বর্ণ পদক জয়ের সূত্রে একই বছরের অলিম্পিক আসরে এই দুই ইভেন্টে স্বর্ণ পদক জয়ের প্রথম নজির সৃষ্টি করেন।

মেয়েদের ৪০০ মিটার দৌড়ে পোলাণ্ডের ত্রিশ বছর বয়স্কা এক সন্তানের জননী ইরিনা জেউইনস্কা বিশ্ব রেকর্ড সময়ে (৪৯-২৯ সেকেণ্ড) স্বর্ণ পদক জয়ী হয়ে প্রমান করে দিয়েছেন তাঁর কাছে বয়সের ভার অলিম্পিক গেমসের আসরে স্বর্ণ পদক জয়ের পক্ষে অন্তরায় নয়। ১৯৬৪ সাল থেকে স্বদেশের প্রতিনিধিত্ব করে তিনি এ পর্যন্ত ৭টি পদক জয় করেছেন—স্বর্ণ ৩, রৌপ্য ২ ও ব্রোঞ্জ ২।

বুলগেরিয়ার ৩৪ বছর বয়স্কা আইভাঙ্কা খ্রিস্টোভা ১০ বছর বয়সের এক পুত্রের জননী। তা সত্ত্বেও তিনি সটপুটের ফাইনালে অলিম্পিক রেকর্ড করেছেন (দূরত্ব ২১-১৬ মিটার) এবং শুক্রবারের অলিম্পিক সটপুট চ্যাম্পিয়ান রাশিয়ার নাদেজা চিজোভাকে দ্বিতীয় স্থানে ফেলে প্রথম স্থান লাভ করেছেন। ১৯৭২ সালের অলিম্পিক সটপুটে তিনি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছিলেন। এই নিয়ে তিনি চারবারের চেষ্টার অলিম্পিক সটপুটে স্বর্ণ পদক পেলেন। এখানে উল্লেখ্য গত জুলাই মাসের গোড়ার দিকে তিনি সটপুটে দুবার বিশ্ব রেকর্ড ভেঙেগছিলেন।

অ্যাথলেটিকস

পদক জয় তালিকা

(প্রথম তিনটি দেশ)

পুরুষ বিভাগ

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট
আমেরিকা	৬	৬	৭	১৯
রাশিয়া	২	২	৬	১০
পূর্ব জার্মানী	২	৩	৩	৮

মহিলা বিভাগ

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট
পূর্ব জার্মানী	৯	৪	৫	১৮
রাশিয়া	২	৩	৪	৯
পূঃ জার্মানী	১	৩	১	৫

দ্রষ্টব্য : মেয়েদের বিভাগে আমেরিকার পদক জয় : স্বর্ণ ০, রৌপ্য ২ ও ব্রোঞ্জ ১—মোট ৩।

অলিম্পিক অ্যাথলেটিকসে সব থেকে মর্যাদাপূর্ণ এবং উত্তেজনাময় অনুষ্ঠান হল স্বরুপ পাল্লার ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়। এ পর্যন্ত ১৮টি অলিম্পিক গেমসের আসর বসেছে। আমেরিকা পুরুষদের ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়ে সর্বাধিকবার স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছে—১০০ মিটার দৌড়ে ১২ বার এবং ২০০ মিটার দৌড়েও ১২ বার। এই দুই ইভেন্টে আমেরিকা শেষ স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছে ১৯৬৮ সালে। ১৯৭২ সালে রাশিয়ার ভ্যালেরী বোরজোভ ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণ পদক জয়ী হন। ১৯৭৬ সালে ১০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণ পদক পেয়েছেন ত্রিনিদাদের হেসলী ক্রফোর্ড এবং ২০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছেন জামাইকার ডোনাল্ড কুয়ারী। এখানে উল্লেখ্য, ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়ের কোন ইভেন্টেই এই দুই দেশের প্রতিনিধি এর আগে স্বর্ণ পদক জয়ী হননি। ১৯৭৬ সালে পুরুষদের দুই মাঝারী পাল্লার দৌড়েও নতুন দেশের এক প্রতিনিধি স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছেন—৪০০ মিটার ও ৮০০ মিটার দৌড়ে কিউবার অ্যালবার্টো জুয়ানটোরেনা। একই বছরের আসরে এই দুই ইভেন্টে একজনের পক্ষে স্বর্ণ পদক জয়ের নজির এই প্রথম।

স্বরুপ পাল্লার ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড় এক কঠিন অগ্নি পরীক্ষার আসর। পুরুষদের ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড় এবং মেয়েদের ২০০ মিটার দৌড়ে এ পর্যন্ত কোন একজন অ্যাথলীটের পক্ষে মোট দুবার করে স্বর্ণ পদক জয় আজও সম্ভব হয়নি। একমাত্র মেয়েদের ১০০ মিটার দৌড়ে আমেরিকার নিগ্রো অ্যাথলীট উইয়োমিয়া টিয়াস উপর্যুপরি দুবার (১৯৬৪ ও ১৯৬৮) স্বর্ণ পদক জয় করে

অসাধারণ নজির সৃষ্টি করেছেন। ১৯৭৬ সালের সদ্যসমাপ্ত অলিম্পিক আসরে এই অসাধারণ নজির সৃষ্টির সুবর্ণ সুযোগ হাতে পেয়েছিলেন রাশিয়ার ভ্যালেরী বোর-জোভ এবং পূর্ব জার্মানীর শ্রীমতী রেনেট স্টেচার। ১৯৭২ সালের অলিম্পিক আসরে বোরজোভ পুরুষদের ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণ পদক জয়ের সূত্রে একই বছরে 'ডাবল' শ্বেতাব জয়ের দুর্লভ সম্মান লাভ করেছিলেন। কিন্তু এবার বোরজোভ ১০০ মিটার দৌড়ে পান ব্রোঞ্জ পদক। তিনি অসুস্থতার কারণে ২০০ মিটার দৌড় থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। অপরদিকে শ্রীমতী স্টেচার ১০০ মিটার দৌড়ে রৌপ্য পদক এবং ২০০ মিটার দৌড়ে ব্রোঞ্জ পদক পান। অলিম্পিকের একই বছরের আসরে কোন একটি দেশের পক্ষে একটি ইভেন্টের তিনটি পদক জয় নিঃসন্দেহে বিরাট সাফল্যের পরিচয়। ১৯৭৬ সালের অলিম্পিক অ্যাথলেটিকসে পুরুষ বিভাগের হ্যামার নিক্ষেপে রাশিয়া এবং মেয়েদের পেন্টাথলনে পূর্ব জার্মানী তিনটি পদক (স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ) জয়ের দুর্লভ গৌরব লাভ করেছে।

মোহনবাগানের লীগ জয়

১৯৭৬ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। এই নিয়ে তারা পনের-বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হল এবং সেই সূত্রে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলার ইতি-হাসে সর্বাধিকবার খেতাব জয়ের রেকর্ড করলো।

মাঠের নায়ক

বাবা বলতেন, খেলবি খেল কিন্তু ময়দানের মায়ায় জড়াস নে। দাদাদের তো দেখলি, দিন কয়েক লোকে মাথায় করে নাচলো, তারপর কোন এক মুহূর্তে স্বার্থ শুষে নিয়ে, ধপাস করে ঐ ময়দানেরই এক কোণায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল, একটিবার ফিরেও তাকালো না। বাবার ঐ দুঃখের হেতু কি, আমি তা ভালভাবেই জানি—

মীর নসিম আলি

নাসিম আলি এরিয়ানের রাইট স্ট্রাইকার। লম্বা, ফর্সা, সুদর্শন। ড্রিবলিং, ডজিং, ট্র্যাপিং নিখুঁত। ফুটবলে যে মেহনত দরকার তা করার ক্ষমতাও নাসিম আলির আছে। বলা বাহুল্য ঐসব গুণ মিলিয়ে নাসিমকে বাংলার অন্যতম প্রতিশ্রুতিপূর্ণ খেলোয়াড়রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ভবিষ্যৎ তার আরও উজ্জ্বল হবে যদি তিনি আর একটু বোল্ড হন, নিজের ওপর আর একটু আস্থা রাখেন, আর একটু রিস্ক নেন। রোবার্স্ট (বলদৃপ্ত) ফুটবলের কাছে নতজানু না হয়ে নাসিম যদি মগজে আর একটু শান দিয়ে মাঠে বিচরণ করেন তবে ঐ মাঠ থেকে তিনি অনেক স্বীকৃতি পাবেন, পাবেন প্রতিষ্ঠা।

জলকাদার মাঠে কুমারটুলির সঙ্গে খেলা শেষ হওয়ার পর নাসিম আলির সঙ্গে কথা হচ্ছিল এরিয়ান তাঁবুতে বসে। গায়ে মুখে কাদা, ক্লান্ত দেহ। নাসিম কোন ভূমিকা না করেই বলেন : 'বাবা চাইতেন না আমি ফুটবল খেলি। বলতেন, দাদারা দেখলো না, মাঠ নিয়েই মেতে রইলো, তুই আমার কার-বারটা দেখ, চাকরি-বাকরি করতে হবে না। তা, বাবার কথা রাখতে পারলুম কৈ? মাঠই মজালো। বড়দা মীর আবাদাদ খেলতেন কালীঘাটে, মেজদা মীরকাশিম এরিয়ান, মোহনবাগান এবং ইস্টার্ন রেলে, ছোটভাই মীর সলিম খেলছে ভিকটোরিয়ায়। বলতে গেলে আমরা চার ভাই-ই ফুটবলকে জড়িয়ে রয়েছি, ফুটবলকে মনে-প্রাণে ভালবেসে ফেলেছি। আব্বাদাদ এবং মীরকাশিম ভাইয়ের নিষ্ঠা ছিল অসাধারণ, খেলতেনও ভাল। তাঁদের মত ফুটবলে নিবেদিত প্রাণ হতে পারলুম কৈ?'

'আব্বাজান অনেক আগেই চলে গেছেন, আব্বাও বিগত। এখন মাথার ওপর বিরাট সংসার, ঘরে অবিবাহিত তিন তিনটি বোন। তাই শুধু ফুটবলের কথা ভাবলেই এখন চলে না, সংসারের কথাও ভাবতে হয়।' ঘর-সংসারের কথা বলতে বলতে নাসিম হঠাৎ কেন জানি না থেমে যান। চলে যান প্রসঙ্গান্তরে। বলেন : 'আমার জন্ম ১৯৫৫ সালের ২ ডিসেম্বর মোমিনপুরে। পাড়ার মাদ্রাসা এবং পাঠশালায় পড়ার পর নাম লেখাই পাইকপাড়া কুমার আশুতোষ ইনস্টি-ট্যুশনে। উদ্দেশ্য—সুব্রত ট্রফিতে খেলা। সেটা ১৯৭২ সাল। তার আগেই অবশ্য আমি ময়দানে ফুটবল নিয়ে নেমে গেছি মহামেডান এ সি-র জার্সি গায়ে চাপিয়ে (১৯৬৯)। মহামেডান এসি তখন এ্যালেন লীগে খেলে। ৭০ সালে গেলাম চন্দ্র মেমো-রিয়ালে (তৃতীয় বিভাগ)। ৭১-এ কালীঘাট মিলনীতে (দ্বিতীয় ডিভিসনে)। ঐ বছরই খেললাম বাংলা স্কুল দলে। জাতীয় স্কুল ক্রীড়ার (আমেদাবাদ)। ৭২ সালে প্রখ্যাত কোচ শ্রীঅচ্যুত ব্যানার্জির পরিচর্যা পেলাম। মণিপুরেও খেললাম জাতীয় স্কুল ক্রীড়ায় বাংলার হয়ে। বছরে ছশো টাকা করে স্পোর্টস স্কলারশীপ পেলাম। ৭৩ সালে এরিয়ানসে এলাম, এলাম মানে নিয়ে এলেন নন্টুদা আর শচীনদা (অশোক মিল, শচীন হাল-দার)। সেই থেকে এরিয়ানসেই আছি। অন্য ক্লাব থেকেও ডাক এসেছিল, বড় ক্লাব। যাইনি, বড়োর ভীড়ে হারিয়ে যাবো বলে। স্কুল ফাইনালে পাশ করেছি, পি-ইউ দিয়েছি কমার্সে বিজয়গড় কলেজ থেকে। লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে, দেখি কি হয়। সবই খোদার মর্জি।'

চাকরীও একটা জোগাড় হয়ে গেছে নাসিমের স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে। ডায়-মন্ড হারবার রোডে অফিস, বাড়ীর কাছেই, বড্ড সুবিধে। এরিয়ানসে খেলা দেখে বোর্ড যেচেই চাকরী দিয়েছিলেন। একদিন এরি-য়ান তাঁবুতে এসে বোর্ডের অরুণাভ সেন চাকরির অফার দিলেন, আমিও রাজী হয়ে গেলাম। সংসারে তখন টাকার বড্ড দরকার।'

শুধু কলকাতার মাঠেই নয়, বাইরের মাঠেও নাসিম প্রচুর খেলেছেন। ৭২ সালে খেলেছেন রোভার্স (বোম্বাই), ডি সি এম (দিল্লি)। ৭৩-৭৪-এ রোভার্স, বরদলুই (গৌহাটি)। ৭৫ সালে মণিপুরে জুনিয়ার বাংলা (চ্যাম্পিয়ান), ডুরান্ড এবং বরদলুই। বরদলুই সেমিফাইনালে সেবার নাসিমের দল এরিয়ান্স হেরেছিল মোহনবাগানের কাছে।

একুশ বছরের যুবক নাসিম আলির সামনে এখনও খেলোয়াড় জীবনের অনেক-খানি পড়ে রয়েছে। দেহ ও মনে সুস্থ থাকলে আগামী দিনে নাসিম অবশ্যই খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার উচ্চতর শিখরে উঠবেন। এ শুধু আমার কথা নয়, গড়েরমাঠের ফুটবল পণ্ডিতদের কথাও তাই। কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠা পেতে হলে, দাদা মীরকাশিম আলির মত অতো বড় হতে হলে নাসিমকে আরও অনু-শীলন করতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে, ধৈর্যবান হতে হবে, কেননা এ-কথা আমরা জানি এবং নাসিমও জানেন যে, খেলার মাঠে অনুশীলন, নিষ্ঠা পরিশ্রম এবং ধৈর্যের কোন বিকল্প নেই বিকল্প নেই বিশ্বস্ত-তার।

বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁশরী

সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়

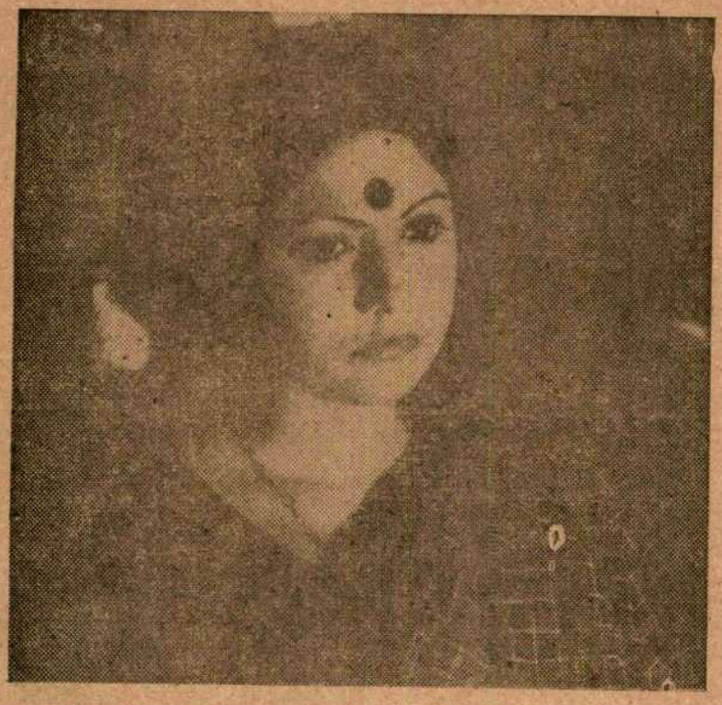

সিনেমাটিক

প্রায় সহস্র দর্শক পরিবেষ্টিত লোকেশানে সত্য বাঁড়ুজ্যে যাঁহা শট দেবেন বলে উঠে দাঁড়িয়েছেন, অমনি পাশ থেকে কে যেন একজন বিরাট হেঁচে উঠল। ব্যস, সত্যবাবু রেগে একেবারে আগুন—কোন আক্কেলে অমন হেঁচে উঠল শুনি? আরে ছি ছি ছি—এটা কোন মানুষের কাজ। আমি এক্ষুনি গরুর শিংয়ের ডগায় দৌড়ঝাঁপ করব আর.....

সত্যবাবু ধপ করে বসে পড়লেন। দেখলাম একদল লোক ভীড়ের মধ্যে থেকে একটি হাটুরেকে চ্যাংদোলা করে টেনে বের করে দিচ্ছে। আর সেই লোকটি চিৎকার করে দারুণ আপত্তি প্রকাশ করছে—আমি না আমি না, ওই শ্যালা হেঁচেছে, উল্টে আমার কাঁধে চাপাচ্ছে—

যাকে দেখাল সে তখন স্রেফ দার্শনিকের মত গম্ভীর মুখে আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অভিযোগ শুনে একটা অশ্রাব্য মন্তব্য করলমাত্র। সত্যবাবু আরও বিগড়ে গেলেন—না ভাই এখানে শুটিং হতে পারে না। এ হেঁচে দিচ্ছে, ও ডায়ালাগ দিচ্ছে—এটা মামদোবাজি নাকি? এই পরিমল, তোমরা প্যাকআপ করে দাও—

কোথায় পরিমল! সে তখন পাগলা ডিরেকটারের সঙ্গে দুষ্টু গরু চুনাও করছে। ছবির সম্পাদক প্রবীন দাস খয়সে প্রবীণ হলে কি হবে, তিনি যেন আরও ক্ষ্যাপাটে (এই ভদ্রলোক সম্প্রতি 'আমি সে ও সখা' ছবির সম্পাদনার কৃতিত্বের জন্যে বিশেষভাবে পুরস্কৃত হয়েছেন—খবরটা লোকেশানে বসেই সংগ্রহ করলাম) ধরনের; হেসে পরিমলকে বলছেন—আরে ধুৎ, ল্যাজ না মোচড়ালে ধরতে পারবে না—

পরিমল অমনি একটি গরুর ল্যাজ ধরে বাঁই করে মুচড়ে দিল। গরুটি বিকট হাম্বা ছেড়ে লাফিয়ে একসা। পরিমল প্রসন্ন মুখে মন্তব্য করল—হ্যাঁ, ওষুধ ধরেছে এবারে। সত্যদা, চলে আসুন দাদা, আমরা মাল পেয়ে গেছি।

হল্লা করতেই ধ্রুব তাড়াতাড়ি অ্যারিফ্লেক্স ক্যামেরার ভিউ ফাইন্ডারে চোখ রেখে কালো কাপড়ে মাথা ঢাকল। তারপর চেঁচিয়ে বলল—আর দেরী না করে তোমরা শটটা দিয়ে নাও ভাই, রোদ পড়ে যাচ্ছে কিন্তু.....

অগত্যা সত্য বাঁড়ুজ্যে শুটিং জোনে গিয়ে দাঁড়ালেন। অনিল তালুকদার ছবির সাউন্ড রেকর্ডিং করছিলেন। তিনি তাঁর সহকারীকে চেঁচিয়ে কি এক দুর্বোধ্য ভাষায় নির্দেশ দিলেন—শুনে সেই সহকারী পড়ি-কি-মরি সাউন্ড বুম হাতে স্যুটেড আর্টিস্টদের মাথায় মাইক্রোফোন ঝোলাবে বলে।

চারিদিকে মানুষের ভীড়, চেঁচামেচিতে গরুগুলোর নার্ভ ফেল করে গিয়েছিল সম্ভবত, একটাকে যেই ছাড়া হল, সে আর কোন কম্মো নয়, সোজা বনবাদাড় ভেঙ্গে টেনে দে হাওয়া। আর গরুর মালিক কপাল চাপড়ে হৈ হৈ করে তার পেছনে ছুটল—এইজন্যে বায়স্কোপের লোকদের গরু দিতে নেই বলে—

একজন লোক মন্তব্য করল—ও কেষ্ট, তোর গরুরে শ্যালা আজ নির্ঘাৎ পিঁজরা-পোলে ঢোকাবে—দৌড়ে আর কি করবি বল—

ফলে দু'নম্বর গরু ছাড়ার আগে সবাই এট্টু ভেবেচিন্তে নিল।

ছবির অন্যতম প্রযোজক একপাশে একটা পেটমোটা ফলিও ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, কি-যেন নাম? হ্যাঁ মনে পড়েছে—পান্না ভদ্র—তা সেই ভদ্রমশাই বললেন—ছাড় ছাড়, ও আর বিবেচনা করে কি হবে—টাকার শ্রাদ্ধ হচ্ছে যখন ভাল করেই হোক। পার আর না-পার ভাড়া তো গুনতেই হবে।

শুধোলাম—সেকি মশাই, গরু ভাড়ায় এনেছেন।

ভদ্রমশাই অমায়িক হেসে—আলবৎ, ভাড়া ছাড়া আর গরু দিচ্ছে কে বলুন? বায়স্কোপে তাবৎ জিনিস—ভাড়ার জিনিস। আর্টিস্ট থেকে শুরু করে আলপিন পর্যন্ত—সব ভাড়া পাওয়া যায়—এক প্রোডিউসার ছাড়া। কারণ টাকাটা যে তার।

বলে' একমুহূর্ত চুপ করে থেকে সহাস্যে ভদ্রমশাই বললেন—না তাই বা বলি কি করে—টাকাও ভাড়া করে আনতে পারেন। ধরুন কারো কাছ থেকে কর্জ্জ করলেন—মোটা সুদে টাকা নিয়ে এলেন—

প্রতিশ্রুতিঃ রঞ্জিত মল্লিক
পরিচালনাঃ পিনাকী মুখার্জি

সেক্ষেত্রে টাকাও তো ভাড়া খাটছে। শোধ করার সময় আসল দিলেন—সেই সঙ্গে সুদের টাকা দিলেন ভাড়া হিসেবে—তাই নয় কি? হেঁ হেঁ হেঁ.....

হঠাৎ হৈচৈ শুনে আমি ফিরে দেখি খেলা শুরু হয়ে গেছে। সত্য বাঁড়ুজ্যে পড়িমরি ছুটছেন আর তাঁকে তাড়া করে নিয়ে চলেছে একটি পুরুষ্টু এঁড়ে গরু। তাই দেখে দর্শকরা হেসে কুটিপাটি। সিনেমার ক্যামেরা নিয়ে সেই অভিনব দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ করতে করতে ধ্রুব বোসও প্রাণপণে ছুটছে। দেখি সেও মজা পেয়ে ফিক ফিক করে হাসছে।

রাস্তার বাঁক পেরিয়ে আর্টিস্ট আর গরু—দুজনই অদৃশ্য হল।

ডিরেকটর চেঁচিয়ে শট কাট করে দিল, তারপর খিক খিক করে নিজের মনেই খানিকটা হেসে হাল্কা হয়ে নিল। ওঃ জব্বর শট হয়েছে।

ওদিকে আর্টিস্টদের আর দেখা পাওয়া যাচ্ছে না।

রবীন দাস বললেন—পরিমল ছুটে যাও, ওরা হয়ত কট শুনতে পায়নি, তাই এখনও দৌড়াচ্ছে ক্যামেরা চলছে বলে—

বলা শেষ হল না, তার আগেই পথের বাঁকে সত্য বাঁড়ুজ্যে দৃশ্যমান হলেন। কাছা মাটিতে লোটাচ্ছে, রীতিমত বিধ্বস্ত চেহারা, নকল গোঁফ উড়ে বেরিয়ে গেছে, বিশ্বের বিরক্তি চোখে-মুখে—চেঁচিয়ে বললেন—আমি বেঁচে গিয়েছি বরদাতেজের, কিন্তু গরু নেমে গেছে—

—নেমে গেছে? কোথায় নেমে গেছে?

—আর কোথায়—হাঁফাতে হাঁফাতে সত্য বাঁড়ুজ্যে বললেন—পাতালে। বলি তোমরা কি আমায় প্রাণে মারবার ফন্দি এঁটেছিলে? আমি এই যে করে খাচ্ছি—তা কি তোমাদের সহ্য হচ্ছে না? না আমার পপুলারিটিতে তোমাদের হিংসে হয়েছে? বলি ব্যাপারটা কী?

পরিমল থতমত —কেন দাদা এরকম ভাষলাগ কেন দিচ্ছেন? কি হয়েছে দাদা!

কি হয়েছে দাদা? সঙ্গে সঙ্গে যেন বোমার মত ফেটে পড়লেন সত্যবাবু আই হলে যে আমি পাতকোয় পড়তাম পড়ে জন্মের মত আলুকাবলি হতাম—

—বলি সে খবর রাখো? যতসব পাগলের কাণ্ডকারখানা। তখন পৈ পৈ করে বলেছিলাম—এ সিন টেক করো না—তা কেউ শুনলে আমার কথা? জোর করে পেছনে গরু লেলিয়ে দিয়ে তুমি দাঁড়ালে—

বেতের মোড়ায় ধপ করে বসে পড়লেন সত্যবাবু—লিখে দেবেন তো মশাই, কড়া করে দু-দশটা কথা, এয়ার্কি পেয়েছে নাকি আর ইয়ে, এবার যাও, কলকাতা থেকে ক্রেন ভাড়া করে নিয়ে এসে গরু উদ্ধারক করো...

হলেও বায়স্কোপ পশ্চাতে শিংওয়ালা গরুর তাড়া—সত্য বাঁড়ুয্যে ফ্লাইট নার্ভাস হয়েই বোধ করি রাস্তা ছেড়ে পাশের জঙ্গলে উঠে পড়েছিলেন। মরকগে শট—আগে প্রাণে তো বাঁচি। আর তাতেই হল কাল। ঝোঁকের ওপর জঙ্গলে পা দিয়েই দে বিরাট এক লাফ—বাপ—এযে বিরাট এক পাতকুয়া—পেছনে ছিল গরু—তার যেমন বুদ্ধি—আর্টিস্টকে ফলো করে যেই উঠেছে অমনি গদাম—মানে একেবারে পাতালে পতন! সত্যবাবু ততক্ষণে ব্রেক কষে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। এ-হে-হে-হে, ছুটে এসে দেখেন, ছোট্ট পাতকো—ভাগ্যিস শুকনো—এঁড়ে দাঁত খিঁচিয়ে পড়ে আছে পাতকোর ভেতরে। দুতানাশ্।

শুনে হাজার লোক লোকেশানে ধুলো উড়িয়ে তখুনি ছুটল গরুর পতন দেখতে। গাঁয়ে গঞ্জে এসব দৃশ্য কদাচিৎ দেখা যায়—এই শুটিং হচ্ছে, এই লাফিয়ে পড়ছে, এই মেশিনের গানে সুন্দরী মেয়েরা ধাই ধাই নাচছে, আমি পরিসংখ্যান নিলাম—গ্রামের বহু বাড়ির হেঁসেলে কাঁদন ভাল রকম আগুনই জ্বলছে, না—কারণ বৌ-ঝিদের সময় কোথায়? তারা শুটিং দেখা নিয়েই ব্যস্ত। পর্দায় বহুবার দেখা মানুষেরা চোখের সামনে রক্ত মাংসের শরীরে ঘোরা-ফেরা করছে—এ দৃশ্য দেখতে পাওয়া যেন কত বড় সৌভাগ্যের—গ্রামের মানুষের কাছে। রবি ঘোষ, জহর রায়, চিন্ময় রায়, গীতা দে—লোকের দেখেও যেন আশ মিটছে না।

সত্যদার জন্যে তৎক্ষণাৎ কফি এল—খান দাদা খান, আর রাগ করবেন না।

সত্য বাঁড়ুজ্যে অবশ্য গজগজ করতে করতে কফি নিঃশেষ করলেন। তারপর মেকআপম্যানকে হেঁকে বললেন—শম্ভু,

একস্ট্রা যে গোঁফটা আছে, এনে লাগিয়ে দিয়ে যাও। পড়েছি যবনের হাতে...। আচ্ছা বল, এবার কি করতে হবে?

—এবার পুকুরে ঝাপ্যে পড়তে হবে?

—কি হবে?

—ঝাপ্যে পড়তে—

—মানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে—এই তো? তা তোমার দেশ কোথায়?

শম্ভু সলজ্জ হেসে বলল—আজ্ঞে ডায়মণ্ডহারবাড়া—

সত্য বাঁড়ুজ্যে ফিক ফিক হেসে বললেন—বুঝেচি আর বলতে হবে না।

এ'দো পানা পুকুর দেখে নাক সিঁটকে সত্যবাবু বললেন—জলে গন্ধ, মরুকগে—আগে ঝাঁপিয়ে তো পড়ি মায়ের নামে, তারপর দেখা যাবে—

ডিরেক্টর বলল—দাদা পকেটে মাছ নিয়ে উঠে আসবেন, পরিমল মাছ সব পকেটে ভরে দাও ঠোঁশে, বেরিয়ে গেলেও দু-চারটে অবশিষ্ট থেকে যায়, তাহলেই আমার শট হয়ে যাবে।

পাঞ্জাবী দুই ঝুল পকেটে দু ডজন জ্যান্ত ল্যাটা মাছ ঢুকিয়ে দিতেই সত্যবাবু একগাল হাসলেন—আইডিয়াটা মন্দ নয়। জমে যাবে ব্যাপারটা মনে হচ্ছে। পরিমল এক হ্যাঁচকা টানে কাছা খুলে দিয়ে বলল—দাদা, কন্টিনিউটি করে দিলাম, শট ফোরে কাছা খুলেছে আপনার—এখন চলছে শট নাইন—

ঢাকুরে তপন দত্ত হাতে ছোরড় সাইজের ল্যাটা ধরেছিল, সেটা খলবল করছে দেখে সে ঘাবড়ে গিয়ে বলল—জলে শুনেছি মাছের বড্ড জোর—যদি হাত ছেড়ে পালিয়ে যায়?

পীযূষ বসু পরিচালিত সিস্টার সুপ্রিয়া দেবী ও অন্যান্য

ডিরেক্টর সংগে সংগে বলল—তাহলে আর তোমার জল থেকে ওঠার দরকার নেই, তুমি ওখানেই চিরকালের মত থেকে যেও—যতসব, এটা ল্যাটা মাছ—তাও ধরে রাখতে পারবে না—বায়োস্কোপে এয়েছিলে কি জন্যে—এ্যাঁ? যাও, যেমন বলা আছে ঠিক তাই তাই করবে—

সিগনাল পেয়ে সত্যবাবু জলে লাফিয়ে পড়লেন।

আর তাঁকে অনুসরণ করে তপন দত্ত। ক্যামেরা তখন ফুলস্পীডে চলছে। তারপর সত্যবাবু উঠে এলেন। ভয়ংকর ক্রুদ্ধ অভিব্যক্তি তাঁর চোখে মুখে। তপন আর ওঠে না কি ব্যাপার?

সত্যবাবু বললেন—দাঁড়াও, ছোঁড়াকে দিচ্ছি আজ। ইডিয়েট। আমার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়েছে বুড়বকটা। উঃ, যতসব অ্যামেচার নিয়ে হয়েছে কারবার—আই তপন ওঠ, আর ডুবে থেকে ন্যাকামো করতে হবে না।

সংগে সংগে ওপার থেকে জবাব এল—আমি ভয়ের চোটে এখানে ডুব সাঁতারে চলে এয়েছি দাদা, এবারের মত মাফ করে দিন—আমি না দাদা, পরিমলবাবু আমায় ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে—তাতেই তো আপনার ঘাড়ে গিয়ে পড়লাম, আপনি জিগ্যেস করে দেখুন—

—পরিমল! কোথায় গেল সে?

ক্যামেরা অনেক আগেই কাট হয়ে গেছে। পরিমল সটকেছে। তাকে অনেক খুঁজে তখনকার মত পাওয়া গেল না।

রঞ্জন মজুমদার

পরিচালনা : সলিল দত্ত

সেই চোখ

সার নবকৃষ্ণ সারাজীবন ভালবাসার লোক খুঁজেই কাটাতে থাকেন। এদিকে বয়সও চল্লিশে গড়িয়ে আসে। মাথায় আবার বংশগত পাগলামী। সারের বিপুল ঐশ্বর্যের লোভে অবশ্য অনেকেই এসেছিল। তবে কারোরই "সেই চোখ" ছিল না। এমন লোক অবশেষে একজন সতিকারের ভালোবাসার লোক পায়—সে হল নীতা সুলতার ভাইঝি। স্বার্থপর সুলতা নিজে বিফল হয়ে সারের হাতে নীতাকে তুলে দেয়। নীতার ভাল না লাগলেও সব ঠিক হয়ে যায়। নবকৃষ্ণ নীতাকে বিয়ে করবে। কিন্তু বাদ সাধে নীতার প্রেমিক আর নীতার সৎমা মালতী, যার জীবন নিয়ে নবকৃষ্ণ এক সময় ছিনিমিনি খেলেছিল। বিয়ে যায় ভেংগে। নবকৃষ্ণর আর মনের মানুষ মেলে না।

একথা ঠিক যে ছবিতে পরিচালক একটি নতুন স্টাইল আনতে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু স্টাইল যা কিছু তা প্রথমার্ধেই। দ্বিতীয়ার্ধে আবার সেই গতানুগতিকতা। এই অর্ধকে অযথা মেলোড্রামাটিক না করে এবং গানগুলিকে (যা ছবির গতিকে বিশেষ ব্যাহত করে) বাদ দিয়ে, শরতের মেজাজটি রাখতে পারলে ছবি কিছুটা আকর্ষণীয় হতে পারত। আকাশ-কুসুম দলের বিচিত্র নারী-পুরুষেরা অবশ্যই বাংলা ছবিতে নতুন এবং এঁদের কীর্তিকলাপও অদ্ভুত। তবু যখন দেখা যায় যে স্বার্থের জন্যই স্বামীরা স্ত্রীদের এবং মায়েরা মেয়েদের নবকৃষ্ণকে উপহার দেয়—তখন কেমন যেন ভাল লাগে না। নবকৃষ্ণের যে চরিত্র ছবিতে দেখা যায় তাকে আনায়াসেই 'লম্পট' বলা চলে। শেষের দিকে হঠাৎ চরিত্রটির প্রতি দর্শকের সহানুভূতি আনাবার চেষ্টাকে তাই কেমন যেন পাগলামি বলে মনে হয়। শিল্পীরা অবশ্য সকলেই ভাল অভিনয় করেছেন। যদিও তাঁরা দুর্বল কাহিনী ও চিত্রনাট্যের শিকার। নাম-ভূমিকায় উত্তমকুমারকে অবশ্যই ভাল লাগে। আর যারা ভালো তারা হলেন উৎপল দত্ত, সাবিত্রী, ছায়া দেবী, হরিধন, বাসবী ও নীতার চরিত্রে মহুয়া রায়চৌধুরী।

—চিত্রলিপি

কয়েকজন

বিভূতি লাহা

১৯৪৭ সাল। ১৪ আগস্ট রাত বারোটা। সারা কলকাতা তখন মেতে আছে স্বাধীনতার উৎসবে। আলোর রোশনাই আর লোকের কলকোলাহলে নমস্ত রাজপথ মুখর। ইংরেজী হিসাবে ভারত স্বাধীনতা পেয়েছে ঐ সময়েই। কলকাতা শহর সেদিন (রাতও বলা যায়) উৎসবের বন্যা।

শুধু রাজপথ নয়, রাজভবনেও তখন উত্তেজনা চরমে। প্রথম মন্ত্রিসভা প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে ভাইসরয় রাজাগোপালাচারীর কাছে শপথ নিচ্ছেন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ইতিহাসের সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তকে সেলুলয়েডের ফিতেয় ধরে রাখছেন চিত্রগ্রাহক বিভূতি লাহা। আনন্দ আর উত্তেজনায় উপস্থিত প্রতিটি ব্যক্তি তখন শিহরিত।

আর ঠিক তখনই দক্ষিণ কলকাতার উজ্জ্বলা সিনেমা হলে স্বাধীন ভারতের সিনেমা পর্দায় যে ছবিটি প্রথম মুক্তি পাচ্ছে সেটি ঐ চিত্রগ্রাহকেরই প্রথম ছবি 'স্বপন ও সাধনা'। পরিচালক সেই মুক্তি উৎসবে অনুপস্থিত, কিন্তু সেজন্য কোনো ক্ষোভ নেই তাঁর মনে। ইতিহাসের সেই স্মরণীয় ক্ষণটির ছবি তোলার সৌভাগ্যে শ্রীলাহা গর্বিত, আনন্দিত। না থাকতে পারলেন নিজের ছবির মুক্তিতে!

সেদিন কথা হচ্ছিল বিভূতি লাহার সঙ্গে তাঁর স্টুডিওর অফিস ঘরে বসে। প্রায় নির্ভুলভাবে তিরিশ বছর আগের ঘটনাগুলো নিখুঁত ডিটেলসে বলে যাচ্ছিলেন। কখনও রসিকতার সুরে কখনওবা স্মৃতির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে সিরিয়স ভঙ্গি নিয়ে।

যখন বললাম—'বিভূতিবাবু, আমি কিন্তু মেইনলি আপনার প্রোডাকশন অ্যাকটিভিটি নিয়েই জানতে চাইছি।'

আলোচনার মোড় ঘুরল তখন। ১৯৩২ সালে ল্যাবরেটরীতে সহকারী হয়ে ঢোকা থেকে শুরু করে ১৯৪৬ সাল অব্দি বিভূতিবাবুর অগ্রগতির ইতিহাস যে কোনো ব্যক্তির কাছেই রোমাঞ্চকর মনে হবে।

বললাম—'ছিলেন তো পরিচালক, প্রোডাকসনে এলেন কি করে?'

—আমার এক অবাঙ্গালী বন্ধু একবার তাঁর ছবি করার জন্য ধরে। এম-পির মুরালীবাবুর সঙ্গে তার আগে থেকেই যোগাযোগ আমার। এই সুজনের কাছ থেকে অঙ্কুর পেয়ে সীতাই একদিন ছবি করায় নেমে গেলাম। মুরলীবাবু একদিন বললেন—'আসুন আমার সঙ্গে প্রোডাকসনে।'

সেদিন থেকে এম-পি প্রোডাকসন হলো এম-পি প্রোডাকসন প্রাঃ লিঃ শুধু বিভূতিবাবুই জয়েন করলেন না, তখন অগ্রদূত গোষ্ঠির বিমল ঘোষ, যতীন দত্তও হলেন পার্টনার। সম্ভবত 'সংকল্প' ছবি থেকেই বিভূতিবাবুর প্রযোজনাকর্মে হাতেখড়ি। পরবর্তী সময়ে এম-পি'র সব ছবির সঙ্গেই জড়িত ছিলেন তিনি। কয়েকখানি ছবি নিজে (অগ্রদূত) পরিচালনাও করেছেন। বিদ্যাসাগর, সহযাত্রী, বাবলা, আঁধি, কার পাপে, অগ্নি পরীক্ষা, অনুপমা, তিযামা, সবার এমন কেউ বাংলা ছবি জগতে আছেন কি? উপরে ইত্যাদি ছবিগুলোর নাম শোনেননি বোধহয় না।

—এত সাকসেসফুল ছবি করা সত্ত্বেও এম পি উঠে গেল কেন?

ঃ একটা প্রোডাকসন কোম্পানীর দু-একখানা ছবি হিট করলেই কি সেটা বাঁচতে পারে? বছরে পাঁচখানা ছবির লস দু একখানা ছবির লাভ দিয়ে মিট-আপ করা যায়। এম-পি'র ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। অগ্রদূতের ছবিগুলো হিট করলেও বেশীর ভাগ ছবি চলেনি।

—প্রোডিউসার হিসাবে এ ব্যাপারে আপনার দায়িত্ব কতখানি?

অস্বীকার করলেন না নিজের দায়িত্ব। গল্প সিলেকশন, স্ক্রিপট্ দেখাশোনা, সব ব্যাপারেই নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে তাঁর। অবশ্য তিনি বললেন—'দায়িত্ব শুধু আমার একারই ছিল না, কমিটিরও কম নয়। সবাই মিলেই তো ডিসিশন।'

—এম-পি ভেঙ্গে যাবার কারণও কি এই সব ছবির ফ্লপ করা?

ঃ ঠিক তাই। একের পর এক ছবিগুলো ফেল করার জন্য স্টুডিও খরচ, আর্টিস্টদের মাইনে ইত্যাদি চালানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালো। ইতিমধ্যে ষাট সালে স্টুডিও লিজও শেষ হতে তা আর রিনিউ করা গেল না।

এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন মাথায় এলো আমার। এম-পি নিউ থিয়েটার্সের সময় তাঁদের মাইনে-করা আর্টিস্ট থাকত। বাংলা ছবির প্রায় প্রবীণ সব শিল্পীরাই এই ব্যবস্থায় কাজ করেছেন। উত্তমকুমারও করেছেন। উনি ছিলেন এম-পি'র মাইনে-করা আর্টিস্ট।

বললাম—'আর্টিস্টরা স্বাধীন হয়ে পড়ায় কোনো অসুবিধে হতো না আপনাদের?

—হতো বৈকি! ভাড়া বাড়ী আর নিজের বাড়ীতে তফাৎ নেই! তবে কিনা আর্টিস্টদের সঙ্গে গুড রিলেশনটা মেনটেন করাটাই আসল ব্যাপার! তাহলে খুব একটা অসুবিধে নেই!

'তিযামা' করার পর এম-পি প্রোডাকসন গেল ভেঙ্গে। তখন বিভূতিবাবু, যতীনবাবু মিলে তৈরী করলেন অগ্রদূত চিত্র—নতুন সংস্থা। এর প্রথম ছবি হোল 'পথে হোল দেরী।' সুপার সুপার হিট ছবি। দু-এক বছর বাদে 'লালুভুলু' এবং 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' করে পরিচালক অগ্রদূতের সঙ্গে অগ্রদূত চিত্রেরও সুনাম কম হোল না।

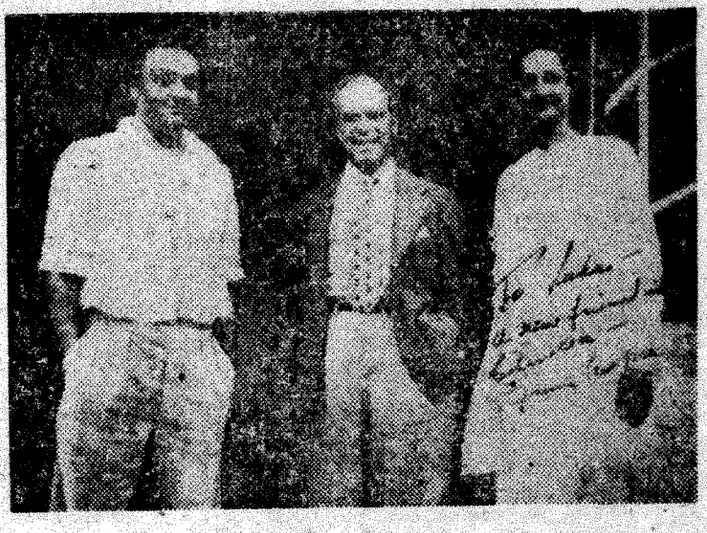

কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিশ্ববিখ্যাত চিত্র পরিচালক ফ্রাঙ্ক কাপ্রোর সঙ্গে বিভূতি লাহা ও বিমল ঘোষ (বায়ে)।

পরবর্তী কয়েক বছর বিভূতিবাবু আর নিজের প্রোডাকসনে ছবি করেননি। অন্যদের ছবি পরিচালনা করেছেন। পরিচালক হিসাবে অগ্রদূতের সুনাম এখনও অক্ষুণ্ণ। সুতরাং ও'র প্রোডিউসারের অভাব কোনো দিনই হয়নি। কিন্তু নিজে ছবি প্রোডিউস করায় যে স্বাধীনতা আর আনন্দ সেটা বোধ হয় পাওয়া যায় না।

তাই যখনই ঐ কথা তুলে জিজ্ঞেস করলাম—'নিজে আর ছবি করলেন না কেন?'

হাসতে হাসতে বললেন—'নিজে ছবি করায় স্বাধীনতা আর আনন্দের সঙ্গে ঝক্কিও কম পোহাতে হয় না। রিস্ক কম নাকি? সেসব কথা ভাবতে ভাবতে ছবির ক্ষতিও কম হয় না। সুতরাং...।'

সুতরাং অগ্রদূত পরবর্তী প্রায় দশ বছর সুবর্ণরেখা, অগ্নিসংস্কার, উত্তরায়ণ, বিপাশা, নবদিগন্ত, বাদশা, সংযুক্তা, তাপসী, নায়িকা সংবাদ ছবিগুলো একটানা করে আবার ভাবলেন ছবি প্রযোজনার কথা। অবশ্যই নিজে পরিচালক বিভূতিবাবু।

বন্ধু শিবনারায়ণবাবুর সঙ্গে পার্টনারশিপে তৈরী হোল চলচ্চিত্র ভারতী। প্রথম ছবি করলেন 'কখনো মেঘ'। ছবিটি হিট করলেও একটানা চলচ্চিত্র ভারতীর জন্য ছবি তিনি করেননি। এ পর্যন্ত মোট তিনখানি ছবি হয়েছে এই ব্যানারে। 'ছদ্মবেশী' আর 'সেদিন দুজনে'। এখন হচ্ছে 'দিন আমাদের'।

বিভূতি লাহার ছবি পরিকল্পনায় ফ্লপের সংখ্যা খুবই কম, বেশীর ভাগই সুপার হিট। আরও একটি বৈশিষ্ট্য অবশ্যই লক্ষণীয়—ও'র শতকরা পঁচাত্তর ভাগ ছবিতে উত্তমকুমারের উপস্থিতি।

এই ধারাবাহিক সাফল্যের স্বাদকাঠিটি কি—জিজ্ঞেস করতে বিভূতিবাবু বললেন—'আগেকার দিনে ছবিতে কনটেন্টকে প্রাধান্য

১১ই সেপ্টেম্বর ৩টায়
কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে
অস্থায়ী নাট্য সংস্থার
দৃশ্যের দর্পণে
রচনা / বোম্মানা বিশ্বনাথম্

নিধিরাম সর্দার

শংকর ব্যানার্জী নন্দিতা বসু ও প্রশান্ত মুখার্জি। পরিচালনাঃ রবি ঘোষ।
অমৃত ফটো

দেওয়া হতো, আজকাল আবার ফর্মটাই প্রাধান্য পাচ্ছে। আমি কিন্তু চিরদিনই এই দুটো জিনিসকে ব্লেন্ড করে ছবি করি।' এটাই বিভূতিবাবুর যাদুকাঠি তাহলে।

প্রোডিউসার হিসাবেও সাকসেস তাঁর প্রায় করায়ত্ত। তবুও বাংলার ছবি-শিল্প যে আজ সংকটের মুখে তার জন্য চিন্তাও তাঁর কম নয়। ছোট ছোট প্রযোজকরা প্রায়ই পরিবেশক-প্রদর্শক চক্রের চক্রবুহো আটকে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

আর এই কারণেই নাকি আগামী অর্ডিনান্সটা এখুনি আসা দরকার। তাঁর মতে—'সব হলে ছাব্বিশ সপ্তাহ বাংলা ছবি দেখানো হলে নিশ্চয়ই প্রতিটি ছবির রিটার্ন বাড়বে, আর রিটার্ন বাড়লেই ছবির সংখ্যাও বাড়তে বাধ্য। সেই সঙ্গে সেন্সর তারিখ অনুসারে রিলিজের বন্দোবস্ত হলে ঐসব ছোট প্রযোজকদের সুবিধেই হবে। ছবি তৈরী করে অনির্দিষ্টকাল হাঁ করে বসে থাকতে হবে না আর তাঁদের।'

আর এটাও বললেন—'দর্শকরা এখন কালার মাইন্ডেড হয়ে পড়েছে। একই পয়সা দিয়ে যদি কেউ বেশ রংচংয়ে মজাদার কিছু পাশের হলেই দেখতে পায়, তাহলে কে আর সাদা-কালো ছবি দেখবে বলুন? সুতরাং এখন থেকে রঙীন ছবির কথা অবশ্যই ভাবতে হবে, নইলে রাস্তা নেই। নো ওয়ে আউট।'

—কিন্তু ইস্টম্যান কালারের জন্য বিদেশী মুদ্রার গ্যারান্টি দেওয়া সম্ভব হবে কি?

প্রশ্নটা শুনে তিনি বললেন—'না তা প্রায় অসম্ভব। তবে শুনেছিলাম দু-চারটি ছবির ক্ষেত্রে নাকি ঐ বাধা-নিষেধের কিছু হেরফের করা হবে।'

—বাকি সবাই কি করবেন তাহলে? তাঁরা কি কোনো দিনই রঙীন ছবি করতে পারবেন না?

: কেন পারবেন না! নিশ্চয়ই পারবেন। আমরা ভাবছিলাম ১৬ মিঃ মিঃ-এ সুটিং করে ৩৫ মিঃমিঃ ব্লো-আপ করার কথা। তাতে বোধহয় কস্ট বেশী পড়বে না। এই প্ল্যানে কাজ করলে সব বাংলা ছবিই রঙীন হতে পারে। অবশ্য সবার আগে এখানে দরকার একটা কালার ফিল্ম ল্যাবরেটরী, নইলে হবে না।'

—তা হলে তো তখন এখান থেকেও অল ইন্ডিয়া মার্কেটের জন্য ছবি করা যাবে!

কথাটা শুনে বিভূতিবাবু দু-তিনবার ঘাড় নেড়ে বললেন—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। করতে হবেও।'

আপাততঃ বাংলা ছবির এখন অস্তিত্ব সংকট। সরকারী অর্ডিন্যান্স বা যে কোনো ব্যবস্থায় একে কাটিয়ে ওঠা দরকার সবার আগে। এজন্য ভালো ছবি মানে রুচিসম্পন্ন ব্যবসায়িক ছবি, বেশী সংখ্যা দরকার। একা বিভূতি লাহা চলচ্চিত্র ভারতী, অগ্রদূত তা পারবে না। আরও কয়েকজন দরকার।

নিরীক্ষক

বেনারসী
জেড্
সিল্ক-তাঁত
মিল বস্ত্র
গেঞ্জি-মোজা
শার্টিং-সুটিং
ছিট কাপড়
রূপদীপ
৭৩, জি, টি, রোড (সাউথ) হাওড়া
ফোন: ৬৭-৫৩২৫

শতবর্ষের স্মরণায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এই ঘটনার বহু পূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অশ্রুমতী' নাটকে গিরিশচন্দ্রকে একবার রাণা প্রতাপের চরিত্রে অভিনয় করতে হয়েছিল। দুই অংকের অভিনয় শেষে নেপথ্য থেকে গিরিশচন্দ্র শুনতে পান রাণা প্রতাপের মেয়ে সলিমকে ভালবেসেছে এবং এ জন্য হা হুতাশ করছে। কাউকে কিছু না বলে রাণা প্রতাপের রূপসজ্জা নিয়েই গিরিশচন্দ্র বাড়ীতে চম্পট দেন। খোঁজ-খোঁজ করেও গিরিশচন্দ্রকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। পরদিন থিয়েটারের কর্তৃপক্ষরা গিরিশচন্দ্রের গৃহে গিয়ে বিষয়টির কথা জানতে চাইলেই তিনি সোজা উত্তর দেন জানিয়ে এলে ত আসতে দিত না—তাই পালিয়ে এলাম। রাণা প্রতাপের উপর গিরিশচন্দ্রেরও একখানি নাটক লেখা ছিল কিন্তু স্টারে অমৃতলালের 'রাণাপ্রতাপ'-এর জন্য নিজের নাটক বন্ধ রাখেন। মিনার্ভার রাণা প্রতাপ জমে নি। স্টারের রাণা প্রতাপ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

৭ ডিসেম্বর ১৯০৫ খৃঃ মিনার্ভা মঞ্চস্থ হয় গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা'। মহাত্মা তিলক সেদিন 'সিরাজদ্দৌলা' দেখতে আসেন। সারা নাট্য গৃহ বন্দেমাতরম ধ্বনিতে মুখরিত হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই সিরাজদ্দৌলা নাটকের অভিনয় দেখেই মিউনিসিপ্যাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় সুভাষচন্দ্রকে অনুপ্রাণিত করেন।

১৯০৫ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাস অর্থাৎ সিরাজদ্দৌলা নাটকের সময় অপরেশচন্দ্র মিনার্ভা থিয়েটার পরিত্যাগ করেন (বাংলা ১৩১২ সালের ভাদ্র মাসে)। কিছুদিন এখানে ওখান ঘুরে অবৈতনিকভাবে প্রায় আট মাস স্টার থিয়েটারের সংগে যুক্ত থাকেন। বাংলা ১৩১৪ সালের বৈশাখ মাসে তার বন্ধু শরৎকুমার রায় ক্লাসিক থিয়েটার ক্রয় করে কোহিনুর থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করলে অপরেশচন্দ্রও এখানে যোগদান করেন। নদীয়া জেলার কুড়ালগাছি গ্রামের জমিদার হাইকোর্টের উকিল প্রসন্নকুমার রায় ছিলেন শরৎবাবুর পিতা। মনমোহনবাবুর ঠিকাদারী ব্যবসায়ের অংশীদার ছিলেন শরৎবাবু। সেই সূত্রে শরৎবাবু প্রায়ই মিনার্ভা থিয়েটারে আসতেন। এই সময় মিনার্ভায় প্রফুল্ল নাটকের অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র যোগেশ চরিত্রে অভিনয় করেন। দর্শক সমাগমে নাট্যগৃহ পরিপূর্ণ। শরৎবাবুও এদিন প্রফুল্লর অভিনয় দেখতে আসেন এবং অভিনয়ের ফাঁকে গ্রীণ রুমে গিয়ে গিরিশ-চন্দ্র প্রমুখের সামনে বলেন : উঃ কি বিক্রী! শরৎবাবু গ্রীণ রুমে চলে গেলে গিরিশচন্দ্র তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। অপরেশচন্দ্র বলেন মনমোহনবাবুর বিশেষ বন্ধু।' হেসে গিরিশচন্দ্র উত্তর দেন বন্ধুত্ব আর বেশী দিন থাকবে না।' অপরেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন, 'কেন?' গিরিশচন্দ্র বলেন : শুনলে না ওর কথা কিভাবে বললেন উঃ কি বিক্রী! এই বিক্রী দেখে ওর আনন্দ হয় নি—ওর মনে দারুণ লোভ আর হিংসা হয়েছে। দেখে নিও উনি নিজেই থিয়েটার ব্যবসায় নামবেন।'

বস্তুত এই ঘটনার দুই বৎসর বাদেই ক্লাসিকের বাড়ী কিনে শরৎবাবু থিয়েটার ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেন। ক্লাসিক শরৎ রায়ের স্বত্বাধিকারীত্বে কোহিনুর নতুন নাম নিল ১৯০৭ খৃঃ। শরৎবাবু অপরেশ-চন্দ্রের বন্ধু ছিলেন। স্টার থেকে তিনি কোহিনুর থিয়েটারে এসে যোগদান করলেন। থিয়েটার গৃহ হলেই থিয়েটার ব্যবসা পরি-চালনা সম্ভব নয়। চাই নাটক শিল্পী ও বিশেষজ্ঞ। হয় নতুন দল গঠন করতে হবে নতুন দর নিয়ে—আর না হয় পুরোনদের ভাঙিয়ে আনতে হবে অন্য থিয়েটার থেকে।

কোহিনুর থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় অপরেশচন্দ্র প্রথমেই স্টার থিয়েটার থেকে শরৎকুমার রায়ের সংগে এসে যোগদান করেছিলেন। ধর্মদাস সুরকে আনিয়ে থিয়েটার গৃহের সংস্কার সাধন শুরু করা হয়েছিল। থিয়েটার গৃহের সংস্কার সাধনের কাজ সমাপ্ত হবার সংগে সংগে যদি নাটক প্রস্তুত করে না রাখা যায়—তাহলে সময় অবথা অতিবাহিত হবে আর এজন্য খরচাও বৃদ্ধি পাবে। তাই দলনেতা হিসেবে চুনীলাল দেবকে প্রথমে আনা হয়। তাঁর সংগে মতের মিল না হওয়াতে তিনি বিদায় নেন। অপরেশচন্দ্র হাজির হলেন রসরাজ অমৃতলাল বসুর কাছে। স্টার থিয়েটারের তিনি অন্যতম অংশীদার। স্টারের অবস্থা তখন শোচনীয়। তিনি কোহিনুরে যোগদান করতে আপত্তি না করলেও ছয় মাসের সময় চাইলেন। ছয় হাজার টাকা বোনাস ও উপযুক্ত এলাওয়েন্স দিতে শরৎবাবু স্বীকৃত ছিলেন। কিন্তু ছয় মাস অপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। তখন এঁরা গিরিশচন্দ্রের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। গিরিশচন্দ্র বললেন, আমি একা গিয়ে কি করবো! নতুন করে দল গঠনের মত স্বাস্থ্য ও বয়স আমার নেই। আর নতুন করে দল গঠন করতে গেলে বছর-খানেক লেগে যাবে—খরচও বৃদ্ধি পাবে। তোমরা অন্যান্য থিয়েটার থেকে বেছে বেছে শিল্পী সংগ্রহ করো। আমি গেলেও নাটক দিতে পারবো না। কোন বই হাতে নেই। ছত্রপতি শিবাজী রিহার্সেলে পড়েছে—সে বই নিতে পারবো না।" মিনার্ভার সংগে গিরিশবাবুর তখন কোন চুক্তি ছিল না। গিরিশচন্দ্রই ম্যানেজার। মিনার্ভার অবস্থাও তখন শোচনীয়। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মিনার্ভায় যোগদান করলেন বেতনভুক শিল্পী হিসাবে। ২১ জুলাই, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে মিনার্ভায় অমরেন্দ্রনাথ সিরাজ-দ্দৌলা নাটকের নামভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন।

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ জেনারেল এসেম্বলির (স্কটিশচার্চ কলেজ) অধ্যাপনার পদ পরিত্যাগ করে স্টার থিয়েটারে নাট্যকার হিসেবে যোগদান করেছেন। তিনিও স্টার পরিত্যাগ করতে অস্বীকৃত হন। সুরেশ সমাজপতি ছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদের বন্ধু। অপরেশচন্দ্র সুরেশ সমাজপতির মারফৎ ক্ষীরোদপ্রসাদকে নাটক রচনা করে দিতে রাজী করালেন। চাঁদবিবি নাটক কোহিনুরের জন্য লিখতে শুরু করেন ক্ষীরোদপ্রসাদ।

এদিকে মিনার্ভা থেকে দানীবাবুকে ৩ হাজার টাকা বোনাস দিয়ে ভাঙিয়ে আনা হলো। তিনকড়ি দাসকে হাজার, তারাসুন্দরীকে হাজার, আরো অনেককে সংগ্রহ করতে ৫০০ ২৫০ টাকা করে খরচ হলো। মিনার্ভা ও স্টার থিয়েটারের অবস্থা শোচনীয়। এবার গিরিশচন্দ্রকে নিয়ে টানাটানি শুরু হলো—মিনার্ভা স্টার আর কোহিনুরের মধ্যে। মিনার্ভা পক্ষ থেকে মহেন্দ্রকুমার মিত্র, স্টারের পক্ষ থেকে হরিবাবু আর কোহিনুরের পক্ষ থেকে অপরেশচন্দ্র ও ক্ষেত্র মিত্র গিরিশচন্দ্রের গৃহে ধর্ণা দিতে লাগলেন।

এ বিষয়ে অপরেশচন্দ্র তাঁর রঙ্গালয়ের ত্রিশ বছর পুস্তকে যে চিত্র এঁকেছেন তা খুবই প্রণিধানযোগ্য।

ক্ষেত্রবাবু আর অপরেশচন্দ্র একদিন কোহিনুরের পক্ষ থেকে গিরিশচন্দ্রের গৃহে হাজির হয়েছেন। গিয়ে দেখেন এঁদের পূর্বেই মিনার্ভার পক্ষ থেকে মহেন্দ্রকুমার মিত্র সেখানে উপস্থিত। এঁরা তখন গোয়ালঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। মশার কামড়ে দুজনে অস্থির। ভাবলেন মহেন্দ্র-বাবু চলে যাবার পরই উপস্থিত হবেন। কিন্তু মহেন্দ্রবাবুর পরই এলেন হরিবাবু। এমনিভাবে রাত দশটা থেকে এঁরা গোয়াল ঘরের মশক সম্প্রদায়ের খাদ্য হয়ে সময় অতিবাহিত করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ক্ষেত্র মিত্রের চেষ্টায় অপরেশচন্দ্রের মধ্যস্থতায় কোহিনুর থিয়েটারেরই জয় হলো। দশ হাজার টাকা বোনাস আর পাঁচ-শত টাকা মাইনেতে গিরিশচন্দ্র কোহিনুর থিয়েটারে যোগদান করেছেন। ২৭ জুলাইর পর, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে মিনার্ভার পদত্যাগ পত্র দাখিল করে কোহিনুর থিয়েটারে যোগদান করেন। গিরিশচন্দ্র পদত্যাগ করলে ৩১ জুলাই, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম ম্যানেজাররূপে ঘোষণা করা হয়। 'চাঁদবিবি' নাটকের চতুর্থ অঙ্ক পর্যন্ত এবং পঞ্চম অংকের খণ্ডিত কয়েকটি দৃশ্য ক্ষীরোদপ্রসাদ শেষ করেন। বলতে গেলে গিরিশচন্দ্রই চাঁদবিবির পঞ্চম অংক সমাপ্ত করেন। (ক্রমশঃ)

কালীশ মুখোপাধ্যায়

নেপথ্যে

কে এ রেজা

টালিগঞ্জেই সম্ভবতঃ একমাত্র ব্যতিক্রম। এখানে যেমন হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা ছাড়াই পরিচালকের চেয়ারে বসা যায়, তেমনি পঁচিশ বছর সহকারী থেকেও স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পান না কেউ কেউ। যোগাযোগ আর ভাগ্য—এই দুয়ের মিলন না হলে অনেক অসম্ভবই এখানে সম্ভব।

যেমনটি ঘটেছে চিত্রগ্রাহক কে এ রেজা ওরফে খন্দকার আহসান রেজার ক্ষেত্রে। সেই ১৯৪৫ থেকে ক্যামেরা হাতে তুলে নিয়েছিলেন, কাজ করেছেন প্রায় আশি। পঁচাশি-খানি ছবিতে। কিন্তু স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ মিলেছে এইমাত্র ক'বছর আগে! সুশীল মুখার্জীর 'ছায়াতীর্থে' রেজা সাহেবের প্রথম কাজ। কিন্তু সেই ছবি রিলিজ হোল পর, পরবর্তী ছবি পাঁচুর গাঙ্গুলীর 'অর্চনা' দেখলো সবাই। মুগ্ধ হোল অনেকে।

জাঁদরেল পুলিশ অফিসার বাঁর বাবা, স্বাভাবিক ছিল তাঁর পক্ষে বড় অফিসার হওয়া, বা অন্য কিছু। কিন্তু না, রেজার মনে তখন অন্য চিন্তা। লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে গান এণ্ড সেল ফ্যাকটরীতে ঢুকেছেন শিক্ষানবিশী হয়ে। সেখানেও থাকতে পারলেন না বেশি দিন। ষোল মিঃ মিঃ ক্যামেরাটি বগলদাবা করে যত্রতত্র ছবি তুলতে শুরু করলেন। তাঁর কাজ দেখে কোডাক কোম্পানীর এক কর্মকর্তা বলেছিলেন 'ছবিতে তো আপনার দারুন হাত মশাই! ভালো করে শিখুন না।'

কদিন বাদেই সোজা অজয় করের কাছে কাজ শেখার আর্জি নিয়ে হাজির। তিনিও রাজী হয়ে গেলেন সঙ্গে নিতে। চন্দ্রশেখর ছবির ক্রেডিট টাইটেলে সহকারী হিসাবে রেজার নাম উঠলো। ঐ সহকারী অবস্থায় তিনি ছিলেন বহু দিন।

কয়েক বছর বাদে এলেন বিশু চক্রবর্তীর কাছে। তাঁর সঙ্গেও কম ছবি করেন নি; ইতিমধ্যে ৫২।৫৩ সাল নাগাদ লণ্ডনে গিয়েছিলেন তিনি। একাধিক বিশ্ববিশ্রুত চিত্রগ্রাহকের কাজ দেখার এবং ঘনিষ্ঠভাবে তাঁদের সঙ্গে মেশার সুযোগ হয়েছিল। ফটোগ্রাফী সম্পর্কে নতুন করে চিন্তার শুরু তখন থেকেই। উপরন্তু উইলার্ড ভন ডাইকের সঙ্গে ডকুমেন্টারী ছবিতে কাজ করার সময় বিভিন্ন দেশ ঘুরে হাতে-কলমের শেখাটা আরও পাকাপোক্ত হয়েছে।

রেজা সাহেবের সেই দক্ষতার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে চিঠির টোন্যাল এফেকটে, **ফুলেশ্বরী, সংসার সীমান্তের** রিয়্যালিস্টিক ফটোগ্রাফীতে এবং সে জন্য তিনি বছরের সেরা ক্যামেরাম্যান হিসাবে বি এফ জে এ-র পুরস্কারও পেয়েছেন।

সদালাপী হাসিমুখী রেজার মধ্যে বিন্দুমাত্র গরিমা নেই। যথেষ্ট বিনয়ী তিনি। তাইতো পুরস্কার নেবার দিন গুরু অজয় করের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে ভুল হয়নি রেজা সাহেবের। বয়োজ্যেষ্ঠদের আশীর্বাদে তিনি আরও এগিয়ে যাবার প্রতীক্ষায়।

বিশেষ প্রতিনিধি

বিবিধ সংবাদ

জয়পুরে রবীন্দ্রনাথের বর্ষা মঙ্গল গীতি আলেখ্য

গত ২৫ জুলাই স্থানীয় রবীন্দ্র রঙ্গমঞ্চে বর্ষামঙ্গল গীতিআলেখ্য সঙ্গীতনৃত্য আবৃত্তি ও ভাষের মাধ্যমে মঞ্চস্থ করেন জয়পুর দুর্গাবাড়ী অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যবৃন্দেরা। রবীন্দ্রনাথের ১৯টি বর্ষার গান ৫টি কবিতা ও ভাবালেখ্য ভাষ্যে সমগ্র অনুষ্ঠানটি বিশেষ মনোজ্ঞ ও শিল্পমণ্ডিত পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল এবং সমবেত দর্শকমণ্ডলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে। শ্যামলী দাসের একক গান এবং আকাশ তলে দলে দলে মেঘ যে ডেকে যায় গানের সঙ্গে শিশু শিল্পীদের নাচটি সকলকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে।

সঙ্গীত ও সামগ্রিকভাবে অনুষ্ঠানটি কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালনা করেন শ্যামলী দাস। নৃত্য পরিচালনায় দীপালি দাস ও ভাষ্য রচনায় জ্যোতিম দাস প্রশংসার দাবী রাখেন।

সুরমূর্চ্ছনার অনুষ্ঠান

'সুরমূর্চ্ছনা' সঙ্গীত শিক্ষণ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করেন সঙ্গীতাচার্য সুখেন্দু গোস্বামী। ইন্দিরা রায়ের উদ্বোধন সঙ্গীতের পরে প্রধান অতিথি মাননীয় রথীন তালুকদার বক্তৃতা করেন। সঙ্গীতানুষ্ঠানের প্রারম্ভে সুখেন্দু গোস্বামী বিভিন্ন সঙ্গীত সম্বন্ধে সুন্দর ভাষণ দেন। সঙ্গীতানুষ্ঠানে বিভিন্ন সঙ্গীত পরিবেশন করেন—প্রদীপ মজুমদার, বিমলেন্দু চক্রবর্তী, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, গীতা দত্ত, ইন্দিরা রায় ও সোমা মুখার্জি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বন্ধু দাশগুপ্ত। সুনীলকুমার নাথ ও অশোককুমার সরকারের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সুব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হয়।

মূকাভিনেতা নিরঞ্জন গোস্বামী

মূকাভিনেতা নিরঞ্জন গোস্বামী এবছর কেন্দ্রীয় সরকারের বৃত্তি পেয়েছেন। মূকাভিনয় বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য। প্রখ্যাত মূকাভিনেতা যোগেশ দত্তর নিকট দীর্ঘদিন ধরে মূকাভিনয় শিখেছেন এবং এখনও লিখছেন। সম্প্রতি নিরঞ্জন গোস্বামী ভুবনেশ্বর গৌহাটি শিলং প্রভৃতি স্থানে একক মূকাভিনয় করে প্রচুর প্রশংসা অর্জন করছেন।

ক্যাসেটে চুরির শাস্তি

আনন্দের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ব্যাসেট গ্রামোফোন কোম্পানীর ভিস্ক প্রকাশিত সঙ্গীত টেপ করে নিয়ে বিক্রী করার অপরাধে বিদ্যানগরে ভূপেন্দর এম. প্যাটেল ও ভীরেশ এম. প্যাটেলকে (মিউজিক সেণ্টার) অভিযুক্ত করে ১,০০০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন। গ্রামোফোন কোম্পানীর কপিরাইটে এইরকম বেআইনীভাবে হস্তক্ষেপ করে শিল্পী ও চিত্রপ্রযোজকদের রয়েলটি থেকে বঞ্চিত করাটা একটা মারাত্মক অপরাধ।

সকল রকম সুব্যবস্থার জন্য সরকারের কাছে অসুস্থ তিমিরবরণ কৃতজ্ঞ : গত সপ্তাহে অসুস্থ তিমিরবরণকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিত পাঁজা পার্ক নার্সিং হোম থেকে পি জি হসপিটালে উডবার্ণ হাউসে স্থানান্তরিত করেছেন চিকিৎসার সকল রকম ব্যবস্থার জন্য। তাঁর ড্রাই প্লুরিসি হয়েছে। এবং সুচিকিৎসার গুণে তিনি এখন ক্রমশঃ ভাল বোধ করছেন বলে জানালেন। শ্রীপাঁজা সরকারের তরফ থেকে তাঁর সকল রকম চিকিৎসা ও ঔষধের ব্যয়ভার গ্রহণ করেছেন।

APPLAUDED BY ONE AND ALL

AFTER DOING ROARING BUSINESS IN BOMBAY, DELHI/UP. NOW COMES TO BENGAL!

ROXY (Daily 4 Shows) **GANESH** (Daily 3 Shows)

PRIYA - MITRA (Daily noon Shows)

BANGABASI, LILHAH, AJANTA, REGENT, KHATOONMAHAL, SANDHYA, RAJNI, JONAKI, RUPMAHAL, ANJANA, MAHUA & SREE LAXMI.

Thru — MUSICAL FILMS (P) LTD. CALCUTTA.

চিতচোর

প্রযোজনা : রাজশ্রী প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিঃ

গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টার পীতাম্বর চৌধুরীকে তার বড় মেয়ে মীরা বম্বে থেকে চিঠিতে জানাল—গ্রামে একজন শিক্ষিত ইঞ্জিনীয়ার যাচ্ছেন ওকে যেন একটু আদর যত্ন করে কারণ ওর ছোট বোন গীতার স্বামী হবার সব যোগ্যতা ওর মধ্যে আছে। বিনোদ মধুপুর গ্রামে এসে অল্প সময়ের মধ্যে পীতাম্বর চৌধুরীর পরিবারের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো। গীতার সঙ্গে ভাব ভালবাসার ব্যাপারেও খুব বেশী সময় নিল না বিনোদ। ওদের পরিবারের বন্ধন তার জন্যে বিনোদ নিজেই গীতাকে গান শেখাত, কারণ সে একজন সঙ্গীতজ্ঞ।

ইতিমধ্যে বম্বে মীরার কাছ থেকে আবার চিঠি এল কাজের চাপে ইঞ্জিনীয়ার এখনও ওখানে যেতে পারেননি শিগগীরই উনি মধুপুর রওনা হচ্ছেন ওরা যেন ওর প্রতি যত্নবান হতে কালক্ষেপ না করেন গীতার জন্যে এর চেয়ে ভালো স্বামী আর পাওয়া যাবে না। সুতরাং আসল ইঞ্জিনীয়ার সুনীল এসে পড়ায় পীতাম্বর চৌধুরীর বাড়ীর দয়া-দাক্ষিণ্য সব চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল বিনোদের সুনীলের সঙ্গেও গীতার ভাব বিনিময় হোল কিন্তু প্রেম হোল না কারণ মনে মনে গীতা বিনোদকেই ভালবাসে। সুনীল অন্তরঙ্গতাকে ভালবাসা মনে করে কিভাবে বিয়ে করতে চাইলো। কিন্তু আচমকা বিনোদ মধুপুর ছেড়ে যাওয়ার জন্য ষ্টেশনে গেলে বিনোদকে মধুপুর ছেড়ে যেতে দিতে রাজী হল না। সুনীল তার ভুল বুঝতে পারে গীতা তাকে ভালবাসে না ওর প্রণয় কেবল কিশোরের জন্যে।

সুবোধ ঘোষের লেখা কাহিনীর এক সর্বাঙ্গ সুন্দর চলচ্চিত্র রূপ দিয়েছেন চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক বাসু চ্যাটার্জি। 'সারা আকাশ' এবং 'রজনীগন্ধার' চেয়েও পরিচালক বাসু চ্যাটার্জি এ ছবিতে আরো ভাবপ্রবণ এবং বাস্তবসম্মত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। অভিনয় ও আঙ্গিক এ ছবির অন্যতম সম্পদ। অভিনয়ে—অমল পালেকর (বিনোদ) গীতা (জারিনা ওয়াহব) সুনীল (রিজয়েন্দ্র) এবং মা ও বাবার ভূমিকায় এ কে হাঙ্গল ও দীনা পাঠক সুন্দর অভিনয় করেছেন অন্যান্য চরিত্রে মাস্টার রাজু, রিতু কমল, সি এম দবের অভিনয় প্রাণবন্ত। কে কে মহাজনের আলোকচিত্র এবং মুক্তার আমেদের সম্পাদনা এবং যাদব ভট্টাচার্যের শিল্প নির্দেশনা এক কথায় অপূর্ব। গীত রচনাও সঙ্গীত পরিচালক রবীন্দ্র জৈন সুন্দর সব মিলিয়ে এরকম সর্বাঙ্গ সুন্দর ছবি পরিচালনার জন্য বাসু চ্যাটার্জি ধন্যবাদার্হ।

চিত্রগুপ্ত

জারিনা ওয়াহব

নাটমঞ্চ

খিদিরপুর অভিযাত্রী পাঠাগার

শরৎ জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে সম্প্রতি আরো একটি মনোজ্ঞ নাট্যানুষ্ঠান হয়ে গেল আকাদমী মঞ্চে। এর উদ্যোক্তা ছিলেন খিদিরপুরের বিখ্যাত প্রাচীন লাইব্রেরী অভিযাত্রী পাঠাগার।

এঁরা অন্যান্য আলোচনা অনুষ্ঠানের সঙ্গে পরিবেশন করলেন শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন', যার নাট্যরূপ দিয়েছেন নাট্য-জগতের এককালের দিকপাল স্বর্গত যোগেশ চৌধুরী।

শরৎচন্দ্রের রচনাভিত্তিক যতগুলি নাটক আছে, ঘটনা, জটিলতা এবং তাকে অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে বোধকরি এ নাটকটি সবচেয়ে দুরূহ।

কারণ নাটকীয়তার চেয়ে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণই এতে বেশী, যাকে অভিনয়ে সজীব করে তোলা রীতিমত কষ্টসাধ্য।

কিন্তু সুখের বিষয় এঁরা তা সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে চমকেরও দৃষ্টি করেছেন। ব্যাপারটা এই নাট্যসমালোচককে আরও বিস্মিত করেছে এইজন্য যে, এই নাটকের পরিচালনার দায়িত্ব ছিল একজন মহিলা শিল্পীর ওপর। বাংলা দেশে নাট্যপরিচালনার ক্ষেত্রে একমাত্র তৃপ্তি মিত্র ছাড়া আর কারুর নাম জানা ছিল না। 'চরিত্রহীন'-এর নাট্য-পরিচালিকা শ্রীমতী গীতা চক্রবর্তী এজন্য ধন্যবাদের যোগ্য। তাঁর কঠিন পরিশ্রমের ফলেই নাটকটি যে দর্শককে আনন্দ দিতে পেরেছে তাতে কোন সন্দেহই নেই।

এই প্রসঙ্গে কিরণময়ীর ভূমিকায় তাঁর অসাধারণ অভিনয়ের কথাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে হয়। কিরণময়ীকে তিনি সেদিন মূর্ত করে তুলেছিলেন।

সেদিন আর ভালো লেগেছে সুভাষ সরকার (সতীশ), অশোক সাহা (উপেন) ও শিবপ্রসাদরূপী দেবকুমার গাঙ্গুলীর অভিনয়। এঁরা সবাই অত্যন্ত নিষ্ঠার

দর্শকে তাঁদের চরিত্রগুলি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন।

এছাড়া দেবকুমার মাইতি, নির্মল মাইতি, সুশীল মাইতি, বিমল রাহা, অনন্ত চ্যাটার্জি, কমল চন্দ, অরুণ বকসী, নির্মল দাস, কেদার ব্যানার্জি, মনোজিৎ চ্যাটার্জি, মুগল দত্ত, বিপ্রদাস চ্যাটার্জি, নিখিল সান্যাল, অরুণ সাহা ও শ্যামল সাধুখাঁ পুরুষ চরিত্রে এবং মিতা মজুমদার, পাপিয়া মজুমদার, স্মিতা চক্রবর্তী, রমা বসু, গৌরী চ্যাটার্জি, জয়শ্রী মুখার্জি ও ভারতী সেন নারী চরিত্রে সুন্দর অভিনয় করেছেন।

টেলিভিশন মানেই

"টেলিকিং"

অর্থাৎ

টি ভির রাজা।

আজই আসুন, দেখুন, শুনুন ও কিনে খুসী হোন।

এ-ছাড়া আমাদের রয়েছে রকমারি রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার, রেকর্ড, ট্রান্সিস্টার রেডিও, ষ্টেপ্ রেকর্ডার, ষ্টিরিওগ্রাম ইত্যাদি ইত্যাদি।

মেরামতের সুবন্দোবস্ত তো আছেই।

রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোরস্

৬৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিঃ-১৩

ফোন : ২৯-৪৭৯৩

GLORIOUS 2nd WEEK

AFTER CREATING BOX OFFICE RECORD AT BOMBAY NOC RUNNING SUCESSFULLY IN CALCUTTA !

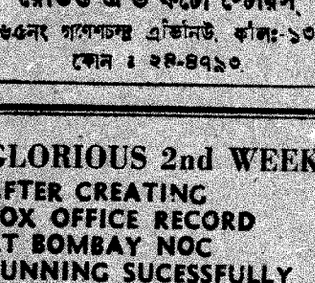

CAAST : AMOL PALEKAR
ZARINA WAHAB
A. K. HANGAL
DINA PATHAK

Introducing : VIJAYENDRA

Story : SUBODH GHOSH

AT METRO

(DAILY NOON SHOW)

RAJSHRI RELEASE

এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে সন্তোষকুমার ঘোষ ও লেডি রানু মুখার্জি।

ক্লান্ত রূপকার

শিয়ালদহ বয়েজ ক্লাব গত মাসে তাঁদের বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে পরিবেশন করলেন শৈলেশ গুহ নিয়োগী রচিত অল্প-মধুর স্বাদের নাটক 'ক্লান্ত রূপকার'।

এই জমাটি নাটকটি ইতিপূর্বে একাধিক নাট্য দল অভিনয় করেছে। তবু শিয়ালদহ বয়েজ ক্লাবের সভ্যদের অভিনয় দেখে নতুনরূপে দেখা গেল তাকে। এ নাটকের গল্পাংশ তেমন কিছু নয়, তবু এর মধ্যে এমন একটা আনন্দ ও বক্তব্য আছে, যা অভিনয়ের গুণে দর্শকের মনকে স্পর্শ করে।

নাটকের যে চারটি চরিত্রের অভিনয় দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছে তাঁরা হলেন অলোক সরকার, নবারুণ সেন, শান্তনু সেনশর্মা ও শিবানী ভট্টাচার্য।

এ ছাড়া পার্বতী ব্যানার্জি, মিতা মজুমদার ও অমিতাভ চক্রবর্তীর অভিনয়ও ভাল লেগেছে।

অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয় করেছেন যথাক্রমে সঞ্চিতা সিনহা রায়, দীপক বসু, মজুমদার, বরুণ ব্যানার্জি, সমীর চ্যাটার্জি স্বপন দে রায়, রথীশ্র সাহা, বাসুদেব দাস রায়, পুষ্কর ভৌমিক, স্বপন তরফদার ও গোবিন্দ গাঙ্গুলী।

নাটক অভিনয়ের পূর্বে পরিবেশিত ছোট্ট মেয়ে মমতা ঘোষের কথক নাচ দর্শকদের প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছে।

বার্ষিক শরৎচন্দ্র

শরৎ জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে এ বছর বহু নাট্যদল বিশেষভাবে শরৎচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য শরৎ-কাহিনীর নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেছেন এবং করছেন। এই সব নাট্যদল ছাড়াও অনেক সাংস্কৃতিক সংস্থা ক্লাব এবং অফিস ক্লাবও শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সর্বসাধারণের পৌঁছে দেবার জন্যে উদ্যোগী হয়েছেন। এটা আনন্দের বিষয় সন্দেহ নেই।

সম্প্রতি বেলওয়ে এমপ্লইজ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন হাওড়ার ডি এস বিল্ডিংসে শরৎ জন্মশতবার্ষিকী স্মরণ উৎসব উপলক্ষে যে নাটকটি উপহার দিলেন সেটি শরৎ-সাহিত্যভিত্তিক নাটক নয়, স্বয়ং শরৎচন্দ্রের বর্মা প্রবাসের জীবনের ওপর লেখা নাটক। নাম 'বর্মায় শরৎচন্দ্র'। নাটকটি লিখেছেন প্রখ্যাত গবেষক নাট্যকার শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায়। সত্যি বলতে কি শরৎচন্দ্রের ওপর এমন তথ্যমূলক ও সজীব নাটক ইদানীংকালে খুব কমই চোখে পড়েছে। শরৎচন্দ্রের ওপর সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত যে কটি জীবনীমূলক নাটক মঞ্চস্থ বা প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে এটি তথ্যে এবং বৈচিত্র্যে উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই।

অভিনয়ে প্রথমেই নামকরা যায় তপনপ্রভা মজুমদার (শান্তি), অম্বারবাবু-রূপী জ্ঞান ভট্টাচার্য এবং খগেন রায়ের (ভৃত্য)। এছাড়া দুর্গা মিত্র (বা খিন) প্রভাস সেনগুপ্ত (শরৎচন্দ্র)ও ভাল।

অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ক্ষমাকান্ত ভুইয়া সুনীতি রায় শিশির রায় মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য নিশ্বা উকিল, রেশমী চৌধুরী ও অমল।

নাটকটি পরিচালনা করেছেন কমল পাল। টিম ওয়ার্কের জন্য নাটকটি হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল।

উর্বশীর অভিশাপ

যৌগিক নাট্য সংস্থা সম্প্রতি অশোক গাঙ্গুলির লেখা 'উর্বশীর অভিশাপ' নাটকটি অভিনয় করে তাঁদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। নাটকটি পরিচালনা করেন উদয় ভট্টাচার্য। অভিনয়ে ছিলেন সুকান্ত গাঙ্গুলি, অজিত গুপ্ত, অনিল দাস, সনৎ অধিকারী, আলপনা দাস, রূপক সাহা ও জ্যোৎস্না ব্যানার্জী।

অলোক বাগচীর দেওয়া সুর শ্রুতিমধুর হয়েছিল।

নাট্য সমালোচক

শোক সংবাদ

বাংলার সুবিখ্যাত বংশীবাদক গৌর গোস্বামী গত ১১ জুলাই ৫২ বৎসর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

ইনি নবদ্বীপের বাসিন্দা। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বংশধর। প্রথম জীবনে অগ্রজ রঞ্জন গোস্বামীর কাছে তাঁর শিক্ষা শুরু। পরে পান্নালাল ঘোষ পণ্ডিত রামকিষণ মিশ্র ও মস্তান গামার কাছেও তালিম নিয়েছেন।

এই সুবিস্তৃত শিক্ষার সঙ্গে মিলেছিলো তাঁর সহজাত শিল্পবোধ। রাগ-সংগীত থেকে শুরু করে যে কোনরকম সুরসৃষ্টিতে তিনি সিদ্ধ সাধক হয়ে উঠেছিলেন। সারা ভারতজোড়া তাঁর খ্যাতি—সংগীতস্রষ্টারূপেও। এই খ্যাতি সাগরতটও ছুঁয়েছিলো। বিদেশী চিত্র-পরিচালক জ্যঁ-রেনারের রিভার ছবির সংগীত পরিচালকরূপে তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। মীরাবাঈ নৃত্যনাট্য সংগীতসৃষ্টি তাঁর আর এক স্মরণীয় অবদান। আকাশবাণীতে তিনি দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইদানীং তিনি ধ্রুপদী টি এল রাণার সহযোগিতায় সংগীত গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অমায়িক আনন্দময় প্রাণখোলা শিল্পী সংগীতজগতে সকলের প্রিয় এবং আন্তরঙ্গ বন্ধু।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ৬এ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের নতুন বই

চিত্র বিচিত্র

একাল-সেকালের বিচিত্র কথা ও রসমধুর কাহিনী-সমারোহ দাম ঃ সাত টাকা

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১৩৮১ সালের মৌচাক পত্রিকা কর্তৃক
সুধীরচন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ রচিত
ছোট বড় সকলের মনের মত
বাংলা সাহিত্যের দু'খানি আশ্চর্য বই

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য ঃ—চার টাকা

(সপ্তম সংস্করণ চলছে)

ছোটদের উপযোগী সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী লেখা হয় নি। বিশেষ করে নানাবিষয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ছোটদের মনের মত বিচিত্র রোমাঞ্চকর লেখা খুব সহজ নয়। 'বিচিত্র কাহিনী'তে লেখক সত্য ঘটনাগুলিকে নিজের সরস মুন্সিয়ানা দিয়ে এমন জীবন্ত আর আকর্ষণীয় করে তুলেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রচনাই অনবদ্য রস ও রোমাঞ্চে টইটম্বুর। মোট পনেরোটি কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রসের ফল্গুধারায় সিক্ত, বর্ণনায় মনোমুগ্ধকর।

আরও বিচিত্র কাহিনী বইটি কিশোর ও বয়স্কদের জন্য সমভাবে রচিত। লেখক শুধু ছোটদের জন্যই রস পরিবেশন করেননি, বড়রাও এই অমৃত আস্বাদন করে পুলকিত হবেন। অনবদ্য রস রচনাশৈলী এবং প্রতিটি কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ চুম্বকের মত পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে। এই বইটিতে দশটি বিভিন্ন রসের কাহিনী রয়েছে এবং লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি এমন সুন্দরভাবে রসযুক্ত করে উপস্থিত করেছেন যে পাঠককে বিমুগ্ধ করবে।

আরও বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য ঃ—চার টাকা

(চতুর্থ সংস্করণ চলছে)

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ । ফোন ৩৪-৬৭৮২

Regd. No. WB/NC-13
ram : AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 20th August, 1976
Phone 55-5231 (14 lines)

iaa/kc0107

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

18 AUG 1976

অনায়াসে দ্বিতীয়বার সম্মান অর্জন করলো

কুকমী

গুঁড়ো মশলা

ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ কোয়ালিটী প্রোডাক্টস কর্তৃক প্রদত্ত একমাত্র উচ্চমানের অকৃত্রিম গুঁড়ো মশলা হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি ও সম্মানপত্র লাভ।

এই বৎসরের শুরুতেই কুকমী গুঁড়ো মশলা নিউ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ট্রান্সওয়ার্ল্ড ট্রেডফেয়ার-এ ক্লাশ—এ স্বর্ণপদক জয় করেছে।

- সর্বোত্তম মান
- ন্যায্য ও নির্দিষ্ট মূল্য
- সঠিক ওজন
- উপাদানের বিশুদ্ধতা
- সমাজ সেবার প্রতি অগ্রাধিকার
- তৎপর ও দ্রুত সরবরাহ ব্যবস্থা

স্বদেশে ও বিদেশে সকলের সেবায় আমরা নিজেদের নূতন করে নিয়োজিত করছি

TRANS-WORLD TRADE FARE SERVICE AWARD DELHI

প্রস্তুতকারক :
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাইভেট লিমিটেড
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০০৭০, পোষ্ট বক্স নং, বড়বাজার : ৬৮৮৫ ফোন : ৩৩০৯৯৫
ফ্যাক্টরী : কাশীপুর

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ /

২৭ আগস্ট ১৯৭৬ ॥

মূল্য ৭৫ পয়সা
অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা

বারোলীন যার সহায়
ম্মে তার ভয় কি?

যদিও নানা কাজে আপনাকে সারাদিন এই প্রকাশ্য সূর্যের নিচেই চলতে ফিরতে হবে। শরীরের উন্মুক্ত অংশগুলো সর্ব তাপ শুলসে যাবে। দেখা দেবে ফোড়া, ফুসকুড়ি ও ঘামের অন্যান্য অস্বাচ্ছন্দ্য। অনেক সময় এই সব ক্ষতজ্বালা দূষিত হ'য়ে ওঠে বাইরের ধুলো-ধোঁয়া বা রোদ-জলে।

বারোলীন স্বতন্ত্রিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম আপনার ত্বকের গভীরে পরে কাটা-ছেঁড়া-ফোটা অংশগুলোকে নিরাপদ রাখে।

পৃথিবীর সর্বপ্রথম ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার বার

সুপার ৭৭৭

পয়সা বাঁচান, বেশী সাদা করুন

সুপার ৭৭৭ বার—দুনিয়াতে এর জুড়ি নেই। এটি একটি নতুন ফর্মুলা। এতে রয়েছে বেশী কাপড় অনেক বেশী সাদা করার, অনেক বেশী পরিষ্কার করার ক্ষমতা—এমনকি যে জলে সাধারণত একেবারেই ফেনা হয় না, তেমন জলে-ও। সাধারণ বার সাবানের তুলনায় দাম-ও কম।

এখন থেকে ব্যবহার করতে শুরু করুন নতুন ধরণের বার—সুপার ৭৭৭ ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার বার!

shilpi hpma 6A/73 BEN

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মজয়ন্তী

॥ বিশেষ ঘোষণা ॥

আগামী ২রা সেপ্টেম্বর হইতে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিভূতিভূষণের জন্মদিন উপলক্ষে বিভূতিভূষণের নিম্নলিখিত বইগুলি ও বিভূতি রচনাবলী খুচরা বা সম্পূর্ণ সেট সাধারণ ক্রেতাদের বিশেষ কমিশনে দেওয়া যাইবে। ১ম, ২য়, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ খণ্ড এখন ছাপা আছে—মোট মূল্য ২৩৫৲। এই কয় খণ্ডের সম্পূর্ণ সেট লইলে সাধারণ ক্রেতারা মাত্র ১৮৮৲ টাকায় পাইবেন। এজেণ্ট বন্ধুগণ কাউণ্টার হইতে লইলে প্রাপ্য কমিশনের উপর অতিরিক্ত ৫% কমিশন পাইবেন।

পথের পাঁচালী ১২৲ ঐ (পেপার ব্যাক) ৭৲ ইছামতী ১৮৲ ঐ (পেপার ব্যাক) ৮৲ আরণ্যক ১৫৲ ঐ (পেপার ব্যাক) ৭৲ অপরাজিত ১৫৲ দেবযান ১০৲ কুশল পাহাড়ী ৫৲ মেঘমল্লার ৭৲ শ্রেষ্ঠ গল্প ১২৲ দৃষ্টিপ্রদীপ ৮৲ দুইবাড়ী ৭৲ অনুবর্তন ১২৲ নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব ৪৲ কিন্নর দল ৩৲ আরো একটি ২৲ অশনি সংকেত ১০৲ অরণ্য মর্মর ৭॥ হীরা মানিক জ্বলে ৫৲ ছায়াছবি ৪৲ অনুসন্ধান ৩॥

বাংলা সাহিত্যে যে কটি বই চিরকালের কিশোর চিত্তকে আনন্দ দিয়ে এসেছে, আজও দিচ্ছে এবং পরেও দেবে তারই একটি—

সীতা দেবী ঃ শান্তা দেবীর

হিন্দুস্থানী উপকথা ১৫৲

নবসাজে শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে।

শারদীয়ার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কীর্তিহাটের কড়চা (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে) ৩০

নীহাররঞ্জন গুপ্তর
অশান্ত ঘূর্ণি (৩য়পর্ব) ১২৲

জরাসন্ধের
তামসী ১৫৲

সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী সপ্তম খণ্ড ২৫৲

নচিকেতার
জাতিস্মর ও মৃতের আবির্ভাব ১০৲

নারায়ণ সান্যালের
অবাক পৃথিবী ৯৲

বাংলা পকেট বই :—
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
স্বর্ণমৃগ ৩৲
উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
আফ্রিদী মল্লুকে ৩৲

তারাশঙ্কর রচনাবলী

দেবল দেববর্মার
সাপ নিয়ে খেলা ৩৲

ত্রয়োদশ খণ্ড কুড়ি টাকা

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২ / ৩৪-৩৪৯২
৮৬।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯/৩৪-৮৭৯১

আজকে ১০০ টাকা মাত্র আপনিই পেয়েছেন

গতকাল আমরা
এক নতুন অধ্যায় শুরু করেছি
আমরা স্থির করেছি
আমাদের উপর গ্রাহকদের
অবিচল আস্থার
প্রতিদান আমরা দেব।

আমাদের সেভিংস অ্যাকাউন্ট গ্রাহকদের 'ধন্যবাদ' জানানোর জন্যে গতকাল আমাদের কাশীপুর শাখায় আমরা একটি আকস্মিক লটারীর আয়োজন করেছিলাম। ঐ লটারীতে কোন প্রবেশ মূল্য কিংবা অন্য কোনরকম ঝামেলা ছিল না। শুধুমাত্র সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকলেই লটারীতে যে কেউ অংশগ্রহণের অধিকারী ছিলেন। আজ তাই তাঁরা খুঁজে পেতে দেখছেন তাঁদের কারো বরাতে কিছু এসেছে কি না। বলা যায় না, এর পরের পুরস্কার হয় তো আপনার বরাতেই আছে।

যুক্তরাজ্যের বাইরে চার্টার্ড ব্যাঙ্কের প্রথম শাখা হিসাবে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে যখন আমরা কলকাতায় আমাদের কাজ শুরু করি, তখন থেকেই আমাদের মূল লক্ষ্য হল আরো ভালোভাবে সেবা করা। গ্রাহকদের সেবার মধ্য দিয়ে জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান অংশের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করা। আর এই সেবার মাধ্যমেই ধীরে ধীরে সারা

চার্টার্ড ব্যাঙ্কের কাশীপুর শাখায় আপনার অ্যাকাউন্ট আছে কি? তাহলে, বলা যায় না আমাদের আকস্মিক লটারী পরিকল্পনায় কোনো না কোনো উপহার আপনিও পেয়ে থাকতে পারেন।

ভারতে আমরা ছড়িয়ে পড়েছি। কাজেই আমরা মনে করি এই কাজে যাঁরা আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের পুরস্কৃত করা আমাদের কর্তব্য।

ভারতে আমাদের প্রথম দিনটি থেকে শুরু করে আজ অবধি সর্বদাই আমরা গ্রাহকদের সঙ্গে বন্ধুর মতোই ব্যবহার করে এসেছি। আর আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের গ্রাহক হয়েছেন বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্যেই আমরা এই আকস্মিক লটারীর আয়োজন করেছি।

আপনি যদি এখনও আমাদের গ্রাহক না হয়ে থাকেন, তবে আজই চলে আসুন।

চার্টার্ড ব্যাঙ্ক আপনার জীবনযাত্রার উন্নতমানের সঙ্গী।

দি চার্টার্ড ব্যাঙ্ক

প্রধান অফিস :
৪ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১
শাখা : বৌবাজার, চৌরঙ্গী, ক্লাইভ রো, কাশীপুর, গড়িয়াহাট, জোড়াসাঁকো, শ্যামবাজার
এছাড়াও, অমৃতসর, বোম্বাই, কোচিন, দিল্লী, কানপুর, মাদ্রাজ, নয়া দিল্লী এবং ডাক্কো-ডা-গামা

স্ট্যাণ্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাঙ্ক গ্রুপের সদস্য

ACME/CB/178

১৬ বর্ষ

অমৃত

১৬ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইষ্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 27th August, 1976 শুক্রবার, ১০ ভাদ্র, ১৩৮৩

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়		
৭	ডেমোসিবিল গ্রর্ডাইক		শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়
১০	কথায় কথায়		শ্রীতারাপদ রায়
১১	প্রথম প্রবাস	(উপন্যাস)	শ্রীবুদ্ধদেব গুহ
১৬	মনের অসুখ		শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
২০	সাময়িকী	(কবিতা)	শ্রীবিষ্ণু দে
২১	গোধূলিয়া	(উপন্যাস)	শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
২৩	সাহিত্যের নেপথ্যে		শাণ্ডিল্য চতুর্বেদী
২৫	বিজ্ঞাপন বিচিত্রা		শ্রীআনন্দ রায়
২৬	চিঠিপত্র		

লীলা মজুমদার সেপ্টেম্বরের প্রথমে বেরোবে

মহাশ্বেতা দেবী

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

নবনীতা দেবসেন নলিনী দাশ

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পূর্ণেন্দু পত্রী

শিশির মজুমদার মঞ্জিল সেন

গৌরী ধর্মপাল অজেয় রায়

সত্যজিৎ রায় ও আরো অনেকে

সন্দেশ

পূজোর

ধাঁধা হাতপাকাবার আসর চিঠিপত্র ম্যাজিক কমিক্স

সন্দেশ কার্যালয় : ১৭২।৩, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা—২৯

নিউস্টলেটের দোকান : এ ১৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলি-৭

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী

১ম খণ্ড ২৫৲ ২য় খণ্ড ২৫৲

৩য় খণ্ড ছাপা চলছে

হ্যান্স অ্যাণ্ডারসন রচনাবলী

প্রথম খণ্ড ২৫৲ দ্বিতীয় খণ্ড ২০৲

গ্রিম ভাইদের রচনাবলী

প্রথম খণ্ড ২৫৲

লুইস ক্যারল রচনাবলী

প্রথম খণ্ড ২৫৲

উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র রচনাবলী

প্রথম খণ্ড ৩০৲ দ্বিতীয় খণ্ড ৩০৲

সুকুমার রায় সমগ্র রচনাবলী

প্রথম খণ্ড ২৫৲ দ্বিতীয় খণ্ড ৩৫৲

এডওয়ার্ড লিয়ার রচনাবলী

এক খণ্ডে ১২৲

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

কার্যালয় : ৭২/১, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলিকাতা—৬

বিক্রয়কেন্দ্র : এ/১৩২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭

ফোন : ৩৪-২৩৮৬

শ্রীশ্রী রচনাবলী

প্রথম টাকায় ডিসকাউণ্ট কুপন কিনে ২৫% কুপনসহ কিনুন

১ম খণ্ড ২৫.০০ আনুষ্ঠানিক ৪ খণ্ড বের হবে

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য অমৃত কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে অমৃত কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে অমৃত কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৩-০০	টাকা ৪০-০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১৬-৫০	টাকা ২০-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৮-২৫	টাকা ১০-০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন
কলিকাতা—৩

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস

হিসাব মেলাতে ৭-০০

সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গীকে কল্পলাখনির পটভূমিতে এ-রকম ধরনের উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে আর লেখা হয়নি। জীবনের সব হিসাবই কি মেলে, না মেলানো যায়! পড়তে শুরু করলে পাঠক আর ছাড়তে পারবেন না। রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাসের থেকে ঘটনার গতি, টান কোনো অংশে কম নয়। লেখকরা যে দ্বিতীয় ঈশ্বর তারও প্রমাণ দিয়েছেন লেখক এ বইয়ে। ঘটনা ঘটবার আগেই তার লেখনী সোচ্চার হয়েছে।

বুদ্ধদেব গুহর বিচিত্র স্বাদের গ্রন্থ

পহেলি পেয়ার ৮-০০

জঙ্গল মহল ৫-০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস

ভালো হতে চাই ৬-০০

শারিও পুজোর

গডফাদার ১ম খণ্ড ১৫-০০ ২য় খণ্ড ১৫-০০

'ফাদার' এবং 'গড' দুটো বিশেষণই যাঁর নামের আগে বসানো যায় এমন একজন দুর্ধর্ষ চরিত্রের মানুষ ডন কর্লিয়নি। হলিউডের নামী অভিনেতা দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ, অত্যাচারিতা কন্যার পিতা সবাই একসঙ্গে আসেন ধর্মপিতার কাছে ন্যায় বিচারের আশায়।

বিশ্ব-বিখ্যাত এই বিশাল উপন্যাসের চমৎকার অনুবাদ করেছেন লীলা মজুমদার। যাঁর শেষ পাতা পর্যন্ত না পড়লে আপনার দু-চোখে ঘুম নামবে না।

নাথ পাবলিশিং হাউস : ২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস : কলকাতা—২৯
পরিবেশক : নাথ ব্রাদার্স : ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলকাতা—১২

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ কর্তৃক গ্রন্থিত

শ্রীশ্রীআমিয়নিমাই চরিত LORDGOURANGA
(১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড)
প্রতি সেট—মূল্য ২৪-০০
(vol. 2)
Per Vol. Rs. 6.00

কালাচাঁদ গীতা
প্রতি কপি—মূল্য ১-৫০

LIFE OF SISIR KUMAR GHOSH
Per Copy Rs. 6.50

নরোত্তম চরিত
প্রতি কপি—২-০০

প্রাপ্তিস্থান :
পত্রিকা হাউস (হিসাব বিভাগ)
১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা ৩

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
২৯	মোহিনী আটম	(উপন্যাস)	শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি
৩৩	একালের চিত্রশিল্পী/ বিবাগী ভট্টাচার্য		শ্রীপ্রশান্ত দা
৩৬	একালের গান		শ্রীসন্ধ্যা সেন
৩৯	অদ্য শেষ রজনী	(উপন্যাস)	শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
৪২	বিজ্ঞানের কথা		শ্রীঅয়স্কান্ত
৪৫	একদিন হয়তো	(গল্প)	শ্রীবিনয় চট্টোপাধ্যায়
৪৯	চন্দনা চলে গেলে	(গল্প)	শ্রীপ্রভাস ভদ্র
৫২	মাঠ থেকে বলছি		শ্রীঅজয় বসু
৫৪	খেলাধুলা		দর্শক
৫৬	কয়েকজন		নিরীক্ষিৎ
৬১	নাটমঞ্চ		নাট্য সমালোচক
৬২	শতবর্ষের স্মরণীয়		শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ পরিচয় : ৩৭ পৃষ্ঠা দেখুন

রূপা'র বই

তারাপদ রাহা

কৃত

'আরব্য রজনী'র

প্রকাশক কর্তৃক

সদ্য প্রকাশিত হলো

মালশ্রীর

পঞ্চতন্ত্র

সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করেছেন

ঈশান স্কলার

গৌরী ধর্মপাল

[দাম : ১৫·০০]

রূপা

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০ ০১২

বিখ্যাত ডাটা গুঁড়ো মশলার প্রস্তুতকারক কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ এখন আপনাদের দিচ্ছেন একটি নতুন অতি সুদৃশ্য টিনের কৌটায় সবরকম গুঁড়ো মশলার অপূর্ব সংমিশ্রণ

এক কৌটা ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাক কিনলে আর কোনরকম মশলা এমন কি পেঁয়াজ, আদা, রসুন প্রভৃতি আলাদা করে কাবার দিতে হয় না. ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাকের মাছ, মাংস, ডিম ও সবরকম মুখরোচক তরিতরকারি অল্প সময়ে চটপট রান্না করা যায়। আপনার সবরকম রান্নায় আজই ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার (কিচেন কুইন প্যাক) ব্যবহার করুন।

ডাটা

রেডিমিক্সড কারি পাউডার

কিচেন কুইন প্যাক

প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ

২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭, পোস্ট বক্স নং ৬৭৭৪.

ফোন : ৩৩-১৩৩৭, ৩৪-১৭০৮

PAM—KCD-74

সম্পাদকীয়

খেলা আর খেলা নয়

মনট্রিল অলম্পিকে আমাদের দুঃখজনক ব্যর্থতার কথা নিয়ে অনেক হা-হুতাশ হয়ে গেছে। পারস্পরিক দোষারোপ ও অশ্রুপাতের পর এখন বোধহয় একটু ঠাণ্ডা মাথায় বসে কর্তব্য ঠিক করার সময় এসেছে।

ভারতের লোকসংখ্যা প্রায় ষাট কোটি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় এ দেশকে ঠিক আর অনুন্নত বলা যায় না। ইতিমধ্যে আমরা দেশের বাইরে আমাদের বিজ্ঞানী ও প্রয়োগবিদদের পাঠাতে পারছি অন্যান্য দেশকেও গড়ে তোলার কাজে সাহায্য করতে। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী এই তো সেদিনই আমাদের জানিয়েছেন—পারমাণবিক গবেষণার জন্যে যে সব যন্ত্রপাতি ও প্রয়োগবিদ্যা দরকার তার জন্য এখন আর আমরা অন্য দেশের মুখাপেক্ষী নই।

আমরা সঙ্গতভাবেই গৌরব বোধ করতে পারি এ সব জন্যে।

কিন্তু খেলাধুলার জগতে এলে একেবারে অন্য ছবি দেখতে পাই। অলিম্পিকে হকি খেলতে গিয়ে সোনা তো ভালো রুপো কিম্বা ব্রোঞ্জও জুটল না। মারদেকায় ফুটবল খেলতে গিয়ে এত গোল হজম যে প্রায় কোনো খেলোয়াড়কেই আর খালি হাতে ফিরতে হয় নি। ক্রিকেট কি হবে সেই এখন এক মস্ত বড় দুর্ভাবনা।

তাছাড়া অন্যান্য প্রতিযোগিতা ও দেহচর্চার অন্য সব বিভাগেই বা আশা করার মতো সাফল্য কোথায়?

এই যে এক সর্বব্যাপী ব্যর্থতা, নিশ্চয়ই এটা অকারণে ঘটে নি। ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশের পর এখন আমাদের নজর দিতে হবে সেই অনুসন্ধানের দিকেই।

গত সপ্তাহে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক উৎসবে রাজ্যপাল শ্রীডায়াস একটি মূল্যবান কথা বলেছেন। বর্তমান আলোচনায় সেটি খুবই প্রাসঙ্গিক। শ্রীডায়াস মনট্রিল অলিম্পিকে আমাদের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, এবার বিশেষ করে নজর দেওয়া দরকার—মফঃস্বল ও গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলার দিকে।

সত্যিই তাই। আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষই বাস করেন গ্রামে ও মফঃস্বলে। কিন্তু খেলাধুলার সব আয়োজনই জমা হয়েছে বড় বড় কয়েকটি মহানগরীতে। এর ফলে আমাদের বেশির ভাগ তরুণ-তরুণীই খেলার ব্যাপারে সত্যিকারের উৎসাহ বা প্রশিক্ষণ পান না। কে বলবে কত প্রতিভা এই কারণে না ফুটতেই অকালে ঝরে পড়ে। এবং গোটা দেশও বঞ্চিত হয় তার প্রাপ্য গৌরব থেকে।

জাতীয় প্রতিভার এই অসম্পূর্ণ বিকাশ বলতে গেলে প্রায় জাতীয় সম্পদের অপচয়ের চাইতেও বড় রকমের ক্ষতি। কারণ এ ক্ষতি ঘটে মানুষকে নিয়ে—যা দেশের মহত্তম সম্পদ।

আরো একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার এ প্রসঙ্গে।

অনেকেই জানেন, খেলাধুলা, শরীরচর্চা, কিম্বা খেলার জগতে অন্য যে কোনো প্রতিযোগিতায় জেতা এখন আর নিছক দলগত বা ব্যক্তিগত প্রয়াসের ব্যাপার নয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণারও বিষয়। ক্রীড়া-বিজ্ঞান আজ এত উন্নত মানে পৌঁছেছে যে, অনুশীলনের বিভিন্ন পর্বে তার সাহায্য নিয়ে খেলোয়াড়দের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করালে, ফল পাওয়া যায় হাতে হাতেই।

মনে হয় এ জন্যে প্রত্যেকটি স্কুল ও কলেজে যাতে একজন ক্রীড়া-বৈজ্ঞানিকের পরামর্শ পাওয়া সম্ভব তার ব্যবস্থা আমাদের করা দরকার। যদি দেশে সে ধরনের প্রশিক্ষক বেশি না থাকেন তবে মাঝে মাঝে প্রতি জেলায় ছুটির সময়ে ক্যাম্প করেও অনুশীলনের পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে।

মোট কথা, খেলাকে আর খেলার বিষয় না করে জাতীয় গুরুত্ব দেওয়া অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

ডেম সিবিল থর্নডাইক

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রায় পঁচাত্তর বছর বৃটেনের নাট্য-জগতে মহিমান্বিত আধিপত্যের পর ডেম সিবিল থর্ণ ডাইক গত জুন মাসে ('৭৬) ৯৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। যে অবিস্মরণীয়া অভিনেত্রী বৃটেনের নাট্য ইতিহাসে সারা সিডন্স ও এলেন টবীর মত অমর হয়ে থাকবেন তাঁকে নিয়ে যে ইতি-মধ্যেই বহু কাহিনী ও জীবনী রচিত হয়েছে তা স্বাভাবিক। তাঁর মৃত্যুর পর দেশ বিদেশের পত্র-পত্রিকায় রেডিও ও টেলিভিশনে যে ব্যাপকভাবে আলোচনা, উপলব্ধির প্রয়াস ও শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন হবে তাও প্রত্যাশিত। কিন্তু যে বিষয়টি এ পর্যন্ত প্রায় অনালোচিত থাকলো তা হচ্ছে তাঁর প্রগাঢ় ভারত প্রীতি। সে প্রীতি তাঁর আকৈশোর। তবু সর্বজনে তা প্রথম প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে ১৯১৯ সালে।

ঐ বছর নভেম্বর মাসে লন্ডনের উইন-টার গার্ডেন নাট্যশালায় কবি রবেনস বিনিয়নের অনূদিত শকুন্তলা নাটকের অভিনয় ব্যবস্থা হয়। নাটকটির অন্যতম প্রযোজক ছিলেন কেদারনাথ দাশগুপ্ত। মঞ্চাধ্যক্ষ ছিলেন সিভিলের স্বামী লুই-কাসন। ইনিই পরবর্তীকালের প্রখ্যাত নট স্যর লুই কাসন।

এর পরের বছর সিবিলের জীবনে অন্যতম অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটে রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে সাক্ষাতকার। জন কাসন তাঁর 'লুইড ও সিবিল বইটিতে বলেছেন ১৯২০ সালে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরি-চয়ের পর থেকে তাঁরা দুজনেই ভারতবর্ষের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত হয়ে পড়েন।'

সে বছর জুন মাসে কবি আমেরিকার পথে লন্ডনে আসেন। তাঁকে সম্বর্ধনা জানান হয় ক্যাক্সটন হলে। সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন সহকারী ভারত সচিব চার্লস রবার্ট। অন্যান্য বশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ও ঝালোয়ারের নৃপতিদ্বয়। সভায় সিভিল রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে লরেন্স বিনিয়নের লেখা একটি কবিতা আবৃত্তি করেন।

সভার শেষে স্বয়ং কবি এসে সিবিলকে বললেন 'এসো একদিন আমার ওখানে।' সিবিল পরের দিনই সকাল আটটায় কবির হোটেলে দেখা করতে গেলেন। সেখানে আরো অনেক লোক ছিলেন। কবি তাঁদের সবাইকে বিদায় দিয়ে সিবিলের সঙ্গে বহু বিষয় আলোচনা করলেন। সিবিলের জীবনে সেই সাক্ষাৎ কার যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করে তা তিনি নিজেই লিখে গেছেন,

একবার ভারতীয় ছাত্রদের একটি সভায় অধ্যাপক গিলবার্ট মারী বলেন যে আপ্ত বাক্য মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে আর ধর্মীয় উপলব্ধি আনে ঐক্য।'—আমার মনে হয় কয়েক বছর আগে লন্ডনে যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হোটেলে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি,—তখন থেকে অধ্যাপক গিলবার্টের কথা যেভাবে উপলব্ধি করেছি তার আগে কখনো তা করিনি। তিনি আমাকে নাটকের রীতিনীতি লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং সেই সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে নানা কথা বলেন। আমি যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন সেই একটি ঘন্টাব্যাপী আলোচনা আমার হৃদয়ে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। কারণ একজন খৃষ্টান হিসেবে আমি যে সত্যের সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে ফিরছিলাম, আরেকটি জাতির এক মহাপ্রাণ ব্যক্তির দৃষ্টিতে তারই সন্ধান পেলাম।

মনে পড়ে এক আশ্চর্য, অননুভূতপূর্ব-আত্মোপলব্ধি নিয়ে আমি ফিরে এলাম। এ হচ্ছে বিচিত্র মানবগোষ্ঠি ও জগতের মহান ধর্ম বিশ্বাসগুলির অন্তরে ও গভীরে গহন এক্যবোধ ও ঐক্য। যেখানে জাতি ও বিশ্বাস নির্বিচারে সবাই সবাইকার

কাব্য ও রচনাবলীর মধ্যে ঐ মহৎ বাণীর অনুরণন আমার হৃদয়ে ধ্বনিত হয়েছিল। তবু সে দিন সকালে একজন শ্রদ্ধাময়ী শিষ্যার মত তাঁর মহৎ বাণী শোনবার পর ঐ সত্য আমার চোখে যেভাবে সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তেমন আর কখনো হয়নি। কবির নাটক ও কাব্যের মধ্যে আমি যা পেয়েছি তার জন্যে তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা অসীম। তবু তার চেয়েও বড় হচ্ছে তাঁর দীক্ষায় প্রাপ্ত এই সৃষ্টির বৈচিত্রের মধ্যে একাত্মবোধের চেতনা।'

শুধু রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও আধ্যাত্মি-কতাই নয় তাঁর মহান ব্যক্তিত্ব তাঁর সৌম্য-মূর্তি, বাচনভঙ্গী, কীর্তির বিপুল কিরণে ভুবন আলো করেও শিশির কণাকে ধরা দেবার ও ভালোবাসার ঔদার্য-সিবিলের হৃদয়ে চির উজ্জ্বল হয়ে থাকে। তাই দেখেছি, ছোট বড় খ্যাত অখ্যাত যে কোন প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্র স্মরণ কিম্বা আলোচনা সভায় তাঁকে আহ্বান করলেই জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত উপস্থিত থাকতেন। রবীন্দ্র-নাথের যে ব্যক্তিত্বের সন্ধান তিনি পেয়ে-ছিলেন তার মুগ্ধ পরিচয় দিতেন। আর করতেন কবির কোন কবিতার ইংরাজি তর্জমার আবৃত্তি। যার মধ্যে সবচেয়ে তার প্রিয় ছিল 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য' অনু-বাদটি। তাঁর বিশ্ববিমোহনী কণ্ঠে সেই আবৃত্তিগুলি যাঁরা শুনেছেন তাঁদের কাছে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১৯৬১ সালে যখন তিনি বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী [illegible]

স্থাপনের জন্যে একটি জাতীয় কমিটি গঠিত হয় তখন স্যর লুই কাসন ও ডেমসিবিল থর্নডাইক ছিলেন মহাসম্মানিত সদস্য। তাঁদেরই যুগ্ম উদ্যোগে বটেনের জাতীয় নাট্যশালা ওল্ডভিকে রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকটি (ইংরাজি অনুবাদ) মঞ্চস্থ হয়। তদানন্তীন বটেনের শ্রেষ্ঠতম নট ও নটিরা বিনা পারিশ্রমিকে অংশ গ্রহণ করেন। রঘুপতির ভূমিকায় ছিলেন স্বয়ং স্যার লুই কাসন, জয়সিংহের ভূমিকায় জন নেভিল, রাণীর ভূমিকায় বাবরাবা জেফর্ড এবং অপর্ণার ভূমিকায় সিবিলের লাবণ্যময়ী তরুণী নাতনী। প্রারম্ভে সিবিল তাঁর আশ্চর্য কণ্ঠে দর্শকদের কাছে নাটকটির পরিচয় করিয়ে দেন।

ঐ উপলক্ষে স্যর লুই সিবিলের জন্যে একটি নীল সাড়ী কিনে আনেন। সিবিল চিরদিন পোষাক হিসেবে সাড়ীর প্রশংসায় উচ্ছ্বসিতা ছিলেন। পূর্বোক্ত সাড়ী উপহারটি সম্পর্কে পরে তিনি একটি সাক্ষাৎকারে বলেন যে তেমন নীল আমি আর কোথাও দেখিনি। ভূমধ্য সাগরের নীলিমাকে আরো অতল, আরো গভীর করলে তবে সে নীলিমা তুলনা হয়।

ওল্ডভিকের অভিনয় শেষে সিবিল আমাকে প্রসঙ্গত, কিন্তু দৃঢ়তাপ্যমান উচ্ছ্বাসের সঙ্গে, বলেছিলেন যে একবার রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিনয় দেখতে যান। অভিনয় শেষে কর্তৃপক্ষ কবিকে নট-নটীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে মঞ্চের ওপর নিয়ে আসেন। কবি সস্নেহে কৌতুকে সবার সঙ্গে আলাপ করেন। সিবিল বলেন তিনি চলে যাবার পরেও বেশ কিছুক্ষণ আমি যেন অভিভূত হয়ে ছিলাম।'

নেহেরু ও ডেম সিবিল

পন্ডিত নেহেরুর সঙ্গে স্যার কাসন ও ডেম সিবিলের বন্ধুত্ব ছিল দীর্ঘ দিনের এবং অকৃত্রিম। নেহেরুর আমন্ত্রণেই তাঁরা ভারত পরিদর্শনে যান। সেখানে গিয়ে তাঁরা যে আতিথেয়তা ও অভিনন্দন লাভ করেন তাতে তাঁরা প্রায় বিহ্বল হয়ে পড়েন। একটি চিঠিতে তিনি বলেন, 'ভয়ানক ব্যস্ত। চিঠি লেখার পর্যন্ত সময় পাই না। একটু পরেই একটা বিরাট জলসায় যেতে হবে, তার জন্যে সাজগোজ করছি। গতকাল তাজমহল দেখে এসেছি। সে দেখার অভিজ্ঞতা বর্ণনার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আমরা গিয়েছিলাম আমাদের পুরোনো বন্ধু রাজকুমারী অমৃত কাউরের সঙ্গে—তিনি ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রী। যাবার জন্যে নেহেরু তাঁর নিজস্ব বিমানটি আমাদের দেন। আমাদের জীবনে সে একটা দিন। লুই এদেশ সম্পর্কে আবেগে উচ্ছ্বসিত।

আবৃত্তি অনুষ্ঠানগুলি বিপুলভাবে সফল ও সার্থক হয়েছে। আমাদের বলা হয়েছিল যে ভারতীয় শ্রোতারা অস্থির—কথা বলা ও চাঞ্চল্য প্রকাশই হচ্ছে তাদের রীতি। কিন্তু তা সত্যি নয়। তারা চমৎকার স্তব্ধতার সঙ্গে শোনে এবং প্রতিটি আবৃত্তি শেষে প্রশংসাব দারুণ উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে! এমন গুণগ্রাহী ও প্রত্যুৎপন্ন দর্শকমন্ডলী এবং সর্বস্তরেব ভারতীয়দেব এমন কৃতজ্ঞতা-বোধের তুলনা এ জগতে দুর্লভ।

নেহেরু আমাদের জন্যে এভারেস্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখানোর ব্যবস্থা করেছেন। আমরা যেন স্বপ্নের মধ্যে বাস করছি। আমবা দুজনেই সম্পূর্ণ সুস্থ ও খুশি।"

সিবিল যখন মাবা যান তখন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সোভিয়েৎ ইউনিযন সফরে ছিলেন। সিবিলের মৃত্যু সংবাদ শোনা মাত্র তিনি মস্কোর ভারতীয় দূতাবাস মারফৎ লন্ডনে একটি শোক বার্তা পাঠিয়ে দেন। তাতে তিনি বলেন ডেম সিবিল থর্নডাইকের মৃত্যুতে আমি গভীর শোক অনুভব করেছি। নাট্য জগতে তিনি ছিলেন বিপুল প্রভাবশালিনী এবং প্রকৃত অর্থে একজন মহান অভিনেত্রী। তাঁব অভিনয় দর্শন ছিল মহা ঐশ্বর্যশালী অভিজ্ঞতা সঞ্চয়েব মত। শৈশবে তাঁকে জোয়ান অফ আর্কের ভূমিকায় দেখার সৌভাগ্য আমাব হয়। পববর্তী কালেও তাঁব বহু অভিনয় আমি দেখেছি।"

শেকসপীয়ারের নাটকগুলির বড় ছোট সব ভূমিকা থেকে আরম্ভ করে অ্যালিস ইন ওয়ান্ডাব ল্যান্ড প্রভৃতি বহু নাটকে সব লবেনস অলিভিয়ে, পল রবসন, স্যার লুইকবন প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত অভিনেতাদের সঙ্গে অভিনয় করলেও সিভিল মনে করতেন জোয়ান অব আর্কের ভূমিকাতেই তাঁব অভিনয় শ্রেষ্ঠতম। বোধহয় হাজার বার ঐ ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হন। কেন জোয়ানের ভূমিকাই শ্রেষ্ঠতম তার ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, "ঐ অভিনয়কালে আমি আর আমিতে থাকি না। অভিনীত চরিত্রের বিরাটত্ব আমাকেও বিরাট করে তোলে।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেব ও পরেব দুটি দশকে বৃটেনে বসবাসকারী ভারতীয়দেব মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান ছিলেন ভি কে কৃষ্ণমেনন। ভারতের স্বাধীনতার জন্যে বটেনের জনমত গঠনে তিনি যেসব বিশিষ্ট বৃটিশের সমর্থন লাভ করেছিলেন তাঁদেব মধ্যে লুই ও সিবিলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। রাজনৈতিক আদর্শবাদের কথা ছেড়ে দিলেও তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে মেননকে গভীরভাবে স্নেহ করতেন। অপরপক্ষে তাঁদের প্রতিও মেননের ছিল গভীব প্রীতি। তাঁর জীবনেব শেষপর্যন্ত সে প্রীতি অক্ষয় ছিল।

জন কাসন লিখেছেন, গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় লুইকে ডকটব অব লিটারেচর উপাধি দেয়। তদুপলক্ষে আমি লুই ও সিবিল বিমানে করে গ্লাসগোয় যাই। উচ্ছ্বসিত পুলকের সঙ্গে লুই হঠাৎ আবিষ্কার করেন সহযাত্রীদের মধ্যে রয়েছেন তাঁদের পুরোনো বন্ধু কৃষ্ণ মেনন। তাঁরা আমাকে মেননেব সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। আমাব তখন মনে হয়েছিলো যে ঐ তিনজনেব মধ্যে বন্ধুত্বের চেয়ে আত্মীয়তার সম্পর্কই যেন বেশি।

বঙ্গ সংস্কৃতি ও সিবিল

লুই ও সিবিলের অনুরাগ ছিল সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতিব প্রতি। তবু রবীন্দ্রপ্রভাব এবং শান্তিনিকেতন পরিদর্শন প্রভৃতিব জন্য তিনি সেই সংস্কৃতির সান্নিধ্যে প্রধানত আসেন তাব পূর্বাঞ্চলিক বা বিশেষভাবে বঙ্গীয় বৈশিষ্ট্য মাধ্যমে। যদিও দিল্লীতে অবস্থানকালে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলেব পাহাড়ী মেয়েদেব বেশভূষা ও নৃত্যগীতেব সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে তবু কলকাতাতেই তিনি সমকালীন নাটক, সঙ্গীত ও বিবিধ এবং প্রাণবন্ত শিল্প চর্চা সমীক্ষার সুযোগ পান।

১৯৬২ সালে শ্রীযুক্তা শ্রীমতী ঠাকুর লন্ডন ভ্রমণকালে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শান্তিনিকেতনে তাঁদেব পরিচয় ঘটে। দীর্ঘকাল পরে লন্ডনে ফের দেখা হতে সিবিল তাঁর কলকাতা অভিজ্ঞতা নিয়ে বহু কথা বলেন। তাঁদের সেই কথোপকথনের একটি বিবরণী অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিতও (২য় বর্ষ, ২৯শ সংখ্যা) হয়।

তখন যদিও বাংলাদেশে নবনাট্য আন্দোলন আরম্ভ হয়নি এবং সাবেকী নাট্যধারা স্তিমিত হয়ে পড়ছে তবু লুই ও সিবিলেব [illegible] চিত্র সেই অবস্থাব মধ্যে যা কিছু

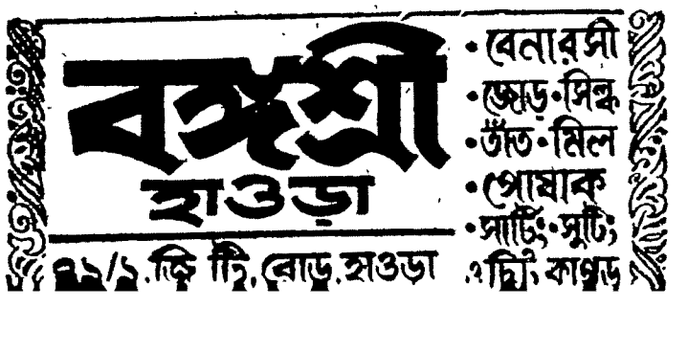

উৎকৃষ্ট যা কিছু সুন্দর ও সাধনার তা সবই মনের মণিকোঠায় সযত্নে সংগ্রহ করে রাখেন। শিশির ভাদুড়ীর অভিনয় সম্বন্ধে সিবিল বলেন যে ওঁর সঙ্গে ফরাসী অভিনেতাদের তুলনা করা চলে। নাটকীয় অথচ স্বাভাবিক। যদিও তাঁরা ভাষা বুঝতে পারেননি তবু শিশিরকুমারের আশ্চর্য কণ্ঠ তাদের বিস্মিত করে। তিন অক্টেভেই তাঁর গলা চলতো।

ঐ আলোচনাতেই তিনি বলেন, কলকাতার ছেলেমেয়েদের অভিনয় প্রতিভা আছে। আমি ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েদের করা বাংলায় ম্যাকবেথ দেখেছিলাম। খুব ভালো লেগেছিল। তোমাদের মধ্যে বহু অপেশাদার দল আছে। প্রচুর নাট্যরসিক লোক আছেন যাঁরা সারাটা জীবন নাট্যরসীর মূলে উৎসর্গ করেছেন। তোমাদের তো প্রচুর সম্ভাবনা। কিন্তু দয়া করে তরুণ নট-নটীদের বলো তারা যেন মাইক ব্যবহার না করে। দেখ না এদেশে আজকাল কণ্ঠস্বরের চর্চা কমে গেছে। কিন্তু গলার স্বরের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুরণন, বিভিন্ন ভাবের প্রকাশে তার সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি তা কি কখনো মাইকে প্রস্ফুটিত হয়। আমার স্বামীর গলাই ধর না কেন। অপূর্ব সে কণ্ঠস্বর। কিন্তু যখন সে গলাই মাইকে শুনি তখন মনে হয় এ যেন আর কারুর গলা শুনছি।

শুধু গলার অভিনয় করা কিছু কঠিন নয়। চর্চা করলেই সেরকম কণ্ঠস্বরের অধিকারী হওয়া যায়। খুব বড় জায়গায় যদি শুনতে অসুবিধা হয় তাহলে সেরকম জায়গায় থিয়েটার করাই উচিত নয়। দর্শকের সংখ্যা ১১০০র বেশি না হওয়া বাঞ্ছনীয়। ১১০০ দর্শকের কানে অভিনেতা বা অভিনেত্রীর কণ্ঠস্বর পৌঁছে দেওয়া এমন কিছু কঠিন নয়।

তিনি বলেন যে তিনি ওপন এয়ার ষ্টেজকেই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রায় নাটকই ওপেন এয়ার ষ্টেজের উপযোগী বলে তিনি মনে করেন। তবে ওপন এয়ারে সংলাপ বলা অপেক্ষাকৃত কঠিন।

সিবিল ভারতীয় নৃত্যের প্রশংসাতেও উচ্ছল হয়ে উঠতেন। মাদ্রাজে থাকার সময় তিনি কয়েকটি গ্রামে গিয়ে অকৃত্রিম দাক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যকে তার স্বাভাবিক পরিবেশে দেখে আসেন। তিনি সেই নাচে বৌদ্ধ প্রভাব লক্ষ্য করেন। মণিপুরী নাচও তাঁর মনকে মাতিয়ে দেয়। কি সুন্দর তোমাদের কমনীয়তা। আমাদের যা সাধনা দিয়ে অর্জন করতে হয় তোমাদের তা জন্মলব্ধ।

লুই কয়েক বছর আগেই মারা যান। সিবিলও চলে গেলেন।

শারদীয় অমৃত ১৩৮৩

সম্পাদক : শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

অমৃতের শারদীয় সংখ্যা বেরোবে এবার মহালয়ার অনেক আগে। সংখ্যাটি এমনভাবে তৈরি করা হচ্ছে যাতে সহজেই পাঠকদের খুশি করতে পারে।

উপন্যাস থাকছে পাঁচখানি এবং লেখকরা বেশির ভাগই 'বেস্ট সেলার'। প্রতিভাবান নতুন লেখকদেরও অবশ্য স্থান দেওয়া হয়েছে সেই সঙ্গে।
গল্পের বেলাতেও ঠিক এইরকমই। প্রবীণ লেখকদের সঙ্গে এবার গল্প লিখছেন এমন কজন লেখক, যাঁরা এর মধ্যেই রীতিমত নাম করেছেন—অথচ অমৃতের শারদীয় সংখ্যায় তাঁদের গল্প বেরোচ্ছে এইবারই প্রথম

৫টি উপন্যাস

এবারে লিখছেন
প্রেমেন্দ্র মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়,
নিমাই ভট্টাচার্য, চাণক্য সেন, আনন্দ বাগচী।

২০টি ছোট গল্প

লিখছেন
অন্নদাশঙ্কর রায়, বনফুল, মনোজ বসু,
প্রমথনাথ বিশী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, শওকত ওসমান
সুমথনাথ ঘোষ, প্রফুল্ল রায়, বুদ্ধদেব গুহ,
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়,
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, অদ্রীশ বর্ধন, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়,
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন রায়, তারাপদ রায়,
দেবল দেববর্মা, সুধাংশু ঘোষ এবং
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক রচনা

অমিতাভ চৌধুরী

নির্বাচিত কবিতা ॥ প্রবন্ধ ॥
সুঅলংকৃত ॥ দাম আট টাকা ॥ অতিরিক্ত
ডাক মাশুল ১·৫০

আপনার কপির জন্য এজেন্টকে বলে রাখুন অথবা যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-তিন

কথায় কথায়

তস্করের প্রতিবেদন

সব জিনসেরই দুটো দিক আছে। একটা সামনের দিক আরেকটা পিছনের দিক। একটা উপরের দিক, একটা নিচের দিক। ভালো-মন্দ, সুবিধা-অসুবিধা সবকিছুর সঙ্গেই রয়েছে।

এই কথাটা সবাই যেমন জানে, আমিও চিরকাল জানতাম। কিন্তু আজ সকালের ডাকে একটা চিঠি পেয়ে আমার দিব্যচক্ষু খুলে গেলো। তস্কর সমিতির অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক এই চিঠিটি আমাকে প্রেরণ করেছেন, তাঁর উদ্দেশ্য হলো আমি যেন চোরদের নিয়ে আর হাসি-ঠাট্টা না করি, চৌর্যবৃত্তির আরো দশটি বৃত্তির সঙ্গে কোনো তুলনা করা উচিত নয়, কারণ প্রকৃত চোর ছাড়া কেউই সম্যক জানে না ভালো চোরের আসল অসুবিধাগুলো কি রকম?

প্রথমত ধরা যাক চোরের সাজপোষাক। অবৈতনিক তস্কর সম্পাদক জানিয়েছেন যে, একজন চোরের আর কিছু না হোক নিদেনপক্ষে একটা কালো হাফপ্যান্ট চাই। দশ-বারো বছর আগেও একটা সাধারণ কালো হাফপ্যান্ট দাম পড়তো সাড়ে তিন টাকা, বড়জোর চার টাকা। কিন্তু এখন কিছুতেই বারো চৌদ্দ টাকার কমে একটা প্রমাণ সাইজের কালো হাফপ্যান্ট পাওয়া অসম্ভব। অনেক সময় হকার্স কর্নারে, বা ফুটপাথের সস্তার দোকানে আট-নয় টাকার কালো হাফ-প্যান্ট সেন্টা করলে হয়তো সংগ্রহ করা যায়। তবে তাতে বিশেষ কোনো লাভ নেই। একবার-দুবার কাচাকাচি করলে তার বং উঠে জ্বালজ্যালে হয়ে যায়, সেটা পরিধান করলে আর চোর-চোর দেখায় না। তা-ছাড়া প্যান্ট বা গায়ের গেঞ্জিটার বং কুচ-কুচে কালো না হলে চুরি করে পালিয়ে যাওয়ার সময় ধরা পড়ার যথেষ্টই সম্ভাবনা।

প্যান্টের চেয়েও বেশি অসুবিধে গেঞ্জি নিয়ে। ভালোমতন চুরি-চামারি একটা করে ফেলতে পারলে দু-চার বছরের জন্য হাফ-ডজন প্যান্ট হয়তো ভালো দেখে কিনে নেওয়া যায় কিংবা কিছু বেশি খরচা করে বানিয়ে নেওয়াও চলে, কিন্তু ইচ্ছে করলেই কালো গেঞ্জি পাওয়া যায় না, গেঞ্জি বানানো তো সম্ভবই নয়। আগে রাস্তায় রাস্তায়, দোকানে-দোকানে কালো গেঞ্জির ছড়াছড়ি ছিলো। এখন হাজারটা দোকানে ঘুরলেও একটা কালো গেঞ্জি মেলে না, মিললেও সাইজ মেলে না। সব বিশাল বিশাল গেঞ্জি, আটত্রিশ, চল্লিশ, বেয়াল্লিশ এমন কি চুয়াল্লিশ সাইজের। যারা গেঞ্জির প্রস্তুতকারক তারা বোধহয় ভাবে এই সব কালো গেঞ্জি ভীমাকৃতি গুন্ডা ও মফঃস্বলের ডাকাতরাই শুধু ব্যবহার করবে, এবং তারা সবাই একেকটা হাতি। কিন্তু আসল ঘটনা অন্য-রকম, এ সব গেঞ্জির সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন চোরদের আর তারা প্রায় সকলেই বেঁটে, ক্ষীণকায়, ছিঁচকে চেহারার। চোরের জীবিকা এ-রকম যে চোরের পক্ষে মোটা-সোটা হলেই সর্বনাশ। এই একটি বিষয়ে খেলোয়াড় ও চিত্রতারকাদের সঙ্গে তাদের জীবিকার প্রচন্ড মিল, মোটা হয়ে গেলেই মারা পড়া, আর জানলার ভিতর দিয়ে গলিয়ে চলে যাওয়া চলবে না, এক লাফে এ ছাদের কার্নিশ থেকে ও ছাদের চিলে-কোঠায় পৌঁছানোর আগে মাধ্যাকর্ষণের বিপুল টানে ধরাতলে চিৎপটাং হয়ে পড়ে, হয় প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে, না হয় গ্রেপ্তার হতে হবে।

সাজ-পোষাকের বিষয়ে আরো অনেক কথা আছে তস্কর সম্পাদকের প্রতিবেদনে। যেমন অনেক চোর চোখের উপর কালো সিল্কের রুমাল বাঁধতে ভালোবাসে। যদিও জিনিষটা যে খুব দরকার তা নয়—কিন্তু এতে একটা আভিজাত্যের ভাব এনে আসে। লোকে যদি জুন মাসের কলকাতায় গরমে বিনা কারণে টাই পরে অফিস যায় তাহলে কোনো কোনো বিলাসী চোর রেশমি রুমাল চোখে বাঁধলে কার কি ক্ষতি? কি চমৎকার রোমান্টিক দেখাবে তাকে যখন সে জ্যোৎস্না রাতে চোখে সিল্কের রুমাল বেঁধে কালো প্যান্ট কালো গেঞ্জি পরে সড়াৎ করে ছাদের ড্রেন-পাইপ বেয়ে নেমে আসবে। কিন্তু এই সামান্য বিলাসিতাটুকুও চোরদের পক্ষে করা কত কঠিন। এক মিটার কালো সিল্কের কাপড় অন্ততঃ পঞ্চাশ টাকা দাম আজকের বাজারে। তাছাড়া এই সব কাপড় বাড়ি নিয়ে গেলে বৌয়েরা তাদের নিজেদের জামা বানিয়ে ফেলে, স্বামী বেচারীর নৈশ অভিযান ব্যবহারের জন্য ছয় ইঞ্চি কাপড়ও রক্ষা পায় না।

সাজ-পোষাকের পরেই প্রসাধনের কথা তুলেছেন তস্কর মহোদয়। নট-নটির যেমন প্রসাধন প্রয়োজন তেমনিই চোরেদের প্রসাধন চাই। প্রসাধন আর কিছুই নয় একটু ভালো গ্রীজ বা ভেজলিন। কিন্তু ভেজলিনের যা দাম—এক রাতে সারা গায়ে জেলিন মেখে বেরোতে গেলে একজন প্রান্তবয়স্ক চোরের প্রায় চার কৌটো ভেজলিন মানে বারো টাকা খরচা। অবশ্য গ্রীজ যদি ভালো হয় তবে তাতেও চলে যায়, কিন্তু ভালো গ্রীজ পাওয়া আজকাল অসম্ভব। কোথায় গেলো সেই সব সাদা ধবধবে মাখনের মত নরম, পিছল বিলিতি গ্রীজ। এখন বাজারে যে সব গ্রীজ বেরোয়, অনেক চোরের শরীরে এই খারাপ গ্রীজ মেখে ঘা পর্যন্ত হয়ে যায়। কিন্তু উপায় কি? গ্রীজ গায়ে না মেখে চুরি করতে বেরোনো প্রায় আত্মহত্যার সামিল, হঠাৎ কেউ জাপটে ধরলে আর পিছলে বেরিয়ে যাওয়ার উপায় থাকে না। অগত্যা ঐ খারাপ, কুৎসিৎ তৈলাক্ত পদার্থটি সারা গায়ে মেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাসাবাড়ির দরজার পিছনে কিংবা ছাদের জলের ট্যাঙ্কের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে হয় যতক্ষণ না গৃহস্থ ঘুমোয়, কিন্তু গৃহস্থ কি সহজে ঘুমোয়? বাড়িতে নবদম্পতি, বৃদ্ধ বা শিশু থাকলে যাকে বলে সর্বনাশ। আর এই সর্বনাশ কাঁধে নিয়ে কুটকুটে গ্রীজ গায়ে মেখে, মশার কামড় খেয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিঃশব্দে আত্মগোপন, হায় সে কি কষ্ট। কে বুঝবে চোরেদের কষ্ট?

তারাপদ রায়

প্রথম প্রবাস

উপন্যাস

বুদ্ধদেব গুহ

লেখকের নিবেদন ঃ

লেখাতে অনেকদিন যতি পড়ে গেল। কিছুটা নিজের দোষে কিছুটা নিজের আয়ত্তাধীন নয় এমন কারণে।

তাই যা বলব বলে প্রথম প্রবাসের দিনগুলোর কথা লেখা শুরু করেছিলাম সে সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলে নিই। পুনরুক্তির মত শোনাবে হয়ত। এ লেখা যাঁরা বারংবার বিলেত গিয়ে সাহেব অথবা বিলেত-না-গিয়েই সাহেব তাঁদের জন্যে একেবারেই নয়। লক্ষ লক্ষ পাঠক-পাঠিকা যাঁরা কখনও বিদেশে যাননি এবং যাঁদের যাওয়ার সম্ভাবনাও নেই সুদূর ভবিষ্যতে তাঁরা যদি বিদেশ যাওয়ার আনন্দ এ লেখা পড়ে একটুও পান তবেই আমার এই চেষ্টা সার্থক। তাঁদের জ্ঞাতার্থেই এমন অনেক খুঁটি-নাটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারের কথা লিখেছি আগে এবং ভবিষ্যতে লিখব—যাতে তাঁরা আমার অভিজ্ঞতার শরিক হন। সেই সব বর্ণনা যাঁরা বিদেশ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল তাঁদের কাছে এক-ঘেয়ে অথবা সাধারণ বলে মনে হতে পারে—কিন্তু আবারও সবিনয়ে বলেছি এ লেখা তাঁরা যেন দয়া করে না পড়েন।

কেন্দ্রয়ারীর মাসে প্রথম প্রবাসের শেষ কিস্তিতে স্টসবার্গ হয়ে রাতের মুনিক DENZLINGZEN এ এসে থেমেছিলাম। ওয়াল্ট হুইটম্যানের "The leaves of grass" বই থেকে কিছু উদ্ধৃত ছিল।

●

ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠেই প্রাতরাশ সেরে নিয়ে যখন বাসে উঠলাম তখন আকাশে মেঘের ঘনঘটা। দেখতে দেখতে আমরা জার্মানীর বিখ্যাত Balack forest এলাকায় চলে এলাম। এই জঙ্গল নিয়ে শুধু এদেরই কেন পুরো ইয়োরোপের খুব গর্ব। হায়! ওরা আমাদের দেশের জঙ্গল দেখেনি! দেখেনি ডুয়ার্সের জঙ্গল দেখেনি উড়িষ্যার মহানদীর অরণ্যাহিকার জঙ্গল—ওরা কি বুঝবে জঙ্গল কাকে বলে? সেটা কোনো কথা নয় আসলে সেটা জানতে ভালো লাগে যে ওরা জঙ্গল খুব ভালবাসে। বাহ্যিক সভ্যতার শেষ ধাপে এসে মঞ্জুলপ্রাণ মাটি আঁকড়াআঁকড়ি করতে করতেই নিজের পর দিন ওদের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হচ্ছে যে প্রকৃতিই শেষ অবলম্বন। যতই সে উন্নত সভ্য শিক্ষিত বোধ করুক না কেন তাকে শেষে প্রকৃতির কাছে ভালো লাগার জন্যে ভালোবাসার জন্যে ফিরে আসতেই হবে।

ব্ল্যাক ফরেস্ট ফার এর জঙ্গল। গাছ-গুলোর গায়ে শ্যাওলা জমে আছে। কিছু কিছু অর্কিড—ঘন সবুজ বং বলে গাছ-গুলোকে কালো মনে হয়—তাই এই নাম। ব্ল্যাক ফরেস্টের মাঝামাঝি এসে বৃষ্টি নামল। ওদের দেশের বৃষ্টির সঙ্গে আমাদের বর্ষার কোনো তুলনা চলে না। বৃষ্টিও যেন বড়বেশী নিয়মানুবর্তী—আমাদের বর্ষার মেজাজ ওদের দেশের বর্ষার নেই। রবীন্দ্রনাথ ওদেশে জন্মালে আমরা এত বিভিন্ন গান পেতাম না বর্ষার আমাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের এত রাগ-রাগিণী বর্ষাবরণের আনন্দে অধীর হয়ে জন্মাতো না।

জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে ছবির মত সব গ্রাম।

এই ছবি-ছবি ব্যাপারটাও আমার মোটে পছন্দ নয়। যারা সবকিছুই ফোরেন ভাল-বাসেন আমি তাদের দলে নই। আমার গরীব দেশের গ্রাম অগোছালো এলোমেলো অনেক কষ্ট সেখানে, কিন্তু গবুর গায়ের গন্ধ জাবনার গন্ধ ব্যাঙের ডাক বাঁশবনে জোনাকি জ্বলা, মেঠো পথ হলুদ বসন্ত পাখির উড়ে যাওয়া ওদের নেই। ওরা সুখ খুঁজতে গিয়ে সুখকে একেবারে মাটি করে বসে আছে। সুখ কাকে বলে ভুলে গেছে ওরা আরামের বিনিময়ে।

এ্যাসকটার একটা গ্রাম দেখিয়ে বলল—দেখুন এই গ্রাম থেকে ড্যানিউব নদী বেরিয়েছে।

দিমার মত ড্যানিউব দেখলাম। বহু-ড্যানিউব বলে এক বিখ্যাত রেকর্ড শুনেছি। বহুবার সেই রেকর্ড শুনতে শুনতে চোখের সামনে যে নদীর ছবি ফুটে উঠেছে বার বার কল্পনায়, তার সঙ্গে এ নদীর চেহারা একে-বারেই মেলে না। আমাদের দেশের হোগলা-বাদার পাশে পাশে এমন নদীমা আকছার দেখতে পাওয়া যায়। নদীমাকে যেমন লোককে ইয়োরোপের নদীগুলো বড় হতাশ করে।

দূর থেকে লেক কনসট্যান্স দেখা যাচ্ছিল। এই হ্রদের এক পাশে জার্মানী অন্যদিকে অস্ট্রিয়া আর সুইজারল্যান্ড। লেক কনসট্যান্স কনস্ট্যান্টাইন বাস্তার ডান-দিকে থাকল। লেকের ও পাড়ে সুইটজার-ল্যান্ডের পাহাড়গুলো—আল্পস-এর শেপ দেখা যাচ্ছিল। লেকের পাশে পাশে কত যে ছবির মত গ্রাম হোটেল কফি হাউস তার লেখাজোখা নেই। জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেশ বোধহয় ইয়োরোপে নেই। জাতের গুণে ওরা ত গত যুদ্ধে প্রমাণ করেছে।

লেক কনসট্যান্স বাঁদিকে রেখে আমরা জার্মানীর বর্ডার পার হয়ে অস্ট্রিয়াতে এসে পড়লাম। তারপর BRENER PASS (৭০০০ ফিট উঁচু) এর দিকে এগোতে লাগলাম। ব্রেনার পাস পেরিয়ে ইটালীতে ঢুকবো বলে।

ইতিমধ্যে ইজরায়েলের উনিশ বছরের মেয়ে সাবার সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়েছে। নীল চোখ—যেন কত কি স্বপ্ন প্রত্যাশা প্রতিজ্ঞা সব লেখা রয়েছে চোখের তারায়। কথা কম বলে, কিন্তু যখন বলে তখন ভারী বুদ্ধিমতী ও রসিকা। এ কদিন আমার সঙ্গে কথা হয়নি একটাও। গায়ের রং বাদামী দেখে আরব গেরিলা-টেবিলা ভেবে থাকবে হয়ত। কিন্তু গত রাতে খাওয়ার টেবিলে ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছে ভাল করে। রাজনৈতিক কারণে দেশে দেশে অনেক বিভেদ ও মনোমালিন্য হতে পারে হয় কিন্তু কোনো দেশের ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির মানুষ হিসেবে খোলা-খুলি মেলামেশার কোনো বৈরীতা বা আড়ষ্টতা হওয়া বা থাকা উচিত বলে আমার মনে হয় না। আমরা সকলেই ত একই মানবজাতির অংশ। যে হারে গ্রহ-গ্রহান্তরে পৃথিবীর মানুষ নাক গলাতে শুরু করেছে এইচ জিওয়েলস-এর [illegible] সম্পাদ লেখা ওয়ার অফ দি ওয়ার্ল্ডস সত্যি হলেও উনি [illegible] পারেন [illegible]। মঞ্জুলা-গুহের সঙ্গে পরিচয়ে [illegible] রাশিয়া-[illegible] পাশাপাশি [illegible] যায়। মাঝে মাঝে মনে হয় এমন একটা [illegible] যুদ্ধ

তাড়াতাড়ি লেগে যাওয়া দরকার অন্তত মনোমালিন্য ভুলে গিয়ে—তাতে এই পৃথিবীর সাদা কালো হলদে বাদামী মানুষগুলো নিশ্চয়ই আরোও কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি আসবে একে অন্যের—তারা বুঝবে যে আমরা সকলেই মানুষ-এর চেয়ে বড় বা এছাড়া অন্য পরিচয় আমাদের কিছুই নেই।

হঠাৎ কাঁধে টোকা পড়ল। আমাদের সর্বসম্মতিক্রমে এবং বিনা— ভোটে নির্বাচিত ইংরেজ টেকো-লিডার কাঁধ ট্যাপ করছেন।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই বললেন—হাউ বাউট আ কিস?

আমি হাত বাড়িয়ে ও'র গোল্ড-ব্লক ট্যোবাকোর টিনটা নিলাম। পাইপ ভরব বলে।

আমাদের নেতার চেয়ে নেতার স্ত্রী আমার বেশী ভক্ত হয়ে উঠেছিল। ছোটবেলা থেকে আমার অনেক দোষের মধ্যে যেটা প্রধান দোষ বলে চিরদিন গন্য হয়েছে তা হচ্ছে কারো কোনো গুণ দেখলে সেটা সংগে সংগে স্বীকার না করে এবং উচ্ছসিত হয়ে না—বলে ফেলে থাকতে পারি না।

আগেই বলেছি, নেতা আমাদের পেশার ছুতোর। আমি গরীব লোক গরীব দেশের লোক, তাই টবী-ভাইয়ের দাক্ষিণে যে টুওরে ইয়োরোপ দেখতে এসেছি সেটা সবচেয়ে গরীবদের টুওর আমার বাসের কমরেডস ছুতোর কামার বাস-ড্রাইভার গরীব ট্রিস্ট ছাত্র-ছাত্রী ইত্যাদি।

এই টেকো সাহেব তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে জীবনের পঞ্চাশ বছর কঠোর পরিশ্রম করে তবে এতদিনে ইংল্যান্ড থেকে কন্টিনেন্টে আসার মত পাথেয় জোগাড় করতে পেরেছেন। সব দেশেই গরীব বড়লোক আছে। ব্যাপারটা আপেক্ষিক। কিন্তু ওদের দেশের যা অর্থনৈতিক মান তাতে এ দম্পতী পঞ্চাশ বছরের আগে ইংল্যান্ড থেকে কন্টিনেন্টে আসার মত পাথেয় জোগাড় না করে উঠতে পারেন তাদের অবস্থা ভাল নয়ই বলতে হবে। যে কারণেই; এতদিন আসতে পেরে ওঁদের আনন্দের আর অন্ত নেই। নিজের মেহনতের পয়সায় এসেছেন, কালোবাজারী বা ফাটকাবাজীর রোজগারের পয়সা নয়—এটাই বা কি কম আনন্দের?

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম.বি, ডি.জি.ও
ডাঃ এস এন পাণ্ডে এম.বি.বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য-৮৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও বহুচিত্রে
চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী • ৩৫ এ, কলেজ ষ্ট্রীট
অগ্রিম ৮৲ টাকা পাঠাইলে ডাকমাশুল ফ্রি

মেমসাহেব প্রায়ই গুনগুনিয়ে গান গাইতেন। গলাটা ভারী মিষ্টি। এমন এমন সব হিট গান বেশীর ভাগই ফিল্মের গান যে ছোটবেলায় আমরাও এদেশে তার কিছু কিছু গান শুনেছি।

আমি একবার মুখ ঘুরিয়ে ওঁকে বলেছিলাম—প্লিজ আমাকে আস্তে গেয়ে কষ্ট দেবেন না—একটু জোরে গান—এত ভাল গলা আপনার লুকিয়ে রাখার জন্যে নয়।

পরক্ষণেই দেখলাম মেমসাহেব গান থামিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে পাউডারের কৌটা বের করে গালে লাগাচ্ছেন।

এতদিনে ইংরিজী প্রবচনের মানে বুঝলাম "To Powder ones noser"

আগে দেশ বা জাত নির্বিশেষে মহিলারা চিরদিন এ ব্যাপারে মহিলাই থাকেন। কমপ্লিমেন্ট পেলে খুশী হন। যে সব পুরুষ জানেন ঠিক কি করে কমপ্লিমেন্ট দিতে হয় তাঁরা চিরদিনই সব বয়সী সব-দেশী মহিলার কাছে সমান প্রিয়।

আমি কিন্তু জানি না। জানলে খুশী হতাম।

কি করে যে সময় উড়ে যায় বগাবীর ঝাঁকের মত তার হিসেব রাখা দায়। লাঞ্চের জন্যে বাস থামল। মাঝে পথে কফি ব্রেকও হয়েছিল। জায়গাটার নাম মনে নেই। DORNBIN নামের একটা ছোট গ্রামের একটা ছোট রেস্তোরাতে লাঞ্চ খাওয়া হল। চমৎকার চিজ্‌নব জুপ বীফ স্টেক। শেষকালে পাইন-এ্যাপল্ পাই। সঙ্গে একটু করে জার্মান schnapps সেই যে schnapps এর কথা লিখেছিলাম আগে—টবীর সংগে TYROLER HUT খেয়েছিলাম লানডানের বেজওয়াটার স্ট্রীটে।

এই DORNBIN -এর হোটেলে যে ছিপছিপে মেয়েটি আমাদের খাওয়া-দাওয়ার দেখাশোনা করছিল সে ভারী সুন্দরী। অস্ট্রিয়ান গাউন পরেছিলো একটি। দেখতে অনেকটা —ম্যাকসির মত—বুকের কাছে লেস বসানো, লাল-কালো কাজের। আমাদের বাসের ড্রাইভার জ্যাক তার সংগে খুব ইয়ার্কি করছিল। এ্যালাসটার লাজুক শিখিত ছেলে। মিষ্ট ভাষী। ও-ও গল্প করছিল মেয়েটির সংগে। জানলাম এই মেয়েটি একসময়ে এই কসমস টুওরের এ্যালাসটারের মতই গাইডের কাজ করত। টুওর নিয়ে কয়েকবার এই হোটেলে এসেছিল। তখনই এই হোটেলের ইয়াং ও হ্যান্ডসাম অস্ট্রিয়ান মালিকের সংগে আলাপ হয়। তারপর তাকে বিয়ে করে আমাদের মত সৌন্দর্য রসিক কসমস কোস্তানীর অনেক যাত্রীর সর্বনাশ করে অস্ট্রিয়ার এই সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে থেকে যায়। ঘন নীল চোখ ফেন্সকাট দাড়ি ও ব্যবসার বক্তসম্পদ তার স্বামীকে দেখে খুব হিংসা হচ্ছিল। এরকম স্ত্রী পাওয়া অনেক পুণ্য-কর্মের ফল। শুধু ফেলাবেই নয় তার কথা-বার্তা হাঁটা চলা সব মিলিয়ে [illegible] সেই লাল-কালো গাউনে [illegible] একটি প্রতিমা বলে মনে হচ্ছিল।

জ্যাক্ আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে ওর গালে একটা চুমু খেল জোর করে ধরে। মেয়েটি ঘুরে দাঁড়িয়েই জ্যাকের পিঠে দুম দুম করে কিল বসিয়ে দিল হাসতে হাসতে গালাগালি করতে করতে।

ওদের দেশে কোনো মেয়েকে চুমু খেলেই সংগে সংগে তার সতীত্ব নষ্ট হয়ে যায় না। এবং চুমু খেলেই ভালোবাসাও হয়ে যায় না।

একদিন চোখ কান খুলে দেখে শুনে যা মনে হচ্ছে তাতে এই-ই ধারণাই জন্মাচ্ছে যে, অদূর ভবিষ্যতে হয়ত ওদের দেশের চেয়ে আমাদের দেশেই বিবাহ-বিচ্ছেদ বেশী হবে। ওরা শরীরটাকে কখনও মনের চেয়ে বড় করে দেখে না। শরীর যাকে তাকে I thank you বলার মত ইচ্ছে করলেই দেওয়া যেতে পারে দেয়ও ওরা। কিন্তু শরীরের মোহ কাটিয়ে উঠে যখন ওরা কাউকে ভালোবাসে তখন মন রুচি ব্যক্তিগত আরো অনেক ব্যাপারে অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়েই বিয়ে করে। আমরা যেহেতু এ ব্যাপারে একটা প্রচণ্ডরকম ট্রানজিটরী সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি—এই ভাঙচুর আমাদের মেনে না নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাছাড়া আমাদের দেশের মেয়েদের সদ্য-প্রাপ্ত আর্থিক স্বাধীনতা এ ব্যাপারে খুব নগণ্য অংশ নেবে না বলেই মনে হয়। আমাদের এখানেও স্ত্রী পুরুষের মেলামেশা আরো অনেক সহজ হয়ে গেলে আমরাও To put the cart before the horse এর মত ভুল বোধহয় করব না। সেদিন ভালোবাসা বলতে ভালোবাসাকেই বোঝাব, মোহ নয়, কাম নয়; রোম্যান্টিক কল্পনামাত্র নয়—তার চেয়েও হয়ত গভীরতর এবং স্থায়ী কিছু।

লাঞ্চ সেরে বেরোতেই এক অবাক কান্ড দেখলাম।

দুপুর থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিল—
BRENER PASS
-এর দিকে যতই এগোতে লাগলাম ততই দূরের পাহাড়চূড়োগুলোকে বরফ দেখা যেতে লাগল। এই সময় লক্ষ্য করলাম যে রাস্তায় কম করে দেড়শ-দুশো গাড়ি, মার্সিডিজ বেঞ্জ ভলভো, সিট্রয় ওপেল ফোর্ড নানারকম ভোকসওয়াগেন রোভার রোলস-বনেটের উপর একটা করে ফুলের তোড়া বসিয়ে প্রসেশান করে চলেছে।

ব্যাপারটা শবযাত্রা না বিয়ে এই নিয়ে আমরা জল্পনা-কল্পনা করছি এমন সময় এ্যালাসটার বলল যে আজ এখানে এক উৎসব।

কি'সব উৎসব?

আমরা সমস্বরে শুধোলাম।

ও বলল— DORFFEST.

সেটা আবার কি?

ও বলল—এল যে শীতের বেলা বরফ পরে। তাই এবারে আপেস পাহাড়ে যে সব [illegible] গরমের সময় চড়তে পাঠানো হয়েছিল তাদের নেমে আসার পালা সম্পন্ন হয়েছে। আজ সেই গরুদের নেমে আসার উৎসব—অস্ট্রিয়ার এ এক ফেস্টিভাল।

গরুরা হাড়গোড় না ভেঙে হাম্বা হাম্বা করতে করতে ফিরে আসুক—পেছন পেছন এ্যালসেসিয়ান কুকুরগুলো ঘাউ ঘাউ করতে করতে—আজ সবাই তাই প্রার্থনা করে। প্রার্থনা করে গরুদের ভাল হোক ওরা বেশী করে দুধ দিক।

ভাবলাম, তবেরে ব্যাটা ইন্টুপিড: ইংরেজ তোরা সারাজীবন আমাদের গরু পুজোর খোঁটা দিয়ে এলি আর তোদের সব বাঘা বাঘা ভাই বিরাদরবাও যে গরু পুজো করে তার বেলা?

নাকি স্যুট পরা সাদা সাহেব মার্সিডিজ গাড়ির বনেটে ফুলের তোড়া সাজালে পুজো হয় না, গরুর পায়ে ভুঁড়িওয়ালা কালো পান্ডা গ্যাদাফুল আর গলাজল দিলেই পুজো হয়!

সাহেবরাও যে গো-পুজো করে এটা জেনে রীতিমত আত্মশ্লাঘা বোধ করলাম। পিছনে বসা নেতা সাহেবকে একথা বলে একের ক্ষীণকণ্ঠে যতটুকু ইংরেজের চরিত্র—হনন করা যায় তাই-ই করতে সচেষ্ট হলাম।

বাস ততক্ষণে ব্রেনার পাসের দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। কিন্তু ওখান থেকে যত গাড়ি আসছে তাদের হাতে বনেটে উইন্ডস্ক্রীনে গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি এবার যে সব গাড়ি আসছে তাদের উপর গুঁড়ো গুঁড়ো নয় প্রায় তাল তাল বরফ।

তারপর ব্রেনার পাসের দিক থেকে আসা গাড়িগুলোকে আর দেখাই যাচ্ছিল না। শুধু সাদা বরফে ঢাকা—ওয়াইপার কোনো রকমে অতি কষ্টে বরফ সরাচ্ছে। দেখতে দেখতে আমরা বরফের রাজত্বে এসে পড়লাম। দু পাশের মাঠ ঘাট ঘর-বাড়ি সব বরফে ঢাকা। সে এক দারুন অভিজ্ঞতা।

আমি বাঙাল তাই আমার কাছে বরফ পড়া দেখার অভিজ্ঞতা দারুন। কিন্তু সাহেবদের কাছে ঐত রোজকার ঘটনা। আমার এই পরদেশে আসার উত্তেজনাকর পরদেশী এই অভিজ্ঞতার স্বদেশী কোনো সমতুল অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করি এমন তুলনা মনে এল না।

পরক্ষণেই মনে পড়ল আমাদের কাল-বৈশাখী!

কোলকাতার লোকের কাছে কাল-বৈশাখী কিছু নয় কিন্তু একজন অস্ট্রিয়ানের কাছে এ নিশ্চয়ই এক অভিজ্ঞতার মতো অভিজ্ঞতা। ধুলোর ঝড়, নারকোল গাছ-গুলোর মাথা নাড়ানো, মেঘের গুরু গুরু আকাশের কালো কুটিল রূপ বিদ্যুতের ঝিলিক বাজের শব্দ।

মনে মনে বললাম—বেশী বরফ দেউিও না, আমাদের দেখাবার অনেক কিছু আছে।

কিছুদূর গিয়ে বাস আর যেতে পারল না। সামনে গাড়ির লাইন। দাঁড়িয়ে আছে। ব্রেনার পাসের দিকে আর কোনো গাড়ি যাচ্ছে না মানে যেতে পারছে না। ওপাশ থেকে সে সব গাড়ি পাস পেরিয়ে ফেলেছে কোনক্রমে সেগুলোই তিরতির করে আসতে আসতে আসছে।

যে হারে বরফ পড়ছে তাতে মনে হল এখানেই এক বড় বাসটারই বুঝি বরফ-সমাধি হবে। সামনের দাঁড়িয়ে থাকা মোটর গাড়িগুলোর রং চেনার উপায় নেই। সব সাদা। আশে-পাশের বাড়ি দোকান গাছ পাতা সব সাদা। পুলিশম্যানের ওভারকোটের নীলচে রং সাদার মধ্যে থেকে একটু একটু উঁকি মারার চেষ্টা করছে। টুপি সাদা।

বাস দাঁড়াল ত দাঁড়ালই।

এ্যালাসটার ও জ্যাককে খুব চিন্তান্বিত হয়ে কি সব আলোচনা করতে দেখা গেল ফিসফিস করে।

ইতিমধ্যে আমাদের পিছনেও শয়ে শয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। জ্যাক থেমে পুলিশের সঙ্গে অনেকক্ষণ বুড়ো আঙ্গুল কড় আঙ্গুল, জান হাটু নাড়িয়ে কথা বলল—তারপর বরফ—ঢেকে গাড়িতে ফিরে এসে এ্যালাসটারকে কি সব বলল বিজাতীয় ভাষায়।

এ্যালাসটার মাইক্রোফনে বলল ওরেল!,

তারপর টিপীক্যাল ইংরেজের মত ট্যাকটফুলি একটু হাসল।

পরক্ষণেই বলল—

Well, ladies and gentlemen, there's a minor problem!

হোয়াট ইজ ইট? হোয়াট ইজ ইট রব উঠল।

আমার তিন সারি সামনে যে কানে খাটো ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোক ছিলেন (তাঁর নাম জানিনি চেঁচিয়ে কথা বলার ভয়েই আলাপ করা হয়ে ওঠেনি তবে মুখের ভাবটি সব-সময়ই ভারী প্রশান্ত) তাড়াতাড়ি পকেট থেকে হিয়ারিং-এইড বের করে কানে লাগালেন।

পেছন দিক থেকে ইজরায়েলের সারা, ইন্ডিনেডাভের কাম্বোজমের মত পুরন্ত ঠোঁট-সম্পন্ন লুসি সেই মালয়েশিয়ান দম্পতি বয়্যাল এয়ার কোর্সের গলায় স্কার্ফ বাঁধা চালু ভদ্রলোক সেই পাসপোর্ট হারিয়ে যাওয়া ভদ্রমহিলা সকলেই একসঙ্গে ওৎসুক্য প্রকাশ করলেন। এক বাসে যে এমন সর্ব-জাতিও ধর্ম সমন্বয় হতে পারে এই মুহূর্তের আগে সম্যক বুঝতে পারিনি।

সব গলা ছাপিয়ে একটি বাঙ্গালি গলা শোনা গেল, সেরেছে।

এই বাঙ্গালি দম্পতি গ্রেটারল্যানডানে সেটলড। স্বামী এঞ্জিনীয়ার স্ত্রী ডাক্তার। কিন্তু আমি বাঙ্গালি পরিচয় দিইনি; আসা-ইস্তক একটি বাংলা শব্দও বলিনি। লোকে আমাকে যে যাই ভাবুক—পাকিস্থানী, আফ্রিকান আরব ইরাণী মেকসিকান মরিশাস আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিলো না—কিন্তু কলিনার জন্যে বিদেশ দেখতে এসে গড়িয়া-হাটে কই মাছের দর অথবা অপর্ণা সেনের জেটেস্ট বাংলা ছবি নিয়ে আলোচনা করার একটুও ইচ্ছা আমার ছিলো না। যদিও কই মাছ (বিশেষ করে শর্ষে বাটা দিয়ে রান্না করা কইমাছ) এবং ঐ বুদ্ধিমতী উজ্জ্বল ও অসাধারণ রূপ ও গুণসম্পন্না মহিলা—এই দুয়েরই আমি সবিশেষ ভক্ত।

এ্যালাসটার আবার হাসল, যাকে ঢাকল করা বলে তেমন। তারপর মাইক্রোফোনে ফুঁ দিল। সম্মিলিত অভিব্যক্তির ধুলো ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার জন্যে।

এ্যালাসটারের চেহারা চুল কথাবার্তা সমস্তই অতি রোমান্টিক। বড় সুন্দর ছেলে। সে কারণেই ও প্রবলমের খবর দেওয়া সত্ত্বও আমাদের অতটা হতাশ হওয়ার কারণ আছে বলে মনে হলো না।

এ্যালাসটার বলল—আমাদের ইটালি যাওয়া বোধহয় হচ্ছে না।

আর যায় কোথায়? নেই না একথা বলা!

আমার মনে হল দীঘা বা বিক্রমপুরের ক্ষমডাকটেড ট্যুরে বেচারী ইনফরমেশান এ্যাসিস্ট্যান্টদের যাত্রীদের কাছ থেকে যে অভদ্র অবজ্ঞা ও অশালীন ব্যবহারের সম্মুখীন হতে হয় তারই স্যাম্পেল দেখতে পাবে আজ এ্যালাসটার।

হৈ হৈ রৈ রৈ রব উঠল। নেহাৎ সাহেব মেম ইংরিজীতেই কথা বলছিল—কিন্তু যা বলছিল তার অর্থ করলে অত্যন্ত সরল অর্থ দাঁড়ায়। 'দাও টাকা ফেরৎ চালাকি পেয়েছো? বাপের নাম খগেন করে দেবো, ভাঙত মারার জায়গা পাওনা? কেস ঠুকে দেবো বলে দিচ্ছি দেখে নেবো ইত্যাদি ইত্যাদি।

সারা পৃথিবীর মানুষই এক। সেই মুহূর্তে মনে হল সাহেবরা দুশো বছর আমাদের পরাধীন করে রেখে তাদের সম্বন্ধে যা আমাদের বুঝতে দেয়নি তা এই এক মুহূর্তেই বোঝা গেল।

তার পা মাড়িয়ে দিলে, তার স্বার্থে ব্যাঘাত বা মানিব্যাগে হাত পড়লে পৃথিবীর সব মানুষই সমান।

আমি একবার চোখ ঘুরিয়ে এদিক ওদিকে তাকালাম।

এই তিনদিনের ভদ্রতা সভ্যতা থ্যাঙ্ক-উ, একসকিউজ মী ইত্যাদি যে কতবড় মুখোস কতবড় বাহ্য এবং মিথ্যা ব্যাপার তা আর জানতে বাকি রইল না।

বড় লজ্জা হল আমার। এদের সকলের জন্যে, আমার নিজের জন্যেও।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম এ্যালাসটার তার কথা শেষ করেনি। তার অসুবিধের কথা তাকে দয়া করে বলতে দেওয়া হোক।

তক্ষুনি আমার পিছন থেকে আমাদের নেতা জন উঠে দাঁড়িয়ে বলল ঊ আর এ্যাব সল্যুটলি রাইট্। লেট দ্যাম হিয়ার হোয়াট

'উজ্জ্বল' শুভ্রতার জন্যে

সুপ্রীম ডেট ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার কেক

নতুন উন্নততর ডেট কেক বাজারের সেরা ডিটারজেন্ট কেক।

এতো পরিষ্কার করার ক্ষমতা, এতো ফেনা ও সুগন্ধকে হার মানায়,কাপড় ধোয়ার এমন কোন কেক আর নেই।

ব্যবহার করে দেখুন। তফাৎ বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, 'উজ্জ্বল' শুভ্রতার জন্যে সুপ্রীম ডেট কেক।

ধবধবে সাদা, ডেটের সাদা

SHIPU:DM 7A/88 Beng

অ্যালাসটার হ্যাজ টু সে। আফটার উই হিয়ার হিম উই উইল কাম টু আ ডিসিশান।

অ্যালাসটার বলল, ব্রেনার পাস বরফে সম্পূর্ণ ঢেকে গেছে। কতক্ষণে বরফ পরিষ্কার করা যাবে কতক্ষণে বরফপড়া থামবে— "It's no-body's guess".

আসলে এ বছরে এত তাড়াতাড়ি যে বরফ পড়বে এবং এমনভাবে পড়বে—ব্রেনার পাসের তদারকী যাঁরা করেন তাঁরাও বুঝতে পারেন নি।

সকলে সমস্বরে বলল কি হবে? তাহলে কি হবে?

কেউ কেউ জুতো দিয়ে বাসের মেঝেতে পা ঠুকতে লাগল।

হংকং-এর চাইনীজ মেয়েগুলো বাসের একেবারে পেছন থেকে 'চ'-কার এবং অনুস্বারের তুবড়ি ছুটালো।

এ্যালাসটার বলল, ইটালীতে ত আমাদের হোটেল ঠিক করা আছে ডিনারও সেখানে তৈরী করে রাখবে—কিন্তু এখন সারারাত এখানে আটকে থাকলে কি হবে? এটা একেবারে আনএকসপেকটেড ব্যাপার। আমার কাছে পয়সাও নেই যে তোমাদের এত লোকের থাকাখাওয়ার বন্দোবস্ত করি এখানেই কোথাও।

অনেক স্বর একসঙ্গে বলল, চোপ্‌। ইয়ার্কি পেয়েছ? পয়সা নেই মানে কি? কেন? তোমার ক্রেডিটে বন্দোবস্ত কর—ওসব আমরা জানি না। আমরা ইটালী যাবই। এদিকেই কোথাও খাওয়া-দাওয়া করে সারা রাত বাস চালিয়ে চল।

এ্যালাসটার অভদ্র হয়ে যাওয়া বিক্ষুব্ধ অতজনের সামনে হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে রইল। যেন ও-ই সবকিছুর জন্যে দায়ী।

তখন জন উঠে দাঁড়িয়ে বলল পাস পেরোবার কোনো উপায়ই কি নেই এ্যালাসটার?

এ্যালাসটার বলল ব্রেনার পাসের নীচ দিয়ে একটা টানেল আছে—ট্রেনে করে গাড়ি পার হয় শীতকালে যখন পাস বরফে ঢাকা থাকে—। এখনও পার হচ্ছে অনেক গাড়ি কিন্তু এতবড় বাস ত ঐ টানেল দিয়ে গলবে না।

জন শুধোল, আর কোনো উপায় নেই?

আছে। যদি টায়ারে স্নো-চেইন লাগানো যায়।

তোমাদের সঙ্গে আছে? জন শুধোল।

জ্যাক বলল, এই সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি যে এমন বরফ পার এখানে কে জানত? নেই। আমাদের সঙ্গে চেইন নেই।

অ্যালাসটার তুড়ি মেরে বলল নট আ ব্যাড আইডিয়া। উই ক্যান ট্রাই দ্যাট আউট।

তারপর বয়্যাল এমার ফোর্সের সাহেব জন অ্যালাসটার ও জ্যাক চেইন পাওয়া যায় কিনা খোঁজ করতে বেরোল।

আমার পাশের ফিলিপিনো ভদ্রমহিলা ব্যাগ থেকে একগাদা বিস্কিট ও চকোলেট বের করে দিলেন। উনি বড়লোক। আমার এদেশে বাড়তি চকোলেট বা বাড়তি খরচ করারও টাকা নেই।

ক্ষিদেও পেয়েছিল। বিকেলে চা-ও খাওয়া হয়নি এদিকে রাত নেমে এল বলে। বহু বহু বছর বাদে কুটমুট করে বিস্কিট চকোলেট খেলাম—কিন্ডারগার্টেনে পড়া ছেলের মত।

ওরা ফিরে এল।

বলল, কোথাওই চেইন পাওয়া গেল না।

এ্যালাসটার ব্রাসেলস-এ কমনওয়েলথ কোম্পানীর হেড কোয়ার্টারে ফোন করতে চেষ্টা করল একটা দোকান থেকে। ব্রাসেলস-এর বস-এর সেক্রেটারী বলল যে তিনি অফিস থেকে বেরিয়ে এক পার্টিতে গেছেন।

জনের ভগ্নীপতি যে ভারতবর্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এসেছিলো মুঠি পাকিয়ে বলল—টু হেল উইথ দা পার্টি।

(ক্রমশঃ)

নতুন পরিকল্পনায় রকমারী রচনায় সমৃদ্ধ
সকলের উপযোগী মননশীল বাংলাপাক্ষিক

ধনধান্যে

নিয়মিত পড়ুন ও দেশকে জানুন

আকর্ষণীয় কয়েকটি নতুন সংযোজনা

মুখোমুখি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, যুবমানস, জেলার সংবাদ
মহিলা মহল, খেলাধুলা, সিনেমা, বিশেষ সংবাদ, কার্টুন
ধাঁধা ও গ্রন্থ আলোচনা।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক ১০ টাকা দু'বছরের ১৭ টাকা এবং তিন বছরে ২৪ টাকা। চাঁদা পাঠাবার ঠিকানাঃ—

সম্পাদক

ধনধান্যে

পাবলিকেসন্‌স ডিভিশন
৮, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট
কলিকাতা — ৭০০০৬৯

সহজ সর্তে বিক্রয় এজেন্সী দেওয়া হয় এবং বিজ্ঞাপন নেওয়া হয়। উপরের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

ধনধান্যে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি শুধু নয়, সামাজিক সাংস্কৃতিক বিবর্তনের বার্তাবহ পাক্ষিক।

ডিএভিপি ৭৬।২৫৩

মনের অসুখ

(পনেরো)

Haste thee, Nymph, and bring
with thee
Jest, and youthful jollity,
....
Sport that wrinkled care derides,
And laughter holding both his
sides
—Milton

—কি হয়েছে আপনার?

—আমার আবার কি হবে? আপনার কি হয়েছে বলুন। টাক পড়েছে, চামড়া কুঁচকে গেছে, চোখ ঘোলাটে দেখাচ্ছে। নিশ্চয়ই কয়েক রাত ঘুম হয়নি! আচ্ছা আপনি কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে চান বলুনতো? আমার কাছে কি দরকার? পরিচয়পত্র! তা, আমি আমার বন্ধুমহলে জানিয়ে দেব। আপনি এই শহরে প্র্যাকটিশ জমাতে চান—এই তো? প্র্যাকটিশ জমাতে হলে সাজপোষাক আর একটু ভাল করতে হবে, ঘরটাকে আর একটু সাজাতে গোছাতে হবে। আর সব থেকে বড় কথা টাকে চুল গজাতে হবে। সে কিছু নয়। হেয়ার-গ্রাফটিং হামেশাই হচ্ছে। চিৎপুর থেকে একটা পরচুলো ভাড়া করলেও চলবে। মোটকথা, ইউ মাস্ট লুক ইয়ং অ্যান্ড স্মার্ট। ঐ বুড়ো-হাবড়া চেহারায় প্র্যাকটিশ জমবে না। আমার মত সুন্দরী মেয়েরা তো আসবেই না এমন কি ঐ এয়ার হোস্টেস বা ওয়েট্রেসদেরও আপনার কাছে পাঠানো যাবে না...জানেনতো, আমার সঙ্গে কাল একটা সিনেমা কোম্পানীর কনট্রাক্ট সই হবার কথা ছিল। আমি রাজী হইনি... নায়কের ভূমিকায় আমার পছন্দমত অভিনেতা চাই। বোম্বেতে চলে যাচ্ছি...এখানে বড় হবার জো নেই। সব ডিরেক্টরগুলো আপনার মত বুড়ো আর বোকা। একটা 'স্কেচসস্যুট' পেলে মঙ্গল গ্রহটা একবার ঘুরে আসতাম। আমেরিকার ওরা আমাকে অফার দিয়েছিল। কিন্তু এদিকে আবার এক বনেদী প্রকাশক আমার আত্মজীবনী ছাপানোর জন্য ধরে পড়েছে। একা মানুষ, কোনদিক সামলাই বলুন তো? আবার ব্যালে দেখানোর প্রোগ্রাম রয়েছে মস্কোতে। ও, হ্যাঁ, আপনি আমার ভিজিটিং কার্ড নিয়ে চাঁদনীতে চলে যান। আপনার মা জেরো রেডিমেড বেলজারেই আপনার চলে যাবে। পাগল বানিয়ে চিকিৎসা করতে চাও তো কামস্কাটকাতে চেম্বার খোলো কোলকাতার লোকরা তোমার ভাওতাতে ভুলবে না। এখন আবার মস রেণ্টুরেণ্টে মরা গরুর মাংস থেকে কাটলেট বানাচ্ছে। যাবার আগে কলেরার ইনোকুলেশন নিতে ভুলবে না। আর হ্যাঁ, একটা বিশেষ মুদ্রা শিখিয়ে দিচ্ছি। এটা জানা থাকলে তুষার মানবই হোক আর ডায়নোসরই হোক —তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

এই বলে শ্রীযুক্তা পাল চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাত মাথার ওপর তুলে, বাঁ হাত কোমরে দিয়ে, মাথাটা পেছনে হেলিয়ে আমাকে মুদ্রা প্রদর্শন করলেন। তার পর শুরু হল হাসি। প্রথমে মুখে হাত দিয়ে হাসি চাপবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না। এতক্ষণ কথার ফুলঝুরি ছুটছিলো, এবার হাসির ফোয়ারা। হাসি আর থামে না। দুহাতে পাঁজর চেপে অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে চেয়ার থেকে নেমে পাশের খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগলেন অঞ্জনা পাল।

অপ্রস্তুত মুখ করে স্বামী প্রকাশ পাল আমার দিকে তাকিয়ে নীচু গলায় বললেন: কিছু মনে করবেন না, স্যার। আমার বাবার সামনে ও হাসছে, গান গাইছে। এমন কি মাঝে মাঝে অশালীন আচরণ, অসঙ্গত কথাও বলছে। কাল রাত্রে ডাক্তারবাবু, মানে আমাদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান ওকে ইনজেকশন দিয়েছিলেন; ঘণ্টা দেড়েক ঘুমিয়েছিল। ঘুম থেকে উঠে আবার সেই চেঁচামেচি, হাসি গান, মাঝে মাঝে ঐ বিকট নাচের মহড়া। আমরা একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে গেছি।

স্বামীকে আমার সঙ্গে কথা বলতে দেখে অঞ্জনার হাসি থামল। হাসির বদলে চোখে মুখে ক্রোধের চিহ্ন দেখা দিল। এবার খাটের ওপর দাঁড়িয়ে উঠে রোষদীপ্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করে চললেন, বীররসের নানা কবিতার পংক্তি। অসংলগ্ন অসম্পর্কিত। আমার দিকে তর্জনী নির্দেশ করে বললেন, 'রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী। আমি কি ডরাই কভু ভিখারী রাঘবে!' তার পর একটু শান্ত হয়ে মেঝেতে নেমে আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে গম্ভীর গলায় রবীন্দ্রনাথ থেকে কিছু আবৃত্তি করলেন: সাবধানে আপন ভাগ্য জয় করিবারে কেন নাহি দিলে অধিকার। হে বিধাতা—ইত্যাদি।

অঞ্জনা পালের বয়স বত্রিশ। অবাঞ্ছিত মেদবৃদ্ধি সত্ত্বেও বোঝা যায় এক সময় সুঠাম দেহশ্রীর অধিকারী ছিলেন। মুখের চেহারা মাত্রাতিরিক্ত 'মেক-আপের' আড়ালে ঢাকা। সেজেছেন পুরোণো দিনের বাইজীর সাজে। শাড়ী, ওড়না ইত্যাদিতে চোখ ঝলসানো রংয়ের সমারোহ!

এই ধরনের সাজগোজ ও এইরকম সংলাপের সঙ্গে অধিকাংশ পাঠকই পরিচিত। নাটক নভেলে ক্ষিপ্ত রমনীর এই ছবি, উন্মত্ততার এই প্যাটার্ণ অনেক দিন ধরেই চালু। ইংরিজিতে এই অবস্থাকে বলা হয় 'ম্যানিক স্টেট'। 'ম্যানিক- ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস' রোগের উপসর্গ—এই ক্ষিপ্ত অবস্থা বিষন্নতার বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। কিছু রোগীর মধ্যে বারবার বিষন্নতার প্রকাশ দেখা যায়, কারুর-মধ্যে আবার শুধু এই ম্যানিক বা ক্ষিপ্ত অবস্থারই অভিব্যক্তি ঘটে বারবার। মস্তিষ্কের বিশেষ টাইপ ও পরিবেশের বিশেষ সমাবেশের সঙ্গে উপসর্গের বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কিত। রোগবিজ্ঞান ও নিদানতত্ত্বের আলোচনায় অনেকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবার সম্ভাবনা, তাই আমরা কেবলমাত্র রোগীর ইতিহাস সাধারণের বোধগম্য করে বিবৃত করতে চাই। রোগের কারণ এই সব ইতিহাস থেকে অনেকটা বোঝা যাবে। ব্যক্তিমানসে সমাজের কঠিননীতি বাধা-নিষেধের প্রভাব কি ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে—সেটা জানা থাকলে মনের অসুখের প্রতিবিধান ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা সম্পর্কে পাঠকসাধারণ কিছুটা অন্তত সচেতন হতে পারবেন। মনের

অসুখকে কেন্দ্র করে অবাস্তব এবং রহস্যময় বহুরকমের ধ্যানধারণা গড়ে উঠেছে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসা বিলম্বিত ও বিড়ম্বিত হয়ে থাকে। রোগ-ইতিহাসে যদি রোগের কারণ সহজবোধ্য করে প্রকাশ করা যায়, তাহলে মনে হয়, এই ক্ষতিকারক অবাস্তব ধ্যানধারণার আংশিক নিরসন ঘটতে পারে। এইবার প্রকাশবাবুর মুখে অঞ্জনার কথা শুনুন।

—গত কয়েকদিন ধরেই অঞ্জনা বেশি কথা বলছিল। প্রায় সারারাত ধরে বকবক করাতে পরশুদিন আমাদের পাড়ার পরিচিত চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাই। তাঁর কাছে গিয়ে অঞ্জনা বলে, ও বেশি কথা বলছে না, ঘুমও ঠিকমত হচ্ছে। আমি নাকি ওর কথা বন্ধ করতে চাই, কেন না ওর কথার মধ্যে আমার কাজের ও চরিত্রের সমালোচনা ছিল। সেই সমালোচনা আমি সহ্য করতে পারছি না বলে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ওর মুখ বন্ধ করতে চাই। ডাক্তারবাবু ওকে অনেকদিন ধরে চেনেন। অনেক বুঝিয়ে-শুঝিয়ে কয়েকটা বড়ি খেতে রাজী করালেন। কিন্তু কোনো কাজ হল না। বরং সেই রাতে ওর বাক্য-স্রোত আরো বেড়ে গেল। আমাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি-গালাজ করতে লাগল, উঁচু গলায় গান ধরল। পাশের ঘর থেকে বাবা উঠে এলেন। তাঁকে এমনিতে খুবই ভক্তিশ্রদ্ধা করে। কিন্তু তাঁকে দেখে গানতো থামালোই না, বরং তাঁকে সমঝদার শ্রোতা ঠাউরে চোখের ইশারায় স্বাগত জানালো। তিনি বেশ কিছুটা লজ্জিত বোধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। প্রতিবেশীদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে, তারা যা-তা ভাবছে,—এই সব কথা বলে অনেক অনুনয় বিনয় করে ওকে শান্ত হতে বললাম। ওর অনুযোগ অভিযোগের মাত্রা বাড়তে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেল কণ্ঠস্বরের তীব্রতা। উপায়ন্তর না দেখে বলপ্রয়োগে বাধ্য হলাম। জীবনে প্রথমে ওর গায়ে হাত তুললাম। আমার সঙ্গে খানিকটা ধস্তাধস্তি করে ঝিমিয়ে পড়ল। ঘণ্টা তিনেক বোধ হয় ঘুমিয়েছিল। দরজায় তালা লাগিয়ে আমি বাইরের ঘরের সোফায় গিয়ে আশ্রয় নিলাম। সকালে কিছুক্ষণ নির্জীব হয়ে পড়েছিল। ডাক্তারবাবু এসে জোর করে একটা ইনজেকশন দিলেন, বিকেল পর্যন্ত শুয়ে রইল। সন্ধ্যায় আরো-দুবার ডাক্তারবাবু এলেন, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে বলে আর একটা ইনজেকশন দিয়ে বিদায় নিলেন। কিন্তু বিশেষ কোনো ফল হল না। ঘণ্টা দেড়েক বোধ হয় ঘুমিয়েছিল। তারপর সকাল হতে ঐ অদ্ভুত সজগোজ করে বেরিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। তারপর ওর দাদার সাহায্যে প্রায় ধরে বেঁধে আপনার এখানে এনে হাজির করেছি। গাড়ীতে উঠে আপনার নাম শুনে অনেকটা শান্ত হল। একদিন আপনি ওর অভিনয় দেখে খুব খুশী হয়েছিলেন, সে কথা ওর মনে আছে। সে-প্রায় বারো বছর আগেকার কথা। তখনও আমাদের বিয়ে হয়নি। অঞ্জনার দাদাকেতো আপনি জানেন,—নিরঞ্জন শর্মা; সে বাইরের ঘরে বসে আছে।

মেয়েটিকে প্রথম থেকেই চেনাচেনা মনে হচ্ছিল। প্রকাশের কথা শুনে পুরনো কথা মনে পড়ল। একবার বিশেষ অনুরোধে অঞ্জনার দাদার লেখা একটা নাটক দেখতে হয়েছিল। শহরতলীর একটা ছোট গ্রুপথিয়েটারের নাট্যকার-পরিচালক নিরঞ্জন বায় তাঁর নাটকের পাণ্ডুলিপি শুনিয়ে আমার কাছে কিছু মনস্তত্ত্ব-সংক্রান্ত উপদেশ চেয়েছিল। নাটকটি আমার ভাল লেগেছিল মেয়েটির অভিনয়েও সত্যিই অভিনবত্ব ছিল। থিয়েটারের দলটি কিছু দিনের মধ্যে ভেঙে যায়। নিরঞ্জন বা অঞ্জনার খবরাখবর বহুদিন পাইনি। আজ আর এক নাটকীয় পরিবেশের মধ্যে ওদের সঙ্গে দেখা। সেই নাটকেও, মনে পড়ছে, এমনি একটা দৃশ্য ছিল।

অঞ্জনা তখনও অসংলগ্ন আবৃত্তি করে চলেছে। মন দিয়ে তার আবৃত্তি শুনতে ও তার তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করলাম। এখন উগ্রতা কিছুটা কম। কণ্ঠস্বরও খাদে নেমেছে। ডাক্তারী পরিভাষায় একে বলা চলে 'হাইপোম্যানিয়াক' অবস্থা। অঞ্জনা বলছিল : শোন সব অকস্মাৎ ছিন্ন করে ঊর্ধ্বে লয়ে যাও। পঞ্চকুন্ড হতে। মহান মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি করে দাও মোরে। বজ্রের আলোতে। তার পর ফেলে দাও, চূর্ণ ক'র, যাহাইচ্ছা তব—ভগ্ন করো পাথা। যেখানে নিক্ষেপ কর হতে পত্র, চ্যুত পুষ্পদল, ছিন্নভিন্ন শাখা। পরক্ষণেই শুনলাম : বলে দে আমায় কী করিব সাজ, কী ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ, পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে কোন বরণের বাস।।

অঞ্জনা একটু থামতেই সেই নাটকের প্রসঙ্গ তুললাম। এর আগে আমার নির্দেশে নিরঞ্জন একবার এসেছে আমার সঙ্গে দু-চারটে বাক্যবিনিময় ঘটেছে। নাটকের কথা তুলতেই অঞ্জনার ভাবান্তর ঘটল। স্বামীর দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বলল—কুইট ইণ্ডিয়া। প্রকাশ আমার দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এবার অনুত্তেজিত কণ্ঠে আমাকে বলল—আপনি আমাকে চিনতে পারেননি ভেবেছিলেন বুঝি শাঁসালো মক্কেল বাগিয়েছেন। হ্যাঁ আমি শাঁসালো বটে কিন্তু আপনার মক্কেল নই। আপনার মক্কেলকে ওষুধে পাঠিয়েছি। ওর ঘুম দরকার, ইনজেকশন দরকার, তারপর দরকার হবে মগজ পরিবর্তন—ব্রেইন ট্রান্স প্লানটেশন। আমি ইচ্ছে করলে ওকে আবার সুস্থ করে তুলতে পারি কিন্তু আমার সময় নেই। অনেকগুলো কনট্রাকট-এ সই করতে হবে। না, থিয়েটার আর করব না। দু-চারশো লোকের সামনে নয়, লক্ষ লক্ষ লোকের সামনে আমার প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে হবে। সিনেমা আর টেলিভিশনের কনট্রাকট ছাড়া আর কিছুতে আমার ইনটরেস্ট নেই। কিম্বা আমাদের লুপ্ত প্রায় বাইজি নাচকে আবার জাগিয়ে তুলব। কথাকলি ভারতনাট্যম তলিয়ে যাবে। আপনার মক্কেলের ঘাটতি হবে না। ঐতো ক্ষুদে পালক পেলেন, বাড়ী থেকে ওর বাবা গোদাপালকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে আসুন! আর সব নাচের স্কুলে টাউট পাঠান। অনেক মক্কেল হবে। নাচ দেখবেন?

—তোমার কথামত সব ব্যবস্থা হবে। আপাতত এই শরবতটা খেয়ে নাও, তারপর তোমার বাইজি নৃত্যও দেখা যাবে।

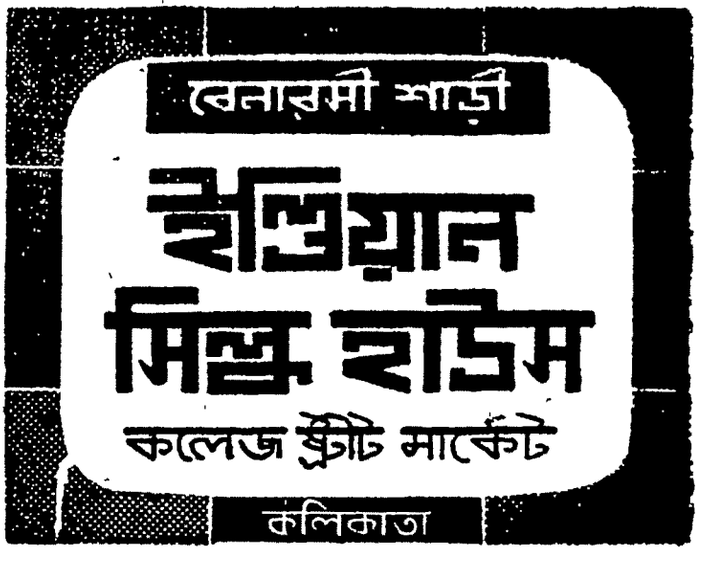

ওকে আর ওর দাদাকে দু গেলাস শরবৎ দেওয়া হল। দাদাকে খেতে দেখে অঞ্জনা এক চুমুকে গেলাসের ওষুধ মেশানো শরবত শেষ করে ফেলল। কিছুক্ষণ পরে শ্রান্ত আধাঘুমন্ত অবস্থায় মনট্রাবট সই কথার নাম করে ওর দাদাকে সঙ্গে ওকে অতি সহজেই তার বাসায় পাঠান গেল।

এরপর দুদিনের মধ্যে অঞ্জনার দাদা আর স্বামীর কাছ থেকে তরুরোগ ইতিহাসের বিবরণ, জানলাম। দুজনের বিবরণে কিছু কিছু গরমিল ছিল, পরস্পরের প্রতি দোষারোপ ছিল, ভুল বোঝা-বুঝির ব্যাপার ছিল। সেই সব বিচার বিশ্লেষণ করে অঞ্জনার অসুখের কারণ সম্পর্কে আমার নিজস্ব ধারণা আপনাদের জানাচ্ছি।

নিরঞ্জনের নাটকের দলে ভাঙন ধরিয়ে প্রকাশ পাল তার নিজের দল গড়ে তোলে: নিরঞ্জন সরকারী অফিসের সামান্য কেরানী আর প্রকাশ পাইপ মার্চেন্ট ধনী পিতার একমাত্র সন্তান। নিরঞ্জন নাটকে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার আমদানি করতে চায় আর প্রকাশ চায় নৃত্যনাট্য ও অপেরাধর্মী নাটক করতে। প্রথমদিকে প্রকাশ নিরঞ্জনের সহযোগী হয়ে তার নির্দেশ মত কাজ-কর্ম করেই সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু ক্রমশ দুজনের মধ্যে রেষারেষি মন কষাকষি শুরু হল, প্রকাশের পৃষ্ঠপোষকতায় একটা নাচের স্কুল সে সময় বেশ নাম করেছিল। সেই স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে অঞ্জনা প্রথম নৃত্যনাট্যে অংশ গ্রহণ করে। নিরঞ্জনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অঞ্জনা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে। নিরঞ্জন সভা ডেকে প্রকাশ ও অঞ্জনাকে তাদের গ্রুপ থেকে বহিষ্কারের প্রস্তাব নিয়ে আসে। অঞ্জনা ও প্রকাশ চলে গেলে তাদের দল টিকতে পারে না জেনে অন্য সবাই এই প্রস্তাব সভায় তুলতে দিল না। অঞ্জনা তাদের একমাত্র মেয়ে আর্টিস্ট আর প্রকাশ কোষাধ্যক্ষ ও ব্যাঙ্কার। নিরঞ্জন পদত্যাগের হুমকি দেখাতে একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি হল। এই সুযোগে প্রকাশ নতুন দল গড়ল ও জাঁকজমক করে নতুন নৃত্যনাট্যের মহড়া দিতে লাগল। পিতার অবর্তমানে নিরঞ্জনের মা ছেলেমেয়ের অভিভাবক। তিনি অঞ্জনাকে প্রকাশের দলে অভিনয়ের অনুমতি দিলেন। নিরঞ্জনের ধারণা প্রকাশের কাছ থেকে বিশেষ ইঙ্গিত পেয়েই মা রাজী হয়েছিলেন। নিরঞ্জন বাড়ী ছেড়ে গড়িয়ায় এক বন্ধুর বাড়ীতে আশ্রয় নিল ও নতুন করে দল গড়বার চেষ্টা করতে লাগল। নিরঞ্জনের ধারণাই শেষ পর্যন্ত সত্য বলে প্রতিপন্ন হল। ধনীপুত্র প্রকাশের সঙ্গে অঞ্জনার বিয়ে হল। মাতৃহীন পুত্রের খেয়ালে পিতা বাধা দিলেন না। মায়ের সাধ্যসাধনাতে নিরঞ্জন বিয়েতে যোগদান করল বটে কিন্তু প্রকাশ ও অঞ্জনাকে ক্ষমা করতে পারল না। ওরা সুবিধাবাদী, কৌষ্যাবিষ্ট নিরঞ্জন ওরকম বোন ভগ্নীপতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে রাজী হল না। দু বছরের মধ্যে মা মারা গেলেন। এই সময়টায় সারা দেশ জুড়ে দ্বন্দ্ব-বিরোধ হিংসাত্মক সংঘর্ষ চলছিল। পাড়া ছেড়ে নিরঞ্জন অন্য কোথাও চলে গেল। বোন ভগ্নীপতির খবর মাঝে মাঝে পেত বটে কিন্তু ওদের সম্বন্ধে ওর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। প্রকাশের নৃত্যনাট্য ও অপেরা পার্টি উঠে গেছে নাচের স্কুলের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই—এইটুকু মাত্র জানত আর শুনেছিল ওর বাবা ধর্মকর্মে মন দেওয়াতে প্রকাশ ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দিয়েছে ও অনেক পয়সা কামাচ্ছে। নিরঞ্জন এই রকমই আশা করেছিল কাজেই একটুও বিস্মিত হয়নি। অঞ্জনার, শিল্প-নিষ্ঠাকে মনে মনে ধিক্কার জানাল। বছরখানেক আগে পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হওয়ার পর পাড়ায় ফিরে এসে সে অঞ্জনা ও প্রকাশ সম্বন্ধে অনেক কিছু শোনে, কিন্তু তখন তার মনে হয়নি যে এব্যাপারে তার কিছু করবার আছে। কয়েক সপ্তাহ আগে অঞ্জনার একখানা চিঠি পেয়ে তার টনক নড়ে ও হেঁচে গিয়ে প্রকাশের সঙ্গে দেখা করে। প্রকাশের অনুমতি নিয়ে অঞ্জনার সঙ্গে দেখা করে জানতে পারে যে বছর তিনেক হল প্রকাশ আবার নাচের স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তার এখন পয়সা ও প্রতিপত্তি বেড়েছে এতস্লাটের মাতব্বর বলে স্বীকৃত। বড় বড় হোমড়া-চোমরাদের সঙ্গে তার দহরম মহরম। তাঁরা এই নাচের স্কুলের পেট্রন। নৃত্যনাট্যের দলটাও আবার তার অর্থে সঞ্জীবিত হয়েছে। নতুন ধরনের নৃত্যনাট্য পরিবেশন করার পরিকল্পনা করেছে ইতিমধ্যে দু-একটি অনুষ্ঠিতও হয়েছে। কিন্তু এসব ব্যাপারে অঞ্জনার কোনো ভূমিকা নেই। তাকে প্রকাশ ভালবাসে। তার জন্যে আলাদা আয়া আলাদা গাড়ী আলাদা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট-এর ব্যবস্থা হয়েছে। ব্যবসার এক-তৃতীয়াংশের অংশীদার হয়েছে অঞ্জনা। তাদের একমাত্র সন্তান আলিপুর-এ বোর্ডিং স্কুলে ইংরিজি মিডিয়ামে সুশিক্ষা লাভ করছে। খুশীমত অঞ্জনা দুপুরবেলা মার্কেটিং করে বিকেলবেলা কোনোদিন বেলুড় কোনোদিন ডায়মন্ডহারবার বেড়াতে যায়। স্বামীকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে তাকে নাচের স্কুলের ভার কবে দেওয়া হবে। বিয়ের আগে প্রকাশ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তার শিল্পী-সত্তাকে বিকশিত করার উদ্দেশ্যেই সে তাকে বিয়ে করতে চায়। নিরঞ্জনের নাটকে রাজনীতি আছে সাহিত্যরস নেই, শিল্প নেই। অঞ্জনা তার শিল্পীসত্তার বিকাশের জন্যই দাদার আদর্শ ত্যাগ করে প্রকাশের সহধর্মিণী হয়েছে। সে আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করে এসেছে যে তাকে ভারত খ্যাত নৃত্যশিল্পী করে গড়ে তোলার জন্যই প্রকাশ তাকে নিরঞ্জনের কবল থেকে মুক্ত করেছে। অরাজক অবস্থার অবসান হলেই প্রকাশ আবার দল গড়বে তাকে নাচ শেখাবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করবে। অঞ্জনার পরিকল্পনায় ফাউন্ট আর ওথেলোর নৃত্যরূপ দেওয়া হবে। শিশুচর্চা করতে করতেই এ নিয়ে দস্তুরমত পড়াশুনো করেছে অঞ্জনা দু-তিনটে স্ক্রিপ্ট তৈরী করেছে। প্রকাশের সঙ্গে বসে আলোচনা করতে চেয়েছে। কিন্তু প্রকাশের সময় হয়নি। ব্যবসা উপলক্ষে আজ বম্বে কাল দিল্লী পরশু মাদ্রাজ করতে করতে বছরের পর বছর ঘুরে গেছে। নিজের ঘরের বড় আয়নার সামনে নাচ প্র্যাকটিশ করতে গিয়ে অঞ্জনা দেখেছে তার দেহ আগের মত পেলব নেই, কোমরেরবেদ কমানো যাচ্ছে না, পা দুটো যেন ছন্দ লয় মেনে চলতে চাইছে না। অনেকবার বলে খবর পাঠিয়েও তবলচিকে পাওয়া যাচ্ছে না। ক্রমশ সব পাওয়া যাবে সব হবে এই আশা করে এতদিন কোনোরকমে দিন কাটিয়েছে অঞ্জনা। স্বামীর নাচের স্কুল আবার চালু হয়েছে নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠানও হতে চলেছে—এই খবর যেদিন পেল সেদিন থেকে সে নাচ প্র্যাকটিশ বন্ধ করে দিল! এ নিয়ে আর স্বামীর সঙ্গে কোনো কথা তুলল না। স্বামীর অনেক অনুরোধেও নাট্যানুষ্ঠান দেখতে গেল না। ক্রমশ মিইয়ে যেতে লাগল। বেড়ানো বন্ধ করল মার্কেটিংও ভাল লাগে না। একদিন নেশার ঘোরে স্বামী তাকে জানিয়ে দিল যে তাদের পরিবারের কোনো বধূ অজস্র লম্পট দৃষ্টির সামনে দেহভঙ্গী দেখাবে—এ তার পিতা কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না। আর পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে স্ত্রীর নাচের মুক্তরোষ পেট চালানোর গ্লানি সে সই করতে পারবে না। নাচের স্কুলের পরিচালক-মণ্ডলীতে অঞ্জনা থাকবে কিন্তু অঞ্জনা কোনো দিন নাচবে না।

অঞ্জনা স্তম্ভিত হয়ে সব শুনল। প্রকাশ চলে গেলে অনেকক্ষণ ধরে ভেবেচিন্তে তারপর নিরঞ্জনকে চিঠি লিখল: নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হলে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে অঞ্জনা খাপছাড়া দু-একটা কথা বলে একখানা চিঠিতে এই সব লিখে ওর হাতে দিল।

নিরঞ্জনকে প্রকাশ বোঝাতে চেষ্টা করল যে সংসার ও সন্তানের স্বার্থে অঞ্জনার এখন আর নাচ-গান থিয়েটার নিয়ে থাকা ঠিক হবে না। নিরঞ্জন না বুঝেও অঞ্জনাকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করল। অঞ্জনা চুপ করে রইল। কোনো কথার উত্তর দিল না। এর কয়েকদিন পরে শুনল বিশিষ্ট বিদেশী অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য শ্যামার অনুষ্ঠান হচ্ছে। শ্যামার ভূমিকায় অঞ্জনা অনবদ্য—একথা অনেকবার প্রকাশের মুখে শুনেছে আর আনন্দ শিহরণে ও আপ্লুত হয়ে গেছে। সেদিন প্রকাশের কাছেই শুনল তার বরস হয়েছে মেদবৃদ্ধি হয়েছে প্র্যাকটিশ নেই। বিদেশী বিশিষ্ট অতিথিদের সামনে তাকে নায়িকার বেশে দাঁড় করানো চলে না। সেই সন্ধ্যা থেকে তার অসুখের সূত্রপাত। অঞ্জনা নিজেকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে কল্পনার রাজ্যে নির্বাসিত করে অপমানের ব্যর্থতার জ্বালা ভুলতে চায়।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

CHAITRA C-29 BEN
কলা খাবে।
ক্রীমে ভরপুর মিল্ক চকলেটে
মোড়া মজাদার ক্যারামেল আর সুস্বাদু
বাদামের পুরের ওপর পুর!

সাময়িকী

বিষ্ণু দে

তবুও তো তুমি এলে, হে পূর্ণ আকাশ!
তুমি এলে এই ঘন-ঘোর-ঘটা বরষায়
সাহারায় ভেজা শ্রাবণে।
ভাবি এ ভাগ্যের গুণে ধৈর্যে ও আশায়
চাতককে ডেকে যাও অশ্রুময় ভরসায়।

জাগাও এবার তুমি, ছড়াও হে নীলকৃষ্ণ কান্তি,
শান্ত হোক দিগ্বিদিক মত্ত হে আকাশ!
আর মাটি স্নিগ্ধ হোক,
রুক্ষ বধূগণ সব পরিণতি পাক, সেই শুষ্ক ক্লান্তি
খুলুক নির্মোক।

আমরা যে পার্থিব, পোষ্য আমাদেরই পৃথিবীর,
গ্রহশান্তি আমাদেরও চাই।
আমরা কেউই নয় পৃথার পোষণে বীর।

হে আকাশ! জল ঢালো স্থিতধী মাটিকে,
নিয়ন্ত্রিত দেশে দেশে দশদিকে বাঁচুক সবাই।।

গোধূলিয়া

উপন্যাস **নিমাই ভট্টাচার্য**

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বছর খানেকের মধ্যে আমাদের বিজিও-ন্যাল অফিসের কাজ অনেক বেড়ে গেল। সুবোধ, বাঁচী আর কাটমাণ্ডুতে সাব-ডিপো খোলা হলো। আমাকে মাসে একবার করে সুবোধের আর বাঁচীর সাব-ডিপো দেখতে যেতে হয়। কাটমাণ্ডু যাই না। মিঃ মুখার্জী ইদানীংকালে প্রত্যেক মাসেই দু-একবার করে কাটমাণ্ডু যাচ্ছেন। একটা বড় কনট্রাকট সম্পর্কে নেপাল সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলছে। আমাদের ম্যানেজিং ডিরেকটর কমল রায়ও দু'বার কাটমাণ্ডু ঘুরে এসেছেন। মিঃ রায়ের এক ছাত্র নেপালের ডেপুটি ডিরেক-টর অফ হেলথ। আবার মিঃ মুখার্জীর এক সহপাঠী আমাদের এম্বাসীতে সেকেণ্ড সেক্রেটারী। সুতরাং ঐ কনট্রাক্ট পাবার সম্ভাবনা আছে এবং ঐ কনট্রাক্ট পেলে কাট-মাণ্ডুতে বদলী করা হবে।

সব মিলিয়ে এত কাজের চাপ বেড়ে গেছে যে আগের মত নিয়ম করে প্রত্যেক মাসে বাংশী যেতে পারছি না। আবার মাঘে পরপর দু'মাস ঠিক গিয়েছিলাম কিন্তু মার্চে কিছুতেই সময় হল না।

বাঁচী থেকে বিকেলবেলার দিকে ফির-লাম। নান করে চা-টা খাবার পর মিঃ মুখার্জী আমার হাতে একটা টেলিগ্রাম দিয়ে বললেন, আপনার পিসীমা খুব অসুস্থ। খাওয়া-দাওয়া করেই তুফানে রওনা হয়ে যান। টেলিগ্রামটা খুলে দেখি দেবী পাঠিয়েছে। সেদিনই সকাল সাড়ে এগারটায় টেলিগ্রাম করেছে দেখে বুঝলাম, সকালের দিকেই কিছু হয়েছে। মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল। পাথরের মূর্তির মত চুপ করে চেয়ারে বসে রইলাম। বেশ কিছুক্ষণ। দু' ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়তেই মিঃ মুখার্জী বললেন, এত আপসেট হবেন না। অসুখ করেছে, সেরে যাবে। আপনি খেয়ে তৈরী হয়ে নিন।

ষ্টেশনে রওনা হবার আগে মিঃ মুখার্জী আমার হাতে একশ টাকার পাঁচটা নোট দিয়ে বললেন রেখে দিন। দরকার হতে পারে। তাছাড়া আমি বাড়েই পপুলার ফার্মেসীর মিশ্রকে ফোন করে বলে দিচ্ছি। সুতরাং বিশু চিন্তা করবেন না।

তুফান একসপ্রেস তিন ঘন্টা লেট করে পাটনা এলো। মোকামাঘাট পৌঁছলাম একে বারে রাত শেষ করে পৌনে চারটের সময়। বেনিয়াবাগের বাস ছাড়ল সাড়ে চারটেয়। রামকৃষ্ণ হাসপাতালে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় ছটা হয়ে গেল। আমি ছোট্ট সুটকেশটা হাতে করে বারান্দা দিয়ে এগুচ্ছিলাম। হঠাৎ পাশের একটা ঘর থেকে দেবী ছুটে বেরিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরেই হাউ-হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললো, সোনা, পিসী চলে গেছে।

আমার হাত থেকে সুটকেশটা পড়ে গেল।

সোনা, দিদি চলে গেছে, পিসীও চলে গেল। এবার আমার কি হবে?

আমারও চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছিল না। তবু কোন মতে বললাম, আমি ত আছি।

তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই সোনা। তুমি চলে গেলে আমি আর বাঁচব না, কিছুতেই বাঁচব না।

জীবনে কোন দিন এরকম বিপদের মুখোমুখি হইনি। প্রথমে বড্ড ঘাবড়ে গেলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিশ্রজীর সাহায্যে সবকিছুই ভালয় ভালয় মিটে গেল।

শ্রাদ্ধের পর দিন সারদা পিসীকে দেবীর কাছে রেখে আমি পাটনা রওনা হলাম। আসার আগে বলে এলাম বউ অফিসের সব কিছুই ত তুমি জানো। তাই আর দেরী করতে পারছি না। তবে কাজের চাপ কমলেই মাস খানেকের ছুটি নেবার চেষ্টা করব।

দেবী বললো, মাস খানেকের জন্য না পারলে অন্তত দিন দশ-পনেরর জন্য নিশ্চয়ই আসার চেষ্টা করো।

মে মাসে একদিনের জন্যও কাশী যেতে পারলাম না। জুনের প্রথমেই নেপাল গভর্ণমেণ্টের কনট্রাক্ট আমরা পেলাম। এক সপ্তাহ দিন রাত খেটে মালের ইনকুইজিশন অর্ডার সেন্ট্রাল ডিপোতে পাঠিয়ে দিয়েই আমিও মিঃ মুখার্জীর সঙ্গে কাঠমণ্ডু রওনা হলাম।

কাটমাণ্ডুতে পৌঁছেই দেবীকে চিঠি দিলাম আগামী তিন-চার দিনের মধ্যেই কলকাতা থেকে লরী এসে পৌঁছবে। ঢ' লরী মাল ঠিক মত ষ্টোর করে রাখতেই আরো চার-পাঁচ দিন। ষ্টোরকিপারকে বুঝিয়ে দিতেও কয়েক দিন সময় লাগবে। তারপর এখান থেকে আমার ছুটি। তবে মিঃ মুখার্জী আমাকে সোজা প্লেনে বেনারস যেতে বলেছেন কিন্তু এক সপ্তাহের বেশী কিছুতেই থাকতে পারব না।

কয়েক দিন পরেই জবাব পেলাম। সোনা, তুমি সারা দিন কত কাজে ব্যস্ত থাক। রাত্তিতে রাত্তিরে ঘুমোও আর আমি? আমার শুধু একটাই কাজ। শুধু তোমার কথা ভাবা। দিনরাত্তির তোমার কথা ভাবি। ভাবি তুমি কত পরিশ্রম করছ নিশ্চয়ই ঠিক মত খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে না

অন্তিম উক্তি

"বিশ্বে এমন কোন মনীষী নেই যাঁর নির্দেশে আবার আমি কলম চালাব; অর্থের এমন কোন অংক নেই যার প্রলোভন-বশবর্তী হয়ে আবার আমি কলম চালাতে পারি। ইচ্ছা-মৃত্যু ঘোষণা তাঁর পবিত্র পারলৌকিক আদেশ— এবং, আমি মনে করি, উনি চান না যে কেবল নাম ভাঙিয়ে আমিও চিরাচরিত পদ্ধতিতে জ্ঞান-পিপাসু সাধারণ মানুষকে নিয়তই প্রতারিত করি।

আমার মৌলিকতা শেষ, লেখার ক্ষেত্রে বেঁচে থাকব কেন? পাঁচ বছরের আংশিক সময়ে প্রয়োজন-ভিত্তিক অনেক লিখেছি, আর লিখবই বা কেন? পরবর্তী সেবকরা মায়ের (ভারতবর্ষের) সেবার সুযোগ যথাযথ যা-তে পান সেটা দেখতে হবে না?"

—শ্বেতকেউটে—

৩১-১-৭৫

শ্বেতকেউটে রচিত ও শ্বেতকেউটে পাবলিশিং কনসার্ণ কর্তৃক প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তক অবিলম্বে সংগ্রহ করুন ও ২৭।৪৫, কে এন নস্কর রোড, টালিগঞ্জ, কলিকাতা—৪০, এই ঠিকানায় সঠিক মতামত পাঠান। —প্রকাশক—

কিন্তু আমি এমনই দুর্ভাগা যে তোমার জন্য কিছুই করতে পারছি না। পারব না।

দীর্ঘ চিঠির শেষে লিখেছে এখানে বেশ বর্ষা নেমেছে। এখন গঙ্গার চেহারা দেখলে তোমার ভয় করবে। দশাশ্বমেধ ঘাটের প্রায় সব সিঁড়ি জলের তলায়।

আমি যখন গেলাম তখন গঙ্গার মূর্তি আরো ভয়াবহ। সব সিঁড়ি জলের তলায়। বেশী বৃষ্টি হলেই গঙ্গার জল রাস্তায় উঠছে। অসী ঘাটের দিকে বহু গলি বহু বাড়ীতে গঙ্গার জল থৈ থৈ করছে। মাঝে মাঝে কলের জল আসছে না। অনেক সময় কল দিয়েও ভাল জল আসছে না। প্রায় প্রতি বাড়ীতেই ডিসেন্ট্রি শুরু হয়েছে। পাটনা রওনা হবার দিন বার বার করে সাবধান পিসী আর দেবীকে বললাম জল না ফুটিয়ে খেও না। আর দরকার হলে মিশ্রজীকে খবর দিও। প্রয়োজন হলে ওকে ট্রাঙ্ক কল করে আমাকে খবর দিতে বলো।

দেবী হেসে বললো বুড়োদের মত শুধু উপদেশ দিও না। তুমিও সাবধানে থেকো।

পাটনা এসে জানলাম মিঃ মুখার্জীকে আরো মাস খানেক নেপালে থাকতে হবে। উনি না থাকায় আমার কাজের চাপ আরো বাড়ল। এরই মধ্যে মিঃ মুখার্জীর নির্দেশে রাঁচী ও মুঙ্গের ঘুরে এলাম। মুঙ্গের থেকে ফিরে আসার দিনই শুনলাম কাটমান্ডু থেকে মিঃ মুখার্জি ফোন করে অন্যান্য কথা বলার পর বলেছেন সোমবার সকালের প্লেনে আমাকে আবার কাটমান্ডু যেতে হবে। আমার টিকিট কাটাও হয়ে গেছে। কাশী থেকে ফেরার সপ্তাহ খানেক পরে দেবীর চিঠি পেয়েছিলাম। তারপর আর কোন চিঠি পাই নি। তাই কাটমান্ডু রওনা হবার আগের শনিবার দেবীকে এক দীর্ঘ চিঠি লিখলাম।

আটটায় এয়ার পোর্ট পৌঁছতে হবে বলে পাঁচটায় এ্যালার্ম দিয়েছিলাম। এ্যালার্ম বাজার সঙ্গে সঙ্গেই মিসেস মুখার্জী উপর থেকে নীচে নেমে এসে আমাকে বললেন কে যেন বেল বাজালেন। বারান্দা থেকে একটা রিকসা দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। বোধহয় কেউ এসেছেন।

আমি দরজা খুলেই অবাক, তুমি !

দেবী জবাব দেবার আগেই আমাকে প্রণাম করল।

মিসেস মুখার্জী আমার পিছনে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা করলেন ইনি কে প্রদীপবাবু?

আমার স্ত্রী দেবী।

মিসেস মুখার্জী সঙ্গে সঙ্গে বললেন এমন স্ত্রী ছেড়ে একলা একলা থাকেন কি করে?

জানদা ঠিকই বলেছিলেন। দেবী আমাকে পেল না। বাঙ্গালী টোলায় কলেরা শুরু হবার পরও দেবী ঠিক ছিল কিন্তু সাবদা পিসীর কলেরায় মারা যাবার পর ও আর থাকতে পারল না। ভয়ে আতঙ্কে আমার কাছে পালিয়ে এলো। আমি অফিসের সময় এয়ার পোর্ট রওনা হয়ে গেলাম। মিসেস মুখার্জী বললেন আমি যখন আছি তখন কোন চিন্তা নেই। তাছাড়া আপনি পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই ফিরে আসছেন।

আমি বললাম তাই ত কথা আছে।

পরের দিন বিকেলেই মিঃ মুখার্জি আমার হাতে পাটনা ফেরার টিকিট দিতেই আমি অবাক। উনি একটু গম্ভীর হয়েই বললেন প্রদীপবাবু আজকে ফিরে যাবার কোন নেই। আপনি কালই চলে যান।

কেন স্যার?

মিঃ মুখার্জী হঠাৎ ব্যস্ততার ভান করে উঠে গেলেন।

দেবী কেমন অবিশ্বাস্যভাবে অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার জীবনে এসেছিল ঠিক তেমন-ভাবেই চলে গেল।

পরের বছর আগেকার কথা কিন্তু এখনও আমি বাঙ্গালী টোলার গলিতে গোধূলিবার মোড়ে হরসুন্দরীর ধর্মশালা ঘুরে বেড়াই। ওকে খুঁজি। পাই না। কোনদিন পাব না। দশাশ্বমেধ ঘাটে একা বসে বসে কাঁদি। দিল্লী ফিরে যাই কলকাতা চলে যাই কিন্তু আবার আসি। বার বার আসি।

সেই ভোর পাঁচটায় ডিলাক্স একস-প্রেসে বেনারস ক্যান্টনমেন্টে নেমেছি। সকাল-দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। এখনও আমি ঘুরছি। না ঘুরে পারছি না। ভেবে-ছিলাম ঢুকব না তবু হরসুন্দরী ধর্মশালায় ঢুকলাম। একতলার সেই কোনার ঘরে বসে কিছুক্ষণ কাঁদলাম। কাঁদতে কাঁদতেই বললাম মাগো তুমি নেই পিসী নেই দেবী নেই আমি কাকে নিয়ে কিভাবে বাঁচব বলতে পারো? আমাকে কাছে টেনে নিতে পারছ না? আমাকে এভাবে দুঃখ দিতে তোমাদের কষ্ট হচ্ছে না?

হঠাৎ কে যেন আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন কাঁদবেন না। এবার বাড়ী যান। সন্ধ্যে হয়ে এল।

আমি উঠলাম। আস্তে আস্তে ধীর পদক্ষেপে বাইরের রাস্তায় বেরুতেই চমকে উঠলাম।

প্রদীপদা, আপনি ?

আলপনাকে দেখে আমিও অবাক। জিজ্ঞাসা করলাম আপনি এখানে?

আমি এখানেই থাকি।

তাই নাকি? আপনার শ্বশুরবাড়ী এখানে?

আলপনা শুধু বললো না।

আপনার মা বলপনা...

মা বহুদিন মারা গিয়েছেন। কল্পনা সংসার করছে। এবার আমাকে জিজ্ঞাসা করল আপনি কবে এখানে এসেছেন?

আজ ভোর পাঁচটায়।

কোথায় উঠেছেন?

আমি কোন জবাব না দিয়ে মুখ নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

খাওয়া-দাওয়াও নিশ্চয় হয় নি?

আমি একথারও কোন জবাব দিলাম না।

চলুন আমার সঙ্গে।

কোথায়?

আমার বাসায়।

না না আপনার শ্বশুর বাড়ী..

ভয় নেই। আমি বিয়ে করি নি।

বিয়ে করেন নি?

ও একটু হাসল। কোন কথা বলল না।

আমি বললাম এই পৃথিবীতে কিছু কীট-পতঙ্গ আছে যারা শুধু অন্যকে দংশন করতেই জানে। আমিও ঠিক সেই রকম একটা...

আপনি কাউকেই দংশন করেন নি; বরং আপনি নিজেই..। ও কথাটা শেষ না করেই বললো যাক গে ওসব। আপনি চলুন।

কিন্তু...

আমার কাছে খাওয়া-দাওয়া করলে দেবী-দির আত্মা কষ্ট পাবে না বরং শান্তি পাবে।

আমি আর কোন কথা না বলে ওর সঙ্গে রিকসায় চড়লাম।

শিবালয়ে তিন তলায় ছোট ছোট দুখানা ঘর বাথরুমে যাবার সময় ভিতরের ঘরে ওর টেবিলে দেবীর একটা ফটো চন্দন দিয়ে সাজান দেখে থমকে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ চুপ করে ফটোটার দিকে তাকিয়ে থাকার পর বললাম আপনাকে ও সত্যি খুব ভালবাসত।

আলপনা কিছু বলল না।

আপনি ত ওকে নিয়মিত চিঠি লিখতেন তাই না?

আমি লিখতাম কিন্তু নিয়মিত নয়। দেবীদি খুব রেগুলারলি চিঠি দিতেন।

ওর শেষ চিঠি কবে পেয়েছিলেন?

দেবীদির মৃত্যুর দু-তিন দিন আগে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

কি লিখেছিল?

আলপনা কোন কথা না বলে টেবিলের ড্রয়ার থেকে চিঠিটা বের করে আমার হাতে দিয়ে বললো, পড়ুন।

ভাই আলপনা তোমাকে অনেক কথাই লিখি কিন্তু একটা জরুরী কথা লিখতেই সব সময় ভুলে যাই। সেই কথাটা লেখার লেখার জন্যই তোমাকে এই চিঠি লিখছি, তোমার প্রদীপদার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না হতে পারে না কিন্তু আমার জীবিত অবস্থায় সে টোপর মাথায় দিয়ে তোমার গলায় মালা দেবে তা আমি সহ্য করতে পারব না। তবে যদি কোনদিন আমি না থাকি তাহলে তুমি নিশ্চয়ই ওর দায়িত্ব নেবে। এ দায়িত্ব আমি আর কাউকে দিয়ে মরবার পরও শান্তি পাব না। তোমার প্রদীপদা বড় দুঃখী বড় নিঃসঙ্গ। জীবনে কোনদিন সুখ পেল না। আমিও ওকে সুখী করতে পারলাম না। আমার অবর্তমানে তুমি ওকে সুখী করবেই। করতেই হবে।

আমি স্তব্ধ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

(শেষ)

সাহিত্যের নেপথ্যে

সূর্যকুমার ব্যানার্জী

বর্তমানে বেশীর ভাগ প্রকাশক বই ফিরি, বইয়ের দোকানে চাকরী করতে করতে এ লাইনে এসেছেন, আমি একেবারে বিপরীত মেরু থেকে এসেছি। সোজা শিক্ষকতা থেকে, না বুঝতাম প্রেস বা ব্যবসা। মূলধন ছিল একটা যার নাম সততা। ওই একটি মূলধনে আজো আমার বই প্রকাশন সংস্থা চলছে।

ব্যানার্জী পাবলিশারস

বাজারে চালু উপন্যাস গল্প কবিতার প্রকাশকদের সিরিজে হঠাৎ দুম্ করে আচমকা উঠে আসা এমন একটা নাম দেখে খানিকটা অবাকই হয়ে যাবার মতোই ব্যাপার। কিন্তু পঞ্চরঞ্জনের গোড়ায় একটু নুন থাকে, তা নাহলে সব বাসনাই যেন বিস্বাদ হয়ে যায়। ব্যানার্জি পাবলিশারের প্রসঙ্গ মানে সেই গোড়ার কথা বলা, অর্থাৎ শিক্ষার কথা। অর্থাৎ দর্শনের কথা মানে স্কুল থেকে কলেজ কলেজ থেকে উচ্চতর শিক্ষার গোড়ার ছিতের কথা, যা থেকে সব শুরু। কি সাহিত্য, কি কবিতা কি ছোট-গল্প।

তাই একটু মুখ পাল্টানোর প্রয়োজন হয়ে পড়লো।

অনেক, অ-নে-ক দিনের আগের কথা তখন আমি একটা মাসিক পত্রের সম্পাদনায় আছি। পত্রিকাটির ছাপার কাজ হোতো কলেজ স্ট্রীটের নিউ মহামায়া প্রেস থেকে, হুড়হাড় দুদ্দাড় একতলা থেকে তিনতলা কাজ ছুটাছুটির মধ্যে তখন দেখতাম—এক ভদ্রলোক সাদা ধুতি পাঞ্জাবী পরে অত্যন্ত ধীর স্থির হয়ে মালিক অবনী মামার সঙ্গে কথা বলে কখন টুক্ করে নেমে পড়তেন। তখনই জানতাম ভদ্রলোক 'ব্যানার্জি' বলে একটা বইয়ের দোকান করেছেন। অল্পসল্প ব্যাপার। ভদ্রলোকের সঙ্গে খুব একটা কথা না হলেও প্রায় মুখ চেনা হয়ে গিয়েছিল। আজ হঠাৎ দশ বছর বাদে বাস্ত 'ব্যানার্জি'তে ঢুকতেই ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে ভাবলেন—বোধহয় প্রেস সংক্রান্ত কোনো কাজে বা আলোচনা করতে এসেছি! দুজনেই দুজনের মুখে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠলাম —আপনি অমুক না?

আমি বললুম—হ্যাঁ, আমি এখন শান্ডিল্য। মানে শান্ডিল্য চতুর্বেদী।

—পদবী পালটালেন কবে?

ঃ এই কিছুদিন হোল ঃ এফিডেফিট করে।

—তা কদ্দিন হোলো?

ঃ মাস ছয়েক হবে।

সূর্য বাবু অর্থাৎ ব্যানার্জি পাবলিশারের মালিক সূর্যকুমার ব্যানার্জির চেহারা ঠিক একইরকম আছে। সেই ধুতি সেইরকম পাঞ্জাবী এক চশমার ফ্রেম। তবু পাল্টেছেন। সে পাল্টে যাওয়ার ঘটনাটা একটু বলি। সেই গোড়ার গল্প। আগরপাড়া কলোনীর প্রাইমারী স্কুল টিচারের গল্প।

পূববাংলা থেকে বাস্তুচ্যুত অনেকেই এসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছেন দমদম বারাসত ব্যারাকপুর যাদবপুর আগরপাড়ায়। রাতারাতি গড়ে উঠছে কলোনী। গড়ে উঠছে বন কেটে বসত। সূর্যবাবুরাও তাঁদের কলোনীটাকে সব দিক থেকেই মজবুত করে তুললেন—গড়ে উঠলো স্কুল। স্কুল তৈরী হোলো, কিন্তু তাকে এড়িয়ে আর চলে আসা হোলো না। ওই স্কুলেই মাস্টারী নিতে হোলো। বেতন বেসিক—৩৫ ডি-এ ৮ আর এ্যালাউন্স ১৫ টাকা মানে সর্বসাকুল্যে ৫৪ টাকার মতো। এই নিয়েই চলছিলো সূর্যবাবুর সুখ দুঃখের জীবন। স্কুল, মাস্টার হতে হতে একদিন ফুরিয়ে যাওয়া, আর দশজনের মতোই এই ঘটনা ঘটারই ১০০ ভাগ উচিত ছিল। কিন্তু রাখে হরি মারে কে। হরি তখন সূর্যবাবুকে অন্য খাতে ছকে ফেলেছেন। আগরপাড়া মহাজাতি বিদ্যালয়ের মাস্টারমশাই হঠাৎ ভেবে বসলেন বাচ্চাদের বই একটা লেখা করলে কেমন হয়। বন্ধুবান্ধবেরা উৎসাহ দিলেন। উৎসাহের চোটে একটা বই লিখে ফেললেন সূর্যবাবু। নাম হোলো ঃ 'আমাদের ইতিহাস' তৃতীয় শ্রেণীর একটা পাঠ্য বই। বই তো লেখা হোলো কিন্তু ছাপানো হবে কি করে? টাকা কোথায়? আর টাকা জোগাড় করলেই তো হোলো না এ ব্যাপারে পুরো আনাড়ি একটা মানুষ কিভাবে গোটা ব্যাপারটা গুছিয়ে তুলবেন সেটাই বড়ো প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ালো। আমি আগেই বলেছি 'রাখে হরি.....' সুতরাং হরিই রাখলেন। পার্টটাইম বীমার এজেন্সীর ব্যবসা ছিল সেখান থেকে শ' আটেক কাচিয়ে কুচিয়ে কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় ঢুঁ মারলেন সূর্যবাবু। ব্যবসার 'ব' জানেন না। প্রেসের 'প' জানেন না বাড়ির নম্বরের ন জানেন না। তবু বপন হোলো বীজ। বই বেরুলো। আশ্চর্য স্কুল বাজার বইটা নিয়ে নিল। ওই বছরেই আবার বেরুলো সূর্য-বাবুর ক্লাস ফোরের একটা বই। প্রায় কপর্দকহীন অবস্থায় যে মানুষটি এলেন এক বছরেই তাঁর ক্যাপিটাল হয়ে গেল। কিন্তু আসল ক্যাপিটাল ছিল সততা। সে সময়ে কাগজে একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, লিখে-ছিলেন ইউনাইটেড ল্যাম্প অফ ইন্ডিয়ার তখনকার সর্বেসর্বা শীতল মশাই। আলো-চনাটার এক জায়গায় উনি বলেছিলেন—যে বাঙ্গালী মূলধন নেই, মূলধন নেই বলেন কিন্তু আসল মূলধন হোলো সততা এটুকু থাকলেই ব্যবসা ফেল যায় কোনো কিছুর জন্যে আটকায় না, আর অর্থের তো নয়ই। কথাটা খুব মনে লেগেছিল সূর্যবাবুর।

১৯৫৫য় সত্যিকারের ব্যবসায় নামলেন প্রাথমিক পর্যায়ে বই বেরুলো। এবং একটু অবাক করে নতুন এই প্রকাশকের বই সরকারী স্বীকৃতি লাভ করলো। সূর্যবাবু তখন একধারে লেখক, প্রুফবীডার প্রেসে দেখাশোনা, তারপর বই বেরুলে আগরপাড়া নিয়ে গিয়ে নিজে হাতে প্যাক করে চালা লিখে এজেন্টের ঘরে পৌঁছে দেওয়া নিজের তো আর দোকান নেই। পি এন রু কোম্পানি ছিলেন ব্যানার্জির এজেন্ট।

এক টিপ নস্যি নিলেন সূর্যবাবু

আমি যখনই দেখেছি ঐ একটা জবরদস্ত নে আছে।

—বিশ্বাস করুন। ঐ সততাই সত্যি আমার আসল ক্যাপিটাল হয়ে দাঁড়ালো। স্ট্যান্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং করে দিতে লাগলেন ব্লক. ভোলানাথ পেপার হাউস দিলেন কাগজ আর অকুণ্ঠ সহযোগিতা করলেন নিউ মহামায়া প্রেসের কর্ণধার—অবনী মান্না। সবাই বিশ্বাস করলেন মুখের কথা, এবং আমার ছিল সততা। দেখলাম সত্যিই সে অর্থে ক্যাপিটাল দরকার হোলো না। রমানাথ মজুমদার স্ট্রীটে ততদিনে ছোট একটা ঘর নেবার ক্ষমতা হয়েছে। সেখান থেকেই এবার ব্যবসা চলতে লাগলো। ৯৯৫৬র উঠে এলেন—এই কলেজ রোতে।

বুঝলেন, ব্যাঙাল তো গোড়া থেকেই একটু একগুঁয়ে ছিলাম, অর্থাৎ বেটা করবো ভাবতাম সেটাই নাকরা পর্যন্ত ছাড়া নেই। যেমন ধরুন, যে-বই বাজারে চালু নয় সে বই প্রকাশের দিকে আমার ঝোঁক গেলো বেশী। আরেকটা কথা না বললে ব্যাপারটা পুরো হয় না, যে প্রায় সব প্রকাশকেরাই বাজার দর বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বইয়ের দরও বাড়িয়ে দেন, কিন্তু আমি কখনো তা করিনি, হয়তো সেজন্যে কিছু টাকার ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে কিন্তু নিজের সততাটুকু বজায় রাখতে পেরেছি।

প্রথম শ্রেণীর বই বানু দেবী আর সূর্যবাবু থেকে যা শুরু ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ছাড়িয়ে প্রি ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি, অনার্স পোস্ট গ্রাজুয়েট, বি-টি বি-এড বেসিক ট্রেনিং নিয়ে প্রায় ঝপাঝপ ৫০টা বই বেরিয়ে গেল।

ব্যানার্জির গবেষ কিছু বই আছে—যা শুধু পশ্চিম বাংলা নয় বাংলাদেশ ত্রিপুরায় প্রায় একচেটিয়া কারবার করছে—তা হল অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্তের ভারতীয় ও উপনিষদ) পাশ্চাত্ত্য দর্শন; পাশ্চাত্ত্য দর্শন (দর্শনের ইতিহাস সহ); পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (বেকন—হিউম) কান্ট ধর্মদর্শন Philosophy of Religion এছাড়া বাংলা সাহিত্যের ওপর ডঃ হরিপদ চক্রবর্তীর কুলীন কুলসর্বস্ব আর ডঃ সত্যপ্রসন্ন সেনগুপ্তের পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সমালোচনার ধারা।

একটা জিনিষ দেখা যাচ্ছে একা প্রমোদবাবুই টেনে নিয়ে গেছেন ব্যানার্জিকে! এই প্রমোদবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন শিল্পী জিতেন সেনগুপ্ত। আমরা প্রথমেই সাড়া পেলাম উচ্চ মাধ্যমিক তর্কশাস্ত্রে ১৯৬১ সালে সারা বাংলায় প্রথম প্রচার হোলো।

জানি না অন্যান্য প্রকাশকরা কি করেন, কিন্তু আমরা যা করি তা খানিকটা কষ্টকর ব্যাপার। ধরুন পাশ্চাত্ত্য দর্শন মানে কান্টের দর্শনের বইয়ের সত্যি অভাব ছিল। অতবড় একটা দুরূহ সাবজেকট—সহজে সরল সাবলীল ভাষায় লেখা চাট্টিখানি কথা নয়। বিশ্বাস করবেন? তিন-তিনবার ভদ্রলোক বইটা পুরো লিখেছেন। এভাবে কোনো প্রকাশক সময় আর অর্থ অপচয় করে। কিন্তু আমরা এটাকে অপচয় বলি না। আমরা জানি এটাই আমাদের সাফল্যের চাবিকাঠি। যার জন্যে আমাদের বইয়ের প্রচার সংখ্যা এত বেশী।

আরেকটা কথা শুনলে আপনারা অবাক হবেন। বই বেরুবার পর আমরা বিভিন্ন অধ্যাপকের কাছে গিয়ে কপি দিয়ে আসি এবং বলি আপনাদের ভালো হয়েছে বলতে হবে না, কোথায় কোথায় ত্রুটি হয়েছে বলুন, শুধু লাইন দেগে যান। ত্রুটি বেরিয়েছে, এবং পরবর্তী সংস্করণে সে ত্রুটি সংশোধন করে নতুন আদলে বেরিয়েছে। আমাদের ব্যবসার পথটাই হোলো এই।

অবাক হয়ে দেখলাম প্রচুর পরিশ্রম করে একেকটা বই লেখা হয়েছে। ধরা যাক—কান্টের দর্শনের কথা। বাংলা ভাষায় কান্টের দর্শনকে পরিবেশন করা সত্যি দুরূহ ব্যাপার। কান্ট তত্ত্ব সব সময় এক মানে বহন করেন নি। আগেকার যা ভাবনা বা অভিজ্ঞতা সে ক্ষেত্রে বুদ্ধির ক্ষমতার অনুসন্ধানের কাজ হোলো বিচারমূলক দর্শন যার নাম ক্রিটিকাল ফিলসফি।

কান্ট তাঁর রিলিজিঅন উইথইন দি লিমিটস অফ পিওর রিজন-এর যে জায়গায় বলছেন—দ্যাখো বাপু খৃস্টধর্মকে মানো নিজেকে পাল্টাও ঠিক আছে, কিন্তু ধর্মটাকে যে অন্ধভাবে মানতে হবে এর কোনো মানে নেই। যীশুকে বিশ্বাস করার মানে হোলো—ভগবানের কাছে মানুষ প্রীতিকর প্রকৃতির যে শ্রেষ্ঠ আদর্শ তাকে উপলব্ধি করার জন্যে সংকল্প করা। এই আদর্শ কোনো বাস্তব মানুষের মধ্যে দিয়ে নাজারাথ-এর যীশুর ভেতর দিয়ে জগতে প্রকাশ লাভ করেছে—এ বিশ্বাস করা উচিত নয়। যে আদর্শ তিনি বহন করছেন তাঁর আদর্শে নিজেকে পরিশীলিত করাই হোলো যথার্থ বিশ্বাস। কান্টের নানা মত অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় লিখেছেন প্রমোদবাবু। রেফারেন্স বই চষে ফেলতে হয়েছে। রাইট থেকে শুরু করে তারকনাথ রায়, রাসবিহারী দাশ কাউকে বাদ দেননি। শুধু কান্ট, বেকন, হিউম নয়। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-এ বেকন, হবস, দেকার্ত, স্পিনোজা, লক, বার্কলে, লাইবনিজ, হিউমের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, যা পড়ে পাশ্চাত্ত্য দর্শন সম্বন্ধে একটা সুন্দর এবং ব্যাপক ধারণা গড়ে উঠবে। এ প্রসঙ্গে ধর্ম-দর্শন একটি মূল্যবান সংগ্রহ হিসেবে থাকতে পারে। এই তথ্যবহুল বইটি অবশ্য কলকাতা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ছাত্রছাত্রীদের জন্যে লেখা। আমার খুব অবাক লেগেছে, এত সহজ সরল ভাষায় বিচার করা হয়েছে যা ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখার মতো বই।

আবার ঘুরে আসি সেই আগরপাড়ার মহাজাতি স্কুলে। না, সেখানে আর নেই, অনেকদিন হোলো তা ছাড়তে হয়েছে। ছাড়তে হয়েছে আগরপাড়া কলেজ রোড জমজমাট দোকানে ৭-৮ জন কর্মচারী, পাশে ব্যস্ত ফোন। পানিহাটিতে বাড়ি করেছেন। নীলরংয়ের এ্যামবাসাডার। নিশ্চিন্ত সংসার।

কিন্তু সূর্যবাবু পাল্টায়নি।

মনে রেখেছেন, অবনীবাবুকে। প্রেসের দুঃসময়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, দুবার স্ট্রোক হয়ে যাওয়া প্রেসের এই মানুষটিকে চেষ্টা করেছেন আন্তরিক সাহায্য করার ছেলেটিকে হেতমপুর কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। ভোলেন নি, এনগ্রেভিং আর ভোলানাথকে।

ভোলা তো এক মুহূর্তে যায়। মনে রাখে ক'জন?

শাণ্ডিল্য চতুর্বেদী

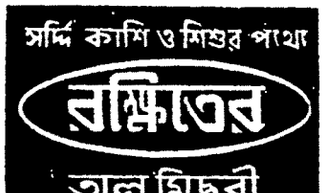

শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত কথা বলেন ভীষণ আস্তে। ধীরে। সেই কথার স্বরে একটা দুঃখ আছে, বিষণ্ণতা আছে। সেই দুঃখ, ব্যথা এবং বাধা কিন্তু তাঁকে কাবু করতে পারেনি। লড়ে, সব কিছু সমস্যা বাধা হটিয়ে তিনি আজ দাঁড়িয়েছেন। যে দাঁড়ানোর মধ্যে সংগ্রাম আছে, কৃতিত্ব আছে। গলার স্বরটা যেন আরো আস্তে হয়ে গেল। কিছুটা হয়তবা কাঁপা কাঁপা। রবীন্দ্র দত্ত পৌঁছিয়ে গেলেন আজ থেকে ১৫।১৬ বছর আগের কথায়।

"যখনকার কথা বলছি, তখনও বহু যৌথ পরিবারগুলো বেশ ভালোভাবেই টিঁকে আছে। উদাহরণস্বরূপ, শহরের বুকে তখনকার দিনে বড় বড় দু'-তিনটি পরিবারের নাম করতে পারি। যেমন, বটকৃষ্ণ পাল, কে এন মুখার্জি, বাঁকুলিয়া হাউস প্রভৃতি। এরকম বড় বড় যৌথ পরিবার অনেক ছিল তখন। এই সব পরিবারগুলোর জীবনযাত্রার সব বিষয়েই এক একটা আভিজাত্য ছিল। যেমন ধরুন, অমুক অমুক নামকরা দোকানের মশলা খাওয়াও এক একটি পরিবারের আভিজাত্যের ব্যাপার ছিল। আমার এখনও মনে আছে, মাসান্তে এক এক পরিবার থেকে সরকার কিংবা ঠাকুররা মশলার ফর্দ নিয়ে আসতো দোকানে, তাতে এই ধরনের নমুনা থাকতো। হয়তো ধরুন দু' মণ লঙ্কা, একমণ জিরে মশলা ইত্যাদি। সব মিলিয়ে হয়তো ১০/১২ মণ মশলার

রবীন্দ্রনাথ দত্ত

তালিকা। কিন্তু এ অবস্থা বেশিদিন চলল না। পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক নানা কারণে দেখলাম, আস্তে আস্তে এই যৌথ পরিবারগুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে। টুকরো টুকরো হবে এক একটা ছোটো ছোটো পরিবার সৃষ্টি হচ্ছে। তখনই আমরা আমাদের ব্যবসা সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে আরম্ভ করলাম। এখন কি উপায়? আমরা

বিজ্ঞাপন ও বিচিত্রা

বুঝতে পারলাম, যদি সত্যিকারের সততা এবং নিষ্ঠা নিয়ে আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানের উপর মানুষের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি, তাহলে তাদের খাওয়া-দাওয়া এবং রুচি পরিবর্তনেও অর্থাৎ প্রতিটি পরিবারের 'অভ্যাস' পরিবর্তনেও আমরা সমর্থ হবো। এই ধারণা নিয়েই আমাদের 'ফ্যামিলি মিটিং'য়ে স্থির হলো, বাড়ীর মা বাবা বৌদি কাকা কাকিমা ছোটো বড়ো সকলে মিলেই যথাসাধ্য পরিশ্রম করে একটা নতুন ধরনের পদ্ধতি চালু করবো, সেটা হলো—ছোটো ছোটো প্যাকেটে করে আমরা প্রতিটি বাড়ী বাড়ী মশলা বিক্রি করবো। এইভাবেই আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্ম।"

—আপনারা নিজেরাই গিয়ে বাড়ী বাড়ী বিক্রি করতেন?

—হ্যাঁ অনেকেই যেতেন। আমি নিজেও দ্বারে দ্বারে ঘুরে এই ধরনের মশলা ব্যবহারের উপযোগিতা বিষয়ে মা, দিদি বোনেদের বোঝাতাম।

—সেই প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া কিরকম দেখেছিলেন?

—কেউ কেউ ব্যবহার করতে শুরু করলেন। কেউ কেউ আবার ঠিকভাবে গ্রহণ করলেন না। আসল কথা, বংশ পরম্পরায় চলে আসা 'মশলা বাঁটা'র অভ্যাসটাকে একদিনে তো আর পরিবর্তন করা যায় না!

—সে তো নিশ্চয়ই। আমি বলি।

—অথচ এখন দেখুন, প্রায় অধিকাংশ ঘরেই গুঁড়ো মশলা ব্যবহার করা হচ্ছে।

একটু থেমে রবীনবাবু আবার সময়ের পশ্চাদধাবন করলেন।

"১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে সম্ভবতঃ ১৮ অকটোবর, পূর্বতন নাম বদলিয়ে সম্পূর্ণ নতুনভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এবং ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিমিটেড

(স্পাইস) প্রাইভেট লিমিটেড। মূলতঃ আমারই পরিকল্পনায়, উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই প্রতিষ্ঠান। কালক্রমে আমাদের বিশ্বস্তপূর্ণ সেবায়, নিষ্ঠায় এবং জনসাধারণের শুভেচ্ছায় সে প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়াল পূর্ব ভারতের বৃহত্তম মশলা ব্যবসায়ী। কিন্তু নানা কারণে সেখানে থাকাও আমার সম্ভব হলো না। চোখের জল ফেলে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নিজ স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠা করলাম এই প্রতিষ্ঠান—কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাইভেট লিমিটেড। আমার তৈরি মশলার নাম হলো—ডাটা। আমার সঙ্গে এই কোম্পানীতে অবশ্য আরও একজন পার্টনার আছেন, আমার স্ত্রী শ্রীমতী রমা দত্ত। আপনাদের সকলের শুভেচ্ছায় এগিয়ে চলেছি। ফুড টেকনোলজিস্ট, ফ্যাকটরির কর্মচারী, ম্যানেজার, সেলসম্যান, ক্লার্ক সব মিলিয়ে প্রায় ১৮০ জন কাজ করেন এখানে।'

কোম্পানীর অগ্রগতির অন্যতম মাধ্যম—বিজ্ঞাপন। সে প্রসঙ্গে এলাম। আমার প্রশ্নের উত্তরে রবীনবাবু সোজাসুজি সরলভাবে সত্যি কথাটাই জানালেন—'এ কথাটা খুবই ঠিক যে আমরা এখনও পর্যন্ত আমাদের প্রতিষ্ঠানের কিংবা আমাদের উৎপন্ন দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের ব্যাপ্তিকে গ্রাম বাংলার অনেক জায়গাতেই নিয়ে যেতে পারিনি। আমরা এখনও পর্যন্ত কলকাতা শহর ছাড়াও শহরতলী অঞ্চল এবং নানা জেলার বড় শহরগুলোতেই সীমাবদ্ধ। তবে চেষ্টা চালাচ্ছি, সর্বত্র যাবার। বিজ্ঞাপনের এই ব্যাপক বিস্তৃতির পথে আমাদের সমস্যাও আছে। যেমন, আমাদের সেরকম পর্যাপ্ত অর্থ নেই। দ্বিতীয়তঃ, যেখানে আমার দ্রব্য যায় না, সেখানে বিজ্ঞাপন দিয়ে কি লাভ?

—তাহলে, গ্রাম বাংলার জনজীবনে আপনার দ্রব্য কি সেরকমভাবে ব্যবহার্য হয়ে ওঠেনি?

—না, আসল কথা—গ্রাম বাংলার অনেক জায়গাতে আমরা এখনও পর্যন্ত বিক্রির ব্যবস্থাই করে উঠতে পারিনি।

আজকের দিনে ব্যবসা এবং বিজ্ঞাপন জগতে ভণিতা ঢুকেছে অনেক। ছলচাতুরিও সেখানে অজস্র। সেই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ দত্তের অকপট উক্তি আমায় মুগ্ধ করে।

ফেমিলিয়ারিটি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন এই দুটি জিনিসকে সুন্দরভাবে প্রয়োগ করিয়ে দিয়েছেন বিজ্ঞাপন—কৌশলে। রবীনবাবুর এই সুন্দর সূক্ষ্ম কৌশলটা খুব ভালো লাগল। বিজ্ঞাপনের এই প্রয়োগ পদ্ধতিটাকে আমি 'হ্যাবিট ফর্মেশন' করিয়ে দেওয়ার রীতিতেও ফেলতে পারি। যদিও এই ধরণের ব্যাপারটা দীর্ঘ মেয়াদী। বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। রবীন্দ্র দত্ত ভালোভাবেই জানেন, আজকে পরিবারে যে মেয়েটি পাঁচ কিংবা ছ বছরের, সেই একদিন বড় হবে, পরিবারের কর্ত্রী হবে রান্না করবে। সুতরাং এখন থেকেই যদি সেই শিশু মেয়েটির মনে তাঁর প্রতিষ্ঠানের নাম এবং দ্রব্য সম্পর্কে দাগ কেটে দেওয়া যায়, পরিচিত সম্পর্কে একটা ভালো ছাপ ফেলা যায় এবং কিছু পরিমাণে ব্যবহারে 'অভ্যস্ত' করিয়ে দেওয়া যায় তবে বর্তমানের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতটাও পরিষ্কার হয়ে থাকে। আখেরে ভালো হবে তাতে। এই জিনিস বলতে গিয়ে পদ্ধতিটা কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (কুকমী) কি নিয়েছেন? সবাই জানেন, শিশু মেয়ে প্রায় সকলেই 'রান্না বাটি' খেলতে ভালবাসে। তাই তাঁরা বাচ্চা মেয়েদের খেলার ভঙ্গিতেই বিজ্ঞাপন দেন—'ছোট ছোট বাসন কোসন, চামচ হাঁড়ি-কুড়ি 'ডাটা'র গুঁড়ো মশলা দিয়ে, রান্না ভালই করি। বেশ ভালো বিজ্ঞাপন।' কথাপ্রসঙ্গে রবীনবাবু জানালেন—পশ্চিমবঙ্গে যতগুলো ছোটোদের পত্রিকা আছে, তার প্রায় সবগুলোতেই এই বিজ্ঞাপনটা আমরা দিই।

পত্র-পত্রিকায় 'ডাটা'র অন্যান্য বিজ্ঞাপন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এঁরা প্রচার—মাধ্যম হিসাবে আর যেগুলো বেছে নিয়েছেন, তা হলো—রেডিও সিনেমা স্লাইড হোর্ডিং প্রভৃতি।

সামগ্রিকভাবে খুব বেশি না এগোলেও গ্রাম বাংলায় প্রচার কার্যের ব্যাপারেও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন 'ডাটা' প্রতিষ্ঠান। যাত্রা শিল্প খুবই জনপ্রিয় গ্রাম বাংলায়। গ্রাম বাংলার ছোট ছোট পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার হ্যাণ্ডবিল-এর মাধ্যমেও প্রচার কার্য চালাচ্ছেন।

আনন্দ রায়

রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা

সর্ষের মধ্যেই ভূত ছিল একথা রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিতদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে মাননীয় সুশান্তকুমার মিত্র 'রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা' শিরোনামায় (অমৃত, ২ জুলাই) যে আলোচনাটি করেছেন এবং 'এরপর আর কেউ দ্বিমত করবেন না' মন্তব্যে প্রথম অংশের আলোচনায় ইতি টেনেছেন সে বিষয়ে ভুল না হয়তো বলি—আরম্ভের আগে যেমন থাকে আরম্ভ তেমনি শেষের পরেও থাকে শেষ। প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে আমি রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ তো নই-ই এমনকি পণ্ডিতও নই। সাহিত্যের সাধারণ একজন সেবক মাত্র।

সুশান্তবাবুর 'রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা' আলোচনা প্রবন্ধটির বক্তব্য একটিই—বিভিন্ন পণ্ডিত 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' প্রবন্ধটিকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা বলে চিহ্নিত করেছেন, তা শুধু ভ্রান্তিকর নয়ই, বিভ্রান্তিকর এবং রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গদ্য রচনা—'গ্রহগণ জীবের বাসভূমি।' শুধু তা-ই নয়, 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' রবীন্দ্রনাথের লেখাই নয়।

সুশান্তবাবুর আলোচনাটিতে যদি নিষ্ঠার চিন্তা, গভীর অধ্যয়নের পরিচয় থাকত তবে বক্তব্য প্রকট হোতো তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং লেখাটি যদি ঠাসবুনোনি হোতো তবে বাংলা সাহিত্যে তা স্মরণীয় দলিল হয়ে থাকত। এ যেন নিজ অভিষ্ট সিদ্ধির জন্যে বেছে বেছে ফুল তুলে মাতৃ পূজা কিংবা মালা গাঁথা। এবং এই বেছে ফুল তোলার মধ্যেও কারসাজি চোখে পড়ে। অভিষ্ট ফুলটিকে তুলেছেন ঠিকই, কিন্তু তা-ও আবার অক্ষত অবস্থায় নয়— কিছু পাপড়ি ছিঁড়ে ফেলে। যথাস্থানে আমি তা অবশ্যই দেখাব। এ-যেন 'অগৌরব-এর 'অ' বাদ দিয়ে' 'গৌরব'কে চিহ্নিত করা। অঙ্ক কষার আগে যদি এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে এ অঙ্কের এই ফল করব, তাতে অঙ্কটি ভুল হয়। বরং ঠিক মত অঙ্কটি কষলে যে ফল পাওয়া যাবে সেই অঙ্কটিই শুদ্ধ হয়। আলোচনার সিদ্ধান্তটি আগে থেকে ঠিক করেই তিনি আসরে নেবেছেন। তা যদি প্রমাণ করতে না-ই পারব, তবে এতবড় কথা বলার মত সাহস থাকত না।

প্রসঙ্গত একটা কথা বলা প্রয়োজন। সকলেই যে 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র'কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা বলে মেনে নিয়েছেন, এ ধারণাও ঠিক নয়। বরং 'জ্ঞানাঙ্কুরে' প্রকাশিত পুস্তক সমালোচনা প্রবন্ধটিকেই প্রথম গদ্য প্রবন্ধ বলে সায় দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মতকেই মেনে নিয়েছেন। ডঃ সুকুমার সেনও কোন বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' কিংবা গ্রহগণ জীবের আবাস ভূমি'র নামোল্লেখ পর্যন্ত না করে সাধারণভাবে মত দিলেন—'১২৮৩ সালের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত ভুবনমোহনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী তিনখানি প্রায় সদ্যপ্রকাশিত কবিতা গ্রন্থের সমালোচনাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ বলিয়া সাধারণ ধারণা।' রবীন্দ্রনাথও যে এই প্রবন্ধটিকেই তাঁর প্রথম গদ্য প্রবন্ধ বলে রায় দিয়েছেন তার কারণ সহজেই অনুমেয়। এক—

প্রবন্ধটি স্বনামে প্রকাশিত। দুই—প্রবন্ধটি মৌলিক রচনা। তিন—প্রবন্ধটিতে অন্য কারো কলম চলেনি। সুতরাং এই দিক দিয়ে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক প্রথম গদ্য রচনা এই সমালোচনাটি ছাড়া অন্য কোনটাই হতে পারে না। মাননীয় সুশান্ত-কুমার মিত্র এবং সুধীমণ্ডলী এ বিষয়ে মতামত দিলে নিশ্চিন্ত হই।

আমি এমন একজন প্রবীণকে জানি, যিনি লোক হিসেবে ভালো নন। কিন্তু আমার সন্তানের কোন একটি দুর্ঘটনায় তিনিই যখন আগ্রহী হয়ে সর্বপ্রথম এগিয়ে এলেন এবং আমাকে বহু সাহায্য করলেন (আর্থিক নয়) তখন তাঁর মধ্যে দুটি সত্তা আবিষ্কার করলুম। ঠিক তখনই তাঁর সম্বন্ধে আমার জ্ঞান সঠিক বলে মনে করেছি। ঠিক তদ্রূপ. সজনীকান্ত দাস প্রথমে প্রবন্ধটি সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হতে না পারলেও পরে নানান প্রমাণে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এটা দোষের হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ কিংবা তারাশংকরও সমালোচকদের জন্যেই নিজেদের রচনার কিছু কিছু ত্রুটির বুঝেছিলেন এবং রচনাগুলি সংশোধনও করেছিলেন। এটা দোষের কিংবা গৌরবের?

সুশান্তবাবুর আলোচনা—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস ও ডঃ অমিয়-কুমার মজুমদারের মতামতের বিরুদ্ধে হলেও, সজনীকান্তকে নিয়েই ঘাটাঘাটি করেছেন বেশি। এমন কথা কথা বলিনে যে সজনী-কান্ত সর্বত্রই অভ্রান্ত। বলি এই কথা যে মোহিতলালের পর সজনীকান্তের মতো এত ভয়ংকর সমালোচক বাংলা সাহিত্যে আর কে আছেন আমার জানা নেই। সজনীকান্ত তো রীতিমত শব বিচ্ছেদ করতেন। তছাড়া এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবান্তর মত তিনি দিতেন তা ভাবতেও কষ্ট হয়। সে যা-ই হোক, সজনীকান্ত প্রভাত মুখোপাধ্যায়, ডঃ মজুমদার প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা সম্বন্ধে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং যা রাজমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত সেটাই অধিক-তর যোগ্য বলেই মনে হয়। এবং মাননীয় মিত্র যে মতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন সেটাই মিথ্যাকে সত্যের আসনে বসাবার ব্যর্থ প্রয়াস। মাননীয় মিত্র মহাশয়ের আলোচনা প্রবন্ধের মধ্যে ব্যবহৃত উদ্ধৃতি ও তার মতামতকে ভিত্তি করে এবং অন্যান্য প্রমাণ ও যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করব যে 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' নামে সুদীর্ঘ প্রবন্ধটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা। এবং যে কেউ একটু মনোযোগী হলেই তা প্রমাণ করতে পারবেন বলেই ধারণা আমার। শ্রদ্ধেয় প্রভাতবাবু, অমিয়বাবু এবং অন্যান্য গুণী ব্যক্তিরা কি মত দেন এবং দেন কিনা লক্ষ্যণীয় সেটাই।

আলোচনা প্রসঙ্গে মাননীয় মিত্র বলেছেন —রবীন্দ্র সাহিত্যে এমন অনেক গান বা কবিতা আছে যা রবীন্দ্রনাথ রচনা করেননি, অথচ সেগুলি রবীন্দ্ররচনাবলীর মধ্যে স্থান পেয়েছে সযত্নে, রবীন্দ্র সাহিত্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে।' অনেক গান কিংবা অনেক কবিতা এ ধরনের মন্তব্য না রেখে সেগুলোর নাম উল্লেখ করলে আমরা নিশ্চিন্ত হতুম। এবং যুক্তিতে তা সমর্থনযোগ্য মনে হলে অবশ্যই সেগুলি রবীন্দ্ররচনাবলী থেকে বাদ দেয়া যেত। সেটা শুধু রবীন্দ্রনাথেরই গৌরব হোতো না—গৌরব হোতো আমাদেরও।

'অমৃত' সাপ্তাহিকের ২ জুলাই সংখ্যার ২৫ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের শেষাংশে রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্ব পরিচয়' গ্রন্থের ভূমিকা থেকে তিনি যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা পাকাটি ছেঁড়া ফুল। উদ্ধৃতির সবটা না থাকলে এবং আংশিক থাকলে সত্যাসত্য নির্ণয়ে আরও জট পাকায়। আর তা ছাড়া উদ্ধৃতিতে যে যে অংশ বাদ দিয়েছেন, সব জায়গায় (---)-চিহ্ন নেই কেন? সে যা-ই হোক, উদ্ধৃতিতে যে অংশগুলো বাদ গেছে এবং সেগুলোর মধ্যে যেটা অবশ্যই দেবার প্রয়োজন ছিল তা হোলো—'---শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্বমাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন।' 'ভারত-বর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' প্রবন্ধটির সঙ্গে এই মন্তব্যের মিল যে কত অবশ্যই তা লক্ষ্য করার। এবং এই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যটি সুশান্তবাবু বাদ দিয়েছেন। কেন? এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় অংকের ফল আগে থেকেই ঠিক করে তিনি আসরে নেমেছেন। তাছাড়া যেখানে তিনি উদ্ধৃতি শেষ করেছেন, তার পরের বাকাটি দেয়াও অবশ্য অবশ্য প্রয়োজন ছিল। সেটি হোলো—'স্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা বৈদ্যুতিক সংবাদ নিয়ে।'—রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্ব-ভারতী সংরক্ষণ পঞ্চবিংশখণ্ড, ৩৪৯ পৃষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটিও 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের তার প্রমাণের অনেক সাহায্য করে। এবং 'বিশ্ব-পরিচয়' প্রকাশিত হয় সজনীকান্তের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনার আগে।

'১৭৯৫ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে পরবর্তী ছয় সংখ্যায় ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ-শাস্ত্র নামক একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।' সজনীকান্ত দাসের এই মন্তব্যটি সুশান্তবাবু তুলে দিয়ে মন্তব্য করেছেন—'একথার মধ্যেও তথ্যগত ভুল আছে। প্রবন্ধটি 'জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে পরবর্তী ছয় সংখ্যায়' নয়, পাঁচটি সংখ্যায় এবং তা পরপর নয়, আট মাসের মধ্যে পাঁচটি কিস্তিতে হয়েছিল। (জ্যৈষ্ঠের পর ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক পৌষ ও মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়)। —'অমৃত, ২৬ পৃষ্ঠা।

সুশান্তবাবু বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কি ভাবেন জানিনে এবং সজনীকান্তের টুকরো একটি মন্তব্য তুলে দিয়ে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চান কিনা তা-ও জানা নেই। সজনীকান্ত 'পরপর' কথা ব্যবহার করেননি, এটা সুশান্তবাবুরই সংযোজন। সজনীবাবু বলেছেন 'পরবর্তী' শব্দটি। 'পরবর্তী' অর্থ কি 'পরপর'? 'জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে পরবর্তী ছয় সংখ্যায়' এই বাক্যাংশটি লক্ষণীয়। অর্থাৎ গণনাটা জ্যৈষ্ঠ মাস হইতেই। পাঁচের জায়গায় 'ছয়' বলবেন অর্থাৎ পাঁচ-ছয় জ্ঞান-টুকু সজনীবাবুর ছিল না. এটা হাসিরই উদ্রেক করে। বরং সুশান্তবাবু ভালো করে লক্ষ্য করেননি বলেই তার এ প্রকার ভুল মন্তব্য। তাছাড়া আমার নিজস্ব সংগ্রহশালায় সজনীকান্ত দাসের 'রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য' বইটিও রয়েছে। সেই বইটির ১৯৫ পৃষ্ঠায় সজনীবাবুর ঐ মন্তব্যটির কয়েক লাইন পরেই যা লেখা দেখছি তা জ্ঞাতার্থে তুলে দিচ্ছি—'এই প্রবন্ধের প্রকাশের কাল এইরূপ—১। জ্যৈষ্ঠ (১৭৯৫ শক), পৃঃ ৩০—৩২; ২। আষাঢ়; পৃঃ ৪৪—৪৭; ৩। আশ্বিন, পৃঃ ১২৫—১২৮; ৪। কার্তিক, পৃঃ ১৪২—১৪৮; ৫। পৌষ, পৃঃ ১৮৪—১৮৮; ৬। মাঘ, ২০৪—২০৭। ইহার পরেও 'ক্রমশঃ প্রকাশ্য" লিখিত আছে।" সুতরাং সুশান্তবাবু যে মাস-গুলোর উল্লেখ করেছেন, সজনীবাবু তা আগেই করেছেন, বরং পৃষ্ঠা সংখ্যা দিয়ে একটু বিস্তৃতভাবেই করেছেন। অতএব সজনীবাবু কোন 'তথ্যগত ভুল' করেন নি। এখানে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার প্রবন্ধটির পৃষ্ঠা সংখ্যা স্মরণে রাখা দরকার। একটু পরেই তা আমাদের কাজে লাগবে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অন্যান্য কিস্তির চেয়ে প্রথম কিস্তির আয়তন সবচেয়ে কম।

১৪ বৈশাখ ১৭৯৫ শকাব্দে কিতাব সঙ্গে বক্সেটা শিখরে রবীন্দ্রনাথ এসে পৌঁছান। এবং ১লা জ্যৈষ্ঠ ...১৭৯৫ শকাব্দের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় "ভারত-বর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র" প্রবন্ধটির প্রথম কিস্তি বের হয়। হিসেব মত সময় অল্প সন্দেহ নেই। কিন্তু ১ জ্যৈষ্ঠ তারিখেই যে

"তত্ত্ববোধিনীর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল তার কি কোন প্রমাণ আছে? পত্রিকার উপর ছাপা তারিখ দেখেই সে বিষয়ে সন্দেহ শূন্য হওয়া যায় না। এই "অমৃত" সাপ্তাহিকের কথাই ধরা যাক। পত্রিকা প্রকাশের তারিখ প্রতি শুক্রবার, কিন্তু আমরা তার ৬ দিন আগেই অর্থাৎ গত শনিবার গুলোতেই প্রায়ই পাই। আর মাসিক "কৃত্তিবাস" পাই প্রকাশিত তারিখের দেড়-দু'মাস পরে। সুতরাং এ হিসেবে বিচার অবৈজ্ঞানিক। তা ছাড়া দেবেন্দ্রনাথ বক্রোটা শিখর থেকে রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতিকে যে চিঠিগুলি লেখেন এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে বক্রোটা শিখরে তাঁর কাছে যে চিঠিগুলি সেগুলো ডাকযোগে নিশ্চয়। সুতরাং ডাক ব্যবস্থা শিথিল ছিল না। উড়োজাহাজ থাক কিংবা না থাক। ১৪ বৈশাখ তারিখে লেখা চিঠিটা রাজনারায়ণ বসু কবে পেয়েছিলেন সে খোঁজ কে নেয়? সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি রাতারাতি লেখা হয়নি। হয়েছে কিস্তিতে কিস্তিতে। এবং প্রথম কিস্তির পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র তিন। সুতরাং এই তিন পৃষ্ঠা লিখতে কত সময় লাগতে পারে? এ প্রসঙ্গে স্মরণে রাখা প্রয়োজন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক যখন অক্ষয়-কুমার দত্ত এবং পৃষ্ঠপোষক স্বয়ং দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুর এবং উল্লেখযোগ্য লেখকদের মধ্যে যখন রাজনারায়ণ বসুও একজন তখন ব্রাহ্মসমাজের মুখপাত্র "তত্ত্ববোধিনী"তে রবীন্দ্রনাথের লেখাটি তাড়াতাড়ি প্রকাশিত হওয়া কঠিন ছিল না।

আশ্বিন সংখ্যায় প্রবন্ধটির যে কিস্তি প্রকাশিত হয়েছিল তাতে দেখা যায়, আরবী গ্রন্থ "আরুনুসে অম্বা কি তবকাতুল অত্বা"-তে এ দেশীয় পণ্ডিতদের মতামতের উল্লেখ বর্তমান। আমাদের জানা আছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভালোভাবে শুধু "আরবী পড়তেই জানতেন না, লিখতেও পারতেন। এমত অবস্থায় প্রবন্ধটির মধ্যে এই মতামতের উল্লেখও প্রমাণ করে যে মহর্ষির কথিত বাণীকেই রবীন্দ্রনাথ রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন।

প্রবন্ধটির নাম রবীন্দ্রনাথের স্মরণে না থাকার বহু কারণ হতে পারে। আমার কাছে যা সম্ভাব্য বলে মনে হয়, তা হোলো—(ক) তিনি যে নাম দিয়ে লিখেছিলেন সম্পাদকের কলম তাতে পড়েছে; (খ) তিনি নাম না দিয়েই নাম নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদকের উপর দিয়েছিলেন; (গ) দীর্ঘ বছরের ব্যবধানে বিস্মৃতি, (ঘ) তাড়াতাড়ি লিখতেই পাঠিয়েছিলেন যার ফলে নামটা স্মরণে নেই।

সুশান্তবাবু মনে করেন "সজনীবাবুর এই সিদ্ধান্তকর তথ্য পরিবেশনের পরও রবীন্দ্রনাথ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস থেকে এতটুকু বিচ্যুত হননি।" এর কয়েক লাইন পরে তিনিই আবার লিখলেন—"তাঁর ওপর সজনীবাবুর ভুল তথ্যে কিছুটা বিভ্রান্তি রবীন্দ্রনাথ।" এ কেমন করে হয়? যে রবীন্দ্রনাথ বিভ্রান্তকর তথ্য পরিবেশনের পরও দৃঢ় বিশ্বাস থেকে এতটুকু বিচ্যুত হননি, তিনিই আবার "কিছুটা বিভ্রান্ত"? এধরনের মন্তব্য কোন যুক্তি কিনা মাননীয় সুশান্তবাবুর কাছে সেটাই আমার বিনীত জিজ্ঞাসা।

মাননীয় মিত্র লিখেছেন—"কোন্ দেশে কোন কালে বারো বছরের বালকের পক্ষে এ জাতীয় জটিল পাণ্ডিত্যপূর্ণ দর্বোধ্য বিষয়কে আয়ত্ত করে সহজ করে লেখবার নজির আছে জানি না।" এই মন্তব্যে বিস্মিত হই। বিস্ময়ের কারণ একাধিক। এক—রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ-ই। দোসরহীন। কোন সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের বিস্ময়। রবীন্দ্র-নাথকে যদি কিছুমাত্র বুঝে থাকি তবে ভুল না হয়তো বলি—রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব মাত্র এক জায়গায় (য়ুরোপের সাহিত্য যেখানে এক একটা যুগ অতিক্রম করতে সময় নিয়েছে তিন থেকে পাঁচশ বছর সেখানে "রবীন্দ্র-নাথ এক জীবনেই সব কটা যুগকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। এবং এটাই তাঁর মহত্ত্ব। সুতরাং এমত অবস্থায় বার বছরের ছেলেকে সন তারিখ দিয়ে বিচার করা চলে না। বালক অভিমন্যু অতগুলো বীরের সঙ্গে সংগ্রাম করেছিল কেমন করে? দুই—প্রবন্ধটির আসল নির্মাণ কর্তা কে? অর্থাৎ তথ্য কে দিয়েছিলেন? রবীন্দ্রনাথ কিংবা পিতা দেবেন্দ্রনাথ? তিন—"অন্য কোন যোগ্য লেখক সেটাকে প্রকাশযোগ্যরূপে পূরণ করে দিয়েছিলেন।" রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি বিচার্য। চার—রবীন্দ্রনাথের বড়দা, জ্যোতিদা, এবং পিতা দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন বলেই ১২ বছরের বালকের অত প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছিল। ক্ষিতিমোহন সেনের অপ্রকাশিত ডাইরী প্রকাশিত হলে এই কথার মর্ম ভালো করে বুঝা যাবে।

সুশান্তবাবু সজনীবাবুর অন্য একটি মন্তব্য তুলে দিয়েছেন—"প্রবন্ধটি—লেখা বলিয়া বোধহয়।" (২ জুলাই-এর 'অমৃত' দ্রষ্টব্য)। এই উদ্ধৃতিটির পূর্ণচ্ছেদ যেখানে তিনি টেনেছেন আসলে সজনীবাবু সেখানে (—) চিহ্ন দিয়ে লিখেছেন—"পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিস্তশাস্ত্রের সহিত তুলনা-মূলক বহু সিদ্ধান্তও ইহাতে আছে, হইতে পারে, এগুলি দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশ।" ভাবতে অবাক লাগে এই গুরুত্ব-পূর্ণ মন্তব্য বাদ দিয়ে কিভাবে তাই বলে ছিলেন, মনোনীত কুমার [redacted] ভুলেছেন, তা-ও সম্পূর্ণ নয়—কোনটার পাপড়িগুলো ছিঁড়ে ফেলে শুধু বোঁটা, কোন ৩।৪ অংশ প্রস্ফুটিত ফলের ৩ অংশ বাদ দিয়ে শুধু কলি। রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তির উদ্ধৃতিতেও সুশান্তবাবু দারুণ গুরুত্বপূর্ণ একটা শব্দ বাদ দিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড় প্রবন্ধ লিখেছি।" সুশান্তবাবু "বড়"টি বাদ দিলেন।' অমৃত,' পৃষ্ঠা ২৮, দ্বিতীয় কলম দ্রষ্টব্য।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলো এমনিতেই বড়। তার উপরে তিনি যখন "বড়ো প্রবন্ধ," তখন তা-যে সুদীর্ঘ তাতে সন্দেহ নেই। আমার প্রশ্ন : 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' এবং 'গ্রহগণ জীবের আবাস ভূমি' এই দু'টির মধ্যে বড়ো কোনটি? রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রথম প্রবন্ধটিকে তাঁর রচনা বলে স্পষ্ট মত দেননি, তেমনি দ্বিতীয়টির কোন ইঙ্গিতও দেননি।

প্রুফ্‌টরের "প"টুকু না থাকলেই যে রবীন্দ্রনাথের রচনা নয় এবং "প"টুকু থাকলেই রবীন্দ্রনাথের রচনা, এটা কোন যুক্তিই নয়। গ্রহগণ জীবের আবাস ভূমি"-তে প্রুফ্‌টর কি সশরীরে আবির্ভূত?

সত্য রায়, বাঙালগর।

সাহিত্যের নেপথ্য বিষয়ে

প্রথমেই জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন 'সাহিত্যের নেপথ্যে' পরিকল্পনা এবং প্রকাশ করার জন্য। কিন্তু আমার 'সাক্ষাৎকার'-এর কয়েকটি মারাত্মক ভুল ছাপা হয়েছে। নীচে ভ্রান্তিগুলি করছি। এ বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করলে বিশেষ বাধিত হব।

ভবদীয়
কল্যাণব্রত দত্ত

১। আমার দাদা মণীন্দ্র দত্ত দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক এবং বালা প্যারীমোহন কলেজ (উত্তরপাড়া) এর উপাধ্যক্ষ। (ইতিহাসের অধ্যাপক নন।)

২। মণীন্দ্র দত্ত শিশুসাহিত্যিক হিসাবে পরিচিত হবে তিনি বড়দের উপন্যাসও অনেক লিখেছেন 'উত্তরপুরুষ' ছদ্মনামে। (উত্তমপুরুষে কোন উপন্যাসের নাম নয়।)

৩। নীহাররঞ্জন গুপ্ত আমার দাদা মণীন্দ্র দত্ত-র বিশিষ্ট এবং সেই সুবাদেই তাঁর প্রথম যে উপন্যাসটি প্রকাশ করি তার 'রুকিণীবাঈ'। (রুকিণীবাবু নামে কোন লোক নেই।)

৪। সিটি কলেজ অফ কমার্স, (সোদপুর) এর সান্ধ্য বিভাগে আমি ইনটারমিডিয়েট এবং বি-কম পড়েছি। (শুধুমাত্র ইন্টারমিডিয়েট নয়।)

উপন্যাস

মোহিনী আড়ুম

চিত্তরঞ্জন মাইতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জয়কিষণ বললেন—না না আমার স্ত্রী এত বড় কিছু ছিলেন না তবে নাচ-গান তিনি খুবই ভালবাসতেন। আমার লালাসয়ার স্টেটের অরণ্য নিবাসে একটি নাটমন্ডপ তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরী করা হয়েছে। তিনি সেখানে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর তাঁর পরিচিত শিল্পীদের রাস অথবা অন্য কোন সময়ে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসতেন। কদিন নাচে-গানে উৎসবে মেতে থাকত আমার নির্জন অরণ্যনিবাস।

সেই থেকে প্রতি বছর তাঁর স্মৃতিটুকু মনে রেখে আমি আর দোলন সামান্য উৎসবের অয়োজন করি। ভারতের এক-একজন শ্রেষ্ঠ গুণীকে সম্মান জানাই সেই উৎসবে। তিনি অনুগ্রহ করে তাঁর নৃত্য পরিবেশন করেন।

একটু থেমে বললেন কুমার জয়কিষণ এবার দোলন আপনার নাচ দেখে বড় খুশি হয়েছে। সে আপনাকে তার মায়ের স্মৃতি মনে নিয়ে যাবার জন্যে আমার কাছে বায়না ধরেছে। আমি বলেছি তুমি নিজে গিয়ে তাঁকে বল। তাঁর সম্মতি পেলে বসন্তের মধুরাসে তাঁকে আনবার ব্যবস্থা করব।

প্রেমা চোখ দুটো ওদের মুখের ওপর থেকে সরিয়ে নিল নিজের দিকে। একটুখানি কি যেন ভেবে নিয়ে বলল—বসন্ত রাসের আর বাকী কতদিন?

জয়কিষণ বললেন—এখনও প্রায় দেড় মাস সময় রয়েছে।

প্রেমা চেয়ে দেখল দোলন বড় বড় দুটো উৎসুক চোখের দৃষ্টি তার মুখের ওপর পেতে রেখেছে।

প্রেমা আর কিছু ভাবল না। সামান্য পরিচয়ের দ্বিধা দোলনের সুন্দর মুখখানার দিকে চেয়ে দূরে হয়ে গেল।

এবার হাত বাড়িয়ে দোলনকে কাছে টেনে এনে বলল—তুমি তোমার মায়ের স্মৃতিমঞ্চে নাচার জন্যে ডাকতে এসেছ কেউ কি তোমায় এ ডাকে সাড়া না দিয়ে পারে।

প্রেমার সম্মতি পাবার সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে ভরে উঠল দোলনের মুখ। সে হঠাৎ প্রেমার হাতখানা তুলে ধরে চুমু খেয়ে বলল—আন্টী তুমি দারুন ভাল।

প্রেমা তাকে তার কৌচের হাতলের ওপর টেনে বসিয়ে বলল—তুমি নাচ শেখনি?

জয়কিষণ বললেন—পাঁচ ছ বছর যখন ওর বয়স তখন ওর মাই ওকে গান গেয়ে গেয়ে হাতে তালি দিয়ে নাচ শেখাতেন। সে নাচ বলতে পারেন ডল্‌পুতুলের হাত-পা নাড়ার মত।

প্রেমা বলল—আমি আপনার ওখানে যাবার ব্যাপারে কারো সঙ্গে পরামর্শ না করে রাজী হয়ে গেলাম কেন জানেন? দোলনের মায়ের মত আমার মাও ছিলেন নর্তকী আর প্রায় দোলনের বয়সেই আমি আমার মাকে হারিয়েছিলাম।

কুমার জয়কিষণ বললেন—একে ভাগ্যে শুভ সাগাযোগ বলতে হবে। না হলে আপনার মত শিল্পীকে এক কথায় কি করে পাওয়া গেল ভাবতেই পারছি না।

প্রেমা হেসে বলল—আমি আদপেই বড় শিল্পী নই। আমি এখনও শিক্ষার্থী। কথক আর মণিপুরী এখনও ভালমত রপ্ত করতে পারিনি। আমার মতে যে কোন বিষয়ের শ্রেষ্ঠ একজন শিল্পীর সব কটি ক্ল্যাসিক্যাল নাচের তালিম নেওয়া দরকার।

জয়কিষণ বললেন—আমার স্ত্রীও কিন্তু আপনার মত একই কথাই বলতেন। তিনি আরও একটি কথা বলতেন। ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে বহু লোকনৃত্যের ধারা আছে। তাদের নাচও লক্ষ্য করতে হবে। দেহের অনেক স্বাভাবিক মুভমেন্ট সেখান থেকে শেখা যায়।

প্রেমা বলল—আপনার স্ত্রী নিশ্চয়ই গুণী ছিলেন।

কুমারবাহাদুর অন্যমনস্ক হলেন। এক সময় ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন—সাড়ে দশটা বাজে। আপনার বিশ্রামের অনেকখানি সময় নিয়ে নিলাম।

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। পেন্টা বের করে পকেট ডায়েরীর পাতায় লিখে নিলেন প্রেমার ঠিকানা। বললেন—আপনার সব যোগাড়ের নিবে আপনি আসুন। ফিরবার থেকে প্লেনে আসতে পারবেন। দিল্লী আমার লোকেরা আপনাদের নিয়ে সব ব্যবস্থা অপেক্ষা করবে। চিন্তা করবেন আপনাকে সর্বাঙ্গীন জানাই দিব

এবার নমস্কার করলেন কুমারবাহাদুর। প্রেমা প্রতি নমস্কার করল। দোলনের হাত ধরে দরজা অব্দি এগিয়ে এল। ওরা বিদায় নিয়ে চলে গেলে প্রেমা চিঠি লিখতে বসল সরিতাকে।

দুষ্টু সরিতা কি করছিস এখন তুই? আমার কথা ভাবছিস নিশ্চয়ই। ভাবছিস ঝঞ্ঝেলটা আমার কপালেই জুটেছে। তাহলে ঐ ভেবেই বসে থাক। নারে ভাই একটুর জন্যে ফস্কে গেল। মাথার মুকুট মিলল না দলে পায়ের নূপুর পেলাম। বাড়ী গিয়ে তার জন্যে সব তোলা রইল। আগামী শনিবার ফ্লাইটে মাচাজ যাব। ওখানে যামিনী কৃষ্ণমূর্তি আর সুধা শেখরের কুচিপুদি নাচের প্রোগ্রাম আছে। চার পাঁচদিন ওখানে থেকে ফিরব।

হাঁ, আর একটা গ্রেট নিউজ আছে। কটু আগে দেরাদুনের লালসিংহ স্টেটের অধিপতীক কুমারবাহাদুর তাঁর দশ বছরের ছেলেকে নিয়ে আমার সুইটে এসেছিলেন। সীন আমাকে তাঁর স্টেটের নাটমন্দিরে তাঁর জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে গেলেন। নাচের কাল—বসন্ত। আহ্বায়ক—অধিপতীক রাজকুমার। স্থান—নির্জন রণ্যনিবাসের মনোরম মঞ্চ।

এখন বল, মত না দিয়ে কি পারি। বাছা শেষে আবার একটা না সাউন্ড অব মিউজিক হয়ে যায়।

এগ্রোমেন্টার ঘরে কাঁটা ছুঁই ছুঁই নম রাখছি। অনেক আদর রইল।

প্রেমা।

প্রেমা বলল—বল তুই কেন যাবি না?

সরিতা বলল— তোর 'সাউন্ড অব মিউজিক' নায়িকা কি তার ছোট বোনকে সঙ্গে নিয়েছিল?

প্রেমা অনুনয়ের সুর গলায় তুলে বলল—লক্ষ্মী সরিতা তুই ছাড়া চোলাকটু সরবরাহ ম পদম ইত্যাদি কে করবে বল? মাধবী মাকে তো আর বলা যাবে না।

সরিতা বলল—তুই ক্ষেপেছিস আমার দীক্ষা না? অ্যানুয়াল পরীক্ষায় আবসেন্ট হলে প্রমোশান দেবে ভেবেছিস? প্রিন্সিপাল বড় কঠিন ঠাঁই।

প্রেমা এবার সত্যি চিন্তায় পড়ল। হঠাৎ একসময় একটা বুদ্ধির ঝিলিক দিতেই সে বিছানার ওপর উঠে বসল।

আচ্ছা দেখ সরিতা, তুই যদি একটা ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিস অসুস্থ বলে!

সরিতা বিজ্ঞের মত বলল—অত সহজ মশাই। বড় রোগের সার্টিফিকেট বড় ডাক্তার দিতে চাইবেন না। দু-চার নম্বর পেটে কামড়ানো অথবা দাঁতে ব্যথার সার্টিফিকেট মিজালও মিলতে পারে। কিন্তু মাস যাওয়া আসা থাক সব মিলিয়ে আমার মনে হয় খুব কম হলেও নব্বই দিনের এদিকে নয়। তারপর যদি ন নাটক দিয়ার শুরু হয়ে যায় তাহলে সময়ের সীমা থাকবে না।

প্রেমা শুয়ে পড়ল। একটা চাদর গায়ের ওপর টেনে নিতে নিতে বলল—তুই একটা ওয়াথলেস সরিতা। ঘটে যদি এক কোঁটা বুদ্ধি থাকে। একটা সামান্য উপায় বের করতে পারলি না।

সরিতা প্রেমার কথার ধারকাছ দিয়েও গেল না। সে হঠাৎ বলল—হাঁরে দিদি কুমারবাহাদুরের স্ত্রী বাঙ্গালী ছিলেন বললি না?

প্রেমা বলল—হাঁ দারুন গুণী মহিলা ছিলেন। নাচে-গানে ওস্তাদ।

সরিতা বলল—বাঙ্গালীরা বড় গুণী হয় তাই নারে দিদি?

প্রেমা বলল টেগোর নেতাজী স্বামীজী উদয়শংকর রবিশংকর এঁরা তো সব বাঙালী।

সরিতা বলল বাস্তবিক একটা গুণীর জায়গা বটে। যদি কোনদিন বিয়ে করি তাহলে বুঝলি দিদি একটা বাঙালী দেখেই করব কি বল?

প্রেমা বলল, তেমন তেমন পেলে করিস।

সরিতা অমনি বলল, তুই খুব ভাল দিবি।

প্রেমা এবার বিছানার ওপর উঠে বসে বলল, কি ব্যাপার বলত? নতুন একটা জায়গায় ভি আই পি ট্যুর দেবার জন্যে ডাকলাম তোকে, বুদ্ধি হল না। পড়াশোনা ছেড়ে দেবার জন্যে বোজ যার বাসনাকা সে হঠাৎ অ্যানুয়াল পরীক্ষার জন্যে উঠে লেগে গেল। তারপর বাঙালী বিয়ের জন্যে আর্জি পেশ। সব ব্যাপারটাই কেমন গোলমালে ঠেকছে। হাঁরে সরিতা সত্যি করে বল প্রেমে পড়েছিস? কোন দারুণ টালেন্টেড বাঙালী কি আমাদের কেবালার এসেছেন? তোর সঙ্গে আলাপটালাপ হয়েছে নাকি রে?

মুষড়ে গেল সরিতা। তার ইন্দ্র এমন কিছু টালেন্টেড নয়। সে তবু গলায় জোর এনে বলল দেখ দিদি সঙ্গী নির্বাচনে আমি এ্যালার্জিক চেয়ে সিনসিয়ারিটিতে বিশ্বাসী। প্রতিভা খুব বড় জিনিস, কিন্তু প্রতিভাবানের বউ হওয়া দারুণ একটা সুখের ব্যাপার নয়। লোকটাকে কোনদিনই একান্তে নিজের মত করে পাওয়া যাবে না। সেদিক থেকে বউ-এর ওপর টান আর কর্তব্যবোধ আছে এমন স্বামী মেয়েদের অনেক বেশী পছন্দ।

প্রেমা বলল, তামার নব।

কেন?

চিরদিন প্রতিভার পূজো করে এসেছি, বলে।

সরিতা বলল তোর কথাই আলাদা। হাজারটা মেয়ে তো আর তোর মত নয়।

প্রেমা বলল, তা না কথাটা হল আমি কি নিয়ে থাকব। আমার নাচের শেষে যদি আমার স্বামী উদয়শংকরের কাছ থেকে আমার পাওনা টাকা পয়সা বুঝে নিতে বসে থাকে কিম্বা আমার নাচের সাজপোশাক গোছগাছের কাজে লেগে যায় তাহলে কি রকম লাগবে বল তো? সাহায্যকারী হিসেবে হয়ত তাকে তারিফ করা যায় কিন্তু স্বামী হিসেবে পুরোপুরি তাকে মেনে নেওয়া যায় না।

সরিতা বলল, আমি অতি সাধারণ তাই আমার সাদামাটা একটা স্বামী হলেই চলবে। দুজনের মন বুঝে চলতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু অনেক উঁচু কিছু হলে তার দিকে তাকাতে গিয়ে পায়ে পায়ে হোচট খাবারই সম্ভাবনা।

প্রেমা বলল, রাত অনেক হয়েছে এদিকে আমাদের আজই বিয়ের কোন সম্ভাবনা নেই অতএব স্বামী চিন্তা ছেড়ে ঘুমিয়ে পড়।

সরিতা বলল, তথাস্তু।

মুখে কথাটা বললেও মনে মনে বলল, নামেই শুধু প্রেমা। প্রেমে তো পড়নি বাছা পড়লে বুঝতে এ ভাবনার জ্বালা কত! যদি ঘুম এসেও যায় তাহলে স্বপ্নে সারারাত জাগিয়ে রাখবে।

পরের দিন প্রেমা গাড়ী করে বেরুতে যাচ্ছে, সরিতা বলল যাচ্ছিস কোথায়?

প্রেমা বলল এই একটুখানি ঘুরে আসছি হোটেলের দিক থেকে।

সরিতা বলল, এত সকালে হোটেলে গিয়ে করবি কি? জলখাবার তৈরী করছি খেতে হবে না?

প্রেমা গাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে বলল, ম্যানেজারটিকে তো সৎ আর এফিসিয়েন্ট বলে মনে হয় তবু সব দিকে নজর না রাখলে ব্যবসা চলে না সকালে একটা সারপ্রাইজ ভিজিট দেবার ইচ্ছে ছিল।

সরিতা মনে মনে বলল তোমার মুন্ডু। ইন্দ্র কাজ পাগলা। সারপ্রাইজ ভিজিট দিয়ে তুমি তার ঘেচু করবে।

মুখে বলল, ঠিক বলেছিস ম্যানেজারদের সব সময় নজরে নজরে রাখা ভাল।

প্রেমা বলল ইন্দ্রকে আমার কিন্তু বেশ ভাল লাগে। ও বেশ সমঝদার বলে মনে হয়।

সরিতা বলল, ভদ্রলোককে আমার তেমন কিছু একটা কেউকেটা বলে মনে হয় না। কেমন যেন ফিলজফার ফিলজফার গোছের মুখের ভাবখানা।

মনে মনে সরিতা বলল, ওদিকে তার নজর দিও না। প্রেমা। ও আমার একেবারে বশংবদ গোবেচারা, তুমি দিদি প্রতিভাবানদের নিয়ে থাক।

প্রেমা বলল তোর বড় নাক উঁচু দেখছি সরিতা। মনের মত মানুষ না পেলে তখন দুঃখ পাবি।

সরিতা বলল দুঃখ কপালে লেখা থাকলে খন্ডায় কে বল? এই যে দেখ না কাল রাত্রে তোকে সার না বলে দিলাম অথচ সকালে উঠে দেখি মনটা সার হয়ে আছে। তাই মনের দুঃখ দূর করতে ঠিক করলাম, তোর সঙ্গেই যাব।

পূজো সংখ্যা **প্রসাদ** একাই একশো

পূজো সংখ্যা **প্রসাদ** একাই একশো

পূজো সংখ্যা **প্রসাদ** একাই একশো

শুরুতে ৭টি উপন্যাস লিখছেন বিমল মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, নিমাই ভট্টাচার্য, এমর, চিত্তরঞ্জন মাইতি এবং চানক্য সেন

বিশেষ একটি গল্প লিখছেন সুবোধ ঘোষ

দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ফোরেনসিক

৭টি গল্প লিখছেন শংকর, তারাশঙ্কর, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, প্রতিভা বসু, মহাশ্বেতা দেবী, সন্তোষকুমার ঘোষ

বড় গল্প লিখছেন বিমল কর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

রহস্য উপন্যাসে কিরীটি রায়কে আনছেন নীহাররঞ্জন গুপ্ত

সম্পূর্ণ নভেলেট লিখছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

লঘু রচনা লিখছেন শচীন ভৌমিক

রম্যরচনা লিখছেন বসুরূপী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এবং প্রিয়রঞ্জন দাশগুপ্তী

প্রদীপ ভট্টাচার্যের চোখে শঙ্কর ঘোষ ॥ কানন দেবীর চোখে ডি ডি ॥ উত্তমকুমারের চোখে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ॥ স্বপনকুমারের চোখে উত্তমকুমার ॥ সমরেশ চৌধুরীর চোখে গৌতম সরকার ॥ বীনা দাশগুপ্তর চোখে জ্যোৎস্না দত্ত ॥ সন্ধ্যা মুখার্জীর চোখে পঞ্চজা মল্লিক

এ ছাড়া চিত্রজগতের ওপর বিশেষ কয়েকটি রচনা

এ ছাড়া রঞ্জন সম্প্রদায়ের কলকাতা স্টুডিও ॥ সন্ধ্যা বিশ্বাসের বোম্বে স্টুডিও ও প্রশ্নোত্তর ॥ বসুরূপীর দপ্তর ও চিঠিপত্র এবং বাঙলা বোম্বের অজস্র অজস্র রঙীন ছবি-ছবির ফিচার-সচিত্র কাহিনী

বেরুচ্ছে সেপ্টেম্বরের গোড়ায়

যোগাযোগের ঠিকানা ৪২ ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট কলকাতা ১৩

দাম : দশ টাকা
সডাক : বারো টাকা

প্রেমা বলল পাগলামি রাখ তোর না পরীক্ষা সামনে। পরীক্ষা ফাঁকি দিয়ে সঙ্গে যাবি ভেবেছিস?

সবিতা বলল, তুই কি ভেবেছিস ঐ বিপত্নীক লোকটার খপ্পরে তোকে একা ফেলে দিয়ে আমি শান্তি পাব।

প্রেমা খুব একচোট হেসে বলল খেতে দিবি তো চল, মুনশিআনা রাখ।

খেতে বসে প্রেমা বলল গানের লোকের ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

কি রকম?

লীলাবতী অনেক দিন থেকে আমার সঙ্গে যেতে চাইছিল। বেচারাকে সব সময়েই অ্যাভয়েড করেছি। এখন নিজের গরজেই ওকে ডাক দিয়েছি।

সবিতা বলল ইতিমধ্যেই ডাক-হাঁক হয়ে গেছে। রাজী আছে লীলাবতী?

এক পায়ে খাড়া।

সবিতা বলল, দুর্ভাবনা একটা গেল। ওর কণ্ঠিতে জোর আছে বুঝিতেও লীলা আছে।

প্রেমা বলল, প্রফেসাররা তোর কথা শুনে নম্বর দেয় না?

সবিতা অমনি বলল, যেমন তোর সুন্দর মুখ দেখে প্রফেসাররা নম্বর দিত।

প্রেমা হেসে ফেলে বলল, তোর মুখখানা কিন্তু অনেক সুন্দর সবিতা। আমার চেয়েও সুন্দর।

সবিতা গম্ভীর হয়ে বলল, বিশ্রীকম। তোকে গোল্ড প্লেটিং করে ছেড়েছে আর আমি ছটপটে বলে এক পোঁচ কালো রঙ মাখিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। নইলে মুখখানা এমন কিছু একটা খারাপ ছিল না।

নীচের থেকে কাজের মেয়েটি ওপরে উঠে এসে বলল, হোটেল থেকে ম্যানেজার সাহেব এসেছেন। বড় মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চান।

প্রেমা অমনি বলল ওপরে নিয়ে এসো।

মেয়েটি চলে যেতেই সবিতা ফোঁস করে উঠল তোর আর লজ্জা নেই ওকে অমনি ওপরে এনে ফেললি? প্রাইভেসি বলতে কিছু রাখলি না।

প্রেমা বলল, সারা রাত বাঙালী বন্দনা করলি এখন আবার হল কি রে?

উত্তর দেবার আর সুযোগ পেল না। সবিতা। ইন্দ্রের জুতোর আওয়াজ এগিয়ে আসছে।

ইন্দ্র ঘরে ঢুকতেই সবিতা সরে গেল।

প্রেমা বলল আসুন আমিই হোটেলে যাব ভেবেছিলাম।

ইন্দ্র একখানা চেয়ারে বসতে বসতে বলল, আপনি পরশু এসেছেন তাই না?

প্রেমা বলল, পরশু দুপুরের ফ্লাইটে।

ইন্দ্র বলল আপনার সঙ্গে যে আইরিশ এডভোকেট এসেছিলেন তিনি এখন আমাদেরই হোটেলের সুইট নাম্বার নাইনে আছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

প্রেমা বলল একই প্লেনে আসার সময় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কথা প্রসঙ্গে আমার হোটেলের কথাও জেনে-ছিলেন। কিন্তু তাঁর তো প্যালেস হোটেলে ওঠার কথা ছিল।

ইন্দ্র বলল, প্রথমে তিনি প্যালেস হোটেলে গিয়েছিলেন, কারণ ওখানে ওঁর ঘর বুক করা ছিল। তারপর একরাত কাটিয়ে কাল এসে উঠেছেন আমাদের হোটেলে।

প্রেমা বলল, লেখক মানুষ, একটু নজর রাখবেন ওঁর সুখ সুবিধের ওপর। আমাদের কেরালার ব্যাকগ্রাউণ্ডে একটা নভেল লিখতে চান।

ইন্দ্র বলল, লেখক মানুষ, একটু নজর দেবার চেষ্টা করি। বিশেষ করে বিদেশীদের সুখ-সুবিধের ওপর হোটেলের সকলেরই সজাগ দৃষ্টি থাকে।

প্রেমা বলল, আমি খানিক পরেই যাচ্ছি হোটেলে, ওঁকে বলে দেবেন।

ইন্দ্র উঠে দাঁড়াতেই প্রেমা বলল, আরে বসুন, উঠছেন কেন! আপনার কাছে গেলে কত ভাল কফি খাওয়ান, আমাদের এখান থেকে না হয় একটু চলনসই কফিই খেয়ে গেলেন।

ইন্দ্র আবার বসল। হেসে বলল, দুটো ঘরই আপনার। এক জায়গায় অনেক দিন থাকলে মুখেরও স্বাদ থাকে না, তখন ঘর বদলালে স্বাদও বদলে যায়।

সবিতা ঘরে ঢুকল ট্রেতে কফি আর কেক নিয়ে।

টিপয়ের ওপর ট্রেটা রেখে কফির কাপ ইন্দ্রের হাতে তুলে দিয়ে বলল, নিন, আমরা এখুনি ব্রেকফাস্ট করেছি।

সরিতা একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল।

প্রেমা বলল, জানেন মিঃ রায় সবিতা আপনাদের খুব প্রশংসা করছিল।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে ইন্দ্র বলল, আমাদের মানে?

প্রেমা বলল, বাঙালীদের প্রতিভার।

ইন্দ্র দরাজ হাসি হেসে বলল, তাই বলুন। আমি ভাবলাম বুঝি আমার মত অভাজনের প্রশংসা করছেন।

প্রেমা বলল, নিজেকে এমন লুকিয়ে রাখছেনই বা কেন। কে বলতে পারে আপনার ভেতর সে প্রতিভা নেই।

ইন্দ্র বলল, আমি কি আপনাদের কাজে কোন গাফিলতি করেছি মিস মেনন?

প্রেমা চমকে উঠল, এ কথা কেন?

ইন্দ্র বলল, এই যে আপনি সকাল বেলা আমাকে নিয়ে মজা শুরু করলেন। বিশ্বাস করুন আমি কৌতুক করার জন্যে বলিনি। একেবারে সহজ সরলভাবে বলেছি।

ইন্দ্র খালি খালি কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে দেখে সবিতা বলল, কেকটা টেস্ট করে দেখুন, একধারে সবিয়ে রাখলেন যে।

প্রেমা বলল, ও আপনাকে এমন করে সাধছে কেন বলুন তো?

ইন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে বলল, নিজের হাতের তৈরী বলে।

প্রেমা সবিতার দিকে চেয়ে বলল, দেখলি তো, জিনিয়াস কাকে বলে।

ইন্দ্র কেকটা হাতে তুলে বলল এমন করে প্রশংসা শুরু করলেন, যাতে কেকটাকে ভাল বলতেই হয়।

সবিতা ফোঁস করে উঠল, তা কেন! ভাল না লাগলে মুখের ওপর বলবেন।

ইন্দ্র হাসতে হাসতে বলল, জিনিয়াসের কুলুপ যে আগেই এঁটে দিয়েছেন মুখে। খারাপ সমালোচনার পথই বন্ধ।

প্রেমা বলল, কথাটা আমি উইথড্র করছি। আপনার কোন রকম প্রতিভাই নেই। এখন আশা করি খুশি হয়ে আমার বোনের তৈরী কেকটা খেয়ে নেবেন।

ইন্দ্র কেক কামড় দিয়ে টেস্ট করল। সঙ্গে সঙ্গে বলল সত্যি সুন্দর হয়েছে। বিশ্বাস করুন একটুও বাড়িয়ে বলছি না।

প্রেমা সবিতার দিকে চেয়ে বলল তাহলে মিঃ রায়কে একদিন ইনভাইট করে তোর পাকা হাতের রান্নার পরিচয় দিয়ে দে।

সবিতা বলল, থাম বাপু, পরীক্ষাটা হয়ে যাক, তারপর যত খুশি রান্না করে তোমাদের ওপর একসপেরিমেন্ট চালাব।

ইন্দ্র আর প্রেমা সবিতার কথায় এক-সঙ্গে হেসে উঠল।

নীল শাড়ির ওপর হীরের সেট করা একটা কণ্ঠহার। ঝিকমিক ঝলমল করে উঠছে। আরব সাগরের নীল জলে যেমনি সূর্যের হীরে ঝলকাচ্ছে। যতদূর দেখা যায় তীর জুড়ে সবুজ নারকেল গাছের সারি। খানিকটা হাঁসুলী বাঁক নিয়েছে বেলাভূমি। ঢেউএর পরিত্যক্ত ফেনাগুলো ধবধবে রুপোর মত মনে হচ্ছে। একটু আগে পাল তোলা কটা ভাসমান সমুদ্রে চষে কূলে এসে ভিড়েছিল। জেলেরা সেগুলো ডাঙ্গায় তুলে বালির জমীনে কায়ক্লেশে রেখে গেছে। কালো কালো জাল ঝেড়ে অনেক রুপোলী মাছ কুঁজিয়েছিল ওরা। এখন কোথাও কোন চাঞ্চল্য নেই। কয়েকটা নারকেল গাছের জটলার ছায়ায় বড় বড় পাথরের স্তূপ। নির্জন। বেশ খানিকটা উঁচুতে জায়গাটার অবস্থান। তাই নীচ থেকে নারিকেল কুঞ্জে ঘেরা জায়গাটা কারো চোখে পড়লেও ওপর থেকে নীচের সব কিছুই দেখা যায়।

ওরা সেই সকাল থেকে সমুদ্রের জীবন-প্রবাহ দেখছিল। ডেভিড প্রেমার কোলের ওপর ম্যাসনাইটের একটা টুকরো ফেলে লেখার টেবিল বানিয়ে ছোট ছোট কথার স্কেচ বানাচ্ছিল। ধীরে ধীরে খেয়ালখুশির পেন স্কেচও চলছিল। কতকটা সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্যের মত। ঘটনার কথাচিত্রের পাশে গতিশীল ভাবোদ্যোতক সব রেখাচিত্র। বড় উপন্যাসের জন্য উপাদান সংগ্রহ। লেখকের রেখাচিত্রের হাতটিও বেশ সচ্ছন্দ।

আজ চারদিন প্রেমার গাড়ী ঔপন্যাসিক ডেভিড ডোনসের তথ্য সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত। আশ্চর্য একটা খেলার নেশায় মেতে উঠেছে প্রেমা। ডেভিড নিমন্ত্রিত হয়ে গেছে প্রেমা কোটেজে। সেখানে হল ঘরে সন্ধ্যায় সবিতার গানের সঙ্গে নেচেছে প্রেমা। অবাক হয় ডেভিড দেখেছে প্রেমার নাচ। কি আশ্চর্য স্নিগ্ধতা আর মাধুর্য। দেহ সঞ্চালনে দুর্বার এক আমন্ত্রণ ডেভিডকে নিষিদ্ধ রাজ্যে প্রবেশের জন্য বারবার প্রলুব্ধ করেছে।

(ক্রমশঃ)

বিকাশ ভট্টাচার্য

খেলার চিত্রশিল্পী

দীর্ঘ বলিষ্ঠ আকৃতি। স্ফীত বক্ষ। ইস্পাতের মত কঠিন। পেশী বহুল টান টান সুঠাম চেহারা। গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল ঘিরে লম্বা লম্বা চুল। কালো কুচকুচে চাপ দাড়ি। প্রস্তর ক্ষোদিত ভাস্কর্যের মত মুখাবয়ব। বজ্রের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। অঙ্গ সঞ্চালনে অশ্বের মত বেগবান। জনারণ্যেও এই পুরুষকে চাক্ষতে চেনা যায়।

যেমন তাঁকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না, খেলার মাঠে। প্রদর্শনীর ভীড়ে। কল্লোলিত কলকাতা জনসমুদ্রে। হ্যাঁ, তাঁকে একবার দেখেছি ময়দানে, ঘেরামাঠের গ্যালারীতে এক উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে—গো-ও-ল বলে চীৎকার করতে।

খেলা দেখা বিকাশ ভট্টাচার্যের ছেলে-বেলার বাতিক। মাঠে না গেলে যেন ভাত হজম হয় না। বোধহয় শিল্পীটিপও বেরোয় না। শিল্পীদের ক্রীড়াপ্রীতি সচরাচর চোখে পড়ে না। তাই আমার মত অনেক স্বজনও শিল্পীকে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে থাকেন। শিল্পী বলেন—খেলার প্রাণ-চঞ্চল উন্মাদনা ও উচ্ছ্বাসে যেন অনেকটা রিলিফ পাই। প্রাণখোলা হৈ হৈ, চীৎকারের মাতামাতিতে নিজেকে উজাড় করে দেয় সবাই। মানুষের ভেতরের আসল চেহারাটা যেন ঐ পরিবেশেই স্পষ্ট চোখে পড়ে। আপনাকে সেদিনের একটা মুভমেন্টের ঘটনা বলি। খেলার আগে ঘন বর্ষা হয়ে গেছে। কিছিৎ ঠাণ্ডা ঝিমিরে পড়া দর্শকরা ভেজা জামা গায়ে প্রায় হীমশীতল। অকস্মাৎ একদল আর একদলের প্রতিরক্ষার বেড়া ভেঙ্গে বল বাড়িয়ে দিল প্রায় গোল সীমানার কাছাকাছি। আমরা রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে পড়েছি। মুহূর্তের মধ্যে প্রচণ্ড একটা সট। সমর্থকরা 'গো-ও-ল' বলে চেঁচিয়ে ওঠে। কিন্তু না। বাবে লেগে বল চলে যায় মাঠের বাইরে। কিন্তু ঐ একটা মুভমেন্ট, সবাইকে চাঙ্গা করে দেয়। সেই রুদ্ধশ্বাস উত্তাপে সবাই যেন সহসা উষ্ণ হয়ে ওঠে। বলের স্পীডটা যেন মুহূর্তের মধ্যে আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। ছবিতে এ স্পীড কতটা আসে জানি না। তাছাড়া শিল্পের মত খেলাও তো শ্রম, নিষ্ঠা, শিষ্টাচার ও অভিনিবেশের সুফল। খুব দ্রুত কথাগুলো বলে গেলেন বিকাশ। আরও বললেন কালচারের ভণিতা সহ্য হয় না। আমি যা আমি তাই। নিজস্বতাকে বিলীন করে কি সামাজিক হওয়া যায়? কালচারের নামাবলী গায়ে জড়িয়ে শিল্পী হতে চাই না। আমি এক সফিসটিকেটেড ধনী মহিলা শিল্পীকে জানি অনেকদিন ধরে। হঠাৎ দেখলুম তিনি একদিন দুঃখকষ্টের ছবি আঁকতে সুরু করেছেন। জিজ্ঞেস করতে বললেন—এই সাবজেকটের ছবির এখন বাজার ভাল। (মুডি মুড়কির মত বিক্রি হয়। তাই এ ধরনের কাজ করছি। আমি মনে মনে হাসলাম। ভাবলাম দুঃখ বেদনার এখন তাহলে বাজারদর বেশ ভালই।)

বস্তুতঃ ধার করা অনুভবে আর যাই হোক চিত্ররচনায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না। জীবনের সঙ্গে শিল্পের যোগ নিবিড় বলে অনভিজ্ঞ অভিজ্ঞতার ফসল সত্যিকারের শিল্প রসিককে আকর্ষণ করে না। এ অর্থে বিকাশ ভট্টাচার্য সৎ সাহসী। নিষ্ঠাবান। তাঁর চিত্রলেখায় পাই স্বকীয় আন্তরঙ্গ অনুভূতির খাঁটী সৌন্দর্য সুষমা। মূলতঃ তাঁর চিত্ররূপ গড়ে ওঠে কলকাতার কর্দ্য-কতাকে ঘিরে। এই শহরের পথের পাঁচালী চিত্ররূপের মূলে মূলধন। এ অনুভূতি জীবন সঞ্জাত। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত। জন্মেছেন ১৯৪০ সালে উত্তর কলকাতায়। পড়াশুনা করেছেন টাউন স্কুলে। মানুষ হয়েছেন উত্তর কল-কাতার ঞ্জিঞ্জী পরিবেশে। শৈশবে চিত্র চর্চার সূত্রপাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বিব্রত বোধ করেন। বলেন—বলার মত তেমন কিছু নয়। তবে কিছু কিছু স্মৃতিচিহ্ন এখনও মন থেকে মুছতে পারিনি। থাকি শোভাবাজার রাজবাড়ীর কাছেই। ওটা আমার ছেলেবেলার ক্রীড়াঙ্গন। ঐ বিশাল ঐতিহাসিক রাজ-বাড়ীর প্রতিটি অলিন্দ, প্রকোষ্ঠ, স্তম্ভ, অলি-গলি আমার ভীষণ চেনা। বর্ষার জলে, জ্যোৎস্না রাতে, সূর্যালোকে কতরূপে কত-ভাবে দেখেছি। ঐ বাড়ীর 'জলসাঘর' ছিল আমার প্রিয় জায়গা। আজও জলসাঘরের কথা উঠলে বা ছবি দেখলে মন পিছু হেঁটে গিয়ে দাঁড়ায় শোভাবাজার রাজবাড়ীর সেই জলসাঘরে। অতীতচারী মন শোনে সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি। ছেলেবেলার এসব 'ইমেজ' এখনও কাজ করে বৈ কি! তবে সে রূপ রূপান্তরিত হবে অন্য আদলে। হুবহু অনুকরণের নয়। যেমন শিল্পীর বাঁশলী পেইন্টিং-এর বাধাকে অসাধারণ মনে হয়। চিত্রে দেহ-সৌষ্ঠব, রংয়ের বাহার বা অলঙ্কারের কাজ দেখে মজে যেতে হয়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ছবি আঁকার সময় প্রতিক্রিয়া হয় অন্যরকম। হয়ত কলকাতারই কোন রমণী রাধার রূপ নিয়ে বিকশিত হবে বিকাশের ক্যানভাসে। সে রাধার সন্ধান বিকাশ এখনও পাননি। হয়ত খুঁজছেন। আমরা কোন একদিন তাকে বিকাশের ছবিতে দেখার অপেক্ষায় দিন শুনছি।

কয়েক বছর আগে বিকাশ গিয়েছিলেন কোণারকের সূর্য মন্দির দেখতে। জ্যোৎস্না রাতে পাথরে উৎকীর্ণ মূর্তিগুলো যেন কোন এক মায়ামন্ত্রবলে জীবন পেয়ে জেগে উঠেছিল। চোখের সামনে সুদূর অতীত বর্তমান নয়। সারা রাত ধরে তাদের নৃত্য, গীত ও মিথুন দৃশ্যের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। একদিন হ্যারিসন রোড কলেজ স্ট্রীটের ব্লসিং-এর বাস থেকে দেখ-লেন সেই নৃত্যবতা সুবসুন্দরীকে। তার কথাবার্তা, হাবভাব হাত-পা নাড়ার ভঙ্গী একেবারে যেন মিলে গেল। মনে একটা ইমেজ সৃষ্টি হয়েছিল। পরে সেই ইমেজকে চেতনার রংয়ে রাঙ্গিয়ে হুবহু এঁকেছেন।

বিকাশের রূপ ধারায় একটু অভিনবত্ব আছে। ডস সিরিজের উদাহরণ দিয়ে বলি। ১৯৩১-৩৩ সালে বৌবাজারের স্টুডিওস্থ একটি বাড়ীর মেয়ে তার পুতুলকে শিল্পীর

বিকাশ ভট্টাচার্যের আঁকা

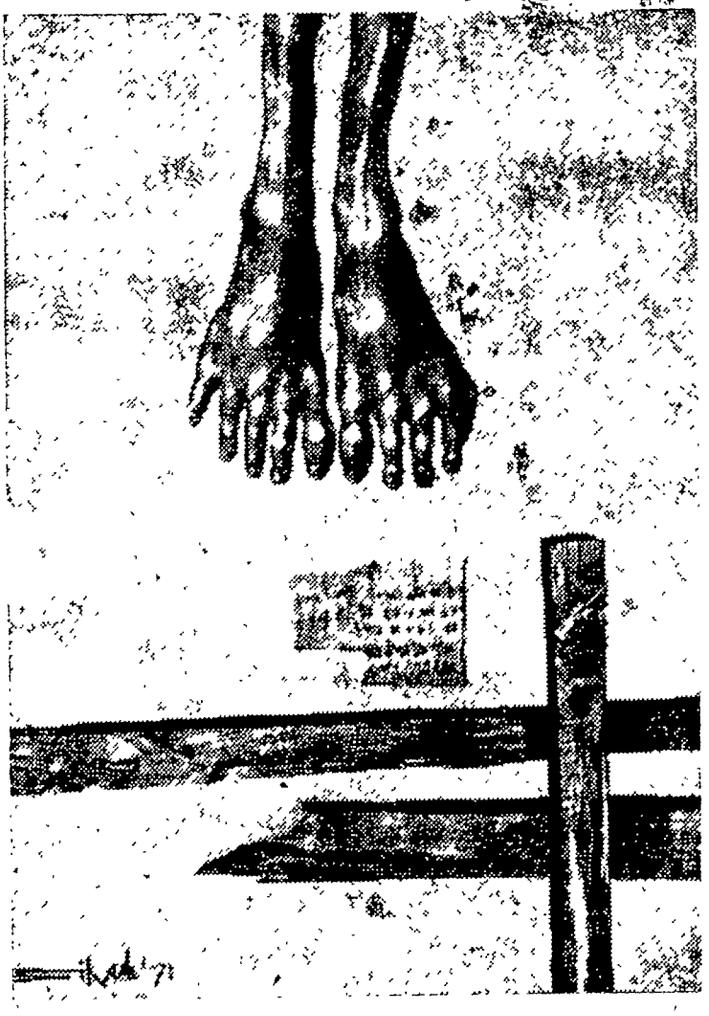

কাছে নিয়ে এল চোখ মুখ এঁকে দেবার জন্যে। শিল্পী ইচ্ছেমত পুতুলকে বসাতেন। দাঁড় করাতেন। স্টুডিও ঘরের নানা জায়গায় ঘোরাতেন। দিনের পর দিন দেখতে দেখতে একদিন যেন পুতুলটাকে জীবন্ত বলে মনে হল। এই ইমেজ থেকেই ডলপুতুল সিরিজের জন্ম। এখন শিল্পী-কন্যা টুকুর মধ্যে যেন সেই ইমেজ আরও বেশী প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে। শিল্পী বললেন—এখন আমার মেয়ে, আমার কাছে অনেক বেশী ডাইরেক্ট। তখন যে ইমেজ ছিল এখন আমার মেয়ে যেন সে ইমেজ আবার নিয়ে আসছে। মেয়েকে নিয়েও হয়ত ছবি আঁকবো। খুব মিষ্টি একটা ছবি।

বিকাশের বর্ণময়তায় সেই শাশ্বত 'সে'র ভূমিকা অপরিসীম। কে সেই 'সে'? অনেক ছবি এঁকেছেন তাকে নিয়ে। তাকে দেখি প্রভাতের প্রথম সূর্যের আলোয় গোধূলীতে, রাতের অন্ধকারে, জ্যোৎস্নার আলোকে। 'সে' নাকি আসতে পারে যেকোন মুহূর্তে ছাদের চিল-কোঠায়, স্টুডিও ঘরে, জওলা ঘাসের আস্তরণ মাথায় নিয়ে। সেই সুন্দরীকে নাকি দেখা যেতে পারে কলকাতার মিছিলে, সুরম্য হোটেলের বাথরুমে কিংবা বাড়ীর আলমারির দরজার ফাঁকে। এমন করে কত রূপে কত রঙে বিকশিত হতে দেখেছি তাকে, বিরুরুশের তুলিতে রুদ্ধশ্বাসে।

কিন্তু বার বার প্রশ্ন জাগে কে সেই 'সে'? সে কি কোণারকের কোন সুরসুন্দরী কিংবা মিথুন ভাস্কর্যের কোন নন্দনবাসী? কারুশ কোণারকের সেই প্রস্তর খোদিত পরী-দেহের কারুকার্যের সঙ্গে এ রমণীর দেহাবয়বের কোন কোন অংশের আশ্চর্য মিল খুঁজে পাই। নাকি এই রহস্যময়ী নারী শিল্পীর মানসকন্যা? জানি না।

তবে আমার মনে হয় এ সেই নারী, যে মোরে চিরকাল হাসালো—কাঁদালো, চিরকাল দিল ফাঁকি। অথবা বলতে ইচ্ছে করে যাকে আমি চিরকাল ভালবেসেছি অথচ যার মুখ আমি কোনদিন দেখিনি. এ সেই 'ইমপসিবল সী'। যাকে আমি ঋতুতে ঋতুতে জ্যোৎস্নায় ছায়ায়, আলোয় অন্ধকারে খুঁজেছি অনেক। পাইনি কোথাও। এ বোধ হয় সেই 'ইমপসিবল সী'। তাই কি? জানি না।

বিকাশ ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজের ছাত্র। পাশ করে বেরিয়েছেন ১৯৬৩ সালে। শিল্প ক্ষেত্রে বিকাশের আবির্ভাব কোলাজের কাজ নিয়ে। বেশ বড় আকারের কোলাজ করতেন। কাটা, সাঁটা এবং মনতাজ করার মেজাজ থেকে কোলাজের আত্মপ্রকাশ নেহাৎই খেলার ছলে বলা চলে। দেশ-বিদেশের পত্রপত্রিকার রঙীন ছবি কেটে কেটে তৈরী করতেন তার ছিন্ন নানান পত্রিকার কাটা নানান সিকোয়েন্স জুড়ে জুড়ে অন্য এক ঘটনা তৈরী করা এবং পরিশেষে পরিবেশ অনুযায়ী রংয়ের প্রলেপ দিয়ে শেষ করা। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭১-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত শিল্পীকে এই মাধ্যমেই পুরোপুরি নিবিষ্ট দেখা যায়। তুলনামূলক বিচারে এই পর্যায়ের শেষের দিকের কোলাজগুলো বক্তব্যে, বিন্যাসে ও রংয়ের বাহারে রসগ্রাহী হয়ে উঠেছিল। এই সময় থেকেই একজন সুদক্ষ চিত্রকর হিসেবে বিকাশের খ্যাতি। তাঁর রিসেন্টিড—মিথিক ম্যান. এদম ইভ প্রভৃতি কোলাজ সত্যিই বহুকাল মনে থাকবে।

১৯৭১-এর মাঝ বরাবর বিকাশ. মনোনিবেশ করেন তেলরংয়ের চিত্র চিত্রণে। রচনারীতি বাঁক নিল নতুন পথে। বাস্তবধর্মী ড্রইং-এর আশ্রয়ে চোখে দেখা বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুললেন বিশাল বিশাল ক্যানভাসের বুকে। ড্রইংগুলো আগের চেয়েও বলিষ্ঠ। সচেতন। জোরালো। হীমশীতল থমথমে পরিবেশে চিত্রের চরিত্রগুলো নিথর স্পন্দনহীন। যেন প্রস্তরীভূত ভাস্কর্যের মত মৌন। কাউন্ট-কাউন্টেস, ডেড কিংস চিত্রদ্বয় দেখে জীবনকে বরফাবৃত ফসিলের মত বোধ হয়। এক চাপা ভয়াবহ ঘন রুদ্ধশ্বাস ছড়িয়ে থাকে ছবিতে। আর সেই রুদ্ধশ্বাস নৈঃশব্দের ভেতর থেকে একটা প্রশ্নই যেন সোচ্চার হয়ে ওঠে—হোয়াট নেকসট্? তারপর কি? কোন উত্তর নেই। রুদ্ধশ্বাসে, অধীর আগ্রহে তৃষিত চাতকের মত মুহূর্ত গোনা ছাড়া। চাপা উত্তেজনার মধ্যে বিকাশের চিত্রকল্পায় এ প্রশ্ন মূলত গড়ে ওঠে সামাজিক বিধি ব্যবস্থার প্রতি শ্লেষ, স্বপ্নের মনোবিকলন ও জীবনযন্ত্রণাকে জড়িয়ে। এ যন্ত্রণা শহরকেন্দ্রিক। বিশেষ করে উত্তর কলকাতার নগরজীবনকে ঘিরে। চোখের সামনে যে সব উত্থান পতন. আন্দোলন, মৃত্যু দেখেছেন তাকেই উপস্থাপিত করেছেন সুচতুর কলাকৌশলে।

সমাজের অপাংক্তেয় অপ্রকৃতিস্থ, ছন্নছাড়া, ভিখিরীদের জীবনচিত্র বিকাশের ছবিতে বড় স্পষ্ট। এদের সহায় সম্বলহীন, অসহায় ভাবকে বিকাশ অপরিসীম আন্তরিকতায় এঁকেছেন একাধিক চিত্রে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিন্তার সঙ্গে এ-বিষয়ে বিকাশের কিছু কিছু চিন্তাভাবনায় সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। আমরা এই মনে হওয়া প্রসঙ্গটি বিকাশকে জানিয়েছিলাম। উনি বললেন—মানিকবাবুর প্রায় সমগ্র রচনাই পড়েছি। মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। টানে। ওঁর অনেক লেখাতে এমন একটি করে চরিত্র থাকে যারা অপ্রকৃতিস্থ কিংবা ছন্নছাড়া, নয়ত কিঞ্চিৎ মস্তিষ্কবিকৃত। এই চরিত্র মানিকবাবুর লেখার সম্বল। যে পরিবেশে বাস করতেন তাকেই নিখুঁতভাবে হাজির করেছেন তাঁর সাহিত্যে। আমার কল্পনার সুপ্ত এসব মিলে যায় বলে ভালো লাগে।

'শহরতলীর' বারোয়ারী, শ্যাওলা সোঁদা গন্ধ যেন অনুভব করতে পারি হরেহরু। আমার চিত্রকর্মেও এই আইডেনটিফিকেশন আশ্চর্য-ভাবে খুঁজে পাই।

ইদানীংকালে বিকাশের ছবিতে ইঙ্গিত-ধর্মতার সুর যেন আরও সূক্ষ্ম হয়ে উঠছে। অল্প ড্রইং-এর মাধ্যমে বাস্তবের বাইরে অতিবাস্তবের আকর্ষণেই যেন শিল্পী সম্প্রতি আত্মমগ্ন। সাধারণ জীবন-বোধ থেকে আরও গভীরতর জীবন দর্শনের দিকে যাচ্ছেন। তাই তাঁর সাম্প্রতিক চিত্র-গুলো বাস্তব অবাস্তবের আলো আঁধারিতে ভরময় ও অর্থপূর্ণ। বিকাশের এই ধরনের ছবিতে সুররিয়ালিজমের গন্ধ পাওয়া যায়। পাওয়া যায় ভয়াবহ এক ভবিষ্যতের ইঙ্গিত।

বিকাশ দেখাচ্ছিলেন তাঁর সদ্য আঁকা কয়েকটি সাদা-কালো ও পাস্টেলের কাজ। অয়েল পাস্টেলের ট্রিটমেন্ট দেখে বিস্মিত হতে হয়। এই কম্বাকোশলের কাজ আর দেখেছি বলে ত মনে হয় না। টেম্পেরা ওয়াটারকালার, পেন্সিল, ক্রেয়নের কাজও বিকাশ প্রায়ই করে থাকেন বিষয় ও প্রকরণ অনুযায়ী। কিন্তু তাঁর কনসিসটেন্সী সেটা হচ্ছে তাঁর পেইন্টিং এলিমেন্ট, তাঁর স্ট্রাক-চার ও ভলিউম। বিভিন্ন দিক থেকে দেখছেন এবং এ্যাপ্রোচ করছেন। মনে হয় বিকাশের ছবি এই এ্যাপ্রোচের এভোলিউসন। এই এ্যাপ্রোচের স্ট্রাগল।

প্রশান্ত দা

ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট

যেমন হাল্কা তেমনি সহজপাচ্য

দিন শুরু করুন বেশ মচমচে আর তাজা ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট বিস্কুট দিয়ে। স্বাদেভরা এই বিস্কুট যেমন হাল্কা, তেমনি হজম করাও সহজ। দাদু থেকে নাতি—বাড়ীর সবার জন্যে। সকালে, কাজের অবসরে চায়ের সঙ্গে—যে কোনো সময়েই ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট খেতে ভাল।

ব্রিটানিয়া
দেয় ভাল বিস্কুট—
৫০ বছরের অভিজ্ঞতায়

ব্রিটানিয়া বিস্কুট

লিবার্টি-BRCAR.3-140 BG

"কোলকাতার এতবড় রবীন্দ্র-সংগীত সম্মেলন একদিনে এতগুলি শিল্পীর এমন সুষ্ঠু পরিবেশনা আমাদের কাছে এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা।"

ফাহ্‌মিদা, হামিদা, রহিম ও কিবরিয়া

ফাহমিদা হামিদা

দূরের বন্ধু সুরের দুয়ারে

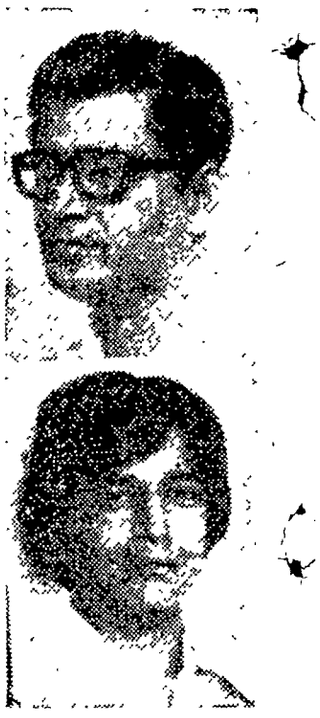

রহিম

কাদেরি কিবরিয়া

থাকেন ওপার বাংলায়। তবু এপার বাংলার গান সুর কবিতা ও কবি ওঁদের কত আপনার হয়ে উঠেছে সেই কথাটি নতুন করে জানা হোলো সম্প্রতি এক রবীন্দ্র-সংগীত সম্মেলনে। ভেঙ্গে গেলো ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার বেড়া। তাঁর ভোরাগো বন্যার মত ওঁদের রবীন্দ্র অনুরাগের জোয়ার এপার বাংলার মানুষের বুকের কাছে যেন আছড়ে পড়লো। আর গানে গানে ছিঁড়ে গেল সব বন্ধন। লায়লা আজমন্দ বানু মালেকা পারভিন বানু আসসারি সানম কলিম শরাফী আবদুল আহাদ। এঁরা সবাই আমাদের চেনা। পুরানো সেই সুরেই যেন কাছে ডাকলেন ফাহমিদা খাতুন হামিদা আতাউর এ কে জাহিদুর রহিম ও কাদেরী কিবরিয়া ওঁদের ঢাকা ফেরার দিন ৩১ জুলাই সকালবেলা চৌরঙ্গীর একটি ফ্ল্যাটে (ইন্দ্রজিৎ সরকারের) ওঁদের গান শুনতে শুনতে আর গল্প করতে করতে তিনটে ঘন্টা যে কোথা দিয়ে কেটে গেলো টেরই পেলাম না।

কোলাহলের কলকাতা ছাপিয়ে ওদেরই চোখের আলোয় দেখা গেলো পদ্মা পাবনা শ্যামলিমা মাখা দৃশ্যপট সেখানের মানুষের সজল আবেগ।

ফাহমিদা খাতুন শোনালেন গড় বিষয়ে লাগে ও সে আমার গোপন কথা মধুর কণ্ঠে। অনুশীলন ও শিক্ষায় যেন ঝলমল করছে।

ফাহমিদা শান্তিনিকেতনের শিল্পী সাজেদা খাতুনের বোন। সংগীত ও সংস্কৃতির অনুকূল পরিবেশেই তাঁর শিল্পী মানস গড়ে উঠেছে। বাবা ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন ন্যাশনাল প্রফেসর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্যেন বোসের সমসাময়িক এবং প্রশান্ত মহলানবীশের প্রিয় শিক্ষক।

রবীন্দ্রসংগীতে আমার প্রাথমিক শিক্ষা মানসিকতা এসব আমার দিদিরই গড়া। আমার সংগীতজীবন সুরু হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গান দিয়েই—গানের প্রসংগে ফাহমিদা বললেন বাবা নিজে ওস্তাদ রেখে গান শিখেছিলেন। দিদিদেরও শিখিয়েছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য বাবার ফেভারিট হবার দরুনই দিদির মধ্যেও রবীন্দ্রসংগীত প্রবণতা বর্তে ছিলো। এবং নজরুলগীতি ও ক্লাসিক্যাল ছাড়াও দিদি রবীন্দ্রসংগীত শিখতে সুরু করলেন। তারপর শান্তিনিকেতন এর্ম-এ পড়তে গেলেন। ব্যস আর পায় কে? এখন রবীন্দ্রসংগীতময় হয়ে আছেন।

একালের গান

বাবার ওস্তাদের ছেলে ওস্তাদ মুনীর হোসেন খাঁর কাছে ক্লাসিকাল গান শিখেছিলাম আড়াই বছর। সেই থেকে গান এত ভালো লেগে গেলো যে ম্যাট্রিকেও আমি গানই নিলাম। আর সংগে সংগে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষাও চলল দিদির কাছে। দিদি গান শেখানোর সংগে সংগে অর্থ ও বুঝিয়ে দিতেন। তার ফলে সংগীত ও সাহিত্য দিয়ে গড়া রবীন্দ্রসংগীতের একটা স্বপ্নময় জগৎ যেন অজানতেই মনকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। এ গান শুধু গান নয়—একটা ধ্যানের ছবি। মনের মধ্যে এই বোধ জেগেছিলো দিদিরই শিক্ষায়। এই ধারণা দৃঢ়তর হোলো পরে কলিম শরাফীর কাছে শেখবার সময়। উনি তখন দক্ষিণীর ছাত্র ছিলেন। এখন আছেন বাংলাদেশে।

কলিম ভায়ের স্নেহভরা শিক্ষা আমার দৃষ্টিভংগির মোড় ঘুরিয়ে দিলো। উনি উচ্চারণের ওপর খুব জোর দিতেন এবং রবীন্দ্রসংগীতে কথার জন্যই যে সুর এই কথাটিই সবসময় মনে রাখতে বলতেন। বই দেখে কখনও গাইতে দিতেন না। পাছে গানের মধ্যের সহজ আনন্দের সুর ব্যাহত হয়। ঐ একই কারণে উনি হারমোনিয়ম বাজিয়ে গাওয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। বেশী জোরালো আওয়াজে যদি গলার স্বাভাবিক সুর ঢেকে যায়? রেডিও স্টেজ-ভিশনের দিকেও উনি অনেকদিন ঘেঁষতে দিতেন না। পাছে গানের প্রতি একমুখীনতা

কেন্দ্রচ্যুত হয়ে যায় এখন বুঝি উনি কত দূরদর্শী ছিলেন।

আমার একখানিই রেকর্ড হয়েছিলো করাচীতে। এখনও তবে চোখে দেখিনি ওরা থাকে কলিমদার পরিচালনায়।

ফিল্মে? সালাউদ্দিন সাহেবের পরিচালনায় যাযাবর ছবিতে কলিম ভাই-এর পরিচালনায় গেয়েছি আমি তোমার সংগে বেরিয়েছি বাংলাদেশের ছবিতে সেই প্রথম রবীন্দ্রসংগীত।

গত বছর সাজাদপুরে কুঠিবাড়ীতে একটি ছেলে এসে আমার সংগে দেখা করে বলল এই গানই তাকে রবীন্দ্রসংগীত গাইবার প্রেরণা জুগিয়েছে। এবং এখন সে ভালই গায়।

রবীন্দ্র এবং নজরুলগীতি দুই-ই ভাল লাগলেও রবীন্দ্রসংগীতই আমার অনেক বেশী ভালো লাগে। কারণ নজরুল গীতিতে সুরের চটক অনেক সময়ই গানের সাহিত্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। রবীন্দ্রসংগীতে কথা ও সুর দুই ই যেন মুক্ত প্রাণের আনন্দে হাত ধরাধরি করে চ'লছে। কেউ কারো প্রতিযোগী নয়। উভয়েই উভয়ের সহযোগী। এ মিলন আর কোথাও নেই।

ক্লাসিক্যাল গানের প্রতি আকর্ষণের জন্যই কিনা জানি না ধ্রুপদ ও টপ্পা অংগের রবীন্দ্রসংগীত গাইতেই আমার বেশী ভালো লাগে যদিও সহজ গানেরও আলাদা একটা আবেদন আছে।

আমার বেশীর ভাগ গানই রেডিও থেকে মোহরদি ও নীলিমাদির গান টেপ করে শেখা। ওরাই আমার প্রিয় শিল্পী। ছেলেদের মধ্যে জর্জ দা।

ফৈয়াজদা যখন বাংলাদেশ গিয়েছিলেন ওর কাছে অনেক গান শিখেছি। মোহরদিও অনেক গান তুলিয়েছেন।

তবে ওপার বাংলা ও এপার বাংলার আরো বেশী ঘনিষ্ঠতা ও আদানপ্রদান দরকার।

ফাহমিদা এখন মৈমনসিংহ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৪২ সালে ওর জন্ম।

ফাহমিদার কাছেই জানা গেলো ওখানে সবচেয়ে জনপ্রিয় হোলো পল্লীগীতি। সিনেমার গানের জনপ্রিয় শিল্পী সাবিনা ইয়াসমীন। রবীন্দ্রসংগীত এখনও বিদগ্ধ মহলে সীমিত। সাধারণের মধ্যে ক্রমশঃ এগোচ্ছে 'ছায়ানট' ও 'বুলবুল ললিতকলা-কেন্দ্রের' মাধ্যমে। প্রথম সংস্থাটির প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন ওঁর দিদি সাজেদা খাতুন। রবীন্দ্রসংগীতপ্রীতির জন্য যুদ্ধের সময় তাঁর প্রাণও বিপন্ন হয়েছে।

'কোলকাতার এত আর্টিষ্ট আর এত-রকম গাওকে ও বিতর্ক যে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল বুঝি না। এখানের সংগীত সম্মেলনের সুশৃংখলা পরিবেশনায় মুগ্ধ না, [redacted] নেই।

হামিদা আতিকের কণ্ঠে শুনলাম 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়'। আরও দুটি গান। প্রতিটি গানই যেন অশ্রু-ভরা বেদনায় বেদনার্ত। গাইবার ধরণ এ সূক্ষ্ম কাজে ইনি এবং ফাহমিদা উভয়েই কনিকাধর্মী। এঁদের কণ্ঠসৌন্দর্যে সৃষ্টি-কর্তার পক্ষপাতিত্ব অনুভব করা যায়। ইনি ফাহমিদারই সমবয়সী। ১৯৪২-এ জন্ম। উনি বারবার বললেন আমি এখনও ইন্টারভ্যু দেবার যোগ্যতা অর্জন করিনি। আমার গান যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে সে কৃতিত্ব আমার নয় আতিকুলের (ওস্তাদ স্বামী)।' বলতে বলতে হাসিখুশীতে উজ্জ্বল মুখখানিতে নেমে আসে বেদনার ছায়া। সে আজ নেই। কিন্তু আমার মনে রবীন্দ্র-সংগীতের এই বাঁধভাঙ্গা বান এত তারই অবদান।'

হামিদার জন্ম নবদ্বীপে। ওটাই ওর মামারবাড়ী। বাবা ওয়াজেদ বক্স কৃষ্ণনগরে কেমিস্ট্রীর অধ্যাপক ছিলেন। দেশবিভাগের পর থেকেই ওঁরা ঢাকায়। ৮।৯ বছর ধরে বাংলার অনার্স পড়তে পড়তেই বিয়ে হোলো শান্তিনিকেতনের ছাত্র আতিকুল ইসলামের সংগে। তিনি তখন সংগীতভবনে শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন। 'আমার জীবনে গান নিয়ে এলেন তিনিই'—বিষণ্ণ অন্য-মনস্কতায় হামিদা বলেন 'ছোটোবেলায় আমি নাচতাম আর সেই ফাংশনেই গানে অংশ নিতেন আতিফুল। আমি পড়ি স্কুলে। তিনি কলেজে। তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত শুনেই এ গানের ওপর আমার আকর্ষণ জেগেছিলো। কিন্তু আমি চিরকালই খাম-খেয়ালী। নিয়মিত যত্ন নিয়ে কোনো কিছু শেখা আমার ধাতে ছিলো না। অনেক পরে বুলবুল ললিতকলা একাডেমীতে মোহরদিরা যখন 'শ্যামা'র দলবল নিয়ে গেলেন তখন মোহরদির গান শুনে সম্মোহিত হয়ে গেলাম। অনুভব করলাম এ গান আমার শিখতে হবে।

গান নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করবার পর বুলবুল একাডেমীতে ভর্তি হলাম। আমি আত্মবিশ্বাসী নই। সিরিয়াসও ছিলাম না। এখানে ভক্তিদার (ভক্তিময় দাসগুপ্ত) উৎ-সাহেই আমি এ বিষয়ে সত্যি করে মন দিলাম।

পরে শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে আতিকুল বুলবুল একাডেমীতে শিক্ষকতা শুরু করলেন। তখন আবার ভর্তি হলাম

এবারের প্রচ্ছদ

সেণ্ট এঞ্জেলা দুর্গের আলোক-চিত্র। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের গোড়ার দিকে, ষোড়শ শতক নাগাদ পোপের আধিপত্যে আসে রোম। এই যুগে রোমান ক্যাথ-লিক ধর্মের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় এই নগরী, এবং শিল্প সংস্কৃতির এক নবজাগরণ ঘটে এখানে। প্রচ্ছদে মুদ্রিত দুর্গের অনুরূপ আরো অনেক প্রাসাদ দুর্গ তৈরি করা হয়েছিল সেই সময়েই।

১৯৬১ সালে। গান শেখার সংগে সংগে আমাদের জীবনে আর একটা মধুর অধ্যায়ও শুরু হোলো—তারই পরিণতি—উভয়ের বিবাহ। ১৯৬৩ সালে।

তিনি রইলেন না। কিন্তু তাঁর দেওয়া রবীন্দ্রসংগীত-প্রীতি রইলো আমার হৃদয় জুড়ে। বিয়ের পর ১৯৬৪ সালে হাওয়াই ইউনিভার্সিটিতে একটা কলাদর্শিপ নিয়ে তিনি যখন গিয়েছিলেন আমিও ছিলাম ওঁর সংগী। সেখানে তিনি বাঙালী ও বিদেশিনীদের নিয়ে চিত্রাংগদা নৃত্যনাট্য করেছিলেন। আমি গান গেয়েছিলাম। খুব এ্যাপ্রিশিয়েটেড্ হয়েছিলো সে অনুষ্ঠান।

গত বছর কোলকাতায় টি ভি প্রোগ্রাম ওপনিং-এ বুমাদিদের কবরের পর প্রথম সোলো গান গেয়েছিলাম আমি। আমার সংগে এসেছিলেন সাবিনা ইয়াসমিন ও শাহ্ নওয়াজ বহমতুল্লা (গান) ও কাজল মাহমুদ (নাচ)।

রবীন্দ্রসংগীত কেন ভাল লাগে? উত্তরটা এত ব্যক্তিগত যে বলতে লজ্জা

করে। প্রথমতঃ কথা ও সুরের আশ্চর্য সামঞ্জস্য, দ্বিতীয়তঃ সব গানই আমার মনের প্রতিটি অনুভূতির অবিকল ছায়া। দুঃখের গান আমার মন টানে বোধহয় আমার স্বামী দুঃখবিলাসী ছিলেন বলে। রবীন্দ্রসংগীত শেখবার আগে আমি গীতবিতানে গানের কথা দেখে গান পছন্দ করতাম।

মোহরদি, সুচিত্রাদি, নীলিমাদি ও জর্জদা আমার প্রিয় শিল্পী। মোহরদির গলায় আছে আত্মমুখী বিরহের মূর্ছনা। এ গান ভাবুক মনকে দারুণভাবে নাড়া দেয়। সুচিত্রাদির গান সর্বশ্রেণীর শ্রোতার ভাল লাগে। তাঁর স্বচ্ছ, মুক্ত বাঙ্ময় প্রকাশভঙ্গির জন্য। জর্জদার গান যেন সোজা-সুজি মনকে ছুঁয়ে যায়। —সুবিনয়দার গানও খুব ভালো লাগে।

শৈলজাদার কাছে অনেক গান শিখেছি উনি যখন বংলাদেশে গিয়েছিলেন।

ওখানে রবীন্দ্রসংগীতে প্রসার আস্তে আস্তে হচ্ছে। অন্যান্য গান প্রফেশ্যনাল বেসিসে গাওয়া হয়—কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত এখনও নন্-প্রফেশন্যাল। কাজেই বুঝতেই পারছেন এ গানের শ্রোতা কত সীমিত শিক্ষিত মহল কিন্তু এ গানে পাগল।

কোলকাতাতেই প্রথম এতবড় এবং একসুসিভ্ রবীন্দ্রসংগীতের আসরে গাইলাম। প্রথমটায় ভয় ছিলো। কিন্তু এত সংবেদনশীল এখানকার শ্রোতারা যে, গাইতে বসে ভুলে গেলাম স্টেজ গাইছি।

হামিদা বাংলাদেশে শিল্পকলা একাডেমীর সাংস্কৃতিক বিভাগের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

রহিমভাই-এর কণ্ঠ ও গাইবার ভঙ্গিতে আছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রভাব। —অন্ততঃ ওর গওয়া 'এসোগো জেলেনী দিয়ে যাও'—শুনে তাই মনে হোলো।

জন্ম ১৯৩৫ সালে। দেশ পাবনা। উনি উপস্থিত ঢাকা রেডিওর ষ্টাফ। ওর বাবার ছিলো বদলীর চাকরী। তাই কোলকাতা, জলপাইগুড়ি ও ঢাকা জুড়েই রহিমের শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলি আবর্তিত।

ছোটবেলায় গাইতাম আধুনিক গান। বেশীর ভাগই হেমন্তদার রেকর্ড থেকে তোলা। জগন্ময় মিত্রও আমার ফেভারিট আর্টিস্ট ছিলেন—গানেরই মত গম্ভীর ও আড়ম্বরহীন রহিমের বলার ভঙ্গি। যশোরে থাকার সময় যখন আমি ক্লাস সিক্সের ছাত্র—সেই সময় স্কাউটে থাকার দরুন একটা সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় গান গাইতে হোলো। বাইরে গাওয়া শুরু হোলো তখন থেকেই।

১৯৫১ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর যশোর থেকে ঢাকায় বুলবুল ললিতকলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হতে ওখানেই ভর্তি হলাম নজরুল-গীতি শেখবার জন্য। এক বছর শিখেওছিলাম। কিন্তু তারপর আমার অগ্রজতুল্য ওয়ারেশ আলি খাঁ-ই। আমার রবীন্দ্রসংগীত গাইবার জন্য ক্রমাগত তাগিদ দিতে লাগলেন। উনিই আমায় মিনু আপা (সন্ধ্যাদি খাতুন), কলিম ভাই—সবার কাছে নিয়ে গিয়ে গান তোলাতেন। সেই থেকে রবীন্দ্রসংগীত গাইছি, রেডিওতে, টিভিতেও। করাচীতে একটা ডিস্ক বেরিয়েছিলো। তবে এখন আর পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্র সংস্কৃতিকে ভালবেসেই আমি রবীন্দ্রসংগীতকে ভালোবেসেছি। এ গানে আমার প্রকৃত গুরু ভক্তিময় দাসগুপ্ত।

১৯৭২ সালে কোলকাতায় এসেছিলাম দুদিনের জন্য। তখন গান গেয়েই চলে গেছি। পুরো সম্মেলন শোনা হয়নি। —এবারে প্রত্যেকটি দিনের প্রত্যেকটা অনুষ্ঠান শুনেছি। শুধুমাত্র রবীন্দ্রসংগীতের আসর এতদিন ধরে এবং একদিনে এতগুলো শিল্পীর গান শোনার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। আমাদের ওখানে পয়লা বৈশাখ, পাঁচিশে বৈশাখ এবং বাইশে শ্রাবণই শুধু রবীন্দ্রসংগীতের আসর হয়—তাও এত বড় করে নয়। এখানের সংগীতিজ্ঞা-যন্ত্রীবৃন্দের উচ্চমান আমায় মুগ্ধ করেছে। এঁদের সংগে গেয়ে খুব তৃপ্তি নিয়ে ফিরে যাচ্ছি।

দিদি সবলের ছবি তুললেন আমার তো তুললেন না?'—অভিমানভরে বললেন শাদেবী কিবরিয়া। ওঁদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো (জন্ম ১৯৫০) বলেই সবার আদুরে এবং সেইজন্যই একটু দুরন্ত। কি সহজেই এরা পরকে আপন করতে। সত্যিই ওর ছবি তুলতে ভুলে যাচ্ছিলাম গোলেমালে। ওর গানে জর্জদা ও চিন্ময়বাবু মিশে আছেন। কে স্পষ্ট হয়ে উঠবেন —'ছেলেমানুষী না কাটলে—বলা মুস্কিল। শুনতে খুবই ভালো লেগেছিলো ওর মুখখানি কর মলিন-বিধুর' ও 'আমার কণ্ঠ হতে—। সবজ মনের আবেগভরা কলেই বোধহয় এত মিষ্টি। ও এখন বাংলাদেশে পর্যটন বিভাগের সমন্বয় কর্মকর্তা।

দেশ পাবনা। বাবা গোলাম কিবরিয়া। ডাক্তার। বদলির চাকরীতে বহাল থাকার দরুন সারা বাংলাদেশ ওর ছোটোবেলাতেই ঘোরা হয়ে গেছে।

গান-বাজনার চর্চা ছিলো ওদের পরিবারে। অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রসংগীত, ঠুংরী, কীর্তন শুনেই গানের রুচি গড়ে ওঠে।

'আমার গানের প্রেরণা বাবা। জানেন দিদি, নাটোরের মহারাজা (বাবার রোগী ছিলেন) বাবাকে একটা হারমোনিয়ম উপহার দিয়েছিলেন। আমার বোনকে আধুনিক ও ক্ল্যাসিক্যাল শেখাবার জন্য শিক্ষক রাখা হয়েছিলো। ও শেখার পর হারমোনিয়মে চাবী দিয়ে চলে যেতো। আমি কাটা দিয়ে খুলে হারমোনিয়ম বাজিয়ে ঐ গান নিজেই তুলে গাইতাম আর বাবাকে শুনিয়ে মতামত নিতাম ঠিক হয়েছে কিনা।

বাবার কাছে একটা গান শিখি চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে'। তখন জানতাম না ওটা কার গান। একবার স্কুলে ছোটদের গানের কম্পিটিশন হয়েছিলো। সেখানে ঐ গানটি গেয়ে আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম। তখনই জানলাম এই গানটি হলো রবীন্দ্রসংগীত।

তারপর বাবারই উৎসাহে ছায়ানটে ভর্তি হলাম। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে কোলকাতা এলে চিন্ময়দা, অজিত রায় এঁদের কাছে শিখতাম।

ওঃ বলতে ভুলেছি। বুলবুল একাডেমী থেকে ডিগ্রী নিয়েছি। বাফা (আতিকুল) তখন সেখানে ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর একটা স্কলারশিপ নিয়ে দু'বছরের জন্য শান্তিনিকেতনে শেখবার সুযোগ পেয়েছি। মোহরদি, বাচ্চুদি, বীরেনদা সকলের স্নেহ ও সহযোগিতা আমার চিরদিন মনে থাকবে।

আতিকুল ইসলামই বাংলাদেশে আমার শেষ গুরু। ঢাকায় শৈলজাদার কাছেও কিছুদিন শিখেছি উনি যখন ছিলেন। খুবই সত্য করে শিখিয়েছেন।

একবার কোলকাতার এক ফাংশনে আমার গান শুনে মায়াদি আমায় গান শেখবার আমন্ত্রণ জানালেন। ওঁরই বাড়ীতে প্রথম জর্জদাকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। গলা শুনে যাঁকে তরুণ ভেবেছিলাম তিনি এমন বয়স্ক? তারপর অনেকদিন কোলকাতায় ছিলাম। অর্থ, স্নেহ, শিক্ষা সব দিয়ে এঁরা দুজন আমায় সাহায্য করেছেন। সে ঋণ ভোলবার নয়।

রবীন্দ্রসংগীত ভালবাসি—। কারণ আমার জগৎ, আমার স্মৃতি, ধারণা, আনন্দ, বেদনা—সবই মিলেমিশে একাকার হয়ে রয়েছে এই গানেই।

জানেন দিদি—ওখানে আর একটু গপ গানের দল আছে। প্রায় সব ফাংশনেই তার ডাক পড়ে। কিন্তু যে গানই গাই—গানের শেষে একটা রবীন্দ্রসংগীত থাকেই।

কোলকাতার শ্রোতা শিল্পী সাংবাদিক —সবাইকে আমার দারুন নিজের মনে হচ্ছে। আপনার কত লেখা পড়েছি। সেই আপনি আমার ইন্টারভ্যু নিতে আসবেন এটা আমার স্বপ্নেরও অতীত।

সন্ধ্যা সেন

শরৎ অমৃত বার্ষিকীতে বহু তথ্যসমৃদ্ধ সশ্রদ্ধ অর্ঘ্য—
শরৎচন্দ্র—মণি বাগচি—১৮৲
রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম • কাজী নজরুল ইসলাম • ২০৲
দেশবন্ধু • মণি বাগচি • ২০৲
মহানায়ক মুজিবুর-অন্যান্য-১০৲ মহাজীবন-অন্যান্য-২০৲
মোহন লাইব্রেরী : ৩৫ এ, সূর্যসেন ষ্ট্রীট • কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৫-৬৬৩৬

উপন্যাস

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আদ্য শেষ রজনী

সকালবেলার কাগজ কলকাতায় অন্তত বারজনের সকাল মাটি করে দিল। নীলকমল যাত্রা সমাজের দু' নম্বর সুজাতার ঢাউস পপার পাবলিসিটি। ভাবখানা—সেটাই যেন আসল সুজাতা। সেটাই এক নম্বর। পঞ্চমুখ যেন দু' নম্বর। খানিকটা থিয়েটার—খানিকটা যাত্রা পালা—দু' রকম পাবলিসিটির মিশেল দিয়ে কাগজের এক কলম জুড়ে ঘোষণা।

সুজাতায় ঐতিহাসিক যোগদান

শংকর

এলেন

দেখলেন

জয় করলেন

নীলকমল যাত্রাসমাজের

জন-চিত্তজয়ী সুজাতা

বঙ্গ রঙ্গালয়ের ইতিহাসে

নতুন নাম

শংকর

চা খেতেই রাস্তা থেকে সব ক'টা কাগজ আনালো অমিয়। সব কাগজেই এক পাবলিসিটি। বড়দেলের ইনসট্রুমেন্ট বকস থেকে স্কেল বের করে মেপে দেখলো অমিয়। কত কলম? কত সেন্টিমিটার? মেপে দেখে তো অবাক। সব ক'টা কাগজ মিলিয়ে বেশ কয়েক হাজার টাকার পাবলিসিটি। দীর্ঘ এক কলম। বাকিটায় চোখ বুলিয়ে অমিয় বুঝলো পাবলিককে ভড়কে দিয়ে নীলকমল পঞ্চমুখের দর্শক টানতে চাইছে। কলকাতায় নয়। কলকাতায় ওদের কাউজ নেই। কলকাতার বাইরে। কল শোয়ে। খয়রাশোল বামগঞ্জ মসনাগাড়ির দর্শকরা তো আর খুটিয়ে খোঁজখবর নিয়ে সুজাতা দেখতে যাবে না। তারা দেখবে সুজাতা। কোনটা এক নম্বর কোনটা দু' নম্বর তা খতিয়ে দেখার সময় নেই কারও। পঞ্চমুখের পাবলিসিটি থেকে চোখা চোখা কয়েকটা শব্দ তুলে নিয়ে নীলকমল ম্যাটার তৈরি করেছে।

কিন্তু শংকর? শংকর এটা কি করে পারলো? অমিয়র চা ঠান্ডা হতে লাগলো।

গত ফাল্গুনে মেদিনীপুর কোর্ট ময়দানে কল শো সেরে বাস বোঝাই হয়ে পঞ্চমুখ কলকাতায় ফিরছিল। রাত দুটো হবে। তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার। পরদিন বেলা দশটায় রবীন্দ্র সদনে সুজাতা। কাদের সাহাদের যেন টাকা তুলতে শো দিল। খড়গপুর কলেজ ছাড়িয়ে বম্বে রোড পড়ার মুখে ট্রাফিক আইল্যান্ডে একদল লোক বাসের ওপর চড়াও হোল। অমিয়র গাড়িও রেহাই পেল না। কী না পাঁচশো টাকা চাই।

সেই গোলমালে শংকর সবকিছু অরগানাইজ করে ফেললো। মাইকের স্ট্যান্ড বাঁশের লাঠি এলোপাথাড়ি চালিয়ে শংকর ফুল স্পীডে গাড়ি চালাতে বলল। শংকরের পায়ে লেগেছিল। পিঠে লেগেছিল। এই হোল গিয়ে টিম স্পিরিট।

এতগুলো বছরের আরও অনেক কথা এক সঙ্গে মনে আসছিল। শংকর সেই গোড়া থেকেই তাদের সঙ্গে আছে। অমিয় শংকরের সব জানে। বালক বয়সে মাতৃহীন। ওর বাবা ফিরে বিয়ে করেন। এই মা শংকরের আপন মায়ের চেয়ে বেশি। পনর ষোল বছর বয়সে বরানগরে নিজেদের পাড়ায় শংকর মুদির দোকান দিয়েছিল। গানের গলাটি ভালো। দোকানে বসেই বাউল গান গাইতে গাইতে সেই তালে হেরিকেনের চিমনি মুছে দাম বলতো—ছ'আনা। এর পর কোন খদ্দেরের সাধ্য আছে না কিনে!

তখন পাড়ায় থাকতেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকেলবেলা নিজের ছাদে বসিয়ে এই কিশোরের গান শুনেছেন অনেক দিন। আঠার বছর থেকেই সংসারের জন্যে আয় করে। তবু বাংলা ভাষায় ভালো বই সব তার পড়া।

এই শংকরের তো তাকে ছেড়ে যাবার কথা নয়। তবে কেন গেল? কেন? আমি ডিকটেটর হয়ে পড়েছি। অন্যের সুবিধে অসুবিধে বুঝি না? শংকর কি আরেকটু মনোযোগ চেয়েছিল? আরেকটু পাবলিসিটি? সে তো গ্রুপ থিয়েটারের আদত মানুষ। তার তো একই নাটকে আবড়ে পড়ে থাকার কথা নয়। তবে কি আরাম সিকিউরিটির হাতছানি শংকরের কাছে বড় হয়ে উঠেছিল?

এখন তো শংকরকে আমার সবচেয়ে বেশি দরকার। আমার শরীর খারাপ শংকর। আমি আগের মত খাটতে পারি না। ভাবতে পারি না। এবার তোমারই পঞ্চমুখের হাল ধরার কথা ছিল। সম্রাট নাটকে তোমাকে আমি কবি সাজাবো ভেবেছিলাম। দারুণ মানাতো। বিষণ্ণ কবি। গলায় গান।

অন্য সময় হলে শংকরের এই দলবদল লীলার কাছে বড় খবর হোতো। এখন নাটক পঞ্চমুখ গ্রুপ থিয়েটার সুজাতা ভরত হাউজ—কোনটাই কোন রকম খবর দিয়ে লীলাকে চমকাতে পারবে না। সে এ-সব ব্যাপারে কোন আগ্রহ পায় না। আগেকার দিন হলে অমিয় লীলাকে ডেকে বলতো। এখন লীলা থিয়েটার নিয়ে বড় একটা তার সঙ্গে কথা বলে না।

সকালবেলাতেই অমিয়র অন্ধকার লাগতে লাগলো।

ম্যাসাজ নিয়ে রজনী চান করে উঠেছিল। কাগজ দেখে অমিয়কে ফোন করলো। তিনবার চেষ্টা করেও লাইন না পেয়ে চুপ করে কাগজের দিকে তাকিয়ে থাকলো। থিয়েটার দল-বদল থাকবেই। বড়বাবুর আমল থেকে দেখে আসছে রজনী। কিন্তু? কিন্তু শংকর? আমাদের শংকর? সে কি করে পারলো? তাও এমন নাটকে গেল—যা কিনা তার নিজেরই এতদিনের কষ্টে দাঁড় করানো সুজাতা নাটকের দু' নম্বর—যার টিকে থাকা নির্ভর করছে এতদিন এক নম্বরের জাল নাটক হিসেবে—পাবলিককে ভাওতা দিয়ে—গা-গঞ্জের মানুষকে বুজরুকি দিয়ে। এখন শংকর এক নম্বর থেকে দু' নম্বরে গিয়ে তাকে এক নম্বরের চেহারা দিতে উঠে পড়ে লাগবে! আশ্চর্য!

চন্ডীর ঘুম ভাঙে বেলায়। অভ্যেস মত কাগজের পাতা উল্টে নীলকমলের পাবলিসিটিতে চোখ আটকে গেল চন্ডীর। তার কাছাকাছি আরেকটা কলমের তফাতেই পঞ্চমুখের পাবলিসিটি কেমন ফিকে করছে। কিন্তু শংকর? কোন্ শংকর? কোন

ভুলে অমিয়কে গেল। কোন্ শঙ্কর?

ওপাশ থেকে অমিয়র গলা ভেসে এল। আমাদের শঙ্কর! আর কাদের হবে চন্ডীদা!

চন্ডী দেখলো লাইন কেটে গেছে।

বিষ্ণু দত্ত পাবলিসিটি থেকে নীলকমলের কোন নম্বর দেখে ফোন করল। তখন বেলা এগারোটা হবে। নীলকমলে কেউ আসে নি। একজন চাকরের ছেলে নিয়ে শশাঙ্ক কাজ করছিল। কাজ মানে—ঝালদায় আর রানীগঞ্জে কল শোয়ের হিসাবপত্তর।

চাকরের ছেলেটি ফোন ধরে বলল কেউ আসে নি এখনো। শশাঙ্কবাবুকে ডেকে দেব?

শশাঙ্ক নিজে এসে ফোন ধরলো। হ্যালো।

শশাঙ্কবাবু কথাটা শুনেই বিষ্ণু সতর্ক হয়ে গেল। কোন্ শশাঙ্ক? রজনীর বিয়ে করা স্বামী নয়তো? কিন্তু আবার এসে জুটলো কোত্থেকে? তাও আবার নীলকমলে। সেখানে শংকর যোগ দিয়েছে। আচ্ছা এ শংকর পঞ্চমুখের নয়তো?

অনেক কথাই মনে আসছিল এক সঙ্গে। খুব সাবধানে গলা মোটা করে বিষ্ণু বলল আমরা বালি থেকে বলছি স্যার।

বলুন।

এ আপনাদের কোন্ সুজাতা? আমরা আরেক সুজাতার পাবলিসিটি দেখছি কাগজে—

ও জ্বালা মশাই। জ্বালা। আমরাই এক নম্বর।

ও তাই বলুন। আ আমরা বারনা নিয়ে কথা বলব ভাবছিলাম।

গদিতে চলে আসুন।

কার নাম নিয়ে বলবো দাদা?

কারও নাম দরকার নেই। সিধে চলে আসবেন।

এতদূর থেকে যাবো সার। আপনার নামটা যদি বলতেন।

দোতলায় উঠে এসে বলবেন শশাঙ্ক দত্তর সঙ্গে দেখা করবো।

সকালে বলাতেই যদি তৈরি থাকতো বিষ্ণু—তাহলে অনেক কথাই মুখে এসে যেতো তার। এবার সে খুব সাবধানে জানতে চাইলো এ শংকর কোন্ শংকর দাদা? কাহেকে যোগ দিলেন?

গদিতে আসুন না। বসে বসে কথা হবে।

পঞ্চমুখে ছিলেন। নাম দেখেছি যেন কাগজে—

ঠিকই দেখেছেন। জ্বাল নাটকে টিকতে পারেন নি বলেই চলে এসেন। অত নাম ডাকিনেমা—তার নাম শুনবেন না— এ কি হতে পারে!

বিষ্ণু লাইন কেটে দিয়ে গুম হয়ে বসে থাকলো খানিকক্ষণ। শংকর এ করেছে কি: স্যাপারটা কি? সব গোলমালে লাগছে। নিশ্চয়ই বিয়ে বিয়ে করে রজনী ঝোলানো ছেলেটাকে হাতছাড়া করতে চাইছে আমায়। রজনীর খেদানো স্বামী তাহলে এখন নীলকমলের অধিকারী! গলার স্বর ঠিকই শুনেছে সে।

বেস্পতিবার বেলা আড়াইটেতেও শংকর এলো না। চন্ডী একবার শংকরদের বাড়ি যেতে চেয়েছিল। অমিয় শান্ত গলায় বলল থাক। দরকার নেই চন্ডীদা। যার আসবার সে নিজে আসবে।

কিন্তু হিসেরপত্তরগুলো তো বুঝিয়ে দিয়ে যাবে। সব যে গুলিয়ে রয়েছে। ওর ওপরেই তো সব দেখাশুনোর ভার ছিল। এখন তো সব জট পাকিয়ে গেছে।

জট আপনা আপনিই খুলে যাবে। নাও চন্ডীদা—তুমি এবার পাজামা পাঞ্জাবি পরে নাও।

আমি?

হ্যাঁ তুমি আজ শংকরের জায়গায় শো করবে।

আমি তো সুজাতায় কোনদিন এ রোল করিনি অমিয়।

শুনতে শুনতে সব ডায়ালগই তোমার মুখস্থ চন্ডীদা।

তা আছে। কিন্তু গান?

এককালে তো টপ্পা গাইতে। তাই এক-খানা গেয়ে দেবে।

সে তো কতকাল আগে। পাবলিক কি নেবে?

ঠিক নেবে। তোমার জায়গায় আজ স্টেট ব্যাঙ্কের সেই ছেলেটা নামবে।

এভাবে এক হপ্তা দিব্যি চলে গেল। পরের বেস্পতিবার আভার রোলে কল্যাণী নেই। নেই অমিয়র ডাবল। ভাগ্যিস রজনী আজ তিরিশ বছর স্টেজে। অন্তত চল্লিশখানা নাটকে মহলা দিয়েছে। প্রায় তিনশো ক্যারেকটার আর্টিস্টকে চেনে।

শো শুরু হবার ঘন্টাখানেক আগে সেবক বৈদ্য স্ট্রীটে একটা ছোট মত বাড়ির সরু সিঁড়ি বেয়ে তেতলায় উঠে গেল। রাধা আছিস? রাধা?

একটি ছোট ছেলে বেরিয়ে এসে বলল আস্তে। মা ঘুমুচ্ছে।

ডেকে দে। বল গে রজনী মাসি এসেছে!

রাধা ঘুম চোখে উঠে এসে বলল কী ব্যাপার? রজনীদি! তুমি?

চল! চলো শাড়ি পরে নে। শো আছে তিনটেয়। মেক-আপ নিতে হবে তোর।

এতদিন পরে মনে পড়লো আমায়. তোমার এখন কত নাম—

পাকা পাকা কথা বলিস নি। চল—

আমি যাবো কি। ছেলের জন্যে ময়দা মেখে রেখেছি। ওর বাবা সকাল সকাল ফিরবেন। তখন গরম গরম লুচি ভেজে দেব।

তোর ছেলেকে হাউজে লুচি খাওয়াবো। প্রাণীর জন্যে চিঠি লিখে রেখে যা—

গাড়িতে রজনী সকল বাঁদিকের উইংসে থাকবি। অপেরার মধ্যে যাবে। আসছে সাজবেন। পারবি না?

তা পারবো।

এ রেস্তর্গা সরকারও সাইকোলজি না জানিস হলে গিয়ে একটা সুপার হাসবেন মতই দিতে হল। আভার রোলে সব ডায়ালগ রাধা রবিবারের ভেতর কণ্ঠস্থ করে ফেললো।

সোমবারের কাগজে নীলকমলের পাবলিসিটি বেরোলো। আসল সুজাতা! আসল সুজাতা!!

অমিয় পড়ে দেখে আস্তে নিজেকেই বলল একেবারে আসমার্কা!

সোম মঙ্গল বুধ—তিনদিন বেলা তিনটে থেকে সন্ধ্যে অবধি ফাঁকা হাউজে স্প্লাটের রিহার্সেল চলে। মঙ্গলবার বিকেলে পিনাকি চা খেতে খেতে রিহার্সেলের ফাঁকে কাকে যেন বলছিল শংকরদার মনে যদি এই থাকবে তাহলে আমরা আগে থেকেই সাবধান হতাম।

আরও যেন কী সব কথা কানে এল অমিয়র। ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে চুপচাপ ডায়ালগের শব্দ পাল্টাচ্ছিল। রিহার্সেলের সঙ্গে সঙ্গে অদল-বদল করা অমিয়র অভ্যেস।

স্ক্রিপ্ট থেকে চোখ তুলে অমিয় খুব আস্তে পিনাকিকে বলল শোন। আমার সামনে শংকরের নিন্দে কোরো না। এতদিন আমরা এক সঙ্গে ছিলাম।

রিহার্সেলের শেষে ফাঁকা হলে বিষ্ণু এসে যা খবর দিল—সবার আগে রজনী তা হেসে উড়িয়ে দিল। আমাদের শশাঙ্ক দত্ত? পাগল! সে হবে অধিকারী? তা হলেই হয়েছে। তবে আর আমার দুঃখু কিসের? কপাল খুলে গেল বিষ্ণু।

না। আমি গলা ঠিক চিনেছি ফোনে।

সকালে না বিকেলে ফোন করেছিলে?

সকালে। না। কিছু খাইনি তখন।

এখন কতটা খেয়েছো?

খেয়েছি পঁচটা। কিন্তু তাতে কি? আমি যা বলছি—সিওর না হয়ে বলছি না।

রজনী হেসে উড়িয়ে দিল বিষ্ণুকে।

অমিয় হাসতে হাসতেই বলল উত্তেজিত হবার কিছু নেই বিষ্ণু। শশাঙ্কবাবু নিজেও বহুকাল থিয়েটারের লোক। বড় দল করেছেন। কবিয়াল নাটক তাঁর হাত দিয়ে এই কলকাতায় খারাপ বিজনেস করে নি। তিনি নিজেই একটা দল খুলতে পারেন। এতে আশ্চর্য হবার কি আছে?

আশ্চর্য হই নি আমি। অন্য কথা ভাবছি।

কি কথা বিষ্ণু?

অধিকারী শশাঙ্ক দত্ত। পালার নাম সুজাতা। অভিনেতা পঞ্চমুখের শংকর। কল্যাণীও ভিড়েছেন গিয়ে। তাই বলছিলাম। আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না তামিয়।

বলার দরকার নেই। আপাতো ভাববারও কিছু নেই বিষ্ণু। তবে ফোনে কারও গলা ঠিক চেনা যায় না।

আমার ভুল হলে আমি খুশী হতাম অমিয়।

ইলেকট্রিকের স্পার্কের মত একটা ঝলক মিনিটের জন্যে ফাঁকা হলে অমিয় দিব্য রজনী চন্ডী রাধা—সবাই কেমন আবছা হয়ে গেল। উজ্জ্বল হয়ে উঠলো

অমিয় প্রথম কথা বলল। সম্রাটে কবি ক্যারেকটারটা লিখবার সময় আমি শংকরকে ভেবে নিয়েছিলাম। জানো বিকু।

সম্রাটের রিহার্সেলের দিনগুলোতে অমিয় রাত আটটা সাড়ে আটটার ভেতর বাড়ি ফিরে যায়। সকাল সকাল ফিরে নন্দ লাগে না। তখন পাড়া জেগে থাকে। বাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে না। ছেলেমেয়েরা দাপা-দাপি করে খেতে বসে। জ্যান্ত জিনিসপত্রের সঙ্গে দেখা হয় অমিয়র।

রিহার্সেলের পর আজ কিন্তু বাড়ি ফিরে অমিয় কঠিন অবস্থায় পড়লো। ছোট মেয়ে পরিষ্কার জানতে চাইলো শংকর কাকু আসে না কেন বাবা?

সময় পায় না। পেলেই আসবে।

কবে? অনেক দিন গান শুনিনি কাকুর।

শীগগিরি আসবে।

তোমাদের নতুন নাটকে শংকর কাকু নেই?

নতুন নাটকের কথা তুই জানলি কি করে?

দাদা বলছিল।

আর কি বলছিল রে?

শংকর কাকু নাকি আসছে না।

আসবে। সময় হলেই আসবে।

খাওয়া দাওয়ার পর লীলা দু' ঘরের মাঝখানটায় সরু ফালিতে স্কুলের সেকেন্ড টার্মিনালের খাতা নিয়ে বসেছে। এই সময় লীলা কালো ফ্রেমের বাইফোকাল চশমাটা চোখে দিয়ে নেয়। ক'দিন ধরেই দেখছে অমিয়। ওই একই জায়গায় বসে খাতা দেখে লীলা।

কোথায় অমিয়র সাজঘর। এক জোড়া গাড়ি। দু'জন ড্রাইভার। ইন্টারকম টেলি-ফোন। সাজঘর আর ক্যান্টিন মিলিয়ে দু' দুটো ফ্রিজ। স্টিরিও টেপ রেকর্ডার। এছাড়া একটা ভ্যাকাম ক্লিনারের অর্ডার দেওয়া হয়েছে। কার্পেট স্টেজ—সব জায়গা থেকে ধুলো শুষে নেবে মেশিনটা। সামনের মাসেই ডেলিভারি দেবে।

আর এখানে! অমিয় তার খাটে বসে বসে দেখছিল। তারই বিয়ে করা বউ মাসান্তে গুটি-কয় টাকার জন্যে চোখে চশমা লাগিয়ে ছাত্রীদের খাতা থেকে অঙ্ক খুটে খুটে খাচ্ছে।

এক রকমের রাগ হল লীলার ওপর। আবার মায়া এসে সে-রাগ মুছে দিল। বেশ ছিলাম ওষুধের কোম্পানির চাকরিতে। তখন লীলা আমার সঙ্গিনী ছিল। সব নাটকের খোঁজ নিত। ওপেন এয়ার থিয়েটার ভাড়া নিতে হলে টাকা দিত এই লীলা। এখন সে নতুন নাটক নামানো হচ্ছে জেনেও একটা কথা বলে নি—কোন কিছু জানতে চায় নি। তখন টেলিফোন করতে হলে ডাক্তারখানা কিম্বা ডাক-ঘরে যেতে হোত। ওন ইওর ওন টেলিফোন স্কীমে টেলিফোন এসেছে এ-বাড়িতে। কিন্তু লীলা একটা দিন সখ করে ডায়ালও করে দেখে না আজকাল।

আমার দিকে একবার তাকাবে না?

খাতা থেকে চোখ তুললো না লীলা।

পঞ্চমুখের নতুন নাটকের রিহার্সেল চলছে।

জানি।

কোন্ নাটক বলতো লীলা।

চোখ না তুলেই লীলা বলল সম্রাট।

তুমি একবার খোঁজ নিলে না পর্যন্ত। তুমিই তো বলেছিলে—আমরা পয়সার লোভে সিকিউরিটির লোভে সুজাতা নাটক নিয়ে পড়ে আছি। এবার দ্যাখো আমরা কেমন পালটাচ্ছি।

লীলা মাথা নিচু করে নম্বরের টোটাল দিচ্ছিল। তাই দিয়ে যেতে লাগলো। একবার অমিয়র দিকে তাকালোও না।

ভয় পেয়ে শংকর চলে গেছে।

লীলা নতুন একখানা খাতা দেখতে দেখতে বলল জানি।

জেনেও তুমি কিছু জানতে চাও নি? এটা কেমন ব্যাপার? খানিক অপেক্ষা করে অমিয় বুঝলো লীলার কাছ থেকে এ-কথার কোন জবাব পাওয়া যাবে না।

(চলবে)

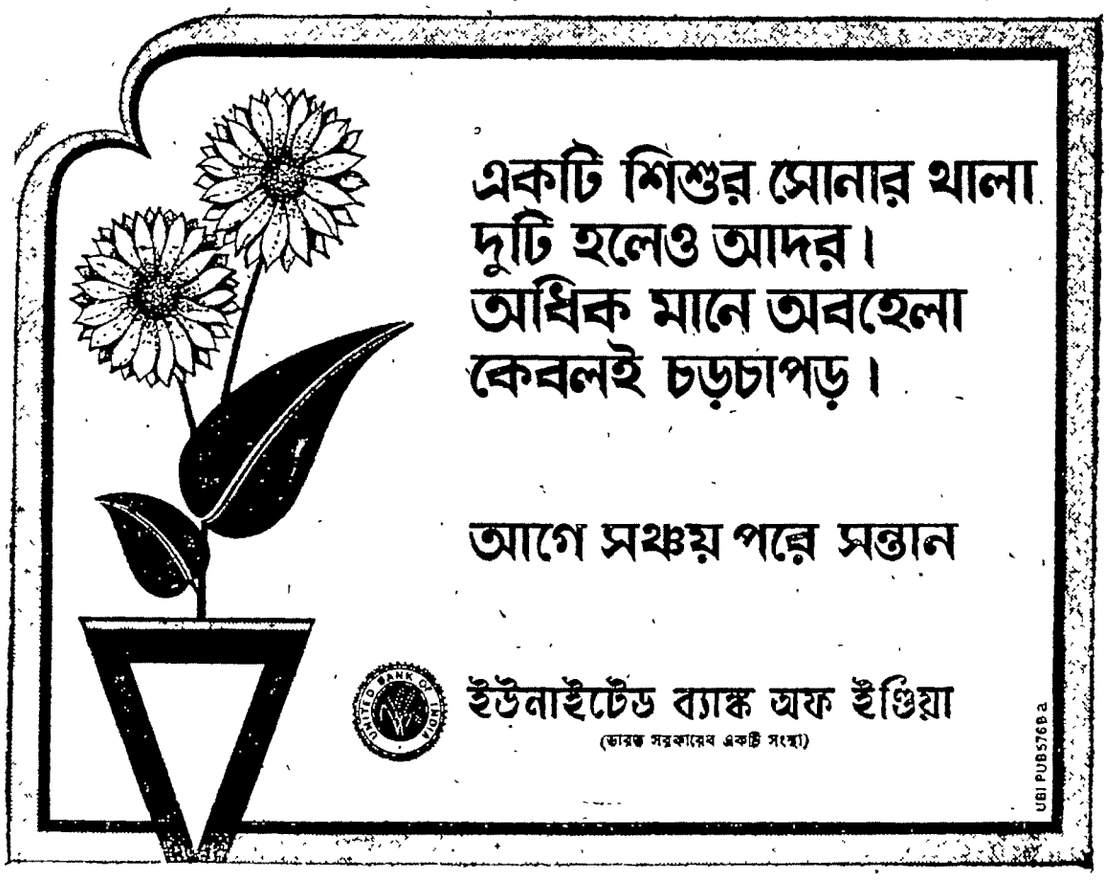

বিজ্ঞানের কথা

বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ পরিবেশকে রক্ষার প্রয়াস

যুদ্ধের সময়ে পরিবেশের ক্ষতি হয়ে থাকে প্রধানত দু-ভাগে। প্রথমত ইচ্ছাকৃত ক্ষতি বা ঘটনাচক্রে সংঘটিত ক্ষতি। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের পদ্ধতি হিসেবে পরিবেশের অদলবদল ঘটানোর ক্ষতি। ইচ্ছাকৃত ক্ষতি করা হয় যাতে শত্রু বাহিনী আড়াল না পেতে পারে ফসল ধ্বংস হয় বা দেশের মানুষকে ভয় পাইয়ে দেওয়া যায়। ব্যাপারটা অবশ্যই উদ্বেগের বিষয়।

সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে আরো উদ্বেগের বিষয়—পরিবেশকেই যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা। যেমন, কৃত্রিম বৃষ্টি বা কুয়াশা বা শিলাবৃষ্টি ঘটানো। বা এমন কি ভূমিকম্প তৈরি করা, সাইক্লোন ডেকে আনা বন্যা বইয়ে দেওয়া। এসব কারখানা ইচ্ছা মতো ঘটানো চলে কিনা তাই নিয়ে গবেষণার কথা শোনা যাচ্ছে যদিও বলা হচ্ছে সমস্ত গবেষণাই নাকি শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে। বলা বাহুল্য, গবেষণা সফল হলে তার সামরিক প্রয়োগ ঘটা মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নয়। ইতিমধ্যেই জীবমন্ডল সম্পর্কে দারুণ একটা উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে। উৎকণ্ঠার কারণ সাম্প্রতিক যুদ্ধগুলিতে ও বিশেষ করে ইন্দোচীনের যুদ্ধে অত্যন্ত প্রকটভাবে প্রকাশ পেয়েছে আধুনিক যুদ্ধে পরিবেশ কিভাবে বিপর্যস্ত হয়। দক্ষিণ ভিয়েতনামের অর্ধেক অরণ্য নষ্ট করা হয়েছে গাছপালা ধ্বংস করার ও গাছের পাতা ঝরিয়ে দেবার রাসায়নিক ব্যবহার করে। সামরিক উদ্দেশ্যে এমন প্লান এঁটে জীবমন্ডলের হানি ঘটাবার ঘটনা বিশেষ ইতিহাসে তুলনারহিত। বিষয়টির ওপরে আরো নজর পড়েছে এই কারণে যে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে পরিবেশগত পদ্ধতির ব্যবহার নিষিদ্ধ করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি নিয়ে কথা চলছে। অন্য দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভ আভাস দিয়েছে যে অতিবিধ্বংসী নতুন যুদ্ধাস্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে। এমন মনে করার কারণ আছে যে এই অতিবিধ্বংসী যুদ্ধাস্ত্র হচ্ছে জিওফিজিক্যাল অস্ত্র।

যুদ্ধের ফলে পরিবেশ বদলে যায় এ-বিষয়ে আন্তর্জাতিক জগতে একটা ভাবনাচিন্তা অনেক আগে থেকেই ছিল। তাই কিছু কিছু চুক্তিও সম্পাদিত হয়েছে। যেমন, ১৯২৫ সালের জেনিভা প্রোটোকল। এতে যুদ্ধের সময়ে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার ও জীবাণু ব্যবহার নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। ১৯৬৩ সালে সম্পন্ন হয়েছে নিউক্লিয়র অস্ত্রাদির আংশিক পরীক্ষা বন্ধ চুক্তি। এই চুক্তি অনুযায়ী বায়ুমন্ডলে বা মহাকাশে বা জলের নিচে নিউক্লিয়র অস্ত্রাদির পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ, কেননা এমনি সব বিস্ফোরণের ফলে পরিবেশ তেজস্ক্রিয়তায় বিষাক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৭২ সালে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে জৈব ও বিষাক্ত অস্ত্রাদির উদ্ভাবন উৎপাদন ও মজুদকরণ নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে।

১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটে প্রস্তাব নেওয়া হয় যে যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে পরিবেশগত বা জিওফিজিক্যাল পরিবর্তন ঘটাবার জন্য গবেষণা ও পরীক্ষা কার্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গভর্নমেন্ট অন্যান্য দেশের গভর্নমেন্টের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন করুক। এক বছর পরে নিকসন-ব্রেজনেভ আলোচনার সময়ে যৌথ বিবৃতি প্রকাশিত হয় যে বিষয়টি নিয়ে দ্বিপাক্ষিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অতঃপর ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাব করে যে পরিবেশ ও আবহাওয়া ও ঋতুর বদল ঘটাতে পারে এমন সকল কাজ নিষিদ্ধ করার জন্য একটি সম্মেলন ডাকা হোক। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা এবং মানুষের মঙ্গল ও স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হলে সামরিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ-ধরনের কার্য কিছুতেই চলতে পারে না।

যে সমস্ত কার্য বন্ধ করার কথা বলা হল তার তালিকাটি দীর্ঘ। যথা, আবহাওয়ার বদল ঘটানো ভূকম্পন ঘটানো বায়ুমন্ডলের ওজোন-স্তরে বিপর্যয় ঘটানো ভূ-স্তরের অদলবদল ঘটানো, উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের বাস্তু সংস্থানে বিপর্যয় ঘটানো ইত্যাদি।

১৯৭৫ সালের আগস্টে জেনিভায় অনুষ্ঠিত নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত কমিটির সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন একযোগে অনুরূপ খসড়া পেশ করে। খসড়ায় বলা হয় যে এমন কোনো সামরিক বা শত্রুতা সাধনের উদ্দেশ্যমূলক কার্যকলাপে কোনো পক্ষই লিপ্ত হবে না যাতে পরিবেশের অদলবদল ঘটে।

অমৃতাঞ্জন

ব্যথা বেদনা, ঠাণ্ডা লাগা ও মচকানির জন্য একটি বহুমুখী ঘরোয়া দাওয়াই

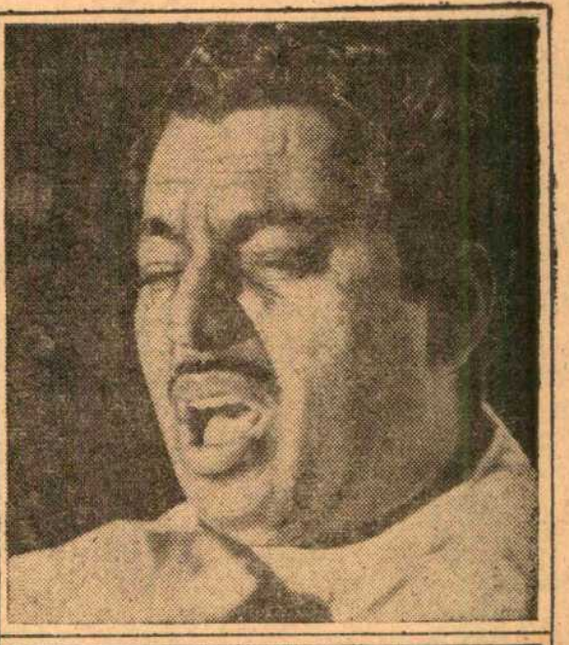

আপনার ব্যথাস্থানে, ঠাণ্ডা-লাগা ও মচকানো জায়গায় সামান্য পরিমাণ আরামদায়ক অমৃতাঞ্জন লাগিয়ে মালিশ করুন। কয়েক মিনিটের মধ্যে এর দশটি ভেষজের কার্যকারিতা অনুভব করবেন এবং আপনি অনেক আরাম বোধ করবেন।

অমৃতাঞ্জন—জার, শিশি ও ছিমছাম কমদামী টিনের কৌটোয় পাওয়া যায়।

অমৃতাঞ্জন
৮০ বছরেরও বেশি
সময় ধরে বিশ্বস্ত
ঘরোয়া রোগপ্রতিষেধক

অমৃতাঞ্জন লিমিটেড

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে জিওফিজিক্যাল অস্ত্র নিষিদ্ধ করার পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের একজন প্রধান প্রবক্তা হচ্ছেন আকাদেমিসিয়ান ই কে ফিওদোরোভ। তিনি হচ্ছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমির ফলিত জিওফিজিকস ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ এবং পরিবেশগত যুদ্ধের সমস্যা বিষয়ে সোভিয়েত গভর্নমেন্টের প্রধান উপদেষ্টা। সম্প্রতি মস্কোর এক সভায় তিনি বলেছেন শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে শিলা-মেঘের অদলবদল ঘটাতে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা সফল হয়েছেন। তার ফলে চল্লিশ লক্ষ হেকটর জমির ফসল রক্ষা পেয়েছে। রেডার মারফৎ প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে থাকতেই শিলা-মেঘ গড়ে ওঠার খবর পাওয়া যায়। তখন বিমান-বিধ্বংসী কামান ও মিসাইলের সাহায্যে এমন সমস্ত বিস্ফোরণ সেই মেঘের ওপরে লাগা হয় যাতে বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ড তৈরি হতে না পারে। ফিওদোরোভ বলেছেন এই পদ্ধতিতে শিলাবৃষ্টির দরুন ক্ষতি চার-পাঁচ ভাগ পর্যন্ত কমানো গিয়েছে।

১৯৬৭ সালের মার্চ থেকে ১৯৭২ জুলাই পর্যন্ত মার্কিন বাহিনী ভিয়েতনাম প্রতি বছর কয়েক শত আক্রমণ চালিয়েছিল যে দু মিনি সড়কের ওপরে স্বাভাবিক বর্ষাকালীন বৃষ্টিপাত আরো বাড়িয়ে তোলার জন্য। এই উদ্দেশ্যে বিমান থেকে সিলভার ও লেড আয়োডাইড ছড়িয়ে মেঘ নিষিক্ত করা হত (আড়াই হাজারেরও অধিক আক্রমণে ছড়ানো হয়েছিল প্রায় ৫০,০০০ পেটি)।

পরিবেশগত যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে আরো যে-সব বিষয়ের উল্লেখ করা হয়—যেমন বজ্রপাত, ঝঞ্ঝা ও টাইফুন ও সাইক্লোন, ভূমিকম্প ইত্যাদি—তা এখনো পর্যন্ত বাস্তবে ইচ্ছামতো ঘটানো সম্ভব হয়নি। তবে বায়ুমণ্ডলের ওজোন-পর্দায় ঘাটতি ঘটানো এখনই সম্ভব। তার ফলে সূর্য থেকে ক্ষতিকর বিকীরণ বিনা বাধায় ভূপৃষ্ঠে পৌঁছে যেতে এবং জীবজগতে বিপর্যয় ঘটাতে পারে।

তবে এসবের দরকার নেই, শুধু ভাবা যাক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে নিউক্লিয়র যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। তাহলে, এক কথায় বলা চলে সমস্ত সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য। এমনকি যদি শুধু ইউরোপে একটা কৌশলমূলক নিউক্লিয়র যুদ্ধ ঘটে এবং ইউরোপে মজুদ নিউক্লিয়র অস্ত্রের অংশমাত্র ব্যবহৃত হয় তাহলে ইউরোপের আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না।

ভিয়েতনামে মার্কিন বোমাবর্ষণ ছিল প্রচণ্ডরকমের তীব্র। ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৩ সালের মধ্যে একমাত্র দক্ষিণ ভিয়েতনামেই আমেরিকানরা ১ কোটি ১০ লক্ষ বোমা ফেলেছে। আর কামান দিয়ে দেগেছে ২১ কোটি ৭০ লক্ষ গোলা। দুয়ে মিলিয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিনীদের দ্বারা বর্ষিত উচ্চ-বিস্ফোরকের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭০ লক্ষ টন। ভিয়েতনামে যদি সাত বছর ধরে প্রতি পাঁচদিন অন্তর একটি করে হিরোশিমা ধরনের পরমাণু বোমা ফেলা হত তাহলেও একই ফল দাঁড়াত।

এর ফলে যে পরিবেশগত ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা গোটা দেশের অর্ধাংশ ধ্বংস হয়ে যাবার শামিল। লক্ষ লক্ষ হেকটর এলাকা জুড়ে লক্ষ লক্ষ গাছ ও বনাপ্রাণী একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

এই বিপুল বিস্ফোরণের ফলে তৈরি হয়েছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গহ্বর—তার ফলেও পরিবেশের ক্ষতি বড়ো কম নয়। হিসেব থেকে জানা যায়, দক্ষিণ ভিয়েতনামে মোট গহ্বরের আয়তন ২০০ কোটি ঘনমিটার। যুদ্ধের দরুন সরাসরি ক্ষতি হওয়া ছাড়াও এর ফলে বাসভূমি বিপর্যস্ত হয় ও পরিবেশের ক্ষতিকর অদলবদল ঘটে থাকে। বাস্তুসংস্থান দীর্ঘমেয়াদী অদলবদল ঘটে যাওয়ার বিপদ যে কতখানি গুরুতর তা কল্পনা করাও শক্ত।

গাছপালা ও লতাপাতা ধ্বংস করার জন্য ভিয়েতনামে ব্যাপকভাবে রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়েছে। ধ্বংস হয়ে গিয়েছে অরণ্য, ফলের গাছ ও ফসল। একমাত্র দক্ষিণ ভিয়েতনামেই ১৭ লক্ষ হেকটর জমিতে এই সর্বনাশ ঘটানো হয়েছে। তার ফল যে কতখানি মারাত্মক হতে পারে ও কত দীর্ঘকাল ধরে চলতে পারে তাও কল্পনা করা শক্ত।

ভিয়েতনামে আরো একটি ব্যাপার ঘটেছে। তা হচ্ছে ব্যাপক এলাকা জুড়ে জমি সাফ করে দেওয়া। এজন্য ব্যবহার করা হত ৩৩-টনের সাঁজোয়া ট্রাকটর। এই ট্রাকটরের কথা যে-কোনো আকারের গাছ উপড়ে ফেলতে পারে। তিনটি করে ট্রাকটর একসঙ্গে চালানো হত এবং দিনে ৪০ হেকটর থেকে ১৬০ হেকটর পর্যন্ত এলাকা একেবারে সাফ হয়ে যেত। এমনিভাবে একমাত্র দক্ষিণ ভিয়েতনামেই ৩,৫০,০০০ হেকটর অরণ্য নিশ্চিহ্ন হয়েছে, উপরন্তু নিশ্চিহ্ন হয়েছে হাজার হাজার হেকটর এলাকায় রবার বাগান, ফলের বাগান, ফসলের ক্ষেত ও জলসেচ ব্যবস্থা। তার ফল যে কী মারাত্মক হয়েছে, হয়ে আছে, এবং দীর্ঘকাল ধরে হয়ে থাকবে, তাও কল্পনা করা শক্ত।

যে-সব এলাকা এমনিভাবে সাফ করে ফেলা হয়েছে সেখানে কিছু নিচু জাতের উদ্ভিদ ছাড়া আর কিছুর ফলন সম্ভব হয়নি। গোটা পরিবেশটাই বদলে গিয়েছে। প্রাণী বলতেও আছে কিছু নিচু জাতের।

সামরিক উদ্দেশ্যে পরিবেশের এমন মারাত্মক বদল ঘটানোর ব্যাপারটা অবশ্যই অধিকাংশ মানুষের কাছে গভীর উদ্বেগের বিষয়। অতএব জিওফিজিক্যাল অস্ত্র নিষিদ্ধ করার পক্ষে বিপুল সমর্থন থাকাটা স্বাভাবিক। একথা মনে রাখা দরকার যে জিওফিজিক্যাল অস্ত্র নিষিদ্ধ না হলে অবশ্যই যুদ্ধের প্রয়োজনে ক্ষেত্রে তোলা হবে। আরো মনে রাখা দরকার, ইতিমধ্যে সামরিক প্রয়োজনে পরিবেশকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে। তাতে যতোটুকু সামরিক প্রয়োজন সিদ্ধ হচ্ছে তার তুলনায় ক্ষতি অনেক বেশি। অতএব এই ব্যাপারটাকে নিষিদ্ধ করার প্রয়োজন আরো অনেক বেশি। ভিয়েতনামের যুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো অপরাধ করা হয়েছে গাছপালা ধ্বংস করার জন্য রাসায়নিক ব্যবহার করায়। তারপরে ফসল ইত্যাদি ধ্বংস করার জন্য নির্বিচার বোমা ফেলায়। এমনি অপরাধের বিরুদ্ধে শুধু ধিক্কার নয়, প্রবল একটি নিষেধ অবিলম্বে গড়ে তোলা দরকার।

জয়ন্তকান্ত

কনাট সার্কাসের 'কফি কর্ণারে' তখন আমাদের নিয়মিত আড্ডা। নতুন খুলেছে। বড় হল ঘরে কম করেও কুড়িটা টেবিল। এক একটা টেবিল ঘিরে চারটে করে বেতের সোফা। চারজনের বেশী হলে এ-পাশ ও-পাশ থেকে চেয়ার টেনে নেওয়া হোত। দরকার পড়লে দুটো টেবিল একত্র করে দশ বারোজনে বসতাম। 'কফি কর্ণারে' পাওয়া যেতো কফি স্যান্ডউইচ ওমলেট আর কাজু বাদাম বাস। আমরা প্রথম দিনেই বুঝে-ছিলাম কোন অনভিজ্ঞ লোক ব্যবসায়ে হাত দিয়েছে কিছু লোকসান খেয়ে বন্ধ করে দেবে। দিয়েছিলও তাই। বছর দুই পর দুঃখের সঙ্গে একদিন দেখলাম কফি কর্ণারের সাইন বোর্ড পাল্টে একটা ব্যাঙ্কের সাইন বোর্ড টাঙ্গানো হয়েছে। কোলাপসিবল গেট বন্ধ ভিতরে ছুতোর মিস্ত্রি ব্যাঙ্কের কাউন্টার তৈরী করছে।

কিন্তু সে কথা থাক্।

'কফি কর্ণারে' প্রথম দিন থেকেই আমাদের কত স্মৃতির সত্য। মাথাপিছু এক কাপ করে কফি খেয়ে দু' ঘন্টা আড্ডা মেরে গেলে মালিক মনে করতো আমরা ওকে কৃতার্থ করেছি। ও শুনেছিল খদ্দের খদ্দের টানে। আমরা চার পাঁচজন বসে আছি দেখলে যদি উটকো খদ্দের ঢুকে পড়ে আর পড়ে তাও মাঝে মাঝে।

মাসিয়ে আমাদের আড্ডায় যোগ দেবার পর দিন থেকে আমাদের কেউ কেউ কালো কফি শুরু করলাম পর সেটাই হয়ে দাড়ালো আড্ডার বৈশিষ্ট্য। মালিক খুশী হতো এই ভেবে যে তার দুধ বাঁচছে।

আড্ডার যা নিয়ম কোনদিন হয়তো খুব জমে গেল এখান ওখান থেকে চেয়ার টানতে হোল। কবি নিমচাঁদ তার সদ্য রচিত কবিতা শোনালেন মাসিয়ে পাইপে তামাক ভরতে ভরতে কয়েকটা সর্বাধুনিক ফরাসী গল্প শোনালো যার মূল বিষয় উচ্চ সমাজের ফরাসী যুবকরা খোলাখুলি পতি চাবিবাদের সঙ্গে প্রেম করতে থাকায় নতুন কি সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। বিজন মুখ খুলে'ই নব-নাট্য আন্দোলন নিয়ে তর্ক উঠতো। মনোজের প্রিয় বিষয় ছিল সাংলা সাহিত্যে আজকাল বিদেশী যৌন সাহিত্যের ভেজাল কি পরিমাণ বাড়ছে তার ভুরি ভুরি উদাহরণ তুলে ধরা। নিয়মিত আড্ডাধারীদের মধ্যে শুধু একজন মলয় সেন মুখ খুলতো না।

মলয়ের একটা দোকান ছিল গোল মার্কেটে। তিনটে নাগাদ সে পৌঁছত কফি কর্ণারে আর আড্ডা ঘতই জমে উঠুক না কেন পাঁচটা বাজলেই সে উঠে পড়তো। অনেক দিন কফি কর্ণারে ঢুকে দেখেছি মলয় একা বসে। তারপর আমরা দুজন। পাঁচটা পর্যন্ত অন্য কারো পদার্পণ ঘটলো না। পাঁচটা বাজ'ল মলয় উঠে গেলে এক সঙ্গে প্রবেশ পার্ল মিঠু বিজন আর মনোজ এসে পড়লো।

একদিন একটু সকাল সকাল পৌঁছে দেখি মলয় এক কাপ কালো কফি নিয়ে বসে সিগারেট ফুঁকছে। আমি গিয়ে বসতেই বেয়ারাটা পট আর কাপ রেখে গেল। মলয় বললো দ্যাখ কদিন ধরে তোর সঙ্গে একটা কথা আলোচনা করবো ভাবছি কিন্তু সুযোগ পাচ্ছি না।

বললাম শুরু কর। মলয় বল'লা সমস্যাটা একটু জটিল কিছুটা সময় লাগবে আমাদের আলোচনার মধ্যে কেউ এসে পড়ুক তা চাই না। তাই বলছিলাম অন্য কোথাও বসলে হয় না?

আমি বললাম অন্য কোথাও যেন অন্য সময় বল। সকালের দিকে তুই কি করিস?

দোকান।

কতক্ষণ?

দশটা থেকে বারোটা। তারপর খেয়ে চলে যাই।

'তা হলে এক কাজ কর না কাল ম্যাটিনীর পর দোকান সেরে এখানে চলে আয় দুপুরের খাওয়া সারা যাবে কফি স্যান্ড উইচ আর ওমলেটে।'

পরদিন মলয় এলো ঠিক সময়ে। এসেই ডবল ডিমের ওমলেট দু' প্লেট করে স্যান্ড-উইচ এবং কফির অর্ডার দিল। খাওয়া শুরু করলাম কিন্তু মলয় কথাটা পাড়ে না। বুঝলাম কোথা থেকে আরম্ভ করবে তা মুখে উঠতে পারছে না। ওর মুখে কথা যুগিয়ে দিলাম। বললাম তোর সমস্যাটা কি! মেয়ে ঘটিত?

মলয় বললো হ্যাঁ।

প্রেমে পড়েছিস?!

'না। তাহলে সমস্যা সমাধানের জন্যে তোর পরামর্শ চাইবো কেন? এটা অতি জটিল।'

তারপর মলয় যা বললো সংক্ষেপে তা এই :

মলয়ের দূর সম্পর্কের এক মাসিমা আছেন যাকে সঙ্গে নিয়ে মলয়কে মধ্যে মধ্যে যেতে হয় কোন এক মিসেস গুপ্তের বাড়ী। মিসেস গুপ্ত মাঝবয়সী বিধবা উচ্চশিক্ষিতা দিল্লীর সমাজে ওপরতলার মহিলা। ওঁর দুই ছেলে একজন খ্যাত-নামা সাইকিয়াট্রিস্ট বিবাট পদার অন্য জন সুপ্রীম কোর্টের প্রথম শ্রেণীর এ্যাড-ভোকেট। এদের ছোট একটি বোন আছে যার বয়স আঠার-উনিশ হবে কুমারী। মিসেস গুপ্ত মলয়ের মাসিমার নিকট-আত্মীয়া। মলয় যেদিন তার মাসিমাকে নিয়ে মিসেস গুপ্তের বাড়ী যেতো সেদিন মলয়ের বেশ কিছুটা সময় কাটতো চরম ক্লান্তির মধ্যে। তাকে নিচের তলায় ড্রয়িং-রুমে একা বসে থাকতে হোত মাসিমা উঠে যেতেন দোতলায়। মাঝে একবার চাকর এসে তাকে চা-জলখাবার দিয়ে যেত তারপর আর কারো দেখা পেত না। ড্রয়িংরুমে সাজানো পুতুল ছবি দেখে আর কয়েকটা ইংরাজি ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে সময় কাটতে চাইতো না। দোতলায় কে বা কারা থাকে মলয় দেখার সুযোগ পায় নি শুধু শুনেছে। এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা কখনো কখনো দু' ঘন্টা পর মাসিমা নেমে আসতেন। প্রথম তো চাকরের মত মাসিমার সঙ্গে তার বড়লোক আত্মীয়ার বাড়ী যেতে ভালো লাগতো না তার ওপর সেই বড়লোকের বাড়ীতে গিয়ে সে পেতো চাকরের ব্যবহার। সবচেয়ে খারাপ লাগতো ঐ বসে থাকা। কিন্তু কি করবে মাসিমাকে সে না বলতে পারতো না। মলয়ের পরিবারের লোকেরা মাসিমার স্নেহ বহুভাবে উপকৃত।

এইভাবে চলছিল। সপ্তাহ দু' সপ্তাহ পরে মলয়ের এই শাস্তির দিন আসতো। মলয় নীরবে সে শাস্তি সহ্য করতো। তারপর একদিন এক কান্ড ঘটলো। মাসিমা ওপরে উঠে যাবার পর মলয় যথারীতি একটা পুরনো ইংরাজি ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে [illegible] এমন সময় পায়ের শব্দ চেয়ে দেখলো সামনে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে—মেয়ে নয় যেন প্রতিমা। মলয় মুখ তুলতে মেয়েটি ফিক করে হাসলো। তারপর সোফা মলয়ের পাশে প্রায় গা ঘেঁষে বসে মলয়ের হাতে ধরা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে লাগলো। মলয়ের শরীর তখন একেবারে কাঠের মত। মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো তুমি বই পড়বে? মলয় হ্যাঁ না একটা কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় একটা চিৎকার কানে এলো—লীনা লীনা! তারপর সিঁড়ি দিয়ে কারো নামার শব্দ। মলয় চোখ তুলতেই দেখলো দরজার মুখে দাঁড়িয়ে মাঝবয়সী এক বিধবা মহিলা। সবিস্ময়ে তিনি চেয়ে আছেন মলয়ের পাশে বসা মেয়েটির দিকে। মেয়েটি ততক্ষণে মলয়কে দ্বিতীয় প্রশ্ন করছে এই ছবিটা দেখেছো? সুন্দর না? মলয় আড়ষ্ট কণ্ঠে বললো হ্যাঁ। তার চোখ দরজার দিকে। বিধবা মহিলাটির পাশে এসে ততক্ষণে দাঁড়িয়েছেন তার মাসিমা এবং মাসিমার পিছনে আর একজন—বোধ হয় পরিচারিকা। তিনজনই অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটি কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। সে মলয়ের গা ঘেঁষে বসে ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে আর একটা ছবি দেখাচ্ছে। 'এটা দেখেছো?' মলয় দেখলো বললো হ্যাঁ। মেয়েটি হঠাৎ সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো বললো তুমি বসো তোমার জন্যে একটা ভালো ম্যাগাজিন নিয়ে আসছি। মেয়েটি অন্য দরজা দিয়ে বার হয়ে গেল। এ দরজায় তিনজন চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। একটু পরে মেয়েটি ফিরে এলো হাতে একটা ম্যাগাজিন নিয়ে। ততক্ষণে মলয়ের একটু সাহস হয়েছে। দুজনে কিছুক্ষণ গল্প করলো এ ছবি সে ছবি দেখালো। তারপর এক সময় মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে বললো তুমি কাল এসো তোমার জন্যে অনেক ম্যাগাজিন নিয়ে আসবো। তারপর সবাইকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মেয়েটি বেরিয়ে গেল।

মাসিমা এগিয়ে এসে মলয়কে বললেন চল। তিনি মলয়কে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। পিছনের দিকে ফিরেও তাকালেন না। তার মুখ খুব গম্ভীর। সারা পথে তিনি কোন কথা বললেন না। মলয়ও কোন প্রশ্ন করলো না।

পরের সপ্তাহে মাসিমা মলয়কে নিয়ে মিসেস গুপ্তের বাড়ীতে ঢুকতেই মেয়েটি কোথা থেকে ছুটে এসে মলয়কে কেড়ে নিয়ে গেল মাসিমার হাত থেকে। বাগানে বসে বসে গল্প করলো। ঘুরে ঘুরে দেখালো কোথায় ময়ূর রাখা হয়েছে কোথায় ফুলের বাগান। মলয় আড় চোখে লক্ষ্য করলো অনেক জোড়া চোখ তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের প্রতিটি কাজ দেখছে।

তৃতীয় সপ্তাহে মাসিমা মলয়কে সঙ্গে যেতে ডাকলে মলয় আর চাকরের মত হুকুম শুনলো না। মাসিমাকে বললে ব্যাপারটা কি সব খুলে বলো তাহলে যাবো না হলে আমি ও বাড়ী যাবো না। মাসিমা তখন খুলে বললেন।

মেয়েটির নাম লীনা। মিসেস গুপ্তের ছোট মেয়ে। লীনা যে কলেজে পড়তো সেই কলেজের সৌমেন নামে একটি ছেলের সঙ্গে লীনার ভাব ছিল। বছর তিনেক আগে ওরা ছুটিতে সুইজারল্যান্ডে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে বরফের ওপর স্কেটিং খেলায় একটা দুর্ঘটনা ঘটে। তাতে সৌমেন মারা যায়। লীনা তারপর থেকে কি রকম যেন হয়ে যায়। হাসে না কথা বলে না। ওর দাদা বড় ডাক্তার। সে এখানে ওখানে পরীক্ষা করায় কিন্তু কিছু ফল হয় না। ফলে লীনা দিল্লীতেই অস্বাভাবিক জীবন যাপন করতে থাকে। তার ঐ অস্বাভাবিক জীবনের শেষ হয় সেদিন যেদিন লীনাকে দেখা যায় মলয়ের পাশে এসে বসতে এবং তার সঙ্গে গল্প করতে। কিন্তু মলয় চলে আসার পরই লীনার আবার মুখ বন্ধ হয়ে বন্ধ। আবার সে অন্য জগতের মানুষ। দ্বিতীয় দিন মলয়কে দেখেই লীনা আরো স্বাভাবিক হয়ে যায়। কিন্তু মলয় চলে আসার পরই আবার লীনার মুখ থেকে কথা চলে যায় হাসি মুছে যায়।

সব শুনে মলয় একেবারে বেঁকে বসলো। বললো আমি কি এক বড়লোকের মেয়ের খেলার পুতুল? আমি আর ও বাড়ী যাবো না।

কিন্তু মলয় তাতে পরিত্রাণ পেল না। মাসিমা উল্টে লীনাকে সঙ্গে করে মলয়দের বাড়ীতে নিয়ে এলেন। মলয়ের সম্পর্কে এসে লীনা ক্রমশঃ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে উঠলো। এক সঙ্গে বই পড়লো লুডো খেললো গান শোনালো। তারপর এক সময় মলয়ের মাসিমার সঙ্গে বাড়ীর গাড়ী করে সে ফিরে গেল।

তারপর হঠাৎই একদিন ছেদ পড়ে গেল লীনার সঙ্গে মলয়ের মেলামেশায়। মাসিমা ওকে লীনাদের বাড়ী নিয়ে যেতেন না লীনাও আর গাড়ী করে তাদের বাড়ী আসতো না। লীনা সম্পর্কে মলয়ের মনে ঠিক ভালোবাসা নয় ভালো লাগা গোছের একটা ভাব জন্মেছিল অবশ্য কিন্তু তার চেয়েও বেশী ছিল লীনা ও তার পরিবারের লোকজন সম্পর্কে কৌতূহল। প্রায় বছর খানেক মলয় তার দোকান এবং আমাদের সঙ্গে আড্ডা নিয়ে রইল এবং লীনা প্রসঙ্গ এক রকম তার মন থেকে দূরই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মাসিমা একদিন আবার তাকে জড়িয়ে তুললেন। বললেন মলয় আজ আমার সঙ্গে মিসেস গুপ্তের বাড়ীতে যেতে হবে।

মলয় সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল তুমি তো কিছুদিন ধরে একাই যাচ্ছো।

মাসিমা বললেন তোকে সঙ্গে নিয়ে যাবো দরকার আছে।

কি দরকার খুলে বলো।

মাসিমা প্রথমে এড়াবার চেষ্টা করলেন। মলয়ও গোঁ ধরলো সব খুলে না বললে সে যাবে না।

মাসিমা তখন গত এক বছরের ইতিহাস সব খুলে বললেন।

লীনার ডাক্তার দাদা প্রথমে কিছুদিন পরীক্ষা চালালেন তাদের সমাজের কলেজে পড়া সুদর্শন ছেলেদের একজন একজন করে ছলছুতোয় বাড়ীতে ডেকে আনা এবং লীনার সঙ্গে মেলামেলার সুযোগ দেওয়া। এ পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হোল লীনা তাদের কাউকে দেখলোও না কাছে যাওয়া দূরে থাক। তারপর ডাঃ গুপ্ত মা ও লীনাকে নিয়ে চলে গেলেন ভিয়েনায় সেখানে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পরীক্ষা করালেন। কিছু হোল না। দিল্লী ফিরে এসে নিজেদের মধ্যে আলোচনা বৈঠক বসলো মাসিমাকেও সে বৈঠকে ডাকা হয়েছিল। মায়ের প্রস্তাব ছিল মলয়ের সঙ্গে মেলামেশা করে যদি লীনা সুখী হয় কথা বলে হাসে তাহলে আমরা তার সুখে বাদ সাধবো কেন? ডাঃ গুপ্ত বললেন তাহলে মলয়ের সঙ্গে লীনার বিয়ে দিতে হয়। একটা সামান্য দোকানদার... আমরা সমাজে মুখ দেখাবো কি করে? একদিকে লীনার সুখ এবং অন্য দিকে সমাজের মুখ নিয়ে অনেকক্ষণ খুব তর্ক বিতর্ক চললো। শেষে ডাঃ গুপ্তর স্ত্রী স্নেহলতা প্রস্তাব দিলেন ওদের আরও কিছুদিন মেলামেশার সুযোগ দাও। যদি দেখ একটা স্থায়ী সম্পর্কের সম্ভাবনা আছে তো তোমরা যাকে সামান্য দোকানদার পাত্র বলছো তাকে সমাজে তুলে নাও। জামাইকে তোমরা বাড়ী দাও গাড়ী দাও নগদ টাকা দাও তোমাদের মেয়ে যাতে ভবিষ্যতে আর্থিক অসুবিধায় না পড়ে তার ব্যবস্থা করে ওদের বিয়ে দিয়ে দাও। সমাজ দুদিন নাক সিঁটকোবে তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। আর মলয় কি খারাপ পাত্র? ভদ্র চেহারা ভদ্র ব্যবহার কলেজে পড়েছে। তাছাড়া গরজ তোমাদের ওর নয়। অন্যথায় এই পাগল মেয়ের ভবিষ্যৎ কি?

মলয় শুনে বললো কথা দিয়েছি আজ যাবো কিন্তু এর পরে আর নয়। আমি গিনিপিগ নই। আর আমাকে বাড়ী গাড়ী টাকার লোভ দেখাতে বারণ করে দিও।

মলয় সেদিন ড্রয়িং রুমে ঢুকতেই লীনা তাকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসালো। তারপর দুজনে ডুবে গেল হাসি গল্প কথাবার্তার মধ্যে। গত এক বছরে লীনার মুখে হাসি কেউ দেখে নি কথা কেউ শোনে নি।

এ পর্যন্ত বলে মলয় থামলো। কফির অর্ডার দিল। কফি এলে বললো এই হোল পটভূমিকা। এখন মাসিমার মাধ্যমে ওরা একটা প্রস্তাব দিয়েছে এই গ্রীষ্মে লীনাকে সঙ্গে নিয়ে সিমলায় গিয়ে মাস পাঁচেক থাকতে হবে ওদের সিমলার বাড়ীতে। সঙ্গে যাবেন লীনার মা। উনি যদি বোঝেন মলয়ের প্রতি লীনার আকর্ষণ সাময়িক নয় এবং মলয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলে মেয়ে সুখে থাকবে তা হলে বিয়ের ব্যবস্থা করবেন। মলয়ের মুস্কিল হোল পাঁচ মাস দিল্লীর বাইরে থাকলে তার দোকান উঠে যাবে। এবং ধরো যদি কোন কারণে লীনা তার প্রতি বিগড়ে যায় হঠাৎ কথা বন্ধ করে মেলা-মেশা না করে তাহলে তাকে দিল্লী ফিরে আসতে হবে শূন্য হাতে এবং ইতিমধ্যে যদি দোকানে তালা পড়ে তো খুবই আর্থিক সঙ্কটে পড়বে সে। কি করবে কিছু ভেবে পাচ্ছে না। আমার পরামর্শ চায়।

কঠিন সমস্যা!

আমি কিছুক্ষণ ভেবে ওকে বুদ্ধি দিলাম। বললাম এখন ওদের সঙ্গে দোকান-দারি করতে তোর কোন দোষ নেই। পরে লীনার সঙ্গে তোর যদি প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হয় তো ভালো কথা। তা যতদিন না হয় ওদের সঙ্গে সম্পর্কটা লেন-দেনের ভিত্তিতে রাখ। ওদের বল, লীনার জন্য ওরা যে টাকা খরচ করবে বা বাড়ী গাড়ী সম্পত্তি যা দেবে তা বিবাহের যৌতুক হিসাবে লিখে দিক। যদি বিবাহ না হয় অথবা পরে যদি বিবাহ ভেঙ্গে যায় তা হলে এইসব সম্পত্তির মালিকানা লীনাতে অর্পাবে। ক্ষতিপূরণ হিসাবে তুই পাবি ধর বিশ-পঁচিশ হাজার টাকার মত। যা নিয়ে তুই দোকান উঠে গেলেও নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে পারবি।

আমার এ পরামর্শ শোনার পর মলয় উঠে পড়লো। তারপর ওর সঙ্গে দেখা সপ্তাহ খানেক পরে। আড্ডা থেকে আমাকে টেনে বাইরে নিয়ে গেল। চুপি চুপি বললো, ঠিক হয়েছে আমার নামে ব্যাঙ্কে বিশ হাজার টাকা জমা দেবে। আমি ওদের সঙ্গে সিমলা যাচ্ছি।

মলয় হাতে হাত মেলালো, আমি বল-লাম, উইস ইউ গুডলাক।

এরপর মলয়ের খবর পেলাম কাগজে ওর সঙ্গে লীনার বিবাহের রিসেপসনের রিপোর্ট পড়ে। কয়েকজন মন্ত্রীর এবং বহু ভি-আই-পির নাম ছিল যাঁরা রিসেপসনে হাজির ছিলেন। মলয় একটা নিমন্ত্রণপত্র আমাকেও পাঠিয়ে ছিল, কিন্তু যাইনি। ওদিকে আমাদের আড্ডাও ভেঙ্গে গিয়েছিল 'কফি কর্নার' উঠে যাওয়ার পর। কবি নিমচাঁদ হার্টের অসুখে মারা গেল। মাসিসে কলকাতায় বদলি হয়ে গেল। আমি বাসা বদলে চলে এলাম দক্ষিণ দিল্লীতে। 'কফি কর্নারে'র যুগ অতীতের পাতায় স্থান পেল। মলয়-লীনা কি সুখে কোথায় আছে জানার কৌতূহলও ধীরে ধীরে মুছে গেল মন থেকে।

বছর আট-দশ পরের কথা। আই-এল-এ মার্কেটে যথারীতি বিকালের পর বাজার করতে গিয়েছি। হঠাৎ একেবারে সামনা-সামনি মলয়ের। সর্বাঙ্গ-সাবয়া বাজার করেছে দু-হাত জোড়া। চিনতে পারলাম, কিন্তু দেখে কষ্ট হোল। পরণে আধ-ময়লা জামা-কাপড়, না-কামানো মুখ, রুক্ষ চুল, যে কেউ দেখে বলবে কারো বাড়ীর চাকর বাকর করে ফিরছে।

—কি রে, কেমন আছিস? খোঁজ-খবর দিস না কেন?

মলয় শুকনো হাসলো।

—দেখে কি মনে হচ্ছে খুব ভালো আছি?

বললাম, না।

ওর হাত থেকে একটা বোঝা জোর করে কেড়ে নিলাম, তারপর টেনে নিয়ে গেলাম সুপার বাজারের গায়ে নতুন যে রেস্টুরেন্টটা খুলেছে সেখানে। কিছু খাবার ও চায়ের অর্ডার দিয়ে বললাম, মলয়, তুই আর যাব কাছেই লুকোস, আমার কাছে লুকোবার চেষ্টা করিস নি। খুলে বল, অন্ততঃ তোর মনটা হালকা হোক।

মলয় আবার শুকনো হাসলো। বললো তুই শুরুটা জানতিস তাই তোকে শেষটা জানাবার জন্যে মধ্যে মধ্যে ইচ্ছা হোত। দু-একবার তোর খোঁজও করেছিলাম, কিন্তু তোকে পাইনি। তুই শুনেছিস বোধহয় কয়েক বছর হোল শাশুড়ি মারা গেছেন, আমার শালা ডাঃ গুপ্ত আমেরিকায় গিয়ে স্থায়ী বাসা বেঁধেছেন। শাশুড়ি মরার আগে সব ব্যবস্থা পাকা করে গিয়েছিলেন। দিল্লীতে হাউজ খাসের বাড়ী আমার নামে, সিমলার বাড়ী লীনার নামে। নগদ টাকা যা ছিল—প্রায় ছ' লাখ টাকার মত—দুজনের

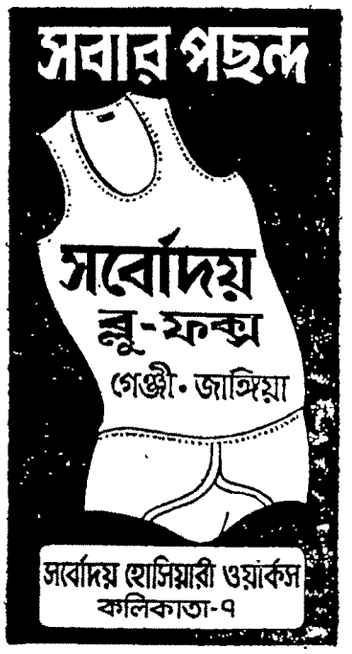

নামে ফিকসড্ ডিপোজিট করেছিলেন, গয়নাগাটি রেখেছিলেন লকারে দুজনের নামে। তাঁর উইলের শেষদিকে ছিল, আমি যদি লীনাকে পরিত্যাগ করি বা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাই তা হলে এইসব সম্পত্তির ভোগ-দখল থেকে বঞ্চিত হবো। এমন কি হাউজ-খাসের বাড়ীটা আমি যাতে বিক্রী না করতে পারি, তারও ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি উইল রেজিস্ট্রি করার আগে আমায় দেখিয়ে-ছিলেন এবং মায়ের পক্ষে মেয়ের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার এ ব্যবস্থার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা আমার চোখে পড়েনি।

বিবাহের পর আমরা শীতকালে দিল্লী থাকতাম এবং গ্রীষ্মে সিমলা চলে যেতাম। বছর তিনেক বেশ সুখেই কাটলো। কাল হোল এক শীতে সিমলায় থেকে যাওয়ায়। দিল্লীর বাড়ীতে শাশুড়ির মৃত্যু হয়েছিল সে কারণে এবং শীতের সিমলার চেহারা দেখার লোভে আমি লীনার প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। কিছুদিন সিমলা থাকার পর লীনা বললো, কুফ্‌রী যাবো। কুফ্‌রীতে সেবার বরফের ওপর খেলাধুলোর নানা আয়োজন হয়েছে। কুফ্‌রীতে গিয়ে যেন ফিরে গেল তার পুরানো জীবনে। খেলা-ধুলায় কোনকালেই আমার আগ্রহ ছিল না। আমি বাংলোয় একা একা বসে নভেল পড়তাম। লীনা চলে যেত কুফ্‌রীর উইনটার স্পোর্টসে যোগ দিতে। স্কেটিং এবং আরও কত কি। আর খেলার কত সরঞ্জাম। লীনা ভিড়ে পড়লো রাজেন্দ্র বলে একটি ছেলের সঙ্গে। সমবয়সী ছেলেটিও ভালো। কিন্তু তবুও আমার মধ্যে স্বামী ভাব মধ্যে মধ্যে মনকে পীড়া দিত। রাশ টানতে যেতাম না। কেননা এটা বুঝতাম লীনা যে সমাজে মানুষ সে সমাজে স্বামী থাকলেও 'বয় ফ্রেন্ড' থাকার মধ্যে দোষের কিছু নেই। তাছাড়া ঐ বরফের খেলাধুলো নিয়ে লীনা যদি সুখী হয় তো আমি সে সুখে বাধা দিই কেন?

শীতকালীন খেলাধুলোর পর্ব শেষ হলে আমরা কুফ্‌রী থেকে সিমলায় নামলাম, কিন্তু বিস্মিত হলাম রাজেন্দ্র আমাদের সঙ্গে আসায়। লীনা বেশ আগ্রহের সঙ্গে বাড়ীতে রাজেন্দ্রের থাকার ব্যবস্থা করে দিল এবং কিছুদিনের মধ্যে এমন ব্যবহার করতে লাগলো যেন লীনা এবং রাজেন্দ্রই বাড়ীর মালিক, আমি অতিথি।

আমি লীনাকে প্রথমে ইসারায় এবং পরে স্পষ্টাস্পষ্টি বললাম এ বাড়ীতে রাজেন্দ্রের থাকাটা আমি পছন্দ করি না। লীনা তর্ক করলো না। শুধু বললো, সিমলা যদি ভালো না লাগে দিল্লীতে গিয়ে থাকো।

এক রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে দেখি লীনা বিছানায় নেই। অনেকক্ষণ জেগে রইলাম, সে ফিরলো না। পরদিন সকালে আমার নিজের সামান্য জিনিসপত্র গুছিয়ে দিল্লী চলে এলাম।

শীত পড়তে একদিন লীনা দিল্লী এসে হাজির, সঙ্গে রাজেন্দ্র। লীনা তার ঘরেই রাজেন্দ্রর থাকার ব্যবস্থা করলো এবং রাজেন্দ্রও এমন ভাব দেখাতে লাগলো যেন সে এবং লীনা বাড়ীর কর্তা, আমি এ বাড়ীর কেয়ার-টেকার।

রাজেন্দ্রের অবর্তমানে আমি একদিন লীনাকে খুব খাতা করে বললাম। ফলশ্রুতি এই লীনা হাউ হাউ করে খানিকটা কাঁদলো এবং নিতান্ত ছেলেমানুষের মত বললো, কি করবো আমি, রাজেন্দ্রকে আমার ভালো লাগে!

লীনাকে বিবাহের আগে আমি যে বিশ হাজার টাকা পেয়েছিলাম এক বোনের বিয়েতে সে টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল। এ বাড়ী ছেড়ে কোথাও গিয়ে দাঁড়াবো তার জায়গা নেই। নগদ টাকা দুজনের নামে ফিকসড্ ডিপোজিটে, সুদ যা আসে দুজনকে সই করে নিতে হয়। সে টাকা থেকে যা ইচ্ছা নিয়ে লীনা বাকিটা আমায় দেয় সংসার চালাবার খরচ হিসাবে। সাংসারিক ব্যাপারে কিংবা টাকাকড়ির ব্যাপারে রাজেন্দ্রর কোন আগ্রহ নেই। সে লীনার সঙ্গে বসে বসে গল্প করে। তাকে নিয়ে বেড়াতে বের হয়, বিকালে টেনিস ক্লাবে যায়, সন্ধ্যায় যায় সিনেমা দেখতে। ফিরে যদি দেখে রান্না হয়নি, লীনাকে নিয়ে চলে যায় রেস্টুরেন্টে।

সুদের টাকা সবটা মাসের হাতে এলে সে সংসারটা একটু গুছিয়ে চালাতে পারতো, কিন্তু লীনা মুঠো ভরে নেবার পর যা পড়ে থাকে তাতে সংসার চালানো দুষ্কর। একটা চাকর ছিল ছাড়িয়ে দিয়েছে। বামুনটা আছে। চাকরের বদলে রেখেছে ঠিকে ঝি। মলয় নিজেই বাজার করে এবং আরও অনেক বাড়ীর কাজ। একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো তাকে।

তার ক্ষীণ আশা একদিন লীনার প্রতি রাজেন্দ্রর অথবা রাজেন্দ্র প্রতি লীনার আকর্ষণ কমে যাবে। এবং তখন লীনা আবার আগের মতই তার কাছে ফিরে আসবে।

চন্দনা চলে গেলে

প্রথমে গোটা অঞ্চলটাই গ্রাম আর জঙ্গল ছিল। পাশে হুগলী নদী। নদীর ধারে অনেকগুলো ইটখোলা। কিছু চাষ-আবাদের জমি। বাকিটা ঝোপজঙ্গলে ভরা। তারপর কোন একসময় চেক সাহেবরা এসে-ছিল। অনেক দেখেশুনে নদীর ধারে বিস্তর জমি কিনে চর্মকারখানা চালু করল। সেই থেকে অঞ্চলটার চেহারা পাল্টানো শুরু। চর্মনগরী গড়ে ওঠে। ক্রমে ব্যবসা বাড়লে কারখানা বড় হয়। কর্মীসংখ্যা বেড়ে যায়। অতএব নগর বড় করার জন্য নতুন জমি কেনা হল। নাম রাখল, 'গ্রীন ল্যান্ড'।

ওপার বাংলার বাঙ্গাল ছেলে আমার পরণে তখন ইজের। 'গ্রীন ল্যান্ডে'র পাশের গ্রামে কাকার বাড়ীতে এসে আমি জীবনে প্রথম নগর দেখলাম। তিনদিকে গ্রাম আর একদিকে নদী দিয়ে ঘেরা সুন্দর সাজানো ছোট্ট নগর। 'গ্রীনল্যান্ডে'র বিরাট এলাকা জুড়ে তখন হলরিকসের কোয়ার্টারস বসানো চলছে। কিছুটা অঞ্চলে তখনো ধান পাট আখের চাষ হত। অনেক গরু মোষ নিয়ে বড় একটা খাটাল ছিল কোম্পানীর। বড় বড় অনেকগুলো পুকুর ছিল। অজস্র আম তাল নারকেল গাছ। সেসব দেখাশোনার জন্য মাথায় শোলার হ্যাটপরা গুপ্ত সাহেব ছিল। গুপ্তসাহেব সাইকেল চড়ে হঠাৎ হঠাৎ ঘুরে বেড়াত।

আমাদের গ্রামে বিজলী ছিল না। 'গ্রীন-ল্যান্ডে'ও না। সুতরাং, সূর্য ডুবলেই চুপ করে সন্ধ্যা। খুব তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা পালিয়ে যেত। তারপর যেন অনেক রাত। ঘরে ঘরে হ্যারিকেনের আলো। উঠোনে তুলসীতলায় প্রদীপ। গাছেদের মাথা ছাড়িয়ে বাঁশের ডগায় আকাশদীপ। ঘুটেঘুটে অন্ধকারে পুকুরপাড়ে জলাজমি ঝোপঝাড়ে জোনাকি জ্বলত। জ্যোৎস্নায় হলরিকসের কোয়া-র্টারসগুলো দেখতে ছবির মত সুন্দর লাগত।

সে সময় ঘরে ঘরে রিফিউজি। আমরা দু'ভাই—বিনু আর বিধু, মা-র কোলে বোন পুষ্প—এসে উঠেছি কাকার বাড়ীতে। কাকার নিজস্ব সুন্দর বিরাট পাকা বাড়ী। অমন বাড়ী ধারে কাছে আমি কোথাও দেখিনি। মাত্র তিনজনের গাড়ী ছিল। কাকা তাদের মধ্যে একজন।

বাবা তখনো দেশের বাড়ীতে হোমিও-প্যাথ ডাক্তারী করে। আমরা বরাবর থাকব বলে আসিনি। অথচ, থেকেই যেতে হল। কাকা বলল, শাক ভাত খেতে হলেও ভাল। তবু আপনাদেরকে আর ফিরে যেতে দেব না বৌদি। দাদাকেও চলে আসতে চিঠি লিখে দেব।

কাকাকে আমার খুব ভালমানুষ মনে হয়েছিল। সেই বয়সে ঠিক অতটা তলিয়ে দেখার কথা নয়—কাকা আমাদেরকে এত বেশি করে আকড়ে রাখতে চাইছে কেন?

মা কোম্পানীর কল থেকে খাবার জল আনত। করাতের মত দাঁতওলা বটিতে খড় কেটে গরুকে জাব দিত। বালতি ভর্তি সিদ্ধ কাপড় কাচত। রান্নাবান্না এবং সংসারের অনেক রকম কাজ করত। কাকার ছেলে দীপুর টম্ নামে একটা শখের নেড়ি কুকুর ছিল। আমি টমকে স্নান করাতাম। ফ্যান খাওয়াতাম। সব রকম দেখাশুনা করতাম।

কোম্পানীর সঙ্গে কাকার কন্ট্রাকটরি কাজ। খুব সকালে ভোঁ বাজলে কাকা কাজে বেরিয়ে যেত। মা অন্ধকার থাকতে ঘুম থেকে উঠে কাকার জন্য চা জলখাবার করে দিত। কাকীমা অনেক বেলায় বিছানা ছাড়ত। চায়ের বদলে এক গ্লাস দুধ খেত। সঙ্গে সিদ্ধ ডিম এবং মাখন মাখানো পাউরুটি। দীপু এ-সব তো খেতই সেই সঙ্গে একটা মর্তমান কলাও খেত। আমি আর বিধু জ্বাল দেয়া ডোবাক ভেলিগুড় আটার রুটি ভিজিয়ে খেতে খেতে জুল জুল চোখে দেখতাম। পুষ্প দুধ ছাড়া পিউবিটি বার্লি খাবার সময় হাত পা ছুঁড়ে ভীষণ চীৎকার করত। ওকে খাওয়াতে বেশি কষ্ট হলে মা হাঁপিয়ে উঠে গাল দিত, শত্তুর!

দীপু ভাল পোশাক জুতো পরে সাইকেল রিক্‌শায় বসে স্কুল যেত। আমারও ইচ্ছে হত। মা প্রায়ই বলত তোর বাবা এলেই তোকে স্কুলে ভর্তি করে দোব। আমি বলতাম কাকাকে বল না তাড়াতাড়ি চিঠি দিতে। মা কোন জবাব দিত না।

রোজ দুপুরে কাকীমা ঘুমোত। চিৎ হয়ে মুখটা অল্প খুলে ঘুমোলে কেমন যেন মরা মানুষের মত দেখতে লাগত! বিধু আর পুষ্পকে ঘুম পাড়িয়ে মা দাওয়ায় বসে কুলোয় করে চালের কাঁকর বাছত। কাঁথা সেলাই করত। মাঝে মাঝে হাতের কাছে রাখা তালপাতার পাখা নেড়ে ওদেরকে বাতাস করত। মশা মাছি তাড়াত। আমার ভীষণ একা একা লাগত। আমি [illegible] আমার জন্য কোন শাসন ছিল না।

আমাদের বাড়ীর দক্ষিণ দিকে ধানক্ষেত। পাশ দিয়ে বজবজ থেকে কলকাতার দিকে রেল লাইন চলে গেছে। ট্রেন আসার শব্দ শুনলেই আমরা হিজল বনের ভিতর দিয়ে দৌড়ে রেল লাইনের ধারে বাবলা গাছের নিচে দাঁড়াতাম। আমরা অর্থাৎ—মোহন বেনু বলাই এবং অনেক বেশি বয়সের কান্তদা। কান্তদা রেল ইঞ্জিনের কয়লা আরো কী সব নিয়ে ব্যবসা করত ঠিক বুঝতাম না। লাইনের ধারে আগাছা এবং আকন্দ গাছের ঝোপের ভিতর চলন্ত ইঞ্জিন থেকে ড্রাইভার কয়লার বড় বড় চাক ফেলে দেয়। কান্তদা সেগুলো কুড়িয়ে আনত। তারপর বাড়ীর উঠোনে চিতার মত সাজিয়ে রাখত। শীতের দিনে আমি বিছানার পোড়াত। আমাদের কোন গরম জামা-কাপড় চাদর গায়ে জড়াতাম। মা একখানা শাড়ী ভাঁজ করে বিধুর গায়ে জড়িয়ে কাঁধের কাছে গিঁট বেঁধে দিত। তারপর দু' ভাই মিলে কান্তদা-র কয়লার আগুন পোহাতে যেতাম। মোহন নিম ডালের দাঁতন নিয়ে আসত। আমাদের দু'জনকেও দিত।

কান্তদা একদিন ইঞ্জিন থেকে ফেলে যাওয়া কয়লা জড়ো করতে করতে আমার ভীতু চোখ দুটোর দিকে বিড়ির ধোঁয়া ছুঁড়ে বলল, কাউকে বলবি নে কিন্তু! তখন বুঝেছি ব্যাপারটা খারাপ কিছু। খারাপ ব্যাপারে আমার দারুণ ভয়। সেই থেকে ভয়ে আমি আর কোনদিন কয়লা কুড়োনো দেখতাম না। চোখ ফিরিয়ে চলন্ত ট্রেনের ছাদে জানলায় এবং পা-দানিতে লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। ভাবতাম ওরা সব যায় কোথায়? কান্তদা বলল, কলকাতায় কাজে যায়। অনেকে কলেজে পড়তে যায়। সন্ধেয় আবার ফিরে আসে।

ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ মজার মনে হল। ভাবলাম ওরা বেশ রোজ গাড়ী চড়তে পারে।

কলকাতা নামটা দেশে থাকতে অনেক শুনেছি। বিশেষ করে কাকা যখন দেশে যেত কলকাতার গল্প খুব করত। শুনতে শুনতে কলকাতার একটা সুন্দর ছবি মনে আঁকা হয়ে গিয়েছিল। দেশ ছেড়ে যখন শেয়ালদা স্টেশনে নামলাম—কে যেন বলেছিল কইল-কাতা আইস্যা গ্যালাম। শুনে সে যে কী আনন্দ আমার। তখন অনেক রাত। প্লাট-ফর্মে শুয়ে থেকে সারারাত আমার চোখে ঘুম আসে নি। শুধু লোকজন ভিড় আলো দেখেছি; ইঞ্জিনের শব্দ শুনেছি—কলকাতা দেখা হয় নি।

আমার ইচ্ছে হল একদিন লুকিয়ে ট্রেনে চড়ে কলকাতায় যাব। কিন্তু একা একা সাহস হল না। ইচ্ছেটা বেনুকে জানালাম। বেনুর বেশ পছন্দ হল। পরে অনেক ভেবে চিন্তে বললাম কিন্তু টিকিট কাটার টাকা কোথায় পাব? বেনু বলল, তুই সত্যিই গাড়ীতে চড়লে কোন টিকিট লাগে না—তাও জানিস না?

—তুই কী করে জানলি? আমি অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম এর আগেও গেছিস কোনদিন?

—যাই নি তবু জানি। বেনু বলল আমাদের গাঁয়ের অনেকে রোজ সকালে ট্রেনে করে কলকাতায় তরকারি বিক্রী করতে যায়। ভ্যান্ডার গাড়ীতে যায় বলে কোন টিকিট লাগে না।

—তাই কখনো হয়? আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না। বেনু বলল, পাঁচু-র মা-কে জিগ্যেস করে দেখিস। তোদের বাগানের তরকারি তো পাঁচু-র মা বিক্রী করে দেয়।

আমাদের বাগানের তরকারি বিক্রী হয়—কথাটা শুনে আমার কেমন যেন কান্না পেয়ে গেল। সবজি বাগানে আমি যে অনেক অনেক জল ঢেলেছি—কান্না পাবে না? আমি আর কোন কথাই বলতে পারলাম না।

বেনু আর আমি লুকিয়ে স্টেশনে গেলাম—ভ্যান্ডার গাড়ীতে চড়ে কলকাতায় যাব। গাঁয়ের মহন্তকাকা বেগুনি রঙের জামা প্যান্ট পরে স্টেশনে জল দেয়। স্টেশনের নাম লেখা চার-কোণা কাঁচের বাকেস কেরোসিনের বাতি জ্বালে। ড্রাই-ভারকে গোলা দেয়। আমাদের দু'জনকে দেখতে পেয়ে মহন্তকাকা তাড়া করে বলল, ট্রেনের আসার সময় হইচে এ্যাত ভিড়ে তোরা কেনে? যা ভাগ।

দে ছুট। আমরা দৌড়ে পালালাম। স্টেশনের বাইরে এসে তবে দৌড় থামল। দূরে সিগন্যালের দিকে তাকালাম। সামনে টেলিগ্রাফ তারে সোঁ সোঁ আওয়াজ হচ্ছিল। তারের ওপর বসে দুটো টিয়া পাখি ল্যাজ দোলাচ্ছিল। কিছুক্ষণ বাদে ইঞ্জিনের ধোঁয়া উড়িয়ে ট্রেন এল। ট্রেনের শব্দে টিয়া দুটো উড়ে পালাল। বেনু হতাশ হয়ে লাইন থেকে একটা খোয়া কুড়িয়ে নিল। চলে যাওয়া ট্রেনের দিকে ছুঁড়ে মারল। তারপর লাল ইঁটের রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলল, চন্দনাদের বাড়ীতে নিয়ে যাবি?

চন্দনাদের বাড়ীর নামে আমার মন নেচে ওঠে। চন্দনার ঠাকুরমা জুবুথুবু বুড়ি আমাকে খুব ভালবাসে। আদর করে অনেক কিছু খেতে দেয়। বাড়ীতে বকুনি খেলে কিম্বা খিদে পেলে অসময়েও আমি চন্দনাদের বাড়ীতে ঠাকুরমার কাছে চলে যাই। ঠাকুরমা প্রায় সময় নাকের ডগায় চশমা ঝুলিয়ে উবু হয়ে ঠাকুর দেবতার বই পড়ে। আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়েই সবকিছু বুঝে নেয়। গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে কাকা কাকীমার নামে বিচ্ছিরি গাল দেয়। প্রায়ই বলে, তোর মা-কে এ্যাত করে বলনু আলাদা সংসার করে দেইলে না। বলে কর্তাকে এসলেই দিন আগে। এসলেই খেতে চাবে দিন। তোমি-পাপ বলে কথা—ভেবসা কী। আমি সলি পাকিস্তানে থাকলে নাবতেই ভয়। নামলি শীত ঢুকবে সংসা।

চন্দনারা কয়েক পুরুষ থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায়। ওদের ঘরে বয়স্কদের কথা বলার ধরণ আমাদের মত নয়। তবু ঠাকুরমা-র মুখের কথা শুনতে আমার খুব ভাল লাগত। জলের মত সহজ। কেমন যেন মিষ্টি মাখানো। টপ করে গিলে ফেলা যায়।

চন্দনার মা বেলা কাকী চওড়া লাল-পাড় শাড়ী পরত। আঁচলে বাঁধা এক গোছা চাবি। মাথায় ঘন কোকড়ানো কালো চুল: কপালে মস্ত বড় সিঁদুরের টিপ। অনেক অনেক পান খেত। টকটকে লাল ঠোঁট: দেখতে প্রতিমা প্রতিমা লাগত। আমাকে দেখলেই বেলাকাকী ভিতর ঘর থেকে চন্দনাকে ডেকে দিত। চন্দনা এসে দাঁড়ালে ঠাকুরমা বলত দু'জনে খেলা গে যা।

চন্দনাদের বাড়ীটা বেশ পুরনো। পড়ো মন্দিরের মত দেখতে। বাড়ীটার পিছনে ছোট্ট একটা পুকুর। খুব ছোট ছোট ইঁট বাঁধানো ঘাটসিঁড়ি। টলটলে জলে লাল সাপলা কলমিলতা ফুল। সিঁড়িতে বাসন মাজার সময় রোদ্দুরে পুঁটি মাছ ঝিলিক দিত।

খিড়কি থেকে ঘাটের পথে দু' মানুষ লম্বা একটা স্বর্ণচাঁপা গাছ। গাছটার নিচে নিকুনো উঠোনের মত মাটিতে গাঢ় দাগ কাটা একরা দোক্কা খেলার ঘর। চন্দনার আর কোন ভাই-বোন ছিল না। মেয়ে বন্ধুও কম। ওর সঙ্গে এই মেয়েলি খেলাটা আমি বেশ ভালই খেলতাম। প্রায় সময় আমাদের দু'জনকে গাছটার নিচে খেলতে দেখা যেত। গাছটার ডালে একটা দোলনা ঝোলানো ছিল। চন্দনাই বেশি দোল খেত।

চন্দনাদের বিরাট সব্জী বাগান ছিল। ডাঙ্গা জমিতে হাজার রকমের গাছপালা। আম জাম পেয়ারা জামরুল গাছ। গাব তেঁতুল কুল গাছ। কাগজী বাতাবি গন্ধ লেবু গাছ। একটা আমলকি গাছ ছিল। একটা কমলালেবু গাছও ছিল। নারকেল সুপুরি তাল—আরও কত কী যে গাছ। কদম বকুল গন্ধরাজ হাস্নুহানা ফুল ফুটত। কলা কচু বাঁশের ঝাড় ছিল। পেঁপে বাগান। বাঁশের মাচায় ঝিঙে শিম লাউলতা। কড়াই অড়হড় লঙ্কা। এইসব ফলে ফলে সব্জির মাঝে আমাদের দু'জনের বেশ সময় কেটে যেত।

সাদা লাল ছাপ ফ্রক পরত চন্দনা। বুকের কাছে একটা পকেট। খাটো সোনালী চুল। স্বর্ণচাঁপার মত গায়ের রং। কাজল টানা নীল নীল চোখ। দেখলে মেম মেম মনে হত। মা বলত বামুনদের ঘর ছাড়া অমন সুন্দর মেয়ে নাকি খুব কম দেখা যায়।

চন্দনা কারও সঙ্গে তেমন মাখামাখি মিশত না। বেশ আদুরে এবং অহংকারী। আমার কাছে অবশ্য কোন অহংকার করত না। বরং এমন একটা ভাব করত যেন অন্য সকলের চেয়ে আমি আলাদা। অর্থাৎ আমি ওর খুব পছন্দমত। চন্দনা প্রায়ই

বলত, বেনু বলাই মোহন—ওরা সব ছোট-লোকের ছেলে। ওদের সঙ্গে মিশবি না।

ওরা আমার বন্ধু। আমাকে খুব ভাল-বাসে। ওদের সম্পর্কে চন্দনার ঘেন্নার কথা শুনতে আমার ভাল লাগত না। একদিন তাই বলেই ফেললাম ওরা কিন্তু তোমাকে খুব পছন্দ করে। তোমার বন্ধু হতে চায়। তুমি ওদেরকে ফুল দাও না কেন?

—ইচ্ছে! চন্দনা ঘেন্না এবং অহংকার মিশিয়ে বলল, বয়েই গেছে ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে। তোকে রোজ ফুল দেব। অনেক ফুল।

—অনেক ফুল দিয়ে কী হবে আমার?

—ঘরে রেখে দিলে সুন্দর গন্ধ হবে।

চন্দনা একা আমাকেই ফুল দিত—স্বর্ণচাঁপা ফুল। গাছের নিচে দাঁড়িয়ে চন্দনা। গাছে উঠে আমি ফুল তুলতাম। দু' হাতে ফ্রকটাকে আঁচলের মত করে চন্দনা ফুলগুলো ধরে নিত। নিচে নেমে এলে কুকাচড় থেকে আমাকে ফুল দিত—অনেক ফুল। প্রথম প্রথম আমাকে সাবধান করে দিত, ওদেরকে দিবি না কিন্তু। দিয়েছিস জানতে পারলে তোর সঙ্গে জন্মের মত আড়ি।

চন্দনা কথা বন্ধ করে দেবে? আমি ভাবতেই পারতাম না। তার চেয়ে বরং কাউকে ফুল না-দেয়াই ভাল। আমি যত্নের সঙ্গে খুব সাবধানে লুকিয়ে চন্দনার দেয়া ফুলগুলো ঘরে আনতাম। তারপর শিয়রের কাছে দেয়াল তাকে রেখে দিতাম। বিছানায় শুয়ে যতক্ষণ জেগে থাকতাম তাকে রাখা ফুলের মিষ্টি গন্ধে চোখ বুজেও চন্দনাকে দেখতে পেতাম।

চন্দনার বাবা পরিতোষ কাকা সাদা ধুতি পাঞ্জাবী পরে স্কুলে পড়াতে যেত। হাতে অনেক মোটা মোটা বই। পালিশ করা চকচকে চুল। চোখে রোল্ডগোল্ড ফ্রেমের চশমা। গোঁফ দাঁড়ি নেই। অথচ দেখলে কেমন ভয় লাগত। আমি খুব সাবধানে পরিতোষ কাকার কাছ থেকে দূরে দূরে সরে থাকতাম। একদিন চন্দনার সাজানো পড়ার ঘরে যখন অনেক সুন্দর সুন্দর বই ছবি খেলনা দেখছিলাম পরিতোষ কাকার কাছে ধরা পড়ে গেলাম। আমাকে কাছে পেয়ে পরিতোষ কাকা জিগ্যেস করল চন্দনা তোমার বন্ধু? আমি ভীষণ ভয় পেলাম। মনে হল, এক্ষুনি বকবে। হয়ত হাতের ছড়ি দিয়ে মারবে। আমি অপরাধীর মত মুখ নিচু করে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম। পরিতোষ কাকা বকল না। মারল না। ভারী গলায় বলল, চন্দনা তো লেখাপড়া করে। তুমি করো না কেন?

কী বলব আমি? কোন উত্তর দিতে পারলাম না। চুপ করে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকলাম। ভিতর বারান্দা থেকে ঠাকুরমা সব কথা শুনছিল। সেখান থেকেই আমার হয়ে জবাব দিল। আমাদের বাড়ীর অনেক কথা বলল। শুনে পরিতোষ কাকা বলল কাল থেকে তুমিও আমার সঙ্গে স্কুলে যাবে—তোমার মা-কে বলো।

পরিতোষকাকার সঙ্গে আমি আর চন্দনা রোজ স্কুলে যেতাম। চন্দনা বয়সে আমার চেয়ে ছোট—পড়ত এক ক্লাস ওপরে। স্কুলের জন্য পরিতোষকাকা আমাকে জামা জুতো প্যান্ট কিনে দিয়েছিল। বই খাতা-পত্তর সব। বিনা বেতনে পড়ার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল।

স্কুল থেকে পরিতোষ কাকা ফিরত অনেক দেরীতে। ফেরার সময় শুধু চন্দনা আর আমি। তখন চন্দনার কাছে আমি খুব সহজ হতে পারতাম। চন্দনাকে ঘাস-ফড়িং প্রজাপতি ধরে দিতাম। থোক থোক কৃষ্ণ-চূড়া ফুল দিতাম। চন্দনা খুব খুশি হত। ওকে খুশি দেখলে আমার যে কী আনন্দ হত।

একটা সুন্দর রঙীন ছাতা ছিল চন্দনার। হঠাৎ বৃষ্টি এলে চন্দনা ওর ছোট্ট ছাতার তলায় আমাকে ডেকে নিত। পাশাপাশি হাঁটতে গিয়ে দু'জনেই প্রায় ভিজে যেতাম। তখন সেই বৃষ্টিভেজা ওর নরম শরীর থেকে মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যেত।

আমার সবকিছুতেই নাকি বাঙাল বাঙাল ভাব। স্কুলে অনেকে আমাকে নিয়ে নানারকম ঠাট্টা করত। আমি ঠিকমত জবাব দিতে পারতাম না। সে জন্যে একা একা থাকতাম। লজ্জা দুঃখে চোখ ছল ছল করে উঠত। টিফিনের সময় মুখ ভার করে চন্দনার কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম। আমার ওপর রাগ দেখিয়ে চন্দনা বলত হাঁদারাম। তোর গায়ে জোর নেই? ঠাস করে থাপ্পড় দিতে পারিস না। চন্দনা আমার হয়ে অনেক সময় গলা চড়িয়ে ওদেরকে অনেক শক্ত শক্ত কথা শোনাত। মাস্টারমশাইকে বলে বেত-পিটুনি খাওয়ারার ভয় দেখাত।

টিফিনের সময় স্কুলের সামনে অনেক রকম খাবার আসত। চন্দনার হাতে অনেক পয়সা। মোয়া শোনপাপড়ি চিনেবাদাম কিনে খেত। আমাকেও দিত। বাড়ী থেকে আচার আমড়া টকফল নিয়ে আসত। সেগুলো আমাকে দিত না। ছেলেরা নাকি টক খায় না।

সেবার গরমের ছুটিতে চন্দনা পরিতোষ কাকার সঙ্গে কলকাতায় বেড়াতে গেল। কলকাতায় ওর পিসি বাড়ী। আমি ভীষণ একা হয়ে গেলাম। বেনু বলাই মোহনের সঙ্গে খেলতে ইচ্ছে হত না। অনেক সময় মনে হত চন্দনা ছাড়া আমার কিছুতেই চলার নয়। চন্দনা থাকলে আমার কোন কিছুতেই ভয় নেই। আমাদের এত যে দুঃখ কষ্ট চন্দনার সঙ্গে মিশলে মনেই থাকে না। চন্দনা না-থাকায় ওদের বাড়ীতে আগের মত খেতে ইচ্ছে হত না। খুব কম খেতাম। গেলে আরো বেশি একা একা লাগত। ঘুরে ফিরে ঠাকুরমা-র কাছে চুপটি করে বসে থাকতাম। ঠাকুরমা একবারও চন্দনার কথা বলত না। আমার মন খারাপ কিনা জিগ্যেস করত না, কিন্তু খেতে দিত। সব খেতাম না। খেতে ইচ্ছে করত না। অথচ কেন সব খেলাম না—ঠাকুরমা জানতে চাইত না। আমার ইচ্ছে হত, ঠাকুরমাকে জিগ্যেস করি চন্দনা ফিরে আসতে আর কতদিন বাকি। অথচ জিগ্যেস করতে কেমন যেন লাগত।

সেদিন বিকেল হবার অনেক আগে চন্দনাদের বাড়ী গিয়েছিলাম। কেন জানি না মনে হয়েছিল স্কুল খুলতে দু'দিন বাকি—চন্দনা হয়ত ফিরে আসবে। ভাল আলো পাবার জন্য সামনের বারান্দায় বসে ঠাকুরমা সুর করে রামায়ণ পাঠ করছিল। ভক্তের মত পাশে বসে আমি শুনছিলাম। চোখ ছিল স্টেশনমুখী পথে। ট্রেন থেকে নেমে ওই পথেই চন্দনা রিক্‌শায় আসবে।

অনেক সময় কেটে গেল। সন্ধ্যা হয়ে এল। রোজ সন্ধ্যার সময় একটা ট্রেন আসে। সেই ট্রেনটা এল। কিছুক্ষণ বাদে একটা রিক্‌শাও এসে বাড়ীর সামনে দাঁড়াল। কিন্তু একা পরিতোষ কাকা নেমে এল। চন্দনা আসে নি। চন্দনা নাকি কলকাতায় পিসি বাড়ী থেকে সাহেবী স্কুলে পড়বে। খবরটা শুনে আমার দারুণ কান্না পেল। ওরা তিনজনে মিলে নিজেদের কথাতেই ব্যস্ত। আমাকে যেন দেখতেই পাচ্ছিল না।

আমি অনেকক্ষণ বোকার মত ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। খিড়কি পেরিয়ে স্বর্ণচাঁপা গাছটার নিচে এসে দাঁড়ালাম। চন্দনার দোলনাটা ঠিক তেমনি-ভাবে ঝুলছিল। দোলনায় হাত রাখলাম। তারপর নিচে মাটিতে হাত বুলিয়ে একটা দোক্কা খেলার ঘর শুঁজলাম। বুকের ভিতর কেমন যেন কষ্ট হল। চোখের কোণে জল এল। গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসলাম। অন্ধকার নেমে এল। মনে হল, মাথার ওপর গাছটা শূন্য করে টুপ টুপ শব্দে সব কটি স্বর্ণচাঁপা ঝরে গেল।

সাধ থেকে বলছি

মন্ট্রিলের শিক্ষা

মন্ট্রিল ওলিম্পিকের পরম শিক্ষণীয় নজির কোন্‌টি? নিশ্চয়ই পূর্ব জার্মানী।

যে দেশের আয়তন বিশাল নয়, জনসংখ্যা সীমায়িত, ক্রীড়াকৃতির পরিচয়ে ও পদক সংগ্রহের সাফল্যে সেই দেশের তরুণ তরুণীরা অন্য অঞ্চলের প্রতিনিধিদের পেছনে ফেলে বৃহৎ বিশ্বের দুই বৃহত্তর দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রীড়া সামর্থ্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে।

সুবিশাল সোভিয়েত দেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগতি, সম্ভাবনা অপরিমেয়। জনবল, অর্থবল, বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের আশীর্বাদে দুটি দেশই সমৃদ্ধির সোপান বেয়ে সারা দুনিয়ার মাথায় চড়ে বসে আছে। অনুপাতে পূর্ব জার্মানীর সামর্থ্য কতোটুকুই বা। কিন্তু তবুও পূর্ব জার্মানীর ক্রীড়াবিদেরা রুশ-মার্কিন প্রতিনিধিদের সঙ্গে ওলিম্পিক আসরে প্রায়শঃই সমান তালে পাল্লা দিয়েছেন। ক্ষেত্র বিশেষে তাঁদের ডিঙিয়ে শীর্ষ সম্মান অর্জন করে নিয়েছেন অল্পায়াসেই।

মন্ট্রিল ওলিম্পিকে পূর্ব জার্মানীর সামগ্রিক সাফল্যের পরিমাপ পেতে গেলে অবাক হতে হয়। চল্লিশটি সোনো এবং পঁচিশটি করে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ সংগ্রহের সূত্রে অন্তর্ভুক্ত পদক তালিকায় পূর্ব জার্মানী দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠের আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। স্বর্ণ সঞ্চয়ের খতিয়ানে পূর্ব জার্মানীর স্থান আমেরিকারও ওপরে।

দেশের আয়তন কিঞ্চিদধিক একচল্লিশ হাজার বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা এক কোটি সত্তর লক্ষ। তবু রাশিয়া আমেরিকার মতো অঢেল সঙ্গতির অধিকারী দুটি দেশকে খেলার আসরে এমন কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দেওয়া পূর্ব জার্মানীর পক্ষে কী করে সম্ভব হলো? হলো এই কারণে যে মূল জীবনের সার্বিক উন্নয়ন ঘটানোর পথে পূর্ব জার্মানী খেলাধুলোর দিকে চোখ ফিরিয়ে রাখে নি। পূর্ব জার্মানীর উপলব্ধি, খেলাধুলো জীবনে অসম্পৃক্ত নয়। তাই অর্থনৈতিক, বৈষয়িক, শিক্ষা, শিল্প-কৃষি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সে দেশে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, ক্রীড়া উন্নয়নেও অবিকল অনুরূপ জোর পড়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে পূর্ব জার্মানীর ক্রীড়াক্ষেত্রেও গণ জাগরণে আস্থাশীল। তাই জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে খেলাধুলোর আবেদন ছড়িয়ে দিতে জার্মান প্রশাসনের কুণ্ঠা নেই। জনসাধারণকে খেলার মাঠে টেনে আনতে সে দেশে দরাজ মেজাজে সুযোগ-সুবিধা প্রসারিত করা চয়েছে। প্রয়োজনে আর্থিক আনুকূল্য বিতরণ করা হয়েছে অকৃপণ হাতে। পুরো মোট বাজেটের এক চতুর্থাংশ খরচ খেলাধুলোর প্রয়োজনে। এবং তার চেয়েও বড় কথা এই যে পূর্ব জার্মানীতে ক্রীড়াচর্চা সংবিধান সম্মত এক মৌল অধিকার।

এতোবড় দুনিয়ায় একমাত্র পূর্ব জার্মানী ছাড়া আর কোনো দেশই এখনও পর্যন্ত ক্রীড়াচর্চাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে পারেনি। খেলাধুলো এবং জীবনচর্চার প্রায় সমস্ত পাঠই পূর্ব জার্মানী প্রাথমিক পর্বে গ্রহণ করেছে সোভিয়েতের কাছ থেকে। কিন্তু সেই সোভিয়েত দেশেও ক্রীড়াচর্চা সাংবিধানিক অধিকার নয়। এ ব্যাপারে শিষ্য পূর্ব জার্মানীর গুরু সোভিয়েতকেও অতিক্রম করে গেছে।

পূর্ব জার্মানীর জনজীবনে খেলাধুলোর আদর-কদর ও প্রসার এমনিই ব্যাপক যে সে-দেশে প্রতি আটজন অন্তর একজন সক্রিয় ক্রীড়াবিদকে খুঁজে পাওয়া যাবে। এঁরা প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। তার বাইরে আরও অগুনতি মানুষ আছেন যাঁদের সক্রিয় প্রতিযোগী না বলা গেলেও সুস্থ ক্রীড়াবিদ বলতে কোনো দ্বিধা নেই। যেহেতু তারাও খেলার মনোভাবের আঙ্গিনে নিত্যই খেলাধুলোয় যোগ দেন। কোথায়ও ক্লাব পর্যায়ের খেলায়। কোথায়ও বা ঐচ্ছিক রিক্রিয়েসনাল স্পোর্টসে। রিক্রিয়েসনাল স্পোর্টসের আয়োজন ঘটে অফিস-কাছারি, কল-কারখানায়, শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্রের দপ্তরে। জীবনের সর্বস্তরেই খেলাধুলোর অংশ নেওয়ার সুযোগ-সুবিধে রয়েছে। সেই সুবিধে আত্মস্থ করে তারা বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। এক কথায়, পূর্ব জার্মানীর মূল জীবনচর্চার খেলাধুলাকে মিশিয়ে দিয়ে ক্রীড়া উন্নয়নে নিরলস সাধনা করে চলেছে। আর সেই সাধনার ফসল আজ তুলছে ঘরে। এর জন্যে পূর্ব জার্মানীকে অনেক পরিকল্পনা হাতে নিতে হয়েছে। প্রস্তুতি পর্বে কর্মোদ্যমের জোয়ার বইয়ে প্রতীক্ষার দীর্ঘকাল কাটাতে হয়েছে। সবই আজ আক্ষরিক অর্থে সার্থক হয়ে উঠেছে। সব মিলিয়ে, পূর্ব জার্মানী আধুনিক দুনিয়ার সামনে একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

মন্ট্রিলে নানা বিভাগে নানান পদক পেলেও, সার্বিক মূল্যায়ণে বলা যায় যে, পূর্ব জার্মানীর মূল সাফল্য অ্যাথলেটিকস নৌবাইচ এবং মহিলাদের সাঁতারেই। মহিলাদের জলক্রীড়ার মোট তেরোটির মধ্যে এগারোটিতে পূর্ব জার্মানীর তরুণীরা, বাইচে চোদ্দটির মধ্যে নটি বিভাগীয় ফাইনালে জার্মান তরুণেরা এবং অ্যাথলেটিকসে পুরুষ ও মহিলা, দু বিভাগ মিলিয়ে সাঁইত্রিশটির মধ্যে এগারোটি স্বর্ণপদক ছিনিয়ে নিয়েছেন পূর্ব জার্মানীর প্রতিনিধিরা।

আধুনিক ওলিম্পিকের দীর্ঘ ইতিহাসে, গ্ল্যামার স্পোর্টস অ্যাথলেটিকসে আমেরিকাই ছিল চিরায়াত নায়ক। কিন্তু পূর্ব জার্মানীর চ্যালেঞ্জের চাপে মন্ট্রিলে নায়কের আসন টলেছে। আমেরিকা অ্যাথলেটিকসে পেয়েছে ছটি। আর সোভিয়েত রাশিয়া চারটি। অর্থাৎ বিশ্বের দুই বৃহৎ রাষ্ট্রের সম্মিলিত সংগ্রহের চেয়ে ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্র পূর্ব জার্মানীর সংগ্রহের পরিমাণ বেশি। চার বছর আগে রাশিয়া মিউনিখে অ্যাথলেটিকসে যে কটি সোনা পেয়েছিল, এবারের সঞ্চয়ের পরিমাণ তার অর্ধেক। আমেরিকার অবস্থা পূর্ববৎই রয়েছে।

গত এক যুগ ধরে বিভিন্ন মহল থেকে এই কথাটি প্রচারিত হচ্ছিল যে আন্তর্জাতিক ক্রীড়ায় স্বর্ণপদকের ভাগ্য

বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারেই নির্ধারিত হয়ে যায়। প্রতিযোগিতা ভূমির আয়োজন শুধু উপলক্ষ্য মাত্র। অর্থাৎ সোনা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে কেবলমাত্র সেই সব দেশেরই যে সব দেশ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছে। পাশাপাশি এই যুক্তিও রাখা হচ্ছিল যে, বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের আশীর্বাদপুষ্ট দেশগুলি ছাড়া অন্যদের স্বর্ণ সঞ্চয়ের স্বপ্ন দেখা নিছকই বিলাস। আগলাভাবে বহু কণ্ঠে উচ্চারিত এই অভিমত যে যুক্তিগ্রাহ্য নয়, একবিংশতিতম অলিম্পিকের ফলাফলই তার প্রমাণ। এবং এটিও মন্ট্রিলের এক শিক্ষা।

বৈজ্ঞানিক বৈষয়িক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসামান্য উন্নয়ন ঘটিয়েছে যেসব দেশ, শুধু তারা ছাড়া অন্য কারুরই সোনা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, উচ্চকণ্ঠে যাঁরা এই মত জাহির করতেন তাঁদের সামনে পূর্ব জার্মানীর সাফল্যের নজির তো নির্দ্বিধায় তুলে ধরা যায়ই। সেই সঙ্গে প্রশ্ন রাখা চলে যে, তাহলে কিউবার সংগ্রহশালায় ছটি সোনা সমেত - মোট তেরোটি পদক কী করে জমা পড়লো? এবং ত্রিনিদাদ-টোব্যাগো মেকসিকো ডেনমার্ক জ্যামাইকার পক্ষে সোনা পাওয়া কেনই বা অসাধ্য হলো না? রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, পোল্যাণ্ডে নিশ্চয়ই রাশিয়া আমেরিকার মতো উন্নততর বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার নেই। তবু ওই সব দেশের প্রতিনিধিদের পক্ষে গণ্ডা গণ্ডা স্বর্ণপদক সংগ্রহ করা সম্ভবপর হলো কী করে? ক্ষেত্র বিশেষে বড়দের অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূত্রে আরও এগিয়ে যাওয়া দেশের সামর্থ্যকে টপকে তথাকথিত অনুন্নত দেশের ক্রীড়াবিদদের চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করার দৃষ্টান্তেও শিক্ষণীয় উপাদান থেকে গেছে। সেই শিক্ষার নির্দেশ কাউকেই ছোট নজরে দেখা চলে না। এবং একমাত্র গবেষণাগারই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফলাফলের ঠিকানা জানাতে অভ্রান্ত গণৎকারের ভূমিকা নিতে পারে না।

অস্ট্রেলিয়ার পদস্খলনও মন্ট্রিল অলিম্পিকের এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। মন্ট্রিলে অস্ট্রেলিয়া মাত্র একটি রুপো ও চারটি ব্রোঞ্জ পদক সংগ্রহ করতে পেরেছে। অথচ একদিন সাঁতারে অস্ট্রেলিয়ার অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠত্ব ছিল এবং অ্যাথলেটিকসেও অস্ট্রেলিয়া প্রায় সমান তালে আমেরিকার সঙ্গে টক্কর দিতে পারতো। সাঁতারের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ন অলিম্পিক উপলক্ষে অস্ট্রেলীয় সাঁতারুরা তো আন্তর্জাতিক মহলে নিজেদের যুগই প্রবর্তন করে দিয়েছিলেন। আর গত দু দশকে অস্ট্রেলীয় অ্যাথলিটরাও খুব পেছনে পড়ে থাকেননি। ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন মারজোরি জ্যাকসন, বেটি কাথবার্ট শার্লি ডি'লা হান্টি হাব ইলিয়ট এবং বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী জন ল্যাণ্ড, রন ক্লার্ক প্রমুখেরা তো আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক ইতিহাসের এক একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায়। কিন্তু তাঁদের উত্তরসূরীরা কোথায়? ওঁদের যোগ্যতার অযোগ্য উত্তরাধিকারীরা আজ ওলিম্পিকে স্বর্ণ সঞ্চয়ে বিফল হয়ে একটি রুপো ও একগণ্ডা ব্রোঞ্জ নিয়ে দেশে ফিরেছেন। অথচ মিউনিখে অস্ট্রেলিয়া পাঁচটি সোনা সমেত মোট পনেরোটি, মেকসিকোয় আধডজন সোনা সমেত আঠারোটি, রোমে আটটি সোনা সমেত বাইশটি এবং মেলবোর্নে তেরোটি স্বর্ণ সমেত মোট পঁয়ত্রিশটি পদক পেয়েছিলেন। এই হিসাবই বলে দেয় যে অস্ট্রেলীয় ক্রীড়া সামর্থ্য ক্রমাবনতির মুখে। হকিতে ভারতের সপ্তম স্থানাধিকারের চেয়েও ওলিম্পিকে অস্ট্রেলিয়ার পিছু হাঁটার ভাবটি আরও প্রকট এবং বিস্ময়করও বুঝি।

মন্ট্রিলের আর এক শিক্ষা, ক্রীড়া সংগঠনে ব্যয়বাহুল্যের ফলে ওলিম্পিকে যে সংকট ঘনিয়ে আসছে সে সম্পর্কে সত্যোপলব্ধি আগের আগের ব্যবস্থাপকদের টেক্কা দেবার নেশায় মন্ট্রিলের সংগঠকেরা দু-হাতে টাকা-পয়সা খরচ করেছেন। এই খরচের পরিমাপ কতো? মোটামুটি হিসেবে বারোশ কোটি টাকার মতো।

প্রবেশপত্র, ডাক-টিকিট ও স্মারক বিক্রয়, লটারির আয়োজনে এবং রেডিও-টিভি স্বত্ব বিক্রিবাবদ কিছু টাকা ব্যবস্থাপকেরা যোগাড় করলেও বাজেটে বড় রকমের ঘাটতি থেকে যাবেই। সেই ঘাটতি পোষানো হবে সরকারী অনুদানে। কুইবেক সরকারও জনসাধারণের ঘাড়ে করের বোঝা চাপিয়ে সেই টাকা উশুল করে নেবেন। এবং পরিণামে হয়তো কুইবেকএর জনসাধারণ ভাবতে পারেন যে ওলিম্পিকের আয়োজন করা শাদা হাতি পোষারই নামান্তর। এরই ফলে সর্বসাধারণের মনে ওলিম্পিক ক্রীড়া সম্পর্কে একটি বিরূপ ধারণা গড়ে উঠাও বিচিত্র নয়।

যে আয়োজনকে সর্বজনীন করে কয়ে তোলাই মূল উদ্দেশ্য ব্যয় বহুলতার জের টানতে গিয়ে সেই আয়োজন তার লক্ষ্যপথ থেকে সরে আসছে। ব্যয়াধিক্যের কথা চিন্তা করে ভবিষ্যতে বিত্তবান দেশগুলি ছাড়া আর কেউই ওলিম্পিক সংগঠনে আগ্রহ দেখাতে হয়তো পারবে না। এবং তা যদি না পারে তাহলে ওলিম্পিক ক্রীড়া তার সর্বজনীন চরিত্র ধর্ম হারিয়ে একদিন বিশ্বক্রীড়ার বদলে আঞ্চলিক আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে।

সেদিনের সেই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির কথা ভেবেই আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটি মন্ট্রিলের কাণ্ডকারখানা দেখে ঠেকে শিখতে চেয়েছে। এই কমিটির সভাপতি লর্ড কিলানিন তাই বলতে বাধ্য হয়েছেন যে ব্যয় বহুলতাই একদিন ওলিম্পিক আন্দোলনের পথে কাঁটায় পরিণত হতে পারে। লোক দেখানো সাজসজ্জায় পাহাড় প্রমাণ টাকা খরচ করে মন্ট্রিল যে ভুলের ফাঁদে পা ফেলেছে, সেই ফাঁদকে এড়াতে না পারলে ভবিষ্যতে ওলিম্পিক ক্রীড়ার সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে। তাই লর্ড কিলানিনের আবেদন যা রয় সয় বা নিতান্তই প্রয়োজন, শুধু সেইটুকু যোগাড়ে আন্তরিক থেকে খরচ খরচা কমিয়ে ফেলা হোক। লোক দেখানো ব্যয় ও বিলাস বাহুল্যের প্রশ্রয় দিতে গিয়ে যেন মূল আন্দোলনের ক্ষতি না করা হয়।

লর্ড কিলানিনের এই মন্তব্য সময়েরই সাবধানবাণী। একালের আয়োজনে অমিতব্যয়িতা লক্ষ্য করে সমালোচকেরা ওলিম্পিয়াড অনুষ্ঠানকে 'একস্ট্রাভ্যাগানজা' বলে বিদ্রূপ করছেন। এই ব্যঙ্গ বিদ্রূপের হাত থেকে ওলিম্পিককে বাঁচিয়ে না রাখতে পারলে মন্ট্রিলের প্রত্যক্ষ শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে এবং বিশ্ব ক্রীড়া তার সর্বজনীন চরিত্র মাহাত্ম্য হারিয়ে নামমাত্র কয়েকটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে।

সেই দুর্দিনই আসন্ন। তাকে কী সত্যিই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না?

অজয় বসু

নিউ রামকৃষ্ণ ভাণ্ডার
• বেনারসী • জোড়
• ফ্যান্সী শাড়ী
ও
সর্ব ভারতীয়
তাঁত বস্ত্র
৫৪৫/১, জি. টি. রোড (সাউথ) হাওড়া।

মন্ট্রিল অলিম্পিকে ২০ কিলোমিটার ভ্রমণে স্বর্ণপদক জয়ী মেকসিকোর ডেনিয়েল ব্রাউতিস্তা (১৩নং)

খেলাধুলা

দর্শক

অলিম্পিক কুস্তি

মন্ট্রিল অলিম্পিক গেমসের আসরে কুস্তির দুই বিভাগেই রাশিয়া সর্বাধিক স্বর্ণপদক জয়ের রেকর্ড করেছে—গ্রীকো-রোম্যান বিভাগে পেয়েছে ৭টি স্বর্ণপদক এবং ফ্রি-স্টাইল বিভাগে ৫টি স্বর্ণপদক। এই দুই বিভাগে মোট পদক জয়ের তালিকাতেও রাশিয়া শীর্ষস্থান লাভ করে—রাশিয়ার মোট পদক গ্রীকো-রোম্যান বিভাগে ১১টি এবং ফ্রি-স্টাইল বিভাগে ৮টি। কুস্তির দুই বিভাগের মোট ৬০টি পদকের মধ্যে রাশিয়া মোট ১৯টি পদক জয়ের সূত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে।

গ্রীকো-রোম্যান বিভাগের ১০টি স্বর্ণপদক এই তিনটি সমাজতান্ত্রিক দেশ ভাগাভাগি করে পেয়েছে—রাশিয়া ৭টি, যুগোশ্লাভিয়া ২টি এবং পোল্যান্ড ১টি। গ্রীকো-রোম্যান বিভাগের মোট ৩০টি পদক ১১টি দেশ এইভাবে ভাগ করে পেয়েছে—৮টি সমাজতান্ত্রিক দেশ পেয়েছে মোট ২৭টি পদক এবং বাকি তিনটি পদক পেয়েছে জাপান, পশ্চিম জার্মানী এবং ফিনল্যান্ড। আটটি সমাজতান্ত্রিক দেশ এইভাবে ২৭টি পদক পেয়েছে—রাশিয়া ১১টি, রুমানিয়া ৪টি, বুলগেরিয়া ৪টি, পোল্যান্ড ৩টি, যুগোশ্লাভিয়া ২টি এবং একটি করে পদক পেয়েছে পূর্ব জার্মানী (ব্রোঞ্জ), হাঙ্গেরী (ব্রোঞ্জ) এবং চেকোশ্লোভাকিয়া (রৌপ্য)। রাশিয়ার মোট ১১টি পদকের মধ্যে আছে স্বর্ণ ৭, রৌপ্য ৩ এবং ব্রোঞ্জ ১। দশটি রৌপ্য পদকের মধ্যে তিনটি সমাজতান্ত্রিক দেশই পেয়েছে ৯টি রৌপ্যপদক—রাশিয়া ৩টি, রুমানিয়া ৩টি, বুলগেরিয়া ২টি এবং চেকোশ্লোভাকিয়া ১টি। গ্রীকো-রোম্যান বিভাগে পদক বিজয়ী ১১টি দেশের মধ্যে ইউরোপেরই ছিল ১০টি দেশ এবং এশিয়ার একটি (জাপান)।

ফ্রি-স্টাইল কুস্তির ১০টি স্বর্ণপদক এই পাঁচটি দেশ এইভাবে জয়ী হয়েছে—রাশিয়া ৫টি, জাপান ২টি এবং একটি করে স্বর্ণপদক বুলগেরিয়া, আমেরিকা এবং দক্ষিণ কোরিয়া। ফ্রি-স্টাইল কুস্তির ৩০টি পদক ১০টি দেশ এইভাবে জয়ী হয়েছে—৬টি সমাজতান্ত্রিক দেশ পেয়েছে ১৭টি পদক এবং অপর চারটি দেশ (আমেরিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান এবং পশ্চিম জার্মানী) পেয়েছে ১৩টি পদক। মোট পদক জয়ের তালিকার ৬টি সমাজতান্ত্রিক দেশ এইভাবে ১৭টি পদক পেয়েছে—রাশিয়া ৮টি, বুলগেরিয়া ৪টি, রুমানিয়া ২টি এবং একটি করে পদক পূর্ব জার্মানী, হাঙ্গেরী এবং মঙ্গোলিয়া। অপরদিকে আমেরিকা ৫টি, জাপান ৫টি, দক্ষিণ কোরিয়া ২টি এবং পশ্চিম জার্মানী ১টি পদক পেয়েছে। পদক জয়ের তালিকায় প্রথম স্থানাধিকারী রাশিয়া পেয়েছে ৫টি স্বর্ণ এবং ৩টি রৌপ্য পদক। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী জাপান পেয়েছে ২টি স্বর্ণ ও ৩টি ব্রোঞ্জ এবং আমেরিকা পেয়েছে ১টি স্বর্ণ, ৩টি রৌপ্য ও ১টি ব্রোঞ্জপদক। ফ্রি-স্টাইল কুস্তি বিভাগে পদক বিজয়ী ১০টি দেশের মধ্যে ইউরোপের আছে ৬টি দেশ (রাশিয়া, বুলগেরিয়া, পূর্ব জার্মানী, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া ও পশ্চিম জার্মানী), এশিয়ার ৩টি (জাপান, মঙ্গোলিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া) এবং আমেরিকা।

মন্ট্রিল অলিম্পিক আসরে গ্রীকো-রোম্যান এবং ফ্রি-স্টাইল কুস্তি বিভাগে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি বিরাট সাফল্যের

পরিচয় দিয়ে অন্যান্য দেশগুলিকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছে।

পদক অর্জন তালিকা

ফ্রি-স্টাইল কুস্তি

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট
সমাজতান্ত্রিক দেশ	৬	৭	৪	১৭
অন্যান্য দেশ	৪	৩	৬	১৩
মোট	১০	১০	১০	৩০

গ্রীকো-রোম্যান কুস্তি

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট
সমাজতান্ত্রিক দেশ	১০	৯	৮	২৭
অন্যান্য দেশ	০	১	২	৩
মোট	১০	১০	১০	৩০

অলিম্পিক বক্সিং

মন্ট্রিল অলিম্পিক বকসিং প্রতিযোগিতায় মোট ১১টি স্বর্ণপদক পাঁচটি দেশ এইভাবে ভাগাভাগি করে পেয়েছে : আমেরিকা ৫টি, কিউবা ৩টি এবং একটি করে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে উত্তর কোরিয়া, পোল্যান্ড এবং পূর্ব জার্মানী। চারটি সমাজতান্ত্রিক দেশ একত্রে যেখানে ৬টি স্বর্ণপদক পেয়েছে আমেরিকা সেখানে একাই পেয়েছে ৫টি স্বর্ণপদক। মোট পদক জয়ের হিসাব তালিকায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সম্মিলিতভাবে অন্য দেশগুলির ওপর টেক্কা দিয়েছে। ১৬টি দেশ ভাগাভাগি করে এইভাবে বকসিংয়ের মোট ৪৪টি পদক জয়ী হয়েছে : ৮টি সমাজতান্ত্রিক দেশ পেয়েছে মোট ২৯টি পদক (স্বর্ণ ৬, রৌপ্য ৯ ও ব্রোঞ্জ ১৪) এবং অন্যান্য ৮টি দেশ পেয়েছে মোট ১৫টি পদক (স্বর্ণ ৫, রৌপ্য ২ ও ব্রোঞ্জ ৮)।

পদক জয়ের তালিকায় ১ম স্থানে আমেরিকা—মোট ৮ (স্বর্ণ ৫, রৌপ্য ১ ও ব্রোঞ্জ ২) এবং ২য় স্থানে কিউবা—মোট পদক ৭ (স্বর্ণ ৩, রৌপ্য ৩ ও ব্রোঞ্জ ১)। মোট ৫টি করে পদক জয়ী হয়েছে পোল্যান্ড (স্বর্ণ ১ ও ব্রোঞ্জ ৪), রুমানিয়া (রৌপ্য ২ ও ব্রোঞ্জ ৩) এবং রাশিয়া (রৌপ্য ১ ও ব্রোঞ্জ ৪)।

তালিকার প্রথম স্থানাধিকারী আমেরিকা ৬টি বিভাগের ফাইনালে খেলে পাঁচটি খেতাব জয়ী হয়েছে। অপরদিকে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী কিউবা ৬টি বিভাগের ফাইনালে উঠে স্বর্ণপদক পেয়েছে ৩টি। এবার রাশিয়া কোন স্বর্ণপদক পায়নি। এই নিয়ে রাশিয়া ৭টি অলিম্পিক গেমসে যোগ দিয়ে দুটি অলিম্পিক গেমসের আসরে বক্সিংয়ের কোন স্বর্ণপদক পেল না। এর আগে ১৯৫২ সালে রাশিয়া তাদের অলিম্পিক গেমসে প্রথম যোগদানের বছরে বকসিংয়ের কোন স্বর্ণপদক জয়ী হয় নি।

এবার এশিয়া মহাদেশের এই দুটি দেশ পদক জয়ী হয়েছে—উত্তর কোরিয়া ২টি (স্বর্ণ ১ ও রৌপ্য ১) এবং থাইল্যান্ড ১টি ব্রোঞ্জ।

এবারের অলিম্পিক বকসিংয়ের আসরে দুটি অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি হয়েছে। কিউবার ২৪ বছরের মুষ্টিযোদ্ধা টিওফিলো স্টিভেনসন স্বর্ণপদক জয়ের সূত্রে হেভীওয়েট বিভাগে উপর্যুপরি দুবার স্বর্ণপদক জয়ের দুর্লভ গৌরব লাভ করেছেন। তাঁর আগে বকসিংয়ের এই হেভীওয়েট বিভাগে কোন একজনের পক্ষে মোট দুবারও স্বর্ণপদক জয় সম্ভব হয়নি, উপর্যুপরি দুবার স্বর্ণপদক জয় দূরের কথা। দ্বিতীয় নজিরটি গড়েছেন আমেরিকার দুই মুষ্টিযোদ্ধা—মাইকেল স্পিংকস এবং লিওন স্পিংকস। এঁরা দুই-সহোদর। মাইকেল মিডলওয়েট বিভাগে এবং লিওন লাইট-হেভীওয়েট বিভাগে স্বর্ণপদক জয়ী হন। অলিম্পিক গেমসে একই বছরের বকসিংয়ের আসরে দুই ভাইয়ের স্বর্ণপদক জয়ের নজির এই প্রথম।

অলিম্পিক বাস্কেটবল

পুরুষ বিভাগের বাস্কেটবল ফাইনালে আমেরিকা ৯৫-৭৪ পয়েন্টে যুগোশ্লাভিয়াকে হারিয়ে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, পুরুষ বিভাগের অলিম্পিক বাস্কেটবলে এ পর্যন্ত মাত্র দুটি দেশ স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে — আমেরিকা ৯ বার এবং রাশিয়া ১বার। ১৯৭২ সালের ফাইনালে রাশিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে আমেরিকাকে ৫১—৫০ পয়েন্টে হারিয়ে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছিল। ১৯৭২ সালের আগে আমেরিকা একনাগাড়ে ৮বার বাস্কেটবলের স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছিল।

এবারের সেমিফাইনালে আমেরিকা ৯৫—৭৭ পয়েন্টে কানাডাকে এবং যুগোশ্লাভিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে গতবারের চ্যাম্পিয়ান রাশিয়াকে ৮৯—৮৪ পয়েন্টে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল। রাশিয়া ১০০—৭২ পয়েন্টে কানাডাকে হারিয়ে ব্রোঞ্জপদক জয়ী হয়। অলিম্পিক বাস্কেটবলে যুগোশ্লাভিয়ার পক্ষে এই প্রথম পদক জয়।

পুরুষ বিভাগ : স্বর্ণ আমেরিকা, রৌপ্য যুগোশ্লাভিয়া ও ব্রোঞ্জ রাশিয়া।

মেয়েদের বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন বছরের ফাইনালে রাশিয়া ১১২—৭৭ পয়েন্টে আমেরিকাকে হারিয়ে মেয়েদের বাস্কেটবলের প্রথম স্বর্ণপদক জয়ের গৌরব লাভ করেছে।

মহিলা বিভাগ : স্বর্ণ রাশিয়া, রৌপ্য আমেরিকা ও ব্রোঞ্জ বুলগেরিয়া।

অলিম্পিক ভলিবল

পুরুষ বিভাগের ফাইনালে পোল্যান্ড ১১—১৫, ১৫—১৩, ১২—১৫, ১৯—১৭ ও ১৫—৭ পয়েন্টে রাশিয়াকে হারিয়ে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে। ১৯৭২ সালের চ্যাম্পিয়ন জাপানকে হারিয়ে কিউবা ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে।

মেয়েদের ফাইনালে জাপান ১৫—৭, ১৫—৮ ও ১৫—২ পয়েন্টে গত দুবারের চ্যাম্পিয়ান রাশিয়াকে হারিয়ে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া ১২—১৫, ১৫—১২, ১৫—১০ ও ১৫—৬ পয়েন্টে হাঙ্গেরীকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৬৪ সালে মেয়েদের অলিম্পিক ভলিবলের উদ্বোধন বছরে জাপান স্বর্ণপদক জয়ী হয় এবং ১৯৬৮ ও ১৯৭২ সালে রানার্স-আপ হয়েছিল।

অলিম্পিক ফুটবল

অলিম্পিক ফুটবলের ফাইনালে পূর্ব জার্মানী ৩-১ গোলে গতবারের (১৯৭২ সালের) চ্যাম্পিয়ান পোল্যান্ডকে পরাজিত করে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে। পূর্ব জার্মানীর পক্ষে এই প্রথম ফাইনাল খেলা। তারা ইতিপূর্বে দুবার ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে (১৯৬৪ ও ১৯৭২ সালে)। তৃতীয় স্থান নির্ধারণের খেলায় রাশিয়া ২-০ গোলে ব্রাজিলকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। গতবারের (১৯৭২ সালের) মত এবারও সমাজতান্ত্রিক দেশ ফুটবলের তিনটি পদকই পেল। গতবার পোল্যান্ড স্বর্ণ, হাঙ্গেরী রৌপ্য এবং যুগ্মভাবে পূর্ব জার্মানী এবং রাশিয়া ব্রোঞ্জ পদক জয়ী হয়েছিল। এবারের কোয়ার্টার ফাইনালে এশিয়ার এই তিনটি দেশ খেলেছিল—ইজরাইল, ইরান এবং উত্তর কোরিয়া। তারা কেউ সেমি-ফাইনালে উঠতে পারেনি।

কোয়ার্টার ফাইনাল

ব্রাজিল ৪ : ইজরাইল ১
রাশিয়া ২ : ইরান ১
পূঃ জার্মানী ৪ : ফ্রান্স ০
পোল্যান্ড ৫ : উত্তর কোরিয়া ০

সেমি-ফাইনাল

পোল্যান্ড ২ : ব্রাজিল ০
পূঃ জার্মানী ২ : রাশিয়া ১

ফাইনাল

পোল্যান্ড ৩ : পূর্ব জার্মানী ১

রাশিয়া ২-০ গোলে ব্রাজিলকে পরাজিত করে ব্রোঞ্জ পদক জয়ী হয়।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

১৯৭৬ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান ক্লাব অপরাজিত অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব লাভ করেছে। এই নিয়ে তারা তিনবার অপরাজিত অবস্থায় প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান হল। এর আগে হয়েছে ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে। মোহনবাগান এই নিয়ে মোট ১৫বার প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান হল। এর আগে হয়েছে ১৯৩৯, ১৯৪৩—৪৪, ১৯৫১, ১৯৫৪—৫৬ (উপর্যুপরি ৩বার), ১৯৫৯, ১৯৬০, ১৯৬২—৬৫ (উপর্যুপরি চারবার) এবং ১৯৬৯ সালে। মোহনবাগানই প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলার ইতিহাসে সর্বাধিক বার (মোট ১৫বার) লীগ জয়ের রেকর্ড করেছে। ইস্টবেঙ্গলের ১৪বার, মহামেডান স্পোর্টিংয়ের ৯বার এবং ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের ৮বারের লীগ জয়ও উল্লেখযোগ্য।

১৯৫৭ খৃঃ। পুরস্কৃত 'বন্ধন' ছবির সার্টিফিকেট গ্রহণ করছেন দিলীপ সরকার ও ইন্দ্রাণী সরকার।

কয়েকজন

নতুন ছবি শেষ রক্ষায় সাবিত্রী চ্যাটার্জি ও [illegible]

দিলীপ সরকার

সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মান ছেলের পক্ষে ভবিষ্যৎ নিয়ে সাধারণতঃ মাথা ঘামাবার কোনো কারণ থাকে না। ভবিতব্যের পাতায় তার যথার্থ স্থান যোগাড় করে নেওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

তবুও দিলীপ সরকারের বেলায় কিন্তু অন্যরকমটি ঘটেছে। বাবা স্যার বীরেন্দ্রনাথ সরকার। ভারতের সবচাইতে নামকরা ফিল্ম কোম্পানী নিউ থিয়েটার্সের কর্ণধার-মালিক। ৫০—৫১ সালে কোম্পানীর ব্যবসা রম্ রম্ করে চলছে। স্যার বীরেন একাই সব সামলাচ্ছেন।

ছেলে দিলীপ সরকার গ্রাজুয়েট হবার পর বাড়ীর সবাই ভাবতে লাগলেন এবার কি করা যায়? শেষ পর্যন্ত স্থির হোল 'বাবার বয়স হচ্ছে, এতবড় ব্যবসা দেখা-শুনো করায় সাহায্য করার জন্য অন্ততঃ একজন নিজের লোক দরকার!' সুতরাং সায়েন্স গ্রাজুয়েট দিলীপ সরকার চলে এলেন ফিল্ম লাইনে। সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মান ছেলে বড় কিংবা আরও বড় হবার পথ ছেড়ে পিতার ব্যবসার দিকেই ঝুঁকলেন। তাতে অবশ্য তাঁর কোনো ক্ষতি হয়নি, আর বাংলা ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিরতো লাভই হয়েছে।

সরকার প্রোডাকসন্স ব্যানারটিতো রুচিশীল-পরিচ্ছন্ন শিল্পসমৃদ্ধ ছবিরই পরিচয় দেয়।

অবশ্য দিলীপবাবুর জীবন, মানে ফিল্ম জীবন শুরু হয়েছিল অন্যভাবে। ছাত্রাবস্থায় ফিল্ম লাইনের সঙ্গে তেমন যোগাযোগ ছিল না। বাবা ফিল্মের ব্যবসায় ছিলেন, নিউ থিয়েটার্সের নাম তখন দর্শকের মুখে মুখে এটুকুই তিনি জানতেন। মাঝেমধ্যে পুজো বা গ্রীষ্মের ছুটিতে স্কুল-কলেজের বন্ধুদের পীড়া-পিড়ীতে তাদের শুটিং দেখাতে নিয়ে যেতেন স্টুডিওয়।

ব্যাস! ঐটুকুই ছিল তাঁর ফিল্মের পরিচয়।

বাড়ী থেকে ফিল্মের ব্যবসায় বাবাকে সাহায্য করার কথা যখন উঠল তখন দিলীপবাবু লাইনে একবারে আনকোরা

পীযূষ বসুর ছবি ব্রজবুলি উত্তমকুমার। অমৃত ফটো

বলা যায়। খ্যাতনামা শিল্পী—নিউ থিয়েটার্সের আর্ট ডিরেকটর সৌরীন সেনের কাছেই কাজকর্ম শেখা শুরু।

কিছুদিন বাদে সম্ভবতঃ একান্ন সাল নাগাদ এন-টি শুরু করলেন 'মহাপ্রস্থানের পথ' ছবিটি। কার্তিক চ্যাটার্জী পরিচালক। বাবার নির্দেশে দিলীপবাবুর ওপর দায়িত্ব পড়ল এই ছবির প্রোডাকশনের দেখাশুনো করা।

সেই সময়কার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি জানালেন—'তখন আমি লক্ষ্য করেছি ইউনিটের প্রতিটি লোক কাজটাকে নিজের মনে করে প্রাণ দিয়ে কাজ করেছেন। ব্যক্তিগত অসুবিধা সত্ত্বেও কারও মধ্যে বিন্দুমাত্র নিষ্ঠার অভাব দেখিনি।'

এমনকি সেই সময় সঙ্গীতকার পঙ্কজ মল্লিকের পিতৃবিয়োগ হলেও তিনি বসে এই ছবির ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক রেকর্ড করে গেছেন। এমনতরো নিষ্ঠা আজ ক'জন শিল্পীর কাছ থেকে আর আশা করা যায়?

এমন আন্তরিকতা—নিষ্ঠা আর একাগ্রতা ছিল বলেই এন-টি'র এত সুনাম-খ্যাতি আর জয় জয়কার।

কিন্তু লক্ষ্মীতো চঞ্চল।

পরবর্তী ক'বছরে চারখানা ছবি হবার পর (নবীনযাত্রা বনহংশী বকুল ও নন্দনদী) চুয়ান্ন সাল নাগাদ স্থির হোল এন-টি'র ব্যাপারে আপাততঃ আর ছবি হবে না।

—কেন এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হোল?

জবাবে দিলীপ সরকার বললেন—শুনেছিলাম ব্যবসা মন্দা চলছে। বিস্তারিত কারণ আমি কখনও জানতে চাইনি।' তবে নানা কথোপকথনের মধ্যে যা বুঝলাম তাতে মনে হোল কারণ তিনটে—

(ক) ছেচল্লিশ সালে রায়টের জন্য শহরের হাওয়া ছিল অস্বাভাবিক কিন্তু স্টুডিও কর্মচারী শিল্পীদের মাইনে বহন করতেই হচ্ছিল। তাও কম নয়, মাসে প্রায় পঁচাত্তর হাজার টাকা।

(খ) যুদ্ধের সময় কিছু ছবি ভালো ব্যবসা করলেও, সরকারের নতুন সুপার ইনকামট্যাক্স চাপার দরুন আর্থিক বোঝা গেল বেড়ে।

(গ) স্বাধীনতার সঙ্গে বাংলা ভাগ হোল। বাংলা ছবির বাজার গেল ছোট হয়ে, আয় গেল কমে। কিন্তু খরচ কমল

যাই হোক এন-টি বন্ধ হোল বটে, এবার দিলীপ সরকার সরাসরি এলেন ফিল্মের ব্যবসায়। সরকার প্রোডাকসন নামে নতুন সংস্থা খোলা হোল যা কর্ণধার হলেন দিলীপবাবু নিজে। এই ব্যানারে প্রথম ছবি গোধূলি (কার্তিক চ্যাটার্জী) দ্বিতীয় ছবি অমর সায়গল (নীতিন বসু)—কোনোটাই তেমন চললো না।

পরের দুখানি ছবি অবশ্য আগের লোকসান পুষিয়ে দিল। পঞ্চান্ন সালে সাহেব বিবি গোলাম আর ছাপান্ন সালে হেমচন্দ্র চন্দ্রের 'বন্ধন' (হিন্দী) সরকার প্রোডাকসনকে প্রতিষ্ঠা দিল বাজারে। ছাপান্ন সালের সেরা ছবির স্বীকৃতি হিসাবে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার নিয়ে এলো 'বন্ধন'।

আবার এই বছরেই ঘটল আর একটি আর একটি অঘটন। আগষ্ট মাসে রিসিভার বসলো এন-টিতে। স্বাভাবিক কারণেই দিলীপবাবু তখন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন নানা মাঝপথে। কোর্ট-কাছারি করতে করতে ছবির প্রোডাকসনে ভাটা পড়ল কয়েক মাস। সাতান্ন সালে তস্বির তদারকি করে দিলীপবাবুই আবার স্টুডিও খুললেন। দুনম্বর স্টুডিও খোলা হোল একটা কো-অপারেটিভ শিল্পীদের। এন-টি ১নং দিলীপ-

পরলোকে ফ্রিৎজ্ ল্যাং

চরিত্রে বোহেমিয়ান, অন্তরে নৈরাশ্যময় রোমান্টিকতায় আর ছবির জগতে রহস্য রোমাঞ্চের মৌলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জার্মান ফিল্মের অন্যতম জনক ফ্রিৎজ ল্যাং এখন ইতিহাসের পাতায় স্থান পেলেন। ছিয়াশী বছরের ল্যাং সম্প্রতি (৩ আগস্ট) শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন জার্মানীতে।

কলকাতার রসিক দর্শকদের কাছে তাঁর পরিচয় অজ্ঞাত নয়। ত্রিরায়ত জার্মান চলচ্চিত্রের একাধিক উৎসবে ল্যাং-এর মেট্রোপলিস, ম্যাবিউজ দি গ্যাম্বলার, ডাঃ নেবুলেন জেন, এম ইত্যাদি ছবিগুলি তাঁরা দেখেছেন নিশ্চয়ই। চলচ্চিত্রের উষালগ্নে যে ক'টি প্রতিভা তাকে শুধু কারিগরি দিকে নয়, শৈল্পিক কোণ থেকেও সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল, ফ্রিৎজ ল্যাং তাঁদেরই একজন। জন্মসূত্রে তিনি অস্ট্রিয়ান হলেও জীবনের কর্মক্ষেত্র ছড়িয়ে ছিল সারা পৃথিবী। বাবার পছন্দ মত স্থপতি হবার বাসনা নিয়ে পড়াশুনা শুরু করেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে শিল্প চর্চার হাতছানিতে পথ বদলাতে হয়। বাড়ী ছেড়ে একসময় উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়িয়েছেন পৃথিবী (সম্ভবতঃ তখন একবার ভারতবর্ষেও এসেছিলেন)। শিল্পসৃষ্টির তৃষ্ণায় ছবি আঁকায় হাত পাকিয়ে যখন প্যারিসে ফিরে সবে থিতু হয়ে বসবেন—অমনি শুরু হোল যুদ্ধ—প্রথম মহাযুদ্ধ। দেশের হয়ে অস্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিলেন ল্যাং। কিছুদিন বাদে যুদ্ধে আহত হয়ে হাসপাতালে। আর এই হাসপাতালে থাকার সময়েই স্ক্রিপ্ট তৈরীর নেশা চাপল মাথায়। প্রথমে অপরের জন্য স্ক্রিপ্ট লিখছিলেন, পরে নিজেই ছবি করতে শুরু করলেন। প্রথম ছবি 'দি টায়ার্ড ডেথ'।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন হলিউডে। সেখানেও প্রচুর ছবি করেছেন ল্যাং। যার মধ্যে রয়েছে ফিউরি, ইউ অনলি লিভ ওয়ানস, মান হান্ট, হ্যাঙ্গমেন অলসো ডাই দি বিগ হিট, হিউম্যান ডিজায়ার। তাঁর সর্বশেষ ছবি হচ্ছে 'থাউজ্যান্ড আইজ অফ ডঃ ম্যাবিউজ'। ৬০ সালে বার্লিনে তোলা হয়েছিল ছবিখানি।

এই বছরই আবার তিনি এলেন প্রোডাকসনে। ছবির নাম—'নতুন ফসল।'

মেইনলি তিনটি কারণে এই ছবিটি এখনও বোধ হয় দর্শক ভোলেনি। এক নম্বর—পরিচালক হেমচন্দ্র চন্দ্রের এইটিই শেষ ছবি, দু'নম্বর—সুরকার রাইচাঁদ বড়ালেরও ছিল এটি শেষ ছবি, তিন নম্বর—আজকের খ্যাতনামা লোকগীত-শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরীর খ্যাতি প্রাপ্তি ঘটেছিল এই 'নতুন ফসল' ছবি থেকেই।

কিন্তু 'নতুন ফসল' ব্যবসা তেমন জমাতে পারল না। সরকার প্রোডাকসন বেশ কিছুদিন চুপচাপ।

বছর চার-পাঁচ বাদে বাষট্টি সালে তপন সিংহকে দিয়ে 'নির্জন সৈকতে' করালেন। ছবি হিসাবে সম্মানপ্রাপ্তি ঘটেছে অনেক কিন্তু ব্যবসা নৈব নৈবচ। যা না হলে ছবি হয় না, ছবি করা যায় না।

আবার এলো অঘটন। বেশ বড় অঘটন।

বাষট্টির মার্চে এন-টি মানে নিউ থিয়েটার্স লিকুয়েডেশনে গেল। হাতী-মার্কা চিহ্ন আর কোনো নতুন ছবি দেখার আশা হলো নিশ্চিহ্ন।

দিলীপবাবু দমলেন না। বাবার তৈরী সুনাম যাতে অক্ষুন্ন থাকে সেজন্য একের পর এক ছবি করে যেতে লাগলেন। বাষট্টিতেই বম্বে গিয়ে একটুকু ছোঁয়া লাগে' করলেন, তেষট্টিতে আজানা শপথ, চৌষট্টিতে অর্পণা। প্রত্যেকটা ছবিই নাকি

তবুও প্রায় বছর দশ-বারো চুপচাপ ছিলেন দিলীপ সরকার। ইণ্ডাস্ট্রিতে অনেকে ধরে নিয়েছিলেন—সরকার প্রোডাকসন আর বোধ হয় ছবি করবে না। ইতিমধ্যে নিউ সিনেমা হলটিও হস্তান্তরিত হয়ে গেল। একমাত্র এক নম্বর স্টুডিওটি ছাড়া আর কিছুই রইল না। দিলীপবাবুদের হাতে। স্টুডিওর দেখাশুনো আর পুরোন কিছু ছবি চালিয়ে ব্যবসাটা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

এবছর আবার ফিরে আসছেন প্রোডাকসনে। সেই সঙ্গে প্রায় ভুলে যাওয়া সেই হাতীমার্কা চিহ্নকে ফিরিয়ে আনছেন। সরকার প্রোডাকসনের নতুন ছবি শেষরক্ষা নিবেদন করবে নিউ থিয়েটার্স প্রোডাকসন প্রাঃ লিমিটেড। এখন শঙ্কর ভট্টাচার্যের পরিচালনায় ছবির সুটিং প্রায় শেষ। রাজ্য সরকারের কাছ থেকে দেড় লাখ টাকা ঋণও নিয়েছেন।

বললাম—হাতীমার্কা ব্যানারকে যখন ফিরিয়ে আনছেন তাহলে এন-টি'র পুরোনো কিছু ছবি রিমেক করুন না! তেমন ইচ্ছেও আছে তাঁর। কিন্তু সমস্যাটা হোল সব ছবির রাইটতো তাঁদের কাছে নেই, কার কাছে সেটা জানাও নাকি মুশকিল। সেই সঙ্গে শ্রীসরকার দর্শকের কাছে একটি প্রশ্ন রাখলেন—পুরোন ছবির রিমেক করবো, তবে তার আগে জানতে চাই দর্শকরা কোন কোন ছবিগুলো আবার দেখতে চান?'

উত্তরে আমিই বললাম—আজকাল পুরোনো ছবি রিলিজের ঝোঁক এসেছে, আপাততঃ সেভাবে কিছু ছবি রিলিজ করুন।'

অনুযোগের সুরে দিলীপবাবু বললেন—সেটাতো পারছি না। এন-টি'র ছবির ডিস্ট্রিবিউশনতো অন্য লোকের। জানি না তাঁরা কেন অঞ্জনগড়-মহাপ্রস্থানের পথে-র মতো ছবি আবার রিলিজ করছেন না! মুক্তির সাফল্যের পরও তাঁরা চুপ করে আছেন কেন?'

—দর্শকের মধ্যে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন কি?

ঃ পরিবর্তনতো হয়েইছে। দর্শকের অন্যান্য খরচ বেড়ে যাওয়ায় সিনেমা দেখার ব্যাপারে খুব চুক্তি হয়েছে। আগে সপ্তাহান্তে একখানা ছবি প্রায় প্রত্যেকেই দেখত। এখন অনেকেই ছবি কেমন হয়েছে শুনে তবেই দেখতে যায়। উপরন্তু ইয়ং জেনারেশন একটু হুল্লোড়ে ছবি পছন্দ করে, আবার হলোই হিন্দী ছবি থাকতে বাংলা ছবি আর দেখবে কেন?

—বাংলা ছবিওতো তেমন ভালো হচ্ছে না।

এই অভিযোগ তিনি মেনে নিলেন। আর বললেন—সেইজন্যই তো আমরা ঋষি ঠাকুরের ক্লাসিক লেখা শেষরক্ষা কে বেছে নিয়েচি। নিউ থিয়েটার্সের ভালো ছবি করার ঐতিহ্য আমি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি, দেখি পারি কিনা।

নিরীক্ষক

নাগরিক
ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় / দেবীকা মুখোপাধ্যায়
কাহিনী চিত্রনাট্য সংগীত পরিচালনা : পার্থপ্রতিম চৌধুরী

উৎসব সংবাদ

দিল্লী

৬ষ্ঠ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রস্তুতি নিয়ে নয়াদিল্লীর শাস্ত্রীভবন এখন কর্মব্যস্ত। উৎসবের নতুন পরিচালক মিঃ ভার্মা কদিন আগে জানিয়েছেন আগামী উৎসব যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর ও ত্রুটিহীন হয়, সেদিকে নজর রেখে কাজকর্ম চলছে।

আগামী ৩ জানুয়ারী থেকে শুরু করে ১৬ জানুয়ারী পর্যন্ত উৎসব চলবে। এই উৎসবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় চলচ্চিত্র শিল্প-মাধ্যমটির যে উন্নতি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার চেষ্টা চলছে তার সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং সেই সঙ্গে প্রতিটি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে তোলাই প্রধান কথা।'

এই মহৎ উদ্দেশ্যের কথা মনে রেখেই কর্তৃপক্ষ বিশ্বের তিরিশটি দেশকে আনন্দন জানিয়েছেন। আমন্ত্রিত দেশগুলির মধ্যে যেমন সমাজতান্ত্রিক চীন আছে, তেমনি জায়রি, কোয়াতারের মত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রও বাদ পড়েনি।

পূর্বেকার মত এবারও উৎসবের তিনটি বিভাগ থাকবে—প্রতিযোগী বিভাগ, বাণিজ্য বিভাগ ও ইনফরমেশন বিভাগ। ১৯৭৫ সালের অকটোবর মাসের পরে তৈরী ছবিই এই উৎসবে যোগ দিতে পারবে। অবশ্য ইনফরমেশন বিভাগের ছবির ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম চলতে পারে। বাণিজ্য বিভাগটির মূল উদ্যোক্তা হচ্ছেন ইম্পেক। সংস্থার চেয়ারম্যান শ্রীকৃষ্ণ এই বিভাগের সর্বেসর্বা। বিভিন্ন বিভাগে ছবির নাম নথিভুক্ত করার শেষ তারিখ ৩ অক্টোবর। এবং ছবির প্রিন্ট পাঠাবার শেষ তারিখ ৩ নভেম্বর।

ছবি বাছাইয়ের জন্য খুব শিগগিরই একটি সর্বভারতীয় কমিটি গঠন স্থির হয়েছে। নভেম্বর মাসে ছবিগুলি পৌঁছনোই সেই কমিটির কাজ শুরু হবে। প্রতিযোগী বিভাগের ছবির জন্য যে আন্তর্জাতিক জুরী বোর্ড গঠন করা হচ্ছে তার চেয়ারম্যান হবেন একজন ভারতীয়, আর বাকি সাতজন সদস্যকে নেওয়া হবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে। ইতিমধ্যে নাকি বিশিষ্ট কয়েকজন পরিচালক ও তারকার কাছ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া গিয়েছে।

এডিনবরা

৩০তম এডিনবরা চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হচ্ছে। যদিও এই মেলা প্রতিযোগিতামূলক নয়, তবুও এই উৎসবকে ঘিরে উৎসাহ উদ্দীপনার অন্ত নেই। স্কটিশ ফিল্ম কাউন্সিলের অর্থানুকূল্যে এই উৎসবের বড় আকর্ষণ হোল চলচ্চিত্র মাধ্যমটির বিকাশ ও অগ্রগতিতে সারা পৃথিবীব্যাপী যে আন্দোলন আর পরীক্ষা চলছে তার একটি বর্ণাঢ্য চিত্র তুলে ধরা।

এই উদ্দেশ্যেই আগামী চলচ্চিত্র উৎসবে কয়েকটি আকর্ষণীয় বিভাগ খোলা হচ্ছে। যেমন 'মনোবিশ্লেষণ ও সিনেমা'—এই বিভাগে সচিত্র আলোচনার বন্দোবস্ত হবে। দর্শক এবং পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বিমুখী আদানপ্রদানের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন দিন আলোচনা করবেন রস কাডিয়ার্ড, স্টিফেন হীথ, ম্লেয়ার জনস্টন, জ্যাকুলিন রস, পল উইলমেন, নোয়েল স্মিথ প্রমুখ বিশেষজ্ঞ।

পৃথিবী জুড়ে নব্য চলচ্চিত্র তথা অঁভা গার্দ আন্দোলনকে ঘিরে তর্ক কম হয়নি। এই বিষয় নিয়ে প্রতিদিন দুখানি ছবির প্রদর্শনীর সঙ্গে আলোচনার আসর বসবে পাঁচদিন। আলোচকদের তালিকায় রয়েছেন রেমন্ড বেলুর, বেন ব্রুস্টার, রোজিনা ক্রনওয়েল, ইভনে রেইনার, মাইকেল স্নো প্রমুখ পরিচালক-সমালোচকরা।

আমেরিকায় নতুন স্বাধীন সিনেমার জন্ম হয়েছে কয়েক বছর আগে। ব্রায়ান দা পালমা, 'ফ্যানটম অফ প্যারাডাইস', 'অবসেসন' ইত্যাদি ছবির মাধ্যমে এই নতুন আন্দোলন শুরু করেছেন। এডিনবরা উৎসব কর্তৃপক্ষ এবার 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সিনেমা—ইউ-এস-এ-৭৬' পর্যায়ে কিছু ছবি দেখাবেন। এছাড়াও প্রায় চল্লিশখানি কাহিনীচিত্র দেখানো হচ্ছে এই উৎসবে।

শিকাগো

রজতজয়ন্তী আন্তর্জাতিক শিকাগো চলচ্চিত্র উৎসব আরম্ভ হতে আর বেশী দেরী নেই। নভেম্বর ৫ থেকে ১৮ পর্যন্ত ছয় সপ্তাহব্যাপী এই উৎসবের প্রধান আকর্ষণ হবে দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত চলচ্চিত্রবিদ ও শিল্পীদের জমায়েত।

উৎসব পরিচালক মাইকেল কারুজ জানিয়েছেন—'এই উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য

হোল দেশে বিদেশের নতুন প্রতিভাকে আন্তর্জাতিক এক সমাবেশে পরিবেশন করা এবং বিভিন্ন পুরস্কারের মাধ্যমে তাঁদের উৎসাহিত করা।' গত উৎসবে সমাজতান্ত্রিক চীন সমেত সাইত্রিশটি দেশ যোগ দিয়েছিল শিকাগো উৎসবে। আশা করা হচ্ছে এ-বছর আরও বেশী সংখ্যক দেশ যোগ দেবে।

কাহিনী, স্বল্প দৈর্ঘ্য, কার্টুন, ডকুমেন্টারী বিভিন্ন বিভাগে প্রায় চৌদ্দটি পুরস্কার দেওয়া হবে বিভিন্ন ছবিকে, এছাড়াও আরও একাধিক পুরস্কারের বন্দোবস্ত আছে। এক আন্তর্জাতিক জুরী বোর্ড গঠিত হচ্ছে এই কাজের জন্য।

এই উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার ও শিল্পীর বাছাইকরা ছবির বিশেষ প্রদর্শনী। এ পর্যন্ত এই বিভাগে যাঁদের ছবি দেখানো হয়েছে তাঁরা হলেন কিং ভিডর, স্ট্যানলি ক্রামার, বেটি ডেভিস, হ্যারল্ড লয়েড, অটো প্রেমিঙ্গার, কলিন মর, জর্জ কুকর, রুবি কীলার, বিসবি বার্কলি, মারভিন লিরয়, নর্মান ম্যাকগারান, জর্জ পল, হাওয়ার্ড হকস, জর্জ স্টিভেনস, জেমস ওয়ংহো, ডন সিগেল, অ্যালেক গ্যানেস, সত্যজিৎ রায়, ভিনসেন্ত মিনেল্লি, স্ট্যানলী ডোনেন, পিয়ের পাওলো পাসোলিনি প্রমুখ। এ বছরের আকর্ষণীয় সেই ব্যক্তিত্বের নাম এখনও জানা যায়নি।

মমতা শংকর সিংহলের ছবিতে

খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী মমতা শংকর সম্প্রতি শ্রীলংকায় (সিংহলে) গেছেন। না, কোনো নৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দিতে নয়, ছায়াছবিতে অভিনয় করতে। পাকিস্থান, ভারত আর শ্রীলংকার শিল্পীদের নিয়ে স্থানীয় পরিচালক মানিক সান্দ্রাসাগরা 'সীতা দেবী' নামে একখানি ছবি করছেন। রামায়ণ কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে আধুনিকীকরণ ঘটেছে গল্পের পুনর্জন্মের ঘটনা দিয়ে ছবির শুরু।

এই রঙীন ছবিখানি প্রযোজনা করছেন অজন্তা উইজেসনা এবং শিল্পী তালিকায় রয়েছেন পাকিস্তানের ওসমান পীরজাদা (রাম), জেমিনি ফোনসেকা (রাবণ), রবীন্দ্র রানডেনিয়া, রেকস কোডিপিলি, সীতা কুমারাসিঙ্গে, অজিত জিন্দাসা, ক্রিস গিট, নবনন্দন উইজেসনা, নলিন উইজেসকেরা প্রমুখ। কুশলীরা সকলেই শ্রীলংকাবাসী। সংগীত পরিচালনা করবেন নির্মল মেন্ডিস। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য মমতার প্রথম ছবি মৃণাল সেনের 'মৃগয়া' এখনও মুক্তিপ্রতীক্ষায়।

জীবন জ্যোতি

প্রযোজনা : শ্রী ভী এম প্রডাকসন্স (প্রাঃ) লিঃ

পণের পুরো টাকাটা দেওয়া সত্ত্বেও লক্ষ্মীর বিয়ে ভেঙে গেল। কারণ পুলিশ প্রপ্রতারক মনোহরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। আগেও মনোহর পণের লোভে এইভাবে একাধিক বিবাহ করেছে। শেখরের বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে সে ওর বোনের বিবাহে উপস্থিত ছিল, বিবাহ ভেঙে যেতে দেখে, এই বিপদ থেকে পরিবারের মর্যাদা ও লক্ষ্মীর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সে নিজেই বিবাহের মণ্ডপে উপস্থিত হল। দেশে ফিরে এলে, রাজা কমলাকান্ত এই বিবাহকে সহজভাবে মেনে নিতে না পারলেও, বোনের অনুরোধে শেখরের বিবাহকে মেনে নিলেন। ধীরে ধীরে পুত্রবধূর নানাবিধ কার্যকলাপে তাকে পরিবারের একজন বলে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া উপায় রইলো না। এদিকে এক কুচক্রী মোসাহেব তার নিজের মেয়েকে শেখরের সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে, অপর এক কুচক্রীর সাহায্যে শেখর ও লক্ষ্মীর মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে দিল। ফলে শেখর লক্ষ্মীকে মার কাছে পাঠিয়ে দিলেন, কারণ লক্ষ্মী কুলটা। আর এই সব তথ্য প্রমাণ করার জন্যে সোমনাথ পূর্ব থেকেই ব্যবস্থা করে রেখেছিল। লক্ষ্মী গৃহত্যাগ করে চলে আসার পথে কুচক্রী মনোহর কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়ে রাজবাড়ীর পুরনো পুরোহিতের বাড়ীতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এখানেই লক্ষ্মী এক পুত্র ও কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়। ছেলে মেয়েরা ধীরে ধীরে সব বুঝলো—বাবা কীভাবে মাকে বিতাড়িত করেছেন। আর এজন্যে কুচক্রী মনোহর, সোমনাথ এবং তারই সাহায্যকারী গোপালদাস চৌরাসিয়ার জন্যেই সম্ভব হয়েছে। নানাবিধ ঘটনার মধ্যে দিয়ে কুচক্রীরা একে একে তাদের অপরাধ স্বীকার করল।

শেখর আবার লক্ষ্মীকে ফিরে পেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ছেলে ও মেয়ে, যারা এই পুনর্মিলন সম্ভব করেছে।

কাহিনীর অবাস্তবতা বাদ দিলেও পরিচালক মরুদ্যান ও কুমারণ কীভাবে সামাজিক কাহিনীতে পৌরাণিক গল্পের হনুমানকে উপস্থিত করে তাকে বানর সাজিয়ে এবং অল্প বয়সী ছেলেমেয়ে শান্তি ও রামকে দিয়ে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করিয়ে নিলেন, সবই অবাস্তব মনে হল গল্পের দুর্বলতার জন্যে। এ ছবির অন্যতম সম্পদ অভিনয় ও আঙ্গিক। অভিনয়ে এ কে হাঙ্গল (রাজা কমলকান্ত), বিজয় অরোরা (শেখর), বিন্দিয়া (লক্ষ্মী), শান্তি (বেবি মুন্নামুন), রাজু (মাস্টার রাজু), ওম শিবপুরী (গোপালদাস) ও সতোন কাজু (সোমনাথ) সুন্দর অভিনয় করেছেন। ইমান অর্ষের আলোকচিত্র এবং সলিল চৌধুরীর সঙ্গীতরচনা সুন্দর। কলাকৌশলের কাজ পরিচ্ছন্ন।

চিত্রদূত

সীতা দেবী / মমতাশংকর

নাটমঞ্চ

গোলাপ বৌ

সন্ধ্যা রায়/বরুণ দাশগুপ্ত। অমৃত ফটো

প্রতিকৃতি-র 'ফেনারাম বেচারাম'

নাটকার মনোজ মিত্র একটা বড় গুণ দর্শকদের কিভাবে মুগ্ধ করে বসিয়ে রাখতে হয়, তিনি তা বেশ ভালভাবেই জানেন। তাঁর নাটকে বেশীর ভাগ সময়েই উদ্দাম হাসির আড়ালে লুকিয়ে থাকে চিকচিকে করুণ ব্যথার কথা। তিনি প্রায় নির্বিকারভাবেই খোঁচা দিয়ে বসেন আমাদের আভিজাত্য, লোভ, আত্মসুখ বা স্বার্থপরতা, সামাজিক-তার মুখোশ, আপাতে সহৃদয় অথচ আড়ালে শয়তান রিপুর গভীরে। যেখানে মনুষ্যত্ববোধ মাথা কুটে মরে। স্বার্থই যেখানে শেষ কথা।

একথাটা তিনি আবার প্রমাণ করলেন 'পরবাস' নাটকের পরে প্রতিকৃতি নিবেদিত 'ফেনারাম বেচারাম' নাটকে। সত্যি বলতে কি, এমন স্যাটায়ার ধর্মী নাটক বাংলা রঙ্গ-মঞ্চে বড় একটা দেখাই যায় না।

পলাতক বা সংসারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে স্বেচ্ছা-নির্বাসিত এক গৃহকর্তার অনু-পস্থিতির ফলে তার কল্পিত সঞ্চিত ধন (গহনা, টাকা-পয়সা ইত্যাদি) হাতাবার ব্যাপার নিয়ে মঞ্চে যে আপাতে মজার সব দৃশ্য একের পর এক অভিনীত হয়েছে, তা রীতিমত উপভোগ্য।

আরো নাটক জমে ওঠে যখন একজন বিচিত্র পেশার (যার প্রধান ব্যবসা হোলো খবরের কাগজের নিরুদ্দেশ সংবাদ দেখে রেল স্টেশনে ফাঁদ পেতে বসে থেকে তাদের ধরে যথাস্থানে পৌঁছি দিয়ে কাঞ্চন মূল্যে পুরস্কার নেওয়া অথবা ধরে এনে দেবে এমন চুক্তি করা) মানুষ একটি দুস্থ লোককে বাপ সাজিয়ে সেই সংসারে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তাকে বাপ বলে প্রমাণ করবার এবং আড়ালে ছেলে, ছেলেবৌ এবং মেয়েকে তাকে বাপ বলে মেনে নেবার জন্য প্ররোচিত করার সেই সব দৃশ্যগুলি কি রকম বৈচিত্র্যময় এবং মজাদার তা না দেখলে বোঝাই মুস্কিল। এমন বিচিত্র মেজাজের গল্প সচরাচর নাটকে দেখা যায় না।

কিন্তু শেষ সময়ে সমস্ত নাটকের মোড় ঘুরে যায় আসল বাপ ফিরে এসে তার মিথ্যা সম্পদের ভান করে থাকা ব্যাপারটা ফাঁস করে দিলে।

শেষ অংকে যেন আজকের প্রায় সংসারেই গলগ্রহ, অথর্ব হয়ে থাকা অবজ্ঞাত মানুষগুলির দীর্ঘশ্বাসের কথা বলা হয়েছে। যেন অতবড় একটা হাসির প্রসন্ন বেলাকে সহসা করুণ মুহূর্তে নির্মমভাবে মুছে নেওয়া।

হাসির তো বটেই, এমন নাটক মঞ্চে যত অভিনীত হয়, ততই শুভ লক্ষণ বলে মনে কোরবো।

আর অভিনয়? এমন স্বচ্ছন্দ, নির্বিকার এবং বিস্ময়কর অভিনয় করেছেন নাটকের মূল চরিত্র সেই নিরুদ্দেশ ব্যক্তি খুঁজে পুরস্কার নেওয়া মানুষটি—যার নাম স্বপন রায়। এমন স্টেজ ফ্রি এবং চরিত্রের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মিশে যাওয়া অভিনেতা অপেশা-দারী হলে কজন আছেন তা রীতিমত ভেবে দেখার।

এর পরের চরিত্র (আসলে দারিদ্র্য আর মানুষের অবজ্ঞাত জ্বালায় রেল-লাইনে গলা দিয়ে আত্মহত্যা করতে যাওয়া এবং পরে নিরুদ্দেশ মানুষ ধরার ব্যবসায়ীর হাতে পড়ে হারানো পিতার ভূমিকায় অভিনয় করতে বাধ্য হওয়া) কেনারাম-রূপী সমীরণ মুখো-পাধ্যায়ের অসাধারণ অভিনয়ও ভুলবার নয়। অনেকগুলি অপূর্ব মুহূর্ত তিনি দর্শক-দের উপহার দিয়েছেন।

অভিনয়ে অবশ্য আর একটি চরিত্রও অবাক করেছেন তিনি প্রদীপ-রূপী অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্দ্রজিৎ দেবও অবশ্য স্বচ্ছন্দ।

নারী চরিত্রে দীপা চট্টোপাধ্যায় (ব্যক্তিগত জীবনে স্থান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী) ও সংযুক্তা দেব যেমন সপ্রতিভ, তেমনি সুন্দর।

এছাড়া সমীরণ রায়চৌধুরী, পান্না দত্ত ও আরতি ঘোষ মোটামুটি। কিন্তু কল্যাণ মিত্র ও নন্দ মুখার্জি অচল।

শ্রীপতি দাসের ধ্বনি আবদুল করিম খানের প্রথম দিকে গানের একটি টুকরো পরিবেশন অপূর্ব; এবং অজয় দত্তগুপ্তর মঞ্চ কিন্তু সত্যি সুন্দর।

এমন একটি উপভোগ্য নাটক উপহার দেবার জন্য পরিচালক অলোক দেবকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ।

সৃজন-এর নাটক

সৃজন নাট্যসংস্থা সম্প্রতি দর্শকদের উপহার দিলেন গোপাল সেনগুপ্তর নাটক অসামাজিক'। এটিকে বলা হয়েছে 'প্রান্ত মনস্কদের জন্য'। এবং বাস্তব সমাজের রূপদর্শন, না পঙ্কিলতম শহরে জীবনের জীবন্ত প্রদর্শনী।'

অভিনয়ে ছিলেন সুমিতা দাস, ছায়া ঘোষ, উজ্জ্বলকুমার, তরুণ দে সরকার, ধ্রুব সাহা, নারায়ণ সেন, সুবোধ সরকার, অমর-নাথ, প্রতাপ বাগচী, অবনী দাস, পরিমল মুখার্জি, অশোক চট্টোপাধ্যায় ও গুরু-প্রসাদ।

নাটকটির আলো ও সঙ্গীতে ছিলেন যথাক্রমে সুবোধ সরকার ও প্রতাপ বাগচী। নির্দেশনায় ছিলেন সোমদেব বসু ও গোপাল সেনগুপ্ত।

১১ই সেপ্টেম্বর ২টায়
কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে
মহুয়া নাট্য সংস্থার
দৃশ্যের দর্পণে
রচনা / বোম্মানা বিশ্বনাথম্

শতবর্ষের স্মরণায়

পালাবার পথ নেই
শুভেন্দু / অপর্ণা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ১১ আগস্ট ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের চাঁদবিবি নাটক নিয়ে শরৎকুমার রায়ের স্বত্বাধিকারিত্ব স্বারোদ্ঘাটিত হলো কোহিনুর থিয়েটারের। অভিনয়ে রইলেন সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ—আদিলশা। ক্ষেত্রমোহন মিত্র—ইব্রাহিম। মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টুবাবু)—এখলাস খাঁ। মন্মথ পাল (হাঁদুবাবু)—রঘুজী। অটলবিহারী দাস—মিয়ানমাঞ্জু। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—মল্লজী। তিনকড়ি দাসী—যোশীবাঈ। ভূষণকুমারী (ছোট)—মরিয়ম। কিরণবালা—তাজবিবি। তারাসুন্দরী—চাঁদবিবি। বিষাদকুসুম—ফয়জান। কুমুদিনী (বেঁটে)—খতিজা। নীরদাসুন্দরী—বাহাদুর। কিরণশশী (নাহার)—বাদী। নীলমণি ঘোষ—নেহাল খাঁ। কার্তিক দে—হামিদ খাঁ। পূর্ণ ঘোষ—দেলওয়ার।

চাঁদবিবি অসম্ভব জনপ্রিয়তার্জন করে। বিক্রীও হয় আশাতীত।

গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম ছত্রপতি শিবাজী প্রভৃতিও কোহিনুরে মঞ্চস্থ হয়ে জনপ্রিয়তার্জন করে।

কোহিনুরের প্রতিষ্ঠাতা শরৎচন্দ্র রায় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর পরলোকগমন করলে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস থেকে তদীয় ভ্রাতা শিশির রায় কোহিনুর পরিচালনার পুরোভাগে আসেন। শিশিরবাবুর পরিচালনায় কোহিনুরে একটা বিশৃঙ্খলতার ভাব দেখা যায়। এই সময়ই সম্ভবত ছত্রপতি শিবাজীর কয়েক রাত্রি অভিনয়ের পর তিনকড়ি দাসী ও তারাসুন্দরীর মধ্যে বাদানুবাদ হওয়ায় তারাসুন্দরী কোহিনুর পরিত্যাগ করেন। অপরেশচন্দ্রও কোহিনুর পরিত্যাগ করে কিছুদিন বাণী থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত থেকে পুনরায় কোহিনুরে যোগদান করেন। গিরিশচন্দ্রও প্রাপ্য টাকার জন্য শিশির রায়ের বিরুদ্ধে মামলা করেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২৯ নভেম্বর ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভাতের বেগারে' অপরেশচন্দ্র চাকদাস এবং ১৮ ডিসেম্বর গুরু গোবিন্দ সিংহের জীবনী নিয়ে হরনাথ বসু রচিত পাঞ্জাব গৌরব নাটকে গুরু গোবিন্দ সিংহ চরিত্রে অভিনয় করেন। ঠাকুর সিংহের জননী চরিত্রে অভিনয় করেন পান্নারাণী।

পাঞ্জাব গৌরব নাটকে ঠাকুর সিংহের জননীর সংলাপে ছিল ঃ আমি শুধু ঠাকুর সিংহের জননী নই—সমগ্র পাঞ্জাবের জননী। না—সমগ্র শিখ সম্প্রদায়ের জননী। শিখ সম্প্রদায় থেকে এই উক্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ওঠে। একজন বারবণিতা কি করে আমাদের মা হতে পারে? নাটক বন্ধ হলো। অপরেশবাবু নাট্যকার হরনাথ বসুকে নিয়ে পুরোন পাটনায় শিখ সম্প্রদায়ের অধিনায়কদের সঙ্গে দেখা করে সব বুঝিয়ে বলতেও কোন ফল হলো না। শেষ পর্যন্ত এই নাটকই নামান্তরিত চরিত্র নিয়ে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৩০ জানুয়ারী 'ববীরপূজা' নামে মঞ্চস্থ হলো।

৮ মে হরনাথ বসুর ময়ূর সিংহাসনে অপরেশচন্দ্র দেখা দিলেন দারা চরিত্রে। ৩ জুলাই প্রতিফল নাটকে স্বার্থশরণ চরিত্রে অভিনয় করে অপরেশচন্দ্র মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করেন। মিনার্ভায় সাজাহান নাটকে দিলদার চরিত্রে অদ্ভুত অভিনয়-কৃতিত্বের পরিচয় দেন অপরেশচন্দ্র।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর গিরিশচন্দ্রের রাজা অশোক নাটকে বীতশোক চরিত্রেও অপরেশচন্দ্র কৃতিত্বের পরিচয় দেন। অভিনয় করেন অশোক আর পদ্মাবতী চরিত্রে।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারী মিনার্ভায় ক্ষীরোদপ্রসাদের পলিন নাটকে হাসান চরিত্রে অভিনয় করে এই বছরই পুনরায় কোহিনুর থিয়েটারে যোগদান করেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের ২৬ আগস্ট হরিশ চন্দ্র সান্যাল রচিত বিশ্বামিত্র নাটকে বশিষ্ঠের চরিত্রে অপরেশচন্দ্র পুনরায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিশ্বামিত্র চরিত্রে ছিলেন তারক পালিত—অরুন্ধতী রূপে আত্মপ্রকাশ করেন বিনোদিনী (হাঁদি)।

অতুল মিত্রের জেনোবিয়া মঞ্চস্থ হলো ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ২৫ নভেম্বর। ফরমাজ চরিত্রে অপরেশচন্দ্র এবারও সকলের প্রশংসা কুড়িয়ে নিলেন।

কোহিনুর থিয়েটারের শেষ নাটক জুন, ১৯১২ খৃষ্টাব্দে। নামভূমিকায় ক্ষীরোদপ্রসাদের খাজা খাঁ মঞ্চস্থ হয় ২৯ অপরেশচন্দ্রের অভিনয়ও হয়েছিল মনে রাখবার মত। ২৯ জুলাই, ১৯১২ খৃষ্টাব্দে কোহিনুর থিয়েটার নীলামে বিকিয়ে যায়। অপরেশচন্দ্র গোড়াপত্তনেও ছিলেন আবার তার পরিসমাপ্তিতেও ছিলেন। এবার কোহিনুর নাট্যগৃহটি নীলামে কিনে নিলেন মনমোহন পাড়ে।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারী নটগুরু গিরিশচন্দ্র পরলোক গমন করেন। তার মৃত্যুর পরই কোহিনুরের অবলুপ্তি ঘটে। স্মরণ থাকতে পারে তারই অধ্যক্ষতায় কোহিনুর স্বারোদ্ঘাটন করেছিল। অপরেশচন্দ্র যোগদান করলেন মিনার্ভা থিয়েটারে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২১ সেপ্টেম্বর গিরিশচন্দ্রের 'মৃত্যুর পর মঞ্চস্থ তাঁর গৃহলক্ষ্মী নাটকে অপরেশচন্দ্র অভিনয় করেন হরীবু ঘোষাল চরিত্রে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১০ মে ক্ষীরোদপ্রসাদের ভীষ্ম নাটকে অর্জুন; ২৩

সেপ্টেম্বর রূপের ডালিতে ওসমান; প্রমথ চৌধুরীর ভাগ্যচক্রে ১৫ নভেম্বর কৃষ্ণবল্লভ এবং ২০ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ অমৃতলাল বসুর নবযৌবন নাটকে তিলকচাঁদ ও অন্যান্য পুরোন টকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে অপরেশচন্দ্র প্রথম সারির অভিনেতারূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিলেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দ অপরেশচন্দ্র তথা বাংলা রঙ্গমঞ্চের পক্ষে উল্লেখযোগ্য বছর। এই বছরই অপরেশচন্দ্রকে আমরা নাট্যকার রূপে লাভ করি।

৫ সেপ্টেম্বর প্রমথ ভট্টাচার্যের ক্লিওপেট্রা নাটকে আমানেহমট চরিত্রে অভিনয় করেন। এন্টনী ও ক্লিওপেট্রারূপে ছিলেন দানীবাবু ও তারা সুন্দরী। ক্লিওপেট্রা নাটকে নাট্যসাম্রাজ্ঞী বিনোদিনী অভিনয়ে করেছিলেন বলে যারা ভ্রান্ত অভিনয় পোষণ করেন। আশা করি তারা নিজেদের ভ্রান্তি সংশোধন করে নেবেন। ২৪ অকটোবর সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের রুমেলা নাটকে জাফর চরিত্রে অভিনয় করেন। ২৫ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হলো অপরেশচন্দ্র রচিত রঙ্গিলা। সোরিডনের একটি নাটক অবলম্বনে রঙ্গিলা রচিত। ১৬ ডিসেম্বর ক্ষীরোদপ্রসাদের আহেরিয়ায় অপরেশচন্দ্র মূলরাজ রূপে অভিবাদন জানান। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ৭ মার্চ 'সাইন অফ দি ক্রস' অবলম্বনে রচিত আহুতি নাটকে মহাব্রত চরিত্রে অপরেশচন্দ্র অভিনয় করেন। আহুতি অপরেশচন্দ্রেরই রচনা।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২ অকটোবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সিংহল বিজয় নাটকে সিংহবাহু চরিত্রে অপরেশচন্দ্র বিদেশতাড়িত পুত্রের জন্য পিতার অনুশোচনার দৃশ্যে যে মর্মস্পর্শী অভিনয় করেন—বিদগ্ধ দর্শকসমাজ অনেক দিন তা মনে রাখেন।

৫ ডিসেম্বর লেডীঅফ লরেন্স অবলম্বনে অপরেশচন্দ্র রচিত শুভদৃষ্টি নাটকে শ্যামলাল চরিত্রের অভিনয়ও ছিল মনে রাখার মত।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২৫ মার্চ দ্বিজেন্দ্রলালের বঙ্গনারীতে অপরেশচন্দ্র উপেন্দ্র চরিত্রে অভিনয় করেন। ১৫ জুলাই মঞ্চস্থ হলো অপরেশচন্দ্র রচিত ভক্তিমূলক নাটক রামানুজ। বস্তুত নাট্যকার হিসেবে রামানুজ নাটকই অপরেশচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠা এনে দিল। এই নাটকের প্রথম ৩ অঙ্ক তারাসুন্দরী এবং পরবর্তী দুই অঙ্কে রামানুজ চরিত্রে অভিনয় করেন হাদুবাবু। অপরেশচন্দ্র আত্মপ্রকাশ করেন যমুনাচার্য চরিত্রে।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ৩০ জুন বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর নাটকে অপরেশচন্দ্র নাম ভূমিকায় বিস্মিত করলেন। স্মরণ থাকতে পারে পেশাদার রঙ্গশালায় যোগদানের পূর্বে এই চরিত্রটি সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে শিক্ষালাভ করেন নটচূড়ামণি অর্ধেন্দুশেখরের কাছে। ৮ সেপ্টেম্বর ক্ষীরোদপ্রসাদের রঙ্গেরাঠোর নাটকে অপরেশচন্দ্রকে দেখা গেল সাহাবাজ চরিত্রে।

আবতি ভট্টাচার্য

চন্দ্রশেখর নাটক সম্পর্কে একটি তথ্য এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসখানির নাট্যরূপ দেন অমৃতলাল বসু। স্টার থিয়েটারে চন্দ্রশেখর মঞ্চস্থ হয়ে অসম্ভব জনপ্রিয়তার্জন করে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার নাটকটির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন এবং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে স্টার থিয়েটারের লেসী হন গিরিমোহন মল্লিক। ৩ আগষ্ট নতুন স্বত্বাধিকারীত্বে মঞ্চস্থ হয় শরৎচন্দ্রের বিরাজবৌ। নাট্যরূপ দিয়েছিলেন ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরাজ বৌ মঞ্চস্থ হবার পর অপরেশচন্দ্র মিনার্ভা পরিত্যাগ করে স্টার থিয়েটারে ম্যানেজাররূপে যোগদান করেন। প্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয় এই সময় নানাভাবে অপরেশচন্দ্রকে সহযোগিতা করেন। এই দুইয়ের যোগাযোগেই বাংলা রঙ্গমঞ্চ একদিন নতুন রূপে ভাস্বর হয়ে উঠেছিল!

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে অপরেশচন্দ্র স্টার থিয়েটারে ম্যানেজার হয়ে আসেন। ১৮ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হলো ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের কিন্নরী। ক্ষীরোদপ্রসাদ অনুমতি দিলেও মিনার্ভার পক্ষ থেকে উপেন্দ্রকুমার মিত্র হাইকোর্টে মোকদ্দমা করে কিন্নরীর অভিনয় বন্ধ করে দেন। কিছুদিনের জন্য ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্যাধরী অভিনীত হয়। পুরোনো নাটকও পুনরাভিনীত হতে থাকে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৮ মার্চ মঞ্চস্থ হলো দেবেন্দ্রনাথ বসু অনুবাদিত শেকসপীয়রের ওথেলো। তারক পালিত ওথেলো, অপরেশচন্দ্র ইয়াগো, তারাসুন্দরী ডেসডিমনা, নীরদাসুন্দরী এমিলিয়া চরিত্রে অভিনয় করেন। প্রবোধ গুহ মশায়ের নির্দেশে দৃশ্যপট প্রস্তুত করেন পরেশ বসু (পটলবাবু)। ওথেলো জনপ্রিয়তার্জন করে না। অপরেশচন্দ্র লিখলেন নৃত্য-গীত বহুল উর্বশী। হয়ত কিন্নরীর মঞ্চসাফল্যের কথা মনে করেই। ৩০ মার্চ নির্মলশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখের মত মঞ্চস্থ হবার পর ১৭ মে, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মঞ্চস্থ হলো উর্বশী। উর্বশী জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও কিন্নরী হলো না। উর্বশী চরিত্রে বসন্তকুমারী আর পুরুরবা রূপে অভিনয় করেন তারক পালিত।

৯ আগষ্ট মঞ্চস্থ হলো অপরেশচন্দ্রের দুমুখো সাপ। এই সময় স্টার থিয়েটার

নানান বিশৃংখলা দেখা দেয়। অপরেশবাবু সাময়িকভাবে অবসর নেন। কয়েক মাস বাদেই প্রবোধচন্দ্র গুহ তাঁর মামাতো ভাই সুশীল বসুর নামে গিরিমোহন মল্লিকের কাছ থেকে স্টার থিয়েটারের লীজ স্বত্ব ক্রয় করেন। এবং অপরেশচন্দ্র, তারাসুন্দরী ও অংশীদারগণ। এবার এঁরা তিনজনে মিলে স্টার থিয়েটারের পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন। অপরেশচন্দ্র এবার ইবসেন অনুসরণে লিখলেন রাখী বন্ধন। ৫ জুন, ১৯২০ খৃষ্টাব্দে রাখী বন্ধন স্টারে মঞ্চস্থ হলো। ধীরা চরিত্রে তারা সুন্দরী আর কৃষ্ণ চরিত্রে প্রথমে তারক পালিত পরে অপরেশচন্দ্র অভিনয় করেন। দেবেন্দ্রনাথ বসুর কৃষ্ণকুমারী অপেরা হবার পর অপরেশচন্দ্র উপহার দিলেন ছিন্নহার। এই নাটক খানিও মৌলিক নয়। মেরী কোরেলির ওয়ার্স উড নাটকের অবলম্বনে রচিত। বিলেত ফেরৎ মিঃ রায়ের চরিত্রে অপূর্ব অভিনয় করেন অপরেশচন্দ্র।

১৯২১ খৃষ্টাব্দ বাংলা রঙ্গমঞ্চের পথে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বছরই শিক্ষামন্দির পরিত্যাগ করে পরবর্তী কালের নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী যোগদান করলেন নাট্যমন্দিরে। নতুন আলোড়ন দেখা দিল সমগ্র নাট্যজগতে। পুরাতনে জীর্ণ কংকালকে প্রথিত করে আবিভাবের জন্য সবাই যেন উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। পসের স্বপ্নবাসবদত্তা অবলম্বনে অপরেশচন্দ্র উপহার দিলেন বাসবদত্তা। ১৩ জানুয়ারী, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে নাটকখানি মঞ্চস্থ হয়। এই বছরই ৩ ডিসেম্বর অপরেশচন্দ্র তার জনপ্রিয় নাটক অযোধ্যার বেগম উপহার দিলেন। হাফেজার রহমন চরিত্রে অপরেশচন্দ্রের অভিনয় ও অভিনন্দিত হলো। স্টার থিয়েটার ম্যাটিনীর প্রদর্শনীরও প্রবর্তনী করলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১৯ আগষ্ট অপরেশচন্দ্র উপহার দিলেন অপ্সরা নাটক। ২৩ সেপ্টেম্বর স্টারে মঞ্চস্থ হলো অপরেশচন্দ্র রচিত সাবিত্রী। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে স্টার থিয়েটার যে দুজন স্বনামধন্যা অভিনেত্রী উপহার দেন—তাদের একজন হলেন কৃষ্ণভামিনী আর একজন নীহারবালা। নীহারবালা মনমোহনের মধ্য দিয়ে। আত্মপ্রকাশ করলেও তার খ্যাতির ব্যাপ্তি স্টার থিয়েটারের মধ্য দিয়ে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে স্টার থিয়েটার আর্ট থিয়েটার লিঃ-এ রূপান্তরিত হলো। স্টার থিয়েটারের লাভস্বত্ব আসবাব পত্র অপরেশচন্দ্র ও প্রবোধচন্দ্র গুহ নবগঠিত যৌথ প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রয় করেন এজন্য তারা নগদে পঁচিশ হাজার ও শেয়ারে কুড়ি হাজার মোট পঞ্চাশ হাজার টাকা পান। প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলীতে রইলেন বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের পরিচালক ও নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—তিনি বিদায় নিলে তার স্থলাভিষিক্ত হন গদাই মল্লিক। সতীশচন্দ্র সেন, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, কুমার কৃষ্ণ মিত্র, প্রবোধচন্দ্র গুহ, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অপরেশচন্দ্র নাটকার, শিক্ষক ও ম্যানেজার এবং প্রবোধচন্দ্র গুহ কোষাধ্যক্ষ সেক্রেটারী পদে বৃত হন। নাট্যগৃহের আমূল সংস্কার সাধন করা হয়। গ্যালারী উঠিয়ে দিয়ে চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়। আলো এবং পাখার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। পশ্চিম দিকে নতুন দরজা করা হয়। সমস্ত পরিকল্পনা করেন প্রবোধচন্দ্র গুহ। নতুন নাটকের জন্য নতুন পোষাক—নতুন নতুন শিল্পী সম্ভারে আর্ট থিয়েটার শিশির সম্প্রদায়ের সংগে যেন পাল্লা দেবার জন্য প্রস্তুতি শুরু করলো।

শনিবার ১৫ আষাঢ়, ১৩৩০ ইংরেজী ৩০ জুন, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম মঞ্চস্থ হলো আর্ট থিয়েটার প্রযোজিত অপরেশচন্দ্র রচিত কর্ণার্জুন নাটক।

শিল্পী সমাবেশে ছিলেন নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্র—শকুনি। তিনকড়ি চক্রবর্তী কর্ণ। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী—অর্জুন। ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণ। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—পরশুরাম। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বিকর্ণ। তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়—দুঃশাসন। তুলসী চক্রবর্তী—কৃপাচার্য। নিভাননী—দ্রৌপদী। নীহারবালা—নিয়তি। আংগুরবালা—গৌরী। কৃষ্ণভামিনী—পদ্মাবতী। ফিরোজবালা—ভৈরবী। তারকবালা—বৃষকেতু। মনোরমা—কুন্তী। তাছাড়া আরো অনেকে। শিল্পী সম্ভারের মধ্য থেকে যে কয়টি নাম এখানে উপহার দিলাম—বাংলার নাট্যমোদী জনসাধারণ তাদের সকলকেই প্রথম সারির শিল্পী হিসেবে মর্যাদাভিষিক্ত করেছেন। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিকর্ণ চরিত্রের মধ্য দিয়েই সকলকে জয় করেন। অভিনয়—মঞ্চসজ্জা—পোষাক পরিচ্ছদ মঞ্চ বিষয়ে কর্ণার্জুন বাংলা রঙ্গমঞ্চের একটি দিগদর্শী নাটক হিসেবে অভিনন্দিত হয়। কর্ণার্জুন তিন বৎসর সমান জনপ্রিয়তায় অভিনীত হয়।

শনি-রবিবার কর্ণার্জুন, বুধবার ইরাণের রাণী আর বৃহস্পতিবার পুরোন নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয় তখন আর্ট থিয়েটারে। পুরোন নাটকে অভিনয়ের জন্য দানীবাবুকে আটশত থেকে হাজার টাকা মাইনেতে তিন বছরের চুক্তিতে বহাল করা হয়।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১ জানুয়ারী মঞ্চস্থ হয় ইরাণের রাণী। অপরেশচন্দ্র দাউদশা চরিত্রে অভিনয় করেন। ২৫ ডিসেম্বর অপরেশচন্দ্রের বন্দিনী'ও জনপ্রিয়তার্জন করে। দুর্গাধ্যক্ষ ইসকিবল চরিত্রে অপরেশচন্দ্র অভিনয় করেছিলেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ জুন দেশবন্ধু পরলোকগমন করেন। মহাত্মা গান্ধী প্রতিষ্ঠিত দেশবন্ধু স্মৃতি তহবিলে অন্যান্য নাট্যগৃহের মত স্টার থিয়েটারও অর্থ প্রদান করে।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ জুন মঞ্চস্থ হলো অপরেশচন্দ্রের পরিচালনায় কবিগুরুর চিরকুমার সভা। রসিক চরিত্রে অপরেশচন্দ্রের অভিনয় স্বয়ং কবিগুরুকেও এতখানি মুগ্ধ করে যে তিনি এরপর থেকে অপরেশচন্দ্রকে রসিকবাবু বলে ডাকতেন।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ মে অপরেশচন্দ্র রচিত শ্রীকৃষ্ণ এবং ২৫ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হয় তার বিপ্রদাস নাটক। কবিগুরুর গৃহ প্রবেশ ও শোধবোধ নাটকখানিক অপরেশচন্দ্রের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে আর্ট থিয়েটার অপরেশচন্দ্রের পরিচালনায় উপহার দিলেন কবিগুরুর পরিত্রাণ। ৩ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হলো অপরেশচন্দ্রের মগের মুলুক।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে আর্ট থিয়েটার স্টার থিয়েটারের সংগে মনমোহন থিয়েটারেরও পরিচালনাভার গ্রহণ করেন। ১ জুলাই ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে রথযাত্রার দিন মনমোহন থিয়েটারে আর্ট থিয়েটার প্রযোজিত অপরেশচন্দ্রের শ্রীরামচন্দ্র মঞ্চস্থ হলো।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে স্টার মঞ্চে অপরেশচন্দ্রের পুনঃপাদিতা নাটক মঞ্চস্থ হয়। প্রবোধচন্দ্র গুহ মনমোহনের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। স্টার রঙ্গমঞ্চে অপরেশচন্দ্রের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হলো শংকরচন্দ্রের রমা। অপরেশচন্দ্রের নিজস্ব নাটক ফুলরী মঞ্চস্থ হলো অপরেশচন্দ্র নাট্যরূপায়িত বঙ্কিমচন্দ্রের রজনী। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ২ জুলাই নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু পরলোকগমন করেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ২৩ নভেম্বর অপরেশচন্দ্র নাট্যরূপায়িত অনুরূপা দেবীর মন্ত্রশক্তি আর একখানি উল্লেখযোগ্য নাটক হিসাবে মঞ্চস্থ হয়ে অভিনন্দিত হলো।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে শিশিরকুমার কিছুদিন আর্ট থিয়েটার পরিচালিত স্টার রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেন। এই সময় চিরকুমার সভায় শিশিরকুমার চন্দ্র আর অপরেশচন্দ্র অভিনয় করেন তার রসিক চরিত্রে। এই বছরই শিশিরকুমার আমেরিকা যাত্রা করেন।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১৮ সেপ্টেম্বর অপরেশচন্দ্র রচিত শ্রীগৌরাংগ নতুন করে সাড়া জাগায়। চাপাল গোপাল ও রায় রামানন্দ চরিত্রে দানীবাবু বন্ধু রমাণাও উচ্চ প্রশংসিত হন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১২ মার্চ অপরেশচন্দ্র নাট্যরূপায়িত অনুরূপা দেবীর পোষ্যপুত্র জনপ্রিয়তা ও অভিনয় মানের দিক থেকে আশাতীত সাফল্য এনে দেয়।

(ক্রমশঃ)

কালীশ মুখোপাধ্যায়

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীদেবীপ্রসাদ সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৭ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা ৩ হইতে মুদ্রিত ও ৬৫ কর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের নতুন বই

চিত্র বিচিত্র

একাল-সেকালের বিচিত্র কথা ও রসমধুর কাহিনী-সমারোহ দাম ঃ সাত টাকা

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১৩৮১ সালের মৌচাক পত্রিকা কর্তৃক
সুধীরচন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ রচিত
ছোট বড় সকলের মনের মত
বাংলা সাহিত্যের দু'খানি আশ্চর্য বই

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য ঃ—চার টাকা

(সপ্তম সংস্করণ চলছে)

ছোটদের উপযোগী সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী লেখা হয় নি। বিশেষ করে নানাবিষয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ছোটদের মনের মত বিচিত্র রোমাঞ্চকর লেখা খুব সহজ নয়। 'বিচিত্র কাহিনী'তে লেখক সত্য ঘটনাগুলিকে নিজের সরস মুন্সিয়ানা দিয়ে এমন জীবন্ত আর আকর্ষণীয় করে তুলেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রচনাই অনবদ্য রস ও রোমাঞ্চে' টইটম্বুর। মোট পনেরোটি কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রসের ফল্গুধারায় সিক্ত, বর্ণনায় মনোমুগ্ধকর।

আরও বিচিত্র কাহিনী বইটি কিশোর ও বয়স্কদের জন্য সমভাবে রচিত। লেখক শুধু ছোটদের জন্যই রস পরিবেশন করেননি, বড়রাও এই অমৃত আস্বাদন করে পুলকিত হবেন। অনবদ্য রস রচনাশৈলী এবং প্রতিটি কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ চুম্বকের মত পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে। এই বইটিতে দশটি বিভিন্ন রসের কাহিনী রয়েছে এবং লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি এমন সুন্দরভাবে রসযুক্ত করে উপস্থিত করেছেন যে পাঠককে বিমুগ্ধ করবে।

আরও বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য ঃ—চার টাকা

(চতুর্থ সংস্করণ চলছে)

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ঃ ফোন ৩৪-১৭৮২

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 27th August, 1976
Phone 55-5231 (14 lines)

12 6 AUG 1976

CALCUTTA UNIVERSITY

ELPARADE

এলপার স্যুটিং-এর প্যারেডঃ

চেক, স্ট্রাইপ, ক্রেপ—টেকস্‌চ্যারাইজড্‌...এলপার স্যুটিং-এর বিস্ময়কর সম্পূর্ণ নতুন সম্ভার ! এছাড়া, শার্টিং • শাড়ী • জামার কাপড়।

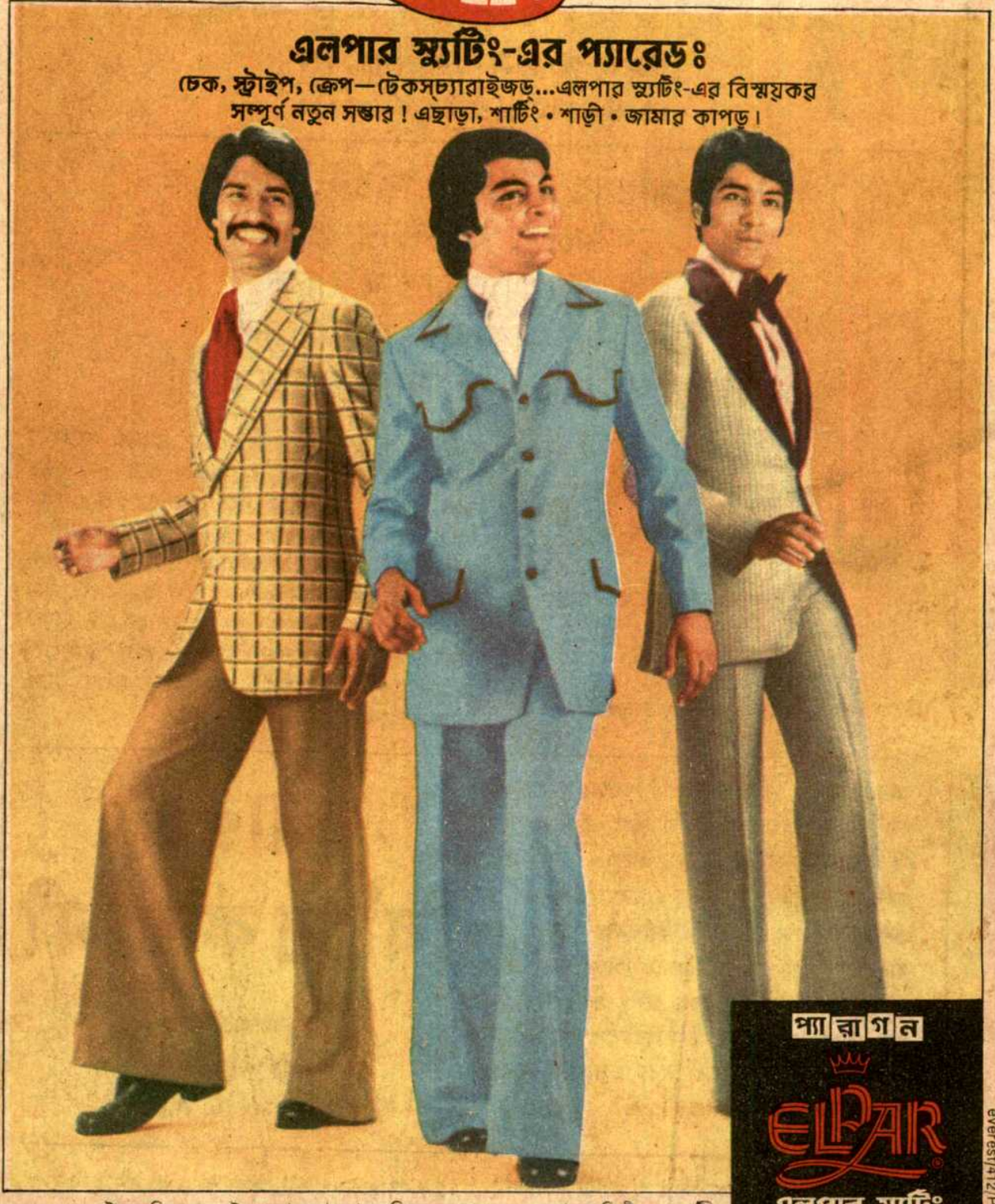

প্যারাগন
ELPAR
এলপার স্যুটিং
বিশ্বাসের প্রতীক

এই সব কিছুর সঙ্গেই এলপার আপনাকে দিচ্ছে পয়সা ফেরত দেবার অদ্বিতীয় গ্যারাণ্টী।
সব প্রধান দোকান গুলিতেই পাওয়া যায়। প্যারাগন টেকস্‌টাইল্‌ মিল্‌স্‌, বম্বে ৪০০ ০১৩

everest/412/PTM-bn

ফটো-অক্সফোর্ড : এন, কে, গোয়েন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

অমৃত
সম্পাদক প্রাতুষারকান্তি ঘোষ
৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ ॥
মূল্য ৭৫ পয়
অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়

বোরোলীন যার সহায়
গ্রীষ্মে তার ভয় কি?
যদিও নানা কাজে আপনাকে সারাদিন এই রৌদ্রদগ্ধ সূর্যের নিচেই চলতে ফিরতে হবে। শরীরের উন্মুক্ত অংশগুলো সূর্য তাপ শুষে যাবে। দেখা দেবে ফোস্কা, ফুসকুড়ি ও ঘামাচির অন্যান্য অস্বাচ্ছন্দ্য। অনেক সময় এই সব ক্ষতস্থানে দূষিত হ'য়ে ওঠে বাইরের ধুলো-ধোঁয়া বা রোদ-জল।
বোরোলীন সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম আপনার ত্বকের সামান্য কাঁচা কাটা-ছেঁড়া-ফাটা অংশগুলোকে নিরাপদ রাখে।
ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাঃ লিঃ বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

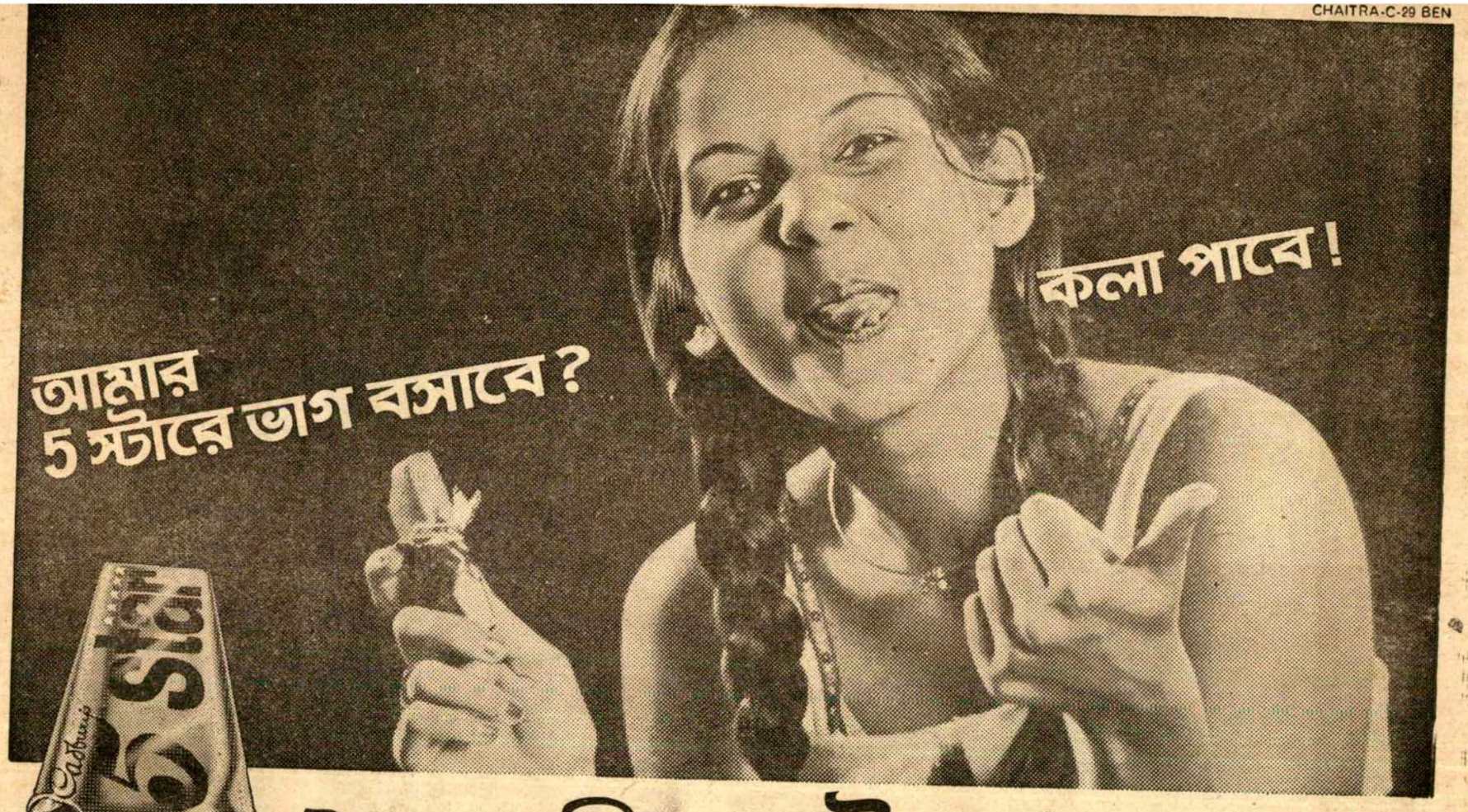

ক্যাডবেরীস্ 5 স্টার

ক্রীমে ভরপুর মিল্ক চকলেটে
মোড়া মজাদার ক্যারামেল আর সুস্বাদু
নুগাটিনের পুরের ওপর পুর!

স্বাদে অতুলনীয়-কেউ ছাড়তে চায় না

বাংলা ভ্রমণ-সাহিত্যের অনন্য রূপকার

শঙ্কু মহারাজ-এর

মন-দ্বারকায় ১২.

জরাসন্ধের আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা থেকে দ্বারকায় চলে গিয়েছিলেন, আর শ্রীকৃষ্ণের মহাজীবনকে ভ্রমণ-কাহিনীর মাঝে ধরে রাখবার প্রেরণায় অস্থির হয়ে লেখক মথুরা থেকে দ্বারকা ও বেট-দ্বারকায় ছুটে গিয়েছেন। তারপরে সেই তীর্থ পরিক্রমার কাহিনী ও মহাভারতের কৃষ্ণকথা নিয়ে দীর্ঘ দু'বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে রচনা করলেন এই অনবদ্য গ্রন্থ। আলোকচিত্র শোভিত অপূর্ব ভ্রমণ-কাহিনী।

নিখিলচন্দ্র সরকারের সাম্প্রতিকতম উপন্যাস

সজনে নির্জনে ১২.

সমস্যাজর্জরিত বাঙালীর সামাজিক জীবনের বর্তমান ভঙ্গুর চিত্র। নানা আঘাত-সংঘাত, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে বাঙালীর পারিবারিক চিত্র আজ বিষাদ-মলিন। তারই প্রেক্ষাপটে আপনার-আমার —প্রতিটি বাঙালী-মনের অসহনীয় বেদনা-বিধুর কাহিনী।

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সর্বাধুনিক উপন্যাস

একাল চিরকাল ১০.

চিরঞ্জীব-এর অনবদ্য গ্রন্থ

বিশ্বকাপ ফুটবল ২৫.

অমলেন্দু ঘোষের নবতম গ্রন্থ

বিপ্লব ও বিপ্লবী ৮.

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অপূর্ব উপন্যাস

চাঁদের কাছাকাছি ৭.

চলচ্চিত্রের রূপালী পর্দায় শীঘ্রই দেখতে পাবেন

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নতুন ভ্রমণ-কাহিনী

গোমুখীর পথ ১৬.

নারায়ণ সান্যালের

গজমুক্তা (২য় সং) ১০.

দৃষ্টিহীনের উপন্যাস

মঞ্চ ১০.

ব্রজমাধব ভট্টাচার্যের উপন্যাস

স্বর্ণভ্রমর ১৪.

অমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সুবর্ণশিরি ২০.

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

থৈ থৈ হাহাকার ১৮.

নারায়ণ সান্যালের উপন্যাস

বিহঙ্গ বাসনা ১০.

শক্তিপদ রাজগুরুর

অভয়ারণ্য ১৫.

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাস

স্বাতী ও দীপু ১২.

আবদুল জব্বারের

পল্লীর পদাবলী ১৬.

কলহণের উপন্যাস

খবরে প্রকাশ ১০.

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

নীলাঙ্গুরীয় ১২

নটরাজন-এর

থানার মাটি নোনা ১৬.

রবীন্দ্র লাইব্রেরী

১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০০৭৩

ফোন ঃ ৩৪-৮৩৫৬

আজকের বিশ্বে কোন দেশই একা
নিজের অস্তিত্ব রক্ষা ক'রতে পারে না।
প্রত্যেক দেশকেই তার বিবেকসম্পন্ন
সহযোগীর অবিচ্ছিন্ন বিনিময়ের উপর আস্থা
রাখতে হয়। রাষ্ট্রের সংগে রাষ্ট্রের এই
সহযোগিতার মধ্য থেকেই সৃষ্টি হয়
পারস্পরিক বোঝাপড়া, বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব
এবং তখনই বিশ্বে গড়ে ওঠে
প্রগতি আর শান্তি।
সহযোগিতা ও বন্ধুত্বই হচ্ছে সাগর
পেরিয়ে দেশ-দেশান্তরের মধ্যে
মজবুত সেতু।
ফেডারেল প্রজাতন্ত্রী জার্মানী—
এক নির্ভরযোগ্য সহযোগী।

সহযোগিতা
মৈত্রী
গড়ে তোলে

ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানী
—এক নির্ভরশীল সহযোগী

ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানীর কনসুলেট জেনারেলের তথ্য ও সংবাদ বিভাগ
৯, হেস্টিংস পার্ক রোড, কলিকাতা-২৭ কর্তৃক প্রচারিত

১৬ বর্ষ

অমৃত

১৭ সংখ্যা

"ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 3rd September, 1976 | শুক্রবার, ১৭ ভাদ্র, ১৩৮৩

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়		
৭	ঘর	(গল্প)	শ্রীনিখিলচন্দ্র সরকার
১০	তাপ	(গল্প)	"
১৭	কাজ চাই, কাজ আছে		বার্তাবহ
১৮	কথায় কথায়		শ্রীতারাপদ রায়
১৯	প্রথম প্রবাস	(উপন্যাস)	শ্রীবুদ্ধদেব গুহ
২১	মনের অসুখ		শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
২৪	নতুন বই		
২৫	সাহিত্যের নেপথ্য		শাণ্ডিল্য চতুর্বেদী
২৭	মোহিনী আটম	(উপন্যাস)	শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি
৩১	বিজ্ঞাপন বিচিত্রা		শ্রীআনন্দ রায়
৩৪	একালের চিত্রশিল্পী : বরীন মণ্ডল		শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৩৭	একালের গান : নির্মলা ভট্টাচার্য		শ্রীসন্ধ্যা সেন

ভুলি-কলম-এর সানন্দ ঘোষণা

শরৎসাহিত্যের রচনাবলী-র পঞ্চম বা শেষ খণ্ড প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। বাঙলা অনুবাদ সাহিত্যে এই দুর্লভ সুযোগ লাভের অধিকারী আমরা হলাম। এটা একটা ইতিহাস সৃষ্টি হলো। যে চারজনের গুরুত্ব করেছিলাম তাকে সার্থক রূপ দেওয়া খুবই দুরূহ কাজ ছিল কিন্তু অনুবাদক সুবোধকুমার ঘোষের নিরলস কর্ম প্রচেষ্টায় তা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে এ জন্য তাঁকে জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন। ৩-টি নাটক, ৩টি দীর্ঘ কবিতা এবং দেড়শতাধিক সনেটের অনুবাদ তিনি বাঙালী সুধী পাঠকদের উপহার দিয়ে সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন নিঃসন্দেহে।

পৃথিবীর চারটি মহাকাব্যের অন্যতম মহাকাব্য হোমার-এর ইলিয়াড ও ওডেসী-র সম্পূর্ণাঙ্গ গদ্যানুবাদও আমরাই একখণ্ডে প্রকাশ করে বাঙলা সাহিত্যের বহুভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছি বলে আমরা গর্বিত ও আনন্দিত।

আমাদের পরবর্তী প্রচেষ্টা দান্তের রচনাসমগ্র। এতে থাকবে ডিভাইনী কমেডিয়ার তিনটি খণ্ড একত্রে।

শেক্সপীয়র রচনাবলী পাঁচ খণ্ডের গ্রাহকমূল্য পঁচিশ টাকা। হোমার সম্পূর্ণ এক খণ্ডের গ্রাহকমূল্য পনের টাকা। দান্তে রচনাসমগ্র এক খণ্ডের গ্রাহকমূল্য পনের টাকা। পাঁচ টাকা অগ্রিম লিখে গ্রাহক হোন।

অপাসাঁ রচনাবলী

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। তিন খণ্ড পাওয়া যাচ্ছে।

ভুলি-কলম : ১, কলেজ রো, কলকাতা-৯ ফোন : ৩৪-৮১১০

সারদা-রামকৃষ্ণ

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

অল ইন্ডিয়া রেডিও : বইটি পাঠক-মনে গভীর রেখাপাত করবে। যুগাবতার রামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর জীবন আলেখ্যের একখানি প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ একটি মূল্য আছে॥

ডিমাই সাইজে ৪৫২ পৃষ্ঠা, বহু চিত্রশোভিত, সুদৃশ্য বোর্ড বাঁধাই অষ্টম মুদ্রণ—১৪৲

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যার অপূর্ব জীবনকথিত

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

আনন্দবাজার পত্রিকা : বাঙালীর আজিও মরিয়া যায় নাই, বাঙালীর মেয়ে শ্রীগৌরীমা তাহার জীবন্ত উদাহরণ ইঁহারা জাতির ভাগ্যে শতাব্দীর ইতিহাসে আবির্ভূতা হন॥

ডঃ ক্রাউন সাইজে ৪০০ পৃষ্ঠা, বহু চিত্রে শোভিত, বোর্ড বাঁধাই, ষষ্ঠ মুদ্রণ—৮৲

দুর্গামা

শ্রীসারদামাতার মানসকন্যার জীবন

সন্ন্যাসিনী শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী রচিত

বেতার জগৎ : অপরূপ তাঁর জীবন লেখা, অসাধারণ তাঁর উপলব্ধি। সমস্ত মানুষের প্রতি অনন্ত ভালবাসা পরিপূর্ণ-হৃদয়া এমন মহীয়সী নারী এযুগে বিরল। 'দুর্গামা' জীবনচরিত খানি একবার অন্ততঃ পড়ে দেখা শুধুমাত্র বাঞ্ছনীয় নয় — একরকম অপরিহার্য॥

মিডিয়াম সাইজে ৪৮৮ পৃষ্ঠা, বহু চিত্রশোভিত, সুদৃশ্য বোর্ডে বাঁধাই,—১৬৲

সাধনা

দেশ : সাধনা একখানি অপূর্ব সংগ্রহ গ্রন্থ। বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের উক্তি, বাণী, শ্লোকাংশ তো এবং তিন শতাধিক। এবার সাড়ে তিন শতাধিক। মনোহর বাংলা ও হিন্দী সংগীত একাধারে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যুগ পর্যন্ত হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতি এবং ভাবধারা সুন্দর রূপে মনোহারীরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে॥

ডঃ ক্রাউন সাইজে ৩১৬ পৃষ্ঠা, আর্টিস্টিক বোর্ডে, ষষ্ঠ মুদ্রণ ৬৲

সাধু-চতুষ্টয়

স্বামিজী-সাহচর্যে মনীষী শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের মনোজ্ঞ রচনা।

তৃতীয় মুদ্রণ—৪৲

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৬

পৃথিবীর সর্বপ্রথম
ডিটারজেন্ট
কাপড় ধোয়ার বার

সুপার
৭৭৭

কমসা বাঁচান, বেশী সাদা করুন

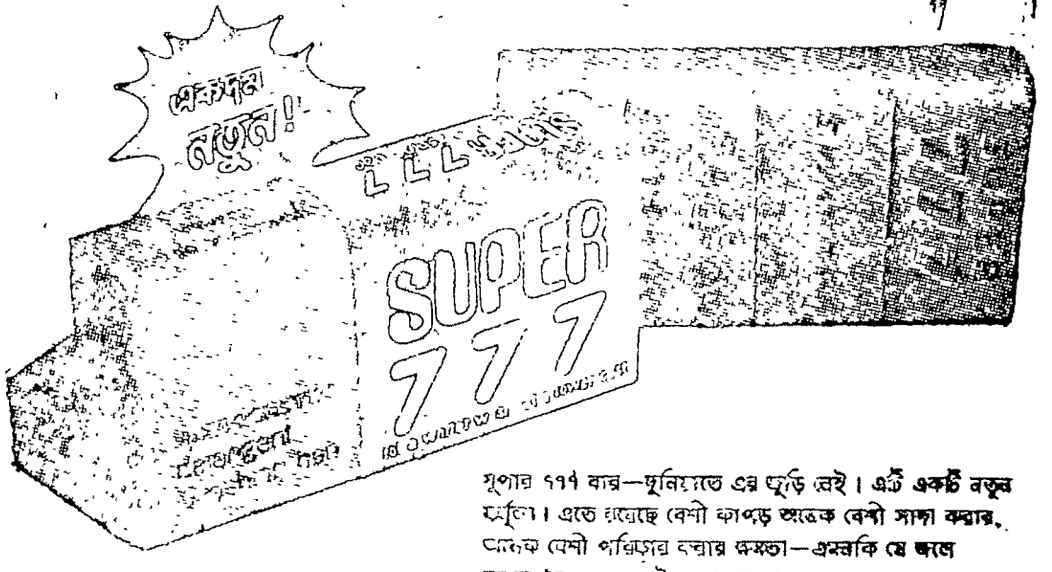

সুপার ৭৭৭ বার—দুনিয়াতে এর জুড়ি নেই। এটি একটি নতুন সৃষ্টি। এতে রয়েছে বেশী কাপড় অনেক বেশী সাদা করার, অনেক বেশী পরিষ্কার করার ক্ষমতা—এমনকি যে জলে সাধারণত একেবারেই ফেনা হয় না, সেই জলে-ও। সাধারণ বার সাবানের তুলনায় দাম-ও কম।

এখন থেকে কাপড় কাচতে কাচতে নতুন ধরণের বার—সুপার ৭৭৭ ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার বার।

shilpi AV73

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৪৩	অন্য শেষ রজনী	(উপন্যাস)	শ্রীশামল গঙ্গোপাধ্যায়
৪৫	কিছুই তো হল না	(কবিতা)	শ্রীরবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৬	অভিনয়	(গল্প)	ঃ অজিত পুততুণ্ড
৫০	পুনশ্চ		ঃ পথিক
৫১	মাঠ থেকে বলছি		ঃ অজয় বসু
৫২	খেলার জগতে মেয়ে		ঃ নয়
৫৩	মাঠের নায়ক		ঃ বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৪	খেলাধুলা		পথিক
৫৫	সিনেমাটিক টক		ঃ ভোলা মজুমদার
৫৬	কয়েকটন		নিরীক্ষক
৬০	ফুটবল সংবাদ		
৬১	লনটেনিস		লনটেনিসালোচক
৬৬	বিদেশী ডাক		ক্যাম্প

প্রচ্ছদ পরিচিতি : প্রচ্ছদের ছবিটি রোম সম্রাটদের। রোম শহরের প্রতিষ্ঠা হয় খৃষ্টজন্মের ৭৫৩ বছর আগে। এর পর রোমক সাম্রাজ্যের পতন হয় খৃষ্টজন্মের ৪৭৬ বছর পরে। প্রায় ১২শ বছরের এই সাম্রাজ্যে রোম সম্রাটের ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অপ্রতিহত বিক্রমে রাজত্ব করেন। আর সেই সময়ে রাজধানী রোম নগরীও সাজিয়ে তোলেন। তাঁরা মানুষ মত করে। এই নগরসভ্যতার কিছু ধ্বংসাবশেষ এখনো বর্তে আছে রোমে। যেমন কলোসিয়াম (এরিনার মতন), রোমান, নানা মন্দির, রাজগৃহ, সুসজ্জিত বাগান, বিদ্যালয়, বাগানবাড়ি এবং আরো অনেক কিছু। নাম তাই ভবনবাড়ির এক প্রধান আকর্ষণ।

প্রকাশিত হল পকেট বই

চম্বলের বিভীষিকা

চিরঞ্জীব সেন ৩·০০

দুর্ধর্ষ দস্যু মানসিং-এর রোমহর্ষক কাহিনী। যাঁরা লেখকের চম্বলের আতঙ্ক পড়ে মুগ্ধ হয়েছেন তাঁরা এই বইখানি পড়ে চমৎকৃত হবেন।

চম্বলের আতঙ্ক

চিরঞ্জীব সেন ৩·০০

মানসিংহের সহচর দস্যু অ্যাল সিং-এর রোমহর্ষক কাহিনী।

চাঁপাডাঙ্গার বৌ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ২·০০

চলচ্চিত্রে রূপায়িত লেখকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

এই তিনখানি বই সাধারণ পুস্তক বিক্রেতার নিকট হতে মাত্র ৬·০০ টাকায় পাইবেন। ক্যাটলগ ফ্রি।

কলেজ পাঠ্যপুস্তক

দর্শন (Philosophy)

অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত প্রণীত

ভারতীয় দর্শন—
১ম খণ্ড—৯ম সংস্করণ ১২-

ভারতীয় দর্শন—
২য় খণ্ড—৩য় সংস্করণ ৭-

ভারতীয় দর্শন—
৩য় খণ্ড (বেদ ও উপনিষদ) ৩-

পাশ্চাত্য দর্শন—১২শ সংস্করণ ১২-

নীতিবিজ্ঞান—১০ম সংস্করণ ১২-

সমাজদর্শন—৯ম সংস্করণ ১২-

মনোবিদ্যা—৮ম সংস্করণ ১২-

পাশ্চাত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—
(বেকন-হিউম) ৩য় সংস্করণ ১২-

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস—কাণ্ট ১১-

ধর্মদর্শন (Religion) ২২-

সমাজ মনোবিজ্ঞান— ১০-
(Social Psychology)

আধিবিদ্যার কয়েকটি সমস্যা—
৩য় সংস্করণ ৮-

শিক্ষা (Education)

অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও বসু প্রণীত

শিক্ষাতত্ত্ব—৩য় সংস্করণ ১২-

ভারতের শিক্ষা সমস্যা—
৩য় সংস্করণ ১৫-

শিক্ষা মনোবিজ্ঞান— (With Applications)
৬ষ্ঠ সংস্করণ ২২-

C.U. B.A. Edu. Hons. (1st) (1943)
— Prof. A. K. Vasu 6

শিক্ষক শিক্ষণ

অধ্যাপক গৌরদাস হালদার প্রণীত

শিক্ষণ প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পাঠ বিশ্লেষণ—
১৬-

শিক্ষণ প্রসঙ্গে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান ১৬-

শিক্ষণ প্রসঙ্গে ইতিহাস— ১৬-

শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষার ইতিহাস—১৬-

ভারতের শিক্ষা সমস্যা—
(প্রাচীন ও মধ্যযুগ) ৮-

অধ্যাপক সেনগুপ্ত রায় ও ঘোষ প্রণীত

শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান—
২য় সংস্করণ ১৮-

শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষাতত্ত্ব— ১৬-

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য

উচ্চ মাধ্যমিক দর্শন—
অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত

উচ্চ মাধ্যমিক মনোবিজ্ঞান—
—অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও [illegible]

উচ্চ মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা—[illegible]
প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায় ও [illegible]

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা—[illegible]
[illegible]

BP ব্যানার্জী পাবলিশার্স

সম্পাদকীয়

পরিবার পরিকল্পনার জাতীয় দায়িত্ব

পুত্রের জন্যেই ভার্যা গ্রহণ করবে, এ-অনুশাসন আজ উপহাসের বিষয়। শতপুত্রের জননী হও, এ-আশীর্বাদও এখন প্রায় অভিশাপের মতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরিবার বৃদ্ধি যে এখনও খুব পরিকল্পিতভাবে ঘটে, এমন বলা শক্ত।

গত সপ্তাহে পরিবার পরিকল্পনার বিষয়ে তিনদিন ধরে যে আলোচনা-চক্রের আয়োজন করেছিলেন অমৃতবাজার পত্রিকা ও যুগান্তর, তাতো রাষ্ট্রপতি ফকিরুদ্দিন আলি আমেদ তাঁর উদ্বোধন ভাষণে বলেছেন, আমাদের দেশে শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে অজস্র উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও জনসংখ্যার বৃদ্ধি এমনভাবে ঘটেছে যে, সেই উন্নতির অনেকটাই অর্থহীন হয়ে গেছে। তিনি এ প্রসঙ্গে আরো জানিয়েছেন, ধর্ম জন্মশাসনের পথে কোনো বাধা হতে পারে না, কোনো ধর্মেই সেরকম অনুশাসন নেই—মুসলমান ধর্মেও নেই। পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্যে পত্রিকা-যুগান্তর এই যে আলোচনা-চক্রের আয়োজন করেছেন এজন্য তিনি তাঁদের খুবই সাধুবাদ জানান।

পশ্চিমবঙ্গে পরিবার পরিকল্পনা কতো জরুরী হয়ে উঠেছে তা জানা যায় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ থেকে। তিনি জানান, স্বাধীনতার সময়ে পশ্চিমবঙ্গে লোকসংখ্যা ছিল ২ কোটি ৫০ লক্ষের মতো, এখন সে-সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৫ কোটি ৫০ লক্ষে। এবং যদি আগামী ১৫ বছর এই হারে বংশবৃদ্ধি ঘটতে থাকে, তবে লোকসংখ্যা হবে ১০ কোটি। এর এক-তৃতীয়াংশকেই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হবে অনাহারে। তিনি অবশ্য আমাদের আশ্বাস দিয়ে জানান, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই বন্ধ্যাত্বকরণ ও জন্মশাসনের কাজে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে যাবার মতো কাজ করেছেন, এবং বছরের শেষে লক্ষ্যমাত্রাকে বহুগুণেই ছাড়িয়ে যেতে পারব আমরা। তবু জনসাধারণের মধ্যে অনুকূল মনোভাবের প্রসার ঘটানোর জন্যে এ-ধরনের আলোচনা-চক্র খুবই সময়োপযোগী। মুখ্যমন্ত্রী উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান এই অনুষ্ঠানটির জন্যে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ করণ সিং, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীডায়াস, এবং জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীদেবকান্ত বরুয়াও ভাষণ দেন সম্মেলনে। তাঁরা সকলেই জনবিস্ফোরণের সমস্যাটির উপর নানাদিক থেকে আলোকপাত করেন। শ্রীবরুয়া বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর ঘোষিত ২০ দফা কর্মসূচির সঙ্গে আমরা যে ৪ দফা জুড়ে ২৪ দফা করা হয়েছে তার মধ্যে পরিবার পরিকল্পনাকে ধরা হয়েছে একটি প্রধান লক্ষ্যবস্তু হিসাবে। জাতীয় কংগ্রেস এই কর্মসূচিকে জাতীয় কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করেছে। এবং জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রচার চালিয়ে কংগ্রেসকর্মীরা আমাদের দেশের সমস্ত মানুষকে সচেতন করে তুলবেন এই দায়িত্বে। তিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে আস্থা প্রকাশ করে বলেছেন, আমাদের দেশের জনসাধারণকে যদি ভালো করে বুঝিয়ে বলা যায় যে পরিবার পরিকল্পনা কেন এত জরুরী, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁরা আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করবেন।

ডঃ করণ সিং এ-বিশ্বাসও প্রকাশ করেছেন যে, ভারত এ-ব্যাপারে সাফল্য লাভ করলে কেবল ভারতেরই জাতীয় জীবনে শান্তি ও কুশলোন্নতি সুনিশ্চিত হবে না, এই সাফল্য গোটা পৃথিবীর সমস্ত উন্নয়নশীল জাতির সামনেই নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেবে।

বাস্তবিক অমৃতবাজার পত্রিকা ও যুগান্তর এই আলোচনা-চক্রের আয়োজন করে এমন একটি জাতীয় দায়িত্ব পালন করেছেন, এই মুহূর্তে দেশের পক্ষে যা অত্যন্তই গুরুত্বপূর্ণ।

পত্রিকার ১০৮ বছরের গৌরবময় ইতিহাসে এ-অনুষ্ঠানের সাফল্য এক নতুন সংযোজন। বলা বাহুল্য সারা দেশে এ-ধরনের ব্যাপক আলোচনা-চক্রও আয়োজিত হল এই প্রথম।

একই লেখক

দুই গল্প : দুই সময়

ঘর

নিখিলচন্দ্র সরকার

আবীর দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তিনটে সিগারেট শেষ করল। তবু তুলির কোন পাত্তা নেই। মুখটা তেতো তেতো লাগছে। খিদেও পেয়েছে। ভেবেছিল তুলি এলে ওকে নিয়েই একসঙ্গে কিছু খেয়েটেয়ে নেবে। তা আর হলো না। থেকে থেকে পেট গুলোচ্ছে। অস্বস্তি হচ্ছিল। তাও শরীরটা আজ তেমন জুত লাগছে না। বেমন ম্যাজম্যাজ করছে। কপালের শিরা দুটো লাফাচ্ছে। মাথাটা ভার হয়ে আছে। চোখ জ্বালা জ্বালা করছে। এভাবে একা একা কতক্ষণ আর সে দাঁড়িয়ে থাকবে। আবার যাই যাই করে যেতেও পারছে না। যদি চলে আসে এর মধ্যে। খানিকক্ষণ পায়চারি করল। মনে মনে সে একটু অধৈর্য হয়ে উঠেছে। কি ব্যাপার এরকম তো কখনো হয় না। ঘরে ফিরে গিয়েও তার দুশ্চিন্তা কমবে না। উদ্বেগ আরো বাড়বে। আরো কিছুক্ষণ সে অপেক্ষা করল। ট্রামে-বাসে লোকজনের ওঠানামা লক্ষ্য করল। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। হঠাৎ যেন দৃষ্টিটা সামান্য চঞ্চল হলো। দূরে একজনকে ঠিক তুলির মতন দেখাচ্ছিল। উল্লসিত হলো আবীর। এদিকেই আসছিল ও। আবীরও কয়েক পা এগিয়ে গেছে। খানিকটা গিয়েই ভুল ভাঙল। আবার আগের জায়গায় ফিরে এলো সে। না, আজো বোধহয় আর এলো না ও। এই ট্রাম গুমটিটাই ওদের মিলন কুঞ্জ। কুঞ্জ শব্দটা মনে আসায় নিজের মনেই হাসল আবীর। সব সময়ই এখানে পাঁচ মিশেলি একটা বুদবুদের মতন ফুটছে। এতে কারো কোন অসুবিধে নেই।

এই কোলাহল মত্ততা শুনতে শুনতে আবীর চার নম্বর সিগারেটটাও ধরিয়ে নিল। মনে মনে সে ঠিকই করে নিল, এই শেষ সিগারেট। এই সময়টুকুই এখানে সে অপেক্ষা করবে। এর মধ্যে না এলে আজ আর ও আসবে না। আবীরকে একটু বিমর্ষ দেখায়। নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে ওর। শরীর-টরীর খারাপ হয়নি তো! সেদিন যা জলে ভিজেছে। কিছু আশ্চর্য নয়। ঘন ঘন হাঁচি দিচ্ছিল। নাক টানছিল। মাথাটাও টিপ টিপ করছিল নাকি! শাড়ির আঁচলে নাক ঘষছিল বারবার। আবীর ওর মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল, 'মাথাটা ভাল করে মুছে নিয়েছ তো?'

তুলিও তাকিয়েছে ওর চোখে চোখে। মুখে হাসি। কি একটা বলতে গিয়ে আবার হেঁচে ফেলেছে নাকের ভেতরে তখনো ওর সুড়সুড়ি। নাক টেনে টেনে বলল, 'এই আমার বোধহয় জ্বরটর চলে আসবে। দেখ তো একবার।' ও নিজেই আবীরের একটা হাত এনে নিয়ে ওর কপালে বুকে ঠেকাল।

আবীর কিরকম এক সঙ্কোচ বোধ করল। লোকগুলো হাঁ করে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। তুলির যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে। চারপাশটা ও-ও একপলক দেখে নিল। পরে কি ভেবে খিল খিল করে হেসে উঠল। চোখ টান টান করে বলল, 'হয়েছে আর ঢং দেখাতে হবে না। অত লজ্জার কিছু নেই এখানে।'

আবীরও হেসে ফেলেছে। হাসতে হাসতে বলেছে, 'তুমি বরং গরম এক কাপ চা খেয়ে নাও।'

'সেই ভাল চল।'

ওরা একটা চায়ের দোকানে এসে বসেছিল। দুটো মরিচ টোস্ট আর দু কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে আবীর হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। বাইরে তখনো ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। বলল, 'একটু আসছি।'

তুলি ওর হাতটা টেনে ধরেছে। একটু অবাক হওয়ার গলায় বলল, 'আবার কোথায় যাচ্ছ?'

'তোমার জন্যে কটা ট্যাবলেট কিনে নিয়ে আসি।

তুলি চোখ পাকিয়ে হাসল। হেসে হেসে বলল, 'বসো। তোমাকে আর ট্যাবলেট আনতে যেতে হবে না।' ওকে জোর করে বসিয়ে দিল আবার।

আবীর ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে কেমন যেন সামান্য শঙ্কিত হলো। একটু আবেগের গলায় বলল, 'তোমার তো দেখছি চোখ ছলছল করছে। জ্বরটা আসবে মনে হচ্ছে!'

'আসুক গে।' তুলি অন্যদিকে তাকাল। একটু নিস্পৃহ। ভেতরে ভেতরে ও যেন তখন অন্য কিছু ভাবছিল। মুখের ওপর তার আবছা আভাস। ওর চোখের কোনে

কিসের যেন এক ক্লান্তি। হয়তো ভাল ঘুমটুম হয় না। চোখে-মুখে একধরনের রুক্ষতা।

পলকে আবীর যেন ওর মনের লেখা-গুলো দেখে নিল। কি ভেবে হালকা গলায় হাসল। বলল, এলে টেরটা পাবে।

তুলি অল্পক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওর মুখের দিকে। এতে আর কি টের পাবে সে আসল অস্বস্তি তো অন্য জায়গায়। এখনো কোন সুরাহা হলো না। দেখতে দেখতে তো কতগুলো মাস কেটে গেল। এভাবে আরো কতদিন কাটবে কে জানে। তার আর ভাল লাগে না। এর চেয়ে অসুখে টসুখে হয়ে মরে পড়ে থাকলেও যেন ভাল। তখন ঠেলাটা বুঝবে। কি ভেবে একসময় ও হেসে ফেলল। মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁঝিয়ে বলল, বেস মজা হবে তাহলে!

তোমার তো মজা। আর আমি যে এদিকে চিন্তায় ছটফট করব! আবীর সিগারেট ধরায়। ধোঁয়া ছাড়ে। মুখ টিপে টিপে হাসে।

আহা চিন্তা যে কত আমার সব জানা আছে! তুলি মুখের এক অদ্ভুত ভঙ্গি করল। ছেলেমানুষী গলায় হাসল। আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে নিল একবার।

আবীর বড় বড় চোখে তাকাল ওর দিকে বলল, কি বলছো তুমি!

আমি ঠিকই বলছি মশায়। তুলির চোখে দুষ্টুমি।

ডাহা মিছে কথা তোমার ভাল-মানুষের ছাব এখন আমার ওপর! ওর গলায় কৌতুক।

সে তো মশায় জাগজ্যান্ত কলঙ্ক! তুলি আড়চোখে ওকে আবার দেখে নিল। পরে কি ভেবে নিজের মনেই হেসে উঠল।

আবীর মুহূর্তের জন্য যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। পরক্ষণেই সামলে নিল। হেসে বলল, ওটাই তো আসল। আমাদের একমাত্র মানপত্র।

তুলি চোখ পিট-পিট করে তাকাল। একটু ঠাট্টার গলায় বলল, মানপত্র যে এদিকে পোকায় কাটছে সে খেয়াল আছে মশায়!

আছে আছে।

ছাই আছে। তুলি মুখ ভেংচাল। বুড়ো আঙুল দেখাল। ওর ঠোঁটের নিচে চাপা হাসি।

টেবিলে টোস্ট আর চা দিয়ে গেল। খেতে খেতে বলল, ইয়ার্কি নয় যাওয়ার সময় ওষুধ নিয়ে যেও। আজকাল খুব ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে।

আমার যা খুসি। তোমার তাতে কি। ওর গলায় অভিমান ফুটে ওঠে।

এটা একটা মোক্ষম কথা বলেছ। আবীর হেসে ফেলল।

তুলি চোখ টান টান করে তাকাল, বলার না তো কি! তোমাকে কতদিন বলেছি। এবার একটা ব্যবস্থা কর। ওখানে এভাবে আমার আর থাকতে ভাল লাগছে না।

তুমি কি ভাবছ আমি কোন চেষ্টা করছি না?

কে জানে কি করছ। মোট কথা আমি আর ওখানে থাকতে পারছি না।

তুমি রাগ করছ তুলি।

তুলি ওর মুখের দিকে খানিকক্ষণ অনিমেষে চেয়ে থাকল। ওর চোখ দুটো যেন বিষণ্ণতায় ভিজে গেছে। কেমন দুঃখী দুঃখী দেখাচ্ছিল ওকে। চায়ে চুমুক দিয়ে আস্তে আস্তে বলেছিল, আমার অবস্থাটা তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না। তুমিই বল তো এভাবে এই লুকোচুরির কোন মানে হয়। একটা শাখা পরতে পারি না সিঁদুর পরতে পারি না। আমার খুব খারাপ লাগে। দেখে কে বলবে যে আমার বিয়ে হয়েছে।

ধর নাও এ আমাদের অজ্ঞাতবাসের দিন। আবীরের ঠোঁটের ওপর পাতলা একটু হাসি।

তুলি অন্যদিকে তাকাল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুধোলো আর কতদিন আমাদের এই অজ্ঞাতবাস চলবে?

আর বেশীদিন নয়। সময় হয়ে এলো।

ইয়ার্কি এখন আমার ভাল লাগে না। দাদারা এখনো কিছু জানে না। শুধু মাকে বলেছি। এজন্যে মার মনেও কোন সুখ নেই। আজকাল আমার ওপর ভীষণ রাগ রাগ করে। দাদারাও আমার এই ঘোরা-ঘুরিটা পছন্দ করছে না। এই নিয়ে বাড়িতে রোজ রোজ অশান্তি।

আর কটা দিন সবুর কর।

এই করতে করতে তো প্রায় বছর ঘুরে এলো। তুলি যেন সামান্য অসহিষ্ণু।

আবীরও সামান্য গম্ভীর। একটু চুপ করে থেকে সিগারেটটা টানতে টানতে বলল, তোমাকে ওখানে ফেলে রাখতে আমারই কি ভাল লাগে! নিজের বউয়ের সঙ্গে এভাবে বাইরে বাইরে থাকতে কে আর চায় বল!

ওসব আর শুনতে চাই না, কবে নিয়ে আসছ বল। তুলি ওর মুখের দিকে অপলক চেয়ে থাকে।

আবীরও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এতে তারও মনে কোন সুখ নেই। সেও এক অস্বস্তির মধ্যে আছে। এর কোন ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত তারও তো দুশ্চিন্তা শেষ হওয়ার নয়। তুলিও অধৈর্য হয়ে পড়েছে। ঠিকই তো আর কতদিন ধৈর্য ধরবে। ওর কোন দোষ নেই। আবীরও তা বোঝে। সে নিজেই তো অস্থির হয়ে পড়েছে। টাকা বিয়ে করে এই দিন যাপনের কোন মানে হয়! মাঝে মাঝে তারও শরীরে যেন আগুন ধরে যায়। ফলশয় ছটফট করে। একটা ঘরের জন্যে দেও পাগলা ঘুরে গেছে। সেও আপ্রাণ চেষ্টা করছে। না পেলে কি করবে! চিন্তাটা তো তারই বেশী। অথচ তুলি তাকে অন্যরকম ভাবছে। ওর এই ধারণাটা ভুল ভুল। আদৌ সে নিস্পৃহ বা নির্বিকার নয়। তুলিকে তো সে সবই বলেছে। তবু ওর প্রতি এরকম অভিযোগ কেন? কোন মানে হয় না এর। মনে মনে সে একটু আহত হলো। এখনো ওদের বিষয়টা প্রচারিত হয়নি। রেজিস্ট্রি ম্যারেজ। আভাসে ইঙ্গিতে সে বাড়িতে একটু বলেছে। তাতেই সব চটেমটে একাকার। আবীরও মনে মনে শক্ত হয়েছে। এমনিতেও তুলিকে নিয়ে ওদের এই বাসায় থাকা যাবে না। থাকবে কোথায়? ঘরই তো নেই। ওদের সাকুল্যে দুটো মাত্র ঘর। লোক সাত-আটজন। ওরা তিন ভাই, এক বোন। মা বাবা। বড়দা বিয়ে করেছে। বউদি একটি বাচ্চা। ওরা একটা ঘর নিয়ে আছে। বাকিরা অন্য ঘর ঠাসাঠাসি করে শোয়। বারান্দায় অনেকগুলো বিছানা পড়ে। ভাইদের মধ্যে আবীর ছোট। ওর ওপরের দাদা এখনো বিয়ে করেনি। বোনেরও বিয়ে হয়নি। এই যেখানে অবস্থা সেখানে তুলিকে তার শ্বশুরবাড়ি কি করে? ওকে আলাদা ফ্ল্যাট নিতে হয়। সেরকমই একটা খোঁজ করছে আবীর। অনেকগুলো বাসাই সে দেখেছে। একটাও তার পছন্দ হয়নি। বেশী তো চায় না। একটা ঘর হলেই তার চলে যায়। দুজন মাত্র তো মানুষ। তাও পাওয়ার উপায় নেই। ভীষণ ভাড়া চায়। তার মধ্যে ও তুলনা চাই। তার সার্কিটটা তো তার তাহা মারি কিছু নয়। সামান্য এল-ডি ক্লার্ক। কত লোককে যে সে একটা ঘরের কথা বলেছে। কেউই কানাই দেয় না। তার সমস্যাটা বুঝে এই চায় না কেউ। লোকগুলো নির্মম দিচ্ছিল। মাঝে মাঝে রাগে সে ফেটে পড়ে। ওর রাগকে লোকে ঠাট্টা তামাশা করে। লোকে হাসে। উপহাস করে। এরকম একটা উপযুক্ত যুবতী বউকে নিয়ে সে রাত কাটাতে পারে না! তার কষ্ট কি কিছু কম! আবীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওর বউকে একদৃষ্টে দেখল কিছুক্ষণ। তার বউয়ের মুখখানা বড় মিষ্টি শরীরের গড়নটা বড় ভাল। গালের ওপর ছোট ছোট কটা ফুসকুড়ি। ওর একটা হাত সে তুলে নিল নিজের হাতে। সামান্য চাপ দিয়ে বলল, শীগগিরই একটা ব্যবস্থা হবে।

তুলিও ওর চোখের দিকে চেয়ে কি একটা অর্থ যেন বুঝবার চেষ্টা করে। চোখে নয় এক হাসি ফুটিয়ে সকৌতুকে বলল, ঠিক বলছ তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই বলছি। তুমি কি ভাবছ এতে আমার কোন ইন্টারেস্ট নেই। বিয়ে করেছি কি তোমাকে ওখানে ফেলে রাখার জন্য?

মনে থাকে যেন। তুলি পরমুহূর্তেই আবার খিল খিল করে হেসে উঠল। হঠাৎ যেন কি একটা কথা ওর মনে পড়ে গেল। ওরও চোখে তখন ধীরে ধীরে যেন কিসের এক নেশা জমছে। ওর শরীর থেকে একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। গন্ধটা আবীরের চেনা। ও কেমন অন্যমনস্ক একটু।

তুলির চোখে দুষ্টুমি। চা খেতে খেতে ওকে দেখছিল আর মুখ টিপে টিপে হাসছিল। হাসিটা যেন একটু অন্যরকম।

কি ভেবে ওর গায়ে একটা চিমটি কাটল তুলি, 'এই, কি ভাবছ গো অমন করে?'

আবীরের চোখেও তখন নেশা। গোল গোল চোখ করে চেয়ে থাকল একটু সময়। বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। শেষে আশাভঙ্গের গলায় বলল, 'বলে আর লাভ কি!'

তুলি ওর ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছে। তবু না বোঝার ভান করল। ঠোঁটটা কামড়ে ধরেছে ও। চোখমুখের চপলতা যেন আরো বেড়েছে। একদৃষ্টে ও চেয়ে আছে। পরে মাথা নাড়িয়ে অস্ফুটে বলল, 'ওসব কথা এখন ভুলে যাও গো মশায়।' বলেই মুখের ওপর একটা হাত রেখে শরীরটা দুলিয়ে দুলিয়ে হেসে উঠল জোরে জোরে। চাপে চুমকি দিয়ে বলল, 'এই, এর মধ্যে না একটা বেশ মজার ঘটনা ঘটে গেছে!'

আবীর সপ্রশ্ন চোখে চেয়ে থাকল।

তুলি হাসি হাসি সপ্রতিভ ভঙ্গিতে বলল, 'কদিন আগে, স্বপ্নে তোমার সঙ্গে খুব ঝগড়া করছিলাম। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে মার পাশে শুয়ে আছি। মা আমাকে ঠেলে তুলে দিল। ছি ছি, মা কি ভাবল বল! সারারাত তো আর ঘুম আসে না! বাইরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি। কী ছটফট করে যে রাতটা কাটল!' কথা শেষ করে ও আনত ভঙ্গিতে বসে থাকল কিছুক্ষণ। আঁচল দিয়ে বাববার আঙুলটা জড়াচ্ছিল। গলার স্বরে যেন সামান্য আবেশ। চোখ দুটো ব্রীড়ায় নম্র।

আবীর হাসল। ওরও হাসিটা অর্থপূর্ণ। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'এরকম রাত আমাকেও অনেক কাটাতে হয়।'

'এ এক জ্বালা, তাই না?' তুলি হাসি হাসি চোখে তাকাল।

'জ্বালা মানে, ভীষণ জ্বালা।' আবীর ওর নাকটা টেনে দিল।

চা আর টোস্ট খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল ওদের। বাইরে তখনো বৃষ্টি। এ বৃষ্টি আর থামবে না। আকাশ তখনো মেঘে ভরে আছে। তুলি এবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল। একটু উদ্বেগের গলায় বলল 'এই, উঠে পড়। ভীষণ দেরি হয়ে যাবে ফিরতে ফিরতে।'

ওরা বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল। রাত হয়ে যাচ্ছে। আর দেরি করা যায় না। ওকে আবার অনেকটা পথ যেতে হবে। সেই এয়ারপোর্টের কাছে। আবীর বলেছিল, 'আমি কি এগিয়ে দেব তোমাকে?'

তুলি বলেছে, 'থাক, তোমাকেও তো আবার ফিরতে হবে।'

'তাহলে আর দেখা কবে না।' আবীর ওকে বাসে তুলে দিয়েছিল। যাওয়ার আগে কয়েকটা ওষুধও কিনে দিয়েছিল ওকে।

'বাড়ির সামনে আবার এই হাঁটুজল। রাস্তায়ও আলো নেই। লোকজনও থাকে না।' তুলি ওর দিকে চেয়ে থাকে। হাত নাড়ে। ওর মুখখানা যেন দেখতে দেখতে মলিন হয়ে যায়।

আবীরও গভীর এক কষ্ট বুকে নিয়ে ঘরে ফিরে আসে।

আবীরের চোখে যেন ঘোর নামে। ভাবতে ভাবতে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। চার নম্বর সিগারেটটাও প্রায় শেষ হয়ে এলো। এতক্ষণ তার খেয়ালই ছিল না। হঠাৎ আঙুলের কাছে তাপ লাগল। খেয়াল হতে কয়েকবার ঘন ঘন টানল সিগারেটের টুকরোটা। এখনো খানিকটা বাকি আছে। মুখের ওপর দুশ্চিন্তার ছায়া পড়েছে। ভেতরে ভেতরে সে এক ধ্বননের অস্থিরতা বোধ করছিল। নিশ্চয়ই ওর শরীর খারাপ হয়েছে। পর পর দুদিন এলো না! গতকাল সে মেট্রোতে দুটো টিকিট কিনে রেখেছিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিল। শেষ পর্যন্ত টিকিট বিক্রী করে দিয়েছে। মনটা খারাপ হয়ে যায় আবীরের। ওকে যে দেখে আসবে, তারও উপায় নেই। অনেকদিনই একটু বেশী রাত হয়ে গেলে সে ওকে এগিয়ে দিয়ে এসেছে। কখনো বাড়ি যায় নি। এক সময় তুলিরা ওদের পাড়াতেই ছিল। ওখানেই ওর সঙ্গে তার আলাপ, ঘনিষ্ঠতা। তারপর থেকেই লুকিয়ে লুকিয়ে সিনেমা দেখা, রেস্টুরেন্টে খাওয়া, ভিকটোরিয়া, ময়দান, আউটরাম ঘাট, ইডেন, দক্ষিণেশ্বরে ঘোরাঘুরি। এ যেন তখন এক নেশার মত ছিল। বিয়ের পর উটকো ঘোরাঘুরিটা একটু কমেছে। ওরাও একদিন এ পাড়া ছেড়ে চলে গেল। দমদম এয়ারপোর্টের কাছাকাছি দুখানা টিনের ঘর ভাড়া নিয়েছে। হঠাৎ অবস্থাটা ওদের খারাপ হয়ে যায়। তুলির বড় এক দাদা ভাল চাকরি করত। একটা অ্যাকসিডেন্টে ওর দাদা মারা যায়। সংসার প্রায় অচল হওয়ার দশা। তুলির ওপর আরো দুই দাদা আছে। ওদের দুজনের আয় খুবই সামান্য। তুলি ওদের সংসারের সব কথাই ওকে বলেছে। মাঝে মাঝে ওর শাড়ি ব্লাউজ আবীরকেই কিনে দিতে হয়। মাসে মাসে হাত খরচের টাকাও দেয়। ও চলেই যাচ্ছিল। আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। এমন সময় পেছন দিক থেকে কে যেন তার একটা হাত চেপে ধরল, 'এই, চলে যাচ্ছ যে বড়!' মুখে ফুরফুরে হাসি। চোখ টান টান।

আবীর যেন আশ্বস্ত হলো। তবু কৃত্রিম রাগের গলায় বলল, 'যাব না তো কি করব!'

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিওলজীর অধ্যাপিকা ও অপারেশন্যাল হাইজিনের ডিরেক্টর কর্তৃক ভূমিকা সম্বলিত ও উচ্চপ্রশংসিত

অপরাধবিজ্ঞানী ডঃ **পঞ্চানন ঘোষালের**

অপরাধতত্ত্ব (প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হ'ল)

দাম : ২৫-০০

শংকর-এর

এপার বাংলা ওপার বাংলা **মানচিত্র**

৩৫শ মুদ্রণ ১৫-০০ রজত জয়ন্তী সংস্করণ নিঃশেষিত প্রায় ১০-০০

এক যে ছিল **সার্থক জনম** **চৌরঙ্গী**

৬ষ্ঠ মুদ্রণ, চলচ্চিত্রায়িত হচ্ছে ৮-০০ ৩য় মুদ্রণ ৬-০০ রজত জয়ন্তী সং ২৫-০০

যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ

রজত জয়ন্তী সংস্করণ ৮-৫০

বিনয় ঘোষের

কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত

দাম : ৪৫-০০। যেসব গ্রাহক নিজ নিজ কপি এখনও সংগ্রহ করেননি, তাঁরা অবিলম্বে সংগ্রহ করুন।

নিমাই ভট্টাচার্যের

উইংকমাণ্ডার

৪র্থ মুদ্রণ ৮-০০

বিমল মিত্রের

এর নাম সংসার

৬ষ্ঠ মুদ্রণ ১০-০০

বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট্ লিমিটেড। ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা-৯

'আমি যে আজ শেষ পর্যন্ত আসতে পারব, ভাবি নি।'

'না এলেই পারতে!' আবীর ম্লান একটু হেসে ওর মুখের দিকে তাকাল। গলার সুরটা সামান্য উদাস শোনালো। বুকের মধ্যে তারও এক অভিমান নড়েচড়ে উঠল।

'তোমাকে দুদিন দেখতে না পেয়ে ভীষণ খারাপ লেগেছে আমার।' মুখ টিপে টিপে হাসছিল তুলি।

'তাই নাকি?' আবীরের চোখমুখ দীপ্ত হয়ে ওঠে। হা হা করে হাসে।

'হ্যাঁ গো মশায়, একটুও বাড়িয়ে বলছি না।'

বুঝলাম, আসলে কি হয়েছে বল তো?' ওর গলা সহজ, আবেগে ভরাট।

'আমাকে দেখে কি তুমি কিছুই বুঝতে পারছ না?' ওর চোখ টলটল করে।

'মুখটা একটু শুকনো দেখাচ্ছে।' আবীর হেসে ফেলল এবার। চোখে চোখে চেয়ে শুধলো, 'জ্বর হয়েছিল?'

'হুঁ, জ্বর মানে, দুম জ্বর, একশ তিনের কাছাকাছি। তার ওপর গা হাত পায়ের কামড়ানো।'

'কি বলেছিলাম তাহলে?'

'তোমার কথাই ঠিক হলো গো জ্যোতিষঠাকুর!' কথা বলতে গিয়ে যেন ওর দম ফুরিয়ে যায়। এরই মধ্যে ও বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে। চোখমুখই তার প্রমাণ। একটু চুপ করে থেকে ফের বলল, 'এখনো শরীর খুব দুর্বল।'

'তাহলে আর আজ এলে কেন?' আবীরের গলায় উৎকণ্ঠা।

তুলি ঘাড়টা সামান্য বেঁকিয়ে ওকে একবার দেখল। হাসল একটু। বলল, 'না এলে আর উপায় ছিল, এতেই তো বাবুর যা গোঁসা।'

আবে না এমনিই খ্যাপাচ্ছিলাম তোমাকে। ওর মুখের দিকে চেয়ে আবীর যেন সামান্য মমতা বোধ করে। এই ঝড়-জলের দিনে এতদূর থেকে আসা কি সোজা কথা! তাছাড়া রাস্তায় কত রকমের অসুবিধে! সে তো আর অবুঝ নয়। একটু চুপ করে থেকে হাসি হাসি মুখে শুধোয়, জল ভাংগতে হলো তো?

তা আর হবে না বাড়ির সামনে এখনো এই জল।

কাজটা ঠিক করনি।

তুলি একটু গম্ভীর হলো। কি যেন ভাবল সামানক্ষণ। একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্লান্ত গলায় বলল, তোমার সংগে দরকারও ছিল খুব।

আবীর ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

হ্যাঁ গো ভীষণ দরকার। তুলি হেসে ফেলে।

চল আগে কোথাও বসে নিই।

আজ আর বেশী হাঁটাহাঁটি করতে পারব না।

ওরা সামান্য পথ হেঁটে রাস্তা পার হলো। পরিচিত দোকানের দোতলায় একটা কোণা বেছে নিয়ে ওরা বসল। খাবারের অর্ডার দিল আবীর। সিগারেট ধরাল আবার। ধোঁয়া ছেড়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে শুধলো এবার বল, কি এমন দরকার।

তুলি চুপ করে থাকল। তাকাল চোখে চোখে। ওর মুখটা এখন মলিন দেখাচ্ছে। মুখের ওপর গভীর কোন চিন্তার ছাপ। আস্তে আস্তে ম্লান গলায় ওই শুধলো তোমার পঙ্কু দালালের খবর কি?

ওদের কথা আর বলো না।

কি আশ্চর্য বল, আজো একটা ঘর খুঁজে দিতে পারল না! ওকে যেন কেমন বিমর্ষ দেখায়।

ওরা কি আমার কাছ থেকে কম টাকা খেয়েছে! পয়লা নম্বরের শয়তান ওরা। দুদিক থেকেই পয়সা খাওয়ার ধান্দা। ওরাই বাড়ির ভাড়া আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। কয়েকটা ঘর দেখিয়েছে। ওসব ঘরে গরুও থাকে না। আর যা ভাড়া চায় শুনলে মাথায় রক্ত উঠে যায়। আবীর রাগে ফেটে পড়ে। ঘন ঘন সিগারেটে টান দেয়। ধোঁয়া ছাড়ে।

আগের গল্প ॥ রচনা ১৯৬৩ খৃঃ

তাপ

বৈশাখের গোড়াতেই খরাটা পড়েছে। খরা তো নয়, যেন কাঞ্চির মতন কতগুলো লিকলিকে সাপ হিসহিস শব্দ তুলে চারদিকে ক্রমাগত ছুটোছুটি করছে। ওদের উষ্ণ নিশ্বাসে এরই মধ্যে বুঝি জ্বলে-পুড়ে যাবে। জীবন সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে লম্বা করে একটা নিশ্বাস ফেলে। এই সাতসকালেই দিনের যা তেজ! কেমন এক ক্লান্ত ঢিলেঢালা দৃষ্টিতে এবার সে সমানের দিকে তাকাল।

সুরেন হাতির দোকানের সামনে দুটো কুকুরছানা ঝিম মেরে শুয়ে আছে। বোদটা আবার ওদের গায়ে এসে পড়েছে এই মাত্র। গনগনে রোদ্দুর সইতে না পেরে ওরা ক্রমশ সরে সরে শীতল ছায়া বেছে নিচ্ছিল। সেদিকে চেয়ে জীবন ম্লানভাবে সামান্য হাসল। হাত পাঁচেক দূরে বোদটা তখন ওদেরও চেয়ে চেয়ে দেখছে। অতি সন্তর্পণে গুটিগুটি এগিয়ে আসছিল। আর একটুর মধ্যেই ধরে ফেলবে বুঝি।

ওরা কজন তেঁতুল গাছটার তলায় ছড়িয়ে ছড়িয়ে বসেছিল। তখনও ওদের মধ্যে কেউ কেউ মুড়ি খাচ্ছে। গল্প করছে। এই কিছুক্ষণ আগে জীবন মুড়ি খাওয়া শেষ করেছে। এখন আরাম করে একটা বিড়ি টানছিল। এখনও ঠান্ডা ঠান্ডা একটা নরম ভাব আছে এখানে। অথচ সামনের চিক চিক করা রোদের দিকে তাকালে, এখনই যেন অস্বস্তি বোধ করে জীবন। কেবলই তেষ্টা পায় এ-দিনে।

জীবন আবার চোখ তুলল। সুরেন হাতির দোকানের বাঁ দিকেই কিছুটা জায়গা, একটু জংগলের মতন। কটা বাবলা গাছ সেখানে। বাঁশবরণ পাতা দিয়ে জায়গাটা ঘের দেওয়া। পাতাগুলোর গায়ে ধুলো কাদার দাগ। তাই কেমন মলিন দেখাচ্ছে। একটা না দুটো মান্দার গাছও আছে। কিছু আশশেওড়া। আর তার সংগে কটা বুনো লতার ছোট মতন ঝোপ। এই জংগলের পাশেই আরো কটা দোকান। তবে অধিকাংশই চা-এর। এখান থেকে চা-এর গ্লাসে চামচ নাড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল জীবন। এই সকালেই যে এভাবে দিনের সমস্ত উদ্যম ঝিমিয়ে পড়বে, তা ভাবতে পারে নি সে। লোকগুলো তাড়াতাড়ি করে নৌকোয় গিয়ে উঠছে। এখানে বসে বসেই জীবন সব লক্ষ্য করছিল।

বাতাসটা পড়ে গেছে। তাই গরমের মাত্রাটা ক্রমশই বাড়ছে। থেকে থেকে বেশ বিছুটা বাধধান তিরতির করে কিছু পাতা কাঁপছিল শুধু। এখান থেকে জীবন এখন দেখতে পাচ্ছে, কটা শালিক উড়তে উড়তে এসে এই মাত্তর বাবলার ডালে পা রাখল। শব্দ করল। খুটে খুটে কি যেন খেল। পরস্পর পরস্পরকে আদর করল। তারপর লাফাতে লাফাতে ওরা এখন, ওই জংগলের আড়ালে চলে গেছে।

এখান থেকে অনেকক্ষণ ধরে সে অস্প অস্প করে গাছ-গাছালির একটা গন্ধ পাচ্ছিল। ঘ্রাণটা যেন এখানে সর্বত্র ছড়ানো। জীবন জোরে জোরে কয়েকবার গন্ধটা নাকে টানল। এখন তা শুকিয়ে ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসছে।

বটা কাক অনেকক্ষণ ধরে মাথার ওপর ডালে বসে ডাকছে। জীবন ছোট মতন একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিল। কাক কটা চিৎকার করে এখন আরও একটু দূরে গিয়ে বসল।

জীবন দৃষ্টিটাকে এবার নদীর দিকে প্রসারিত করে ওদের নৌকোটাও দেখল।

তুলির মুখটা আরো যেন ফ্যাকাসে হয়ে যায়। এভাবে আর কতদিন ও কাটাবে।

আবীর তখনো ক্ষুব্ধ। একটু রোষের গলায় বলল, সবার সব কিছু হয় আর আমার বউকে নিয়ে থাকার মতন একটা বাসা হয় না।

লোকটা টেবিলে খাবার জলের গ্লাস রেখে গেল।

গ্লাসের খানিকটা জল শেষে তুলি তাকাল। ও যেন আরো মুষড়ে পড়েছে। মুখের ওপর বিষণ্ণ ছায়াটা আরো গাঢ় হয়েছে। ভাঙা ভাঙা অনুচ্চ গলায় বলল, এদিকে দাদাদের সঙ্গে আমার ভীষণ চটামটি হয়ে গেছে।

কেন?

ওরা আমাকে বেরোতে দেয় না। রোজ রোজ কোথায় যাই কি করি ফিরতে এত রাত হয় কেন ইত্যাদি নানারকম কৈফিয়ৎ।

তাই নাকি?

হ্যাঁ—আমার আর ওখানে একদম থাকতে ইচ্ছে করে না।

অল্পক্ষণ চুপ করে থাকল আবীর। গম্ভীর গলায় বলল এবার কিছু বলবে বলে দিও তুমি তোমার বরের কাছে যাও এবং যাবে।

আমি তো বলতেই চাই। তুমি মুখ নিচু করে থাকো।

আবীর হেসে ফেলল, হ্যাঁ হ্যাঁ ভাল করে কথাটা ওদের বলে দিও।

কি ব্যাপার এত সাহস যে, তুলি যেন উৎসাহিত হয়।

আমি ঠিক করে ফেলেছি।

এই কি ঠিক করেছ বল না লক্ষ্মীটি বল। তুলি শোনার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বুকের ভেতরটা ওর ছলাৎ করে ওঠে। এরকম একটা খবরের জন্যেই তো ও এতদিন ধরে অপেক্ষা করে আছে।

বলব। একটু চুপ করে থাকল আবীর। কি ভাবতে ভাবতে বলল, আমার চেয়ে ফুটপাথের লোকগুলোও অনেক সুখী। ওরাও বউকে নিয়ে থাকে।

তুলির মুখের ওপর থেকে এতক্ষণে বেজার ঘোলা ভাবটা কেটে যায়। ওকে প্রসন্ন দেখায়।

একটু পরে চা এলো। চায়ে চুমুক দিয়ে আবীর ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। শুধালো বাইরে যেতে তোমার কোন আপত্তি আছে?

তুলির চোখেও আবেশ। বুকের ভেতর আবেগ উচ্ছল হয়ে ওঠে। মুচকি হেসে বলল তোমার সঙ্গে নরকে গিয়েও আমার সুখ।

আবীর আবার কিছুক্ষণ চুপ হয়ে থাকে। একসময় বলে আমি ট্রান্সফারের জন্যে বলেছিলাম অর্ডার হয়ে গেছে। বাইরে কোয়ার্টার পাওয়া যাবে। কয়েকদিনের মধ্যেই হয়ে যাবে।

তুলির চোখে মুখে খুশি ছড়িয়ে পড়ে। বুকের ভেতরটা যেন নেচে ওঠে।

আবীর হঠাৎ সখেদে বলে ওঠে, এখানে নিজের বউয়ের সঙ্গেও চুরি করে দেখা করতে হয়।

ওরা একসময় ওঠে পড়ে। হাঁটতে হাঁটতে রাজভবনের গেট-এর কাছাকাছি চলে আসে।

এখান থেকেই বাস উঠবে তুলি। জায়গাটা একটু নির্বিবিলি। সামান্য অন্ধকার জমে আছে একটা জায়গায়। কদিন আগে এখানেই আবীর তুলিকে জড়িয়ে নিয়ে একটা চুমু খেয়েছিল। একটা লোক অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন লুকিয়ে ছিল। লোকটা হি হি করে হেসে উঠেছিল। আবীর ভীষণ চমকে উঠেছিল। মনে মনে গালাগালি করেছিল: এতে হাসবার কি আছে রে! এক ফালতু মেয়েছেলে ভেবেছিস আমার বউ রে বউ।

বাস এলো। তুলি উঠে পড়ল। ওকে আজ খুব খুশি। নিশ্চিন্ত মনে হলো।

নিখিলচন্দ্র সরকার

দুটোর পরেই হাবাধনদের নৌকা। এখনও লোক উঠছে সেখানে। আর কতগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। আলো কিছু দূরে একটা জায়গায় কটা জেলেনৌকো। জেলেরা এখানে থাকে না। মাঝে মাঝে আসে। ওরা নৌকো কিনারে রেখে বিরাট বিরাট জাল মেলে দিয়েছে রোদে। দু-তিনজনে কুয়ো থেকে নৌকো ধুয়ে পরিষ্কার করছে। কিছু বুনোও জড়ো হয়েছে ওখানটায়।

মাছের গন্ধ পেয়ে অনেক কাকচিল নেমে এসেছে ডাঙায়। কিছু মাথার ওপর চক্রাকারে ঘুরছে। আর কতগুলো জলের ওপর পড়ে, ঢেউয়ের মাথায় মাথায় দোল খেতে খেতে কিনারে চলে আসে, আবার উড়ে গিয়ে বেশ কিছুটা দূরে জলের ওপর খুশীতে সাঁতার কাটে। ওরা যেন আজ কোন এক স্বাদ-বাড়িতে এসে জড়ো হয়েছে। আশপাশে কিছু কাকও ছিল।

আবার যেন তেষ্টা পাচ্ছে তার। জীবন হিসেব করল আজ মাসের কত। কিন্তু বারবারই কোথায় যেন ভুল হচ্ছে। বেলাই তার মনে হচ্ছিল, আজ মঙ্গলবার। কিন্তু হিসেবের গিঁটটা কিছুতেই ছাড়তে পারছিল না। বুকের তলায় আর একবার হিসেব যেন একটা শব্দ শুনতে পায় জীবন। ঠিক এমন সময়ই হাবাধন মাঝি তার এখানে এসে বসল। জীবন তাকে হাবাধনদা বলে ডাকে। এক সময় ওর বাবার নৌকোতে হাবাধন কাজ করত। এখন সে অন্য নৌকোর মাঝি হয়েছে। বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ।

হাবাধনের দিকে চোখ তুলল জীবন। নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে জিজ্ঞেস করল, 'হ-গো দাদা, আইজ মাসের কত কউ ত?'

'কেনরে, আইজ ত মাসের ছ।'

'আগর মঙ্গলবার ত চৈত্ত্ব সাতানতে মেলা যাইচে, তাউ নয়?'

'হ।'

'আর আইজ এক মঙ্গলবার, মঙ্গলে আর্ত তার থাকতে এক বাদ দিলু হয় সাত। কিন্তু, একদনা কইথিলে আইজ ছ, তুমিও কওঠ ছ।' জীবনের গলার স্বরে তখনও একটা সংশয় স্পষ্ট।

'ঠিকই ত কইঠি তব যে গোড়াতেই ভুলদবে।' হাবাধন ওর মুখের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে থাকল।

জীবন কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, কোথায় তার ভুলটা মনে মনে আরো একবার হিসেব করল। চুপ করে থাকল কিছু সময়। কিন্তু না, আবার ভুল হচ্ছে হিসেবে। হবে না তাকে দিয়ে। মাথাটা আরো গরম হয়। বিরক্তি বাড়ে। জীবন বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে তাই হাবাধনের মুখের ওপর চোখ রাখল। বলল, 'কি রকম?'

'কি রকম কি, আইজ ত সমবার।'

'সমবার?' জীবন আরও অবাক হওয়ার চোখ নিয়ে হাবাধনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'হ হ সমবার। হাবাধনও একদৃষ্টে জীবনকে দেখছিল।

'তাউ কউ, মাথাটা একবারে খারাপ হইচে। জীবনের দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে আসছিল ক্রমে। এতক্ষণ ভুলটার কারণ বের করতে পেরে ঈষৎ খুশী হয়েছে যেন সে।

একটা কাক জোড় পায়ে লাফিয়ে মাছ নিয়ে পালাচ্ছিল। আরও কটা তার দেখাদেখি মাটিতে নেমে এসেছে। হাবাধন দু-মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকল। পরে জীবনের দিকে চোখ রাখতে রাখতে বলল, 'তব আর দোষ কি, যে জ্বরে পরথুলু (পড়েছিলি), একদনে সেটা ত কাহিল করইয়া দেয়।'

জীবন ধীরে ধীরে একটা নিশ্বাস ছাড়ে।

'আর দুদিন পরে রইলে ত পারতু।' হাবাধন টেনে টেনে বলে।

'না না, ঘরে থাইলে খাবু কি? আর তুমি ত জান গো দাদা ঘরে থাইলে যেন দম আটকি যায়।' দু মুহূর্ত নীরব থাকে জীবন। একটা ঢোক গিলে গাছের দিকে দৃষ্টি ফেলতে আবার বলল, 'পিপরাখ পাখি দেখও ত, অর মতন খালি ছটপট করে।' কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে জীবন।

'তা আমানে হইলি ত জলের পোকা, ঘরে রইতে কি আর মন লাগে।' জীবনের ঘরে না থাকার কৈফিয়তটা হারাধনের যেন মনের মতন হয়েছে। তাই প্রসন্ন মনে মাথা নাড়িয়ে সায় দিল, তারপর জীবনের চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে বলল, 'দে গটে বিড়ি দে।'

জীবন দুটো বিড়ি বের করে একটা হারাধনের দিকে এগিয়ে দিল। অন্যটা নিজে ধরাল।

ভাটা হয়ে গেছে। আর এক সিকি জল কমলেই হারাধন তার নৌকো ছাড়বে। যাবে মণ্ডলিয়া। হারাধন বিড়িটায় একটা জোর টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'আইজ কতদিন নু (থেকে) কেমন কাঁঠাল পাকা গরম পড়ছে দেখছু ত?' ধীরে ধীরে বিড়িটা টানতে থাকে জীবন। 'আরও একটা দিন তুই ঘরে রইলে পারতু, তর শরীরটা বড় পাউসা (পানসে) হই'চ।' কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর হারাধন আস্তে আস্তে বলল।

জীবন বিড়িটা ফেলে দিল। কেমন এক ঘোলাটে তেতো স্বাদ লাগছে জিভে। হারাধনের মুখের দিকে স্থির শান্ত পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ক দণ্ড। তারপর মৃদু হেসে বলল, 'ওকথা আর কইবু নি।' কেমন যেন এখন অন্যমনস্ক পীড়িত দেখাচ্ছে তাকে।

হারাধনও জীবনের মুখের দিকে চেয়ে ক মুহূর্ত কি ভাবে। কিছুটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে কি খুঁজল যেন। তারপর সামান্য হেসে বলল, 'জীবন একটা কথা কইবু, ক রাগ করবা নি?'

'তোমার কথায় কবে রাগ করছি, কইতে পারও?' বলতে বলতে মাটি থেকে একটা শুকনো ডাল তুলে নিল জীবন। হাতে নিয়ে সেটা নাড়াচাড়া করে।

'এবার ঘরে একজনকে লিয়ায় তর বুড়ো মা ত আর পারে নি। সেদিন না কীর্তিবাসের কাছে গেলি, সেঠি তর মা বস্‌সেইয়া (বসে) গাইল। আমাকে দেখ্‌ইয়া কান্‌তে লাগল বুড়ি, হারাধন চুপ করে। জীবনকে ভাল করে লক্ষ্য করতে থাকে। এরই মধ্যে জীবন কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছে। চোখে-মুখে তা ক্রমশ ফুটে উঠছে। বিড়িটা টান দিতে গিয়ে হারাধন টের পেল, কখন যেন সেটা নিভে গেছে। পোড়া বিড়িটায় আর একবার আগুন ধরিয়ে নিয়ে জোরে জোরে কটা টান দিল। পর একগাল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'তাউ কহু কি এবার একটা বে থা কর জীবন।' এতক্ষণ যেন ভেবে নিচ্ছিল হারাধন কি ভাবে বলবে কথাটা। গলার স্বরে তাই একটা মন্থর ভাব ছিল।

হাতের ডালটা ফেলে দিয়ে জীবন হাসল। তেতোসের কটা শুকনো পাতা কামড়াতে কামড়াতে এল মাথায় পড়ল। জীবনের এ হাসির তলায় কোথায় যেন সূক্ষ্মতম একটুকরো বেদনার ছায়া ছিল। এ প্রসঙ্গ তার ভাল লাগছিল না তার। এখানেই সে আলোচনাটা শেষ করে দিতে চাইছিল। দু মুহূর্ত নীরব থেকে কি যেন ভাবল সে। তারপর হারাধনের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বলল, 'আরে তোমার নৌকা যে ছাড়বে, প্রায় দু সিকি ভাটা ত হইয়াল। পরে যাইতে কষ্ট হবে কিন্তু।'

'ঐ ত চালাকি করছু।' বলতে বলতে হারাধন উঠে পড়ল। সত্যিই এ বেলায় নৌকো ছাড়তে না পারলে অনেক কষ্ট হবে। কথার কথার সময় একটু নষ্ট করে ফেলেছে।

জীবনের গলাটা আবার যেন আঠা আঠা হয়ে আসছে। আজ খুব তেষ্টা পাচ্ছে তার। বোদটা এখন হাত দুয়েকের মধ্যে এসে গেছে। এরই আকাশের দিকে তাকালে ভয় লাগে। এতটা পথ যেতে আজ খুব কষ্ট হবে। বাতাস আগুনের ছোঁয়া পেয়ে এরই মধ্যে যেন তেতে উঠেছে। জীবনের নৌকোর তখন একটি দুটি করে লোক উঠছে। ভাটা শেষ হয়ে জোয়ার এলেই ছাড়বে।

'আইজে বড় কষ্ট হবে যাইতে।' নিরঞ্জন শান্ত জলের দিকে চেয়ে বলল।

'তা ত হবেই, বাতাসটা যে পশ্চিমাল (পড়ে গেল)।' কথা বলতে জীবনের অল্প কষ্ট হচ্ছিল। তবু নিরঞ্জনের মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'একটা কাজ করত, এক ঘটি জল লিয়ায় গেলাস গলা শুকি যাচ্ছে।' নিরঞ্জন ঘটি নিয়ে চলে গেলে জীবন গাঙের দিকে তাকাল, দেখল, হারাধনের নৌকোটা ততক্ষণে অনেকটা দূরে চলে গেছে। হারাধনের কথাগুলো দিয়েই যেন এখন তার মনের কাজ শুরু হয়েছিল। ইতিমধ্যে নিরঞ্জন জল নিয়ে এসেছে। প্রথমটায় খেয়াল করেনি। পরে ঘটিটা নিজের হাতে নিয়ে মুখের ওপর তুলে ধরল। তৃষ্ণা কোথায় কত জল যেন অনেকখানি। ঘটিটা মাটিতে রাখতে রাখতে নিরঞ্জনের দিকে চোখ রেখে বলল, 'একবার খোলটোলটা ভাল করে ইয়া দেখ ভাল উঠেছে নাকি।

যাই। বলে নিরঞ্জন ঘটিটা হাতে নিয়ে বলল।

'ভাল গো বাবা, বাবাঠাকুরের দোয়া বুনটা' একজন বুড়ো লোক জীবনের সামনে এসে দাঁড়াল। তার হাতে কতগুলো জালের চুড়ি। ওর মধ্যে একটা বড়ো করে তার চুড়ির দিকে জীবন এক দৃষ্টে তাকিয়েছিল। কিছুটা সময় সে অন্যমনস্ক। তার কথাটা তার কানে যায়নি। একটু অপ্রতিভ হয়ে সে চুড়িগুলো দেখছিল। কি ভেবে পর বুড়োর মুখের দিকে তাকে ধীরে ধীরে বলল, 'শুদ্ধাশা এ চুড়িগুলা ত আর সকলে নো বুড়ার পো, কত নিবা, বিলাও।'

'বেশি লেম না, সাগরদাঁড়ের থেকে। সকালে মাত্র ছ আনা দিয়া।' বলে এই বৃদ্ধের জন্যে বুড়ো হাসতে লাগল।

'চুড়ি গাঁথবে কিনত বুড়ো পো চোখ আছে বটা। তা বেচি কইবে ভাল।' বলে নিরঞ্জন হাসতে থাকে সে জোর দিকে চেয়ে।

'ঠাট্টা মশকরা পরে দিয়া ওই ... চুড়ি ছয়টা।'

'কিরে নিরঞ্জন অখনও গেলু নি ছাটা যে শেষ হইয়ালবে।' গলায় ঈষৎ বিরক্ত ভাব ছিল।

'যাইস গো বড়োর পো।' নিরঞ্জন আর দাঁড়াল না সেখানে।

বুড়ো চলে গেলে জীবন এখন কেমন অন্যমনস্ক হলো। বেশী দিনের কথা নয়। মনে মনে ক মুহূর্ত ভাবল জীবন। মাত্তর ত পাঁচটা বছর। দেখতে দেখতে এই কটা বছর কি করে যেন একটা একটানা আচ্ছন্নতার মধ্য দিয়ে চুপিচুপি কেটে গেল। জীবন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সঙ্গে সামান্য একটু যন্ত্রণাও অনুভব করল এখন।

জীবনের বাপ ছিল এ ঘাটের মাঝি। সেবা মাঝি। একটু বয়েস হতেই বাপের সঙ্গে সঙ্গে থাকত জীবন। বাপ বলত, 'দেখ জীবন এসব কাজের তরে চোখ থাকা চাই। কান-মন সজাগ নাই রাখলে, বিপদ আস্‌ইয়া যখন তখন লাফইয়া পড়তে পারে। দেখতে হয় শিখতে হয়। আমানে হইলি গিয়ে চৌদ্দপরুষ নু মাঝি। তর মত বয়সে আমি এই লৌকাদ হাইল ধরি। তর ঠানদি আমার হাত ছাড়াইয়া দিয়া দেখত। অখনই ত রে শিখবার সময়।'

এ সব কথা কেন যেন জীবনের ভাল লাগত না। এতে মোটে পয়সা নেই। অথচ কী পরিশ্রম। কি হবে ঘাটের মাঝি হয়ে! আর ওপর প্রায়ই ওর বাপ ওকে বকাবকি করে। একটু ভুল করলে বেগে আগুন। জীবনের ভাল লাগে না এসব। সেদিন এতগুলো লোকের সামনে কটা চড় মারল। বিড়িটার সঙ্গে গালিগালাজ দিল। কি, না—পাটাটা ঘুরোতে সামান্য দেরি হয়েছিল। তার পরদিন থেকেই জীবন আর নৌকোয় ওঠেনি। আর ঠিক সেই সময়টায়ই চন্দনেশ্বরের মেলা সবে শুরু হবে হবে করছিল। নৌকোয় না যাওয়ার জন্যে জীবনকে অবশ্য বাপের হাতে মার খেতে হয়েছিল। তবু সে নৌকোয় গেল না। কিছু পয়সা হাতে করার একটা ফন্দি হঠাৎ তার মাথায় এল। বুদ্ধিটা হারাধনই তাকে দিয়েছিল। মেলায় বসবে ঠিক করল।

তারপর সত্যি সত্যিই মেলায়, জীবন একদিন বাচের চুড়ি, গেওলের রং-করা আঁটি ছেলেমেয়েদের খেলনা, ঝুনোবাদাম এসব দোকান দিয়ে বসল। আর সেই সময়েই একদিন গাঁগন বয়ের সঙ্গে তার আলাপ। ওর বাবাকেও চেনে লোকটি। শুধু চেনেই না, এক সময় যে ওদের মধ্যে পারিবারিক মেলামেশা নিবিড় ছিল জীবন তা বুঝতে পারল। তবে সেটা লোপ পেয়ে থাকে হারাধনের বাড়ির ঝোঁক। হারাধনই সঙ্গে করে জীবনের দোকানে গাঁগন বয়েকে নিয়ে এসেছিল। সঙ্গে লক্ষ্মণ মেয়ের মাও এসেছিল।

'ও গো তুমি আমাদের বরোদের বেটা না?'

হুঁ। জীবন মাথা তুলেছিল। চোখমুখে একটা বিস্ময়ের ঘোর। বেঞ্চিতে হারাধন ... আগেই এগিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর ওর মুখের দিকে চেয়ে বলেছে

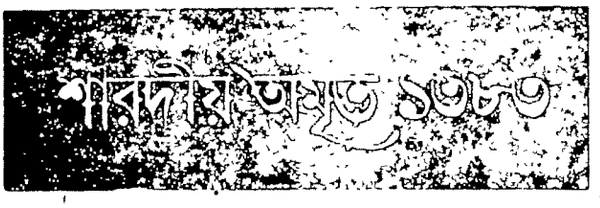

সম্পাদক ঃ তুষারকান্তি ঘোষ

৫টি উপন্যাস

এবারে লিখছেন

প্রেমেন্দ্র মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, নিমাই ভট্টাচার্য,
চাণক্য সেন, আনন্দ বাগচী।

২০টি ছোট গল্প

লিখছেন

অন্নদাশঙ্কর রায়, বনফুল, মনোজ বসু, প্রমথনাথ বিশী,
গজেন্দ্র কুমার মিত্র, শওকত ওসমান, প্রফুল্ল রায়,
সুমথনাথ ঘোষ, বুদ্ধদেব গুহ, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়,
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, অদ্রীশ বর্ধন,
বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন রায়,
তারাপদ রায়, দেবল দেববর্মা, সুধাংশু ঘোষ এবং
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়।

একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক রচনা

অমিতাভ চৌধুরী

সুনির্বাচিত কবিতা

লিখছেন

বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, দিনেশ দাস, মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, বাণী বসু, শঙ্খ ঘোষ, তরুণ সান্যাল, কৃষ্ণ ধর মৃগাঙ্ক রায়, গোপাল ভৌমিক, সুনীল গুপ্ত, মানস রায় চৌধুরী, নবনীতা দেব সেন, শান্তনু দাস, পরেশ মণ্ডল, রবীন্দ্র হাজরা দীপেন রায়, মৃণাল বসু চৌধুরী, কবিরুল ইসলাম, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, রুদ্রেন্দু সরকার, পরমানন্দ সরস্বতী, প্রতিমা রায় সেনগুপ্ত এবং গৌতম গুহ

আপনার কপির জন্য এজেন্টকে বলে রাখুন অথবা যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে।

দাম আট টাকা
অতিরিক্ত ডাক মাশুল ১·৫০

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-তিন

জেঠা বলেছিল, অমন নামকরা বাপের বেটা হয়ে শেষকালে এ ব্যবসা কেন?'

জীবন উত্তরে কিছু বলল না। মাথা নীচু করে থাকল।

আবে সন্ধ্যা, এসা (এদিকে। আয়। অকে একটু তুমার ওদিকে বুসতে দাও না। আর হাটতে পারচে না ও।'

জীবন বসবার জায়গা করে দিল।

'বাপু, অকে ভাল দেখ্ইয়া খানকতক চুড়ি দাও তা, চুরি পরবার খুব সখ হইচে অর। তা তুমি অকে চুড়ি পরাও, আমি আর একটা জিনিস লেইসি। যাব আর আইসবো। আয় হারাধন।'

ওরা চলে গেলে জীবন সন্ধ্যার দিকে তাকিয়েছিল। এই প্রথম পরিপূর্ণভাবে সে ওকে ভাল করে দেখল। হারাধনদা অনেক আগেই এর কথা কয়েকবার বলেছিল। একেবারে মিথ্যে বলেনি সে।

সন্ধ্যার সর্বাঙ্গে তখনও লজ্জা জড়ায়নি। চোখ নীচু করে সে বসেছিল। জীবন তার দিকে চেয়ে সামান্য দুর্বল গলায় শুধলো, 'কুন্‌টা তুমার পচন্দ হয় গো দেখ।'

সন্ধ্যা শাড়ির আঁচলটা মুখে নিয়ে টানছিল। আস্তে আস্তে নরম গলায় বলল, 'যেট ভাল হবে সেটাই দাও।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জীবন দুপলক স্থির চোখে সন্ধ্যাকে দেখল। তারপর ঠোঁটের ডগায় সূক্ষ্ম একটু হাসির দাগ ফুটিয়ে বলল, 'আমার দোকানের সব ভাল।'

সন্ধ্যা অল্পক্ষণ চুপ করে থাকল। পরে জীবনের চোখের ওপর স্নিগ্ধ নরম চোখ জোড়া স্থির রেখে ধীরে ধীরে বলল, 'ভাল জানিয়াই ত আস্‌সি গো।' বলতে বলতে দৃষ্টি গুটিয়ে নিয়ে সামান্য হেসে চুড়িগুলো দেখতে থাকে। একটু পরে কটা চুড়ি বের করে আনল। দু মুহূর্ত কি ভেবে জীবনের দিকে বাড়িয়ে দিল। 'পরি দাও।'

জীবন ওর চোখের দিকে তাকাতে তাকাতে চুড়ি কটা হাতে নিয়ে হাত স্পর্শ করল। সন্ধ্যার চোখে তখন কেমন একটা ভীরু ছায়া কাঁপছিল। কিন্তু পরক্ষণেই ও জীবনের দিকে চেয়ে সামান্য অর্থপূর্ণ হাসি হাসল। জীবন লজ্জা পেল। তখনও সে ওর হাতটা ধরে রেখেছে। এবার ছেড়ে দিল। বলল, 'এটা ত তুমাকে ভাল মানিবে না।' জীবন কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক।

'তবে সেটা মানিবে সেটাই দাও।' সন্ধ্যা তখন মুচকি মুচকি হাসছিল।

'বাতাসটা যে বুসিয়াল মাঝিদা।' হীরা কথাটাই বলল।

হীরার কথা কানে যাচ্ছিল না জীবনের। তখনও সে নির্বোধ বিমূঢ় দৃষ্টি নিয়ে হীরার দিকে তাকিয়েছিল।

'কইঠি আর কত দেবি ছাড়তে, বাতাসটা যে পড়িয়াল?' হীরার গলার স্বর যেন কিছুটা রুক্ষ।

একটু একটু করে আচ্ছন্নভাব ধোঁয়া ঠেলে সরিয়ে যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল জীবন, তখনও চোখ দুটো তার জ্বালা করছিল। হীরার দিকে চেয়ে এখন কেমন যেন সামান্য বিরক্ত হলো। হীরা যেন তাকে কাঁচা ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছে।

জীবন আরও খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। তার দৃষ্টি এখন সতেজ, স্বাভাবিক। দেখল, রোদটা এতক্ষণে তার পা ছুঁয়েছে। এবার বসতে বসতে হীরার চোখের ওপর চোখ রাখল। কোমর থেকে একটা বিড়ি বের করে নিয়ে ধরাল। পরে একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'হুঁ, পড়িছে তো বহুক্ষণ, এতক্ষণ তুই কাই (কোথায়) থাইলু?

'জোয়ার তো কতবানু (কখন থেকে) এক পোয়র বেশী হইচে।' খাটো স্বরে হীরা কথাটা বলল।

কিছু সময় চুপ করে থেকে জীবন কি যেন ভাবল। পরে স্বাভাবিক, শান্ত অথচ কঠিন গলায় বলল, 'ভাল কর্‌ইয়া সব দেখ্‌ইয়া টেখ্‌ইয়া লিচু ত?'

'হুঁ।'

'চল তাইলে?'

নৌকো এর মধ্যে ভরে গেছে লোকে। গরমটা এই ভরদুপুরে তির তির কাঁপছে। অনেকে ঘামছিল ভেতরে। জীবনের কপালেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে।

নৌকোর নোঙ্গর তুলে ফেলল হীরা। তার লগি দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে জলের মাঝে নিয়ে আসছিল নৌকোটা। এমন সময় পারে এসে একটা লোক অসহিষ্ণু, অধীর গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি মরাগালিয়ার নৌকা?'

'না, সেটা তো অনেক আগে ছাড়্‌ইচে।'

'এটা যাবে কাইকে?'

'কাকদ্বীপ। আরে ভাব কিগো তুমি, উঠইয়া আস্‌হ না। কঠিন কচুবাড়িয়ার খেয়া পাব।' কানাই লোকটার দিকে চেয়ে থেকে বলল।

দু মুহূর্ত কি চিন্তা করল লোকটা। পরে বলল 'তবে একবার ধারে লাগাও না. সাথে মাইয়া মানুষ আচে।'

'পা চালি আসতে কও।' লগিটা টেনে নিতে নিতে মৃদু বলল।

বিড়ি টানছিল জীবন। বাঁ হাতে হালটাকে একটু ঘুরিয়ে দিল। বিড়ির শেষ টানটা দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে গিয়ে যেই সামনের দিকে চোখ ফেলেছে জীবন মুহূর্তের মধ্যে যেন সে কেমন স্তব্ধ অনড় হয়ে গেল। হীরা জীবনের চোখের দিকে চেয়ে বলল 'আরে চুপ করইয়া হাইল ধরইয়া আচ যে. হাইলটাকে একটু ঘুরাও না।'

জীবন এবার হীরার চোখে চোখে তাকাল। সামান্য লজ্জা পেয়েছে যেন সে। হীরা তার কাছে এসে আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, 'তুমার গা কি ভাল নাই আইজ?'

'না না ঠিক আচে।' সামান্যক্ষণ চুপ করে থাকল জীবন। তারপর মৃদুর দিকে চেয়ে চেয়ে বলল, 'অনকে ক, এ পাশটায় ঘুরইয়া বসতে।'

'কানকে?'

'ওই যেবে, পরে যানে (যারা) উঠল।'

'তুমানে সে ডালিতে ভর দিয়া বস গো।'

জীবন সামনের দিকে চাইল। এ ঘাটেও আরো অনেক নৌকোলোক বসেছে। মুহূর্তে সে তাকে চিনতে পেরেছিল। এখন সেদিকে চেয়ে চেয়ে দেখল জীবন, ও জলের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চুপ করে কি যেন একটা গভীরভাব ভাবছে। জীবন দীর্ঘ করে একটা নিশ্বাস ফেলল। তারপর একটু একটু করে সেখান থেকে কাতর দৃষ্টিটা সরিয়ে আনল। সত্যি বড় দুর্বল লাগছিল তার নিজেকে। আরো কটা দিন ঘরে থাকলে পারত। মাথাটা এখনও সমস সমায় ঝিম ঝিম করে।

'কি গো মাঝি ভাই. আইজ যে লোকা মোটে লড়তেই চায় না।' ভেতর থেকে একজন বলল।

'হুঁ', যাইতে খুব কষ্ট হবে আইজ। বাতাসটা যে একবারে পড়িয়াল।' কানাই জবাব দিল।

আস্তে আস্তে নৌকো এগোচ্ছিল। ভেতর থেকে একজন হাসতে হাসতে বলল, 'এতবড় গাং আর ওই পুচকে মাঝি. আর সময়টাও তো ভাল না। কে জানে আইজ কপালে কি আছে।' ওর পাশেই ছিল একজন আধ-বয়েসী লোক। জীবনকে সে চেনে। লোকটির দিকে তাকিয়ে হাসল একটু। হাসিটা যেন লোকটির এ মন্তব্যকে উপহাস করছিল। পরে ধীরে ধীরে বলল, 'মশায় এ পথে বোধ হয়ে লোতন?'

পরে বুড়ো জীবনদেব জীবনের ঠাকুর্দা বাবা ও জীবনের প্রশংসা করছিল।

লোকটা একেবারে চুপ করে গেল। জীবন এখান থেকে সব কথা শুনতে পাচ্ছিল। আর একবার চোখ ফেরাল ওদিকটায়। দেখল, একটি বউ তখনও ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। তাকিয়ে তাকিয়ে সব কথার সঙ্গে যেন ওকে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছে। তারও চোখমুখ একটু একটু করে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। জীবন একসময় চোখ নত করল। তার কেন যেন এখন একটু কথাই মনে হচ্ছিল. মেয়েটির দৃষ্টিতে গভীর এক অভিযোগ বেদনা স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

জীবন যেন ক্রমশ আরো ম্লান দুর্বল হয়ে আসছে। তার চোখের সামনে মেলার ছবিটা যেন এই মুহূর্তে জীবন্ত হয়ে উঠছিল ক্রমে ক্রমে।

মেলা থেকে আসার পর কিছুই ভাল লাগছিল না তার। মনের মধ্যে শুধু তখন একটা বিচিত্রবর্ণ প্রজাপতি ফরফর করে উড়ছিল। যন্ত্রণা ছড়াচ্ছিল। বথের মেলায় ভাসবার জন্যে সন্ধ্যাকে সে বারবার করে বলে দিয়েছে। সন্ধ্যাও আসবে বলে মাথা নেড়েছিল। তবে এবার আর অত দূরে নয়। মেলাটা বসবে ওদের বাড়ির কাছেই।

জীবনের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। কিন্তু সন্ধ্যা তার কথা রাখেনি। তারপর একদিন কি মনে করে জীবন ওদের বাড়ি গেল। তখন বর্ষাকাল। বিকেলের দিকে আকাশে প্রচুর কালো মেঘ জড়ো হয়েছে। বাতাস ছুটছিল দুরন্ত গতিতে। ঠিক সেই সময়ই জীবন ওদের বাড়ির গোড়ায় পা রেখেছিল।

'ঘরে কে আচ গো?' গলার স্বরটা অল্প অল্প কাঁপছিল জীবনের।

'কাকে খুজেঠ?'

'লখেন জেঠাকে।'

'সে তো ঘরে নাই দেশ চলিছে।'

'তুমি কে গো?'

'চিনব নি আমাকে, আমি পরাণের বেটা।'

একটু পরেই দরজা খুলে মুখ বাড়াল সন্ধ্যা। 'তুমি—?' সন্ধ্যার হাসি হাসি মুখেও সেদিন প্রচ্ছন্ন একটা বিস্ময়বোধও ছিল।

'ওদিকে হারাধনদার দকে আস্থিলি, রাস্তায় ঝড় উঠল; তুমার দরে উঠ্‌ইয়া পড়লি।' জীবন সহজ হওয়ার চেষ্টা করছিল।

'ভালই করচ গো মাঝিব পো। তা যা ঝড় আইল।' কেমন যেন অর্থপূর্ণ হাসি হাসল সন্ধ্যা।

তারপর সন্ধ্যা জীবনকে নিয়ে এসে একটা ঘরে বসিয়েছিল। জীবন কোন কথা বলতে পারছিল না। কেমন একটা লজ্জা, সংকোচ এসে আঁকড়ে ধরেছিল ওকে। জীবন দেখল, ঘরের এক কোণায় এক বয়স্কা রমণী বসে বসে কি যেন কবছে। চোখ তুলে বার-বার তাকে দেখছিল। কিন্তু ভাল করে চিনতে পারছিল না। সন্ধ্যাকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় জিজ্ঞেস করেছিল তার পরিচয়। সন্ধ্যা তখন একটা বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে মুখে শাড়ির আঁচলটা নিয়ে ঠোঁট টিপে টিপে হাসছিল।

কথার উত্তর দিতে দিতে জীবন সন্ধ্যার হাতের দিকে তাকাচ্ছিল বারবার। 'মেলায় তুমি যে কি চুড়ি পচন্দ করাইয়া দিলে গো।' সন্ধ্যা ঠোঁট কামড়ে হাসছিল।

'কেনি?'

'কদিন পরহু যে মট করইয়া ভাঙ্গিয়াল।' সন্ধ্যার গলায় ছেলেমানুষি চপলতা ছিল।

জীবন ওকে দেখছিল। বুড়ি, সন্ধ্যার ঠাকুমা তখন ঘরের এক কোণায় বসে দোক্তা গুঁড়ো করছে। পাশের ঘরে কারা যেন অনুচ্চ স্বরে কথা বলছে। জীবন সন্ধ্যার চোখের ওপর চোখ রাখতে রাখতে একসময় বলল, তুমি তো মেলায় যাওনি।

সন্ধ্যা এখন শান্ত জড়ানো চোখে দু' মুহূর্ত তার দিকে চেয়ে থাকল। পরে দৃষ্টিটা সরিয়ে নিতে নিতে বলল, যাইতে দিল নি।' সন্ধ্যাকে তখন বড় করুণ ব্যথিত দেখাচ্ছিল। একটু পরেও সেখান থেকে চলে গিয়েছিল। জীবন সেদিকে কিছুটা আহত কাতর চোখে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে সেখান থেকে বেরিয়ে এসছিল।

ঢেউ ঢেউ এখন একটা নিশ্বাস নিল জীবন। অবাধ্য ছেলের মতন ওদিকটায় চুপি চুপি আবার তাকাল। তখন ঘোমটার ফাঁক দিয়ে দুটো নিবিড় কালো চোখ ওকে নীরব লক্ষ্য করছিল।

মন্থর গতিতে নৌকোটা এগোচ্ছে। শরীরটা এখন যেন সামান্য কেঁপে উঠতে লাগছে জীবনের। নিরঞ্জনরা ক্লান্ত হাতে দাঁড় টেনে টেনে এইমাত্র থেমেছে। বিড়ি ধরিয়ে তখন-ক্ষণ জিরিয়ে নিচ্ছিল ও আর হাঁপা। মধু কানাই ওরা তখনও থেকে থেকে নবম-গরম দাঁড় মারছিল। জলের ওপর তার মৃদু শব্দ ফুটছিল।

একটা ছবি এখনও জীবন মনের তলায় সযত্নে অলক্ষ্যে লুকিয়ে রেখেছে। মাঝে মাঝে সংগোপনে নিভৃতে না দেখে। আজও এই অলস মুহূর্তের একফাঁকে জীবন তা প্রত্যক্ষ করে।

হারাধনকে দিয়েই খবরটা পাঠিয়েছিল জীবন। সন্ধ্যার বাবা বলেছিল, 'পরাণের ঘরে মাইঝি দব সে তো ভাল কথা। কিন্তু বড় অভাব সে ঘরে।'

'জোয়ান মরদ, অখন তো বেশ দুটা পইসা আয় কবেঠে (করছে)। অত ভয় কিসের তুমাব। আর অভাবের কথা কওঠ, সে তো সব ঘরেই যাছে খুড়ো. তাছাড়া জীবনের পইসা আয় করার একটা নেশা আছে।'

'তা নাইলে হইল, কিন্তু টাকা দিতে পারবু তো।'

'একটু কমসম করইয়া কইলে পারতে পারে।'

'দেখ, এই তোকে কইলি, তিনশ টাকা দিতে হবে। মাইঝি-টার তরে সামান্য গয়না-গাটি খরিদ করব।'

'আর কিছু কম কব খুড়া, তুমার তো খুব একটা অভাব নাই।'

'অরে কমলাপাড়ার অনন্ত দাসের বেটার অবে কইথ্‌লে, অনে (ওরা) পাঁস্‌শ টাকা দিবে।'

হাবাধন ফিবে এসে পুরো ছবিটা জীবনের হাতে তুলে দিয়েছিল। মনে আছে, জীবন সেদিকে চেয়ে চেয়ে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। তারপব ছবিটা তখন একসময় মনের গুপ্তস্থানে তুলে রেখেছিল। এখন জীবন অনুভব করতে পারছিল, ছবিটা মলিন হয়েছে।

'মাঝিদা?'

জীবনের চিন্তায় মৃদু ধাক্কা লাগল। চোখ তুলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কানাই-এর মুখের দিকে তাকাল।

'হায় চায়া দেখ।'

জীবন কপালে বাঁ হাত রেখে আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণাব দিকে দৃষ্টি ফেলল। জীবনরা ওই কোণটাকে ঠাকুর-কোণ বলে। কি যেন সে তন্ন-তন্ন করে খুঁজল ওখানে। যাত্রীদের মধ্যে একজন সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'না না আকাশ পরিষ্কাব। ওটা কিছু না, হাবলা মেব।'

অনেকক্ষণ পব জীবন চিলের মতন তীক্ষ্ণ তীব্র চোখজোড়া নামিয়ে আনে। তাবপর ইতস্ততভাবে বসা যাত্রীদের লক্ষ্য করে বলল, 'তুমাদে সে-পাশে সর্‌ইয়া বস গো।'

ভেতরে বসা একজন বুড়ো মতন লোক, জীবনের দিকে এতক্ষণ নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। পরে আস্তে আস্তে বুড়ো জিজ্ঞেস করল, কি, কিছু দেখলু নাকি?'

'না— তবে মনে হযঠে—।' বলতে বলতে আবার জীবন ঠাকুব-কোণেব দিকে সন্ধানী চোখ দুটো মেলে ধরল। আরো খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে একসময় জলেব ওপব দৃষ্টি ফেলল। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে যেন এইমাত্র দেখতে পেল সে, জলের তলায় তখন বাতাসেব একটু একটু শিহরণ ছাড়িয়ে পড়ছে। কারো কথা তখন কানে যাচ্ছিল না জীবনেব। এখন যেন সে আর এক মন ষ। মুহূর্তের মধ্যে দেহেব সমস্ত জড়তা সে কাটিয়ে উঠেছে। আরো কিছু সময় কান নাক সজাগ রেখে বাতাসের গন্ধ নিল। সবে একটু একটু বাতাস উঠেছে।

'আরে ওসব কিছু হবেনি। খালি খালি ভয় পাউঠ্‌।' একজন যাত্রী হেসে হেসে বলল।

'হবে নি তুমানকে কে কইল, হইতেও তো পারে।"

জীবন মেয়েদের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করল। পরে, একটু বিরক্ত হওয়ার গলায় বলল, 'তুমানকে কইলি না, একটু সর্‌ইয়া (সরে) আসতে, কথা কি কানে যায়নি?'

জীবন দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিতে গিয়ে আর একবার দেখল, সেই বউটি তখনও ঘোমটার আড়াল থেকে তাকে দেখছে। সেদিকে স্বল্প-সময় চোখ স্থিব বেখে একসময় দৃষ্টি আনত করে সে। বাতাসেব গন্ধটা যেন ক্রমশ আরো উগ্র হয়ে বারুদের মতন ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। আর স্থিব থাকতে পারল না জীবন। সময় থাকতে থাকতে সব ঠিকঠাক করে রাখা ভাল। তারপর যা হয়। মনে মনে জীবন কোন এক দেবতার কথা স্মরণ করল। কপালে হাত ঠেকিয়ে অন্তরের শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করল। তারপর একজনের হাতে হালটা ধরতে দিয়ে পবনের গামছাটা শক্ত করে কোমরে জড়িয়ে নিল। নিরঞ্জনদের দিকে সাংকেতিক দৃষ্টিতে চেয়ে কি যেন একটা ভেবে নিল। কিছু সময় চুপ করে থেকে বলল, দেবানের ওখানটায় তুই রইবু নিরঞ্জন। দাঁড় আর মারতে হবে নি রে। পাউলেব কাচির কাছে যা তোনে।'

কি হইল গো তুমানদের?' ভেতব থেকে হাসতে হাসতে একজন যাত্রী মুখ বের করে।

অখনও হয় নি গো. হবে। মধু কাচিটা হাতেব মধ্যে ঠিক করে নিতে নিতে জবাব দিল।

কয়েকজন যাত্রী এখন অবাক হয়ে দেখল, আকাশের ঠাকুব-কোণায় একটুকরো কালো মেঘ জমা হয়েছে। ভেতরে ততক্ষণে কথা-বার্তা কমে এসেছে। জীবন চেয়ে দেখল, মেয়েদের চোখ ভয়ের একটা ছায়া দীর্ঘ হয়ে ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে যাচ্ছে। সবাই একটু সংকেতে বসল। সময়টা খারাপ। বলা যায় না।

জীবন বিড় বিড় করে কি যেন বলল। তারপর কটা পয়সা কপালে ঠেকিয়ে জলের মধ্যে ফেলে দিল। যাত্রীদের দিকে চেয়ে বলল, আধঘণ্টার ভিতরে একটা ঝড় আইসবে গো। তুমানকের ভয় নাই। জীবনের হাত যতক্ষণ হাইল আছে ততক্ষণ কুন ভয় নাই গো এই কইয়া দিলি।' জীবন ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ় বিশ্বাসের গলায় যেন কথাগুলো বলে গেল। দৃষ্টিটা কেমন বলিষ্ঠ শক্ত।

পুরুষদের মধ্যেও যেন এতসময় পর একটা ভয় নিঃশব্দে পা ফেলে এগিয়ে এসে তার ডানা বিস্তার করছে। যাত্রীদের মধ্যেও তার কথা নেই। কেউ কেউ অবশ্য তখনও ভাবছে ছোকরা মাঝি আর এতবড় গাঙ কি হবে ঠাকরই জানেন।

জীবনের এখন অন্য কোন দিকে মন ছিল। ভাবছিল ঝড়টা এরকম সময় উঠল

যে নৌকা তখন মাঝখানে। লোক ভরতি নৌকো। এর আগেও যে কয়েকবার ঝড়ে না পড়েছে সে তা নয়। তবু আজকে যেন অন্যরকম লাগছিল।

জীবনের এখন চোখ কান আরো সজাগ তীক্ষ্ণ। কিশোরী বাঘের মতন চোখ দুটো তার দপ দপ করে যেন জ্বলছে।

সবাই টের পেল ক্রমশ বাতাস উঠছে। কালো মেঘখণ্ডটা এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে অনেকখানি। জীবন জলের দিকে তাকাল। জলের রঙটা এখন আরো ঘোলাটে, গভীর কালো। কান খাড়া করে বাতাসের এগিয়ে আসার উল্লাস শুনল জীবন।

তুমানে ভয় করনি গো। যে যেঠি বসি আচ ঠিক সেঠি বসাইয়া (বসে) থাউ। খুন ভয় নাই মাথা লাড়ব নি। বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল জীবন। বাপের শেখানো কথাটি স্মরণ করল। বিপদের জন্যে একটা কৌশল শিখিয়ে দিয়েছিল ওর বাপ। জীবন এখন মুহূর্তের মধ্যে আলস্য বিক্ষিপ্ত মনটা একটা জায়গায় শক্ত করে বেঁধে রাখল।

আরে তুমানে কাঁদব কেনি? কইলি নি ভয় নাই। ধমকের সুরে কানাই বলল।

একজনের কান্না দেখে আরো কজন মেয়েলোক ভেতরে কান্না শুরু করে দিল।

জলের ঢেউগুলো এখন বাড়ছে। জীবন সেদিক থেকে দৃষ্টি তুলে নিয়ে পরমুহূর্তে নিরঞ্জনের দিকে চেয়ে চেয়ে বলল, নিরঞ্জন দেবান শক্ত করইয়া ধরইয়া রাখবু বাতাসের সাথে সাথে হাত-দেড়েক সলাক দিবু। তারপর ফুলন্ত জলের দিকে চেয়ে বিপদের সংকেত জানায় : ই. ই উ উঃ। শব্দটা চারদিক প্রতিধ্বনি তোলে। অন্যদিক থেকেও অস্পষ্টভাবে ওইরকম সংকেত শুনতে পাচ্ছে জীবন। আবার মুখে হাত দিয়ে শব্দ করে। হে ই.. উ উঃ। অনেক দূরে অন্য একটা নৌকো দেখতে পেল ওরা। এতক্ষণ বিন্দুর মতন ছিল। এখন তা কিছুটা বড় হয়েছে। জীবন এবার তাড়াতাড়ি করে অন্যদের দিকে উদ্বিগ্ন চোখ রাখল সাথে সাথে তোনে (তোরা) পাউলটা ঘুরি দিবু।

আমানে ঠিক আচি গো মাঝিদা।

বলতে বলতে একটা ঢেউ নৌকোটাকে দোল দিল। তারপর আর একটা। নৌকোটা যেন পুরো দমে নাচবার পূর্বমুহূর্তে পা ঠুকে ঠুকে নিচ্ছিল। শরীরের জড়তা অবসাদ ছাড়িয়ে নিতে চাইছে।

জল ফুলছে। বাতাসের শব্দটা এবার যেন বুকের বুকভরা শ্লেষ্মার মতন ভারী হয়ে ছটফট করছে। গোঙাচ্ছে। কজন ছেলে-মেয়ে ভয়ে কান্না জুড়ে দিল। সবার মুখেই আতঙ্কের ছায়াটা এখন গাঢ়, গভীর। মুহূর্তে কিছুলোক নির্বাক, স্তব্ধ।

অকস্মাৎ জীবনের দৃষ্টি পড়ল সামনের দিকে। দেখল সবার চোখে ভয় থরথর করছে। কিন্তু কি আশ্চর্য ওই বউটির সোজা মুখে একটা হাসি স্পষ্ট; জীবন্ত হয়ে উঠেছে। জীবন প্রথমটায় কেমন অবাক হলো। কিন্তু পরে ধীরে ধীরে তার কেন যেন মনে হচ্ছিল এ হাসির তলায় যেন মেয়েটির প্রচ্ছন্ন একটা অভিযোগ অভিমান আছে। এরই জন্য যেন সে প্রতীক্ষা করছিল। তিল তিল করে সংসারের কোন বেদনাকে সে এতদিন জমিয়ে রেখেছিল। এখন বুঝি আর পারছে না। আর কিছু ভাবতে পারছিল না জীবন। মেয়েটির হাসি যেন ওকে নিমম ভাবে উপহাস করছিল। জীবন দৃষ্টি সরিয়ে আনল। এরই মধ্যে মনের দাঁড়কে সে সামান্য ঢিল দিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার নিজেকে শক্ত করল।

'আরে, কইঠি ত তুমানেরে ভয় নাই, তবু খালি খালি চকাব—।' কথা শেষ না হতেই একটা ঝড়ো বাতাস এসে নৌকোটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে হালটাকে বুঝিয়ে দিল জীবন।

নিরঞ্জনও দেবান হাত দেড়েক সলাক দিয়েছিল। আচমকা প্রথম বাতাসটা কাটিয়ে দিল। জলের ঢেউও তখন তালগাছ প্রমাণ। সমস্ত আকাশটায় এখন মুহূর্তে কে যেন আলকাতরা ঢেলে দিয়েছে। জীবন শক্ত মুঠিতে হালটাকে ধরে রাখল। নৌকোটা তখন মাতালের মতন টলছে। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় রাখছে নৌকোটাকে। হিসেবে চুল পরিমাণ ভুল হলে..

ভাবতে চায় না জীবন আর। তার নজর এখন তীব্র, শাণিত। 'চার কড়া খিচ দে দেবান।' আর একটা বাতাস আসার আগেই জীবন চেঁচিয়ে উঠল।' আর একটু, দে. আর একটু বাস। আবার চটকা হাওয়াটা কাটিয়ে দিল নিরঞ্জন।

নৌকোটা কাত হয়ে গেছে। একটা ধার তখন জল থেকে আর মাস্তুর এক কড়া ওপর। আরো একটা চটকা বাতাস এল। প্রায় সবাই চীৎকার করে উঠল। একটু আতঙ্ক শুধু সরু সুতোর সঙ্গে ঝুলছে তখন।

কয়েকজন বমি করতে শুরু করেছে। নৌকোর ওপর দিয়ে একটা ঢেউ ভয় দেখিয়ে চলে গেছে। জীবন প্রাণপণে হালটাকে ধরে থাকল। পাশাপাশি দুটো ঢেউ-এর মাঝে পড়ে গিয়েছিল নৌকোটা। যথাসাধ্য ঢেউগুলোকে বশে রাখবার চেষ্টা করল। ওই হাসিটা মাঝে মাঝে তাকে টেনে নিয়ে আসতে চাইছিল। জীবন আবার তার মতবটা মনে মনে স্মরণ করল। কে একজন ভয়ে উঠে পড়েছিল। জীবন চীৎকার করে উঠল, 'কে মাথা তুলেরে? বাবরার ধরইয়া কইঠি, কানে পশে নি?' মুহূর্তে নৌকোটা টাল খেল। চারী ধাক্কা দিয়ে বসিয়ে দিল লোকটাকে। মোচার খোলার মতন নৌকোটা তখন ঢেউ-এর মাথায় মাথায় উঠানামা করছে।

'কেউ লড়নি গো তুমানে।' আর একবার সাবধান করে দেয় জীবন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কালো মেঘের বুক চিরে বৃষ্টি নামল। আতঙ্কের পরদাটাকে কে যেন এখন টেনে টেনে অনেক দূরে নিয়ে চলে যাচ্ছে। কালো মেঘগুলো ক্রমশই গাতলা হচ্ছে। রংটাও চায়ে ঘোলা জলের মতন হয়ে এসেছে।

'আর ভয় নাই গো তুমানের।' জীবনের গলায় আশ্বাস স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। চারদিকে তাকিয়ে এবার সে দেখল, তাদের নৌকো লোহাচরের কাছে এসে গেছে। সবাই একটু একটু করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

এখন জীবনের মনে হলো চোখ দুটো তার জ্বালা করছে। হাতটাও কেমন অবশ অবশ। ঘোড়ামারা পেরিয়ে তারা কাকদ্বীপের ছোট নদীতে পড়েছে ততক্ষণে।

বিষণ্ণ ক্লান্ত বৃষ্টিভেজা দৃষ্টিতে জীবন আর একবার শেষবারের মতন ওদিকটায় চোখ ফেরায়। কারো চোখে-মুখে আর আতঙ্কের ছায়া নেই। আকাশ পরিষ্কার হয়ে আবার রোদ ঝরে পড়ছে। রোদে রোদে পৃথিবী আবার ভেসে যাচ্ছে। জীবন শুধু দেখল এখন সেই বউটি তখনও ঘোরলাগা ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকে দেখছিল। একটু আগেও পলকে তার চোখে-মুখে যে হাসি দেখেছিল জীবন, এখন আর তা নেই। বরং চোখ দুটো কেমন ভেজা ভেজা, করুণ। জীবন কিছু বুঝতে পারল না। শুধু টের পেল, এখন বুকের মধ্যে সে সামান্য ব্যথা অনুভব করছে। বুকের হাড়ে একটা যেন ফোড়া হয়েছে। সেটা টনটন করছে।

নৌকো কিনারে লাগল। যাবার সময় ভাড়া মিটিয়ে সবাই তাকে সাধুবাদ জানিয়ে নেমে গেল। অই বউটি তখনও নামতে বাকি। সবার শেষের যাত্রী। ওর সাথের লোকটি ততক্ষণে মাটিতে নেমে গেছে। আর একবার মেয়েটি বিষণ্ণ চোখে জীবনের দিকে তাকাল। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে। চোখ দুটো তার ছলছল করছে যেন। তারপর একটা নিশ্বাস ছাড়ল দীর্ঘ করে। জীবনের গায়েও এসে সে বাতাস স্পর্শ করল। ফোড়ার বেদনাটা এই মুহূর্তে আরও বেড়ে গেল যেন।

স্তব্ধ দৃষ্টিতে সেও তার দিকে তাকিয়ে থাকল ক-মুহূর্ত। ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল জীবনের।

'আরে খাড়া রইলু যে।' নীচে থেকে তাড়া দিল লোকটি। বিষণ্ণ পায়ে বউটি ধীরে ধীরে হেঁটে গেল কিনারে। তারপর নামতে গিয়ে ক্লান্ত, ক্লিষ্ট গলায় কি যেন একটা চাইল। হাতটা ছুটে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি করে ধরে ফেলল জীবন।

হাতটা এত গরম! অথচ জীবনের হাতপা যেন ঠাণ্ডায় তখন ভয়ানকভাবে জমে আসছে। ওর হাতের এই উষ্ণতা যেন এখন জীবনকে নতুন করে বাচাতে চাইল। ও যেন এই মুহূর্তে কেমন বিমূঢ় অবাক। তার বিষণ্ণ চোখ স্থির অপলক। বেদনায় ডুবোনো। বউটি অনুচ্চস্বরে আবার কি যেন বলতে চাইল। ঠোঁট দুটো শুধু থর থর করে কাঁপল। নীচে থেকে লোকটি হাত বাড়িয়ে দিল।

ওরা চলে গেলে জীবন সেদিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। ওর বুকের গভীরে নিবু নিবু আগুনটা আবার যেন নতুন করে কে উসকে দিয়ে গেল।

কাজ চাই? কাজ আছে

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতি এবং একস-সার্ভিসমেনদের কাছ থেকে অডিটর পদে নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করছেন। শূন্য পদের সংখ্যা পাঁচ। ঊর্দ্ধতম বয়ঃসীমা ৩০ বছর। প্রার্থীকে একটি লিখিত পরীক্ষায় বসতে হবে। (১) সাধারণ ইংরেজী (প্রেসি রাইটিং লেটার রাইটিং ইডিয়ম), (২) পাটীগণিত ও সাধারণ জ্ঞান। —বিষয়ে প্রতিটি পেপারের জন্য আড়াই ঘন্টা সময়ের পরীক্ষায় বসতে হবে। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে রেজিস্ট্রীকৃত প্রার্থীরা অগ্রগণ্য বিবেচিত হবেন। তপশীলভুক্ত প্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হলে দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলওয়ে পাস দেওয়া হবে। মেয়েরাও এ পদের জন্য বিবেচিত হতে পারেন।

কিভাবে আবেদন করতে হবে তার হদিশ লিখে দিচ্ছি। (১) প্রার্থীর নাম (ইংরাজি ক্যাপিটাল অক্ষরে), (২) পোস্টাল ঠিকানা, (৩) জন্ম তারিখ (হায়ার সেকেণ্ডারী বা ম্যাট্রিক সার্টিফিকেট অনুসারে)। সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল সঙ্গে দিতে হবে), (৪) জন্মস্থান—থানা, জেলা, রাজ্য নাম উল্লেখ করতে হবে), (৫) জাতীয়তা, (৬) প্রার্থী তপশীলভুক্ত জাতি/উপজাতি, (খ) পূর্ব বাংলা-গত উদ্বস্তু (এদেশে আসার তারিখ), (গ) ছাঁটাইকৃত শ্রমিক, (ঘ) বুত্তিচ্যুত স্বর্ণকার, (ঙ) একস সার্ভিসমেন, (চ) দৈহিক প্রতিবন্ধী, (ছ) পূর্ব আফ্রিকা-আগত কিম্বা গোয়া-দমন-দিউ-এর অধিবাসী, (জ) ব্রহ্মদেশ অথবা সিংহল থেকে এসেছেন (আসার তারিখ) কিনা। (৭) শিক্ষাগত যোগ্যতা—মোট নম্বর, প্রাপ্ত নম্বর, শতকরা নম্বর, ডিভিশন, ক্লাস প্রভৃতি উল্লেখ করে সার্টিফিকেট, মার্কশীটের প্রত্যয়িত নকল দিতে হবে। (৮) কারিগরি যোগ্যতা (৯) পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে বিশদ বিবরণ (১০) প্রার্থী বর্তমানে সরকারী চাকরে কিনা, যদি হন তাহলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।

(১২) অন্যান্য যোগ্যতা—খেলাধুলো, সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ প্রভৃতিতে যোগদানের ঘটনা যদি থাকে তার উল্লেখ করতে হবে। (১৩) প্রার্থীর স্বাক্ষর ও তারিখ।

উপরের তথ্যগুলি দিয়ে ফরম ৭ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে চীফ অডিটর এন-ই রেলওয়ে গোরখপুর ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

রেঞ্জার্স কোর্সে ভর্তির পরীক্ষা আগামী অকটোবর মাসে গৃহীত হবে। যাঁরা এই লাইনে নিজের রেজিয়ার তৈরী করতে চান তাঁরা বিশেষভাবে মনে রাখবেন আগামী ৭-৯-৭৬ তারিখের মধ্যে অবশ্যই আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।

এই কোর্সে ভর্তির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা দরকার ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্স বা অনুরূপ শিক্ষা। অঙ্ক পদার্থবিজ্ঞান রসায়নবিদ্যা প্রাণী বিদ্যা অথবা উদ্ভিদ-বিদ্যা যে কোন দুটি বিষয় নিয়ে অবশ্যই পাশ করা চাই। উচ্চতা হবে ১৬৩ সেঃ মিঃ এবং বুকের মাপ হবে ৭৯ সেঃ মিঃ থেকে ৮৪ সেঃ মিঃ। বয়স গেন ১-৪-৭৭ তারিখে ১৮ থেকে ২৪ বছরের বেশী না হয়। নর্দার্ণ ইণ্ডিয়া ফরেস্ট রেঞ্জার্স কলেজ দেরাদুনে এই কোর্সে মোট ২০ জন প্রার্থীকে নেওয়া হবে। দু টাকা মণিঅর্ডার করলে সচিব বিভাগ সংখ্যা ৫৮।ই—৭৬ লোকসেবা আয়োগ ইউ-পি এলাহাবাদ-এর কাছ থেকে আবেদনপত্র পাওয়া যাবে। নির্দিষ্ট পূরণ করা ফরম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবশ্যই সচিবের নিকট পৌঁছান চাই।

দি ন্যাশনাল স্মল ইণ্ডাস্ট্রিস কর্পোরেশন লিমিটেড পূর্বাঞ্চলের তরুণ এঞ্জিনিয়ারদের স্বনিযুক্ত প্রকল্পে উৎসাহিত করার জন্য ইন্দো-জাপানিজ প্রোটোটাইপ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ট্রেনিং সেণ্টার, পোঃ বালটিকুরি, জেলা হাওড়ায় শিল্পউদ্যোগ বিষয়ে এক পুরো সময়ের ট্রেনিং কোর্সের ব্যবস্থা করছেন। এই কোর্সে নতুন শিল্প গঠন, পরিচালনা, শিল্পউদ্যোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সহায়তা এবং শিল্পশিক্ষা ভ্রমণের ব্যবস্থা ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে। ট্রেনিংকাল পুরো তিন মাস। শুধু হবে মাত্র ত্রিশজনকে। যাঁরা মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক এঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী বা ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত অথচ বেকার, কিন্তু ১-১-৭৩ তারিখের পরে পাশ করেছেন এবং পূর্ব ভারতের পশ্চিমবঙ্গ বিহার উড়িষ্যা আসাম, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস করছেন, তাঁরাই আবেদন করতে পারবেন। তিনটি আসন তপশীলদের জন্য সংরক্ষিত। যদি এমন কেউ থাকেন যিনি গত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে দৈহিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কিংবা কারো পরিবারে গত যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন সেই সব প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তাঁদের ইউনিট কমান্ডারের মারফৎ আবেদন করতে হবে।

যাঁরা নিজেদের কোন প্লান বা প্রজেকট নিয়ে কাজ শুরু করতে চান কিন্তু বেকার, তাঁরা সাদা কাগজে টাইপ করে নীচের সব তথ্য দিয়ে আবেদনপত্র ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ট্রেনিং সেণ্টারে পাঠিয়ে দেবেন। (১) পুরো নাম (ইংরেজী ক্যাপিটাল অক্ষরে) (২) বাবার নাম (৩) বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা (ইংরেজী ক্যাপিটাল অক্ষরে), (৪) জন্মতারিখ (৫) যোগ্যতা (৬) শতকরা নম্বর (এঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা পরীক্ষায়) (৭) যে সালে পাশ করেছেন (৮) জাতীয়তা (৯) কোন রাজ্যে বাস করেন (১০) তপশীলভুক্ত জাতি-উপজাতি ইত্যাদি কিনা। সেই সঙ্গে নিজের প্লান ও প্রজেকট সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানাতে হবে। সাড়া পেলে প্রার্থীদের নিজেদের খরচে ইণ্টারভিউ দিতে আসতে হবে। ট্রেনিংকালে সবশুদ্ধ ২৫০ টাকা স্টাইপেণ্ড দেওয়া হবে।

শ্রীনগর দূরদর্শন কেন্দ্র একজন জুনিয়র স্টেনোগ্রাফার চাইছেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা ম্যাট্রিকুলেশন অথবা তার সমতুল্য। মিনিটে একশ' শব্দ শর্টহ্যাণ্ডে লিখতে ও ৪০টি শব্দ টাইপ করতে পারা চাই। প্রার্থীকে অবশ্যই তপশীলী হতে হবে। বয়স ১৮ থেকে ২৫-এর মধ্যে। বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, জাতি প্রভৃতি উল্লেখ করে সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকলসহ আবেদনপত্র ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ডিরেকটর, দূরদর্শন কেন্দ্র, শ্রীনগর ঠিকানায় পাঠাতে হবে। আকাশবাণী বা দূরদর্শন কোনো কেন্দ্রে কোনো আত্মীয় কাজ করেন, তাহলে সে-বিষয়ও উল্লেখ করতে হবে। ইণ্টারভিউতে ডাকা হলে ভ্রমণভাতা দেওয়া হবে। সরকারী কর্মীকে আইনানুগ পদ্ধতিতে দরখাস্ত করতে হবে।

ঋতবিহ

কথায় কথায়

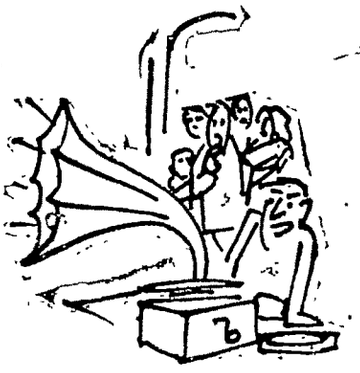

ক্রস্ কানেকশন

'বর্ষার শেষে যখন দূর্বাঘাস খুব সতেজ হয়ে ওঠে তখন এই ঘাসগুলো গোড়া সমেত তুলে আনতে হবে। তারপর জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে কাদামাটি ছাড়িয়ে নিতে হবে, নিয়ে ঘাসের বীচিগুলি আলাদা করে ফেলতে হবে। এইরকমভাবে এক ছটাক ঘাসের বীচি সংগ্রহ হয়ে গেলে, সেটা ভালো করে খটখটে রোদ্দুরে শুকিয়ে নিতে হবে, ভাদ্রমাসের রোদ্দুর হলেই খুব ভালো। সেই শুকনো বীচি ভালো করে কর্পূর দিয়ে মাখিয়ে গরম জলে কাঁচা হলুদের সঙ্গে এক ঘন্টা টগরগিয়ে ফুটিয়ে নিতে হবে, যখন জল সম্পূর্ণ মরে যাবে তখন কাঁচা হলুদ ও দূর্বাঘাসের বীচির এই মিশ্রণ তিন দিন পরে শিল-নোড়ায় মন্থন করে কাদা-কাদা করে প্রলেপ বানাতে হবে। এই প্রলেপ কৃষ্ণা একাদশীর সন্ধ্যায় মাথা নেড়া করে মাখাতে হবে, পাগলামি বা উন্মাদ-রোগের প্রথম স্টেজে অব্যর্থ ওষুধ এই ঘাস-হলুদের কবাথ্।'

এই টোটকা ওষুধটি বলা যেতে পারে প্রায় স্বপ্নাদ্য। আমি ঠিক স্বপ্নে পাইনি, এ ধরনের স্বপ্ন দেখার আমার অভ্যাস নেই কিন্তু আমি টেলিফোনে ক্রশ-কানেশনে এই টোটকার বিবরণটি পেয়েছিলাম। আলোচ্য বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ বুঝতে পেরে (আমার ফোনে আলাপচারী দুই অনুপ্রবেশকারী এদের কিছু বুঝতে না দিয়ে এবং বাধা না দিয়ে) আমি সঙ্গে সঙ্গে পেন্সিল দিয়ে কাগজে টুকে নিই।

এই রকম আরো বহু জিনিস এবং জিনিসের সন্ধান আমি টেলিফোনে ক্রশ-কানেকশন মারফৎ পেয়েছি। এই ক্রশ-কানেকশনের দয়াতেই আমি জানতে পারি যে চীনে রেস্তরার রাঁধুনিরা কেউই চীনে নয়, কলকাতায় সবচেয়ে সস্তা কাঁঠাল পাওয়া যায় খিদিরপুর বাজারে এবং কালীঘাট পার্কের পিছনে এক বাড়িতে এক অন্ধ বৃদ্ধের কাছে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচের দুটি টিকিট কোনো অজ্ঞাত কারণে রয়েছে।

স্বীকার করা উচিত, আমি প্রত্যেকবারই এইসব ফোনলব্ধ জ্ঞান যথাসাধ্য নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। এবং দু-একবার উপকৃতও হয়েছি।

ফলে অন্যান্যেরা টেলিফোনে ক্রশ-কানেকশন হয়ে গেলে যতটা উত্তেজিত হয়ে যান, আমি তা হই না। আমি যথাসাধ্য ধৈর্য ধরে, ও'ৎ পেতে অপেক্ষা করি।

অবশ্য এই ব্যাপারে আরো একটা বড় কারণ আছে। ক্রশ-কানেকশনে অপর ব্যক্তি-দ্বয়ের কণ্ঠস্বর শোনা মাত্র সবাই যেমন পাগলা বেড়ালের মত ফুঁসে ওঠেন, আমি যে তা উঠি না, তার মানে এই নয় যে, আমি অন্যান্যদের চেয়ে ধৈর্যশীল বা বেশি সহনশীল। আসলে আমার অসুবিধে হলো আমার নিজের বীভৎস গলা। এর আগে বহুবার বলেছি এবং প্রায় সকলেই জানেন যে আমার গলার স্বর যে একবার শুনেছে সে কখনোই ভোলে না, ভোলা সম্ভব নয়। ফলে এই সংকীর্ণ মহানগরে আমার পক্ষে গলাবাজি করা ভীষণ কঠিন।

কতবার যে জব্দ হয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। যেই গর্জন করে উঠেছি, 'এই চোপ, টেলিফোন রেখে দিন বলছি,' আগে আমাদের কথা বলতে দিন।' সঙ্গে সঙ্গে অপর দৈবতকণ্ঠের একটি বঙ্কিম হাস্যে আমাকে বিদ্রূপ করে উঠেছে কি হচ্ছে তারাপদবাবু আর কতদিন এইসব চলবে।'

কি সব চলবে, কি সব চলছিলো—সে সব নিয়ে জবাব দেবার আগেই আমার হাত থেকে একা একা টেলিফোন ঘটাং করে পড়ে যায় আমি রীতিমত ভয় পেয়ে যাই অপরিচিত ব্যক্তির শুধু আমার গলার স্বর চিনে আমাকে ধমকানোয়।

কিন্তু শুধু ভয় পাওয়ার জন্যে নয়, যে যাই বলুক, ক্রশ-কানেকশন আমার ভারি ভালো লাগে, আমি ভাবি আমোদ পাই এতে। তবে সবাদন ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকে না, এমন দিন যায়, সারাদিন ধরে প্রাণান্ত চেষ্টা করেও একটিও ক্রশ পাই না। শুনতে পাই না, বড়বাজারের গোপন সলাপরামর্শ, উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের করুণ সংলাপ কিংবা পরকীয়া প্রেমের আদি রসাশ্রিত প্রণয়কাব্য। এমন বিনিপয়সার নাটক শোনার সুযোগ না পেয়ে যেসব দিন ক্রশ পাই না, আমার মন খিঁচড়ে থাকে। সেই সময় কেউ আমাকে যদি ফোন করে খেপে গিয়ে যেসব কথা শুনবো বলে ক্রশে কান পেতে বসেছিলাম, সেই সব কথা তাকে শুনিয়ে দিই।

আসলে আমার সোজা কথা হলো আমি ক্রশ-কানেকশনের ভক্ত, ক্রশ-কানেকশন পেলে আমি আহ্লাদিত হই, উত্তেজিত হই যার সঙ্গে কথা বলছিলাম বা বলতে যাচ্ছিলাম সে যত দরকারি কথই হোক না কেন তাকে ফেলে রবাহূত আগন্তুকদের কথা শুনি।

কেউ হয়তো প্রশ্ন করবেন, এমন কি কখনোই হয় না যে এমন জরুরি কথা বলার আছে যে ক্রশ-কানেকশন যতই রোমান্টিক বা নাটকীয় হোক, সেটিকে উপেক্ষা করেই বলতে হবে।

হ্যাঁ, তা হয় এবং এসব ক্ষেত্রে আমার কোনো অসুবিধাই হয় না। জরুরি কথার মধ্যে যেই অপর দুই ব্যক্তির আলাপ ঢুকে পড়ে, আমি আস্তে গলার স্বর নামিয়ে বলি, 'হ্যালো, ট্রাংক, টেলিফোন রেখে দিন, জরুরি ট্রাংক-কল আছে।' আর কিছু বলতে হয় না, পরপর দুটো খটাং করে শব্দ হয়, আমার প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয় টেলিফোন নামিয়ে ট্রাংকের জন্যে প্রতীক্ষা করতে থাকেন। তবে কখনো কখনো একটা অসুবিধা হয় আমি যার সঙ্গে কথা বলছিলাম তিনিও দুম করে টেলিফোন নামিয়ে ফেলেন, কিন্তু তিনি যদি এত বোকা হন, এবং আমার কণ্ঠস্বরও বুঝতে না পারেন, তা হলে কি আর করা যাবে?

তারাপদ রায়

পেখম পেবাস

উপন্যাস

বুদ্ধদেব গুহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জন বলল, যা হয় একটা ঠিক করা হোক। বাস থেমে থাকলে ত আর হোয়ার চলবে না সারারাত—আমরা কি এই ক্রেনার পাসের উপরে ঠাণ্ডায় জমে মারা যাব?

আর, এ. এফ-এর সাহেব বলল, মেয়েদের খুব ক্ষিদে পেয়েছে. কেউ চা পর্যন্ত খায়নি বিকেলে, বাসটাকে কোনোক্রমে পাশের গলিতে ঢুকিয়ে একটা চায়ের দোকানের সামনে অন্ততঃ আপাতত নিয়ে যাওয়া যাক।

ইংরেজ পুরুষগুলো ভারী সেয়ানা। যা-কিছু দয়া-ফয়া, ফেভার-টেভার চায়; সব মেয়েদের নাম করে।

বাস থেকে আমি একবার নেমে ছিলাম, একটু বরফের উপর হাঁটার শখ হয়েছিল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। একটুখন পরই আবার বাসের গরমে ফিরে আসতে বাধ্য হলাম।

জন, এয়ারহোস্টের সাহেব, এবং আমি মিলে আলোচনা করে ঠিক করা হল, সারা দিনের যাত্রার পর আবার সারারাত বাস চালিয়ে গিয়ে ইটালী পৌঁছনোর চেষ্টা করাটা খুবই ঝুঁকি নেওয়া হবে।

জন বলল, তাছাড়া জ্যাক সারা দিনে আইনমাফিক যতখানি চালানো সম্ভব প্রায় চালিয়েছে। এরপর সারারাত চালানো বে-আইনী হবে।

আমার জানা ছিলো না যে এরকম আইন কোথাও আছে। আছে জেনে ভাল লাগল।

জ্যাক বাসটা ব্যাক করে নিয়ে পাশের গলিতে ঢুকলো। সেখানে পর পর অনেকগুলো দোকান, রেস্তোঁরা।

এ্যালাস্টার বলল, আপনারা চা-টা খেয়ে নিন এখানে। আমি ততক্ষণে ব্রাসেলসে সারার ফোন করে দেখি, যোগাযোগ করতে পারি কিনা।

আগেই বলেছি, পশ্চিমী দেশে ফোনে এ প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি ফোনে যোগাযোগ করাটা কোনো ব্যাপারই নয়। এরিয়া-কোড ঘুরিয়ে নাম্বার ডায়াল করলেই হল। ডায়রেক্ট ডায়ালিং পৃথিবীর এদিকে সর্বত্র। এখন কসমস কোম্পানীর ইয়োরোপীয়ান বস যেখানে পার্টিতে গেছেন সেখানকার ফোন নম্বর পেলেই ঝামেলা মিটে যায়।

বাইরে তখন বরফ পড়া থেমে গেছে কিন্তু টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হয়েছে।

বাস থেকে নামতেই মনে হল ঠাণ্ডায় কে যেন কান কেটে নিয়ে গেল। নেমেই, সামনে দেখি, একটা বার ও রেস্তোঁরা। প্রায় সাতটা বাজে। অন্যান্য দিন এমন সময় আমরা ডিনারে বসে যাই। ক্ষিদেও পেয়েছে।

বার-এ সার সার ওয়াইন, লিকুওর, হুইস্কী, শ্যাম্পেন ইত্যাদির বোতল সাজানো আছে। হঠাৎ একটু বজ্জাতী করে গরম হওয়ার ইচ্ছে গেল। এমন সময় দেখি, আমার পিছনে সারা। জিনের গ্লেয়ার, জিনের শার্ট আর তার উপরে একটা বুক-খোলা হাত-ওয়ালা সোয়েটার পরে। বাস থেকে নেমেই অবশ্য সোয়েটারের সবকটা বোতাম বন্ধ করে নিয়েছে।

সারা বলল, হাই।

আমি বললাম, হ্যালো!

বাস থেকে নেমে এটুকু এসেই মেয়েটার ঠোঁট নীল হয়ে গেছে ঠাণ্ডায়।

বললাম, কেয়ার ফর আ ড্রিঙ্ক?

সারা আমার দিকে তাকাল, তারপর স্বরূপ পরিচিত আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আই উডনট মাইন্ড।

আমি বললাম, কি খাবে?

ও বলল, কনিয়াক।

আমরা দুটো কনিয়াক নিলাম।

এখন ডিনারের ব্রেক নয়। তাছাড়া পয়সা যখন দিয়েছে টুওর কোম্পানীকে তখন ক্ষিদে পেলেও নিজের পয়সায় ডিনার খাবে এমন ইচ্ছা কারোরই দেখা গেল না। এমতাবস্থায় গরীব ইণ্ডিয়ানের পক্ষে কপির স্যুপ এবং আলুসেদ্ধর শুটি সেদ্ধ খাওয়াটাও বড়লোকী বলে গণ্য হবে হয়ত। তাছাড়া, সবইকে ফেলে একা একা খাওয়াটা অশোভনও বটে। কনিয়াকটা শেষ করতে না করতে এ্যালাসটার এসে খবর দিল যে, যোগাযোগ করা যায়নি; কিন্তু জোর চেষ্টা চলছে। অতএব আমি আর সারা আরেক একটা করে কনিয়াক গিলে বাসে ফিরে এলাম। অন্যান্যরাও কেউ চা, কেউ কফি কেউ টকাস করে একটু স্ন্যাপস খেয়ে বাসে ফিরে এসেছেন।

বাইরে বৃষ্টি জোর হয়েছে। বাসের কাঁচে পিটির পিটির করে ছাট লাগছে। স্টোয়ারটা দাঁড়ানো অবস্থায় অনেকক্ষণ চলেছে বলে জ্যাক বন্ধ করে দিয়েছে এখন নেতা জনের নির্দেশে। বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। কোটের কলার তুলে, হাত পকেটে ভরে হেলান দিয়ে বসে আছি। বাইরে রাত নেমে এসেছে। কাঁচে বৃষ্টির জল গড়ায় বাইরে বিশেষ কিছু দেখা যায় না। বরফের সাদা, প্রতিফলিত আলো, বড় রাস্তায় তাড়া করে থাকা গাড়িগুলো সব মিলিয়ে মাথার মধ্যে এক অসংলগ্ন ভাবনার ট্রেন চলেছে ধীরে ধীরে ক্লান্তির টানেলের মধ্যে দিয়ে। হঠাৎ জনের শালা বলে উঠল, লুক জন! আই টোল্ড উ, জার্মানী উইল ফাইন্যালী গেট আস।

আমি হেসে উঠলাম।

জনও হেসে উঠল। অন্য অনেকেই হাসলেন।

জন আমাকে বলল, দিস ব্লাইটার অফ আ ব্রাদার-ইন-ল কান্ট ফরগেট হিজ ইয়ারস ইন দ্যা ওয়ার।

বয়সবোধ আছে শালাবাবুর! যুদ্ধের সময় হেলমেট মাথায় দিয়ে চুইংগাম চিবোতে

চিবোতে হাওয়াইটজারের আলোয় আলোকিত আকাশে তাকিয়ে ভয়ার্ত গলায় এই কথাই অনেকবার মনে মনে বলেছে বাবু। আজ জার্মানীতে সত্যি এসে, তুষারাবৃত ট্রেনার পাসের সামনে ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় বাসের মধ্যে বার্ধক্য ও অসহায়তার মধ্যে বসে তাই বুঝি পুরনো কথাটা মনে পড়ে গেছে এমন করে।

মেয়েরা অনেকে ঘুমোচ্ছেন। পিছনের সীটে এয়ারফোর্সের পাপা তার পাতলা মেয়েদের সঙ্গে সমানে বকে চলেছে। মেয়েগুলো এক গামলা কইমাছের মতো খলবল খলবল করছে। চাইনীজ, ইস্রায়েলী মালয়েসীয়ান, কেনীয়ান, অস্ট্রেলীয়ান একগাদা মেয়ে একসঙ্গে কথা বললে ঠিক জলতরঙ্গের মত আওয়াজ হয়।

এমন সময় জ্যাক তড়াক করে দরজা খুলে ভিতরে এসে মহাসমারোহে বাও করে বলল—প্রবলেম—ফিনি...।

জ্যাক ইংরিজীর মধ্যে থ্যাংক য়্যু; প্রবলেম; নো প্রবলেম; গুড; ব্যাড এবং মাদাম; মিস্টার এই কটা কটা জানত। কিন্তু এই সামান্য কটি কথা সম্বল করে চোখমুখের অভিব্যক্তি দিয়ে সে যেভাবে কথা বলত বহু ভাষাভাষী সর্বজ্ঞ হয়েও তেমন করে বলা যায় না।

সকল আনন্দে হৈ হৈ করে উঠলেন। শীতের লম্বা রাত অভুক্ত শয্যাহীন অবস্থায় কি করে কাটানো হবে এই চিন্তা সকলকেই কম বেশী পেয়ে বসেছিল। এমন সময় এ্যালাসটার এল।

মাইক্রোফোনে বলল, ব্রাসেলস-এর সঙ্গে কথা হল। এ যাত্রা আমদের ইটালী যাওয়া হবে না। আমরা আবার কেম্পটেনে ফিরে যেখানে দুপুরে খেয়েছিলাম—সেই অষ্ট্রিয়ান হোটেলওয়ালার সুন্দরী ইংরেজ স্ত্রীর হেপাজতে ফিরে যাব। ওখানেই খাওয়া দাওয়া করে দু-তিনটে হোটেলে ভাগ করে শুয়ে পড়ব। সকালবেলা ব্রেকফাস্টের পর দশটা নাগাদ কনফারেন্স করে পরবর্তী গন্তব্য ঠিক করে নিয়ে আবার পথ চলা শুরু হবে। জ্যাক বাসটা স্টার্ট করল। আবার বোঝাবার চলতে শুরু করল। বাসটা মুখ ফেরাল কেম্পটেনের দিকে।

বেশ কদিন পর সকাল নটা অবধি পালকের লেপ গায়ে দিয়ে ঘুমুনো যাবে এ একথা ভেবেই আরামে আমার ঘুম পেয়ে গেল। বাস চলতে লাগল হু-হু করে। ভেতরের বাতি নিবিয়ে নাইট লাইট জ্বালিয়ে দিল এ্যালাসটার। ভোর ছটায় চলা শুরু হয়েছে আর এখন রাত প্রায় সাড়ে নটা। কারোরই আর জেগে থাকার ইচ্ছা বা জোর ছিলো না।

পুরো বাসে বোধহয় ড্রাইভার জ্যাক গাইড এ্যালাসটার নেতা জন এবং আমি জেগে রইলাম।

সকলে যখন ঘ করে আমার তখন ঠিক তার উল্টোটা করতে ইচ্ছে করে চিরদিন। বরফ-ঝরা নির্জন হিমেল রাতের জার্মানীর রাতের গ্রামের রূপে চোখ ডুবিয়ে বসে রইলাম।

সকালে বলাবাহুল্য আমার উঠতে দেরী হয়েছিল।

ব্রেকফাস্ট করে বাইরে একে দেখি ঝকমকে রোদ। চারিদিকে বৃষ্টিপাত ঘর বাড়ি পথঘাট—চমৎকার দেখাচ্ছে।

কনফারেন্স যত সহজে শেষ হবে ভাবা গেছিল তত সহজে হল না। প্রবল আপত্তি উঠল নানা তরফ থেকে। নানা মুনির নানা মত। অনেকেই জ্যাক ও এ্যালাসটারের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করতে লাগল যেন ওরাই ট্রেনার পাসের উপর নিজে হাতে গামলা গামলা বরফ ঢেলে আমাদের ইটালী যাওয়া ভন্ডুল করেছে।

আগেই বলেছি, জনগণ সর্বত্র এক। পাঁচমিশেলী লোকে ভরা। নয়াপয়সা দিয়ে টাকা ওশুল করার মনোবৃত্তিটা শুধু আমাদেরই একচেটিয়া নয় দেখে মনে মনে আত্মশ্লাঘা বোধ করলাম।

শেষে মেজরিটী ডিসিশান মানতেই হল অবশ্য এই ডিসিশান মানাতে জন এবং আমার অনেক মেহনত করতে হল। সেই মুহূর্তে আমাদের সেই গোল হয়ে দাঁড়ানো কনফারেন্স দেখলে যে কেউ মনে করতে পারত যে এর মধ্যে স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ এবং গান্ধীজীও আছেন।

উত্তেজনা প্রশমিত হলে বাস ছাড়ল জ্যাক।

বাঁ হাতের পাঁচ আঙ্গুল তুলে আমাদের দিকে দেখিয়ে বলল, নো প্রবলেম।

দেখতে দেখতে আমরা অষ্ট্রিয়ার বিখ্যাত টীরল, এভিন্স-এ এসে পৌঁছোলাম। এই প্রদেশের নামেই লানড়ানের বেইজওয়াটার স্ট্রীটের সেই অষ্ট্রিয়ান রেস্তোঁরা—টীরলার হুট্। যার কথা আগে বলেছি। পথের দৃশ্য যে কী সুন্দর তা বলার নয়। চতুর্দিকে বরফ বরফ—পাহাড়গুলো পা অবধি বরফে ঢাকা—উপত্যকা-গাছপালা-পথের পাশের সবকিছু বরফে ঢাকা। সব সাদা। রাতে বরফ পড়েছে—এখন আস্তে আস্তে গলে যাচ্ছে। অটোবান দিয়ে এক জোর ও এত বেশি সংখ্যক গাড়ি যায় সব সময় যে পথটা ভিজে থাকার অবকাশ পায় না—গাড়ির চাকায় চাকায় শুকিয়ে যায় নিমেষে।

ডান দিক দিয়ে ইন্ নদী বয়ে চলেছে পথের পাশে পাশে। ভারী সুন্দরী ছিপছিপে নদী। অনেকটা আসামের ও ভুটানের সীমানার যমদুয়ারের কাছের সংকোষ নদীর মতো।

যেখানে বরফ পড়ে নেই সেখানের দৃশ্য যেন আরো সুন্দর। কী যে নয়নভোলানো সবুজ, তা বলার নয়। চতুর্দিকে আল্পস্ এর বরফাবৃত শ্রেণী।

আসটগ বলে একটা গ্রামের পাঁচতলা হোটেলে আমরা দুপুরের খাওয়া খেলাম। কাছেই স্কি-লিফ্ট ও স্কি-ক্লাব আছে অনেক হোটেলটার মধ্যে সনা বাথ, হিটেড সুইমিং পুল সব আছে। আশেপাশে কাছাকাছি কোনো শহর নেই। এখনও এখানে ভীষণ তেমন জমেনি—কারণ স্কীইং-এর সময় এখনও শুরু হয়নি এখানে। বরফ এখন এখানে যা পড়েছে তা স্কীইং করার উপযুক্ত নয়। কিন্তু তবুও কিছু কিছু অত্যুৎসাহী লোক এসে জড়ো হচ্ছে। নারী পুরুষ সাউন্টেনীয়ারিং-এর উজ্জ্বল লাল নীল পোশাক পরে হেঁটে বেড়াচ্ছে জোড়া জোড়ায়।

(ক্রমশঃ

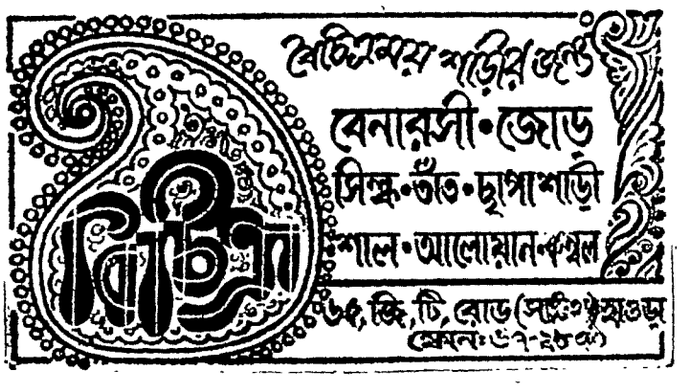

মনের অসুখ

(ষোল)

—This thought is as a death,
which cannot choose
But weep to have that which it
fears to lose.
—Shakespeare

কল্পনাকে নিয়ে বাড়ীর লোকেরা খুবই মুস্কিলে পড়েছেন। সে আজ মাস দুয়েক হলো হাসছে, কাঁদছে, মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে আপনমনে কি যেন বলছে। কেন হাসছে, কেন কাঁদছে, কি বলছে, কেউই কিছু বুঝতে পারছেন না। কোনো কথার জবাব তার কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ মানুষ চিনতে পারছে, খেতে দিলে খাচ্ছে, দরকারমত বাথরুমে যাচ্ছে। বাড়ীর ডাক্তারের ওষুধে গত কয়েক রাত ঘুম হচ্ছে, কিন্তু অন্য কোনো দিকে কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। প্রথমটায় এ-নিয়ে মা-বাবা বিশেষ উদ্বিগ্ন হননি। ভেবেছিলেন—কোনো কারণে বোধ হয় মন খারাপ হয়েছে, দু-চারদিনে আবার আগের মত স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কিন্তু অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যেতে তাঁরা ভয় পেয়ে হাতুড়ে বদ্যি, জ্যোতিষী, রোজা, ইত্যাদি সব রকমের বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিয়েছেন; সকলেই নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী দাওয়াই বাতলেছেন; সব রকম দাওয়াই ও টোটকাটুটকি দিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু ফল পাওয়া যায়নি। এ-সব ব্যাপারে ডাক্তারের সাহায্য সাধারণত সব থেকে শেষে চাওয়া হয়; এ-ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ডাক্তার বলেছেন —এ এক ধরনের মনের অসুখ, মনের রোগের ডাক্তারের কাছেই যাওয়া উচিত।

কল্পনাকে নিয়ে এসেছেন তার দিদি, সঙ্গে বাড়ীর ডাক্তার। ডাক্তারবাবু প্রথমে প্রয়োজনীয় তথ্য ও ইতিহাস জানালেন।

কল্পনার বয়স তেইশ। বছর চারেক হল বিজ্ঞানে স্নাতক হয়ে কোলকাতা থেকে কিছু দূরে এক গ্রামের স্কুলে মাস্টারী করছে। স্কুলটি এখনও ভাল করে গড়ে ওঠেনি, মাইনেপত্র নিয়মিত পাওয়া যায় না, যা পাওয়া যায় তার পরিমাণও যৎসামান্য। কল্পনার বাবা দেবীবাবু একজন প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামী। প্রথম জীবনে কোনো বিপ্লবী পার্টির সভ্য ছিলেন, শেষে গান্ধীবাদে দীক্ষিত হন। অনেক বছর জেলে কাটিয়েছেন। দেশ স্বাধীন হবার পর একটু বেশি বয়সে বিয়ে করেন। স্ত্রীও স্কুলে পড়ার সময় ৩০।৩১ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। তিনিও জেলখানার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। স্বাধীনতা লাভের পর রাজনীতি ছেড়ে দেবীবাবু সরকারী গৃহ-নির্মাণের ঠিকাদারীর কাজ ও অন্যান্য নানা ধরনের ব্যবসা করার চেষ্টা করেন। কোনোটাতেই তিনি সফল হতে পারেননি। অসাফল্যের কারণ—তাঁর আদর্শনিষ্ঠা ও স্পষ্টবাদিতা। ব্যবসা-বাণিজ্যে সফলতা লাভ করতে হলে আদর্শ ও সততাকে সব সময় আঁকড়ে থাকা চলে না, মনের কথা সব সময়ে সব স্থানে প্রকাশ করা চলে না, কিছুটা আপোষ না করতে শিখলে জীবনযুদ্ধে টিঁকে থাকা যায় না—এই সহজ সত্য জীবনধারণের মূলনীতিগুলি তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও বুঝতে পারেননি। কাজেই ছেলে পড়িয়ে, একখানা টালির ঘরে দুই মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে তাঁকে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে দিন কাটাতে হয়েছে। এ ছাড়া নিয়মানুবর্তিতার ব্যাপারে তিনি ছিলেন বিশেষ কঠোর; তাঁর চরিত্রের সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচিতি থাকার দরুণ তাঁর স্ত্রী প্রায় সব ব্যাপারে একরকম মানিয়ে নিতে পেরেছেন। কিন্তু গোলমাল বেধেছে মেয়েদের নিয়ে। বড় মেয়ে কল্পনা বছর পাঁচেক আগে প্রায় বিদ্রোহ করেই ঘর ছেড়ে একটা মেয়েদের বোর্ডিএ আশ্রয় নিয়েছে। দেবীবাবুর পছন্দকরা পাত্রকে তার পছন্দ না হবার দরুণ দেবীবাবুর সঙ্গে বচসা হয় এবং তিনিই তাকে অন্য আশ্রয় খুঁজে নিতে বলেন। সরকারী পরিবার-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা বিভাগে একটা কাজ জুটিয়ে নিয়ে সে স্বনির্ভর হয়েছে। এই কাজ নেবার ব্যাপারেও দেবীবাবুর সঙ্গে কল্পনার মতবিরোধ ঘটে। এই পরিকল্পনা ব্যাপারটাতে তাঁর নৈতিক সমর্থন ছিল না, আর কল্পনার কাজটাকে তিনি নোংরা কাজ বলে মনে করেছিলেন। বর্তমানে অবশ্য কল্পনা এ-বাড়ীতে যাতায়াত করে এবং বাবাকে না জানিয়ে মায়ের হাতে মাসে মাসে কিছু টাকা দিয়ে যায়। কল্পনার কলেজে পড়ার খরচও সেই চালিয়েছে। তাঁর কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, স্পষ্টবাদিতা ও ক্ষেপন স্বভাবের জন্য পাড়ার কোনো লোকের সঙ্গে দেবীবাবুর বিশেষ সদ্ভাব নেই। বড়রা তাঁর নাম দিয়েছে 'বিশ্বামিত্র' আর ছেলেছোকরারা তাঁকে বলে 'জীবন্ত জীবাশ্ম' বা 'লিভিং ফসিল'। দেবীবাবু সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে হল। তার কারণ এই যে, কল্পনার অসুখের সঙ্গে তার পারিবারিক পরিবেশের বিশেষ সম্পর্ক আছে।

ডাক্তারবাবু দেবীবাবুর বন্ধুপুত্র, দেবীবাবুকে তিনি শ্রদ্ধা করেন। এদের পরি-

ঘরের অনেক কিছু খবর রাখেন। তাঁর কাছে আরো জানা গেল যে, কল্পনার বিয়ের ব্যাপার নিয়ে দেবীবাবু অনেকদিন ধরে চেষ্টা করেও এ-পর্যন্ত উপযুক্ত পাত্র খুঁজে পাননি। কল্পনা খুবই নম্র ও বিনয়ী, বাবার কোনো কথার কোনো প্রতিবাদ সে করে না। ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা খুব কম। তবে মেয়েদের মনের সন্ধান পাওয়া খুবই দুরূহ, তার স্কুলে কোনো ছেলে-মাস্টারের সঙ্গে তার ভাবসাব হয়েছে কিনা বলা ডাক্তারবাবুর পক্ষে সম্ভব নয়।

দিদির সঙ্গে ধীরপদে কল্পনা প্রবেশ করল। হাত ধরে এনে জয়ন্তী তাকে আমার সামনের চেয়ারে বসিয়ে দিল। মাথা নীচু করে স্থিরভাবে সে বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে ভ্রূ কুঁচকে সে বিড়বিড় করে কথা বলতে লাগল। জয়ন্তী একটু জোর গলায় জিজ্ঞাসা করল—কি বলছিস, জোরে বল। ডাক্তারবাবু শুনতে পাচ্ছেন না। কল্পনা—কল্পনা। —কল্পনা সাড়া দিল না। কিন্তু মুখভাবের পরিবর্তন হল। বিরক্তির চিহ্ন মিলিয়ে গিয়ে মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। এইবার মুখ তুলে একবার আমার দিকে তাকিয়ে আবার মুখ নামিয়ে নিল।

এতক্ষণে ওকে ভাল করে দেখার সুযোগ হল। শিশুর মত সরল মুখে বয়সের কোনো ছাপ পড়েনি। মুখ দেখে মনে হবে যে তার বয়স বড়জোর পনেরো-ষোলো। জয়ন্তী একটু বিরক্ত হয়ে এবার আরো উঁচু গলায় বলে উঠল : কি হয়েছে বল ডাক্তারবাবুকে। একটা বুগী নি'য় উনি কতক্ষণ বসে থাকবেন?

ইঙ্গিতে তাকে নিরস্ত করে আমি বললাম : ব্যস্ত হয়ো না। আমার তাড়া নেই। হ্যাঁ বলতো—তোমাদের কোনো কথাতেই ও-সাড়া দিচ্ছে না!

—হ্যাঁ, না, আচ্ছা, এই ধরনের এক অক্ষরের কি বড়জোর দু অক্ষরের কথা মাঝে মাঝে দু-একটা বলছে। সেও অনেক সাধ্য-সাধনার পর। আর ঐ দেখুন, আবার ভুরু কোঁচকাচ্ছে, একটু পরেই হাসবে; মাঝে মাঝে শব্দ করে হাসে। এবার সশব্দে হেসে উঠল কল্পনা, তারপরই আবার চুপ করে চোখেমুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়ে তুলল।

—একখানা চেয়ার টেনে এনে ওর পাশে বসে ফিসফিস করে কথা বলে দেখতো। মনে হয় উত্তর পাবে। মস্তিষ্কের কোষ নিস্তেজিত থাকলে মৃদু উদ্দীপকে সাড়া দিয়ে থাকে। জোরালো উদ্দীপকে আরো নিস্তেজিত হয়ে পড়ে।

জয়ন্তী একটু অবাক হয়ে আমার দিকে চোখ ফেরাল। তারপর আমার কথামত একটা চেয়ার টেনে ওর পাশে বসল। ও-তখন আবার মৃদু মৃদু হাসছে। মুখ নীচু, চোখ দুটো আধ-বোঁজা। ডাক্তারবাবু আমার কথা-মত বাইরে চলে গেলেন। একটা কাগজে তাড়াতাড়ি কতকগুলো প্রশ্ন লিখে জয়ন্তীর হাতে দিয়ে আমি একটু দূরে গিয়ে বসলাম। ফিসফিস করে দুজনে কথা বলতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কল্পনা এক-নাগাড়ে অনেকক্ষণ ধরে অনেক কিছু বলল। জয়ন্তী বিস্মিত হয়ে মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাতে লাগল। বাইরে গিয়ে ডাক্তার-বাবুকে বললাম : কল্পনাকে কয়েকদিন জয়ন্তীর সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করে দিন। ওদের বাবাকে যেমন করে হোক রাজী করাতেই হবে, না হলে আমার পক্ষে চিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব হবে না। তারপর ঘরে এসে কল্পনার দিকে তাকিয়ে মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে বললাম : তোমার সব কথা দিদির কাছে খুলে বলবে। আমি আর দিদি ছাড়া তোমার কথা আর কেউ জানবে না। তোমার বাবা-মা, এমন কি তোমাদের ডাক্তারবাবুকেও কোনো কথা বলা হবে না। তুমি দিদির কাছে নিশ্চিন্ত মনে সব কথা বলতে পার। দিদি তোমাকে ভাল-বাসে, সে তোমার সমস্যার একটা কিছু সমাধান ঠিকই করে দেবে।

দিন তিনেক পরে জয়ন্তীর মুখে কল্পনার মনের খবর জানলাম।

—আমি ভাবতেই পারিনি ডাক্তারবাবু যে কল্পনা এতদূর যেতে পারে। বয়সের তুলনায় ওকে যেমন ছোট দেখায়, আমি ভাবতাম বুঝি সব দিক থেকেই ও ঐরকম ছোটই রয়ে গেছে। বি-এস-সি পড়বার সময় একটি ছেলের সঙ্গে ওর ভাব হয়। ছেলেটি ঐ কলেজের ল্যাবরেটরীতে দিন-কতক কাজ করেছিল নাম শংকর। তারপর তাদের গ্রামে একটা স্কুল খোলে, সেই স্কুলেই মাস্টারী করছে কল্পনা। ওদের ভালবাসা অনেক দূর এগিয়েছে, সামনের মাসেই রেজিস্ট্রী হবার কথা। কিন্তু কি আশ্চর্য! আমরা এর বিন্দু বিসর্গও জানি না। বাবা-মাকে না হয় ভয়ে কিছু না বলতে পারে, কিন্তু আমাকে পর্যন্ত, ঘুণাক্ষরেও কিছু জানাল না। রাগে, ক্ষোভে প্রায় কেঁদে ফেলল জয়ন্তী।

—এ অবস্থাটা হল কেন? রেজিস্ট্রী করতে ভয় পাচ্ছে নাকি? বাবা-মায়ের অমতে বিয়ে করাটা যুক্তিযুক্ত হবে না মনে করছে বুঝি?

—কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি তো ওকে নানাভাবে উৎসাহ দিয়ে রেজিস্ট্রী করে ফেলতে বললাম। বাবা-মা শেষ পর্যন্ত মেনে নেবেন—এই আশ্বাস দিলাম। কিন্তু ও কোনো কথার জবাব দিল না। কাঁদতে লাগল। সন্দেহ হচ্ছে অন্য কোনো ব্যাপার আছে।

—ছেলেটি ফিরে যায়নি তো? তার মত পালটায়নি তো? ওরা কতদূর এগিয়েছে বুঝতে পারলে? অনেক ছেলেতো মেয়েদের বিপন্ন অবস্থায় ফেলে কেটে পড়ে!

—সে দিকটা আমি খুঁটিয়ে দেখেছি। এরকম ব্যাপার নিয়ে আমাকে মাঝে মাঝে ডিল করতে হয়। ঐদিক থেকে বিপদ হলে আমার কাছেই তো প্রথমে ছুটে যেত। না, আই আম শিওর, দিস ইজ নট ক্যাবিং'। ওর কিন্তু খানিকটা উন্নতি হয়েছে। আপনার কাছে একবার নিয়ে আসি, আপনি আর একবার দেখুন।

কয়েক দিন পরে জয়ন্তীর সঙ্গে কল্পনা আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। বেশ কিছুটা উন্নতি হয়েছে বোঝা গেল। স্বাভাবিক হাসি দিয়ে আমাকে শুভেচ্ছা জানাল। দু-চারটে আজে-বাজে কথার পর কাজের কথা তুলতেই কিন্তু ওর চোখমুখের ভাব বদলাতে লাগল। তখন শোফার দেহটা এলিয়ে বিশ্রাম করতে বললাম। অভিভাবনের ফলে কল্পনা তন্দ্রাচ্ছন্ন হল। তখন নির্দেশ দিলাম যে, ও-এবার দিদিকে ওর ভয়ের আসল কারণ ব্যক্ত করবে। কয়েকবার ঐ রকম নির্দেশ দিয়ে জয়ন্তীকে ওর সঙ্গে কথা বলতে বললাম। টুকরো টুকরোভাবে কল্পনা তার মনে কথা বলতে লাগল : আমার ভয় করছে, আমি ওকে ঠিক মত বিশ্বাস করতে পারছি না। কেন?.. ও-বোধহয় অন্য কাউকে ভালবাসে। কাকে? ঠিক বলতে পারব না। হয়তো মনীষাকে। মনীষা কে? স্কুলের নতুন একজন টিচার। আমার থেকে অনেক ভাল দেখতে। আমার চেয়ে বুদ্ধিও বেশি। শংকরকে স্কুলের ব্যাপারে সে অনেক বেশি সাহায্য করে। তারই চেষ্টায় এ-বছর বোর্ড থেকে আমরা 'রেকগনিশন' পাচ্ছি। আমার থেকে শংকরের কাছে তার দাম অনেক বেশি। ওরা হয়তো রোজ সন্ধ্যায় বাঁধের ধারে বেড়াতে যায়। আমি তো সন্ধ্যার আগে চলে আসি। মনীষা কোথায় থাকে? টালিগঞ্জে। আমার সঙ্গেই

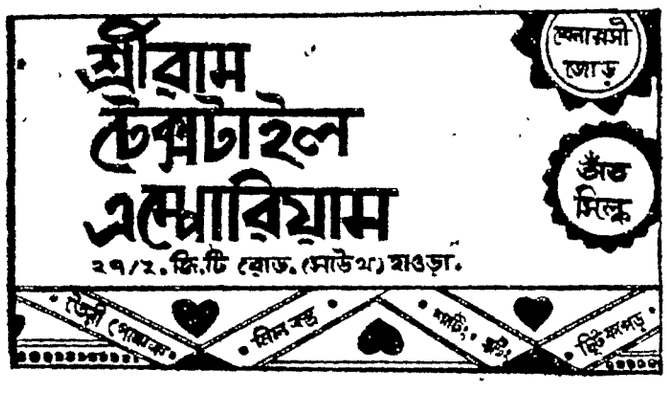

স্কুল থেকে বেরিয়ে আসে ঠিকই। কিন্তু আমার মনে হয়, আমি বাসে উঠলেই ও বোধ হয় আবার ফিরে যায়। ওর সঙ্গে শঙ্করের নির্জন বাঁধের ধারে দেখা করার কথা থাকে। এসব আমার সন্দেহ! আমার কল্পনা? কী জানি? হতেও পারে। আমি বোধ হয় মনীষাকে হিংসে করি। রোজ শাড়ী পালটায়, ম্যাচ করে ব্লাউজ পরে, জুতো থেকে ঘড়ির ব্যান্ড, চুলের ফিতে পর্যন্ত ম্যাচ করা। 'শি ইজ এ ফ্লার্ট' আর শঙ্কর একটা 'ফাপিশ ড্যানডী'—ওর ঐ ধরনের মেয়েই পছন্দ। তবে বেড়িস্ট্রীটা সেরে ফেলবার জন্য অত তাগিদ দিচ্ছে কেন? তাইতো! আমিও তো তাই ভাবি। বুঝতে পারি না। ও-ভাবে, ওর সঙ্গে বিয়ে না হলে আমি বোধহয় আত্ম-হত্যা করব। 'সুইসাইড' করতে যাব কোন দুঃখে। আমার বাবা-মা আমাকে কত ভাল-বাসেন। আমার বাবাকে সকলে চেনে, সকলে মানে, তিনি দেশের জন্য কত কী করেছেন। রাজবন্দী ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত বাবাকে চেনেন। শঙ্করের সঙ্গে বিয়ে না হলে আমি মরবও না, পাগলও হব না। কি বললি? ওকে আর ভালবাসি না! নারে না, খুব ভালবাসি, আগের মতই ভালবাসি। ওই বরং আমাকে ভালবাসে না। কি করে বাসবে? ও আজ চার বছর ধরে যা বলছে, আমি তাতে রাজী হইনি। ছিঃ বিয়ের আগে? ছিঃ। ছিঃ। সবাইতো মনীষার মত 'ফ্লার্ট' নয়, 'চীপ' নয়। কিন্তু আমার কি ভয় হয় জানিস? হয়তো স্কুলে গেলে ও আমাকে স্পষ্ট বলে দেবে—ও আমাকে চায় না। আমিও কি চাই? বাবা-মায়ের অমতে বিয়ে করলে সে বিয়ে টেকে না। আমি যদি বাবা-মায়ের আশীর্বাদ না নিয়ে বিয়ে করি, ও ঠিক কিছুদিন পরে আমাকে ছেড়ে মনীষাকে বিয়ে করবে। আমি তোদের না জানিয়ে পাপ করেছি, অপরাধ করেছি। বিয়ে করলে বাবা-মায়ের মনে আঘাত দেওয়া হবে। তুই বাড়ী থেকে চলে গেলে বাবা তিন মাস রাত্রে ঘুমোননি। উঠোনে সারা রাত পায়চারি করতেন।.. আমার কান্না পাচ্ছে রে, ভীষন কান্না পাচ্ছে। না, শঙ্করকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। ওকে মনীষার হাতে তুলে দিতে পারব না। কিন্তু বাবা-মাকে, বিশেষ করে বাবাকে ছেড়ে আমি বাঁচব না। আমার তোর মত মনের জোর নেই কেন রে? বাবা আমার পায়ে বেড়ি না পরিয়ে মনের দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছে। আমার মন নেই। তোরও তো মন নেই। তেড়েফুঁড়ে তো বেরিয়ে গেলি, কাউকে তো মন দিতে পারলি না। আমাদের উড়ে বেড়াবার ডানা নেই কেন? আমাদের উড়ে বেড়াবার ডানা নেই কেন? আজকের কত মেয়ে উড়ে বেড়ায় প্রজাপতি হয়ে। আমরা পারি না! আমি তোর মত বিদ্রোহ করতে পারব না। বাবাকে আমি ভয় পাই। আমার ভয় করছে, খুব ভয় করছে। আমি ভালবাসি না, ভয় করি।—কেটে কেটে কথাগুলো বলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল কল্পনা।

আমার কথামত কল্পনা শঙ্করের ঠিকানায় একখানা চিঠি পাঠিয়ে লিখেছিল সে যেন ওর সঙ্গে দেখা করে। সেই সঙ্গে কল্পনার অসুখের খবরও জানিয়েছিল। শঙ্কর চিঠি পেয়েই দেখা করল। তাকে খুবই উদ্বিগ্ন মনে হল। আমার প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল যে কল্পনাই প্রথম চিঠি লিখে তাদের গ্রামের স্কুলে চাকরী চায়। কিছু-দিনের মধ্যে দুজনের মধ্যে ভালবাসা জন্মায়। বাবার যে ওদের বিয়েতে অমত থাকতে পারে, আভাসেও এমন কথা কল্পনা কোনো দিন জানায় নি। শঙ্করের নানা রকমের সন্দেহ হত, ও কেন ওদের বাড়ীতে শঙ্করকে যেতে বলে না, ওর বাবার কাছে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব করার ব্যাপারে ও কেন বাধা দিয়েই চলেছে—এতদিনে বুঝতে পেরে শঙ্কর যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হল। আমার কাছে আসার আগে কল্পনার অফিসে গিয়ে তার কাছ থেকে ও শুনে এসেছে যে, এই বিয়েতে ওদের বাবা-মা খুব সম্ভব মত দেবেন না। অনেকক্ষন ধরে কল্পনার অসুখের কারণ, অসুখের প্রকৃতি, সারবার ও আবার হবার সম্ভাবনা প্রভৃতি নিয়ে ছেলেটির সঙ্গে আলোচনা চলল। ছেলেটি মোটামুটি বুদ্ধি-মান। সব ব্যাপার জেনে ওর কর্তব্য সম্পর্কে আমার পরামর্শ চাইল। আমি বললাম : তোমাকে কোনো পরামর্শ আমি দিতে পারি না। এই রোগ তোমাকে আগেই বলেছি, আবার 'রেকার' করতে পারে। এই 'হেবেফ্রেনিক' টাইপের স্কিজোফ্রেনিয়া কল্পনার মত ছেলেমেয়েদেরই হয়। 'হেবেফ্রেনিয়া' কথাটির মানে শিশু-মন কথাটা গ্রীক। কল্পনার বয়সের তুলনায় এখনও অনেকটা ছেলেমানুষ আছে। কঠোর নিয়মনিষ্ঠ, নীতিবাগিশ বাবার প্রভাবেই হয়তো তার মনের বৃদ্ধি ঘটেনি। তবে যদি ওর মনে আঘাত না দিয়ে ধীরে ধীরে ওকে বড় করে তোলা যায়, তবে অসুখের পুনরা-ক্রমণের সম্ভাবনা খুবই কম। স্বনির্ভর ও আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলতে পারলে অসুখ পুরোপুরি সেরে যেতে পারে। তবে এ-বিষয়ে কোনো রকম ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না। এখন তুমি কি সিদ্ধান্ত নেবে, তুমি ঠিক কর। হ্যাঁ, আর একটা কথা। মনীষা কে? কতদিন তোমার স্কুলে চাকরী করছে?

—মনীষা আমার পিসতুতো বোন। আমার ওখানে চাকরী ঠিক করছে না। কয়েক মাসের ছুটিতে স্টেট থেকে দেশে এসেছে। ওর স্বামী আর ও দুজনেই কালিফোর্নিয়ায় প্রশিক্ষণের ডকটরেট করেছে। ছুটির মধ্যে যতটা পারে আমাদের স্কুলটাকে দাঁড় করিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। ওর কথা কেন হঠাৎ। চেনেন না কি?

টেলিফোনের বিসিভার তুলে ডায়াল করতে করতে বললাম : ডিলিউশনেও ভুগছে কল্পনা। পরে বলব।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান

প্রধান সম্পাদক : ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ॥ সম্পাদক : শ্রীঅঞ্জলি বসু

বাঙলার সংস্কৃতি জগতের কোন-না-কোন ক্ষেত্রে উল্লেখ্য দান আছে এমন প্রায় সাড়ে তিন হাজার বাঙালীর জীবনচরিত। ৬৪৮ পৃঃ লাইনো হরফে ঝকঝকে ছাপা মজবুত বাঁধাই [৫০-০০]

তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ

সম্পাদক : অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য। তারাশঙ্করের সমগ্র ছোটগল্প [প্রায় ২০০] কালানুক্রমিক সাজিয়ে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। ১ম ও ২য় খণ্ড প্রকাশিত, ৩য় খণ্ড যন্ত্রস্থ। [প্রতি খণ্ড ৪০-০০, একত্রে অগ্রিম মূল্য ৮০-০০]

স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ শঙ্কর ঘোষ কর্তৃক উক্ত বিষয়ের তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা ২০-০০

প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য

ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ। সংস্কৃত ও ভারতীয় ভাষার সাহিত্য বিশেষভাবে আলোচিত [২৫-০০]

সংস্কৃত নাটকের গল্প

অধ্যাপিকা অমিতা চক্রবর্তী কর্তৃক ১০টি প্রাচীন সেরা সংস্কৃত নাটকের সাবলীল গল্পরূপ [৮-০০]

সাহিত্য সংসদ ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা—৯

নতুন বই

অন্য রবীন্দ্রনাথ। অমিতাভ চৌধুরী। অনন্য প্রকাশন। ৬৬ কলেজ স্ট্রীট। কলকাতা-১২। সাত টাকা।

ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাণ পুরুষ রবীন্দ্রনাথের এ এক অন্য চেহারার ছবি। অন্য রং তুলিতে আঁকা এ যেন কোন্ অন্য রবীন্দ্রনাথ। অতি পরিচিত কবি উপন্যাসিক সঙ্গীতকার কিম্বা প্রাবন্ধিক পরিচয়ের বাইরে এক নেপথ্য জগতে অমিতাভবাবু রবীন্দ্রনাথকে খুঁজেছেন ভিন্নতর পরিপার্শ্বে। যেখানে সেই বিস্ময়ের মানুষটি শাশুড়ির মন রাখতে চৈ দিয়ে কৈ মাছের ঝোল খান—টিপু আজ্ঞা পালনে মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়েও এবং নীতিগত সমর্থন থাকলেও বলেন্দ্রনাথের স্ত্রী কিশোরী বিধবা সাহানা দেবীর পুনর্বিবাহে বিরোধিতা করেন। উত্তরকালে নিজেরই পুত্রের বিবাহ দেন এক বিধবা আত্মীয়ার সঙ্গে। ব্রহ্মচর্য আশ্রমের অব্রাহ্মণ শিক্ষকের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার প্রশ্নে নেতিবাচক সমাধান করেন, আবার পরবর্তী সময়ে বিশ্বভারতী গঠনকালে এইসব ঠুনকো আচার-সংস্কার মূলে শুদ্ধু উপড়ে ফেলতে শক্ত হয়ে দাঁড়ান। কখনও দেখি শিলাইদহে পূণ্যাহ অনুষ্ঠানে হিন্দু মুসলমানের আসন ব্যবস্থার বৈষম্য চুকানোর কথা বলেন মানব-প্রীতির উদার অনুপ্রেরণায়।

শুধু কি তাই! 'অন্য রবীন্দ্রনাথ'-এ আরও কতই না অজানা ছবি দেখি। দেখি নিজেরই বিবাহ বাসরে রবি কবি নিজেই গান জুড়েছেন—আমার লাবণ্যময়ী, কে ও স্থির সৌদামিনী। কিম্বা রন্ধনরতা স্ত্রীর পাশে মোড়া নিয়ে বসে দিব্যি আটপৌরে মেজাজে নতুন নতুন রান্নার ফরমাশ করছেন। মুগের ডাল আর কুলির অম্বল ছাড়া বাঙালি দেশের আর কোন শাক সংগ্রহে না থাকা সত্ত্বেও শান্তিনিকেতন বাঙালি সভার সভাপতিত্ব করছেন।

এইসব আটপৌরে ছবিতে চোখ বুলোতে বুলোতে আবার কখনও সেই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কিছু কিছু গভীর ছবিও চোখে পড়ে। অমনি প্রশ্ন জাগে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সাহিত্য সঙ্গী জ্যোতিদাদার সঙ্গে শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক অত নিরুত্তাপ ছিল কেন? কেন জ্যোতিদাদা বাঁচিতে থাকার সময় রবীন্দ্রনাথ সেখানে কোনদিন যান নি? কেনই বা জ্যোতিদাদাও কোনদিন শান্তিনিকেতনে আসেন নি? শেষ পর্যায়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে দেখার জন্য আকুল হয়ে রাঁচিতে আসার আমন্ত্রণ জানানো সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ কেন সে আমন্ত্রণ রক্ষা করেন নি? এই জ্যোতিদাদারই সুর দেওয়া অন্তত পঁচিশটি গান রবীন্দ্রসঙ্গীত হিসেবেই প্রচলিত। সেই গানগুলির তালিকাও দেখা গেল। সম্ভবত অনেকেই এ তথ্যটি জানতেন না।

অমিতাভবাবু তাঁর অন্য রবীন্দ্রনাথ-এ এমনিভাবেই জোড়া আলখাল্লায় মোড়া ঋষিপ্রতিম চেহারার নেপথ্যে এক নতুন রবীন্দ্রনাথের ছবি খুঁজে পেয়েছেন। অন্যভাবে বলা যায় অনেক পয়াসে অবিষ্কার করেছেন তাঁকে। আমরা জেনেছি কবির জ্যোতিষচর্চার খবরাখবর, পোষাক-আশাক অন্যান্য দাদা দিদিদের কথা নতুন কথা স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কের কথা কাদম্বিনী দেবীর কথা পুষ্পোনারাগ ফরমাসী সংহিতা এমনি আরো কত কি!

কবি উপন্যাসকার গল্প লেখক সাহিত্য সমালোচক নাটককার ইত্যাদি পরিচয়ের বাইরে এক অন্য রবীন্দ্রনাথকে অন্তরঙ্গভাবে জানতে বইখানির ভূমিকা অপরিসীম। সরস ভঙ্গিতে লেখার ফলে কখনই গুরু ভারাক্রান্ত হয় নি। আগাগোড়া একটি হালকা চাল পাঠককে চমৎকার ভাবে আকর্ষণ করে। ছাপা এবং প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন।

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

কালের কবিতা : সম্পাদনা—শান্তনু দাস। দেজ পাবলিশিং।। মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৯।

বাংলা যাদের মাতৃভাষা তাদের হৃদয়ে কবিতা এই শব্দটির যেন এক মায়াবী স্পর্শ রয়েছে। নানা সমস্যার ভারে আক্রান্ত এই বাংলাদেশে অর্থনীতির টানাপোড়েনের স্রোত রাজনীতির ঘূর্ণিঝড় কিছুই কবিতার চিরায়ুষ্মতী রূপটিকে মলিন করতে পারে নি। আর কবিতার পাঠক হয়ত দেখা যাবে দূরতম পল্লীতেও কোন যুবক একাকী পড়ে যাচ্ছে তার প্রিয় কবির কবিতা।

বর্তমান সংকলনের সম্পাদক শ্রীশান্তনু দাস একজন পরিচিত তরুণ কবি। উপরন্তু এর আগেও তিনি দুটি জনপ্রিয় কবিতা সংগ্রহের সম্পাদনায় ব্যস্ত ছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা তাঁকে এবার আরও পরিণতভাবে কবি ও কবিতা নির্বাচনের সুযোগ দিয়েছে বোঝা গেল।

কালের কবিতা বলতে সম্পাদক এই বইতে সমসাময়িকতা ও বিস্তৃততর অর্থে রবীন্দ্র পরবর্তী আধুনিকতাকে বোঝাতে চান নি। তাঁর মতে কালের কবিতা যা টিকে ছিল টিকে আছে হয়তো বা টিকে থাকবে। সে জন্যই গ্রন্থ মধ্যে অনায়াসে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে ষাটের দশকের তরুণতম কবি। এই সংকলনটি কোন নির্দিষ্ট সময় ও দৃষ্টিকোণের প্রতিবিম্ব নয়, বরং বিভিন্ন মত ও পথাবলম্বীদের সমাহারে গড়ে ওঠা বৈচিত্র্যের স্বর্কেস্ট্রার পরিমণ্ডল। এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় মাইকেল মধুসূদন রচিত আত্মবিলাপ—যার মাধ্যমে আমাদের ক্ল্যাসিক আধুনিকতার জন্ম— কবিতাটি দিয়েও সংকলন শুরু হতে পারত। তবু রবীন্দ্রনাথই এই বইয়ের প্রথম কবি। কেননা শান্তনুবাবু হয়ত আধুনিকতার অন্যতম প্রধান চরিত্র জীবনানন্দ দাসের মতই বিশ্বাস করেন রবীন্দ্র কাব্যকে আধুনিকেরা—অন্তত আধুনিকদের একটা উৎকৃষ্ট পক্ষ সজাগভাবে বিস্মৃত হতে দিলেও অবচেতনায় তাঁরই কাব্যে রবীন্দ্রনাথ অনুভাবিত হয়ে এসেছে। বাংলা কবিতার জলহাওয়ায় অভ্যস্ত পাঠকদের পক্ষে এ মন্তব্য মেনে নেওয়াই স্বাভাবিক।

বইটির পাতা ওলটাতে ওলটাতে রবীন্দ্র-উৎস থেকে মুক্ত হয়ে পাই উপলব্ধির নজরুল এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে। তার তারই পরে প্রশস্ত উটযেথা। দেখা মেলে মগ্ন চৈতন্যের জীবনানন্দের কিম্বা ঈষৎ দার্শনিক সুধীন্দ্রনাথ অথবা প্রখর সামাজিক বিষ্ণুদের। বুঝতে পারি বাংলা কবিতার ঋতু বদল ঘটছে।

এই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাব্য সংকলন যেখানে ষাটের দশকও স্থান পেল সে সময় সম্পাদক যথার্থ দাবীই করেছেন কাব্যালোচনায় সচরাচর অবহেলিত। সেই সূত্রে পাঠকেরা আরও কয়েকজন ক্ষমতাবান কবির কবিতায় স্বস্তি বোধ করবেন।

সংকলনকে ধন্যবাদ জানাতে হয় যে তিনি পশ্চিমবঙ্গের কবিদের পাশাপাশি রেখেছেন ওপার বাংলার শামসুর রহমান আল মাহমুদ প্রমুখদেরও। ফলে পাঠক কলকাতা ও ঢাকা থেকে কবিতার গঠন ও উত্থানকে একটি তুলনামূলক প্রেক্ষাপটে রাখতে পারেন।

দুটির দিক থেকে বলা যায় কবি নির্বাচনে গণতান্ত্রিক উদারতা সবসময় প্রীতিকর নয়। একটু সতর্কতা আরোপিত হলে কয়েকজন অকবির অনধিকার প্রবেশ রোধ করা যেত। তাহলে হয়ত স্থান সমস্যা সৃষ্টি না করেই ছাপা হতে পারত প্রচারহীন কয়েকজন কবির কিছু ভালো কবিতাও। তারপর ওপার বাংলা থেকে যদি সত্তর দশকের কবিও অন্তর্ভুক্ত হন তবে এপার বাংলা থেকে ঐ দশকেরই ক্ষমতাবান কবিদের কেন নেওয়া হবে না? অবশ্য গুণের পরিমাণ যেখানে বেশী সেখানে ছোট ত্রুটি মেনে নেওয়া যায়।

বইটির ছাপা ঝকঝকে সর্বাঙ্গ সুন্দর অঙ্গসজ্জা এবং ভূমিকাটিও সুলিখিত। আশা করি পাঠক বাংলাদেশ কবিতার প্রাণভূমি তাঁরা বইটি থেকে তৃপ্তি ও স্বপ্নের স্বাদ পাবেন।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

বেশীর ভাগ প্রকাশক কোন প্ল্যান, প্রোগ্রাম না নিয়েই শুধু মাত্র তাৎক্ষণিক লাভের জন্যে। বক্স অফিসের লেখক ধরেন। এতে একটা সুবিধে, যে তাড়াতাড়ি বাজার থেকে টাকাটা উঠে আসে ঠিকই কিন্তু সামাজিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাদের কোন ভূমিকা থাকে না। প্রকাশকদের এ ক্ষেত্রেও একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

নবপত্র প্রকাশন

একটা ছাতা কিনে ফেললাম।

আগের দুদিন কলকাতা-ভাসানো বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাতারাতি একবালপুর, মেটে-বুরুজ, বেলেঘাটার লেক হয়ে গেল। খসে পড়লো প্রপিতামহ-বাড়ি, কখনো বা বাড়ি রেখে শুধু সিঁড়ি। টালা থেকে টালিগঞ্জ বানভাসি, বুক থৈ থৈ জল। তাবৎ সিএমডিএ-এর কলকাতায় কখন জল সরবে কে জানে! শুধু জানি এ মুহূর্তে আমাকে যেতে হবে পটুয়াটোলায়। এর-মধ্যে এ পকেট ও-পকেট করতে করতে কখন যে ঠিকানাটা হারিয়ে গেছে ঠিক বুঝতে পারিনি। ঠিকানা ছাড়া পটুয়াটোলায় তো অর ঘর খোঁজা চাট্টিখানি কথা নয়। এসব রাস্তা কোথা দিয়ে শুরু হয়ে কোথায় যে শেষ হয়, কেউ জানে না। সুতরাং স্টার্ট করলাম সেই আমহার্স্ট স্ট্রীটের মুড়ো থেকে। এদিকে আকাশ টিপটিপ ঝিবঝির হয়ে ঝরছে। ঝরছে ত ঝরছেই। আগের দুটো ছাতা হারানোর দন্ড হিসেবে কলম দিয়ে মাথা বাঁচাবার চেষ্টা করছি। যা হবার তাই হবে, কপাল ঠুকে শেষবারের মতো একটা ছাতা কিনে ফেললাম। সেই ছাতাটা ব্যাগেই জিজ্ঞেস করতে হল—নবপত্র কোথায়? উত্তর দিতে না দিতেই অর্থাৎ ছাতা খোলার আগেই আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম নিউ এজ প্রিন্টার্স-এর সামনে, মানে নবপত্রের দোরগোড়ায়।

ছাতার গল্প এখানে শেষ।

এবার নবপত্রে আসি।

না, একে বোনো বইয়ের দোকানের, বিশেষ করে প্রকাশকদের সেলস কাউন্টার বলা যায় না। টেবিলের ওপরে প্রুপ-ট্রুপ ফোন নিয়ে মোটামুটিভাবে প্রেসের অফিস বললেই ভালো হবে। আসলে প্রেস ছাড়া নবপত্রের অস্তিত্ব ভাবা যায় না, এখানে ঢুকলে বোঝাই যায়, 'নবপত্র'কে কোলে কাঁখে করে মানুষ করছে নিউ এজ প্রিন্টার্স। এবং আসল ব্যাপারটাও ঠিক তাই। আবার প্রেসকে জন্ম দিয়ে মারা গেল 'আগামী'। তাহলে 'আগামী' থেকেই এখন শুরু করা যাক।

প্রসূনবাবুর সঙ্গে আমার মুখোমুখি পরিচয় ছিল না। এখন ভদ্রলোককে দেখে মনে হোল—এ মানুষ রাস্তা দিয়ে হাঁটলে চোখ-কান বুজে সাহিত্যিক যাচ্ছেন বলে দেওয়া যায়। মানে সত্যি কথা বলতে গেলে কি প্রেমে পড়ার মতো চেহারা। এবং ব্যক্তিগত জীবনে প্রসূনবাবু নিজেও একজন সাহিত্যিক। ওঁর সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে আমি আগে মোটামুটিভাবে ওয়াকিবহাল ছিলাম। বেশ কিছুদিন আগে এই 'অমাতেই 'সত্যকাম' নামের আড়ালে ধারাবাহিকভাবে 'অন্য ভুবন' লিখে প্রসূনবাবু পাঠকের কাছে রীতিমতো প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। কে লিখছেন, সে ব্যাপারে এই শার্পিডল্যা চতুর্বেদীরও কম আগ্রহ ছিল না। হাসির আড়ালে নারীসম্ভাব কান্নাভেজা মুখের আদল বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল 'মনিমালা'য় বা সোনা-মুখী বা ক্যাবারে গার্ল লোরার জীবন ওদের মুখগুলো চট করে আমি ভুলতে পারিনি। আসলে সত্যকাম যে প্রসূন বসু তা জেনেছিলাম অনেক পরে। তারপর যা হয়, হাজার ব্যস্ততায় সেই মুখ কখন ধূসর হয়ে এসেছে, কিন্তু মিলিয়ে যায়নি। এখন নবপত্রে এসে আবার চারপাশ থেকে স্মৃতিরা এসে ভিড় করলো।

ঃ আচ্ছা প্রসূনবাবু, সাহিত্য-টাহিত্য ছেড়ে হঠাৎ প্রেসে এলেন কেন? প্রকাশনার কথা না হয় ছেড়ে দিন কারণ নিজে সাহিত্যিক ফলে পরে প্রকাশনীতে উৎসাহিত হয়েছেন সেরকম অনেক ইতিহাস আমার হাতে আছে। বিশেষ করে মনোজবাবু, গজেন্দ্রনাথ মিত্র, সুমথ ঘোষ কিংবা বাবা শ্রীবাসবের বই নিয়ে ব্রজকিশোর মন্ডলের থেকে হালিফিল্মের অমিতাভ রায়ের আড়ালে হীরকের কথা তো আমার এ মুহূর্তে মনে পড়ছে। আপনারও প্রকাশনা জগতে আসা কি ঐ একই কারণে?

—না, একেবারেই তা নয়। আসলে কি জানেন। আমি কবিতা বা গল্প এই জীবনের শুরু থেকেই লিখতাম কিন্তু মনটা পড়ে থাকতো শিশু-সাহিত্যে। ছড়াটড়া তখন কম লিখিনি। আমার মনে হোত শিশু-সাহিত্য যেন বড্ডো অবহেলিত। অন্ততঃ যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, খুব একটা

প্রসূন বসু

কিছু হচ্ছে না। শুধু আমার নয়, একথা অনেকেরই মনে হোত। তখনই ভাবলাম ছোটদের জন্যে কিছু একটা করা যাক। যেভাবে আমরা ভেবেছিলাম, তারই একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার চেষ্টা করলাম। বের হোল 'আগামী'। প্রথমে গেলাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। উনি জিজ্ঞেস করলেন —আবার নতুন কাগজ কেন? কিংবা তো হচ্ছে না। বললাম—ঠিক আছে, হচ্ছে না যখন বলছেন, তখন আপনিই নতুন কিছু লিখুন না কেন। রাজী হলেন মানিকবাবু। প্রথম সংখ্যা থেকেই নিয়মিত লিখতে শুরু করলেন। এবং বলতে গেলে প্রায় সব সংখ্যাতেই উনি লিখেছেন। শুধু মানিকবাবু কেন, এখনকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সব সাহিত্যিকেরাই 'আগামী'কে সাজিয়েছেন তাঁদের মনোমতো।

ঃ প্রসূনবাবু, আমরা কি বে-লাইনে চলে যাচ্ছি না?

—না। তার কারণ হোল, আগামীর জন্যই ঐ প্রেস তৈরী। আর প্রেসের জন্যেই প্রকাশনা।

ঃ কি রকম?

—যেমন ধরুন—আগামীর সার্কুলেশন ক্রমশই বেড়ে চললো। গল্পে, ছবি, ছড়াতে তাবড় তাবড় মানুষেরা এগিয়ে এসেছেন। অন্য প্রেস থেকে আগামী ছাপা হচ্ছিল, ফলে খরচটা বাড়তে বাড়তে এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছুলো যখন আগামীর নিজের প্রেস করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না। প্রেসে

সাহিত্যের নেপথ্যে

তখন ছিল শুধু কম্পোজিং সেকশন। কিন্তু ততদিনে নিজের জীবিকা মানে রুটির প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে। ফলে প্রেস চালাবার দিকে বেশী নজর গেল। আর প্রেসের দিকে বেশী নজর দিতে গিয়ে আগামীর তেরটা বাজলো। কাগজ হয়ে গেল অনিয়মিত, বেশী ভাগ গ্রাহকেরা তাদের গ্রাহককার্ড রিনিউ করলো না। স্টলেও ঠিকমতো কাগজ গিয়ে পৌঁছল না। একা তখন কদিকে আর সামলাই। ফলে আগামী ক্রমশই বস্তুশূন্যতায় ভুগতে ভুগতে একসময় ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ১৯৬৭তে বড় বদ্যি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে চিকিৎসা শুরু করলুম। বছরে একবার বার্ষিকী হয়ে ঝলমলিয়ে উঠলো। নাঃ তারপর আবার যে কে সেই। একদিন নাড়ি বন্ধ হয়ে গেল। আগামী হয়ে উঠল স্মৃতি। এই আগামী করতে করতেই লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে হয়েছে অন্তরঙ্গতা। সুখদুঃখের দিন যাপন। এছাড়া এঁদের মধ্যে অনেকেই নতুন লিখছেন, তাঁদেরও বই বের করার ইচ্ছে নিয়ে নতুন একটা প্রকাশনী গড়ে উঠলো যার নাম—'নবপত্র'। উলুধ্বনি বা শাঁখ বাজলো না, শুধু লেখকদের আন্তরিক অভিনন্দন পেলাম। তাই পাথেয় করে নবপত্রের পথ চলা শুরু হল। প্রথমেই ছাপলাম—কৃষ্ণা দত্তের 'ইংলিশ চ্যানেল'। নতুন লেখিকা। বাজারে তেমন পরিচয় নেই। ফলে বই কি-রকম যাবে এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকারই কথা। ধরুন, আর দশটা নতুন প্রকাশক হলে কি করতেন, তাঁরা প্রথমেই বকস-অফিসের দিকে ছুটে যেতেন, এবং এইটিই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকাশনী করার আগেই ভেবে নিয়েছিলাম যে, বই যদি বের করতে হয়, তাহলে আগে ভাববো নতুনদের কথা, এর মধ্যে অবশ্য আমার কিছু সাহিত্যিক-বন্ধুও ছিলেন।

যাই হোক বইতো বের হল, কিন্তু যাবে কি করে। কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় সোলে এজেন্ট-দের কাছে হাতে করে বই নিয়ে গেলাম। বললাম—দয়া করে একটু শো-কেসে রাখুন, না হয় বিক্রি হলে দাম দেবেন। ধারে দিচ্ছি, তবুও কেউ রাজী হলেন না। কেউ বা দয়া করে দু-পাঁচ কপি রেখে এককোণে সরিয়ে রেখে দিলেন। ভাবতে লাগলাম, এভাবে তো প্রকাশনী চলবে না। সুতরাং বইগুলোর যথা-যথ বিজ্ঞাপন দেবার কথা ভাবলাম। নতুন ধরনের বিজ্ঞাপন দিলাম বেশ বড়ো করে। বিজ্ঞাপনের একটু নতুনত্ব ছিল এবং জায়গা নেওয়া হয়েছিল আরো বেশী। বিজ্ঞাপন সাপ্তাহিকে পড়তেই বিশ্বাস করবেন না, যাঁরা বই নিতে চাননি, তাঁরা এই এখান থেকে বই নিয়ে গেলেন। এই টেবিলে বসেই দিনে অন্ততঃ দশ পনেরো কপি 'ইংলিশ চ্যানেল' বিক্রি করেছি। ব্যাস, বাজারের পালস আমার সেদিন থেকেই জানা হয়ে গেল। কারণ ভুলে গেলে হবে না, যুগটা এখন পাবলিসিটির। সুতরাং মোটামুটিভাবে লাইনটা আমার জানা হয়ে গেল। এরপর বের করলাম গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়ের 'ভারতের মডার্কলা'; তারপর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'ডাক বাংলার ডায়েরী' এবং তারপর মণীন্দ্র রায়ের কাব্যগ্রন্থ 'মোহিনী আড়াল'। আমাদের প্রকাশনীর গর্ব কবি মণীন্দ্র রায়ের 'মোহিনী আড়াল' যা জাতীয় সম্মান, একাডেমী পুরস্কার নিয়ে এসেছে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন বকস-অফিস কোনো দিনই আমাদের কাম্য ছিল না। তাছাড়া পাবলি-শারের দিকে তাকিয়ে দেখেছি, যে পরিমাণে প্ল্যান এবং প্রোগ্রামে প্রকাশনীর বইয়ের করতে হয়, সে ধরনের দীর্ঘমেয়াদী পরি-কল্পনায় তারা বিশ্বাসী নয়। খুব একটা বিচার-বুদ্ধির দিকে না গিয়ে আমরা শুধু মাত্র বকস-অফিসের দিকে ঝুঁকি। এতে অবশ্য তাড়াতাড়ি লাভটা উঠে আসে, কিন্তু সাহিত্যের বা সমাজের প্রয়োজনে খুব একটা কিছু করা হয় না। অর্থাৎ সহজ উপায় মানে 'ইজি প্রেসেসে' যতটা সম্ভব কম খাটা খাটুনি এবং ঝুঁকি না নিয়ে লাভের কড়ি তবিলে ফেলা হয়ে যায়। সুতরাং আদর্শগত এবং প্রকাশনাগত বইপত্তর সম্বন্ধে আমাদের ধ্যান-ধারণা একটু উল্টো ছিল। যেমন ধরা যাক, আমরা চেষ্টা করেছি, ডাক্তারকে দিয়ে ডাক্তারী বই বের করানো। যাতে লোকে লব্ধ অভিজ্ঞতা নিজেদের জীবনে গ্রহণ করতে পারে। এর জন্য বেরিয়েছে 'মানুষের কথা'। মানুষের জন্ম থেকে এক বিরাট ইতিহাস তারপরে 'মগজের কথা', মানুষের মস্তিষ্কের কার্যকারণের ইতিহাস। সুতরাং কোন্ লেখক বাজারে চালু বা কোন্ লেখক চলবে না, এভাবে আমরা বই বের করবো না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সেভাবেই আজ পর্যন্ত নবপত্র চলছে।

এ প্রসঙ্গে আবার নতুন করে ভাবছি শিশু-সাহিত্যের প্রকাশনের কথা। কিন্তু শিশু-সাহিত্যের প্রকাশনার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রোডাকসনের ব্যাপারটাও ভালো করে চিন্তা করে নিতে হয়। সুতরাং সেই সব কথাই মনে রেখে এবার ভাবছি—শিশু সাহিত্যে নামবো। ঠিক গল্প উপন্যাসের পাশাপাশি চলবে শিশু-সাহিত্যের প্রকাশনা।

এধরনের কি নতুন কোনো পরিকল্পনা আছে? ঠিক নতুন নয় তবে সংসাহিত্য—প্রকাশনের ব্যাপারে আমাদের চিরন্তন আগ্রহ। বের করছি বিমলকরের নতুন বই। বের হচ্ছে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বরেন গাঙ্গুলী মুস্তফা সিরাজের নতুন বই। আচ্ছা আর একটা বইয়ের কথা ধরুন, যেমন ভাই বিশ্বাসের 'প্রতিবেশী ভূটান'। ভূটানের সাধারণ মানুষের জীবনের কথা নিয়ে গোটা ভূটানের ইতিহাস। ভাই বিশ্বাস এই নামটি পরিচিত হওয়া দূরের কথা সামান্য মানুষ। এই নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। অথচ দেখুন এই বইটি প্রায় দ্রুত মুদ্রণ নিঃশেষ হচ্ছে। সুতরাং তরুণতর লেখকদের প্রতি আগ্রহ না থাকার কোনো কারণ দেখিনে।

এভাবেই আমরা বইয়ের পরিকল্পনা। একটার সঙ্গে আরেকটা বইয়ের খুব একটা মিল খুঁজে পাবেন না। যেমন ধরুন—সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা নেই, সা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের দিনলিপি তার সঙ্গে সুভাষবাবুর 'ভূতের বেগার'এর মিল নেই। যার উপজিব্য বিষয় হল—ভারতের অর্থনীতি। তার পাশাপাশি বদরুদ্দীন ওমরের 'সাম্প্রদায়িকতা' বা রনজিত রায়ের 'ক্যারিবিয়নের স্বপন বা সন্তোষকুমার ঘোষের 'বাংলাদেশ কোন্ পথে', হাওয়ার্ড ফাস্টের 'নগ্ন শিকারী'। সব কটা বই একটু পর্যালোচনা করে দেখুন, বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই এই সব বইয়ের প্রকাশনা, যেখানে ব্যবসাটা এসেছে পরে।

—আচ্ছা প্রসূনবাবু, কবিতার ব্যাপারে আপনারা কিছু ভাবছেন না?

ঃ ভাবছি না একথা বলবো, বরঞ্চ ভাবছি একটু নতুনভাবে। আপনি হয়তো জানেন, নবপত্র থেকে এক সময় তিনজন কবি বলে, একসঙ্গে সংকলন হয়ে তিন দশকের তিনজন কবির নির্বাচিত কবিতার বই বেরুতো। সেটা বন্ধ হয়ে যাবে। এখন আবার সেভাবেই ভাবছি। তাছাড়া এধরনের আরো কিছু পরিকল্পনা আছে।

—এই সব যে নতুন নতুন পরিকল্পনা নিচ্ছেন, কিন্তু বাজার কি রকম মনে হচ্ছে। অনেকেইতো বেশী এগুতে সাহস পাচ্ছেন না। আপনার কি মনে হয়।

ঃ বইয়ের বাজার খুব যে একটা খারাপ তাতো মনে হচ্ছে না। বরঞ্চ মনে হয়, এখন ব্যক্তিগত সংগ্রহের পরিমাণ বেড়েছে। আসলে দেখুন শিক্ষিতের সংখ্যা কতো পার্সেন্ট। এভাবে হিসেব করলে মোট জনসংখ্যার মধ্যে পাঠকের সংখ্যা ধরা যায় ১ পার্সেন্ট। ক্রমশই শিক্ষার প্রসার হচ্ছে শুধু শহরে নয়, সুদূর গ্রামে। ফলে শিক্ষিতের সংখ্যা বারবার সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে পাঠকগোষ্ঠী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হতে হচ্ছে, যেমন বিক্রির ব্যাপারে। আমাদের মতো প্রকাশক যাঁদের নিজস্ব কোনো সেলস-কাউন্টার নেই, তাদের বিপদ হোলো—যে প্রথম পর্যায়ে ধরুন লেখককে শতকরা ১৫ পার্সেন্ট এবং হোলসেলারদের শতকরা ৩০ পার্সেন্ট দিয়ে হাতে কতো থাকে। অপরদিকে ধরুন হোল-সেলারেরা একে একে প্রকাশনার্য চলে আসার প্রথমতঃ তাদের ঐ কমিশনটা ছাড় যাচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ তারা নিজেদের বই বেশী পুশ করার সুযোগ পাচ্ছেন। ফলে বর্তমানে প্রকাশকেরা একটু কোনঠাসা হয়ে পড়ছে এব্যাপারটা না বিচার করেই বলে দেওয়া যায়।

তাই আমরা ব্যবসাটাকে আর একটু ছড়িয়ে দেবার ব্যাপারে সর্বভারতীয় বাজারের কথা ভাবছি। এব্যাপারে বুঝতেই পারছেন মাধ্যম হবে ইংরেজী। এসব কাজে এগুতে হলে নিজেদেরও আর একটু গুছিয়ে নেওয়া দরকার। কাজ চলছে। চলছে যোগাযোগ অল ইণ্ডিয়া ডিলারদের সঙ্গে শুরু হচ্ছে কথা-বার্তা তাছাড়া আমারো ব্যক্তিগত যোগাযোগ আছে।

তারপর চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে উঠে পড়লাম।

শান্ডিল্য চতুর্বেদী

উপন্যাস

মোহিনী আট্টম

চিত্তরঞ্জন মাইতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ডেভিড বলেছে, প্রেমা, তুমি আমার নায়িকা। ঐ ঢেউয়ের ওপর ট্রপিক্যাল কার্নিভ্রর সূর্যের তীব্র তীক্ষ্ণ খেলার মত তোমার নাচের ছন্দ। এখানে প্রকৃতির সমুদ্র, নদী, নারিকেল অরণ্য, মানুষ সবার ভেতর আশ্চর্য নাচের লীলা। তুমি এই অবাক পৃথিবীর মধ্যমণি হয়ে থাকবে আমার নভেলে।

প্রেমা কোন কথা বলেনি। সে মোহিনী মায়ায় ঘন পল্লবিত চোখের দৃষ্টি হেনে সুন্দর হাসি হাসি উপহার দিয়েছে ডেভিডকে।

চারটি দিনের নিবিড় সান্নিধ্যে সময়ের সীমা হারিয়েছে ওরা।

এখন একটা। প্রেমার কোলে ফেলে রাখা ম্যাসনাইটের ওপর সাদা খাতার পাতায় ডেভিডের লেখা চলেছে। হাতের কনুই ছুঁয়ে আছে প্রেমার নিটোল জানুদেশ। একটি বলিষ্ঠ তপ্তাত পুরুষের স্পর্শ প্রেমাকে কখনো চঞ্চল করে তুলছে, কখনোবা এলোমেলো স্বপ্ন রচনার প্রেরণা এনে দিচ্ছে। মগ্ন লেখকের মুখের প্রতিটি ভাবান্তর মুগ্ধ আগ্রহে লক্ষ্য করছে প্রেমা।

ডেভিডের লেখা এক সময় থেমে গেল। খাতাখানা তুলে নিয়ে ডেভিড তার ব্যাগে যত্ন করে ভরে নিল। প্রেমার কোল থেকে ম্যাসনাইটের ছোট্ট বোর্ডটা তুলে নিয়ে ডেভিড বলল, এ এক আশ্চর্য আবিষ্কার প্রেমা।

প্রেমা বলল, কিসের আবিষ্কার ডেভিড? মানুষের আর তার চারদিকে ঘিরে থাকা প্রকৃতির। কত যুগ ধরে কত মানুষ নতুন জনপদ আবিষ্কার করছে, কত গুপ্ত নগরীর রহস্যময় অস্তিত্বের সন্ধান লাভ করছে, কিন্তু আমার মনে হয় এই সরল সবুজ নারিকেল গাছের নির্জনে এই যে প্রেমা নামের তরুণীটি বসে আছে, তাকে আবিষ্কার করার মত বিস্ময় আর কিছুতে নেই।

প্রেমা ঝর্ণার মত হাসি ঝরিয়ে বলল, আমি এতক্ষণ আমার কোলের ওপর তোমার লেখার সরঞ্জাম ধরে রেখেছিলাম, তাই এ পুরস্কার?

ডেভিড বলল, লেখক যদি মালাটিমিলিও-নীয়ার হত তাহলে তার তৈরী প্রতিটি চরিত্রকে সোনার মুকুট পরিয়ে পুরস্কৃত করত।

প্রেমা বলল, কেন তা হবে, তারা তো লেখকেরই সৃষ্টি। পুরস্কার যদি কারু প্রাপ্য হয় তাহলে তা একমাত্র লেখকের।

তুমি ভুল করছ প্রেমা, তপ্তাত ডেভিড বলে উঠল। মা বাবার সম্ভোগ থেকে জন্ম নিল যারা, তাদের স্বভাব, তাদের সৌন্দর্য তাদের চঞ্চল লীলাখেলার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যান তাদের স্রষ্টা। লেখকের অনুভূতিও ঠিক তাই। তার চিন্তার থেকে যে চরিত্রেরা ভূমিষ্ট হল তারা একসময় লেখকের ভাবনার রাজ্য থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যায়। তাই লেখক যখন একান্তে বসে তাঁর নিজের লেখা পড়তে থাকেন, তখন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রেরা তাঁকে ক্ষণে ক্ষণে আবিষ্ট করে তোলে। মা বাবার অন্তরে আনন্দ দেবার জন্যে সন্তান যেমন পুরস্কৃত হয়, ঠিক তেমনি লেখকের চরিত্রাবলী লেখকের অন্তরের পুরস্কার বার বার পেয়ে থাকে।

প্রেমা বলল, তোমার এ নতুন উপন্যাসে আমাকে নায়িকার চরিত্রে চিত্রিত করে যদি তুমি সফল হও ডেভিড তাহলে তোমার সৃষ্টি হিসেবে নিশ্চিত আমার একটা পুরস্কার জুটবে।

ডেভিড বলল, নিশ্চিত, কিন্তু কি পুরস্কার তুমি চাও প্রেমা?

প্রেমা বলল, তোমার নিভৃত অবসরে যখন তুমি সম্পূর্ণ উপন্যাসটি পাঠকের মন নিয়ে পড়বে তখন যদি এই মালাবার উপকূলের মেয়েটিকে তোমার ভাল লাগে, তাহলে তাই হবে আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

ডেভিড বলল, শুধু এই প্রেমা, আর কিছু চাইবার নেই তোমার লেখকের কাছে! তোমার সামনেই লেখক। আগাম পুরস্কার তার হিরোইনের হাতে তুলে দেবার জন্যে সে তৈরী।

প্রেমা দুষ্টুমির চোখে ডেভিডের দিকে চেয়ে বলল, পুরস্কার তো চাইতে নেই ডেভিড। ওটা হল দাতার খুশির দান। আর তাছাড়া বই-এর চরিত্রেরা রক্তমাংসের জীব নয় যে তারা ইচ্ছে মত চেয়ে নেবে।

ডেভিড বলল, এখানেই তোমার ভুল প্রেমা। শক্তিমান স্রষ্টার হাতে যে চরিত্র জন্ম নেয় তারা রক্তমাংসে সে গড়া মানুষের চেয়েও জীবন্ত তার উদাহরণ। সাধারণ মানুষের লাবণ্য যেমন বাড়িয়ে দেয় পরিমিত প্রসাধন,

তেমনি সাধারণ চরিত্রকে আরও সুন্দর করে তোলে লেখকের সজীব ভাবনার ছোঁয়া।

প্রেমা বলল, তুমি লেখক ডেভিড, আমি কেমন করে তোমার সঙ্গে কথায় এঁটে উঠতে পারব।

ডেভিড অমনি বলল, এসো তাহলে চুপচাপ বসে থাকি দুজনে। নারিকেল পাতার ঝালরের ঝিলিমিল আর সমুদ্রের নীলে রোদের সোনার ঝিকমিক খেলা দেখি।

ডেভিড প্রেমার একখানা হাত নিজের দু'হাতের পাতায় চেপে ধরে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইল।

প্রেমা বাধা দিল না। একসমর সমুদ্রে হাওয়া দিল। হাওয়ায় বেগ ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। বেলাভূমির রুপালী বালি উড়তে লাগল। ঢেউগুলো আছড়াতে লাগল গদাম গদাম আওয়াজ তুলে। নারকেল গাছের পাতায় তবলার বোলের মত চড়-বড়িয়ে উঠল শব্দ তরঙ্গ। প্রেমার চুর্ণ চুল বার বার উড়ে এসে পড়তে লাগল মুখের মুখের ওপর। প্রেমা বাঁ হাতখানা দিয়ে সে চুল সরিয়ে দিল কিন্তু ডেভিডের হাতের মুঠোয় ধরে থাকা ডান হাতটা টেনে নিল না।

প্রেমা হঠাৎ বলল, আচ্ছা ডেভিড সাহিত্যে তুমি নগ্নতাকে স্বীকার কর?

নিশ্চয় করি, বলল ডেভিড।

প্রেমা অবাক হয়ে বলল, নগ্নতা অশ্লীলতা নয়?

ডেভিড জোরের সঙ্গে বলল, একটুও না। এই মুহূর্তে এই নির্জন পরিবেশে একটি তরুণী ধীবর কন্যা যদি সমুদ্র স্নান সেরে নগ্নদেহে বেলাভূমিতে উঠে এসে দাঁড়ায় আর তার যুগল বাহু তুলে ভেজা চুলের বাশ সংস্কার করতে থাকে, তাহলে তার সেই নগ্ন রূপকে তুমি কি অশ্লীল বলবে প্রেমা? তার প্রসারিত বাহুতে রোদের সোনা মেখে সে যদি আশ্চর্য সুন্দর ভঙ্গীতে দেহটাকে দোলাতে থাকে তাহলে কি তোমার মালাবার উপকূলের সবুজ ঋজু ফলবান নারিকেল বৃক্ষের দোলায়িত ছন্দের চেয়ে তাকে অসুন্দর মনে হবে? এর পরেও কথা আছে প্রেমা। নগ্নতা পরিস্থিতি আর পরিবেশ মেনে চলে। সুসজ্জিত মানুষের অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে আবার এ নগ্নতা মানায় না।

প্রেমা বলল, তোমার যুক্তিকে মেনে নিয়েও বলব, ডেভিড বহু আধুনিক উপন্যাসকার মন্ত্রের মত জপ করে চলেছেন এই নগ্নতাকে। নগ্নতার যথার্থ সৌন্দর্য কিভাবে কোটান যায় সে সম্বন্ধে তাঁদের কোন ধারণা আছে বলে আমার মনে হয় না।

ডেভিড বলল, উদ্দেশ্য নিয়ে নগ্নতাকে ছড়ানোর ভেতর সহৃদয় পাঠকের সমর্থন কোনদিনই থাকে না। সাধারণ পাঠক উত্তেজনার খোরাক হিসেবে ওগুলোকে নিতে পারে। কিছুদিন পরে বই বেস্ট সেলার হয়ে লেখক আর প্রকাশকদের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ফাঁপিয়ে তোলে, তারপর একদিন ফানুসের মত ওড়ার খেলা দেখতে দেখতে, ফেঁসে কোথায় উড়ে যায়।

প্রেমা বলল, দেহধর্মের ব্যাপারে আমার কোন গোঁড়ামী নেই ডেভিড। কিন্তু তাকে হাজার চোখের সামনে বিসদৃশ করে তুলতেই আমার আপত্তি। আমরা নাচের মুদ্রায় আমন্ত্রণ জানাই দর্শকদের কিন্তু তা আভাসে, ইঙ্গিতে, ইসারায়। ক্যাবারে নাচের নগ্নতার চেয়ে সে আমন্ত্রণ কম প্রলুব্ধ করে না। তবু বলব, তার ভেতর শিল্পের একটা শ্রী আছে।

ডেভিড বলল, ঠিক তোমাদের ইণ্ডিয়ার মন্দিরে খোদাই মূর্তির মত। আমি খাজুরাহো আর কোণারকের মন্দির দেখে এসেছি। সেখানে দেহভঙ্গীমায় চূড়ান্ত নগ্নতা চোখে পড়েছে, কিন্তু মনের ওপর বিকারের কোন খেলা চলে নি. ভাস্করের সৃষ্টিকে বার বার সাধুবাদ জানিয়েছি।

প্রেমা তার দুহাত দিয়ে ডেভিডের দুটো হাত ধরে বলল, কি আশ্চর্য মিল হয়ে গেল তোমার আর আমার ভেতর।

ডেভিড প্রেমার হাত থেকে নিজের হাত মুক্ত করে নিয়ে প্রেমার কটি বেষ্টন করে বলল, আইরিশ সাগরের সঙ্গে মিলল আরব সাগরের ঢেউ, কি বল?

প্রেমা অর্থভরা চোখে তাকাল ডেভিডের মুখের দিকে। সে মুখের পাঠ পড়তে ডেভিডের একটুও দেরী হল না। সে গভীর আলিঙ্গনে প্রেমাকে জড়িয়ে ধরে আদরে আশ্লেষে ভরে দিতে লাগল।

যেখানে ডেভিড সেখানে প্রেমা। প্রেমার প্রিমিয়ার প্রেসিডেন্টের চালক কখনো ডেভিড কখনো বা প্রেমা নিজে।

গাড়ী এসে ব্রেক কষে দাঁড়াল কোন এক নারকেল বাগানের সামনে। মেয়েরা ছোবড়া পিটিয়ে চলেছে। কাঠের কট্রুপিড তালে তালে পড়ছে ছোবড়ার ওপর। গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়াল ডেভিড। সবকিছুর ওপর তার ঔৎসুক্য। ডেভিডের প্রশ্ন ক্ষণে ক্ষণে, প্রেমার জবাবও সঙ্গে সঙ্গে।

কি করছে এরা প্রেমা?

নারকেলের ছোবড়া পিটিয়ে ফাইবার সংগ্রহ করছে।

মেয়েদের পেছনে নারকেল গাছের বেষ্টনীর ভেতর একটা পুকুর। জলটা ঘন কালো হয়ে আছে। ডেভিড আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, ওখানে কি?

প্রেমা বলল, ওটা সমুদ্রের ব্যাকওয়াটার। ওকে আমাদের ভাষায় বলে কায়েল। ওর খানিক অংশ ঘিরে একটা নেট জলের ভেতর নামান হয়।

ডেভিড অমনি বলে, ঐ নেটকে তোমরা কি বল?

কায়ার ভয়ম।

হাঁ তারপর? প্রশ্ন করে ডেভিড।

প্রেমা বলে ঐ কায়ার ভয়মের ওপর নারকেল পাতার কলা মুনে তাতে নারকেলের ছোবড়া ফেলে দেওয়া হয়।

আবার প্রশ্ন, ঐ নারকেলের ছোবড়াকে তোমরা কি বল?

তোণ্ডু।

তোমাদের ঐ তোণ্ডু কতদিন জলের ভেতর থাকে?

প্রায় তিনমাস।

তিন মাস! জলের রং এজন্যেই বোধকরি পচে কাল হয়ে গেছে প্রেমা।

ঠিক তাই।

ডেভিড বলে, জল থেকে তুলে পেটাইএর পর এর ফাইবারগুলো কোথায় যায়?

তাটু মেশিনে। ওখানে ফাইবারগুলোকে রিফাইন করে নেওয়া হবে। ঐ রিফাইন নারকেল ছোবড়াকে বলে চাকিরি তুম্বু।

ছোট্ট ডায়েরীর পাতায় ডট পেন্সিলে ডেভিড নোট করতে থাকে শব্দগুলো।

নোট করা শেষ হলে বলে, তারপর?

প্রেমা বলে, ঐ রিফাইন ফাইবারগুলো মেয়েরা পাট করে পেটের কাছে চেপে ধরে। তারপর খানিক অংশ একটা মেশিন ধরিয়ে দেয়। মেশিন ঘুরতে থাকে। ঐ মেশিনের চাকাকে বলে রাট। যদি দুটো সরু দড়িকে পাক দিয়ে মোটা করতে হয় তাহলে একটা কাঠের ছোট যন্ত্রের ভেতর ঐ দুটো দড়ি ভরে দিতে হয়। কখনো বা তিনটে দড়ি ভরে আরও মোটা করা হয়। ঐ যন্ত্রণাকে বলে চোং। মেয়েরা ঐ চোং হাতে ধরে পেছন দিকে পিছিয়ে পিছিয়ে যেতে থাকে। এরকম করেই দড়ি তৈরী হয়।

নোট নেওয়া হলে গাড়ীতে ফিরে যায় ওরা।

ডেভিড গাড়ী চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করে, এই মেয়েদের দেখে ওদের আর্থিক অবস্থা খুব স্বচ্ছল বলে তো মনে হল না প্রেমা।

প্রেমা বলল, একটা নারকেলের ছোবড়াকে চার ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ভাগকে বলে, পলা। এমনি পঁচিশটা নারকেলে হয় একশো পলা। ঐ একশো পলা পিটিয়ে ফাইবার বের করলে মজুরী পায় এক টাকা। সারা-দিনে আড়াই থেকে তিন টাকার বেশী রোজগার হয় না ওদের।

ডেভিড বলল, এত হল পেইড এরা।

প্রেমা বলল, আমাদের দেশে আর্থিক সমৃদ্ধি কম, তাই সংগ্রাম বেশী। আমরা কঠিন পরিশ্রমের ভেতর দিয়ে দেশটাকে গড়তে চাইছি।

ডেভিড বলল বিচিত্র দেশ তোমাদের প্রেমা। এক হাতে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছ, অন্য হাতে উৎসবের রোশনাই জ্বালছ।

প্রেমা বলল আমি আশা করব তোমাদের শ্বেতকায় বহু লেখকের মত আমাদের দেশকে তুমি ভুল বুঝবে না। আর তোমার লেখার ভেতরও সে ভুলের ছাপ থাকবে না।

ডেভিড বলল, সাহিত্যিকের কাজ সত্যকে রূপ দেওয়া। সত্য যেমন দারিদ্র্যের ছবি দেখায় তেমনি ভেতরের ঐশ্বর্যকেও

প্রকাশ করে প্রেমা। তোমার দেশের বৈচিত্র্য আমাকে মুগ্ধ করেছে।

পনের দিনের অবস্থান ডেভিডের ভারতের এই দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তের ছোট্ট দেশটিতে। উল্কা মত সে ঘুরে বেড়িয়েছে স্টেজের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। সঙ্গ দিয়েছে তাকে তার আগামী উপন্যাসের প্রধান চরিত্র প্রেমা মেনন। আয়োজন করেছে নাচের। দেখিয়েছে কথাকলি, মোহিনীআট্টম, কালি-আট্টম, পুলায়ারকলি, ওটাম তুল্লাল, কোইকোট্টিকলি, সারি আরও কত বিচিত্র নাচ। ঠেকাডির অরণ্যভূমি থেকে লেকের জলে নেমে আসা হাতির দলের শুঁড় উঁচিয়ে মুক্তোর মত জল ছড়ানোর দৃশ্য ওরা দেখেছে মোটর বোটের ডেকে পাশাপাশি বসে। দেখে এসেছে শবরীমালাই পাহাড়। যেতে পারেনি আয় আপ্পানের মন্দিরে। সেখানে যুবতী নারীর নিষিদ্ধ যাত্রা। তাই পম্বার তীরে বসে ডেভিড শুনেছে প্রেমার মুখে মোহিনী আর শঙ্করের মিলন জাত সন্তান আপ আপ্পান বা সাস্তার কাহিনী।

সেই সাস্তার মন্দিরে দলে দলে ভক্ত চলে মকর ভিলাক্কুর দিনটিতে পুজো দিতে। তিনটি নদী এসে মিলেছে পম্বায়। তার পরেই দুর্গম শবরীমালাই। পম্বায় স্নান সেরে কালো মুন্ডি পরে ভক্তেরা নারকেলের মালায় ঘি রেখে মাথায় বয়ে নিয়ে যাবে। সাস্তার যজ্ঞ বেদীতে দিতে হবে এই ইরুমুদিব আহুতি।

পৌষের শেষ সন্ধ্যায় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবে শত শত ভক্ত। আয়-আপ্পানের কথা তো মিথ্যে হবার নয়। তিনি যে কথা দিয়েছেন এই মকর ভিলাক্কু তিথিতে ভক্তদের দেখা দিতে আসবেন।

গোধূলির সঙ্গে সঙ্গে আকাশের উত্তর-পূর্ব কোণে আশ্চর্য এক জ্যোতির আবির্ভাব ঘটে। ভক্তেরা আকুল হয়ে প্রণাম জানায় সেই জ্যোতির্ময় আয় আপ্পানের উদ্দেশ্যে।

ডেভিড বলে বড় বিশ্বাসপ্রবণ তোমাদের ভারতীয়েরা।

প্রেমা বলে সবেতেই বিশ্বাস আমাদের। দেবতার যেমন মানুষেও তেমনি।

একটু থেকে ডেভিডের মুখের দিকে চেয়ে হেসে বলে দূর দেশের মানুষের ওপরেও আমাদের বিশ্বাস কম নয়।

ডেভিডের কোলে মাথা রেখে শুয়েছিল প্রেমা। ডেভিড প্রেমার মুখে আঙুলের আঁকিবুকি কাটতে কাটতে বলল বিশ্বাস রেখ প্রেমা তোমার কাছ থেকে যা পেলাম তা আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে রইল। তোমার চরিত্রের যা আমাকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করছে তা হল তোমার অকৃত্রিমতা। আর তোমার স্বভাবের একমাত্র তুলনা ঐ নদী পম্বা। তুমি শিল্পীর হৃদয় নিয়ে জন্মেছ। তোমাকে চিরদিন বুকে ধরে রাখার মত মানুষ জন্মায় নি। সমুদ্রের সময় তুমি যেমন একান্ত করে নিজেকে বিলিয়ে দাও তেমনি কোন কিছু সৃষ্টির ভেতরে মত্ত হলে সব ভুলে তারই গভীরে ডুব দাও। তুমি এই নদীর মত গভীর আর বেগবতী কিন্তু নদীর ওপর যেমন বাইরের আঘাতে আলোড়ন উঠলেও চিরস্থায়ী দাগ পড়ে না তোমার স্বভাবের ধর্মও ঠিক তেমনি।

প্রেমা বলল সুন্দরকে আমি ভালবাসি ডেভিড। তুমি বলিষ্ঠ সুন্দর পুরুষ তোমার সাহিত্য চিন্তায় কোন সংস্কার নেই তাই প্রেমা তোমাকে তার সবকিছু উজাড় করে দিতে কুণ্ঠিত হয় নি। কিন্তু আজ যে মেয়েটি তোমার কোলে সংকোচে তার মাথা রেখে শুয়ে আছে সে জানে এমনি করে চিরদিন কাউকে ধরে রাখা যায় না। তুমি ঠিকই বলেছ জীবন বয়ে চলা নদী। তার গতিতে বাধা পড়লেই বিপত্তি। এ তোমার আমার সবার মনের কথা। আমি তোমাকে যতই ধরে রাখতে চাইব ততই তোমার মনের থেকে দূরে সরে যেতে হবে আমাকে। তাই অনেক দূরে দুজনে সরে গিয়ে মনের অনেক কাছে দুজনকে পেতে চাই।

ডেভিড বলল তুমি বয়েসে অনেক ছোট প্রেমা কিন্তু জীবন সম্বন্ধে তোমার এসব ধারণা আমাকে সত্যি বিস্মিত করেছে।

জ্যোৎস্না রাত। ঢেউ ভাঙার শব্দ। সবুজে ছায়ায় মিশে যাওয়া নারকেল বীথি। বালির ফরাসে পাশাপাশি বসে প্রেমা আর ডেভিড। ওরা আজ সারারাত জেগে কাটাবে। কথা বলবে যে কথার কোনদিন শেষ হয় না। গল্প বলবে জীবনের অভিজ্ঞতার গল্প। তারপর এক সময় ভোর হবে। হোটেলে ফিরে যাবে ওরা। প্রেমা গোছগাছ করে দেবে ডেভিডের ছড়ান জিনিসপত্র। ওকে গাড়ী করে পৌঁছে দিয়ে আসবে ত্রিবান্দ্রম এয়ার পোর্টে। ওরা দুজনের কাছ থেকে বিদায় নেবে। মনটা ভারী হয়ে উঠবে। কিন্তু পুনর্মিলনের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি কেউ কাউকে দেবে না।

প্রেমা সামনে আছড়ে পড়া ঢেউ-এর দিকে চেয়ে বলল মনটা কেন জানি না আজ ঐ ঢেউগুলোর মত কেবলই ভেঙে ভেঙে পড়ছে।

ডেভিড বলল আজ সন্ধ্যায় তোমার এমন অশান্ত ভাবনায় পেয়ে বসল কেন প্রেমা। সারাদিন তুমিই তো আমার পাশে পাশে থেকে বিচ্ছেদের শক্তি যুগিয়েছ।

অন্যমনস্ক প্রেমা বলল দিনে রাতে কত তফাৎ। রাতগুলো যেন মনের ওপর অদৃশ্য এক চাপ সৃষ্টি করে ডেভিড।

ডেভিড প্রেমাকে আরও নিবিড় করে কাছে টেনে নিয়ে বলল আমাদের মনের এ উত্তাপ অনেক দূরে গেলেও নিভে যাবে না প্রেমা।

প্রেমা কোন কথা বলল না। ডেভিডের বুক নিশ্বাসের ছোঁয়ায় সে আচ্ছন্ন হয়ে রইল।

(ক্রমশঃ)

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

থমকে কেন দাঁড়িয়ে ১০·০০

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের

নিলয় না জানি ১০·০০

গোপনে নির্জনে ৮·০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

কোনে মনে বনে ৬·০০

প্রফুল্ল রায়ের

মানুষের জন্য ৭·০০

গ্রন্থাগার ও পাইকারী ক্রেতাদের উপযুক্ত কমিশনে বই সরবরাহ করা হয়।

শৈব্যা পুস্তকালয় ॥ ৮।১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২
ফোন : ৩৪-৮৫৪৩

নতুন ফরমুলা সিলো

ধোলাই শক্তি বেড়েছে

অতিরিক্ত সুগন্ধে

সবচেয়ে শক্তিশালী কাপড় ধোয়ার পাউডার

ধবধবে সাদা, ভেতরে সাদা

Shilpi dm 11b/76 bang

বিজ্ঞাপন ও বিচিত্রা

পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা সংস্থা : পশ্চিমবঙ্গ

পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত ব্যবস্থা এবং প্রচারের কাজ শেষ করে ডক্টার অমৃতলাল দত্তচৌধুরী তখন সদ্য সদ্য মেদিনীপুর থেকে ফিরেছেন। আবার একটু পরেই বেরিয়ে যাবেন হুগলীতে। সেই একই কাজে। এ-রকম এক মধ্যবর্তী সময়ে আমরা মুখোমুখি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবার পরিকল্পনার প্রচারের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ডক্টার দত্তচৌধুরীকে প্রশ্নটাও সরাসরি—যতদূর দেখেছি এবং শুনেছি তার থেকে একথাটা কি সত্যি যে গ্রাম বাংলার অনেক মানুষ ধর্মগত কিম্বা অশিক্ষাজনিত অথবা নানা কারণে পরিবার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন না? যদি একথা ঠিক হয় তবে সেই শ্রেণীর লোকদের বিশেষতঃ মহিলাদের এই পরিকল্পনার উপকারিতা প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে বোঝাবার জন্য আপনি কোন ধরনের প্রচার-পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন?

আমার কথা শুনে ডঃ দত্তচৌধুরী ঘাড় নড়লেন। বললেন—প্রশ্নটা কিছুটা ঠিক সবটা নয়। তবে হ্যাঁ আজ থেকে কয়েক বছর আগেও এটা একটা বড় বাধা ছিল। সেটা আস্তে আস্তে ভাঙ্গছে। অর্থাৎ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে গ্রামের প্রায় অধিকাংশ মানুষই এখন ছোটো পরিবারের প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা বুঝতে পারছেন তবা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসছেন এখন। আসলে আপনি যেটা বলছেন সেটা ঠিকই। জনবিস্ফোরণ আমাদের অন্যতম প্রধান সমস্যা। একটা চ্যালেঞ্জ বলতে পারেন। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয় সমগ্র দেশের পক্ষে। দেশের সমৃদ্ধির পক্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যেভাবেই হোক আমাদের কমাতে হবে। সেই লক্ষ্য রেখে কাজ করতে গিয়ে গ্রামের প্রায় অধিকাংশ অশিক্ষিত পুরুষ কিম্বা মহিলা আমাদের কাছে একটা বড় সমস্যা একথাটা সত্যি। আমরাও আপ্রাণ চেষ্টা করছি তাদের বোঝাবার। ফলও হয়েছে, হচ্ছে।

ডঃ দত্তচৌধুরী বললেন—আসলে দেখুন শহরের লোকদের আমায় বিশেষভাবে সেরকম কিছু বোঝাতে হয় না। তাদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা আছে, গ্রহণ করার মতো ক্ষমতা আছে। তবুও শহর এবং শহরাঞ্চলের লোকদের জ্ঞাতার্থে আমার প্রচার-ধারা যে স্তরের হয়, গ্রামের মানুষকে বোঝানোর পদ্ধতিটা তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এর অবশ্য নানা কারণও আছে—(১) অশিক্ষা (২) নানা ধরনের কুসংস্কার এবং সামাজিক অহেতুক লোকলজ্জার ভয় এবং (৩) নানাপ্রকার ধর্মভীতি। এর মধ্যে প্রথম হলো, অহেতুক নানা কুসংস্কার এবং লোকলজ্জাজনিত ভয় এবং অমূলক ধর্মীয় ভীতি। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, সর্বপ্রথম এই যাবতীয় ভয়গুলোকে কিভাবে দূর করা যায় সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই প্রচার-কৌশলের মাপকাঠিটা ঠিক করতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হয়, পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তাটা কত সহজভাবে এদের বোঝানো যায় সেই দিকটার প্রতিও। সেইজন্যেই নানা ধর্মের নানা মহাপুরুষের কথা দিয়েই, নানা ধর্মগ্রন্থের উক্তি তুলে ধরেই তাদের বোঝাই। যেমন ধরুন হিন্দু রমনীদের সামনে শ্রীশ্রীমায়ের (সারদামণি) কথা তুলে ধরি : অনেক সন্তান হলে ঠাকুর তাদের গ্রহণ করতেন না। একটা দেহ থেকে ২৫টা ছেলে বেরোচ্ছে এরা সব কি!' একসময় কেউ কেউ মনে করতেন, পরিবার পরিকল্পনা বোধহয় ইসলাম-ধর্মবিরোধী। এই ধারণা যে কতখানি ভুল সেটা প্রমাণিত করার জন্য মুসলিম মায়েদের রমনীদের কাছে আমরা পবিত্র কুরআন-এর আয়াত ৬৪ : ১৫ অংশ তুলে দেখাই—তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি (আল্লাহর নিকট) পরীক্ষাস্বরূপ (যেহেতু তাহাদের অপব্যবহার বা তাহাদের প্রতি অযত্ন তোমাদের পতনকেই ডাকিয়া আনিবে)।' শুধুমাত্র তাই নয় তাঁদের একথাও আমরা বলি, বিশ্বের অন্যতম মুসলিম রাষ্ট্রগুলোও গত কয়েক বছর ধরে পরিবার পরিকল্পনাকে তাদের জাতীয় পরিকল্পনা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। যেমন : পাকিস্থান : ১৯৬০ সাল থেকে; সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র : ১৯৬৫ সাল থেকে; ইরাণ : ১৯৬০ সাল থেকে ইত্যাদি।

ডাঃ অমৃতলাল দত্তচৌধুরী

জাতি ধর্ম দল ও মত নির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসীর কাছেই আমাদের আবেদন—পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা একান্তভাবে ব্যক্তিগত ব্যাপার। এর সঙ্গে রাজনীতি বা ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। সীমিত পরিবার গঠন করে মা ও সন্তানের স্বাস্থ্য-রক্ষা পরিবারের সমৃদ্ধি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও পরোক্ষভাবে দেশের ও জাতির কল্যাণ সাধনই এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য।

কথাগুলো শেষ করে গ্রামের মানুষের বোঝবার উপযোগী ভাষায় লেখা কতগুলো সুন্দর সুন্দর পুস্তিকা দিলেন আমার হাতে। একটার পরিকল্পনা বেশ সুন্দর। স্কেচ করে আঁকিয়ে তার সঙ্গে গ্রামের মানুষের মুখের ভাষায় ছড়া কেটে কোট বোঝানো হয়েছে পরিবার পরিকল্পনার উপকারিতা। গ্রাম্য কথকতার ভঙ্গিতে, বলা অথচ মনে বেশ দাগ কেটে যাওয়ার ব্যাপার। আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে বইগুলো দেখছিলাম। অমৃতলালবাবু বললেন—প্রচারের আরো অন্যান্য দিক আছে। যেমন : (১) সংবাদপত্র এবং মূলতঃ স্থানীয় আঞ্চলিক পত্রপত্রিকা (২) হোর্ডিং (৩) পাবলিক মিটিং (৪) রেডিও (৫) ইনডিভিজুয়াল কনট্রাকট এবং (৬) চলচ্চিত্র। আমরা এখন স্থানীয় আঞ্চলিক গ্রামীণ পত্রপত্রিকাগুলোতে বিজ্ঞাপনের উপর জোর দিচ্ছি। যেমন ধরুন সাঁওতাল অধিবাসী অঞ্চলে সাঁওতালি ভাষায় প্রকাশিত কাগজে সাঁওতালি ভাষাতেই বিজ্ঞাপন দিয়েছি। দ্বিতীয়তঃ একটা গ্রাম্য জীবনে অঞ্চল-প্রধানের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার একটা স্কুলের প্রধান শিক্ষক কিংবা শিক্ষকের গুরুত্বও আমাদের কাছে অপরিসীম। যেহেতু গ্রামের মানুষকে পরিকল্পনা সম্পর্কে বোঝানোর ব্যাপারেও শিক্ষকের দায়িত্ব অনেকখানি। সেইজন্যে আমাদের স্বার্থে অহুত কোনো পাবলিক মিটিংয়ে গ্রামের শিক্ষকের উপস্থিতি ও সহযোগিতাও আমরা প্রার্থনা করি।

তৃতীয়তঃ যে জিনিসটা সেক্কাসুক্কি কাগজে কলমে বললে গ্রামের সাধারণ মানুষের মর্মমূলে আঘাত করবে না, সেই জিনিসটাকেই আমরা গান বাজনা মূকাভিনয় কিম্বা নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরি। এতে ফলও অনেক ভালো পাওয়া যায়।

—আচ্ছা দত্তচৌধুরী, প্রচারের কৌশল হিসাবে তো আপনি এতগুলো মিডিয়া বেছে নিয়েছেন। এর মধ্যে কোনটাকে সবচেয়ে বেশী কার্যকরী মনে হয়?

—সেইদিক থেকে বিচার করলে আমি বলব, ইনডিভিজুয়াল কনট্যাকট পদ্ধতিই

সবচেয়ে ভালো উপায়। অর্থাৎ ব্যাপারটা আপনাকে একটু বুঝিয়ে বলি। ধরুন কোনো গ্রামের একজন মহিলা পরিবার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত অস্ত্রোপচার গ্রহণ করার পর নিজেই সন্তোষ প্রকাশ করলেন। সন্তোষ প্রকাশ করলেন অর্থে নিজের ভবিষ্যৎ কত সুন্দর হলো সেটা বুঝতে পারলেন এবং আমাদের জানালেন। এই যে একজন নির্দিষ্ট মহিলা এই পরিকল্পনার দ্বারা উপকৃত হলেন, আমরা তখন সেই মহিলাটিকেই সবচেয়ে ভালো প্রচার-যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করি বা তিনিই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে বেশী প্রচারে সাহায্য করেন। কখনও স্বেচ্ছায় কখনও বা আমাদের অনুরোধমূলক নির্দেশানুযায়ী সেই মহিলাটিই তখন গ্রামের আরো ২৫।৩০জন স্ত্রীলোককে বলেন : এই পরিকল্পনার দ্বারা আমি উপকৃত হয়ছি। সময়ও লাগে না তাছাড়া কোনো ভয়ও নেই এতে। গ্রামের অন্যান্য ঘরের স্ত্রীলোক যখন শোনেন যে তাদেরই গ্রামের একজন মহিলা এরকম কথা বলছেন তার দ্বারা আমাদের পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের লাভ ও সুবিধা হয় অনেক।

তাছাড়া প্রচারের কাজ করে যে সমস্ত পুরুষ বা মহিলা প্রতিদিন একটি করে কেস সংগ্রহ করে আনতে পারবেন, তাদের কেসপিছু পাঁচ টাকা করে প্রমোটার মানি দিই। ইনসেনটিভ দেওয়ার জন্য।

কুড়ি বছরেরও বেশী সময় ধরে ডাক্তার দত্তচৌধুরী কাজ করে যাচ্ছেন এই বিভাগে। তাই প্রশ্ন রাখলাম—এই ধারায় প্রচার করতে গিয়ে কোনো মজার মজার অভিজ্ঞতা হয়েছে?

আমার প্রশ্ন শুনে উঁহু বলে জোরে হেসে উঠলেন। বললেন—অনেক, অনেক। ১৯৫৮ সালের এক কাহিনী শোনাই। দার্জিলিংয়ে গেছি এই ব্যাপারেই। তিন চারজনের আমাদের টিম। সবদিক থেকে সুবিধামতো দিনে স্থানীয় লোকদের আহ্বান করেছি এক সভায়। সেখানে নানা রোগের প্রতিকার সম্বন্ধে বলার পর আমরা বেই পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে বলতে উঠেছি এক বৃদ্ধ লাঠি নিয়ে রীতিমত তেড়ে এলেন আমাদের দিকে। আমাদের অপরাধ—আমরা নাকি এইসব প্রচার করে তরুণ ছেলেমেয়েগুলোর মাথা খাচ্ছি। আরো জোর হাসলেন অমৃতলালবাবু।

আমি অন্য কথা ভাবছিলাম—আমি ভাবছিলাম, সন্তান ঈশ্বরের দান কিংবা যিনি জীব দিয়েছেন যিনি আহার যোগাবেন তিনি—এরকম অন্ধবিশ্বাস আমাদের মধ্যে বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে এখনও প্রচুর। এই শত্রুটাকে হত্যা করতে সেরকম প্রচণ্ড কোনো প্রচার-যন্ত্র নিয়ে আমাদের প্রধানতম কর্তব্য, ঐ অন্ধবিশ্বাসগুলোকে আঘাত করা। সমূলে উৎপাটিত করা।

আনন্দ রায়

সংশোধন

বর্তমান বর্ষের 'অমৃত'-এর ১৪ সংখ্যায় ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া সম্পর্কে যে তথ্যগুলি পরিবেশন করেছেন, তা মনোরম হয়েছে। তবু সামান্য যে টেকনিক্যাল অসংগতিটুকু রয়ে গেছে তা টেলিফোনে কথা বলার সময় আপনি লিখিতভাবে জানাতে অনুরোধ করেছেন। সেইজন্যেই এই চিঠি।

শ্রীচট্টোপাধ্যায় বর্তমানে পূর্বাঞ্চল বিপণন বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার। আর আমাদের প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সার ইউরিয়া। যাতে সার অংশ বা নিউট্রিয়েন্ট আছে শতকরা ৪৬ ভাগ। আর পূর্বাঞ্চলে আমাদের যে সমস্ত কারখানা আছে বা নির্মিত হতে চলেছে, তা পশ্চিমবঙ্গ বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত। পূর্বাঞ্চলের বিপণন এলাকাও বস্তুত। এর মধ্যে আছে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার উড়িষ্যা আসাম মধ্যপ্রদেশ মণিপুর ত্রিপুরা মেঘালয় মিজোরাম অরুণাচল নাগাল্যাণ্ড সিকিম ও আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

দিলীপকুমার ঘোষ
(প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগের পক্ষে)
ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ

প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর
নেসকাফে®
স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়
নেসকাফে
শতকরা ১০০ ভাগ
খাঁটি কফি থেকে তৈরী
একমাত্র ইনস্ট্যান্ট কফি
NESCAFÉ
instant coffee
বিশ্বের সর্বাধিক
বিক্রীত কফি

আত্মপ্রতিকৃতি

রবীন মণ্ডল

চেতনার সুড়ঙ্গ বেয়ে সে কেবলই নিজেকে খোঁজে অবচেতনের অতলে। চেতনার রঙে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অনুভবগুলো পাখার মত রাঙা হয়ে ওঠে মনের আঙিনায়। সেই রং, রসই মূর্ত হয়ে ওঠে শিল্পী রবীন মণ্ডলের চিত্রলেখায়।

রবীন মণ্ডলের ড্রইং মূলতঃ মিউজিক্যাল বলেই বোধহয় আমাদের চৈতন্যে সাংঘাতিক ছায়া সঞ্চারিত করে। বাসকের রক্তে প্রতিধ্বনিত হয়। চিত্রে প্রতিটি চরিত্রের আকৃতি নিটোল। অথচ বলিষ্ঠ রেখাগুলো গতিময়। জোরালো। সাদা চিত্রফলকে কাল রেখার বেস্টনীতে প্রতিটি চরিত্রের সন্নিবেশ সাবলীল। গতিপ্রকৃতি ছন্দময়। যেন এক 'মিউজিক্যাল ভাইব্রেসন' ছড়িয়ে থাকে ছবিতে। এই রিদ্‌মিক রূপবাঞ্জতা রবীনের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য।

শিল্পীর রেখাধর্মী ড্রইং নানা বোধেছে ছন্দের ওপর। নানান ছন্দের নানান রূপ। আপাত দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বা সুসংহত মনে হয় না। অনেক হিজিবিজি জটিল রেখার, ক্রিয়াকলাপ থেকে বেরিয়ে আসে এক একটি রূপ। এ রূপ নিখুঁত প্রতিলিপি নয়। অথচ রূপে মূল কথাটুকুর সংবাদ স্ফটিকের মত স্পষ্ট। সেখানে নরনারী, পশুপাখি, গাছ, লতা, পাতার আকৃতি মরলোকের। স্বপ্নাদৃষ্ট নয়। আবার দৃষ্টরূপের সঙ্গেও তাদের সাজ সাদৃশ্য নেই। অথচ চিত্রের শরীরে এমন এক অস্তিত্ব আছে যে তাদের চিনে নিতেও ভুল হয় না। অর্থাৎ মানুষকে মানুষ এবং পাখি কে পাখি বলে চেনা যায়।

কৌনিক, অর্ধবৃত্ত, সমান্তরাল ত্রিভুজাকৃতি কিংবা আঁকা বাঁকা ঘোরানো রেখার বন্ধনী থেকে প্রস্ফুটিত হয় রূপকলা। কখনও বা বেরিয়ে আসে একটি করুণ মুখ। আবার কখনও বা প্রকাশিত হয় এক ক্রন্দসীর জলে ভেজা ভাগর দুটি চোখ। সেই অজস্র জটিল বক্ররেখার মধ্যে ক্রন্দসীর গালের এক ফোঁটা জল মুক্তা বিন্দুর মত টল টল করতে থাকে।

রবীন মণ্ডলের জন্ম ১৯৩২ সালে। ছেলেবেলায় ড্রইং করার তাগিদ অনুভব করেছিলেন জ্যেঠতুতো ভাইয়ের পেন্সিল স্কেচ দেখে। তখন থেকেই ক্যালেন্ডার অথবা বই-এর পাতায় যে সব ছবি দেখতেন তাকেই হুবহু আঁকতে চেষ্টা করতেন। দৃশ্যরূপকেও ধরে রাখতে চাইতেন কলমের আঁচড়ে। সেই অবধি ছবি আঁকা নিত্যকর্মের একটি অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠে শিল্পী দারুন অসুস্থ হয়ে পড়েন। একটানা চার বছর রোগ শয্যায় দিন কেটেছে। গভীর একাকীত্ব ছিল দিনগুলো। খেলাঘরের জানলা দিয়ে দেখা বেতু পীচের রাস্তার ধারে মন্দির। বিচিত্র মানুষের আনাগোনা। কানে ভেসে আসত ঘন্টার শব্দ। ফিরিওয়ালার হরেক রকম ডাক। এসব দৃশ্য, শব্দ রাসায়নিক ক্রিয়ার মত মানব মধ্যে কাজ করত। প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন হত ছবিতে। মাঝে মাঝে বাড়ীর ছোটদের হাতে দুচার পয়সা গুঁজে দিয়ে বসিয়ে রাখতেন প্রতিকৃতি আঁকবেন বলে। রোগশয্যায় এই চার বছরে শিল্পী হবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেছিলেন।

পড়াশুনায় চার বছরের বিরতিতে বীতিমত পিছিয়ে পড়েছিলেন। স্বভাবতই স্কুল ফাইন্যাল পাসও করে বেরোলেন বেশ বড় বয়সে। তবে চিত্র চর্চা চালিয়েছেন বিরামহীন। পাড়ার এক শিল্পরসিকের সান্নিধ্যে এসে এবং তাঁরই দৌলতে কিছু

ছবি আঁকার বই-এর সঙ্গে পরিচিত হয়ে শিল্পশৈলীর মূল বিষয়গুলো জেনে নেবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

বাড়ীর সঙ্গে সমঝোতা করে রবীন যখন সরকারী আর্ট কলেজে গেলেন তখন ভর্তির সেসব চুকে গেছে। প্রিন্সিপ্যাল অতুল বসু বললেন—ইউ আর টু আরলি ফর দি নেকস্ট ইয়ার। প্রত্যাশার ভাটা গড়লেও কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন পুরোদমে। অন্যদিকে অধিক শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের অভিপ্রায়ে আই. কম এ ভর্তি হলেন। এবং একের পর এক পরীক্ষার বেড়া ডিঙিয়ে ১৯৫২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-কম পাস করলেন।

: ঘটনার সংঘাতেই এক একটি মানুষের জীবনের মোড় ঘোরে এক এক পথে। যেমন ১৯৫২-৫৩ সালে এক চিত্র প্রদর্শনীতে নিজের ছবির স্বীকৃতির সুবাদে রবীন শিল্পের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন অসম্ভব রকমের। ঐ প্রদর্শনীতে শিল্পী তিনটি জলরঙের ছবি পাঠিয়েছিলেন সংশয়ে। ছবির তলায় লিখে দিয়েছিলেন 'নট ফর সেল'। ঐ প্রদর্শনীতে রামকিঙ্কর বেইজ ও হুসেনের কাজের সঙ্গে রবীনের একটি ছবি কর্তৃপক্ষের উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছিল। এই স্বীকৃতির জন্যে তিনি মানসিক দিক থেকে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। এই ঘটনার পর অনেক টাকার রং তুলি কিনে দ্বিগুণ উৎসাহে ছবি আঁকা শুরু করলেন।

আর একটি বিদেশী প্রিন্টের প্রদর্শনী শিল্পীকে নতুন চিন্তার আলোকে উদ্ভাসিত করেছিল। পেছনে ফেলে আসা আলো আঁধারে ভরা সেই দিনগুলোকে শিল্পী স্মরণ করলেন,—তখন কলকাতায় ইমপ্রেসনিস্ট ও পোস্ট ইমপ্রেসনিস্ট বিদেশী শিল্পীদের কিছু প্রিন্টের এক মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল। আমি প্রিন্টস দেখে ভীষণ ইনসপায়ার্ড হয়েছিলাম।

তখনই মনে হয়েছিল ট্রোটাস ট্রাডিসনাল থেকে দূরে সরে গিয়ে ওরা যদি নতুন শিল্পবোধে দীক্ষিত হতে পারে ত আমরা পারব না কেন? রং ও তুলিতে নতুন আস্বাদ পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। প্রচলিত ধারণার বাইরে কিছু একটা করতে হবে এই চিন্তাতেই অহরহ আহত হতে লাগলাম। ব্যাকরণগত শিল্প আঙ্গিককে আত্মীকরণের অভিপ্রায়ে ভর্তি হলাম ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে। তখন কলেজের অধ্যক্ষ সতীশ সিনহা ১৯৫৬ সালে কলেজ থেকে বেরিয়ে পেটের তাগিদে চাকরী নিলাম এক কারখানায়। সেখানে বছর চারেক কাজ করার পর মোটামুটি ভদ্রগোছের একটা চাকরী পেলাম। এই করে বছর বেশ কিছু ছবি এঁকেছিলাম। তার থেকেই গোটা ত্রিশেক ছবি নিয়ে ১৯৬১ সালে অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস প্রদর্শনী করলাম ভয়ে ভয়ে। তেলরঙের আঁকা শ্রমিক, কারখানার জীবন ও কিছু ল্যান্ডস্কেপ ছিল প্রদর্শনীতে।

অধিকাংশ সংবাদপত্রে প্রশংসিত সহকারে প্রদর্শনীর সমীক্ষা ছাপা হয়। নিন্দাসূচক বিরূপ মন্তব্যও যে আসেনি এমন নয়। তবে ভেঙ্গে পড়িনি। বরং উৎসাহিতই হয়েছিলাম। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারীতে রবীন মণ্ডল ও তাঁর কিছু শিল্পী বন্ধু সম্মিলিতভাবে দিল্লীতে চিত্র প্রদর্শনী করে প্রভূত সমাদর পেয়ে সেই বছরের ডিসেম্বর মাসে পুনরায় সেখানেই আর একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এই শিল্পীগোষ্ঠীকে সেখানকার শিল্পানুরাগী ও কলা সমালোচক—'এ গ্রুপ অফ আর্টিস্ট ফ্রম কালকাটা' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। কলকাতায় ফিরে এসে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা এক ছত্রছায়াতলে সংঘবদ্ধ হলেন। প্রকাশ কর্মকার, মহিম রুদ্র, বিজন চৌধুরী, গোপাল সান্যাল, বিমল ব্যানার্জি গুন রবি নিখিল বিশ্বাস ও রবীন মণ্ডল একত্রিত হয়ে সৃষ্টি করলেন 'ক্যালকাটা পেন্টারস' শিল্পগোষ্ঠীর। এখন অবশ্য এই গোষ্ঠী অনেক বড় হয়েছে। আরও অনেক নতুন মুখের আবির্ভাব হয়েছে স্বাভাবিক কারণে।

ক্লেশবিদ্ধ জীবনের যন্ত্রণাকাতর চিত্রই রবীন মণ্ডলের শিল্প রহস্যের যথার্থ প্রাণবন্ত। প্রাগৈতিহাসিক চরিত্রের চিত্রময় বর্ণনেই বক্তব্যের বিকাশ। অত্যাচারিত, শোষিত, নিরন্ন মানুষের আকুল আর্তি বা সমাজ বিগর্হিত প্রেমের উজ্জ্বল আক্তিম চিত্র প্রতিভাত হয় শিল্পকর্মে। প্রিমিটিভ ওয়ার্ল্ড কিংবা ম্যানিয়েসটেন সিরিজের কাজগুলোতে ব্যথাদীর্ণ অন্ধকার জীবনের প্রতিচ্ছবি মূর্ত হয়ে ওঠে। ক্রিয়েশন মিথ সিরিজের চিত্রাবলীতে নরনারীর যৌন মিলনের তীব্র ক্ষুধা ও আত্যন্তিক আকাঙ্খার অভিব্যক্তি। 'ওম্যান' এই শিরোনামে বেশ কিছু সংখ্যক ড্রইং ও মিকসড

বাংলা সাহিত্যের অদ্বিতীয়া লেখিকা
আশাপূর্ণা দেবীর
সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুবৃহৎ উপন্যাস

কখনো দিন কখনো রাত

লেখিকার 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' 'সুবর্ণলতা' 'বকুলকথা' যাঁরা পড়েছেন—তাঁদের অবশ্যপাঠ্য। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম এক স্মরণীয় উপন্যাস
॥ ত্রিশ টাকা ॥

বিমল মিত্রের
বিষয় বিষ নয় ৭৲ আমি ১৬৲
পরস্ত্রী ২৫৲ তিন ছয় নয় ৮৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
পাও নাই পরিচয় ৫৲
হিন্দী ফিল্মে রূপান্তরিত হয়েছে—হিন্দী ও গুজরাটি ভাষায় অনূদিত

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
বাজীকর ১৬৲ বিদেশিনী ৪৲
কাঞ্চন রাগিনী ৮৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
কিরীটী অমনিবাস
৮ম ও ৯ম খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে।
প্রতি খণ্ড ১৫৲

অমর সাহিত্য প্রকাশন, ৭, টেমার লেন, কলি-৯

রবীন মণ্ডলের আঁকা

মিডিয়া চিত্রকলার মাধ্যমে শিল্পী নারী জাতির অন্তর্বেদনার স্বরূপ প্রকাশে প্রয়াসী হয়েছেন। এসব ফসল সত্তর দশকের। বুল, ফ্রগ, এলিফ্যান্ট প্রভৃতি প্রাণীর দেহসৌষ্ঠব-চিত্র রবীনের তুলিতে নতুন বলে মনে হয়। কারণ ইতিপূর্বে এধরনের বর্ণনা তাঁর ক্যানভাসে দেখিনি। এদের আকৃতি এবং প্রাগৈতিহাসিক ভয়াবহ। সারা গায়ে অলঙ্করনের কাজ।

রবীন মণ্ডলের বড় মুন্সিয়ানা প্রকাশ-প্রণালীতে। তিনি কতিপয় হতাশাব্যঞ্জক করুণ অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তিকে চিত্রিত করেছেন কৌতূহলোদ্দীপক। অথচ হাস্য-রসাত্মক ভঙ্গীতে। যেমন বস্তীর শীর্ণকায় মানুষ কিংবা ফুটপাথের কঙ্কালসার নারী শিল্পীর তুলিতে রূপলাভ করেছে ছেঁড়া কম্বল গায়ে, নগ্ন পদে রাজকীয় মূর্তিতে, অথবা বিবর্ণ প্রায় নিরাবরণ নারী যাণীর বেশে। এইভাবে পরিহাসচ্ছলে তির্যক প্রথায় রবীন মণ্ডলের তুলি সোচ্চার বিদ্রোহে মুখর হয়ে উঠেছে।

শান্তস্বরূপবাক, সমাহিত এই ব্যক্তিত্বটি কিন্তু নীতির লড়াইয়ে নির্মম, মুখর, নিষ্ঠুর। সেখানে কোন সমঝোতা নেই। আপোস নেই। তার জন্যে তাঁকে কম কথাও শুনতে হয়নি। যেমন ব্রথেল পর্যায়ের চিত্রাবলী দেখে এক বিশিষ্ট শিল্পরসিক বলেছিলেন—ইউ আর এ ডিবচার। আবার বার্থ অফ ম্যারেজ সিরিজের দোমড়ানো মোচড়ানো ক্ষতবিক্ষত যীশুকে দেখে এক ভদ্রলোক বলে বসলেন—ইউ আর ভেরী ব্রুটাল।

রবীনের সাম্প্রতিক চিত্র চর্যায় অনুষঙ্গের রদবদল হয়েছে। তিনি ভীড় থেকে সরে আসতে চাইছেন। যেন জনারণ্যের কোলাহল থেকে নির্জন, একক অস্তিত্বের খোঁজে বিলীন হতে চাইছেন। গ্রুপ আইডেনটিটি থেকে সলিটারি আইডেনটিটির দিকে যাত্রা। বাল পটের ওপর লাল, নীল, কিংবা সবুজের ছোঁয়ায় প্রস্ফুটিত হয় শেষ রাতের শুকতারার মত কোন নিঃসঙ্গ বিষণ্ণ মুখ। এ মুখের প্রতিটি রেখা ও বলি রেখা আমাদের ভীষণ চেনা। তবে এ ভাবাসঙ্গে ঘটনার প্রতিফলন প্রত্যক্ষ নয়। কেবল তার নির্যাসটুকু নিয়ে যেন পঙ্কের মধ্যে পঙ্কজের অন্বেষণ।

রবীনের প্রাথমিক পর্যায়ের ছবিতে একটা ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্যের মৃদু স্পর্শ ছিল বটে। কিন্তু পরের অধ্যায়ে ইমপ্রেসনিস্টিক-এ্যাবস্ট্রাকটিভ এবং তৎপরবর্তী চিত্রাবলীতে কিছুটা কিউবিস্টিক চিত্র রীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অধুনা সেই প্রভাবমুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত।

তেলরঙে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেও মিকসড মিডিয়ার কাজেও সমান পারদর্শী। জলরঙের সঙ্গে কালির সংমিশ্রনে সৃষ্ট কাজগুলোতে এমন জমাটি ভাব ফুটে ওঠে যে তৈলচিত্র বলে ভ্রম হতে পারে। পেন অ্যান্ড ইনক এর কোন কোন ড্রইং-এ অত্যন্ত স্বচ্ছ জল রঙ-এর হাল্কা প্রলেপে ছবির পরিবেশ মোলায়েম হয়ে ওঠে। কখনও বা স্পাটুলা দিয়ে আবার কখনও টিউব থেকে সরাসরি রঙ ঘষে ক্যানভাসের শরীরে সৃষ্টি করেন অতীন্দ্রিয় কালোছায়ার খেলা।

নিজের ছবি সম্পর্কে রবীন মণ্ডলের অভিমত—প্রচলিত বিশ্বাস ও ধারণার বাইরে গিয়ে একটা নতুন ধারা গড়তে চাই। স্টাইলাইজেসনের দিকে অবশ্যই ঝোঁক আছে। চেষ্টাও করছি। সজ্ঞানে নয়। অবচেতন থেকে। অনেক কিছুই মনে রেখাপাত করে। সেইসব প্রতিক্রিয়াকেই ফুটিয়ে তুলতে চাই নিজের মত করে। মিষ্টি মিষ্টি ছবি আঁকতে ভাল লাগে না। এ ছবি দর্শকদের সাময়িক মুগ্ধ করলেও দীর্ঘদিন ধরে রাখতে পারে না। মোঘল, কাংড়া কুলুর কাজ ভাল লাগে বটে। কিন্তু তেমন করে মনকে টানে না। যুগের কথা বলতে গিয়ে প্রিমিটিভ কিংবা ট্রাইবালদের 'রাফনেস' ও সিমপ্লিসিটি মনের গভীরে কাজ করে। পলিটিক্যাল ঘটনার সংঘাত আমার ছবিতে আসে। তবে ডাইরেকট নয়।

রবীন মণ্ডলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তাঁর প্রিয় শিল্পীদের কাজ সম্পর্কে। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন—কতজনের নাম করব? দু'একজনের কথা বলি। পিকাসোর বোল্ডনেস, ডেসপারেটভাব এবং ছবিকে ছবির বাইরে নিয়ে যাবার ব্যাপারটা ভাল লাগে। মাতিসের ছবির বিশুদ্ধতা, দুবুফের টোটাল টেকসচারাল এফেক্ট এবং যামিনী রায়ের ফর্ম ভাল লাগে। রবি ঠাকুরের, চিত্রের টোটাল ব্যাপারটা ভাবায়। ডিকুনিং চাইল্ডস সিমপ্লিসিটি দেখে বিস্মিত হই।

রবীন মণ্ডলের অস্তিত্ব ঘিরে এখন এক অস্থিরতা। তিনি বোধহয় তাঁর শিল্প-ভাবনার মোড় ফেরাবার মধ্যবর্তী একটা পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে চলেছেন। আর আমরা নতুন কিছু দেখার অপেক্ষায় দিন গুনছি।

প্রশান্ত দাঁ

'যুগের প্রয়োজনে বেশভূষা, খাওয়ার মেনু, সাহিত্য, নাটক সবই বদলাবে—আর গানের সুর বদলাবে না? তবে যত পরিবর্তনই আসুক শেকস্‌পীয়র, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, আলাউদ্দিন খাঁ-র সম্মান চিরদিন অপরিবর্তিতই থাকবে। কারণ ক্ল্যাসিক্যাল আর্ট-এর মূল্য কোনোদিন বদলায় না।'

নির্মল ভট্টাচার্য

বাংলা গানের অনেক স্মরণীয় সুরকারের নামের ভীড়ে যে নামটি বারবার হারিয়ে গিয়েও হারায় না আকাশে-বাতাসে ছড়ানো অনেক অতি জানা সুরের আড়ালে থেকেও যাঁর সুর হাস্নাহেনার মৃদু সুরভির মত অগোচরেই সারা মনকে মধুরতায় ভরিয়ে দেয় সেই সুরকারের নামটিই হোলো নির্মল ভট্টাচার্য। ওঁরই দেওয়া সুরের একটি গান হোলো 'এ পথে যখনই যাবে' অনিল ভট্টাচার্যর কথা। গেয়েছেন সুপ্রভা সরকার। ঐ গানটিই যেন নির্মলবাবুর সুরের চরিত্রকে নিখুঁতে মেলে। ওঁর দেওয়া সুর মনের মধ্যে ঠিক এরকমই একটা মধুর বেদনার রেশ রেখে যায়। স্কুলে পড়বার সময়ই ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যর একটা গান শুনেছিলাম 'আমায় তুমি ভুলতে পার কেমন ক'রে ভুলবে আমার গান?'

কার গান? তখনই শুনলাম নির্মল ভট্টাচার্য নামটা। ঐ একই শিল্পীর কণ্ঠে ও কারোরই সুরে গাওয়া 'তোমার চরণ ছুঁয়ে ধরে' আজও আমার মনকে দোলায়' 'তোমারে যে ভালবাসি এই মোর অভিমান' 'ঘুমাঘুমাঘুম' 'ওগো গুণী বাজাও শুনি' 'বাজানো রাতের সাঁঝ (তুমি)' 'মাথায় যখন আমার মালা মালিনী' 'মোর চোখো অনুরাগে —এতবারই শুনি ইচ্ছে করে আবার শুনতে। ভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে, ভিন্ন সুরে। সন্তীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে শুনেছি 'যদি আসে কভু কিশলয়ের বেলা' ও 'পথিকা বিকল বাঁশরী' গেয়েছেন সাবিত্রী চ্যাটার্জি (ভুল ছেঁড়া তবু আমার ফুলের মালাতে 'আমি ফুলের মত ঝরে যেতাম' আশা গেয়েছেন তালাত মামুদ। 'আকাশ যদি ঘুমে ভেঙে যায় চাঁদ' (আলোকলতা মোরে)। পান্নালাল ভট্টাচার্য গেয়েছেন বীণা বাজিয়ে গেলে মোর স্বপনে ও সব কথা তুমি না শুনে গিয়েছো চলে। ওঁর সুরে ছড়ার গান গেয়েছেন আশাপনা বন্দ্যোপাধ্যায়। উৎপলা সেনের কণ্ঠে শুনেছি গান কে আমার প্রদীপ শিখার মত গানের বলাকা ভেসে যায় প্রিয় ও রাতের কবিতা শেষ করে দাও এবার ঘুমাও কবি। এই রাগ ভিত্তিক কারুকৃতি অলংকারের ঝলমলে আলোভরা সুরেই আবার আড়ালের হাসি সরলতায় যেন এপ্রতারা হয়ে রেকেছে কেতকী মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে বেলা যে ফুরায় আধার ঘনায় সেদিন ডাকবে কেন ওরে পরদেশী ও আমি সন্ধ্যাবিহীন একা আঁধার ঘর বাহিরে বাদল ঝরে।

বিভিন্ন শিল্পীর নেজাজ কণ্ঠ ও গানের কথার চাহিদায় সুরের রূপ পাল্টেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু পরিবর্তনের এই স্রোতের মধ্যে ও অপরিবর্তনীয় অর্ঘ হোলো সুর-স্রষ্টার সংবেদশীল মনের পরশ। এই মনটি সুরের সঙ্গে মিশে আছে বলেই সে গানে নেমেছে এমন মনভেজানো কোমলতার ছল। অনেক কাজে-ঠাসা অন-বকাশের মুহূর্তের কোনো ফাঁকে হঠাৎ যখন কানে আসে কেমন ক'রে ভুলবে আমার গান অভিমানভরা সীড় (ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য) কিংবা এবার ঘুমাও কবির (উৎপলা) চরণটিতে ক্লান্ত মনের ওপর আদরভরা সুরের রেশ ও পথিক আপনাকে বিলিয়ে দেবার আবেগে দুহাত ভরিয়া দেব ফুলে-এর অঞ্জলি? সেসবই ও ঐ মনটিরই কথনা। এসব গান শুনে মনে হয় না এমন মানুষ কেউ আছেন কিনা আমার জানা নেই।

তবু ভাবতে অবাক লাগে নামটি সবাই চিনলেও তাঁর সুরের স্রষ্টাকে অনেকেই চেনেন না।

একালের গান

এই প্রসংগেই মনে এলো বিনুদার (ঐ নামেই উনি শিল্পী এবং ভক্ত মহলে পরিচিত) কাছে শোনা একটি গল্প। একবার আমার সুরে ধনঞ্জয়ের একটা রেকর্ড বেরিয়েছে। আমি মেলডিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যর ঐ গানের রেকর্ডটা আছে? কাউন্টারের ভদ্রলোকটি সংগে সংগে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন একখানিই আছে। নেবেন? কাল আর থাকবে কিনা সন্দেহ। একে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যর গলা। তার ওপর সুধীরলাল যা দারুন সুর দিয়েছেন।

বললাম কিনব না। শুনব। নেহাৎ দোকানে গিয়ে পড়েছিলাম বলেই শুনতে চাইলাম। নইলে একথা শোনবার পরই মনটা এমন ভরে উঠেছিলো যে ও রেকর্ড শোনবার আর দরকার ছিলো না।

কেন?

বয়সে ছোটো হলেও সুধীরলাল এত-বড় সুরকার যে তাকে আমি প্রণাম করি—বলে সত্যিকারই দুহাত অঞ্জলিবদ্ধ করে মাথায় ঠেকালেন) তার সংগে এক নিঃশ্বাসে আমার নাম উচ্চারিত হোলো এর চেয়ে বড় গৌরব আমার মত মানুষের আর কি থাকতে পারে?—

এই বিনয় আবেগ ও নাট্যরসের এক উপভোগ্য সমন্বয় হলেন বিনুদা ওরফে নির্মল ভট্টাচার্য। ওঁর মনের মধ্যে সবসময় আবেগের জোয়ার বইছে। তারই ঢেউ যেন ওঁর চিত্ততটের সীমা পেরিয়ে আছড়ে পড়ে চারপাশের মানুষের মনেও। কোনো গান শুনে কোনো লেখা পড়ে অথবা কারো অভিনয় দেখে ভাল লাগলো বস। আর রক্ষা নেই। ওঁর উচ্ছ্বাসী মন মুখর হয়ে উঠলো। সামনে যাকে দেখলেন তারই কাছে শতধারে যেন উচ্ছলিত হতে লাগলো—আহা কি গান গেয়েছে আহা কি লেখা লিখেছে। কি সুর কি ভাষা কি একসপ্রেশন? আমার মাথাটা ওর পায়ের ওপর ঠেকাতে ইচ্ছে করছিলো। সত্যিই দেখেছি ওঁর চেয়ে বয়সে ছোটো অনেককে প্রণাম করতে উদ্যত হয়েছেন—তাঁদের লজ্জায় একাশেষ করে দিয়ে। স্পর্শকাতর শিল্পী মন। একটু ছুঁতে না ছুঁতেই দুলে ওঠে। শিল্পী অনেক আছেন। কিন্তু এমন শিল্পী মনের অধিকারী খুব অল্পই দেখেছি। দেখেছি কারো ওপর তিনি হয়ত কঠিন ক্রুদ্ধ কিন্তু যে মুহূর্তে তার মধ্যে সুন্দর কিছুর বিকাশ দেখলেন অমনই ছলছল চোখে তাকে প্রণাম করবার জন্য পায়ের দিকে হাত বাড়াচ্ছেন। সকল বিরূপতা গলে জল হয়ে গেছে কখন। সেকথা নিজেও জানেন না।

কোনো নামকরা শিল্পীর প্রসংগে হয়তো কেউ মন্তব্য করলো অমুকের গানের জন্য সরাই কেন যে এমন পাগল হয়? আমি ওঁর একটা গানও মনে করতে পারি না যেটা ভালো লেগেছে।

ওরে বাবা! অমন কথা বোলো না। ও মস্তবড় শিল্পী বলেই চোখ বুঁজে ভুরু কুঁচকে মাথাটা ওপর দিকে তুলে আবার উচ্চারণ করেন ম-অ-স্ত বড় শিল্পী। কি ব্যাপার জান? কথা বলতে বলতে একমুখ পান গলায় আটকে বিষম লেগে গেলো কাশি সামলাবার আগেই আবার ব্যাকুলভাবে বোঝানর চেষ্টা করলেন—ব্যাপারটা হচ্ছে ওর গলার উপযোগী গান ওকে গাইতে দেওয়া হয় না। ফরমাসের গন্ডীতে ওকে আটকে রাখা হয়। ওকে আটকে থাকতে হয়। বলার সংগে সংগে কণ্ঠস্বরের চড়াই উতরাই-এর উত্তেজনা ওঁর উদগ্রীব চিত্তকে যেন ছবির মত মেলে ধরে।

বাটা ভর্তি পান সৌখীন জর্দা হিমছাম বেশভূষা জমাটি স্বভাব সব মিলিয়ে উনি জারী ইনটারেস্টিং। শিল্পীরা ওঁকে অন্তরের থেকে ভালবাসে। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মত বাঘা বাঘা শিল্পীদেরও দেখেছি গান গাইতে বসবার আগে ওঁকে প্রণাম করতে।

আর্টিষ্ট হৃদয় ওঁর পারিবারিক সম্পত্তির মতই। আর ওঁর সংগীত প্রতিভা সহজাত। বাংলা গানের পয়লা নম্বরের গীতিকার 'অনিল ভট্টাচার্য ওঁর সেজদা। প্রখ্যাত ক্রীড়া সমালোচক কমল ভট্টাচার্য ওঁর আর এক দাদা। ওঁর এই স্পোর্টিং নেচার মানে যার ওপর এই মুহূর্তে রাগ করছেন পরমুহূর্তে তাকে বুকে টেনে নিচ্ছেন—এও পারিবারিক সম্পদ। আর কথাবার্তার নাট্যরস? এর মূলে আছে ওঁর অভিনয় প্রতিভা।

নির্মল ভট্টাচার্য একদা নামকরা খেলোয়াড় ছিলেন। সৌখীন অভিনেতা বেতারশিল্পী এবং আকাশবাণীর সংগীত প্রযোজক। প্রত্যেকটি বিষয়েই তিনি যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু কোনো বিষয়কে আঁকড়ে ধরে থাকেননি তাঁর অ-পেশাদারী মানসিকতার জন্য। ইনি সুন্দরের উপাসক। কিন্তু উচ্চাকাংখী নন। তবে কোন শৈশবে গানকে ভালোবেসে-ছিলেন। সেই মুগ্ধতাই রয়েছে ওঁর হৃদয় জুড়ে। তাই গুণীর প্রতি ওঁর এত সম্ভ্রম। এত ভালোবাসা।

অমৃতবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষ গুণ-গ্রাহী বলেই ওঁকে পত্রিকার কাজ দিয়ে তাঁকে রেখেছেন। নইলে আজ এ সাক্ষাৎকার লেখা হয়ত সম্ভব হোতো না।

ওঁর সম্বন্ধে যে সংবাদটি আমায় বিস্মিত করেছে সেটি হোলো এই যে ওঁর এমন অসাধারণ সুরসৃষ্টির পিছনে কোনো গুরুর তালিম নেই। নেই কোনো সু-সংবদ্ধ রেওয়াজ কোনো পরিকল্পিত স্বরসমন্বয়। ওঁর সেজদা একাধারে ওঁর গুরু বন্ধু ঈশ্বর সবই। কিন্তু তাঁর কাছ থেকেও কোনো শিক্ষা পাননি। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের শেখাচ্ছেন আর ইনি আড়াল থেকে শুনে বন্ধুর বাড়ী বসে হার্মোনিয়ম বাক্সায় রেওয়াজ করে নিচ্ছেন। ঐ অবধি। সেজদার দেওয়া সুরে গাওয়ার চেয়ে সেজদার গান নিজের সুরে গাওয়ার দিকেই ওঁর ঝোঁক ছিলো বেশী। সেজদা এধার ওধার গেলে আমি ওর খাতা থেকে গান টুকে নিতাম আর নিজের মনে সুর দিয়ে গাইতাম। এজন্য সেজদার সংগে কত যে চুলোচুলি হয়েছে। একবার সেজদা এক ছাত্রীকে গান শেখাচ্ছেন। শুনে তিনি বললেন—এ গানের ত অন্যরকম সুর। কে বললো? সেজদা ত মহা খাপ্পা। এই ত সেদিন রেডিওতে গাইছিলেন। কে একজন বললো উনি আপনার ভাই। মোটেই না। ও আমার ভাই নয়—সেজদা অপ্রসন্ন মুখে বলেন। তারপর বাড়ীতে এসে আমার ওপর মারমুর্তি। আমি ভালমানুষের মত চুপ করে থাকতাম। পরের দিন আবার ওঁর গান টুকে নিয়ে নিজের সুরে গাইতাম। শেষকালটা সেজদা হাল ছেড়ে দিলেন।

এসব গল্প বিনুদার কাছেই শোনা। সেজদা হেসে বলতেন ঐ গলার আড্ডায় বসে গল্প করা যায়। খাওয়া যায় চেঁচানো যায়। কিন্তু গান গাওয়া যায় না। বলতেন। তবু রোজ সকালে উঠে নগেন্দ্র কৈবিনে চা খেতে যাবার সময় (বাড়ীতে তখনও চায়ের রেওয়াজ হয়নি) আমায় নইলে তাঁর চলতো না। একদিন। সেটা ছিলো ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪৪। সেদিন বেতার জগতের কভার পেজে আমার একটি ছবি ছাপা হবে জানতাম। চা খেতে যাবার একটু আগে বাড়ী থেকে বেরিয়ে স্টলে গিয়ে টুক করে একটা বেতার জগৎ কিনেই রাপারের তলায় লুকিয়ে বাড়ী এলাম। দেখি সেজদা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। কোথায় গিয়েছিলি? চা-তেষ্টায় মরে গেলাম?

সেজদা এক মিনিট। তুমি এগোও আমি তোমায় ধরে ফেলছি। বলেই সেজদাকে লুকিয়ে (ওর ঠাট্টার ভয়ে) দৌড়ে ঘরের মধ্যে বেতার জগৎটা রাখতে গেলাম। পেছন থেকে হঠাৎ চাদরের খুঁটটা টেনে সেজদা

বঙ্গশ্রী হাওড়া
৪১/১, জি, টি, রোড, হাওড়া
• বেনারসী
• জোড় • সিল্ক
• তাঁত • মিল
• গোষাক
• সাটিং • সুটিং
ওছিটকাপড়

উঠলো ... থেকে প... নিয়ে দেব... বললো এবপর ... নয়।

ওর খুব আনন্দ হলে এইভাবেই কথা বলতো। কিন্তু ঠাট্টাটা কিরকম প্র্যাকটিক্যাল জোক হয়ে দাঁড়ালো দ্যাখো? পরদিন—মানে ১৯৪৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর সেজদার আকস্মিক মৃত্যু সমস্ত সংগীতজগতকে স্তম্ভিত করে দিলো।

এবং সেই দিনটি থেকে আমিও খেলা খেলা অভিনয় ছেড়ে গানেই নিজেকে ঢেলে দিলাম। সেজদার সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রতিজ্ঞায় গানই হয়ে উঠলো জীবনের ইষ্টমন্ত্র।

আপনাদের এই গানের প্রেরণা এসেছিলো কোথা থেকে? বাবা মা কেউ গান গাইতেন?—এতক্ষণে বিনুদাকে প্রশ্ন করবার অবকাশ পাওয়া গেলো।

আরে না না—আমার বাবা অমৃতলাল ভট্টাচার্য গান-বাজনার ধারও ধারতেন না। তিনি তাঁর ছোটোখাটো একটি ব্যবসাতেই সারাদিন রাত ব্যস্ত। আর মা (জগদম্বা দেবী) সংসার সামলাতে সামলাতে নিঃশ্বাস নেবার সময় পেতেন না—(আবার গলায় পান আটকানো কাশি সুরু হোলো) আমার মেজদা সুশীল ভট্টাচার্য কমার্শিয়াল আর্টিস্ট ছিলেন। তাঁর হাতে একবার একটি বেহালা এসে গিয়েছিলো। সেই বেহালা বাজানোর চেষ্টায়-গান হয়ে দাঁড়ালো ওঁর নেশা। সেই নেশা আমাদেরও পেয়ে বসলো। আমার বন্ধু শিবদাররাগানে। বোসপাড়ায় ছিলো আমাদের নিজেদের বাড়ী। সেখানে সারা বছর ধরে যাত্রা থিয়েটার কালী কীর্তন লেগে থাকতো। আমাদের ছ ভাই (এখন তিন) সারারাত জেগে সেসব গিলতাম বললেও অত্যুক্তি হয় না।

এইসব শুনতে শুনতেই গানের রুচি-প্রকৃতি গড়ে উঠলো। নিজের সুরে গান গাওয়ার অভ্যাস তখন থেকেই। সেজদার গান রচনার ইতিহাস শুনবে? একবার ইন্টার কলেজ আধুনিক সংগীতের প্রতিযোগিতায় একটি গান নিজের সুরে গেয়েছিলো। তখন রবীন্দ্রসংগীত বলে আলাদা কোনো বিষয় ছিলো না) গানটি রবীন্দ্রনাথের। জাজদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে অরুন্ধতী দেবী (আগের) দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং উমাপদ ভট্টাচার্য। সকলের বিচারে সেজদাই প্রথম হয়েছিলো। শুধু দীনু ঠাকুর ওকে গোল্লা বসিয়ে দিলেন। তারপর ডেকে খুব তিরস্কার করে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের গান নিজের সুরে গাও? এতবড় সাহস, ইস কি করে? বিচারমণ্ডলীর প্রস্তাব করছিলেন কলেজ ওকে স্পেশাল ফার্স্ট করা হোক। উনি তাতেও রাজী নন। বললেন—তাতে তু স্পেশ্যাল কৃতিত্ব দেওয়া হয়। অগত্যা শাস্তিস্বরূপ ওকে সেকেন্ড করা হোলো।

সেদিন বাড়ী এসে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে ও কেঁদেছিলো আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলো আর কখনও অন্যের গান গাইবে না। সেইদিন থেকে সেজদার গান লেখা ও সুর দেওয়া সুরু হোলো।

১৯৩৪ সালে আমি স্কটিশচার্চ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করি। আমাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিলো না। গানের টিউশনি করেই পড়ার খরচ চালাতে হোতো....

কিন্তু তখনকার দিনে...গানের টিউশনি করে পড়ার খরচ...যে যুগে গান মধ্যবিত্ত সমাজে অপাংক্তেয়?

—আমি জিজ্ঞেস করি।

আজকের মত এমন ঘরে ঘরে গান ছিলো না। কিন্তু গান যাঁরা ভালবাসতেন—তাঁরা একেবারে পাগলের মতই এতে ডুবে যেতেন। তখন গানের শিক্ষককে কেউ গানের টিচার বলে অবজ্ঞা করতো না। বলতো গুরু ওস্তাদ। গুণী বলে সম্মান করতেন। যদিও আমি গুণী নই কোনোদিনও ছিলাম না। কিন্তু গানের প্রতি আমার সবটালা ভালোবাসাই তাঁদের মধ্যে এ ভ্রম জাগাতো।

কিন্তু সেজদার সংগীত নিষ্ঠার কাছেই আমার সংগীত প্রেমের হাতে খড়ি। সেজদা ছিলো বিজ্ঞানের ছাত্র। ষ্ট্যান্ড করে স্কলারশিপ পেয়ে বি এস সি পাশ করেছিলো। কিন্তু এ বিদ্যাকে কখনও অর্থোপার্জনের কাজে লাগায়নি। সংগীতেই সে ছিলো আত্মহারা। তখনকার দিনে শুধুমাত্র গানের টিউশনি করে সেজদা হাজার টাকারও বেশী উপার্জন করতো ভাবতে পার?

না পারি না। কিন্তু আপনি গান শিখলেন কেমন করে?

সেজদার গানের সংগে তবলা বাজিয়ে আর যাত্রা থিয়েটার শুনে?

তবলা শিখলেন কার কাছে?

নিজে নিজেই ঠেকা দেবার চেষ্টা করে?

আপনি কোনোদিন কারো কাছে কিছু শেখেন নি? আপনার কোনো গুরুই ছিলেন না?

বলেছি ত সেজদাই আমার একমাত্র গুরু। ওর গান আর তন্ময়ভাবের কাছেই আমার সংগীতের দীক্ষা।

কি বলছেন আপনি? বিস্ময়ে আমি হতবাক. আপনার সুরে ক্ল্যাসিক্যাল গানের অমন সুস্পষ্ট ছায়া? সে কি গুরু তালিম ছাড়া সম্ভব?

গুরু আছেন এইখানে নিজের বুকে। তর্জনীর টোকা মেরে বলেন ওঁর সেই নাটকীয় ভংগিতে।

— নতুন নাটক প্রকাশিত হোল —

বিজয় তেন্ডুলকরের
চোপ আদালত চলছে
৫·০০
বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত একটি বলিষ্ঠ যুগপযোগী নাটক।

শক্তিপদ রাজগুরুর
মেঘে ঢাকা তারা
৫·০০
একটি অনন্যসাধারণ নাটক
৫ম মুদ্রণ

— অন্যান্য নাটক —

ঘুর্ণি — শম্ভু মিত্র
অন্ধকারের বৃত্ত — গঙ্গাপদ বসু
অংশীদার — গঙ্গাপদ বসু
হারানো চিঠি — অমিতা রায়
বড়ো পিসিমা — বাদল সরকার
অমাবস্যার মৃত্যু — মন্টু গঙ্গোপাধ্যায়
জীবন জিজ্ঞাসা — মন্টু গঙ্গোপাধ্যায়
নায়কের সন্ধানে — মন্টু গঙ্গোপাধ্যায়
আজ অভিনয় বন্ধ — বীরেন্দ্র পালচৌধুরী
দুই রাত্রি — নীহাররঞ্জন গুপ্ত
তথাস্তু — সুশীল মুখোপাধ্যায়
অমিত্রাক্ষর — সুশীল মুখোপাধ্যায়
বাঁধ — সুশীল মুখোপাধ্যায়
গল্প বলুন — সুশীল মুখোপাধ্যায়
কাঞ্চনরঙ্গ — শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র
আজকের নাটক — সুশীল মুখোপাধ্যায়
তোমার হলো সুরু — সুশীল মুখোপাধ্যায়
আশ্চর্য/মিলনমেলা — সুশীল মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থপীঠ ২০৯বি, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

স্কুলে পড়বার সময় থেকেই গানের নেশায় শরীরকে শরীরজ্ঞান করিনি। অল-বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স থেকে সুরু করে যত জায়গায় গানের আসর হোতো, সারারাত জেগে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতাম। মনে আছে একদিন জোর বৃষ্টি এলো। বৃষ্টিতে ভিজে আমায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন বললেন আহা ছেলেটা ভিজছে। বেচারাকে হলে ঢুকিয়ে দাও। এ্যাই খোকা ভেতরে যাও। কিন্তু খবরদার চেয়ারে বোসো না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনবে।

আমি তাতেই মহাখুশী। অত বড় বড় শিল্পীদের দেখতে আর গান শুনতে পাব? এতবড় সৌভাগ্য কোনোদিন কল্পনাতেও আনতে পারিনি। এইভাবে গান শুনতে শুনতে রাগসঙ্গীতের সম্বন্ধে একটা ধারণা অজ্ঞাতেই মনের মধ্যে গড়ে উঠছিলো। সুর রচনার সময়ও মনের অগোচরে এই ধারণাটিই কাজ করতো। তাই তুমি আমার গানে ক্ল্যাসিক্যালের ছোঁওয়া পাও।

আপনি আন্দাজ কত গানের সুর করেছেন?

দাদার সঙ্গীতাঞ্জলি-র প্রায় ৮০০র ওপর। ঢাকা ও কোলকাতা বেতারকেন্দ্রে।

বেতারকেন্দ্রের সঙ্গেও আপনি যুক্ত ছিলেন?

বেতারশিল্পী এবং সঙ্গীত-প্রযোজক দুভাবেই আমি বেতারকেন্দ্রে যুক্ত ছিলাম। ঢাকা বেতারকেন্দ্রে সঙ্গীত প্রযোজক হিসেবে যোগদানের আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম বন্ধুবর প্রভাত মুখোপাধ্যায় ও সুনীল বসুর কাছ থেকে।

হ্যাঁ মনে পড়ছে। উৎপলদি বলছিলেন সেই সময় উনি আপনার কাছে অনেক গান শিখেছিলেন।

উৎপলাকে আমি দাদার লেখা এবং আমার সুরের অনেক গান তখন তুলিয়ে-ছিলাম। ওর গলাটিও ছিলো সুন্দর। ওর বিখ্যাত গান শুকতারাগো নিওনা বিদায় গানটির সুর দিয়েছিলো বিমান ঘোষ (গ্রামোফোন কোম্পানী)। দাদার আরো অনেক গানে ও সুর দিয়েছিলো. সেজদার প্রিয় ছাত্রছাত্রী অনেকেই ছিলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে কাছের ছিলাম আমরা কজন, বিমান, রথীন রুদ্র আর আমি। তখন রেডিওতে ছোটোদের আসরে গান শেখাতাম বলে অনেকে আমায় খুদে পঙ্কজ বলতো ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৩ সাল অবধি কোলকাতা বেতারকেন্দ্রের অডিশন বোর্ডে আমি ছিলাম—

রাতের কবিতা শেষ করে দাও আপনারই সুরে ত—ও'কে বাধা দিয়ে বলি।

হ্যাঁ। আর এ গানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার চোখের জলে-ভেজা একটি দিন। ১৪ই ডিসেম্বর (১৯৪৪ সালে) সেজদার আকস্মিক মৃত্যুর কথা একটু আগেই বলেছি। তার ৩।৪দিন বাদেই আমার রেডিও প্রোগ্রাম ছিলো। প্রথমে ভাবলাম যাব না। তারপরই মনে হোলো আজকের এই মুহূর্তেই সেজদার গান আমায় গাইতে হবে। তখন বেছে বেছে ঐ গানটিই বার করলাম। কিন্তু যতবার সুর দেবার চেষ্টা করি চোখের জলে গানের অক্ষরগুলি ঝাপসা হয়ে যায়। অবশেষে রেডিও ষ্টেশনে যাবার সময় ট্রামে বসে সুর করলাম রাতের কবিতা শেষ করে আজ এবার ঘুমোলি কবি

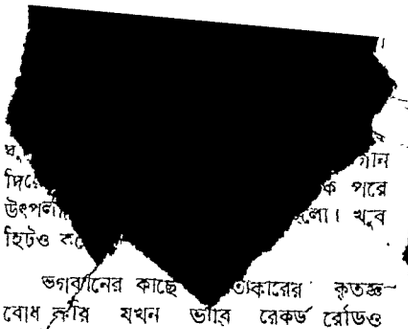

ভগবানের কাছে তাঁকারের কৃতজ্ঞ-বোধ করি যখন ভীরু রেকর্ড রেডিও ছাড়াও সেজদার স্মৃতি তর্পণের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা অনিল স্মৃতিবার্ষিকীতে আমার সুরে গাননি এমন কোনো দিকপাল শিল্পী নেই। সর্বশ্রী পঙ্কজ মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, চিন্ময় লাহিড়ী, সুচিত্রা মিত্র থেকে সুরু করে সব শিল্পী।

আপনি রেডিওতে কতদিন গেয়েছেন?

১৯৩১ থেকে ৪৮ সাল অবধি নিয়মিত গেয়েছি। হঠাৎ একদিন মনে হোলো আমার গলা এখন আর গাইবার উপযুক্ত নেই। সঙ্গে সঙ্গেই চিঠি লিখে গান গাওয়া ছেড়ে দিলাম। আমি এতটুকুও অহংকার করে বলছি না, বিনয় করেই বলছি সারা ভারতে আমিই বোধহয় প্রথম যে নিজে থেকে রেডিওতে গান গাওয়া ছেড়েছে। যদিও গান শেখানো ছাড়িনি। নিজের সম্বন্ধে এই দুর্বলতাটুকু কাটিয়ে ওঠবার শক্তি দিয়ে-ছিলেন বলে ওপরওলাকে আমি বারবার প্রণাম জানাই।

এর পরই দিল্লী থেকে পাকাপাকিভাবে সঙ্গীত-পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছিলাম। রম্যগীতি করেছি অন্ততঃ ৭০—৮০ খানা। সেজদার গান এবং অন্যান্য গান মিলিয়ে অন্ততঃ হাজার ছয়-সাত গানের সুর করেছি। কোলকাতার বেতারকেন্দ্রে নাটক বিভাগে অনেক বছর নিয়মিত অভিনয় করেছি। এছাড়া শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট এবং আরও নানা রঙ্গমঞ্চে অপেশাদার শিল্পী হিসেবে এবং বেতারে অনেক বড় বড় চরিত্রে অভিনয়ও করেছি। কোনোদিন পারি-শ্রমিক নিয়ে কোনো জলসায় গাইনি। গান আমার পেশা ছিল না। ছিল নেশা। আমার বহু ছাত্রছাত্রী এবং বিশিষ্ট শিল্পীরা কোলকাতা বেতারকেন্দ্রে নিয়মিত-ভাবে আমার গান গেয়ে থাকেন।

অযাচিতভাবে কত যে সৌভাগ্য ঈশ্বরের প্রসাদ হাসির মত সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ছোটোবেলার একটি ঘটনা এখনও যেন চোখের সামনে ভাসে।

একবার সবুজ সংঘের এক সভার প্রেসিডেন্ট ছিলেন সুভাষচন্দ্র। আমি তখন হাফ-প্যান্টপরা বার-তের বছরের স্কুলের ছেলে। সেই সভায় গেয়েছিলাম 'ফিরে চল মাটির টানে'।

সুভাষবাবু আমার গান শুনে খুব খুসী হয়ে বললেন 'আমি একে কিছু উপ-হার দিতে চাই' বলেই একজনকে টাকা দিলেন একটি বই এর নাম লিখে। কিছু-ক্ষণের মধ্যেই বই এলো। উনি [redacted]

এরিখ মারিয়া রেমার্ক-এর

লিসবনে এক রাত ১৬

রেমার্কের শ্রেষ্ঠ অবদান এই উপন্যাসটি একাদিক্রমে পাঁচ মাস ন্যু ইয়র্ক টাইমসের পুস্তক তালিকার শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল।

"শ্রেষ্ঠ প্রেমের কাহিনী" (ডালাস্ নিউজ্)

"অতি উচ্চাঙ্গের এ্যাডভেঞ্চার, সহনশীলতা এবং মানবতার আলেখ্য" (বোস্টন হেরাল্ড)

"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় নাজিবাদের জালে জড়িয়ে পড়া এক মরীয়া প্রেমিক দম্পতির অতি সুন্দর কাহিনী। এ কাহিনীতে বর্ণিত আধুনিক যুগের ত্রাস এবং বর্বরতা পাঠককে স্তব্ধ করে। রেমার্কের শ্রেষ্ঠ অবদান" (ফিলাডেলফিয়া এনকোয়ারার)

অনুবাদক ও প্রকাশক : সুনীতিচরণ ভট্টাচার্য

৫৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, পশ্চিম পুটিয়ারি, কলিকাতা ৪১

বিশু ঘোষাল সে হেরে গেছে তার চোখই সে-কথা বলছে। মুখে কিন্তু বলল না রজত। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে বাধল।

উঠবার আগে বিশুদা রজতের কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রায় ফিস ফিস করে বলল, 'আজ সন্ধেবেলা আমার বাড়ি আসবি। সঙ্গে তণিমাকেও আনবি। ওর বরোকে খবর আমি ডেকেছি।'

রজতের বুকটা ধক করে উঠল। আনন্দের দোলা লাগল যেন। তণিমাকে ডাকার অর্থ বুঝতে ওর অসুবিধে হল না। বিশুদা তণিমাকে বোঝাবে, রজতের মত প্রতিভাবান অভিনেতার অভিনয় ছাড়া উচিত নয়। ওর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। বরং তণিমার এতে গর্ব করাই উচিত। বিশুদা কী কী বলতে পারে মনে মনে সেগুলো আউরে গেল রজত। ওর স্থির বিশ্বাস, বিশুদার কথা ফেলতে পারবে না তণিমা। মুখে যে যা-ই বলুক বিশুদাকে অমান্য করতে পারে এমন বেশী কেউ নেই। কী এক জাদু আছে বিশুদার মধ্যে। সবাই তাকে মানতে বাধ্য হয়। একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল রজত। মনে মনে এতক্ষণ যাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে আনন্দ পাচ্ছিল এই মুহূর্তে তাকে অত্যন্ত আপনজন মনে হল। ভাবল, বিশুদা যখন তণিমার দায়িত্বটা হাতে নিয়েছে, তখন আর ভয় নেই। ওর এই সমস্যাটা এবার মিটবে।

বিশুদার কথা শেষ হতে না হতেই রজতের চোখে মুখে খুশির আমেজ ফুটিয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি বলল, 'যাব বিশুদা, নিশ্চয় যাব।'

বিকেলে রজত যখন তণিমাদের বাড়ি এল, তণিমা তখন চুল বাঁধছে। রজতকে দেখে চুল বাঁধতে বাঁধতেই সামান্য ভুরু কুঁচকালো, কিন্তু মুখে কিছু বলল না। তণিমার মুখ দেখে রজত বুঝতে চেষ্টা করল, গতকালের অভিনয় দেখার পর ওর মত পাল্টেছে কিনা। কিন্তু মুখ দেখে স্পষ্ট কিছু বোঝা গেল না।

বিশুদার বাড়ি যাবার কথা শুনে তণিমা একটু গম্ভীর হল বটে কিন্তু আপত্তি করল না। রাজী হল।

বিশুদার বাড়ি যেতে যেতে তণিমা এক সময় বলল, 'কালকের অভিনয় সত্যিই খুব ভাল হয়েছে। এত ভাল হবে আমি তা আশাই করিনি। আজ খুব টায়ার্ড লাগছে তো?' গভীর দৃষ্টি নিয়ে রজতের দিকে তাকাল তণিমা।

তণিমার চোখের দিকে তাকিয়ে রজতের মনে হল, ও যেন আশার অতিরিক্ত কিছু পেয়ে গেল। গতকাল হাজার হাজার মানুষ যা দিতে পারেনি তণিমার সামান্য কটা কথা তা-ই যেন দিল। রজত কথা বলল না। নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল তণিমার চোখের দিকে। রজতের চোখ থেকে বিচ্ছুরিত হতে লাগল আনন্দের মিহি দ্যুতি। সে-দ্যুতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তণিমার চোখ মুখ। দারুণ লজ্জা পেল সে। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিতে নিতে বলল, 'তুমি এমন হ্যাংলার মত তাকাও না! ভারি অসভ্য!'

রজতের মনে হল, এই সুবর্ণ সুযোগ। এই মুহূর্তে অভিনয়ের কথা বললে তণিমা না করতে পারবে না। ওর মনটা এখন ভিজে ভিজে হয়ে আছে। সহানুভূতির আর্দ্র প্রলেপ পড়েছে সেখানে। বলি বলি করেও কিন্তু বলতে পারল না রজত। নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল।

তণিমাই আবার বলল, 'বিশুদা আমাকে ডেকে পাঠাল কেন? তোমাকে অভিনন্দন জানাবার ব্যাপার যদি হয়, তাহলে তার মধ্যে আমি কেন?'

—তুমি আমার, তাই আমার ব্যাপারে তুমি।—হাসল রজত। তারপর বলল, 'আসলে লোকটি একটু খেয়ালী তো। কী মনে করে ডেকেছে কে জানে।'

তণিমা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'সতী বৌদি মারা যাবার পর বিশুদা একটু অন্যরকম হয়ে গেছে, তাই না?'

—সেই আমুদে লোকটা কেমন যেন নির্জীব হয়ে গেছে। অভিনয় করাও ছেড়ে দিল।

—সতী বৌদি চাইত না, বিশুদা অভিনয় করুক। হয়তো তাই—।

রজত তণিমার পাশে ঘন হল। তণিমার দেহ থেকে কেমন এক মসৃণ গন্ধ এসে লাগল ওর নাকে। শিশির-ভেজা নরম হয়ে উঠল ওর মনটা। ওর মনে হতে লাগল, ও যেন এক বিশিষ্ট নায়কের রোলে অভিনয় করছে। মনে মনে এই মুহূর্তটার রসাস্বাদন করল রজত। তারপর বলল, 'আমার কিন্তু মনে হয় বিশুদার অভিনয় ছেড়ে দেবার কারণ ওটা নয়। ওটা একটা 'আই ওয়াশ' মাত্র। আসল কারণ অক্ষমতা। ভদ্রলোকের আগের সে-ক্ষমতাই আর নেই। খ্যাতি হারাবার ভয়ে অভিনয় ছেড়েছেন।'

তণিমা সে-কথার উত্তর দিল না। ওর মাথার মধ্যে তখন সতী বৌদির মুখটা ভাসছে। ফর্সা ঢলঢলে একটা মুখ। অসুখ হবার কিছুদিন আগেও সতী বৌদির কাছে গিয়েছিল তণিমা। কত কথা বলল বৌদি। রজতের কথা জিজ্ঞাসা করল। কবে ওরা বিয়ে করছে সে প্রশ্নও করল। অথচ তার দশদিন পরেই সব শেষ। সতী বৌদি চির-কালের জন্যে হারিয়ে গেল কোথায়। সতী বৌদির কথা ভাবতে ভাবতে তণিমার মনে হল, ওর নিজেরও যদি এমনি হয়? জীবন শুরু হবার মুহূর্তেই যদি হারিয়ে যায় এই পৃথিবী থেকে? তণিমার বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। অজানা আতঙ্কে গলাটা শুকিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি রজতের একটা হাত চেপে ধরল ও।

ওরা এতক্ষণে বিশুদার বাড়ির সামনে এসে গেছে। বিশুদা ওদের জন্যে বারান্দায় অপেক্ষা করছিল। ওদের দেখে খুশি হয়ে বলল, 'আয়, ভেতরে আয়।'

ওদের যে-ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল বিশুদা সে-ঘরে আরও অনেক বার এসেছে তণিমা। ঘরের দেওয়ালে মস্ত বড় একটা ফটো টাঙ্গান। সতী বৌদির। ফটোটার চারটে ফুলের মালা ঝুলছে। তণিমা ফটোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'আজ ওর জন্ম দিন।' শান্ত গলায় বলল বিশুদা।

ওরা দুজনেই নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল ফটোর দিকে। মনে মনে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাল।

ফটো থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে ঘরের চারদিক দেখতে লাগল তণিমা। দেখতে দেখতে হঠাৎ চমকে উঠল। বলল, 'একী! এখানে বন্দুক কেন?'

রজত লক্ষ্য করল, টেবিলের ওপর একটা দো-নলা বন্দুক শোয়ানো রয়েছে। বন্দুকটা দেখে ও নিজেও একটু অবাক হল। কিন্তু কিছু বলল না।

বিশুদা সামান্য হেসে বলল, 'বন্দুকটায় অনেক দিন হাত পড়েনি তো, তাই একটু পরিষ্কার করছিলাম। দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বোস তোরা।'

বিশুদা দুটো চেয়ার দেখিয়ে দিল। যে-দেওয়ালে সতী বৌদির ফটো টাঙ্গান তারই গা ঘেঁষে রাখা চেয়ার দুটো। তণিমা আর রজত বসল পাশাপাশি। বিশুদা নিজে বসল টেবিলের পাশে রাখা চেয়ারটায়। বিশুদার ডান হাতের কাছে টেবিলে শোয়ানো বন্দুকটা। বন্দুকের ম্যাগাজিনে হাত বোলাতে বোলাতে বিশুদা বলল, 'আমার হাতের টিপ কিন্তু খারাপ নয়।'

—তা জানি। আগে তো কত পাখি মারতেন।—বলল তণিমা।

—হুঁ।

—তাছাড়া সেবার যখন সাপটাকে মারলেন। দূর থেকে গুলি করে সাপের মাথাটা উড়িয়ে দিলেন, তখন বৌদি পাশে আমিও ছিলাম। আমার মনে আছে।

তণিমার কথায় অদ্ভুতভাবে হাসল বিশুদা। তারপর রজতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই আমার মীর জুমলার অভিনয় দেখেছিলি?'

—দেখিনি আবার? সে অভিনয় যে একবার দেখেছে—। সত্যি এমন অভিনয় হতে পারে না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

—হুঁ। আমি ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে চাই। এক ইঞ্চিও সরতে চাই না।

বিশুদার ঠোঁটের কোণে বিদ্যুৎ খেলে গেল। রজত কথাটার অর্থ বুঝল না। চোখ সংকুচিত করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'মানে?'

—ওই মানেটা বোঝবার জন্যেই তো তোদের ডেকেছি।

কথাটা শেষ করেই উঠে দাঁড়াল বিশুদা। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল দরজার কাছে। দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিয়ে ফিরে এসে দাঁড়াল টেবিলের পাশে। বসল না। টেবিলের ওপর ডান হাতটা রেখে দাঁড়িয়েই রইল।

অদূরে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে। তার আলো এসে পড়ল বিশুদার মুখের এক অংশে। মুখের আর অংশ ঢাকা পড়ল আবছা অন্ধকারে। বিশুদা নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ

সরে না দাঁড়ালে রঞ্জত নিশ্চয়ই রোলটা পেত না। পঁয়তাল্লিশ বছর এমন একটা কিছু বয়েস নয়। বয়েসের হিসেবে অভিনয়ের জগত থেকে বিশুদার সরে দাঁড়াবার কথা নয়। বছর তিনেক আগে স্ত্রী বিয়োগের পরই লোকটি যেন কেমন হয়ে গেছে অভিনয়-টভিনয় ছেড়ে দিয়েছে একেবারে। যাত্রা-থিয়েটারের ছায়া মাড়ায় না কখনও। লোকে বলে, বৌ-এর জীবিতকালে কিছু তো দেখত না, কেবল যাত্রা-থিয়েটার করে বেড়াত, তাই বৌ-এর মৃত্যুর পর অনুতাপের জ্বালায় অভিনয় ছেড়েছে। টাকার অভাব নেই মানুষটার। ইচ্ছে করলেই অভিনয় নিয়ে মেতে থাকতে পারত। কিন্তু তা না করে সব ছেড়েছুড়ে ঝিম মেরে বসে থাকে সারাক্ষণ। রঞ্জতের ধারণা, আসলে লোকটার অভিনয় ক্ষমতাই ঝিমিয়ে পড়েছে। আর কখনও সেই আগের মত উঠে দাঁড়াতে পারবে না, হাজার চেষ্টা করলেও না। তবু বিশুদাকে হিংসে করে রঞ্জত। যশের যে-চূড়োয় লোকটা উঠে বসে আছে সেখান থেকে তাকে নামাতে না পারলে রঞ্জতের মনে শান্তি নেই। খল চরিত্রাভিনয়ে বিশুদার খ্যাতিকে ম্লান করতেই হবে। এবং তা করতে হবে আজকের রাতের অভিনয়েই। এত বড় সুযোগ জীবনে রোজ আসে না।

কিন্তু—? একটা প্রশ্ন রঞ্জতের গলায় আটকে যায়। মুঠোয় ধরা ফুলের গন্ধ শুকতে শুকতে তনিমার কথা মনে পড়ে। অভিনয়ের ব্যাপার নিয়ে তনিমার সঙ্গে অশান্তি লেগেই আছে। তনিমার ইচ্ছে নয় রঞ্জত অভিনয় করে। বিশেষ করে ভিলেনের চরিত্রে। তনিমার ধারণা, খল চরিত্রে অভিনয় করতে করতে একটা মানুষের গোটা চরিত্রই পাল্টে যায়। বাস্তব জীবনেও মানুষটা হয়ে দাঁড়ায় পরিপূর্ণ ভিলেন। কলেজে-পড়া একটি মেয়ের মনে এমন একটা উদ্ভট চিন্তা কী করে স্থান পায় ভেবে পায় না রঞ্জত। অথচ তনিমাকে ছেড়ে থাকার কথা ভাবতেও পারে না। তনিমা কিন্তু সর্ত আরোপ করে বসে আছে—হয় ভিলেনের পার্ট ছাড়তে হবে, না হয় ভুলতে হবে তাকে। দুটো একসঙ্গে চলবে না। তার সাফ কথা, বিয়ের পরে অশান্তির চেয়ে আগের অশান্তি অনেক ভাল। বিশ্বনাথ ঘোষালের মত স্বামী হোক, এটা তার আদৌ কাম্য নয়। রঞ্জত গ্রামের হাই স্কুলের মাস্টার—এই পরিচয়ই যথেষ্ট। ওসব আবার কেন? অভিনেতা হওয়া? অভিনয় যদি ছাড়তে না পার, বেশ তো নায়কের পার্ট করো। তা-ও যদি না জোটে অন্য কোন ভাল পার্ট বেছে নাও। তা নয়, বিশ্বনাথ ঘোষালকে ছাড়িয়ে যাব। যত্তসব!—গত কালই ঝাঁঝাল গলায় এইসব বলেছে তনিমা। কেবল তা-ই নয়, আরও বলেছে, আজকের এই অভিনয়ের পর এই জাতীয় রোলে আর নামা চলবে না।

রঞ্জত মনে মনে কেমন আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। দুটোর একটাও ছাড়বার কথা ভাবতে পারে না সে। তনিমা এবং অভিনয় দুটোই তাকে গ্রাস করতে থাকে।

বেলা বাড়তে লাগল। চা-জল-খাবারের পাট চুকিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল রঞ্জত। রাস্তার অনেক জায়গায় ছাপানো পোস্টার পড়েছে। কলকাতার কয়েক জন শিল্পীর সঙ্গে ওর নামটাও বড় বড় অক্ষরে ছাপা। রাস্তায় অনেকেই ওকে ডেকে কথা বলল। উদ্দেশ্যবিহীনভাবেই হাটতে লাগল রঞ্জত। হাটতে হাটতে নিজের অজান্তেই কখন এসে দাঁড়াল বিশ্বনাথ ঘোষালের বাড়ির সামনে।

রঞ্জতদের অঞ্চলটা ঠিক গ্রাম নয়। শহর ঘেঁষা। শহর এবং গ্রাম দুয়ের সুবিধেই আছে। বিশ্বনাথ ঘোষালের বাড়িটাও শহুরে কায়দায় পরিপাটি করে সাজানো। সামনে একটা পরিচ্ছন্ন ফুলের বাগান। রঞ্জত সেই বাগানের সামনে এসে ভাবল, হঠাৎ সে এখানে আসতে গেল কেন? এমন একটা ইচ্ছে তো তার ছিল না। ভাবতে ভাবতে ফিরেই যাচ্ছিল সে। কিন্তু ফেরা হল না। সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়াল বিশ্বনাথ ঘোষাল স্বয়ং। আট-সাট চেহারার মানুষ। লম্বা এবং ফর্সা। পরনে ধুতি, গায়ে গেঞ্জি। রঞ্জতকে দেখে হেসে বলল, 'কী রে, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে আয়।'

রঞ্জত বাগানের বেড়ার একটা হাত রেখে বলল, 'না বসবো না বিশুদা। আপনাকে একবার বলতে এলাম। আজ পুরো সময়টা থাকছেন তো?'

—হ্যাঁ, নিশ্চয় থাকব।

কথা বলতে বলতে বারান্দা থেকে নেমে এল বিশুদা। রঞ্জতের কাছে এসে বলল, 'তনিমার খবর কী রে? ওকে অনেক দিন দেখিনা যে? কলেজ-টলেজ যায় না?

—হ্যাঁ যায় তো।

—তা তোর অভিনয় করা নিয়ে ওর যে রাগ-অভিমান চলছিল তা বন্ধ হয়েছে?

—নাহ্।

তেতো গেলার মত মুখটা বিকৃত করল রঞ্জত। বিশুদা রঞ্জতের চোখে চোখ রেখে হাসল কিন্তু কিছু বলল না।

বিকেল থেকেই গ্রামের লোক আসরের দিকে ছুটতে লাগল। সন্ধ্যে থেকে লোক গিজ-গিজ করতে থাকল সেখানে।

রঞ্জতের বুকের ধুকপুকুনিও চলছিল এতক্ষণ। সেই ধুকপুকুনি বন্ধ হল মুখে রং মাখার পর। তারপর ক্ল্যাণ্ডিনেটের সুর যখন ওর কানে এসে পৌঁছল, তখন ও একেবারে অন্য মানুষ। তখন থেকেই নিজেকে ঝিন্দের সেই কুটিল মানুষ হিসেবে ভাবতে শুরু করল। তখন থেকেই ওর কেবল একটিই চিন্তা, কী করে বাংগালী নটুয়াকে দেশ থেকে হটাবে, কী করে ঝিন্দের সিংহাসনের ওপর নিজের পূর্ণ কর্তৃত্ব বিস্তার করবে। রঞ্জত ভুলে গেল নিজের অস্তিত্ব, ময়ূরবাহনের সঙ্গে একাকার হয়ে গেল সে।

যাত্রা শুরু হল। দ্রুত ছুটতে লাগল দৃশ্যগুলো। প্রচণ্ড গতিময় নাটক। দম ফেলার মত অবসর নেই দর্শকদের। রুদ্ধ-শ্বাসে দেখছে সবাই। দেখতে দেখতে ময়ূর-বাহনকে কুচক্রী, বদমায়েস বলে গালাগালি করছে। সেই সঙ্গে হাততালির পর হাত-তালি দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে রঞ্জতকে। গাছে গাছে পাখির ঘুম ছুটে যাচ্ছে বার বার। ফণা তোলা সাপের মত তলোয়ার হাতে ময়ূরবাহন দুলছে—ডানে-বায়ে, সামনে-পেছনে।

শেষ দৃশ্যে ছোরার আঘাত খেয়ে ময়ূর-বাহন যখন মুমূর্ষু, তখনকার অভিনয় দেখে লোকে একেবারে চঞ্চল হয়ে উঠল। অভি-নন্দনে অভিনন্দন মুখর করে তুলল সমগ্র অঞ্চল।

যাত্রা যখন শেষ হল পুবের আকাশটা তখন লাল হতে শুরু করেছে। কল-কল করতে করতে ফিরে যেতে লাগল গ্রামের মানুষ। তাদের মুখে এক কথা—বিশ্বনাথ ঘোষালের পর এ অঞ্চলে এত ভাল অভিনয় আর কেউ করেনি। তিন বছর আগে দেখে-ছিল, বিশ্বনাথ ঘোষালের মীর জুমলার অভিনয়। তারপর রঞ্জতের এই ময়ূরবাহন। দর্শকদের টুকরো টুকরো মন্তব্য রঞ্জতের কানেও পৌঁছল। খুশিতে ভরে উঠল রঞ্জতের বুক। নিজেকে সার্থক মনে হল।

মেক-আপ তুলতে তুলতে বিশ্বনাথ ঘোষালের মুখটাই মনে পড়ছিল রঞ্জতের। সেই সঙ্গে তনিমার মুখও। তনিমার কথা মানতে গেলে এর পর আর এ-জাতীয় অভিনয় নয়। কিন্তু আজকের এই সাফল্যের পর সে-কথা ভাবার কোনো মানেই হয় না। বিশ্বনাথ ঘোষালের খ্যাতি এখন তার হাতের মুঠোয়। এ-অবস্থায় অভিনয় ছাড়া বাতুলতা। কিন্তু তনিমা—?

'চমৎকার হয়েছে রঞ্জত।'

রঞ্জতের ভাবনায় বাধা পড়ল। কোঁচা হাতে গ্রীন রুমে ঢুকল বিশ্বনাথ ঘোষাল। সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল রঞ্জত। অন্যেরাও খাতির করে বিশুদাকে চেয়ারে বসাল। রঞ্জতের হাতে হাত রেখে বিশুদা ছোট্ট মন্তব্য করল, তোর হবে।'

বিশুদার ছোট্ট মন্তব্যের উত্তরে রঞ্জত মনে মনে হাসল। ভাবল, হবে না। হয়েছে।

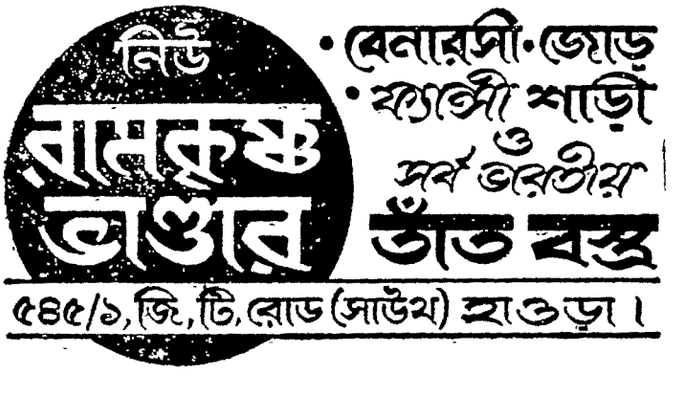

অভিনয়

অজিত পুততুণ্ড

প্রকাণ্ড একটা সাপ হিস্ হিস্ করতে করতে ছুটে এল রজতের সামনে। রজত সভয়ে পিছিয়ে গেল কয়েক পা। সাপটা ফণা বিস্তার করে স্থির হয়ে দাঁড়াল। ওর কুত-কুতে চোখ থেকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল হীরের দ্যুতি। যে কোনো মুহূর্তে ওটা মৃত্যুর কারণ হতে পারে। অথচ দেখে বোঝার উপায় নেই। বরং ওর রূপের মধ্যে কেমন এক টান অনুভব করল রজত। দম বন্ধ করে তাকিয়ে রইল সাপটার দিকে। কেমন যেন সম্মোহিত হয়ে পড়ল সে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সাপের ফণাটা আর একটু উঁচু হল। সেই সঙ্গে পেছনের দিকে সামান্য হেলে পড়ল। আক্রমণের পূর্ব মুহূর্তে। রজত আর পারল না। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠল।

ঘুমটা ভেঙে গেল রজতের। উত্তেজনায় তখনও ওর শরীরটা কাঁপছে। মাথার ভেতর মৃদু যন্ত্রণা। স্বপ্নের দৃশ্যটা তখনও চোখের পর্দায় লেপটে আছে। গোটা শরীর ভিজে গেছে ঘামে। বিছানার ওপর তাড়াতাড়ি উঠে বসে চারদিকটা ভাল করে লক্ষ্য করল। কোথাও কিছু নেই। জানালা দিয়ে বাইরে ছড়িয়ে দিল দৃষ্টি। পুবের আকাশে লাল আভা ছড়িয়ে পড়ছে। রজত আর ঘুমোবার চেষ্টা করল না। দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ওর শরীরটাকে জুড়িয়ে দিল।

তখনও পুরোপুরি অন্ধকার কাটেনি। সাদা কাগজের বুকে ছোপ ছোপ কালির দাগের মত অন্ধকারের পুঞ্জ ঝোপে ঝাড়ে। ভোরের হাওয়া গাছের পাতায় বিলি কাটছে। পাখিরা নতুন দিনকে স্বাগত জানাচ্ছে অফুরান আনন্দে।

রজত ঘর ছেড়ে বারান্দা, বারান্দা ছেড়ে মাঠে নামল। তারপর খালের ধার দিয়ে হাঁটতে লাগল সামনের দিকে। খানিকটা গিয়েই রাধাগোবিন্দের মন্দির। মন্দিরের গায়ে বকুল গাছের তলাটা ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে। রজত একমুঠো বকুল কুড়িয়ে নিয়ে আবার হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে প্রতি মুহূর্তে একটা অস্বস্তিকর অনুভব করছে সে। স্নায়ুর ওপর বেশ চাপ। কেমন যেন টান-টান ভাব। আজকের অভিনয়ের ব্যাপারটা কিছুতেই যেন মাথা থেকে তাড়াতে পারছে না। ঘুরে ফিরে সেই এক ভাবনা। বুঝে উঠতে পারছে না, এত বড় রোলে শেষ পর্যন্ত উতরে যেতে পারবে কিনা। এ তল্লাটে অনেক দিন পর এত বড় যাত্রার আসর বসছে। সাত-আটখানা গ্রামের লোক এসে জড়ো হবে সেখানে। অভিনয় ভাল হলে যেমন গাছে-বসা পাখির ঘুম ভাঙিয়ে হাততালির ফোয়ারা ছুটবে, অভিনয় খারাপ হলেও তেমনি ইঁটপাটকেল মাথায় এসে পড়াও বিচিত্র নয়।

এত বড় একটা রোল নিতে রাজী হয়নি রজত। পালার মাস্টারমশাই-ই এক-রকম জোর করে ওর ঘাড়ে চাপিয়েছেন। ময়ূর-বাহনের ভূমিকায় ওকে ছাড়া নাকি আর কাউকে মানাবে না। সুন্দর চেহারা অথচ খল-চরিত্র, এর যোগ্য নাকি কেবল রজতই। খল-চরিত্রের আসল মজাটা রজতের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন পালার মাস্টারমশাই। সাপের মত ক্রুর। সুন্দর কিন্তু ভয়ঙ্কর। সাপের চেহারাটা ভাবতে ভাবতেই যে ভোর বেলা সাপের স্বপ্নটা দেখেছে সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না রজতের। কিন্তু স্বপ্নটা দেখার পরই উত্তেজনাটা যেন আরও বেড়েছে। নিজেকে স্থিরভাবে ধরে রাখতে পারছে না কিছুতেই।

রজত জানে, এই সাত-আটখানা গ্রামের মধ্যে যার অভিনয় আজও লোকে মনে রেখেছে তার নাম বিশ্বনাথ ঘোষাল। লোকের চোখে আজও তার অভিনয় লেগে আছে। ভিলেনের চরিত্র চিত্রণে তার পাশে দাঁড়াবার মত কেউ ছিল না। লোকের ধারণা, আজও কেউ নেই। রজত সে-কথা বিশ্বাস করে না। তবে এ-কথা ঠিক, বিশুদা অভিনয় থেকে

কিছুই তো হল না॥

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছুই হয়ে উঠল না। কোথা থেকে বারবার
ঝুঁটি ধরে নাড়া দেয় আরেক মানুষ।
বলে,—ওঠো, ওঠো, পথ এখনো অনেক বাকি।
আমি নিঃসাড় চেতনায় উঠে বসি, চলি।
ঝোপের আড়াল থেকে ব্যঙ্গ করে একটানা
ঝিঁঝি পোকা, মাকড়সার জাল ওৎ পাতে।
গোপন থাবার ভয় মর্ম ময় পরিত্রাণ খোঁজে।
সুরমা অট্টালিকা থেকে কৌতুকে তাকায়
আপনার দল। শাড়ির দড়ি ঝুলিয়ে দেয়, বলে,—
চটপট উঠে এসো, বিছানা পেতেছি। আমি
সে শাড়ির সম্ভারে সাপ দেখি, উদ্যত ছোবল।

আবার বন্ধুর দল আড়ালে আবডালে
চোরাগোপ্তা চোখ ইশারায় দিশেহারা
আমাকে নিরস্ত করে। বলে,—যাবে কোন চুলোয়।
অবাক সান্ত্বনা আর অস্থির গুঞ্জন
গর্ত থেকে টেনে তুলে কামিনী কাঞ্চন
নিরন্তর অভ্যর্থনায় কোলাহল করে।
শুভার্থীর দল শপথের অন্তরালে লুকোতো অপথে
বানচাল করে যাত্রাপথ। আমি
বিমূঢ় বিস্ময়ে হতবাক, ভাবি,—এখন এখানে নয়
তবে কি ওখানে, কিম্বা ওখান থেকে
এখানে সেখানে, ফিরে ফিরে গোলকের মতো
কার পায়ে পায়ে হই খেলার পুতুল।

খেলার পুতুল হই, উঠি, বসি, শুই, বসি, উঠি,—
পা বাড়াই, চলি। থমকাই। হয় না কিছুই।

কবিতা

কবিতা ॥

দীপেন রায়

বাঘ আর অন্ধকার যেখানে পরস্পরকে থামা মেরে
জড়িয়ে ধরেছে
সেখানে দাঁড়িয়ে
আমি মেঘের রেখার ওপর বিদ্যুতের ঝলসানো আলোয়
চমকে যেতে দেখেছি অরণ্যের অন্ধকার
ভয়ের শিঙ ধরে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে
সমুদ্রের তরঙ্গ.....

ধান মেলে শুকোতে দেয়ার মতো ছড়ানো সাহস
সন্ধ্যায় মুঠোয় তুলে
দুঃখকে প্রদীপ করে বলি ঃ এসো,
আমাদের এই তালপুড়ির সংসারে
টর্চের আলোর মতো ঋজু
আর ঘরের ভেতর দরজা-জানালার মতো সম্পূর্ণ অপরিহার্য।

শস্যের সমস্ত আয়োজন পূর্ণ করে
পৃথিবী আর একবার ঘুরে এলো সূর্যকে
তবু আমরা যে যেখানে ছিলাম
আমাদের অনভিপ্রেত সেই ইচ্ছার-ভিতরে
বাজ খাওয়া গাছের মতো দাঁড়িয়ে যেন এখনো?

এখন ॥

কৃষ্ণা বসু

সাইক্লোনের প্রবল বাতাসে
লণ্ড ভণ্ড হয়ে যায়
সমুদ্র পারের গাঁ।
প্রমত্ত বন্যায় ভেসে যায়
গ্রাম গঞ্জ শহর বাজার।
নির্মম দায়িত্বের কেউ প্রথর আঙুলে
তুলে নেয় আগাছার ফুল।
এরকম ভাবেই তুমি আসো...
পরিচিত সংসার সংস্কার থৈ থৈ
ভেসে যায় ভীষণ বন্যায়।
নেড়া মরা প্রান্তরে পলি পড়ে,
প্রসন্ন সকালে হাসে, আঞ্জলায়
স্মৃতির উজ্জ্বল বকুল।
তারপর বিবাগী বাউল এক
সংসারে ফের ফিরে আসে।
পলিপড়া চরাচরে মায়াবী বৃক্ষ এক
জেগে ওঠে আশ্বিনের মাখন রোদ্দুরে।

'গলাব্যথা-
কাশি থেকে
নিমেষে আরাম...
ভোকাসিল
চারকোনা,
সবুজ
কাশির বড়ি
VOCACIL
COUGH DROPS
U-VOC-4 BEN

যা বলছি তাই করো। ফিয়েটকে বেরোবার পথ দিও না।

শংকরের গাড়ি হর্ন দিতে সুরু করেছে। লালু পথ দিল না।

রাগে রাগে শংকর দরজা খুলে বেরিয়ে এল। জোর পায়ে। গায়ে সিল্ক। পায়ের জুতো ফুটপাথের এটুকুর ভেতরেই বেশ সুন্দর মচমচ আওয়াজ দিল। অমিয়র ঘড়িতে রাত পৌনে এগারোটা। যে জোরে ছুটে এসেছিল শংকর—গাড়িটা দেখে— ঠিক তত তাড়াতাড়িই মিইয়ে গেল শংকর। পেছনের সিট থেকে অমিয় পরিষ্কার গলায় বলল উঠে এসো। আমি পৌঁছে দিচ্ছি তোমায়।

কী করবে ঠিক করতে পারছিল না শংকর। ফিয়েটের বনেট চালু ইঞ্জিনের ওপর থর থর করে কাঁপছে। তাতে রাস্তার সরকারী আলো পড়ে জায়গাটুকু একদম রূপকথার দেশ হয়ে গেল।

নীলকমলের 'গাড়ি ছেড়ে দাও'

এ-গলা আজ ষোল বছর চেনে শংকর। গাড়ি তুলে দাও বিজয়। আমি এ-গাড়িতে যাবো।

কাল কখন যাবো স্যার?

শংকরের খুব লজ্জা হল। দরজা খুলে লালুর পাশে বসতে গিয়ে অস্পষ্ট কি একটা বলল। যার মানে হয়—রোজ যেমন আসো তেমন আসবে।

উহুঁ। তুমি পেছনে আমার পাশে এসে বোসো শংকর।

তাই বসতে হল শংকরকে। দুজনে পাশাপাশি গাড়ির দুই জানলায়। লালুকে ডিরেকশন দেবার কিছু ছিল না। চেনা প্যাসেঞ্জার। চেনা পথ।

কথার আর কিছু না পেয়ে শংকর বলল গাড়িটা ডেলিভারি নিলে কবে? বেশ সিট করেছে কিন্তু দাদা। ডবল কোম।

খুব ভালো করে সারায় নি। আওয়াজ আছে এখনো। শংকরের মুখের দিকে না তাকিয়েই অমিয় বলল।

তুমি আবার এত রাতে অন্দরে যাবে কেন দাদা। তোমায় নামিয়ে আমায় দিয়ে আসুক লালু।

শুনতে ভালো লাগলো অমিয়র। যেন শংকর এখনো পঞ্চমুখেই আছে। রিহার্সেলের পর দুজন এক সঙ্গে বাড়ি ফিরছে।

নাঃ! তোমাকেই আগে পৌঁছে দিয়ে আসি! চোখে মুখে বাতাস লেগে ভালোই লাগছে।

তোমার শরীর এখন কেমন?

অনেকক্ষণ পরে জবাব দিল অমিয়। ভালোই। বিশেষ কোন কমপ্লেন নেই।

তারপর বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ। দু ধারের জানলায় কলকাতা পাশ হয়ে যাচ্ছে। কখনো আলো কখনো অন্ধকার।

কদ্দুরশোষে বাইরে যেতে হচ্ছে না?

তিনবার গেছি।

ডায়ালগ সিন ডিভিশন কি রকম?

কেউ কারও মুখের দিকে না তাকিয়েই কথা হচ্ছিল।

দুটো সিন জমাট আছে। বাকি সব ঢিলেঢালা। কম্পোজিশন বাজে। টিমওয়ার্ক বলতে কিছু নেই।

ঘসে মেজে নাও। এখানে তো তোমার ফুল ফ্রিডম শংকর। মাথার ওপর কোন অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় নেই।

শংকর কথা নিচু করলো। তারপর আস্তে আস্তে বলল দাদা—তোমার সুজাতা এতদিনে অন্তত বিশ লাখ লোক দেখেছে। তোমার পেপার পাবলিসিটি অন্তত এক কোটি বাঙালীর চোখে পড়েছে। এই পাবলিসিটি বিল্ড-আপের অনেকখানি সুযোগ পাচ্ছে নীলকমল।

পাক না। বলে অমিয়র মনে হল একবার জানতে চায় এ শশাঙ্ক কোন্ শশাঙ্ক। কিন্তু বলতে পারলো না। একই নাম দিয়ে নাটক নামানোর জন্যে তুমি ইচ্ছে করলে কোর্টে যেতে পারো। আদালতে ইনজাংশন চাইলেই পাবে।

আমি তো ও-পথে যাবো না শংকর। বরং পঞ্চমুখ অন্য নাটক সুরু করছে।

নীলকমলের তাতে পোয়াবারো দাদা। নিজের আর তোমার—দুটো পাবলিসিটি বিল্ড আপের সুযোগ ফাঁকা ময়দানে নীলকমল একা এনজয় করবে। তোমার শুধু খাটুনিই সার।

করুক না। আমি দর্শকের দিকে তাকিয়ে আছি শংকর। আসল নকল—দর্শক ছাঁটাই বাছাই করে নেয়। কোন গুণ না থাকলে নীলকমলের এ লম্ফঝম্ফ দু দিনের। আর গুণ যদি থাকে তাহলে টিকে যাবে। কেউ আটকাতে পারবে না।

তুমি একটুও পাল্টালে না দাদা।

আমি গ্রুপ থিয়েটারের মানুষ। যেটুকু হয়েছি গ্রুপ থিয়েটারেই। আরেকটা দল যদি দাঁড়ায়—সে তো আমাদেরই ভালো। থিয়েটার মুভমেন্টের উপকার হবে।

তুমি কি মনে কর—এসব যা হচ্ছে—সবই থিয়েটার? মুভমেন্ট?

লোকের ওপর নির্ভর করে শংকর। মানুষ কিভাবে নেয় তার ওপর। গাড়ির ভেতরটা অন্ধকার। বাইরে আলো। অমিয়র বড় মত মাথাটা ঘিরে ফিকে আলোর রেখা। মুখখানা দেখতে পেল না শংকর। একবার রাস্তার আলো আসছে ভেতরে। আবার অন্ধকার।

থিয়েটারের এখন আর কিছু নেই দাদা। সবটাই দর্শক। সবটাই যাত্রা। পাবলিসিটি বিল্ড-আপ। এই গ্রেটেস্ট মাস মিডিয়া শীগগিরি থিয়েটার-সিনেমাকে গিলে খাবে।

পারলে খাবে। সে তো প্রাকৃতিক ব্যাপার শংকর। টিকে থাকার লড়াইয়ে যে টিকতে পারে টিকবে। বাকি সবাই হজম হয়ে যাবে। থিয়েটার তো দো-আসলা জিনিস। তাই নয়?

(ক্রমশঃ)

উপন্যাস

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আদ্য শেষ রজনী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

তুমি কি আমার দিকে একবার তাকাবেও না। সারাদিন রিহার্সেলের পর আমি ভীষণ টায়ার্ড। আমার এই শরীরে তোমাকে তো আমার দরকার হয়। আমারও তো তোমার কাছে কিছু কিছু প্রয়োজন থাকতে পারে। তুমি কাছে এসে বসবে—এমন ইচ্ছেও তো আমার হতে পারে।

লীলা চোখ তুলে তাকালো এতক্ষণে। সে মুখ ভাবলেশহীন। পলকহীন চোখে বলল এত পরিশ্রম না করলে পারো। এই তো এতবড় অসুখ থেকে উঠলে। একটু চোখ বুজে থাকলে পারো।

আমি না দেখলে কে দেখবে? যেদিকে লক্ষ রাখিনি—সেদিকেই গোলমাল।

কেন? আর কেউ দেখার নেই?

লীলার এ-কথায় অমিয় সরাসরি তার মুখে তাকালো। লীলার চোখ তখনো পলকহীন। তাতে অমিয়র অস্বস্তিই বেড়ে গেলো। তাড়াতাড়িতে সে বলল ভরত হাউজে এটা আমাদের নতুন ভেনচার। তুমি তো জানো নতুন নাটক নিয়ে আমি কেমন মেতে যাই। ঘোরে থাকি। মহলার সঙ্গে বদলাই। নতুন ভেনচার স্টেজ হওয়ার আগে অন্দি আমার খানিকটা করে আয়ু ক্ষয় করে দিয়ে যায়। তুমি কিন্তু এবারে একদম এগিয়ে এলে না। অথচ সুজাতার জায়গায় নতুন ভেনচারের কথা তুমিই প্রথম আমার মাথায় ঢুকিয়েছিলে। আর এখন তুমিই সবচেয়ে সায়ালেন্ট। নতুন নাটকে—

আর এগোতে পারলো না অমিয়। লীলা হাতের খাতাখানা ভাঁজ করে রেখে বলল নতুন? ভেনচার? কোথায়? সম্রাটে?

নিজের গলাই নিজের কানে এবার কৈফিয়তের মত শোনালো অমিয়র। নতুন নয়? এ নাটক নতুন নয়? লেখার সময়টা তো তুমি জানো। তবু জানতে চাইবে নতুন কিনা? ভেনচার! বলে ঠাট্টা করছো?

লীলা বলল লিখছো নতুন। কিন্তু আর সবই তো পুরনো। রজনী যেখানে তোমার সঙ্গে আছে—সেটা আসলে নতুন কোন ভেনচারই নয়।

অমিয় এতটা ভাবেনি। সে বলল তাহলে তো তুমি বলতে পারো—সেই একই হাউজ ভরতে সম্রাট হচ্ছে। সুতরাং এ কোন নতুন অ্যাটেম্পট্ নয়।

তা বলছি নে। তবে তুমিই বলো—সুজাতা নাটক করতে গিয়ে তুমি যেভাবে তোমার সারাদিনের অভ্যেস তৈরি করেছো—তা কি এ নাটকে পালটাবে?

কী রকম অভ্যেস?

ভরত হাউজ তোমার ঘর-বাড়ি। বেলা এগারোটা থেকে গভীর রাত। ওখানেই কাটছিল তোমার। তোমার এতটা সময়ের সবটাই কি নাটক পেয়েছে? পায় নি? পেতে পারে না। এই ভেনচার আসলে নতুন বোতলে পুরনো মদ। রজনী কখনো তোমায় ছাড়বে না। নতুন নতুন মটকের মহলা চালু করে দিয়ে তোমায় আটকাবে।

অমিয় মুখে কিছু বলল না। মনে মনে বলল হিংসে মানুষকে অন্ধ করে। মূর্খ করে। লীলা একটু খোঁজ নিলেই জানতে পারতো—এ নাটক রজনী বাঙ্গি ছিল না। এ নাটকের মহলা রজনীর মাথা দিয়ে বেরোয় নি। বেরিয়েছে অমিয়র মাথা থেকে। তারই জেদ এ-সব হচ্ছে। না হলে শংকরের চলে যাওয়ার কথা তো ছিল না!

অমিয় উঠে গিয়ে ভরতে ফোন করলো।

ওপাশ থেকে পাখি পড়ার মত পরিষ্কার গলা ভেসে এল। নমস্কার। পঞ্চমুখ। ভরত থেকে বলছি। শনি-রবি ছুটির দিন তিনটে টা—বৃহস্পতিবার সন্ধে ছটায় সুজাতা। নাটক নির্দেশনা—অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। সাড়ে দশ সাড়ে সাত সাড়ে পাঁচ সাড়ে তিন টাকার টিকিট হলে। সব প্রকার ফ্রি পাশ বন্ধ।

অমিয় ধমকে থামালো বিপুলকে। আজ কি শো আছে, নাকি? বলেছি না শুধু শোয়ের দিন বলবি। বিপুলের কোন পার্সোনালিটি গড়ে উঠলো না। অমিয় দু একবার চেক করতে বাইরে থেকে ফোন করেছে। বিপুল বলতে পারে নি। অসতর্ক অবস্থায় ধরা পড়ে গিয়ে লজ্জা পেয়েছে। তাই এখন ওই কথাগুলো ওর জপমন্ত্র। বাইরের ফোন এলেই ওর ধারণা অমিয়দা চেক করছে।

দ্যাখো তো লালু আছে কিনা। থাকলে গাড়ি নিয়ে আমার বাড়িতে আসতে বল।

একটু ধরুন অমিয়দা। আমি দেখে বলছি।

একটু বাদেই বিপুলের গলা ভেসে এল। লালু খেতে বসেছে ক্যান্টিনে। খেয়ে উঠেই গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে।

চন্দ্রদীদা খেয়েছেন?

উনিও খেতে বসেছেন। ডাকবো।

না দরকার নেই।

লীলা খাতা দেখে যাচ্ছিল। পৌনে দশটা নাগাদ লালু এলো। দশটায় অমিয় গাড়ির পেছনের সিটে গিয়ে বসলো। চিৎপুর চলো।

ফাঁকা রাস্তা। ঠিকানা মিলিয়ে পনেরো মিনিটের ভেতর সেই দোতলা বাড়িটার সামনে এসে গাড়ি থামালো লালু। সিঁড়ির মুখের সাইন বোর্ডটাও পড়তে পারলো অমিয়। রাস্তার আলোয়। নীলকমল মাতা সমাজ। পরের লেখাগুলো ছোট।

দোতলা থেকে হাসির টুকরো মহলার ডায়ালগের দু এক দানা সুর পার্টির কেউ বেহালায় ছড় টানছে—সবই গাড়ির ব্যাক সিটে বসে শুনতে পাচ্ছিল অমিয়। অনেকগুলো গলার স্বর। তার ভেতর থেকে নিজের চেনা গলা খুঁজে নিতে চাইছিল অমিয়। ট্রাম এসে সব গোলমাল করে দিল।

দোতলার সিঁড়ি ধরে দু-একজন নেমে এসে ট্রাম ধরছিল। বাসে উঠছিল।

সিঁড়ির মুখোমুখি একখানা ফিয়েট দাঁড়িয়ে। ড্রাইভার সিটে বসে দুলছে। অমিয়র চেনা লোকটি এসে গাড়িতে উঠলো।

লালু ওই গাড়িটার মুখোমুখি গিয়ে পার্ক করো। এখুনি। পারবে?

ফিয়েট সেলস্ দেবার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চমুখের আমবাসাডর গিয়ে তার সামনে দাঁড়ালো। হেড লাইটের কড়া আলো ভেতরটা আলো করে দিতে শংকরকে দেখতে পেল অমিয়। পেছনের সিটে তারই মত হেলান দিয়ে বসে আছে। মুখে আলো পড়ায় রেগে উঠে বসলো।

লালু। আলো জ্বালিয়ে রাখা। আমাদের শংকরদা যে—

মেন্টাল বেসিসে আমার সুরে হরদম রেকর্ড করেছে মস্তবড় বুকের পাটা না থাকলে সেটা সম্ভব হোতো না। ও সে কত বড় শিল্পী তখনই বুঝেছি।

আপনি রবীন্দ্রসঙ্গীতকে এমন করে ভালবাসলেন কি করে?

বেতারে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যে হেমন্ত, আমি অনেকবার গান করেছি। তাছাড়া আমার ছোটো মামা শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যর হুকুমে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে অনেকবার গেয়েছি। ছোটো মামার বাড়ীর সংস্থা বিচিত্রায় শান্তিদেব ঘোষ গান শেখাতেন। সেখানে এক বছর রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছি তাঁর কাছে। জোড়াসাঁকোর উৎসবে—এক ধারে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর পরিচালনায় মেয়েরা গাইতেন আর এক ধারে শান্তিদার পরিচালনায় ছেলেরা গাইতেন। সে গান লীড্ করতাম আমি।

সেখানে আমার গান শুনে দীনুঠাকুর আমায় শেখাতে চেয়েছিলেন। আমি ভয়ে যাইনি। আমার যে পারিশ্রমিক দেবার টাকা ছিলো না। হয়তো তিনি নিতেন না। কিন্তু আমার সংকোচ হোতো যেত। ক্ল্যাসিক্যালও উপযুক্ত গুরুর কাছে শেখবার ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু অর্থাভাবে হয়ে ওঠেনি।

আপনি এর মধ্যে আর কোনো রেকর্ডের গানের সুর দেননি?

সেই ৫৮ সালে গ্রামোফোন কোম্পানী ছেড়ে এসেছিলাম। এবার আবার আমার ডাক পড়লো পূজোয় অজয়দার (ভট্টাচার্য) গানের একটি এল-পি ডিস্ক বেরোচ্ছে। তার একটি গানে আমায় সুর দিতে হবে। মনে হোলো জীবনের শেষপ্রান্তে এসে অজয়দার মত গীতিকারের গানে সুর দেবার আহ্বান পাওয়াটা সৌভাগ্যের কথা। গানটি হোলো ছায় ফুটেছিলো শতদল—গেয়েছে তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আপনি গানে সুর দেন কিভাবে?

আগে গানটা বারবার করে পড়ে নিই। গভীর ভাব যদি থাকে তাহই অনুকূল রাগের ছোঁয়ায় কথায় প্রাণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি। প্রত্যেক সুরের একটা রেস থাকা চাই। নইলে সুরের রেস থাকে না। এই রেসকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই মূল ভাবটিকে বীজমন্ত্রের মতন মনের মধ্যে জপ করি। অমনই সব সহজ হয়ে যায়। সুরের স্ট্রাকচারের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে বড় হোলো সঞ্চারী। কারণ এই সঞ্চারীই হোলো অস্থায়ী অন্তরার মধ্যে যোগসূত্র।

এখনকার গানের সুরকার এই সঞ্চারীর প্রতি উদাসীন। মিউজিক দিয়ে এই শূন্যতা তাঁরা ভরাতে চান। কিন্তু আগেকার দিনে গানই সুরে ভরাট হয়ে থাকতো জমকালো মিউজিকের প্রয়োজনই হোতো না। আমি এঁদের সবার নীচে ছিলাম। তবু আমায় এতসব ভাবতে হোতো। কারণ ফাঁকি দিয়ে কিছু করার অভ্যাস সে যুগের কারো ছিলো না। এটা তখনকার যুগের সংস্কারও বলতে পার। আর ফাঁকি ছিলো না বলেই তখনকার গান এমন কালজয়ী হয়ে আছে। তোমরা এখনকার মানুষরাও সে গানের খোঁজ কর।

তা বলে এখনকার যুগের গান কিছুই নয় অথবা এখনকার সুরকাররা সঙ্গীতজ্ঞানহীন একথাও আমি মানতে রাজী নই।

যুগের প্রয়োজন একটা মস্তবড় ফ্যাকটর। একথা অস্বীকার করবার কোনো পথ নেই। যুগের প্রয়োজনে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাচ্ছে, পোষাক পরিচ্ছদ বদলাচ্ছে, খাবার মেনু বদলাচ্ছে, সাহিত্য বদলাচ্ছে আর গানে সেই অস্থিরতার ছায়া পড়বে না? যাঁরা গান লিখবেন অথবা সুর দেবেন তাঁরাও ত মানুষ? এবং এ-যুগেরই মানুষ। এ-যুগ গতির যুগ। সেটা ভুললে ত চলবে না?

তবে যতই পরিবর্তন হোক শেক্সপীয়ার, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র আলাউদ্দিন খাঁর সম্মান সব যুগেই থাকবে। তাই দ্রুতলয়ের জীবনে ক্লান্ত মানুষ এক সময় বিশ্রাম চায় এঁদের বিরাট বুকে। ক্ল্যাসিক্যাল আর্টের মূল্য কোনোদিন বদলায় না।

অনেক শিল্পী আসবে যাবে। সকলেরই প্রতিভা নিশ্চয় আছে। নইলে মানুষকে এঁরা মুগ্ধ করলেন কেমন করে? কিন্তু সেই পঙ্কজ মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দে, শচীন দেববর্মন, সায়গল, কানন এঁদের ভাবীকাল কোনোদিন ভুলবে না। এ-যুগের শিল্পীদের মধ্যে ধনঞ্জয়, হেমন্ত, সতীনাথ ও মান্না আপন চরিত্র বৈশিষ্ট্যে বেঁচে থাকবে।

হেমন্ত ও ধনঞ্জয় বাংলা গানের দুটি স্তম্ভ। একজন—ক্ল্যাসিক্যাল ভিত্তিক আধুনিক গানের। অপরজন সহজ, সরল সুরে সাধারণ মানুষের গানের।

ক্ল্যাসিক্যাল মাইণ্ডেড যারা তাঁরা ধনঞ্জয়কে মাথায় করে রাখবে। আবার সঙ্গীতজ্ঞানহীন সাধারণ মানুষের মনে সঙ্গীতবোধ জাগাতে হলে মস্তবড় শক্তির দরকার। এবং এইখানেই হেমন্ত তুলনাবিহীন।

সতীনাথ খেয়াল এবং ঠুংরীর সূক্ষ্ম কাজে নিখুঁত। ও বাংলা গানে নতুন কিছু করবার চেষ্টা করেছে এবং অনেক গানে উল্লেখযোগ্য সাফল্যও অর্জন করেছে।

একবার আমার একটা গানের সুর শুনে কমলদা (দাসগুপ্ত) বলেছিলেন, নির্মল তোমার গানের সুর অসাধারণ। কিন্তু তুমি কোনোদিন বড় হতে পারবে না। কারণ তুমি মোটেই কমার্শিয়াল নও। ওঁর সেই প্রশংসা আমার কাছে ভগবানের আশীর্বাদ।

আপনার মনে কোনো ক্ষোভ নেই?

কোনো ক্ষোভ নেই। দ্যাখো, বোন সবাই সবকিছু পায় না। আর অর্থ, যশ, বাড়ী, ঘরের আমার দরকারই বা কি? আমি ত সংসারী নই? সেজদা, ন'দা, আমি তিনজনেই অবিবাহিত।

অর্থ, যশ, কোনোটাই আমার লক্ষ্য ছিলো না। গান গেয়ে, সুর বেঁধে, গান শিখিয়ে যে আনন্দ পেয়েছি তাতেই আমার মনপ্রাণ ভরে আছে। আমি সুখী। কারণ কারো সঙ্গে আমি নিজের তুলনা করি না। আমি অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু কারো কাছে কোনো কিছুর প্রার্থী হয়ে আমায় হাত পাততে হয়নি। যা পেয়েছি তা আমার যোগ্যতার চেয়ে অনেক বেশী। শিল্পী, সুরকার, গীতিকার সকলের প্রাণঢালা শ্রদ্ধা জীবনে কটা মানুষ পায়? আমার ক্ষোভ থাকবে কেন?

বিনুদার সুরের গান যতবার শুনি কেন জানি না মনে মনে ম্যাকবেথ নাটকের একটি মন্তব্য ব্যাংকোর সম্বন্ধে মায়াবিনীদের—**লেসার দ্যান ম্যাকবেথ বাট গ্রেটার। নট সো হ্যাপি, বাট মাচ হ্যাপিয়ার।**

সন্ধ্যা সেন

প্রকাশিত হলো—ছোটদের হাতে তুলে দেবার মতো চমৎকার একটা বই:

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়ের

ঝাঁপড়দহে ঝক্‌মারি ৪-০০

নতুন কিশোর উপন্যাস

বাড়ীতে এলেন সাতপুরুষের গুরুদেব। কদিন বাদেই তিনি বাতাসে মিলিয়ে গেলেন। আর তারপরেই বন্ধুর সঙ্গে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে হারিয়ে গেল বাড়ীর একমাত্র ছেলে পার্থ।.....জ্ঞান ফিরল এক পোড়ো বাগানবাড়ীতে গুণ্ডাদের আস্তানায়। তারপর? তারপর সে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড! সেই দুই ছেলেতে মিলে ঘোল খাইয়ে দিলে গোটা গুণ্ডা দলকে!! আজব তাদের কাণ্ডকারখানা। পড়ার আগে রুদ্ধশ্বাস, পড়তে পড়তে হেসে খুন। এক নিঃশ্বাসে পড়ার মত বই। শিল্পী শৈল চক্রবর্তীর আঁকা, সুদৃশ্য প্রচ্ছদ আর মজার মজার ছবি। ঝকঝকে ছাপা। সুন্দর বোর্ড বাঁধাই।

গ্রন্থমেলা • এ-১২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭০০০০৭

হাতে উপহার লিখে আমায় দিলেন। বইটির নাম 'ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ'।

গভর্নমেন্ট কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়বার সময় অল বেঙ্গল মিউজিক কলেজ ও লাইট মিউজিকের ওপর সকল প্রতিযোগিতায় নির্মল ভট্টাচার্য দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। প্রথম হতেন 'মুরারী মিশ্র (নির্মলা মিশ্রর দাদা) মুরারীটাকে আমি কোনোদিন হারাতে পারিনি।' বিনুদা হেসে বলেন 'যে কম্পিটিশনে ও আসতো না সেখানে কিন্তু আমি ফার্স্ট হতাম'।

'আপনি রেকর্ড করেন নি?' সোনালী কোম্পানীতে রেকর্ড করেছিলাম। কিন্তু মতের অমিল হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সে রেকর্ড রিলিজ করা হয়নি।'

'আপনি কোনো ছবিতে সংগীত পরিচালনা করেন নি?'

প্রভাত মুখোপাধ্যায় এবং অসিত সেনই আমায় প্রথম সিনেমার সংগীত পরিচালকের অফার দিল। প্রথম 'শ্বশুরবাড়ী' তারপর একে একে 'মা' 'চলাচল', 'পঞ্চতপা' 'মমতা' ছবির সুর দিয়েছিলাম। চলাচল ও পঞ্চতপার দুটি গান খুব জনপ্রিয় হয়েছিলো—'আমি যাবো যবে হারায়ে আমার সমাধি পরে' ও কখন এলাম কেন যে গেলাম কে জানে'। এই প্রসঙ্গেই একটা কথা বলি। সেজদা আমায় বারবার বলেছিলো 'জীবনে কখনও আমার গানের খাতা নিয়ে টালিগঞ্জ পাড়ায় ফিল্ম লাইনের' হর্তাকর্তাদের পিছনে 'ঘুরবি না কিংবা গ্রামোফোন কোম্পানীতে হাঁটাহাঁটি করবি না।

সেজদার কথা আমি অমান্য করিনি। আমি কোনোদিন গ্রামোফোন কোম্পানী বা ফিল্মজগতের বিধাতাদের কাছে ধাইনি। তারাই সেজদার গানের খোঁজে আমায় জ্বলব করেছেন।

'কিভাবে?'

হিন্দুস্থান কোম্পানী থেকে যামিনীবাবু একবার আমায় ডেকে পাঠালেন সেজদার গানের একটি রেকর্ডের রয়ালটি দেবার জন্য। সেইসময় জিজ্ঞেস করলেন 'অনিলবাবুর গান কি আপনার জানা আছে?'—

'আছে। ভালো শিল্পী পেলে দিতে পারি'।

'সুপ্রভা সরকার হলে চলবে?' —উনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

আমি রীতিমত রোমাঞ্চিত। সুপ্রভা সরকার (সংগীতমহলের বড়দি) আমার কাছে আইডল্। তিনি আমার মত লোকের সুরে গাইবেন এ ছিলো আমার স্বপ্নেরও অতীত। —যাইহোক নির্দিষ্ট দিনে তাঁর বাড়ী গেলাম। যামিনীবাবুই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সুপ্রভা সরকারের তখন দারুণ নামডাক। উনি যদি আমার সুর শুনে গাইতে রাজী হন তবেই রেকর্ড হবে।

বড়দি প্রথম গানটি শুনলেন মন দিয়ে। দ্বিতীয় গানটি সুরু করতেই উনি নিজের জায়গা থেকে উঠে এসে আমার হাত চেপে ধরে বললেন 'নির্মল আমায় কথা দাও এ গান আর কাউকে দেবে না' বলতে বলতে ওঁর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়াচ্ছে। গানটি হোলো 'সে যে মধুর সে যে মধুর যে ব্যথা দিয়ে গেলে'। আর একটি গান এ-পথে যখনই যাবে বারেক দাঁড়াযো ফুলবনে —এই গানটিই ছিলো সেজদার জীবনের শেষ গান। মৃত্যুর আগের দিন লেখা।

সে বছর পুজোয় রেকর্ড হোলো এবং এ গান ছিলো হিট রেকর্ডের শীর্ষে। এরপর সেজদার অনেক গানই বড়দি রেকর্ড করেছেন। আরো অনেক শিল্পী করেছেন। সেজদার কথা, আর তাঁদের গলার গুনে উতরে গেছে ভালোভাবেই।

'সুরকারের কৃতিত্ব বুঝি কিছু নয়?

'সে তোমরা জানো। আমি শুধু সেজদাকে স্মরণ করে পাগলের মত সুর দিয়ে গেছি। সেজদার নামে আর একটি জিনিস আমি করতে চেয়েছি এবং তাতে সফল হয়েছি শিল্পীদেরই সৌজন্যে। অনিল স্মৃতিবার্ষিকী। প্রতি বছর নামকরা শিল্পীরা বিনা দক্ষিণায় এখানে গান গেয়ে গেছেন। সেই সব অনুষ্ঠান থেকে পাওয়া অর্থ দিয়ে সেজদার নামে একটি ফান্ড খুলেছিলাম। তার থেকেই কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০০০৲ টাকা দেওয়া হয়েছে। তাতে প্রতি বছর বি ইউ মিউজিকে যিনি প্রথম হন তাঁকে একটি স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। এ ছাড়া রবীন্দ্রভারতীতে বাংলা গানে যিনি প্রথম হন তাঁকে অনিল স্মৃতিবাসরের পক্ষ থেকে একটি চ্যালেঞ্জ ট্রফি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কোলকাতা ইন্টার কলেজিয়েট মিউজিক কম্পিটিশনে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে একটি চ্যালেঞ্জ ট্রফি দেওয়া হয়। বিশ্বভারতীতেও এই ফান্ড থেকে কিছু টাকা দেবার প্রস্তাব চলছে। আশা করছি সেটা কার্যকরীও হবে।

অনিল স্মৃতি বাসর একটা শ্যামারাস সংস্থা হয়ে উঠেছিলো—শিল্পীদের সহৃদয়তায়। এ সংস্থায় সভাপতি ছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ তরুণকান্তি ঘোষ কৃষ্ণচন্দ্র দে অহীন্দ্র চৌধুরী ছবি বিশ্বাস পাহাড়ীদা আরও অনেকে। শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষও এ সংস্থার সঙ্গে একাত্ম ছিলেন প্রথম থেকেই। শ্রীমিহিরলাল গঙ্গোপাধ্যায়ও সহযোগিতা করেছেন নানাভাবে। শিল্পীরা সবাই দাদাকে কত ভালবাসতেন বুঝতে পারবে এর থেকেই।

সেজদার দুটি অসাধারণ জনপ্রিয় গানের নাম দিয়ে তাঁর দুটি গানের বই প্রকাশিত হয়েছে আলো ঝলমল ও মাধবী রাতে। আরো অনেক গান আছে। ছাপাবার সুযোগ হয়নি।

'আপনার আদর্শ গীতিকার ও সুরকারদের কথা বলবেন না?

রবীন্দ্রনাথ ও কাজী সাহেবকে (করজোড়ে নমস্কার করে) বাদ দিয়ে বলছি আমার প্রিয় সুরকার সুরসাগর হিমাংশু দত্ত, অনুপম ঘটক, কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাসগুপ্ত, পঙ্কজ মল্লিক, শচীন দেববর্মন, শৈলেশ দত্তগুপ্ত এবং সুধীরলাল চক্রবর্তী। এঁরা শুধু বাংলার নন, সারা ভারতের গর্ব। প্রিয় গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য, প্রণব রায়, শৈলেন রায়, সুবোধ পুরকায়স্থ, অনিল ভট্টাচার্য। তার পরের যুগের যুগের সুরকারদের মধ্যে হেমন্তকে আমি শ্রেষ্ঠ মনে করি।

রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় গীতিকার ও সুরকার বোধহয় সারা পৃথিবীতে নেই। ওঁর যে কোনো গান শুনলেই মনে হবে এ গানের এ ছাড়া অন্য কোনো সুর হতে পারে একথা আমি সুরকার হিসেবেই বলছি।

আমার গান জনপ্রিয় করে তোলবার জন্য যে তিনজন শিল্পীর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী তাঁরা হলেন সুপ্রভা সরকার, উৎপলা সেন, ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। আমার সুরে এঁদের গাওয়া গানের রেকর্ড পরপর হিট হবার দরুণই আমার সুরকে সবাই চিনেছে।

কোনোরকম ব্যবসায়িক সাফল্যের দিকে নজর না দিয়ে ধনঞ্জয় যেভাবে একসপেরি-

দুটো যেন ধীরে ধীরে জ্বলে উঠতে লাগল তার।

বিশুদার চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে রজতের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। একটা বেড়াল মারার ঘটনা। ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ অবস্থায় একটা বেড়াল মারতে গিয়েছিল সে। বেড়ালটাকে মারবার আগের মুহূর্তে বেড়ালের চোখ দুটো হঠাৎ যেন জ্বলে উঠেছিল। অন্ধকারের বুক চিরে দুটো অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল যেন। সেই চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিল রজত। আর এক মুহূর্তও দেরী না করে দরজা খুলে দিয়ে বেড়ালটাকে যেতে দিয়েছিল। বেড়াল যে-কত হিংস্র হতে পারে সেদিন সেই চোখ দুটো না দেখলে কোনো দিনই বিশ্বাস করতে পারত না। এই মুহূর্তে বিশুদার চোখেও সেই ভয়ংকর হিংস্রতাই লক্ষ্য করল রজত। লক্ষ্য করে অবাক হল। চোখ দুটো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই একটা তীক্ষ্ণ হাসি ঠোঁটের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে খেলা করতে লাগল। মস্তিষ্ক টান টান ভুরু জোড়া কুঁচকে গিয়ে কেমন বীভৎস রূপ নিল। কপালের ওপর ভেসে উঠল কয়েকটা কুঞ্চিত রেখা। চোখ দুটো কিছুক্ষণ জ্বলে থেকেই, আবার স্তিমিত হয়ে এল। স্তিমিত চোখ দুটোকে কী এক অব্যক্ত ব্যথা ফুটে উঠল। পরমুহূর্তেই আবার জ্বলে উঠল। জ্বলে উঠল আরও ভয়ংকর রূপ নিয়ে। রজতের মনে হল একটা ক্ষুধার্ত বাঘের মুখ যেন তার সামনে স্থির হয়ে আছে। অস্বস্তিতে রজতের কপাল ঘেমে উঠল।

বিশুদার মুখ চোখ লক্ষ্য করতে করতে তণিমার হঠাৎ মনে হল, লোকটা পাগল হয়ে যায়নি তো? কথাটা মনে হতেই হাতের কাছের বন্দুকটার দিকে তাকাতে বার বার ভয় হয়, হঠাৎ কিছু একটা অঘটন ঘটে যাবে না তো? তণিমার গলায় কথা আটকে গেল।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঘরের আবহাওয়াই বদলে গেল যেন। একটা আতঙ্কের ছায়া ঘুরে বেড়াতে লাগল ঘরের মধ্যে। ঘরের আবহাওয়াটা হাল্কা করার জন্য রজত মনে মনে কথা খুঁজে বেড়াতে লাগল। কিন্তু কোনো কথাই খুঁজে পেল না। শেষে মরীয়া হয়ে বলে উঠল, 'বিশুদা আপনার শরীর কী—?'

রজতের গলার স্বর ঢাকা পড়ল বিশুদার চাপা হুঙ্কারে। রজতের কানের ভেতরে গোলা বর্ষণ হল যেন। ঠোঁট জোড়া সামান্য ফাঁক করে বিশুদা বলল, এখানেই তোকে থামতে হবে রজত। এ পথে আর এগোনো চলবে না।'

—কোন পথে? —বিস্ময়ের আতিশয্যে গলার স্বর কাঁপতে লাগল রজতের।

বিশুদার ঠোঁট উল্টে গেল। মুখের মাংস পেশীতে একটা তাচ্ছিল্যের হাসির দোলা লাগল যেন। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে চাপা গলায় বলল, 'অভিনয়ের পথে। এবার থেকে অভিনয় করতে হবে। আই মিন ভিলেনের অভিনয়।' ডান হাতের তর্জনী দিয়ে বন্দুকের ওপর টোকা দিতে দিতে বলল, 'আমি চাই না, আর কেউ আমার মাথা ছাড়িয়ে যায়।

বিশুদার কথা শেষ হতে না হতেই কীসের এক গরম স্রোত তণিমার শিরদাঁড়ার পাশ দিয়ে বয়ে গেল। সোজা হয়ে বসল তণিমা। ওর মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, 'একী আপনার হুকুম?'

বিশুদার চোখের কোণে কৌতুকের হাসি খেলে গেল। ঠোঁট জোড়া ছুঁচলো হল একটু। তারপর বেশ, ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'যদি বলি তা-ই? এ আমার হুকুম এবং এ হুকুম তামিল করতেই হবে।

—তাহলে বলব আপনি মুখের স্বর্গে বাস করছেন। রজত অভিনয় করবে এবং ভিলেনের অভিনয়ই।

কথা শেষ করেই উঠে দাঁড়াল তণিমা। রজতের দিকে ফিরে বলল, 'উঠে পড়ো রজতদা। এমন নীচ লোকের সামনে বসে থাকতেও ঘেন্না করছে। ক্ষমতা নেই অথচ খ্যাতির চূড়োয় থাকবেন। নির্লজ্জ।' দরজার দিকে পা বাড়াল তণিমা। রজতও উঠে দাঁড়াল।

—দাঁড়া।

ঘরের মধ্যে একটা বোমা পড়ল যেন। সে-আওয়াজে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। দেখল, বিশুদার মাথা সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে আছে, চোখে আগুনের আভা, ঠোঁট জোড়া ছুঁচলো এবং ভুরুতে ধনুকের টান লেগেছে। গোটা দেহটাই যেন দুলছে একটু একটু। রজতের মাথাটা কেমন দুলে উঠল। নেশার ঘোর লাগল যেন। রজত স্পষ্ট দেখতে পেল, বিশুদার মুখটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে একটা সাপের ফনার রূপ নিল ঠিক যেন স্বপ্নে দেখা প্রকাণ্ড সেই সাপটা। একটু একটু দুলছে। আক্রমণের পূর্ব মুহূর্ত। রজত নিজের অজান্তেই আতঙ্কে উঠে পিছিয়ে এল খানিকটা।

বিশুদার হাতটা তখন বন্দুকের ট্রিগারের কাছে। সেই হাতটা লক্ষ্য করে তণিমার গলা শুকিয়ে গেল। কেমন ফ্যাসফেসে গলায় বলল, 'গুলি করবেন নাকি?'

খসখসে গলায় হাসতে লাগল বিশ্বনাথ ঘোষাল। বেশ খানিকটা সময় নিয়ে হাসল। কশাই-এর ছুরিতে শান পড়ল যেন। রজতের অন্ততঃ তাই মনে হল।

হাসি থামিয়ে ভুরু কুঁচকে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'চুপ করে বোস।'

কিছু না ভেবেই আবার বসে পড়ল ওরা। কতকটা সম্মোহিতভাবে। ঠিকঠাক কোনো কিছু চিন্তাও করতে পারছিল না, আর। রীতিমত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল ওরা।

বিশুদা পায়চারি করতে লাগল। ওরা নিঃশব্দে লক্ষ্য করতে লাগল বিশুদাকে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কী একটা বিষয়ে দ্বন্দ্ব চলছে মনের মধ্যে। কিছুক্ষণ পায়চারি করে চেয়ারটায় গিয়ে বসল বিশুদা। মুখখানা একটা আগুনের পিণ্ড যেন। সতী বৌদির ফটোটার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তাকাল রজতের দিকে। দৃষ্টির ফলা দিয়ে রজতের বুকটা যেন ফালা ফালা করতে চাইল। কাটল কয়েকটা সেকেণ্ড। আস্তে আস্তে দৃষ্টিটা যেন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এল। বলতে লাগল, 'সতী আমার অভিনয় কোনো দিন দ্যাখেনি। কতকটা অভিমান করেই দ্যাখেনি। একবার অসুখের সময় বলেছিল, ভাল হয়ে উঠলে তোমার অভিনয় দেখব। কিন্তু ও আর ভাল হয়ে উঠল না। আমিও ছেড়ে দিলাম অভিনয়। কার জন্যে আর অভিনয় করব? সতীই রইল না। কিন্তু অভিনয় ছাড়লেও খ্যাতি নেশা আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। ওখান থেকে আমি সরতে পারব না। ওই খ্যাতি বজায় রাখবার জন্যে সব কিছু করতে আমি প্রস্তুত। কাজেই—।'

চুপ করল বিশুদা। আস্তে আস্তে চোখ দুটো আবার জ্বলে উঠতে লাগল। ক্ষুধার্ত বাঘের চোখে পরিণত হল আবার। চাপা গর্জন করল বিশুদা, 'কী ঠিক করলি তোরা?'

রজতের মনে হল, কশাই-এর ছুরিতে শান দেওয়া এবার শেষ। এরপর ছুরিটা গলায় গিয়ে বসবে। রজত ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আপনি যা বলছেন তাই হবে। ভিলেনের অভিনয় আর করব না।'

জয়ের উল্লাসে হা-হা করে হেসে উঠল বিশ্বনাথ ঘোষাল। হাসতে হাসতেই বলল, 'আমার কাজ শেষ। এবার তোরা যেতে পারিস।'

রজত আর তণিমা এক সঙ্গেই উঠে দাঁড়াল। লজ্জা-ঘৃণা-ভয় তিনটেই এক সঙ্গে ওদের গ্রাস করতে চাইল যেন। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল বন্ধ দরজার কাছে। কিন্তু ছিটকিনিতে হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অস্বাভাবিক গলার স্বর শুনে পেছন ফিরে তাকাল ওরা। দেখল, বিশুদা তাকিয়ে আছে সতী বৌদির ফটোটার দিকে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলছে, 'দেখলে সতী? দেখলে আমার অভিনয়? আজ তোমার জন্ম দিন। নিশ্চয় তুমি এখানে আছ। কিন্তু তোমার ভাল লাগল কিনা তা আমি কেমন করে বুঝব সতী?'

বিশুদার দুচোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল ফটোটার দিকে। এক মুহূর্তে ঘরের আবহাওয়াই যেন বদলে গেল আবার।

রজত আর তণিমা হতভম্ব হয়ে গেল। এরকম অবস্থার জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। বিস্ময়ের ধাক্কাটা কোনো রকমে সামলে নিয়ে রজত বলল, আপনি এতক্ষণ অভিনয় করলেন?

বিশুদা যেন নতুন করে দেখতে পেল ওদের। দেখে আকুলভাবে বলে উঠল, অভিনয়টা কেমন হল রে? তোরা তো দেখলি, ভাল লাগল তোদের? সতীর ভালবাসার মত হয়েছে? ও-তো আমার অভিনয় কোনোদিন দ্যাখেনি।' আকুলভাবে জিজ্ঞাসা করতে লাগল বিশুদা। —বল্ না রে তোরা কেমন হল অভিনয়?

পুনশ্চ

আগেকার দিনে ধনী ও জমিদার শ্রেণীর ব্যক্তিদের যেমন নানা বদখেয়াল ও অর্থের প্রাচুর্য হেতু কিছু উদ্ধত ব্যবহার এবং অসামাজিক কাজও করতে দেখা যেত, তেমনি আবার পুষ্করিণী খনন, বৃক্ষরোপণ এবং দয়া, ধর্ম, বদান্যতার পরিচয়ও পাওয়া যেত প্রচুর।

কেবলমাত্র কান্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তির কন্যার বিবাহ বা পিতৃমাতৃ দায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে দায়-মুক্তই তাঁরা করতেন না, প্রয়োজনে সাহিত্য-সংস্কৃতির জন্য, দরিদ্র অথচ গুণী সাহিত্য-সেবীদের ভরণপোষণের জন্য, অথবা তাঁদের উৎকৃষ্ট সাহিত্যকার্য পুস্তকাকারে প্রকাশনের জন্যও ব্যয় করতেন। অতীতে এবং বিধ সৎকার্যে ধনীগণের বদান্যতার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়।

আমরা অতীতে কয়েকজন দানশীল সাহিত্যানুরাগী স্বনামধন্য ব্যক্তিদের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত 'প্রাচীন শিল্প-পরিচয়' নামক একখানি অতি উৎকৃষ্ট গবেষণামূলক গ্রন্থের 'পাকবিদ্যা' নামক একটি পরিচ্ছেদ এস্থলে উদ্ধৃত করছি। এই গ্রন্থে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে অসংখ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ এই গ্রন্থের লেখক এবং সুপণ্ডিত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এই গ্রন্থের জন্য একুশ পৃষ্ঠার একটি জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা রচনা করে দেন। গ্রন্থখানি প্রকাশের জন্য ময়মনসিংহের নরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্রকিশোর, দিঘাপতিয়ার কুমার হেমেন্দ্রকুমার রায়, রাজসাহীর কুঞ্জমোহন মৈত্র, কলিকাতা হাই-কোর্টের দ্বারকানাথ চক্রবর্তী এবং সের-পুরের গোপালদাস চৌধুরী অর্থ সাহায্য করেন।

।। পাকবিদ্যা ।।

আর্য্য-সাহিত্যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই পাকবিদ্যার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় এই বিদ্যও সভ্য-সমাজে বিশেষ পরিচিত ছিল। এমন কি, রাজা এবং রাজ পরিবারবর্গও আগ্রহের সহিত এই বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। পুণ্যশ্লোক নৈষধ এবং মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন এই বিষয়ে উদাহরণস্বরূপ-উপন্যস্ত হইবার যোগ্য। বাৎস্যায়নের কাম-সূত্রে এবং তাহার টীকায় এই বিদ্যা চতুঃষষ্টিকলার অন্যতম বলিয়া কথিত হইয়াছে। শিল্পেরই অংশবিশেষ কলানামে পরিচিত। রাজপুত্রদিগের বিদ্যাশিক্ষা-বর্ণনপ্রসঙ্গে কলাশিক্ষারও উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে যেমন নিরক্ষর ঠাকুর বা পাচকের পদ এক শ্রেণীর লোকে এক-চেটিয়া করিয়াছে, এবং বড়লোকের ভক্ষ্যান্নরস-পাচকতাবভার বাবুর্চীর উপরই ন্যস্ত হইয়াছে, পূর্ব্বকালে তেমন ছিল না। সেকালে অন্যান্য বিদ্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ নানা শ্রেণীর খাদ্য প্রস্তুত করিত এবং তাহাতে নৈপুণ দেখাইয়া সভ্য-সমাজে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিত। ভীমসেন বলিয়াছিলেন যে, যেসকল সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইঁহার (বিরাটের) জন্য বিবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া থাকে, আমি তাহাদিগকেও পরাভূত করিব।

খাদ্যের প্রস্তুত প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য করিলে, পক্ক ও অপক্ক এই দুই প্রকার খাদ্যের বিভাগানুসারে পাক ও তদতিরিক্ত প্রক্রিয়া, এই দুই প্রণালী দেখা যায়। তন্মধ্যে পাকের নানা প্রকার পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়।

অনেকের বিশ্বাস এবং অভিমত যে, মুসলমানের শুভাগমনের পর হইতেই নানা শ্রেণীর উপাদেয় খাদ্য ভারতবাসীর রসনা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব-রস বিতরণে তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। পলান্ন প্রভৃতি নৈপুণ্যোদ্ভাবিত নবদুর্লভ অমৃতায়মান খাদ্য মুসলমান নরপতিবৃন্দের রসনার প্রীতিসাধনের জন্যই ভারতে পদক্ষেপ করিয়াছে। এই সকল কথা আপাততঃ অতীত যুগের অবস্থা-জ্ঞাপক ইতিহাসের উপাদান বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু সেই সুপ্রাচীন যুগের সংহিতা, পুরাণ, ব্যাকরণ, কাব্য, নাটক, চিকিৎসাগ্রন্থ প্রভৃতির প্রতি মনোনিবেশ করিলে দেখা যায়, যাহা আমাদের নিজস্ব ছিল, তাহাই ঘটনাচক্রে কালের আবর্ত্তনে বিদেশে উদ্ভাসিত শিল্প বলিয়া আজ বিবেচিত হইতেছে।

পলান্ন ও পোলাও, এই উভয় শব্দের পর্য্যায়তায় কাহারও প্রায় বিপ্রতিপত্তি দেখা যায় না। কারণ, বর্ত্তমান সময়ে পোলাও যে প্রণালীতে পক্ব হইয়া থাকে, আমাদের পুরাতন পলান্নও সেই প্রণালীর অতিক্রম করিত বলিয়া বোধ হয় না। পলান্ন এই শব্দটি যোগরূঢ়; পল অর্থ মাংস, তাহার সহিত পক্ব অন্ন পলান্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রচুর পরিমাণে ঘৃতের সহিত ইহার পাক নিষ্পন্ন হয়, ইহার সৌরভে সর্ব্বদিক আমোদিত হইয়া থাকে। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভবভূতির লেখনী এই সর্পি ধূর্ব ভক্তের (অন্নের) মনোহর গন্ধে বাল্মীকির তপোবন সৌরভিত হইয়া গিয়াছে।

কত জিনিসে যে এই বিদেশীয় স্বত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহাই সম্পূর্ণভাবে দেখাইতে অনেক সময়ের ও যত্নের প্রয়োজন, সুতরাং আজ কয়েকটি মাত্র বস্তুর উল্লেখ করিব।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় গণপতির বলিদানে পললৌদনের উল্লেখ দেখা যায়। যথা—কৃতাকৃত (অর্দ্ধকৃত) তণ্ডুল, পললৌদন, পক্ব ও অপক্ব মৎস্য এবং মাংস, বিচিত্র পুষ্প-সুগন্ধ দ্রব্য এবং বিবিধ প্রকার সুরা।

অহহ পললৌদন ও পলান্ন সমানার্থক। কারণ, পলল-মাংস, তাহার সহিত পক্বতণ্ডুল (অন্ন) পললৌদন নামেও পরিচিত ছিল। যদিও অপরার্ক এবং মিতাক্ষরা পললৌদন শব্দের তিলপিষ্ট মিশ্র ওদন এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি আমরা অবিচারিতভাবে তাঁহাদের এই মত গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ অভিধানে পলল শব্দের অর্থান্তর দৃষ্ট হইলেও, মাংস অর্থেই ইহার প্রসিদ্ধি দেখা যায়। সুতরাং পলান্নের সমানার্থ পললৌদন শব্দের প্রসিদ্ধার্থ পরিত্যাগের হেতু দেখা যায় না। পিষ্টতিলের সহিত অন্নপাক প্রসিদ্ধও নহে।

এই অন্নে ঘৃতের প্রাচুর্য্য-নিবন্ধন কবি-প্রবর ভবভূতি সর্পিতেই ইহার পাক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়েই পরশুরামকে বলিতেছেন—সর্পিতে অন্নপাক করা হইয়াছে, বৎসতরী—সংস্কৃত করা হইয়াছে, তুমি শ্রোত্রিয়, শ্রোত্রিয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়াছে, আমাদের এই সকল দ্রব্য গ্রহণ কর।

এই উক্তি হইতে বুঝা যায় আজকাল যেমন বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত হইলে, তাহার জন্য পোলাও মাংসের ব্যবস্থা করা হয়, পূর্ব্বকালেও এইরূপ হইত।

ক্রমশঃ

পাশ থেকে বলছি

মন্টিলের আরও শিক্ষা

প্রাচীনকালে, খৃস্টজন্মের হাজার হাজার বছর আগে জীবনের শিক্ষা পেতেই ওলিম্পিক ক্রীড়ার অনুষ্ঠান ঘটানো হয়েছিল। গ্রীক সভ্যতার তখন স্বর্ণযুগ। তবু রাষ্ট্রব্যবস্থায়, এক অঞ্চল প্রদানের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের প্রধানের হানাহানি, কাটাকাটির অন্ত ছিল না। এক-একটি জায়গায় এক-একজন নায়ক। কেউ কারুর প্রভুত্ব মানতে রাজি নয়। নিজের আধিপত্য বজায় রাখায় এবং স্বশাসিত সীমানার আয়তন বৃদ্ধি করার প্রয়োজনে একে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ বাধাতে কুণ্ঠাবোধ করতো না। গ্রীকরা ছিল বীরের জাত। কথায় কথায় তরবারি হাতে তুলে নেওয়া ছিল তাদের কাছে ছেলেখেলারই সামিল।

স্বার্থ হিংসা, ভেদবুদ্ধি এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার এই লড়াকু মনোভাবের পরিণামে গ্রীসে তখন অস্বাস্থ্যকর অবস্থা। ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি, আত্মীয়স্বজনে হানাহানির এই সর্বনাশা ছবি দেখে এক চিন্তানায়ক সমগ্র গ্রীকভূমিকে একবার একটি সূত্রে বেঁধে রাখার নিশ্ছিদ্র পরিকল্পনা রচনা করে সর্বজনীন ক্রীড়াভূমিতে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে সারা গ্রীসকে আহ্বান জানান। এই চিন্তানায়কের নাম হেরাকলস।

দেশকে একীভূত সংহত করার মহান সংকল্পে হেরাকলস উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন ওলিম্পিক ক্রীড়া এক সর্বজনীন অনুষ্ঠান। এসো ক্রীড়াভূমিতে মিলিত হয়ে আমরা একদিকে সুস্থ জীবনচর্যায় মেতে উঠি। অন্যদিকে দেবগণের আশীর্বাদ কামনায় তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা রাখি। বন্ধুর জাত তোমরা। প্রাণভরে কাটাকাটি করবো। তবে অন্য সময়। ওলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গনের পুণ্য লগন নয়। অন্ততঃ এই কটা দিনের জন্যে বিদ্বেষ, বিভেদের মন্ত্র ভুলে একই পতাকাতলে, একই অনুষ্ঠানকালে সবাই মিলিত হও।

হেরাকলসের ডাকে যাদু ছিল। তাঁর বক্তব্যে বস্তু ছিল। তাই শতধা বিভক্ত সে কালের কারুর তাঁর কথা ফেলতে পারে নি। এক ডাকে সাড়া দিয়েই খেলার নামে সর্বজনীন মিলনভূমিতে এসে পরস্পরের আত্মীয় হয়ে উঠেছিল। ফলে জন্য সময়ে না হোক, প্রতিটি ওলিম্পিক অনুষ্ঠানকালে খণ্ড-বিখণ্ড গ্রীকভূমিতে অখণ্ড শান্তি স্থিতিশীল হয়ে উঠেছিল।

অন্য কোনো ডাকে সেদিনের গ্রীকজাতি এমন একযোগে একটি চিহ্নিত অঞ্চলে মিলিত হতে পারতো কিনা সন্দেহ। তাই ওলিম্পিক দৃশ্যতঃ একটি খেলাধুলার আসর হলেও পরোক্ষে একটি জাতির জীবনচর্যায় কল্যাণমূলক দায়-দায়িত্ব যে পালন করে গেছে তাতে কোনো সন্দেহই নেই। হেরাকলস উদ্ভাবিত পরিকল্পনা যে মূলতঃ মানব বেরাদেও নিয়োজিত সে সম্পর্কে ইতিহাসও নিঃসন্দেহ হতে পেরেছে।

বিষয়টি সম্পর্কে কালান্তরের দুনিয়ার মনেও কোনো সংশয় নেই। একালেও তাই বলা হচ্ছে যে ওলিম্পিক ক্রীড়াকেন্দ্র হচ্ছে মানুষের নিমলতীর্থ। ওখানে দাঁড়িয়ে বিশ্ববাসী মৈত্রী, শুভেচ্ছার শপথ গ্রহণ করে। কিন্তু মুখে মুখে যা বলা হয়, কাজের হিসাবে কতটা মর্যাদা ধরে রাখার সবাই নিষ্ঠ থাকতে পারছে? আদর্শ সম্পর্কে তিলা মত বাদ্‌ নেই। তবে সে আদর্শের রূপায়ণে অনেকেই একমত নন। রাজনৈতিক ও সম্প্রদায়গত স্বার্থচিন্তার তাগিদে কেউ কেউ আজ নিজের পথে চলতে গিয়ে ওলিম্পিক ক্রীড়ার মহান আদর্শকেই উপেক্ষা করে বসছে। ফলে যে পরিকল্পনা হাতে নিয়ে সেই প্রাচীনকালে খণ্ডবিখণ্ড গ্রীকভূমি অখণ্ড সত্তায় নিজেকে পরিবর্তিত পেয়েছিল এবং যে পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে কোথাও কোনো বিরোধ বাধার কথা নয়, আজ সেই পরিকল্পনা ঘিরেই তীব্র মতবিরোধ ও বিতর্ক গড়ে উঠছে। এরই সর্বনাশা বিরোধ যে গোটা দুনিয়ার বুকে ওলিম্পিক উপলক্ষ্যে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়!

প্রাচীনকালে ওলিম্পিক ক্রীড়ার সময় অন্তত তিন মাসকাল গোটা গ্রীসে অখণ্ড শান্তি বিরাজ করতো। গ্রীসের জীবনেতিহাস থেকেই আধুনিক দুনিয়া শিক্ষা পেতে চায় বলেই একালে সাম্প্রতিক ওলিম্পিক ক্রীড়ার পুনরুজ্জীবন ঘটেছে। কিন্তু একালের চিন্তাধারায় সেকালের প্রাদেশিকতা ভাবনার প্রতিফলন ঘটেনি এবং একালের কর্মোদ্যোগে কিন্তু সেকালকে অনুসরণ করায় আন্তরিকতা নেই। তাই ওলিম্পিক আসরে যোগ দেওয়ার নাম করেও একাল কথায় কথায় দলে দলে আসাদা হয়ে যেতে চাইছে। এক কথায়, আদর্শের জন্য অনেকেই চিন্তিত নয়। তাদের বড় চিন্তা, নিজেদের মুখ থাকে আকড়ে ধরে রাজনৈতিক দাবা খেলায় চাল মাৎ করে দেওয়ারই চেষ্টা।

খেলাধুলো ও রাজনীতি, দুটি স্বতন্ত্র উপগ্রহের বস্তু। দুটিতে মিশ খায় না, যেমন তেলে-জলে এক হয়ে যেতে পারে না। তত্ত্বটি সকলেরই জানা। তবু খেলাধুলোর সঙ্গে রাজনীতির মেলবন্ধন ঘটিয়ে একটি অত্যাশ্চর্য মিশ্রিত উপাদান গড়ে তোলার জন্যে আজ যেন দিকে দিকে তোড়জোড় পড়ে গেছে। পরিণামে শুধু যে ওলিম্পিকের মহান আদর্শ ক্ষুণ্ন হচ্ছে তাই নয়, মানব কল্যাণের পথও বন্ধুর হয়ে পড়ছে। উত্তর প্রজন্ম ইতিহাস থেকে শিক্ষা পাওয়ার ভান করছে বটে। কিন্তু সেই শিক্ষা আত্মস্থ করার তার সত্যিই কোনো গরিদ নেই।

আধুনিক দুনিয়া নিজেকে সভ্য বলে অভিহিত করে। এই কালের বুলি, বিশ্বশান্তি ও মৈত্রী প্রসারে সচেষ্ট থাকবো। অথচ এই কালেই ওলিম্পিকের মতো এক সর্বজনীন মিলনভূমিকে ছলচাতুরী ও তুচ্ছ অজুহাতে ভেঙে দেওয়ার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। রাজনীতি যখন সর্বগ্রাসী হয়ে দাঁড়ায় তখন সে মূল জীবনের কোনো মঙ্গলকে, মায় খেলাধুলাকেও যে রেহাই দিতে চায় না, এই সত্যই যেন আজ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

এই সত্য তিক্ত, অপ্রিয় ও বেদনাদায়ক। কিন্তু উপলব্ধি সাচ্চা। ১৯৩৬ সালে নাৎসী নায়ক হিটলারের আমলে আত্মকেন্দ্রিক জার্মানী ওলিম্পিকের উদ্দেশ্য, আদর্শ ভুলে আর্য-অনার্য শ্রেণীগতের চুলচেরা বিশ্লেষণে মত্ত থাকতে চেয়েছে। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরীয় অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে বুশ বিরোধী প্রভাব চালিয়ে ওলিম্পিক ক্রীড়াভূমিতে বিভেদের বীজ বপন করার চেষ্টা হয়েছে। ১৯৬০ সালে তাইওয়ানের যোগদানের প্রশ্নে জলঘোলা করা হয়েছে। ১৯৬৮তে ওলিম্পিক সনদ উপেক্ষা করে বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেসিয়াকে পেছনের দরজা দিয়ে ওলিম্পিকের পারিবারিক পিঁড়িতে ঠাঁই দেওয়ার চক্রান্ত আটা হয়েছে। তাছাড়া ওলিম্পিককে সামনে রেখে সেবার মেকসিকোতে গড়ে ওঠা ছাত্র আন্দোলনের সূত্রে হাঙ্গামা, সংঘর্ষ কিছু কম হয়নি এবং নিগ্রো আন্দোলনকেও ক্রীড়াভূমিতে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। মিউনিখের গেরিলা হামলা তো আরও বড় দুর্ঘটনা। ঘাতকের উদ্যত খড়্গে সেদিন যে এগারো-জনকে প্রাণবলি দিতে হয়েছিল তারাও তো রাজনীতিরই শিকার।

সর্বগ্রাসী রাজনীতির হাত থেকে মন্টিলেরও মুক্তি মেলে নি। প্রথমে বাড়তি দাবি-দাওয়া ও শ্রমিক ধর্মঘট নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতি। পরে তাই ওলিম্পিক ক্রীড়াদান প্রসঙ্গে এবং আরো নানা দেশের যোগ

ক্রীড়া বয়কটকে কেন্দ্র করে বহুস্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতিক আন্দোলন। যতো দিন এগোচ্ছে ততোই যেন রাজনীতিক ঝড়ঝাপ্টা এসে ওলিম্পিকের মূল কাঠামোয় কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে। রাজনীতিকে প্রতিহত করে ওলিম্পিক কাঠামোর কাঁপন বন্ধ করতে না পারলে মূল অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব হয়তো একদিন ধ্বসেই পড়তে পারে।

তাইওয়ানের যোগদানের প্রশ্নে কানাডা এবার যে প্রশ্ন তুলেছিল অথবা, নিউজিল্যাণ্ডের ভূমিকার প্রতিবাদে ক্রীড়া বর্জনে আফ্রিকান দেশসমূহ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তার মধ্যে যুক্তি আছে কি নেই সে বিতর্কের অবতারণা না করেও অসংকোচে বলা যায় যে এই প্রশ্ন ও প্রতিবাদ তুলে ওলিম্পিক ক্রীড়াকে রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনায় জড়িয়ে ফেলা হয়েছে। যে কাজ মূলতঃ ওলিম্পিক সনদ বিরোধী ক্রিয়াকলাপ।

ওলিম্পিক এক সর্বজনীন ক্রীড়া। জাতি-ধর্ম, রাজনৈতিক মতবাদ নির্বিশেষে অনুমোদিত সব দেশেরই এই অনুষ্ঠানে যোগদান ওলিম্পিক সনদ স্বীকৃত মৌল অধিকার। নানা যুক্তি ও অজুহাতের উল্লেখে কাউকেই সে অধিকারে বঞ্চিত রাখা চলে না। তবু সনদ বিরুদ্ধ ক্রিয়া কলাপেই আজ অনেক পক্ষ মাথা ঘামাচ্ছে। রাজনৈতিক বিবাদ বিতর্কের ফয়সালা করার জায়গা রাজনীতিক মঞ্চ, ওলিম্পিক আসর নয়। কিন্তু বিশ্বজনীন ক্রীড়াভূমিকেই যেন আজ রাজনৈতিক মঞ্চে রূপান্তরিত করার আয়োজন ঘটছে। ওলিম্পিক বহু প্রচারিত এক অনুষ্ঠান। ওলিম্পিক ক্রীড়াকালে অনুষ্ঠানটির দিকে সারা বিশ্বের নজর কেন্দ্রীভূত থাকে বলেই ওলিম্পিক ক্রীড়াভূমিকেই রাজনীতিক মতলববাজেরা তাদের সাময়িক কার্যকলাপকে সীমায়িত করেন। উদ্দেশ্য, এরই ফলে প্রচারযন্ত্রটিকে তারা নিজেদের নিজেদের দিকে টেনে নিতে পারবেন।

ওলিম্পিক ক্রীড়াভূমিতে তাদের কার্যকলাপের সদর দপ্তর সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত করে রাজনীতিকেরা তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পেরেছেন কিনা জানি না। কিন্তু একথা জানি যে রাজনীতিক আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে বিশ্ব ক্রীড়া ওলিম্পিকের নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম ঘটেছে। বিশ্ব শান্তি ও মৈত্রী প্রসারে এমন এক মহান আইডিয়া রাজনীতিক মারপ্যাঁচের চাপে পড়ে আজ রীতিমতো বিপন্ন বোধ করছে।

রাজনীতিক দাবিদাওয়ার পরিণামে আরব-আফ্রিকা গোষ্ঠীর প্রায় ত্রিশটি দেশ মন্ট্রিল ওলিম্পিক বয়কট করেছে। মার্কিন নিগ্রো এবং এশীয় অঞ্চলের কয়েকজন ছাড়া অশ্বেতকায় প্রতিযোগীরা ছিলেন এই আসরে অনুপস্থিত। এক কথায়, মন্ট্রিলে আয়োজিত একবিংশতিতম ওলিম্পিক ক্রীড়া সীমায়িত ছিল মূলতঃ শ্বেত সম্প্রদায়ের মধ্যে। অর্থাৎ ওলিম্পিক তার সর্বজনীন চরিত্র হারিয়ে সম্প্রদায়গত ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে আটকা পড়ে গেছে।

আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে ওলিম্পিক ক্রমশঃই দূরে সরে দাঁড়াচ্ছে। এই অবস্থা কারুরই অভিপ্রেত নয়। ক্ষুদ্র পরিসরের বন্দীত্ব থেকে সর্বজনীন প্রতিবেশ মুক্তি ঘটাতে হলে রাজনীতিক চিন্তাভাবনাকে হটিয়ে ওলিম্পিককে এক মুক্ত অনুষ্ঠানে পরিণত করতেই হবে। রাজনীতি এবং খেলাধুলোয় যে মিলন ঘটতে পারে না, এই চিরায়ত সত্যোপলব্ধিও মন্ট্রিল ক্রীড়ার এক বড় শিক্ষা। আধুনিক দুনিয়া কী এই শিক্ষা আত্মস্থ করতে পারবে না?

পুরাকাল থেকে আধুনিক ওলিম্পিকের প্রথম যুগ পর্যন্ত এই সত্যই স্বীকৃত ছিল যে ওলিম্পিক ক্রীড়াভূমিতে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাধে। দেশের সঙ্গে দেশের নয়। যতো দিন এই মনোভাবের প্রাধান্য ছিল ততো দিন অবস্থা ছিল মনোমত। আদর্শ। কিন্তু ওলিম্পিক ক্রীড়ার আড়ম্বর ও প্রচার বাড়াবার উদ্দেশ্যে যে মুহূর্তে জাতিগত মান-মর্যাদার প্রশ্ন ওই আসরে উঁকি দিতে আরম্ভ করে সেই মুহূর্তে থেকেই রাজনীতিক চিন্তাভাবনাও খেলার আসরে পরম বিবেচ্য বলে পরিগণিত হতে থাকে। এবং সেই লগ্নেই ওলিম্পিকের আসল সংকট দেখা দেয়।

দৌড়ঝাঁপ শেষে ওলিম্পিকে পুরস্কার-বিতরণী অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিজয়ীর জাতীয় সংগীত বাজানো হয়। প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে যোগদানকারী দেশসমূহের জাতীয় পতাকাও উত্তোলিত হয়। মূল অনুষ্ঠানের ওপর বং চড়াবার সংকল্পেই পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত গাওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই আয়োজনই শেষ পর্যন্ত বুমেরাং হয়ে মূল পরিকল্পনার গলায় কাঁটার মতো বিঁধে গেছে। পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত বাজানোর সূত্র ধরে জাত্যাভিমানীরা ব্যক্তিগত ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আয়োজিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলে মনে করছেন। আর সেই মনোভাবের খোঁচাতেই এক দেশ আর এক দেশকে টেক্কা দেবার নেশায় মেতে উঠছে। ফলে রাজনীতিক চিন্তা-ভাবনাতেই যেন শিরোধার্য হয়ে উঠেছে।

ওলিম্পিকে দেশে দেশে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয় না। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সুস্থ লড়াই বাধে—এই ধারণার পুনরুজ্জীবন ঘটলেই ভালর দিকে বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে। তাই প্রস্তাব। ওলিম্পিক আসরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত গাওয়ার রীতি, নীতির খাতিরেই বন্ধ করে দেওয়া হোক। প্রতিযোগীরা যোগ দিন ব্যক্তিগত পরিচয়ের জোরে, কোনো দেশের প্রতিনিধি রূপে নয়। তাহলেই ওলিম্পিকের সংকট ত্রাণে প্রথম ধাপে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

তাইওয়ানের কোনো ক্রীড়াবিদ বা নিউজিল্যাণ্ডের কেউ নিজের পরিচয়ে মন্ট্রিলে হাজির থাকলে রাজনীতিক অজুহাত তুলে চীন বা আফ্রিকার পক্ষে আপত্তি তোলা সহজ হোত না বলেই উপরোক্ত প্রস্তাব রাখা হচ্ছে। এ প্রস্তাব আগেও তোলা হয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটি দূরদর্শিতার অভাবে প্রস্তাবটি বিবেচনা করেন নি। মন্ট্রিলের পর যদি আন্তর্জাতিক কমিটি পূর্বোক্ত প্রস্তাব ঘিরে স্থির সিদ্ধান্ত না নেন, তাহলে বোধহয় মস্তো ভুল করা হবে।

আশা করি দেখে ঠেকে শেখার পরও আন্তর্জাতিক কমিটি আরও ভুল না করে মন্ট্রিলের শিক্ষাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে চাইবেন। ওলিম্পিকের মস্তো আইডিয়াকে রাজনীতিক ঝড়ঝাপ্টা থেকে আগলে রাখার দায়িত্ব আন্তর্জাতিক কমিটিরই। বিশ্বাস করি, এই গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থেকে কমিটি যথাযথ পথ অনুসরণে প্রেরণা বোধ করতে পারবেন।

অজয় বসু

শ্রেষ্ঠ কাবাডি কুশলী রঞ্জনা ব্যানার্জি

খেলার জগতে মেয়ে

রোগা পাতলা দেখতে মেয়েটি যখন কাবাডি কোর্টে নামে, তখন তার চেহারাই আলাদা। দৃপ্তিতে প্রতিপক্ষ ভীতসন্ত্রস্ত। হ্যাঁ, এবারের বাঙলা মহিলা কাবাডির শ্রেষ্ঠ কুশলী রঞ্জনা ব্যানার্জি সম্পর্কে ঐ কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

রঞ্জনা নিজেই নিজের সুবিধা অসুবিধার কথা নিঃসংকোচে বলে গেল। বাবা মারা যাবার পর থেকেই ওদের সংসারে টানাটানি প্রায় চরম। দুভাই তিন বোনের মধ্যে রঞ্জনাই বড়—তাই ত আমার ওপর সংসারের দায়-দায়িত্বও বড় বেশি। কাবাডি খেলা শুরু করি চন্দননগর এসোসিয়েশনে। বাবা আমার খেলায় খুব উৎসাহ দিতেন। হঠাৎ তাঁকে হারিয়ে আমরা অকূল-পাথারে পড়ে যাই। কিন্তু আমি নিজের ওপর আস্থা হারাইনি। পড়া, পড়ানো এবং খেলা তিন কাজই চালিয়ে যাই। সংসারে অর্থ সাহায্যও করতে হবে।

রঞ্জনার সংকল্প দৃঢ়। মুখের দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি করলুম, নিজের ওপর তার যথেষ্ট আস্থা আছে, তার সামনে জীবনপথের কোন বাধাই বাধা নয়। সব বাধাই সে অতিক্রম করতে পারে। এখন পর্যন্ত সংগ্রাম করে এগিয়ে যেতে। স্কুলের গণ্ডী পার হয়ে ও এখন কলেজের ছাত্রী। বি এ পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় ডিস্টিংশন পেয়েছে। প্রতিকূল পারিপার্শ্বকে তুচ্ছ করে রঞ্জনা তার লক্ষ্য স্থির রেখে এগোচ্ছে। কাবাডি মাঠে নিয়মিত অনুশীলন করার ফাঁকে পড়া শোনাও ঠিক চালিয়ে যাচ্ছে। আর্থিক অভাবের কথা প্রকাশ করতে রঞ্জনার তিলমাত্র সংকোচ নেই। ও বলে, হুগলি উইমেন্স কলেজ আমাকে ফ্রিশিপ দিয়েছে। এ না হলে

তাদের পক্ষে পড়া চালানো হেড না। ছেলেদের স্কুল চালানোর জন্য ছাত্রী পড়াই। তাদের এই কাবাডি ক্লাবও চন্দননগরের মেয়েদের সাহায্যের জন্য কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করে।

চন্দননগর এসোসিয়েশন গ্রেগে মাওয়ার পর রঞ্জনা তার সহ-গবনীদের নিয়ে এই কাজে যোগ দিয়ে কলকাতা কাবাডি লীগে খেলা শুরু করে। পরে ক্যালকাটা স্পোর্টস এন্ড হবি-ডু-ডু ক্লাবের শৈলেন সেন ওকে এ ক্লাবে নিয়ে আসেন। ৭২-এ এবিবাসের পক্ষে লীগ ও নকআউট প্রতিযোগিতায় নিয়মিতভাবে রঞ্জনা স্থান পায়। ক্রীড়া-কুশলতার সুবাদে বাংলার নির্বাচনমণ্ডলী ওকে আসানসোলে ৭৩-৭৪ সালে আয়োজিত জাতীয় কাবাডি আসরে খেলার জন্য পশ্চিমবঙ্গ দলে স্থান দেয়। পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়ে রঞ্জনার উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। পরবর্তী মরশুমে অর্থাৎ ৭৪-৭৫-এ ও ক্যালকাটা স্পোর্টস এন্ড হবি-ডু-ডু ক্লাবের যোগদানের ডাকে সাড়া দিয়ে এবিবাসে চলে আসে। ঐ বছরও বাঙ্গালোরে আয়োজিত জাতীয় আসরে পশ্চিমবাংলার প্রতিনিধিত্ব করে। পরের মরশুমে (৭৫-৭৬-এ) আবার রঞ্জনা বাংলার হয়ে জালন্ধরপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই কুশলী মেয়েটি পরপর তিন বছরই পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি হবার যোগ্যতা দেখিয়েছে। গত তিনটি জাতীয় কাবাডি প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ খানাপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। গত বছর নভেম্বরে আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষ উপলক্ষে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মহিলা কাবাডি প্রতিযোগিতাতেও রঞ্জনা বাংলা-দলে ছিল। এই সর্বভারতীয় আসরে পশ্চিমবাংলা তৃতীয় স্থান অধিকার করলেও রঞ্জনা তার ক্রীড়াকুশলতার জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে।

রঞ্জনারা চন্দননগরের পুরোনো বাসিন্দা। কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দির থেকে পাশ করে ও এখন হুগলি মহিলা কলেজে বি-এ (৩য় বর্ষ) ক্লাসের ছাত্রী। আগেই বলেছি রঞ্জনা মেধাবী ছাত্রী। পার্ট ১ থানে ডিস্টিংশন নিয়ে পাশ করেছে। কলেজ স্পোর্টসে ১০০ মিটার দৌড়, ১১০ মিটার হার্ডলস এবং দীর্ঘ লম্ফনে বিজয়িনী হয়ে মেয়েদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ান আখ্যা অর্জন করে।

রঞ্জনা বলে স্কুল কলেজে খেলাধুলো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলে আমরা আরও উন্নতি করতে পারব। দেখুন না আমার আর্থিক অবস্থা দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও আমি খেলা ও পড়ার মান উঁচু রাখার চেষ্টায় ত্রুটি রাখিনি। চন্দননগর থেকে শহরে অনুশীলন করতে আসতে বেশ অসুবিধা হয়, তবু হতাশা হইনি। খেলাও ছাড়িনি। আমিই এখন ক্লাবের সহকারী অধিনেত্রী। নিত্য শিক্ষার্থী হচ্ছে দলের ভবিষ্যৎ। তাদের কোন অফিস-টফিসে চাকরী হয়ে গেলে তাহলে খেলার দিক থেকে অনেক সুবিধা হয়।

আসল কথাটাই বলা হয়নি। রঞ্জনা এবার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী খেলোয়াড় হিসাবে বিদ্যুৎ বিভূতি মজুমদার স্মারক লাভ করেছে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়াকুশলী ছাত্রী হিসাবে ও ১৩ বছর যাবৎ আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ক্রীড়াবৃত্তি পাচ্ছে।

রঞ্জনা বলে, এখন অনেক কলেজে ছাত্রী কাবাডি খেলছে। সুতরাং বিভিন্ন অফিস এদের চাকরী দিয়ে অফিস কাবাডি টীম গঠন করতে পারে।

—পাশ করে ভবিষ্যতে কোন্ লাইন করার ইচ্ছা?

—আমার ইচ্ছা পাশ করে কোনো শিক্ষিকা হব। স্কুলের মেয়েদের পড়াব না। শিক্ষা দেব। সেজন্য প্রয়োজনে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রশিক্ষণ নেব।

অনেকক্ষণ কথাবার্তার মধ্যে বুঝলাম পড়ার ছোটখাট এই মেয়েটির মনোবল যে কতখানি তা তাকে এ মোমে ভবিষ্যতে মহিলাদের খেলাধূলায় একটি বিশেষ নাম হয়ে উঠবে।

অমল

মাঠের নায়ক

কলকাতার মাঠে প্রতিষ্ঠা পাওয়া বড়ো কঠিন ব্যাপার। আমাদের পক্ষে আরও কঠিন, কেননা জার্সির রং তেমন জনবাঙ্গা নয়। বড়ো ক্লাবে অনেকেই ভাবে কেউ যান কিন্তু আমাদের ফাটতে হয় ধাবে। সেখান ফাঁকি দেওয়া সহজ নয় সম্ভবও নয়

বাসু চৌধুরী

গোটা মাঠে অধিকাংশ লোক যাকে বাসু চৌধুরী বলে চেনেন- এবিবাসের সেই মেরুদণ্ডের পোষাকী নাম হোল শ্রীপ্রভাত চৌধুরী। ডাকনাম বাসু। লম্বা চওড়া, শক্তসমর্থ চেহারা। অবশ্য পরিচয়টা মাঠের আচরণে মনে হয় যেন- মেঠো পুতুল। মেজাজটি চরম উত্তপ্ত। মাঠের মুহূর্তেও বরফের মত ঠাণ্ডা। অবশ্য এই ক্রীড়া-পদ্ধতিটি মোটামুটি সে পাটি। ট্যাকলিং, হেডিং এবং তাৎক্ষণিক বিদ্যুৎবুদ্ধির দিক থেকে বাসু রিমিস্ট, প্রতিপক্ষের আক্রমণের ধরণধারণের সঙ্গে মাঝে মাঝে বাধা হয়ে যাসকে এ টু টাঁ হতে হয় কিন্তু স্টে সম্পূর্ণই ফেয়ার ট্যাকলিং, ফাউল নয়। সবই ভদ্রলোক বাসু অনেক তাবড় তাবড় খেলোয়াড়দের উৎসাহ পাচ্ছে। চলাফেরায় নড়ে চড়ে তার একটু ক্ষিপ্রতা আনতে পারলে ফুটবল মাঠে ওকে পাওয়া যায় কে?

বাসুর জন্ম ১৯৫৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারী, বাংলাদেশ চট্টগ্রামে। বাবা ননীগোপাল চৌধুরী মশাই বর্মায় ব্যবসা করতেন। এখন ছেলেরা বড়ো হয়েছে, চাকরী-বাকরী করছে, তাই বিজে আর দিচ্ছ করেন না, বার্মার মধুময় অতীত জীবনের স্মৃতিচারণে ছাড়া। শৈশব থেকেই বাসু মাতৃহারা। মা মারা গেলেন ১৯৬৮ স্কুল বাসু তখন দমদম ক্যান্টনমেন্ট ইনস্টিটিউশন ক্লাস নাইনের ছাত্র। সংসারে যার মা নেই তার কিছু নেই, অনেক কিছু থেকেও নেই। আনন্দ নেই, সুখ নেই, শান্তির কোন আশ্রয় নেই কথা বলতে বলতে প্রমনি টয় স্টপার বাসুরও গলা ভারী হয়ে উঠছিল, জল এসেছিল চোখে।

বাসুরা তিন ভাই, দু বোন। ভাইয়েদের মধ্যে আমি সবচেয়ে ছোট বাকী দাদার স্নেহ, দাদাদের, বোনেদের স্নেহ উপচে পড়েছে বাসুর ওপর। বাসু ভাই ঘরের আদুরে ছেলে। আদুরে ছেলে এবিবাসে এখনও। একটু শরীর বেঁকুৎ হলে অশোক ভট্টাচার্য আর শচীন হালদারের (এবিবাসের দুই ফুটবল কর্মকর্তা) উপদেশের অন্ত থাকে না। বাপ্ট রোধ তাই বাসুকে শুনতে হয়ঃ এই লক্ষ্মীছাড়া, ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলি? তখুধপত্তর খেয়েছিস? হতচ্ছাড়া, ডোবালে আমাদের! মুখে মনে ওরা ঠিকই জানেন ওরা যে কেউ ডোবাক, বাসু ওদের ডোবাবে না।

১৯৭১ সালে কুমার আশুতোষ (মেমো) গেলে হামার সেকেন্ডারী (বিজ্ঞান) পাশ করার আগেই বাসু স্কুল ফুটবলের আসর উত্তর শহরতলীর প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। দক্ষিণ [illegible]-মেন্টের সুভাষনগর কলোনীতে এর ওকে সবাই চিনতেন বাসুকে। ১৯৬৮ সাল ফুটবলে হাতেখড়ি ঐ সুভাষনগরেই। একটু বড়ো হয়ে ১৯৭২ সালে এলেন জীবন দাস ও সমীর মজুমদারের হাত ধরে গড়ের মাঠে এলবার্টের জার্সি গায়ে নিয়ে লীগ খেলতে। ৭৩-৭৫ কাটলো [illegible]-ঘাটে। এবিবাসে নিয়ে এলেন নন্টু মিত্তির ১৯৭৫ সালে।

কলেজ ফুটবল খেলার সূত্রে (কলেজ মতিঝিল) আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতার আসরে কলকাতার দলভুক্ত হলেন ১৯৭৪ সালে। খেলা হলকাতা ময়দান বাইপাসে। সেবার আঞ্চলিক ফাইনালে ভাগ্য হেরে গিয়েছিলো। ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ সালে বাংলার হয়ে জুনিয়ার [illegible] ফুটবলে খেলেছেন, যথাক্রমে কলকাতা ও কোয়েম্বাটুরে। ৭৪ সালে সিনিয়র বাংলা দলের বাসু ছিলেন স্ট্যান্ড-বাই ৭৪-৭৫ সালে জুনিয়ার জাতীয় দল গঠনে পূর্ব প্রশিক্ষণ শিবিরে আমন্ত্রণ পেলেও [illegible] দলে ঠাঁই মেলেনি। ঠাঁই মেলেনি ১৯৭৫ সালে বাংলা সিনিয়র দলেও। ১৯৭৬ সালে কি ঘটবে বাসু সে সম্পর্কে উৎসাহী কিন্তু অত্যুৎসাহী নন। এ-ব্যাপারে বাসু সংযত, শান্ত। মাটির দিকে চোখ রেখে বাসু বললেন ঃ 'আমার কপালটা ভোগাচ্ছে বড়ো বছর বয়সে মা মারা [illegible] খেলা। যা মা নেই তার [illegible]

বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলাধুলা

দর্শক

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ইংল্যাণ্ড

সদ্য সমাপ্ত ১৯৭৬ সালের টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৩—০ খেলায় (ড্র ২) ইংল্যাণ্ডকে হারিয়ে 'উইসডেন' ট্রফি জয়ী হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার কাছে ১৯৭৫-৭৬ সালের টেস্ট সিরিজে হেরে যাওয়াতে আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট মহলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রাধান্য যথেষ্ট খর্ব হয়েছিল। আজ ইংল্যাণ্ডকে হারিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তাদের হৃতগৌরব ফিরে পেল। ১৯৭৬ সালের ইংল্যাণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের প্রথম ও দ্বিতীয় খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। এরপর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পর পর তিনটে টেস্টে জয়ী হয়—৩য় টেস্টে ৪২৫ রানে, ৪র্থ টেস্টে ৫৫ রানে এবং ৫ম টেস্টে ২৩১ রানে। ইংল্যাণ্ড-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১৯৭৬ সালের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে এই ৬টি উল্লেখযোগ্য রেকর্ড হয়েছে :

(১) ওল্ড ট্রাফোর্ডের ৩য় টেস্টে ইংল্যাণ্ডের ১ম ইনিংসের ৭১ রান ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ইংল্যাণ্ডের এক ইনিংসের খেলায় সর্বনিম্ন রানের রেকর্ডে পরিণত হয়েছে।

(২) ওভালের ৫ম টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংসের ৬৮৭ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডে পরিণত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, যে-কোন দেশের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড হল ৭৯০ রান (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। বিপক্ষে পাকিস্তান, কিংস্টোন, ১৯৫৭-৫৮)।

(৩) ভিভিয়ান রিচার্ডসের ৮২৯ রান—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে যে-কোন দেশের বিপক্ষে একটি টেস্ট সিরিজে ব্যক্তিগত সর্বাধিক মোট রান করার রেকর্ডে পরিণত হয়েছে। রিচার্ডসের এই ৮২৯ রানের থেকে টেস্টের এক সিরিজে বেশী রান করেছেন মাত্র এই তিনজন খেলোয়াড় : অস্ট্রেলিয়ার ডন ব্র্যাডম্যান—৯৭৪ রান (৫টা টেস্টের ৭ ইনিংসে, বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, ১৯৩০), ইংল্যাণ্ডের ওয়ালী হ্যামণ্ড—৯০৫ রান (৫টা টেস্টের ৯ ইনিংসে, বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ১৯২৮-২৯) এবং অস্ট্রেলিয়ার নীল হার্ভে—৮৩৪ রান (৫টা টেস্টের ৯ ইনিংসে, বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, ১৯৫২-৫৩)। এতদিন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে টেস্টের এক সিরিজে সর্বাধিক ব্যক্তিগত মোট রানের রেকর্ড ছিল সি এল ওয়ালকটের—৮২৭ রান (৫টা টেস্টের ১০ ইনিংস, বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ১৯৫৪-৫৫)। এখানে উল্লেখ্য, একটা টেস্ট সিরিজে ৪টে টেস্ট ম্যাচ খেলে ৭০০ রান করেছেন এ পর্যন্ত এই তিনজন খেলোয়াড় : ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জর্জ হেডলে —৭০৩ রান (৪টে টেস্টের ৮ ইনিংস, বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, ১৯২৯—৩০), ভারতের সুনীল গাভাস্কার—৭৭৪ রান (৪টে টেস্টের ৮ ইনিংস, নট আউট ২ বার, বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ১৯৭১) এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ভিভিয়ান রিচার্ডস —৮২৯ রান (৪টে টেস্টের ৭ ইনিংস নট আউট ০ বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, ১৯৭৬)। একটা টেস্ট সিরিজে ৪টে টেস্ট ম্যাচ খেলে সর্বাধিক মোট রান করার বিশ্ব রেকর্ড আজ ভিভিয়ান রিচার্ডসের।

(৪) ওভালের ৫ম টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংসে ভিভিয়ান রিচার্ডসের ২৯১ রান ওভালে অনুষ্ঠিত টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে যে-কোন দেশের পক্ষে এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া রিচার্ডসের এই ২৯১ রান ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের রেকর্ডেও পরিণত হয়েছে। এ বিষয়ে পূর্ব রেকর্ড ছিল স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেলের ২৬১ রান (নটিংহাম, ১৯৫০)।

(৫) ওভালের ৫ম টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ২২ বছর বয়সের ফাস্ট বোলার মাইকেল হোল্ডিং ১৩৯ রানে ১৪টি উইকেট নেওয়ার সূত্রে যে কোন দেশের বিপক্ষে একটি টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার রেকর্ড করেন। এ বিষয়ে পূর্বের রেকর্ড ছিল অ্যাণ্ডি রবার্টসের ১২৯ রানে ১২টি উইকেট (বিপক্ষে ভারত, মাদ্রাজ, ১৯৭৫)। ওভালের ৫ম টেস্টে মাইকেল হোল্ডিং প্রথম ইনিংসে ৯২ রানে ৮টি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৭ রানে ৬টি উইকেট পেয়েছিলেন।

(৬) ওভালের ৫ম টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংসের খেলায় ক্লাইভ লয়েডের ক্যাচ ধরার সূত্রে ইংল্যাণ্ডের উইকেট-কিপার অ্যালান নটের উইকেট পাওয়ার সংখ্যা দাঁড়ায় ২২০টি (ক্যাচ ও স্টাম্প)। অ্যালান নট এই ২২০টি উইকেট পেয়ে উইকেট-কিপার হিসাবে সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার বিশ্ব রেকর্ড করেন। এর আগে উইকেট কিপিংয়ে সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার বিশ্ব রেকর্ড ছিল ইংল্যাণ্ডেরই গডফ্রে ইভান্সের—মোট ২১৯টি উইকেট (ক্যাচ ১৭৩ ও স্টাম্পিং ৪৬)।

ব্যাটিং ও বোলিংয়ের গড়

ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় উভয় দলের পক্ষে শীর্ষস্থান লাভ করেছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ভিভিয়ান রিচার্ডস—খেলা ৪, ইনিংস ৭, নট আউট ০, মোট রান ৮২৯, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২৯১, সেঞ্চুরী ৩ এবং গড় ১১৮-৪২। অপর দিকে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় শীর্ষস্থান পান ডেনিস অ্যামিস—খেলা ১ ইনিংস ২ মোট রান ২১৯ এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২০৩ এবং গড় ১০৯-৫০। উভয় দলের পক্ষে টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক মোট রান করেছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ভিভিয়ান রিচার্ডস—মোট ৮২৯ রান। অপরদিকে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে সর্বাধিক মোট রান করেছেন স্টীল—মোট ৩০৮ রান। এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান করেছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ভিভিয়ান রিচার্ডস ২৯১ রান এবং ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ডেনিস অ্যামিস ২০৩ রান।

বোলিংয়ের গড় তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে মাইকেল হোল্ডিং—১৫৬ রানে ২৮ উইকেট (গড় ১২-৭১) এবং ইংল্যাণ্ডের পক্ষে উইলিস—২৩৪ রানে ৯ উইকেট (গড় ২৬-০০)। সিরিজে সর্বাধিক উইকেট পেয়েছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে মাইকেল হোল্ডিং—২৮ উইকেট (৩৫৬ রানে) এবং এ্যাণ্ডি রবার্টস —২৮ উইকেট (৫৩৭ রানে)। অপর দিকে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট পেয়েছেন আণ্ডারউড—১৭ উইকেট (৬৩১ রানে)। একটি খেলায় উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাইকেল হোল্ডিং —১৪টি উইকেট (৯২ রানে ৮ উইকেট ও ৬৭ রানে ৬ উইকেট)

বোম্মানা বিশ্বনাথনের

অতন্দ্র সীমান্ত ০-৫০

সার্কাসের বাঘ। অন্বেষণ

২-০০

দৃশ্যের দর্পণে। ট্যাক্সমন্ত্রী

(২য় সং। ২-০০

প্রতিটি একাঙ্ক স্ত্রী বর্জিত, ১টি স্টেজে অভিনয়যোগ্য মঞ্চসফল পুনরুক্তিপ্রাপ্ত নাটক

নবগ্রন্থ কুটির : ৫৪।৫-এ, কলেজ স্ট্রীট

সিনেমাটিক টক

কলকাতার কত কাছে সুন্দরবন; অথচ সুন্দরবনকে পটভূমি করে আজ পর্যন্ত একটা ভাল ছবি এখানে তৈরী হল না—এটা আফশোষের কথা। যা দু-একখানা হয়েছে—তাতে আর যাই হোক—সুন্দরবন কখনো তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয়নি। এই সেদিন পর্যন্ত এসব কথা আলোচনা হচ্ছিল স্টুডিওতে। বিদেশের ফিল্ম ইউনিট এসে সুন্দরবনের ব্যাকগ্রাউণ্ড একটা ছবি না করা পর্যন্ত আমাদের চৈতন্য হবে বলে মনে হয় না।

বাঘে-মানুষে, বাঘে কুমীরে লড়াই করে আমাদের এত কাছের সুন্দরবন এখনও আছে। বিশ্ববিখ্যাত শিকারী জিম করবেট তাঁর আয়ুষ্কালে বেশী ঘুরেছেন গাড়োয়ালের জঙ্গলে, গির ফরেস্টে। তাঁর শিকার-কাহিনী বিশ্ব পাঠকের কাছে অবিস্মরণীয় আছে। কুমায়ুনের ম্যান-ইটার হয়ত কিন্তু সে কাহিনী আজও আমাদের স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে। জানি না বোম্বের কোন অসমসাহসী প্রযোজক-পরিচালক জিম করবেটের গল্পে ছবি করবার পরিকল্পনা করবেন কিনা, কিন্তু ইদানিং আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে—কলকাতা থেকে যদি কোন উদ্যোগী তরুণ পরিচালক নদীভিত্তিক সুন্দরবনের গরান জঙ্গলের বাঘে-সাপে ঠাশা ভয়ঙ্কর সুন্দর পরিবেশে গিয়ে শুটিং করে একটা বিশ্বাসযোগ্য কাহিনীচিত্র তৈরী করেন, তাহলে তা অবিলম্বে জনপ্রিয় হবে।

আশীষ মুখোপাধ্যায় আমাদের দেশের একজন বিখ্যাত তথ্যচিত্র নির্মাতা। ভদ্রলোক ডকুমেন্টারী ফিচার ফিল্ম করেন না। কিন্তু ডকুমেন্টারী ফিল্ম তোলার ব্যাপারে এদেশে তাঁর উপর শক্তিমান নির্মাতা আছেন, আশীষ মুখোপাধ্যায় তাঁদেরই অন্যতম।

উত্তমকুমার / নীলিমা দাস

ভোলা ময়রা
অমৃত পত্রিকা

একদিন হঠাৎ ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে :

—কী ব্যাপার ও মশাই: এই যে আশীষবাবু...

দেখি একজন হৈ হৈ করে ডাকছে। আশীষবাবু ক্যান্টিনে ঢুকতে গিয়ে থমকে ঘুরে দাঁড়ালেন, মুখে বরাবরের সেই অমায়িক প্রসন্ন হাসি— আমায়?

—হ্যাঁ, আপনাকে...

—কী বলুন..

আসলে সেইমাত্র উনি সুন্দরবন থেকে ফিরেছেন। বাড়ি না গিয়ে এসেছেন ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে। নিশ্চয় কোন কাজ ছিল। শুনেছিলাম সুন্দরবনের বনের ওপর উনি যে ছবিটি করছেন, সেটা ইস্টম্যানকালারে তোলা হচ্ছে। কলকাতায় রঙীন ছবি প্রসেস করার ল্যাবরেটরী সেদিনও ছিল না, কেয়াবাৎ, আজও নেই, থাকার মধ্যে ঘন ঘন শুধু আফশোষটাই আছে। সোজা আসছেন জঙ্গল থেকে জীপে চড়ে, পোশাকে বাঁধা সুন্দরবনের গন্ধ তখনও উপে যায় নি।

—হ্যাঁ বলুন—

—শুনলাম ওখানে বাঘের পাল্লায় পড়েছিলেন?

লহমায় প্রসন্ন দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল ওঁর—কে বললে?

প্রশ্নকর্তা ফিক্‌ফিক্‌ হেসে—সেকি আর চাপা থাকে মশাই, আপনার ইউনিটের ক্যামেরা কেয়ার-টেকারের মুখেই শুনলাম গল্পোটা—

আশীষ মুখার্জির ভ্রূ-কুঞ্চিত হল—তাহলে আর আমাকে কেন...

অর্থাৎ ওর কাছেই শুনুন।

অরুণাচল / পরিচালনা ঃ অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। অমৃত ফটো

আর আমি? এসব ক্ষেত্রে যা হয়—বাঘের গন্ধ পেয়ে তৎক্ষণাৎ সেঁটে গেলাম ওঁর সঙ্গে। মূল প্রশ্নকর্তাকে কাটাতে আমায় বেশ কিছুক্ষণ মেহনত করতে হল—সহজে যেতে কি চায়—গাটের পয়সায় চা-টোস্ট খাইয়ে ভুজুং দিয়ে তাকে ইস্ট-বেঙ্গলের গোলে ঢুকিয়ে দিয়ে উঃ, এবার আশীষবাবু, বলুন তো আমায় আসল ব্যাপারটা; অশীষবাবুর তখনও স্মিত প্রসন্ন হাসি—পরে পরে—

ও হরি, আমাকেও কাটানোর ধান্দা? কিন্তু একবার যখন বাঘের গন্ধ পেয়েছি আমার নট নড়ন-চড়ন। আশীষবাবু আমায় একটা লম্বা সিগারেট দিয়ে পাশ কাটাবার উপক্রম করতেই—ও মশাই বাঘটা— আশীষ-বাবুর সেই সুপরিচিত হাসি—পরে একদিন বলব। দেখছেন তো এই মাত্তর ফিরলাম লোকেশান থেকে...

এ-ছবির ক্যামেরাম্যান কানাই দে'র সহ-যোগী দীপক দাস ছিল ঘটনাস্থলে। দীপক রোমাঞ্চকর গল্প ভাল গুছিয়ে বলতে পারে। ও আমার হাত ধরে টেনে বলল—এস তোমাকে বলছি, আগে কফির অর্ডার দাও—

আশীষ মুখার্জি তখুনি সহাস্যে দীপককে আমার হাতে সঁপে দিয়ে নিজের কাজ সারতে চলে গেলেন। আর দীপক তাড়াতাড়ি ভয়ংকর গম্ভীর হয়ে আমায় একখানা—

আশীষ মুখার্জি সারা সুন্দরবন চষে ফেলেছিলেন শুটিং করতে গিয়ে। দশ-বার দিন ওঁরা জঙ্গলে-নদীতে কাটিয়েছেন, তবে ভাগ্যায় নয়, একটি লঙ্চে। দিনের আলোয় ভাগ্যায় ভেড়াতেন সুশস্ত্র গাইড নিয়ে, প্রয়োজনমত শুটিং করেছেন, তারপরই ফিরেছেন লঙ্চে। ডাঙ্গায় বেশীক্ষণ ঘোরা-ঘুরি করা নাকি নিরাপদ নয়। ওই করতে গিয়ে বছরে বেশ কিছু লোক বাঘের পেটে যায়। সাপের ছোবলে মারা পড়ে।

একদিন এক নির্জন দ্বীপে নেমেছেন ছবি তোলবার জন্যে।

গাইড নামবার আগে বলল—দাঁড়ান, আমি আগে নেমে এটু তত্ত্ব-তালাশ করে আসি, তারপর নামবেন।

বলে সে বন্দুক কাঁধে নেমে গেল কাদা ভেঙ্গে।

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ওই নির্জন দ্বীপকে বনের পশুদের মিঠে জল সর-বরাহের কেন্দ্র বানিয়েছেন। দ্বীপের মধ্যে একটা পুকুরকাটা হয়েছে। সেখানে সারা বছরের বর্ষার জল ধরা থাকে। আর তৈরী করা হয়েছে নুনের ঢিপি। পশুরা খুশীমত সেখানে আসে। জল খায়। নুনের ঢিপি চেটে শরীরের প্রয়োজনীয় নুন সংগ্রহ করে।

গাইড কিছুক্ষণ পর ইউনিটকে ডাঙ্গায় নামার সিগন্যাল দিল।

তখন আশীষ মুখার্জির নেতৃত্বে ক্যামেরাম্যান কানাই দে, সহযোগী দীপক দাস, ক্যামেরা কেয়ার-টেকার কানাই দাস লঞ্চ থেকে দ্বীপে নেমে এল। প্রত্যেকের পায়ে রবারের তৈরী গামবুট।

একটা সুন্দর জায়গা দেখে আশীষবাবু ক্যামেরা বসাতে নির্দেশ দিলেন। বসান হল ক্যামেরা। শুরু হল চিত্রগ্রহণ। অদূরে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে গাইড চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে ওঁদের পাহারা দিতে লাগল।

দ্বীপের নরম মাটিতে সকলের গামবুট সমেত পা কাদায় ডুবে যাচ্ছিল। একটা শট নেবার পর আশীষ মুখার্জি পজিশন চেঞ্জ করতে চাইলেন ক্যামেরার। কানাই দে সেই-মত কেয়ার-টেকারকে বললেন—তোল ক্যামেরা—

কানাই দাস ক্যামেরা তুলবে বলে যাঁহাতক ডান-পা তুলেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিকট আর্তনাদ করে সে লাফিয়ে সরে দাঁড়াল। ওর চীৎকারে সবাই চমকে ফিরে দেখে যেখানে কানাইয়ের ডান-পা ছিল—সেখানে বিরাট এক সাপ দ্রুত মাথা তুলছে। কাদায় মাখামাখি তার বিশাল ফণা। ক্রুদ্ধ গর্জন করছে ফোঁস ফোঁস শব্দে।

এক লহমায় সবার যেন সম্বিত ফিরল।

কার যেন হাতে ছিল একটা লম্বা ধারাল হেঁসো—সূর্যের আলোয় সে হেঁসো সাঁ করে বিদ্যুতের ঝিলিক হানল একবার। তারপরই দেখা গেল সেই বিরাট সাপ দু টুকরো হয়ে লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে —কিন্তু ফণার অংশ তখনও মাটি থেকে তিন ফুট ওপরে জেগে আছে—ঝট করে মাটির বুকে ছোবল হেনে আবার জেগে উঠছে।

ততক্ষণে গাইডের হাতের বন্দুক গর্জন করে উঠেছে। আর তৎক্ষণাৎ সেই উদ্যত ছোবল গুলির আঘাতে ধুলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে। লেজের দিকের অংশ তখনও লম্বা লম্বা বৃত্ত কেটে চলেছে। মনে হল ওই বৃত্তের মধ্যে কেউ গিয়ে পড়লে তার হাড়গোড় নিমেষে চুর-চুর হয়ে যাবে।

কিছুক্ষণ কারো মুখে কথা জোগাল না।

কানাই দাস তখনও থরথর কাঁপ নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে সে ফি এসেছে। অন্যরা তখন কুলকুল করে ঘামছে আতঙ্কে-উত্তেজনায়।

প্রথম কথা বলল গাইড—ওনার পায়ের তলায় ছিল সাপটা—উফ্!

গামবুট পরা অবস্থায় নিজের অজান্তে সাপের মুখের ওপর পা রেখে দাঁড়িয়েছিল কানাই দাস—চলচ্চিত্র শিল্পের একজন বিশ্বস্ত কর্মী। কোথায় টালীগঞ্জের ফ্লোরে নকল ছাদখোলা বাড়ির মধ্যে সাদা-কালো শিল্পীদের নিয়ে শুটিং করায় অভ্যস্ত যে-সে আজ এই ভয়ংকর সাপের মাথায় পা রেখে দাঁড়িয়ে এবং সুন্দরবনের মত ভয়ংকর জঙ্গলের পরিবেশে। কানাইয়ের স্টামিনা শক্ত, অন্য কেউ হলে হয়ত তখুনি হার্টফেল করত।

গামবুট থাকায় পায়ের তলায় দুর্দান্ত এক মৃত্যুদূত সামান্যক

দীপেন গুপ্ত পরিচালিত ছবি 'ফুল অপর্ণা সেন। অমৃত ফটো

পড়েছে, কানাই অনুভবও করতে পারে নি। একবার অবশ্য তার মনে হয়েছিল—গাম-বুট সমেত পা যেন উপরে ঠেলে উঠতে চাইছে, তখনি সে আরও জোর চাপ সৃষ্টি করে পা মাটিতে ঠেলে রেখেছিল। ভাগ্যিস রেখেছিল, নইলে সে প্রাণ নিয়ে আর কোন দিন টালীগঞ্জে ফিরতে পারত না।

দীপক বলল—আমি স্প্লিট অফ এ সেকেণ্ডে দেখলাম কানাই পা সরাল আর সাঁ করে সেখানে জেগে উঠল বিরাট এক ফণা। তার সঙ্গে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ। পিলে যেন চমকে গেল আমার।

আশীষ মুখার্জি এমনিতে ধীর-স্থির মানুষ, কিন্তু এই ঘটনায় তিনিও বেশ বিচলিত হয়ে পড়লেন—প্যাক আপ প্যাক আপ, কানাই ক্যামেরা গুটিয়ে ফেল, আমার আর শটে কাজ নেই, সবাই লঞ্চে ফিরে চল—

হুড়মুড় করে সবাই লঞ্চে ফিরে এল।

সব শুনে সারেঙ্গ মৃদু হাসল—মুখার্জিসাহেব, এতেই ভয় পেলেন? আর আমাদের তিনশো পয়ষট্টি দিন এই নদীতে জঙ্গলেই কাটাতে হয়। মৃত্যুর পরোয়ানা সঙ্গে নিয়ে ঘুরি আমরা...

প্রৌঢ় লঞ্চ সারেঙ্গ তার সুন্দরবনের জীবনে বহু ভয়ঙ্কর ঘটনার সাক্ষী। নিজেও কয়েকবার সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে। এখন আর সেই গা ছমছম ভাবটা নেই। জঙ্গলের নিয়মকে সে স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছে।—তা না, হলে এখানে একরাতও কাটান যেত না মুখার্জিসাহেব। মাঝনদীতে অ্যাঙ্কর করে লঞ্চে শুয়ে আছি, গভীর রাতে হৈ চৈ শুনে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে, সেই ঘুমচোখে দেখি কি আমারই এক ক্লিনারকে মুখে নিয়ে একটা বাঘ নদীর জল সাঁতরে ডাঙ্গায় উঠে অন্ধকার জঙ্গলে অদৃশ্য হচ্ছে। কিছু করা গেল না। শেষ রাতটা ছটফট করে কাটল। পরদিন সকালে সাঁতিয়ার আর লোকজন সঙ্গে নিয়ে ডাঙ্গায় নেমে খোঁজাখুঁজি করে শেষে—নাঃ, আর শুনবেন না—ভয়ানক সে দৃশ্য... সহ্য করা শক্ত...অথচ রাতে যখন ঘুমোতে যাচ্ছি তখন ওকে পই পই মানা করেছিলাম বন্দার বাইরের ডেকে শুবি না, কেবিনে থাকবি। থাকল না। ঈশ্বর নিদান হাঁকিলেন। বেচারা বাঘের মুখে চলে গেল...

জলে কুমীর আর ডাঙ্গায় বাঘ—এই সেই বিচিত্র সুন্দরবন। এখানকার মানুষ প্রতিদিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষে বেঁচে থাকে—সে জীবন কত অসম সাহসে ভরা সাচ্চা জীবন হতে পারে একবার কল্পনা করুন।

দীপক বলল—গল্পের শেষ কিন্তু এখানেই নয়, রায়মঙ্গল নদীতে। দিনের বেলায় আমরা ডাঙ্গায় নেমে পটু পটু করে কিছু শট নিয়ে তৎক্ষণাৎ লঞ্চে উঠে পড়ি—রাতে নৈব নৈব চ। অন্ধকার ডেকে বসে শুনতে পাই মানুষের গন্ধ পাওয়া ক্ষুধার্ত বাঘের ক্রুদ্ধ গর্জন। গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। শুধুই বাঘ, আরও কত অজানা জন্তু-জানোয়ার ডেকে যায়—আয় আয়... আমাদের কাছে আয়...

তারই মধ্যে পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের ঢালাও আসর বসাই। দিগন্ত বিস্তৃত নদীর বুকে সেই গান প্রতিধ্বনিত হয়ে হয়ে ফিরতে থাকে আমাদেরই কানে। নদীর দুই তীরের হিংস্র জন্তু-জানোয়াররা হয়ত অবাক হয়। ভাবে—এ কারা ওখানে?

আশীষ মুখার্জি হচ্ছেন টিল সীডার। গভীর রাত্রির পর্যন্ত জেগে তিনি তাঁর চলচ্চিত্র জীবনের অভিজ্ঞতার গল্প শোনান কোন দিন। আবার কোন দিন সেই প্রৌঢ় লঞ্চ সারেঙ্গ শোনায় তার জলে জঙ্গলের আশ্চর্য অভিজ্ঞতার সব রোমাঞ্চকর কাহিনী। তারপর সবাই শুতে যায়। জঙ্গল থেকে ভেসে আসা ক্রুদ্ধ জানোয়ারদের হাঁকাহাঁকি শুনতে শুনতে এক সময় সবাই ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে। জেগে থাকে মাত্র একজন। সে হচ্ছে সশস্ত্র নাইট গার্ড। বন্দুকের ট্রিগারে আঙ্গুল ছুঁয়ে সে সারা রাত জেগে থেকে কানখাড়া করে জঙ্গলের হিংস্র সংলাপ শুনে যায়—একের পর এক।

কাট-টু-কাট এল সেই দিনটি।

লঞ্চ নদীর উত্তাল তরঙ্গ কেটে রায়-মঙ্গল নদীর মাঝখান দিয়ে পুবের দিকে এগিয়ে চলেছে সশব্দে। মাকড়শার জালের মত নদীনালা ছেয়ে আছে সুন্দরবনের হৃদয়ে। রায়মঙ্গল তারই একটা নদী।

(চলবে)

রীণেন মজুমদার

সুপ্রিয়া দেবী ও উত্তমকুমারের সঙ্গে অসীমা ভট্টাচার্য

কয়েকজন

অসীমা ভট্টাচার্য

আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষ শেষ হয়েছে পাঁচাত্তরের ডিসেম্বরে। ঘটা করে অনুষ্ঠানাদিও কম হয়নি তখন। সমাজের প্রতিটি স্তরে নারীর অবাধ স্বচ্ছন্দ গতি সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনের অনুপন্থী এ সত্যটা মোটামুটি কাগজে কলমে মেনে নিয়েছিও আমরা সবাই। পর্দানসীন-যুগ এখন ইতিহাসের পাতায়।

তবুও এই সমাজে মহিলাদের সর্বত্র সব সময় আমরা যেন দেখতে অভ্যস্ত নই। চোখে কটু না মনে হলেও দৃষ্টি বাধা পায় যেন। তাই সেই ১৯৪৭ সালে প্রতিভা শাসমলের যখন প্রথম পরিচালনার কাজ হাত দিলেন তখনও কম কথা সহ্য করতে হয়নি তাঁকে! ক্যামেরার সামনে অভিনয় পর্যন্তই যেন মহিলাদের এক্তিয়ার, পেছনে বসে নায়ক বা পুরুষশিল্পীকে নির্দেশ দেবার দুঃসাহস যেন তাদের নেই।

বেশ কয়েক বছর আগে মঞ্জু দে আবার ফিরিয়ে এনেছিলেন প্রতিভা শাসমলের সেই দুঃসাহসকে। পরপর দু-তিনটি ছবির পরিচালনা করেছিলেন।

কিন্তু ছবির প্রযোজনা? সেখানে মহিলার গতায়াত কই? হাতে গুণে কজনের নাম বড়জোর করা যায়? কানন দেবী, সুনন্দা ব্যানার্জী, মঞ্জু পার, অসীমা ভট্টাচার্য, দুলালী চৌধুরী—বাস! এঁদের মধ্যে একমাত্র অসীমা ভট্টাচার্য এখনও 'গোয়িং স্ট্রং'। শুধু প্রযোজনা নয়, পরিবেশনায়ও তাঁর কর্মব্যস্ত হাত প্রসারিত। মজার ব্যাপারটা হোল ছবির জগতে কোনো ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ছাড়াই একদিন প্রায় অতর্কিতে পা রেখেছিলেন টালিগঞ্জর স্টুডিওতে। ঘটনাটা এই রকম ঃ—

অসীমা ভট্টাচার্য তখন রেডিওতে গান গাইতেন। প্রায় নিয়মিতই বলা যায়। সঙ্গীত পরিচালক-গায়ক শৈলেন মুখার্জির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। তিনিই একদিন ওঁর স্বামী দিলীপ ভট্টাচার্যের কাছে প্রস্তাব দিলেন ছবি করুন না, ভালো ব্যবসা।'

দিলীপবাবুর আলাদা ব্যবসা ছিল। তিনি বলেন, 'বাস্তু ভয়ানক, ছবির ঝামেলা তো কম নয়। সামলাবে কে?'

কিন্তু শৈলেনবাবু নাছোড়বান্দা হয়ে দিলীপ ভট্টাচার্যকে নামালেন প্রোডাকশনে। পার্থপ্রতীম চৌধুরীর পরিচালনায় 'দোলনা' ছবির কাজ শুরু হোল। বিজনেস-এর কাজে ভীষণ ব্যস্ত থাকায় স্বামীর কাজ কাঁধে তুলে নিলেন স্ত্রী। অসীমা ভট্টাচার্য হলেন প্রোডিউসার। জন্ম হোল পদ্মিনী ফিল্মসের।

অনভিজ্ঞতাজনিত অসুবিধে হতে লাগল পদে পদে। প্রোডাকশনের সহৃদয় দু-একজন এগিয়ে এলেন সাহায্য করতে। বললাম—'তাহলে খুব একটা অসুবিধে হয়নি, কি বলেন?' হাসতে হাসতে তিনি বললেন—অসুবিধে মানে—অভিজ্ঞতা না থাকার যে অসুবিধে তাছাড়া কিছু নয়। আর প্রত্যেক লাইনেই তো ভালো-মন্দ লোক থাকে, কেউ সুযোগ নেবার চেষ্টা করে, কেউবা হাত বাড়িয়ে দেয় সাহায্যের।'

আস্তে আস্তে লাইনের ফাঁক-ফোকড় মানে সিক্রেটগুলো তিনি বেশ পিক-আপ করে নিয়েছেন। এখন আর তেমন অসু হয় না।

'দোলনা' ছবির বিজনেস তেমন না। নিজের ডিস্ট্রিবিউশন ছিল তবু বললাম—'কেন এমন হোল তে কখনো?'

—ভাববো না কেন, নিশ্চয়ই ছবিতেই ত্রুটি ছিল। শহরের দর্শক ছবি ভালো লাগে নি।'

পরের ছবি 'চৌরঙ্গী' শংকরে উপন্যাসকে বেছে নেবার কারণ অসীমা ভট্টাচার্য বললেন—'নতুন বিষ ছবি করব ভেবেছিলাম। গল্প হি 'চৌরঙ্গী' তখন হট-ফেভারিট।'

এই ছবি তৈরীতেও কম গ হয়নি। স্ক্রিপ্ট বদল পরিচালক বদ পর 'চৌরঙ্গী যা দাঁড়াল তাতে খা ছিল না, তবে স্মুদ্দল ছবিখানা হলে আরও ভালো হতে পারতো। এ ছবি দেবীকে অ্যাজ এ প্রোডিউসার পয়সা খ্যাতিও কম দেয়নি। (যদিও বি এ'র বিচারে 'চৌরঙ্গী' সে বছর ছবির স্থান পেয়েছে। কিন্তু অসী চার্য তাতে বোধ হয় সন্তুষ্ট নন। 'চৌরঙ্গী'র স্থান আরও ওপর উচিত।)

চার বছরের বিরতি আবার। 'প্রতিদান'—দুখানা ছবির ডি নিয়ে একটু সেটব্যাক হয়েছে কার ছবিই তেমন চলেনি। না শহরে, সম্ভবতঃ এই কারণেই বিরতি।

বাহাত্তর সালে ফিরলেন ছবি নিয়ে। হিট ছবি। এ-ছবি অপর্ণা সেন সেরা অভিনেত্রীর পেলেন। বিভিন্ন সংস্থা থেকে। ফি সেরা বাংলা ছবির প্রযোজন হিসাবে করলো অসীমা ভট্টাচার্যকে। হোল তাঁর পরিশ্রম।

নতুন বিষয়বস্তু, নতুন ধর সব সময়ই আকর্ষণ করে অসীম ছবি করা তাঁর কাছে একদিকে তে তেমনি নতুন কিছু সৃষ্টির 'আন নয়।

তাই নতুন ছবি হিসাবে প্রফুল্ল রায়ের একটি 'গল্প

' সমাজের লোয়ার স্ট্রাটার লোকদের দুঃখের গল্প।

অল্প বাজেটের ছবি, তেমন স্টারও নেই টয়ে। আর এখানেই এলো সমস্যা। আর শেষ হয় না। যে একসিবিটররা কুমারের ছবি নেবার জন্য ক'দিন আগে খ ছিলেন, 'এক বিন্দু সুখ'এর রে তাঁরা নীরব থাকলেন। আর্থিক ধা পেলেন না তাঁদের কাছ থেকে। হয়ে দ্বারস্থ হতে হোল সরকারের । লোন পেলেন দীর্ঘ দিন বাদে। ছবি ততদিনে শেষের সুখে।

ই ফাঁকে আরেকখানা ছবি করেছেন মা ভট্টাচার্য—'বাঘবন্দী'। উত্তমকুমার চরিত্রে। সুতরাং এই ছবি তৈরী আর জ বেশী সময় লাগল না। 'এক বিন্দু এর বছরখানেক পরে 'বাঘবন্দী' শুরু প'ণ্ডরেই রিলিজ হয়ে গেল। সম্ভবতঃ ত্র উত্তমকুমারের উপস্থিতির জন্যই ট হোল।

াংলা ছবির জগতে এই ঘটনাই চলছে। কাস্টিং-এর ছবি নিয়ে অসুবিধে হচ্ছে না। এদিক-ওদিক থেকে উসার টাকা যোগাড় করছেন, রিলিজের রও তেমন হাঙ্গামা নেই। বিপাকে ন ছোট ছবির প্রযোজক। যাঁদের বড় বড় স্টার নেই।

ক বিন্দু সুখ' নিয়ে এই ঝামেলার পর তিনি আবার অল্প বাজেটের ছবি করবেন কিনা জিজ্ঞেস করায় অসীমা দেবী বললেন—'না করবো কেন? ভালো গল্প যদি পাই, নিশ্চয়ই করবো। উত্তমকুমারকে সব ছবিতে সব চরিত্রে লাগানো যাবে না।'

সম্প্রতি একাধিক গল্পও শুনেছেন। ডিসাইড করতে পারেন নি কি করবেন!

ছবি করার ফাঁকে গানের রেওয়াজে ভাটা পড়েনি তাঁর। রেডিওতে শুধু নয়, মিউজিক ডিরেকশনেও এসে গেছেন। 'চৌরঙ্গী' 'মেমসাহেব' ছবির মিউজিক অসীমা দেবীর ক্রেডিটে। এখনতো রেডিওর মিউজিক বিভাগের প্রযোজকও তিনি।

তাই বললাম—'বিইং এ মিউজিকম্যান, মিউজিক্যাল ছবি করছেন না কেন?'

—হাঁ হাঁ সে রকম প্ল্যান আমার আছেও, কিন্তু মিউজিক্যাল ছবি করতে গেলেও ভালো প্লট তো চাই—সেটারই বড় অভাব।

তিনি আরও বললেন—'ভালো গল্পের অভাবেই বাংলা ছবি এমনভাবে মার খাচ্ছে। দর্শকের রুচি বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে কাহিনী ও ট্রিটমেন্টের মানে গল্প বলার ভঙ্গির তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি।'

সুতরাং আপাততঃ অসীমা দেবীর কাছে গল্প সিলেকশনটাই প্রবেম।

ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির আর যে সমস্যাটি বেশী হল্ট করে সেটি রিলিজ সমস্যা। বহু আশার অর্ডিন্যান্স কবে আসবে তাই নিয়ে তিনি চিন্তিত।

ঃ কেন?

উনি বললেন, 'সেন্সর ওয়াইজ রিলিজ হলে সুবিধে হবে অনেক। ইনিসিয়্যাল কিছু অসুবিধে নিশ্চয়ই, কিন্তু আলটিমেট লাভ আছে।'

ঃ সরকার যে হল তৈরীর প্ল্যান করেছেন, তাতে কোনো অসুবিধে হবে না?

—নিশ্চয়ই হবে। এখুনি হল হওয়া দরকার। হলের অভাবে ছবি রিলিজ হচ্ছে না। ইণ্ডাস্ট্রির ভালোমন্দ নিয়ে চিন্তা কম নয় তাঁর।

মহিলা হলেও ছবির জগতের একজন হিসাবে অসীমা দেবী সব সময়ই চিন্তা করেন ছবি নিয়ে, ছবির সমস্যা নিয়ে, ছবি করার সুবিধা অসুবিধে নিয়ে। এবং ছবিও করে চলেছেন নিয়মিত। সেই সঙ্গে গানের চর্চাও বন্ধ নেই।

ভ্রম সংশোধন ঃ বিভূতি লাহার সাক্ষাৎকার রাজাগোপালাচারী ভারতের গভর্ণর জেনারেল পড়তে হবে এবং নিরাপদ সরকারের পিতা ধীরেন্দ্রনাথ সরকার স্যর নন।

নিরীক্ষক

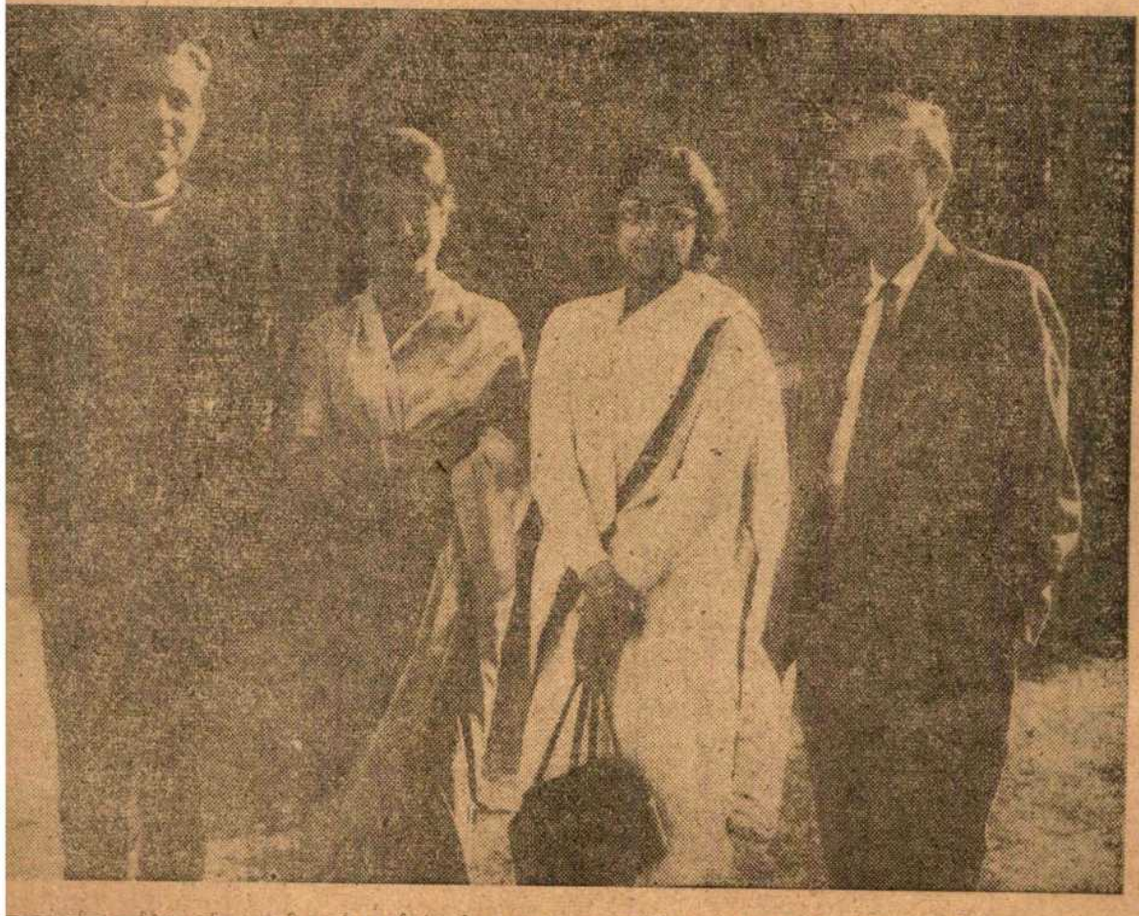

সাহেব ছবির স্যুটিংয়ে পরিচালক পিনাকী মুখার্জি, নায়িকা অপর্ণা সেন, অসীমা ভট্টাচার্য এবং লেখক নিমাই ভট্টাচার্য

ষ্টুডিও সংবাদ

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর তিন নম্বর ফ্লোরে ঢুকেই দেখি ক্যামেরাম্যান বিভূতি চক্রবর্তী দেবী দুর্গার আশীর্বাদ দেবার ভঙ্গীটি সযত্নে চিত্রায়িত করছেন। স্বর্ণালঙ্কার-খচিত দেবী ডান হাতটি তুলে রেখেছেন। পরিচালক প্রভাতবাবু (চক্রবর্তী) হাতের পজিশন দেখছেন আর দুর্গা ওরফে সীমা দাসকে বলছেন বরাভয় হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে দিতে।

দেবী দুর্গা স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন ধনপতির স্ত্রী সীতাদেবীকে। সাত সাতটি কন্যার জননী সীতাদেবী (গীতা দে) তবুও তার বুকটা ফাঁকা একটি পুত্র সন্তানের জন্য। স্বপ্নে আশীর্বাদ দিলেন এবার তাঁর পুত্র সন্তান হবে। নাম জয়দেব।

সেই সন্তানের সঙ্গে বিয়ে হবে লক্ষ-পতির একমাত্র কন্যা জয়াবতীর। দেবী দুর্গা অবশ্য সীতাদেবীকে এই অমূল্য খবরটি দিচ্ছেন। নিজের মাহাত্ম্য মর্ত্যে প্রচারের জন্য। দেবী দুর্গা রূপে নয়, মা মঙ্গলচন্ডীরূপে তিনি মর্ত্যবাসীর পুজো পেতে আগ্রহী। তাই তাঁর এই পরিকল্পনা।

কিন্তু অত সহজে মর্ত্যবাসীর কাছে নিজের প্রচার সম্ভব নয়, তাই তিনি নানা বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি করে লোককে নিজের প্রতি আগ্রহী করতে চান। জয়দেব আর জয়াবতী তাঁর অস্ত্র।

মঙ্গলকাব্যের নানা ঘটনা আমাদের অজানা নেই। দেবতারা নিজ মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য বিভিন্ন সময়ে এইরকম পন্থা অবলম্বন করে থাকেন। এখনও জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবার এখনও বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা মঙ্গলচন্ডীর উপোস করে থাকেন।

বিভূতি চক্রবর্তীর ক্যামেরায় দেবী দুর্গার ঐ বরাভয় মূর্তি দেখে সিনেমার ফ্লাশব্যাকের মত পরপর ঘটনাগুলো চোখের সামনে ভেসে এলো। পরিচালক প্রভাতবাবু দৃশ্যটি টেক করে বললেন—দেবী দুর্গার হাতের মধ্য দিয়ে যে আলো বেরোবে সেজন্য কয়েক ফুট ফিল্ম আলাদা করে রেখেছি। বম্বেতে গিয়ে স্পেশাল এফেক্টে ঐ কাজটা করবো।

—হঠাৎ এই ধরনের পৌরাণিক ছবি করতে আরম্ভ করলেন কেন? (ইতিপূর্বে তিনি মা লক্ষ্মী নামে আরকখানি ছবি করেছেন।)

: আমাদের দেশে এখন ধর্মমূলক ছবির বাজার ভালো। বিশেষ করে গ্রামে। মেইনলি বাণিজ্যিক কারণেই এই ছবি করা। তাছাড়া আজকাল গল্প বাছা নিয়েও প্রব্লেম।

বাবুমশাই / সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

—জয় সন্তোষী মা-র সাকসেসই কি আপনার অনুপ্রেরণা?

: হ্যাঁ—অনেকটা তাই। উপরন্তু বাংলা ছবিতে এমন গল্প নিয়ে ছবিতো খুব কমই হয়।

প্রবীণ প্রভাত চক্রবর্তী **জয় মা মঙ্গল-চন্ডীর** কাজ অনেকটাই করলেন সম্প্রতি ইন্দ্রপুরীতে। পৌরাণিক যুগের সুন্দর সেট পড়েছিল সেদিন ফ্লোরে। সীতা দেবীর সুসজ্জিত ঘরখানির কারুকাজ দারুণ লাগছিল। প্রামাণ্য এই সেট তৈরীর কৃতিত্ব শিল্পনির্দেশক অমিতাভ বর্ধনের।

কিছুদিন আগে সন্তোষ মুখো-পাধ্যায়ের সুরে দুখানি গানও রেকর্ড করা হয়েছে। গেয়েছেন অনিতা মজুমদার ও পিন্টু দাশগুপ্ত। ছবিখানি সম্পাদনার দায়িত্ব আছেন অনিল সরকার।

সেদিন সেটে যেসব শিল্পী ছিলেন তাঁরা হলেন গীতা দে তরুণকুমার শ্যামল রায়চৌধুরী সীমা দাস পদ্মাদেবী। প্রধান দুটি চরিত্র জয়দেব ও জয়াবতীর জন্য নতুন মুখের খোঁজ চলছে। আরও জানা গেল ঐ দুই শিল্পী নির্বাচন হলে রাজস্থানের লোকেশনে দৃশ্যগ্রহণের জন্য ইউনিট চেষ্টা করবেন। ছবির প্রযোজক—ইউনাইটেড নিসিয়ান প্রোডাকসন।

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে 'নিধিরাম সদ ছবির চিত্রগ্রহণ শেষ হয়ে গেছে। টানা বেশ কয়েকদিন শুটিং করে ছ সমাপ্তী ঘোষণা করলেন অভি পরিচালক রবি ঘোষ। এই ছবির প্র চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন উত্তমকুমার। অ বিশিষ্ট চরিত্রে রূপারোপ করছেন অ সেন, নন্দিতা বসু, উৎপল দত্ত, চিন্ময় শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দোপা হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতেশ ব পাধ্যায়, সুব্রত সেনশর্মা, সুশীল মজু (প্রবীণ পরিচালক), সমরেশ বানার্জি, ব্যানার্জি (সত্যজিৎ রায়ের ছবির শি শ্যামল সেন এবং পরিচালক স্বয়ং।

ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা, সম্প চিত্রগ্রহণ ও শিল্প-নির্দেশনা ক যথাক্রমে আনন্দশঙ্কর, রমেশ সোমেন্দু রায় এবং প্রসাদ মিত্র। 'নি সর্দার' কাহিনী ও চিত্রনাট্য লি অশোক ঘোষাল।

মতি নন্দীর বিখ্যাত লেখা স্ট্রী অবশেষে চলচ্চিত্রে রূপ পেতে চ 'মেঘদূত' রচিত চিত্রনাট্যে ছবিটি

। করছেন অর্চন চক্রবর্তী। প্রধান
কায় অভিনয় করছেন সমিত ভঞ্জ,
মুখার্জি, চিন্ময় রায়, অনিল
াধ্যায়, দিলীপ বসু ও সৌমিত্র
াধ্যায়। খেলার মাঠ ও খেলোয়াড়দের
এই কাহিনী। এঁরা এই খেলার
মে ছবির প্রভূত আউটডোর শুটিং
বন বলে আমাদের জানিয়েছেন। চিত্র-
করবেন দীপক দাস। সংগীত পরি-
া করবেন নবাগত প্রবীর মুখার্জি।

তপন সিংহ'র সহকারী পলাশ বন্দ্যো-
য় তারাশংকরের লেখা কাহিনী 'প্রতিমা'
একটি নতুন ছবির কাজ আরম্ভ
ন বলে জানিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ
রের অর্থানুকূল্যে চিত্রটি পলাশ
াধ্যায় প্রোডাকশনের ব্যানারে
িত হবে। ইনি প্রথমে ছবির গান
ডিং করছেন—সংগীত পরিচালনা
ছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন
অভিনয় করছেন সৌমিত্র চ্যাটার্জি,
মুখার্জি, ছায়া দেবী, সত্য বন্দ্যো-
য়, রবি ঘোষ, অনুপকুমার, চিন্ময় রায়,
ী দেবী, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

'প্রণয়পাশা' নামে সম্প্রতি একটি নতুন
র কাজ আরম্ভ করেছেন পরিচালক
ল চক্রবর্তী। ছবির প্রধান দুটি চরিত্রে
নয় করছেন সুচিত্রা সেন ও সৌমিত্র
র্জি। এছাড়া রয়েছেন যাদবজগতের
ন চ্যাটার্জি ও দিলীপ চ্যাটার্জি।
বার দুইজন এই ছবি প্রযোজনা করছেন।

সংগীত পরিচালনা করছেন হেমন্ত মুখো-
পাধ্যায়। ছবির অপরাপর শিল্পী হচ্ছেন
ছায়া দেবী, সত্য ব্যানার্জি, তরুণকুমার,
কেয়া চক্রবর্তী, গীতা কর্মকার, নবাগতা
দীপা ব্যানার্জি।

কে, এল, কাপুর প্রযোজিত ও তপন
সিংহ পরিচালিত 'এক যে ছিল দেশ' ছবির
চিত্রগ্রহণ শেষ। শংকরের কাহিনী অবলম্বনে
ছবির চিত্রনাট্য তপন সিংহ নিজেই
লিখেছেন। এতে অভিনয় করেছেন সুমিত্রা
মুখোপাধ্যায়, দীপংকর দে, ছায়া দেবী,
অনিল চ্যাটার্জি, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়,
অনুপকুমার, সোনালী গুপ্ত, রবি ঘোষ,
ভানু ব্যানার্জি, জহর রায়, গীতা দে এবং
প্রেমনারায়ণ। সংগীত পরিচালনা ও চিত্র-
গ্রহণ করছেন যথাক্রমে তপন সিংহ এবং
বিমল মুখার্জি।

সমরেশ বসুর কাহিনীতে অশোক
প্রোডাকশনের ব্যানারে 'সূর্যকন্যা' নামে
একটি ছবির কাজ আরম্ভ করেছেন পরি-
চালক আশুতোষ ব্যানার্জি। উনি নিজেই
চিত্রনাট্য লিখেছেন। অভিনয় করছেন
আরতি ভট্টাচার্য, দীপংকর দে, দিলীপ
রায়, তরুণকুমার, সোমা মুখার্জি, নির্মল
ঘোষ এবং সুপ্রিয়া দেবী। এ ছবির সুরকার
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

পিকক ফিল্মসে ব্যানারে 'লালকুঠি'
রঙীন বাংলা ছবির শুটিং এখন বোম্বেতে
হচ্ছে বলে খবর পেলাম। এর আগে ছবির
বেশকিছু বহির্দৃশ্য গৃহীত হয়েছে

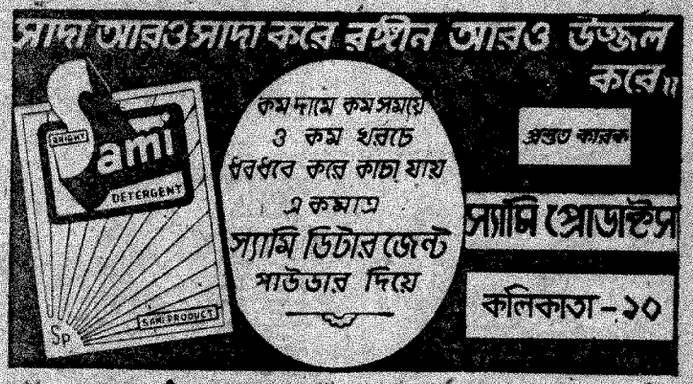

দার্জিলিং শহর লোকেশানে। ছবিটি পরিচালনা করছেন কণক মুখার্জি। অভিনয় করছেন রঞ্জিত মল্লিক, তনুজা, উৎপল দত্ত, তরুণকুমার, শম্ভু ভট্টাচার্য এবং ড্যানি। সংগীত পরিচালনা করছেন স্বপন-জগমোহন।

সম্প্রতি 'বনবাসর' সুশীল রায়ের কাহিনী নামে একটি নতুন ছবির শুটিং আরম্ভ করেছেন পরিচালক সুশীল মুখার্জি। এতে এখন অভিনয় করছেন দেখলাম সমিত ভঞ্জ, সত্য ব্যানার্জি, সন্তু মুখার্জি এবং মহুয়া রায়চৌধুরী। সংগীত পরিচালনা করছেন অধীর বাগচী।

দীনেন গুপ্ত সম্প্রতি 'সানাই' নামে একটি ছবির শুটিং সম্পূর্ণ করেছেন। এতে অভিনয় করেছেন সমিত ভঞ্জ, দীপঙ্কর দে, উৎপল দত্ত, অনুপকুমার, কাজল গুপ্ত, সোনালী গুপ্ত, ইন্দ্রজিৎ মুখার্জি ও নবাগতা লায়লা ও ঝুলন। সংগীত পরিচালনা করেছেন হেমন্ত মুখার্জি। দীনেন গুপ্ত এখন 'প্রকৃতি' ও রিমেক 'নন্দিনী' নামে দুটি ছবির কাজ শুরু করছেন। 'প্রকৃতি' গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কাহিনী আর 'নন্দিনী' শৈলজানন্দ মুখার্জির।

মুবারিক

ঘড়ি
ও
গ্যারান্টিসহ ঘড়ি মেরামত
রায় কাজিন এণ্ড কোং
জুয়েলার্স এণ্ড ওয়াচ মেকার্স
৪, বি, বি, ডি বাগ, কলি-১
ওমেগা ও টিসট ঘড়ির
অফিসিয়াল এজেন্টস্

টেলিভিশন মানেই
"টেলিকিং"
অর্থাৎ
টি ভির রাজা।
আজই আসুন, দেখুন শুনুন ও
কিনে খুসী হোন।
এ-ছাড়া আমাদের রয়েছে রঙ্গীন রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার, রেকর্ড ট্রান্সস্টার রেডিও, টেপ রেকর্ডার, স্টিরিওগ্রাম ইত্যাদি ইত্যাদি।
মেরামতের সুবন্দোবস্ত তো আছেই।
রেডিও এণ্ড ফটো স্টোরস্
৬৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিঃ-১৩
ফোন : ২৮-৪৭৯৩

স্ট্রাইকার ছবির একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে শমিত ভঞ্জ ও চুনী গোস্বামী। অতীত ও বর্তমানের বহু দিকপাল খেলোয়াড়কে ছবিতে দেখা যাবে।

নাটমঞ্চ

মহাত্মা শিশির কুমারের স্মৃতি বিজড়িত শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট তাদের ছাপ্পান্নতম বার্ষিক অধিবেশনের উদযাপন করলেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্ম শতবার্ষিকী পালনের মাধ্যমে।

এই উপলক্ষে তাঁরা গত ১৬ আগষ্ট স্টার রঙ্গমঞ্চে শরৎচন্দ্রের 'বিজয়া' নাটকটি পরিবেশন করলেন সাফল্যের সঙ্গে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ এবং প্রধান অতিথিরূপে কলকাতার সেরিফ শ্রীরঘুনাথ দে উপস্থিত ছিলেন।

'বিজয়া' শরৎচন্দ্রের হৃদয়গ্রাহ্য নাটক। এ নাটকে যত না জটিলতা তার চেয়ে বেশী আবেগ এবং সংঘাত। তাই এ নাটক সর্বকালেই দর্শককে সমানভাবে আকর্ষণ করে। নাটকের কেন্দ্র-চরিত্র বিজয়ার নরেনের প্রতি নিরুচ্চার আকর্ষণ এবং বিলাস বিহারীর ভূমিকা অভিনয়ের গুণে এক সময় যেন, আপনা হতেই দর্শকের মনকে আপ্লুত এবং আবিষ্ট করে রাখে। এমনি দুর্বার এ নাটকের গল্পের আকর্ষণ।

সেটা আর একবার বোঝা গেল সেদিন ইনস্টিটিউটের শিল্পীদের দ্বারা অভিনীত 'বিজয়া' নাটক দেখতে দেখতে।

দর্শকদের সেদিন সবচেয়ে বেশী অবাক করেছেন শ্রীসতী রায়' (রাসবিহারী), শ্রীমুকুলকান্তি ঘোষ (বিলাসবিহারী), শ্রীবীরেনকান্তি ঘোষ (নরেন) বালক 'পরেশরূপী শ্রীমান কুণালকান্তি ঘোষ এর স্বচ্ছন্দ ও সজীব অভিনয় দর্শকদের রীতিমত বিস্মিত করেছে। এমন অভিনয় ছোটদের মধ্যে বড় একটা দেখাই যায় না। এবং 'বিজয়ার ভূমিকায় শ্রীমতী বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়।

বিলাসবিহারীর জটিল এবং রূপায়ণে-কঠিন চরিত্রটি ফোটাতে মুকুলকান্তিবাবু যে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন এবং তা যে কতটা সার্থক হয়েছে তার প্রমান দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন। তাঁর সার্থকতা সেখানেই।

স্বচ্ছন্দ অভিনয়ের জন্য বীরেনকান্তি বাবু এবং সহৃদয় অভিনয়ের জন্য বিজয়ারূপী বাসন্তী দেবীও দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। এই তিন শিল্পীর অভিনয় বহুদিন মনে থাকবে দর্শকদের।

এরপরেই নাম করতে হয় অসীমরতন গাঙ্গুলী (কালিপদ), গীতশ্রী দেবী (পরেশের মা) এবং শ্রীসুধীর মুস্তাফীর (দয়াল)।

এছাড়া সুশীলকুমার মুখার্জী, সুমিত চৌধুরী, তরুণচন্দ্র কর, হিরন্ময় মুন্সী বরুণ দত্ত, প্রতাপ রায়চৌধুরী, শ্যামল দে বিশ্বনাথ মিত্র (কাবুল) ও শ্রীমতী কাজল ব্যানার্জী চরিত্র অনুযায়ী সু-অভিনয় করেছেন।

এমন একটি রসোত্তীর্ণ এবং সর্বাঙ্গসুন্দর নাটক উপহার দেবার জন্য নাট্য-পরিচালক শ্রীমাহরলাল গাঙ্গুলীকে ধন্যবাদ। নাট্য পরিচালনায় তিনি যে কতখানি যোগ্য তার পরিচয় সেদিন তিনি রেখেছেন। সত্যি বলতে কি, এমন একটি দুরূহ নাটককে সুষ্ঠুভাবে মঞ্চস্থ করা খুব কঠিন।

আবহসঙ্গীতে কমলকৃষ্ণ ব্যানার্জী সুশিল্পীবৃন্দ রীতিমত যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন।

জীবনরঙ্গ

সল্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব সম্প্রতি পরিবেশন লেন শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'জীবন-' নাটকটি। এই হাসির নাটকটিতে কভাবে অভিনয় করেন অসিত বসু, পদ ভট্টাচার্য, শিবকৃষ্ণ মুখার্জী, লেন্দু ঘোষ, শঙ্কর বিশ্বাস, অমিয় , শান্তি ভট্টাচার্য, সুহাস ব্যানার্জি, হত ঘোষ, হরেন চক্রবর্তী, অর্পিতা ঘোষ জ্যোৎস্না বিশ্বাস।

য়্যায়সা কা ত্যায়সা

মহাকবি গিরিশ চন্দ্রের প্রহসনমূলক 'য়্যায়সা কা ত্যায়সা' সম্প্রতি রাম-স মঞ্চে পরিবেশন করলেন পদাতিক দল।

গিরিশ ঘোষের নাটক একালে বড় টা মঞ্চস্থ করতে দেখা যায় না। যুগের গত পার্থক্যই বোধ হয় এর মূল কারণ। তু সবটাই কি তাই? আমার অন্তত তা হয় না। তাঁর 'প্রফুল্ল' নাটক এখনও দের চোখে যে জল আনে, তাও দেখা ছ।

গিরিশ চন্দ্রের 'য়্যায়সা কা ত্যায়সা' ন মূলক নাটক বলা হলেও মূলত ব্যঙ্গ সাটায়ার ধর্মী নাটক। পদাতিক তাকে গান হাসি দিয়ে জমিয়েছিলেনও ভাল। টি অপেরা ঢঙে পরিবেশন করা

নাটকটি সম্পাদনা, পরিকল্পনা ও র্শনায় ছিলেন দিলীপ মজুমদার: তি পরিচালনায় মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ্যতর পরিচয় দিয়েছেন।

বৈকুন্ঠের উইল : শরৎ জন্ম শত-র্ষকী উপলক্ষে বাগবাজারের অন্তরঙ্গ সংস্থা ২১ আগষ্ট অমৃতলাল হলে মবাজার এ-ভি স্কুল) বৈকুন্ঠের উইল কটি সাফল্যের সংগে অভিনয় করেন। নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন প্রখ্যাত ও সমালোচক মনোমোহন ঘোষ, শরৎ হনীর অন্তর্নিহিত আবেদন এত গভীর স্বতঃই মানুষকে মুগ্ধ করে তার উপর সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করা যায় তবে র্থক হয়ে ওঠে। নির্দেশক এই দিকেই রেখে যেভাবে নাটকটির উপস্থাপনা ছেন তা প্রশংসার দাবী রাখে। অভি-প্রতিটি শিল্পী নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে-এককভাবে কোন অভিনেতাকে বিশে-না করে সামগ্রিকভাবে বিচার করলে ত্র-নির্বাচন যথাযথ হয়েছে বলা যায়। ল ঘোষ রবীন ঘোষ শশাঙ্ক চ্যাটার্জী া পাল চন্দ্রশেখর দে পরিমল পাল া অধিকারী সুভাষ দাস তাপস বোস ন ঘোষ পরেশ নন্দন মানিক ঘোষ র্থ দত্ত রাধারাণী সন্ধ্যা ঘোষ শেলী পুষ্প মন্ডল রানু আচার্য মিতা দত্ত মা মন্ডল প্রমুখ শিল্পীরা অভিনয়ে গ্রহণ করেন। নলিনী করনের সংগীত স্থাপনাকে ভালই বলা যায়।

নিধিরাম সর্দার
অপর্ণা সেন

সফল অভিনয় : গত ২০ আগষ্ট ৭৬ শ্যামাপ্রসাদ মঞ্চে ফেরারী কাব্যে দর্ষি' অতি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। নাট-কটি পরিচালনা করেন অমর মৈত্র এবং নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে সু-অভিনয় করেন রাজকুমার লাহিড়ী গোরা লাহিড়ী গোবিন্দ ভট্টাচার্য স্বপন সেনগুপ্ত মানস রায় বাপী চট্টরাজ অমর মাইতি অজিত দাঁস মাঃ বিপ্লব মন্দিরা দাস রীতা দাশ-গুপ্ত ও অমর মৈত্র।

গভর্ণমেণ্ট ইনস্পেকটর

গত ২২ জুলাই এ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে মেটাল বক্স অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাব বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে ভোলা দত্তের নির্দেশনায় গভর্ণমেন্ট ইনস্পেকটর নাটকের প্রশংসনীয় মঞ্চাভিনয় করেন। অজিত ব্রহ্মচারীর উদ্বোধনী ভাষণের পর প্রধান অতিথি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, স্বভাবসিদ্ধ মৃদু রসিকতায় প্রেক্ষাগৃহ হাসিতে ফেটে পড়ে আর নাটকের গতি সে হাসিকে ধরে রাখে যবনিকার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। শিল্পীদের সমবেত নাটনৈপুণ্যে দর্শনীয় টিম-ওয়ার্ক সৃষ্টি করে দর্শককুলকে বিমোহিত করে। আবহসঙ্গীত ও বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীতে ও সংলাপে এফেকট মিউজিক উপভোগ্য। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন বিশ্বনাথ বোস সনৎ তোষ সুকুমার চ্যাটার্জি প্রকাশ চ্যাটার্জি নির্মলা রায় সনী ভট্টাচার্য রমেন দত্ত প্রশান্ত সান্যাল শ্যামল ট্টার্জি নীরোদ সাহা অলোকেশ ভট্টাচার্য গোবিন্দ পাল আরতি ঘোষ বেবী ঘোষ ও শাশ্বতী চৌধুরী।

নাট্য সমালোচক

বিদেশী ছবি

যিশুকে নিয়ে সেই বিতর্কমূলক [redacted]

ইতিপূর্বে যে দুটি [redacted] ছবির সংবাদ সমগ্র পৃথিবীর [redacted] দর্শকদের সচকিত ও কৌতূহলী [redacted] তুলেছিল তার একটি আদম ও ইভকে নিয়ে নুড ছবি এবং দ্বিতীয়টি হোলো নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে যিশুর জীবনী ভিত্তিক ছবি। এ নিয়ে বেশ কিছুদিন বাদ প্রতিবাদ হৈ চৈ এমন কি প্রচণ্ড বিক্ষোভও হয়ে গেছে। এবং কোন কোন জায়গায় সেই ছবি প্রদর্শনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনও হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সেই ছবির প্রদর্শন বন্ধ করে দিতে হয়েছে।

ছবিটি যিশুর জীবনী অবলম্বনে প্রস্তুত। হপ জে টকনফিল্ড নামক ৭০ বছরের ইংরেজ লেখকের 'দি পাস ওভার প্লট' নামক বই-এর ভিত্তিতে ছবিটি তৈরী হয়েছে। এই বইতে বলা হয়েছে যেণ রুশ-বিদ্ধ হয়ে যিশুর মৃত্যু হয়েছিল বলে এযাবৎকাল যে কাহিনী প্রচলিত আছে, আসলে তা সত্য নয়। আসলে যিশু একজন তৎকালীন রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের ঘটনা তিনি নিজেই পূর্বাহ্নে সাজিয়ে রেখছিলেন। চলচ্চিত্রটিকে সেই সব ঘটনা বা বিষয়ই প্রাধান্য পেয়েছে বলে ছবিটিকে ঘিরে সেখানে প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে বিতর্কের।

দশ বছর আগে যখন এই বইটি প্রকাশিত হয়, তখনি পাঠক মহলে তুমুল হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। চলচ্চিত্র রূপায়িত হবার পরও সেই একই প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। বইটি বেরুবার পর ভাটিকান ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকেও তীব্রভাবে আপত্তি জানানো হয়েছিল তাঁদের উপাস্য দেবতাকে ছোট করে দেখানো হয়েছে এই যুক্তিতে। তাতে কিন্তু পাঠক মহলে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি বরং বইটির লক্ষ লক্ষ কপি দ্রুত বিক্রি হয়ে গিয়েছিল।

বই--এর কাহিনী সম্পর্কে লেখক স্কন-ফিল্ড-এর বক্তব্য : যিশু ছিলেন [redacted] রোমান জবরদস্ত শাসকদে[redacted] বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী জনগণের নেতা। স্বভাবতই সেই জন্য তাঁকে প্রচুর অত্যাচারও সহ্য করতে হয়েছিল। তাই এটা বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে উন্মত্ত জনতা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে মারেনি। নিজের নৃশংস মৃত্যু হতে পারে জেনে তিনি নিজেই গোপনে ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন এমন ওষুধ খাবার যা দেহে বিষের ক্রিয়া করে। সেই গোপন ব্যবস্থা মতই তিনি সেই ওষুধ খান ও দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়েন। এবং শেষ পর্যন্ত অচেতন হয়ে পড়েন। কিন্তু তাতেও তাঁর মৃত্যু হয়নি। আসলে মৃত্যুর সু[redacted] হয়েছিল ঐ বিষাক্ত ওষুধ খাওয়ার আগে[redacted] রোমান সৈনিকের হাতের অস্ত্রে গু[redacted] জখম হয়ে। পরে একদল ইহুদী তাঁর দেহ সমাধিস্থ করে। কুশবিদ্ধস্থান গ্রাম সেই কবর দেখতে এলে তাদের বোঝানো [redacted] যিশুর পুনরুত্থান ঘটেছে। লেখক [redacted] খানে বাইবেলের নিউ টেস্টামে[redacted] অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে [redacted] গ্রেপ্তার এবং মৃত্যুর ঘটনা স[redacted] সাজানো।

এই বক্তব্য এবং বিষয়বস্তুর [redacted] তোলা ছবিটির দৃশ্যগ্রহণ জেরুজ[redacted] অঞ্চলেই হয়েছে। বাইবেলে উল্লেখ অনু[redacted] যিশুর জীবন এই অঞ্চলেই কাটে।

খোদ গোড়া পরই এমন চলচ্চিত্র [redacted] ও প্রদর্শন স্বভাবতই জেরুজালেমবাস[redacted] মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন ও ক্ষোভের [redacted] করেছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এ[redacted] দেখার জন্য এক শ্রেণীর দর্শকদের [redacted] প্রচুর আগ্রহেরও সৃষ্টি হয়েছে।

ধর্মের ভিত নাড়া দিয়ে এমন চ[redacted] নির্মাণ করা যেমন নতুন বিচারবোধের [redacted] আগ্রহের প্রমাণ তেমনি সেটা দুঃসাহ[redacted] বটে। যা দেশের মানুষের কাছে কল্প[redacted] অতীত। —শ.

শঙ্কর দাদা

প্রযোজনা : কাপুর ফিল্মস ইণ্টারন্যাশনাল

অমর সিং একজন সৎ পুলিশ অফিসার, দুই যমজ পুত্র রাম ও শঙ্করকে নিয়ে আনন্দের মধ্যে দিয়েই দিন অতিবাহিত হচ্ছিল। বাবুদাদা নামে একজন কুখ্যাত স্মাগলার অমর সিং-এর সৎ উৎকোচের সাহায্যে সমঝোতায় না আসতে পেরে এমন এক ষড়যন্ত্র করলো যার ফলে অমর সিং-এর মতো সৎ ব্যক্তিও হত্যাকাণ্ডের মিথ্যা ফাঁসলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হল। ওঁর সুখের সংসার ভেঙ্গে গেল। স্ত্রী পাগল হয়ে গেল রাম একজন সৎ পুলিশ অফিসার হতে পারলেও শঙ্কর একজন কুখ্যাত অসামাজিক ব্যক্তিতে পরিণত হল। এরপর নানাবিধ ঘটনা উপঘটনার মধ্যে দিয়ে রাম কুচক্রীদের হাতে বন্দী হল, শঙ্কর রাম সেজে পুলিশের কাছে ধরা পড়ল। কচক্রী বাবুদাদা গ্রেপ্তার হল দুই যমজ ভাইয়ের সঙ্গে মা ও বাবা অমর সিং-এর পুনর্মিলন ঘটল। রাম তাঁর প্রেমিকাকে বিবাহ করে আবার গড়ে তুলল সুখের সংসার।

গতানুগতিক ও কাল্পনিক কাহিনী চিত্রনাট্য ও পরিচালনার জন্য ছবিটি তেমন জমতে পারেনি তবে ছবির মিশ্রগতির জন্য পরিচালক শিবু মিত্র সাধুবাদ পাবেন। অভিনয়ে অশোককুমার [redacted] শশী কাপুর বিন্দু ও নিতু সিং সকলেই দুর্বল চিত্রনাট্যের শিকার হয়েছেন। [redacted] কৌশল আণ্ডিক এবং সৌনিক [redacted] সংগীত পরিচালনা সুন্দর।

রংগীলা রতন : প্রযোজনা : আ[redacted] ফিল্মস। শহরের খ্যাতনামা পাবলিক [redacted] কিউটারের একমাত্র পুত্রকে প্রতি[redacted] নেবার জন্যে লক্ষ্মণদাদা অপহরণ [redacted] কালরমে সেই গোপাল (কিষণ) ও [redacted] নামর ছেলেটিকে একজন কথাতি পকে[redacted] থেকে শুরু করে গুণ্ডায় পরিণত [redacted] ওর মনের আশা অতৃপ্ত রয়ে গেল। [redacted] ডাক্তার আনন্দ গোপাল কিষণকে এ[redacted] সৎ ব্যক্তিতে পরিণত করে রতন [redacted] চাইল তখন লক্ষ্মণদাদা আবার সেই ভয়[redacted] এক মিথ্যা হত্যাকাণ্ডের আসামী [redacted] নিজের ছেলের প্রতিশোধ নেবার [redacted] করতে গিয়ে নিজেই পুলিশের হাতে [redacted] সমর্পণ করে কৃতকর্মের ফল পেল।

পরিচালক এস রামনাথন সমাবেদনা[redacted] দৃশ্যের ও মহান আদর্শ প্রভৃতি পরিকল্প[redacted] মধ্যে সকলকে আনন্দ দেবার [redacted] করেছেন। অভিনয়ে : অশোককুমার শ্রী[redacted] লাগছে দুর্গা খোটে পারভিন বাবী [redacted] কাপুর মন্দ নয়। আণ্ডিকের কাজ উচ্চ[redacted] কিন্তু সংগীত গতানুগতিক।

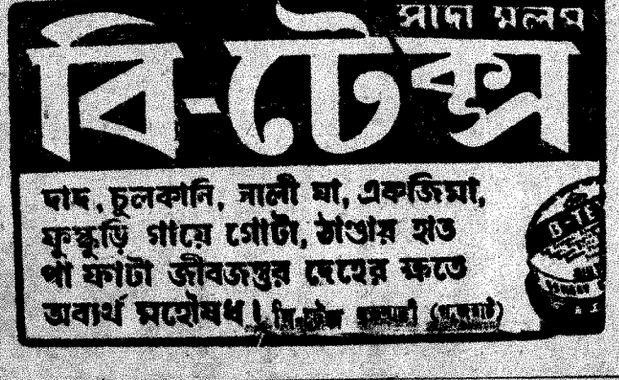

মুদ্রক পাবলিসার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষ শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

...ভাবতে পারবেন না!

ফিনিট

ছড়ান বাড়ীতে নিয়মিতভাবে, বাড়ী পোকামাকড় মুক্ত করুন, নিরাপদ অথচ নিশ্চিতভাবে!

বিজ্ঞানসম্মত ফরমুলায় তৈরী ফিনিট বহু উদ্দেশ্যসাধক কীটনাশক—মাছি, ম[illegible] আরশোলা, ছারপোকার মত সব পোকামাকড় মারবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী।

অতএব, নাশ করুন সারা বাড়ীর কীট, ছড়িয়ে দিয়ে ঘাতক ফিনিট। মশা, মাছি, আরশোলা, ছারপোকা:

ফিনিট ছড়ান, ওদের খতম করুন!

নিরাপদ অথচ নিশ্চিতভাবে।

HP

হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003
AMRITA
Phone
iaa/kc0107

অনায়াসে দ্বিতীয়বার সম্মান অর্জন করলো

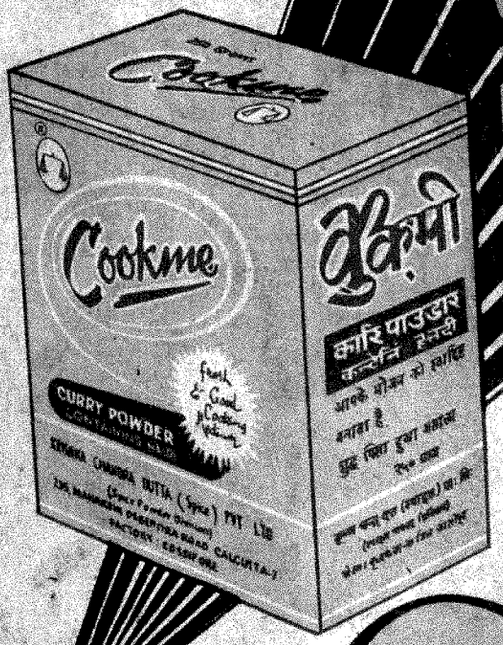

কুকমী

গুঁড়ো মশলা

ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট
কোয়ালিটী প্রোডাক্ট
কর্তৃক প্রদত্ত
একমাত্র উচ্চমানের অকৃত্রিম
গুঁড়ো মশলা হিসাবে
শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি ও
সম্মানপত্র লাভ।

IQP

- সর্বোত্তম মান
- ন্যায্য ও নির্দিষ্ট মূল্য
- সঠিক ওজন
- উপাদানের বিশুদ্ধতা
- সমাজ সেবার প্রতি অঙ্গীকার
- তৎপর ও দ্রুত সরবরাহ ব্যবস্থা

স্বদেশে ও বিদেশে
সকলের সেবায়
আমরা নিজেদের
নূতন করে
নিয়োজিত করছি

TRANS-WORLD TRADE FAIRE
SERVICE AWARD DELHI

এই বৎসরের শুরুতেই
কুকমী গুঁড়ো মশলা
নিউ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত
ট্রান্সওয়ার্ল্ড ট্রেডফেয়ার-
ক্লাশ—এ
স্বর্ণপদক জয় করেছে।

প্রস্তুতকারক :
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাইভেট লিমিটেড
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০০৭০, পোষ্ট বক্স নং, বড়বাজার : ৬৮৮৫ ফোন : ৩৩০৯৯
ফ্যাক্টরী : কাশীপুর